ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কি

অখন্ড সংস্করণ

- বাংলাবুক.অর্গ -

# কারামাজভ্ ভাইয়েরা

রুশ থেকে অনুবাদ ।। অরুন সোম

**'কারামাজভ্ ভাইয়েরা'** দস্তইয়েভ্স্কির সর্ববৃহৎ রচনা, তাঁর জীবনের সর্বশেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

দস্তইয়েভ্স্কির অন্য আরও উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটিও বাহ্যত একটি অপরাধের কাহিনি। উপন্যাসের প্লট আধুনিক যে-কোনও রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনির মতোই চমকপ্রদ, তার চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে নানা উপকাহিনি, বিচিত্র সমস্ত ঘটনা।

প্রকরণের বিচারে বহুকণ্ঠের সমন্বয়ে বিশালতার আবহ সৃষ্টির যে কোরাস রীতির আশ্রয় তিনি তাঁর রচনাগুলিতে গ্রহণ করেছিলেন তারও চরমোৎকর্ষ এই উপন্যাসে।

গভীর দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস সর্বকালীন রাশিয়ার মহাগাথা, দস্তইয়েভ্স্কির সর্বাধিক আলোচিত মহাগ্রন্থ।

**ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কি**-র (১৮২১-১৮৮১) জন্ম মস্কোয়। রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী পেতের্বুর্গের মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক হওয়ার পর ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'অভাজন' নামে ছোট উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

অপরাধ ও শাস্তি (১৮৬৬), জুয়াড়ি (১৮৬৭), ইডিয়ট (১৮৬৯), কারামাজভ্ ভাইয়েরা (১৯৮০) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। জীবিতকালেই তিনি তুর্গেনেভ্ ও তল্‌স্তোয়ের সমপর্যায়ের লেখকে পরিণত হয়েছিলেন।

**অরুণ সোম** (জ. ১৯৩৮) রুশ ভাষায় বিশেষজ্ঞ প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সাংবাদিক। মস্কোর 'প্রগতি' ও 'রাদুগা' প্রকাশনে দীর্ঘ দুই দশকের কর্মসূত্রে রুশ ও সোভিয়েত ক্লাসিক, শিশু ও কিশোর সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, গোগল, তুর্গেনেভ্, তল্‌স্তোয়, চেখভ্, শোলখভ্ প্রমুখের রচনা রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তুর্গেনেভের পিতা পুত্র, শোলখভের প্রশান্ত দন, গোগলের রচনাসপ্তক, দস্তইয়েভ্স্কির অপরাধ ও শাস্তি, ইডিয়ট, তল্‌স্তোয়ের যুদ্ধ ও শান্তি। উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ রুশ সাহিত্যের ইতিহাস, রবীন্দ্র চেতনায় রাশিয়া ও রবীন্দ্র চর্চায় রাশিয়া।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ
মূল্য : ৫৮০ টাকা
ISBN 978-93-89778-41-0
*Karmazv Bhayera (Volume I)* (Bengali)
₹ 580/-

সাহিত্য অকাদেমি

The Online Library of Bangla Books

# কারামাজভ্ ভাইয়েরা

**অখন্ডসংস্করণ**

ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কি

রুশ থেকে অনুবাদ

অরুণ সোম

The Online Library of Bangla Books

সাহিত্য অকাদেমি

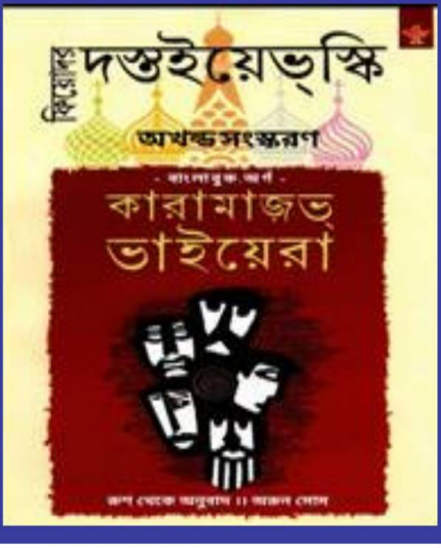
ফিওদর
দস্তইয়েভ্স্কি
অখণ্ড সংস্করণ
- বাংলাবুক.অর্গ -
কারামাজভ্
ভাইয়েরা
রুশ থেকে অনুবাদ :: অরুণ সোম

- বাংলাবুক.অর্গ -

নির্দিষ্ট পর্ব পড়তে চাইলে ,আপনার

পছন্দের পর্বের উপরে ক্লিক করুন :

# পর্ব - ১

# পর্ব - ২

# কারামাজভ্ ভাইয়েরা

এই পুস্তকের অন্তঃপ্রচ্ছদে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। এই ভাস্কর্যের বিষয়: রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় তিনজন জ্যোতিষী ভগবান বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। জ্যোতিষীদের আসনের তলায় বসে করণিক তাঁদের বক্তব্য লিখে চলেছেন। অনুমান এটি ভারতের লিখনকলার প্রাচীনতম চিত্ররূপ।

উৎস নাগার্জুন কোণ্ডা, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক
সৌজন্য জাতীয় সংগ্রহালয়, নতুন দিল্লী

The Online Library of Bangla Books

# কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা

## প্রথম খণ্ড

ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কি

রুশ থেকে অনুবাদ

অরুণ সোম

The Online Library of Bangla Books

সাহিত্য অকাদেমি

**Karmazv Bhayera : Volume I (Novel)**: A translation by Arun Som, of the Russian Novel Brat'ya Karmazovy by Fyodor Dostoyevsky. Sahitya Akademi, New Delhi (2020). Price : Rs. 580.

Copyright © সাহিত্য অকাদেমি ২০২০

ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কি, ১৮২১-১৮৮১ লেখক

অরুণ সোম, ১৯৩৮ —: অনুবাদক

বিষয়: উপন্যাস

প্রকাশক: সাহিত্য অকাদেমি

প্রথম প্রকাশ: ২০২০

ISBN 978-93-89778-41-0

৫৮০ টাকা

---

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সাহিত্য অকাদেমির লিখিত অনুমতি ছাড়া, ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার সমস্ত পদ্ধতি সহ অন্য কোনও ধরনের যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক উপায়ের মাধ্যমে এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ কোনও ভাবেই পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

---

সাহিত্য অকাদেমি

**প্রধান কার্যালয়:** রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
secretary@sahitya-akademi.gov.in, ০১১-২৩৩৮৬৬২৬/২৭/২৮

**বিক্রয় কেন্দ্র:** 'স্বাতী', মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
sales@sahitya-akademi.gov.in, ০১১-২৩৭৪৫২৯৭, ২৩৩৬৪২০৪

**কলকাতা:** ৪ দেবেন্দ্রলাল খান রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৫
rs.rok@sahitya-akademi.gov.in, ০৩৩-২৪১৯১৬৮৩/২৪১৯১৭০৬

**চেন্নাই:** গুণ বিল্ডিং কমপ্লেকস্ (তৃতীয় তল), ৪৪৩, (৩০৪) আন্না সলাই,
তেয়নামপেট, চেন্নাই ৬০০ ০১৮
chennaioffice@sahitya-akademi.gov.in, ০৪৪-২৪৩১১৭৪১

**মুম্বাই:** ১৭২ মুম্বাই মরাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
rs.rom@sahitya-akademi.gov.in, ০২২-২৪১৩৫৭৪৪/২৪১৩১৯৪৮

**বেঙ্গালুরু:** সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ড. বি. আর. আম্বেদকর ভীধি
বেঙ্গালুরু ৫৬০ ০০১ www.BanglaBook.org
rs.rob@sahitya-akademi.gov.in, ০৮০-২২২৪৫১৫২/২২১৩০৮৭০

প্রচ্ছদ সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস: ডট কম মাল্টি হাব, কলকাতা

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা

---

Website: http://www.sahitya-akademi.gov.in

# প্রসঙ্গত

'কারামাজভ্ ভাইয়েরা' প্রথমে '*রুশবার্তা*' পত্রিকার ১৮৭৯ সালের নয়টি সংখ্যায় এবং ১৮৮০ সালের ৭টি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দস্তইয়েভ্স্কির জীবদ্দশাতেই পৃথক গ্রন্থাকারে ৩ হাজার মুদ্রণে প্রকাশিত হয় সাংক্ত্ পেতেবুর্গ থেকে, ১৮৮১ সালে, তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কোনো সংস্করণেই ধারাবাহিক প্রকাশের সময় যে সমস্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছিল সেগুলির সংশোধন ছাড়া রচনাশৈলীগত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

দস্তইয়েভ্স্কির চারটি সাধারণভাবে স্বীকৃত মহৎ সৃষ্টিরই (*অপরাধ ও শাস্তি*, ১৮৬৬; 'ইডিয়ট', ১৮৬৮; 'অপদেবতা', ১৮৭২; 'কারামাজভ্ ভাইয়েরা', ১৮৮০) বিষয়বস্তু হত্যাকাণ্ড। *কারামাজভ্ ভাইয়েরা* উপন্যাসের বিষয়বস্তু পিতৃহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েক জন আবেগপ্রবণ সন্তানের আত্মজিজ্ঞাসা ও তাদের মানসিক পরিবর্তন।

লেখকের এই শেষ উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর সূত্র অনেকে সন্ধান করেছেন তাঁর নিজের বাবার শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে। উপন্যাসের প্রথম দুটি অধ্যায়ের নায়ক, পরিবারের পিতা ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ কারামাজভের মতোই লেখকের ও বাবা মিখাইল আন্দ্রেয়োভিচ্ খল প্রকৃতির ও ভ্রষ্টাচারী ছিলেন। প্রথম জীবনে মস্কোর মারিইন্‌স্কি হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতেন। পরে ছোটোখাটো ভূস্বামীও হয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর মদ্যপান ব্যভিচার ও অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। একবার তুলার কাছাকাছি তাঁর জমিদারি থেকে নিজেরই আরেকটি জমিদারি চের্‌মাশ্‌নোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর তিনি আর ফেরেন না (উপন্যাসে 'চের্‌মাশ্‌নিয়া' নামে উল্লেখ আছে এই জায়গাটির, যেখানে বুড়ো কারামাজভ্ তার মেজো ছেলে ইভানকে পাঠাতে চেয়েছিল)। ভূমিদাসদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার দরুন হোক বা নারীঘটিত কোন কারণেই হোক—যা পরে কোনো কালে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি—পথে তাঁর নিজের প্রজাদের হাতেই খুন হলেন মিখাইল আন্দ্রেইয়েভিচ্। ফিয়োদরের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। সংবাদটি শোনার পর তিনি মূর্ছা গিয়েছিলেন। অনেকের মতে, এটা ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন মৃগীরোগের একটি বহিঃপ্রকাশ, তাঁর কোনো কোনো জীবন চরিতকারের অবশ্য স্থির বিশ্বাস এই মানসিক আঘাতই তাঁর পরবর্তী জীবনের চিরসঙ্গী মৃগীরোগের কারণ।

*কারামাজভ্ ভাইয়েরা* উপন্যাসে সংঘটিত পিতৃহত্যার ঘটনার সঙ্গে দস্তইয়েভ্স্কির নিজের বাবার ভাগ্যের অভ্রান্ত যোগাযোগের ব্যাপারটি তাঁর জীবনচরিতকার ও মনোবিদদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং মনোবিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই ঘটনার

যোগাযোগকে তাঁদের অনেকে বিশ্লেষণও করেছেন। এই বিষয়ে 'দস্তইয়েভ্স্কি ও পিতৃহত্যা' শিরোনামে জিগমুন্ড ফ্রয়েডের একটি বিশদ পর্যালোচনাও আছে, যদিও লেখক নিজে পিতৃহন্তা নন এবং কাহিনিতে যে ব্যক্তি বস্তুত হত্যা করেছিল তার সঙ্গে লেখকের আরও তফাত এই যে লোকটার মৃগীরোগ আগে থাকতেই প্রকট ছিল।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের ধারণা বালক ফিয়োদর একজন স্বৈরাচারী ব্যক্তির মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিল, আর সেই ব্যক্তিটি অন্য কেউ নয়—তারই ঘৃণিত পিতা। একজন বালকের মনে মনে তার পিতাকে শাস্তিদানের এবং তাকে আক্রমণ করার এক গোপন ইচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন মৃগীরোগগতও হতে পারে। সেই আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি যখন সংঘটিত হয় তখন নিজে হাতে তা না ঘটালেও একটা অপরাধবোধ তার মনের মধ্যে বাসা বাঁধলেও বাঁধতে পারে, আর তখন নিজেকে শাস্তিদানের মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদি তার প্রবল হয়ে ওঠে সেটাও বিচিত্র নয়। দস্তইয়েভ্স্কি জীবনে কখনও মুক্ত হতে পারেন নি সেই অপরাধবোধ থেকে যা তার নিজের জন্মদাতা পিতাকে খুন করার অভিপ্রায় থেকে উঠে এসেছিল। লেখকের পারিবারিক এবং অন্যান্য সূত্র থেকেও জানা যাচ্ছে সারাটা জীবন এই অপরাধবোধ তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। বন্ধু স্ত্রাখভ্‌কে তিনি বলেছিলেন নিজেকে তিনি একজন দাগী অপরাধী বলে মনে করেন। একটা অজানা অপরাধের ভার যেন সব সময় তাঁর ওপর চেপে থাকত। তাঁর মনে হত যেন তিনি কোনো বড়ো রকমের দুষ্কর্ম করেছেন, যা তাঁকে পীড়ন করছে। লেখকের কন্যার কথায় 'সারা জীবন তিনি তাঁর বাবার বিভীষিকাময় মৃত্যুর বিশ্লেষণ করেছেন। ফিয়োদর কারামাজভের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তিনি হয়তো তাঁর নিজের বাবার সঙ্কীর্ণ চিত্তের কথাই স্মরণে রেখেছিলেন, যা তাঁর সন্তানদের মনে তাঁর ব্যভিচার লাম্পট্য ও পানোন্মত্ততার দরুন নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার করত।....'

চল্লিশ বছর নীরব থাকার পর কথাশিল্পী ওই ঘটনার ভিত্তিতে রচিত তাঁর অন্তিম রচনায় তাঁর নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। ব্যভিচার, অপরাধ ও পাপ এবং নৈতিক অপরাধ, পাপবোধ ও আত্মশুদ্ধির এক জটিল মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে এই উপন্যাসে লেখক তাঁর সমাজচিন্তা, অধ্যাত্মচেতনা এবং অভিনব দর্শন চিন্তার এক নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটন করলেন।

১৮৪৩ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর দস্তইয়েভ্স্কি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সরকারি ডিপার্টমেন্টের নকশা অফিসে চাকরি পান। কিন্তু পরের বছরই পদত্যাগ করেন। নিজেকে কবি বলে মনে হত, ইঞ্জিনিয়ার বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।.... তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল 'যে যা-ই বলুক, আমার ভবিষ্যৎ আমার নিজের হাতে এবং একমাত্র আমিই তার প্রভু।' কোনো ভুল ছিল না।

এর এক বছর পরে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস *অভাজন*। তখনকার দিনের সাহিত্য সমালোচনা জগতের একচ্ছত্র অধিপতি, প্রকৃতিবাদী সাহিত্যধারার পৃষ্ঠপোষক ভিস্‌সারিওন বেলিনস্কি এই তরুণ লেখকের মধ্যে 'মহৎ লেখকের সম্ভাবনা' দেখতে পেয়েছিলেন। দস্তইয়েভ্স্কির উপন্যাসটিকে তিনি 'শিল্পের সত্য' আখ্যা দেন।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে চমকে উঠেছিলেন সমকালীন কবি, সাহিত্যস্রষ্টা ও কথাশিল্পী নেক্রাসভ্। 'এক নতুন গোগলের উদয় হয়েছে!' তিনি সহর্ষে বলে উঠেছিলেন। বস্তুত গোগলের বিচারমূলক বাস্তবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল দস্তইয়েভ্স্কির এই রচনায়।

প্রথম উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন ধীরেসুস্থে—প্রায় বছর খানেক ধরে। রাজধানীর বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিষ্ঠালাভের ফলে তরুণ লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তিনি দ্রুতগতিতে বেশ কয়েকটি ছোটো ও বড়ো গল্প লিখে ফেললেন। দ্বৈত (১৮৪৬), প্রণয়িনী (১৮৪৭) এবং শুক্লা যামিনী (১৮৪৮) তাঁর এই পর্বের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এখান থেকেই লক্ষ করা যায় যে দস্তইয়েভ্স্কি দ্রুত তাঁর সাহিত্যের সুর পালটে ফেলেছেন, অন্যথায় বলা যেতে পারে এটাই ছিল তাঁর প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ বাস্তবতার মধ্যে যে-কল্পনার উপকরণ এবং মানবচৈতন্যের যে-গূঢ় তাৎপর্যময় ও তামসিক পরিচয় নিহিত থাকতে পারে কোনো কল্পিত জগতের আশ্রয় গ্রহণ না করে জার্মান ঔপন্যাসিক হফ্মানের (১৭৭৬ ১৮২১) আদর্শে লেখক এগুলির মধ্যে তারই অনুসন্ধানে ও পরিচয় উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত। এ হল কাহিনি বিন্যাসের সেই কৌশল যেখানে ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরস্পরাবিরোধী তথ্যগুলির মধ্য দিয়ে পাঠককে অনুসন্ধান করতে হয় এবং স্থির করে নিতে হয় ঘটনাগুলি কোনো ভারসাম্যহীন চরিত্রের কল্পনা বা অতিপ্রাকৃতকে বাস্তবরূপে উপস্থাপনার প্রয়াস কিনা। দস্তইয়েভ্স্কির সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে অতঃপর যে বিষয়টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা ছিল দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান। বিশেষত 'প্রণয়িনী'তে দস্তইয়েভ্স্কি নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণির পরিবেশ থেকে দূরে সরে গিয়ে যে ভাবে হফ্মানের প্রকৌশল অথবা গোগলের পরবর্তীকালে অনুসৃত 'সেন্টিমেন্টাল প্রকৃতিবাদের' আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বেলিন্স্কি তাকে স্বাগত জানাতে পারেননি। দস্তইয়েভ্স্কি সম্পর্কে অচিরেই তাঁর মোহভঙ্গ ঘটেছিল, যেমন ঘটেছিল গোগলের পরিণতিতে। গোগলের বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লেখকের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ পত্রও লিখেছিলেন বেলিন্স্কি। জারের সেন্সরব্যবস্থা উক্ত পত্রের প্রকাশ ও প্রচারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

*অভাজন* উপন্যাসের সাফল্যের ফলে রাজধানীর প্রথম সারির সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়ে তাঁদের প্রভাবে, বিশেষত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সমালোচক বেলিন্স্কির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রভাবে ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের রচনা পাঠ করার ফলে শুরুতে ইউরোপীয়, বিশেষত ফুরিয়ের সমাজতন্ত্রের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকেছিলেন দস্তইয়েভ্স্কি। রাজধানীর রাজনৈতিক বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তিনি। ১৮৪৭-এর কোনো এক সময় থেকে তিনি পেতের্বুর্গের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পেত্রাশেভ্স্কি পরিচালিত এক গোপন বিপ্লবী সংগঠকের উদ্দেশ্যে পেত্রাশেভ্স্কির জনৈক সহযোগী পরিচালিত প্রগতিশীল পাঠচক্রের সভায় যাতায়াত করতে থাকেন। পরে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে পেত্রাশেভ্স্কির জনৈক সহযোগী পরিচালিত এক গোপন বিপ্লবী সংগঠক যোগ দেন। অথচ মনে রাখতে হবে এই সময়ের মধ্যে 'দ্বৈত' বা 'প্রণয়িনীর' মতো এমন সমস্ত রচনা তিনি লিখে ফেলেছেন যেগুলির সঙ্গে সমাজতন্ত্রী ধ্যানধারণার কোনো মিল ছিল না, সেই কারণে বেলিন্স্কির বিরূপ সমালোচনার মুখে তাঁকে পড়তে

হয়েছিল। বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে গোপন ছাপাখানায় নিষিদ্ধ সাহিত্য মুদ্রণেও তাঁর উৎসাহ ছিল। এর একটা সঙ্গত কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি তাঁর সাক্ষ্যে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল বর্তমান সরকারি সেন্সর ব্যবস্থার ফলে 'সাহিত্যের পক্ষে তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে যাবতীয় শিল্প ও সাহিত্য লোপ পাবে। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ট্র্যাজিডি—কোনোটারই কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।' কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আরও বড়ো একটা অভিযোগ ছিল এই যে পেত্রাশেভ্স্কির পাঠচক্রের এক সভায় তিনি সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গোগলের কাছে লেখা বেলিন্স্কির চিঠি প্রকাশ্যে পাঠ করেছিলেন। কেন পাঠ করেছিলেন? ১৮৪৭ এর ১৫ জুলাই তারিখে লেখা সেই চিঠিতে তো সমালোচক বেলিন্স্কি লেখককে তাঁর নিজের ভাবাদর্শ ও শিল্প থেকে পশ্চাদপসরণের জন্য কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, প্রসঙ্গত স্বৈরাচার ও ভূমিদাস ব্যবস্থার স্বরূপও উদ্‌ঘাটন করেছিলেন! পরন্তু বেলিন্স্কির সঙ্গে দস্তইয়েভ্স্কির ইতিমধ্যে বিচ্ছেদও ঘটে গেছে।

দস্তইয়েভ্স্কির এই সব কার্যকলাপের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তাঁর সত্যি সত্যি কতদূর সম্পর্ক ছিল, নাকি নতুন চিন্তাধারা নিছক তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করেছিল, করলেও কতটা করেছিল, ষড়যন্ত্রকারীরাও কতটা ঐকান্তিক ছিল, সর্বোপরি এই ঘটনা তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতার সঙ্গে কতটা মানানসই—এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। সে যাই হোক, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পেত্রাশেভ্স্কির পাঠচক্রের ওপর রাজরোষ নেমে আসে। এপ্রিল মাসে সংগঠনের বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে দস্তইয়েভ্স্কিও গ্রেপ্তার হন। সামরিক আদালতের বিচারে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে তাঁরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। অনুষ্ঠিত হয় এক নিষ্ঠুর প্রহসনের দৃশ্য। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দস্তইয়েভ্স্কিকেও হাজির করা হয় বধ্যভূমিতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জার নিকলাইয়ের পূর্বপরিকল্পনামতো সে দণ্ডাদেশ মকুব করে সাইবেরিয়ায় বন্দিশিবিরে চার বছরের সশ্রম নির্বাসনদণ্ডে তাঁকে দণ্ডিত করা হল।

চার বছর সশ্রম নির্বাসনদণ্ড ভোগের পর আরও পাঁচ বছর তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয় সাইবেরিয়ার এক ডিসিপ্লিনারি ব্যাটেলিয়নে সাধারণ সৈন্যের চাকুরি করে।

দশ বছর পরে তিনি যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবেশে ফিরে এলেন ততদিনে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও তাঁর মধ্যে ছিল না। শুধু তা-ই নয়, সাইবেরিয়ায় অন্তরীণ থাকাকালেই তিনি বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক গাথাও লিখে ফেলেছিলেন। যাঁর কল্যাণে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল সেই জার প্রথম নিকলাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উদ্দেশে একটি প্রশস্তিও লিখে ফেলেছিলেন, যেখানে তিনি সম্রাটকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেন এবং কুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেন যে সম্রাটের নাম নেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। দ্বিতীয় আলেক্সান্দ্রর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যেও এই সময় তিনি একটি প্রশস্তি লিখেছিলেন। লেখকের দৃষ্টিতে ততদিনে সামাজিক সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে মানুষের আধ্যাত্মিক সমস্যা, ধর্মীয় ও নৈতিক পুনরুজ্জীবনের আইডিয়া।

আরও পরে, ষাটের দশকে তিনি চের্নিশেভ্স্কি এবং অন্যান্য বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের প্রকাশ্য

বিরোধিতা করে লিখলেন 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' (১৮৬৪)। সত্তরের দশকে তিনি যে 'অপদেবতা' (১৮৭২) লিখলেন সে তো বহিরাগত ভাবধারার প্রভাবে একটি জাতির আত্মবিনাশেরই কাহিনি। 'অপদেবতার' সেই ভূত যে 'কমিউনিজমের ভূত' নয় এমন কথা হলফ করে কে বলতে পারে? কমিউনিস্ট ইস্তেহার (১৮৪৭), ততদিনে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিতও হয়েছে। ১৮৭২ সালে মার্কসের *পুঁজি* পর্যন্ত রুশ অনুবাদে বেরিয়ে গেছে।

কারাদণ্ড ভোগের পর দস্তইয়েভ্স্কির নবলব্ধ অধ্যাত্মচেতনার আপাত-বিরোধিতা এখানেই যে তিনি তাঁর কারাদণ্ডকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ বলে মেনে নিয়েছিলেন, মানুষের অনুশোচনার আবশ্যকতা এবং যন্ত্রণাভোগ বা আত্মনিপীড়নের মধ্য দিয়ে তার মুক্তি সম্পর্কে লেখকের দৃঢ়বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তাঁর একটি বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়।

*কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা* উপন্যাসের মূল প্লটটি আধুনিক যে কোনো রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনির মতোই চমকপ্রদ ঘটনায় ঠাসা। তার চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে নানা উপকাহিনি, বিচিত্র সব ঘটনা।

একটি সাধারণ বাস্তব ঘটনা লেখকের দৃষ্টিতে কীভাবে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে *কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা* তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। গোগলের *ইনস্পেক্টর জেনারেল* বা তল্‌স্তোয়ের *পুনরুজ্জীবন*-এর কাহিনির ভিত্তির মতো দস্তইয়েভ্স্কির এই কাহিনিরও মূলে ছিল একটি বাস্তব ঘটনা : পিতৃহত্যা এবং আদালতের বিচারে একজন নিরপরাধের সশ্রম কারাদণ্ডভোগ। দস্তইয়েভ্স্কি যখন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন সেই সময় পিতৃহত্যার অপরাধে বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জনৈক বন্দি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইলিন্‌স্কি নামে এই লোকটা এককালে কোনো এক ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড লেফ্‌টেনান্ট ছিল। 'ভূতলবাসীর আত্মকথা'র সূচনাতে এর প্রসঙ্গ আছে। সেখানে বলা হয়েছে লোকটা ছিল উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, আপাদমস্তক ঋণে জর্জরিত, সম্পত্তির লোভে সে তার বাপকে খুন করে। কিন্তু সে তার অপরাধ স্বীকার করেনি। *কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা* উপন্যাসের অন্যতম নায়ক দ্‌মিত্রির স্বভাব ও ভাগ্যের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে আরও এই কারণে যে 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' প্রকাশের এক বছর ৮ মাস পরে সাইবেরিয়া থেকে দস্তইয়েভ্স্কির কাছে এই সংবাদ আসে যে তাঁর বর্ণিত 'পিতৃহন্তা' আসলে নিরপরাধ ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। বিনা অপরাধে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর অবশেষে সে মুক্তি পেয়েছে। ঘটনার আকস্মিক মোড়বদলে লেখক স্তম্ভিত। এই নির্মম ট্র্যাজিডির ওপর ভিত্তি করে দস্তইয়েভ্স্কি একটি কাহিনির খসড়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৮৭৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। এই কাহিনিতে আছে দুই ভাই আর তাদের বুড়ো বাবা। বড়ো ভাইয়ের এক বাগ্‌দত্তা আছে, কিন্তু ছোটোজন মনে মনে তাকে ভালোবাসে। বড়ো ভাই সেনাবাহিনীর একজন তরুণ এন্‌সাইন। উচ্ছৃঙ্খল, গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের। মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বখরা নিয়ে বাপের সঙ্গে তার বিবাদ — যেমন উপন্যাসের নায়ক দ্‌মিত্রির ক্ষেত্রেও হয়েছিল। বাপ নিখোঁজ হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন কোনো খোঁজখবর নেই। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে তুমুল বচসা শুরু হয়ে গেল। এমন সময় একদিন

পুলিশের আগমন। মাটি খুঁড়ে বুড়ো বাপের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বড়ো জনের বিরুদ্ধে। তার বাগ্‌দত্তা পর্যন্ত তাকে সন্দেহ করে। আসলে খুন করেছিল ছোটোজন, কিন্তু কারসাজি করে সাক্ষ্যপ্রমাণ এমন ভাবে সাজিয়েছিল যার ফলে বিচারে বড়ো জনের শাস্তি হল। হত্যাকারী আসলে কে এই নিয়ে জনসাধারণের মনেও সংশয় ছিল। বহু বছর বাদে ছোটো ভাই বিবেকের তাড়নায় তার অপরাধ স্বীকার করে— প্রথমে বড়ো ভাইয়ের কাছে, পরে সর্বসমক্ষে। এই খসড়া কাহিনিরই আরও কিছু অদল বদল ঘটেছে *কারামাজ়ভ্‌ ভাইয়েরা* উপন্যাসের মূল কাহিনিতে, কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত 'রহস্যময় আগন্তুক' উপকাহিনিতে। শুধু তা-ই নয়। কারমাজ়ভ্‌ ভাইয়েরা প্রসঙ্গে দস্তয়েভ্‌স্কি পত্রিকার সম্পাদনা দপ্তরে একথাও জানিয়েছিলেন: 'আমার এই রচনায় আমার কাহিনির নায়কের মুখ দিয়ে যা যা কথা বেরিয়েছে, ছেলেদের সম্পর্কে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ এখানে আছে সে সবই বাস্তবিক ঘটেছিল— এক কথায়, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোথায়, তাও আমি বলে দিতে পারি। কোনোকিছুই স্বকপোলকল্পিত নয়।'

কাহিনিতে মঠের জীবনযাত্রার যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তাও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শিশুপুত্র আলেক্সেইয়ের মৃগীরোগে মৃত্যু হলে সন্তপ্ত লেখক সান্ত্বনালাভের জন্য দার্শনিক সলভিয়োভের সঙ্গে ওপ্‌তিনা মঠে গিয়েছিলেন। উপন্যাসে সন্তানহারা জননীর উদ্দেশে মঠবৃদ্ধ মহাস্থবির জোসিমার উপদেশও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত, এখানেও মৃত শিশুটির নাম আলেক্সেই। আবার উপন্যাসের নায়কও আলেক্সেই —আলিয়োশা।

হয়তো তা-ই, কিন্তু সবই একজন মহাপ্রতিভাধর শিল্পীর গভীর মানবতাসম্পন্ন দৃষ্টিতে নতুন ভাবে, নতুন আলোকে উদ্ভাসিত।

সত্তরের দশকে এই উপন্যাসের একটি খসড়ায় লেখক লিখেছিলেন: 'দাঁড়াচ্ছে এই যে এক ভাই নাস্তিক ও নৈরাশ্যবাদী। অন্যজন রগচটা, উগ্রচণ্ড। তৃতীয় জন—ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, নব জীবনশক্তি, নতুন মানুষ (এবং নবীনতম প্রজন্ম—শিশুরা)।'

গ্রন্থের সূচনায় সুসমাচার থেকে যে উদ্ধৃতি লেখক দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে তা গভীর অর্থবহ। এর দ্বারা লেখক রাশিয়ার ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন। রাশিয়া বর্তমানে যে অসুস্থতায় ভুগছে (দস্তইয়েভ্‌স্কির ভাষায় পচন, বিশৃঙ্খলা, অবক্ষয় ইত্যাদি) একদিন সে তা কাটিয়ে উঠবে। সেটা ঘটবে আলিয়োশার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে, যার ভূমিকা বর্তমান উপন্যাসে তেমন স্পষ্ট নয়। বর্তমান উপন্যাসের ভূমিকাতে লেখক বলেছেন: '.....কাহিনি দুটি। দ্বিতীয়টাই মুখ্য। তার উপজীব্য, আমাদের এই সময়ে, ঠিক এই বর্তমান মুহূর্তে আমাদের নায়কের কার্যকলাপ।' নায়ক যে আলিয়োশা ভূমিকার প্রথম ছত্রেই একথাও তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। আলিয়োশাকে নিয়ে সেই মুখ্য কাহিনিই লেখক শেষ পর্যন্ত লিখে যেতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর থেকে আশির দশকের মধ্যে আলিয়োশার কার্যকলাপই হত কারামাজ়ভ্‌ সংক্রান্ত দ্বিতীয় উপন্যাস বা আখ্যানের মূল বিষয়বস্তু। লেখকের সহধর্মিণী আন্না দস্তইয়েভ্‌স্কায়া ১৯১৬ সালে

জানিয়েছিলেন যে ১৮৮২ সাল নাগাদ 'কারামাজভ্'- এর পরবর্তী অংশ নিয়ে বসার ইচ্ছে তাঁর ছিল। 'আলিয়োশা তখন আর নবীন যুবা নয়, একজন পূর্ণবয়স্ক পরিণত মানুষ। বহু নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে সে ইতিমধ্যে লিজা খখ্‌লাকোভার সঙ্গে এক জটিল জীবন কাটিয়ে এসেছে, মিতিয়া নির্বাসনদণ্ড ভোগের পর ফিরে এসেছে।.....' তৎকালীন বিখ্যাত সমালোচক সাংবাদিক ও প্রকাশক আলেক্সান্দ্র সের্গেইয়েভিচ্ সুভোরিন (১৮৩৪-১৯১২) তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন 'ফিয়োদর মিখাইলভিচ্ বলেছিলেন আলিয়োশা কারামাজভ্‌কে নায়ক করে তিনি একটি উপন্যাস লিখবেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মঠের জীবন যাপনের পর আলিয়োশা একজন বিপ্লবীতে পরিণত হবে। সে সত্যের সন্ধান করবে, সত্যের সন্ধান করতে করতে বিপ্লবের পথে যাত্রা করবে, রাজনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়বে, সে জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।.....' তার পর? কিন্তু এসবই জল্পনাকল্পনার বিষয়। তবে আলিয়োশাই যে কাহিনির নায়ক হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসের সমাপ্তি সেই রকম হলেও হতে পারত যাতে আলিয়োশার দ্বিধাবিভক্ত সত্তা মানুষের দুঃখদুর্দশা মোচনে বিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কে একটা বড়ো রকমের প্রশ্ন রেখে যেত।

কিন্তু *কারামাজভ ভাইয়েরা* আমরা যে আকারে পাচ্ছি সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

বিশিষ্ট রুশ চিন্তাবিদ এবং *দস্তইয়েভ্স্কি* গ্রন্থের (১৯৩৪) লেখক নিকলাই বের্দিয়ায়েভ্ (১৮৭৪-১৯৪৮)-এর মতে, অপরাধ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন বারবার লেখকের কাছে অবধারিত ভাবে উঠে এসেছে তা হল 'মানুষের কোন্ কাজ অপরাধ সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য? মানুষের যে কোনো অপরাধকেই আমরা যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারি?... *অপরাধ ও শাস্তি*, *অপদেবতা*, *কারামাজভ্ ভাইয়েরা* — প্রতিটি উপন্যাসেই তিনি কোনো না কোনো ভাবে সে প্রশ্ন পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বারবার ফিরে আসছে 'অপরাধ ও শাস্তি'র রাস্‌কোলনিকভের সেই চিন্তা- 'কারামাজভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাসে রাকিতিনের মুখে আমরা শুনতে পাই, "একজন বুদ্ধিমান মানুষের সব কিছুই করা সাজে। কী ভাবে কী করতে হয় তার জানা আছে। কিন্তু তুমি? খুন করে ফেঁসে গেলে, এখন জেলে পচে মর। দস্তইয়েভ্স্কির স্বাধীন মানুষের দ্বন্দ্ব যে প্রশ্ন থেকে শুরু হচ্ছে তা এই যে আমার স্বাধীনতা কি কোনো অলঙ্ঘনীয় নৈতিক বিধানে সীমাবদ্ধ, না কি আমি চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন? তাঁর মনে হয়েছে স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারের সীমায় নেমে আসে তখন মানুষ কোনো কিছুকেই আর পবিত্র বা নিষিদ্ধ বলে ভাবতে পারে না। সে তখন নিজেকেই ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করে, ভাবে যা খুশি করার স্বাধীনতা তার আছে। অথচ এই রকম অত্যুগ্র স্বাধীনতা থেকেই মানুষ একটা নির্দিষ্ট ধারণার জালে আটকে পড়ে এবং শেষাবধি তার সত্যিকারের স্বাধীনতাই হারিয়ে ফেলে। এই সঙ্কটকে দস্তইয়েভ্স্কি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের ফলে বারবার উপস্থাপনা করেছেন তাঁর মহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে।'

স্মের্দিকোভ্ যখন বুড়ো কারামাজভ্‌কে খুন করে তখন সমস্ত 'পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ' দ্‌মিত্রির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু ইভান বুঝতে পারে যে অভিসন্ধিমূলক ভাবে না হলেও খুনের বুদ্ধি পরোক্ষ ভাবে জুগিয়েছিল সে-ই, তাই উসকানিদাতা হিসেবে অপরাধের দায় তার ওপর বর্তায়। শেষে সে যে স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে

তা অনেকটা *অপরাধ ও শাস্তির* রাস্কোল্নিকভের ধরনের। স্বীকারোক্তি করার আগে তার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক চলে শয়তানের। শয়তান তাকে এই যুক্তি দেয় যে ভালোমন্দের মধ্যে সমান ভার বজায় রাখার জন্য মন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার ঘুরে ফিরে আসছে দস্তইয়েভ্স্কির সৃষ্ট চরিত্রগুলির সেই দ্বৈত সত্তা বা দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব যা নিজেই নিজের বিরোধিতা করছে। ইভান, দ্মিত্রি, স্মের্দিকোভ্ এমন কি আলিয়োশা—এদের সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। যে পরিস্থিতিতে বুড়ো কারামাজ়ভের মৃত্যু হল তাতে পরোক্ষ ভাবে ইভানকে কেন, এমনকি দ্মিত্রিকে এবং অল্পবিস্তর আলিয়োশাকেও দায়ী করা যেতে পারে — বিশেষত দ্মিত্রিকে তো বটেই, যেহেতু মনে মনে বাবাকে খুন করার অভিপ্রায় তারও ছিল। আলিয়োশার একমাত্র অপরাধ এই যে সে অপরাধ নিবৃত্ত করতে পারত, অথচ চেষ্টা করেনি। অর্থাৎ নীতিগত ভাবে এরা সকলেই অপরাধী। প্রায় সকলেই বিবেকের তাড়নায় তাড়িত। প্রকৃত খুনি স্মের্দিকোভ্ আত্মহত্যা করল। প্রবল মানসিক চাপে ইভান স্নায়ুজ্বরে আক্রান্ত হল, তার জীবন সংশয় দেখা দিল। দ্মিত্রিকে 'অপরাধ' না করেও বিচারের প্রহসনে শাস্তি পেতে হল। সে শাস্তি মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর রইল না। দ্মিত্রির নিজেরই মুখের কথায়, ''দন্ড আমি মাথা পেতে নিচ্ছি এই কারনে নয় যে খুন করেছি, নিচ্ছি এই কারনেই যে খুন করতে চেয়েছিলাম, আর হয়ত সত্যি সত্যি করতামও।'' মানুষের এই দুঃখভোগকে দস্তইয়েভ্স্কি বড়ো রকমের মর্যাদা দিয়েছেন। *অপরাধ ও শাস্তিতে* দেখতে পাই রাসকোল্নিকভ্ সোনিয়ার সামনে নতজানু হয়ে তাকে বলছে ''আমার এই প্রণতি তো তোমাকে নয়, মানুষের এই যে শত দুঃখযন্ত্রণা তাকেই।'' 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাসেও দেখতে পাই দ্মিত্রির আসন্ন দুঃখ ভোগের আভাস পেয়ে মহাস্থবির জোসিমা তাকে প্রণতি জানাচ্ছেন। এই দুঃখভোগের মধ্য দিয়েই দ্মিত্রির মুক্তিলাভ ঘটেছিল।

*অপরাধ ও শাস্তিতে* খুনি কে আমরা আগে থাকতেই তা জানতাম। বিবেকের তাড়নায় সে কীভাবে নিজেই ধরা দিয়ে মুক্তি লাভ করল নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক সেই আত্মশুদ্ধির কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন। *কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা* উপন্যাসে খুনি কে আমরা জানি না, অথচ অনুমান করতে পারলেও সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। আদালতের বিচারে শাস্তি পেতে হল এমন একজনকে যে প্রত্যক্ষ ভাবে হত্যার সঙ্গে যুক্ত নয়। অথচ নীতিগত ভাবে অপরাধের চিন্তা মনে মনে পোষণ করার কারণে আত্মশুদ্ধির জন্য এ শাস্তি তার প্রাপ্য। দস্তইয়েভ্স্কির চিন্তা যে কীভাবে একটি বিরোধ থেকে আরেকটি বিরোধের সৃষ্টি করে, আবার তারই মধ্য দিয়ে সত্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয় এটা তারই এটা দৃষ্টান্ত। এতে পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে আদালতের দৃশ্যে লেখক প্রসিকিউটর ও কৌঁসুলির সওয়াল জবাবের বর্ণনা দিয়েছেন। পক্ষ প্রতিপক্ষের এই প্রচণ্ড বাদপ্রতিবাদের মধ্যেও আবার প্রসিকিউটর ও কৌঁসুলি-দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং একজনের কর্মজীবনের পথে আরেকজনের প্রতিবন্ধকতার মানসিক দুর্বলতার দিকও উদ্ঘাটিত। বিশাল ও জটিল রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে কী ভাবে একজন নির্দোষ ব্যক্তির দণ্ডবিধান করতে পারে তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লেখক এটাও দেখিয়েছেন যে একই ঘটনার দুটি ভাষ্য হতে পারে এবং দুটির যে কোনোটাই সমান সম্ভাবনাময়, অথচ কোনোটাই উপযুক্ত নয়, সমান ত্রুটিপূর্ণ, আবার একেকজনের নিজেরই দ্বৈতসত্তা পরস্পরবিরোধী, স্ববিরোধীও বটে।

ঠিক এই দৃষ্টিতেই বিচার করতে হয় যখন আমরা দেখি ফিয়োদর কারামাজ়ভের মতো একজন ভ্রষ্টাচারী মঠের সাধুদের জীবনযাত্রার বিরূপ সমালোচনা করে বলে: "আরে, এদের এখানে কী কী খাবার তৈরি হয়েছে দেখি?... ওরে বাবা, এ যে দেখছি পুরোনো পোর্ট ওয়াইন, য়েলিসেইয়েভ্ ব্রাদার্স-এর দোকানের সিল করা মধুর সুরা। বাহবা, বাবারা ... ওঃ কী সব বোতলই না এনে বসিয়েছেন আমাদের সাধুবাবারা! হে- হে- হে! বলি, এসব এখানে জোগাচ্ছে কে? রুশি চাষাভুসো, মেহনতি মানুষ হাতে কড়া ফেলে সামান্য যে কয়েকটি কপর্দক উপার্জন করছে, নিজের পরিবারকে বঞ্চিত করে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কর ফাঁকি দিয়ে তা-ই এনে তুলে দিচ্ছে এখানে! আপনারা না পুণ্যাত্মা সাধুসন্ত, আপনারা কিনা দেশের মানুষকে শুষে খাচ্ছেন!'— সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা। কিন্তু তাই বলে ফিয়োদর কারামাজ়ভের মুখে! এমন ভাঁড়ামির সুরে! অথবা রাকিতিনের মতো নীতিজ্ঞানহীন সুযোগসন্ধানী যখন আদালতে বহুকালের বদ্ধমূল ভূমিদাসপ্রথার কু অভ্যাস এবং যথোপযুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে বিশৃঙ্খলার কথা বলে অথবা সামাজিক অন্যায় অবিচারের ওপর প্রবন্ধ লেখে তখন তা সত্য হলেও কি বিশ্বাসযোগ্য শোনায়? আবার শয়তানের সঙ্গে ইভানের সাক্ষাৎকার অথবা ইভান রচিত মহাবিচারকের উপাখ্যান? বিশেষত মহাবিচারক — সে ইভান নিজেই। লেখক খ্রিস্টের পক্ষে, কিন্তু যুক্তিবাদী ও সন্দেহবাদী ইভান নিজে? তার মহাবিচারকের মতে খ্রিস্ট অসম্পূর্ণ। এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যর্থ। সাধারণ মানুষের পরিপাক করার পক্ষে যিশু বড়ো বেশি মৌলিক। তাঁর বার্তা একমাত্র অলৌকিকতা ও শক্তির মোড়কেই টিকে থাকতে পারে। তাঁর স্মৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যিশুকে একথা স্বীকার করে নিতে হল। সেই স্বীকৃতির স্মারক হিসেবে গল্পের যিশু মহাবিচারককে চুম্বন করল। আলিয়োশাও তার স্বীকৃতিস্বরূপ চুম্বন করল কাহিনির রচয়িতা ইভানকে। কিন্তু এই অধ্যায়েও দেখা যাচ্ছে অনেক প্রশ্নেই ইভানের মতামত দ্বিধাবিভক্ত, পরস্পরবিরোধী।

উপন্যাসের পটভূমি বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাহারে সমৃদ্ধ: মঠের সাধুসন্ন্যাসী, কৃষক বিচারক, উকিল—কে নেই সেখানে? প্রতিটি চরিত্রচিত্রণে ঔপন্যাসিক তাঁর পরিণত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকরণের বিচারে দস্তইয়েভ্স্কি তাঁর উপন্যাসগুলিতে যে কোরাস রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তারও চরমোৎকর্ষ ঘটেছে এই উপন্যাসে। বহুকণ্ঠের সমন্বয়ে (Polyphony) বিশালতার আবহ সৃষ্টি দস্তইয়েভ্স্কির উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 'দস্তইয়েভ্স্কির শিল্পকলার সমস্যা' প্রবন্ধে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিখ্যাত রুশ সাহিত্য সমালোচক ও তাত্ত্বিক মিখাইল বাখ্‌তিন। প্রতিটি নায়ক-নায়িকার নিজস্ব কণ্ঠ, নিজস্ব আইডিয়া আছে—সেটা তার জীবনের মূলমন্ত্র — অবশ্য তার মধ্যেও স্ববিরোধ আছে। কারামাজ়ভদের সকলেই এরকম ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠের অধিকারী—আর এই সব কণ্ঠের, তাদের পরস্পর বিরোধিতার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয় বহুকণ্ঠের স্বর। তা ছাড়া একই ঘটনার

বিবরণ নানা ভাবে শোনা যায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে—তাতেও সৃষ্টি হয় এই আবহ। বাখ্‌তিনের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হয়ে আনাতোলি লুনাচারস্কি তাঁর 'দস্তইয়েভ্‌স্কিতে কণ্ঠস্বরের বহুত্ব' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: 'দস্তইয়েভ্‌স্কি যখন উপন্যাসের ধারাটি মনে মনে নির্মাণ করেছিলেন, চরিত্রগুলির বিকাশের স্তর নিয়ে ভাবছিলেন—সম্ভবত তখন কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছক ধরে অগ্রসর হননি, কিংবা সে ভাবে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিংবা বাস্তবিকই তাঁর কাজের ধর্মটি ছিল কণ্ঠস্বরের বহুত্বধর্মী, অর্থাৎ তিনি স্বপ্নিল কিছু ব্যক্তিসত্তাকে একত্রীভূত করেই, তাদের চিন্তা ও চেতনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মতাদর্শ ও নান্দনিক বোধের অভাবে ধ্যান ধারণাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিষয়ে দস্তইয়েভ্‌স্কি অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন।...''

'অপরাধ ও শাস্তি' এবং 'কারামাজভ্‌ভাইয়েরা' পাশাপাশি মিলিয়ে পরতে গেলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে আরও যে জিনিসিটি ধরা পড়ে তাও কম আকর্ষণীয় নয়। 'অপরাধ ও শাস্তি'তে অপরাধীর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও মানসিক চাপে পড়ে তাকে শেষ পর্যন্ত তার অপরাধ স্বীকার করতে হয়েছিল, কিন্তু 'কারামাজভ্ ভাইয়েরা' - তে ঠিক তার বিপরীত একজন নিরপরাধের বিরুদ্ধে তথাকথিত কিছু পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়ে তারই ভিত্তিতে তদন্তের ফলে কোনও মামলা যে কতদূর ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে এবং নিরপরাধ ব্যক্তি যে শাস্তি পেতে পারে এই উপন্যাসে তারই নিদর্শন আছে। বিচারের এই প্রহসনও অনেক সময় বাস্তব সত্য।

দস্তইয়েভ্‌স্কি তাঁর এই অসমাপ্ত উপন্যাসে শেষ কথা বলে কোনো কথা বলে যান নি— অবশ্য উপন্যাস সমাপ্ত হলেও হয়তো বলতেন না। তার বদলে মানবজীবন ও সমাজের সমস্যার পর সমস্যা, সেগুলির অন্তর্নিহিত পরস্পরাবিরোধিতা, অবিরাম একটি বিরোধ থেকে আরেকটি বিরোধের উদ্ভবের কাহিনি বিবৃত করেছেন একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের ঘটনা অফুরান। পাত্রপাত্রীরা বড়ো তাড়াহুড়ো করে কথা বলে, যেন সময়ের বড়োই অভাব। লেখক নিজেও ঘন ঘন মূল কাহিনি মুলতুবি রেখে আরেকটি নতুন উপাখ্যানের অবতারণা করেন, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান — যেন তাঁর অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু আশঙ্কা যে শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারবেন না।

দস্তইয়েভ্‌স্কির উপন্যাসের গঠন শিথিল। তাঁর রচনায় এবং রচনাশৈলীতে, বাক্যবিন্যাসে 'গৃহিণীপনার অভাব' আছে। অনেক সময় বাক্য পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। সর্বত্রই একটু অগোছাল, বেখেয়লি ভাব। তাঁর চরিত্রগুলিও 'হঠাৎ-হঠাৎই' উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বড় বেশি, 'চেঁচিয়ে' কথা বলে, কথায় কথায় 'ফ্যাকাশে' হয়ে যায়, মূর্ছা যায়। এমন কি অদ্ভুত কাণ্ড এই যে ক্রোধে লাল না হয়ে রক্তশূন্যও হয়ে যায় তাদের কারও কারও মুখ। বিশেষত তাঁর নারী চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত। অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন? তুর্গেনেভের কথায়

এ হল মৌলিক লেখক আখ্যা অর্জনের একটা সস্তা উপায়।' কিন্তু এই মৌলিকতাই

হয়ত বা নামান্তরে পরাবাস্তবতা যার সাহায্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা বা তার মর্মমূলে প্রবেশ করাও সম্ভব? এটাও দস্তইয়েভ্স্কির একটা নিজস্ব প্রকরণ—ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে বাস্তবকে দেখানোর একটা কৌশল।

তাঁর ভাষারীতি সেকেলে। তাঁর রচনায় বেশ কিছু অপ্রচলিত শব্দের এবং প্রচলিত শব্দের অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগও আছে যা তাঁর সমকালীন লেখকদের লেখার মধ্যে—যেমন তল্স্তোয়ের ক্ষেত্রে—এমনকি পূর্বসূরী পুশ্কিনের রচনাতেও দেখা যায় না। সেই তুলনায় তাঁর ভাষারীতিকে সাবেকিই বলতে হয়। এত কিছু সত্ত্বেও কাহিনির গতি এমনই দুর্বার যে টানটান উত্তেজনার মধ্যে তা পাঠকদের টেনে রাখে, ঘটনার ঘনঘটায় পাঠককে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে হয়।

দস্তইয়েভ্স্কি অতি জটিল ও পরস্পরবিরোধী। তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও লেখক মহলে তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের মত প্রচলিত ছিল। ইভান বুনিন তাঁকে স্রেফ 'বাজে' লেখক বলে মনে করতেন। মাক্সিম গোর্কির কথায়: 'দস্তইয়েভ্স্কির প্রতিভার মহিমা অবিসংবাদিত। শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতায় তাঁর প্রতিভা বুঝি-বা একমাত্র শেক্সপিয়রের সমতুল।' কোন কোন সমালোচক তাঁকে 'পাগলা গারদের শেক্সপিয়র' আখ্যাও দিয়েছেন। তাঁর পরম ভক্ত টোমাস মান পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: 'দস্তইয়েভ্স্কি—তবে পরিমিত মাত্রায়'। কিন্তু তাহলে ত দস্তইয়েভ্স্কির রচনা সীমিত সংখ্যায় প্রকাশের যে নীতি সোভিয়েত আমলে প্রচলিত ছিল তাকেই সমর্থন করতে হয়।

কলকাতা অরুণ সোম
২ এপ্রিল, ২০১০

The Online Library of Bangla Books

# উপন্যাসের চরিত্র-পরিচয়

| | |
|---|---|
| ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ কারামাজ়ভ্‌ | জমিদার, ৫৫ বছর বয়স |
| আদেলাইদা ইভানভ্‌না (মিউসভা) | ফিয়োদর্‌ পাভ্‌লভিচের প্রথম স্ত্রী |
| দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ (ডাক নাম মিতিয়া): | ফিয়োদর্‌ কারামাজ়ভের বড়ো ছেলে, আদেলাইদার গর্ভজাত, কাহিনির শুরুতে '২৮ বছরের যুবা' বলে উল্লিখিত। |
| পিয়োতর্‌ আলেক্সান্দ্রভিচ্‌ মিউসভ্‌ | আদেলাইদার খুড়তুত দাদা, বড় ছেলে মিতিয়ার মামা |
| সোফিয়া ইভানভ্‌না | ফিয়োদর্‌ পাভ্‌লভিচের দ্বিতীয় স্ত্রী। গির্জার কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল কর্মচারীর মেয়ে, জনৈক জেনারেলের বিধবা পত্নীর কাছে মানুষ। |
| ইভান বা ইভান ফিয়োদরভিচ্‌ | ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ কারামাজ়ভের দ্বিতীয় পুত্র, সোফিয়া ইভানভ্‌নার গর্ভজাত। |
| আলেক্সেই ('আলিয়োশা' ডাক নামেই সমধিক পরিচিত) | কনিষ্ঠ পুত্র, সোফিয়া ইভানভ্‌নার গর্ভজাত। উপন্যাসের এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে: আলিয়োশার যখন ২০, ইভানের ২৪, দ্‌মিত্রির ২৭ পেরিয়ে গেছে। |
| গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্‌ কুতুজ়ভ্‌ | ফিয়োদরের ভৃত্য |
| মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না | গ্রিগোরির স্ত্রী |
| এফিম পেত্রোভিচ পলিয়েনভ্‌ | জেলার রাজপুরুষ প্রধান, ইভান ও আলেক্সেইয়ের এককালের অভিভাবক। |
| সাধু জোসিমা | মহাস্থবির বা মঠবৃদ্ধ, বয়স ৬৫ |
| প্রভু পাইসি | মঠের জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ |
| সাধু ইওসিফ্‌ | মঠের গ্রন্থাগারিক, ধর্মযাজক |
| মিখাইল ওসিপভিচ্‌ রাকিতিন | ধর্মীয় বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষার্থী, |

| | |
|---|---|
| | অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'রাকিতিন' পদবি ধরে উল্লেখ করা হয়েছে, কদাচিৎ 'মিখাইল' নামে বা 'মিশা' ডাকনামে। ২০-২২ বছর বয়স |
| পিয়োতর ফোমিচ্ কালাগানভ্ | বছর কুড়ি বয়স, মিউসভের দূর সম্পর্কের এক 'আত্মীয়, আলিয়োশার বন্ধু। |
| মাক্সিমভ্ | জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত জমিদার |
| পাভেল ফিয়োদরভিচ স্মের্দিকোভ্ | ফিয়োদরের ভৃত্য, তার অবৈধ সন্তান। |
| কাতেরিনা ইভানভ্না ভের্খভ্ৎসেভা | জনৈক কর্নেলের মেয়ে। বনেদি ঘরের পরমা সুন্দরী, এক সময় দ্মিত্রির বাগদত্তা। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া, জনৈক জেনারেলের বিধবার সূত্রে প্রভুত বিত্তের মালিক। |
| আগাফিয়া ইভানভ্না | উক্ত কর্নেলেরই প্রথম পক্ষের কন্যা |
| আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না স্ভেত্লোভা<br>('গ্রুশেন্কা' ডাক নামেই সমধিক পরিচিত) | এককালে সাম্সোনভ্ নামে এক ব্যবসায়ীর অভিভাবকাধীন, পরে ফিয়োদর কারামাজ়ভের কারবারের কর্মচারী। ২২ বছর বয়স। 'আগ্রিপিনা' নামেও তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সম্বোধনে ও উল্লেখে মাদাম স্ভেত্লোভা |
| কুজ্মা কুজ্মিচ্ সাম্সোনভ্ | জনৈক ব্যবসায়ী, গ্রুশেন্কার অভিভাবক |
| গোরস্তকিন | জনৈক কাঠের ব্যবসায়ী, 'খোচর' নামে পরিচিত |
| মঠাধ্যক্ষ নিকলাই | |
| মাদাম খখ্লাকোভা বা কাতেরিনা ওসিপভ্না | অভিজাত জমিদার মহিলা, বিধবা, তেত্রিশ বছর বয়স। কোথাও বা চল্লিশ বলা হয়েছে। |
| য়েলিজাভিয়েতা খখ্লাকোভা (লিজে বা লিজা) | তার মেয়ে বছর চৌদ্দ বয়স |
| পর্ফিরি | আশ্রমের ব্রতচারী শিষ্য |
| প্রভু ফেরাপোন্ত্ | আশ্রমবাসী সাধু, ৭৫ বছর বয়স |

| | |
|---|---|
| প্রোখরভা | জনৈক অধস্তন সামরিক অফিসারের বিধবা স্ত্রী |
| সন্ত সেলিভেস্তর মঠ থেকে আগত জনৈক তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী | |
| নিকলাই ইলিচ্ স্নেগিরিয়োভ্ | সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়া ক্যাপ্টেন, ফিয়োদর্ কারামাজ়ভের কাজের সহযোগী। 'ফতো কাপ্তান' নামে পরিচিত। দ্‌মিত্রির হাতে নিগৃহীত। |
| ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌না | তার বড়ো মেয়ে |
| ইলিয়া ('ইলিউশা' ডাক নামে পরিচিতি) | ক্যাপ্টেনের ছেলে, স্কুলের পড়ুয়া, ৯ বছর বয়স। |
| নিনা নিকলাইয়েভ্‌না | ক্যাপ্টেনের ছোটো মেয়ে |
| আরিনা পেত্রোভ্‌না | ক্যাপ্টেনের স্ত্রী, ৪৩ বছর বয়স |
| মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না | জীর্ণদশাগ্রস্ত বসতবাড়ির কর্ত্রীর মেয়ে, মস্কো থেকে আগত। |
| 'রহস্যময় আগন্তুক' | পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়, নামে উল্লেখ নেই, যদিও উল্লেখযোগ্য চরিত্র, তবে লেখক যখন তার সম্পর্কিত প্রসঙ্গের যবনিকা টেনেছেন, তখন শেষ পংক্তিতে একবার শুধু 'মিখাইল' নামে উল্লেখ করেছেন। |
| মরোজ়ভা | বণিক মরোজ়ভের বিধবা স্ত্রী, যার বাড়িতে গ্রুশেন্‌কা ভাড়া থাকত। |
| ফেনিয়া (ফেদোসিয়া মার্কভ্‌না) | গ্রুশেন্‌কার দাসী |
| পিয়োতর ইলিচ্ পের্‌খোতিন | যুবক, সরকারি আমলা, যার কাছে মিতিয়া তার পিস্তল বন্ধক রেখেছিল। |
| ত্রিফন্ বরিসভিচ্ | মোক্রয়ের জনৈক সরাইওয়ালা |
| মুসিয়ালভিচ | জনৈক পোল বংশোদ্ভূত ব্যক্তি গ্রুশেন্‌কার প্রণয়ী |
| ভ্রুব্‌লিয়োভ্‌স্কি | উক্ত ব্যক্তির সঙ্গী, পোল বংশোদ্ভূত |
| মিখাইল মাকারভিচ্ মাকারভ্ | জেলা পুলিশ সুপার, বৃদ্ধ। |
| ভার্‌বিন্‌স্কি | জেলা পরিষদের ডাক্তার। যুবক। |
| ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ | প্রসিকিউটর বলে পরিচিত। আসলে ডেপুটি প্রসিকিউটর, ৩৫ বছর বয়স |

| | |
|---|---|
| নিকলাই পার্‌ফেনভিচ নেল্যুদভ্ | বিচারবিভাগীয় তদন্তকারী |
| মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্ শ্‌মের্‌ৎসোভ | মোক্রয়ের থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর্ |
| মাদাম ক্রাসোত্‌কিনা<br>(আন্না ফিয়োদরভ্‌না) | জনৈক সরকারি আমলার বিধবা পত্নী, ত্রিশ বছর বয়স। |
| কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিন | তার ছেলে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, বছর চৌদ্দ বয়স। |
| দার্দানেলভ্ | মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষক |
| ডাক্তার গিন্নি | জনৈক নিখোঁজ ডাক্তারের স্ত্রী, মাদাম ক্রাসোত্‌কিনার বান্ধবী ও ভাড়াটে। |
| নাস্তিয়া | ডাক্তার-গিন্নির মেয়ে, আট বছর বয়স |
| কোস্তিয়া | ডাক্তার-গিন্নির ছেলে, সাত বছর বয়স |
| স্মুরভ্ | বছর এগারো বয়স, স্কুল-পড়ুয়া, জনৈক অবস্থাপন্ন সরকারি আমলার ছেলে। |
| ফেতিউকোভিচ্ | বয়স চল্লিশ, মস্কো থেকে আগত আইনজীবী, দ্‌মিত্রির পক্ষ সমর্থনকারী কৌঁসুলি। |
| ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে | জার্মান বংশোদ্ভূত স্থানীয় চিকিৎসক, সত্তর বছর বয়স। |

The Online Library of Bangla Books

# উৎসর্গ

আন্না গ্রিগোরিয়েভ্‌না দস্তইয়েভ্‌স্কায়া[১]

আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যথার্থই কহিতেছি গমের বীজ ক্ষেত্রে পতিত হইলে উহার বিনাশ না ঘটিলে একাকী রহিয়া যায়; বিনাশ ঘটিলে তবেই প্রভূত ফল প্রসব করে। (যোহান কথিত সুসমাচার অধ্যায় ১২, শ্লোক ২৪)[২]

# গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার কাহিনির নায়ক আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কারামাজভের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে বসে আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত।’ ঘটনা এই যে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচকে যদিও আমি আমার কাহিনির নায়ক বলছি, তবু আমি নিজেই জানি যে লোকটাকে মহাপুরুষ আদৌ বলা যায় না। তাই অনুমান করতে পারি অনিবার্য কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে: আপনার আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কীসে এমন অসাধারণ যে আপনি তাকে আপনার নায়ক হিসেবে বেছে নিলেন? কী এমন কাজ সে করেছে? কার কার কাছে এবং কী কারণে তার খ্যাতি? আমি একজন পাঠক হয়ে তার জীবনের ঘটনাবলি জানার পেছনে কেনই বা সময় নষ্ট করতে যাব?

এই শেষ প্রশ্নটিই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক, যেহেতু এর উত্তরে আমার মাত্র একটি কথা বলার থাকে: ‘হয়তো উপন্যাস থেকে আপনি নিজে তা দেখতে পারেন।’ কিন্তু উপন্যাস পাঠ করার পরও যদি আপনার চোখে তা ধরা না পড়ে? আমার আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য আছে এ বিষয়ে যদি আপনি একমত না হন? আমার একথা বলার কারণ এই যে এটা আমি আগে থাকতে অনুমান করতে পারছি এবং অনুমান করে মনে দুঃখ পাচ্ছি। আমার কাছে সে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু পাঠকের কাছে সেটা প্রমাণ করতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তার কারণ এই যে মানুষটি হয়তো বা কীর্তিমান, কিন্তু তার সেই কীর্তি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। তবে আমাদের মতো এমন এক সময়ে লোকের কাছ থেকে স্পষ্টতা দাবি করাও বোধহয় অদ্ভুত। একটা বিষয়ে সম্ভবত সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই: লোকটা অদ্ভুত, এমনকি খাপছাড়া গোছের। কিন্তু অদ্ভুত ও খাপছাড়া প্রকৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেয়ে সম্ভবত ব্যাঘাতই বেশি ঘটাতে পারে, বিশেষত লোকে যখন অংশের পর অংশ জুড়ে সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলতে এবং সার্বিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামগ্রিক কোনো অর্থের সন্ধানে আগ্রহী। অথচ একজন খাপছাড়া লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। তাই নয় কি?

এখন আপনি যদি আমার এই শেষ সিদ্ধান্তটির সঙ্গে একমত না হয়ে উত্তরে বলেন: ‘ঠিক তা নয়’ অথবা ‘সব ক্ষেত্রে তা হয় না’ তাহলে আমার নায়ক আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি উৎসাহ বোধ করতে পারি। তার কারণ, একজন খাপছাড়া মানুষ সবক্ষেত্রে যে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নয়, তা তো বটেই, এমন

কি সময় সময় তার মধ্যে সাধারণ ধর্মের নির্যাসও খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সমসাময়িক আর সবাই—বাকি সকলে কোনো এক দমকা হাওয়ায় কেন যেন সাময়িক ভাবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন।...

নিতান্ত নীরস ও বিভ্রান্তিকর এই সব কৈফিয়ত দানের মধ্যে না গিয়ে কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াও অবশ্য শুরু করা যেত। পছন্দ হলে অমনিতেই লোকে পড়বে। কিন্তু মুশকিল এই যে জীবনবৃত্তান্ত আমার একটা অথচ কাহিনি দুটি।[1] দ্বিতীয়টিই মুখ্য। তার উপজীব্য আমাদের এই সময়ে, ঠিক এই বর্তমান মুহূর্তে আমার নায়কের কীর্তিকলাপ। প্রথম উপন্যাসের ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে তেরো বছর আগে—[2] এমনকি এটাকে উপন্যাস বলাও একেবারে ঠিক হবে না—বরং বলা যেতে পারে আমার নায়কের প্রথম যৌবনের একটি ক্ষণিক মুহূর্ত মাত্র। এই প্রথম উপন্যাসকে বাদ দিয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব, কেন না তা হলে দ্বিতীয় উপন্যাসের অনেক কিছুই দুর্বোধ্য থেকে যাবে। তাতে কিন্তু আমার প্রাথমিক অসুবিধা আরও জটিল হয়ে পড়ছে: আমি, অর্থাৎ স্বয়ং জীবনীকারই যদি মনে করি যে এরকম একটা সাদামাঠা ও বৈশিষ্ট্যহীন মানুষের ক্ষেত্রে একটি উপন্যাসই হয়তো বাড়তি, তাহলে আবার দুটো কেন? আমার এই আত্মম্ভরিতার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে?

এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে যেহেতু আমি বিভ্রান্ত, তাই ঠিক করেছি কোনো রকম সমাধানের চেষ্টা না করে সেগুলিকে এড়িয়েই যাব। বলাই বাহুল্য, বিচক্ষণ পাঠক অনেক আগে থাকতে অনুমান করতে পেরেছেন যে একেবারে গোড়া থেকে সে দিকেই আমার ঝোঁক। আমার ওপর তাঁর ক্ষোভ শুধু এই কারণে যে মিছিমিছি আমি কতকগুলো অন্তঃসারশূন্য কথা আর মূল্যবান সময় ব্যয় করছি। এর যথাযথ উত্তর অবশ্য আমি দেব: অন্তঃসারশূন্য কথা আর মূল্যবান সময় আমি ব্যয় করেছি প্রথমত ভদ্রতার খাতিরে, দ্বিতীয়ত ওটা আমার একটা চালাকি—আগে থাকতে সতর্ক করে দিলাম আর কি। প্রসঙ্গত অখণ্ডতার অপরিহার্য ঐক্যবন্ধন থাকা সত্ত্বেও আমার উপন্যাস যে আপনা আপনি দুটি উপাখ্যানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এই ভেবে আমি বরং খুশি। প্রথম উপাখ্যানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে পাঠক নিজেই স্থির করতে পারবেন দ্বিতীয়টি ধরা তাঁর পক্ষে সমীচীন হবে কিনা। অবশ্য কারও ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই—প্রথম উপন্যাসের দুটো পৃষ্ঠা পড়ার পর ইচ্ছে হলে বই সরিয়ে রাখতে পারেন, পরে আর নাও খুলতে পারেন। তবে এমন কিছু কিছু বিচক্ষণ পাঠকও আছেন যাঁরা নিরপেক্ষ বিচারে যাতে কোন ভুল না হয় সেই উদ্দেশ্যে অতি অবশ্য পড়ে শেষ করতে চাইবেন—রুশ সমালোকেরা সকলেই এই জাতের। হাজার হোক এ ধরনের মানুষও যে আছেন তা ভেবে আমি মনে মনে স্বস্তি বোধ করে থাকি। যাবতীয় নিষ্ঠা ও বিবেচনাবোধ সত্ত্বেও প্রথম আখ্যানের পর উপন্যাসটি সরিয়ে রাখার অজুহাত যদি তাঁদের থাকে তা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলে আমি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে রাজি আছি। ভূমিকায় এর বেশি

কিছু আমার বলার নেই। এটা যে বাড়তি সে বিষয়ে আমার এতটুকু দ্বিমত নেই, কিন্তু লেখা যখন একবার হয়ে গেছে তখন থাকলই বা।

এবারে কাজের কথায় আসা যাক।

The Online Library of Bangla Books

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

# প্রথম পর্ব

## প্রথম অধ্যায়

## একটি পারিবারিক ইতিবৃত্ত

### এক

### ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ কারামাজভ্

আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্ কারামাজভ্—ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ কারামাজভের তৃতীয় পুত্র। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ ছিল আমাদের মহকুমার একজন জমিদার। এক সময় আমাদের এলাকায় লোকটার নাম শোনা যেত—এবং এখনও যে লোকে মনে করতে পারে এর কারণ তার শোচনীয় ও রহস্যজনক মৃত্যু। ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক তেরো বছর আগে। সে কাহিনি যথাস্থানে বলা যাবে। নামেই 'জমিদার', জীবনের অতি অল্প সময় সে তার জমিদারিতে কাটিয়েছে। তার সম্পর্কে কেবল একটি কথাই বলতে হয়—অদ্ভুত চরিত্রের লোক। তবে ওরকম লোকের দেখা হামেশা মেলে না একথা বলা যায় না—ঠিক এমনই এক চরিত্রের যে শুধু কুৎসিত আবার নোংরাই নয়, কাণ্ডজ্ঞানহীনও বটে, যদিও সেই জাতের কাণ্ডজ্ঞানহীন, যাদের আর কোনো বিষয়ে না হোক, নিজেদের বিষয়সম্পত্তি সামলানোর ব্যাপারে জ্ঞান বেশ টনটনে। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ যখন জীবনযাত্রা শুরু করে তখন বলতে গেলে তার কিছুই ছিল না। সামান্য ছোটোখাটো জমিদার। সুযোগ পেলে যার তার বাড়িতে পাত পেতে বসে যেত, উঞ্ছবৃত্তি করে জীবন কাটত। কিন্তু যখন সে মারা যায় তখনও তার কাছ থেকে নগদ টাকাই পাওয়া গিয়েছিল এক লক্ষ রুবল। তা সত্ত্বেও আমাদের সারা মহকুমা জুড়ে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন উদ্ভট লোক হিসেবে তার সারাটা জীবন কাটে। আবারও বলছি: বোকামি নয়—উদ্ভট বলে যাদের আমরা জানি তাদের অধিকাংশই বেশ চালাক আর ধূর্ত প্রকৃতির—আসলে এটাকে বলা যায় স্রেফ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, তা আবার বিশেষ এক জাতের, জাতিগত।

লোকটা বিয়ে করেছিল দুবার। তিন ছেলে। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে—বড়ো ছেলে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ—মিতিয়া। বাকি দুজনের একজন ইভান, আরেকজন আলেক্সেই—আলিয়োশা। তাদের জন্ম দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচের প্রথম স্ত্রী

আমাদেরই মহকুমায় মিউসভ্ নামে রীতিমতো সম্পন্ন ও অভিজাত এক জমিদার পরিবারে মেয়ে। অগাধ বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সুন্দরী, তার ওপর প্রাণচঞ্চল বুদ্ধিমতী অমন একটি মেয়ে, যার দেখা পাওয়া আজকাল না হলেও সেকালে নিতান্তই দুষ্কর ছিল, লোকসমাজে অপদার্থ নামে পরিচিত ওরকম একটা বাজে লোককে কী করে যে স্বামী হিসেবে বেছে নিতে পারল তার বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। আজ থেকে দুই প্রজন্ম আগের রোমাণ্টিক যুগের একটি মেয়েকে আমি জানতাম—এক ভদ্রলোককে সে ভালোবেসেছিল, যে-কোনো সময় স্বচ্ছন্দে তাকে বিয়েও করতে পারত, কিন্তু বছরের পর বছর তার সঙ্গে প্রহেলিকাময় প্রণয়লীলার পর শেষকালে কেন যেন তার মাথায় ঢুকল যে তাদের মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে। তাই এক ঝড়ের রাতে উঁচু খাড়া পাড় থেকে গভীর খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করল—স্রেফ ঝোঁকের মাথায়, শেক্সপীয়রের ওফেলিয়ার মতো হওয়ার ইচ্ছায়। তার বহুকালের পছন্দসই বড়ো সাধের ওই খাড়া উঁচু পাড়টা যদি অমন চোখ জুড়ান না হত, ওই জায়গায় যদি নেহাৎ সাদামাঠা একটা গদ্যময় সমতল পাড় থাকত তাহলে আত্মহত্যার ঘটনাটা হয়তো আদৌ ঘটত না। ঘটনাটা সত্যি এবং ভেবে দেখতে গেলে আমাদের রুশিদের জীবনে গত দু-তিন প্রজন্মের মধ্যে এরকম বা সমজাতীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ঠিক তেমনি, আদেলাইদা ইভানভ্না মিউসভার এই অদ্ভুত আচরণও নিঃসন্দেহে ছিল অন্যদের ধ্যানধারণার প্রতিধ্বনি। সেই সঙ্গে এর পেছনে ছিল অন্তরের অবরুদ্ধ চিন্তার জ্বালা।[৫] সে হয়তো নারী স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিল, হয়তো চেয়েছিল তার আত্মীয়স্বজন ও পরিবার পরিজনের স্বেচ্ছাচার আর সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, অলীক কল্পনার মোহে একমাত্র একটি মুহূর্তের জন্য তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে উঞ্ছজীবী হওয়া সত্ত্বেও ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ আসলে প্রগতিমুখী এক যুগসন্ধিক্ষণের নির্ভীক ও তেজস্বী প্রবক্তাদের একজন। অথচ লোকটাকে একটা খল প্রকৃতির ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আরও চটক সৃষ্টি করেছিল প্রণয়ীর সঙ্গে আদেলাইদা ইভানভ্নার গোপনে গৃহত্যাগ, যা তার নিজের কাছে পরম উপভোগ্য মনে হয়েছিল। এদিকে ফিয়োদর পাভ্লভিচের তখন যা মানসিক অবস্থা তাতে এমন একটা সুযোগ গ্রহণ করতে তার এতটুকু বাধেনি—এর জন্য সে মুখিয়েই ছিল। যেন তেন প্রকারেণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তখনও তার একমাত্র লক্ষ্য। বড়ো ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতান আর ভালো যৌতুক হস্তগত করার সম্ভাবনায় সে পুলকিত। ওদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তা সম্ভবত একেবারেই ছিল না—না ভাবী বধূর দিক থেকে, না তার দিক থেকে—এমনকি আদেলাইদা ইভানভ্নার রূপ যৌবনের কোনো অভাব না থাকা সত্ত্বেও। ফিয়োদর পাভ্লভিচের মতো অতবড় একটা লম্পট, যে সারাটা জীবন মেয়েমানুষের পেছনে ছোঁক ছোঁক করে বেড়িয়েছে, কোনো বাছবিচার না করে সারা জীবন

সামান্যতম প্রশ্রয়ের ইঙ্গিতে মেয়েমানুষের পেছনে দৌড়েছে, তার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা বোধ করি একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। একমাত্র এই নারীই তার কামনা তেমন জাগ্রত করতে পারল না।

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে গৃহত্যাগের অনতিকাল পরেই আদেলাইদা ইভানভ্‌নার মোহভঙ্গ হল। সে আবিষ্কার করল স্বামীর প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি তার মনের মধ্যে নেই। ফলে এই পরিণয়ের স্বরূপ প্রকাশ পেতে খুব বেশি দেরি হল না। মেয়ের পরিবার অবশ্য সহজই এই ঘটনাকে মেনে নিল, পলাতককে তার প্রাপ্য অংশ মিটিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর জীবনে ইতিমধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঝগড়াঝাঁটি তাদের নিত্য লেগে থাকত। শোনা যায় এক্ষেত্রে নববধূ এত বেশি উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিল যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের ব্যবহারের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। একথা জানতে কারও বাকি নেই যে আদেলাইদা ইভানভ্‌না পঁচিশ হাজার রুবল হাতে পেতে না পেতে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ সঙ্গে সঙ্গে তার পুরোটা হাতিয়ে নেয়—সে টাকার আর কোনো হদিশ মেলেনি। যৌতুক হিসেবে এছাড়া যে একটি গ্রামের জমিদারী আর শহরের একটা সুন্দর বাড়ি মহিলার ভাগে পড়েছিল তাও লোকটা সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল তৈরি করে নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার তালে ছিল, এ ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটিও সে করেনি। এই নিয়ে বেহায়ার মতো সমানে ঝোলাঝুলি আর ঘ্যানঘ্যান করে স্ত্রীর মনের মধ্যেও তার প্রতি যে অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণার ভাব সে জাগিয়ে তুলেছিল একমাত্র তার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত শুধু মানসিক ক্লান্তিবশত, স্রেফ স্বামী রত্নটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই হয়তো তার নামে দানপত্র সে লিখে দিত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত মহিলার বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজন মাঝে পড়ে প্রতারণার সে পথ বন্ধ করে দেয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মারামারির ঘটনা যে বিরল ছিল না তা সুবিদিত। তবে জনশ্রুতি এই যে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ মারত না, মারত আদেলাইদো ইভানভ্‌না। রোদে পোড়া তামাটে বর্ণের এই বদমেজাজি, জেদি অসহিষ্ণু প্রকৃতির মহিলাটি ছিল অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারিণী। শেষ পর্যন্ত এক দিন ধর্মশিক্ষায়তনের এক সহায়সম্বলহীন নিঃস্ব শিক্ষগুরুর সঙ্গে গৃহ পরিত্যাগ করে সে চলে গেল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের হাতে রেখে গেল তিন বছর বয়সের সন্তান মিতিয়াকে। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ কালবিলম্ব না করে বাড়িটাকে দস্তুরমতো একটা হারেম বানিয়ে ফেলল, নিত্য মেতে রইল উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসবে। এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে সে টহল দিয়ে বেড়াত সারাটা জেলা, যাকে পেত তারই সামনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে কুলটা আদেলাইদা ইভানভ্‌নার নামে নালিশ করত, প্রসঙ্গত নিজেদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এমন সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ জানাত যা যে কোনো স্বামীর পক্ষে মুখে আনা রীতিমতো লজ্জাজনক। আসল কথা, সর্বসমক্ষে অপমানিত স্বামীর হাস্যকর ভূমিকায় অভিনয় করে, এমনকি রসিয়ে রসিয়ে নিজের অপমানের জ্বালার বিশদ

বর্ণনা দিয়ে সে যেন মনে মনে সুখ উপভোগ করত, এমনকি এক ধরনের আত্মপ্রসাদও অনুভব করত। শ্রোতাদের পক্ষে কেউ কেউ ঠাট্টা করে তার মুখের ওপরই বলত, 'দেখে শুনে মনে হয়, তোমার পদোন্নতি হয়েছে হে ফিয়োদর্‌ পাভলভিচ্‌। দুঃখ কর আর যাই কর, তোমাকে ত দিব্যি খুশি খুশি দেখাচ্ছে।' অনেকে আবার এমন কথাও বলতে লাগল যে নতুন করে ভাঁড়ামি করার সুযোগ পেয়ে তার খুশি আর ধরে না এবং লোকে যাতে আরও বেশি হাসে সেই উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন নিজের হাস্যকর অবস্থাটা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু কে বলতে পারে, হয়তো এটা ছিল তার এক ধরনের সরলতা? অবশেষে পলাতকার সন্ধান পাওয়া গেল। বেচারি তার সেই প্রেমিকার সঙ্গে সাংকৃত পেতেবুর্গে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে অবাধ মুক্ত জীবনের স্রোতে মনেপ্রাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। ফিয়োদর্‌ পাভ্‌লভিচ্‌ সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল, পেতেবুর্গে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল।—কেন?—তা সে নিজেও জানে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত যেতও। কিন্তু এরকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল যাত্রার আগে মনের জোর আনার খাতিরে মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার বিশেষ অধিকার তার আছে। ঠিক সেই সময় তার স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেরা পেতের্বুর্গে মহিলার মৃত্যুসংবাদ পেল। হঠাৎ মৃত্যু, এক বাড়ির চিলেকোঠায়। কেউ বলে মরেছে টাইফাসে, কেউ বা বলে ক্ষুধার তাড়নায়। ফিয়োদর্‌ পাভ্‌লভিচ্‌ যখন তার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেল তখন সে নেশায় চুর। শোনা যায় সেই অবস্থায় নাকি সে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আকাশের দিকে দুহাত তুলে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে: 'হে প্রভু, এক্ষণে তোমার দাসকে অব্যাহতি দান কর।' কারও কারও কথায়, সে নাকি একটা বাচ্চা ছেলের মতো এমন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে যে লোকে তাকে দুচক্ষে দেখতে না পারলে কী হয় তার দশা দেখে দুঃখবোধ করে। হয়তো দুইই সত্যি। অর্থাৎ কিনা স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে আনন্দে যেমন আত্মহারা হয়েছিল, তেমনি যে স্ত্রী তাকে মুক্তি দিয়ে গেল তার জন্য চোখের জলও ফেলল—একই সঙ্গে। মানুষ, সে যত বড়ো দুর্বৃত্তই হোক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় তাদের সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, সাধারণত তার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধে ও সরলমতি। তাছাড়া আমরা নিজেরাও তো তাই।

## দুই

## জ্যেষ্ঠ পুত্রের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

এহেন লোক বাপ হিসেবে কেমন হতে পারে এবং সন্তানের লালনপালনই বা কীভাবে করতে পারে তা অনুমান করা নিশ্চয়ই কঠিন নয়। বাপ হিসেবে সে যে আচরণের পরিচয় দিল ঠিক সেটাই তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল। অর্থাৎ আদেলাইদা

ইভানভ্‌নার গর্ভজাত সন্তানকে একেবার পরিত্যাগ করল। এর কারণ কিন্তু শিশুর প্রতি তার বিদ্বেষ নয়, বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তার মনের কোনো ক্ষোভও নয়। আসলে ছেলেটার অস্তিত্ব সে বেমালুম ভুলে গেল। লোকজনকে ধরে ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের শোক-দুঃখের কথা জানিয়ে যখন সে তাদের উত্যক্ত করে তুলছে, অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতায় বাড়িটাকে নরককুণ্ড বানিয়ে তুলেছে তখন তিন বছরের শিশু মিতিয়ার দেখাশোনার ভার তুলে নিল বাড়ির বিশ্বস্ত ভৃত্য গ্রিগোরি। গ্রিগোরি তখন সে ভার না নিলে বাচ্চাটার জামা বদল করার পর্যন্ত কেউ ছিল না। পরন্তু তার মাতৃকুলের আত্মীয়স্বজনও যেন গোড়ার দিকে তার কথা ভুলে গিয়েছিল। দাদামশায় অর্থাৎ আদেলাইদা ইভানভ্‌নার পিতৃদেব মিউসভ্ মহাশয় ততদিনে গত হয়েছে। তার বিধবা স্ত্রী, মিতিয়ার দিদিমা মস্কোয় চলে আসর পর থেকে সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। আদেলাইদার বোনদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। ফলে মিতিয়াকে প্রায় পুরো একটি বছর গ্রিগোরির তত্ত্বাবধানে ভৃত্যমহলে তার কুঁড়েঘরে কাটাতে হয়। প্রসঙ্গত, বাপের যদি ওর কথা মনেও পড়ত—ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সে জানত না, তা তো আর আসলে হতে পারে না—তবু সে নিজেই ওকে ফের ওই ভৃত্যমহলেই পাঠিয়ে দিত। কেন না ছেলে তার উচ্ছৃঙ্খলতার পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারত। কিন্তু ঘটনাচক্রে তখন প্যারিস থেকে ফিরে এসেছে আদেলাইদা ইভানভ্‌নার এক খুড়তুতো ভাই পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্ মিউসভ্। এর পরে এক নাগাড়ে আরও বহু বছর তাকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে। যখনকার কথা বলছি তখন সে সদ্য যুবা, রাজধানীতে ও বিদেশে বসবাসকারী একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে মিউসভ্‌দের মধ্যে সে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়েছিল। আজীবন সে ছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভক্ত। উত্তর জীবনে সে হয়েছিল চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের একজন উদারনৈতিক। কর্মজীবনে সে রাশিয়া ও দেশের বাইরে তার যুগের বহুবিখ্যাত উদারনৈতিক মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল। প্রুদোঁ[১১] ও বাকুনিনের[১২] সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। জীবনের পথপরিক্রমার শেষে এসে সে আটচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারির তিন দিন ব্যাপী প্যারিস বিপ্লবের[১৩] স্মৃতিচারণা করে বিশেষ সুখ পেত।—প্রসঙ্গত এমন ইঙ্গিতও দিত যে সে নিজে বলতে গেলে ওই সময় ব্যারিকেডে অংশ গ্রহণ করেছিল। এটা ছিল তার যৌবনের অন্যতম সুখস্মৃতি। বিষয় আশয়ের জন্য তাকে অন্য কারও ওপরে নির্ভর করতে হত না, আগেকার দিনে যাদের 'জন' বলা হত, সেই ভূমিদাস তার ছিল সংখ্যায় হাজার খানেক। তার অতি চমৎকার তালুকটি ছিল আমাদের শহর যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখানটায়, আমাদের বিখ্যাত মঠের জমির গায়ে তার সীমানা। পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচের বয়স তখন খুবই কম, সবে জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়েছে—সেই তখন থেকেই নদীতে মাছ ধরার বা জঙ্গলে কাঠ কাটার কীসের যেন অধিকার নিয়ে মঠ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার একটানা মামলা চলতে থাকে। তবে 'ক্ল্যারিকালদের'[১৪]

বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা একজন আলোকপ্রাপ্ত মানুষ ও নাগরিক হিসেবে সে তার কর্তব্যও মনে করত। আদেলাইদা ইভানভ্নাকে বলাই বাহুল্য তার মনে ছিল, এমনকি কোনো এক সময় মেয়েটিকে তার চোখেও লেগেছিল, তাই তার সম্পর্কে সমস্ত কথা শোনার পর এবং মিতিয়ার কথা জানতে পেরে যৌবনের যত ঘৃণা আর অবজ্ঞা ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের জন্য তার মনে জমা হয়ে থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সে জড়িত না হয়ে পারল না। এই সূত্রেই ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। সে সরাসরি তাকে জানাল যে মিতিয়ার শিক্ষা দীক্ষার ভার সে গ্রহণ করতে চায়। তারপর বহুকাল লোকটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে সে বলত, যখন ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের সঙ্গে দেখা করে সে মিতিয়া প্রসঙ্গ তুলল তখন কিছুক্ষণের জন্য তার চোখেমুখে এমন ভাব ফুটে উঠল যেন কোন্ বাচ্চার কথা হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না, এমনকি বাড়িতে মিতিয়া নামে তার একটা বাচ্চা ছেলে আছে তা জানতে পেরে সে যেন অবাকই হয়ে গেল। পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচের বিবরণের মধ্যে যদি কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকেও তবু ঘটনাটা যে একেবারে অসত্য এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। কিন্তু ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ সত্যি সত্যি সারা জীবন ভান করতে আর হঠাৎ হঠাৎ সকলের সামনে কোনো অপ্রত্যাশিত চমক জাগান ভূমিকায় অভিনয় করতে ভালোবাসত—সবচেয়ে বড়ো কথা, কোনো কোনো সময় কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তাই করত, এমনকি নিজের ক্ষতি করেও—যেমন হয়েছিল বর্তমান ক্ষেত্রে। এই অভ্যাস অবশ্য অজস্র মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান—ফিয়োদর পাভ্লভিচের মতো আদৌ নয়। পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্ মহা উৎসাহে এই কাজ সম্পন্ন করল, সে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের সঙ্গে শিশুর অভিভাবকও নিযুক্ত হল লিখিত পড়িত ভাবে, যেহেতু মার মৃত্যুর পর শিশু ছোটোখাটো বিষয়সম্পত্তির—একটা বাড়ি আর খানিকটা জমির মালিকও হয়েছিল। মিতিয়া সত্যি সত্যি তার এই মামাটির কাছে এসে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু মামার নিজের বলতে কিছু ছিল না, এবং যেহেতু কোনোমতে বিষয়কর্ম সেরে, তালুকের খাজনা আদায়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার পর তাঁকে তাড়াহুড়ো করে দীর্ঘকালের জন্য আবার প্যারিসে পাড়ি জমাতে হল সেই হেতু মিতিয়াকে সে মস্কোয় তার এক সম্পর্কীয় পিসির জিম্মায় রেখে গেল। প্যারিসে থিতু হয়ে বসার পর বাচ্চা ছেলেটাকে ভুলে যেতে তারও দেরি হল না—বিশেষত যখন ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। ওই বিপ্লব তার মনে এত গভীর দাগ কেটেছিল যে সারা জীবন সে তা ভুলতে পারেনি। মস্কোর সেই মহিলাটি এক সময় মারা যেতে মিতিয়া মহিলার এক বিবাহিতা মেয়ের সংসারে আশ্রয় পেল। পরে খুব সম্ভব চতুর্থবার মিতিয়াকে আবার তার আস্তানা পালটাতে হয়। সে কথা এখন থাক, বিশেষত ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের এই প্রথম সন্তান সম্পর্কে যখন আমাকে আরও অনেক কথা বলতে হবে; তাই আপাতত,

কেবল তার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলির মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকব, কেননা তা না হলে আমি আমার এই কাহিনি শুরুই করতে পারছি না।

প্রথমত এই মিতিয়া, যার ভালো নাম দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচ্, ফিয়োদরের তিন ছেলের মধ্যে, একমাত্র ছেলে যার মনে শিশুকাল থেকে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে সে কিছু বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং যখন সে সাবালক হবে তখন স্বাধীন জীবনযাপনে তার কোনো বাধা থাকবে না। তার বাল্য আর কৈশোর কাটে বিশৃঙ্খল ভাবে। স্কুলের শিক্ষা সে শেষ করতে পারেনি, পরে একটি সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তার পরে ককেশাসে যায়, সেখানে তার পদোন্নতিও হয়। তবে ডুয়েল লড়ার ফলে তার পদমর্যাদা হ্রাস পায়। পরে আবার পদোন্নতি হয়। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে প্রচুর টাকাপয়সা উড়িয়ে দেয়। সাবালক হওয়ার পর থেকে বাপের কাছ থেকে সে টাকা পেতে থাকে, কিন্তু এর আগে পর্যন্ত ঋণের বোঝা কেবল বাড়িয়েই গিয়েছে। বাপ ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচের সঙ্গে প্রথম তার যতটুকু পরিচয় ও দেখা তা সেই সাবালক হওয়ার পর। তখন সে বিশেষ করে বাপের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে আমাদের এই অঞ্চলে এসেছিল। মনে হয় তখনই নিজের জন্মদাতাকে তার তেমন মনে ধরেনি। বেশিদিন তার কাছে থাকেও নি, পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে মাত্র কিছু টাকা হাতিয়ে এবং তার সঙ্গে তালুকের আয় থেকে ভবিষ্যতে নিয়মিত কিছু পাবার একটা বন্দোবস্ত করে সে যত তাড়াতাড়ি পারে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেয়। লক্ষ করার বিষয় এই যে তার ভূসম্পত্তির মূল্য এবং তা থেকে আয় যে কত সে যাত্রায় শত চেষ্টা করেও ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচের কাছ থেকে তার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। একথা মনে রাখতে হবে যে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ সেই প্রথমবারের সাক্ষাতের সময় মন্তব্য করেছিল যে নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে মিতিয়ার ধারণা আসলে ভুল ও অতিরঞ্জিত। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ মনে মনে যে হিসেব করে রেখেছে তাই ভেবে সে বেজায় খুশি—সে এটাই বুঝতে পারল যে এই যুবক আসলে অস্থিরমতি, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল, প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ, অসহিষ্ণু ও শিথিল চরিত্রের—আপাতত কিছু হাতে পাওয়া নিয়ে কথা। কাঁচা টাকা হাতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যাবে—তা হলই বা অল্প সময়ের জন্য। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ এই কৌশলটা নিজের স্বার্থে খাটাতে লাগল, অর্থাৎ অল্পস্বল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল বাদে বাদে কিস্তিতে কিস্তিতে ছেলেকে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে লাগল। এই ভাবে বছর চারেক চলার পর শেষকালে অবস্থা এমন হল যে মিতিয়া ধৈর্য হারিয়ে জন্মদাতা বাপের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আবার আমাদের শহরে এসে হাজির হল। আসার পর হঠাৎই সে এই তথ্য আবিষ্কার করে দারুণ অবাক হয়ে গেল যে তার পাওনা বলতে কিছুই নেই, পাওনাগণ্ডা হিসাবের ব্যাপারটা পর্যন্ত বেশ কঠিন। দেখা যাচ্ছে তার সম্পত্তির মোট যা মূল্য হয়, ইতিমধ্যে নগদে

ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের কাছ থেকে সে তো তা পেয়েই গেছে বরং এখন হয়তো উলটে সে নিজেই বাপের কাছে ঋণী। তাছাড়া এটা ওটা দলিলপত্র অমুক অমুক সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সই করে বিনিময়ে সে যা পেয়েছে তার ফলে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কারণে কানাকড়ি দাবি করার অধিকার তার নেই। যুবক একেবারে স্তম্ভিত। বাপ তাকে মিথ্যে বলছে, ফাঁকি দিচ্ছে এই সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিতে সে রেগে আগুন, তার মাথা বিগড়ে যাবার মতো অবস্থা। এই পরিস্থিতির ফলেই এমন এক বিপর্যয়ের সূচনা যার বিবরণ আমার প্রথম অথবা প্রারম্ভিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু, অথবা আরও ভালোভাবে বলা যেতে পারে, তার বাহ্যবস্তু। কিন্তু এই উপন্যাসের অবতারণা করার আগে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের অপর দুই পুত্র—মিতিয়ার অন্য দুই ভাইয়ের কথা এবং কোথা থেকে তারা এলো তা বলে নেওয়া দরকার।

## তিন

## দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ, আরও দুই সন্তানের জন্ম

চার বছরের মিতিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার পর দেখতে দেখতে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে বসল। তার এই বিয়ে বছর আষ্টেক স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম সোফিয়া ইভানভ্না। তারও বয়স খুব কম—অন্য এক প্রদেশের মেয়ে। ছোটোখাটো একটা লেনদেনের ব্যাপারে এক ইহুদি মহাজনের সঙ্গে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচকে সেখানে যেতে হয়েছিল। ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ লোকটা মাতাল উচ্ছৃঙ্খল ও লম্পট হলে কী হবে, টাকা খাটাতে সে কারও চাইতে কম জানত না, ব্যবসায় বুদ্ধি তার প্রখর ছিল। অবশ্য তার বেশির ভাগ লেনদেনই ছিল গোলমেলে ধরনের। সোফিয়া ইভানভ্না ছিল গির্জার কোনো এক অজ্ঞাতকুলশীল কর্মচারীর মেয়ে, শিশুকাল থেকে পিতৃমাতৃহীনা, 'অনাথা', আত্মীয়স্বজন বলতে তার কেউ ছিল না। মানুষ হয় এক ধনী পরিবারে—জেনারেল ভরোখভের বিধবা পত্নীর আশ্রয়ে। অভিজাত পরিবারের এই বৃদ্ধা মহিলা একদিকে যেমন মেয়েটার পরম উপকার সাধন করেছে তেমনি তার ওপর নির্যাতনও কম করত না। বিশদ জানি না, তবে শোনা কথা এই যে নিরীহ, ভদ্র ও মুখচোরা স্বভাবের এই মেয়েটি উঠতে বসতে বৃদ্ধার দাঁত খিচুনি আর তার খামখেয়ালে এতদূর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে একবার ভাঁড়ার ঘরের একটা পেরেকে ফাঁস ঝুলিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল—সময়মতো তাকে যেখান থেকে নামিয়ে আনা হয়, তাইতে বেঁচে যায়। বৃদ্ধার মনের মধ্যে যে মেয়েটার প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছিল তা মনে হয় না, তার বদমেজাজ আর খামখেয়ালের আসল কারণ স্রেফ আলস্য—কিছু করার নেই বলে। ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ মেয়েটির পাণিপ্রার্থনা করল। তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার পর বৃদ্ধা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিল। প্রথমবারের বিয়ে যে পন্থায় হয়েছিল এবারেও সেই

একই পন্থা অবলম্বন করল ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্—মেয়েটির কানে গৃহত্যাগের মন্ত্রণা দিল। এটা ঠিক যে যথাসময়ে তার চরিত্রের যদি আর একটু বেশি পরিচয় মেয়েটি জানত তাহলে খুব সম্ভব কিছুতেই সে তাকে বিয়ে করতে যেত না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে অন্য এক প্রদেশে। তাছাড়া এক ষোড়শী কিশোরীর আর কীই বা বোঝার ক্ষমতা থাকতে পারে যখন তার মনে হয় আশ্রয়দাত্রীর অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটান অনেক ভালো। অতএব বেচারি আশ্রয়দাত্রীকে ছেড়ে আশ্রয়দাতাকে ধরল। ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ এ বিয়েতে একটি কপর্দকও পেল না। জেনারেল-গিন্নি তো এ খবর শুনে রেগে আগুন—কিছু তো দিলই না, পরন্তু ওদের দুজনকেই যা নয় তাই বলে শাপশাপান্ত করল। তবে পণের আশা ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ নিজেও করেনি। এতদিন কেবল স্থূল ধরনের নারী সৌন্দর্য উপভোগের পর এই অপাপবিদ্ধা কুমারীর সরল সৌন্দর্যই হঠাৎ প্রলুব্ধ করেছিল বিকৃত রুচির লম্পটটাকে, তাকে সর্বোপরি মুগ্ধ করেছিল মেয়েটির সরল নিষ্পাপ চেহারায়। বিয়ের পরে তার স্বভাবসুলভ নোংরা হাসি হেসে সে প্রায়ই বলত: ‘হেঁ হেঁ ওর ওই মিষ্টি নিষ্পাপ চোখের চাউনি ক্ষুরের মতো আমার বুকের ভেতরটা কেটে ফালা ফালা করে দিয়েছিল।’ যা হোক এরকম একটা জঘন্য লম্পটের ক্ষেত্রে এটাকেও লালসা ছাড়া উঁচু দরের কোনো অনুভূতির প্রকাশ বলা যায় না। বিয়ে করে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ যেহেতু কোনও পণ পায়নি সেই হেতু স্ত্রীর প্রতি এতটুকু সমাদর দেখানোর প্রয়োজন সে বোধ করল না। তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সে তাকে বলতে গেলে গলায় দড়ি দেবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে মনে মনে এই বিবেচনা করে, তাছাড়া মেয়েটার অসাধারণ নিরীহ ও মুখচোরা স্বভাবের সুযোগ নিয়ে দাম্পত্য জীবনের সামান্যতম সম্ভ্রমবোধকেও পদদলিত করতে তার এতটুকু বাধল না। স্ত্রীর সাক্ষাতেই বাড়ির মধ্যে নষ্ট মেয়েদের আনাগোনা আর উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসব চলতে লাগল। একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হতে পারে যে ফিয়োদর্ পাভ্লোভিচের গোমড়ামুখো, একগুঁয়ে তার্কিক স্বভাবের ভৃত্য যে গ্রিগোরি তার আগেকার গৃহস্বামিনী আদেলাইদা ইভানভ্নাকে দু চক্ষে দেখতে পারত না, এবার কিন্তু সে নববধূর পক্ষ নিল, তার পক্ষ নিয়ে মাঝে মাঝে প্রভুকে যে ভাষায় তিরস্কার করতে লাগল তা কোনো ভৃত্যের মুখে কদাচিৎ শোভা পায়। একবার তো সে প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল পানের আসরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাজে মেয়েদের দঙ্গলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়। সেই শিশুকাল থেকে ভয়ে তটস্থ বেচারি তরুণী বধূটি—শেষ পর্যন্ত এক ধরনের মেয়েলি স্নায়বিক রোগের শিকার হল। সাধারণ গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে এ রোগ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, গ্রাম্যলোকে একে বলে ভূতে পাওয়া। এই রোগের ফলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা হতে লাগল তার, এমনকি সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণও দেখা গেল। এরই মধ্যে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের দুটি ছেলের জন্ম দিল সে। একজন ইভান, অন্যজন আলেক্সেই। প্রথমটির জন্ম বিয়ের প্রথম

বছরেই, দ্বিতীয়টির—তিন বছর পরে। হতভাগিনী যখন মারা গেল তখন ছেলে আলেক্সেইয়ের বয়স চলছিল চার বছর। অদ্ভুত বলে মনে হলেও আমি জানি যে পরে সে সারা জীবনের মতো তার মাকে মনে করে রাখে—অবশ্য বলাই বাহুল্য সে স্মৃতি ছিল স্বপ্নের মতো ভাসা ভাসা। মা মারা যাবার পর এই দুই ছেলেরও অবস্থা হল ঠিক তাদের বড়ো ভাই মিতিয়ার মতো। বাপ তাদের কথা বেমালুম ভুলে গেল, ফিরেও তাকাত না তাদের দিকে। তারা মানুষ হতে লাগল ভৃত্য গ্রিগোরির কাছে, তার সেই কুটিরে। সেখানেই তাদের সন্ধান পেল তাদের মার আশ্রয়দাত্রী সেই স্বেচ্ছাচারিণী বৃদ্ধা, জেনারেলের বিধবা পত্নী, যে তাকে মানুষ করেছিল। তখনও সে বেঁচে এবং গত আট বছরের মধ্যে একবারও অপমানের জ্বালা সে ভুলতে পারেনি। গত আটবছর ধরে সে তার সোফিয়ার জীবনের গতিপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সঠিক খবর রাখত। সোফিয়ার অসুস্থতা এবং তার বীভৎস পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা শুনে সে তার আশ্রয়ে প্রতিপালিত অন্যদের দু তিনবার শুনিয়ে শুনিয়েই বলল: "ঠিক হয়েছে, বেইমানির শাস্তি ভগবান ওকে দিয়েছেন।"

কিন্তু সোফিয়া ইভানভ্‌নার মৃত্যুর ঠিক তিন মাস পরেই জেনারেলের বিধবা পত্নী একদিন হঠাৎ সশরীরে আমাদের শহরে এসে উদয় হল, সটান গিয়ে হাজির হল ফিয়োদর্ পাভলভিচের কুটিতে। শহরে ছিল মাত্র আধঘণ্টা খানেক, কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই প্রচুর কাজ সারল। সময়টা তখন সন্ধ্যা। এই আট বছরের মধ্যে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচের সঙ্গে তার কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ যখন মহিলার সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে এলো তখন সে মাতাল। শোনা যায়, তার দেখা পাওয়ামাত্র মহিলা বিনাবাক্যব্যয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার দু গালে চটাস চটাস করে চটপট দুটো চড় কষিয়ে দিল, তার মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে উপরে নীচে তিনবার হেঁচকা টান মারল, তারপর কোনো কথা না বলে সোজা চলে গেল ভৃত্য মহলে শিশু দুটির সন্ধানে। ওদের নোংরা চেহারা আর গায়ের মলিন জামাকাপড়ের দিকে নজর পড়ামাত্র সে এবারও ক্ষেপে উঠল এবং কালবিলম্ব না করে এবারে গ্রিগোরিকেই চড় মারল, জানিয়ে দিল যে শিশুদুটিকে সে নিয়ে যাচ্ছে নিজের কাছে। তারপর ওরা যে পোশাকে ছিল সেই পোশাকেই ওদের তুলে নিয়ে এসে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে সোজা গাড়িতে তুলল। গ্রিগোরি অনুগত ভৃত্যের মতো চড়টা হজম করে নিল, কোনো রকম অভদ্রতা করল না। কোনও প্রতিবাদ জানাল না। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধা মহিলাকে বিদায় জানানোর সময় আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে একথাও বলল যে অনাথ দুটোর ভার নেবার জন্য ভগবান ওঁর ভালো করবেন। জেনারেল-পত্নী গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল: "বোকা হাঁদা কোথাকার।" ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন ভেবে দেখল ব্যবস্থাটা ভালোই। পরে জেনারেল-পত্নীর কাছে

তার ছেলেদের মানুষ হওয়ার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে মত দিতে কোনও দিক থেকে তার এতটুকু বাধা রইল না। আর চড় খাওয়ার ঘটনাটা সে নিজেই সারা শহরে ঘুরে ঘুরে রসিয়ে রসিয়ে বলে বেড়াতে লাগল।

ঘটনাক্রমে এর কিছুদিন বাদে জেনারেল-পত্নীও গত হল। তবে মৃত্যুর আগে দুটি শিশুর নামে প্রত্যেকের নামে হাজার রুবল করে উইল করে যায় 'তাদের শিক্ষা বাবদ, যাতে ওই টাকা সমস্তটা তাদের পেছনে অতি অবশ্যই এমন ভাবে খরচ করা হয় যে তারা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ওতে কুলিয়ে যায়, যেহেতু এহেন শিশুদের জন্য ওই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পর্যন্ত মাত্রাতিরিক্ত। অবশ্য অন্য কেউ টাকা ঢালতে চাইলে ঢালতে পারে... ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের কথা সেই উইলে লেখা ছিল। উইল আমি নিজে পড়িনি, তবে শুনেছি প্রকাশের ধরনটা নাকি ওই রকমই বড়ো অদ্ভুত আর বিচিত্র ছিল। বৃদ্ধার প্রধান উত্তরাধিকারী হল ওই অঞ্চলেরই একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—জেলার রাজপুরুষ প্রধান এফিম পেত্রোভিচ পলিয়েনভ্। অতি সজ্জন ব্যক্তি। ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের সঙ্গে চিঠি চালাচালির পর তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে ছেলে দুটির প্রতিপালনের জন্য তাদের বাপের কাছ থেকে কিছুই বের করা যাবে না, যদিও টাকাকড়ি দেবে না এমন কথা সে সরাসরি কখনও বলেনি। তবে ওই প্রসঙ্গ উঠলেই সে নানারকম টালবাহানা করত, এমনকি কখনও কখনও হৃদয়াবেগের বন্যা বইয়ে দিত। যা হোক পলিয়েনভ্ নিজেই অনাথ শিশু দুটির দায়িত্ব গ্রহণ করল। বিশেষ করে তার মায়া পড়ে যায় ছোটো আলেক্সেইয়ের ওপর—এত বেশি মায়া পড়ে যায় যে সে দীর্ঘদিন তার পরিবারের একজন হিসেবে বড়ো হতে থাকে। গোড়াতেই আমি এই ব্যাপারে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই দুই তরুণকে তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য যদি কারও কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তাহলে সে এই এফিম্ পেত্রোভিচ্ ছাড়া আর কেউ নয়। অতি মহদাশয়, এত বেশি মানবিক গুণের অধিকারী যে তেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। জেনারেল-পত্নী ওদের যে হাজার রুবল করে রেখে গিয়েছিল সে টাকা সে স্পর্শ না করে এমনভাবে রেখে দিল যে ওরা যখন সাবালকত্ব অর্জন করল ততদিনে তা সুদে মূলে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের প্রতিপালন সে করে তার নিজের টাকায়। বলাই বাহুল্য একেক জনের পেছনে তার খরচ হল হাজার রুবলেরও অনেক বেশি। ওদের বাল্য ও কৈশোরের বিশদ বিবরণও আমি আপাতত দিতে যাচ্ছি না, ওই পর্বের মূল কতকগুলো ঘটনার উল্লেখমাত্র করব। প্রসঙ্গত, বড়ো ভাই ইভান সম্পর্কে কেবল এই কথাই জানাই যে কেমন যেন বিষণ্ণ ও চাপা স্বভাবের এক কিশোরে পরিণত হয়েছিল, যদিও ভীরু তাকে আদৌ বলা যায় না। দশ বছর বয়স থেকেই সে যেন বুঝতে শুরু করেছিল যে হাজার হোক তারা পরাশ্রয়ী, অপরের কৃপাপ্রার্থী এবং তাদের বাপ এমন একটা লোক যার নাম মুখে আনতে লজ্জা করে। এই বালক খুব তাড়াতাড়ি, একেবারে শিশুকাল থেকে—অন্তত লোকে

তাই বলে—অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও মেধার পরিচয় দিতে থাকে। সঠিক জানি না, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, তেরো বছর হতে না হতেই এফিম পেত্রোভিচের পারিবারিক আশ্রয় পরিত্যাগ করে মস্কোর এক শিক্ষায়তনে ঢোকে এবং তখনকার দিনে এক নামজাদা অভিজ্ঞ শিক্ষকের গৃহে বসবাস করতে থাকে। ভদ্রলোক ছিলেন এফিম পেত্রোভিচের ছেলেবেলার বন্ধু। ইভান নিজে পরে বলে বেড়াত যে এ সবই ঘটেছে 'ভালো কাজের জন্য' এফিম পেত্রোভিচের 'গভীর আকুলতার' ফলে। তার মাথায় এই চিন্তা বাসা বেঁধে বসেছিল যে অসাধারণ বুৎপত্তিসম্পন্ন বালকের শিক্ষার ভার যার উপর দেওয়া হবে সেই শিক্ষককেও অসাধারণ হতে হবে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে যুবক যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল ততদিনে এফিম পেত্রোভিচ বা অসাধারণ শিক্ষকটি—তাদের কেউই আর জীবিত ছিল না। সেই স্বেচ্ছাচারিণী জেনারেল-পত্নী ছেলে দুটিকে উইল করে যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল এবং যা ইতিমধ্যে সুদেমূলে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা তোলার ব্যাপারে এফিম পেত্রোভিচ যেহেতু ভালোমতো বন্দোবস্ত করে যেতে পারেননি, সেই হেতু আমাদের দেশে যা অবধারিত তাই হল—অর্থাৎ আইনঘটিত নানা বাধা আর লাল ফিতের বাঁধন কেটে সেই টাকা বের হতে অনেক বিলম্ব হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু বছর দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কাটে, কেননা এই সময় পড়াশুনা করতে করতে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খাওয়া পরার কথা ভাবতে হত। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এত অসুবিধা সত্ত্বেও একবারও বাপকে একটি ছত্রও লেখার প্রবৃত্তি পর্যন্ত তার হয়নি। তার কারণ হতে পারে আত্মসম্মান বোধ, বাপের প্রতি অবজ্ঞার ভাব, হয়তো বা ওর নিজের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতা, সুস্থ বিচারবুদ্ধি, যার ফলে ওর মনে হয়েছিল যে অমন বাপের কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা। সে যাই হোক না কেন, যুবক তাতে এতটুকু দমল না, যা হোক করে কাজ জুটিয়ে নিল, প্রথম প্রথম যৎসামান্য বেতনে ছাত্র পড়াতে শুরু করল, তারপর খবরের কাগজের দপ্তরে ঘুরে ঘুরে 'প্রত্যক্ষদর্শীর' স্বাক্ষরে গোটা দশেক ছত্রের মধ্যে রাস্তার ঘটনা সম্পর্কে ছোটোখাটো বিবরণ বিক্রি করতে লাগল। শোনা যায় তার ওই লেখাগুলো সব সময় এত কৌতূহলজনক আর রসাল হত যে দ্রুত তাদের কাটতি বেড়ে গেল। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের দেশের শিক্ষার্থী যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বদা অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভাগ্য পীড়িতদের যে বিপুল অংশ দেশের রাজধানী আর মহানগরের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অফিসের দোরগোড়ায় সচরাচর সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ধরনা দিয়ে থাকে, অথচ ফরাসি থেকে তর্জমা করা বা লেখা কপি করার ওই এক আর্জি ছাড়া আর কোনও কিছু করার কথা যারা কল্পনাই করতে পারে না, এই যুবকের সাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানবত্তা তাদের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রখর। পত্রিকার দপ্তরগুলোর সঙ্গে একবার জানাশোনা হয়ে যাবার পর ইভান ফিয়োদরভিচ্ নিয়মিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে

চলত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষ দিকে বিভিন্ন কাগজে নানা বিষয়ের বইয়ের ওপর এত চমৎকার সব পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ করতে লাগল যে সাহিত্যিক মহলে পর্যন্ত তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। যা হোক মাত্র এই হালে, নেহাৎ ঘটনাচক্রে সে আরও ব্যাপক পাঠকমহলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়, যার ফলে সে এক সময় হঠাৎ অসংখ্য মানুষের নজরে পড়ে যায়, তারা তাকে মনে রাখে। ঘটনাটি রীতিমতো কৌতূহলজনক। শিক্ষা শেষ করার পর গচ্ছিত দু হাজার রুবল সম্বল করে বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ নেবার পর হঠাৎই কী খেয়াল হতে ইভান ফিয়োদরভিচ্ একটা বেশ বড়ো কাগজে আশ্চর্য একটা প্রবন্ধ লিখে বিশেষজ্ঞ মহলের বাইরে পর্যন্ত চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা প্রবন্ধের যা বিষয়বস্তু তার ওপর ইভান ফিয়োদরভিচের আপাত দৃষ্টিতে আদৌ কোনো অধিকার থাকার কথা নয়, যেহেতু তার ডিগ্রী ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানের। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল দেশের যাজকীয় বিচারালয়ের ‘স্থান নিয়ে,’’ যা ছিল তখনকার সময়ে সর্বত্র আলোচনার বস্তু। বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা জনের নানা প্রচলিত মত বিবৃত করে সে তার নিজস্ব মতও প্রকাশ করে। প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা এবং আশ্চর্য ধরনের, আকস্মিক সিদ্ধান্ত। মজার কথা এই যে প্রবন্ধটি পড়ে ধর্মধ্বজেরা অনেকে স্থির সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে লেখক তাঁদের পক্ষের লোক। আবার হঠাৎ দেখা গেল তাঁদের পাশাপাশি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত বহু লোক এমনকি যারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাদেরও ধারণা হল যে লেখক তাদেরই দলভুক্ত। শেষ পর্যন্ত জনাকয়েক বিচক্ষণ ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করলেন যে প্রবন্ধটি আগাগোড়া একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনাটির উল্লেখ করছি বিশেষত এই কারণে যে লেখাটা যথা সময়ে আমাদের শহরতলির বিখ্যাত মঠেও এসে পৌঁছায়। যাজকীয় বিচারালয় সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছিল আমাদের মঠবাসীদের তাতে গভীর আগ্রহ ছিল। এ প্রবন্ধ তাদের হাতে পড়ার পর তারা কিন্তু একেবারে থ বনে যায়। লেখকের নাম জানার পর, সে যে আমাদেরই শহরের লোক এবং ওই ‘ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের’ ছেলে তা জানতে পেরে তাদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। ঠিক এই সময় অকস্মাৎ লেখকের সশরীরে অবির্ভাব আমাদের মাঝখানে।

ইভান ফিয়োদরভিচ্ তখন যে কেন আমাদের এখানে এসেছিল, আমার বেশ মনে আছে, সেই সময়ই আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম। মনে মনে কেমন যেন একটু অস্বস্তিও বোধ করেছিলাম। ইভান ফিয়োদরভিচের এই আগমন এত বেশি বিধি-নির্ধারিত মনে হয়েছিল এবং তার পরবর্তী ফলাফল এতই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে ব্যাপারটা পরে বহুকাল পর্যন্ত আমার কাছে প্রায় দুর্বোধ্য থেকে যায়। এত বড়ো বিদ্বান, এত বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং আপাতদৃষ্টিতে সাবধানী এক যুবক কী বলে যে এত দিন পরে হঠাৎ বীভৎস পিতৃগৃহে, কুখ্যাত বাপের কাছে এসে হাজির হল মোটের ওপর ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। বাপ সারা জীবন তাকে

অবজ্ঞা করে এসেছে, তাকে জানত না, মনেও করত না, এমনকি ছেলে চাইলেও কস্মিনকালে কোনো মতেই তাকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত না, তবে সর্বক্ষণ মনে মনে তার আশঙ্কা ছিল যে তার আর দুই পুত্র ইভান ও আলেক্সেইও একদিন এসে টাকাকড়ি চেয়ে বসবে। যে যাই হোক, যুবক এসে উঠল এহেন পিতৃগৃহে। এক মাস গেল দু মাসও গেল—বসবাস করতে লাগল বাপের সঙ্গে। বেশ সদ্ভাবেই কাটতে লাগল। বিশেষ করে এই শেষ ঘটনায় শুধু আমি কেন, আরও অনেকেই অবাক হয়ে গেল। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচের প্রথমা স্ত্রীর সূত্রে তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্ মিউসভ্, যার কথা আমি আগেই বলেছি, ঘটনাচক্রে সেই সময় জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে প্যারিস থেকে আমাদের পাশের এলাকায় এসে আছে। ইতিমধ্যে সে প্যারিসেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। যুবক ইভানের প্রতি সে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমার মনে আছে, সে-ই ওর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আর সকলের চেয়ে বেশি অবাক হয়ে যায়। ওর সঙ্গে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে কখনও কখনও তার যে তীব্র বাদানুবাদ হত তাতে ভেতরে ভেতরে সে যে বেশ যন্ত্রণা অনুভব করত একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। ওর সম্পর্কে মনে মনে বলত, 'ছেলেটার অহমিকা আছে। উপার্জনের কোনও অভাব ওর কখনও হবে না। তাছাড়া, বিদেশে যাবার মতো পাথেয়ও ওর এখন আছে। তাহলে এখানে পড়ে আছে কী করতে? এটা সকলের কাছে পরিষ্কার যে টাকা পয়সা আদায় করার জন্য ও বাপের কাছে আসেনি, কেননা চাইলেও যে পাবে না তা নিঃসন্দেহ। সুরাপান আর লম্পট্যেও তার আসক্তি নেই, অথচ বুড়ো তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না—এতই অন্তরঙ্গতা ওদের দুজনের মধ্যে।' ঘটনাটা সত্যি। এমনকি বুড়ো বাপের ওপর যুবকের যেন একটা প্রভাবও লক্ষ করা যেত। বাপ বুঝিবা মাঝে মাঝে ছেলের কথা প্রায় শুনতেও শুরু করেছিল, যদিও সময় সময় তার ভয়ঙ্কর একগুঁয়েমি আর দুর্বৃত্ত স্বভাব যে একেবারে প্রকাশ পেত না এমন নয়। শুধু তাই নয়, কখনও কখনও লোকজনের সঙ্গে আগের চেয়ে ভদ্র ব্যবহার পর্যন্ত করতে লাগল।....

একমাত্র পরে জানা যায় যে অনেকটা বড়ো ভাই দমিত্রি ফিয়োদরভিচের অনুরোধে এবং তারই স্বার্থে ইভান ফিয়োদরভিচ এসেছিল। বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় জীবনে তার এই প্রথম—বলতে গেলে এবারকার এই যাত্রায়। তবে মস্কোতে থাকতে দাদার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান তার ছিল—সেটা অবশ্য দাদারই কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনে। প্রয়োজনটা কী সে পাঠকরা যথাসময়ে বিশদ জানতে পারবেন। তবে তা সত্ত্বেও, এমনকি যখন আমি এই বিশেষ পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেছি তখন ইভান ফিয়োদরভিচ্ আমার কাছে প্রহেলিকাময় বলে মনে হয়, তার আবির্ভাবটা শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্যই থেকে যায়।

প্রসঙ্গত এও যোগ করি যে বাপের সঙ্গে দাদা দমিত্রি ফিয়োদরভিচের সম্পর্ক

তখন খুবই খারাপে দাঁড়িয়েছে, এমনকি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ বাপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা মনে মনে ভাবছিল—এহেন পরিস্থিতিতে ইভান ফিয়োদরভিচ্ ওদের দুজনের মাঝখানে সালিস বা মধ্যস্থের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়।

এই বিচিত্র পরিবারটি, আবারও বলছি, এতদিন পরে এই প্রথম একত্র হল, পরিবারের কোনো কোনো সদস্য আবার জীবনে এই প্রথম পরস্পরকে দেখল। একমাত্র ছোটো ছেলে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্ গত এক বছর হল এখানে বসবাস করছিল—তিন ভাইয়ের মধ্যে সে-ই সবার আগে এখানে আসে। উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে এই আলেক্সেইকে উপস্থিত করার আগে আমার এই ভূমিকায় তার সম্পর্কেই কিছু বলা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবু তার সম্পর্কে একটা ভূমিকা না লিখলে নয়—অন্তত আগে থাকতে যে অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা আমাকে দিতেই হয় তা এই যে আমার কাহিনির ভাবী নায়ককে আমি প্রথম দৃশ্য থেকে নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারীর আলখিল্লায় পাঠকদের সামনে হাজির করতে বাধ্য হচ্ছি। বস্তুতপক্ষে গত এক বছর হল সে আমাদের মঠে বাস করছে। মনে হয় বাকি জীবন মঠবাসী হয়ে নির্জনে কাটানই তার একান্ত বাসনা।

## চার

## তৃতীয় পুত্র আলিয়োশা

তার যখন বয়স সবে কুড়ি, দাদা ইভানের বয়স তখন চব্বিশ, আর সবার বড়ো দ্‌মিত্রির—সাতাশ পেরিয়ে গেছে। প্রথমেই বলে রাখি, এই যুবক আলিয়োশা ধর্মান্ধ মোটেই ছিল না। আমার মতে, অন্তত পক্ষে অলৌকিকের প্রতি আগ্রহ পর্যন্ত তার ছিল না। এ ব্যাপারে আগে থাকতে বলে রাখি আমার পূর্ণ মতামত। আসলে খুব ছোটোবেলা থেকে সে ছিল মানবদরদি। মঠবাসীর জীবন যে সে গ্রহণ করেছে তার একমাত্র কারণ এই যে তখন ওটাই তাকে মুগ্ধ করে এবং পার্থিব হিংসা দ্বেষের তামসিকতা থেকে প্রেমের আলোকে যখন সে আত্মার পরিত্রাণ খুঁজছিল তখন তার কাছে আদর্শস্বরূপ মনে হয়। এই সন্ন্যাসজীবন তাকে আকর্ষণ করে এই কারণে যে এরই মধ্যে তখন সে সাক্ষাৎ পায় এমন একজন মানুষের যিনি, ওর মতে, এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ইনি আমাদের মঠের প্রসিদ্ধ সাধু মহাস্থবির জোসিমা। আলিয়োশা তার অশান্ত হৃদয়ের প্রথম প্রস্ফুটিত উদগ্র ভালোবাসা তাকেই উজাড় করে দেয়। তবে হ্যাঁ, ও যে তখনই খুব অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে ছিল—এমনকি, সেই ছোটোবেলা থেকেই ছিল—এ নিয়ে আমি তর্ক করতে যাচ্ছি না। প্রসঙ্গত, আমি ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে এও উল্লেখ করেছি যে মাত্র চার বছর বয়সে সে তার মাকে হারায়, কিন্তু পরে সারা জীবন তার মুখ, তার স্নেহ ভালোবাসা সে ঠিক মনে করে রাখে—'ঠিক যেন জলজ্যান্ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে।' একথা

সর্বজনবিদিত যে এমন স্মৃতি খুব ছোটোবেলা থেকে, এমনকি দু বছর বয়স থেকে কারও কারও মনে থাকা বিচিত্র নয়— তবে অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিন্দুর মতো সমস্ত জীবন ধরে প্রতিভাত হয়ে থাকে—অনেকটা যেন এক বিশাল ছবির একটা ছেঁড়া কোণ—ছবিটার কেবল ওই ছোট্ট অংশটা ছাড়া আর সবটাই মিলিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই ঘটেছিল। ও মনে করতে পারত একটা দৃশ্য: গ্রীষ্মের একটি শান্ত সন্ধ্যা, খোলা জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে অস্তগামী সূর্যের তির্যক রশ্মিরেখা হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি ওর মনে আছে এই তির্যক রশ্মিরেখা। এ ছাড়া ঘরের এক কোনায় দিব্যমূর্তি, তার সামনে মিটমিট করে জ্বলছে একটি প্রদীপ, মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে বিকারগ্রস্তের মতো ব্যাকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তার মা, দু হাতে শক্ত করে তাকে চেপে ধরে আছে, এত শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরেছে যে তার ব্যথা লাগছে, ওর জন্য প্রার্থনা করছে ঈশ্বর জননীর কাছে, আলিঙ্গন ছেড়ে দিয়ে দুহাতে ধরে তাকে বাড়িয়ে ধরেছে দিব্যমূর্তির দিকে যেন করুণাময়ীর আশ্রয়ে সন্তানকে সমর্পণ করছে।.... এমন সময় ঘরের মধ্যে দৌড়ে এলো একজন ধাত্রী, ভীতসন্ত্রস্ত হয় তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল মায়ের কোল থেকে। দৃশ্যটা এইটুকুই। আলিয়োশার স্মৃতিতে সেই মুহূর্তে গাঁথা হয়ে গেল তার মার মুখচ্ছবি। আলিয়োশার কথায়, তার যতদূর মনে পড়ে, সে মুখ উন্মাদগ্রস্ত, কিন্তু সুন্দর। তবে এই স্মৃতির কথা সে কদাচিৎ কাউকে বলত। ছোটোবেলায় এবং কৈশোরেও সে নিজেকে তেমন একটা প্রকাশ করত না, এমনকি কথাবার্তাও খুব কম বলত। তার কারণ এই নয় যে লোকজনকে সে অবিশ্বাস করে, অথবা সে ভীরু স্বভাবের বা রুক্ষ মেজাজের অসামাজিক লোক। কারণটা একেবারে উলটো, অন্য কিছু। এর মূলে আছে এক ধরনের আত্মস্থ ভাব, যা একান্তই তার ব্যক্তিগত, অন্য কারও সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু তার নিজের কাছে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এর ফলে সে যেন অন্যদের কথা বিস্মৃত হয়ে যেত। অথচ লোকজনের সঙ্গ সে পছন্দ করত। তাকে দেখে মনে হত যেন সারাটা জীবন মানুষের ওপর অগাধ আস্থা রেখেই সে কাটাচ্ছে, যদিও কারও ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি যে সে অতি সরল বা একবারে সাদাসিধে। ওর ভেতরে এমন একটা কিছু ছিল যা মানুষকে বলে দিত, মানুষের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করত এবং পরবর্তীকালে ওর সারা জীবন ধরেও করেছে যে ও কারও বিচারক হতে চায় না, কারও সমালোচনা বা নিন্দা করতে সে একেবারে নারাজ। মনে হত যেন এতটুকু নিন্দা না করে সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণ করছে, যদিও অনেক সময়ই কিন্তু মনে মনে দারুণ দুঃখ পেত। শুধু তাই নয়, এদিক থেকে সে এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যে শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে অবাক করতে পারে না, ভয় দেখাতেও পারে না—এমনকি তার বয়স অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও নয়। কুড়ি বছর বয়সে পিতৃগৃহে এসে যখন দেখল বাড়িটা লাম্পট্যের একটা নোংরা নরককুণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়,

তখন তার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মন প্রচণ্ড আঘাত পেল। সব দেখেশুনে যখন আর সহ্য করতে পারল না তখন কেবল নীরবে নিজেকে সরিয়ে নিল, কিন্তু একটি বারের জন্যও কারও প্রতি এতটুকু অবজ্ঞা বা কারও বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভের এতটুকু লক্ষণ প্রকাশ করল না। এদিকে বাপ এককালে উঞ্ছবৃত্তি করে জীবন ধারণ করত বলে তার মান অপমান বোধটাও আবার ছিল বেশ টনটনে। ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর গোড়ার দিকে অবিশ্বাসবশত সে বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবল: 'বড় বেশি চুপচাপ থাকে, আপন মনে কী যে ছাই ভাবনাচিন্তা করে কে জানে?' কিন্তু শিগ্‌গিরই, দু সপ্তাহ যেতে না যেতে দেখা গেল বাপ নেশার ঘোরে উন্মত্ত হৃদয়াবেগে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে ছেলেকে বড়ো বেশি ঘন ঘন বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। তা হলেও এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল যে ছেলের প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধ সত্যি সত্যি তাকে পেয়ে বসেছিল। এরকম ভালোবাসার অনুভূতি এর আগে কারও প্রতি কখনও তার হয়নি।....

আলিয়োশা যেখানেই যাক না কেন, প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসত। এমনকি সেই ছোটোবেলা থেকে সে সকলের প্রিয়পাত্র। ওর সেই শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক ইয়েফিম পেত্রোভিচ্ পলেনভের আশ্রয়ে যখন ও গিয়ে পড়ল তখন তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের হৃদয় সে এমন জয় করে নিয়েছিল যে তাকে ওরা পরিবারের একজন বলেই ধরে নিয়েছিল। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইয়েফিম পেত্রোভিচের পরিবারে যখন সে আসে তখন তার বয়স এত কম ছিল যে ওই বয়সের কোনো শিশুর পক্ষে অন্যের মন ভোলানো বা ভালোবাসা আদায়ের উপযোগী চাতুরি প্রয়োগ, ধূর্তের মতো হিসাব করে লোকের মন বুঝে চলার মতো বুদ্ধি বা নিজেকে অন্যের ভালোবাসার পাত্র করে তোলার বিদ্যা—কোনোটাই থাকা সম্ভব নয়। তাই নিজের প্রতি অন্যের বিশেষ স্নেহ-ভালোবাস উদ্রেকের তার এই ক্ষমতাটা ছিল একান্ত নিজস্ব, প্রকৃতিদত্ত, অকৃত্রিম। স্কুলে থাকতেও তাই দেখা গেছে, যদিও তাকে দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে-সমস্ত শিশু সহপাঠীদের মনে অবিশ্বাসের উদ্রেক করে, সময় সময় তাদের উপহাসের—এমনকি বিদ্বেষের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়—সে হয়তো তাদেরই একজন। সে যেন কীসের চিন্তায় ডুবে থাকত, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে থাকতে ভালোবাসত। সেই ছোটোবেলা থেকে একলা এককোনায় বসে বই পড়তে ভালোবাসত। তবু তার সহপাঠীরা তাকে এত ভালোবাসত যে স্কুলে সে যতদিন ছিল ততদিন সে সেখানকার সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। ক্রীড়াকৌতুক যে তেমন পছন্দ করত না, এমনকি কদাচিৎ সে উল্লাস প্রকাশ করত, কিন্তু তার দিকে তাকালে লোকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারত যে এর কারণ মোটেই তার গোমড়াস্বভাব নয়। বরং তার উলটো—সকলের সঙ্গে সে সমান, সকলের কাছে সে খোলাখুলি। সমবয়সিদের মাঝখানে নিজেকে কখনও সে জাহির করতে চাইত না। হয়তো ঠিক এই কারণেই সে কখন কাউকে ভয় পেত না। তা সত্ত্বেও সহপাঠী

ছেলেরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারল যে নির্ভীক বলে এতটুকু অহঙ্কার তার মধ্যে নেই এবং সে যে সাহসী ও নির্ভীক এই ব্যাপারে যেন বিন্দুমাত্র সচেতনতা তার নেই। অপমান সে কখনও গায় মাখত না। এমনও দেখা যেত যে কারও কাছে অপমানিত হওয়ার পর এক ঘণ্টা যেতে না যেতে সে দিব্যি তার কথায় জবাব দিচ্ছে অথবা নিজে যেচে তার সঙ্গে এমন অকপটে ও অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে যে দেখে মনে হত তাদের দুজনের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা আদৌ, কখনও ঘটেনি। তার অর্থ এই নয় যে সে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন অপমানের কথাটা সে দৈবাৎ ভুল গেছে অথবা সচেতন ভাবেই ক্ষমা করে দিচ্ছে। আসলে অপমানকে সে অপমান বলে মোটে গণ্য করত না। এর ফলে ছেলেরা সকলে তার গুণে সম্পূর্ণ মুগ্ধ বশীভূত হয়ে পড়ে। স্কুলে থাকতে তার চরিত্রের মধ্যে কেবল একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে যার ফলে ছোটো থেকে শুরু করে বড়ো ক্লাস পর্যন্ত সকলে তাকে নিয়ে মজা করতে ভালবাসত কিন্তু সেই মজার পেছনে কারও কোনও বিদ্বেষ থাকত না। স্রেফ মজা করতে ভালো লাগত বলেই তারা মজা করত। যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি সেটা আসলে ছিল তার বড়ো বেশি রকমের লাজুক স্বভাব আর মার্জিত রুচি। মেয়েদের নিয়ে কিছু কিছু কথা আর আলোচনা সে শুনতে পারত না। দুর্ভাগ্যবশত এই 'কিছু কিছু' কথা আর আলোচনা স্কুল থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। যারা মনেপ্রাণে নির্মল, এমনকি বলতে গেলে শিশু, সে সব ছেলেও ক্লাসে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে ভালোবাসে, এমনকি সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সমস্ত বিষয়, ছবি বা দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করে থাকে যা পল্টনের লোকজনদের মধ্যে পর্যন্ত সব সময় বলতে শোনা যায় না। শুধু তাই নয়, আমাদের এই বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত মহলের এই সব শিশু এত অল্প বয়সে যা জেনে ফেলেছে তার অনেক কিছু সম্পর্কেই পলটনের লোকদের কোনও ধ্যানধারণা নেই। এটাকে ঠিক চরিত্রদোষ সম্ভবত বলা যায় না, ভেতরের তাগিদে সত্যিকার দূষিত নিন্দাচর্চা বলতে যা বোঝায় তাও এর মধ্যে নেই: যা আছে তা নেহাৎই বাহ্য। এ জিনিসটা আবার ওদের মধ্যে অনেক সময় বেশ মার্জিত ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক এক ধরনের বাহাদুরি এবং অনুকরণের যোগ্য বলেও ধরা হয়ে থাকে। আলিয়োশা কারামাজভ্ নামে এই ছেলেটি 'ওই প্রসঙ্গ' উঠলেই তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিচ্ছে দেখে ওরা অনেক সময় ইচ্ছে করে ওর সামনে দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ত, জোর করে ওর কান থেকে আঙুল ছাড়িয়ে নিয়ে কানের কাছে চেঁচিয়ে নোংরা কথা বলে মজা দেখত। আলিয়োশা ওদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পরে মুখ লুকাত, কিন্তু কখনও কাউকে কটু কথা বলত না, মুখ বুজে অপমান সহ্য করে যেত। শেষ দিকে অবশ্য ওরা আর ওকে ঘাঁটায় না, ওকে 'মেয়ে' বলে বিদ্রূপ করাও ছেড়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এটা ওর একটা দুর্বলতা মনে করে ওকে করুণাও

করতে থাকে। প্রসঙ্গত, ক্লাসে পড়াশুনায় ও সব সময় ভালো ছাত্রদের একজন ছিল, যদিও প্রথম কখনও হতে পারত না।

ইয়েফিম্ পেত্রোভিচ্ যখন গত হল তখনও জেলা স্কুলের শিক্ষা শেষ হতে আলিয়োশার আরও দু বছর বাকি। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর শোকাকুলা বিধবা পত্নী সপরিবারে দেশ ত্যাগ করে দীর্ঘ কালের জন্য ইতালিতে বসবাস শুরু করেন। পরিবার বলতে সকলেই অবশ্য স্ত্রীলোক। আলিয়োশা আশ্রয় পায় ইয়েফিম্ পেত্রোভিচের দুজন দূরাত্মীয়া মহিলার কাছে। এঁদের সে আগে কখনও দেখেনি। কোন্ শর্তে তাঁকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা আলিয়োশা নিজেও জানত না। আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, এমনকি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে কার আশ্রয়ে সে আছে, কার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে এ নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামাত না। এ ব্যাপারে সে ছিল তার দাদা ইভান ফিয়োদরভিচের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দু বছর ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, নিজের ভরণপোষণ তাকে নিজেকেই করতে হয়েছে, সে যে অন্যের দয়ায়, পরান্নে প্রতিপালিত হচ্ছে এই বেদনাবোধে শিশুকাল থেকেই তিক্ত হয়ে গিয়েছিল তার মন। কিন্তু চরিত্রের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্য আলিয়োশাকে কঠোর নিন্দা করা ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না, যেহেতু যে কেউ তার এতটুকু সংস্পর্শে এসেছে, এধরনের প্রশ্ন উঠলে তৎক্ষণাৎ নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে পারত যে আলেক্সেই অনেকটা আত্মভোলা প্রকৃতির এক কিশোর। হঠাৎ কখনও বিপুল বিত্ত তার হাতে এসে পড়লে প্রথম যে লোক ওর কাছে তা চাইবে তাকে অথবা কেউ কোনো সদুদ্দেশ্যে, এমনকি স্রেফ কোনো ধূর্ত বদমাসও যদি চায় তাকে, এতটুকু ইতস্তত না করে সে তা দিয়ে দিতে পারে। মোটের ওপর বলতে গেলে, টাকাপয়সার কী মূল্য তা সে বুঝত না—যদিও, বলাই বাহুল্য, আক্ষরিক অর্থে নয়। হাত খরচের জন্য টাকা সে নিজে থেকে কখনও চাইত না, কিন্তু সেই টাকা যখন সে পেত তখন কয়েক সপ্তাহ ধরে ভেবে কূল পেত না তা দিয়ে ও কী করবে, কিংবা এতটুকু গ্রাহ্য না করে মুহূর্তের মধ্যে খরচ করে ফেলত। পরবর্তীকালে আলেক্সেইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার পর মধ্যবিত্তসুলভ সৎ চরিত্রের ও টাকাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত হুঁশিয়ার পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্ মিউসভ তার সম্পর্কে একটা মোক্ষম মন্তব্য করেছিল: ‘পৃথিবীতে ও-ই বোধ হয় একমাত্র লোক যাকে একা কপর্দকশূন্য অবস্থায় লক্ষ মানুষের কোনো অজানা শহরের মাঝখানে ছেড়ে দিলেও কষ্ট পাবে না, ক্ষুধা তৃষ্ণায় বা ঠাণ্ডায় মারা যাবে না। তার কারণ, লোকে ওকে যেচে আশ্রয় দেবে, আহার জোগাবে। আর তা যদি না করে ও ঠিক নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারবে। এর জন্য তাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে না, কারও কাছে নতি স্বীকারও করতে হবে না। আর যারা তাকে আশ্রয় দেবে তাদের কাছে সে বোঝা হয়ে তো থাকবেই না বরং উলটে তারা এতে সুখ পাবে।’

উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ আলেক্সেই শেষ করেনি। পুরো একটি বছর বাকি ছিল, এমন সময় সে তার আশ্রয়দাত্রীদের কাছে ঘোষণা করল যে একটা বিশেষ পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছে, সেটা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সে তার বাবার কাছে যেতে চায়। মহিলারা দুঃখ পেল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় রইল না তাদের। পথখরচ তেমন বেশি নয়। আলিয়োশার আশ্রয়দাতার পরিবার বিদেশে চলে যাবার আগে তাকে যে ঘড়ি উপহার দিয়েছিল মহিলারা কিছুতেই সেটা বন্ধক দিতে দিল না, তারা ওকে পথ খরচ বাবদ অর্থ, এমনকি নতুন জামাকাপড়ও দিল। কিন্তু অর্ধেক টাকা তাদের ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল যে তৃতীয় শ্রেণিতেই যাবে বলে মনস্থ করেছে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাপ তাকে প্রশ্ন করল কেন পড়াশুনোর পাট শেষ না করেই সে চলে এলো। প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর সে দিল না। শোনা যায় তাকে বড়ো বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছিল। শিগগিরই জানা গেল সে তার মার সমাধিস্থানের খোঁজ করছে। এমনকি সে তখন নিজেও স্বীকার করে যে একমাত্র এই কারণেই তার আগমন। কিন্তু এটা তার আগমনের একমাত্র কারণ বলে মনে হয় না। তার মনের ভেতরে হঠাৎ এমন কোন্ ভাবনা চিন্তার তরঙ্গ উঠেছিল যার ফলে এক নতুন, অজ্ঞাত অথচ অবশ্যম্ভাবী এই পথের দুর্নিবার আকর্ষণ তার পক্ষে রোধ করা সম্ভব হয়নি, খুব সম্ভবত সে তখন তা নিজেও জানত না, নিজে ব্যাখ্যা করে কখনও বোঝাতেও পারত না। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ তার দ্বিতীয় স্ত্রী কোথায় সমাধিস্থ হয়েছিল তা ছেলেকে দেখাতে পারল না, যেহেতু কবরে মাটি দেবার পর আর সে কখনও সেখানে যায়নি, কবরটা যে কোথায় ছিল ততদিনে ভুলেই গেছে একেবারে।....

এবারে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ প্রসঙ্গে। এর আগে বেশ কিছু কাল সে আমাদের শহরে ছিল না। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর তিন চার বছর পরে সে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে চলে যায়, শেষকালে ওদেসায় গিয়ে উপস্থিত হয়, সেখানে এক নাগাড়ে বেশ কয়েক বছর কাটায়। সেখানে, তার নিজের কথায়, 'গুচ্ছের ইতর শ্রেণির ইহুদি মেয়ে পুরুষ আর তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে' তার আলাপ হয়। তবে শেষ পর্যন্ত শুধু নোংরা ইহুদি মহলেই নয়, 'ভালো ইহুদিদের' সমাজেও সে গৃহীত হল। জীবনের এই পর্বে, খুব সম্ভব এদের সংস্পর্শে এসে একটা গুণ তার হয়—টাকা পয়সা করার আর সঞ্চয়ের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা সে অর্জন করে। আবার সে স্থায়ীভাবে ফিরে আসে আমাদের শহরে—আলিয়োশার আগমনের মাত্র বছর তিনেক আগে। তার আগেকার চেনা পরিচিতরা তাকে দেখে অবাক—ভীষণ বুড়িয়ে গেছে সে, যদিও বয়স তার আসলে তখনও তেমন কিছু নয়। তার আচার আচরণ আগের তুলনায় ভব্য তো হয়ইনি, বরং যেন আরও বেশি নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। আগেকার ভাঁড়টার মধ্যে এখন অন্যদের নিয়ে ভাঁড়ামি করার একটা উদ্ধত ধরনের প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায়। মেয়েদের সঙ্গে সে আগের মতোই নোংরামি করতে ভালোবাসত

বললে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হবে না, বরং তার সেই প্রবৃত্তি আরও বীভৎস রূপ নিয়েছে। অচিরে সে আমাদের মহকুমায় বহু সংখ্যক নতুন নতুন শুঁড়িখানার মালিক হয়ে বসল। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে এক লাখ যদি না হয়, তার চেয়ে খুব একটা কম টাকার মালিক সে নয়। শহর আর মহকুমায় বহু সংখ্যক বাসিন্দা দেখতে দেখতে তার কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ল—বলাই বাহুল্য, বেশ শাঁসাল বন্ধকের বিনিময়ে। একেবারে হালে সে যেন কেমন মুটিয়ে গেছে, যেন আরও অসংযত, আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে, এমনকি তার ভাবনাচিন্তায় কিছুটা অসংলগ্নতাও দেখা যাচ্ছে, একটা কাজ এক ভাবে শুরু করে শেষ করছে আরেক ভাবে, যেন ঠিক তাল রাখতে পারছে না। বড়ো বেশি ঘন ঘন মাতলামি করছে। ওর সেই ভৃত্য গ্রিগোরিও ইতিমধ্যে বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তা হলেও প্রভুকে সে প্রায় অভিভাবকের মতোই চোখে চোখে রাখে। গ্রিগোরি না থাকলে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের ফৌত হতে হয়তো বিশেষ সময় লাগত না। আলিয়োশার আগমন যেন নৈতিক দিক থেকেও তার ওপর এক ধরনের প্রভাব ফেলল, মনে হল অকালবৃদ্ধ এই মানুষটির মনের মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে অনুভূতিটা সুপ্ত ছিল তা যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। আলিয়োশাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে প্রায়ই বলত, 'জানিস, তুই দেখতে হয়েছিস অনেকটা ওর মতো—আমাদের উন্মাদিনীর মতো?' ওই নামই সে দিয়েছিল তার মৃত স্ত্রী আলিয়োশার মাকে। উন্মাদিনীর সমাধিটা অবশেষে ভৃত্য গ্রিগোরিই চিনিয়ে দিল আলিয়োশাকে। আমাদের শহরের সমাধিক্ষেত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় গ্রিগোরি। সেখানে দূরের একটি কোণে সে ঢালাই লোহার একটা সমাধি ফলক দেখিয়ে দেয়। ফলকটা সস্তার, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার ওপর মৃতের নাম, সামাজিক পরিচয়, বয়স এবং মৃত্যু-তারিখ পর্যন্ত লেখা আছে। তলায় মৃতের উদ্দেশে চার ছত্রের একটা মামুলি কবিতা খোদাই করা— প্রাচীন রীতিতে লেখা—মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজনের সমাধির ওপর সাধারণত যেমন দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে এটা গ্রিগোরির কাজ। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্‌কে অসংখ্যবার সমাধিটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সে তাকে উত্ত্যক্ত করতে ছাড়েনি। কিন্তু সমাধি কেন, অতীতের সমস্ত স্মৃতিকে উপেক্ষা করে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ শেষ কালে যখন ওদেসাতে চলে গেল তার পর গ্রিগোরি নিজের অর্থে বেচারি 'উন্মদিনীর' সমাধির ওপর এই ফলকটি বসিয়েছিল। আলিয়োশা তার মার সমাধি দেখে বিশেষ কোনো আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করল না। সে কেবল নীরবে গ্রিগোরির মুখে সমাধি ফলক তৈরির গুরুগম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ কাহিনিটি শুনল, মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটি কথাও না বলে সেখান থেকে প্রস্থান করল। এর পর, সম্ভবত পুরো এক বছরের মধ্যে সে আর একবারও সমাধিক্ষেত্রে যায়নি। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনাটাও ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মনে প্রভাব ফেলল—আর সেটা হল খুবই মৌলিক ধরনের। হঠাৎ মৃত স্ত্রীর আত্মার উদ্দেশে শান্তি স্তোত্র পাঠের জন্য হাজার রুবল সে দান করে

বসল আমাদের মঠে। কিন্তু আলিয়োশার মা, তার দ্বিতীয় স্ত্রী 'উন্মাদিনীর' নামে নয়—দিল প্রথমা পত্নী আদেলাইদার নামে যার হাতে এককালে মার খেয়েছিল অনেকবার। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আকণ্ঠ মাতাল হয়ে এসে ছেলের সামনে মঠের সন্ন্যাসীদের নামে অশ্রাব্য গালিগালাজ করল। ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচের কস্মিনকালে ধর্মে মতি ছিল না, জীবনে সম্ভবত কখনও আইকনের সামনে পাঁচ কোপেকের মোমবাতিও রাখেনি। তবে এই ধরনের লোকজনের মধ্যে, অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত আবেগ উচ্ছ্বাস ভাবনাচিন্তার আকস্মিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

আগেও বলেছি সে বেশ মুটিয়ে গেছে। তার চেহারায় ততদিনে এমন একটা ছাপ ফুটে উঠেছে যা তার সমগ্র বিগত জীবনের ধারা ও বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। তার খুদে খুদে দুই চোখের দৃষ্টিতে সর্বক্ষণ লেগে রয়েছে ঔদ্ধত্য, সন্দেহ আর আবেগের ভাব। চোখের কোল ঘেঁষে লম্বালম্বি আকারে থলথল করছে মাংসপিণ্ড। মুখটা ছোট্ট কিন্তু মেদবহুল, অসংখ্য গভীর বলিরেখায় ছেয়ে আছে। এসবেরও উপরে তার ধারাল চিবুকের সংলগ্ন হয়ে বিশাল, মাংসল ও লম্বাটে কণ্ঠমণিটা যে-ভাবে টাকার থলির মতো ঝুলে আছে তাতে তার চেহারায় কেমন যেন একটা বীভৎস কামুক ভাব ফুটে উঠছে। এর সঙ্গে যদি যোগ করতে হয় লম্বা ধরনের লোলুপ মুখবিবর, ফোলা-ফোলা ঠোঁটে জোড়া, যার আড়াল থেকে চোখে পড়ে প্রায় ক্ষয় যাওয়া কালো কালো দাঁতের ভাঙা টুকরো—তা হলে তো কথাই নেই। সে যখন কথা বলতে শুরু করে তখন তার মুখ দিয়ে সমানে থুতু ছিটতে থাকে। অবশ্য হ্যাঁ, সে নিজেও তার চেহারা নিয়ে রসিকতা করতে ভালোবাসত, যদিও দেখেশুনে মনে হয় নিজের চেহারা নিয়ে সে বেশ তৃপ্ত ছিল—বিশেষত নাক নিয়ে। নাকটা তার তেমন বড়ো নয়, তবে বেশ পাতলা, বড়ো বেশি বাঁকা হয়ে নেমে এসেছে। সেটা দেখিয়ে সে বলত, 'খাঁটি রোমান নাক, আমার কণ্ঠমণির সঙ্গে মিলে চেহারায় অবক্ষয় যুগের প্রাচীন রোমক আভিজাত্যের ভাব এনে দিয়েছে।' তাতে যেন সে গর্বই বোধ করত।

মার সমাধি দেখতে যাবার কয়েক দিন পরেই আলিয়োশা হঠাৎ বাপকে জানাল যে সে মঠবাসী হতে চায়, মঠের সন্ন্যাসীদের আপত্তি নেই তাকে ব্রতচারী রূপে গ্রহণ করতে। সে বলল এটা তার বহুদিনের একান্ত অভিলাষ। এখন বাপের কাছে সে অনুষ্ঠানিক সম্মতি চায়। বুড়ো জানত মঠের নির্জন আবাসে আশ্রমবাসী মহাস্থবির জোসিমার প্রভাব তার এই 'শান্তশিষ্ট ছেলেটির' মনে কত গভীর।

আলিয়োশার প্রার্থনায় এতটুকু অবাক না হয়ে চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে চুপচাপ তার কথাগুলো শোনার পর ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ বলল, 'হ্যাঁ সাধুদের মধ্যে উনিই সবচেয়ে সৎ। ওরে আমার শান্তশিষ্ট খোকা, তা হলে ওখানেই তুই যেতে চাস।' ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের তখন অর্ধ প্রকৃতিস্থ অবস্থা। হঠাৎ তার মুখে ফুটে উঠল অর্ধ প্রকৃতিস্থের দীর্ঘ হাসির রেখা—অবশ্য সেই হাসির মধ্যে ধূর্ত মাতালের শঠতারও অভাব ছিল না। বলল, 'হুম, আমার মন আগে থাকতেই বলছিল ওই রকমই কোনো পরিণতি

তোর ঘটবে। —ধারণা করতে পারিস? ওই পথে যাবার জন্যেই তুই তৈরি হচ্ছিলি। কী আর বলব বল? দু হাজার রুবল তোর নিজের আছে, এটা তোর বিয়ের যৌতুক হিসেব প্রাপ্য। ওরে খোকা, সোনা আমার, আমি কিন্তু তোকে কখনও ছেড়ে যাব না। হ্যাঁ, ওখানে এখন তোর যা যা দরকার, যা যা ওরা চান সব এনে দেব তোর জন্যে। তবে হ্যাঁ, ওরা যদি না চান তাহলে পীড়াপীড়ি করতে যাব কেন বল? ঠিক বলিনি? তোর টাকাপয়সা খরচ মানে তো টুনটুনি পাখির খরচের মতো—হপ্তায় দুটি শস্যের দানা।....হুম্, জানিস, একটা মঠের আবার একটা বসতি আছে শহরের বাইরে, সেখানে থাকে কেবল 'মঠের বউরা'—ওখানকার সবাই জানে। ওই নামেই ওখানে ওদের পরিচয়। আমার যতদূর ধারণা, সবসুদ্ধ জনা তিরিশেক হবে।.... আমি ওখানে গিয়েছিলাম। খাসা জায়গা, বুঝলি? বলাই বাহুল্য ওর নিজস্ব ধরনে, বৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখতে গেলে। খারাপ কেবল একটা জিনিস—রুশিয়ানার চূড়ান্ত, ফরাসি মেয়েমানুষ একটিও নেই— অথচ ওদের যে পরিমাণ টাকাপয়সা আছে তাতে পেতে কোনো বাধা দেখি না। জানতে পারলে ওরা ঠিকই এসে হাজির হবে। কিন্তু এখানে সে সবের বালাই নেই, মঠের বউ মিলবে না, সন্ন্যেসীরা সংখ্যায় শ দুয়েক হবে। সত্যি বলছি। এরা সবাই উপোস চর্চা করে। বলতে বাধা নেই।....হুম, তাহলে তুই সন্ন্যেসী হবি বলেই ঠিক করলি? আমার কিন্তু তোর জন্যে দুঃখ হচ্ছে রে আলিয়োশা—সত্যি বলছি বিশ্বাস কর, আমি তোকে ভালো বেসে ফেলেছি।...সে যাই হোক, এ একটা মোক্ষম সুযোগ—আমরা সবাই পাপীতাপী মানুষ। বড়ো বেশি মাত্রায় পাপী, এখানে বসে বসে পাপের বোঝা ভারী করে চলছি—তুই আমাদের উদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা করবি। আমি সব সময় ভাবতাম কে আমার হয়ে প্রার্থনা করবে ভগবানের কাছে? কখনও কেউ করবে কি? দুনিয়ায় এমন মানুষ কি আছে? ওরে খোকা আমার, এ ব্যাপারে আমি একটা হাঁদারাম। বললে বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, ভীষণ হাঁদা। তবে বুঝলি কিনা এব্যাপারে যত হাঁদাই হই না কেন এ নিয়ে আমি ভাবি, কেবলই ভাবি—অবশ্য হ্যাঁ, কদাচিৎ বটে, তবু ভাবি তো। ভাবি, আমি মারা গেলে শয়তানগুলো আমায় নরকে টেনে নিয়ে গিয়ে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখতে ভুলে যাবে এ তো আর হয় না। তারপর আবার ভাবি: কড়িকাঠ? কড়িকাঠ ওদের ওখানে এলো কী করে? কীসের তৈরি? লোহার নাকি? লোহার যদি হয় তাহলে ওখানে কোথায় সে লোহা পেটায়? কোনো কামারশালা আছে নাকি? মঠের সাধু সন্ন্যেসীদের বোধহয় ধারণা যে নরকে ছাদ আছে। আমার কিন্তু নরকে বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই—তবে ওই ছাদ বাদ দিয়ে—তা হলে জিনিসটা আরও বেশি মার্জিত, অনেক বেশি শিক্ষামূলক, অর্থাৎ লুথারীয় হয় আর কি। তাছাড়া মোটের পর ছাদ থাকুক আর না-ই থাকুক কী বা এসে যায় তাতে? কিন্তু হতচ্ছাড়া প্রশ্নটাও ত এখানেই! আরে, ছাদ যদি না থাকে তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে কড়িকাঠও নেই। আর কড়িকাঠ যদি না থাকে তাহলে পুরো ব্যাপারটাই ভেস্তে যাচ্ছে, অথচ সেটাও বিশ্বাসযোগ্য

নয়— সে ক্ষেত্রে কে আমায় নরকে টেনে এনে কড়িকাঠে ঝোলাবে? কেন না আমাকে যদি নরকে টেনে নিয়ে না যায় তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়াবে? পৃথিবীতে সত্য তাহলে কোথায়? Il faudrait les inventer,* ওই কড়িকাঠ উদ্দেশ্যেমূলক ভাবে আমার জন্য, শুধু আমারই জন্য, কেন না তুই যদি জানতিস আলিয়োশা, আমি কী পরিমাণ ইতর!...'

'না না ওখানে কড়িকাঠ নেই', বাপের দিকে তাকিয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় আলিয়োশা বলল।

'ঠিক, ঠিক, যা আছে সে শুধু কড়িকাঠের ছায়া। জানি, তা জানি। নরকের অনেকটা এরকম বর্ণনা দিয়েছিলেন এক ফরাসি ভদ্রলোক: 'j' ai vu l' ombre d'un cocher, qui avec l' ombre d'une brosse frottait l' ombre d'une carrosse'**।' তা তুই কী করে জানলি রে খোকা যে নরকে কড়িকাঠ নেই? সাধুসন্ন্যেসীদের মধ্যে, কিছু দিন থাক না, তখন অন্য সুরে কথা বলবি। তা সে যাক গে, ওখানেই যা, সত্য উদ্ধার কর, তারপর এসে আমায় জানাস— হাজার হোক পরলোকে কী আছে ঠিক জানা থাকলে সেখানে যাওয়াটা একটু সহজ হয়। তা ছাড়া আমার মতো একটা মাতাল বুড়ো আর নষ্ট ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে কাটানোর চেয়ে সাধুসঙ্গে তোর জীবনটা অনেক ভদ্র ভাবে কাটবে, ...যদিও এটা ঠিক যে তোর মতো নিষ্পাপ মানুষকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু ধর সেখানেও যদি তোকে কিছুই স্পর্শ করতে না পারে—সেই কারণেই, এই শেষটাতে আমার ভরসা আছে বলেই না আমি তোকে অনুমতি দিচ্ছি। তোর যা বুদ্ধি। একটু জ্বলবি পুড়বি, পুড়ে নিভে যাবি, সেরে উঠবি, আবার ফিরে আসবি। আমি কিন্তু তোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, কেননা আমি উপলব্ধি করতে পারছি এই পৃথিবীতে তুই-ই একমাত্র মানুষ যে আমাকে নিন্দে করেনি। খোকা, খোকা আমার, আমি এটা বেশ উপলব্ধি করতে পারি। উপলব্ধি না করে কি পারি!....'

বলতে বলতে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। লোকটা ছিল আবেগপ্রবণ। যেমন বজ্জাত, তেমনি আবেগপ্রবণ।

## পাঁচ

## সাধুসঙ্গ

আমার কোনো কোনো পাঠকের ধারণা হতে পারে যে আমার কাহিনির নায়ক এই তরুণটি অসুস্থ ধরনের, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, অপরিণত বুদ্ধির, রুগ্ণ কল্পনাবিলাসী, জীর্ণশীর্ণ,

---

সেগুলিকে উদ্ভাবন করতে হয় (ফরাসি)

আমি এক গাড়োয়ানের ছায়া দেখেছিলাম—বুরুশের ছায়া দিয়ে সে গাড়ির ছায়া সাফ করছিল (ফরাসি)।

রক্তশূন্য একটি জীব। এ ধারণা ভুল। বরং যে সময়ের কথা বলছি তখনও উনিশ বছরের উঠতি বয়সি আলিয়োশা রীতিমতো দেহসৌষ্ঠব ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, লাল টকটকে তার দুই গাল, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। তখন সে দেখতে বেশ সুন্দরই ছিল বলা যেতে পারে—সুগঠিত, মাঝারি গড়নের, মাথাভর্তি ঘন বাদামি চুল, মুখের আকৃতি স্বাভাবিক, যদিও ছাঁদ সামান্য লম্বাটে। ঘন ধূসর উজ্জ্বল দুটো চোখের মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান, চোখের দৃষ্টিতে চিন্তার ছাপ, দেখে মনে হয় বেশ শান্ত। লোকে বলতে পারে যাদের গাল লাল টকটকে, অন্ধ গোঁড়ামি বা অতীন্দ্রিয় বোধ কোনোটাই তাদের পক্ষে বেমানান নয়। আমার কিন্তু মনে হয় আলিয়োশা বরং অন্য কারও তুলনায় বেশি বাস্তববাদী ছিল। ও হ্যাঁ, মঠে থাকাকালে সে অবশ্য অলৌকিক ঘটনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আমার মতে, অলৌকিককতা বাস্তববাদীকে কখনও বিভ্রান্ত করে না। একজন বাস্তববাদীকে যা ধর্মবোধে প্রবৃত্ত করে তা অলৌকিক ঘটনা নয়। একজন খাঁটি বাস্তববাদী যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী না হয় তা হলে সব সময়ই অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস না করার মতো শক্তি ও ক্ষমতা নিজের মধ্যে খুঁজে পাবে। কিন্তু কোনো অলৌকিক ঘটনা যদি তার সামনে অকাট্য অখণ্ডনীয় হয়ে দেখা দেয় তা হলে ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়ার চেয়ে সে বরং নিজের ইন্দ্রিয়কেই অবিশ্বাস করবে। আর যদি তা মেনেও নেয় সেটা মেনে নেবে তার নিজের কাছে এ পর্যন্ত অজ্ঞাত এক প্রাকৃতিক ঘটনা রূপে মাত্র। বাস্তববাদীর মনে বিশ্বাসের জন্ম অলৌকিক থেকে হয় না, বিশ্বাস থেকেই অলৌকিকের জন্ম হয়। বাস্তববাদী যদি একবার বিশ্বাস করে বসে তাহলে তাকে অতি অবশ্য তার ওই বাস্তবতার কারণেই অলৌকিককেও মেনে নিতে হবে। ভগবদ্বাক্য প্রচারক সন্ত টমাস[১১] বলেছিলেন যে তিনি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তখন তাঁর মুখ থেকে নির্গত হল 'হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর।' যা তাঁকে বিশ্বাসে প্রবৃত্ত করেছিল সেটা কি অলৌকিক কোনো কিছু? খুব সম্ভবত তা নয়, তাঁর বিশ্বাস উদ্রিক্ত হয়েছিল একমাত্র এই কারণে যে তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন এবং হয়তো বা অন্তরের অন্তস্তলে কোথাও গোপনে তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাস করতে শুরুও করেছিলেন—এমনকি যখন তিনি মুখে বলেছিলেন, 'না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করব না'—তখনও।

আলিয়োশা নির্বোধ, অপরিণতবুদ্ধি, পাঠ শেষ করতে পারল না—এই রকম নানা কথা লোকে বলতে পারে। পাঠ সে শেষ করেনি তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তাকে নির্বোধ বা স্থূলবুদ্ধি মনে করলে তার প্রতি বড়ো অবিচার করা হবে। ইতিপূর্বে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে আবারও বলছি: তার এই পথ গ্রহণের একমাত্র কারণ এই যে তখন এটাই তার কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল এবং আত্মাকে অন্ধকার থেকে আলোকে উন্মোচনের যে প্রবল বাসনা তার ছিল তা পূরণের একমাত্র আদর্শ উপায় বলে তার মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে এটাও যোগ করা যেতে পারে যে

আলিয়োশা ছিল কতকাংশে আমাদের এই হাল আমলেরই একজন তরুণ—অর্থাৎ, স্বভাবত সৎ। সে সত্যকে দাবি করে, সত্যের সন্ধান করে, সত্যকে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের ফলে তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠে সত্যের সেবায় আত্মনিয়োগের এবং সত্যের খাতিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো কীর্তি সন্ধানের তাগিদ—এর জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনের প্রবল বাসনা। অথচ দুর্ভাগ্যবশত এই তরুণেরা বুঝতে পারে না যে প্রাণ বিসর্জন করা হয়তো বহু ক্ষেত্রে সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকারের চেয়ে অনেক বেশি সহজসাধ্য। তাদের এ বোধও নেই যে তারুণ্যে উচ্ছ্বসিত জীবনের পাঁচ-ছয় বছর কঠিন। দুরূহ বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান চর্চার জন্য আহুতি প্রদান, যে সত্যের সেবায় তাদের এত আগ্রহ, যে কীর্তি সম্পাদনের জন্য তারা কৃতসঙ্কল্প তার জন্য মনের মধ্যে অন্তত যে দশগুণ শক্তি বৃদ্ধি করতে হয় নিদেনপক্ষে তাও যদি ধরি তাহলে মানতেই হবে এ ধরনের আত্মত্যাগ তাদের অধিকাংশেরই সাধ্যের একেবারে বাইরে। আলিয়োশা কেবল আর সকলের বিপরীত পথ বেছে নিয়েছিল, কিন্তু তারও পেছনে ছিল দ্রুত কীর্তি সম্পাদনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। গভীর অনুধ্যানের পর ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর মানবাত্মার অমরত্ব সম্পর্কে যে মুহূর্তে সে নিঃসংশয় হয়েছে তখনই সহজ প্রবৃত্তির বশে সে মনে মনে বলেছে: 'অমরত্বের জন্যই আমি বাঁচতে চাই, এর মাঝামাঝি কোথাও আপস চলতে পারে না।' ঠিক এমনি ভাবেই তার মন যদি দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মার অমরত্ব আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করত তাহলে সে আর দ্বিরুক্তি না করে নাস্তিক হত, সমাজতন্ত্রী হতে পারত। কেননা আজকের দিনে সমাজতন্ত্র শুধু শ্রমিক সমস্যা অথবা তথাকথিত চতুর্থ সম্প্রদায়ের সমস্যা মাত্র নয়। সমাজতন্ত্র মুখ্যত নাস্তিকতার প্রশ্ন, আধুনিক নাস্তিকতাবাদের প্রশ্ন, বাবেল মিনারের[illegible] প্রশ্ন। ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই তৈরি হচ্ছিল সে মিনার—পৃথিবী থেকে স্বর্গে পৌঁছানো নয়, পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল তার উদ্দেশ্যে। আগেকার মতো জীবন নির্বাহ আলিয়োশার কাছে অদ্ভুত, এমনকি অসম্ভব মনে হতে লাগল। শাস্ত্রে কথিত আছে: 'যদি সম্পূর্ণ হইতে চাও তাহা হইলে সর্বস্ব দান কর, আমাকে অনুসরণ কর।' আলিয়োশা তাই মনে মনে বলল: 'সর্বস্ব' দান করার বদলে তাই বলে তো আর মাত্র দুটো রুবল দিতে পারি না, আর তিনি যে বলেছেন 'আমাকে অনুসরণ কর'—তার বদলে শুধু গির্জার আনুষ্ঠানিক উপাসনায় যোগ দেওয়া—তাই বা কী করে হয়?' অথচ ওর খুব ছোটোবেলায় ওর মা আমাদের শহরের উপকণ্ঠের এই মঠে ওকে নিয়ে আসত উপাসনার সময়—হয়তো সে রকম কোনো ঘটনা তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে ছিল। অথবা তার উন্মাদিনী মা যখন তাকে তুলে বিগ্রহের দিকে বাড়িয়ে ধরত তখন বিগ্রহের সামনে তেরছা হয়ে অস্তগামী সূর্যের যে কিরণ ছড়িয়ে পড়ত হয়তো তা তাকে প্রভাবিত করে থাকবে। গভীর ভাবনাচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সে যে তখন আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয় হয়তো বা তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল

এটাই যাচাই করে দেখা যে এখানে ওই দুটো রুবলের ব্যাপার, নাকি এখানে সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়। ....যখন সে মনে মনে এসব কথা ভাবছে ঠিক তখনই মঠে তার দেখা হয়ে গেল আমাদের এই মহাস্থবিরের সঙ্গে।....

যে মহাস্থবিরের কথা বলছি, আমি আগেও উল্লেখ করেছি, তিনি ছিলেন মহাস্থবির জোসিমা। প্রসঙ্গত, আমাদের রুশদেশের মঠে মহাস্থবির বলতে মোটের ওপর কী বোঝায় সে সম্পর্কে দু চার কথা আগে বলা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে আমি নিজেকে খুব একটা যোগ্য বা ওয়াকিবহাল বলে মনে করতে পারছি না। সে যাই হোক, স্বল্প কথায় ভাসা ভাসা পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। প্রথমত এ বিষয়ের ওপর যাঁরা বিশেষজ্ঞ, যাঁদের বিশেষ অধিকার আছে, তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে মহাস্থবির বা মঠবৃদ্ধ প্রথার প্রবর্তন আমাদের দেশে, আমাদের রাশিয়ার মঠগুলিতে খুব একটা বেশি কাল আগের নয়, এমনকি একশো বছরও হবে না। অথচ সনাতন খ্রিষ্টধর্মী প্রাচ্যের সর্বত্র—বিশেষত সিনাই ও আথোসে ইতিমধ্যে হাজার বছরেরও ওপরে তার প্রচলন আছে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে সুপ্রাচীন কালে রাশিয়াতেও এর প্রচলন ছিল—প্রচলন না থেকে পারেই না। কিন্তু রাশিয়ার ওপর যে সমস্ত বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে তার ফলে—তাতার আক্রমণ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, তারপর কনস্টানটিনোপল ধ্বংস[১২]—এই সব কারণে প্রাচ্যের সঙ্গে তার আগেকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে প্রথাটি বিস্মৃতির গর্ভে চাপা পড়ে যায়, আমাদের দেশ থেকে লোপ পায়। পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে বিগত শতাব্দীর শেষে আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ নামে যাঁর পরিচয় সেই পাইসি ভেলিচ্‌কোভ্‌স্কি[১৩] ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায়। অথচ আজ পর্যন্ত, এমনকি প্রায় একশো বছর পরেও আমাদের অনেক মঠেই এর অস্তিত্ব নেই। শুধু তাই নয়, এই নতুন ব্যবস্থা রাশিয়ায় কেউ কখনও শোনেনি বলে কখনও কখনও এর জন্য অনেককে বলতে গেলে নির্যাতন পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে। আমাদের রুশদেশে এর বিকাশ বিশেষভাবে ঘটে কোজেল্‌স্কি ওপ্‌তিন[১৪] আশ্রম নামে খ্যাত এক মঠে। আমাদের এই স্থানীয় মঠেও তা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কবে থেকে এবং কার উদ্যোগে তা বলতে পারছি না। তবে আমি যখনকার কথা বলছি ততদিনে সেখানে পরম্পরাক্রমে তিন জন মহাস্থবিরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—তাঁদের মধ্যে শেষ জন হলেন সাধু জোসিমা। কিন্তু তিনি তখন বড়ো দুর্বল ও অসুস্থ—প্রস্তুত মৃত্যুপথযাত্রী, অথচ তাঁর স্থান গ্রহণের উপযুক্ত কাউকে তখনও পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রশ্নটা আমাদের মঠের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেন না এর আগে পর্যন্ত আমাদের মঠের তেমন কোনো নাম ডাক ছিল না: এখানে না ছিল কোনো পুণ্যাত্মা সাধুসন্তের পবিত্র দেহাবশেষ, না ছিল কোনো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিগ্রহ এমনকি আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গৌরবজনক ঐতিহ্যবাহী কিছু বা ঐতিহাসিক কীর্তি অথবা দেশ সেবামূলক কোনো ঘটনার স্মৃতিও এখানে ছিল না। এর সমৃদ্ধি এবং সারা

রাশিয়ায় এর খ্যাতির একমাত্র কারণ এখানকার মহাস্থবিরেরা। তাঁদের দেখার জন্য, তাঁদের মুখের বাণী শোনার জন্য রাশিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে পুণ্যার্থীরা ভিড় করে আমাদের এখানে এসে জুটত। তাহলে মহাস্থবির কাকে বলে? মহাস্থবির হলেন তিনি যিনি অন্যের আত্মাকে, অন্যের ইচ্ছাবৃত্তিকে নিজের আত্মার মধ্যে, নিজের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে গ্রহণ করেন। মঠে মহাস্থবিরকে একবার বেছে নেবার পর ব্রতচারীকে তার নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে একান্ত ভাবে তাঁর কাছেই আত্মনিবেদন করতে হবে। এই ব্রত, আত্মনিবেদনের এই শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তারা তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এই আশাতেই যে দীর্ঘকাল ব্রত ধারণের পর তারা আত্মজয়ে সক্ষম হবে, তাদের আত্মসংযম এমন পর্যায়ে পৌঁছুবে যে শেষ পর্যন্ত সারা জীবনের এই আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়েই তারা পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করবে, অর্থাৎ নিজের অহং থেকে মুক্ত হতে পারবে, যে সমস্ত মানুষ সারা জীবন অতিবাহিত করার পর নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পায়নি, তাদের দশা এড়াতে পারবে। মঠবৃদ্ধ অর্থাৎ মহাস্থবির নামে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রচলনের মধ্যে কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই—প্রাচ্যে হাজার বছর আগে এই প্রথা প্রচলিত ছিল—তার থেকেই এর উদ্ভব। আমরা যাকে সচরাচর 'আজ্ঞানুবর্তিতা' বলে থাকি, যা সব সময়ই আমাদের রুশ মঠগুলিতে ছিল, মহাস্থবিরের প্রতি কর্তব্যবোধ কিন্তু ঠিক তা নয়। এখানে যারা মহাস্থবিরের শরণাপন্ন তাঁর কাছে তাদের স্বীকারোক্তির কোনো শেষ নেই এবং শরণাগত ও শরণদাতার মধ্যে এখানে যে বন্ধন তা অবিচ্ছেদ্য। যেমন, কথিত আছে, খ্রিস্টধর্মের সুপ্রাচীন কালে এরকম একজন ব্রতচারী তাঁর মঠের মহাস্থবিরের নির্দেশিত আজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়ে মঠ ছেড়ে দেশ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, সিরিয়া ছেড়ে মিশরে চলে যান। সেখানে বহু বছর খ্রিস্ট ধর্মের সেবা করে তিনি বিপুল কৃতিত্বের অধিকারী হন, শেষ পর্যন্ত বিধর্মীর অত্যাচারে ধর্মের জন্য প্রাণদান করে তিনি শহিদত্বও অর্জন করেন। তাঁর দেহকে গির্জা যখন সাধুর উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করতে যাবে এমন সময় প্রধান ধর্মযাজক যথারীতি ঘোষণা করলেন: 'খ্রিস্টধর্মে যাহারা দীক্ষিত নহে তাহারা অপগত হউক।' সঙ্গে সঙ্গে শবাধারসমেত শহিদের দেহ যেন কোন্ অজ্ঞাত মন্ত্রবলে নিক্ষিপ্ত হল গির্জার বাইরে। এরকম পর পর তিন বার ঘটল। অবশেষে প্রকাশ পেল শহিদত্ব বরণকারী এই পুণ্যাত্মাটি একবার তাঁর গুরুর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিলেন, তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেই কারণে তাঁর গুরু মহাস্থবিরের মার্জনা ছাড়া তাঁর আত্মার মুক্তি নেই—তা তিনি ধর্মের জন্য যত বড়ো কীর্তিই সম্পাদন করুন না কেন। মহাস্থবিরকে ডেকে আনার পর যখন তিনি তাঁর আজ্ঞা থেকে তাঁকে রেহাই দিলেন একমাত্র তখনই তাঁকে সমাধিস্থ করা সম্ভব হল। অবশ্য এ সবই প্রাচীন কিংবদন্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে সাম্প্রতিক একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের একালের এক সন্ন্যাসী আথোস-

পর্বতের[১১] নির্জন আশ্রয়কে তাঁর তপস্যার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, এমন সময় তাঁর গুরু তাঁকে আথোস ছেড়ে প্রথমে যেরুসালেম গিয়ে তীর্থস্থানগুলিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাশিয়ায় ফিরে এসে দেশের উত্তরে সাইবেরিয়া অঞ্চলে চলে যেতে বলেন। তিনি বলেন, 'তোমার স্থান এখানে নয় বৎস, ওখানে।' দুঃখে ম্রিয়মাণ, হতবাক সন্ন্যাসীটি তখন কনস্টানটিনোপলে ধর্ম মহাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে গুরুর আজ্ঞা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু অত যাঁর ক্ষমতা সেই ধর্ম মহাধ্যক্ষ বললেন যে তিনি এ বিষয়ে অপারগ—শুধু তিনি কেন, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা মহাস্থবিরের অর্পিত দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে—একমাত্র যিনি পারেন তিনি ওই মহাস্থবির নিজে। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাস্থবিরদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা অপরিসীম, ব্যাখ্যার অতীত। ঠিক এই কারণে আমাদের দেশের বহু মঠে গোড়ার দিকে এই প্রথাটিকে ভালো চোখে দেখা হত না, প্রায় দোষের পর্যায়ে ধরা হত। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে মহাস্থবিরদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে এতটুকু বিলম্ব হল না। যেমন, আমাদের এই মঠে যেমন অতি সাধারণ অজ্ঞ লোকজনের, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও ভিড়ের কোনো কামাই ছিল না। মঠের মহাস্থবিরদের কাছে তারা আত্মনিবেদন করে তাদের মনের সন্দেহ প্রকাশ করত, পাপ স্বীকার করত, নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা বলে তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ চাইত। তাই দেখে মহাস্থবির প্রথার প্রতিপক্ষরা তুমুল হৈ হট্টগোল তোলে, অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে এই অভিযোগও তোলে যে এর ফলে মূর্খের মতো যদৃচ্ছ ভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। অথচ মহাস্থবিরের শিষ্য অথবা কোনো সাধারণ মানুষ যখন মন খুলে তাঁর কাছে অনর্গল স্বীকারোক্তি করে তখন সেখানে আদৌ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোনও চরিত্র থাকে না। মোটকথা, পরিণামে প্রথাটি টিকে যায় এবং অল্প অল্প করে রাশিয়ার মঠগুলিতে প্রতিষ্ঠাও পেতে থাকে। অবশ্য সম্ভবত এটাও সত্য যে দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং নৈতিক উৎকর্ষে উত্তরণের, মানুষের নৈতিক পুনর্জন্মের জন্য হাজার বছরের পরীক্ষিত এই যে অস্ত্র তা এক সময় শাঁখের করাতেও পরিণত হতে পারে, ফলে কারও কারও ক্ষেত্রে পূর্ণ আত্মসংযম ও বিনয়ের বদলে দেখা দিতে পারে রীতিমতো শয়তান-প্ররোচিত অহঙ্কার, অর্থাৎ মুক্তির বদলে শৃঙ্খলে পরিণত হতে পারে।

মহাস্থবির জোসিমার বয়স পঁয়ষট্টি। ভূস্বামী বংশোদ্ভূত। প্রথম যৌবনে কোনো এক সময় তিনি সৈন্যবিভাগে ছিলেন, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারী রূপে ককেশাসে ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মার কোনও এক বিশেষ গুণে আলিয়োশাকে মুগ্ধ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলিয়োশা তাঁরই কুটিরে আশ্রয় নিল। বৃদ্ধ তার প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়েন, তাই তাকে তাঁর কাছে থাকতে দেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আলিয়োশা মঠে বাস করতে শুরু করলেও তার ওপর কোনও বাধানিষেধ ছিল না, সে যেখানে খুশি যেতে পারত—এমনকি যতদিন খুশি মঠের বাইরে কাটাতে

পারত। মঠবাসীর জোব্বা যে সে পরত তাও স্বেচ্ছায়—যাতে মঠের আর দশজনের থেকে তাকে আলাদা না দেখায়। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্য তার নিজেরও ভালোই লাগত। ক্ষমতা আর যশ দুয়েরই কোনো সীমা ছিল না গুরু জোসিমার। হয়তো তাঁর এই ক্ষমতা আর যশই আলিয়োশার তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করে। মহাস্থবির জোসিমা সম্পর্কে অনেকে একথাও বলত যে বছরের পর বছর ধরে যারা তাঁর কাছে অকপট স্বীকারোক্তি করতে এসেছে, তাঁর মুখ থেকে উপদেশ বা রোগের চিকিৎসার উপায় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এসেছে তাদের সকলকেই গ্রহণ করার ফলে তাঁর অন্তরে এত বেশি পরিমাণ দিব্যজ্ঞান, দুঃখবোধ ও অনুভূতির সঞ্চার ঘটেছিল যে শেষকালে তিনি প্রখর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন। তাঁর সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল এতই প্রখর যে নতুন কেউ এলে তার মুখ দেখেই তিনি বলতে পারতেন কী কারণে সে এসেছে, কী তার প্রার্থনা—এমনকি তার বিবেকের দংশনটা ঠিক কোন্ ধরনের—তাও। আগন্তুকের মুখের কথা পড়ার আগেই তার মনের খবর তিনি জেনে ফেলেছেন এই দেখে আগন্তুক অবাক হয়ে যেত, হতভম্ব হয়ে যেত, অনেক সময় প্রায় ভয়ই পেয়ে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে আলিয়োশা প্রায় সব সময় লক্ষ করে দেখেছে যে অনেকে, যারা একান্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে মহাস্থবিরের কাছে এই প্রথম এসেছে তাদের প্রায় সকলেই তাঁর কুটিরে ঢোকে দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি নিয়ে, কিন্তু সেখান থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন আনন্দে তাদের মুখ উদ্ভাসিত। এমনকি সবচেয়ে গম্ভীর যে লোকটি তার মুখেও ফুটে ওঠে খুশির আভাস। আরও একটা জিনিস আলিয়োশাকে অসাধারণ মুগ্ধ করে—সাধু জোসিমাকে কখনও কঠোর হতে দেখেনি সে। বরং সব সময় তাঁকে ভারি হাসিখুশি দেখাত। সন্ন্যাসীরা তাঁর সম্পর্কে বলাবলি করত, যে বেশি পাপী ঠিক তার প্রতিই তাঁর মনের টান, যার পাপ যত বেশি তার প্রতি তাঁর তত করুণা। মহাস্থবিরের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের এমন কেউ কেউ ছিল যারা তাকে ঘৃণা করত, হিংসে করত। তবে তাদের সংখ্যা অনেক কমে এসেছিল। তারা চুপ করে থাকত, যদিও মঠের জনাকয়েক রীতিমতো বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও তাদের দলে ছিল। যেমন, একজন ছিলেন অতিবৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী মৌনব্রত ও উপবাস পালনে তাঁর কঠোরতার কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মঠবাসীই নিঃসন্দেহে ছিল সাধু জোসিমার পক্ষে। তাদের মধ্যে অনেকে তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসত, গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা করত তাঁকে। কেউ কেউ আবার ছিল প্রায় তাঁর অন্ধ ভক্ত। এরা ততটা উঁচু গলায় না হলেও প্রকাশ্যে বলে বেড়াত যে উনি পুণ্যাত্মা—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর অন্তিমকাল আসন্ন দেখে এরা অদূর ভবিষ্যতে, অচিরেই তাঁর দেহাবশেষকে কেন্দ্র করে মঠের একটা বিপুল খ্যাতি এমনকি অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটবে এই আশায় দিন গুনছিল। সাধু জোসিমা যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী আলিয়োশা তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত, যেমন

সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত গির্জা থেকে শবাধার উড়ে যাবার সেই কাহিনি। সে স্বচক্ষে দেখেছে মহাস্থবির একবার যাতে তাদের গায়ে হাত রাখেন, তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এই আর্জি নিয়ে রুগ্ণ সন্তান বা বয়স্ক আত্মীয়স্বজন নিয়ে যারা তাঁর কাছে আসছে তাদের অনেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছে— কেউ কেউ আবার ফিরে যাচ্ছে পরের দিন—সাধু জোসিমা যে তাদের রোগীদের রোগ সারিয়ে তুলেছেন এর জন্য ফেরার সময় তারা অশ্রুপাত করতে করতে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ছে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। সেটা আসলে আরোগ্য ছিল, না কি রোগের স্বাভাবিক গতিতে যেটুকু উন্নতি ঘটতে পারে স্রেফ তা-ই ছিল—আলিয়োশার কাছে এ প্রশ্নের কোনো অস্তিত্ব নেই। যেহেতু ততদিনে তার গুরুর অধ্যাত্ম শক্তিতে তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেছে। গুরুর যা গৌরব তা যেন তার নিজেরই জয়টিকা। বিশেষ করে তার বুকের ভেতরে শিহরন জাগত, সে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যখন একমাত্র মহাস্থবিরকে দেখার উদ্দেশ্যে, তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য রাশিয়ার দূর দূরান্ত থেকে সমাগত সাধারণ শ্রেণির ভক্তমণ্ডলী তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় কুটিরের সামনে প্রাঙ্গণে ভিড় জমায়, তখন মহাস্থবির বেরিয়ে এসে তাদের দর্শন দেন। তারা তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ে, অশ্রু বিসর্জন করে তাঁর পদচুম্বন করে, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানকার মাটি চুম্বন করে, বিলাপের সুরে কাঁদে। মেয়েরা তার দিকে তুলে ধরে তাদের শিশু সন্তানদের, সামনে এগিয়ে দেয় ভূতগ্রস্থ রোগীদের—তিনি ওদের সারিয়ে দেবেন। বৃদ্ধ তাদের সঙ্গে কথা বলেন, সংক্ষেপে তাদের জন্য প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, আশীর্বাদ করেন সকলকে, তারপর বিদায় দেন। সম্প্রতি ঘন ঘন রোগের আক্রমণে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে কুটিরের বাইরে প্রায় আসতেই পারেন না। ভক্তেরা কখনও কখনও দিনের পর দিন কুটিরদ্বারে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। ওরা তাঁকে কেন এত ভালোবাসে, কেন তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ে, তাঁর দর্শনমাত্র কেন আবেগে অশ্রুপাত করে এ নিয়ে আলিয়োশার মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না। সে বেশ বুঝতে পারে রাশিয়ার এই সাধারণ মানুষ হাড়ভাঙা শ্রমে, শোকে দুঃখে জর্জরিত, আরও বড়ো কথা এই যে তারা নিত্যকার অন্যায় অবিচারে জর্জরিত, তারা ডুবে আছে নিত্যকার পাপপঙ্কে—সে পাপ যেমন তাদের নিজেদের, তেমনি পৃথিবীরও। তাই কোনও পুণ্যস্থান বা পুণ্যাত্মা কাউকে আঁকড়ে ধরার যে তাগিদ তারা বিনীত চিত্তে উপলব্ধি, করে থাকে এর মধ্যে যে সান্ত্বনা তারা পায় তার চেয়ে বড়ো তাদের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তারা তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম ঠুকে বলে: 'আমাদের মধ্যে পাপ আছে, অন্যায় অবিচার, প্রলোভন আছে, তবু এই পৃথিবীতেই কোথাও কোথাও আছেন এক পুণ্যাত্মা, সেই পরম পুরুষ যিনি সত্যের আধার। তিনিই সত্যকে জানেন। তাই যদি হয় তাহলে পৃথিবীতে সত্যের বিনাশ ঘটে না। সুতরাং সত্য একদিন আমাদের কাছেও আসবে এবং প্রতিশ্রুতি মতো

সারা জগতে সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।' আলিয়োশা জানে ঠিক এটাই সাধারণ মানুষের উপলব্ধি, এভাবেই তারা বিচার করে। এটা সে বুঝতে পারে। কিন্তু মহাস্থবির জোসিমাই যে সেই মহাপুরুষ, তিনিই যে জনসাধারণের চোখে ঈশ্বরের সেই সত্যের প্রতিভূ তাতে তার এতটুকু সন্দেহ নেই। ওই যে চাষাভুসো লোকগুলো চোখের জল ফেলছে, ওদের ঘরের সেই রুগ্‌ণ মেয়েমানুষগুলো যারা তাদের কোলের সন্তানকে মহাস্থবিরের দিকে তুলে ধরছে তাঁর আশীর্বাদ লাভের আশায়—আলিয়োশা নিজেও তাদেরই দলে। মহাস্থবিরের মৃত্যুর পর মঠের খ্যাতি যে অসাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পাবে আলিয়োশার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এমনকি হয়তো মঠের যে কারও তুলনায় অনেক বেশি প্রবল মাত্রায় ছিল। মোটের ওপর, কিছুকাল হল তার ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটি গভীর ভাবাবেশ উজ্জ্বল শিখার মতো প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে জ্বলছে। এই বৃদ্ধটি যে এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাতেও কিন্তু সে এতটুকু বিচলিত নয়। তাতে কিছু এসে যায় না। উনি পুণ্যাত্মা। সকলের জন্য নবজীবন লাভের গোপন রহস্য তিনি ধারণ করে আছেন—এ হল সেই শক্তি যা পৃথিবীতে অবশেষে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে, তখন মানুষমাত্রেই হবে পুণ্যাত্মা, মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, তখন না থাকবে ধনী, না দরিদ্র, না কোনো রকম উচ্চনীচ ভেদাভেদ। সবাই হবে ঈশ্বরের সন্তান। সেই দিন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রভু যিশুর প্রকৃত রাজত্ব। আলিয়োশা মনে মনে •দেখত এই সুখস্বপ্ন।

তার দুই ভাইয়ের আগমন সম্ভবত আলিয়োশার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এর আগে তাদের সে একেবারেই জানত না। ভাই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ যদিও আলিয়োশার আরেক ভাই তার সহোদর ইভান ফিয়োদরভিচের চেয়ে কিছুকাল পরে এসেছিল তবু তারই সঙ্গে তার খুব তাড়াতাড়ি খাতির ও বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। ইভানকে জানার ব্যাপারে আলিয়োশার ভীষণ আগ্রহ ছিল, কিন্তু ইভান তখন যদিও দুমাস হল ওখানে বসবাস করছে, যদিও তাদের দুজনের মধ্যে বেশ ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হত, তবু ঘনিষ্ঠ তারা কোনোমতে হতে পারেনি। আলিয়োশা নিজেও চাপা স্বভাবের, সে যেন কিছু একটা প্রত্যাশা করছিল, কেমন যেন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব তাকে পেয়ে বসেছিল। এদিকে তার ভাই ইভান—যদিও আলিয়োশা এও লক্ষ করে দেখেছে প্রথম প্রথম তার দিকে অনেকক্ষণ ধরে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত—শেষ পর্যন্ত যেন ওকে নিয়ে মনের মধ্যে চিন্তার প্রশ্রয় মাত্র দিত না। এটা লক্ষ করে আলিয়োশা একটু বিব্রত। সে মনে মনে ভাবল ওদের দুজনের বয়সের পার্থক্য, বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্যই বুঝি তার ভাইয়ের এই ঔদাসীন্যের কারণ। কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন তার মনে উদয় না হয়ে পারেনি: তার প্রতি ইভানের এই যে এত কম কৌতূহল ও সহানুভূতি এর পেছনে এমন কোনও কারণ থাকতে পারে কি যা আলিয়োশার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত? তার সব সময় কেন

যেন মনে হত ইভান এমন একটা কাজে ডুবে আছে যা তার অন্তরের সামগ্রী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে যেন চলেছে এমন একটা লক্ষ্যের দিকে যা অর্জন করা সম্ভবত খুবই কঠিন—হয়তো এই কারণেই আলিয়োশার প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই, আলিয়োশাকে সে যে উদাসীন দৃষ্টিতে দেখে থাকে হয়তো এটাই তার একমাত্র কারণ। মাঝে মাঝে এও মনে হয় তার দাদাটি যেমন পণ্ডিত, তেমনি নাস্তিক—তার মতো একটা মূর্খ সন্ন্যাসব্রতীকে হয়তো বা অবজ্ঞার চোখেই দেখে। সে বেশ ভালোভাবেই জানত যে তার দাদা নাস্তিক। তা অবজ্ঞা যদি থাকেও তাতে আলিয়োশার কোনো দুঃখ নেই। তবু সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন যেন অস্থিত্ব আর উদ্বেগের সঙ্গে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে কবে তার ভাই তাকে কাছে টেনে নেবে। অন্য ভাই দমিত্রি ফিয়োদরভিচ্ অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করে ইভান সম্পর্কে, তার সম্পর্কে কথা বলে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে। তার কাছে থেকেই আলিয়োশা বিশদ জানতে পারল কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফলে তার দুই দাদার মধ্যে সম্পর্কটা সম্প্রতি এত ভালো আর নিবিড় হয়েছে। দ্মিত্রির মুখে ইভানের সপ্রশংস উল্লেখ আলিয়োশার কাছে বড়ো অদ্ভুত মনে হল। ইভানের তুলনায় দ্মিত্রির শিক্ষাদীক্ষা তো প্রায় কিছুই না, তাছাড়া ব্যক্তিত্বে চরিত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে এত অমিল যে সে রকম অমিল দুটো লোকের মধ্যে কল্পনা করাও কঠিন।

ঠিক এই সময় সাধু জোসিমার কুটিরে এই বিশৃঙ্খল পরিবারের সকলের মধ্যে এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল—অবশ্য একে সাক্ষাৎ না বলে পারিবারিক আলোচনা সভা বলাই ভালো। ঘটনাটা আলিয়োশার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আলোচনার অজুহাতটা ছিল আসলে একেবারে বাজে। ঠিক এই সময় সম্পত্তির উত্তরাধিকার আর ভাগ নিয়ে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ আর তার বাপ ফিয়োদর পাভলভিচের মধ্যে সম্পর্কটা স্পষ্টত তিক্ত হতে হতে চূড়ান্ত খারাপ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি ঘোরাল ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয় ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ই প্রথম, সম্ভবত ঠাট্টাচ্ছলেই প্রস্তাব করল—সকলে মিলে সাধু জোসিমার কুটিরে বসে একদিন আলোচনা করা যাক, সরাসরি তাঁর মধ্যস্থতা গ্রহণের কোনো দরকার নেই, মোটামুটি বড়ো ধরনের একটা বোঝাপড়ায় আসা গেলেও যেতে পারে, মহাস্থবিরের উপস্থিতি ও তাঁর ব্যক্তিত্ব হাজার হোক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও শান্ত সংযত পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হবে। দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ মহাস্থবিরের কাছে কখনও যায়নি, এমনকি তাঁকে কখনও চোখেও দেখেনি। বলাই বাহুল্য তার ধারণা হল মহাস্থবিরের কথা বলে বাপ তাকে ভয় দেখাতে চায়, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার বাদানুবাদের সময় বিশেষ করে যে বদমেজাজের পরিচয় সে দিয়েছে তার জন্য সে নিজেই মনে মনে নিজেকে দুষেছে, তাই চ্যালেঞ্জটা সে গ্রহণ করল। প্রসঙ্গত, বলে রাখি ইভান পেত্রোভিচের মতো সে কিন্তু বাপের সঙ্গে থাকত না, শহরের আরেক প্রান্তে আলাদা বসবাস করত। এমনই যোগাযোগ যে—সেই সময় পিয়োতর্

আলেক্সান্দ্রভিচ্ মিউসভ আমাদের এলাকায় বসবাস করছিল—ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের এই আইডিয়া তার বিশেষভাবে মনে ধরে। সে ছিল চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের উদারনৈতিক ভদ্রলোক। স্বাধীন চিন্তার মানুষ, নিরীশ্বরবাদী। একঘেয়েমির কারণে হতে পারে, হয়তো বা স্রেফ মজা করার জন্য হালকা মেজাজেও হতে পারে, এ ব্যাপারে সে খুব উৎসাহের পরিচয় দিল। হঠাৎই মঠ ও 'সাধু' সন্দর্শনের বাসনা তার মনে প্রবল হয়ে উঠল। মঠের সঙ্গে তার একটা পুরানো মামলা তখনও ঝুলে ছিল। দুই তরফের জমির সীমানা, জঙ্গলে গাছ কাটা ও নদীতে মাছ ধরার অধিকার ইত্যাদি নানা প্রশ্নে দীর্ঘকালের এই বিবাদ। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপসে তার মীমাংসা করা যায় কিনা এটা দেখার জন্য সে নিজে উদ্যোগী হয়ে মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে একান্ত ইচ্ছুক—এই অজুহাত দেখিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যারা মঠে আসে, এ ধরনের সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত দর্শনার্থীর খাতির যত্নের সম্ভাবনা বলাই বাহুল্য সেই তুলনায় বেশি থাকে। বৃদ্ধ জোসিমা ইদানীং তাঁর কুটির ছেড়ে কদাচিৎ বের হন, এমনকি যাঁরা তার নিয়মিত দর্শনার্থী তাদেরও দর্শন দেন না—এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। যা হোক, শেষকালে তিনি রাজি হলেন। আলোচনার একটা দিনও স্থির হল। কেবল মৃদু হেসে তিনি আলিয়োশাকে বললেন: 'ওদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করবার কী অধিকার আমার আছে?'

ওরা যে আলোচনার জন্য মঠে আসছে তা জানতে পেরে বড়ো দুশ্চিন্তা হল আলিয়োশার। সে জানত ওরা নিজেদের মধ্যে যতই চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাঁটি করুক না কেন, এই আলোচনাকে ওদের মধ্যে যদি কেউ গুরুত্ব দেয় সে নিঃসন্দেহে তার ভাই দ্‌মিত্রি। বাকিরা সকলে কিন্তু আসবে ছেবলামি করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাই ঘটনাটা সাধু জোসিমার পক্ষে অপমানজনকও হতে পারে। দাদা ইভান আর মিউসভ আসবে কৌতূহল চরিতার্থ করতে—সে কৌতূহল হয়তো অত্যন্ত স্থূল ধরনেরও হতে পারে। আর তার বাপ হয়তো মনে মনে ভাঁড়ামি করার বা কোনো নাটকীয় দৃশ্য অবতারণার মতলব আঁটছে। আলিয়োশা চুপ করে থাকলে কী হবে, বাপকে সে খুব ভালোভাবেই জানে। আবার বলছি ছেলেটাকে লোকে যেমন বোকা ভাবে আসলে সে মোটেই তা ছিল না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে ওই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। নিঃসন্দেহে এইসব পারিবারিক বিবাদ বিসংবাদের কীভাবে মিটমাট হতে পারে এই ভেবে মনে মনে তার চিন্তার অন্ত ছিল না। তবু তার প্রধান চিন্তা ছিল তার গুরুকে নিয়ে। গুরুর কথা ভেবে, পাছে তাঁর মর্যাদা বা গৌরবের হানি হয় এই ভেবে আলিয়োশার বুক টিপটিপ করতে থাকে। তার ভয় হচ্ছিল ওঁকে কেউ অবজ্ঞা করে না বসে। ভদ্রতার আড়ালে মিউসভের সূক্ষ্ম হাস্যপরিহাস এবং পণ্ডিত দাদা ইভানের উন্নাসিকতাপূর্ণ বাঁকা বাঁকা অর্ধোক্তিকে ও বিশেষ করে ভয় পায়। অন্তত এরকম আশঙ্কাই তার মনে হয়েছিল তখন।

তার এমন মনে হয়েছিল যে ঝুঁকি নিয়ে গুরুকে সতর্ক করে দেয়, সম্ভাব্য আগন্তুকদের সম্পর্কে আগে থাকতে তাঁকে কিছু বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে চুপ করে থাকাই সমীচীন বোধ করল। কেবল নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন একজন পরিচিতের মারফত দাদা দ্‌মিত্রিকে এই মর্মে একটা চিঠি পাঠাল যে তাকে সে খুব ভালোবাসে এবং আশা করছে দাদা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। চিঠি পেয়ে দ্‌মিত্রি ভাবনায় পড়ে গেল। কেননা সে কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিল না কী প্রতিশ্রুতি সে তার ভাইকে দিয়েছিল। শুধু উত্তরে এই কথাই লিখল যে নীচতার সামনে নিজেকে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা সে করবে এবং যদিও মহাস্থবির এবং ভাই ইভানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তার আছে, তবু তার দৃঢ়বিশ্বাস যে এই সাক্ষাৎকার হয় তাকে ফাঁদে ফেলার বা তাকে নিয়ে উপহাস করার একটা কৌশলমাত্র। চিঠির শেষে সে লিখল: 'সে যাই হোক, যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিটিকে তুমি অত শ্রদ্ধা কর, তাঁর সামনে অসংযম প্রকাশ করে তাঁর মর্যাদাহানি অবশ্যই ঘটাব না—আমি আমার জিহ্বা সংযত রাখব।' তা সত্ত্বেও আলিয়োশা কিন্তু তেমন আশ্বস্ত হতে পারল না।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## একটি অসঙ্গত সমাবেশ

### এক

### মঠে আগমন

তখন আগস্ট মাসের শেষ। দিনটি চমৎকার, উষ্ণ উজ্জ্বল। মহাস্থবিরের সঙ্গে দেখা করার সময়টা ধার্য হয়েছিল বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ, সকালবেলার উপাসনার ঠিক পরই। আমাদের আগন্তুকরা অবশ্য উপাসনায় যোগ দিল না, উপাসনা শেষ হওয়ার পর ভক্তরা যখন প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় তাদের আগমন। তারা এলো দুটো ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। প্রথমে একজোড়া চমৎকার ঘোড়ায় টানা দামি একটা খোলা গাড়িতে চেপে উপস্থিত হল পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্ মিউসভ্। তার সঙ্গে তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়—খুব অল্পবয়সি, বছর কুড়ি বয়স, নাম পিয়োতর্ ফোমিচ কাল্‌গানভ। এই নবীন যুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আপাতত কী কারণে কে জানে, সে মিউসভের কাছে আছে। মিউসভ্ ওকে খুব করে তাতাচ্ছে তার সঙ্গে বিদেশে যেতে, জুরিখ অথবা যেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখানকার পাঠ শেষ করতে। যুবক এখনও মনস্থির করতে পারে নি। ছেলেটি কেমন যেন চিন্তাকুল একটু আনমনা। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী। তার দৃষ্টিতে সময় সময় ফুটে ওঠে একটা অদ্ভুত আড়ষ্টতা—এ ধরনের বড়ো বেশি অন্যমনস্ক

লোকদের সকলের বেলায় যেমন দেখা যায়—অনেক সময় স্থিরদৃষ্টিতে লোকের দিকে তাকিয়ে থাকে, অথচ আসলে হয়তো তাকে আদৌ দেখছ্ না। কথা কম বলে, একটু আড়ষ্ট ও গম্ভীর প্রকৃতির। তবে কারও সঙ্গে একান্তে আলাপ আলোচনার সময় হঠাৎ হঠাৎ কথা বলার দারুণ উৎসাহ তাকে পেয়ে বসে, তখন কথায় কথায় কারণে অকারণে তাকে হাসতে দেখা যায়। কিন্তু তার সেই আবেগ উচ্ছ্বাস যেমন দ্রুত ও অকস্মাৎ জেগে ওঠে তেমনি দ্রুত ও অকস্মাৎ নিভেও যায়। বেশভূষা পরিপাটি, এমনকি নিখুঁত। ইতিমধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগের অধিকারী, তার চেয়েও আরও বেশি ধনসম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা আছে। আলিয়োশার বন্ধু সে।

ধূসর গোলাপি রঙের একজোড়া থুত্থুড়ে ঘোড়ায় টানা ভাড়া করা এক গাড়ি চেপে উপস্থিত হল ফিয়োদর্ পাভলভিচ্, সঙ্গে তার ছেলে ইভান। গাড়িটা বেশ প্রশস্ত তবে পুরানো ঝরঝরে। মিউসভ্দের গাড়ির চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে ছিল ওদের গাড়ি। সময়ের কথা আগের দিন যথারীতি দ্মিত্রিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবু সে দেরি করছিল। দর্শনার্থীরা মঠের দেয়ালের ধারে ধর্মশালার কাছে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে চলল মঠের দ্বার পর্যন্ত। ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ ছাড়া দলের বাকি তিনজনের কেউ কখনও কোনো মঠ দেখেছে বলে মনে হয় না। আর মিউসভ্ তো বোধহয় গত ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনও গির্জাতেই ঢোকেনি। সে বাইরে বেশ খানিকটা সহজ স্বচ্ছন্দভাব বজায় রেখে অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তার সন্ধানী বিচারবুদ্ধি মঠের অভ্যন্তরে গির্জা আর তার সংলগ্ন দরদালান ছাড়া সে রকম উল্লেখযোগ্য কিছু খুঁজে পেল না—আর সেগুলোও, প্রসঙ্গত খুবই সাধারণ। উপাসনার শেষে উপাসকদের শেষ দলটি টুপি হাতে করে খালি মাথায় ক্রুশ প্রণাম ঠুকতে ঠুকতে গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। সাধারণ লোকজনের মাঝখানে চোখে পড়ল উঁচু মহলের কিছু লোকজন, দু একজন অভিজাত মহিলা; অতি বৃদ্ধ এক জেনারেলও আছেন তাদের মধ্যে: এরা সব বাইরের আগন্তুক। এরা সকলে ওই ধর্মশালায় এসে উঠেছে। ভিখিরিরা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আগন্তুকদের ছেঁকে ধরল। কিন্তু ওরা কেউ কিছু ঠেকাল না। কেবল ছোকরা কাল্গানভ্ চট করে তার মানিব্যাগ থেকে দশটা কোপেকের একটা মুদ্রা বের করে, ভগবান জানেন কী কারণে, কেমন যেন লজ্জিত মুখে এক বুড়ি ভিখিরির হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: 'সমান ভাগে ভাগ করে নিও।' ওর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করল না, তাই ওর লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণও ছিল না, অথচ ঠিক এটা লক্ষ করেই সে যেন আরও বেশি লজ্জিত হল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। মঠের দরজায় যা প্রত্যাশিত ছিল তা তো দেখা যাচ্ছে না। ওদের জন্য কারও না কারও অপেক্ষা করে থাকার কথা—এমনকি কতকটা

সম্মান দেখিয়ে সংবর্ধনা জানোনোও উচিত। ওদের মধ্যে একজন এই হালে এক হাজার রুবল দান করেছে মঠে, আরেক জন আবার বৈভবশালী ও অতি উচ্চ শিক্ষিত এক জমিদার—এমন এক ব্যক্তি যে মামলার মোড় ঘুরে গেলে নদীতে মাছ ধরার ব্যাপারে মঠের সাধুদের অংশত তারই ওপর নির্ভর করতে হতে পারে। অথচ দ্যাখ কাণ্ড। আনুষ্ঠানিক ভাবে মঠকর্তৃপক্ষের কেউই ওদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসছে না। মিউসভ্ অন্যমনস্ক ভাবে গির্জা সংলগ্ন সমাধিশিলাগুলি দেখতে লাগল, মনে মনে ভাবার চেষ্টা করতে লাগল এরকম একটা 'পুণ্যস্থানে' সমাধিস্থ হওয়ার অধিকার লাভের জন্য এদের নিশ্চয়ই কম মূল্য দিতে হয়নি। তবে মনের ভাব চেপে গেল। উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিটির সাধারণ বিদ্রূপ প্রায় ক্রোধে রূপান্তরিত হল। হঠাৎ সে যেন আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠল: 'যাচ্চলে, এ যে দেখছি একটা আহাম্মকের জায়গা। এখানে কোন্ চুলোয়, কাকে জিগগেস করব? একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। সময় চলে যাচ্ছে যে।'

এমন সময় তাদের দিকে এগিয়ে এলেন গরমকালের ঢিলেঢালা হালকা জোব্বাধারী এক টাক মাথা প্রৌঢ়। তাঁর দু চোখে যেন স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছে। মাথার টুপি তুলে অভিবাদন জানিয়ে আধো আধো মিষ্টি গলায় নিজেকে তুলার জমিদার মাক্সিমভ্ বলে পরিচয় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অতিথিদের ভার নিজের ওপর তুলে নিলেন।

তিনি বললেন, 'সাধু জোসিমা থাকেন একটা আশ্রম কুটিরে, সবার থেকে আলাদা একেবারে নির্জন এক কুটিরে—মঠ থেকে শ চারেক পা দূরে—বনবাদার পেরিয়ে যেতে হয়।'

'বন পেরিয়ে যেতে হয় সে আমি জানি', ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ উত্তরে বলল। 'কিন্তু পথটা আমাদের একদম মনে নেই। বহুকাল আসা হয় না কিনা।'

'এই যে গেটটা দেখছেন এটা পেরিয়ে বনের ভেতর দিয়ে....ছোটো বনটার ভেতর দিয়ে সিধে যেতে হবে। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে...আমার নিজেরও সেখানে দরকার আছে... আমিও যাচ্ছি...আমার সঙ্গে আসুন।... এই যে পথে....'

ওরা গেট পেরিয়ে বনের পথ ধরল। জমিদার মাক্সিমভের বয়স বছর ষাটেক, কিন্তু তা হলে কী হবে, ভদ্রলোক ওদের এক পাশ ধরে কাত হয়ে যে ভাবে হাঁটছেন তাকে হাঁটা না বলে বোধহয় উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা বলাই ভালো। ওদের সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল অবিশ্বাস্য রকমের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তাই চলতে চলতে নার্ভাস দৃষ্টিতে ওদের সকলকে নিরীক্ষণ করছিলেন তিনি। তাঁর চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল।

'বুঝলেন কিনা, আমরা এই মহাস্থবিরের কাছে এসেছি আমাদের নিজেদের একটা কাজে', কঠিন স্বরে মিউসভ্ বলল। 'আমরা এই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছি। তাই বলি কি, পথ দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, তবে আপনাকে আর আমাদের সঙ্গে আসতে হবে না।'

'আমি গিয়েছিলাম, ওখানে গিয়েছিলাম।....Un chevalier parafait!—একজন খাঁটি বীরব্রতী।' এই বলে জমিদার মশাইটি শূন্যে তুড়ি মারলেন।

'Chevalier? কার কথা বলছেন?' মিউসভ্ জিগ্গেস করল।

'মহাস্থবির, মহাস্থবির, আমাদের অসাধারণ মহাপুরুষ জোসিমা।....আমাদের মঠের সম্মান আর গৌরব। এতই মহান....'

তাঁর অসংলগ্ন, বিশৃঙ্খল বক্তৃতার মাঝখানে বাধা পড়ল মঠের একটি সাধু ছুটতে ছুটতে এসে তাদের নাগাল ধরতে। মাঝারি আকারের, শীর্ণ পাণ্ডুর লোকটার চেহারা, মাথায় আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীর টুপি। ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ ও মিউসভ্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাধুটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে প্রায় কোমর পর্যন্ত নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'ভদ্রমহোদয়রা, মঠাধ্যক্ষ আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের সকলের প্রতি তাঁর বিনীত অনুরোধ, কুটিরে মহাস্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব শেষ হবার পর তাঁর ওখানে আসবেন। মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আপনাদের সকলকে। একটার সময়, দেরি করবেন না কিন্তু। আপনারও নিমন্ত্রণ আছে', মাক্সিমভের দিকে ফিরে সে বলল।

'এই অনুরোধ আমি অবশ্যই রাখব।' নিমন্ত্রণের কথা শুনে দারুণ উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্। 'অবশ্যই যাব। জানেন তো আমরা সবাই কথা দিয়েছি যে এখানে ভদ্র ব্যবহার করব।... তা আপনি, পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্? আপনিও যাবেন তো?'

'যাব না মানে? আলবত যাব। ওঁদের এখানকার সমস্ত আচার অনুষ্ঠান দেখব বলেই না আমি এখানে এসেছি। আমার একমাত্র অসুবিধে এই যে আমি এখন আপনার সঙ্গী ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্...'

'তাও ত দ্মিত্রি ফিয়োদর্ভিচ্ এখনও এসে জোটেনি।'

'একবারে না এলেই বাঁচি। আপনার কি ধারণা আপনাদের এসব ঝুট ঝামেলা আমার ভালো লাগে?—তার ওপরে আপনার সঙ্গে আবার একটা ফাও? হ্যাঁ, মধ্যাহ্নভোজে নিশ্চয়ই যাব আমরা। ধন্যবাদ জানাবেন মঠাধ্যক্ষ প্রভুকে', সাধুটিকে সে বলল।

সাধুটি উত্তরে বলল, 'না, আমার ওপর আজ্ঞা আছে মহাস্থবিরের কাছে আপনাদের পৌঁছে দেবার।'

'তাহলে ত ভালোই হল। আমি তাহলে এই অবসরে মঠাধ্যক্ষ প্রভুর কাছে, তাঁর কাছেই সোজা চলে যাই', জমিদার মাক্সিমভ কিচির মিচির করে বলে উঠলেন।

'উনি ঠিক এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন। তা সে আপনার যা অভিরুচি তাই করুন গে...' সাধুটি একটু ইতস্তত করে বলল।

জমিদার মাক্সিমভ্ যখন ছুটতে ছুটতে মঠের দিকে ফিরে গেলেন তখন মিউসভ্ জোরে জোরেই মন্তব্য করল: 'ওঃ কী নাছোড়বান্দা বুড়ো রে বাবা।'

'ফন জোহ্নের মতো,' ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের মুখে ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল।

'আপনি শুধু ওটাই জানেন।....লোকটা কীসে ফন্ জোহ্নের মতো হল, শুনি? আপনি নিজে ফন্ জোহ্নকে দেখেছেন নাকি?

'তার ছবি দেখেছি। আর মুখের চেহারায় না হোক এমন একটা কিছুর মিল আছে যা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। ফন জোহ্নের হুবহু দ্বিতীয় সংস্করণ। ও আমি যখন তখন একমাত্র মুখ দেখে বলে দিতে পারি।'

'তা হবেও বা। আপনি এই ব্যাপারে একজন রসিক, তাই বলুন। তবে দেখুন, একটি কথা বলে দিচ্ছি ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্, আপনি এই কিছুক্ষণ আগে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা ভদ্র ব্যবহার করব বলে কথা দিয়েছি।... মনে আছে তো? আপনাকে বলছি, নিজেকে সংযত করুন। আপনি যদি ভাঁড়ামি শুরু করেন তাহলে বলে দিচ্ছি এখানে লোকে আমাকে আপনার সঙ্গে এক আসনে বসাক এটা আমার অভিপ্রেত নয়।... এবারে সাধুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখতে পাচ্ছেন কী ধরনের লোক? ওর সঙ্গে ভদ্র সমাজে যেতে আমার বড়ো ভয়।'

সাধুটির রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখে ফুটে উঠল নীরব হাসির সূক্ষ্ম রেখা—তার মধ্যে ধূর্ততার অভাবও অবশ্য ছিল না। কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না। বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল আত্মসম্মান বজায় রাখার খাতিরে সে মৌন থাকা সমীচীন বোধ করল। মিউসভ্ এতে আরও বেশি ভ্রুকুটি করল। মনে মনে সে ভাবল, 'চুলোয় যাক ব্যাটারা। বহু যুগের চেষ্টায় বাইরের এই ভড়ংটাই ওরা আয়ত্তে আনতে পেরেছে। আসলে সবটাই ভণ্ডামি, ফালতু।'

'এই তো আশ্রম। আমরা এসে গেছি।' ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ বলে উঠল। 'কিন্তু ফটক বন্ধ দেখছি।'

ফটকের মাথার ওপরে আর একপাশে সাধুসন্তদের অনেকগুলি মূর্তি আঁকা—তাই দেখে সে ঘন ঘন ক্রুশ প্রণাম ঠুকতে লাগল।

'যস্মিন দেশে যদাচার', সে মন্তব্য করল। 'এখানে, এই আশ্রমে মোট পঁচিশ জন সাধু সন্ন্যাসী মুক্তির সন্ধানে তপস্যা করছেন। তাঁরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর বাঁধাকপি ভক্ষণ করে জীবনধারণ করেন। বিশেষ ভাবে লক্ষ করার বিষয় এই যে একটি মেয়েমানুষ এই ফটক দিয়ে গলবে না, এটা কিন্তু ঘটনা। তবে আমি কিন্তু এটাও শুনেছি যে সাধু জোসিমা বড়ো বড়ো ঘরের মেয়েদেরও দর্শন দেন—তা কী করে হয়?' হঠাৎ সে তাদের পথপ্রদর্শক সাধুকে প্রশ্ন করল।

সাধু বলল, 'ওই যে ওখানে দরদালানটা দেখছেন সাধারণ ঘরের মেয়েরা তারই মেঝেতে শুয়ে বসে থাকে দর্শনের অপেক্ষায়, আর বড়ো ঘরের মহিলাদের জন্য ওই দরদালানেরই লাগোয়া—অবশ্য দেয়ালের বাইরে—তৈরি করা হয়েছে দুটো ছোটো ছোটো ঘর। ওই দেখুন ঘরের জানলা। প্রভু যখন সুস্থ থাকেন তখন ভেতরের সরু রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসে দর্শন দেন—দেখতেই পাচ্ছেন আশ্রমের চৌহদ্দির বাইরে। এই এখন এক ভদ্রমহিলা তাঁর রুগ্‌ণ মেয়েকে নিয়ে ওখানে আছেন। খারকভ্

থেকে এসেছেন। মাদাম খখ্‌লাকোভা। উনি একজন জমিদার। সম্ভবত ওঁকে দর্শন দেবেন বলে কথা দিয়েছেন প্রভু। তবে আজকাল উনি কদাচিৎ বেরিয়ে লোকজনের কাছে দেখা দেন—বড়ো বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন কিনা।'

'তার মানে, যাই বল না কেন বাপু, আশ্রম থেকে মেয়েমহলে যাবার একটা চোরাপথ আছে। আরে না না, সাধুবাবা, অন্যভাবে নেবেন না। ও সব কথার কথা। 'জানেন, আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, আথোসের মঠে মেয়েমানুষদের সাক্ষাৎ তো বটেই, সারা মঠের চৌহদ্দির মধ্যে তাদের ঢোকার একদম নিয়ম নেই, এমন কি মেয়েজাতের কোনো জীব—মুরগি, গোরু, বকনা বাছুরটি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না।...'

মিউসভ্ ধমকে উঠল, 'ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্, এরকম করলে কিন্তু আমি এখানে আপনাকে একলা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি সঙ্গে না থাকলে এরা আপনাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে—এ আমি আপনাকে বলে রাখছি।'

আশ্রমের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'আহা আমি আবার কীসে আপনার বাধা হলাম বলুন তো পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ? ওই দেখুন, কেমন সুন্দর গোলাপের উপত্যকায় ওঁরা থাকেন।'

বাস্তবিকই গোলাপ অবশ্য তখন ওখানে নেই, তবে আশ্রমের সর্বত্র জুড়ে, যেখানে যেখানে লাগান সম্ভব হয়েছে, ফুটে আছে অজস্র দামি দামি সুন্দর মৌসুমী ফুল। দেখে বোঝাই যাচ্ছে কোনও দক্ষ হাতের যত্নে এগুলি লালিত। গির্জার চৌহদ্দির ভেতরে সমাধিগুলির ফাঁকে ফাঁকে ফুলের কেয়ারি। যে ছোট্ট বাড়িটাতে মহাস্থবিরের নির্জন কুটির, সেটা একতলা, কাঠের তৈরি। প্রবেশ পথের সামনে বারান্দা। এটারও চারদিকে ফুল আর ফুল।

'আচ্ছা এর আগেকার মহাস্থবির ভার্সোনোফির আমলে কি এসব ছিল? উনি তো শুনেছি এসব আড়ম্বর পছন্দ করতে না, এমনকি কখনও কখনও লাঠি দিয়ে মহিলাদেরও ধরে ঠ্যাঙাতেন,' দেউড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ মন্তব্য করল।

'প্রভু ভার্সোনোফিকে মাঝে মাঝে সত্যি সত্যি ক্ষ্যাপাটে বলে মনে হত। তবে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই বাজে রটনা। উনি কখনও কাউকে লাঠি দিয়ে ঠ্যাঙান নি', সাধুটি উত্তর দিল। 'এবারে মহোদয়রা মিনিট খানেক ধৈর্য ধরুন, আমি আপনাদের আসার সংবাদ জানাচ্ছি।'

'ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ শুনছেন? আমি এই শেষ বারের মতো আপনাকে জানাচ্ছি। ভদ্রভাবে চলুন, নইলে কিন্তু মজা টের পাইয়ে দেব', বিড়বিড় করে আরও একবার তাকে মনে করিয়ে দিলেন মিউসভ্।

'আপনি এত অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন বলুন তো? আমার একদম বোধগম্য হচ্ছে না', বিদ্রুপের হাসি হেসে ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ বলল। 'পাপের ভয় বুঝি?

লোকে বলে উনি নাকি লোকের চোখ দেখেই বলে দিতে পারেন কার মনে কী আছে। আপনি একজন প্যারিস ফেরত পণ্ডিত হয়ে কিনা ওদের মতামতের এত মূল্য দিয়ে থাকেন? অবাক করলেন মশাই, আমাকে।'

মিউসভ্ ওর এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দেবার অবকাশ পেল না। ঠিক এই সময় ওদের ভেতরে ঢোকার ডাক এলো। মনে মনে বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়েই সে ভেতরে ঢুকল।

'এখন আমি আগে থাকতেই বুঝতে পারছি যেহেতু বিরক্ত হয়ে আছি তাই কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে, মেজাজ গরম হতে থাকবে—ফলে নিজের মানসম্মান খোয়াব, সেই সঙ্গে আমার আইডিয়াও খেলো হয়ে যাবে', তার মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল এই চিন্তাটা।

## দুই

## বুড়ো ভাঁড়

মহাস্থবিরের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে সবাই প্রবেশ করল আশ্রমের বাইরের ঘরে। অতিথিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উনিও বেরিয়ে এলেন তাঁর শয়নকক্ষ থেকে। কুঠুরিতে ইতিমধ্যে মহাস্থবিরের প্রতীক্ষায় ছিলেন দুই মঠবাসী সন্ন্যাসী। একজন মঠের গ্রন্থাগারিক, অন্য জন ফাদার পাইসি। ফাদার পাইসি অসুস্থ, যদিও তেমন বৃদ্ধ নন। লোকে বলে, দারুণ পণ্ডিত। এ ছাড়া এক কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল— পরে সর্বক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—কুড়ি বাইশ বছর বয়সের এক ছোকরা। তার পরনে গৃহীদের সাধারণ পোশাক। ছেলেটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে শাস্ত্রজ্ঞ হবে। কোনো কারণে মঠ এবং সেখানকার ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ওকে এখানে আশ্রয় দিয়েছে। বেশ দীর্ঘকায়, তাজা চেহারা, গালের হাড় দুটো প্রশস্ত, বাদামি রঙের চোখজোড়া সঙ্কীর্ণ, উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি সজাগ। চোখেমুখে পরম ভক্তির ভাব, কিন্তু সেটা মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে কোনো তোষামোদের চিহ্ন নেই। আগন্তুকদের সে নীচু হয়ে অভিবাদন পর্যন্ত করল না, যেহেতু সে সামাজিক ভাবে ওদের সমপর্যায়ভুক্ত নয় বরং অন্যের অধীনস্থ, পরনির্ভরশীল।

সাধু জোসিমা ঢুকলেন তাঁর একজন শিষ্য আর আলিয়োশাকে সঙ্গে নিয়ে। ঘরে উপস্থিত সাধু দুজন উঠে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে মাটিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন, তারপর তাঁর কর চুম্বন করলেন। তাঁদের আশীর্বাদ করার পর উত্তরে তিনি একে একে তাঁদের দুজনকেই ওই ভাবে আভূমি নত হয়ে মাটিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন। নত মস্তকে নিজেও তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। পুরো অনুষ্ঠানটি বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পন্ন হল। ঠিক নিত্যকার

আচার অনুষ্ঠানের মতো নয়—এর মধ্যে বেশ খানিকটা হৃদয়াবেগও ছিল। মিউসভের কিন্তু মনে হল এ যেন লোক দেখান, বাড়াবাড়ি। আগন্তুকদের সকলের সামনে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার উচিত ছিল—এমনকি গতকাল সন্ধ্যায় সে মনে মনে ভেবেও রেখেছিল—তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা যাই হোক না কেন যেহেতু এটাই এখানকার রীতি তাই স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে মহাস্থবিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা, করচুম্বন না করলেও অন্তত আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। কিন্তু এখন সাধুদের এই সব প্রণাম ঠোকাঠুকি আর চুমোচুমির ঘটা দেখে মুহূর্তের মধ্যে সে তার সিদ্ধান্ত বদল করে ফেলল। সে কেবল সামাজিক রীতি অনুযায়ী গুরুগম্ভীর ভাবে মাথা নুইয়ে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা চেয়ারে আসন গ্রহণের জন্য একপাশে সরে গেল। মিউসভের অক্ষম অনুকরণে, তার পরম বিরক্তির উদ্রেক করে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচও ঠিক তাই করল। ইভান ফিয়োদরভিচ্ অত্যন্ত ভদ্রভাবে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল—তবে তারও হাত দুটি দুপাশে আড়ষ্ট হয়ে ঝুলে রইল। আর কাল্‌গানভ এমনই ঘাবড়ে গেল যে কিছুই করতে পারল না। মহাস্থবির আশীর্বাদের জন্য হাত তুলে ছিলেন। হাত নামিয়ে মাথা নীচু করে আবার তাদের অভিবাদন জানালেন, সকলকে বসতে বললেন। আলিয়োশার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। তার মনে যে অশুভ চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটাই তাহলে ফলল।

খুব সেকেলে ধরনের তৈরি, চামড়া-ঢাকা মেহগনি কাঠের একটা সোফায় সাধু জোসিমা বসলেন। উপস্থিত দুই সাধু ছাড়া অতিথিদের বসতে দিলেন মুখোমুখি দেয়ালের ধারে পর পর দাঁড় করিয়ে রাখা দস্তুরমতো রংচটা কালো চামড়ায় ঢাকা মেহগনি কাঠের চারটি চেয়ার। সাধু দুজন গিয়ে বসলেন দুপাশে—একজন দরজার ধারে, আরেকজন জানলার ধারে। ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আলিয়োশা আর শিষ্যটি দাঁড়িয়ে রইল। আশ্রমের কক্ষ খুবই অপ্রশস্ত দেখতে কেমন যেন নিষ্প্রাণ। নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, দরিদ্র, স্থূল ও অমার্জিত। জানলায় দুটো ফুলের টব, এক কোনায় অনেকগুলি আইকন—তাদের মধ্যে একটি যিশুমাতার। বিশাল আকৃতির পট—চতুর্দশ শতাব্দীতে গির্জায় যখন সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেখা গিয়েছিল সম্ভবত তারও অনেক আগের আঁকা। তার সামনে জ্বলন্ত একটি প্রদীপ। এই আইকনটার পাশে আরও দুটি আইকন—চারধারের উঁচু ধাতব কাঠামোগুলি জ্বলজ্বল করছে। এর পর আছে দেবশিশুদের কয়েকটি মূর্তি—খোদাই করা; চিনেমাটির তৈরি কয়েকটি ডিম, গজদন্ত নির্মিত একটি ক্যাথলিক ক্রস—তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন শোকাকুলা যিশু জননী Mater dolorosa।* সেই সঙ্গে বিগত কয়েক শতাব্দীর বড়ো বড়ো ইতালীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি থেকে বেশ কিছু বিদেশি খোদাই কাজ। এই সব

---

* লাতিন

চমৎকার দামি দামি খোদাই চিত্রের পাশে শোভাবর্ধন করছে সাধুসন্ত, শহিদ বা পুণ্যাত্মা ইত্যাদি ধরনের মহাপুরুষদের অতি সাধারণ স্তরের বেশ কিছু রুশি তৈলচিত্র যা যে কোনো হাটে কিংবা মেলায় শস্তায় বিক্রি হয়ে থাকে। রাশিয়ার বর্তমান ও অতীত বিশপদের একসারি তৈলচিত্র ছিল—কিন্তু সেগুলি ঝুলছিল অন্য দেয়ালে। মিউসভ্ মঠের এই সমস্ত গতানুগতিক জিনিসের ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মহাস্থবিরের ওপর। নিজের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে তার খুব উঁচু ধারণা। এটা তার একটা দুর্বলতা। তবে এর জন্য তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে—অন্তত আমরা যদি মনে রাখি যে তার বয়স ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হয়েছে—এমন একটা বয়স যে বয়সে একজন বুদ্ধিমান বিষয়ী ও স্বচ্ছল মানুষের মনে স্বভাবতই আত্মাদরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমনকি কখনও কখনও নিজের অজ্ঞাতেই তা ঘটে।

প্রথম দর্শনেই মহাস্থবিরকে তাঁর ভালো লাগেনি। আসলে মহাস্থবিরের চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা মিউসভ্ কেন আরও অনেকেরই ভালো না লাগার কথা। খর্বকায় ছোটোখাটো মানুষটি, ন্যুব্জদেহ, পায়ে জোরবল একেবারে নেই। বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তাঁকে দেখায় অনেক বুড়ো—অন্তত যেন আরও বছর দশেকের বুড়ো। তাঁর মুখটা শীর্ণ, সারা মুখ সরু সরু বলিরেখায় ছেয়ে আছে—বিশেষত চোখের কোলে অনেক। চোখ দুটো ছোটো, দ্রুত সঞ্চারী উজ্জ্বল, দুটো ছোটো ছোটো বিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করছে। মাথার চুল সাদা তবে চুল যেটুকু রয়ে গেছে তা শুধু রগের দুপাশে। স্বল্প পরিমাণ ছোট্ট ছুঁচাল দাড়ি। সরু রেখার মতো পাতলা দুটি ঠোঁটে প্রায়ই খেলে যায় হাসির আভাস। নাকটা লম্বা নয়, তবে তীক্ষ্ণ—অনেকটা পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো।

মিউসভের মনে হল, 'সমস্ত লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে লোকটা নীচ আর খল প্রকৃতির, মনটাও ছোটো, অথচ দম্ভে পরিপূর্ণ।' মোট কথা, নিজের ওপরই তার দারুণ রাগ হল।

ঘড়ির ঘণ্টা বাজতে আলোচনার সূত্রপাতের পথ প্রশস্ত হল। দুটো ওজন দণ্ড সমেত শস্তার দেয়াল ঘড়িটাতে দ্রুত ঢং ঢং করে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজল।

'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটায় আমরা হাজির,' ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ বলে উঠল। 'অথচ দেখুন, আমার ছেলে দ্মিত্রির কোনো পাত্তা নেই। ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি পূজ্যপাদ মহাস্থবির।' 'পূজ্যপাদ মহাস্থবির' সম্বোধন ওর মুখে শুনে আলিয়োশা দারুণ চমকে উঠল। ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ বলে চলল, 'আমি নিজে সারা জীবন এত নিখুঁত সময় মেনে চলি.... সব সময় এই কথাটা মনে রাখি যে নিয়মানুবর্তিতা হল রাজা রাজড়ার শিষ্টতা।....'[২১]

'কিন্তু আপনি তো আর তাই বলে রাজা নন', মিউসভ্ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম হারিয়ে অস্ফুটস্বরে ফুট কাটল।

'না না রাজা অবশ্যই নই। একবার ভেবে দেখুন, পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্, সে আমি নিজেই জানি, মাইরি বলছি। আমি সব সময়ই এমন ধারা অবান্তর কথা বলে থাকি, প্রভু।' একটা মুহূর্তের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলল। 'আপনি চোখের সামনে যে লোকটাকে দেখছেন সে একটা ভাঁড়, আসল ভাঁড়। হ্যাঁ, আপনার কাছে আমি নিজের এই পরিচয়ই রাখছি। কী করব বলুন, পুরোনো অভ্যাস। আর অবান্তর হলেও মিথ্যে কথা যদি আমি মাঝে মধ্যে বলিও সেটা কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক—লোককে হাসানো আর তার মন জোগানোর উদ্দেশ্যেই বলি। লোকজনকে খুশি করতে হবে না? কী বলেন? বছর সাতেক আগেকার কথা—একটা ছোটো শহরে এসেছি, একটা ছোটোখাটো কাজ ছিল। সেখানকার কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলে একটা কোম্পানি খোলার মতলব করছিলাম। তা আমরা জেলার পুলিশকর্তার কাছে গেলাম, কেননা তার কাছে আমাদের কয়েকটা জিনিস জানার ছিল, তাকে ভোজে আপ্যায়িত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। যখন বেরিয়ে এলো তখন দেখি কি ইয়া লম্বা মোটাসোটা একটা লোক, মাথার চুলগুলো ফ্যাকাশে রঙের। গোমড়ামুখো। এসব ক্ষেত্রে এ ধরনের লোক অত্যন্ত বিপজ্জনক—যকৃতের গোলমাল, বুঝলেন মশাই, যকৃতের গোলমাল আছে। আমি একটা সাধারণ বিষয়ী লোকের মতো উপযাচক হয়ে সরাসরি তাকে লক্ষ করে বললাম: 'আপনি তো জেলার পুলিশ কর্তা, যাকে আমরা বলে থাকি ইস্‌প্রাভ্‌নিক। তা ইস্‌প্রাভ্‌নিক মহাশয়, আপনি আমাদের নাপ্রাভ্‌নিক হন না কেন?' লোকটা জিগ্‌গেস করল; 'নাপ্রাভ্‌নিক মানে? আপনি কী বলতে চান?' দেখি, কেমন একটা একরোখা ভাব, মুখ থমথম করছে। পলকের মধ্যে বুঝতে পারলাম গতিক ভালো নয়। আমি বললাম: 'সবাইকে আনন্দ দেবার জন্যে আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম আর কি। মিস্টার নাপ্রাভ্‌নিক** আমাদের রুশ অর্কেস্ট্রার নামজাদা কণ্ডাক্টর কিনা। আমাদের উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যও ওই রকম কণ্ডাক্টর একজন কাউকে দরকার।....' আমার ব্যাখ্যা আর তুলনা কিন্তু যুক্তিযুক্ত ছিল—ঠিক কিনা? 'মাফ করবেন, আমি ইস্‌প্রাভ্‌নিক পদের অধিকারী, আমার পদ নিয়ে এরকম কথার খেলা আমি বরদাস্ত করব না। এই বলে উলটো দিকে ঘুরে হাঁটা দিল। আমি ওর পেছন পেছন চিৎকার করে বললাম: ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি পুলিশকর্তা ইস্‌প্রাভ্‌নিক। মানছি আপনি কণ্ডাক্টর নাপ্রাভ্‌নিক নন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বলল, 'না একবার যখন নাপ্রাভ্‌নিক বলে ফেলেছেন তখন আর কোনও কথা হয় না।' বুঝুন কাণ্ড! গেল আমাদের কাজটা ভেস্তে। আমার ব্যাপারটাই এরকম—সব সময় এরকম অমায়িক ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেই নিজের ক্ষতি করে বসি। আরেকবার হয়েছে কি—সেও বহু বছর আগেকার কথা—একজন বেশ প্রভাবশালী ভদ্রলোককে আমি বললাম: 'আপনার স্ত্রী খুব স্পর্শকাতর মহিলা।' কথাটা ভালো অর্থে, তার নৈতিক গুণের কথা মনে রেখেই বলেছিলাম। উলটে উনি আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন: 'কী করে জানলেন? আপনি স্পর্শ করে

দেখেছেন নাকি?' আমি ভাবলাম এক্ষেত্রে আমার বোধহয় সৌজন্য দেখান উচিত, তাই না বলে পারলাম না, 'হ্যাঁ তা দেখেছি।' ব্যস্ আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে ওর স্পর্শ আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।...তবে সে অনেকদিন আগের ঘটনা, তাই এখন আর সে কাহিনি বলতে লজ্জা নেই। আমি এই করে চিরটাকাল নিজেরই ক্ষতি করে আসছি।'

'আপনি এখনও তাই করছেন', বিরক্তির সঙ্গে চাপা গলায় মিউসভ্ বলল। সাধু জোসিমা স্তব্ধ হয়ে একবার একে আরে একবার ওকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

'যা বলেছেন। ভাবুন একবার, আমি নিজেও কিন্তু এটা জানতাম পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ। এমনকি, জানেন আমার মন বলছিল, আমার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তাই ঘটবে। এমনকি জানেন, আমার মন এও বলছিল যে আপনিই প্রথম এ ব্যাপারে মন্তব্য করবেন। প্রভু, আমি যে মুহূর্তে দেখতে পাই ভাঁড়ামি আমার আসছে না, সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই গাল বসে গিয়ে চোয়ালের সঙ্গে লেপটে যেতে শুরু করে। প্রায় খিঁচুনি লাগার মতো অবস্থা হয়। সেই অল্প বয়স থেকেই এটা আমার হয়ে আসছে—সেই তখন থেকে যখন আমি অভিজাত লোকজনের ঘাড়ে চেপে মুফতে খেয়ে পরে থাকতাম, উঞ্ছবৃত্তি করে জীবন ধারণ করতাম। আমি একটা ভাঁড়, আপাদমস্তক ভাঁড়, জন্ম থেকেই ভাঁড়। সে যাই বলুন না কেন প্রভু, যাকে বলে ভাবোন্মত্ত ক্ষ্যাপা—তাই। হতে পারে একটা শয়তান আমার ওপর ভর করেছে। এ নিয়ে আমি তর্ক করছি না। তবে হ্যাঁ, সেটা একটা ছোটোখাটো শয়তান। আরও বড়ো মাপের শয়তান, যার অনেকটা গুরুত্ব আছে, অন্য কোথাও বাসা বাঁধা তার বেশি পছন্দ—অবশ্য আপনার ওই পিঞ্জরে নয়, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ। পিঞ্জর হিসেবে আপনার কোনও গুরুত্ব নেই কিনা। কিন্তু আমি হলেম গিয়ে, ধর্মবিশ্বাসী, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। কেবল এই হালে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি অমোঘ বাণীর প্রত্যাশায় হাঁ করে বসে আছি প্রভু। প্রভু, আমি হলাম দার্শনিক দিদ্‌রোর[১২] মতো। হে পরম পূজনীয়, সম্রাজ্ঞী য়েকাতেরিনার রাজত্বকালে দার্শনিক দিদ্‌রো[১৩] যে রাজধানীর প্রধান ধর্মযাজক প্লাতোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন সে ঘটনা আপনি অবগত আছেন কি? প্রবেশমাত্র তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন: 'ঈশ্বর নেই।' তাতে মহাপ্রভু তর্জনী তুলে উত্তর দিলেন: 'একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তি কহিবে তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান নাই।' উনি সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছিলেন তেমনি লুটিয়ে পড়লেন প্রধান ধর্মযাজকের পদতলে। আকুল হয়ে বললেন: '**বিশ্বাস করি। আমি দীক্ষা গ্রহণ করছি।** তখনই তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হল। রাজকুমারী দাশ্‌কোভা[১৪] হলেন তাঁর ধর্মমাতা, আর ধর্মপিতা হলেন পতিয়োম্‌কিন।....'

'আর সহ্য করা যায় না, ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্। আপনি নিজেও জানেন যে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আপনার এই সব গালগল্প মূর্খের প্রলাপ ছাড়া আর

কিছু নয়। মশকরা করছিলেন নাকি?’ মিউসভের ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে পড়ল। তাঁর গলা কাঁপতে লাগল।

‘সারা জীবন ধরে আমি মনে মনে অনুভব করছিলাম যে এটা অসত্য।’ আবেগে চিৎকার করে বলল ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্। ‘তাহলে শুনুন মশাই আপনারা, আমি পুরো সত্যটা আপনাদের বলব। হে মহাপ্রাণ মহাস্থবির, আমায় ক্ষমা করবেন: দিদ্‌রোর দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে শেষ যে কথাটা আমি বললাম, ওটা আমার নিজের তৈরি। এই এখুনি, এই মুহূর্তে গল্প বলতে বলতে বানালাম। আগে কিন্তু মাথায় কখনও আসে নি। রসাল করে তোলার জন্য একটু বানালাম আর কি। পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্, আমি যে মশকরা করে থাকি তার উদ্দেশ্য অন্যের কাছে সমাদর পাওয়া। যদিও হ্যাঁ, সময় সময় নিজেও জানি না কেন এমন করি। আর দিদ্‌রো সম্পর্কে ‘অজ্ঞ ব্যক্তি কহিবে ‘এই ঘটনাটি? সে আমি আমার প্রথম জীবনে অন্তত বার কুড়ি শুনেছি এখানকার জমিদারদের মুখে, যখন আমি ওঁদের আশ্রিত ছিলাম। প্রসঙ্গত, আপনার পিসি মাভ্‌রা ফোমিনিশ্‌নার মুখেও শুনেছি, পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্। আজ পর্যন্ত কিন্তু ওঁদের দৃঢ় বিশ্বাস নিরীশ্বরবাদী দিদ্‌রো ঈশ্বর সম্পর্কে বিতর্কের উদ্দেশ্য রাজধানীর প্রধান ধর্মযাজক প্লাতোনের কাছে এসেছিলেন।....’

মিউসভ্ উঠে দাঁড়াল। তার ধৈর্যচ্যুতি তো ঘটেইছিল, এমনকি সব দেখেশুনে যেন কাণ্ডজ্ঞানও লোপ পেয়ে যাচ্ছিল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু মনে মনে উপলব্ধি করতে পারছিল যে এতে তার নিজেরই হাস্যাস্পদ হওয়ার সম্ভাবনা। বস্তুতপক্ষে আশ্রম-প্রকোষ্ঠে একেবারে অবিশ্বাস্য অসম্ভব ধরনের কাণ্ডকারখানা ঘটতে চলেছে। ঠিক এই প্রকোষ্ঠটিতে হয়তো বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে, আগেকার মহাস্থবিরদের আমলেও কত দর্শনার্থীরই না আনাগোনা হয়েছে—কিন্তু সকলেই এসেছে সশ্রদ্ধ চিত্তে—গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া অন্য কোনও অনুভূতি তাদের মনে কখনও স্থান পায় নি। যারা যারা এখানে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে তাদের প্রায় সকলেরই এই নির্জন আশ্রম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভ অনুগ্রহ লাভের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠত। অনেকে নতজানু হয়ে থাকত। সাক্ষাতের সময় সর্বক্ষণ ওই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকত। এমনকি অনেক ‘উচ্চকোটির’ মানুষ, বহু বাঘা বাঘা পণ্ডিত, শুধু তাই নয়, কোনো কোনো স্বাধীন চিন্তার মানুষ পর্যন্ত—কেউ নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, কেউ বা অন্য কোনো কারণে এখানে আসত। কিন্তু যে যেই উদ্দেশ্যই আসুক না কেন আর সকলের সঙ্গে অথবা একান্ত সাক্ষাতের সুযোগ নিয়ে তারা যখন আশ্রম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তাদের প্রত্যেকে সাক্ষাতের সময় সর্বক্ষণ সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভব্যতা বজায় রাখা প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করত—বিশেষত আরও এই কারণে যে টাকাকড়ির সঙ্গে এখানকার কোনো সংশ্রব ছিল না। এখানে একমাত্র যা ছিল তা হল এক দিক থেকে প্রেম-প্রীতি দয়া, অন্যদিক থেকে আত্মার কোনো দূরূহ সমস্যা সমাধানের অথবা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কট

কাটিয়ে ওঠার ও প্রায়শ্চিত্তের প্রবল বাসনা। তাই এরকম একটা জায়গায় এসে ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ আচমকা যে ভাঁড়ামি ও অশ্রদ্ধার পরিচয় দিল তাতে উপস্থিত সকলে, অন্তত কেউ কেউ তো বটেই, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দুই সাধুবাবা গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করে যাচ্ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন মহাস্থবির কী বলেন। তাঁদের মুখভাবের অবশ্য বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটল না, তবু মনে হল তাঁরাও যেন মিউসভের মতোই উঠে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আলিয়োশার তো কাঁদ কাঁদ অবস্থা, সে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হল যে একমাত্র যার ওপর ওর এত আশা ভরসা ছিল এবং ওর বাবার ওপর একমাত্র যে মানুষটির এত প্রভাব, যে তাকে নিবৃত্ত করতে পারত সেই দাদা ইভান এখন চোখ মাটিতে নামিয়ে একেবারে স্থাণু হয়ে চেয়ারে বসে আছে। এমনকি দেখে মনে হয় যেন পরম কৌতূহলভরে অপেক্ষা করছে ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, যেন সে এখানে একেবারে বাইরের লোক। ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিতিন তো আলিয়োশার খুবই পরিচিত, প্রায় ঘনিষ্ঠ বলা চলে। তার দিকেও চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না আলিয়োশা। বন্ধুর মনে যে কী হচ্ছে আলিয়োশা অবশ্য তা বুঝতে পারছে। সে-ই একমাত্র লোক যে রাকিতিনের মনোভাব জানে।

মহাস্থবিরকে উদ্দেশ্য করে মিউসভ্ বলল, 'আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এই অপমানজনক ইতর ভাঁড়ামিতে আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমার যেটা ভুল হয়েছিল তাই এই যে আমার বিশ্বাস ছিল আপনার মতো মহৎ ব্যক্তির সামনে এসে অন্তত ফিয়োদর্ পাভ্লভিচের মতো লোকও তার কর্তব্য বোঝার চেষ্টা করবে।...ওর সঙ্গে এসেছি বলে যে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে এটা আমি কখনও ধারণাই করতে পারিনি।....'

পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ এত মুষড়ে পড়েছিল যে কথাগুলো শেষ না করেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল।

'অনুরোধ করছি, বিচলিত হবেন না' মহাস্থবির হঠাৎ তাঁর দুর্বল পায়ে ভর দিয়ে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রাভিচের দুহাত ধরে তাঁকে ফের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'দয়া করে শান্ত হোন। আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, মনে রাখবেন আপনি আমার অতিথি।' মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে মহাস্থবির আবার ফিরে গিয়ে বসলেন তাঁর সোফার আসনটিতে।

'হে মহাপ্রাণ মহাস্থবির, আপনিই বলুন, আমার প্রাণোচ্ছলতা কি আপনার কাছে অপমানজনক মনে হচ্ছে, অ্যাঁ?' বলত বলতে দুহাতে চেয়ারের হাতল চেপে ধরে আচমকা এমন আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল ফিয়োদর্ পাভ্লভিচ্ যে উত্তর সে রকম হলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠার জন্য সে প্রস্তুত।

'না না আপনার প্রতিও আমার একান্ত অনুরোধ—বিচলিত হবেন না, লজ্জা

করবেন না,' গুরুগম্ভীর স্বরে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন মহাস্থবির।... 'লজ্জা করবেন না। মনে করুন এ তো আপনারই ঘর। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজেকে নিজের অত লজ্জা কীসের? ওটাই তো এ সবের মূল।'

'বলছেন, নিজের বাড়ি বলে মনে করব? অর্থাৎ কিনা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করতে বলছেন? না না এটা বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। তা যাক গে, কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করছি। জানেন, মহিমান্বিত প্রভু, আমাকে আমার আসল স্বরূপে প্রকাশিত হতে বলছেন বটে, কিন্তু অমন ঝুঁকি আপনার না নেওয়াই ভালো।...আমিও নিজেও অবশ্য অতদূর যেতে পারব না। আপনাকে রক্ষা করার জন্যেই আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। হুম্। বাদবাকি সব অপরিচয়ের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে, যদিও কিছু কিছু লোক রং ফলিয়ে আমার বর্ণনা দিতে আগ্রহী। এটা আপনাকে লক্ষ করে বলছি, পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্। আর পরম পুণ্যাত্মা আপনাকে আমি বলি প্রভু, আমি আনন্দে আত্মহারা—সেই আনন্দ আমি আর ঢেকে রাখতে পারছি না।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়িয়ে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে ঘোষণা করল: 'ধন্য সেই মাতৃগর্ভ যা থেকে আপনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, ধন্য সেই স্তনবৃন্ত যা স্তন্যদান করে আপনার পুষ্টিসাধন করেছে—হ্যাঁ, বিশেষ করে স্তনবৃন্ত। আপনি এই যে মন্তব্য করলেন: 'নিজেকে নিজের অত লজ্জা কীসের? ওটাই তো এ সবের মূল'—আপনার এই মন্তব্য আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে চলে গেছে, আমার ভেতরের সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দিয়েছে। আমি যখন লোকজনের মাঝখানে আসি তখন ঠিক এই উপলব্ধিটাই কিন্তু আমার হয় যে আমি সকলের চেয়ে নীচ এবং সকলে আমাকে ভাঁড় বলে মনে করে। তাই মনে মনে ভাবি, 'তাহলে আর কী? সত্যি সত্যি ভাঁড়ের ভূমিকায় নামি না কেন? কারও কোনো মতামতের আমি ধার ধারি না, কেন না সব কটা লোকই আমার চেয়ে নীচ, ইতর।' ঠিক এই কারণেই না আমি ভাঁড়! লজ্জাতে আমি ভাঁড়ামি করি মহাপ্রভু, লজ্জাতে। একমাত্র সন্দেহবাতিক বলেই আমি অমন দুর্দান্ত হয়ে পড়ি। আমি যখন লোকসমাজে যাই তখন যদি শুধু এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারতাম যে সকলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মধুর স্বভাবের, পরম বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবে তাহলে ভগবান, কত ভালো লোকই না আমি হতে পারতাম!... গুরুদেব।...' বলতে বলতে সে হঠাৎ নতজানু হয়ে পড়ল। 'কীসে আমার মুক্তি হবে বলুন।' লোকটা কি ভাঁড়ামি করছে নাকি সত্যি সত্যি মনের আবেগ প্রকাশ করছে এবারে কিন্তু তা বলা দুষ্কর।

মহাস্থবির তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার কী করা উচিত আপনি অনেক আগে থেকে জানেন। আপনার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। মাতাল হবেন না, বাক্‌সংযম করুন। লালসা সংযম করুন, বিশেষত টাকা পয়সার লোভ ছাড়ুন। আর হ্যাঁ, আপনার ওই শুঁড়িখানাগুলো বন্ধ করুন—সবগুলো যদি নাও

পারেন, অন্তত দুটো তিনটে বন্ধ করুন। আর বড়ো কথা, সবচেয়ে বড়ো কথা মিথ্যে কথা কখনও বললেন না।

'দিদ্রোর প্রসঙ্গে বলছেন নাকি?'

'না না, দিদ্রো বলে কথা নয়। সর্বোপরি নিজের কাছে নিজে মিথ্যে বলবেন না। যে লোক নিজেই নিজেকে মিথ্যে দিয়ে ভোলায়, নিজের মিথ্যাচারে কর্ণপাত করে তার শেষ পর্যন্ত এমন দশা হয় যে সে না নিজের অন্তরে তার আশেপাশে কোথাও সত্যকে আলাদা করে চিনতে পারে না। ফলে সে যেমন আত্মসম্মানবোধ হারায় তেমনি পরকেও সম্মান করতে পারে না। কারও প্রতি শ্রদ্ধা না থাকায় সে ভালোবাসার ক্ষমতা হারায়। আর প্রেম না থাকায় কিছু নিয়ে ভুলে থাকে এবং নিজের মনকে ভোলানোর উদ্দেশ্যে লালসার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে, স্থূল আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়, তার চরিত্র কলুষিত হয়, সে তখন পশুত্বকে বরণ করে নেয়। এ সবই নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অবিরাম মিথ্যাচারের ফল। যে লোক নিজের কাছে নিজে মিথ্যে কথা বলে তার কথায় কথায় আঁতে ঘা লাগে যে কারও চেয়ে বেশি। আর এই আঁতে ঘা লাগার মধ্যেও অনেক সময় পরম সুখ উপভোগ করা যায়, তাই না? লোকটা বেশ ভালো ভাবেই জানে যে কেউ তাকে অপমান করেনি, অপমানের ব্যাপারটা তার নিজের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত, মিথ্যে রং চড়ান, অতিশয়োক্তির সাহায্যে একটা ছবি তৈরি করার চেষ্টা। আসলে সে তুচ্ছ কোনো একটা কথার সূত্র ধরে তিলকে তাল করছে। সে নিজেও উপলব্ধি করে। আর তারই ফলে শেষ পর্যন্ত শত্রুতার পর্যায়ে চলে যায়।.... আহা উঠে দাঁড়ান, জায়গায় গিয়ে বসুন স্থির হয়ে। একান্ত অনুরোধ করছি আপনাকে। আপনি এখন যা করছেন এসবও কিন্তু মিথ্যে ঢং।....'

'আপনি মহাপুরুষ! দিন, আপনার হাতে চুমু খাই', বলতে বলতে ফিয়োদর্ পাভলভিচ্ লাফিয়ে উঠে দ্রুত সশব্দে চুম্বন করল বৃদ্ধের শীর্ণ হাত। তাঁর শেষ কথায় সায় দিয়েই বরং বলল, 'ঠিক বলেছেন, ঠিক কথা বলেছেন, নিজেকে অপমানিত বোধ করার মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে। এত সুন্দর করে বললেন যা আপনি—এমনি করে কাউকে আমি বলতে শুনিনি। আমার কথা যদি বলেন, যথার্থই আমি সারা জীবন নিজেকে অপমানিত করে সুখ পেয়েছি, সৌন্দর্যের খাতিরে ওই বোধ আমার মনের মধ্যে জেগেছে, যেহেতু অনেক সময়ে নিজেকে অপমানিত মনে করা শুধু সুখের নয়—সুন্দরও বটে। সুন্দর!—এই কথাটা কিন্তু আপনি বলতে ভুলে গেছেন, মহাপ্রাণ মহাস্থবির! এটা আমি নোটবইতে টুকে রেখে দেব। আমি মিথ্যে কথা বলেছি, ডাহা মিথ্যে বলেছি সারাটা জীবন, প্রতিদিন বলেছি, প্রতি ঘণ্টায় বলেছি। যথার্থই আমি মূর্তিমান মিথ্যা, মিথ্যার জনক। উঁহু সম্ভবত মিথ্যার জনক নয়—বয়ানটা একেবারে গুলিয়ে ফেলছি। যাক গে, অন্তত মিথ্যার জাতক বলতে পারেন আমাকে—সেটাই যথেষ্ট হবে। শুধু....হে দেবতুল্য...দিদ্রো প্রসঙ্গটা মাঝে

মাঝে বলা যেতে পারে....কী বলেন? দিদ্‌রোতে কোনো ক্ষতি নেই, তবে হ্যাঁ এমন কিছু কথা আছে যা ক্ষতিকারক। হে মহাপ্রাণ মহাস্থবির, প্রসঙ্গত বলি... প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম...আমি কিন্তু গত দুবছর হল মনে মনে ভাবছিলাম এখানে এসে আপনার পরামর্শ নেব, একবার এসে আপনাকে ধরব, জিগগেস করে নেব। কিন্তু দয়া করে পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচকে বলুন। আমার কথায় যেন বাধা না দেন। হ্যাঁ, যা জিগগেস করতে চাইছিলাম: আচ্ছা মহাপ্রভু, এটা কি সত্য যে প্রাচীন সন্ত চরিতাবলী না কোথায় নাকি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনো এক সাধুপুরুষের কথা আছে, যিনি ধর্মের জন্য বিধর্মীদের হাতে প্রাণ বলি দিয়েছিলেন—শেষকালে গলা কেটে ফেলার পর তিনি নাকি সোজা দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুণ্ডটাকে হাতে তুলে নিয়ে পরম স্নেহভরে চুম্বন করেন এবং পরম স্নেহভরে চুম্বন করতে করতেই সেটা হাতে নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন? প্রভু, আপনারা পূজনীয় ব্যক্তি, আপনারাই বলুন, এ কাহিনি কি সত্য নয়?'

'না, সত্য নয়', মহাস্থবির বললেন।

'কোনও সন্ত চরিতাবলীতে কোথাও এ ধরনের কোনও কাহিনি নেই। কোন্ মহাপুরুষ সম্পর্কে এমন কথা লেখা আছে আপনি বলছেন?' গ্রন্থাগারিক সাধুটি জিগগেস করলেন।

'কোন্ মহাপুরুষ তা আমি জানি নে। জানি নে, বলতেও পারছি না। আমাকে এই সব ভুলভাল বলে ঠকিয়েছে তাহলে। যা শুনেছি তাই বলছি। ও হ্যাঁ কে বলেছিল জানেন? এই যে পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ মিউসভ, যিনি দিদ্‌রোর কথা বলতে এই মাত্র খেপে গিয়েছিলেন, উনিই বলেছেন।'

'কস্মিন কালে এ গল্প আমি আপনাকে বলিনি। আপনার সঙ্গে আমি কথাই বলি নে কখনও।'

'ঠিক বটে, আপনি আমাকে বলেননি, তবে কিনা ভায়া, একটা আড্ডায় বলেছিলেন—সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিন বছর আগেকার কথা। আমি এই কারণেই উল্লেখ করলাম যে তখন এই গাঁজাখুরি গল্প বলে আপনি আমার ধর্মবিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ। আপনি জানতেন না, আপনি অবগত নন, অথচ আমি আমার ধর্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে সে দিন বাড়ি ফিরে আসি, তার পর থেকে সে ফাটল দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। হ্যাঁ, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ, কোনও দিদ্‌রো নয়, আপনিই ছিলেন অত বড়ো পতনের কারণ!'

ফিয়োদর পাভলভিচের উত্তেজনার মধ্যে ব্যাকুল ও করুণ ভাব ফুটে উঠল, যদিও উপস্থিত কারো বুঝতে বাকি রইল না যে সে আবার ভাঁড়ামি শুরু করেছে। তবু নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল মিউসভ।

'বাজে কথা! যত সব বাজে কথা', বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে। 'হয়তো

বলেছি, কোনো এক সময় সত্যি সত্যি বলেছি...তবে আপনাকে বলিনি। আমি নিজেই হয়তো শুনেছি অন্যের মুখে। শুনেছি প্যারিসে থাকতে। এক ফরাসি ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমাদের দেশে গির্জার প্রার্থনা সভায় 'সন্ত চরিতাবলী' থেকে নাকি এটা পড়ে শোনা হয়।....উনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, রাশিয়ার স্ট্যাটিকটিকসের ওপর বিশেষ ভাবে পড়াশুনা করেছেন, বহুকাল রাশিয়াতে ছিলেনও।...আমি নিজে সন্ত চরিতাবলী পড়িনি... পড়ার ইচ্ছেও নেই। ভোজসভায় লোকে কত আবোল তাবোলই না বকে।...আমরা তখন খানাপিনা করছিলাম।....'

'বাঃ বাঃ, চমৎকার! আপনি তখন খানাপিনা করছিলেন, ওদিকে আমি আমার ধর্মবিশ্বাসটি হারালাম যে!' ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ ভেংচি কেটে বলল।

'আপনার ধর্মবিশ্বাসের আমি থোড়াই ধার ধারি।' মিউসভ্ খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আত্মসংবরণ করে অবজ্ঞাভরে বলল, 'আপনি যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই কলুষিত করে ছাড়েন।'

মহাস্থবির হঠাৎ, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অতিথিদের সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়রা আমাকে ক্ষমা করবেন, আপাতত মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আমি আপনাদের এখানে রেখে যাচ্ছি। বাইরে আরও কয়েকজন আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁরা আপনাদের আগে এসেছেন।' তারপর ফিয়োদর পাভ্লভিচের দিকে ফিরে স্মিতমুখে তিনি বললেন, 'আপনি কিন্তু তাই বলে মিথ্যে কথা বলবেন না, কেমন?'

তিনি প্রকোষ্ঠ ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। আলিয়োশা আর শিক্ষার্থীটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে তাঁকে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। আলিয়োশা হাঁপিয়ে উঠেছিল। পালাতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। তবে মহাস্থবির যে ক্ষুণ্ণ হননি এবং তিনি যে খুশি মনে আছেন তা দেখে ওর আনন্দ হল। তিনি দরদালানের দিকে চললেন—যেখানে দর্শনার্থীরা তাঁর আশীর্বাদ লাভের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু ফিয়োদর পাভলভিচ নাছোড়বান্দার মতো দরজার সামনে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'আরও একবার আপনার করচুম্বনের অনুমতি দিন, মহাত্মা! না, আপনি এমন একজন মানুষ যার সঙ্গে কথা বলা যায়, ওঠা বসা করা যায়। আপনি ভাবছেন আমি সব সময় অমন ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলি আর ভাঁড়ামি করি? জেনে রাখবেন, আমি এতক্ষণ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, ইচ্ছে করে, আপনাকে যাচাই করে দেখার জন্য অভিনয় করে গেছি। এতক্ষণ আমি আপনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি, বুঝতে চেয়েছি আপনার সঙ্গে ওঠা বসা করা যায় কিনা, আপনার যে অহমিকা আছে তার পাশাপাশি আমার বিনয়ের স্থান হতে পারে কিনা। আপনাকে প্রশংসাপত্র দিতে পারি: আপনার সঙ্গে ওঠা বসা করা যায়। আচ্ছা এবারে চুপ করে থাকব, এখন থেকে আর একটি কথাও বলব না।

এই আমি চুপ করে বসে রইলাম। চেয়ারে। এবারে কথা বলার পালা আপনার, পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রাভিচ্। মুখ্য ব্যক্তি বলতে এখন আপনিই রইলেন.... দশ মিনিটের জন্য কিন্তু...।'

## তিন

## ধর্মবিশ্বাসী চাষি মেয়েরা

নীচের তলায় মঠের সীমানার দেয়াল ঘেঁষে বাইরে তৈরি কাঠের দরদালানের কাছে এবারে কেবল মহিলাদের ভিড়—চাষি পরিবারের জনা বিশেক মেয়েমানুষ। তাদের কাছে খবর এসেছে যে মহাস্থবির অবশেষে দর্শন দিচ্ছেন। তারা তাই আশায় আশায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। খখ্‌লাকোভা নামে সেই জমিদার মহিলাটিও তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে দরদালানে। তারাও মহাস্থবিরের দর্শনার্থী। তাদের থাকার ব্যবস্থা অবশ্য ছিল আলাদা—অভিজাত মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক ঘরে। ওরা দুজন—মা আর মেয়ে। মা শ্রীমতী খখ্‌লাকোভা বিত্তশালিনী মহিলা। এখনও রীতিমতো যুবতী। চেহারা বেশ আকর্ষণীয়, পোশাক পরিচ্ছদ রুচিসম্মত। দেখতে সামান্য ফ্যাকাশে। চোখ দুটি প্রায় সম্পূর্ণ কালো, প্রাণচঞ্চল। বয়স তেত্রিশের বেশি হবে না, কিন্তু স্বামীকে হারিয়েছেন আজ বছর পাঁচেক হল। তাঁর মেয়েটির বয়স চৌদ্দ। আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগছে, দুটি পা-ই পঙ্গু। বেচারি মেয়েটি গত ছয় মাস হল চলৎশক্তিরহিত, চাকাওয়ালা আরাম কেদারায় বসিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় তাকে। মিষ্টি মুখখানা, অসুস্থতার দরুন রোগাটে, তবে হাসিখুশি। আঁখি পল্লবের দিঘল ঝালর ঘেরা ডাগর কালো চোখ দুটি তার দুষ্টুমি মাখানো। বসন্তকাল থেকেই তার মার ইচ্ছে ছিল তাকে বিদেশে নিয়ে যায়, কিন্তু জমিদারি সংক্রান্ত কয়েকটা ব্যবস্থার জন্য দেরি হয়ে গেল—সারাটা গ্রীষ্মকাল কেটে গেল। গত এক সপ্তাহ হল আমাদের শহরে আছে। এসেছে আসলে কাজে—ঠিক ভক্তি নিবেদনের উদ্দেশ্যে নয়। তিন দিন আগেও একবার এসে মহাস্থবিরের সঙ্গে দেখা করে গেছে। মাঝেও হঠাৎ আবার এসেছে। যদিও জানে যে মহাস্থবির ইদানীং প্রায় কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন না, তবু অলৌকিক আরোগ্য ক্ষমতার অধিকারী মহাপুরুষটির দর্শন লাভ করে আরও একবার নয়ন সার্থক করার সুযোগ আদায়ের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে।

মহাস্থবিরের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় মা তার মেয়ের চাকাওয়ালা আরাম কেদারার পাশে একটি চেয়ারে বসে ছিল। তাঁর দুই পা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। এখানকার কোনো মঠের লোক নন, এসেছেন দূর উত্তরাঞ্চলের অখ্যাতপ্রায় এক আশ্রম থেকে। মহাস্থবিরের আশীর্বাদপ্রার্থী। কিন্তু মহাস্থবির দরদালানে দর্শন দিয়ে প্রথমেই সোজা গেলেন জনতার কাছে। মঠ থেকে যে তিনটি ধাপ নীচু দরদালানের

দিকে চলে গেছে ওরা সকলে ভিড় করে তার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিল। মহাস্থবিরকে দেখে মেয়েরা ঠেলাঠেলি করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল। মহাস্থবির সন্ন্যাসীর আঙরাখাটা গায়ে চাপিয়ে ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে তাদের সকলকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। এক উন্মাদিনী নারীকে দুহাত ধরে টানতে টানতে তাঁর সামনে আনা হল। তাঁকে দেখামাত্রই হঠাৎ কেমন যেন অদ্ভুত রকম তীক্ষ্ণ চিৎকার আর হিক্কা তোলা শুরু করে দিল, প্রসব বেদনার মতো অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। মহাস্থবির তাঁর আঙরাখার আঁচলে মেয়েটির মাথা ঢেকে দিয়ে সংক্ষেপে প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির হয়ে গেল, শান্ত হল। আজকালকার কথা বলতে পারছি না, কিন্তু আমাদের ছোটোবেলায় পাড়াগাঁয়ে মঠে আশ্রমে এ ধরনের উম্মদিনীর কথা অনেক শুনেছি, তাদের দেখেছিও। গির্জায় সকালের উপাসনার সময় লোকে তাদের নিয়ে আসত। হাউমাউ চিৎকার করে, কুকুরের মতো ডাক ছেড়ে তারা গির্জা মাথায় করত। কিন্তু যখন পূজার নৈবেদ্য নিয়ে আসা হত এবং নৈবেদ্যের কাছাকাছি ওদের আনা হত, সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভূত ছেড়ে যেত; রোগগ্রস্তরা কিছু সময়ের মতো ঠিক শান্ত হয়ে যেত। আমি তখন বাচ্চা ছেলে। এই দেখে আমার ভারি অবাক লাগত, আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। কিন্তু তখনই আমার প্রশ্নের উত্তরে কোনো কোনো জমিদার, বিশেষত আমার শহুরে শিক্ষাগুরুদের মুখে আমি শুনতে পাই যে ওসব আসলে ভান, কাজ না করার অছিলা, উপযুক্ত শাসন করলেই ভূত ছাড়ে। এই বক্তব্যের পক্ষে অনেক মজার মজার গল্পও তাঁরা বলে বেড়াতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনে অবাক হয়ে গেছি যে এর মধ্যে কপটতার কিছু নেই—আসলে এ হল একটা ভয়ঙ্কর ধরনের মেয়েলি রোগ, সম্ভবত আমাদের এই রুশদেশেই মূলত দেখা যায়, আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের ভাগ্য যে কতদূর কঠিন হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এর কারণ চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই সম্পূর্ণ অবৈতনিক অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তান প্রসব এবং প্রসবের অব্যবহিত পর থেকে তাদের হাড়মাস খাটুনি, তাছাড়া আছে সংসারিক জীবনের চরম দুঃখদুর্দশা, পুরুষের হাতে নিত্য শারীরিক পীড়ন ও প্রহার যা সাধারণের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও কোনো নারী একেবারে সহ্য করতে পারে না। এলোপাতাড়ি হাত ছুঁড়তে থাকা অবস্থায় ভূতে পাওয়া মেয়েদের যে পূজার নৈবেদ্যের সামনে হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে তারা আরোগ্য লাভ করছে এই অদ্ভুত ঘটনাটিকে ওঁরা এই বলে আমাকে ব্যাখ্যা করতেন যে সেটাও একটা ধোঁকাবাজি, পরন্তু বলতে গেলে পুরোহিত সম্প্রদায়ের খাটানো এক ধরনের ভেলকি। এটাও সম্ভবত খুবই স্বাভাবিক কারণে: রোগীকে যারা পূজার নৈবেদ্যের সামনে নিয়ে আসত, তারা এবং রোগী নিজেও প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত যে রোগীর ওপর যে-ভূত ভর করেছে রোগীকে পূজার নৈবেদ্যের কাছে এনে তার সামনে জোর করে মাথা নুইয়ে দিতে পারলে সে আর তা সহ্য করতে পারবে না। এই কারণে

সব সময় যা ঘটত এবং না ঘটে পারতও না, তা এই যে পূজার নৈবেদ্যের সামনে মাথা নত করার মুহূর্তে স্নায়বিক দৌর্বল্যযুক্ত এবং বলাই বাহুল্য মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি সারা শরীরে এক ধরনের কাঁপুনি উপলব্ধি করত। এর পেছনে প্রত্যাশা থাকত যে অলৌকিক শক্তির বলে অতি অবশ্য রোগমুক্তি ঘটবে, থাকত এই পূর্ণ বিশ্বাস যে তা না ঘটে যায় না। আর তা ঘটতও—যদিও মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য। তখন ঠিক তা-ই ঘটল—মহাস্থবির তাঁর আঙরাখা দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটিকে স্পর্শ করতে না করতে।

যেসব স্ত্রীলোক তাঁর কাছাকাছি ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে অনেকে মুহূর্তের ওই দৃশ্য দেখে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগল। কেউ কেউ অন্তত যদি তাঁর পোশাকের আঁচলও চুম্বন করা যায়, এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল। কেউ বা আবার ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে কী সব বলতে লাগল। তিনি ওদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন, কারও কারও সঙ্গে কথাও বললেন। এই উন্মাদিনীকে তিনি আগে থাকতে জানতেন, মঠ থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরের এক গ্রাম থেকে আনা হয়েছে, এর আগেও আনা হয়েছিল তাঁর কাছে।

'এই যে, এই একজন অনেক দূরের।' আরেকজন স্ত্রীলোককে দেখিয়ে তিনি বললেন। বয়সের অনুপাতে জীর্ণ শীর্ণ তার শরীর, মুখ ঠিক রোদে পোড়া নয়, সারা মুখ যেন কালিমায় ছেয়ে গেছে। নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল মহাস্থবিরের দিকে। কেমন একটা উন্মত্ত আচ্ছন্ন ভাব তার দৃষ্টিতে।

'অনেক দূর থেকে বাবা, অনেক দূর থেকে। এখান থেকে একশো কোশ। অনেক দূর থেকে প্রভু, অনেক দূর থেকে,' করতলে চিবুক ঠেকিয়ে মন্থরগতিতে মাথা দোলাতে দোলাতে সুরেলা গলায় স্ত্রীলোকটি বলে উঠল। বিলাপ ঝরে পড়ছিল তার কণ্ঠে। লোকসমাজে এমন শোক আছে যার কোনো ভাষা থাকে না। সে শোক সহ্য করতে হলে অপরিসীম ধৈর্যের দরকার হয়। বেদনার ক্ষত তখন নীরবে বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। আবার এমন শোকও আছে যা সহ্যের বাইরে—তখন দুঃখের প্রকাশ ঘটে অশ্রুবন্যায়, বিলাপে, আর্তনাদে। বিশেষত এটা ঘটে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এ শোকও নীরব শোকের চেয়ে কোনো অংশে কম হালকা নয়। বিলাপ শুধুমাত্র মানুষের মনের ক্ষত ও জ্বালাযন্ত্রণা আরও বেশি বাড়িয়ে তুলে তাকে স্বস্তি দেয়। এধরনের শোকে কোনো সান্ত্বনা কাম্যও নয়। গভীর নৈরাজ্য ও অতৃপ্তির উপলব্ধি তাকে জিইয়ে রাখে। বিলাপ—সে শুধু কাটাঘায়ে নতুন করে জ্বালা ধরিয়ে দেবার তাগিদ মাত্র।

কৌতূহলভরে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে মহাস্থবির বললেন, 'তুমি তো বাপু শহুরে মধ্যবিত্ত মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, বাবা শহুরে, আমরা শহুরে। আমরা আসলে চাষি গেরস্থ। তবে শহরে থাকি, তাই শহুরেই বলতে পার। তোমাকে দেখতে এসেছি প্রভু। তোমার কথা

অনেক শুনেছি, বাবা। আমার বাচ্চা ছেলেটাকে মাটি দিয়ে ধর্মস্থানে গেলাম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে। তিনটে মঠে ঘুরলাম। যে মঠেই যাই তারা বলে, 'যাও নাস্তিয়া, ওখানে যাও'—মানে, তোমার কাছে আসতে বলে, বাবা। গতকাল এসেছি, গির্জায় গিয়েছিলাম। আজ তোমার কাছে এলাম।'

'কাঁদছ কেন মা?'

'ছেলের দুঃখে, বাবা। তিন বছর বয়স হয়েছিল—আর মাত্র তিন মাস গেলেই তিন বছর পূর্ণ হত। ছেলেটার জন্যে মনে বড়ো যন্ত্রণা পাচ্ছি প্রভু, বড়ো যন্ত্রণা। ওই আমার শেষ সন্তান হল। চারটে ছেলে হয়েছিল আমাদের। একটাও রইল না। টেকে না প্রভু, টেকে না। প্রথম তিনটে যখন গেল তখনও এত দুঃখ পাইনি, কিন্তু এই শেষটার বেলায় এত দুঃখ হচ্ছে বাবা, যে ভুলতে পারছি নে। এখনও মনে হচ্ছে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুহূর্তের জন্যেও আমার কাছছাড়া হচ্ছে না। আমার বুকের ভেতরটা ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলে গেল গো! ওর জামা কাপড়, ওর জুতো আমি চোখের সামনে দেখি আর ডুকরে কাঁদি। ওর সব জিনিস আমি সামনে সাজিয়ে রেখে চেয়ে চেয়ে দেখি আর ডাক ছেড়ে কাঁদি। আমি আমার স্বামী নিকিতাকে বললাম, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও গো কত্তা, আমি তীর্থ করতে যাব। আমার স্বামী ঘোড়ার গাড়ি চালায়। আমরা গরিব নই প্রভু, গরিব আমরা নই। আমরা আমাদের নিজেদের ঘোড়ার গাড়ি চালাই। গাড়ি ঘোড়া—সবই আমাদের নিজেদের। কিন্তু কী হবে এখন আমাদের ওসব দিয়ে? আমি না থাকায় স্বামী আমার মদ ধরেছে। নির্ঘাত তাই। আগেও তাই হত—যেই আমি চোখের আড়াল হলাম অমনি দুর্বলতা ওকে পেয়ে বসল। কিন্তু এখন আমি ওর কথা আর ভাবি নে। আজ তিন মাস হতে চলল আমি ঘরছাড়া। আমি ভুলে গেছি, সব কিছু ভুলে গেছি। মনে করতে চাইও না। এখন আর আমাদের একসঙ্গে থাকার কী অর্থ হয়? ওর সঙ্গে সব পালা চুকিয়ে দিয়েছি, একেবারে চুকিয়ে দিয়েছি। এই সব ঘরবাড়ি, বিষয় আশায় আমার এখন আর মায়া নেই—ও আমি দেখতেও চাই নে।'

'তোমাকে একটা কথা বলি, মা,' মহাস্থবির বললেন। 'সে অনেক কাল আগেকার কথা, প্রাচীনকালের ঘটনা: একবার এক মহাপুরুষ তোমারই মতো এক সন্তানহারা জননীর দেখা পান এক মন্দিরে। ঈশ্বর তার শিশুপুত্রটিকে, তার একমাত্র সন্তানকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন, তাই সেও তোমার মতো কাঁদছিল শোকে আকুল হয়ে। মহাপুরুষ তাকে বললেন, 'ওই কচি বাচ্চারা, যাদের দুদিন না যেতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়, তারা ঈশ্বরের আসনের সামনে কী রকম সাহস নিয়ে দাঁড়ায় তুই কি জানিস? ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে তাদের চেয়ে বেশি স্পর্ধা আর কে ধরে? ঈশ্বরের মুখের ওপর তারা বলে, 'প্রভু তুমি আমাদের জীবন দিয়েছিলে, কিন্তু পৃথিবীর আলো ভালো করে দেখার সুযোগ না দিয়ে তার আগে আমাদের ফিরিয়েই বা আনলে কেন?' তারা এত সাহস করে বার বার এই অনুরোধ করতে থাকে যে

ঈশ্বর তাদের বুঝতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবদূত করে দেন।' মহাপুরুষ বললেন, 'তাই বলি কি, হে নারী, শোক কোরো না, আনন্দ কর। তোমার সন্তান আজ স্বর্গে দেবদূতদের মধ্যে আসন পেয়েছে।' সেই প্রাচীন মহাপুরুষ এই কথাই বলেছিলেন সন্তানহারা জননীকে কাঁদতে দেখে। তিনি মহাপুরুষ, তাঁর কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তাই তুমিও জেনে রাখ মা, তোমার শিশু নিশ্চয় এখন ঈশ্বরের আসনের সামনে স্থান পেয়েছে, সে বড়ো সুখে আছে, আনন্দে আছে, তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। তাই তুমি চোখের জল ফেল, কিন্তু আনন্দ কর।'

স্ত্রীলোকটি চিবুকে হাত ঠেকিয়ে মাটিতে চোখ নামিয়ে তাঁর কথা শুনল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার স্বামী নিকিতাও ওই কথা বলেই আমাকে প্রবোধ দেয়। ও বলে, কাঁদ কেন? তুমি বড়ো অবুঝ। আমাদের ছেলেটা হয়তো এতক্ষণে প্রভুর সামনে তাঁর দেবদূতদের সঙ্গে মিলে স্বর্গরাজ্যের মহিমা কীর্তন করছে।' একথা বলে বটে, কিন্তু আমি তো দেখি, বলতে বলতে নিজেও কাঁদতে থাকে আমারই মতো। আমি বলি, 'জানি গো, জানি, ভগবানের কোলে ছাড়া আর কোথায়ই বা থাকবে? কিন্তু এখানে, আমাদের কাছে, আগেকার মতো আমার কোল জুড়ে তো আর রইল না!' আহা, অন্তত একবারটি যদি ওকে চোখের দেখা দেখতে পেতাম। শুধু একটি বারের চোখের দেখা!—আমি কাছে যেতাম না, দূর থেকেই না হয় দেখতাম। একটি কথাও বলতাম না, এক কোনায় লুকিয়ে থেকে ক্ষণেকের জন্য ওকে যদি ওকে দেখতে পেতাম, শুনতে পেতাম উঠোনে ওর দাপাদাপি করে খেলার আওয়াজ, ওর সেই কচি গলার ডাক: 'মা, তুমি কোথায়?' শুধু যদি শুনতে পেতাম ওর ছোটো ছোটো পায়ে ঘরের মধ্যে হাঁটাচলার আওয়াজ, শুধু একবার সেই টুক টুক পায়ের শব্দ। মনে পড়ছে, বড্ড বেশি মনে পড়ছে, কেমন চেঁচাতে চেঁচাতে হাসতে হাসতে ছুটে আসত আমার কাছে। একবার ওই পায়ের শব্দও যদি শুনতে পেতাম—শুনলে ঠিক চিনতে পারতাম। কিন্তু হায়, প্রভু, ও নেই, ওর মুখের কথা আর শুনতে পাব না—কখনও পাব না! এই যে ওর কোমরের ছোট্ট ঘুনসিটা, কিন্তু ও তো নেই, ওকে আর কখনও দেখতে পাব না, শুনতেও পাব না।....

বলতে বলতে সে বুকের মধ্যে থেকে তার খোকার কোমরে বাঁধার কারুকাজ করা একটা ছোট্ট ফিতে বের করল, সেদিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে লাগল। তার দুহাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে প্রবল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

মহাস্থবির বললেন, 'এ ত সন্তানের জন্য প্রাচীনের সেই জননী রাখিলের কান্না।[২২] এ শোক প্রবোধ মানে না। তাই এর কোনো সান্ত্বনা নেই। তোমরা মা জননী, পৃথিবীতে এটাই তোমাদের ভাগ্য। সান্ত্বনা খুঁজতে যেও না, সান্ত্বনার দরকারও নেই তোমার। প্রবোধ মানার চেষ্টা না করে তুমি কাঁদ, তবে যখন কাঁদবে তখনই মনে রাখবে, অবশ্যই মনে রাখবে তোমার পুত্রটি স্বর্গের দেবদূতদের একজন—

স্বর্গ থেকে তোমাকে দেখছে, তোমার প্রতিবারের কান্না দেখতে পাচ্ছে, দেখে আনন্দ উপভোগ করছে, ভগবানকেও দেখাচ্ছে। তোমার এই বিশাল মাতৃহৃদয়ের শোক আরও দীর্ঘকাল থাকবে, কিন্তু অবশেষে তা পরিণত হবে নীরব আনন্দে—তখন তোমার তিক্ত অশ্রু স্নিগ্ধ কোমল আবেগের রূপ নেবে, তোমার মনের সমস্ত কলুষতা মার্জনা করবে, তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবে। তোমার মৃত শিশুর আত্মার শান্তির জন্য আমি প্রার্থনা করব মা। কী নাম ছিল তার?'

'আলেক্সেই প্রভু!'

'বড়ো সুন্দর নাম। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ আলেক্সেইয়ের নামে বুঝি?

'হ্যাঁ প্রভু, তাই। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ আলেক্সেইয়ের নামে।'

'আহা, বড়ো পুণ্যাত্মা ছিলেন। আমার প্রার্থনায় আমি তোমার মৃত শিশুকে স্মরণ করব, তোমার শোকের কথাও স্মরণ করব মা। তোমার স্বামীর মঙ্গলের জন্যও প্রার্থনা করব। ওকে পরিত্যাগ করে বড়ো অন্যায় করেছ কিন্তু বাপু তুমি। ফিরে যাও ওর কাছে, ওকে আগলে রাখ। স্বর্গ থেকে তোমার ছেলে দেখছে তার বাপকে তুমি ছেড়ে গেছ, এতে সে দুঃখই পাচ্ছে। তোমার ছেলেকে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত করছ কেন তুমি? আছে সে বেঁচে আছে, কেন না আত্মা অবিনশ্বর। ঘরে সে বসে নেই বটে, কিন্তু তার অশরীরী আত্মা তোমার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী করে সে ঘরে আসবে বল, যখন তুমি বলছ যে বাড়িঘরে তোমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে? ঘরে তোমাদেরই যদি না পায়, মা-বাবাকে যদি না পায়, তাহলে কার কাছেই বা আসবে? এই যে তুমি ওকে স্বপ্নে দেখছ, দেখে কষ্ট পাচ্ছ, ঘরে ফিরে গেলে কিন্তু দেখবে ও তোমাকে বড়ো মধুর স্বপ্ন পাঠাবে। যাও মা, তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও, আর দেরি না করে আজই যাও।'

'যাব বাবা, তোমার কথাতে যাব বৈকি। আমার মনটাকে ঠিক বুঝে ফেলেছ তুমি। ওগো, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছ, আমার অপেক্ষায় বসে আছ।' স্ত্রীলোকটি বিলাপ শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু মহাস্থবির ততক্ষণে তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেছেন অতি বৃদ্ধ এক মহিলার কাছে। বৃদ্ধার পোশাক শহুরে, গ্রাম্য তীর্থযাত্রিণীর মতো নয়। তার চোখের দৃষ্টিতেই প্রকাশ কোনো একটা কাজে সে এসেছে, কোনো একটা বিশেষ কথা সে বলতে চায়। বৃদ্ধা জানাল সে একজন সামরিক কর্মচারীর বিধবা। বেশি দূর থেকে সে আসেনি, আমাদের এই শহরেই থাকে। তার ছেলে ভাসিলি সাইবেরিয়ার ইর্কুৎস্ক শহরে গেছে, সেখানে কমিসারিয়েটে কাজ করে। দুবার চিঠি লিখেছিল ওখান থেকে। আজ এক বছর হতে চলল আর কোনো চিঠিপত্র নেই। ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কি, কোথায় খোঁজখবর নেবে তা জানা নেই।

'এই সেদিন আমাদের পাড়ার এক বড়োমানুষ বেনের বৌ স্তেপানিদা বেদ্রিয়াগিনা আমায় কী বুদ্ধি দিলে জান বাবা? বললে, তোমার ছেলে মরে গেছে এমনি ছল

করে গির্জাতে গিয়ে উপাসনার সময় তার সদগতি প্রার্থনার জন্য নাম লেখাও, তার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা কর। দেখো ঠিক তার মনে গিয়ে বাজবে, তোমাকে ঠিক চিঠি লিখবে সে। সে বললে, এতে কাজ হবেই, এটা নাকি বহুবার পরীক্ষা করে দেখা। আমার কিন্তু সন্দেহ হল। তুমি আমাদের অন্ধকারের আলো, তুমিই বল বাবা, এটা কি সত্যি? অমন কাজ করা কি ঠিক হবে?'

'ও কথা মনেও এনো না মা। এমনকি জিগগেস করাটাও লজ্জার। জীবিত লোকের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা। তাছাড়া গর্ভধারিণী মা হয়ে তুমি করবে এই কাজ। এ যে মহাপাতক হবে! এ তো ডাইনিদের তুকতাক করার সামিল। কেবল তোমার অজ্ঞতার জন্যই তোমাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। আমাদের যিনি চিরকালের সহায়, যিনি আমাদের পরিত্রাণের উপায়, বরং তাঁর কাছে প্রার্থনা কর যাতে তোমার ছেলে সুস্থ থাকে এবং তোমাকেও তিনি ক্ষমা করেন তোমার বুদ্ধিভ্রংশের জন্য। তোমাকে যা বলি শোন বাছাঃ তোমার ছেলে শিগগিরই তোমার কাছে ফিরে আসবে, নয়ত দেখবে ঠিক তোমাকে চিঠি লিখবে। যাও, এখন থেকে মন শান্ত কর। আমি বলছি তোমাকে, তোমার ছেলে বেঁচে আছে।'

'তোমার অসীম কৃপা বাবা। তুমি আমাদের মঙ্গলদাতা, আমাদের সকলের জন্য, আমাদের পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা কর তুমি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।...

ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে মহাস্থবিরের নজরে পড়ল দুটি জ্বালাধরা চোখের স্থির দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করছে। চাষির মেয়ে, এখনও যুবতি, তবে ক্ষয় রোগীর মতো ক্লান্ত চেহারা। তার নীরব দৃষ্টিতে কীসের যেন অনুনয়, কিন্তু মহাস্থবিরের সামনে যেতে যেন তার ভয়।

'কী হয়েছে তোমার, মা?'

নতজানু হয়ে মহাস্থবিরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, ধীরে সুস্থে মৃদু গলায় মেয়েটি বলল, আমার প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে হবে, বলে দাও, প্রভু। আমি পাপ করছি বাবা, আমার সেই পাপের ভয়ে আমি মরছি।'

নীচের সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লেন মহাস্থবির। স্ত্রীলোকটি নতজানু অবস্থাতেই তাঁর আরও কাছে এগিয়ে এলো।

'দুবছরেরও ওপরে আমি বিধবা, হয়েছি' অর্ধস্ফুট স্বরে বলতে শুরু করে হঠাৎই যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠল তার দেহ। 'বড়ো যন্ত্রণার ছিল আমার বিবাহিত জীবন। বুড়ো বর ভীষণ মারত আমাকে। সে যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইল তখন তাকে দেখে ভাবলাম, রোগ সারলেই আবার উঠে দাঁড়াবে, তখন আমার কী অবস্থা হবে? ঠিক তখনই আমার মাথায় এই চিন্তা এলো...'

'দাঁড়াও', এই বলে মহাস্থবির তাঁর কান যুবতির মুখের কাছে বাড়িয়ে দিলেন। এবারে সে এত নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে তার কাহিনি বলতে শুরু করল যে প্রায় কিছুই ধরা গেল না। কথা শেষ হতে বেশি সময় লাগল না।

'দু বছরেরও ওপর বলছ?' মহাস্থবির জিগগেস করলেন।

'হ্যাঁ বাবা, তা হবে। প্রথমটা ভাবতামই না। এখন ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছি, বিষণ্ণতায় ভুগছি।'

'কত দূর থেকে আসছ?'

'তা এখান থেকে দেড়শ ক্রোশ মতো হবে।'

'এ পাপ কি তুমি কখনও কোনো ধর্মযাজকের কাছে স্বীকার করেছ?'

'করেছি, দুবার করেছি।'

'অনুতাপ করার পর প্রসাদের ছোঁয়া পেয়েছিলে তো?'

'তা পেয়েছিলাম প্রভু। কিন্তু এখনও আমার ভয় করে। মরতে ভয় করে।'

'ভয় কোরো না। ভয় কীসের? তোমার সমস্ত ভয়, সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর কর। শুধু জানবে, তোমার অনুতাপে যদি কোনো কুণ্ঠা না থাকে, তাহলে ঈশ্বর তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন। তাছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো পাপ নেই, এমন কোনো পাপ থাকতেই পারে না, কেউ প্রকৃত অনুতাপ করলে যে পাপ ঈশ্বর মার্জনা করেন না। এত বড়ো কোন্ পাপ মানুষ করতে পারে বল তো, যা ঈশ্বরের অপার করুণাকেও নিঃশেষ করে দিতে পারে? এমন কোনো পাপ থাকতে পারে কি যা ঈশ্বরের ভালোবাসাকেও ছাড়িয়ে যায়? শুধু অনুতাপের দিকে মনোযোগ দাও, প্রতি মুহূর্তে অনুতাপ কর, মন থেকে সমস্ত রকম ভয় দূর কর। এই বিশ্বাস মনে রেখো যে ঈশ্বর তোমাকে এত ভালোবাসেন যে তুমি তা কল্পনায়ও আনতে পারবে না— সে তোমার যতই পাপ থাকুক না কেন, যত পাপেই তুমি ডুবে থাক না কেন। শাস্ত্রে একথা তো কবেই বলা হয়েছে যে একজন অনুতপ্ত পাপীর জন্য স্বর্গে যা আনন্দ, দশজন পুণ্যাত্মার জন্যও তা হয় না। যাও, ভয় কোরো না। কারও প্রতি কোনও ক্ষোভ মনে রেখো না, কেউ অপমান করলে তার ওপর রাগ কোরো না। তোমার মৃত স্বামীর অত্যাচারের কথা ভেবে বিন্দুমাত্র গ্লানি রেখো না মনে। তার সঙ্গে প্রকৃত শান্তির সম্পর্ক হোক তোমার। অনুতাপ যখন করছ, তখন ভালোও বাস। আর ভালো যদি বাস তো ঈশ্বরও তোমাকে ভালোবাসবেন। প্রেম এমনই জিনিস যে তাতে সব পাপ ঘুচে যায়, সবাই উদ্ধার পায়। তোমারই মতো একজন পাপী মানুষ হয়ে আমিও যদি তোমার প্রতি করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ি তাহলে ঈশ্বর তো আরও অনেক বেশি হবেন। প্রেম এমন এক অমূল্য সম্পদ যে তা দিয়ে সমস্ত পৃথিবী জয় করা যায় এবং শুধু নিজের কেন অন্যের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। যাও ভয় কোরো না।'

তার ওপর তিনবার ক্রুশচিহ্নের সঙ্কেত করে তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন, তারপর নিজের গলা থেকে একটা ছোট্ট আইকন খুলে তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। স্ত্রীলোকটি নীরবে আভূমি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। মহাস্থবির উঠে দাঁড়ালেন। খুশি হয়ে চোখ তুলে তাকাতেই এবারে তার নজর পড়ল এক কৃষাণ বধূর ওপর। স্বাস্থ্যবতী. কোলে তার দুধের শিশু।

'ভিশেগোরিয়ে থেকে আসছি, বাবা।'

'সে তো এখান থেকে দু ক্রোশের পথ। অতটা পথ কষ্ট করে বাচ্চাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ? কী চাই তোমার?'

'তোমাকে একবার দেখতে এলাম। আমি কিন্তু আগেও তোমার কাছে এসেছিলাম। আমাকে মনে নেই তোমার? আমায় যদি ভুলে গিয়ে থাক তাহলে বলব তোমার স্মরণশক্তি তেমন ভালো নয়। আমাদের ওখানে লোক মুখে শুনলাম তোমার নাকি খুব অসুখ, তাই ভাবলাম, যাই, নিজের চোখে একবার দেখ আসি। এখন দেখছি, কোথায় অসুখ? আরও বিশ বছর বাঁচবে, ভগবানের আশীর্বাদে। সত্যি বলছি। তোমার অসুখ করবে কী করে? কত লোক তোমার পরমায়ুর জন্য প্রার্থনা করে তুমি জান?'

'সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, বাছা।'

'ভালো কথা ঠাকুর, একটা ছোট্ট কথা আছে। এই নাও ষাটটা কোপেক। আমার চাইতেও যে গরিব তাকে ওগুলো দান করবে বাবা। এখানে আসার পথেই আমি ভেবে রেখেছিলাম। তোমার হাত দিয়ে হওয়াই ভালো। কাকে দেওয়া উচিত, তোমার চাইতে ভালো আর কেউ জানত না।'

'বেশ, বেশ। তাই হবে মা। বড়ো ভালো মন তোমার। খুব ভালোবাসি আমি তোমাকে। তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করব। তা তোমার কোলের সন্তানটি কি মেয়ে নাকি?'

'হ্যাঁ প্রভু, মেয়ে। নাম ওর লিজাভেতা।'

'তোমাকে আর তোমার কচি বাচ্চা লিজাভেতা—দুজনকেই ভগবান আশীর্বাদ করুন। বড়ো আনন্দ দিলে মা, তুমি, খুশিতে ভরিয়ে দিলে আমার মনটা। আচ্ছা, এবারে তোমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, বড়ো আদরের বাছারা আমার। কেমন?'

মহাস্থবির সকলকে আশীর্বাদ করলেন, অনেকখানি নত হয়ে, মাথা নুইয়ে সকলকে প্রণাম করলেন।

## চার

## এক অল্পবিশ্বাসী ভদ্রমহিলা

সাধারণ চাষি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সাধু জোসিমার আন্তরিক কথাবার্তা এবং তাঁর আশীর্বাদের দৃশ্য দূর থেকে লক্ষ করে বহিরাগত সেই মহিলা নীরবে চোখের জল ফেলছিল, বারে বারে রুমাল দিয়ে মুছছিল। অভিজাত মহল্লের নারী সে, বেশ আবেগপ্রবণ, বহু ক্ষেত্রে আন্তরিক ভাবে পরোপকারের প্রবৃত্তিও তার মধ্যে

দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত মহাস্থবির যখন ভদ্রমহিলার কাছে এলেন তখন সে আবেগে অভিভূত।

উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে সে বলল, 'এই দৃশ্য আমার মনকে এত নাড়া দিয়েছে না, কী বলব প্রভু... উত্তেজনায় সে মুখের কথা শেষ করতে পারল না। 'ওঃ আমি বুঝতে পারছি লোকে আপনাকে কত ভালোবাসে। আমি নিজেও মানুষকে ভালোবাসি, মানুষকে ভালোবাসতে চাই আমি। আহা, নিজেদের মহত্ত্বের জন্য যারা এত সহজ সরল, এত চমৎকার, আমাদের দেশের সেই সব মানুষকে কি ভালো না বেসে পারা যায়!'

'আপনার মেয়ে এখন কেমন আছে? আপনি আবার আমার সঙ্গে কথা বলবেন বলে এসেছেন কি?'

'ওঃ আপনি জানেন না, এই সুযোগ পাবার জন্যে কত পীড়াপীড়ি, কত অনুনয় বিনয় আমি করেছি। আপনি যতক্ষণ না আমাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিচ্ছেন ততক্ষণ নতজানু হয়ে আপনার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেও আমি রাজি ছিলাম—তেমন হলে তিন দিনও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। অসাধারণ আপনার রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা প্রভু! আমরা আপনার কাছে আবার এসেছি প্রাণ খুলে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে। আপনি আমার লিজাকে সারিয়ে তুলেছেন, সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলেছেন। কীভাবে সারিয়ে তুললেন? গত বৃহস্পতিবার আমরা এসেছিলাম, তখন আপনি ওর মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করলেন, তাইতেই মা সেরে উঠল। আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অনুভূতি আর শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়ে আপনার করচুম্বন করার জন্য আমরা ছুটে এসেছি।'

'সারালাম আর কোথায়? এখনও তো দেখছি চেয়ারে পড়ে আছে।'

'কিন্তু প্রভু, রাতে যে জ্বরের প্রকোপটা হত সেটা একেবারে চলে গেছে—এই তো গত দুদিন হল—সেই বৃহস্পতিবারের পর থেকে', ভদ্রমহিলা নার্ভাস হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'শুধু তা-ই নয়, ও এখন পায়ে বল পাচ্ছে। আজ সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙল তখনও বেশ সুস্থ। সারা রাত ভালো ঘুমিয়েছে। একবার তাকিয়ে দেখুন ওর দিকে—গালে গোলাপি রং লেগেছে, চোখ দুটো ঝলমল করছে। আগে সব সময় কাঁদত, এখন হাসে। আনন্দে, খুশিতে ভরপুর এখন। আজ ও নিজে বারবার করে বলছিল দাঁড় করিয়ে দিতে। নিজে, কোনোরকম অবলম্বন ছাড়াই পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। ও আমার সঙ্গে বাজি রেখে বলছে যে আর দু সপ্তাহ পরেই নাচতে শুরু করে দেবে। এখানকার স্থানীয় ডাক্তার হের্‌ৎসেন্‌শ্টুবে—বিদেশি, জার্মান—তাঁকে আমি ডেকেছিলাম। দেখেশুনে তিনি একেবারে থ, অবাক হয়ে শুধু কাঁধ ঝাঁকান। এর পরও আপনি কি মনে করেন আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলব না, তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব না? ওরে লিজা, ধন্যবাদ জানা, ওঁকে ধন্যবাদ দে প্রাণ খুলে।'

লিজার হাসি-হাসি ছোট্ট মুখখানা হঠাৎ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। চেয়ারেই যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে মহাস্থবিরের দিকে তাকিয়ে তাঁর সামনে হাত জোড় করল। তারপর হঠাৎই কেন যেন নিজেকে সামলাতে না পেরে খিল-খিল করে হেসে উঠল।

'না, না হাসছি আমি ওকে দেখে, ওকে দেখে হাসছি', হাসি চাপতে না পেরে ছেলেমানুষের মতো নিজের ওপরই নিজে বিরক্ত হয়ে এই বলে সে তাড়াতাড়ি আলিয়োশাকে দেখিয়ে দিল। আলিয়োশা দাঁড়িয়ে ছিল মহাস্থবিরের এক পা পেছনে। তার দিকে তাকালেও কারও চোখে না পড়ে পারে না যে দ্রুত রক্তিম হয়ে উঠেছে তার মুখ, মুহূর্তের মধ্যে দুই গালে ফুটে উঠেছে রক্তোচ্ছ্বাস। তার চোখে ঝিলিক খেলে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চোখ নামিয়ে নিল।

'ও আপনার জন্যে একটা বার্তা নিয়ে এসেছে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ!... কেমন আছেন?' হঠাৎ আলিয়োশাকে লক্ষ করে দামি দস্তানা পরা হাতখানা ভদ্রমহিলা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। মহাস্থবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন আলিয়োশার দিকে। আলিয়োশা ততক্ষণে লিজার কাছে এগিয়ে এসেছে। কেমন যেন অদ্ভুত আনাড়ির মতো হেসে লিজার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। লিজা তার চেহারায় ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে তুলল।

'কাতেরিনা ইভানভ্না আমার মারফত এই এটা পাঠিয়েছেন আপনাকে', এই বলে একটা ছোট্ট কাগজে লেখা চিরকুট তাকে দিল সে। তারপর তাকে বলল, 'ওর বিশেষ অনুরোধ আপনি যেন ওর সঙ্গে দেখা করেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারেন। ওঁকে হতাশ করবেন না—অবশ্যই যাবেন।'

'উনি আমাকে যেতে বলছেন? ওঁর কাছে আমাকে?...কী দরকার?' ভীষণ অবাক হয়ে অস্ফুট স্বরে আলিয়োশা বলল। তার মুখে হঠাৎ ফুটে উঠল গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ।

'হ্যাঁ ওই দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের ব্যাপারে আর কি... সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেই নিয়ে কথা বলতে চান', তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'কাতেরিনা ইভানভ্না এখন একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন...কিন্তু এর জন্য আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা তাঁর খুব দরকার।...কেন তা অবশ্য জানি নে, কিন্তু উনি বলেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনি এটা করবেন, অতি অবশ্য করবেন। এমনকি একজন খ্রিস্টিয়ান হিসেবে আপনার যে অনুভূতি তার খাতিরেও এটা আপনার কর্তব্য।'

'আমি তো ওঁকে মাত্র একবার দেখেছি', আগের মতোই বিভ্রান্ত কণ্ঠে আলিয়োশা বলল।

'আচ্ছা আপনি যদি জানতেন কত বড়ো ওঁর মনটা। ওর কোনও তুলনা হয় না। ...যে দুঃখকষ্ট ওঁকে সইতে হয়েছে একমাত্র তার কথাও যদি মনে করি।... ভেবে দেখুন একবার, কী কষ্ট তিনি পেলেন কত কষ্ট তিনি সহ্য করছেন এখন! একবার ভেবে দেখুন, আরও কত দুঃখ লেখা আছে তাঁর কপালে! ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।'

'বেশ, যাব আমি', রহস্যময় সংক্ষিপ্ত চিরকুটটার ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে আলিয়োশা তার সিদ্ধান্ত জানাল। চিঠিতে অবশ্য আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ ছিল না, কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

'বাঃ চমৎকার। আপনার অশেষ অনুগ্রহ বলতে হবে।' লিজা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল। 'আমি মামণিকে তাহলে ঠিকই বলেছিলাম, আপনি না গিয়ে পারবেন না। আপনি মুক্তির সন্ধান করছেন যে! বড়ো ভালো লোক আপনি। আমি সবসময়ই মনে মনে ভাবতাম আপনি বড়ো ভালো লোক। এটা আপনাকে এখন বলতে পেরে কী ভালোই যে লাগছে!'

'লিজা!' মা ধমকের সুরে বলে উঠলেন, যদিও বলার সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হাসলেনও।

'আপনি আমাদেরও ভুলে গেছেন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। আপনি আমাদের বাড়ি আর আসতেই চান না। তা লিজা কিন্তু বার দুয়েক আমাকে বলেছিল, একমাত্র আপনার সঙ্গই ওর ভালো লাগে।' এই কথায় আলিয়োশা মাটি থেকে চোখ তুলে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে আবার লাল হয়ে উঠল ওর মুখখানা, আবারও হঠাৎ—নিজেও জানে না কেন—হেসে ফেলল। মহাস্থবিরের দৃষ্টি অবশ্য তখন আর ওদের ওপর ছিল না। ইতিপূর্বে তাঁর দর্শনপ্রার্থী যে তীর্থযাত্রী সাধুটির কথা আমরা বলেছিলাম, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লিজার আরাম কেদারার ধার ঘেঁষে। মহাস্থবির এবারে তার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। সাধুটিকে দেখে মনে হয় অতি সাধারণ স্তরের। অর্থাৎ তেমন কোনো পদমর্যাদা তার নেই, জগৎ সংসার সম্পর্কে অতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অটল মনোভাবের অধিকারী, কিন্তু যথার্থ ধর্মবিশ্বাসী—অনমনীয় গোছের। সুদূর উত্তরের অব্‌দোরস্কের সন্ত সিল্‌ভেস্তর মঠ থেকে এসেছে বলে জানাল। মাত্র নয়জন সাধুর একটা নগণ্য সম্প্রদায় নিয়ে এই মঠ। সাধুটিকে আশীর্বাদ করে মহাস্থবির তার নিজের সুবিধামতো সময়ে তাঁর প্রকোষ্ঠে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

'কোন্ অসাধারণ ক্ষমতাবলে আপনি এই অসাধ্য সাধন করেন?' হঠাৎ লিজাকে দেখিয়ে আনুষ্ঠানিক গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে সাধুটি জিগ্‌গেস করল। লিজার 'আরোগ্য' প্রসঙ্গেই তার এই আকস্মিক প্রশ্ন।

'আরোগ্য লাভ করেছে এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি। একটু আরাম বোধ করছে এখন, তার মানে কিন্তু পূর্ণ আরোগ্যলাভ নয়। তাছাড়া সেটা অন্য নানা কারণেও ঘটতে পারে। আর সে রকম কিছু যদি ঘটেও থাকে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কোনও ক্ষমতাবলে সম্ভব নয়। সবই তাঁর ইচ্ছা। তা একবার পায়ের ধুলো দেবেন কিন্তু প্রভু, আমার ঘরে,' এবারে তিনি যোগ করলেন, 'সব সময় আবার এমন সুযোগও হয় না আমার কপালে। অসুস্থ শরীর, জানি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।'

'না, না, অমন কথা বলবেন না। ঈশ্বর আপনাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে

নেবেন না। আপনি আরও অনেক, অনেক দিন বেঁচে থাকবেন', আর্তনাদ করে উঠল লিজার মা। 'তাছাড়া আপনি আবার অসুস্থ কীসের? চেহারাতে খারাপ স্বাস্থ্যের কোনো লক্ষণ দেখছি না, দিব্যি হাসিখুশি দেখাচ্ছে আপনাকে।'

'আজ আমি খুব আরাম বোধ করছি। কিন্তু আমি জানি এটা ক্ষণিকের। আমার কী রোগ তা আমি জানি—আমার এই জানার মধ্যে এতটুকু ভুল নেই। আমাকে দেখে যদি আপনার এত হাসিখুশি বলে মনে হয় তাহলে বলব আপনার এই কথার চেয়ে বেশি আনন্দের আর কিছু কখনও আমার কাছে হতে পারে না। মানুষের দৃষ্টিই হয়েছে আনন্দ উপভোগের জন্য, তাই যে মানুষ পরিপূর্ণ আনন্দের অধিকারী সে-ই অকুণ্ঠচিত্তে মনে মনে বলতে পারে: 'এই পৃথিবীতে আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করেছি।' পৃথিবীর যত ধর্মপ্রাণ মানুষ যত সাধু মহাপুরুষ আর পুণ্যাত্মা—সবাই ছিলেন এই আনন্দের অধিকারী।'

মহিলাটি সোল্লাসে বলে উঠল, 'ওঃ কত উঁচুদরের, কত আশ্বাসের কথা যে আপনি বলেন প্রভু! আপনার মুখের একেকটি কথা মর্মে গিয়ে বেঁধে। তবু, বলুন তো আনন্দ কোথায়? কোথায় আনন্দ? কে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে সে আনন্দের অধিকারী? ওঃ আপনার যখন এতই দয়া হল প্রভু, যে আজ আরও একবার আপনার দর্শন পেলাম তখন ধৈর্য ধরে আমার সবগুলো কথা শুনুন। গতবার আপনাকে পুরোটা বলা হয়ে ওঠেনি। আমি যে কী কারণে আজ এতকাল হয়ে গেল এত কষ্ট পাচ্ছি এ কথা সেদিন সাহস করে আপনাকে বলতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করবেন, আমি অসুখী, বড়ো অসুখী।....' বলতে বলতে অসংযত উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে সে দুহাত জোড় করে তুলে ধরল মহাস্থবিরের দিকে।

'আপনার যন্ত্রণা বিশেষ করে কী ধরনের?'

'অবিশ্বাসের... অবিশ্বাসের যন্ত্রণা।....'

'ঈশ্বরে অবিশ্বাস?'

'না, না, ওকথা ভাবতেও সাহস হয় না। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন, পরলোক—এসব আমার মনে ধাঁধা জাগায়। মনে হয়, এ রহস্যের কোনও উত্তর কারও জানা নেই। শুনুন, আপনি লোকের ব্যাধি সারান, মানুষের আত্মার আপনি এতবড়ো একজন তত্ত্বজ্ঞ, আমার কথায় আপনার সম্পূর্ণ প্রত্যয় হবে এমন দুরাশা অবশ্য আমার নেই, তবু বিশ্বাস করুন, আমি হলফ করে বলছি কথাগুলো আমি কিন্তু মোটেই হালকা মেজাজে বলছি না: মৃত্যুর পর পরলোক যদি থাকে, সেই পরলোকের কথা ভেবে আমি ভয় পাই, ভীষণ ভয় পাই, আমার অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে।... আমি জানি না, কার শরণ নেব, কাকে সাহস করে এসব কথা বলব।...সারা জীবন মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারিনি। এখন আপনি ভরসা, আপনার শরণ নিলাম, প্রভু। হা ভগবান! আপনি আমাকে এখন কী ভাবছেন কে জানে?' বলতে বলতে ভদ্রমহিলা ব্যাকুল হয়ে আবার দুহাত জোড় করল।

'আমার ধারণা নিয়ে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই', উত্তরে মহাস্থবির বললেন। 'আপনি যে সত্যি সত্যি কষ্ট পাচ্ছেন তা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি।'

'ওঃ আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই প্রভু। দেখুন, অনেক সময় আমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবি বিশ্বাস যদি সকলেই করে তাহলে তার উৎস কোথায়? লোকে তখন প্রতিপাদন করার চেষ্টা করে যে এসবের উৎস হল মানুষের ভয়—প্রকৃতির ভয়ালতা থেকে ভীতি—তা থেকেই এই বিশ্বাসের জন্ম: আসলে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি মনে মনে ভাবি, ধরুন আমি সারা জীবন এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে রইলুম, কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল সব ফাঁকি—একমাত্র যা সত্যি তা হল এই যে ভাঁটুই গাছের আগাছায় ছেয়ে আছে আমার কবর—এই ধরনের একটা কথা পড়েছিলাম কোনো এক লেখকের লেখায়। কী সাঙ্ঘাতিক। কী করে ফিরে পাওয়া যায় বিশ্বাস? কী করে? আমি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলাম একমাত্র তখনই আমার বিশ্বাস ছিল—কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল যান্ত্রিক, সেখানে ভাবনা চিন্তার কোনো স্থান ছিল না।...কী করে, আপনিই বলুন, কী করে প্রমাণ করা যায় এর অস্তিত্ব? আমি এখন এসেছি আপনার পদতলে আত্মনিবেদন করে একথাই জানতে। এই সুযোগ যদি আমি আজ হাতছাড়া করি তা হলে সারা জীবন কারও কাছ থেকে কোনো উত্তর পাবার আশা নেই। কীসে প্রমাণ হতে পারে বা প্রত্যয় জন্মাতে পারে? ওঃ কী জ্বালা আমার! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার চারপাশে দৃষ্টিপাত করি—দেখি, সকলে—হ্যাঁ প্রায় সবাই এ ব্যাপারে উদাসীন। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমি একা, একা আমিই এটা সইতে পারছি না। কী ভীষণ কী মর্মান্তিক, বলুন তো!'

'হ্যাঁ, মর্মান্তিক—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যুক্তি দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যায় না, তবে বিশ্বাস করা সম্ভব।'

'কী ভাবে? কী করে?'

'সক্রিয় ভালোবাসার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আপনার প্রতিবেশীকে সক্রিয় হয়ে, অক্লান্তভাবে ভালোবাসার চেষ্টা করুন। এই ভালোবাসা যত বাড়বে আপনার ঈশ্বরোপলব্ধিও ততই বাড়বে এবং আপনার আত্মা যে অবিনশ্বর এই সত্য ততই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে আপনার মনে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে যেদিন পরকে ভালোবাসতে পারবেন সেদিন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবেন। কোনও সন্দেহ, কোনও দ্বন্দ্ব তখন আর ঠাঁই পাবে না আপনার মনে। এটা সত্য, পরীক্ষিত সত্য।'

'সক্রিয় ভালোবাসা দিয়ে? তা হলে বলি, আরও একটা সমস্যা আছে—বড়ো সমস্যা, বেশ বড়ো সমস্যা। দেখুন, মানুষকে আমি বড় বেশি ভালোবাসি। এত বেশি ভালোবাসি, বিশ্বাস করুন, এক এক সময় মনে হয় আমার যা কিছু আছে সব ফেলে লিজাকেও ছেড়ে কোথাও চলে যাই—মানুষের শুশ্রূষায় নিজেকে নিবেদন করি। আমি চোখ বুঝে মনে মনে ভাবি, স্বপ্ন দেখি সেই সব মুহূর্তে মনের ভেতরে

অনুভব করি এক দুর্জয় শক্তির উচ্ছ্বাস। তখন কিন্তু কোনো ক্ষত বা পচাগলা ঘরের কথা ভেবে আমার এতটুকু ভয় হয় না। আমার ইচ্ছে করে যারা পীড়িত, যারা রোগগ্রস্ত নিজে হাতে তাদের ক্ষত ধুয়ে মুছে পটি বেঁধে দিই। তাদের ক্ষতস্থান চুম্বন করতেও আমি প্রস্তুত।...'

'এটা অবশ্য অনেক। অন্য কোনো স্বপ্ন না দেখে এমনি স্বপ্ন যে আপনি দেখেন তাও ভালো। এই করে করে একদিন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে আপনি সত্যি সত্যি একটা ভালো কাজ করে বসেছেন।'

'ঠিক কথা। কিন্তু এরকম জীবন কি আমি দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারব?' অনেকটা যেন দিশেহারা হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চললেন ভদ্রমহিলা। 'এটাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন! এটা আমার সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণার প্রশ্ন। দুচোখ বুজে আমি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি—কিন্তু ও পথে তোমার কত দিন নিষ্ঠা থাকবে? যে রোগীর ঘৃণিত ক্ষতের পরিচর্যা তুমি করবে সে যদি সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তোমার পরোপকারের মূল্য না দিয়ে উলটে যদি নিজের অদ্ভুত অদ্ভুত আবদার প্রকাশ করে তোমাকে অস্থির করে তোলে? যদি সে তোমার ওপর চোটপাট শুরু করে, রূঢ় অমার্জিত ভাষায় এটা ওটা দাবি করতে থাকে, এমনকি ওপরওয়ালার কাছে তোমার নামে নালিশ করে—তাহলে? যারা বড়ো বেশি কষ্ট ভোগ করে তাদের ক্ষেত্রে সচরাচর তো এরকমই দেখা যায়। তাই না? তাহলে তখনও কি টিকে থাকবে তোমার ভালোবাসা? কত দিন থাকতে পারে? তাই, ভেবে দেখুন, আমি মনে মনে শিউরে উঠি, যখন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুই যে মানুষের প্রতি আমার সক্রিয় ভালোবাসার উত্তাপ যদি হঠাৎ কোনো কারণে জুড়িয়ে যায় তা হবে অকৃতজ্ঞতা—একমাত্র অকৃতজ্ঞতাই হবে তার কারণ। এক কথায় আমি ভাড়া করা কাজের লোকের মতো, হাতে হাতে দাম চাই। সে দাম স্বীকৃতি, প্রশংসা, ভালোবাসার প্রতিদানে ভালোবাসা। মূল্য না পেলে ভালোবাসতে আমি কখনও পারব না।'

অকপট আত্মধিক্কারের প্রবল উত্তেজনায় মহিলা তখন কাঁপছে। কথাগুলো শেষ করে সে তাকাল মহাস্থবিরের দিকে। তা দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে যুদ্ধংদেহি আহ্বানের দৃঢ় সঙ্কল্প।

মহাস্থবির মন্তব্য করলেন, 'ঠিক এমন ধারা কথাই একবার আমাকে বলেছিলেন এক ডাক্তার। সে অবশ্য অনেককাল আগেকার কথা। যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তাঁর, নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান লোক। উনিও আপনার মতোই এমনি অকপটে আমায় বলেছিলেন, যদিও ঠাট্টাচ্ছলে। কিন্তু তাঁর সেই ঠাট্টার মধ্যে একটা দুঃখের জ্বালাও ছিল। বলেছিলেন, 'আমি ভালোবাসি, কিন্তু আমার নিজেকে নিজের কাছে অবাক লাগে এই দেখে যে সামগ্রিক ভাবে মানবজাতিকে যত বেশি ভালোবাসি ততই যেন আংশিক ভাবে, অর্থাৎ কিনা বিচ্ছিন্ন ভাবে, মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা

আরও কমে যায়।' তাঁর কথায়, 'মাঝে মাঝে কল্পনায় মানবজাতিকে সেবার প্রবল আবেগ আমাকে পেয়ে বসে। হঠাৎ তেমন প্রয়োজন হলে আমি হয়তো অন্যের জন্য সত্যিকারের আত্মত্যাগও করতে পারতাম, অথচ দেখুন, আমি এক ঘরে কারও সঙ্গে দুদিনও বাস করতে পারি না—এ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় জানি। কোনো মানুষ আমার একটু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেই মনে হয় তার ব্যক্তিত্ব আমার অহংকে পীড়ন করছে, আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করছে। এমনকি সবচেয়ে ভালো মানুষটিও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্য আমার পরম ঘৃণাস্পদে পরিণত হতে পারে। কেউ হতে পারে এই কারণে যে আহার পর্ব সারতে তার অনেক সময় লাগে, আবার কেউ বা স্রেফ এই কারণে যে তার সর্দি লেগেছে, অনবরত সে নাক ঝাড়ছে। লোকে আমাকে একটু স্পর্শ করলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের শত্রু হয়ে যাই। অথচ আমার জীবনে চিরকাল এমন ঘটেছে যে ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে আমি যত বেশি ঘৃণা করি ততই বেশি করে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেমে আমার মন উদ্বেল হয়ে ওঠে।'

'তাহলে কী করা উচিত? কী করা উচিত এক্ষেত্রে, বলুন? তবে কি কোনও আশাই নেই?'

'না, তা কেন হবে? আপনি নিজে যে এতে মনোকষ্ট পাচ্ছেন এটাইতো যথেষ্ট। আপনি যেটুকু পারেন করুন, ঠিক তার প্রতিদান পেয়ে যাবেন। আপনার যখন এত গভীর আর অকপট আত্মোপলব্ধি ঘটেছে তখন তো অনেকখানি কাজই আপনি সেরে ফেলেছেন। কিন্তু এখন আপনি এতটা মন খুলে আমাকে যে কথাগুলো বললেন তার কারণ যদি একমাত্র এই হয় যে এখন আপনার সত্যবাদিতার জন্য আমার কাছ থেকে প্রশংসা পেতে চান, তা হলে, বলাই বাহুল্য, সক্রিয় ভালোবাসা বা প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি কিছুই অর্জন করতে পারবেন না। ওই স্বপ্ন নিয়েই থাকতে হবে আপনাকে। আপনার সারাটা জীবন একটা ছায়ার মতো আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই, ভবিষ্যতের চিন্তা, পরলোকের চিন্তাভাবনা আপনি বিস্মৃত হবেন, তারপর এক সময় নিজেই নিজেকে কোনো না কোনো ভাবে প্রবোধ দেবেন।'

'আপনি আমাকে বিধ্বস্ত, করে দিলেন। মাত্র এখনই ঠিক এই মুহূর্তে, এই যে আপনি কথাগুলো বললেন, আমি বুঝতে পারলাম, আসলে যখন আমি আপনাকে বলছিলাম যে মানুষের অকৃতজ্ঞতা আমি সহ্য করতে পারব না, তখন আমি আমার অকপট আত্মসমালোচনার জন্য আপনার কাছ থেকে শুধু প্রশংসাই প্রত্যাশা করেছিলাম। আপনি আমার আত্মোপলব্ধি ঘটিয়েছেন, আপনি আমার মনের কথা ধরেছেন শুধু তাই নয়, আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আসলে আমি কে!'

'আপনি কি সত্যি বলছেন? তা এখন আপনার এই স্বীকারোক্তির পর আমি বিশ্বাস করছি যে আপনি অকপট এবং আপনার মনটা ভালো। সুখের সন্ধান যদি

না পান, তবু সব সময় মনে রাখবেন যে আপনি সঠিক পথে চলছেন। চেষ্টা করবেন এ পথ থেকে যেন ভ্রষ্ট না হন। সবচেয়ে বড়ো কথা, মিথ্যাকে পরিহার করে চলবেন। কোনও রকম মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবেন না, অন্তত নিজের প্রতি মিথ্যাচার কখনও করবেন না। নিজের কপটতার ওপর নজর রাখবেন। অহরহ, প্রতিক্ষণ তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। অবজ্ঞা—সে অন্যের প্রতি হোক বা নিজের প্রতি হোক—তা পরিহার করে চলবেন। নিজের অন্তরে যেটা কদর্য বলে আপনার নিজেরই মনে হচ্ছে, আপনি যে সেটা লক্ষ করতে পেরেছেন একমাত্র তাতেই তার পরিশুদ্ধি ঘটছে। ভয়ও স্থান দেবেন না মনে, যদিও ভয় হল যে কোনো ধরনের মিথ্যাচারের পরিণতি মাত্র। ভালোবাসা অর্জনের পথে নিজের কাপুরুষতাকে কখনও ভয় পাবেন না, এমন কি সে ক্ষেত্রে নিজের দুষ্কর্মকেও খুব একটা ভয় করলে চলবে না। দুঃখের কথা আপনাকে সান্ত্বনা দেবার মতো আর কোনো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, যেহেতু সক্রিয় ভালোবাসা মানুষের স্বপ্নের ভালোবাসার তুলনায় কঠিন, ভয়াল। স্বপ্নের ভালোবাসা ভাবালু—দ্রুত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল, তার উদ্দেশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বস্তুত সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে যখন মানুষ নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে তার অগ্নিপরীক্ষা দীর্ঘস্থায়ী না হয়ে সংক্ষিপ্ত হয় এবং সকলে যেন তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তাকে বাহবা দেয়, যেমন তারা করে থাকে মঞ্চাভিনেতার বেলায়। কিন্তু সক্রিয় ভালোবাসার জন্য চাই কঠোর শ্রম আর তিতিক্ষা। আবার কোনো কোনো মানুষের কাছে তা সম্ভবত পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডারও বটে। তবে আপনাকে বলি, আপনি যখন এই দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন যে আপনার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি লক্ষ্যের কাছাকাছি তো পৌঁছুতে পারেনইনি, এমনকি তার থেকে যেন দূরেই সরে গেছেন—তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে— মনে রাখবেন, আপনি হঠাৎ পৌঁছে গেছেন আপনার লক্ষ্যে, আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন আপনার নিজের ওপর সেই পরম কারণিক ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির আশ্চর্য ক্ষমতা, যিনি অলক্ষ্যে থেকে সর্বক্ষণ আপনাকে পথ দেখিয়ে এসেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, এর চেয়ে বেশিক্ষণ আর আপনার সঙ্গে কাটন সম্ভব হচ্ছে না। অন্যেরা অপেক্ষা করে রয়েছেন। চলি তাহলে, কেমন?'

ভদ্রমহিলা কাঁদছিল।

'লিজা, লিজা। দয়া করে একবার আশীর্বাদ করে যান আমার লিজাকে!' হঠাৎ চমক ভাঙতে ছটফটিয়ে সে বলে উঠল।

'বয়ে গেছে আমার। ভালোবাসার যুগ্যি নয় ও! আমি দেখেছি, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করছিল', কৌতুকের হাসি হেসে মহাস্থবির বললেন। 'কেন সমানে দুষ্টুমি করছিলে, আলেক্সেইকে নিয়ে মজা করছিলে? সব দেখেছি আমি।'

সত্যি সত্যি লিজা এতক্ষণ সমানে মজা করছিল আলেক্সেইকে নিয়ে। লিজা

এর আগেও, গতবারও লক্ষ করেছে যে আলিয়োশা ওকে দেখে লজ্জা পায়, চেষ্টা করে ওর দিকে না তাকাতে। এই ব্যাপারটা ওর কাছে দারুণ কৌতুককর ঠেকে। তাই সে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে থাকে কখন ওর চোখের ওপর আলিয়োশার চোখ পড়ে যায়। এদিকে আলিয়োশাও তাকায় না তাকায় না করে কোনো এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির আকর্ষণ নিজের অজান্তে হঠাৎ হঠাৎ লিজার দিকে তাকিয়ে ফেলে, তখনই লিজা তার মুখের ওপর বিজয়িনীর হাসি হাসতে থাকে। আলিয়োশা লজ্জা পেয়ে যায়, তার চেয়েও বেশি হয় বিরক্ত। শেষ পর্যন্ত ওর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে মহস্থবিরের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার সেই অপ্রতিরোধ্য শক্তির আকর্ষণে সে ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেল লিজা তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিনা। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল লিজা প্রায় তার আরাম কেদারা থেকে একপাশে শুয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে আছে কখন আলিয়োশা একবার এদিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই খিলখিল করে হেসে উঠল লিজা। এবারে মহাস্থবিরও আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলে উঠলেন, 'আহা, ও বেচারিকে অমন জ্বালাতন করছ কেন বল তো? দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।'

লিজার চোখমুখ সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লাল হয়ে গেল। তার দুই চোখে ঝিলিক খেলে গেল, মুখখানা বেজায় গম্ভীর হয়ে উঠল। ভীষণ উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে রীতিমতো ক্ষোভের সুরে দ্রুত তড়বড়িয়ে সে বলল, 'কেন উনি সব ভুলে গেছেন? আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমায় কোলে করে নিয়ে বেড়িয়েছেন, কত খেলেছি ওঁর সঙ্গে। উনি আমায় লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন, আপনি জানেন? দু বছর আগে আমাদের কাছ থেকে যখন বিদায় নেন তখন বলেছিল কখনও আমায় ভুলবে না, বলেছিলেন আমরা বন্ধু, চিরকালের বন্ধু, চিরকালের! কিন্তু এখন দেখছি উনি আমাকে ভয় পান। কেন, আমি ওঁকে খেয়ে ফেলব নাকি? আমার ধারে কাছেও আসতে চান না, আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না। কেন? কেন আমাদের বাড়ি আসতে চান না? এমন নয় যে আপনি ওকে মানা করেছেন? আমরা তো জানি ওঁর সর্বত্র যাতায়াত আছে। আমি মুখ ফুটে কেমন করে ওঁকে ডাকি? সেটা তো আর ভালো দেখায় না। উনি যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন তাহলে ওঁরই উচিত প্রথম মনে করা। না না, উনি তো এখন নিজের মুক্তি খুঁজছেন! আপনারা ওঁর গায়ে সন্নিসির জোব্বা চড়িয়েছেন। ওই লম্বা ঝুলের জোব্বা পরে দৌড়ানোর চেষ্টা করে দেখুন না একবার...হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবেন না!...

বলতে বলতে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল লিজা। কিছুতেই তার সেই হাসি আর থামে না। হাসির দমকে স্নায়ুবিকারগ্রস্তের মতো অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকে তার সর্বাঙ্গ। মহাস্থবির স্মিত হাস্যে ওর কথাগুলো শুনছিলেন। এবারে তিনি সস্নেহে ওকে আশীর্বাদ করলেন।

তাঁর হাত চুম্বন করতে গিয়ে লিজা হঠাৎ হাতটা চেপে ধরল তার দুচোখের ওপর। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি একটা বোকা মেয়ে, কোনও গুণ নেই আমার...আমার মতো হাসির খোরাক একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে না চেয়ে আলিয়োশা হয়তো ঠিক কাজই করেছেন, খুবই ঠিক কাজ করেছেন।'

'ওকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেব', মহাস্থবির বললেন।

## পাঁচ

## তথাস্তু, তথাস্তু!

প্রায় পঁচিশ মিনিট হতে চলল মহাস্থবির আশ্রম কক্ষের বাইরে। ইতিমধ্যে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, অথচ যার জন্য আশ্রমের এই সমাবেশ সেই দ্‌মিত্রি ফিয়োদর্‌ভিচের এখনও দেখা নেই। কিন্তু তার কথা যেন সবাই ভুলেও গেছে। মহাস্থবির যখন আবার তার কুঠুরিতে ফিরে এলেন তখন দেখতে পেলেন অতিথিরা নিজেদের মধ্যে তাদের সকলের সাধারণ আগ্রহোদ্দীপক কোনো একটা বিষয়ের আলোচনায় জোর মেতে আছে। সেখানে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে ইভান ফিয়োদরভিচ্ আর উপস্থিত সাধু দুজন। মিউসভ্‌কে দেখে মনে হচ্ছিল সেও বেশ উৎসাহের সঙ্গে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু এবারেও তার ভাগ্য প্রসন্ন নয়, তার ভূমিকা যেন নেপথ্যের; এমনকি তার কথার তেমন কোনো উত্তরও ওরা কেউ দিচ্ছে না। ফলে তার ভেতরে ভেতরে যে রাগটা জমে উঠছিল এই নতুন পরিস্থিতিতে তা আরও বেড়ে গেল। ঘটনা এই যে এর আগেও বেশ কয়েকবার বিদগ্ধ আলোচনার ক্ষেত্রে ইভান ফিয়োদর্‌ভিচের সঙ্গে তার জোর কথা কাটাকাটি হয়েছে এবং তার প্রতি ইভান ফিয়োদর্‌ভিচের বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে সেটাকে সে শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারেনি। মনে মনে ভাবল: 'ইউরোপে অগ্রণী বলতে যা বোঝায় এতকাল অন্তত সে সবের সামনের সারিতেই থেকে এসেছি, অথচ এই নতুন প্রজন্ম কিনা আমাদের অবজ্ঞা করে!'

ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্ নিজেই কথা দিয়েছিল যে সে চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকবে। বাস্তবিকই বেশ খানিকটা সময় সে চুপ করে বসেও ছিল, তবে পাশের এই লোকটির দশা দেখে মজা পেয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছিল—মিউসভের বিরক্তিটা যেন সে বেশ উপভোগ করছিল। অনেকক্ষণ হলই তার ওপর পুরনো অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার তাল করছিল, এখন আর সে-সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। শেষকালে আর থাকতে না পেরে মিউসভের কাঁধের ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে তাকে খেপানোর উদ্দেশ্যেই অর্ধস্ফুট স্বরে বলল, ''এই 'চুমোচুমির পালাটা' শেষ হয়ে যাবার পর মানে মানে কেটে পড়লেই তো পারতেন। তা না করে কী বলে যে ছোটোলোকদের

এমন একটা দলের সঙ্গে থেকে যেতে রাজি হলেন জানি নে। না কি আপনি নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করছেন—এখন সুযোগমতো নিজের বিদ্যে জাহির করে তাই দিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন বলে ভেবেছেন? তা সুযোগ যখন একবার পেয়েছেন তখন ওদের সামনে বিদ্যে জাহির না করে তো আর যাবেন না।"

"আঃ, আপনি আবার শুরু করলেন! মোটেই তা নয়। এই আমি চললাম।"

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ আরও একচোট খোঁচা দিয়ে বলল, "আরে না না, আপনি যাবেন আরও পরে—সবার শেষে।"

প্রায় ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই মহাস্থবির তাঁর কক্ষে ফিরে এলেন।

মুহূর্তের জন্য তর্কবিতর্ক থেমে গেল। কিন্তু মহাস্থবির তাঁর নিজের আসনটিতে জুত করে বসে সকলের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন তাদের আলোচনা চালিয়ে যাবার সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন। আলিয়োশা এত দিন ধরে দেখে দেখে মহাস্থবিরের মুখের প্রায় সব ভাবই এখন বুঝতে পারে। সে স্পষ্টই দেখতে পেল যে মহাস্থবির ভয়ঙ্কর ক্লান্ত, তাঁকে বেশ কষ্ট করে সংযত থাকতে হচ্ছে। অসুস্থতার ফলে তিনি এত ক্ষীণবল হয়ে পড়েছেন যে সম্প্রতি তাঁর মূর্ছার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। মূর্ছার আগের মুহূর্তে যেমন হয় এখনও প্রায় সে রকম একটা পাণ্ডুরতায় তাঁর সারা মুখ ছেয়ে গেছে, তাঁর ঠোঁটদুটো সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু এটা ঠিক যে সভাটা ভেঙে দিতে তাঁর মন চাইছে না। মনে হচ্ছিল আলোচনাটা জিইয়ে রাখার মধ্যে তাঁর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেটা তো? আলিয়োশা মনোযোগ দিয়ে তাঁকে লক্ষ করতে লাগল।

মহাস্থবিরের দিকে ফিরে ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে দেখিয়ে দিয়ে মঠের গ্রন্থাগারিক সন্ন্যাসী ইওসিফ বললেন, "আমরা এই ওঁর অত্যন্ত কৌতূহলজনক একটা লেখা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অনেক নতুন কথা আছে এতে, কিন্তু আমার মনে হয় তার যুক্তি দু দিকেই সমান কাটে। ধর্মসভা পরিচালিত সামাজিক বিচারালয় এবং তার অধিকারের ব্যাপ্তি সম্পর্কে এক পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি আসলে এই বিষয়ে যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো এক ব্যক্তির পুরো একটা বইয়ের জবাবে লেখা..."[২৮]

একাগ্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইভানের দিকে তাকিয়ে মহাস্থবির জবাব দিলেন, 'দুঃখের কথা, আপনার প্রবন্ধটা আমার পড়া হয়ে ওঠে নি, তবে ওটার কথা আমি শুনেছি।"

গ্রন্থাগারিক সাধুটি বলে চললেন, "উনি একটা খুবই কৌতূহলজনক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সামাজিক বিচারালয়ে ধর্মসভার এক্তিয়ারের কথা যদি বলেন তা হলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তিনি বুঝি ধর্মীয় সংস্থাকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঘোর বিরোধী।"

"কৌতূহল জাগানোর মতো বটে। কিন্তু কোন্ অর্থে?" সাধু জোসিমা ইভানকে জিগ্‌গেস করলেন।

আলিয়োশা আগে থাকতে আশঙ্কা করছিল ইভানের কথার মধ্যে একটা অবজ্ঞামিশ্রিত শিষ্টাচারের ভাব প্রকাশ পাবে। কিন্তু ইভান শেষকালে যে জবাব দিল তাতে স্পষ্টতই সৌজন্য এবং যথোচিত বিনয় ও সংযমের পরিচয় পাওয়া গেল। বিন্দুমাত্র গোপন কোনো উদ্দেশ্য তার আছে বলে মনে হল না।

"আমি যে অবস্থান থেকে শুরু করেছি তা এই যে গির্জা ও রাষ্ট্রের মূল নীতিগুলোকে অর্থাৎ উপাদানগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করলে তাদের এই মেশানোটা অবশ্যই অনন্তকাল চলতে থাকবে, যদিও তাদের মিশ হওয়া অসম্ভব; সেই সব উপাদানের মিশ্রণে শুধু স্বাভাবিক কেন, এতটুকু মানিয়ে চলার মতো অবস্থারও কখনও সৃষ্টি হবে না, যেহেতু যার ওপর বিষয়টা দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তিটাই মিথ্যা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচার ব্যবস্থার মতো বিষয়ের প্রশ্নে, পরিপূর্ণ ও প্রকৃত অর্থে আপস বলতে যা বোঝায়, আমার মতে রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে তা অসম্ভব। যাঁর কথায় আমি আপত্তি তুলছি তিনি একজন ধর্মযাজক। তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে গির্জার একটি সুনির্দিষ্ট ও সঠিক স্থান আছে। আমি তাঁর কথায় আপত্তি তুলে বলছি যে বরং তার বিপরীত—রাষ্ট্রের কোনো একটা কোনায় স্থান না নিয়ে গির্জার নিজেরই উচিত হবে সমস্ত রাষ্ট্রকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া; কোনো কারণে এখন যদি তা সম্ভব নাও হয়, তো প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রিস্টীয় সমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ বিকাশের স্বার্থে সেটাই নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ ও মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রাখা উচিত।"

শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মযাজক স্বল্পবাক পাইসি দৃঢ় ও উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "একদম খাঁটি কথা!"

মিউসভ্ অস্থির হয়ে পায়ের ওপর পা বদল করে রেখে চেঁচিয়ে উঠল, "কিন্তু এ তো শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে নয়, নাগরিক প্রশাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও, পোপের সার্বভৌম অধিকারকে মেনে নেওয়া—এ যে পাহাড়ের অপর পাড়ের নির্ভেজাল উল্‌ত্রা মস্তানবাদ'[২২]।"

"আরে না না, আমাদের এখানে ওসব পাহাড়- টাহাড়ের বালাই নেই!" উত্তেজিতভাবে এই কথা বলার পর মহাস্থবিরের দিকে ফিরে ফাদার ইওসিফ বলে চললেন: 'প্রসঙ্গত, ওঁর যিনি প্রতিপক্ষ—খেয়াল রাখবেন—একজন ধর্মযাজক, তাঁর উত্থাপিত 'মূল ও গুরুত্বপূর্ণ' যে প্রস্তাবগুলোর জবাব তিনি দিয়েছেন তা এই রকম: কোনও সামাজিক সংঘই এমন ক্ষমতা হস্তগত করতে পারে না এবং সেটা তার পক্ষে উচিতও হবে না যার বলে সে তার সদস্যদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে পারে; দ্বিতীয়ত ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা গির্জার অধিকারভুক্ত হওয়া উচিত নয়। যেহেতু গির্জা দেবতার পীঠস্থান এবং ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে গঠিত জনসাধারণের একটি সংঘও বটে, সেই হেতু এটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' এবং তৃতীয়ত ও শেষত, 'গির্জা একটি সাম্রাজ্য, যাহা ইহজগৎ হইতে আগত নহে'

"এ এক ধরনের কথার খেলা। একজন ধর্মযাজকের পক্ষে অশোভন!" আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে কথার মাঝখানে আবারও বলে উঠলেন ফাদার পাইসি। "যে বইটির বিরুদ্ধে আপনি আপত্তি তুলেছেন আমি সেটা পড়েছি", ইভান ফিয়োদরভিচকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "গির্জা একটি সাম্রাজ্য, যাহা ইহজগৎ হইতে আগত নহে'—একজন ধর্মযাজকের এই উক্তিতে আমি স্তম্ভিত! ইহজগৎ হইতে আগত যদি না হয় তাহলে বলতে হয় এই পৃথিবীতে তার আদৌ কোনও স্থান নেই, থাকতে পারে না। পবিত্র সুসমাচারে 'ইহজগৎ হইতে আগত নহে' কথাগুলো সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এসব কথা খেলার সামগ্রী হতে পারে না। আমাদের প্রভু যিশু যে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে তো পৃথিবীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠারই উদ্দেশ্যে। স্বর্গরাজ্য, বলাই বাহুল্য, ইহজগৎ থেকে আগত নয়, তা স্বর্গেই আছে; কিন্তু সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র পথ গির্জা, যা এই পৃথিবীতে স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই এ ধরনের পার্থিব ব্যাখ্যা দিয়ে কথার খেলা অনুচিত, অশোভন। গির্জা যথার্থই এক সাম্রাজ্য, রাজত্ব করার জন্যই যার প্রতিষ্ঠা এবং শেষপর্যন্ত নিঃসন্দেহে সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করবে— এই মর্মে আমরা দৈব প্রতিশ্রুতিলব্ধ।..."

বলতে বলতে অনেকটা যেন আত্মসংবরণ করে হঠাৎই চুপ করে গেলেন প্রভু পাইসি। ইভান ফিয়োদরভিচ্ মনোযোগ দিয়ে ভক্তিভরে তাঁর কথাগুলি শুনে গেল। এর পর অত্যন্ত শান্তভাবে এবং আগের মতোই উৎসাহভরে, সহজ সরল ভাব নিয়ে মহাস্থবিরকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করল: "আমার প্রবন্ধের মোদ্দা কথাটা এই যে খ্রিস্টধর্ম প্রাচীন কালে— প্রথম, তিন শতাব্দী কাল পৃথিবীতে কেবল গির্জা রূপে এবং একমাত্র গির্জার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। পৌত্তলিক রোম সাম্রাজ্য যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করল তখন অনিবার্যভাবে যা ঘটল তা এই যে খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করে সে নামে গির্জার অন্তর্ভুক্ত হল বটে, কিন্তু তার রাষ্ট্রব্যবস্থার বহু ক্ষেত্রে আগের মতোই পৌত্তলিক রয়ে গেল। বস্তুত, নিঃসন্দেহে এরকমটাই ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে রোমে পৌত্তলিক সভ্যতা ও বিজ্ঞতার অনেক কিছু বড়ো বেশি মাত্রায় থেকে যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমনকি তার রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও ভিত্তিমূলের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। অথচ খ্রিস্টের গির্জা যখন কোনো রাষ্ট্রে প্রবেশ করে তখন এটাই স্বাভাবিক যে তার পক্ষে নিজের মূলনীতি থেকে— যে মূলভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে এতটুকু সরে আসা সম্ভব নয়। তার যে অনুশাসন স্বয়ং প্রভু কঠোর ভাবে নির্দেশ ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন— প্রসঙ্গত, যা হল তাবৎ জগৎকে, অর্থাৎ কিনা সমগ্র প্রাচীন পৌত্তলিক রাষ্ট্রকে গির্জার সাম্রাজ্যে পরিণত করা—তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো লক্ষ্য তার পক্ষে অনুসরণ করাই সম্ভব নয়। এই ভাবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বলা যেতে পারে, যে লেখকের বিরোধিতা আমি করছি; তিনি যাকে যে কোনো সামাজিক সংগঠন অথবা 'ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জনসংঘের' মতো বলে উল্লেখ

করেছেন, সেই গির্জাকেই যে রাষ্ট্রের মধ্যে তার নির্দিষ্ট স্থানের সন্ধান করতে হবে এমন নয়; বরং তার বিপরীত—যে কোনো পার্থিব রাষ্ট্রকে পরিণামে পরিপূর্ণভাবে গির্জায় পরিণত হতে হবে এবং গির্জার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তার নিজের এমন যে-কোনো উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে অবশ্যই গির্জা হয়ে উঠতে হবে, এর অন্যথা হতে পারে না। এসবে কিন্তু তার এতটুকু অবমাননা হবে না, মহান রাষ্ট্র হিসেবে তার মানমর্যাদা বা গৌরব কোনোটাই ক্ষুণ্ণ হবে না, তার সার্বভৌম অধিপতিদের গৌরবও ক্ষুণ্ণ হবে না; এখন পর্যন্ত পৌত্তলিকতার মিথ্যাচারে আচ্ছন্ন ভ্রান্ত যে পথ সেখান থেকে তাকে সরিয়ে একমাত্র সঠিক ও সত্য সেই পথের সন্ধান দিতে পারে যা তাকে চিরন্তন লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করতে পারে। ঠিক এই কারণেই বলছি, 'ধর্মসভা পরিচালিত সামাজিক বিচারালয়ের মূলনীতি' গ্রন্থের লেখকের বিচারটা সঠিক হতে পারত যদি ওই মূলনীতিগুলির অনুসন্ধান ও উত্থাপনের সময় সেগুলিকে তিনি পাপাচারে পরিপূর্ণ আমাদের এই অসম্পন্ন সময়ের আপাত অপরিহার্য এক ধরনের সাময়িক আপস হিসেবে দেখতেন, তার চেয়ে বড়ো করে নয়। কিন্তু ওই মূলনীতগুলির রচয়িতা যখন বলতে গেলে স্পর্ধা করেই ঘোষণা করে বসেন যে তিনি বর্তমানে যে সমস্ত মূলনীতি উত্থাপন করছেন—এইমাত্র অংশত যার সংখ্যা গণনা করলেন ফাদার ইওসিফ—সেগুলিই অমোঘ, নিত্য ও শাশ্বত মর্মবস্তু, তখন কিন্তু তিনি সরাসরি গির্জা এবং তার পবিত্র শাশ্বত ও অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছেন। এই হল আমার পুরো প্রবন্ধটার বক্তব্য, তার মূল কথা।"

"অর্থাৎ কিনা, দু-চার কথায়", প্রতিটি কথার ওপর জোর দিয়ে ফাদার পাইসি আবার বলতে লাগলেন, "কোনো কোনো তত্ত্ব অনুযায়ী—যেগুলি অবশ্য বড়ো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে আমাদের এই উনবিংশ শতাব্দীতে—গির্জাকে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে হবে, নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় বিবর্তন বলতে যা বোঝায় এটা হবে অনেকটা সেই রকম, আর হবে সেই উদ্দেশ্যে যাতে অতঃপর তারই মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং জ্ঞানবিজ্ঞান যুগধর্ম ও সভ্যতার পথ সুগম করে দেয়। আর তা যদি না চায়, যদি প্রতিরোধ করে, তাহলে রাষ্ট্রের মধ্যেই কোথাও একটা, কোনো এক পাশে তাকে সরিয়ে রাখা হবে—তাও আবার নিয়ন্ত্রণাধীনে। আমাদের এই সময়ে, আধুনিক য়ুরোপ ভূখণ্ডের সর্বত্র এটাই ঘটনা। কিন্তু রুশিদের যে ধ্যানধারণা ও আশা আকাঙ্ক্ষা সেই অনুযায়ী যেটা দরকার তা এই নয় যে গির্জা নিম্নতর থেকে উচ্চতর বস্তুতে বিবর্তিত হওয়ার মতো রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হোক, বরং রাষ্ট্রেরই পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে এমন ভাবে যাতে তা আর কিছু না হয়ে একান্ত ভাবে, একমাত্র গির্জায় পরিণত হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তথাস্তু, তবে তা-ই হোক।"

"যাক, স্বীকার করতে হয়, আপনারা আমাকে এখন বেশ খানিকটা আশ্বস্ত

করলেন", আবারও এক হাঁটু থেকে আরেক হাঁটুর ওপর পা বদলাবদলি করে বাঁকা হাসি হেসে মিউসভ্ বলল। "আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তাতে দাঁড়াচ্ছে এই যে এটা এক ধরনের আদর্শের রূপায়ণ, যা প্রভু যিশুর দ্বিতীয় আবির্ভাবে সম্ভাব্য অশেষ দূরবর্তী ঘটনা। সে আপনারা যা-ই বলুন না কেন: যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না, কূটনীতিবিদ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কোনো অস্তিত্বই থাকবে না—এটা কিন্তু একটা ইউরোপীয় স্বপ্ন—এমনকি, অনেকটা যেন সোশ্যালিজমের মতো। আমি কিনা ভেবেছিলাম এসব গুরুতর ব্যাপার, এই যেমন গির্জা এখনই অপরাধীদের বিচার করতে লেগে যাবে। কাউকে বেত মেরে বা জেলের ঘানি টানতে পাঠিয়ে দণ্ড দেবে, কাউকে বুঝিবা মৃত্যুদণ্ডই দেবে।"

"কিন্তু না, এখনই যদি বিচারালয় বলতে একমাত্র ধর্মভিত্তিক বিচারালয় থাকত, তাহলে এখনও কিছু গির্জা কাউকে ঘানি টানতে পাঠাত না, অথবা মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিত না। সেক্ষেত্রে অপরাধ বদলাত, তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও নিঃসন্দেহে পালটে যেত—অবশ্যই অল্প-অল্প করে—হঠাৎ করে বা সঙ্গে সঙ্গে নয়, তবে হ্যাঁ, বেশ তাড়াতাড়িই সেটা হত..." চোখের পলক না ফেলে শান্তভাবে ইভান ফিয়োদরভিচ বলল।

"সত্যি নাকি?" নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মিউসভ্ জিগ্গেস করল।

"সবই যদি গির্জায় পর্যবসিত হত, তাহলে অপরাধী ও অবাধ্যদের মাথা না কেটে গির্জা তাদের ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করত", ইভান ফিয়োদরভিচ বলে চলল। "আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, বহিষ্কৃত ব্যক্তি তাহলে কোথায় যেত? কথাটা এই যে এক্ষেত্রে তাকে কেবল মানুষজন থেকে দূরে সরে গেলেই চলবে না—যেমন এখন দেখা যায়—তাকে খ্রিস্ট থেকেও দূরে সরে যেতে হয়, যেহেতু তার অপরাধ তাকে শুধু মানুষের বিরুদ্ধাচারী নয়, খ্রিস্টের গির্জারও বিরুদ্ধাচারী করে তুলেছে। এখনও অবশ্য সঠিক অর্থে বলতে গেলে, ব্যাপারটা এরকমই, তবে এটাও ঠিক যে স্পষ্ট ঘোষিত নয়, এবং আজকের দিনের অপরাধী অত্যন্ত বেশি করে, বড়ো বেশি ঘনঘন তার নিজের বিবেকের সঙ্গে রফায় নেমে পড়ে। 'চুরি করেছি বটে, কিন্তু গির্জার বিরুদ্ধে তো আর যাইনি, খ্রিস্টের শত্রুও নই', আজকের দিনের অপরাধী বড়ো বেশি করে এই বলে নিজের মনকে বুঝি দেয়। কিন্তু গির্জা যখন রাষ্ট্রের স্থান নেবে তখন তার পক্ষে এটা বলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, যদি না বিশ্বসুদ্ধ সব গির্জাকে অস্বীকার করে সে বলে: 'সব মানুষ ভ্রান্ত, সকলেই বিপথগামী, মানুষের গির্জা মাত্রেই মেকি, আমি—একজন খুনি ও চোর—একমাত্র এই আমি খাঁটি, খ্রিস্টীয় গির্জার যথার্থ প্রতিমূর্তি।' এমন কথা কিন্তু মনে মনে বলা বেশ শক্ত, এর জন্য যা দরকার তা হল বিপুল পরিমাণ এমন সব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সমাবেশ যা সচরাচর হয়ে ওঠে না। এবারে অন্য দিক থেকে, অপরাধের প্রতি গির্জার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথাই ধরুন না কেন: সমাজ সংরক্ষণের নামে সমাজের দূষিত ক্ষতযুক্ত প্রত্যঙ্গকে বর্তমানে যে ভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেটে বাদ দেওয়া

হচ্ছে, যা প্রায় পৌত্তলিক দৃষ্টিভঙ্গিরই সামিল, আজ তার বদলে তার নিজেকেই পরিবর্তন করা এবং এবারে আর মিছিমিছি না হয়ে যথার্থই মানুষের নবজন্ম, পুনরুজ্জীবন ও মুক্তির আদর্শে তার পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটা—এটাই কি উচিত হবে না?...''

''তার মানে? সেটা আবার কী রকম? এবারেও কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না'', মিউসভ্ বাধা দিয়ে বলল, ''আবারও কোথাকার কোন্ স্বপ্ন। নিরাকার কী যেন একটা, বোধবুদ্ধির বাইরেও বটে। বহিষ্কারটা কী? কী ধরনের সেই বহিষ্কার? আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি স্রেফ মজা করছেন ইভান ফিয়োদরভিচ।''

''হ্যাঁ জানেন কি, বাস্তবে এখনও কিন্তু তা-ই'', মহাস্থবির হঠাৎ কথা বলে উঠতে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন, ''এখনও কিন্তু খ্রিস্টের গির্জা যদি না থাকত তাহলে অপরাধীর দুষ্কর্মও কোনোমতে ঠেকানো যেত না, এমনকি পরিণামে তার কোনও শাস্তিবিধান, অর্থাৎ প্রকৃত শাস্তিবিধান হত না। এটা সেই যান্ত্রিক পদ্ধতির শাস্তি নয় যার উল্লেখ এই মাত্র করা হয়েছে এবং যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হৃদয়ে তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আমি যে শাস্তিবিধানের কথা বলছি সেটাই একমাত্র যথার্থ, একমাত্র ভয়প্রদ ও শান্তিপ্রদ, যা মানুষের মনকে তার বিবেক সম্পর্কে সজাগ করে তোলার মধ্যে নিহিত।''

''সেটা কী করে সম্ভব জানতে পারি কি?'' গভীর কৌতূহলভরে মিউসভ্ জিগ্‌গেস করল।

''ব্যাপারটা এই রকম'', মহাস্থবির বলতে শুরু করলেন, ''এই সব সশ্রম নির্বাসনদণ্ড, আগেকার দিনে সেই সঙ্গে আবার প্রহারও চলত—এর কোনোটাই কাউকে সংশোধন করে না; আর সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রায় কোনও অপরাধীর মনে ভীতিও সঞ্চার করে না, এতে অপরাধের সংখ্যা তো কমেই না, বরং যত দিন যায় তত বাড়তেই থাকে। এটা কিন্তু আপনাদের মানতেই হবে। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে সমাজ এই ভাবে আদৌ সুরক্ষিত হয় না, যেহেতু অনিষ্টকর সদস্যটিকে যদিও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেটে বাদ দেওয়া হয়, তাকে দূরে চোখের আড়ালে কোথাও নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় আরেকজন—আরেকজনই বা কেন, হয়তো বা আরও দুজন অপরাধী এসে হাজির হয়। এমনকি আজকের দিনে, আমাদের এই সময়ও যদি এমন কিছু থাকে যা সমাজকে সুরক্ষিত করে, এমনকি অপরাধীকে পর্যন্ত সংশোধন করে, অন্য মানুষে তার রূপান্তর ঘটায়, তাহলে আবারও বলব, সেটা একমাত্র, শুধুই সেই খ্রিস্টের বিধান যা মানবমনে, তার বিবেকের ওপর প্রভাব ফেলে। খ্রিস্টীয় সমাজের, অর্থাৎ গির্জার একজন পুত্র হিসেবে মানুষ যখন তার অপরাধীকে উপলব্ধি করতে পারবে। একমাত্র তখনই সমাজের বিরুদ্ধে পর্যন্ত, অর্থাৎ গির্জার বিরুদ্ধেও তার অপরাধ সে উপলব্ধি করতে

পারবে এইভাবে, রাষ্ট্রের কাছে নয়, একমাত্র গির্জার কাছেই আজকের অপরাধী নিজেকে অপরাধী বলে মনে করতে পারে। তাই বিচারব্যবস্থা যদি গির্জার মতো সমাজের অধিকারভুক্ত থাকত, তাহলে সেই সমাজ জানত কাকে অপাঙ্‌ক্তেয় অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে আবার নিজের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা দরকার। কিন্তু এখন যেহেতু গির্জার নিজের প্রকৃত কোনো বিচারালয় নেই, যা আছে তা কেবল নৈতিক ধিক্কারের ক্ষমতা, তাই সে নিজেই অপরাধীর সক্রিয় শাস্তিবিধান থেকে দূরে সরে থাকে। ধর্মসম্প্রদায় থেকে তাকে বহিষ্কার করে না বটে, তবে তাকে অন্তত পিতৃসুলভ নৈতিক শিক্ষা থেকে একেবারে বঞ্চিত করে না। শুধু তা-ই নয়, গির্জা অপরাধীর সঙ্গে সমগ্র খ্রিস্টীয় সমাজের যোগাযোগ পর্যন্ত বজায় রাখার চেষ্টা করে: গির্জার প্রার্থনাসভা এবং অন্যান্য পবিত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাকে যোগ দিতে দেয়, তাকে ভিক্ষা দান করে, আর তাকে অপরাধী হিসেবে ততটা দেখে না যতটা দেখে একজন বন্দি হিসেবে। হা ভগবান! অপরাধীর কী দশা হত বলুন তো যদি খ্রিস্টীয় সমাজও, অর্থাৎ গির্জা পর্যন্ত তাকে অস্বীকার করত, যেমন করে নাগরিক আইন তাকে অস্বীকার করে ও কেটে বাদ দেয়? কী দশা হত যদি প্রতিবারই নাগরিক আইনে তার শাস্তিবিধানের পর, সঙ্গে সঙ্গে গির্জাও ধর্মসম্প্রদায় থেকে তাকে বহিষ্কার করে তার শাস্তিবিধান করত? এর চাইতে বড়ো হতাশা আর কিছুই হতে পারত না—অন্তত পক্ষে একজন রুশি অপরাধীর কাছে, যেহেতু রুশি অপরাধীরা আবার ধর্মবিশ্বাসীও বটে। অবশ্য—কে-ই বা জানে?—সেক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটলেও ঘটতে পারত: অপরাধীর হতাশ হৃদয় হয়তো তার বিশ্বাস হারাত। তখন কী হত? কিন্তু স্নেহময়ী ও করুণাময়ী জননীর মতো গির্জা সমস্ত রকম সক্রিয় শাস্তিবিধান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে, যেহেতু তার দেওয়া দণ্ড ছাড়াই রাষ্ট্রের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অপরাধী ইতিমধ্যে বড়ো বেশি মারাত্মক শাস্তি পেয়েছে; তাই অন্তত এমন একজন কেউ থাকা দরকার যে তাকে করুণা করবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, গির্জা নিজেকে যে দূরে সরিয়ে রাখে তার কারণ এই যে একমাত্র গির্জার বিচারই এমন বিচার যার মধ্যে সত্য নিহিত আছে এবং সেই হেতু বস্তুগত ও নৈতিক কোনও ভাবেই অন্য কোনও বিচারের সঙ্গে তার সংযুক্তি পর্যন্ত ঘটতে পারে না, সাময়িক আপসও সম্ভব নয়। এখানে লেনদেনের ভেতরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শোনা যায়, অন্য দেশের অপরাধীরা কদাচিৎ অনুশোচনা করে, কেন না অতি আধুনিক এমন সব মতবাদও আছে যেগুলি অপরাধীর মনের মধ্যে এই ভাবে গেঁথে দেয় যে তার অপরাধ কোনও অপরাধ নয়—উৎপীড়নকারীর অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ মাত্র। সমাজ যান্ত্রিক ভাবে তার নিজের ওপর পূর্ণ আধিপত্যকারী এক শক্তির সাহায্যে তার দেহ থেকে অপরাধীকে কেটে বাদ দেয় এবং এই বহিষ্কারের হাত ধরে আসে ঘৃণা—ইউরোপে অন্তত লোকেরা নিজেদের সম্পর্কে এমন কথাই বলে—আর এ এমনই এক ধরনের ঘৃণা, যা একজন বিপথগামী

ভ্রাতার ভাগ্য এর পর কী হতে পারে সে সম্পর্কে চরম উদাসীন ও বিস্মৃত। এইভাবে গির্জার এতটুকু করুণা ছাড়াই এসব ঘটছে, কেননা অনেক ক্ষেত্রে ওসব দেশে গির্জা বলতে আদৌ কিছু নেই, থাকার মধ্যে আছে কেবল গির্জার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু লোকজন ও গির্জার জমকাল সব দালান, খোদ গির্জাগুলো সেখানে অনেককাল হলই গির্জার মতো নিম্নতর অবস্থা থেকে রাষ্ট্রের মতো উচ্চতর অবস্থায় উত্তরণের চেষ্টা করছে, আর তা করছে এই উদ্দেশ্যে যাতে রাষ্ট্রের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। অন্ততপক্ষে লুটরীয় দেশগুলিতে তো অবস্থাটা এমনই মনে হয়। এদিকে রোমে আজ এক হাজার বছর হল গির্জার বদলে ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্র। ঠিক এই কারণেই অপরাধী নিজে যে গির্জার একজন সদস্য এই বিষয়ে সে সচেতন নয়, এবং বহিষ্কৃত হওয়ার পর সে হতাশায় ডুবে যায়। আর সমাজে যদি ফিরে আসে তখন অনেক সময় এমনই ঘৃণা নিয়ে ফিরে আসে যে খোদ সমাজ অনেকটা যেন নিজে থেকেই তাকে বহিষ্কার করে দেয়। এর পরিণতি কী হতে পারে সে বিচার আপনারা নিজেরাই করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে আমাদের নিজেদেরও বুঝি ব্যাপারটা ওই রকমই; কিন্তু ঘটনা এই যে আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত আইন আদালত ছাড়া গির্জাও আছে, যে গির্জা অপরাধীকে পরম স্নেহভাজন এবং এখন পর্যন্ত আপন প্রিয় পুত্র হিসেবে গণ্য করে তার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ হারায় না; তদুপরি, শুধুমাত্র মনে মনে যদিও বা হয়, তবু আরও যেটা আছে, যেটা বজায় আছে, সেটা হল গির্জার বিচার, যা এখন সক্রিয় না হলেও ভবিষ্যতের চিন্তা হিসেবে এখনও বেঁচে আছে—অন্তত স্বপ্ন হিসেবে হলেও আছে, এবং একজন অপরাধী তার হৃদয়ের সহজাত বোধ দিয়ে তা চিনতে পারে। গির্জার বিচারালয় যদি সত্যি সত্যি কাজে পরিণত হত, যদি তার পূর্ণশক্তিতে কাজ করতে পারত, অর্থাৎ গোটা সমাজটা যদি স্রেফ গির্জা হয়ে যেত, তাহলে গির্জার বিচার অপরাধীর সংশোধনকে প্রভাবিত করত—এমন ভাবে করত যে ভাবে বর্তমানে কখনই করে না— শুধু তা-ই নয়, অপরাধ নামে বস্তুটিই অসম্ভব মাত্রায় কমে যেত —এই যে কথাগুলি এই মাত্র এখানে বলা হয়েছে তাও ন্যায়সঙ্গত। তাছাড়া এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতের অপরাধী ও ভবিষ্যতের অপরাধকে আজ যে দৃষ্টিতে দেখা হয় গির্জা অনেক ক্ষেত্রেই তার চাইতে একেবারে অন্য দৃষ্টিতে দেখত এবং সম্প্রদায়চ্যুত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হত, কুমতলবিকে নিবৃত্ত করতে পারত, অধঃপতিতের পুনর্জন্ম ঘটাতে পারত।" মৃদু হেসে মহাস্থবির বললেন, "এটা ঠিক, খ্রিস্টীয় সমাজ নিজে এখনও প্রস্তুত নয়, শুধু পুণ্যাত্মা সপ্তর্ষির জোরে দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু তাঁদেরও কোনও ঘাটতি নেই, তাই যে সমাজ এখনও প্রায় পৌত্তলিক ধরনের একটি সম্প্রদায় হয়ে আছে, এক ঐক্যবদ্ধ, বিশ্বজনীন ও সার্বভৌম আধিপত্য বিস্তারকারী গির্জায় পরিপূর্ণ রূপান্তরের প্রত্যাশায় তা অটল ভাবে অবস্থান করছে। হোক, তা-ই হোক, যুগ-যুগান্তরের শেষে হলেও হোক, কেন না এটা যে ঘটবেই

তা পূর্বনির্ধারিত। আর সময় বা মেয়াদ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, যেহেতু সময় বা মেয়াদের রহস্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, তাঁর দিব্যদৃষ্টি ও তাঁর প্রেমের মধ্যে নিহিত। আর মানবিক গণনায় যা হয়তো এখনও বড়ো বেশি দূরের বিধির পূর্বনির্ধারণক্রমে তা হয়তো আবির্ভাবের ঠিক প্রাক্কালে, একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই শেষ ব্যাপারটা সম্পন্ন হোক, তথাস্তু!”

“তথাস্তু! তথাস্তু!” পরম ভক্তিভরে, কঠিন স্বরে সমর্থন করে আওড়ালেন প্রভু পাইসি।

“আশ্চর্য! বড়োই আশ্চর্যের!” ঠিক উত্তেজিত হয়ে নয়, অনেকটা যেন এক ধরনের চাপা বিরক্তিভরে উচ্চারণ করল মিউসভ্।

“কীসে আপনার এত আশ্চর্য লাগছে বলুন তো?” সাবধানে জানতে চাইলেন সাধু ইওসিফ্।

“বলি, এসব আসলে কী?” হঠাৎ যেন ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠল মিউসভ্। “পৃথিবী থেকে রাষ্ট্র উবে গেল আর গির্জা কিনা রাষ্ট্রের পর্যায়ে গিয়ে উঠল! এটা যে উল্‌ত্রামন্তানবাদ তা নয়, এত দেখছি মহা উল্‌ত্রামন্তানবাদ! স্বয়ং পোপ সপ্তম গ্রিগোরিরও স্বপ্নের বাইরে”!

“কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কিন্তু একেবারে উলটোটা বুঝলেন”, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন প্রভু পাইসি। “গির্জা যে রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে তা নয়—এটা বোঝার চেষ্টা করুন। সে তো রোম, তার স্বপ্ন। সেটা শয়তানের তৃতীয় প্রলোভন!* বরং রাষ্ট্রই গির্জায় পরিবর্তিত হচ্ছে, গির্জার পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে, দুনিয়াজোড়া গির্জা হয়ে উঠছে—যা কিনা উল্‌ত্রামন্তানবাদ ও রোমের এবং আপনার ভাষ্যেরও সম্পূর্ণ বিপরীত, আর এটাই পৃথিবীতে রুশ সনাতন খ্রিস্টধর্মের জন্য নির্ধারিত পরম ভাগ্য। সে তারকার দীপ্তি প্রকাশ পাবে পুব থেকে।”

মিউসভ্ অর্থপূর্ণ ভাবে চুপ করে রইল। তার সমগ্র আকৃতির মধ্যে ফুটে উঠল অসাধারণ এক ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ। তার ঠোঁটে খেলে গেল উন্নাসিকতা মিশ্রিত অনুতাপের হাসি। আলিয়োশা দুরুদুরু বুকে সমস্ত কিছুর ওপর লক্ষ রেখে যাচ্ছিল। এই সমস্ত কথাবার্তা তাকে সমূলে বিচলিত করে তুলেছিল। দৈবাৎ তার চোখ পড়ে গেল রাকিতিনের দিকে। রাকিতিন দরজার পাশে তার আগের জায়গাটাতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল ও লক্ষ করছিল, যদিও চোখ নামিয়ে। কিন্তু তার দুই গালে যে রকম রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে তাতে আলিয়োশা আন্দাজ করতে পারল যে রাকিতিনও উত্তেজিত, আর সেই উত্তেজনা, মনে হয় আলিয়োশার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আলিয়োশা জানে রাকিতিনের উত্তেজনার কারণ কী।

---

শয়তানের প্রলোভন প্রসঙ্গে ৮৫ সংখ্যক টীকা দ্র.

অর্থপূর্ণ ভাবে এবং বিশেষ করে কেমন যেন একটা গুরুগম্ভীর চালে মিউসভ্ হঠাৎ বলে উঠল, "ভদ্রমহোদয়গণ, যদি অনুমতি দেন তো একটা ছোটো ঘটনার কথা আপনাদের বলি। প্যারিসে, তা আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে, ডিসেম্বরের কু দে তা'র'' ঠিক পর পর হবে, পরিচয় সূত্রে অত্যন্ত গণ্যমান্য এবং তখনকার দিনের একজন বড়ো কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে একবার তার বাড়িতে রীতিমতো কৌতূহলজনক এক বড়লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। ওই ব্যক্তিটি ঠিক যে গোয়েন্দা ছিলেন এমন নয়, তিনি ছিলেন রাজনৈতিক গুপ্তচর সংস্থার পুরো একটি বাহিনীর একজন পরিচালক গোছের, যেটা এক ধরনের যথেষ্ট প্রভাবশালী পদও বটে। অত্যন্ত কৌতূহলবশত এই সুযোগে আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় লেগে পড়লাম। আর উনি যেহেতু কোনও আলাপ-পরিচয়ের সূত্রে আসেননি, এসেছিলেন একজন অধস্তন সরকারি কর্মচারী হিসেবে মামুলি ধরনের একটা রিপোর্ট নিয়ে, তাই তাঁর ওপরওয়ালা আমাকে যেভাবে গ্রহণ করলেন তা দেখে তিনি আমাকে খাতির করে আমার সঙ্গে আলাপে খানিকটা অকপট হলেন— তবে, বলাই বাহুল্য, একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁকে ঠিক অকপট না বলে সম্ভবত ভদ্র বলাই ভালো, ঠিক সে ধরনের ভদ্র হতে ফরাসিরা জানে—বিশেষত আমাকে যখন একজন বিদেশি বলে চিনতে পারল। তবে আমি তাঁকে বেশ বুঝতে পারলাম। কথা হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের নিয়ে, যাদের ওপর, প্রসঙ্গত, তখন নির্যাতন চলছিল। কথাবার্তার মূল বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক মন্তব্যের উল্লেখ করব যা আল্‌টপকা এই ভদ্রসন্তানটির মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন: 'দেখুন, আসলে এই সব সোশ্যালিস্টদের— নৈরাজ্যবাদী বলুন, নিরীশ্বরবাদী বলুন আর বিপ্লবীই বলুন—এদের আমরা বড়ো একটা ভয় পাই না। এদের ওপর আমরা নজর রাখি, এদের গতিবিধি আমাদের জানা আছে। তবে তাদের মধ্যে, স্বল্পসংখ্য হলেও, বিশেষ ধরনের গুটি কয়েক লোক আছে: তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও খ্রিস্টান, আবার একই সঙ্গে সোশ্যালিস্টও। ঠিক এদেরই কিন্তু আমরা সবচাইতে বেশি ভয় পাই। এরা ভয়ঙ্কর জাতের লোক! খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট নিরীশ্বরবাদী সোশ্যালিস্টদের চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর।' কথাগুলো শুনে তখনই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এখন, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের এখানে কথাবার্তা প্রসঙ্গে কেমন করে যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেল।..."

"তার মানে আপনি সেগুলো আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন? আমাদের মধ্যে সোশ্যালিস্টদের গন্ধ পাচ্ছেন?" কোনো রকম ভণিতা না করে সরাসরি প্রশ্ন করলেন ফাদার পাইসি।

কিন্তু পিয়োতর্ আলেক্সান্দ্রভিচ্ এর উত্তরে কী বলবেন ভেবে বের করার আগেই ঘরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে এসে ঢুকল বড়ো বেশি বিলম্বে আগত দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ। সত্যি কথা বলতে গেলে কি তার জন্য অপেক্ষা করে করে সকলে

হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তাই তার আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথম মুহূর্তে সকলে খানিকটা চমকেই উঠেছিল।

## ছয়

## এমন লোক বেঁচে থাকে কী বলে!

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ মাঝারি উচ্চতার আটাশ বছরের যুবা, মুখখানা তার ভালোই, তবে তাকে বয়সের তুলনায় অনেক বড়ো দেখায়। পেশীবহুল বটে এবং তার মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দৈহিক শক্তি আছে বলেও অনুমান করা যায়, তা সত্ত্বেও তার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে কেমন যেন একটা অসুস্থতার ভাব প্রকাশ পায়। মুখটা শীর্ণ, গাল দুটো বসে গেছে, আর সেই দুই গাল এক ধরনের রুগ্‌ণ হলদে আভায় ছেয়ে আছে। তার বেশ বড়ো বড়ো গভীর কালো চোখজোড়া দেখে যদিও মনে হয় বিস্ফারিত হয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টিতেই চেয়ে আছে, অথচ তারই মধ্যে আছে কেমন যেন একটা অনিশ্চিত ভাব। এমনকি যখন সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বিরক্তির সঙ্গে কোনো কথা বলে তখনও তার চোখের দৃষ্টি তার মানসিক অবস্থা বা মেজাজের বশ মেনে চলে না, তাতে যেন প্রকাশ পায় অন্য একটা কিছু — মাঝে মাঝে এমন একটা কিছু যা বর্তমান মুহূর্তের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। 'ও যে কী ভাবছে জানা কঠিন', ওর সঙ্গে যারা কথা বলে অনেক সময় তারা এমন মতও ব্যক্ত করে থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে আবার এমনও হয়েছে যে যখন তার চোখে গভীর ভাবমগ্ন ও বিষাদাচ্ছন্ন একটা কিছু দেখতে পেয়েছে তখন হঠাৎ অবাক হয়ে গেছে তাকে আচমকা এমন হাসিতে ফেটে পড়তে দেখে, যে হাসি তার মনের গহনে উল্লসিত ও কৌতুকপ্রদ ভাবনার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে, অথচ ঠিক তখনই কিনা সে কটমট করে তাকাচ্ছে। প্রসঙ্গত তার মুখে এই যে এক ধরনের অসুস্থতার ছাপ তা এই মুহূর্তে বোধগম্য হলেও হতে পারে: অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও হুল্লোড়বাজের জীবনে এই সম্প্রতি আমাদের এখানে সে যে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তা সকলেই জানে অথবা শুনে থাকবে, সেই সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত কিছু বিতর্কের জেরে বাপের সঙ্গে তার বিবাদ যে অস্বাভাবিক তিক্ততায় পৌঁছে গেছে সেটাও সকলের সমান জানা ছিল। শহরে ইতিমধ্যে এ নিয়ে বেশ কিছু গল্পও চালু হয়ে গেছে। তার সম্পর্কে আমাদের সামাজিক শান্তি রক্ষা আদালতের বিচারপতি** সেমিয়োনি ইভানভিচ কাচাল্‌নিকভ একবার যে বলেছিলেন, 'খাপছাড়া ও ভ্রান্তবুদ্ধির' লোক, সেটাই তার যথার্থ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

দ্‌মিত্রি এসেছে নিখুঁত ও কেতাদুরস্ত সাজগোজ করে। গায়ে বোতাম আঁটা লম্বা ঝুলকোট, কালো দস্তানামোড়া হাতে ধরে রেখেছে মাথা থেকে খোলা উঁচু টুপিটা।

সবে সেনাবাহিনী ছেড়ে আসা একজন সামরিক ব্যক্তির মতো এখনও সে গোঁফ রাখে, দাড়ি এখনও কামায়। তার ঘন বাদামি রঙের চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, এমন ভাবে আঁচড়ানো যে জুলফিজোড়া বেশ খানিকটা সামনে চলে এসেছে। লড়াইয়ের ময়দানের একজন সৈনিকের মতো তার লম্বা লম্বা দৃঢ় পদক্ষেপ। এক লহমার জন্য দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মহাস্থবিরই যে এখানকার কর্তা তা অনুমান করে সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল। অনেকখানি নীচু হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করল। মহাস্থবির তাঁর আসন ছেড়ে সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। দ্মিত্রি ফিয়োদর্‌ভিচ সসম্ভ্রমে তাঁর হস্তচুম্বন করল এবং ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত অদ্ভুত উত্তেজনাভরে বলে উঠল:

"অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি—নিজের মহত্ত্বের গুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন প্রভু। কিন্তু স্মের্দিকোত্‌ নামে যে চাকরটিকে বাবামশাই আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন সময় সম্পর্কে আমার সনির্বন্ধ প্রশ্নের উত্তরে সে দু দুবার দৃঢ়স্বরে আমাকে বলেছিল যে সাক্ষাৎকারটা একটার সময় ধার্য করা হয়েছে। এখন হঠাৎ জানতে পারলাম..."

"চিন্তার কোনো কারণ নেই", তাকে বাধা দিয়ে মহাস্থবির বললেন, "সামান্য একটু দেরি হয়েছে তো কী হয়েছে? এতে কোনও বিপত্তি ঘটেনি..."

"আপনার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ, আপনার উদারতা থেকে অবশ্য এর চেয়ে কম কিছু প্রত্যাশাও করতে পারিনি", মোক্ষম জবাবটা দিয়ে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ আরও একবার মাথা নোয়াল, তারপর হঠাৎ তার 'বাবামশাইয়ের' দিকে ফিরে অনেকখানি নীচু হয়ে তাকেও তেমনি সসম্মানে অভিবাদন জানাল। দেখেশুনে বোঝাই যাচ্ছিল মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানানোর ব্যাপারটা সে আগে থাকতে ভেবেচিন্তে ঠিক করে এসেছে, আন্তরিকভাবে মনে মনে ভেবে দেখেছে যে এই ভাবে নিজের শ্রদ্ধানিবেদন ও সদভিপ্রায় প্রকাশ করা তার এক ধরনের কর্তব্য।

ফিয়োদর্‌ পাভ্‌লভিচ যদিও এতে হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিজস্ব ধরনে একটা সমুচিত জবাব খুঁজে পেতে তার দেরি হল না: দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানানোর প্রত্যুত্তরে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক একই রকম ভাবে সেও অনেকখানি নীচু হয়ে মাথা নুইয়ে ছেলেকে অভিবাদন জানাল। তার মুখটা হঠাৎ গুরুগম্ভীর ও প্রভাবব্যাঞ্জক হয়ে উঠল, এতে অবশ্য তাকে রীতিমতো কুটিল দেখাতে লাগল। দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ অতঃপর নিঃশব্দে ঘরে উপস্থিত সকলকে সাধারণভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে তার লম্বা লম্বা দৃঢ় পদক্ষেপে জানলার ধারে গিয়ে সেখানে ফাদার পাইসির থেকে অল্প খানিকটা দূরে যে একমাত্র খালি চেয়ারটা ছিল তাতে বসে পড়ল; তার আগমনে সকলের কথাবার্তায় যে ছেদ পড়েছিল, চেয়ারে বসা অবস্থাতেই গোটা শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তারই সূত্র ধরে কিছু শোনার জন্য সে প্রস্তুত হল।

দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের আগমনে যেটুকু সময় গিয়েছিল তা মিনিট দুয়েকের বেশি হবে না, তাই আলোচনা আবার শুরু না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু এবারে প্রভু পাইসির সনির্বন্ধ ও প্রায় বিরক্তিকর প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ্।

"যদি অনুমতি করেন তো এই প্রসঙ্গটা না হয় থাক", এক ধরনের পরিশীলিত তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে মিউসভ্ বলে উঠল। "তাছাড়া বিষয়টা বেশ খানিকটা জটিলও। ওই তো ইভান ফিয়োদরভিচ্ আমাদের দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে: হয়তো এ বিষয়েও কৌতূহলজনক কিছু ওর কাছে আছে। ওকেই জিগ্‌গেস করুন না কেন।"

"বিশেষ কিছু নয়, শুধু একটা ছোটো মন্তব্য ছাড়া", তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ইভান ফিয়োদরভিচ। "ব্যাপারটা এই যে সাধারণভাবে ইউরোপীয় উদারপন্থীরা, এমনকি আমাদের রুশদেশের পল্লবগ্রাহী উদারপন্থীরা অনেক সময় এবং আজ বহুকাল হল খ্রিস্টধর্মের চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গে সোশ্যালিজমের চূড়ান্ত ফলাফলকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এই উৎকট সিদ্ধান্ত অবশ্যই তাঁদের একটি লক্ষণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত, দেখা যাচ্ছে, সোশ্যালিজমকে যে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে সে কেবল উদারপন্থী আর পল্লবগ্রাহীরাই নয়, তাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিলিটারি পুলিশের লোক, অর্থাৎ বলাই বাহুল্য, বিদেশি পুলিশও আছে। আপনার প্যারিসের গল্পটি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ।"

"আবারও আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি, এ আলোচনা একেবারে বন্ধ হোক", পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ আবার বলল, "বরং ভদ্রমহোদয়গণ, তার বদলে আরেকটি ঘটনার কথা আমি আপনাদের বলব। এটা স্বয়ং ইভান ফিয়োদরভিচকে নিয়ে—খুব ইন্টারেস্টিং আর অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচকও বটে। এই দিন পাঁচেকের বেশি দিন আগেকার ঘটনা নয়, এখানকার এক সামাজিক আসরে—আসরটা মুখ্যত মহিলাদের—তর্কাতর্কির মধ্যে সে সাড়ম্বরে ঘোষণা করল যে সারা দুনিয়ায় একেবারেই এমন কিছু নেই যা মানুষকে তার নিকটতম প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারে, মানুষ যাতে মানবজাতিকে ভালোবাসে প্রকৃতিতে এমন কোনো নিয়মের আদৌ কোনও অস্তিত্ব নেই, আর পৃথিবীতে আজও যদি প্রেম বলে কিছু থেকে থাকে এবং আজ পর্যন্ত ছিল বলে দেখাও যায় তাহলে সেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মবশত নয়, স্রেফ এই কারণে যে মানুষ তার অমরত্বে বিশ্বাসী। ইভান ফিয়োদরভিচ এই প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত বাক্যরূপে যোগ করলেন যে সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়মের মূল কথা এই বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত, তাই নিজের অমরত্ব সম্পর্কে মানুষের এই যে বিশ্বাস একবার যদি তাকে নষ্ট করে দেওয়া যায় তাহলে শুধু ভালোবাসা কেন, যে সমস্ত জীবনীশক্তি পার্থিব জীবনের ধারা অব্যাহত রাখে সেগুলির সব কটি সেই মানুষের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, তখন আর নীতিবিগর্হিত

বলে কিছু থাকবে না, সবেরই অনুমোদন থাকছে— এমনকি নরমাংস ভক্ষণেরও। কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়, সে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বলে তার বক্তব্য শেষ করল যে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের কাছে—এই এখন আমরা যেমন, না ঈশ্বরে না নিজেদের অমরত্বে, কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না—তাদের কাছে, প্রকৃতির নৈতিক নিয়ম তৎক্ষণাৎ অবশ্যই আগেকার ধর্মীয় নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীতে বদলে যাবে এবং স্বার্থপরতা—দুষ্কর্মের পর্যায়ে চলে গেলেও—মানুষের কাছে বৈধ তো হবেই, এমনকি তার এই অবস্থায় সর্বাধিক বিচক্ষণ, অপরিহার্য, বলতে গেলে, পরম সম্মানজনক পরিণতি রূপে স্বীকৃত হবে। ভদ্রমহোদয়রা, উৎকেন্দ্রিক ও কূট-তার্কিক, আমাদের পরম প্রিয়পাত্র এই ইভান ফিয়োদরভিচ কৃপাপরবশ হয়ে কী জাহির করবেন এবং আর কী যে জাহির করা সম্ভবত তার অভিপ্রায়, বাকি সে সব কিছুই তাঁর এহেন কূটাভাস থেকে আপনারা অনুমান করতে পাবেন।"

"মাফ করবেন", অপ্রত্যাশিত ভাবে, হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, "যদি আমি ভুল শুনে না থাকি: তাহলে যে-কোনো নিরীশ্বরবাদীর কাছে দুষ্কর্ম শুধু বৈধই হবে না, এমনকি পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারলাভের অত্যাবশ্যক ও সর্বাধিক বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় রূপে স্বীকৃত হবে! তাই তো, না কি?"

"ঠিক তাই", ফাদার পাইসি বললেন।

"মনে থাকবে।"

এই কথাগুলি বলে, যেমন আকস্মিকভাবে কথাবার্তার মধ্যে উড়ে এসে পড়েছিল তেমনি আকস্মিকভাবেই চুপ করে গেল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। সকলে তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

"আত্মার অবিনশ্বরতায় মানুষের আস্থা চলে যাবার পরিণাম সম্পর্কে সত্যিই কি এই তোমার দৃঢ় বিশ্বাস?" হঠাৎ ইভান ফিয়োদরভিচকে জিগ্‌গেস করলেন মহাস্থবির।

"হ্যাঁ, আমি জোর দিয়ে একথা বলেছিলাম। অমরত্ব না থাকলে সৎগুণ নেই।"

"এই যদি তোমার বিশ্বাস হয় তাহলে বলব তুমি পরম স্বর্গসুখের অধিকারী, নয়তো বড়োই অসুখী!"

"অসুখী কেন?" মুচকি হাসল ইভান ফিয়োদরভিচ।

"কারণ এই যে খুব সম্ভবত তুমি নিজেই তোমার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস কর না, এমনকি গির্জা এবং সেই সংক্রান্ত প্রবন্ধে যা যা লিখেছ তাতেও না।"

"হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন!... তবে এটাও ঠিক, আমি কিন্তু মোটেই ঠাট্টা করে বলিনি হঠাৎ অদ্ভুতভাবে স্বীকার করে বলল ইভান ফিয়োদরভিচ, সঙ্গে সঙ্গে তার গাল দুটোও অবশ্য দ্রুত লাল হয়ে উঠল।

"ঠাট্টা মোটেই করনি, একথা সত্য। এই আইডিয়াটা তোমার অন্তরে এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে, তোমাকে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু যে ব্যক্তি যন্ত্রণা ভোগ করে

সেও অনেক সময় তার হতাশা নিয়ে মজা করতে ভালোবাসে, অনেকটা যেন হতাশাবশতই। আপাতত তুমিও লৌকিক তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে হতাশাবশত মজা করছ, অথচ প্রতিপক্ষের যুক্তির দ্বান্দ্বিকতা[২২] দেখতে পেয়ে তার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হয়েছ তোমার নিজের কিন্তু তাতে বিশ্বাস নেই এবং দ্বান্দ্বিকতার সেই যুক্তিকে মনে মনে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তুমি ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাও।... তোমার অন্তরে এ প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়ে গেছে, আর এখানেই তোমার বড়ো দুঃখ, যেহেতু তা একটি সিদ্ধান্তে আমার সনির্বন্ধ দাবি জানাচ্ছে।...”

“কিন্তু সেটা কি আমার মধ্যে সমাধিত হতে পারে? তার সদর্থক সমাধান ঘটতে পারে কি?” তখনও কেমন যেন দুর্বোধ্য একটা হাসি নিয়ে মহাস্থবিরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে প্রশ্ন করে চলল ইভান ফিয়োদরভিচ।

সদর্থক সমাধান যদি সম্ভব না হয়, তাহলে নেতিবাচকও কদাপি হবে না, তুমি নিজেই তোমার অন্তরের এই প্রবৃত্তি জান, আর এখানেই তার যত যন্ত্রণা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রতি তোমার এই কারণে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে তিনি তোমাকে অতি উন্নত ধরনের এমন একটি হৃদয় দিয়েছেন যা এরকম যন্ত্রণা ভোগ করার ক্ষমতা রাখে—যা 'উচ্চলোকের সন্ধানী, উচ্চচিন্তার জগতে বিচরণশীল, যেহেতু আমাদিগের বাসভূমি স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত।' ঈশ্বর করুন যেন এই পৃথিবীতে অবস্থানকালেই তোমার হৃদয় তোমার প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পায়। তোমার এই পথে ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন।”

মহাস্থবির হাত তুললেন, যেখানে ছিলেন যেখান থেকেই ক্রুশচিহ্ন এঁকে ইভান ফিয়োদরভিচকে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ্ অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করল, তাঁর হস্তচুম্বন করে নীরবে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। তার চেহারায় কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। ইভান ফিয়োদরভিচের এ হেন আচরণ এবং ইতিপূর্বে মহাস্থবিরের সঙ্গে তার কথাবার্তার সবটাই তার দিক থেকে এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে এর মধ্যে নিহিত এক ধরনের রহস্যময়তা, এমনকি কেমন যেন একটা আনুষ্ঠানিক ভাবগাম্ভীর্য উপস্থিত সকলকে স্তম্ভিত করে দিল—তারা এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গেল যে মিনিটখানেকের মতো তাদের কারও মুখ থেকে কোনও বাক্যস্ফূর্তি হল না, আর আলিয়োশার মুখে ফুটে উঠল প্রায় আতঙ্কের ভাব। কিন্তু স্তব্ধতা ভাঙল যখন মিউসভ হঠাৎ তার কাঁধদুটো ঝাঁকাল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

“পরম পুণ্যাত্মা ও দেবতুল্য মহাস্থবির!” পুত্র ইভান ফিয়োদরভিচকে দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। “এটি আমার পুত্র, আমার অস্থিমজ্জা, আমার নিজের অতি প্রিয় রক্তমাংসে গড়া! এটি আমার, পরম সম্ভ্রম উদ্রেককারী, যাকে বলে কার্ল মোওর, আর এই যে পুত্রটি এইমাত্র প্রবেশ করল, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্, যার বিরুদ্ধে আমি

আপনাদের কাছে ন্যায়বিচার চাইছি, এটি হল গিয়ে অসম্ভ্রম উদ্রেককারী ফ্রান্ৎস মোওর—দুটিই উঠে এসেছে শিলারের 'ডাকাত' পালা থেকে, আর আমি, আমি হলাম সেক্ষেত্রে আধিপত্যকারী কাউন্ট ফন্ মোওর।[২২] বিচার করুন, বিচার করে বাঁচান! আমাদের যেটা দরকার সেটা কেবল প্রার্থনা নয়, আপনার ভবিষ্যদ্বাণীও।"

"ক্ষ্যাপামি ছেড়ে যা বলার বলুন, তাছাড়া নিজের বাড়ির লোকজনকে অপমান করতে যাবেন না", ক্ষীণ ও অবসন্ন কণ্ঠে মহাস্থবির উত্তরে বললেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল তিনি যেন উত্তরোত্তর বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, আর বেশ লক্ষণীয়ভাবেই শক্তি হারিয়ে ফেলছেন।

"একটা বেয়াড়া ধরনের রসিকতা—এরকম যে ঘটবে আমি এখানে আসার আগেই টের পেয়েছিলাম!" ঘৃণায় ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠে সেও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। "ক্ষমা করবেন, পরম আরাধ্য প্রভু", মহাস্থবিরকে উদ্দেশ করে সে বলল, "আমি তেমন একটা শিক্ষিত লোক নই, আপনাকে কী বলে সম্বোধন করতে হয় তাও জানি না, তবে এটা ঠিক যে ওরা আপনাকে ঠকিয়েছে, আপনার এখানে এসে আমাদের জড় হতে দিয়ে আপনি বড়ো বেশি ভালোমানুষির পরিচয় দিয়েছেন। বাবামশাইয়ের দরকার স্রেফ একটা কেলেঙ্কারি বাধানো—কেন, সেটা অবশ্য তিনিই জানেন। সব সময়ই তাঁর নিজস্ব একটা হিসাব আছে। তবে আমার মনে হয়, কী কারণে, সেটা আমি এখন জানি।"

"সবাই আমাকে দোষ দেয়, ওরা সবাই!" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ তার পালা আসতে চেঁচিয়ে বলল। "এই যে ফিয়োদর আলেক্সান্দ্রভিচ্, উনিও আমাকে দুষছেন। দোষ দিয়েছেন পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ, দোষ দিয়েছেন!" বলতে বলতে হঠাৎই মিউসভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, যদিও তাকে বাধা দেবার কোনো অভিপ্রায় মিউসভের আছে বলে একেবারেই মনে হল না। "সবাই আমাকে এই বলে দুষছে যে আমি বাচ্চাদের জুতোর সুকতলার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছি, ওই টাকার লেনদেন করে নাকি একশতে একশ ফায়দাও উঠিয়েছি। কিন্তু বলুন তো, আইন আদালত বলে কি কিছু নেই? ওহে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, ওই আদালতই তোমার নিজেরই লেখা হাত চিঠি, তোমার চিঠিপত্র আর দলিলের সাহায্যে হিসেব করে বলে দেবে কত টাকা তোমার ছিল, কত উড়িয়েছ আর কতই বা তোমার আছে। পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ কোনো অভিমত প্রকাশ না করে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ তো আর তার পর নয়। এর কারণ, সবাই আমার বিরুদ্ধে, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচই উলটে আমার কাছে ধারে, তার সেই ঋণের অঙ্কও খুব একটা কম নয়—কয়েক হাজার হবে, যার প্রমাণস্বরূপ যাবতীয় দলিলপত্রও আমার কাছে আছে। আরে বাবা, গোটা শহরটাই যে ওর লাম্পট্যের দৌরাত্ম্যে কেঁপে ঝেঁপে অস্থির। তাছাড়া আগে যেখানে সে চাকরি করত সেখানে ভালো স্বভাবচরিত্রের কিছু মেয়েকে ফুঁসলে বের করে আনার দরুন দু এক হাজার

করে তাকে খেসারতও দিতে হয়েছে। বুঝেছ হে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, এই ব্যাপারটা এবং তার অতি গোপনীয় যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের জানা আছে, সেটা আমি প্রমাণও করব।... হে মহাপুণ্যবান প্রভু, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, হালে সে দস্তুরমতো স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতি সচ্চরিত্রের এক কুমারী মেয়েকে পটিয়েছে—ওর আগেকার ওপরওয়ালা অফিসার এক অসমসাহসী কর্নেল, যিনি একজন সম্মানযোগ্য ব্যক্তি, ক্রুশাকারে সাজানো জোড়া তলোয়ার শোভিত আন্নার সামরিক পদক যার গলায় ঝুলছে—এ হল গিয়ে তারই মেয়ে। বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে মেয়েটার ইজ্জত সে নষ্ট করল। সেই মেয়ে এখন এখানে, এখন সে অনাথা, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের বাগদত্তা বটে, কিন্তু দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ তার চোখের সামনেই স্থানীয় এক মনোলোভার পিছনে ঘুরঘুর করছে। মহিলাটি মনোলোভা বটে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান মেনে কারও যে বিয়ে করা বউ তা-ও নয়, তবে থাকে সে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে; কিন্তু তা হলে কী হবে, স্বাধীন চরিত্রের মহিলা এবং সকলের কাছে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ—ঠিক যেন আইনত বিয়ে করা বউটি, কেন না সাধ্বী। হ্যাঁ গো, পুণ্যাত্মা সাধুবাবারা—যা বলছি—সতীসাধ্বী নারী। আর আমাদের দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কিনা সোনার চাবি দিয়ে সেই দুর্গের বন্ধ দুয়ার খুলতে চায়, যে কারণে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে, আমার কাছ থেকে টাকাপয়সা ঝাড়ার তাল করছে। ইতিমধ্যেই অবশ্য ওই মনোলোভাটির পিছনে হাজার হাজার টাকা সে উড়িয়ে দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই না সে সমানে টাকা ধার করে যাচ্ছে। হ্যাঁ প্রসঙ্গত, ধারটা করছে কার কাছে? আপনাদের কী মনে হয়? কী রে মিতিয়া, বলব নাকি?”

“চোপ্!” দ্‌মিত্রি গর্জন করে উঠল। “আমি যতক্ষণ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না যাচ্ছি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করুন। আমার সাক্ষাতে একজন অতি সচ্চরিত্রের কুমারী মেয়ের নামে কুৎসা রটালে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।... আপনি যে তার নাম মুখে আনার মতো স্পর্ধা দেখিয়েছেন এটাই তো তার পক্ষে লজ্জাজনক।... বরদাস্ত করব না!”

বলতে বলতে সে হাঁপাতে লাগল।

“মিতিয়া! মিতিয়া!” খানিকটা চোখের জল নিঙড়ে বার করে স্নায়ুবিকারগ্রস্তের মতো হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল ফিয়োদর পাভলভিচ। “তাহলে কি জন্মদাতা বাপের আশীর্বাদ তোর কাছে কিছুই নয়? আর আমি যদি তোকে অভিশাপ দিই তাহলে কী হবে?”

“বেহায়া, ভণ্ড কোথাকার!” ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠল দ্‌মিত্রি।

“বাপকে কিনা ও এমন কথা বলতে পারল? নিজের বাপকে! অন্যদের সঙ্গে তাহলে ওর ব্যবহারটা কেমন হতে পারে? একবার ভেবে দেখুন, ভদ্রমহোদয়রা: আমাদের এখানে এক গরিব বড়োলোক আছেন; গরিব, তবে সম্ভ্রান্ত বটে, অবসরপ্রাপ্ত

ক্যাপ্টেন, একটা বেশ বড়ো পরিবার নিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে ছিলেন। একবার দুর্ভাগ্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তিনি তাঁর চাকরিটি খোয়ান, তবে প্রকাশ্যে নয়, কোর্ট মার্শাল-টার্শালও কিছু হয়নি, তাইতে তাঁর মানসম্মানও অটুট থাকে। তা এই হপ্তা তিনেক আগেকার ঘটনা: এক শুঁড়িখানায় আমাদের দ্‌মিত্রি বাবাজি করল কি, তাঁর দাড়ি চেপে ধরল, আর সেই দাড়ি ধরেই হিড়হিড় করে তাঁকে রাস্তায় টেনে আনল, রাস্তার ওপরে সবার চোখের সামনেই তাকে বেধড়ক প্রহার করল। এসবের একমাত্র কারণ এই যে বেচারি ভদ্রলোকটি ছোটোখাটো একটা ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়ে গোপনে আমার হয়ে কাজ করছিলেন।"

"মিথ্যে! এসবই ডাহা মিথ্যে! ওপর-ওপর দেখতে গেলে সত্যি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মিথ্যে!" রাগে দ্‌মিত্রির সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। "বাবা মশাই! আমি আমার আচরণের সাফাই গাইছি না। হ্যাঁ, সকলের সামনে স্বীকার করছি, ওই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সেদিন জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছিলাম আর জানোয়ারের মতো সেই ক্রোধ প্রকাশের জন্য আমার নিজেরই নিজের ওপর বিতৃষ্ণা হচ্ছে। কিন্তু আপনার ওই ক্যাপ্টেন, আপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই লোকটি গিয়েছিল সেই ভদ্রমহিলাটির কাছে, যাকে আপনি মনোলোভা বলছেন। আপনার নাম করে তার কাছে প্রস্তাব করেছিল আপনার কাছে আমার যত হুন্ডি আছে সেগুলো তিনি যেন নিয়ে নেন, আর আমি যদি সম্পত্তির হিস্যে নিয়ে আপনাকে বড়ো বেশি উত্যক্ত করি তাহলে ওগুলোর ভিত্তিতে তিনি যেন টাকা আদায়ের জন্য আমার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনেন, যাতে, আমাকে জেলে পোরা যায়। আপনিই এখন আবার এই বলে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন যে এই ভদ্রমহিলার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, আর আপনি নিজেই লোভ দেখিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য তাঁকে শেখাতে-পড়াতে গিয়েছিলেন। উনি কিন্তু কোনো রকম রাখঢাক না করে নিজে থেকে সরাসরি আপনার সব মতলব আমার কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন, এই নিয়ে আপনাকে টিটকিরিও দিয়েছেন। আমাকে যে জেলে দিতে চান তার একমাত্র কারণ ওঁকে নিয়ে আমার সঙ্গে আপনার রেষারেষি, কেন না আপনি নিজেই মহিলাকে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। এসবই কিছু আপনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতেই তিনি নিজমুখে আমাকে বলেছেন। তাহলে পুণ্যাত্মা সাধুজন আপনারা ভালো করে দেখুন কেমন এই মানুষটি, কেমন এই বাপ যে তার দুশ্চরিত্র ছেলেকে তিরস্কার করে। সাক্ষী মহোদয়রা, আমার এই ক্রোধ প্রকাশের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মন আগে থাকতেই বলছিল যে এই কুচুটে বুড়োটা আপনাদের সকলকে যে এখানে ডেকে এনে জড় করেছে সেটা স্রেফ একটা কেলেঙ্কারি বাধানোর মতলবে। তবু আমি ক্ষমা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলাম। উনি যদি একবার আমার দিকে হাতখানি বাড়িয়ে দিতেন তাহলেই আমি ক্ষমা করতে এবং ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যেহেতু তিনি এই মুহূর্তে শুধু আমাকেই নয়, অত্যন্ত সচ্চরিত্রের এমন এক কুমারী মেয়েকেও

অপমান করলেন যাঁর প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধা এত গভীর যে তাঁর নাম পর্যন্ত এখানে অমনি অমনি মুখে আনার মতো স্পর্ধা আমার নেই, তাই মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছি উনি আমার বাপ হলে কী হবে, ওঁর সব জারিজুরি সকলের সামনে ফাঁস করে দেব!...”

এর বেশি সে আর কথা চালাতে পারল না। তার চোখদুটো ধকধক করে জ্বলতে লাগল, তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্রম-প্রকোষ্ঠে উপস্থিত সকলেও উত্তেজিত। বিব্রত হয়ে সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন,—একমাত্র মহাস্থবির ছাড়া! পুরোহিত ব্রতধারী আশ্রমিক সাধুদের চোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠল, তবে তাঁরা অবশ্য মহাস্থবিরের অভিপ্রায় কী হয় তার অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহাস্থবির তখনও বসে ছিলেন। তাঁর চোখমুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, উত্তেজনাবশত নয়, অসুস্থতাজনিত দুর্বলতার কারণে। তাঁর অধরে স্ফুরিত হচ্ছিল মিনতিপূর্ণ মৃদু হাসি। থেকে থেকে তিনি তাঁর হাতটা তুলছিলেন—তুলছিলেন অনেকটা যেন ক্রোধোন্মত্ত দুই পক্ষকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে। অবশ্যই তাঁর একটিমাত্র ইঙ্গিতই এই দৃশ্যের যবনিকাপাত করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু তিনি নিজে যেন আরও কিছুর অপেক্ষায় ছিলেন এবং অপলক দৃষ্টিতে এমন ভাবে নজর করে দেখছিলেন যেন আরও এমন একটা কিছু বুঝে নিতে চাইছেন যা তাঁর কাছে তখনও স্পষ্ট নয়। শেষ পর্যন্ত পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ মিউসভের উপলব্ধি হল তার অপমান ও লজ্জার একশেষ হয়েছে।

“এই যে কেলেঙ্কারিটা ঘটে গেল এর জন্য আমরা সবাই দোষী!” উত্তেজিত স্বরে সে বলল, “তবে এখানে আসার সময় আমি আগে থাকতে কল্পনাও করতে পারি নি, যদিও কাকে নিয়ে কাজে নেমেছি সেটা জানতাম।... এটা এখনই বন্ধ করা দরকার। বিশ্বাস করুন, পরম পূজ্যপাদ, এখানে যা যা প্রকাশ গেল তার সব কিছুর এমন নিখুঁত খুঁটিনাটি আমার জানা ছিল না, সেগুলো বিশ্বাস করতে আমার মন চায়নি, মাত্র এই এখনই প্রথম জানতে পারছি।... একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষকে নিয়ে ছেলের সঙ্গে বাপের রেষারেষি, আবার বাপ নিজে ছেলেকে জেলে পোরার উদ্দেশ্যে সেই ইতরটার সঙ্গেই যোগসাজস করতে যাচ্ছে।... বোঝ কাণ্ড, এরকম একটা সংসর্গে পড়ে কিনা আমাকে এখানে উপস্থিত হতে হল!... আমাকে ওরা ঠকিয়েছে, আমি আপনাদের সকলের সামনে ঘোষণা করছি, অন্য কারও চেয়ে কোনও অংশে কম ঠকিনি আমি।...”

“দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ!” হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ যেন সে কণ্ঠস্বর তার নিজের নয়। “তুমি যদি আমার ছেলে না হতে তাহলে এখুনি তোমাকে ডুয়েল লড়তে ডাকতাম   পিস্তল নিয়ে, তিন পা দূরত্বে একটা রুমালের ভেতর দিয়ে! রুমালের ভেতর দিয়ে!” বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার করে দুই পা-ই মাটিতে ঠুকল”।

যারা বহুকালের পুরনো মিথ্যেবাদী, সারাটা জীবন অভিনয় করে এসেছে, তাদের জীবনে এমন একেকটা মুহূর্ত আসে যখন তারা তাদের ভূমিকার সঙ্গে এমনই একাত্ম হয়ে যায় যে আবেগে সত্যি সত্যি কাঁপতে থাকে অথবা চোখের জল ফেলে— যদিও এমনকি ঠিক সেই মুহূর্তটিতে অথবা তার এক মুহূর্ত পরেও সে ব্যক্তি নিজেকে ফিসফিসিয়ে বলতে পারে: 'তুমি তো জানই যা করছ তা মিথ্যে! তোমার ক্রোধের প্রকাশ যত 'পবিত্রই' হোক, যত 'পবিত্রই' হোক না কেন তোমার ক্রোধের মুহূর্তটি আসলে কিন্তু তুমি একজন অভিনেতাই।'

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি হেনে এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে তার বাপের দিকে তাকাল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

"আমি ভেবেছিলাম... ভেবেছিলাম..." কতকটা শান্ত ও সংযত কণ্ঠে সে বলল, "এটাই ভেবেছিলাম যে আমার প্রাণেশ্বরী আমার বাগদত্তাকে নিয়ে নিজের জন্মভূমিতে এসে ওঁর বৃদ্ধ বয়সে ওঁকে যত্ন আত্তি করব, কিন্তু এসে কী দেখলাম? দেখলাম এ লোকটা একটা লালসাপরায়ণ লম্পট আর অতি নীচ প্রবৃত্তির ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই নয়!"

"ডুয়েল হয়ে যাক!" হাঁপাতে হাঁপাতে, প্রতিটি কথার সঙ্গে থুতু ছিটোতে ছিটোতে চিৎকার করে উঠল বুড়োটা। "আর আপনি, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ মিউসভ্‌, আপনি জেনে রাখুন মশাই, আপনি স্পর্ধা দেখিয়ে 'ইতর জীব' বলে এইমাত্র যার উল্লেখ করলেন তার চেয়ে উন্নত মনের ও সচ্চরিত্রের—শুনছেন?— সচ্চরিত্রের কোনও মহিলা হয়ত আপনার তিন কুলে কেউ কোথাও নেই, ছিলও না। আর এই যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, তুমি, তোমার বাগদত্তাকে ফেলে কিনা ওই 'ইতর জীবটাকেই' ধরেছ! তার মানে, নিজেই মনে মনে বিচার করে দেখেছ যে তোমার ওই বাগদত্তাটি তার পায়ের নখেরও যুগ্যি নয়। তাহলেই দেখ, কেমন সেই 'ইতর জীবটি!"

"কী লজ্জার কথা!" ফাদার ইওসিফের মুখ ফসকে আচমকা বেরিয়ে গেল।

কালাগানভ্‌ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। উত্তেজনায় কাঁপতে কাপতে সে তার ভাঙা ভাঙা কিশোর কণ্ঠে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা।"

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ ততক্ষণে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল। কাঁধদুটো সে কেমন যেন বড়ো বেশি উঁচুতে উঠিয়ে ফেলেছিল, ফলে তাকে প্রায় কুঁজোমতন দেখাচ্ছিল। চাপা গর্জন করে সে বলে উঠল, "এমন লোক বেঁচে থাকে কী বলে! না না, আপনারাই বলুন, এইভাবে পৃথিবীকে কলুষিত করবে এ আর কতদূর হতে দেওয়া যায়?" উপস্থিত সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে আঙুল উঁচিয়ে বুড়োকে দেখাল সে।

"শুনলেন, শুনলেন আপনারা সাধুবাবারা? শুনলেন পিতৃহন্তার কথা?"

ইওসিফের ওপর তেড়েফুঁড়ে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ। "আপনার 'লজ্জার কথা'র এই হল জবাব। এই যে পুরোহিত ব্রতধারী আশ্রমিক সাধুবাবারা, আপনারা যারা মোক্ষর সন্ধান করছেন তাঁরা নিজেরা যতটা পুণ্য সঞ্চয় করেছেন, এই 'ইতর জীবটির', এই 'নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষটির' পুণ্য হয়তো তার চাইতে অনেক বেশি। প্রথম যৌবনে হয়তো বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল, কিন্তু তিনি 'অনেক ভালোবাসা বিলিয়েছেন', আর অনেক ভালোবাসা যিনি বিলিয়েছিলেন এমন একজন নারীকে খ্রিস্টও ক্ষমা করেছেন।*

"খ্রিস্টের ক্ষমা এ ধরনের ভালোবাসার জন্য নয়..." অসহিষ্ণু হয়ে মুখ ফসকে বলে ফেললেন নম্র স্বভাবের সাধু ফাদার পাইসি।

"ভুল বলছেন, এ ধরনের ভালোবাসার জন্য, ঠিক এ ধরনের ভালোবাসার জন্য, এই ভালোবাসার জন্যই, সাধুবাবারা। আপনারা এখানে, এই আশ্রমে শাকাহার করে আপনাদের আত্মার উদ্ধারসাধন করেন, ভাবেন আপনারা সদাচারী! আর যা খান তা তো ওই চুনোপুঁটি, দিনে একটি করে, ভাবেন ওই চুনোপুঁটি দিয়ে ভগবানকে কিনে রাখবেন!"

"অসহ্য! অসহ্য!" আশ্রম-প্রকোষ্ঠের ভেতরে চারদিক থেকে শোনা গেল।

দৃশ্যটা পুরোপুরি অসভ্যতার পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাতে ছেদ পড়ল। হঠাৎ মহাস্থবির তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মহাস্থবির এবং আর সকলের জন্য দুশ্চিন্তায় আলিয়োশা বলতে গেলে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, তবু যা হোক তাড়াতাড়ি করে সময়মতো মহাস্থবিরের হাতাটা চেপে ঠেকা দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। মহাস্থবির দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের দিকে পা বাড়ালেন, তার একেবারে কাছে এসে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। আলিয়োশা আরেকটু হলেই ভাব যাচ্ছিল তিনি দুর্বলতাবশত পড়ে গেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। নতজানু হয়ে মহাস্থবির সজ্ঞানে, সুস্পষ্টভাবে দ্‌মিত্রির পায়ের কাছে মাথা নোয়ালেন, এমনকি তাঁর কপাল পর্যন্ত মাটিতে ঠেকালেন। আলিয়োশা এতই হকচকিয়ে গিয়েছিল যে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার অবকাশ পর্যন্ত পেল না। তাঁর অধরে তখন ঈষৎ স্ফুরিত হচ্ছে ক্ষীণ মৃদু হাসি।

"আমাকে মার্জনা করবেন। আপনাদের সকলের কাছে মার্জনা চাইছি!" চতুর্দিকে মাথা নুইয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। তার পায়ে মাথা ঠেকানো—এর মানে কী? শেষকালে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল: "হা ভগবান!" তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাদবাকি আর সব অতিথিও দল বেঁধে তাকে অনুসরণ করল। তারা এতদূর হতবাক হয়ে

---

* বাইবেলে মেরি মাগ্‌দালিন প্রসঙ্গে যিশুর উক্তি।

গিয়েছিল যে মাথা নুইয়ে গৃহকর্তার কাছ থেকে ঠিকমতো বিদায় পর্যন্ত নিতে পারল না। কেবল পুরোহিত ব্রতচারী আশ্রমিক সাধুরাই আবার তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

"এভাবে উনি যে পায়ে পড়লেন এর অর্থ কী? এটা কি কোনো কিছুর ইঙ্গিত নাকি?" হঠাৎ কেন যেন মিইয়ে গিয়ে নতুন করে কথাবার্তা শুরু করতে গেল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ—অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কাউকে উদ্দেশ করে কথা বলার মতো ভরসা তার হল না। অতিথিরা সকলে এই সময় সন্ন্যাসীর নির্জন আবাসের বেষ্টনী ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল।

"পাগলা গারদ আর পাগলদের কাণ্ডকারখানার জন্য দায়দায়িত্ব আমার নেই", তৎক্ষণাৎ রাগতস্বরে জবাব দিল মিউসভ, "তবে এটা ঠিক আপনাদের এই সঙ্গ আমাকে ছাড়তে হচ্ছে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ, বিশ্বাস করুন একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি। আরে, সেই সাধুবাবাটি আবার কোথায় গেল?..."

কিন্তু 'সেই সাধুবাবাটি' অর্থাৎ যে, এই কিছুক্ষণ আগে মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হল না। অতিথিরা যে-মুহূর্তে মহাস্থবিরের আশ্রম-প্রকোষ্ঠের ছোটো বারান্দার ধাপ ছেড়ে নেমে এলো অমনি তার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল—যেন সারাক্ষণ ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

"দয়া করে আমার একটা উপকার করবেন মাননীয় সাধুবাবা, মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন, আমি মিউসভ্ বলছি, ব্যক্তিগত ভাবে আমার হয়ে অশেষ শ্রদ্ধাভাজন তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বলবেন যে আকস্মিক ভাবে অদৃষ্টপূর্ব এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যার ফলে আমার আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভোজসভার নিমন্ত্রণে যোগদানের সম্মান আমি গ্রহণ করতে পারছি না" বিরক্তির সঙ্গে পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ্ সাধুটিকে বলল।

"আরে, অদৃষ্টপূর্ব যে পরিস্থিতির কথা হচ্ছে সে তো আমিই" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ তৎক্ষণাৎ কথাটা লুফে নিয়ে বলে উঠল। "বুঝলেন সাধুবাবা, আসলে পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ আমার সংসর্গে থাকতে চান না, নইলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেন। তা যাবেন তো যান না, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুগ্রহপূর্বক মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোজসভায় আপনার পদার্পণ ঘটুক, আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি হোক! জানবেন, আপনি নন, আমিই সরে যাচ্ছি। বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি, বাড়ি গিয়েই খাব, এখানে নিজেকে অপারগ বলে মনে হচ্ছে, আমার পরম আত্মীয়, পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ্ ভায়া।"

"আমি আপনার আত্মীয় নই, কখনও ছিলামও না। আপনি একটা ছোটোলোক!"

"আমি ইচ্ছে করেই বলেছি আপনাকে একটু খেপিয়ে দেবার জন্য, কেন না আপনি বরাবর আত্মীয়তা অস্বীকার করে থাকেন, যদিও যত ফন্দিফিকিরই করুন

না কেন, গির্জার খাতাপত্র থেকে আমি প্রমাণ করে ছাড়ব। আর ইভান ফিয়োদরভিচ্, তুমিও, চাইলে থাকতে পার, আমি পরে বাড়ি ফিরে গিয়ে যথাসময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আর আপনি পিয়োতর আলেক্সান্দ্রাভিচ, এমনকি ভদ্রতার খাতিরেই আপনার উচিত হবে মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়ে আমরা ওখানে যে অসভ্যতা করেছি তার জন্য ক্ষমা চাওয়া।...

"আরে আপনি কি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন নাকি? মিছে কথা বলছেন না তো?"

"পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ! যা ঘটে গেল তারপর আর থাকি কোন্ মুখে বলুন? মাফ করবেন ভদ্রমহোদয়রা, আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম, একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া আমি বিপর্যস্ত! আর হ্যাঁ, লজ্জিতও। ভদ্রমহোদয়রা, কারও বুকের পাটা সম্রাট আলেকজান্ডারের মতো, কারও বা পেতি পোষা কুকুরের মতো। আমারটা ওই খুদে পোষা কুকুরের মতো। বড়োই সঙ্কোচ বোধ করছি। এমন একটা যা-তা কাণ্ডের পরও কিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া আর মঠের যত ঝোলঝাল দিব্যি সাঁটানো —তা কী করে হয়? লজ্জার কথা। না, তা হয় না, মাফ করবেন!"

'শয়তানই জানে আমাদের ধাপ্পা দিচ্ছে কিনা!' মিউসভ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে থমকে দাঁড়াল, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ভাঁড়টা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে সে একবার পিছন ফিরে দেখল, তারপর পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ তাকে লক্ষ করছে দেখে হাত তুলে তার দিকে একটা চুম্বন ছুড়ে দিল।

"তুমি মঠাধ্যক্ষের কাছে যাচ্ছ তো?" মিউসভ্ খাপছাড়া ভাবে জিগ্‌গেস করল ইভান ফিয়োদরভিচকে।

"না যাবার কী আছে? তাছাড়া গতকালই মঠাধ্যক্ষ আমাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"দুর্ভাগ্যবশত এই অভিশপ্ত ভোজের আসরে আমার উপস্থিত থাকাটা প্রায় অপরিহার্য বলে বাস্তবিকই আমি মনে মনে উপলব্ধি করছি", সাধুটি যে ওদের কথাবার্তা শুনছে কোনো রকম মনোযোগ না দিয়ে আগের মতোই তিক্ত জ্বালাধরা কণ্ঠে মিউসভ্ বলতে লাগল। "এখানে আমরা যে কাজটা করেছি তার জন্য ওখানে অন্তত ক্ষমা চাওয়াও তো উচিত এবং ভেঙে বলা দরকার যে ওটা আমাদের কাজ নয়... তোমার কী মনে হয়?"

"হ্যাঁ, ভেঙে বলা দরকার যে ওটা আমাদের কাজ নয়। তাছাড়া বাবামশাই থাকছেন না", ইভান মন্তব্য করল।

"হুঁঃ তোমার বাবামশাই সঙ্গে থাকলেই হয়েছিল আর কি! ধুত্তোর এই নিমন্ত্রণের!"

তা সত্ত্বেও কিন্তু ওরা সকলেই চলল। সাধুটি নীরবে ওদের কথা শুনতে লাগল। শুধু একবারই যখন তারা ছোটো বনটার ভেতরে রাস্তা ধরে যাচ্ছিল একমাত্র তখনই

সে মন্তব্য করল যে মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ঠাকুর অনেকক্ষণ হল ওদের অপেক্ষা করছেন এবং ওরা আধ ঘণ্টারও বেশি দেরি করে ফেলেছে। তার কথার কোনও জবাব ওরা দিল না। মিউসভ ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ইভান ফিয়োদরভিচের দিকে তাকাল।

'অথচ দেখ, ভোজ খেতে চলেছে—যেন কিছুই হয় নি!' সে ভাবল। 'হবে না কেন? কপালটা আস্ত থান ইট, আর বিবেক বলতে তো ওই কারামাজ়ভ্ বংশের!'

## সাত

## ধর্মশিক্ষায়তনের সুযোগসন্ধানী শিক্ষার্থী

আলিয়োশা মহাস্থবিরের হাত ধরে তাঁকে শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। এই ঘরটা খুবই ছোটো, আসবাব বলতে এখানে যা আছে তা অতি প্রয়োজনীয়, যৎসামান্য। সরু, লোহার একটা খাট, তার ওপরে তোশকের জায়গায় স্রেফ একখানা কম্বল পাতা। কোনায় গুটিকয়েক উপাস্য প্রতিকৃতি, সেগুলির নীচে ভজনালয়ের পাদপীঠে যাজকীয় ভাষণ ও উপদেশাবলী পাঠের একটা খাড়া উঁচু ডেস্ক, ডেস্কের ওপর একটি ক্রস ও একটি সুসমাচার গ্রন্থ। মহাস্থবির শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তিনি বিছানায় গা ছেড়ে দিলেন। তাঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। একটু উঠে বসে তিনি মনে মনে কী যেন একটা ভাবতে ভাবতে অপলক দৃষ্টিতে আলিয়োশার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

"যাও বাছা, এবারে যাও। আমার কাছে পর্‌ফিরিই যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি কর। ওখানে তোমার দরকার হবে। মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে যাও, অতিথিদের খাবার সময় পরিচর্যা কর গিয়ে।"

"আপনি আশীর্বাদ করুন প্রভু, আমি বরং এখানেই থাকি", কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাল আলিয়োশা।

"ওখানে তোমার বেশি করে দরকার হবে। ওখানে শান্তি নেই। পরিচর্যা কর, ওদের কাজে লাগবে তুমি। শয়তান যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে প্রার্থনা উচ্চারণ কোরো। আর জেনে রাখো, বৎস আমার"—মহাস্থবির এই বলেই তাকে সম্বোধন করতে ভালোবাসতেন—"ভবিষ্যতেও এটা তোমার জায়গা নয়। এই কথাটি মনে রেখো, যুবক। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে যে মুহূর্তে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন—তুমিও অমনি মঠ ছেড়ে চলে যেয়ো। একেবারে চলে যেয়ো।"

আলিয়োশা চমকে উঠল।

"এতে তোমার ভাবনার কী আছে? আপাতত এটা তোমার জায়গা নয়। পৃথিবীতে যে বিপুল কর্মভার তোমাকে সম্পাদন করতে হবে তার জন্য আমার আশীর্বাদ রইল। আরও অনেক পথ যেতে হবে তোমাকে। আর দারপরিগ্রহও তোমাকে করতে হবে, অবশ্যই করতে হবে। এসব তোমাকে বহন করতে হবে

যতদিন না তুমি আবার যথাস্থানে ফিরে আসছ। কাজ তোমার অনেক। কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই, তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি। খ্রিস্ট তোমার সহায়। তাঁকে পরিত্যাগ কোরো না, তিনিও তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না। অনেক দুঃখতাপ তোমার দৃষ্টিগোচর হবে, সেই দুঃখতাপের মধ্যেই আবার সুখও পাবে। দুঃখের মধ্যে সুখের সন্ধান কর—এই হল তোমাকে আমার অন্তিম উপদেশ। কাজ করে যাও, নিরলস কাজ করে যাও। এখন থেকে আমার এই কথাগুলো মনে রেখো, কেন না যদিও তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা হবে, তবু বলছি শুধু দিন নয়, আমার ঘণ্টাও গোনাগুনতি।"

আলিয়োশার মুখে আবার ফুটে উঠল প্রবল আলোড়নের চিহ্ন, তার ওষ্ঠপ্রান্ত কেঁপে উঠল।

"আবার কী হল তোমার?" মৃদু হেসে মহাস্থবির বললেন। গৃহীরা তাদের মৃতজনদের চোখের জলে বিদায় দিক, কিন্তু এখানে আমাদের কোনো সাধুবাবা যখন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন আমরা আনন্দ করি। আনন্দ করি আর তাঁর জন্য প্রার্থনা করি। এখন আমাকে ছেড়ে দাও। প্রার্থনা করা দরকার। ভাইদের কাছে-কাছে থাকবে। একজনের নয়, দুজনের কাছে-কাছেই থাকবে।"

মহাস্থবির আশীর্বাদ করার জন্য হাত তুললেন। আপত্তি তোলার কোনো উপায় রইল না, যদিও আলিয়োশার বড়ো ইচ্ছে ছিল থেকে যায়। তার আরও ইচ্ছে ছিল মহাস্থবিরকে জিগ্‌গেস করে এবং তার দুঃখ থেকে আরেকটু হলে বেরিয়েও গিয়েছিল: 'আভূমি নত হয়ে দাদা দ্‌মিত্রিকে যে প্রণাম করলেন তার গূঢ় রহস্যটা কী?' কিন্তু জিগ্‌গেস করার সাহস হল না। আলিয়োশা জানত ব্যাখ্যা করার উপযোগী মনে হলে প্রশ্নের অপেক্ষা না করে মহাস্থবির নিজে থেকেই তাকে ব্যাখ্যা করে বলতেন। দেখা যাচ্ছে সেটা করা তার অভিপ্রেত নয়। অথচ ওই প্রণাম করার ঘটনাটা আলিয়োশাকে নিদারুণ বিস্মিত করেছে, তার এখন একটা অন্ধবিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এর মধ্যে কোনো গূঢ় অর্থ আছে। যা আছে সেটা একটা রহস্য, হয়তো বা ভয়ঙ্করও।

মঠাধ্যক্ষের অতিথিসেবার শুরুতে—বলাই বাহুল্য শুধুমাত্র খাবার টেবিলে অতিথিদের পরিচর্যার জন্য—সময়মতো মঠে পৌঁছুনোর উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীর নির্জন আবাসের বেষ্টনী ছেড়ে আলিয়োশা যখন বেরিয়ে এলো তখন তার বুকের ভেতরটা একটা তীব্র যন্ত্রণায় হঠাৎ কেমন যেন কুঁকড়ে গেল, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল: তার কর্ণকুহরে আবার বেজে উঠল মহাস্থবিরের সেই কথাগুলি—নিজের আসন্ন অন্তিমকাল সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ। সে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছেন—আর এমনই যথার্থ-ভাবে করেছেন—তা নিঃসন্দেহে ঘটবে—এটা আলিয়োশার এক ধরনের পবিত্র বিশ্বাস। কিন্তু তাঁকে ছাড়া সে থাকবে কী করে? তাঁকে দেখতে পাবে না, শুনতে পাবে না, তাহলে কী নিয়ে থাকবে সে? কোথায় সে যাবে?

কাঁদতে মানা করছেন, মঠ ছেড়ে যেতে বলছেন। হা ঈশ্বর! এমন বিষণ্ণ ব্যাকুলতা আলিয়োশা বহুকাল উপলব্ধি করেনি। সন্ন্যাসীর নির্জন আবাস আর মঠকে বিভক্ত করে দুয়ের মাঝখান দিয়ে যে বনভূমি চলে গেছে আলিয়োশা তার ভেতর দিয়ে দ্রুত পা চালাল। তার নিজের ভাবনাচিন্তার চাপ এত বেশি পরিমাণে তার ওপর এসে পড়তে লাগল যে তা সহ্য করার মতো শক্তি পর্যন্ত তার হচ্ছিল না। চলতে চলতে সে বনের পথের দুধারের শতাব্দীপ্রাচীন পাইন গাছগুলির দিকে তাকাতে লাগল। তেমন একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে না তাকে—বড়োজোর শ পাঁচেক পা হবে। সময়টা এমনই যে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু হঠাৎই পথের প্রথম বাঁকটা ঘুরতেই সে দেখতে পেল রাকিতিনকে। কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে।

"আমার জন্য অপেক্ষা করছ না তো?" তার কাছে এসে আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

"তোমার জন্যই", মুখ টিপে বাঁকা হাসি হেসে রাকিতিন বলল। "মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য তোমার তাড়া আছে সেটা আমি জানি। ওঁর ওখানে আজ ভোজ। সেই যে আমাদের এলাকার বড়ো পাদ্রি মশাই আর জেনারেল পাখাতভ্‌কে উনি আপ্যায়ন করেছিলেন—মনে আছে তোমার?—তারপর থেকে কিন্তু আর এমন ভোজের আয়োজন হয়নি। আমি ওখানে থাকছিনে, তা তুমি যাও, ওঁদের ঝোলঝাল পরিবেশন কর গিয়ে। আচ্ছা, আমাকে একটি কথা বল তো আলেক্সেই: ওই অলৌকিক স্বপ্নদর্শনের মানেটা কী? এটাই একমাত্র আমি তোমাকে জিগ্‌গেস করতে চেয়েছিলাম।"

"কোন্ স্বপ্নদর্শন?"

"ওই যে গড় হয়ে তোমার দাদা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে প্রণাম করা। তাও আবার এমন ভাবে যে কপালটাও কেমন যেন মাটিতে ঠুকে গেল!"

"একথা তুমি বলছ ফাদার জোসিমা সম্পর্কে?"

"হ্যাঁ, সাধু প্রভু জোসিমা সম্পর্কেই বলছি।"

"কপাল ঠুকেছেন বলছ?"

"ও, আমার বলার ধরনটা সম্মানের হল না, তাই না তো? তা, না-ই বা হল সম্মানের। সে যা-ই হোক সেই অলৌকিক স্বপ্নদর্শনের অর্থটা কী, বলতে পার?"

"জানি না মিশা এর অর্থ কী।"

"আমি ঠিকই ধরেছি, উনি তোমাকে এর ব্যাখ্যা দেবেন না। এর মধ্যে অবশ্য আহা-মরি কিছু নেই, আমার তো মনে হয় যদি কিছু থাকে সেটা হল চিরাচরিত এক ধরনের মূর্খামির ভেক— এর বেশি কিছু নয়॰॰। তবে ভেল্‌কিটা দেখানো হয়েছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। অর্থাৎ শহরে যত ধর্মের ভেকধারী আছে তারা এখন এই নিয়ে কথা বলাবলি করতে থাকবে, আর প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে

দেবে এই প্রশ্নটি: ‘কী অর্থ হতে পারে ওই একটা অলৌকিক স্বপ্নদর্শনের?’ আমার মনে হয়, বৃদ্ধ বাস্তবিকই দূরদৃষ্টির অধিকারী: তিনি একটা ফৌজদারি অপরাধের গন্ধ টের পেয়েছেন। পচা দুর্গন্ধ ছাড়ছে তোমাদের বাড়িতে।”

“কীসের দুর্গন্ধ ছাড়ছে?

রাকিতিনকে দেখে মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা খুলে বলতে চায়।

“তোমাদের পরিবারে এটা ঘটবে —এই অপরাধ। সেটা ঘটবে তোমার বড়োলোক বাপ আর তোমার দাদাদের মধ্যে। তাই ভবিষ্যতে কী হয় বলা যায় না এই ভেবেই সাধু জোসিমা মাটিতে মাথা ঠুকছিলেন। পরে যদি কিছু ঘটে যায় তখন লোকে বলাবলি করবে: ‘আরে পুণ্যাত্মা মহাস্থবির তো দেখছি এটা আগে থাকতেই বলেছিলেন, এই ব্যাপারে মোক্ষম দিব্যবাণী করেছিলেন!’,— যদিও সত্যি বলতে গেলে কি, তিনি যে কপাল ঠুকেছিলেন তার মধ্যে দিব্যদৃষ্টির কীই বা পরিচয় আছে? না, তাহলে কী হবে, তারা বলবে ওটা ছিল একটা প্রতীক, এক ধরনের রূপক এবং কে ছাই জানে আরও কত কী! লোকে শত মুখে তাঁর গুণগান করবে, ওই ঘটনা স্মরণ করে বলাবলি করবে: অপরাধটা তিনি আগে থাকতে অনুমান করতে পেরেছিলেন, অপরাধীকে চিহ্নিত করেছিলেন। যাদের আমরা ক্ষ্যাপা সাধক বলে জানি, তাদের সব ধরনধারণই এমনি: শুঁড়িখানা দেখলে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম ঠুকবে, কিন্তু দেবালয়ে ঢিল ছুড়বে। তোমার মহাস্থবিরও তেমনি: যে মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে তাকে লাঠি হাতে তাড়া করেন, অথচ একজন খুনির চরণে প্রণিপাত করেন।”

“কীসের অপরাধ? কোন্ খুনি? এসব তুমি কী বলছ?” আলিয়োশা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, রাকিতিনও থমকে দাঁড়াল।

“কোন্ খুনি? আহা তুমি যেন আর জান না! আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে তোমার নিজেরও ইতিমধ্যে একথা মনে হয়েছে। হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলি, কৌতূহল জাগানোর মতোও বটে: শোন আলিয়োশা, তুমি তো সব সময় সত্যি কথা বল— অবশ্য যদিও বরাবরই দুই নৌকায় পা দিয়ে চল—বলি এটা তোমার মনে হয়েছে, কি হয়নি? জবাব দাও।”

“মনে হয়েছে”, মৃদু কণ্ঠে আলিয়োশা বলল। রাকিতিন পর্যন্ত থতমত খেয়ে গেল।

“বল কি? সত্যি সত্যি তোমার মনে হয়েছে?” সে চেঁচিয়ে উঠল।

“না, আমি আমি ঠিক যে ভেবেছি তা নয়”, বিড়বিড় করে বলল আলিয়োশা, “কিন্তু এই যে তুমি এখন বিষয়টা সম্পর্কে এমন অদ্ভুত ভাবে বলতে লাগলে তাইতে আমার মনে হল যেন আমার নিজেরই এরকম একটা ধারণা হয়েছিল।”

“তাহলেই দেখ, আর তুমি কত স্পষ্ট করেই না ব্যাপারটা প্রকাশ করলে!- দেখলে তো? আজকে তোমার বাপ আর তোমার ওই গুণধর দাদা মিতিয়াকে দেখে

অপরাধের কথা তোমার মনে হয়েছিল তো? তাহলেই দেখতে পাচ্ছ আমার ভুল হয়নি? কী বল?"

"আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও", আলিয়োশা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "বলি তুমি এসব কোথা থেকে দেখতে পারছ?... ব্যাপারটা তোমাকে এমন টানছে কেন? এটাই প্রথম প্রশ্ন।"

"দুটো অবশ্য আলাদা আলাদা প্রশ্ন, তবে স্বাভাবিক। আলাদা আলাদা করেই প্রত্যেকটার উত্তর দেব। কী করে দেখতে পাচ্ছি? আমি কিছুই দেখতে পেতাম না যদি তোমার দাদা দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচকে আজ হঠাৎ তার স্বরূপে পুরোপুরি বুঝতে না পারতাম, হঠাৎই এক ধাক্কায় বুঝতে না পারতাম লোকটা আসলে কেমন। তার কোনো একটি বিশেষ প্রকৃতির সাহায্যেই কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুরো মানুষটাকেই ধরে ফেললাম। অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির অথচ প্রবল ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ এই সব মানুষের চরিত্রের একটি নিজস্ব সীমারেখা আছে, যা পার হতে দেওয়া ঠিক নয়। সেটা করতে দিলেই হয়ে গেল—মানুষটা তখন তার বাপের বুকেও ছুরি বিঁধিয়ে দিতে পারে। আর বাপ তোমার মাতাল, অসংযত উচ্ছৃঙ্খল, কোনও ব্যাপারেই তার মাত্রাজ্ঞান কোনও কালে ছিল না। তাই দুজনের কেউই যদি সংযত থাকতে না পারে তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না—দুজনেই ঝপাং করে গাড্ডায় গিয়ে পড়বে।..."

"না মিশা, না, যদি শুধু এটাই হয় তাহলে বলব, তুমি আমাকে আশ্বস্ত করলে। অতদূর গড়াবে না।"

"তাহলে তোমার গা-হাত-পা অমন ঠকঠক করে কাঁপছে যে? একটা ব্যাপার কি জান? ধরলাম না হয় লোকটা সৎ—তোমাদের ওই মিতিয়া আর কি—বোকা, তবে সৎ, কিন্তু ওই যে বললাম, কামুক প্রকৃতির। এটাই হল গিয়ে তার আসল চরিত্র, তার ভেতরের আসল চেহারাটা। এই যে জঘন্য কামুক প্রকৃতি, এটা সে পেয়েছে বাপের কাছ থেকে। আমি কিন্তু তোমাকে দেখে অবাক না হয়ে পারি না আলিয়োশা: তুমি কেমন করে অমন কৌমার্য রক্ষা করে চলতে পারছ? তুমিও তো হাজার হোক, একজন কারামাজভ্! কামাসক্তি তো তোমাদের একটা বংশগত রোগের পর্যায়ে চলে গেছে। তা এই তিন কামুকে হাইবুটের ভেতরে ছুরি গুঁজে আড়াল করে রেখে একে অন্যের ওপর নজর রাখছে। তিনজনে তো মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করছে, এখন তুমি জুটলে চতুর্থ জন হতে পার।"

"ওই মহিলা সম্পর্কে তুমি ভুল করছ, ওর ওপর... ওর ওপর দ্মিত্রির বড়ো বিতৃষ্ণা", বলতে বলতে কেমন যেন শিউরে উঠল আলিয়োশা।

"কার কথা? গ্রুশেন্‌কার কথা বলছ ত? না ভাই, বিতৃষ্ণা মোটেই না। যখন এটা প্রত্যক্ষ যে নিজের বাগদত্তাকে ছেড়ে তার বদলে ওকে ধরেছে, তখন মানতেই হবে যে বিতৃষ্ণা নেই। এখানে  দেখ ভাই, এখানে এমন একটা কিছু আছে যা তুমি এখন বুঝতে পারবে না। কোনো মানুষ যখন কোনো নারীর সৌন্দর্যে মোহিত

হয়ে তার প্রেমে পড়ে, কোনো নারীর দেহ, অথবা এমনকি নারী দেহের মাত্র একটি কোনো অংশের মোহে পড়ে যায়—সেটা কী ভাবে হয় তা কামাসক্ত মানুষই ভালো বুঝবে—তখন সেই নারীর জন্য সে আপন সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে, বাবা মা, রাশিয়া এবং স্বদেশকে বিকিয়ে দিতে পারে; সৎ হওয়া সত্ত্বেও সে চুরি করতে যাবে, স্বভাবে নম্র হলেও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হবে, বিশ্বস্ত হলেও বেইমানি করবে। নারীর পদসৌষ্ঠবের গীতিকার* পুশ্‌কিন তাঁর কবিতায় সেই পদসৌষ্ঠবের গুণগান করেছেন। অন্যেরা তা করে না; কিন্তু রোমাঞ্চিত না হয়ে সে দিকে তাকাতেই পারে না। তবে শুধু পদসৌষ্ঠবের কথাই বলি কেন।... বিতৃষ্ণা এক্ষেত্রে কোনও কাজে আসে না ভাই, যদি এমনও ধরে নিই যে গ্রুশেন্‌কার ওপর তার বিতৃষ্ণা আছে। যেমন বিতৃষ্ণা তেমনি আবার ছাড়তেও পারে না।”

“এটা আমি বুঝি”, হঠাৎ দুম্ করে বলে উঠল আলিয়োশা।

“বটে? তা হ্যাঁ, সত্যি তো দেখাই যাচ্ছে যে তুমি ব্যাপারটা বোঝ, কথাটা মুখ থেকে পড়তে না পড়তে তুমি যেমন দুম্ করে বলে উঠলে, তাহলে তো বোঝই”, হিংস্র উল্লাসে বলে উঠল রাকিতিন। “এটা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই দুম্ করে তোমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। তাইতে স্বীকৃতিটা আরও বেশি মূল্যবান। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিষয়টা তোমার আগেই জানা, এই নিয়ে ইতিমধ্যে তুমি ভেবেও দেখেছ। ওঃ, কামাসক্তি আর কাকে বলে! ওহে অপাপবিদ্ধ কুমার! তুমি আলিয়োশা, তুমি একটা শান্তশিষ্ট মানুষ, একজন সাধুপুরুষ, আমি মানছি; কিন্তু একটা ভিজেবেড়াল। কে ছাই জানে, কী নিয়ে তুমি ভাবনি, আর এর মধ্যে কীই বা তোমার অজানা আছে! কৌমার্যব্রতধারী বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে তলে তলে এত! আমি তোমাকে অনেক দিন যাবৎ লক্ষ করে আসছি। তুমি নিজে একজন কারামাজ়ভ্, কারামাজ়ভ্ তুমি হাড়ে মজ্জায়—তার মানে তোমার বংশধারা আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটা না একটা অর্থ থাকতেই হবে! পিতৃসূত্রে কামাসক্ত, মাতৃসূত্রে ক্ষ্যাপা সাধু। আরে অমন কাঁপছ কেন? সত্যি বলছি কিনা? জান, গ্রুশেন্‌কা আমাকে অনেক করে বলেছে: ‘ওকে’—মানে তোমার কথা আর কি—‘একবারটি আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি ওর সন্নেসির জোব্বা ঘুচিয়ে ছাড়ব।’ আরে সে কত করেই না বলেছে! কেবলই বলে, নিয়ে এসো, একবারটি নিয়ে এসো! শুধু মনে মনে ভাবি: তোমাকে নিয়ে ওর এত কৌতূহল কেন? তবে যা-ই বল, একজন অসাধারণ মহিলাও বটে!”

“আমার নমস্কার জানিয়ো, বোলো আমি আসছি না”, বাঁকা হাসি হেসে আলিয়োশা বলল। “তুমি যা বলছিলে শেষ কর মিখাইল, এর পর আমি আমার ভাবনা তোমাকে বলব।”

---

* সমসাময়িক কোন কোন মহলে, বিশেষত রক্ষণশীল মহলে জাতীয় কবি আলেক্সান্দ্র পুশকিনের কাব্য সম্পর্কে এরকম একটা কুখ্যাতি রটে গিয়েছিল।

"শেষ করার আর কী আছে? সব পরিষ্কার। সবই সেই পুরানো গৎ, ভাই। তোমারও যদি ভেতরে ভেতরে সেই কামুক প্রবৃত্তিটি থাকে তাহলে তোমারই সহোদর ভাই, তোমার দাদা ইভানের অবস্থাটা কী? সেও তো কারামাজভ্। কামুক, অর্থ পিশাচ আর ক্ষ্যাপা—তোমাদের কারামাজভ্দের সমস্ত প্রশ্ন এরই মধ্যে নিহিত। তোমার ইভান দাদাটি মনে মনে অতি নির্বোধ ধরনের অজ্ঞাত কী একটা হিসেব করে, ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যেই, নিজে নাস্তিক হয়েও ইদানীং ঈশ্বর নিয়ে যত সব প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করছে, আর এটা যে অত্যন্ত জঘন্য নীচ কাজ তা নিজেও স্বীকার করে— তোমার এই ভাই ইভান। তার ওপরে তার প্রাণের ভাই মিতিয়ার বাগদত্তাটিকে বাগানোর তাল করছে, তা তার এই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে বলেই মনে হচ্ছে। হবেই বা না কেন? কাজটা সে করতে যাচ্ছে স্বয়ং মিতিয়ারই সম্মতিক্রমে, কেন না মিতিয়া নিজে তার বাগদত্তাকে ওর কাছে ছেড়ে দিচ্ছে, আর সেক্ষেত্রে তার একমাত্র উদ্দেশ্য মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রুশেন্কার কাছে যেতে পারা। খেয়াল রাখবে, এসবটাই কিন্তু করার জন্য সে প্রস্তুত তার এত মহানুভবতা ও নিঃস্বার্থপরতা সত্ত্বেও। এই লোকগুলোই হল সবচেয়ে সর্বনেশে! ওরা নিজেরাই নিজেদের নীচতা স্বীকার করে, আবার নিজেরা সেই নীচতার মধ্যে ঢুকেও পড়ে: এর পর কার ছাই সাধ্যি আছে তোমাদের মতিগতি বোঝে! আরও শোন, এখন, মিতিয়ার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়ো বাপ, মাঝখান থেকে বুড়োই এখন হঠাৎ গ্রুশেন্কার জন্য পাগল হয়ে গেছে, ওকে দেখলেই এখন বুড়োর মুখ দিয়ে লালা ঝরে। মিউসভ যে সাহস করে গ্রুশেন্কাকে একটা নষ্ট চরিত্রের ইতর জীব বলে উল্লেখ করেছিল একমাত্র সেই কারণে, শুধু ওই ওর জন্যই না এই কিছুক্ষণ আগে আশ্রম কুঠিতে কেমন তুলকালাম কাণ্ড সে বাধিয়ে তুলেছিল! তার ভালোবাসা একটা হলো বেড়ালের ভালোবাসার চাইতে ভালো কিছু নয়। গ্রুশেন্কা প্রথম প্রথম কেবল তোমার বাবার কী সব সন্দেহজনক কারবার আর শুঁড়িখানা সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপারে বাঁধা মাইনের চাকরি নিয়ে ঢুকেছিল; এখন হঠাৎ বুড়োর টনক নড়েছে, চোখ খুলেছে, মাথাটা ঘুরে গেছে—নানা রকম প্রস্তাব দিয়ে তাকে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে খাচ্ছে—প্রস্তাবগুলো যে সৎ নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। ব্যস, এই জায়গাতেই বেধে গেল গোলমাল—ছেলের সঙ্গে বাপের গোলমাল। এদিকে গ্রুশেন্কা বাপ-ছেলে দুজনের কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না; আপাতত দুজনকেই খেলাচ্ছে, খুব করে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে, মনে মনে হিসেব করে দেখছে কোন্টা বেশি লাভজনক হবে, কেন না বাপটার কাছ থেকে অনেক টাকা বাগানো যেতে পারে বটে, কিন্তু লোকটা বিয়ে তাকে কখনই করবে না, আর শেষকালে হয়তো দেখা গেল হাড়কঞ্জুস ইহুদি[৩৪] বনে গিয়ে টাকার থলের মুখ বন্ধই করে দিল। সেক্ষেত্রে মিতিয়ারও একটা নিজস্ব মূল্য আছে: ছেলেটার টাকাকড়ি না থাকলে কী হবে গ্রুশেন্কাকে বিয়ে করতে সে প্রস্তুত। হ্যাঁ, সে ক্ষমতা ওর আছে বটে! একজন

কর্নেলের মেয়ে, বনেদি ঘরের ধনী ও পরমা সুন্দরী কাতেরিনা ইভানভ্নার মতো পাত্রীকে ফেলে কিনা বিয়ে করতে চায় গ্রুশেন্কাকে, যে গ্রুশেন্কা এক কালে ছিল সাম্‌সোনভ্ নামে অশিক্ষিত বুড়ো লম্পট ব্যাবসাদার এক নগরপ্রধানের রক্ষিতা! এই যে সব কাণ্ডকারখানা চলছে তা সত্যি সত্যিই একটা ফৌজদারি অপরাধে গড়াতে পারে। তোমার ভাই ইভান এরই অপেক্ষায় আছে। তখন তো সে তোফা আরামে: যার চিন্তায় দিনে দিনে অমন শুকিয়ে যাচ্ছে সেই কাতেরিনা ইভানভ্নাকে পেয়ে যাবে, আবার ষাট হাজার টাকার যৌতুকও তার পকেটস্থ হবে। ওর মতো একজন ছোটোখাটো ও কপর্দকশূন্য ন্যাংটো লোকের জীবন শুরু করার পক্ষে এটা যথেষ্ট লোভনীয়ও বটে। আর খেয়াল করে দেখ, এতে দ্‌মিত্রির মনে কোন দুঃখ তো দেওয়া হবেই না, বরং তার পরম উপকারই সে করবে। আমি কিন্তু ঠিকই জানি যে মিতিয়া নিজে এই গত সপ্তাহে এক শুঁড়িখানায় জিপ্‌সিদের সঙ্গে আড্ডায় মাতাল অবস্থায় সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে গলাবাজি করে বলেছে যে সে তার বাগদত্তা কাতেরিনার যোগ্য নয়, কিন্তু হ্যাঁ, যোগ্য যদি কেউ থাকে সে তার ভাই ইভান। আর কাতেরিনা ইভানভ্না নিজেও অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইভান ফিয়োদরভিচের মতো অমন মন ভুলানো একজন মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না; এখনই কিন্তু সে ওদের দুজনের মাঝখানে দোটানার মধ্যে আছে। আচ্ছা বল তো, তোমাদের এই ইভান কীসে তোমাদের সকলকে এমন মুগ্ধ করল যে তার সামনে কীকরে শ্রদ্ধায় তোমরা ভক্তি গদগদ হয়ে পড়? অথচ সে লোকটা তোমাদের কথা ভেবেই মনে মনে হাসছে: ভাবছে, আহা, তোফা আরামে আছি, তোমাদের ঘাড় ভেঙে দিব্যি মজা লুটছি!"

"এত সব তুমি কী করে জান? অমন নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছ?" ভুরু কুঁচকে হঠাৎ রুক্ষস্বরে আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

"ও কথা কেন তুমি আমাকে এখন জিগ্‌গেস করছ, এদিকে আমার উত্তর শুনে আগে থাকতে এত ঘাবড়েই বা যাচ্ছ কেন? তার মানে তুমি নিজেই মেনে নিচ্ছ যে আমি সত্যি বলছি।"

"তুমি ইভানকে পছন্দ কর না। টাকার লোভ ইভানের নেই।"

"বটে? আর কাতেরিনা ইভানভ্নার রূপ? কথাটা শুধু টাকা নিয়ে নয়, যদিও যাট হাজারও লোভ জাগিয়ে তোলার মতো বস্তু বটে।"

'ইভানের নজর আরও উঁচুতে। কোনো হাজারেই তার মনে কোনো লোভ জাগবে না। ইভান যার সন্ধান করছে তা টাকা নয়, শান্তিও নয়। হয়তো সে যা খুঁজছে তা দুঃখ।"

"এ আবার কোন্ স্বপ্নদর্শন? যত সব বড়মানুষি চাল! ওহো তোমরা তো হলে গিয়ে বনেদি লোক।"

"আঃ মিশা, ইভানের অন্তরাত্মায় প্রচণ্ড ঝড় বইছে। এক অমীমাংসিত মহৎ

চিন্তার মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে তার মনটা। ও সেই ধরনের একজন মানুষ যারা লাখ টাকা চায় না, যারা চায় তাদের চিন্তার সমাধান।”

“এটা অন্যের লেখা চুরি হয়ে গেল, আলিয়োশা। তুমি তোমার মহাস্থবিরের কথাগুলোই সামান্য এদিক-ওদিক করে বলছ। ওঃ ইভান দেখছি তোমাদের একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে!” রাকিতিনের চিৎকারের মধ্যে স্পষ্টতই বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠল। এমনকি তার মুখের ভাবেও পরিবর্তন দেখা দিল, ঠোঁট বেঁকে গেল। সে বলল, “তবে যাই বল, ধাঁধাটা কিন্তু বোকা-বোকা, সমাধান করার মতো কিছু নেই। মগজটা একটু খাটালেই ধরে ফেলা যায়। ওর লেখাটা হাস্যকর, উদ্ভট। ওই তো শুনলে ওর নির্বোধ তত্ত্বকথা: ‘আত্মার অমরত্ব বলে কিছু নেই, তাই সুনীতিও নেই, অর্থাৎ সবেরই অনুমোদন আছে’ প্রসঙ্গত বলি, তোমার গুণধর মিতিয়া ভাইটি ‘মনে থাকবে!’ —বলে কেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল মনে আছে তো? পাজি বদমাশদের তাতিয়ে তোলার মতন থিয়োরি।... মুখ খারাপ করছি, এটা অবশ্য আমার মূর্খামি।... পাজি বদমাশ না বলে ‘মীমাংসার অসাধ্য অথই সমস্যায়’ জড়িয়ে পড়া অসার দাম্ভিক প্রকৃতির স্কুল-পড়ুয়া বলাই ভালো। হামবড়াই, কিন্তু সার কথাটি তো হল: ‘এক দিক থেকে, স্বীকার না করে পারা যায় না, অন্য দিক থেকে, না মেনে পারা যায় না!’ তার পুরো থিয়োরিটাই একটা ফক্কিকারি! আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করেও মানবজাতি নিজেই নিজের মধ্যে সুনীতির জন্য জীবনধারণের শক্তির সন্ধান পাবে, তা পাবে স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাত্রের জন্য ভালোবাসার মধ্যে!...”

রাকিতিন কথা বলতে বলতে বড়োই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, নিজেকে প্রায় সংযত রাখতে পারছিল না। কিন্তু হঠাৎ যেন কী মনে হতে থেমে গেল।

“যাক গে, অনেক হয়েছে”, বলতে বলতে আগের চেয়েও বাঁকা হয়ে গেল তার হাসিটা। “হাসছ যে বড়ো? ভাবছ আমি একটা ইতর?”

“না, তোমাকে ইতর ভাবব অমন ভাবনা আমি ভাবতেও পারি না। তুমি বুদ্ধিমান, কিন্তু আমি বোকার মতো হেসে ফেলেছিলাম বলে মনে কিছু কোরো না। এই ব্যাপারে তোমার মেজাজ যে এতটা গরম হয়ে উঠতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারি, মিশা। তুমি যে রকম আবেগে ভেসে যাচ্ছিলে তাতে আমার অনুমান, তুমি নিজে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার ব্যাপারে উদাসীন নও। অনেক দিন আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল ভাই, আর সেই কারণেই আমার ভাই ইভানকে তোমার পছন্দ নয়। ওর সঙ্গে তোমার রেষারেষি তাই তো?”

“কাতেরিনা ইভানভ্‌নার টাকা নিয়েও রেষারেষি বলতে চাও? সেটা যোগ করলে না?”

“না, টাকার কথা আমি কিছু বলছি না। মিছিমিছি তোমার মনে আমি দুঃখ দিতে চাই না।”

“বিশ্বাস করছি, যেহেতু তুমি বলছ, কিন্তু যা-ই বল না কেন, আবারও বলি

তোমার ওই দাদা ইভানের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উচ্ছন্নে যাবে। তোমরা কেউ এটা বুঝতে পারবে না যে কাতেরিনা ইভানভ্নাকে বাদ দিলেও অমনিতেই ইভান অত্যন্ত অপছন্দের হতে পারে। ওকে আমি ভালোবাসতে যাবই বা কোন্ দুঃখে বল তো? নিজে আমাকে গালাগাল দিয়ে সম্মানিত করছে। আমারই বা কেন তাকে গালাগাল দেবার অধিকার থাকবে না?"

"তোমার সম্পর্কে অন্তত ভালোমন্দ কোনো কথাই আমি তাকে কখনও বলতে শুনিনি। তোমার সম্পর্কে আদৌ কিছু বলে না।"

"আমি কিন্তু শুনতে পেয়েছি গত পরশুদিন কাতেরিনা ইভানভ্নার বাড়িতে বসে যা নয় তাই বলে আমাকে তুলোধুনো করেছে—তাহলেই বোঝ, তোমাদের এই বশংবদ ভৃত্যটির প্রতি তার কত আগ্রহ। এরপর কে কাকে হিংসে করে — জানি নে ভাই! দয়া করে আবার এমন ধারণাও প্রকাশ করেছে যে অনতিদূর ভবিষ্যতে আমি যদি মঠের প্রধান আচার্যের বৃত্তি গ্রহণে রাজি না হই, সন্ন্যাসীর ধাঁচে কেশকর্তন ও আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করে সাধু হওয়ার সঙ্কল্প যদি আমার না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই পেতেবুর্গে গিয়ে সেখানকার একটা শাঁসাল পত্রিকায়—অবশ্যই পত্রিকার সমালোচনা বিভাগে—যোগ দেব, বছর দশেক ওই পত্রিকায় লেখার পর শেষমেশ পত্রিকা স্বত্বাধিকার নিজের নামে বদল করে ফেলব। তারপর আবার নতুন করে যখন প্রকাশ করতে থাকব তখন সেই পত্রিকার লেখাগুলিতে অবশ্যই থাকবে উদারনৈতিক ও নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ছোঁয়া, যৎসামান্য হলেও সমাজতন্ত্রের খানিকটা পালিশ; তবে কাজটা করতে হবে কান বেশ খাড়া রেখে—অর্থাৎ, এককথায়, তোমাদের আমাদের দু দলেরই মন রক্ষা করে, মূর্খদের চোখে ফাঁকি দিয়ে। তোমার ভাই যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতে আমার পত্রিকায় সমাজতন্ত্রের ছোঁয়া থাকলেও গ্রাহকদের চাঁদার টাকা চলতি আমানতে চালান করে দিয়ে সুযোগমতো কোনো সুচতুর ইহুদিসন্তানের তত্ত্বাবধানে খাটানোর পথে কোনো বাধা হবে না; আর এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে আমার কর্মজীবনের শেষে আমি পেতের্বুর্গে এক বিশাল বাড়ি তুলব, আমার সম্পাদকের দপ্তর সেখানে তুলে আনব, বাকি তলাগুলোতে ভাড়াটে বসাব। এমনকি বাড়িটা কোথায় হবে তাও তোমার ভাই নির্দেশ করে দিয়েছে: ভিবর্গ শহরতলির সঙ্গে লিতেইনি এভিনিউয়ের যোগাযোগের জন্য পেতের্বুর্গে নেভা নদীর ওপর যে নতুন কামেন্নি ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে বলে লোকে বলছে, তারই কাছাকাছি কোথাও।...."

আলিয়োশা আর হাসি চাপতে পারল না, উল্লাসের হাসি হেসে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বাঃ মিশা! ঠিক এটাই ঘটবে কিন্তু, দেখে নিয়ো। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হবে!"

"এবারে কিন্তু আপনিও কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ মশাই।"

"আরে না না, আমি ঠাট্টা করছি। এর জন্য ক্ষমা চাইছি। আমার মাথার ভেতরে এখন একেবারে অন্য চিন্তা। দয়া করে আমাকে একটা কথা বলবে কি?—এত খুঁটিনাটি তোমাকে কে জানাতে পারে? কার কাছ থেকে এসব তুমি শুনলে? কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়িতে ও যখন তোমার কথা বলছিল তখন তো আর তোমার সশরীরে সেখানে হাজির থাকার কথা নয়, তাই না?"

"আমি ছিলাম না, তবে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ ছিল, আমি নিজের কানে ওই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মুখ থেকেই শুনেছি, মানে, তুমি যদি জানতে চাও তো বলি: সে যে আমাকে বলেছিল তা নয়, আসলে আমি শুনে ফেলেছিলাম—বলাই বাহুল্য, নিজের ইচ্ছায় নয়; কেন না আমি গ্রুশেন্‌কার শোবার ঘরে ছিলাম, দ্‌মিত্রি যতক্ষণ পাশের ঘরে ছিল ততক্ষণ বের হতে পারছিলাম না।"

"ও, হ্যাঁ আমি আবার ভুলেই গিয়েছিলাম: সে তো তোমার আত্মীয়া হয়—তাই না?

"আত্মীয়া? ওই গ্রুশেন্‌কা কিনা আমার আত্মীয়া? অ্যাঁ?" রাকিতিন একেবারে লাল হয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "বলি তোমার মাথাটা কি গেছে নাকি? মাথার ঠিক নেই তোমার।"

"কেন? আত্মীয়া নয় নাকি? আমি তো তাই শুনেছিলাম..."

"কোথায় শুনতে পার এটা? না, তোমরা কারামাজভ্‌ মহোদয়রা কোথাকার কোন্‌ মস্ত বনেদি বংশের লোক বলে নিজেদের জাহির কর, অথচ তোমার বাপটা তো অন্যদের খাবার টেবিলে ঘুর ঘুর করে বেড়াত আর ভাঁড়ামি করত, তাদের রান্নাঘরে যদিও বা তার জায়গা হত সে দয়াদাক্ষিণ্যে করে। হলামই না হয় নিছক এক পুরোহিতের ছেলে এবং তোমাদের মতো বনেদি বংশীয়দের চোখে একটা কীটস্য কীট, কিন্তু তাই বলে অমন হালকা মেজাজে যা নয় তাই বলে অপমান করবে! আমারও একটা মানসম্ভ্রম আছে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। গ্রুশেন্‌কা একটা বাজারে মেয়ে, আমি তার আত্মীয় হতে পারি না, দয়া করে এটা বোঝার চেষ্টা কর!"

রাকিতিন ভয়ানক চটে গিয়েছিল।

"ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মাফ কর ভাই, আমার কোনও ধারণা ছিল না তাছাড়া সে বাজারেই বা হতে যাবে কেন? তাহলে কি ওই ধরনের, বলছ?" হঠাৎ লাল হয়ে উঠল আলিয়োশা। "আবারও তোমাকে বলছি, আমি কিন্তু আত্মীয়া বলেই যেন শুনেছিলাম। তুমি প্রায়ই ওর বাড়ি যাও, নিজেই আমাকে বলেছিলে যে ওর সঙ্গে তোমার প্রেমের সম্পর্ক নেই। আর যাই হোক, তুমিও যে তাকে অমন অবজ্ঞার চোখে দেখ, আমি কিন্তু কখনও ভাবিনি! ওকে কি সত্যি-সত্যি এই ভাবে দেখা উচিত?"

"আমি যদি ওর বাড়ি যাই তার পেছনে আমার নিজস্ব যুক্তি আছে, তবে সেটা তোমার জেনে কাজ নেই। আর আত্মীয়তার কথা যদি বল তাহলে আমার

সঙ্গেনয়, তোমার সঙ্গেই সেই সম্পর্ক পাতিয়ে দেবে খুব সম্ভব তোমার দাদা, এমন কি স্বয়ং তোমার পিতাঠাকুর। আচ্ছা অনেক হয়েছে। তুমি বরং বাপু এখন রান্নাঘরে যাও। আরে, আরে এ কী হল? কী ব্যাপার? আমাদের কি দেরি হয়ে গেল নাকি? উঁহু এত তাড়াতাড়ি ওদের খাবারের পাট চুকে গেল তা কী করে হয়? এখানেও আবার কারামাজভ্‌রা কোনো কাণ্ড বাধিয়ে বসেনি তো? সম্ভবত তা-ই। ওই তো তোমার বাবামশাই, তার পেছন পেছন ইভান ফিয়োদরভিচকেও দেখছি। ছিটকে বেরিয়ে এসেছে, মঠাধ্যক্ষের ঘর থেকে। ওই দেখ, সাধু ইসিদোর বাড়ির সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পেছন পেছন চেঁচিয়ে কী যেন বলছেন। ওদিকে তোমার বাবামশাইও হাত নেড়ে চেঁচাচ্ছে। নির্ঘাত মুখ খারাপ করছে। বাঃ ওই তো মিউসভও দেখ চলে গেল তার গাড়িতে চড়ে, দেখতে পাচ্ছ, ওই যে যাচ্ছে। বুড়ো জমিদার মাক্সিমভও দৌড়চ্ছে দেখছি—হ্যাঁ একটা কেলেঙ্কারি ঘটেছে বটে। তার ভোজসভা পণ্ড! মঠাধ্যক্ষ প্রভুকে মারধর করেনি তো? নাকি উলটে ওরাই মার খেয়েছে? সেটা হলে একটা কাজের কাজ হত!..."

রাকিতিনের এত সব বিস্ময়োক্তি অহেতুক নয়। অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত একটা লজ্জাজনক ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটে গেছে। সবটাই ঘটেছিল এক ধরনের 'ঝোঁকের মাথায়'।

## আট

## একটি কেলেঙ্কারি

ইভান ফিয়োদরভিচকে সঙ্গে নিয়ে পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ মিউসভ্‌ যখন মঠাধ্যক্ষের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল তখনই তার মনের মধ্যে দ্রুত এক ধরনের সূক্ষ্ম একটা প্রক্রিয়া ঘটে গেল। সে যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছিল এই ভেবে একান্তই ভদ্র ও মার্জিত রুচির এই মানুষটির লজ্জা হতে লাগল। মনে মনে উপলব্ধি করল যে আসলে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মতো একটা বাজে লোকের প্রতি তার অতটা অশ্রদ্ধা না দেখালেও চলত। মহাস্থবিরের কুঠুরিতে সে যে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি এবং এই ভাবে সে যে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছেন সেটা তার পক্ষে অনুচিত হয়েছে। 'অন্ততপক্ষে এক্ষেত্রে সাধুদের তো আর কোনও দোষ নেই', মঠাধ্যক্ষের বাড়ির দেউড়ির সামনে সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল। 'আর এখানকার এই লোকগুলো যদি ভদ্রই হয়—আর এই মঠাধ্যক্ষ নিকলাই নিজেও, আমার মনে হয় একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় মানুষ—তাহলে তাদের সঙ্গে ভালো, সৌজন্যমূলক ও ভদ্র ব্যবহার না করারই বা কী আছে?... কোনো রকম তর্কবিতর্কের মধ্যে যাব না, এমনকি কথায় কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাব, সৌজন্য দিয়ে ওদের মন জয় করে নেব এবং  এবং  অবশেষে ওদের কাছে প্রমাণ করে

ছাড়ব যে ওই ঈশপটার সঙ্গে ওই ভাঁড় আর পেরোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, ঠিক ওদের সকলের মতোই আমিও তালেগোলে এমন একটা বেকায়দায় পড়ে গেছি

সে এও স্থির করল, জঙ্গলের গাছ কাটা আর মাছ ধরা নিয়ে মঠের সঙ্গে তার যে বিবাদ তা মিটিয়ে ফেলবে, তার দাবি সে একেবারে ছেড়ে দেবে, চিরকালের জন্য ছেড়ে দেবে, আজই ছেড়ে দেবে, মঠের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে নেবে। অমনিতেই জঙ্গলের কোথায় সে সব জায়গা তার নিজেরও ঠিকমতো জানা নেই। তাছাড়া সে সবের তেমন একটা মূল্যও নেই।

এই সব ভালো ভালো অভিপ্রায় তার মনের মধ্যে আরও দৃঢ় হল যখন তারা মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীঠাকুরের খাবার ঘরে ঢুকল। খাবার ঘর বলতে অবশ্য আদপে তাঁর কিছু ছিল না, যেহেতু গোটা বাড়িটাতে তাঁর সত্যিকারের ঘর সাকুল্যে দুটো—তবে হ্যাঁ, মহাস্থবিরের ঘরের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত এবং আরামদায়কও বটে। কিন্তু এখানেও ঘরগুলির সাজসজ্জায় বিশেষ কোনো বিলাসিতার বালাই নেই। আসবাবপত্র মেহগনি কাঠের, চামড়ায় মোড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশের দশকের সেকেলে রীতির; এমনকি কাঠের মেঝের তক্তাগুলিও রং করা নয়, তবে তাহলেও সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ঝকঝক করছে। জানলায় জানলায় নানা রকমের দামি দামি ফুল। তবে এই মুহূর্তে এখানকার যেটা বড়ো বিলাসিতা স্বাভাবিকভাবেই সেটা হল সুন্দর সাজানো ব্যয়বহুল টেবিল—যদিও অবশ্যই আপেক্ষিক অর্থে: টেবিলক্লথটা সাদা ধবধবে, বাসনপত্র ঝকঝকে; তিন ধরনের অতি চমৎকার সেঁকা রুটি, দু বোতল মদ, মঠের পরম সুস্বাদু দু বোতল মধু আর একটা বড়ো কাচের ডিক্যান্টারে মঠের তৈরি শীতল পানীয়, আশেপাশের এলাকায় যার বেশ খ্যাতি আছে। ভোদ্‌কা একেবারেই নেই। রাকিতিন পরে জানিয়েছিল যে এবারে খাবার রান্না করা হয়েছিল পাঁচ পদের: মাছের পুর দেওয়া খাস্তা কচুরির সঙ্গে স্টার্লেট মাছের সুপ্; তারপর বিশেষ রন্ধন প্রণালীতে সিদ্ধ করা অপূর্ব স্বাদের মাছ, তারও পরে স্যামন মাছের কাটলেট, আইসক্রিম ও সিদ্ধ ফলের সরবত এবং শেষ পাতে ব্লাঁ সাঁজে ধরনের জেলি। এসব ভালো ভালো খাবারের গন্ধ রাকিতিন ঠিক টের পেয়ে যেত, লোভ সংবরণ করতে না পেরে বিশেষ মতলব নিয়ে মঠাধ্যক্ষের রান্নাঘরে উঁকিঝুঁকি মারার অভ্যাস তার ছিল, সেখানে তার বিশেষ যোগাযোগও ছিল। সর্বত্র তার যোগাযোগ ছিল এবং হেন জায়গা নেই যেখান থেকে সে কথা বার করতে পারত না। তার অন্তরটা ছিল অত্যন্ত অস্থির ও পরশ্রীকাতর ধরনের। নিজের ক্ষমতার গুরুত্ব সম্পর্কে সে মনে মনে রীতিমতো সচেতন ছিল, কিন্তু নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণাবশত স্নায়বিক উত্তেজনায় অধীর হয়ে তাই নিয়ে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলত। সে ভালো করেই জানত যে কালে সে কমবীর গোছের কেউ একটা হবে। আলিয়োশা তার যথেষ্ট অনুরাগী ছিল বটে, কিন্তু সে এই দেখে

কষ্ট পেত যে তার বন্ধু রাকিতিন অসৎ এবং নিজে সে সম্পর্কে এতটুকু সচেতন তো নয়ই, বরং সেহেতু উলটে মনে মনে এই বিষয়ে সচেতন যে টেবিলে অন্যের পড়ে থাকা টাকা সে চুরি করবে না, তাই চূড়ান্ত ভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে সে অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির মানুষ। এক্ষেত্রে শুধু আলিয়োশার কেন, কারোরই কিছু করার ছিল না।

রাকিতিন একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ, তাই এই ভোজে তার নিমন্ত্রণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন প্রভু ইওসিফ ও প্রভু পাইসি, তাঁদের সঙ্গে আরও একজন আশ্রমিক সাধু। পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ, কালাগানভ্ আর ইভান ফিয়োদরভিচের যখন আগমন ঘটল তার আগে থাকতেই তাঁরা মঠাধ্যক্ষের খাবার ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। একটু দূরে একপাশে জমিদার মাক্সিমভ্ও অপেক্ষা করছিল। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মঠাধ্যক্ষ এগিয়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। মঠাধ্যক্ষ এই সন্ন্যাসীটি শীর্ণ, দীর্ঘকায় ব্যক্তি, বৃদ্ধ হলেও দেহে এখনও শক্তি ধরেন, মাথার চুল কালো, তবে তাতে বেশ পাক ধরেছে, উপবাসক্লিষ্ট লম্বাটে মুখটা গম্ভীর, ভাবব্যঞ্জক। কোনো কথা না বলে মাথা নুইয়ে তিনি অতিথিদের অভিবাদন জানালেন, কিন্তু অতিথিরা এবারে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য এগিয়ে গেল। মিউসভ্ এতটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিল যে আরেকটু হলেই সে মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীর হস্তচুম্বন করে বসত, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর কেমন করে যেন সময়মতো হাতটা টেনে সরিয়ে নিলেন, ফলে হস্তচুম্বন আর হয়ে উঠল না। অথচ ইভান ফিয়োদরভিচ ও কালাগানভ কিন্তু এবারে পুরোপুরি আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থাৎ সাধারণ লোকসমাজে যেমন হয় সেই রকম সহজ সরল ভাবেই হস্তচুম্বন করে আশীর্বাদ গ্রহণ করল।

"একটু বেশি করেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হচ্ছে আমাদের, পরম পূজ্যপাদ", সৌজন্যবশত দেঁতো হাসি হেসে, তবে তা সত্ত্বেও সসম্ভ্রমে ও গুরুগম্ভীর স্বরে পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ বলতে শুরু করল, "ক্ষমা চেয়ে নিতে হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের একজন সঙ্গী ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ, যিনি আপনার একজন নিমন্ত্রিত, তাঁকে ছাড়াই আমাদের আসতে হল। আপনার ভোজসভার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, এবং সেটা অকারণে নয়। পূজ্যপাদ প্রভু জোসিমার ঘরে নিজের ছেলের সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক ঘরোয়া বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তিনি এতটাই বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন যে একেবারেই অসঙ্গত  এক কথায়, একেবারে অশালীন কয়েকটি কথা বলে ফেলেন " এরপর সাধুবাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে চলল, "এ ব্যাপারে, মনে হয় পরম পূজ্যপাদ প্রভু ইতিমধ্যেই অবগত আছেন। আর সেই কারণে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে তিনি আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত এবং সেই লজ্জার উপলব্ধি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে না পেরে আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন, আমরা—মানে আমি আর তাঁর ছেলে ইভান ফিয়োদরভিচ—যেন তাঁর হয়ে আপনাদের সামনে তাঁর আন্তরিক পরিতাপ, মনোবেদনা ও অনুশোচনার কথা ঘোষণা

করি। এক কথায়, তাঁর ইচ্ছা—এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে পরে কোনো এক সময়ে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করে এসব শুধরে দিয়ে যাবেন; আপাতত তাঁর প্রার্থনা, যা ঘটে গেছে তা ভুলে গিয়ে আপনি যেন নিজগুণে তাঁকে ক্ষমা করেন ও আশীর্বাদ করেন।

মিউসভ্ তার কথা থামাল। এই গুরুগম্ভীর ভাষণের শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় সে মনে মনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল, এতদূর আত্মপ্রসাদ লাভ করল যে কিছুক্ষণ আগেকার বিরক্তির চিহ্নমাত্র তার মনে রইল না, আবার মানবজাতির প্রতি আন্তরিক প্রেমে আপ্লুত হয়ে উঠল তার হৃদয়। মঠাধ্যক্ষ মনোযোগ দিয়ে গম্ভীর ভাবে তার কথাগুলি শুনে গেলেন, ঈষৎ মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে উত্তরে বললেন:

"ওঁর অনুপস্থিতির জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখবোধ করছি। হয়তো আমাদের সকলের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসলে উনি আমাদের ভালো বাসতে পারতেন, তেমনি আমরাও ওকে ভালোবাসতে পারতাম। যা হোক ভদ্রমহোদয়রা, খাবার টেবিলে বসতে আজ্ঞা হোক।"

উপাস্য বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সরবে প্রার্থনা আবৃত্তি করতে লাগলেন। সকলে ভক্তিভরে মাথা নত করল। জমিদার মাক্সিমভ্ আবার আবেগে রীতিমতো গদগদ হয়ে বুকের সামনে দু হাত জোড় করে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর ঠিক এখানেই ফিয়োদর পাভ্লভিচ ওস্তাদের মার চরম রসিকতাটা ছাড়ল। উল্লেখ করতে হয় যে সে সত্যি সত্যি চলে যেতেই চাইছিল, আর বাস্তবিকই মনে মনে এও উপলব্ধি করেছিল যে মহাস্থবিরের কুঠুরিতে তার লজ্জাজনক আচরণের পর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে মঠাধ্যক্ষের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে যাওয়া সম্ভব নয়। এই নয় যে নিজের কথা ভেবে তার বড়ো লজ্জা হচ্ছিল এবং মনে মনে সে নিজেকে দুষছিল—বরং এমনও হতে পারে যে ঠিক তার উল্টোটি। কিন্তু সে যাই হোক, মনে মনে সে উপলব্ধি করছিল যে এরপর নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়াটা আর শোভন হবে না। কিন্তু বিকট ঝনঝন আওয়াজে সাড়া জাগানো তার গাড়িটা সবে সরাইখানার দেউড়ির ধাপের সামনে ভিড়ানো হয়েছে এবং সে নিজেও গাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময়, হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল মহাস্থবিরের কুঠুরিতে তার নিজেরই উচ্চারিত কথাগুলি: 'আমি যখন লোকজনের মাঝখানে আসি তখন ঠিক এই উপলব্ধিটাই কিন্তু আমার হয় যে আমি সকলের চেয়ে নীচ এবং সকলে আমাকে ভাঁড় বলে মনে করে। তাই মনে মনে ভাবি, তাহলে আর কী? সত্যি সত্যি ভাঁড়ের ভূমিকায় নামি না কেন? কারও কোনও মতামতের আমি ধার ধারি না— কেন না, তোমরা, তোমার মতো সব ক'টা লোকই আমার চেয়ে বেশি বোকা, আমার চেয়েও নীচ, ইতর।' সে নিজে যে

জঘন্য কাজটি করেছে তার জন্য সকলের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার একটা প্রবল স্পৃহা তার মনের মধ্যে জেগে উঠল। এখন, এই মুহূর্তে, হঠাৎই প্রসঙ্গত তার মনে পড়ে গেল, আরও আগেকার কথা কোনো এক সময় কে একজন তাকে জিগ্‌গেস করেছিল: 'আচ্ছা, অমুক লোককে আপনি অমন ঘৃণা করেন কেন?' উত্তরে সে তখন তার নির্লজ্জ ভাঁড়ামির প্রবল ঝোঁকেই বলেছিল: 'তাহলে বলি শোন, সত্যি বলতে গেলে কি ও আমার কিছুই করেনি, বরং আমিই একবার অতি নির্লজ্জ ধরনের একটা তাঁদড়ামি ওর ওপর খাটিয়েছিলাম, আর সেটা যে-ই করলাম সঙ্গে সঙ্গে ওপর একটা ভয়ানক ঘৃণার ভাব আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল।' সেই কথাটা এখন মনে পড়ে যেতে মুহূর্তখানেকের জন্য সে নিজের ভাবনায় ডুবে গেল, বিদ্বেষের জ্বালাধরা একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল, এমনকি ঠোঁটদুটোও কেঁপে উঠল। 'হুঁ, একবার শুরু যখন করেছি তখন শেষটাও দেখা দরকার', হঠাৎ সে সিদ্ধান্ত করে বসল। সেই মুহূর্তটিতে তার অন্তরতম উপলব্ধি বলতে যেটা হয়েছিল তা প্রকাশ করা যেতে পারে অনেকটা এই ভাষায়: 'এখন, যখন নিজের পুনরুদ্ধার সাধন করা যাবে না, তাহলে আর কি—লজ্জার মাথা খেয়ে আরও বেশি করে ওদের গায়ে থুতু দিই না কেন? আমার তো আর লজ্জা নেই, আমার নির্লজ্জতায় যদি কারও লজ্জা হয় সে তোমাদেরই হবে!' গাড়োয়ানকে সে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলল, ওদিকে নিজে দ্রুত পায়ে মঠে ফিরে গিয়ে সোজা মঠাধ্যক্ষের কাছে হাজির হল। কী করবে সেটা তখনও তার ভালো জানা ছিল না, তবে জানত যে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারছে না—এখন একটা ছোটোখাটো ধাপ্পা—সঙ্গে সঙ্গে পলকমাত্র কোনো এক ধরনের নোংরামির এক চরম সীমায় সে পৌঁছে যাবে—তবে হ্যাঁ, এই নোংরামি পর্যন্তই, কদাচ কোনও অপরাধের পর্যায়ে নয়, অথবা এমন কোনও কিছু করা নয় যার জন্য আদালতের বিচারে শাস্তি হতে পারে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে বরাবরই নিজেকে সংযত করার ক্ষমতা তার আছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। সবে প্রার্থনা শেষ হয়েছে, অতিথিরা সকলে খাবারের টেবিলে বসতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে মঠাধ্যক্ষের খাবার ঘরের দরজায় তার আবির্ভাব ঘটল। দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘরের ভেতরে উপস্থিত দলটিকে একবার নজর বুলিয়ে দেখে নিল, তারপর কটমটিয়ে সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রগল্ভ ও কুটিল ধরনের দীর্ঘ একটানা হাসি হাসল, সারা হলঘর কাঁপিয়ে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে ঘোষণা করল: "হুঁ হুঁ, ওঁরা তো ভেবেছিলেন আমি সরে পড়েছি, কিন্তু বাবারা, এই যে আমি!"

মুহূর্তের জন্য সকলে নির্বাক হয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল; প্রত্যেকেরই হঠাৎ মনে হল এইবারই নির্ঘাত মহা কেলেঙ্কারি গোছের উদ্ভট ও ন্যক্কারজনক কিছু একটা ঘটবে। পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ্ এতক্ষণ যে দিব্যি খোশমেজাজে ছিল

এক লহমায় তা ঘুচে গিয়ে সে জায়গায় একটা ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ততা তাকে পেয়ে বসল। যে সব ভাব তার মনের মধ্যে নিভে আসছিল, শান্ত হয়ে এসেছিল তা সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথা চাড়া দিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল।

"নাঃ, এটা আর সহ্য করতে পারছি না।" সে চেঁচিয়ে উঠল। "একেবারে পারছি না, কোনো মতেই পারছি না।"

তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। এমনকি সে ভেবাচেকা খেয়ে তালগোলই পাকিয়ে ফেলল, কিন্তু কী বলছে না বলছে সেই নিয়ে ভাবার মতো মনের অবস্থা তার তখন আর ছিল না; সে খপ্ করে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে ওঠার উপক্রম করল।

"কী সেই জিনিস যা উনি সহ্য করতে পারছেন না?" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ চেঁচিয়ে উঠল। "'কোনোমতে পারছি না, কিছুতেই পারছি না'—সেটা কী, শুনি? পূজ্যপাদ প্রভু, ভিতরে ঢুকব কি ঢুকব না—আপনিই বলুন। আমাকে এক পংক্তিতে ভোজন করার অধিকারী বলে মনে করেন কিনা?"

"সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই", মঠাধ্যক্ষ জবাব দিলেন, তারপর হঠাৎ অন্য নিমন্ত্রিতদের দিকে ফিরে তিনি যোগ করলেন, "ভদ্রমহোদয়রা, আমি আপনাদের একান্ত ভাবে এই অনুরোধ জানাতে পারি কিনা, আপনাদের মধ্যে দৈবাৎ যে মতবিরোধের সূচনা হয়েছে, আসুন, সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা প্রেমের বন্ধনে ও এক পরিবারের মতো বোঝাপড়া করে একত্রে মিলিত হই, গরিবের এই খাবার টেবিলে বসে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি

"না, না, এ অসম্ভব!" ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মিউসভ্ চেঁচিয়ে উঠল!

"তা পিয়োত্‌র আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে যদি অসম্ভব হয় তাহলে আমার পক্ষেও অসম্ভব, আমিও থাকছি না। সেই কারণেই আমি এসেছি। এখন থেকে আমি সর্বত্র পিয়োত্‌র আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সঙ্গে থাকব: আপনি যদি চলে যান পিয়োত্‌র আলেক্সান্দ্রভিচ তাহলে আমিও যাব, আপনি থেকে গেলে আমিও থাকব। ওই যে পারিবারিক বোঝাপড়ার সম্পর্কের কথাটা আপনি বললেন না প্রভু, তাতেই কিন্তু ভায়া আমার বেশি করে খোঁচাটা খেয়েছেন: উনি আবার আমাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করেন না কিনা! ঠিক বলি নি কিনা ফন্ জোহ্‌ন। এই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ফন জোহ্‌ন। এই যে ফন্ জোহ্‌ন, কী খবর?"

"আপনি আপনি আমাকে বলছেন নাকি?" দস্তুরমতো অবাক হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল জমিদার মাক্সিমভ্।

"অবশ্যই তোমাকে", চেঁচিয়ে বলল ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ্। "নয়ত আর কাকে? আমাদের মঠাধ্যক্ষ প্রভু তো আর ফন জোহ্‌ন হতে পারেন না।"

"কিন্তু আমি তো ফন্ জোহ্‌ন নই। আমি মাক্সিমভ্।"

"না, তুমি ফন্ জোহ্‌ন। ফন্ জোহ্‌ন কে, জানেন কি পূজ্যপাদ প্রভু? সে এক ফৌজদারি মোকদ্দমার কেচ্ছা: লোকটা একটা নিষিদ্ধ পল্লীতে খুন হয়—যতদূর

মনে হয়, ওসব জায়গাকে আপনারা ওই নামেই উল্লেখ করে থাকেন—তা, লোকটাকে ওরা খুন করল, তার সর্বস্ব লুটপাট করল এবং সম্ভ্রম উদ্রেককারী বয়স সত্ত্বেও রেয়াত না করে তাকে ওরা একটা প্যাকিং বাক্সে পুরে পেরেক দিয়ে বন্ধ করে দস্তুরমতো লেবেল-টেবেল মেরে একটা মালগাড়িতে করে পেতের্বুর্গ থেকে মস্কোয় চালান করে দিল। পথে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে নাচনেওয়ালি নষ্ট মেয়েছেলেগুলোর দঙ্গলটা নাকি আবার গান-টানও গায়, বীণা না হারমোনিটারমোনি কী সব যন্ত্র-তন্ত্রও বাজায়। তাই বলছিলাম কি এই যে লোকটা এ ঠিক সেই ফন্ জোহ্ন। মৃতাবস্থা থেকে তার পুনরুত্থান ঘটেছে, ঠিক বলছি কিনা ফন্ জোহ্ন?"

"কী ব্যাপার? এসব কী হচ্ছে?" আশ্রমিক সাধুদের দলের মধ্যে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"চল, আর নয়!" কালাগানভ্‌কে উদ্দেশ করে মিউসভ্ চেঁচিয়ে বলল।

"না, না, আমাকে অনুমতি দিন!" তীক্ষ্ণস্বরে তাকে বাধা দিয়ে এই কথা বলে ঘরের ভেতরে আরও এক পা এগিয়ে গেল ফিয়োদর্ পাভ্‌লভিচ। "দয়া করে আমাকে শেষ করতে দিন। মহাস্থবিরের আশ্রম কুঠুরিতে আমি বে-আদবি করেছি, সঠিক ভাবে বলতে গেলে, চুনোপুঁটি ভক্ষণের কথাটা চেঁচিয়ে বলেছিলাম—এই অজুহাতে আমাকে বদনাম দিতে ছাড়েননি। আমার পরম আত্মীয় পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ্ মিউসভের যেটা পছন্দ, তা হল plus de noblesse que de sincerité—কথার মধ্যে যেন 'আন্তরিকতার চাইতে আভিজাত্যের ভাবটা বেশি থাকে', কিন্তু আমার পছন্দটা উলটো: plus de sincerité que de noblesse—আমি চাই আমার কথার মধ্যে যেন আন্তরিকতাটাই বেশি থাকে—noblesse-এর আমি থোড়াই পরোয়া করি! ঠিক কিনা ফন্ জোহ্ন? আমাদের মঠাধ্যক্ষ প্রভু অনুমতি দেন তো বলি, আমি লোকটা যদিও একটা ভাঁড় এবং ভাঁড় বলেই আমি পরিচিত, কিন্তু আমি বীরধর্ম পালন করি—মানমর্যাদারক্ষার জন্য আমার লড়াই, আমি মনের কথা খুলে বলতে চাই। হ্যাঁ, আমি মানমর্যাদা রক্ষার বীরধর্মে দীক্ষিত, কিন্তু এই পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচের মধ্যে যা আছে তা আহত আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমি যে এই এখন এখানে এসেছি তা খুব সম্ভবত সমস্ত ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে আর যা বলার তাই বলতে। আমার ছেলে আলেক্সেই এখানে আছে, এখানে থেকে সে আত্মার মুক্তির সন্ধান করছে: আমি তার বাপ, তার ভালোমন্দ নিয়ে আমার চিন্তা, সেটা আমাকে দেখতেই হয়। আমি অভিনয় করছিলাম বটে, কিন্তু আমি সব শুনেছি, চুপিচুপি লক্ষও করেছি, এখন আমি নাটকের শেষ দৃশ্যটা আপনাদের সামনে পরিবেশন করতে চাই। আমাদের এখানকার রীতিটা কেমন? এখানে যা পড়ে তা চিরকাল পড়েই থাকে। এটা একটা কথা হল! আমি উঠে দাঁড়াতে চাই। হে পুণ্যব্রতী সাধুবাবারা, আপনাদের ওপর আমার দারুণ রাগ। স্বীকারোক্তি হল গূঢ় রহস্যপূর্ণ বড়ো রকমের একটা ধর্মানুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের প্রতি

আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, এর মহিমাকে আমি প্রণিপাত জানাতে প্রস্তুত; কিন্তু মহাস্থবিরের আশ্রম-কুঠুরিতে কী দেখলাম?—সবাই নতজানু হয়ে সরবে স্বীকারোক্তি করছে। সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে স্বীকারোক্তি করাটা কি ঠিক? গির্জার পবিত্র ধর্মগুরুরা স্থির করে দিয়েছেন যে স্বীকারোক্তি করতে হবে গোপনে, ধর্মযাজকের কানে কানে, একমাত্র তাহলেই আপনার স্বীকারোক্তি হবে গূঢ় রহস্যপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আর এটাই চলে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। কিন্তু কী করে আমি সবার সামনে ব্যাখ্যা করে বলব যে আমি, এই যেমন, এটা করেছিলাম সেটা করেছিলাম মানে, এই এটা সেটা—বুঝলেন কিনা? অনেক সময় তো এসব কথা মুখে আনাটাও অশালীন। সে তো এক কেলেঙ্কারি! না, সাধুবাবারা, আপনাদের সঙ্গে থাকলে আত্মনিগ্রহকারী খ্লিস্তিদের দঙ্গলে`` ভিড়তে কতক্ষণ! আমি প্রথম সুযোগেই এ নিয়ে ধর্মমহাসভাকে লিখব, আর আমার ছেলে আলেক্সেইকেও এখান থেকে সরিয়ে বাড়ি নিয়ে যাব।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কোথায় কীসের ঘণ্টা বাজছে ফিয়োদর পাভ্লিভিচের তা ভালোই জানা ছিল। শুধু আমাদের মঠ সম্বন্ধে নয়, যেখানে যেখানে মহাস্থবির পদের প্রচলন আছে এরকম অন্যান্য মঠ সম্বন্ধেও এক সময়ে এই মর্মে একটা বদনাম রটেছিল—এমনকি অঞ্চলের ঊর্ধ্বতন পাদ্রি মশাইয়ের কানেও পৌঁছেছিল—যেন এই সমস্ত মঠে মঠাধ্যক্ষের পদমর্যাদা পর্যন্ত ক্ষুণ্ন করে মহাস্থবিরদের বাড়াবাড়ি রকমের সম্মান দেখান হচ্ছে, আর প্রসঙ্গত, মহাস্থবিররা যেন স্বীকারোক্তি অনুষ্ঠানের ধর্মীয় গূঢ় রহস্যের অপব্যবহার করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিযোগগুলির কোনও ভিত্তি ছিল না, তাই যেমন আমাদের এলাকায়, তেমনি অন্য সব জায়গাতেও এক সময় আপনা থেকেই থিতিয়ে যায়। কিন্তু ফিয়োদরের মাথায় নির্বুদ্ধিতার যে ভূত চেপে বসেছে, যা তার স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে তাকে দূরে আরও দূরে কোথায় কোন নীচতার গভীর তলদেশে টেনে নিয়ে চলেছে, তাকে চুপি চুপি বলে দিল এক কালের সেই অভিযোগের কথা যার বিন্দুবিসর্গ ফিয়োদর পাভ্লভিচের নিজেরও বোধগম্য ছিল না। তার বলাটাও বুদ্ধিমানের মতো হল না, আরও এই কারণে যে এবারে মহাস্থবিরের আশ্রম-কুঠিরে কেউ নতজানু হয়ে ছিল না, কেউ সরবে স্বীকারোক্তি করেনি; তাই ওরকম কিছু নিজের চোখে দেখতে পাওয়া ফিয়োদর পাভ্লভিচের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কথাগুলি সে বলেছিল স্রেফ পুরনো গালগল্প ও রটনা থেকে, যার কিছু কিছু কোনো মতে তার মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের বোকামিটা প্রকাশ করে ফেলার পর সে উপলব্ধি করতে পারল যে কতকগুলি অর্থহীন আবোল তাবোল কথা আচমকা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, তাই হঠাৎই তার প্রবল বাসনা হল তক্ষুনি তার শ্রোতাদের কাছে এবং সর্বোপরি নিজের কাছে প্রমাণ করে যে সে যা বলেছে তা মোটেই আবোল তাবোল নয়; যদিও সে বেশ ভালোভাবেই জানত যে ইতিমধ্যে যে আবোল তাবোল কথা সে বলে ফেলেছে

তার সঙ্গে ওই রকমই আরও কিছু যোগ করতে গেলে কথার পিঠে কথা জুড়ে আরও বেশি অর্থহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু নিজেকে সে আর সামলাতে পারল না—পাহাড় থেকে গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল।

"কী জঘন্য!" পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচ চেঁচিয়ে উঠল।

"মাফ করবেন", মঠাধ্যক্ষ হঠাৎ বলে উঠলেন, "সুপ্রাচীন কালেই বলা হয়েছে: 'অত্র কতিপয় মনুষ্য আমার বিরুদ্ধে কথনের, পরন্তু কতিপয় মন্দবাক্য উচ্চারণের সূচনা করিয়াছে। এই সকল শ্রবণপূর্বক আমি আপনি আপনাকে কহিয়াছি: ইহাই প্রভু যিশুর চিকিৎসাবিধান, আমার বৃথা দম্ভপূর্ণ আমার নিরাময়ের নিমিত্ত তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।' ঠিক এই কারণেই হে আমাদের পরম সমাদরণীয় অতিথি, আমরা বিনম্রচিত্তে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই!"

তিনি কোমর পর্যন্ত নুইয়ে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে অভিবাদন জানালেন।

"আ-হা-হা! যত সব ভণ্ডামি আর পুরনো বাঁধাবুলি! গুচ্ছের পুরনো বাঁধা বুলি আর পুরনো ভাবভঙ্গি! সেই পুরনো মিথ্যে আর আভূমি নত হয়ে আনুষ্ঠানিক প্রণামের ঘটা! ওসব, আমাদের ঢের দেখা আছে। শিলারের সেই 'দস্যুদল' পালার মতো 'অধরে চুম্বন আর হৃদয়ে ছুরিকা'।[৫৮] না বাবাঠাকুররা, মিথ্যাচার ভালো লাগে না, আমি চাই সত্য! কিন্তু সত্য আপনাদের ওই চুনোপুঁটি ভক্ষণের মধ্যে নেই, আর সেটাই আমি ঘোষণা করেছি! সন্ন্যাসী বাবারা, আপনারা উপবাসব্রত পালন করেন কেন? এর জন্য স্বর্গরাজ্যে পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন কেন? তাহলে অমন পুরস্কারের জন্য আমিও ত উপবাসব্রত পালন করতে পারি! না গো আমার পুণ্যাত্মা সাধুবাবা, বলি কি, জীবনেই সততার চর্চা কর না কেন? তৈরি খাবার দাবারের ওপর ভরসা করে মঠের মধ্যে নিজেকে রুদ্ধ করে না রেখে এবং ওপর থেকে কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে বরং সমাজের কিছু উপকারে লাগ—সেটা কিন্তু বেশ খানিকটা কঠিন কাজই হবে। সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে আমিও কিন্তু জানি মঠাধ্যক্ষ ঠাকুর। আরে, এদের এখানে কী কী খাবার তৈরি হয়েছে দেখি?" বলতে বলতে সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। "ও বাবা, এ যে দেখছি পুরনো পোর্ট ওয়াইন য়েলিসেইয়েভ্ ব্রাদার্স-এর দোকানের সিল করা বোতলে মধুর সুরা। বাহবা, বাবারা! এ ত ঠিক চুনোপুঁটির মতন মনে হচ্ছে না। ওঃ কী সব বোতলই না এনে বসিয়েছেন আমাদের সাধুবাবারা! হে-হে-হে! বলি, এসব এখানে জোগাচ্ছে কে? রুশি চাষাভুসো, মেহনতি মানুষ হাতে কড়া ফেলে সামান্য যে কয়েকটি কপর্দক উপার্জন করছে, নিজের পরিবারকে বঞ্চিত করে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কর ফাঁকি দিয়ে তা-ই এনে তুলে দিচ্ছে এখানে! আপনারা না পুণ্যাত্মা সাধুসন্ত, আপনারা কিনা দেশের মানুষকে শুষে খাচ্ছেন!"

"এটা কিন্তু আপনার বলা একেবারেই অসঙ্গত", ইওসিফ বললেন।

প্রভু পাইসি অটল গাম্ভীর্য নিয়ে চুপ করে রইলেন। মিউসভ্ এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার পিছন পিছন কালাগানভ্ও।

"তাহলে বাবারা, আমিও চললাম পিয়োতর আলেক্সান্দ্রভিচের পিছু পিছু! আর আপনাদের কাছে আসছি না আমি, পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও না। আমি আপনাদের হাজার রুবল পাঠিয়েছিলাম, তাইতে কিনা আপনাদের চোখের দৃষ্টি অমন খরশান হয়ে উঠেছে! হে-হে-হে! না, ওর সঙ্গে আর যোগ করতে যাচ্ছি না। আমি আমার ফেলে আসা যৌবনের জন্য, যে লাঞ্ছনা আমাকে সইতে হয়েছে তার জন্য প্রতিশোধ নিচ্ছি!" একটা সাজানো উপলব্ধি জাহির করার ঝোঁকে টেবিলে ঘুষি মেরে সে বলল। "আমার জীবনে এই মঠের তাৎপর্য বিরাট! এর জন্য কত দুঃখে কত চোখের জলই না আমি ফেলেছি! আপনারা আমার স্ত্রী উন্মাদিনীকে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছিলেন। হেন ভজনালয় নেই যেখানে আপনারা আমার নামে শাপমন্যি করেননি, আশে পাশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমার নামে গালমন্দ ছড়াননি! অনেক হয়েছে বাবারা, আজকের যুগ উদারনীতির যুগ, স্টিমার আর রেলওয়ের যুগ। হাজার নয়, একশ রুবলও নয়, এমনকি একশটি কোপেকও আমার কাছ থেকে পাবেন না!"

এবারেও উল্লেখ করতে হয়: ওর জীবনে আমাদের মঠের কস্মিনকালে বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না এবং এই মঠের জন্য কোনও দুঃখে কোনও চোখের জলই তাকে ফেলতে হয়নি। চোখের জলটা তার বানানো কথা, কিন্তু সেই বানানো চোখের জলে সে এতটাই ভেসে গিয়েছিল যে একটা মুহূর্তে সে যেন নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করতে পারল না: এমনকি ভাবে বিগলিত হয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তটিতে তার মনে হল আর নয়, এবারে মানে মানে সরে পড়তে হয়।

বিদ্বেষের জ্বালাধরা এই মিথ্যা কথার জবাবে মঠাধ্যক্ষ মাথা নোয়ালেন, তারপর আবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "এমনও কথিত আছে: 'তোমার উপর অবাঞ্ছিত ভাবে যে অসম্মান বর্ষিত হইতেছে, সতর্কতার সহিত, সানন্দচিত্তে তাহা বহন করিবে, অপিচ যে ব্যক্তি তোমার অসম্মান সংঘটনকারী তাহার দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে না, তাহাকে ঘৃণা করিবে না।' সেটাই আমরা করব।"

"থাক থাক, অনেক হয়েছে ওসব বড়ো বড়ো চিন্তা। আর যত সব আগড়ম বাগড়ম! যত খুশি পরমার্থ চিন্তা করুন সাধুবাবারা, আমি কিন্তু চললাম। তবে আমার পিতৃত্বের অধিকার বলে আমার ছেলে আলেক্সেইকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, চিরকালের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আর ইভান ফিয়োদরভিচ আমার পরম ভক্তিভাজন পুত্রটি, ভরসা দেন তো আমাকে অনুসরণ করার আজ্ঞা দিই আপনাকে! তা ফন্ জোহ্ন ভায়া, তোমারই বা এখানে থাকার কী মানে হয়! এখুনি আমার সঙ্গে শহরে চলে এসো। জমিয়ে আমোদফুর্তি করা যাবে আমার বাড়িতে। আধ কোশটাকও

হবে কি হবে না। ওসব সাত্ত্বিক ভোজ্য তেলের আহারের বদলে পাবে একটা নধর শুয়োরছানা, সেই সঙ্গে ঘি-মাখনে জবজবে জাউ। ডিনার করা যাবে। ব্র্যান্ডি থাকবে, তারপর লিকিওর, ফলের রস থেকে তৈরি ভালো মদও আছে। ওহে ফন্ জোহ্ন, বলি এমন সুযোগ হাতছাড়া কোরো না!”

চিৎকার চেঁচামেচি ও অঙ্গভঙ্গি করতে করতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক এই মুহূর্তে রাকিতিন তাকে দেখতে পেল, আলিয়োশাকেও দেখাল।

“আলেক্সেই!” তাকে দেখতে পেয়ে বাপ দূর থেকে হাঁক দিল। “আজই বাড়িতে আমার কাছে চলে আসবি, একেবারে চলে আসবি। বালিশ তোশক যা যা আছে সব বেঁধে ছেঁদে নিয়ে আসবি। যেন তোর ছায়ামাত্র চোখে না পড়ে মঠের ত্রিসীমানায়!”

আলিয়োশা যেখানে ছিল সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, নীরবে, মনোযোগ দিয়ে দৃশ্যটি লক্ষ করতে লাগল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে, তাকে অনুসরণ করে চুপচাপ, বিষণ্ণবদনে ইভান ফিয়োদরভিচও গাড়িতে ওঠার উপক্রম করছে, আলিয়োশাকে যে হাত নেড়ে বিদায় জানাবে সে জন্য তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কিন্তু এমন সময় ঘটল আরও একটি অবিশ্বাস্যপ্রায় হাস্যকর দৃশ্য, যা আখ্যানটিকে সম্পূর্ণতা দান করল। হঠাৎ করেই গাড়ির পা দানিতে জমিদার মাক্সিমভের আবির্ভাব ঘটল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছুটে এসেছে, তার ভয় পাছে দেরি হয়ে যায়। লোকটা যে ভাবে দৌড়াচ্ছিল রাকিতিন ও আলিয়োশার তা চোখে পড়েছিল। সে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে ইভান ফিয়োদরভিচের বাঁ পা'টা পা দানির ওপর থাকতে থাকতেই অধৈর্য হয়ে তার ওপর নিজের পা'টা চাপিয়ে দিল এবং গাড়ির গা'টা আঁকড়ে ধরে লাফিয়ে ভেতরে ঢোকার উপক্রম করল।

“আমি, আমি, আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি!” তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো কিছুতে পিছু হটার পাত্র সে নয়। মুখে পরম সুখের ভাব। খুশিতে ডগমগ হয়ে চাপা হাসি হেসে লাফাতে লাফাতে চেঁচিয়ে বলল, “আমাকেও সঙ্গে নিন!”

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ উল্লসিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, “আমি বলিনি যে এটা নির্ঘাত ফন্ জোহ্ন! সত্যিকারের ফন্ জোহ্ন—কবর থেকে ওর পুনরুত্থান হয়েছে। তুমি ওখান থেকে ছাড়া পেলে কী করে হে বাপু? ওখানে আবার ফন্ জোহ্ন মার্কা কী কাণ্ড বাধালে তুমি? ভোজটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেই বা কী বলে? মাথাটা নিরেট না হলে কি আর অমন হয়! আমার মাথাটাও ভায়া অমনি, কিন্তু তোমারটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! উঠে পড়, উঠে পড় চটপট! এই ইভান, ওকে উঠতে দাও। ভালো মজা হবে। এখানে যা হোক তা হোক করে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকবে খন। কী বল ফন জোহ্ন, পারবে তো? না কি ওকে কোচবক্সে কোচম্যানের পাশে বসিয়ে দেব?... যাও দেখি ফন্ জোহ্ন, লাফিয়ে উঠে পড় কোচবক্সে!...

কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছিল। কোনো কথা না বলে সর্বশক্তিতে মাক্সিমভের বুকে আচমকা এমন একটা ধাক্কা মারল যে মাক্সিমভ ছিটকে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ল, মুখ থুবড়ে যে পড়ল না সেটা দৈবাৎ বলতে হবে।

"হাঁকাও গাড়ি!" ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়োয়ানকে ধমক দিয়ে বলল ইভান ফিয়োদরভিচ।

"আরে, আরে এ কী করলি? এ কী করলি? অমন কাজ করতে গেলি কেন?" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। ইভান ফিয়োদরভিচ কোনও উত্তর দিল না।

"বোঝ ছেলের কাণ্ড!" মিনিট দুয়েক চুপচাপ থেকে ছেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার মুখ খুলল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ। "এই মঠের ব্যাপারটা তুই নিজেই মাথা থেকে বার করেছিলি, নিজে এ ব্যাপারে তাতিয়েছিস, মত দিয়েছিস। এখন তাহলে রাগ করছিস কেন?"

"অনেক আজেবাজে বকেছেন, এখন অন্তত খানিকটা বিশ্রাম করুন", মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বলল ইভান ফিয়োদরভিচ।

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আবার চুপ করে গেল—তবে সে মিনিট দুয়েকের জন্য।

"এখন খানিকটা ব্র্যান্ডি পেলে দিব্যি হত", সাড়ম্বরে সে ঘোষণা করল। কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ সাড়া দিল না।

"বাড়ি ফিরেই খাব, তখন তুইও পাবি।"

ইভান ফিয়োদরভিচ আগের মতোই নীরব।

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করল।

"কিন্তু যা-ই বল বাপু, আলিয়োশাকে আমি মঠ থেকে বাড়ি নিয়ে আসব—যদিও সেটা তোমার খুব একটা মনঃপূত হবে না, কী বলেন অশেষ ভক্তিভাজন কার্ল ফন্‌ মোওর?"

ইভান ফিয়োদরভিচ্‌ অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকাল, মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখতে লাগল। এরপর একেবারে বাড়ি পর্যন্ত বাকি পথটা তাদের মধ্যে আর কোনো কথা হল না।

The Online Library of Bangla Books

# তৃতীয় অধ্যায়
# কামাসক্তদের প্রসঙ্গে

## এক
## ভৃত্যমহল

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ কারামাজভের বাড়ি শহরের ঠিক মাঝখানে একেবারেই নয়, তবে একেবারে উপকণ্ঠেও নয়। বাড়িটা যথেষ্ট পরিমাণে জরাজীর্ণ, তবে বাইরে থেকে দেখতে ভালোই: একতলা, তবে তার ওপরে আরও আধখানা তলাও আছে: ছাইরঙের দেয়াল, লাল রঙের লোহার পাতের ছাদ, পরিসরে বেশ বড়ো, আরামদায়ক। প্রসঙ্গত, আরও অনেক কাল টিকে থাকার মতো। বাড়িটার মধ্যে নানা ধরনের ছোটোখাটো খুপরি নানা চোরা কুঠুরি আর এখানে ওখানে আচমকা বেশ কিছু সিঁড়ির ধাপও আছে। একপাল ধেড়ে ইঁদুর তার মধ্যে বাসা করে আছে, কিন্তু তাদের ওপর ফিয়োদর পাভলভিচের তেমন একটা রাগ নেই: 'হাজার হোক সন্ধ্যা বেলায় যখন সারা বাড়িতে একা থাকতে হয় তখন বেজার লাগে না।' বাস্তবিকই তার বরাবরের অভ্যাস ছিল রাত হলেই ভৃত্যদের বাইরের বাড়িতে বার করে দেওয়া, আর নিজে সে খিল এঁটে দিয়ে সারারাত একা বাড়ির ভেতরে কাটাত। বসতবাড়ির আঙিনার মধ্যেই বাইরের বাড়িটা। সেটাও বেশ প্রশস্ত ও শক্তপোক্ত; রান্নাঘরের স্থান ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ সেখানেই নির্দেশ করে দিয়েছিল, যদিও বাড়িতেও একটা রান্নাঘর ছিল: রান্নাঘরের গন্ধ সে পছন্দ করত না। শীত গ্রীষ্ম সব সময় উঠান পার হয়ে সেখান থেকে রান্না খাবার নিয়ে আসা হত। মোটের ওপর, একটা বড়ো পরিবারের কথা ভেবে বাড়িটা তেরি হয়েছিল, প্রভু ভৃত্য মিলে আরও পাঁচগুণ বেশি লোকের সেখানে ঠাঁই হতে পারত। কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলছি সেই মুহূর্তে বাড়িতে বসবাস করছিল শুধু ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আর ইভান ফিয়োদরভিচ, বাইরের বাড়িতে ভৃত্যমহলে থাকার মধ্যে ছিল মাত্র তিন জন: বুড়ো গ্রিগোরি, তার বৃদ্ধা স্ত্রী মার্ফা আর স্মের্দিকোভ্ নামে একটি চাকর—বয়সে এখনও ছোকরা। এই তিন কাজের লোক সম্পর্কে খানিকটা সবিস্তারে কয়েকটা কথা বলতে হয়। বুড়ো গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ কুতুজভ সম্পর্কে অবশ্য আগেই আমরা অনেকটা বলেছি। লোকটা দৃঢ় চরিত্রের, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; একরোখা ভাবে সোজাপথে

তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে, একমাত্র তখনই চলে যদি কোনো কারণে সেই লক্ষ্য তার সামনে অলঙ্ঘনীয় সত্য হয়ে দেখা দেয়, যদিও কারণগুলি অনেক সময়ই আশ্চর্যরকমের অযৌক্তিক হত। মোটের ওপর বলতে গেলে সে ছিল সৎ, সততায় অবিচল। তার স্ত্রী মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না সারা জীবন বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে এসেছে বটে, কিন্তু তাকে বড় জ্বালাতনও করেছে এক সময়—যেমন হয়েছিল ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্তিঘোষণার ঠিক পর পর—স্বামীকে বারবার উত্ত্যক্ত করে বলেছে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, তাদের সামান্য যেটুকু পুঁজিপাটা হয়েছে তাই নিয়ে মস্কোয় গিয়ে একটা ছোটোখাটো কারবার খুলে বসতে; কিন্তু গ্রিগোরি তখনই চিরদিনের মতো বুঝে গেছে যে মেয়েমানুষটা বাজে বকে এবং 'মেয়েমানুষ মাত্রেই অসৎ', আর পুরাতন প্রভুকে ছেড়ে যাওয়া তাদের উচিত হবে না, তা সে লোকটা যা-ই হোক না কেন, 'কারণ এটাই এখন তাদের কর্তব্য।'

"কর্তব্য কী, বোঝ?" স্ত্রীকে সে জিগ্‌গেস করেছে।

"কর্তব্য কাকে বলে আমি জানি গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু এখানে আমাদের পড়ে থাকাটা যে কেন কর্তব্য তা কোনোমতেই আমার বোঝার সাধ্যি নেই", মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না উত্তরে দৃঢ়স্বরে বলেছে।

"তবে আর বুঝে কাজ নেই। জেনে রাখ যেমন বললাম তেমনি হবে। এরপর থেকে চুপ করে থাকবে।"

হলও তাই: ওরা এখান থেকে গেল না। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ ওদের একটা মাইনে ঠিক করে দিল—সেটা বেশি নয়, তবে নিয়মিত ভাবেই ওদের দেওয়া হত। তা ছাড়া গ্রিগোরি এও জানত যে মনিবের ওপর তার প্রভাব প্রশ্নাতীত। সে এটা উপলব্ধি করতে পারত, আর এর মধ্যে কোনও ভুল ছিল না: ধূর্ত ও একগুঁয়ে প্রকৃতির ভাঁড় ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্—তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে—'জীবনের কোনো কোনো ব্যাপারে, দৃঢ় চরিত্রের বটে, কিন্তু সে নিজেই আবার অবাক হয়ে এও লক্ষ করেছে সে 'জীবনের অন্য আরও কতকগুলি ব্যাপারে' সে বেশ দুর্বল—এমনকি বড়ো বেশি দুর্বল। কোন্ কোন্ ব্যাপারে, তা সে নিজেও জানত; জানত এবং অনেক ব্যাপারে ভয়ও পেত। জীবনের কোন কোন ব্যাপারে কান খাড়া করে চলতে হয়, আর সে সব ক্ষেত্রে একজন বিশ্বাসী লোক না থাকলে ভারি মুশকিল। গ্রিগোরি ছিল পরম বিশ্বস্ত অনুচর। জীবনে কাজ করতে গিয়ে অনেকবার এমনও হয়েছে যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে হয়তো মার খেতে হত, ভালো মতোই খেতে হত, কিন্তু সব সময়ই তাকে উদ্ধার করেছে গ্রিগোরি, যদিও এমন ঘটনার পর কোনোবারই প্রভুকে ভালো ভালো উপদেশবাক্যে জর্জরিত করতে সে ছাড়েনি। কিন্তু মারের ভয়ই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বড়ো ভয় নয়: জীবনে এর চেয়েও অনেক বড়ো বড়ো, এমনকি অতি সূক্ষ্ম ও জটিল এমন সব ঘটনা ঘটেছে

যখন ফিয়োদর পাভ্লভিচের নিজেরও হয়তো নির্ধারণ করার সামর্থ্য হত না বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ একজন কাউকে আঁকড়ে ধরার অস্বাভাবিক সেই তাগিদ, যা একেক সময় মুহূর্তে তার বোধশক্তির বাইরে হঠাৎ হঠাৎ ভেতরে ভেতরে সে টের পেতে শুরু করেছে। সে সব ঘটনাকে এক রকম অসুস্থতাই বলা যেতে পারে। ফিয়োদর পাভ্লভিচের লাম্পট্যের কোনো সীমাপরিসীমা ছিল না, ভোগবাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে অনেক সময় সে ক্ষতিকর কীটের মতোই নিষ্ঠুর; কিন্তু কখনও কখনও দেখা গেছে মাতলামির মুহূর্তে হঠাৎ সে অন্তরে অনুভব করছে অধ্যাত্মবোধজনিত এক ধরনের আতঙ্ক ও নৈতিকতার একটা কাঁপুনি, যা এমনকি বলা যেতে পারে, প্রায় শারীরিক যন্ত্রণার মতোই তার প্রাণে বাজত। 'এরকম সময় তো দেখছি আমার প্রাণটা যেন গলার কাছে এসে ধড়ফড় করছে', কখনও কখনও সে বলত। ঠিক এই সব মুহূর্তেই তার ভালো লাগত ওই ঘরে না হলেও যদি ধারে কাছে কোথাও— অন্তত বাইরের বাড়িতেও দৃঢ় চরিত্রের বিশ্বস্ত এমন একজন কেউ থাকত যে একেবারেই তার মতো লম্পট নয়, যে তার যাবতীয় কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখেছে, তার সমস্ত গোপন রহস্য জানে, অথচ তা সত্ত্বেও তার প্রতি আনুগত্যবশত সেগুলি অগ্রাহ্য করে, তাকে কোনও বাধা দেয় না, সবচেয়ে বড়ো কথা, ভর্ৎসনা করে না, ইহলোক অথবা পরলোক কোনো কিছুর ভয় দেখিয়ে তাকে শাসায়ও না; আর তেমন প্রয়োজন হলে তাকে আগলে রাখে। কার হাত থেকে? অজ্ঞাতপরিচয় তবে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর কারও হাত থেকে। আসল কথা এই যে অতি অবশ্যই থাকতে হবে *আরেকজন* কাউকে— অনেক কালের পুরনো বন্ধুভাবাপন্ন এমন কাউকে যাকে দুঃসময়ে কাছে ডাকা যায়, একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে তার মুখের দিকে তাকানো যাবে, তার সঙ্গে সম্ভবত দু একটা বাক্যবিনিময়ও করা যাবে—হোক না তা নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক; আর সেই লোকটা যদি তেমন একটা কিছু না বলে, যদি রাগারাগি না করে তা হলে মনটা বেশ খানিকটা হালকা হয়ে যায়, আবার যদি রাগারাগি করে তাহলে মন আরও ভার হয়ে যায়। এমন হয়েছে—তবে হ্যাঁ, সেটা কালেভদ্রে— এমনকি রাতদুপুরে ফিয়োদর পাভ্লভিচ হেঁটে বাইরের বাড়িতে গিয়ে গ্রিগোরিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে, তাকে মিনিট খানেকের জন্য একবার নিজের কাছে আসতে বলেছে। সে এলে পরে ফিয়োদর পাভ্লভিচ নেহাৎই আজেবাজে কিছু বিষয় নিয়ে তার সঙ্গেকথাবার্তা শুরু করেছে, শিগগিরই তাকে ছেড়েও দিয়েছে—অনেক সময় তো আবার রীতিমতো হাসিতামাশা ও ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্য দিয়ে। সে চলে গেলে ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ 'ধুত্তোর' বলে বিছানায় শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়েছে সাধু সজ্জনের মতো নিশ্চিন্তে। অনেকটা এই রকমই একটা অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল যখন আলিয়োশা এলো। আলিয়োশা তার 'হৃদয়কে বিঁধেছিল', আর সেটা যা দিয়ে করেছিল তা এই যে এখানে বসবাস করছে, সব দেখছে অথচ কোনো নিন্দা করছে না'। শুধু তা-ই নয়, সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে অভূতপূর্ব একটি বস্তু: এতটুকু অবজ্ঞা

করে না বুড়ো লম্পট বাপটাকে, বরং সব সময়ের জন্য আছে দরদ এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এক সরল হৃদয়ের অকপট অনুরাগ। এসব পাবার অতি সামান্যই যোগ্যতা আছে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের। একটা উড়নচণ্ডে বুড়ো লম্পট, যার পরিবারের কোনো বালাই নেই, এটা ছিল তার কাছে এক পরম বিস্ময়, 'নোংরামি করা' ছাড়া আর কিছুতেই এ পর্যন্ত যার গতি ছিল না, তার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। আলিয়োশা চলে যাবার পর সে মনে মনে স্বীকার করল যে ততদিনে সে এমন একটা কিছু বুঝতে শিখেছে যা এর আগে পর্যন্ত সে বুঝতে চায়নি।

আমার এই কাহিনির শুরুতেই আমি উল্লেখ করেছি যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের প্রথমা স্ত্রী, তার প্রথম পুত্র দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মা আদেলাইদা ইভানভ্‌নাকে গ্রিগোরি ঘৃণা করত, আবার অন্য দিকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের দ্বিতীয়া স্ত্রী 'উন্মাদিনী' সোফিয়া ইভানভ্‌নাকে খোদ মনিবের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করত তো বটেই, তার সম্পর্কে অ কথা কুকথা বলার অথবা চটুল কোনো মন্তব্য মুখে আনার কথাও যারা চিন্তা করত তাদের সকলের হাত থেকেও তাকে রক্ষা করত। এই দুর্ভাগা বধূটির প্রতি তার সহানুভূতি তার কাছে এমন এক ধরনের পুণ্যকর্ম হয়ে দাঁড়ায় যে বধূটির মৃত্যুর বিশ বছর পরেও কারও মুখে—তা সে লোক যে-ই হোক না কেন—তার নামে কোনও কটুকথার সামান্যতম ইঙ্গিত পর্যন্ত সে সহ্য করতে পারত না, তৎক্ষণাৎ আপত্তি তুলত। বাইরে থেকে দেখতে গেলে গ্রিগোরি ছিল নিস্পৃহ ও গম্ভীর প্রকৃতির, বাজে বকত না, ছেবলামি করত না, কথা যখন বলত তখন বেশ মেপে গুরুত্ব দিয়ে বলত। ঠিক তেমনি, তাকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতে এটাও বোঝা অসম্ভব ছিল যে সে তার কথার বাধ্য, নম্র স্বভাবের স্ত্রীটিকে ভালোবাসে কিনা, অথচ সত্যি সত্যি সে তাকে ভালোবাসে, আর তার স্ত্রীও অবশ্যই সেটা বুঝতে পারত।

এই মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না মহিলাটি বোকা তো মোটেই ছিল না, বরং হয়তো তার স্বামীর চেয়েও বেশি বুদ্ধি সে ধরত, অন্তত পক্ষে সাংসারিক ব্যাপারে তার বিচক্ষণতা তো বেশি ছিলই, অথচ তাদের দাম্পত্য জীবনের সেই শুরু থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে, মুখ বুঁজে সে তার স্বামীকে মেনে চলেছে, তার অসাধারণ নৈতিক গুণের জন্য তাকে অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা করে এসেছে। লক্ষ করার বিষয় এই যে তারা দুজনেই তাদের সারা জীবনে নিজেদের মধ্যে বাক্যবিনিময় করেছে অত্যন্ত কম—কথাবার্তা যাও বা হত তা অতি প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ব্যাপারে। গম্ভীর ও ভারিক্কি গোছের মানুষ গ্রিগোরি সব সময় একা একা নিজের মনে তার সমস্ত কাজ ও দায়দায়িত্বের ভাবনা ভাবত, ফলে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না অনেক কাল আগেই বুঝে গেছে, চিরকালের জন্য বুঝে গেছে যে তার স্বামী তার পরামর্শের কোনও প্রয়োজন বোধ করে না। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার উপলব্ধি হয়েছে যে তার স্বামী তার নীরবতার মূল্য দেয় এবং সেটাকে স্ত্রীর সুবুদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করে। প্রহারের কথা বলতে

গেলে স্বামী তাকে প্রহার কখনও করেনি—অবশ্য জীবনে মাত্র একবারই সামান্য যেটা করেছিল তার কথা বাদ দিলে—সে প্রহার ছিল খুবই মৃদু। একবার, আদেলাইদা ইভানভ্‌নার সঙ্গে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বিয়ের প্রথম বছরে গ্রামে, বাবুদের উঠোনে নাচগানের জন্য ডেকে জড় করা হয়েছিল সেখানকার চাষি বৌ-ঝিদের, যারা তখনও অবশ্য ভূমিদাস শ্রেণির অন্তর্ভুক্তই ছিল। শুরু হয়েছিল 'সবুজ ঘাসের মাঠে' দিয়ে। মার্ফা ইগ্‌তিয়েভ্‌না তখনও যুবতী। হঠাৎই একলাফে বেরিয়ে গানবাজনার দলটার সামনে গিয়ে পড়ল। নাচল সে, কিন্তু তার সেই নাচটা অন্য মেয়েদের মতো গ্রাম্য ভঙ্গিতে না হয়ে হয়েছিল 'রুশি লোকনৃত্যের' এক বিশেষ ভঙ্গিমার, যে ভাবে এক সময় ধনী জমিদার মিউসভদের বাড়ির চাকরানি হিসেবে সে নাচত জমিদার বাড়ির থিয়েটারে। তাদের নাচের তালিম দেওয়ার জন্য তখন মস্কো থেকে নাচের মাস্টার ভাড়া করে আনা হত। গ্রিগোরি দেখেছিল তার স্ত্রীর সেই নাচ। এক ঘণ্টা বাদে বাড়িতে, তাদের নিজেদের কুটিরে ফেরার পর সে তাকে একটি শিক্ষা দিয়েছিল তার চুলের মুঠি সামান্য চেপে ধরে। কিন্তু সে-ই শেষ, সেখানেই চিরকালের জন্য প্রহারের সমাপ্তি, সারা জীবনে আর একবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভনাও মনে মনে শপথ করল এর পর থেকে আর কখনও সে নাচবে না।

ঈশ্বর তাদের সন্তানাদি দেননি। একটি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু সেও মারা যায়। গ্রিগোরিকে দেখে মনে হয় সে শিশুদের ভালোবাসে, তার সেই অনুভূতি সে কখনও গোপনও করত না, অর্থাৎ প্রকাশে কোনো লজ্জাও ছিল না তার। আদেলাইদা ইভানভ্‌না যখন গৃহত্যাগ করে দ্‌মিত্রি তখন তিন বছরের শিশু। গ্রিগোরিই তাকে কোলে তুলে নেয়, প্রায় এক বছর তাকে নিয়ে পড়ে থাকে। নিজে তার চুল আঁচড়ে দিত, এমনকি নিজের হাতে তাকে টবে স্নান করিয়ে দিত। এরপর সে ইভান ও আলিয়োশারও তদ্বির তদারক করে, যার পুরস্কার স্বরূপ তাকে গালে চড় খেতে হয়—তবে সে সব কথা আমি আগেই বলেছি। তার নিজের সন্তানকে নিয়ে যেটুকু আনন্দ সে পেয়েছিল তা কেবল সন্তানের জন্মের প্রত্যাশায়। তখনও মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না গর্ভবতী। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হল তখন দুঃখে আতঙ্কে তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ছেলেটার হাতে দুটি করে আঙুল। এই দেখে গ্রিগোরি এমনই ভেঙে পড়ল যে শিশুসন্তানের জাতকর্ম অনুষ্ঠানের একেবারে আগে পর্যন্ত সে গুম মেরে রইল। শুধু তা-ই নয়, চুপচাপ থাকার জন্য ইচ্ছে করেই বেরিয়ে সেখানে চলে যেত। তখন বসন্তকাল, পুরো তিন দিন ধরে সে বাগানে কুপিয়ে কুপিয়ে সবজি ক্ষেতের মাটি তৈরি করল। তিন দিনের দিন নবজাতকের জাতকর্মের অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে গ্রিগোরি যা করার মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে। যাজকপল্লীর ভজনালয়ের পূজারি ও সেবকদের একটা দল কুটিরে এসে জড় হয়েছে, অন্যান্য অতিথিরাও এসেছে, অবশেষে এলো স্বয়ং গৃহকর্তা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্—সশরীরে হাজির হয়েছে

শিশুর ধর্মপিতা হিসেবে; এই সময় কুটিরে ঢুকে গ্রিগোরি হঠাৎ ঘোষণা করল যে শিশুর 'জাতকর্ম করার মোটে দরকার নেই'—ঘোষণাটা সে করল অনুচ্চ কণ্ঠে, কোনোমতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটি একটি করে কথা চেপে বার করে, তবে কথা বাড়িয়ে সবিস্তারে কিছু বলতে গেল না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুরোহিতের দিকে।

"কেন নয়?" মজা পেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল পুরোহিত।

"কারণ ওটা একটা ড্রাগন", বিড়বিড় করে বলল গ্রিগোরি।

"ড্রাগন? কীসের ড্রাগন?"

কিছুক্ষণের জন্য গ্রিগোরির মুখে কোনও কথা নেই।

"ওটা একটা সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি " বিড়বিড় করে সে বলল, খুব একটা স্পষ্টভাবে না হলেও বেশ দৃঢ়স্বরেই বলল। দেখে মনে হল বিশদ করে আর কিছু বলতে ইচ্ছুক নয়।

সবাই হেসে উঠল এবং বলাই বাহুল্য, বেচারি শিশুটির জাতকর্ম সম্পন্ন হল। গ্রিগোরি পবিত্র দীক্ষাবারির পাত্রের সামনে সোৎসাহে প্রার্থনা করল, কিন্তু নবজাতক সম্পর্কে তার মত পালটাল না। তাহলেও কোথাও কোনো ব্যাঘাতও সৃষ্টি করল না। শুধু জন্ম থেকে অসুস্থ ছেলেটা যে দু সপ্তাহ বেঁচে ছিল, সেই সময়ের মধ্যে বলতে গেলে একবারও তার দিকে তাকায়নি, এমনকি লক্ষ করতেও চায়নি ওটাকে, বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির মধ্যে কাটিয়েছে। কিন্তু দু সপ্তাহ পরে বাচ্চাটা যখন মুখ ও গলার ঘায়ে মারা গেল, তখন গ্রিগোরি নিজেই ছোট্ট কফিনের মধ্যে ওকে শুইয়ে দিল, গভীর শোকাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে দেখল, কবরের অগভীর ছোট্ট গর্তটা যখন মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন নতজানু হয়ে বসে সমাধির মাটিতে মাথা ঠেকাল। এর পর বহু বছর কেটে গেছে—একবারের জন্যও সে সন্তানের কথা মুখে আনেনি, মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নাও স্বামীর সামনে একবারও স্মরণ করেনি তার নিজের এই সন্তানের কথা: কারও সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যদি তাদের 'বাছার' কথা এসেও যেত, তা বলত ফিসফিসিয়ে—এমনকি গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ সেখানে উপস্থিত না থাকলেও। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না লক্ষ করেছে যে শিশুসন্তানকে কবর দিয়ে আসার পর, সেই দিন থেকেই তার স্বামী 'ভগবদ্‌মহিমা' চর্চা শুরু করে দেয়, 'সন্তজীবনকাহিনি' পাঠ করতে থাকে, বেশির ভাগ সময় একা একা চুপচাপ বসে থাকে, যখনই চোখ পড়ে, দেখা যায় তার রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো বড়ো বড়ো গোল গোল চশমাজোড়া এঁটে আছে। বড়ো বড়ো সংযমব্রতের দিন ছাড়া কদাচিৎ জোরে জোরে ওই সব পুথি পড়ত। 'জোব্-এর গ্রন্থ'[১৭] তার পড়তে ভালো লাগত। কোথা থেকে যেন 'ভগবদ্‌গতচিত্ত অস্মদীয় পিতৃকল্প মহাত্মা সিরীয় ইসা আক'-এর[১৮] বাণী ও ধর্মোপদেশের একটি কপি জোগাড় করেছিল, জেদ ধরে বছরের পর বছর সেটা পড়ে চলে; সেটার বলতে গেলে বিন্দুবিসর্গ কিছুই সে বুঝতে

পারত না, কিন্তু হয়তো ঠিক সেই কারণেই বেশি করে ভালো লাগত, বড়ো বেশি মূল্যবান, মনে হত পুথিটাকে। তাদের প্রতিবেশী এলাকায় আত্মনিগ্রহকারী 'খ্‌লিস্তিদের' কিছু কিছু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, অতি সম্প্রতি তাদের তত্ত্বটা গ্রিগোরি শোনার ও বোঝার চেষ্টা শুরু করেছিল। সম্ভবত সেটা তার মনকে নাড়াও দিয়েছিল। কিন্তু নতুন কোনো ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করাটা সমীচীন হবে বলে তার মনে হল না। বড়ো বেশি 'ভগবদ্‌মহিমা' পাঠ করতে করতে, বলাই বাহুল্য, তার চোখেমুখে আরও বেশি গাম্ভীর্যের ছাপ পড়তে থাকে।

হয়তো অলৌকিকতার দিকে তার ঝোঁক ছিল। তায় আবার ছয় আঙুলওয়ালা সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়া ও মারা যাবার ঘটনা ঠিক যেন বুঝে বুঝে এসে মিলল বড়োই অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আরও এমন একটি ঘটনার সঙ্গে, যা—পরবর্তীকালে একদা সে নিজেই স্বীকার করেছে—তার মনের ওপর 'ছাপ' ফেলে।

যা ঘটেছিল তা এই যে ছয় আঙুলওয়ালা একরত্তি বাচ্চাটাকে যে দিন কবর দেওয়া হল ঠিক সে দিন রাতেই ঘুম ভেঙে যেতে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না যেন একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনতে পেল। ঘাবড়ে গিয়ে স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। গ্রিগোরি কান পেতে শুনল, শোনার পর মন্তব্য করল, মনে হচ্ছে কেউ যেন কাতরাচ্ছে, 'সম্ভবত কোন মেয়েমানুষ'। বিছানা ছেড়ে উঠে সে জামাকাপড় পড়ল। মে মাসের বেশ উষ্ণ রাত। সদর দরজার সামনের ধাপে বেরিয়ে আসার পর সে স্পষ্ট শুনতে পেল কাতরানিটা আসছে বাগান থেকে। কিন্তু বাগান রাতের বেলায় উঠোনের দিক থেকে তালাবন্ধ থাকে। এই গেটটা ছাড়া বাগানের ভেতরে ঢোকার আর কোনও রাস্তা নেই, কেন না বাগানটা চারদিক থেকে উঁচু ও মজবুত বেড়ায় ঘেরা। ঘরে ফিরে গ্রিগোরি একটা লণ্ঠন জ্বালাল, বাগানের গেটের চাবিটা নিল। আতঙ্কে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হয়ে তার স্ত্রী তখনও বারবার জোর দিয়ে বলে চলেছে, যে একটা বাচ্চার কান্না সে শুনতে পাচ্ছে, আর সেটা বোধহয় তার নিজের ছেলেরই কান্না, কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকছে। গ্রিগোরি সে দিকে আমল না দিয়ে, কোনো কথা না বলে বাগানের দিকে চলল। বাগানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল বাগানের গেটের কাছে তাদের যে স্নানের ঘরটা আছে কাতরানিটা সেখান থেকে আসছে, আর কাতরাচ্ছে নিঃসন্দেহে কোনো মেয়েমানুষ। স্নানঘরের দরজাটা ঠেলে ভেতরে যে দৃশ্য দেখতে পেল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শহরের একটা জড়বুদ্ধি মেয়ে, লিজাভিয়েতা, রাস্তায় রাস্তায় যে ঘুড়ে বেড়ায় এবং গায়ের বোটকা গন্ধের দরুন সারা তল্লাটে —'স্মের্দিয়াশ্‌শায়া'—'দুর্গন্ধ' 'পূতিগন্ধী' লিজাভিয়েতা নামে যার পরিচয়, কী করে যেন ওদের স্নানঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, ওখানে সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছে। সদ্যোজাত শিশুটির পাশে শুয়ে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না—অমনিতেও অবশ্য

একটা কারণই তার কথা না বলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল—কথা সে কখনও বলতে পারত না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বিশেষ করে খুলে বলা দরকার।

## দুই

## 'পূতিগন্ধী' লিজাভিয়েতা

এখানে বিশেষ এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যা গ্রিগোরিকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং আগেকার নিতান্ত অপ্রীতিকর ও ন্যক্কারজনক একটা সন্দেহ চূড়ান্ত ভাবে তার মনের মধ্যে গেঁথে বসে। 'পূতিগন্ধী' লিজাভিয়েতা নামে এই মেয়েটি ছিল একেবারে বেঁটে। 'লম্বায় হাত চারেকও হবে কি হবে না, মারা যাবার পর তাকে স্মরণ করে আমাদের এই ছোটো শহরের ধর্মভীরু বৃদ্ধাদের অনেকে মমতাভরে এই সব কথা বলত। বিশ বছর বয়সের এই মেয়েটার প্রশস্ত ও রক্তিম মুখটাতে স্বাস্থ্য ফেটে পড়ত কিন্তু মুখের ভাব ছিল একেবারে জড়বৎ, তার চোখের স্থির দৃষ্টি অপ্রীতিকর, যদিও নিরীহ ধরনের। সারাটা জীবন, কী শীত কী গ্রীষ্ম মোটা শণ কাপড়ের একটা কামিজ পরে, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াত। মাথার চুল প্রায় কালোই বলা যায়, রীতিমতো ঘন, ভেড়ার লোমের টুপির মতো চেপে বসে থাকত। তার ওপরে চুলের জট সব সময় মাটি ও কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকত, তাতে জড়িয়ে থাকত ঘাস পাতা, কুটো, কাঠের ছিলকে, কেন না সে সব সময় মাটিতে নোংরার মধ্যে ঘুমোত। বাপ ইলিয়া ছিল শহরে ছাপোষা শ্রেণির লোক, হাঘরে, অসুস্থ বদ্ধ মাতাল; সর্বস্ব খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। বহু বছর আমাদের শহরে শ্রেণিরই এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের আশ্রয়ে থেকে তাদের টুকটাক কাজ করত। লিজাভেতার মা বহুকাল হল গত হয়েছিল। মেয়ে বাড়িতে এলেই চিরকালের ব্যাধিগ্রস্ত ও তিরিক্ষি মেজাজের বাপ তাকে নির্দয় ভাবে প্রহার করত। বাড়িতে অবশ্য সে কদাচিৎ আসত, কারণ যেহেতু বাতুল, তাই লোকের চোখে দেবতার আশ্রিত এবং সেই কারণে শহরের যেখানে সেখানে তার আশ্রয় ও খাবার ঠিক জুটে যেত। ইলিয়ার মনিবরা, ইলিয়া নিজেও, এমনকি শহরের অনেক সমব্যথী লোকজন,—মুখ্যত ব্যবসায়ী ও দোকানদার শ্রেণির লোকেরা— লিজাভিয়েতা যাতে ওই একটিমাত্র কামিজ পরে না থাকে সেই জন্য একাধিকবার তাকে একটু ভদ্রগোছের জামাকাপড় পরানোর চেষ্টা করেছে, শীতকালে সব সময় ভেড়ার চামড়ার কোট আর পায়ে হাইফুট পরতে দিয়েছে। এসব যখন তাকে পরানো হত তখন সে কোনো আপত্তি তুলত না বটে, কিন্তু তারপর সচরাচর দেখা যেত কোনো এক জায়গায়—বিশেষ করে বড়ো গির্জার প্রাঙ্গণে গিয়ে—ঘাগরা বল, ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথা ঢাকার রুমাল আর পায়ের হাইবুটই বল, যা যা তাকে দেওয়া হয়েছিল অবধারিতভাবে সে সব একে একে বারান্দার ধাপের ওপর খুলে রাখছে, সব ফেলে

রেখে সেই আগের মতো একটি মাত্র কামিজ গায়ে, খালি গায়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে। একবার এমন হয়েছিল যে আমাদের নতুন প্রদেশপাল হঠাৎ করে না-বলে-কয়ে আমাদের শহর পরিদর্শন করতে এসেছিলেন সেই সময় লিজাভিয়েতাকে দেখতে পেয়ে তাঁর অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ মনে দারুণ আঘাত লাগে। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মেয়েটা 'বাতুল'; লোকে তাকে সে কথা জানিয়েছিলও বটে, তবু এই বলে নিন্দা করতে ছাড়লেন না যে একটি সোমত্ত মেয়ে একটি মাত্র কামিজ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এতে সমাজের শালীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তাই ভবিষ্যতে এমনটা যেন না ঘটে। কিন্তু প্রদেশপালও প্রস্থান করলেন, লিজাভিয়েতাকেও সে যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হল। শেষকালে বাপ মারা গেল, আর তাইতে অনাথিনি বলে শহরের ধর্মভীরু মানুষদের সকলের মায়ামমতা তার ওপর আরও বেড়ে গেল। দেখেশুনে এমনও মনে হত যে তাকে যেন আসলে সকলে ভালোই বাসে; এমন কি বাচ্চা ছেলেরাও তাকে ভেংচি কাটত না উত্ত্যক্ত করত না—অথচ আমাদের শহরের বাচ্চা ছেলেদের, বিশেষত স্কুল-পড়ুয়া, জাতটার এসব ব্যাপারে উৎসাহের কমতি নেই। সে অপরিচিত লোকজনের বাড়িতে ঢুকে পড়লে কেউ তাকে তাড়াত না, বরং উলটে সকলে আদর করে দুটো একটা পয়সা তার হাতে দিত। পয়সা যা পেত তা-ই হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ এক ছুটে গিয়ে গির্জার ভাণ্ডে হোক বা জেল কয়েদিদের জন্য রাখা বাক্সেই হোক—কোথাও না কোথাও ফেলে দিয়ে আসত। বাজারে কেউ তাকে ছোটো বড়ো মিষ্টি নোনতা যে কোনো ধরনের রুটি দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে বাচ্চাটাকে সামনাসামনি পেত তাকে সেটা দিয়ে দিত, তা না হলে কখনও-কখনও এমনও হয়েছে যে আমাদের শহরের অত্যন্ত ধনী কোনো মহিলাকে থামিয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছে, মহিলাও খুশি হয়ে তা গ্রহণ করেছে। নিজে কিন্তু কালো রুটি আর জল ছাড়া কিছুই খেত না। কখন বড়ো দোকানে ঢুকে সেখানে গিয়ে বসত। সেখানে দামি দামি জিনিসপত্র আর টাকাপয়সার ছড়াছড়ি, কিন্তু দোকানের মালিকরা তার সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে কখনও মনে করত না, তারা জানত তার চোখের সামনে কেউ যদি হাজার টাকা ফেলে রেখে ভুলেও যায়, সেখান থেকে একটি কানাকড়িও সে ছোঁবে না। গির্জায় সে কদাচিৎ ঢুকত। ঘুমোত হয় গির্জার বারান্দার ধাপে, নয়ত কারও বাড়ির আঙিনার কঞ্চির বেড়া টপকে কোনও সব্জি খেতে। আমাদের শহরে তক্তার বেড়ার বদলে কঞ্চির বেড়া এখনও—এমনকি আজ পর্যন্ত অনেক আছে। বাড়িতে, অর্থাৎ তার পরলোকগত বাবা যাদের কাছে থাকত সেই মনিবদের বাড়িতে মোটামুটি সপ্তাহে একবার আসত। শীতকালটা অবশ্য প্রতিদিনই আসত, তবে সে শুধু রাতের বেলায় থাকার জন্য, হয় উঠোনে খড়ের গাদায়, নয়ত গোয়ালে শুয়ে নিদ্রা যেত। এমন জীবনযাত্রা সে সহ্য করে কীভাবে তাই ভেবে লোকে অবাক হয়ে যেত। কিন্তু এতেই সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। দৈর্ঘ্যে

ছোটখাটো হলে কী হবে, তার গড়নটা ছিল অসাধারণ মজবুত। আমাদের ভদ্রমহোদয়দের কেউ কেউ আবার জোর দিয়ে এমন কথাও বলত যে ওসব যে সে করত তা একমাত্র গর্ববোধ থেকে। কিন্তু কথাটা তার বেলায় কেমন যেন খাটে না: মেয়েটা তো অমনিতে একটা কথাও বলতে পারত না, কেবল কদাচিৎ জিভটা কেমন যেন নেড়ে ঘোঁত-ঘাঁত আওয়াজ বের করত—তার আবার গর্ববোধ!

সে অনেক দিন আগেকার কথা। একবার হল কি, সেপ্টেম্বরের এক উষ্ণ ঝকঝকে জ্যোৎস্নারাতে, তা রাত বেশ গভীরই হবে—অন্তত আমাদের মফস্‌সল শহরের হিসেবে তো বটেই—এখানকার ভদ্রঘরের জনা পাঁচ-ছয় কাপ্তান গোছের উচ্ছৃঙ্খল ইয়ার বক্‌শিদের পানোন্মত্ত একটা দল হৈ হৈ করতে করতে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিল। তারা যাচ্ছিল লোকের বাড়িঘরের ‘পিছনের গলি’ দিয়ে। গলির দু ধারে কঞ্চির বেড়া, বেড়ার ওপাশে দু ধার দিয়ে চলে গেছে বাড়ি ঘরের সংলগ্ন সব্জি ক্ষেত। আমাদের অঞ্চলে অনেক সময় নদী নামে প্রচলিত পূতিগন্ধময় একটা লম্বাটে ডোবার ওপরকার সাঁকোর মাথায় গিয়ে পড়েছে গলিটা। বেড়ার ধারে ভাঁটুই গাছ আর বিছুটিপাতার জঙ্গলের মাঝখানে আমাদের বখাটেদের দলটা ঘুমিয়ে থাকতে দেখল লিজাভিয়েতাকে। ভদ্রসন্তানরা তখন বেশ মৌজে আছে। মেয়েটাকে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, হো হো করে হাসতে হাসতে তাকে নিয়ে যত রাজ্যের অশ্লীল রসিকতা ছুঁড়ে দিল। একজন ভদ্রযুবকের মাথায় হঠাৎ খেলে গেল উদ্ভট একটা বিষয়ের ওপর এক খামখেয়ালি প্রশ্ন: ‘এমন একটা জন্তুকে কি কারও পক্ষে—তা সে যেই হোক না কেন—অন্তত এই মুহূর্তেও যদি ধরা যায়, মেয়েমানুষ বলে মনে করা সম্ভব কি  ইত্যাদি।’ সবাই নাক সিটকিয়ে গর্ব করে বলল যে তা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই দলে ছিল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্। সে হুট করে সামনে এগিয়ে এসে এই অভিমত প্রকাশ করল যে মেয়েমানুষ বলা যায়, এমনকি খুবই বলা যায় এবং এর মধ্যে মশলাদার ধরনের বিশেষ একটা কিছু আছেও বটে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা ঠিক যে সেই সময়ে বড়ো বেশি গায়ে পড়া হয়ে ভাঁড়ের ভূমিকায় নেমে সে আমাদের অঞ্চলে রীতিমতো বিশিষ্টই হয়ে পড়েছিল; সেও যে আর দশটা ভদ্রলোকের সমান—এমন একটা ভাব করেই অবশ্য আগ বাড়িয়ে সামনে লাফিয়ে পড়ে তাদের আনন্দ দিতে তার ভালো লাগত। কিন্তু আসলে তাদের চোখে সে একটা ইতর ছাড়া আর কিছু ছিল না। এটা ঠিক সেই সময়কার ঘটনা যখন পেতের্বুর্গ থেকে সে তার প্রথমা স্ত্রী আদেলাইদা ইভানভ্‌নার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল এবং মাথার টুপিতে শোকচিহ্নসূচক কালো ক্রেপকাপড়ের ফিতে বেঁধে এমনই মাতলামি ও বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছিল যে শহরে রীতিমতো শিথিল চরিত্রের আরও যারা ছিল তারা পর্যন্ত তাকে দেখে আঁতকে উঠত। দলের সকলে, বলাই বাহুল্য তার এই অপ্রত্যাশিত মত শুনে হো-হো করে হেসে উঠল, তাদের মধ্যে কে একজন আবার কাজে নেমে পড়ার জন্য ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে তাতাতেও

শুরু করল। বাকিরা অবশ্য আরও বেশি করে ছ্যা ছ্যা করতে লাগল, যদিও ব্যাপারটা তখনও দস্তুরমতো আমোদফুর্তির মধ্যেই ছিল। শেষকালে সকলে যে যার বাড়ির পথে পা বাড়াল। পরে ফিয়োদর পাভ্লভিচ শপথ করে, জোর দিয়ে বলেছিল যে সেই সময় আর সকলের সঙ্গে সেও ওখান থেকে চলে গিয়েছিল; হয়তো বা তা-ই—নিশ্চিতভাবে কেউ সেটা জানে না, কখনও জানতও না। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস পরে সারা শহরের লোকজন ক্রোধে ঘৃণায় আন্তরিকভাবে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে লিজাভিয়েতার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা বলাবলি করতে লাগল; মেয়েটার এমন সর্বনাশ কে করল, কে সেই পাপিষ্ঠ—এই নিয়ে নানারকম প্রশ্ন ও তত্ত্বতল্লাস চলতে লাগল। আর তখনই হঠাৎ করে গোটা শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এক সাংঘাতিক গুজব—অনিষ্টকারী দুর্বৃত্তটি ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ ছাড়া আর কেউ নয়। কোথা থেকে এই গুজব কে জানে? বখাটে মাতাল বাবুদের সেই দলবলের মধ্য থেকে, তত দিনে শহরে থাকার মধ্যে মাত্র একজনই রয়ে গিয়েছিল; সে লোকটাও আবার প্রৌঢ়বয়স্ক, একজন গণ্যমান্য সিভিল কাউন্সিলর, দস্তুরমতো সংসারী, তার মেয়েরা সব সোমত্ত; অর্থাৎ কিনা এমন একজন লোক যার পক্ষে আদৌ এসব কিছু রটানো সম্ভব ছিল না—এমনকি যদি সত্যি সত্যি কিছু ঘটতও। বাদবাকি আর যারা—সেই জনা পাঁচেক লোক ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু জনরব আঙুল তুলে সরাসরি ফিয়োদর পাভ্লভিচকেই দেখিয়ে দিল এবং তা-ই দেখিয়ে যেতে লাগল। এই দুর্নামের খুব একটা দাবি যে সে করেছিল এমন কথাও অবশ্য বলা যায় না; তবে কোথাকার কোন্ ব্যবসায়ী বা শহুরে ছাপোষা শ্রেণির কোনো লোকের প্রশ্নের কোন জবাব সে দেবে এমন পাত্রও সে নয়। তখন তার মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল, সরকারি আমলা আর অভিজাত শ্রেণির লোকজন — যাদের সে মনোরঞ্জন করে বেড়াত—তার নিজের সেই সমাজের বাইরে আর কারও সঙ্গে সে বাক্যালাপই করত না। এই সময়ও কিন্তু গ্রিগোরি সোৎসাহে ও সর্বশক্তিতে তার মনিবের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ায় এবং এত সব কুৎসারটনার বিরুদ্ধে তাকে সমর্থন তো করেই, এমনকি তার পক্ষ নিয়ে গালিগালাজ ও কথা কাটাকাটি কম করেনি, আর এই ভাবে অনেকের মনে নতুন করে বিশ্বাস উৎপাদনেও সক্ষম হয়। ‘মেয়েটা নীচুশ্রেণির, দোষটা তারই,’’ গ্রিগোরি জোর দিয়ে বলত, ‘আর মেয়েটার ক্ষতি যদি কেউ করেই থাকে সে ওই ‘পাঁকাল’ কার্প নামে শহরে পরিচিত জেল-পালানো মারাত্মক কয়েদিটা ছাড়া আর কেউ না হয়ে যায় না।’ লোকটা তখন আবার আমাদের শহরেই আত্মগোপন করে ছিল। এই অনুমানটা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। কার্পের কথা লোকের মনে পড়ল, লোকে ঠিক এটাও মনে করতে পারল যে শরৎকালের গোড়ার দিকে ওই রকমই রাতের বেলায় তাকে শহরে ঘুরঘুর করতে দেখা গিয়েছিল এবং সেই সময় তিনজন লোকের ওপর চড়াও হয়ে সে লুটতরাজ চালায়। কিন্তু পুরো ঘটনাটা এবং এই সব গল্পগুজব—এর কোনোটার

ফলেই বেচারি জড়বুদ্ধি মেয়েটার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি এতটুকু তো কমলই না, বরং লোকে আরও বেশি করে তাকে আদর-যত্ন করতে লাগল। কোনো এক সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের বিধবা স্ত্রী কন্দ্রাতিয়েভা আবার এমন ব্যবস্থা করেছিল যে এপ্রিলের সেই শেষাশেষি থেকেই মেয়েটিকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখতে থাকে। মহিলার উদ্দেশ্য ছিল প্রসবের আগে পর্যন্ত তাকে কোথাও ছাড়বে না। তাকে সে সর্বক্ষণ চোখে-চোখে রাখত; কিন্তু দেখা গেল, এত চোখে-চোখে রাখা সত্ত্বেও ঠিক শেষ দিনটিতে সন্ধ্যাবেলায় কেমন করে যেন হঠাৎ কন্দ্রাতিয়েভ্দের চোখে ফাঁকি দিয়ে গোপনে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে ফিয়োদর পাভ্লভিচের বাগানে এসে পড়ে। তার ওই অমন অবস্থায় কী করে অত উঁচু ও মজবুত বেড়া ডিঙিয়ে সে বাগানে ঢুকল তা এক ধরনের রহস্যই থেকে গেল। কারও কারও ধারণা হয়েছিল কেউ তাকে 'বহন করে' সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, কারও বা ধারণা হয়েছিল কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে সে সেখানে গিয়েছিল। যেটা খুবই সম্ভব তা এই যে অত্যন্ত জটিল কোনো উপায়ে হলেও ঘটনাটি ঘটেছিল কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই: কঞ্চির বেড়া বয়ে অন্যের সবজি খেতের ভেতরে ঢুকে পড়া এবং সেখানে রাত্রিযাপনের একটা দক্ষতা লিজাভিয়েতার ছিল, তাই সেদিনও হয়তো যেভাবেই হোক ফিয়োদর পাভ্লভিচের বাগানের বেড়ার ওপরও গিয়ে সে উঠেছিল, আর সেখান থেকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা সত্ত্বেও, নিজের ক্ষতি করেও সে লাফিয়ে বাগানের ভেতরে গিয়ে পড়ে।

লিজাভিয়েতাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গ্রিগোরি দৌড়ে ফিরে গিয়ে মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্নাকে সাহায্যের জন্য তার কাছে পাঠিয়ে দিল। নিজে সে ডেকে আনতে ছুটল শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বুড়ি দাইকে, যে খুব একটা দূরে থাকত না। বাচ্চাটাকে বাঁচানো গেল, কিন্তু লিজাভিয়েতা ভোরের আগেই মারা গেল। গ্রিগোরি বাচ্চাটাকে বাড়ি নিয়ে এলো, স্ত্রীকে বসতে বলে বাচ্চাটাকে তার কোলে, একেবারে বুকের কাছে তুলে দিয়ে বলল, 'ঈশ্বরের অনাথ শিশু সকলের আপনজন—আর তোমার আমার তো কথাই নেই। আমাদের যে বাচ্চা গত হয়েছে সে-ই একে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে, কিন্তু এ এসেছে এক শয়তানের পুত্র আর এক নিষ্পাপ পুণ্যবতীর কাছ থেকে। আর কেঁদো না, একেই সেবাযত্ন করে বড়ো করে তোল।' তা মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে লাগল। তার জাতকর্ম হল, নাম দেওয়া হল পাভেল, কিন্তু নামের পিতৃনামসূচক অংশটি কারও কোনও নির্দেশ ছাড়া আপনা আপনিই বাড়ির কর্তা ফিয়োদরের নামে হয়ে গেল ফিয়োদরভিচ; সে পরিচিত হল পাভেল ফিয়োদরভিচ নামে। ফিয়োদর পাভ্লভিচ এর কোনোটারই কোনো বিরোধিতা তো করলই না, বরং এসবের মধ্যে মনে মনে বেশ একটা মজাও উপলব্ধি করতে লাগল, যদিও যতদূর সাধ্য সব কিছুর দায়িত্ব অস্বীকার করে যেতে লাগল। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটাকে সে যে গ্রহণ করেছিল

এটা শহরের লোকেরা ভালো মনেই নিল। পরে লিজাভিয়েতা যে 'পূতিগন্ধী' স্মের্দিয়াশশায়া নামে পরিচিত ছিল তা থেকে ছেলের পদবি রাখল স্মের্দিকোভ্। এই স্মের্দিকোভ শেষ পর্যন্ত ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের দ্বিতীয় ভৃত্য হল এবং আমাদের এই কাহিনির যখন শুরু তখন সে বুড়ো গ্রিগোরি আর বুড়ি মার্ফার সঙ্গে বাইরের বাড়িতে ভৃত্যমহলে বসবাস করছে। তাকে পাচকের কাজে বহাল করা হয়েছিল। স্মের্দিকোভ্ সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু বলা একান্ত দরকার ছিল। কিন্তু এত সাধারণ এই সব হুকুমবারদার শ্রেণির লোকজনের কথা বলে পাঠকদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে আমার কেমন যেন বিবেকে বাধছে, তাই ফিরে যাচ্ছি আবার মূল কাহিনিতে; তবে মনে মনে এই আশা আছে যে স্মের্দিকোভ্ যথাসময়ে কোনো না কোনো ভাবে আখ্যানের প্রবাহে আপনা আপনি উঠে আসবে।

## তিন

## কোন এক উদগ্র হৃদয়ের স্বীকারোক্তি: কাব্যে

মঠ ছেড়ে চলে যাবার সময় গাড়ি থেকে হেঁকে আলিয়োশার বাবা তার ছেলেকে যে হুকুম দিয়ে গেল তা শুনে আলিয়োশা রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে যেখানে ছিল কিছুক্ষণের জন্য সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই নয় যে নিশ্চল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে রইল, সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বরং দেখা গেল মঠাধ্যক্ষের রান্নাঘরের ওপরতলায় তার বাবামশাই কী কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে গেছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে ওই অবস্থাতেও সে তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হতে পেরেছিল। যা হোক, ওখান থেকে সে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো তখন তার মনে মনে এই আশা ছিল যে এই মুহূর্তে যে-সমস্যাটি তাকে এত পীড়া দিচ্ছে শহরে যাবার পথে কোনো-না-কোনো ভাবে তার একটা সমাধান সে ঠিকই বের করে ফেলতে পারবে। এখানে আগে থাকতে বলে রাখি: বাপের চেঁচামেচিতে অথবা 'বালিশ তোশক বেঁধে ছেঁদে' বাসবদল করে বাড়িতে চলে আসার হুকুমে এতটুকু ভয় সে পায়নি। সে বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছিল যে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে এবং অমন লোক-দেখানো চিৎকার-চেঁচামেচি করে মঠ ছেড়ে বাড়িতে চলে আসার যে হুকুম, সেটা দেওয়া হয়েছিল মুহূর্তের একটা 'উন্মাদনার বশে', এমনকি বলা যেতে পারে, রং ফলানোর উদ্দেশ্যে—অনেকটা যেমন হালফিল ঘটেছিল তাদের এই ছোটো শহরে ছাপোষা শ্রেণির একজন লোকের বেলায়, যে তার নিজেরই নাম-তিথি উৎসব পালন করতে গিয়ে বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করে বসেছিল: তাকে আর ভোদ্‌কা দেওয়া হচ্ছে না বলে হঠাৎ খেপে গিয়ে নিজের বাড়িরই বাসনকোসন ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করতে থাকে, তার নিজের এবং স্ত্রীর জামাকাপড় ছিঁড়তে শুরু করে, শেষকালে বাড়ির জানলার কাচও ভাঙতে থাকে—এসবই সে করে

আবার সেই রং ফলানের খাতিরে। এমন ধরনেরই একটা কিছু, বলাই বাহুল্য, এখন তার বাবামশাইয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। পরদিন নেশা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর সেই হুল্লোড়বাজ লোকটির অবশ্য আক্ষেপ হয়েছিল। আলিয়োশা জানত যে বুড়োও তেমনি নির্ঘাত তাকে আগামীকাল—এমন কি বলা যায় না, হয়তো আজও মঠে ফিরে যেতে দিতে পারে। তাছাড়া সে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে বাপ আর যার মনেই আঘাত দিক না কেন, তার মনে কখনওই আঘাত দিতে চাইবে না, এমনকি শুধু যে চাইবে না তা নয়, পারবে না। এটা ছিল তার কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, যুক্তিতর্কহীন চিরকালের সত্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এতটুকু ইতস্তত না করে সে সামনে এগিয়ে যেত।

কিন্তু এই মুহূর্তে আরেক ধরনের একটা ভীতি তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সেটা একেবারে অন্য এক ধরনের, তা ছাড়া এমনই পীড়াদায়ক যে তার নিজের পক্ষেও নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তার ভয় বিশেষ করে কোনো এক নারীকে—ঠিক বলতে গেলে কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে, মাদাম খখ্‌লাকোভার হাত দিয়ে যে এই সবে আলিয়োশাকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে কেন যেন তার সঙ্গে একবার দেখা করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে। এই দাবি এবং অতি অবশ্য দেখা করতে যাবার প্রয়োজনীয়তা আলিয়োশার মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা পীড়াদায়ক অনুভূতির সঞ্চার করে। সারাটা সকাল ধরে, এবং যত সময় যাচ্ছে ততই আরও বেশি করে, উত্তরোত্তর আরও বেশি অস্বস্তিকর হয়ে এই অনুভূতি তাকে বিঁধছে, তা সে তার পর থেকে পর পর এত সব কাণ্ড, মঠে এবং এই এখন মঠাধ্যক্ষের এখানে অপ্রত্যাশিত সমস্ত ঘটনা—ইত্যাদি ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও। তার ভয়টা এই কারণে নয় যে সে জানে না যে মেয়েটি কী নিয়ে তাকে কথা বলবে, আর সে-ই বা তাকে কী জবাব দেবে। মেয়েমানুষ বলে যে তাকে ওর ভয় আদৌ তা নয়: এটা ঠিক যে মেয়েদের সে খুব কমই জানে, তবু সেই শিশুবয়স থেকে শুরু করে মঠে ঢোকার একেবারে আগে পর্যন্ত তার সারাটা জীবনে পুরোপুরি একমাত্র তাদের সাহচর্যেই কেটেছে। আসলে এই মেয়েটিকে, এই কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকেই তার যত ভয়। প্রথম যখন তাকে দেখে সেই তখন থেকেই তাকে সে ভয় করে। তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে সাকুল্যে একবার কি দুবার, বড়োজোর তিনবার হলেও হতে পারে; এমনকি একবার দৈবাৎ দুএকটি বাক্য বিনিময়ও হয়েছিল তার সঙ্গে। এক সুন্দরী অহঙ্কারী ও দাপুটে মেয়ে হিসেবে তার চেহারাটা আলিয়োশা মনে করতে পারে। কিন্তু আলিয়োশার কাছে যেটা অস্বস্তিকর তা ওর রূপ নয়, অন্য একটা কিছু। তার এই আতঙ্ক, যে ব্যাখ্যাতীত, একথা ভেবেই তার মনের ভেতরের এই আতঙ্কটা প্রবল হয়ে উঠছে। মেয়েটির উদ্দেশ্য অতি মহৎ—একথা আলিয়োশা জানে; আলিয়োশার ভাই দ্‌মিত্রিকে সে বাঁচাতে চায়। যদিও দ্‌মিত্রি ইতিমধ্যেই তার কাছে অপরাধী, কিন্তু মেয়েটি স্রেফ তার উদারতাবশত এটা করতে

চাইছে। তা তার এত সব সুকুমার ও মহৎ অনুভূতি মনে মনে স্বীকার করা এবং সেগুলির প্রতি সুবিচার করা ছাড়া আলিয়োশার যদিও কোনও গত্যন্তর ছিল না, তবু কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়ির যত কাছাকাছি সে চলে আসছিল তার শিরদাঁড়া বয়ে ততই বেশি করে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে আসতে লাগল।

আলিয়োশা মনে মনে ভেবে দেখল, তার দাদা ইভান ফিয়োদরভিচের সঙ্গে মেয়েটির বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে বটে, তবে তাকে ওর ওখানে পাওয়া যাবে না: সে এখন খুব সম্ভব বাবার সঙ্গে আছে। দ্‌মিত্রিকে যে পাওয়া যাবে না সেটা আরও নিশ্চিত—কেন তা আগে থাকতেই সে উপলব্ধি করতে পারছিল। সুতরাং তাদের কথাবার্তা একান্তেই হবে। তার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল এই সর্বনাশা কথাবার্তার আগে একবার একছুটে দ্‌মিত্রির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসে। চিঠিটা তাকে না দেখিয়ে তার সঙ্গে এই নিয়ে দু একটা কথা বলা যেত। কিন্তু দ্‌মিত্রি আবার থাকে অনেকটা দূরে, তাছাড়া সে হয়তো এখন বাড়িতেও নেই। মিনিটখানেক ইতস্তত করে থমকে দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে সে চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলল। তার যেমন অভ্যাস সেইভাবে দ্রুত ক্রুশ-প্রণাম ঠুকল, সঙ্গে সঙ্গে কী যেন মনে হতে মুচকি হেসে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ভয়াবহ ভদ্রমহিলাটির বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বাড়িটা তার জানা ছিল। কিন্তু বল্‌শায়া স্ট্রিটে পড়ে তারপর শহরের বাজার চত্বর ইত্যাদির ওপর দিয়ে যদি যেতে হয় তাহলে বেশ খানিকটা দূর পড়ে যায়। আমাদের এই শহরটা ছোটো হলে কী হবে বড়ো বেশি ছড়ানো-ছিটানো, এখানে তাই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব অত্যন্ত বেশি হয়ে দাঁড়ায়। পরন্তু আলিয়োশার বাবা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, হয়তো এখনও নিজের হুকুমটা ভুলে যাবার অবকাশ সে পায়নি, ফলে চূড়ান্ত রকমের খামখেয়ালিপনা শুরু করে দিতে পারে, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে গিয়ে বাড়ি ফিরে আসা দরকার। এই সব ভাবনাচিন্তার ফলে সে ঠিক করল পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য লোকের ঘরবাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাবে। শহরের এই সব গলিঘুঁজি ছিল তার নখদর্পণে। পিছন দিক দিয়ে যাবার অর্থ সেখানে রাস্তাঘাট বলতে প্রায় কিছুই নেই, বাড়িঘরের নির্জন বেড়ার ফাঁক দিয়ে এমনকি কখনও-কখনও বা অন্যের বাড়ির কঞ্চির বেড়া টপকে তাদের উঠোন পেরিয়ে যেতে হয়, সেখানে আবার সবাই তাকে চেনে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে তাকে প্রীতিসম্ভাষণ করে। এই পথ দিয়ে বের হতে পারলে বলশায়া স্ট্রিট অর্ধেক কাছে পড়ে। এই পথে আবার এমন একটা জায়গাও পড়ল যেটা আলিয়োশার বাবার বাড়ির খুবই কাছাকাছি; বলতে গেলে তাকে যেতে হল তাদেরই বাড়ির পাশের একটা বাগানের কাছ দিয়ে। এই বাগানের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল একপাশে হেলে পড়া একটা ছোট্ট জরাজীর্ণ বাড়ি, যার চারটে জানলা। আলিয়োশা জানে, বাড়িটা যার অধিকারে আছে সে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক পঙ্গু বৃদ্ধা, তার মেয়েকে নিয়ে সেখানে থাকে। মেয়েটি এক সময়

রাজধানী পেতের্বুর্গে সুসভ্য গৃহপরিচারিকার কাজ করত। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেখানকার তাবড় তাবড় জেনারেলের বাড়িতে বসবাস করে এসেছে; এখন, বছর খানেক হল বৃদ্ধার অসুস্থতার দরুন তাকে দেখাশোনা করার জন্য বাড়ি ফিরে এসেছে এবং ফ্যাশনদোরস্ত জামাকাপড় পরে চালবাজি করে বেড়াচ্ছে। এই বৃদ্ধা আর তার মেয়ে কিন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছে, এমনকি প্রতিদিন পাশের বাড়ির ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের রান্নাঘরে এসে স্যুপ আর রুটিও চেয়ে নিয়ে যেত। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না সানন্দে তাদের সে খাবার জোগাত। মেয়েটি স্যুপ আর রুটি নিতে আসত বটে, কিন্তু তার দামি পোশাকগুলির একটিও বিক্রি করতে নারাজ; সেগুলির মধ্যে একটি লম্বা পোশাকের আঁচলটা আবার মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া লম্বা লেজের মতো ছিল। এই শেষের ব্যাপারটা অবশ্য আলিয়োশা জানতে পেরেছে নেহাৎই দৈবাৎ—তার বন্ধু রাকিতিনের কাছ থেকে। এদের এই ছোটো শহরের কোথায় কী ঘটছে তা রাকিতিনের ভালো জানা আছে। তবে কথাটা শোনার পর, বলাই বাহুল্য, আলিয়োশা তৎক্ষণাৎ ভুলেও গিয়েছিল। কিন্তু এখন প্রতিবেশীর বাগানের কাছাকাছি হতে সেই লম্বা লেজটার কথাই তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে সে মাথা হেঁট করে পথ চলছিল, এবারে চট্ করে মাথা তুলে তাকাতেই আচমকা একটা অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার ঘটে গেল।

প্রতিবেশিনীর বাগানের কঞ্চির বেড়ার ওপাশে কীসের ওপর যেন চড়ে বুক পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে গলা বাড়িয়ে তার ভাই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ প্রবল বেগে দুহাত নেড়ে নানারকম ইশারা ইঙ্গিত করে, হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে; দেখেশুনে মনে হচ্ছে তাকে চিৎকার করে ডাকতে তো ভয় পাচ্ছেই, এমনকি পাছে কেউ শুনে ফেলে সেই ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না। আলিয়োশা তৎক্ষণাৎ বেড়ার কাছে ছুটে গেল।

"ভালো বলতে হবে যে তোর চোখ পড়েছিল, আরেকটু হলেই তোকে চিৎকার করে ডেকে ফেলেছিলাম", উৎফুল্ল হয়ে ফিসফিস করে তড়বড়িয়ে বলে উঠল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্। 'উঠে আয় দেখি এখানটায়। চটপট! আহা কী ভালোই না হল তুই আসাতে! এইমাত্র তোর কথাই ভাবছিলাম!"

আলিয়োশা নিজেও খুশি হল, শুধু কী করে বেড়া ডিঙোবে এই ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু অমিতবলশালী 'মিতিয়া' তার হাত দিয়ে আলিয়োশার কনুই চেপে ধরে তাকে বেড়া টপকাতে সাহায্য করল। শহরের রাস্তায় রাস্তায় যে সব বাচ্চা ছেলে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, আশ্রমিকের ঢিলে জোব্বাটা গুটিয়ে তুলে ধরে তাদের মতো আলিয়োশাও কায়দা করে বেড়া টপকে টুপ করে ওপাশে গিয়ে পড়ল।

"বাঃ এই তো পেরেছিস! এবারে চল!" উল্লসিত হয়ে মিতিয়া চাপা গলায় বলে উঠল।

"কোথায় যাব বল তো?" চারদিকে দৃষ্টিপাত করে যেখানে ওরা দুজন ছাড়া

আর কোনও জনপ্রাণী নেই, একেবারে নির্জন পরিত্যক্ত এমন একটা বাগানের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে আলিয়োশাও চাপা গলায় বলল। বাগানটা ছোটো বটে, তবে তার ভেতরের ছোটো বসতবাড়িটা সেখান থেকে আরও অন্তত পঞ্চাশ পা মতন দূরে। তা দেখে আলিয়োশা বলল, "আরে এখানে তো কেউ কোথাও নেই, তাহলে অমন চুপিচুপি কথা বলছ কেন?"

"কেন চুপিচুপি কথা বলছি? মরুক গে যা!" দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ হঠাৎ পুরোদমে গলা ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "তাই তো, চুপিচুপি কথা বলছিই বা কেন? তা তুই নিজেই দেখতে পাচ্ছিস, প্রকৃতির গোলমাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি এখানে গোপনে আছি এবং লুকিয়ে লুকিয়ে একটা গোপন ব্যাপারের ওপর চোখ রাখছি। ব্যাপারটা পরে হবে, কিন্তু বিষয়টা যে গোপন সেটা বোঝার পর আমি হঠাৎই গোপনভাবে কথা বলতে শুরু করেছি, বোকার মতো ফিসফিসিয়ে কথা বলছি, দেখ কাণ্ড, তার কোনো দরকার ছিল না। চল! ওই যে ওখানে! তার আগে কোনো কথা নয়। তোকে চুমো খেতে ইচ্ছে করছে।

জগতে পরম যিনি তাঁর হোক জয়,
আমাতে পরম যিনি তাঁর হোক জয়!...

আমি এই এখন, তুই আসার ঠিক আগে, এখানে বসে এটাই আওড়াচ্ছিলাম।..."

নয় বিঘা বা তার কিছু বেশি পরিমাণ জমির ওপর বাগানটা, তবে গাছপালা যা লাগানো হয়েছে তা কেবল চারধারে; চারদিকের সবগুলি বেড়ার ধারে ধারে আপেল, ম্যাপল লাইম আর বার্চগাছ। মাঝখানটা খালি, সেটা ঘাসজমি। ফিবছর গ্রীষ্মকালে সেখান থেকে মন-মন ওজনের শুকনো ঘাস কাটা হয়। বসন্তকাল থেকে বাগানটা কিছু রুবলের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া হয়। সেখানে র‍্যাস্পবেরি, গুজবেরি, কার‍্যান্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ছোটো ছোটো ফলের ঝোপঝাড়ের সারিও ছিল—সেগুলিও কিন্তু সেই বেড়ার ধার ঘেঁষে; আনাজখেতের সারিগুলি বাড়ির একেবারে কাছাকাছি—সেগুলি অবশ্য বেশি দিন হল করা হয়নি। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ তার অতিথিকে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে বাগানের এক নিভৃত কোনায়। সেখানে লাইমগাছের ঘন জঙ্গল আর কার‍্যান্ট, এল্‌ডার, স্নোবল ও লাইলাকের পুরনো ঝোপঝাড়ের মাঝখানে হঠাৎ মান্ধাতা আমলের সবুজ উদ্যানগৃহের ধ্বংসস্তূপের মতো কিছু একটা চোখে পড়ল। জাফরিকাটা দেয়ালগুলিতে কালচে ধরেছে, সেগুলি বেঁকেচুরে গেছে, তবে ওপরের চালাটা আছে, তাই এখনও বৃষ্টির হাত থেকে ভেতরে মাথা গোঁজা যেতে পারে। কবে যে তৈরি হয়েছিল ভগবান জানেন। লোকশ্রুতি বলে যে বছর পঞ্চাশেক আগে বাড়ির তখনকার মালিক, আলেক্সান্দ্র কার্লভিচ্ ফন্ শ্‌মিড্ নামে কোনো এক অবসরপ্রাপ্ত লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল নাকি এটা তৈরি করেছিল। কিন্তু এতদিনে সবই নষ্ট হয়ে গেছে। মেঝের কাঠ পচে গেছে, তক্তাগুলো সব আলগা হয়ে নড়বড় করছে, পচা কাঠ থেকে সেঁতসেঁতে ছাতাপড়া গন্ধ উঠছে।

ভেতরে সবুজ রঙের একটা কাঠের টেবিল, সেটার পায়াগুলো মাটিতে গাঁথা। চারপাশে বেশ কয়েকটা বেঞ্চ, সেগুলিও সবুজ। এখনও সেখানে বসা যেতে পারে। আলিয়োশা ইতিমধ্যে তার দাদার উচ্ছ্বসিত ভাবটা লক্ষ করেছিল এবারে ঘরের ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর অর্ধেক বোতল ব্র্যান্ডি আর একটা মদের গ্লাস দেখতে পেল।

"এটা ব্র্যান্ডি!" হো হো করে হেসে মিতিয়া বলল। "তোর চাউনি দেখে বুঝতে পারছি, ভাবছিস, 'আবার মদ খাচ্ছে'? ওসব ভূতুড়ে বিশ্বাস ছাড় দেখি'।

বিশ্বাস কোরো না ফাঁকা, মিছে জনতাকে
ভুলে যাও সন্দেহ যদি মনে থাকে

"মদ খাচ্ছি না, এই একটু 'চাখাচাখি করছি' আর কি—তোর ওই শুয়োর রাকিতিনটার ভাষায় বলতে হয়। দ্যাখ, বলে দিলাম, ও বেটা একদিন সিভিল কাউন্সিলর হবে, কিন্তু ওই 'চাখাচাখি করছি' বলাটা ওর তখনও ঘুচবে না। নে, বোস। আলিয়োশা, ভাই আমার, আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোকে বুকে টেনে নিয়ে চেপে পিষে ফেলি, কেন না পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি হ্যাঁ, সত্‌-ত্যি সত্‌-ত্যি একবার ভেবে দ্যাখ! যদি কাউকে ভালো বেসে থাকি সে কেবল তোকেই!"

শেষ কথাগুলি সে উচ্চারণ করল অনেকটা যেন ঘোরের মধ্যে।

"একমাত্র তোকে, হ্যাঁ আর ওই একটা 'নচ্ছার মেয়েকে', যার প্রেমে পড়ে আমি ডুবতে বসেছি। কিন্তু প্রেমে পড়ার অর্থ ভালোবাসা নয়। কাউকে ঘৃণা করেও তার প্রেমে পড়া যায়। মনে রাখিস! এখন আপাতত খুশি মনেই কথাগুলো বলছি! এই এখানে টেবিলের এই ধারটাতে বোস, আর আমি বসছি তোর পাশে, এই একটা পাশ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে তোকে দেখব, আর তোর সঙ্গে কথা বলব। তুই শুধুই চুপ করে থাকবি, আমি কেবলই কথা বলে যাব, কারণ সময় হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, জানিস, আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম, বাস্তবিকই নীচু গলায় কথা বলা দরকার, কারণ এখানে এখানে বলা যায় না, হঠাৎ দেখা গেল কেউ হয়তো কান খাড়া করে আছে। সব বুঝিয়ে বলব, ওই যেমন বলে: ক্রমশ প্রকাশ্য। কেন তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি অমন ছটফট করছিলাম, কেন এখন, গত কয়েক দিন ধরে, এই এখনও তোর জন্য আমার মন অমন আকুলি বিকুলি করছিল? আমি এখানে গত পাঁচদিন হল নোঙর ফেলে বসে আছি। এত দিন ধরে? কারণ কথাটা একমাত্র তোকেই বলব বলে, কারণ এটা দরকার, কারণ তোকে আমার দরকার, কারণ আগামীকাল স্বর্গের রাজ্য থেকে আমি উড়ে পড়ব, কারণ কালই জীবনের শেষ ও শুরু। তোর কি কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে? তুই কি কখনও স্বপ্নে দেখেছিস পাহাড়ের মাথা থেকে অতল গহ্বরে পড়লে কেমন লাগে? তা এখন যে আমি উড়তে উড়তে পড়ছি সেটা কিন্তু আর স্বপ্নের মধ্যে নয়। আমার তাতে কোনও ভয় নেই, তুইও ভয় পাসনে। অর্থাৎ কিনা, ভয় পাচ্ছি

বটে, তবে বেশ মধুর লাগছে। মানে, মধুর ঠিক নয়, এক ধরনের তুরীয়ানন্দ।

ধুত্তোর ছাই! যা-ই হোক না কেন, ওতে কিছু আসে যায় না। শক্ত মন, দুর্বল মন, মেয়েলি মন—তা সে যা-ই বলিস না কেন! এখন আয়, গুণগান গাই প্রকৃতিদেবীর: দেখছিস, সূর্যের কী তেজ, আকাশটা কেমন নির্মল, পাতাগুলো সব কত সবুজ, এখনও পুরোদমে চলছে গ্রীষ্মের দাপট, দুপুর গড়িয়ে বেলা তিনটে পেরিয়ে গেছে, সব সুনসান! কোথায় যাচ্ছিলি বল তো?"

"যাচ্ছিলাম বাবার কাছে, তবে প্রথমে যাবার ইচ্ছে ছিল কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে।"

"তার কাছে, আবার বাবার কাছেও! আচ্ছা একেই বলে যোগাযোগ! আরে তোকে যে আমি ডেকেছিলাম সেটা কীসের জন্য? কীসের জন্য আমার অত ছটফটানি, অমন আকুলি বিকুলি আমার অন্তরাত্মার প্রতিটি আনাচে কানাচে, এমনকি আমার বুকের প্রতিটি পাঁজরে? সে তো তোকে আমার তরফ থেকে বাবার কাছে, তারপর ওর কাছে—কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে পাঠাব বলেই, আর ওই ভাবে তার সঙ্গে এবং বাবার সঙ্গে—ওদের দুজনের সঙ্গেই একটা হেস্তনেস্ত করব। পাঠাতে হলে একজন দেবদূতকেই পাঠাতে হয়। আমি যে কাউকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু আমার দরকার ছিল একজন দেবদূতকে পাঠানো। তা এই তো দেখছি তুই নিজেই তো ওর কাছে যাচ্ছিস, আবার বাবার কাছেও যাচ্ছিস।"

"তুমি কি সত্যি-সত্যি আমাকে পাঠাতে চেয়েছিলে নাকি?" আলিয়োশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। তার মুখের ওপর ফুটে উঠল যন্ত্রণাকাতর ভাব।

"দাঁড়া দাঁড়া, তুই এটা জানতিস। আমি দেখতে পাচ্ছি তুই সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝে ফেললি। কিন্তু কোনো কথা নয়, আপাতত চুপ করে থাক। কোনো করুণা দেখান নয়, কোনো চোখের জল ফেলা নয়।"

দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ উঠে দাঁড়াল, একটা আঙুল কপালে ঠেকাল, তাকে চিন্তিত দেখাল।

"সে তোকে নিজেই ডেকে পাঠিয়েছে, তোকে চিঠি চিঠি লিখেছে, অথবা ওই রকম কিছু হবে, যে কারণে তুই তার কাছে যাচ্ছিলি, তাই না? নইলে কি আর যেতিস?"

"এই যে চিরকুট", আলিয়োশা পকেট থেকে বের করে দেখাল। মিতিয়া দ্রুত তার ওপর চোখ বুলাল।

"তুই কিনা যাচ্ছিলি পিছনের রাস্তা ধরে! হে ভগবান, ওকে যে বড়ো রাস্তা দিয়ে না পাঠিয়ে পিছন দিয়ে পাঠিয়েছ এর জন্য তোমাকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব! তাইতে না ও আমার কাছে ধরা দিল! এ যে দেখছি রূপকথার সেই বোকা বুড়ো জেলেটার কাছে সোনার মাছ ধরা পড়ার মতো।[২২] শোন আলিয়োশা, শোন ভাই আমার: এখন কিন্তু তোকে সব বলব বলে ঠিক করেছি, কেননা কাউকে

না কাউকে তো বলতেই হয়। স্বর্গের দেবদূতকে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, এবারে মর্ত্যের দেবদূতকেও বলতে হয়। তুই আমার মর্ত্যের দেবদূত। তুই সবটা শুনবি, তুই বিচার করবি, ক্ষমা করার হয় তুই করবি। আমার যেটা দরকার তা হল যিনি সবার ওপরে আছেন এমন কেউ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। শোন তাহলে, এমন যদি হয় যে দুটি প্রাণী যদি অকস্মাৎ পার্থিব সব কিছুর বন্ধন কাটিয়ে অস্বাভাবিক কিছু একটার মধ্যে গিয়ে উড়ে পড়ল—অথবা অন্তত ওদের একজনও তা করে—এবং উড়ে পড়ার বা ধ্বংস হওয়ার আগে আরেকজনের কাছে এসে বলে: আমার জন্য এটা অথবা ওটা করে দাও—অর্থাৎ এমন কিছু করে দিতে বলে যা কখনও কেউ কাউকে করতে বলে না, কিন্তু যে অনুরোধ লোকে একমাত্র মৃত্যুশয্যাতেই করতে পারে—তা হলে কি সেই আরেকজন তা রাখবে না যদি সে বন্ধু হয়, ভাই হয়?”

“আমি রাখব, কিন্তু বল সেটা কী, আর যত তাড়াতাড়ি পার বলে ফেল”, আলিয়োশা বলল।

“তাড়াতাড়ি বলতে বলছিস হুম্। দাঁড়া, অত তাড়াহুড়ো করিস নে, আলিয়োশা, ভাই আমার। ওই তাড়াহুড়ো করতে গেলেই না যত দুশ্চিন্তা। এখন আর তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। এখন পৃথিবীটা একটা নতুন বাঁক নিয়েছে। ওঃ আলিয়োশা, আফসোসের কথা এই যে পরম পুলক কাকে বলে তা তুই কল্পনায় আনতে পারবি না! কিন্তু না, এ আমি কাকে কী বলছি? তুই কল্পনায় আনতে পারবি না তা কী করে হয়! বলব কি, আমি একটা আস্ত গবেট। আমি বলি কি:

হে মানুষ, মহৎ হও![১১]

কার কবিতা এটা?”

আলিয়োশা স্থির করল আরেকটু অপেক্ষা করবে। বুঝতে পারল তার যা কাজ তা এখন সত্যি-সত্যি হয়তো একমাত্র এখানেই মিটে যেতে পারে। মিতিয়া টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে, হাতের তালুতে মাথা রেখে মিনিট খানেকের জন্য চিন্তায় ডুবে গেল। দুজনেই চুপচাপ।

“আলিয়োশা ভাইটি”, মিতিয়া বলল, “তুই-ই একমাত্র লোক যে আমার কথা শুনে হাসবে না! আমার ইচ্ছে ছিল আমার স্বীকারোক্তিটা শুরু করি শিলার-এর ‘আনন্দ স্তোত্র’ An die Freude দিয়ে[১২]। কিন্তু জার্মান আমি জানি নে, শুধু জানি ওই An die Freude। তাই বলে আবার ভেবে বসিস নে যে আমি মাতাল হয়ে বকবক করছি। আমি আদৌ মাতাল নই। ব্র্যান্ডি হল গিয়ে ব্র্যান্ডি, কিন্তু মাতাল হতে গেলে আমার দরকার দুবোতল।

লালমুখো সিলেনুস্ গাধার সওয়ার,
যে গাধা হোঁচট খায় হায় পদে পদে —

আমি কিন্তু সিকিবোতল মদও খাইনি, আমি সুরাদেবতার গুরু সিলেনুস্[১৩] নই,

তবে আমার হিম্মৎ আছে কারণ আমি চিরকালের জন্য মনস্থির করে ফেলেছি। যাক গে, কথার এই মারপ্যাঁচের জন্য তুই আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে দিস। কথার মারপ্যাঁচ কেন, আরও অনেক কিছুর জন্যই আজ আমায় ক্ষমা করে দিতে হবে ভাই। চিন্তা করিস না, আমি ফাঁকা বুলি কপচাচ্ছি না, আমি কাজের কথা বলছি, এই এক্‌খুনি কাজের কথায় আসছি। না না, কোনো ইহুদি বাছাধনের বাপের নাম ভুলিয়ে দেবার মতো অবস্থা তোর করব এমন মনে করিস না। দাঁড়া দাঁড়া, আচ্ছা, এটা কেমন হয় বল তো?

বলতে বলতে সে মাথাটা উর্ধ্বে ওঠাল, একটু ভেবে নিল, তারপর হঠাৎ মহা উৎসাহে শুরু করে দিল:[৪২]

অসভ্য সে ভয়ে ভীত, গুহাবাসী, উলঙ্গ সে জন
দুর্গম কন্দরে গিয়ে করেছিল আত্মগোপন,
সমতলে যাযাবর বেড়ায় দাপিয়ে
সুফলা ভূমির বুক রিক্ত করে দিয়ে।
অরণ্যেতে ধনুর্বাণ কাঁধে, বর্শাধারী
পশুবধে মেতেছিল দুরন্ত, শিকারী।

ওলিম্পুসের বাস উচ্চ শীর্ষদেশ
হতে নামে শোকাকুলা জননী সেরেস —[৪৩]
অন্বেষণ করে কন্যা প্রসেরপিনের
বন্যতার পরিচয় পায় জগতের।

নেই কোনো সুখীকোণ, নেই আপ্যায়ন,
এখানে দেবীর নেই কোনো আবাহন।
এমন মন্দির নেই কোথাও, যেখানে
দেবতার অধিষ্ঠান হয় সসম্মানে।

খেতের আঙুর, স্বাদু ফল বাগিচার
ভোজের উৎসবে নেই তাহার বাহার;
স্তূপাকার দেহ যত রুধিরে প্লাবিত
বেদিমূলে ধিকিধিকি হয় ধূমায়িত।
বিষাদে আকুল হয়ে সেরেস তাকায়:
ভারাক্রান্ত দুনয়ন যেদিকেই ধায়
মানুষ, সর্বত্র দেখে, গেছে অধঃপাতে,
নীচতায় নিমজ্জিত, নাহি ভুল তাতে।

মিতিয়ার বুক ফেটে হঠাৎ একটা চাপা কান্না বেরিয়ে এলো, সে আলিয়োশার হাত চেপে ধরল।

"বন্ধু আলিয়োশা, বন্ধু আমার, আমি লাঞ্ছনার মধ্যে আছি, এখনও লাঞ্ছনার

মধ্যে আছি। মানুষকে এই পৃথিবীতে কী ভয়ানক পরিমাণে দুঃখকষ্টই না সইতে হয়, কত দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়েই না তাকে যেতে হয়! ভাবিস নে, মিলিটারি অফিসারের পদে আছি বলে আমি স্রেফ একটা জঘন্য ইতর প্রকৃতির লোক, যে শুধু ব্র্যান্ডি খেয়ে মাতলামি করে আর লাম্পট্য করে বেড়ায়। আমি ভাই, বলতে গেলে কেবল এই নিয়ে ভাবি, এই লাঞ্ছিত মানুষের কথা ছাড়া বলতে গেলে আর কোনও কথা ভাবি না—অবশ্য যদি আমি মিথ্যে বলে না থাকি। ঈশ্বর করুন, আমি যেন এখন আর মিথ্যে না বলি আর নিজের প্রশংসায় না মাতি। এই কারণেই আমি সেই মানুষের কথা ভাবি, যেহেতু আমি নিজেও সেই মানুষ।

আদি মাতা ধরণীর মনে চিরন্তন
যদি থাকে মানবের নিবিড় বন্ধন,
তখন বিলুপ্তি ঘটে সব নীচতার—
আলোকের পানে চিত্ত প্রসারিত তার।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ধরণীর সঙ্গে আমি চিরন্তন বন্ধন রচনা করব কী করে? আমি ধরণীকে চুম্বন করি না, তার বুক ফাড়তে পারি না; আমাকে কী তাহলে চাষা হতে বল, না কি রাখাল হতে বল? আমি এগিয়ে চলেছি, অথচ আমি জানি না পূতিগন্ধময় বা লজ্জাজনক কিছুর মধ্যে গিয়ে পড়লাম, নাকি আলো ও আনন্দের জগতে এসে পড়লাম। এখানেই তো বিপদ, কেননা দুনিয়ার সবটাই প্রহেলিকা! আমার জীবনে যতবার চূড়ান্ত ব্যভিচারের গভীর কলঙ্কের মধ্যে আমি ডুবতে বসেছি — আমার জীবনে অবশ্য কেবল এটাই ঘটেছে—ততবার আমি সেরেস্ আর মানুষকে নিয়ে লেখা এই কবিতাটা পড়েছি। তাতে কি আমি শুধরেছি? না আদপেই না! কারণ আমি যে কারামাজভ্‌দের একজন। কারণ উড়তে উড়তে যখন রসাতলে গিয়েই পড়ব তাহলে আর কেন, সোজা মাথা নীচু করে দুপা ঊর্ধ্বে তুলে গোত্তা খেয়ে পড়াই তো ভালো। এমনকি এরকম একটা অপমানজনক অবস্থায় যে আমার পতন ঘটছে এই ভেবে ভালো লাগে, আর আমার নিজের পক্ষে এটা শোভনীয় বলেও মনে হয়। ঠিক এই অধঃপতনের মুহূর্তেই কিনা আমি হঠাৎ স্তোত্রটা আওড়াতে শুরু করি! অভিশাপ লাগুক আমার ওপর, না হয় হলামই আমি নীচ আর হীন, তবু আমার ঈশ্বরের গাত্রাবরণ যে বসন তার আঁচলে একবারটি চুমো খেতে দাও আমাকে। না হয় হলই যে ঠিক এই সময়টাতে আমি শয়তানকে অনুসরণ করে চলছি, কিন্তু হে প্রভু, হাজার হোক আমি তোমারই সন্তান, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে উপলব্ধি করি আনন্দ, যে আনন্দ ছাড়া জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই, জগৎ টিকতে পারে না।

আনন্দের অন্তহীন সুধা বরিষণ—[১৮]
পানে তৃপ্ত বিধাতার সকল সৃজন।
জীবনের পাত্র পূর্ণ কানায় কানায়
অগ্নিগর্ভ মন্ত্রে তার, গোপন ছোঁয়ায়।

তৃণাঙ্কুর উদ্দীপিত আলোকে পুলকে,
উদ্দাম আলোড়ন জাগে সৌরলোকে:
মহাকাশ জুড়ে তার চলেছে প্লাবন—
সাধ্য নেই গ্রহাচার্য করে নিয়ন্ত্রণ।

প্রকৃতির অকৃপণ বক্ষোলগ্ন যারা—
পান করে আনন্দের সঞ্জীবনী ধারা।
সর্বভূতে সর্বজনে গতিসঞ্চার —
সবেতে নিশ্চিত আছে অবদান তার।
দুঃসময়ে সুহৃদের দেয় সন্ধান,
সুধারস ঢালে, যোগ্য অর্ঘ করে দান।
কীটানুকীটেরা পায় কাম সর্বনাশা,
দেবদূত যিনি তাঁর দেবতা ভরসা।

যাক গে, অনেক কাব্যি হয়েছে! আমি চোখের জল ঝরিয়েছি। আমাকে একটু কাঁদতে দে। এটা বোকামি হয় তো হোক, এই নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে তো করুক, কিন্তু তাই বলে তুই করিস নে। এই তো দেখছি, তোর চোখদুটোও জ্বলছে। না, অনেক কাব্যি হয়েছে। আমি এখন তোকে বলতে চাই 'কীটানুকীটে'র কথা, সেই সব 'কীটের' কথা, ঈশ্বর যাদের কামাসক্তিতে ভূষিত করেছেন।

কীটানুকীটেরা পায় কাম সর্বনাশা!

ভাই, আমিই হলেম গিয়ে সেই 'কীটস্য কীট', বিশেষ করে আমাকে নিয়েই এই কথা। আমরা সবাই—আমরা কারামাজভ্‌রা সবাই ওই একই প্রকৃতির। এমনকি তুই যে অমন দেবতুল্য সেই তোর মধ্যেও ওই কীট বাসা বেঁধে আছে এবং তা তোর রক্তের মধ্যেও ঝড় তুলবে। এটাকে ঝড়ই বলব, কারণ কামনা এক ধরনের ঝড়, ঝড়ের চেয়েও বেশি! রূপ—সে অতি ভয়ঙ্কর, বিষম বস্তু! বিষম এই কারণে যে তার কোনো সংজ্ঞা হয় না, আর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় না এই কারণে যে ঈশ্বর আমাদের জন্য কেবল কতকগুলো প্রহেলিকা সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছেন। এখানে একূল ওকূল মিলে যায়, যত পরস্পরবিরোধিতা পাশাপাশি সহাবস্থান করে। আমি ভাই তেমন একটা শিক্ষিত নই, কিন্তু এই নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ভয়াবহ রকমের বেশি রহস্য! পৃথিবীতে এই যে বড়ো বেশি রহস্য তা মানুষের ওপর অত্যাচার বিশেষ। যেমন পার তেমনি সমাধান করো, জলে নেমেও জল থেকে শুকনো উঠে এসো। রূপ! তাছাড়া আমি বরদাস্ত করতে পারি না যখন কোনো মানুষ—এমন কি উন্নত হৃদয় ও উন্নত বুদ্ধির কোনো মানুষ শুরু করে মাতৃমূর্তি মাদোনার আদর্শ দিয়ে, কিন্তু শেষ করে সদোম্-এর ভ্রষ্টাচার দিয়ে। আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় যখন কেউ মনে মনে পৌরাণিক সদোম শহরের আদর্শ পোষণ করা সত্ত্বেও মাদোনার আদর্শকে অস্বীকার করে না, সেই পবিত্র আদর্শের পাবকে

আবার তার হৃদয়ও দগ্ধ হয়, বাস্তবিকই দগ্ধ হয়, সত্যি-সত্যি দগ্ধ হয়, ঠিক যেমনটি হত তার অপাপবিদ্ধ কৈশোরের দিনগুলিতে। না, মানুষ প্রশস্ত, এমনকি বড়ো বেশি প্রশস্ত; আমি হলে তাকে চেপে সরু করে দিতাম। কে জানে ছাই, এসবের অর্থই বা কী! আরে বাবা, সেটাই তো কথা! বুদ্ধির কাছে যার পরিচয় লজ্জাজনক, হৃদয়ের কাছে তা-ই সৌন্দর্যপ্রতিমা। সদোম্-এ কি সৌন্দর্য আছে?[১২] বিশ্বাস কর, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে সদোম-এই কিন্তু তার অধিষ্ঠান—এই রহস্যটা কি তুই জানতিস, না কি জানতিস না? যেটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার তা হল এই যে সৌন্দর্য শুধু ভয়ঙ্কর নয়, তা এক রহস্যজনক বস্তুও বটে। সেখানে শয়তান বিধাতার সঙ্গে রণমত্ত, আর সেই লড়াইয়ের ময়দান—মানুষের হৃদয়। হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলি, যার যা ব্যথা সে সে-ই ব্যথার কথাই বলে। শোন, এবারে আসল প্রসঙ্গে আসি।

## চার

## কোনো এক উদগ্র হৃদয়ের স্বীকারোক্তি আখ্যানে

আমি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছিলাম। একটু আগে বাবা বলছিল অল্পবয়সি মেয়েদের নষ্ট করার জন্য আমি হাজার হাজার টাকা উড়িয়েছি। এটা তার উর্বর শূকর-মস্তিষ্কের কল্পনা। অমনটা কখনই হয়নি, আর যদি কিছু হয়েও থাকে শুধু 'সেটার' জন্য কোনো টাকার দরকার হয় না। আমার কাছে টাকা হল স্রেফ একটা আনুষঙ্গিক, মনের উত্তেজনা, মনের একটা অবস্থা। আজ হয়তো কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলা, কাল তার জায়গায় রাস্তার কোনো মেয়ে। একে এবং ওকে—দুজনকেই আমি আনন্দ দিই। নাচগান হুল্লোড় আর জিপসিদের পিছনে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করি আমি। যদি দরকার হয় তাহলে মহিলাটিকেও দেব, কারণ ওরা তা নেয়ও, আর স্বীকার করতেই হয় যে রীতিমতো আগ্রহভরে নেয় এবং তাতে তারা যেমন খুশি তেমনি কৃতজ্ঞ। ভদ্রঘরের মেয়েরা আমাকে ভালোবেসেছে—সবাই নয়, তবে ঘটেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। অবশ্য আমার বরাবরের পছন্দ হল গলিপথ, বড়ো রাস্তার পেছনের অন্ধকার নির্জন গলিঘুঁজি—সেখানে পাওয়া যায় যত রকমের রহস্য রোমাঞ্চ ও চমক, গোবরে পদ্মফুলের সন্ধান মেলে। আমি ভাই আলঙ্কারিক ভাষায় বলছি। আসলে আমি যে শহরে থাকতাম সেখানে আক্ষরিক অর্থে অমন অলিগলি ছিল না, তবে নৈতিক অর্থে ছিল। কিন্তু, তুই যদি আমার মতো হতিস তাহলে বুঝতে পারতিস এসবের অর্থ কী। আমি ব্যভিচার পছন্দ করতাম, ব্যভিচারের ফলে যে কলঙ্ক গায়ে লাগে তাও পছন্দ করতাম। পছন্দ করতাম নিষ্ঠুরতা—করবই বা না কেন?—আমি কি ছারপোকা নই, জ্বালা ধরিয়ে দেবার মতো কীট নই? কারামাজভ্ বলে কথা! একবার আমরা বলতে গেলে শহরসুদ্ধ সবাই দল বেঁধে সাতটা

তিনঘোড়ার স্লেজ গাড়ি করে বেরিয়েছিলাম বনভোজনে। শীতের অন্ধকার, স্লেজের মধ্যে আমি আমার পাশের একটি কুমারী মেয়ের হাতে চাপ দিতে লাগলাম, আমাকে চুমো খেতে বাধ্য করলাম মেয়েটাকে। শান্ত ভদ্র ও নম্র স্বভাবের বেচারি মেয়েটা—সে ছিল কোনো এক সরকারি আমলার মেয়ে। সে আমাকে দিল, অনেক কিছুই করতে দিল অন্ধকারের মধ্যে। বেচারি ভেবেছিল পরদিনই আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওকে বিয়ের প্রস্তাব করব। হ্যাঁ, পাত্র হিসেবে কিন্তু আমার দামও কম ছিল না। কিন্তু এর পর তার সঙ্গে আর একটা কথাও হল না আমার, পাঁচ মাসের মধ্যে আধখানা কথাও নয়। দেখা হত নাচের আসরে। আমাদের ওখানে কথায় কথায় নাচ লেগে থাকত। দেখতে পেতাম নাচঘরের একটা কোনা থেকে তার দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছে, তার চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছে—সেখানে জ্বলছে শান্ত রোষের আগুন। যে কামকীটটাকে আমি ভেতরে ভেতরে লালন পালন করে আসছিলাম এই খেলায় কেবল সেটাই মজা পেতে লাগল। পাঁচ মাস পরে একজন সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল, চলে গেল শহর ছেড়ে আমার ওপর রাগ — এমনকি তখনও সম্ভবত গোপন ভালোবাসা বুকে চেপে রেখে। এখন তারা সুখেশান্তিতে বসবাস করছে। খেয়াল রাখবি কিন্তু, এসব কথা আমি কাউকে বলিনি, এই নিয়ে কখনও জাঁকও করিনি। আমার কামনা বাসনা যদিও ইতর ধরনের, যদিও আমি ইতরামি পছন্দ করি, তবু আমার মানসম্মানবোধ আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তুই লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিস, তোর চোখ ঝিলিক দিচ্ছে। নোংরামিটা তোর পক্ষে বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু এখনই কী? এ ত সবে পল্ দে কোক্[৭৭] স্টাইলের সামান্য পুষ্প উপহার, যদিও আমার ভেতরকার নিষ্ঠুর জীবটি ইতিমধ্যে দিব্যি বেড়ে উঠেছে, শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে আমার সমস্ত মন জুড়ে গেঁথে বসে গেছে। আমার স্মৃতিতে যা আছে তাতে একটা ছবির বই ভরে যেতে পারে। ঈশ্বর কুশলে রাখুন আমার এই আদরের ধনদের। সম্পর্ক ছেদ করতে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করতে যাব সেটা আমার পছন্দ নয়। ওদের কাউকে কখনও ফাঁসাইনি, কাউকে কখনও অপবাদ দিইনি। কিন্তু না, অনেক হয়েছে। তুই কি মনে করিস আমি কেবল এই সব বাজে বকার জন্যই তোকে এখানে ডেকে এনেছি? না, আমি তোকে আরও বেশি কৌতূহল জাগানোর মতো জিনিস বলব। কিন্তু তোর সামনে যে লজ্জা পাচ্ছি না এই ভেবে অবাক হোস নে, লজ্জা তো পাচ্ছিই না, বরং আমার আনন্দই হচ্ছে।”

“আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেছি দেখে তুমি এই কথা বলছ?” আলিয়োশা হঠাৎ বলে উঠল। “আমি যে লজ্জা পাচ্ছি তা তোমার কথা শুনে নয়, তোমার কাজকর্মের জন্যও নয়, আমি লজ্জা পাচ্ছি এই ভেবে যে তুমি যেমন, আমিও ঠিক তা-ই।”

“বলিস কী! তুই? না, এটা বাপু তোর খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।”

“না, বাড়াবাড়ি নয়”, যে ভাবে উত্তেজিত হয়ে আলিয়োশা হঠাৎ বলে উঠল তাতে মনে হল এই ভাবনাটা অনেক দিন যাবৎই তার মনের মধ্যে ছিল। “সেই একই সিঁড়ির ধাপ। আমি একেবারে নীচে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি আছ ওপরে —ধর এই তেরো-টেরোর ধাপে। আমি ব্যাপারটাকে এই ভাবে দেখছি, কিন্তু এসবই এক, একই সমান। তলার ধাপে যে পা রেখেছে তাকে শেষমেশ ওপরের ধাপে উঠতেই হবে।”

“তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে ওপথ আদৌ না মাড়ান ভালো?”

“যে না মাড়িয়ে পারে তার পক্ষে একেবারে না মাড়ালেই ভালো।”

“তুই—তুই না মাড়িয়ে পারবি?”

“মনে তো হয় না।”

“চুপ, আলিয়োশা, ভাই আমার, চুপ। আমার মনটা দরদে এমন উথলে উঠেছে যে ইচ্ছে করছে তোর হাতে চুমো খাই। ওই বজ্জাত ছুঁড়ি গ্রুশেন্‌কাটা পুরুষগুলোকে ঠিক চেনে, একবার আমায় এমন কথাও বলেছিল যে তোকে একবার পেলে চিবিয়ে খাবে। যাক গে, যাক গে, ও কথা থাক! ও সব হল মাছি বসার দাগে নোংরা ঘিনঘিনে চত্বর। সে ইতরামির কথা ছেড়ে দিয়ে বরং আমার জীবনের ট্রাজিডির প্রসঙ্গেই আসি—যদিও সেটাও মাছি বসার দাগে নোংরা ঘিনঘিনে, অর্থাৎ রাজ্যের নীচতার জঞ্জালভর্তি একটা চত্বর। কথাটা হল এই যে বুড়ো যদিও মেয়েদের কুমারীত্ব নষ্ট করার ব্যাপারে মিথ্যে করে বলেছে বটে, তবে আসলে আমার জীবনের ট্র্যাজিডির মধ্যে অন্তত একবার এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল—কিন্তু ওই ঘটতে যাওয়া পর্যন্তই—শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। বুড়ো যে গাঁজাখুরি গপ্পো বলে আমাকে ধাতাল, এই ব্যাপারটাই কিন্তু সে জানে না: আমি এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি, তোকেই এই প্রথম বলব—অবিশ্যি হ্যাঁ, ইভানকে ছাড়া—ইভান সব জানে। তোর অনেক আগে থাকতে জানে। তবে ইভান হল গিয়ে কবর।

“ইভান—কবর? বলছ কী?”

“হ্যাঁ, তা-ই বটে।”

আলিয়োশা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

“সীমান্তরক্ষীদের ওই ব্যাটেলিয়নে আমি যদিও একজন এন্‌সাইন ছিলাম, তবু আমাকে অনেকটা যেন নজরবন্দির মতোই থাকতে হত—যেন আমি একটা নির্বাসিত কয়েদির জীবন যাপন করছি। কিন্তু মফস্‌সলের ওই ছোট্টো শহরের লোকজন আমাকে দারুণ ভালোভাবে নিয়েছিল। টাকাপয়সা আমি দেদার ওড়াই, লোকের বিশ্বাস আমি বড়োলোক, আমি নিজেও সেটা বিশ্বাস করতাম। তা সে যা-ই হোক, কীসে যেন আমি ওদের মন জোগাতে পেরেছিলাম। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে মাথা নাড়াত বটে, আবার সত্যি বলতে গেলে কি, আমাকে ভালোও বাসত। আমার ওপরওয়ালা অফিসার —একজন বৃদ্ধ কর্নেল—হঠাৎ কেন যেন আমাকে বিষ নজরে

দেখতে শুরু করল। পদে পদে আমার দোষ ধরতে লাগল; কিন্তু আমারও হাতে কিছু লোকজন ছিল, তাছাড়া শহরের সকলে আমার পক্ষে, আর খুঁত ধরার মতো বিশেষ কিছু থাকতও না। দোষটা অবশ্য ছিল আমার নিজেরই কারণ আমি নিজে ইচ্ছে করেই তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেখাতাম না। মনে মনে আমার একটা গর্ব ছিল। একরোখা গোছের এই বুড়ো তেমন একটা মন্দ লোক ছিল না, বরং বেশ অতিথিবৎসল সদাশয় ব্যক্তিই তাকে বলা যায়। বিয়ে করেছিল দুবার—দুই স্ত্রীই মারা গেছে। একজন—প্রথমজন ছিল নিতান্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে—একটি মেয়ে রেখে মারা যায়। সেই মেয়েটিও তার মতো সাদাসিধে। আমি যখন সে শহরে যাই তখনই সে বছর চব্বিশেক বয়সের কুমারী—বাপের বাড়িতে থাকে, সঙ্গে থাকে তার এক মাসি। মাসিটি মুখচোরাগোছের সাদামাটা, কিন্তু বোন্‌ঝিটি—কর্নেলের বড়োমেয়ে—চঞ্চল স্বভাবের সরল মেয়ে। কাউকে যদি মনে করতে হয় তবে আমি তার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলতেই ভালোবাসি। ধারণা করতে পারিস ভাই, ওই মেয়েটির চাইতে মধুর স্বভাবের কোনো মহিলা আমি কখনও দেখি নি। ওর নাম ছিল আগাফিয়া—ভাবতে পারি—আগাফিয়া ইভানভ্‌না! তা, আমাদের রুশিদের রুচিতে দেখতে শুনতেও নেহাৎ মন্দ নয়: লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট, উচ্ছল ভরাট দেহ, চমৎকার দুটি চোখ, মুখটা না হয়, ধর গিয়ে একটু রুক্ষ ধরনের। বিয়েতে আগ্রহ নেই, যদিও দু দুজন তার পাণিপ্রার্থী, দুজনকেই সে হাঁকিয়ে দিয়েছে, তবু মনের ফূর্তি হারায়নি। ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল—না না তাই বলে অন্য কিছু ভেবে বসিস না—ওখানে কোনও খাদ ছিল না, সম্পর্কটা ছিল নিছক বন্ধুত্বের। অনেক সময় কিন্তু একেবারে নিষ্পাপ মন নিয়ে—বন্ধুভাবে আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি। ওর সঙ্গে বকবক করে, মন খুলে এমন সব কথা বলি যে ওঃ সে কী বলব! ও শুধু শোনে আর হাসে। অনেক মহিলা এরকম খোলামেলা ভাব পছন্দ করে—খেয়াল রাখবি কিন্তু—তাছাড়া সে আবার একটা কুমারী মেয়ে, তাইতে আমিও মনে মনে বেশ আনন্দ পেতাম। হ্যাঁ আরও একটা কথা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলতে যা বোঝায় ওর মধ্যে সে সবের কোনও বালাই ছিল না। মাসিকে নিয়ে সে বাপের বাড়িতে থাকত, কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে যেন ইচ্ছে করেই নীচু হয়ে থাকত। সবাই তাকে ভালোবাসত, তাকে সকলেরই প্রয়োজন হত, কেন না সে দারুণ সেলাইয়ের কাজ জানত: এ ব্যাপারে তার প্রতিভা ছিল; কাজের জন্য কোনো টাকাপয়সা সে চাইত না, কাজ করত লোকের উপকার করার মানসিকতা নিয়ে, তবে এর জন্য কেউ তাকে কিছু দিতে চাইলে সে নিতে দ্বিধাও করত না। আর আমাদের কর্নেল—তার কথা আর কী বলব! সবার চাইতে একেবারে আলাদা। আমাদের অঞ্চলে সে ছিল একেবারে প্রথম সারির একজন। নবাবি চালে জীবন কাটাত, শহরের সব্বার জন্য তার বাড়ির দ্বার অবারিত—আজ নৈশভোজন তো কাল নাচের আসর। আমি যখন ওখানে গিয়ে ব্যাটেলিয়নে যোগ দিয়েছি তখন

গোটা শহর জুড়ে এই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে যে শিগ্‌গিরই রাজধানী থেকে আমাদের এখানে আগমন ঘটছে কর্নেলের দ্বিতীয় কন্যার—সে মেয়ে নাকি পরমাসুন্দরী, আর এই সবে রাজধানীর একটা অভিজাত ইনস্টিটিউটের পড়াশুনা শেষ করেছে। এই দ্বিতীয় কন্যা—এই হল গিয়ে আমাদের কাতেরিনা ইভানভ্‌না, কর্নেলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও অবশ্য ইতিমধ্যে গত হয়েছে। সে ছিল কোনো এক নামজাদা জেনারেলের ঘরের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে, যদিও, প্রসঙ্গত, বিশ্বস্তসূত্রে আমি যতদূর জানতে পেরেছি, এই বিয়েতেও কর্নেল কোনো টাকাকড়ি যৌতুক পায়নি। মানে, আত্মীয়স্বজন তার ছিল বটে, তবে নামেই তাদের কাছ থেকে আশা করার মতো, কিছু থাকলেও ছিল না। আর নগদ টাকাকড়ি বলতে ত কিছুই নয়! সে যা-ই হোক, 'ইনস্টিটিউটের মেয়ে' যখন এলো—এলো অবশ্য অতিথি হয়ে, চিরকালের জন্য নয়—আমাদের গোটা শহরটা যেন নবজীবন পেয়ে জেগে উঠল। আমাদের সবচেয়ে খানদানি মহিলারা—দুজন 'মহামান্যের' স্ত্রী, একজন কর্নেলের স্ত্রী—তারা সবাই এবং তাদের পিছন পিছন আর সকলেও তৎক্ষণাৎ তাকে লুফে নিল, তাকে নিয়ে মেতে উঠল, তাকে খুশি করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল, তাকে নাচগান পিকনিকের মধ্যমণি করে তারা প্রাণবন্ত সমস্ত দৃশ্যের অবতারণা করতে লাগল, আর সেগুলিকে উপলক্ষ্য করে কোথাকার কোন্ দুঃস্থ গৃহশিক্ষিকাদের স্বার্থে তাদের জন্য চাঁদা তোলার কাজ চলতে লাগল। আমি এ ব্যাপারে চুপচাপ আছি, যথারীতি উচ্ছৃঙ্খলতা করে চলছি, ঠিক এই সময়ই আবার আমি এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলাম যা সারা শহরে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। একবার, সেটা ঘটেছিল আমাদের ব্যাটগড়ি-কমান্ডারের বাড়িতে, দেখলাম মেয়েটি আমাকে চোখের নজরে মেপে দেখছে; আমি কিন্তু তখন ওর কাছে গেলাম না, এমন ভাব দেখালাম যেন ওর সঙ্গে আলাপ করতে আমার বয়েই গেছে। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম অবশ্য কয়েক দিন পরে, সেটাও এক সান্ধ্য আসরে; কথাও শুরু করলাম, কিন্তু সে আমার দিকে তেমন একটা তাকাল না, অবজ্ঞাভরে ঠোঁট বাঁকাল। আমি মনে মনে ভাবলাম, রোসো, এর শোধ নেব! তখনকার বেশির ভাগ ঘটনার ক্ষেত্রে আমার আচরণ ছিল ভয়ঙ্কর রকমের বন্য, সেটা আমি নিজেও উপলব্ধি করতে পারতাম। সবচেয়ে বড়ো কথা, এটা উপলব্ধি করতে পারলাম যে এই 'কাতেরিনা মেয়েটি'কে একটা যেমন তেমন নিষ্পাপ 'ইনস্টিটিউটের মেয়ে' মনে করা ঠিক হবে না, তার একটা নিজস্ব চরিত্র আছে, মানসম্মানবোধ আছে, সত্যিকারের নীতিবোধ আছে, সর্বোপরি বিদ্যাবুদ্ধি আছে, কিন্তু আমার এসবের কোনোটাই নেই। তুই ভাবছিস আমি ওকে প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছিলাম? মোটেই নয়, চেয়েছিলাম স্রেফ প্রতিশোধ নিতে, এই কারণে যে আমি এমন একটা বীরপুরুষ, সে কিনা এটা উপলব্ধি করতে পারছে না! যা হোক আপাতত উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদ আর দাঙ্গাহাঙ্গামা করে আমার দিন কাটতে লাগল। শেষ অবধি আমাদের

কর্নেল আমাকে গ্রেপ্তার করে তিন দিনের জন্য হাজতে চালান করে দিল। ঠিক এই সময়ই বাবা আমাকে পাঠাল ছয় হাজার রুবল: আমাদের সমস্ত হিসেব 'মিটে গেছে' এবং এর পর আমার আর কিছু দাবি থাকছে না, অর্থাৎ তার সম্পত্তির ওপর আমার আর কোনো অধিকার থাকছে না এই মর্মে একটা দলিল তাকে লিখে পাঠানোর পর। সেই সময় ওই দলিলের কিছুই আমি বুঝতে পারিনি, এখানে আসার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি ভাই—গত কয়েক দিন আগে পর্যন্ত তো বটেই, এমনকি আজও বুঝে উঠতে পারিনি টাকাপয়সা নিয়ে সবার সঙ্গে আমাদের এত সব ঝগড়া বিবাদের মাথামুণ্ডু। তা ও সব পরের কথা, আপাতত চুলোয় যাক। যা বলছিলাম, তখন ওই ছয় হাজার আসার পর আমার এক বন্ধুর লেখা একটা চিঠিতে আমি হঠাৎ এমন একটা খবর পেলাম যা দস্তুরমতো আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। সেটা এই যে ওপরওয়ালারা আমাদের কর্নেলের ওপর সন্তুষ্ট নয়, সরকারি কাজে নানারকম গোলমালের জন্য তারা তাকে সন্দেহ করছে, এক কথায়, তার শত্রুরা তার ওপর এক হাত নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সত্যি সত্যি এসেও গেলেন আমাদের ডিভিশনের বড়ো কর্তা, যা নয় তাই নয় বলে খুব একচোট ধাতানি চলল। এর পর কিছুদিন বাদেই কর্নেলের অবসর গ্রহণের হুকুম এলো। পুরো ঘটনাটি কী রকম কী ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণের মধ্যে আমি যাব না। শত্রু তার বাস্তবিকই অনেক ছিল তবে এই ঘটনার পর হঠাৎ তার এবং তাদের পরিবারসুদ্ধ সকলের সম্পর্কে শহরের লোকজনের নিদারুণ উদাসীন্য দেখা দিল, সকলে হঠাৎই যেন মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঠিক তখনই আমি আমার প্রথম চালটি চাললাম: গিয়ে দেখা করলাম আগাফিয়া ইভানভ্‌নার সঙ্গে। তার সঙ্গে আমি বরাবরই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলছিলাম। তাকে বললাম: "তোমার বাবার কাছে যে সরকারি তহবিল ছিল সেখান থেকে তো সাড়ে চার হাজার রুবল গায়েব হয়ে গেছে।" "এসব তুমি কী বলছ? এর মানে কী? এই তো সেদিন জেনারেল এসেছিলেন, সবই তো যথাস্থানে ছিল। — "তখন ছিল, কিন্তু এখন নেই।" দারুণ ভয় পেয়ে গেল, বলল, "দোহাই তোমার, ভয় দেখিয়ো না, কার কাছ থেকে শুনেছ?", আমি বললাম, "ঘাবড়িয়ো না, কাউকে বলতে যাচ্ছি না। তুমি তো জান, এ ব্যাপারে আমি কবরের মতো নিস্তব্ধ, তবে কিনা এই ব্যাপারেই আবার কতকটা যে ধরনের কথা আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে 'কোথা থেকে কী হয়' বলা যায় না: যদি ওরা তোমার বাবার কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার দাবি করে বসে আর তোমার বাবা তা দিতে না পারেন তাহলে তো ওরা তাঁকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, বুড়ো বয়সে একজন সাধারণ সৈন্যের পদে নামিয়ে দেবে, তার চেয়ে বরং বলি কি, তোমার ওই 'ইনস্টিটিউটের মেয়ে' বোনটিকে গোপনে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সবে আমার হাতে কিছু টাকা এসেছে, তা যদি বল, হাজার চারেক তো আমি হেসে খেলেই ওর হাতে দিয়ে দিতে পারি, তা যেমন পারি, তেমনি বলতে পারি যে

গোপনীয়তার নিয়মও ভক্তি সহকারে মেনে চলা হবে।” তাতে সে বলল — ঠিক এই কথাই বলল — “বদমাশ কোথাকার! কী শয়তান! ওঃ কী ইতর! কী আস্পর্ধা!” রাগে ঘৃণায় প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল। আমিও ওর পিছন পিছন আরও একবার চেঁচিয়ে বললাম যে গোপনীয়তার নিয়ম ভক্তিসহকারে মেনে চলা হবে, তা অলঙ্ঘনীয় হবে। এই দুটি মেয়েমানুষ, অর্থাৎ কিনা আগাফিয়া আর তার মাসিটি—আমি আগেভাগেই বলে রাখি—এই পুরো বৃত্তান্তের মধ্যে দেখা গেছে, খাঁটি দেবদূত বলে যদি কেউ থাকে তাহলে ওদের দুজনকেই বলতে হয়। বোনটিকে —দেমাকি কাতিয়াকে ওরা একেবারে মাথায় করে রাখত, ওর সামনে নীচু হয়ে থাকত, ওর দাসীর মতো হয়ে থাকত। আগাফিয়া কিন্তু এই ব্যাপারটা, অর্থাৎ আমাদের এই আলোচনার কথা তখনই তাকে বলে দেয়। সেটা আমি পরে নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি। গোপন রাখল না; তা, বলাই বাহুল্য, এটাই আমার দরকার ছিল।

হঠাৎ এক নতুন মেজর এলো আমাদের ব্যাটেলিয়নের ভার নিতে। ভার নিলও। আমাদের বুড়ো কর্নেল তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, নড়তে চড়তে পারে না, দুদিন দু রাত ঘরেই বসে রইল, ব্যাটেলিয়নের টাকা আর দিতে পারে না। আমাদের ডাক্তার ক্রাভ্‌চেন্‌কো নিশ্চয় করে বলেছে যে সত্যি সত্যিই অসুস্থ ছিল। গোপন রহস্যটা কিন্তু বিশদ ভাবে জানতাম শুধু আমি—এমনকি অনেক দিন আগে থাকতে জানতাম: ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাব পরীক্ষা করে চলে যাবার পর প্রত্যেকবারই ওই টাকাটা কিছুকালের মতো অন্তর্ধান করত—আর এটা চলে আসছিল পর পর চার বছর ধরে। টাকাটা কর্নেল ধার দিত তার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন একটি লোককে। সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে দাড়িওয়ালা বুড়ো বিপত্নীক ত্রিফনভ্ নামে ওই লোকটা ছিল আমাদের এলাকার একজন ব্যবসায়ী। টাকাটা সে হাটে গিয়ে তার যেমন দরকার সেই ভাবে খাটায়, তারপর ফিরে এসেই পুরো টাকাটা কর্নেলকে ফেরত দিয়ে দেয়। হাট থেকে সে টুকটাক খাবার দাবারও উপহার নিয়ে আসত। সেই সব উপহারের সঙ্গে সুদও ফেরত দিত কর্নেলকে। শুধু এই এবারই—আমি তখন নেহাৎই ঘটনাচক্রে এসব জানতে পারি মুখে লালা জড়ানো উঠতি বয়সের একটা ছেলের কাছ থেকে—ছেলেটা ত্রিফনভেরই সুপুত্তুর, বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—অমন হাড়বজ্জাত ছেলে বোধহয় দুনিয়ায় দুটি জন্মায় না যা বলছিলাম, এইবারই ত্রিফনভ্ হাট থেকে ফিরে কিছুই ফেরত দিল না কর্নেলকে। কর্নেল ছুটল তার বাড়িতে। “আমি আপনার কাছ থেকে কখনও কিছু নিইনি, তাছাড়া নেবই বা কেমন করে?” এই হল গিয়ে তার জবাব। আমাদের কর্নেল তো সেই ঘরেই বসে রইল, মাথায় তোয়ালে জড়াল, তিন মহিলা মিলে তার মাথার চাঁদিতে বরফ দিতে লাগল; এমন সময় একটা খাতা আর হুকুমনামা নিয়ে হুট করে এসে হাজির হল এক পেয়াদা: ‘এক্ষুনি, কোন কালবিলম্ব না করে, দুঘণ্টার মধ্যে সরকারি টাকা ফেরত দিতে হবে।’ কর্নেল

খাতায় সই করল—সই করা খাতাটা আমি পরে দেখেওছি—তারপর উঠে দাঁড়াল, বলল ইউনিফর্ম পরার জন্য ভেতরের ঘরে যাচ্ছে; এই বলে ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল, দোনলা শিকারি বন্দুকটাতে একটা সার্ভিস বুলেট ভরল, ডান পায়ের বুটজুতোটা খুলল, নলটা বুকে ঠেকিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বন্দুকের ঘোড়ার সন্ধান করতে লাগল। এদিকে আগাফিয়ার ইতিমধ্যেই সন্দেহ হচ্ছিল, আমি তখন ওকে যে কথা বলেছিলাম তা ওর মনে ছিল, চুপিসারে গিয়ে যথাসময়ে ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখতে পেল। দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে পিছন দিক থেকে বাপকে জড়িয়ে ধরল। বন্দুকের গুলিটা ছুটে ঘরের ছাদে গিয়ে লাগল, কারও গায়ে লাগল না। আরও যারা ছিল তারাও ছুটে এলো, তাকে চেপে ধরল, বন্দুকটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দু হাত ধরে তাকে আটকাল। এসবই আমি পরে বিশদ জানতে পেরেছি। আমি তখন বাড়িতে বসেছিলাম, সবে বেরোব বেরোব বলে ভাবছি, জামাকাপড় পড়েছি মাথার চুল আঁচড়েছি, রুমালে ভালোমতো এসেন্স ঢেলেছি, টুপিটাও হাতে নিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ ভেজানো দরজাটা খুলে গেল—দেখি, আমার বাড়িতে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাতেরিনা ইভানভ্‌না।

অদ্ভুত অদ্ভুত একেকটা ঘটনা ঘটে বটে। কী ভাবে যে সে আমার কাছে এসেছিল পথে সেদিন কারও নজরে পড়েনি। তাই শহরে ব্যাপারটা আড়ালেই চাপা পড়ে রইল। আমি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম দুজন সরকারি কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে, দুজনেই থুত্থুড়ে বুড়ি, তারা আমার দেখাশোনাও করত। দুটি মেয়েমানুষই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত, সব ব্যাপারে আমার কথা শুনত, তাই আমার হুকুম মেনে পরে ওরা দুজনে লোহার থামের মতো চুপ মেরে রইল। বলাই বাহুল্য আমি সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে পারলাম। ঘরে ঢুকে সে সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল। গভীর কালো চোখের দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রত্যয়, এমনকি একটা ঔদ্ধত্যের ভাব, কিন্তু ঠোঁট দুটিতে, ঠোঁটের কোনায় দেখতে পেলাম কুণ্ঠার আভাস।

"আমার বোন আমাকে পাঠিয়েছে, বলেছে আপনি সাড়ে চার হাজার রুবল দেবেন যদি আমি তা নিতে আসি   নিজে আপনার কাছে হাজির হই। এই আমি এসেছি।   টাকা দিন!" বলতে বলতে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না, ভয়ে তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল, কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল, ঠোঁটের কোনা আর ঠোঁটের আশেপাশের রেখাগুলো কাঁপতে লাগল।

"আলিয়োশা, তুই শুনছিস? না কি ঘুমোচ্ছিস?"

"মিতিয়া, আমি জানি তুমি সব সত্যি বলবে", উত্তেজিত কণ্ঠে আলিয়োশা বলব।

"বলব, ঠিক তা-ই বলব। যদি পুরোপুরি সত্যি বলতে হয়, যা যা ঘটেছিল তা বলতে হয় তা হলে নিজেকেও রেহাই দিতে পারব না। প্রথমে যে ভাবটা আমার জেগে উঠল সেটা কারামাজভীয়। একবার ভাই একটা বিষাক্ত মাকড়সা

আমাকে কামড়েছিল. তার ফলে আমি দু সপ্তাহ ধরে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলাম; তা এবারেও ঠিক তেমনি—টের পেলাম আমার বুকের তলায় কোথায় যেন কামড় দিয়ে বসেছে একটা বিষাক্ত মাকড়সা, একটা বিষাক্ত কীট, বুঝতে পারছিস? আমি চোখের দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক একবার মেপে দেখলাম। তুই ওকে দেখেছিস তো? সুন্দরী যাকে বলে। কিন্তু তার তখনকার সৌন্দর্যটা ছিল অন্য ধরনের। সেই মুহূর্তে সে যে কারণে সুন্দর ছিল সেটা হল তার মহত্ত্ব। আর আমি কি না একটা ইতর! সে তার হৃদয়ের মহিমায় মহীয়সী, তার বাবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চলেছে। তার সামনে আমি একটা ছারপোকা। অথচ এই ছারপোকা, ইতর, আমার ওপরই কিনা সে নির্ভর করছে, নির্ভর করছে তার 'সবটা', আগাগোড়া সবটা, তার সমগ্র সত্তা, তার দেহ তার আত্মা—সব। সে এখন একটা গণ্ডির মধ্যে বাঁধা। আমি তোকে সোজাসুজি বলছি: এই ভাবনাটা, বৃশ্চিকের দংশনের মতো এই চিন্তাটা এতদূর পর্যন্ত আমার হৃদয় অধিকার করে বসল, তাকে ভারাক্রান্ত করে ফেলল যে শুধু সেই চাপেই তার মুষড়ে পড়ার মতো অবস্থা হল। মনে হচ্ছিল যেন এখন আর বোঝাবুঝির কোনও প্রশ্নই ওঠে না: কোনও রকম মায়াদয়া না করে ছারপোকার মতো, বিষাক্ত মাকড়সাটার মতো নেমে পড়লেই হল।... এমনকি আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শোন, যদি সে রকম কিছু হয়ে যেত, ভাবলাম, বলাই বাহুল্য, সেক্ষেত্রে কালই ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর পাণিপ্রার্থনা করব, যাতে দস্তুরমতো সম্মানজনক ভাবে বলতে যা বোঝায় সেই ভাবে ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যায়, যাতে আসলে কী ঘটেছে কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, কারও জানার কোনও উপায় না থাকে। কারণটা এই যে আমি ইতর বাসনাসম্পন্ন মানুষ বটে, কিন্তু আমি সৎ। কিন্তু সেই সময়, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ কে যেন ফিসফিসিয়ে আমার কানে কানে বলে দিল: 'আরে কাল তুমি যখন পাণিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে যাবে তখন সে ত তোমার সামনে বেরই হবে না, ওদের কোচোয়ান দিয়ে বাড়ির উঠোন থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। বুঝিয়ে দিতে চাইবে, যাও যাও শহরময় রাষ্ট্র কর গিয়ে, আমি তোমাকে থোরাই ডরাই। কাতেরিনার মুখের দিকে চাইতে আমি বুঝতে পারলাম আমার কণ্ঠস্বর ভুল বলে নি। এটাই হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাকে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে তা ওর এখনকার এই মুখ দেখেই বলে দেওয়া যায়। আমার বুকের ভেতরটা হিংসায় জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল। শুয়োরের মতো নোংরা, অতি জঘন্য একটা ব্যাবসাদারি চালাকি ওর ওপর খাটানোর সাধ হল আমার· ভাবলাম ওর দিকে ব্যঙ্গভরে তাকিয়ে ওই ওখানে থাকতে থাকতেই, যতক্ষণ ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সময়ের মধ্যে এমন একটা কথা বলে তাকে স্তম্ভিত করে দিই যা একমাত্র কোনো ব্যাবসাদারের পক্ষেই সম্ভব।

"সেই চার হাজারের কথা! আরে কী যে বলেন? সে তো আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। অত সহজে বিশ্বাস করে বসলেন! অমনি কিনা গুনতে শুরু করে

দিলেন, দিদিমণি! যদি বলেন তো শ দুয়েক আমি দিতে পারি—এমনকি খুশি মনে, আগ্রহ সহকারেই দেব, তাই বলে চার হাজার! সে তো দিদিমণি অমন হেলাফেলা করে উড়িয়ে দেবার মতো টাকা নয়। খামোকাই কিন্তু এতটা কষ্ট করতে গেলেন।''

''দেখতে পাচ্ছিস, সেক্ষেত্রে আমি নির্ঘাত সব হারাতাম, ও পালিয়ে যেত। কিন্তু এটা করে এক ধরনের পৈশাচিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা যেত, কাজটা একবার করতে পারলে আর দেখতে হত না। আবার তখন যদি এই চালাকিটা খাটাতে যেতাম তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র এর জন্যই পরে সারাটা জীবন আমাকে অনুতাপে জ্বলেপুড়ে মরতে হত! বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, এরকম একটা মুহূর্তে কোনো মেয়ের দিকে আমি ঘৃণার চোখে তাকিয়েছি এমনটা আমার জীবনে কখনও হয়নি—ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি! তিন কিংবা পাঁচ সেকেন্ড হবে, আমি তখন জ্বলন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। সে ঘৃণা ছিল এমনই এক ধরনের ঘৃণা যার সঙ্গে প্রেমের—উন্মত্ত ভালোবাসার ব্যবধান মাত্র এক চুলের! জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম, বরফ জমা ঠান্ডা শার্সির গায়ে কপাল ঠেকালাম। মনে আছে বরফে আমার কপালটা আগুনের জ্বালা ধরার মতো চিড়বিড় করছিল। তোর চিন্তার কোনও কারণ নেই—ওকে ধরে রাখিনি। ঘাড় ফেরালাম, টেবিলের ধারে এসে টানা দেরাজটা খুললাম, সেখানে আমার ফরাসি শব্দকোষের পাতার মাঝখানে কারও নামে সইসাবুদ না করা পাঁচ শতাংশ সুদের হারের পাঁচ হাজার রুবল দামের একটা ঋণপত্রও ছিল। সেটা বের করে কোনো কথা না বলে তাকে দেখালাম, তারপর ভাঁজ করে তার হাতে তুলে দিলাম। নিজেই ওর যাবার জন্য বাইরের বারান্দার দরজাটা খুলে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় ও আবেগে আপ্লুত হয়ে নমস্কার জানালাম ওকে। বিশ্বাস কর! ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। একবার মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। মুখটা ওর ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল—বলব কি, একেবারে একটা সাদা কাগজের মতো। তারপর আচমকা, সেও একটি কথাও না বলে, কোনো আবেগ প্রকাশ না করে বেশ মোলায়েম করে, গভীর অনুভূতির সঙ্গে নিঃশব্দে সর্বাঙ্গ নুইয়ে সোজা মাটিতে, আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল —'ইনস্টিটিউটের মেয়ে'র মতো নয়, একেবারে সাবেকি রুশি ধরনে! তারপর এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যখন সে ছুটে বেরিয়ে গেল সেই সময় আমার কোমরে তলোয়ার ঝোলান ছিল। আমি খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করলাম, ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই সোজা নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিই। কেন —তা জানি না। অবশ্যই একটা ভয়ঙ্কর বোকামি, তবে সম্ভবত সেটা ছিল আনন্দের উচ্ছ্বাসবশত। তুই এটা বুঝিস কি যে আনন্দের উচ্ছ্বাসের এরকম যে-কোনো একটা মুহূর্তে মানুষ নিজেকে খুন করতে পারে? তবে আমি বুকে তলোয়ার বিঁধাইনি, তার বদলে শুধু তলোয়ারটাকে চুমো খেয়ে আবার খাপে ভরে রাখলাম—অবশ্য এটার উল্লেখ তোকে না করলেও পারতাম। এখন আবার

আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা তোকে বলতে গিয়ে যেন নিজের সুখ্যাতি করার জন্য খানিকটা রং চড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু থাক, না হয় হলই বা। চুলোয় যাক মানবহৃদয়ের আনাচে কানাচে অনুসন্ধানকারী যত গুপ্তচর! এই হল গিয়ে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার সঙ্গে আমার এককালে যা 'ঘটেছিল' তার যাবতীয় বৃত্তান্ত। তার মানে, এখন ভাই ইভান এটা জানে, আর জানলি এই তুই—এছাড়া আর কেউ জানে না।"

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিতভাবে দু এক পা হাঁটল, রুমালটা বার করে তাই দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তারপর আবার বসে পড়ল—তবে আগে যে জায়গায় বসে ছিল এবারে আর সেখানে না বসে গিয়ে বসল অন্য আরেকটা জায়গায়—অন্য দেয়ালের কাছে উলটো দিকের বেঞ্চিটাতে, তাই আলিয়োশাকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে হল তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

## পাঁচ

### কোনো এক উদগ্র হৃদয়ের স্বীকারোক্তি উল্‌টো সুরে

আলিয়োশা বলল, "এখন আমি এই ব্যাপারের প্রথম অর্ধেকটা জানি।"

"প্রথম অর্ধেকটা তুই বুঝতে পেরেছিস: সেটা একটা নাটক, ঘটেছিল ওখানে। দ্বিতীয় অর্ধেকটা ট্র্যাজেডি, ঘটবে এখানে।"

"এই দ্বিতীয় পর্বটির কিছুই আমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি", আলিয়োশা বলল।

"আর আমি? আমিই কি কিছু বুঝতে পেরেছি?"

"দাঁড়াও, দ্‌মিত্রি, এখানে একটা কথা আছে—সেটা বড়ো কথা। তুমি আমায় বল: তোমার তো বিয়ের কথা দেওয়া আছে, এখনও কি তুমি বিয়ের পাত্র?"

"বিয়ের কথা আমাদের যে হয়েছিল সে তো এখন নয়, ওই ঘটনা যখন ঘটে তার মাত্র তিন মাস পরেই। পরদিনই, তখন যেমন ঘটেছিল, বললি, আমি মনে মনে বললাম, ঘটনা মিটে গেছে, সব চুকেবুকে গেছে, উপসংহারের জন্য আর এগোতে হবে না। পাণিপ্রার্থী হয়ে ওর কাছে যাওয়াটা নীচতা হবে বলে মনে হল আমার। এর পর আরও ছয় সপ্তাহ সে আমাদের শহরে ছিল বটে, কিন্তু সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার তরফ থেকে সেও তার নিজের সম্পর্কে অন্তত একটি আভাসে ইঙ্গিতেও একটি কথাও জানার সুযোগও দেয়নি আমাকে। অবশ্য হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, একটি ঘটনা বাদে: যে দিন সে আমার কাছে এসেছিল তার পর দিন তাদের বাড়ির পরিচারিকা লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো এক ফাঁকে আমার বাসায় এসে হাজির, কোনো কথা না বলে সে আমাকে একটা বন্ধ খাম দিয়ে গেল। খামের ওপর ঠিকানা বলতে লেখা ছিল: অমুক ব্যক্তিকে। খুলে দেখলাম

আমি যে পাঁচ হাজারের ঋণপত্রটা দিয়েছিলাম তা ভাঙিয়ে খরচ করার পর উদ্বৃত্ত কিছু রুবল। মোট দরকার ছিল সাড়ে চার হাজার, কিন্তু পাঁচ হাজারের ঋণপত্র ভাঙাতে গিয়ে দুশ'র একটু বেশি রুবল গচ্চা গেছে। আমাকে পাঠিয়েছিল, মনে হচ্ছে যেন মোট দুশ ষাট রুবল অবশ্য ভালোমতো মনে করতে পারছি না। কিন্তু শুধু ওই টাকা কটাই—না কোনো চিরকুট, না দুটো কথা, না কোনো ব্যাখ্যা। খামটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—পেন্‌সিলের আঁচড়ের কোনো চিহ্ন আছে কিনা—না:, কিছু নেই! কী আর করা, তখনকার মতো আমি আমার বাদবাকি টাকাগুলো দিয়ে ফুর্তি করলাম—এমনই ফুর্তি করলাম যে নতুন মেজরও শেষ পর্যন্ত আমাকে বকুনি দিতে বাধ্য হল। এদিকে আমাদের বুড়ো কর্নেল দিব্যি ভালোয়-ভালোয় সরকারি টাকা মিটিয়ে দিল। সবাই অবাক, কেননা টাকাটা যে যেমনকার তেমন তার কাছে আছে এটা কেউ আশা করেনি। টাকা দিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ হয়ে পড়ল, শয্যাশায়ী হয়ে সপ্তাহ তিনেক পড়ে রইল, তারপর হঠাৎই মস্তিষ্কক্ষয়ের রোগ দেখা দিল, এর পাঁচ দিন পরেই মারা গেল। যথোচিত সামরিক সম্মানের সঙ্গে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল, কারণ তখনও অবসর গ্রহণের কাগজপত্র তার হাতে আসেনি। বাবার শেষকৃত্যের দিন দশেক পরে কাতেরিনা ইভানভ্‌না তার দিদি আর মাসির সঙ্গে শহর ছেড়ে মস্কোয় চলে গেল। অবশেষে যাত্রার ঠিক আগে আগে, ঠিক যাত্রার দিনটিতেই—তাদের সঙ্গে আমার অবশ্য দেখা হয়নি, তাদের বিদায় জানাতেও আমি যাই নি —আমি একটা ছোট্ট খাম পেলাম, একটা ফিন্‌ফিনে নীলরঙা কাগজে পেনসিল দিয়ে সে লিখেছে মাত্র একটি ছত্র: 'আমি আপনাকে পরে লিখছি, অপেক্ষা করুন।—ক'—এইটুকু মাত্র, এর বেশি নয়।

“এবারে বাকিটা দু এক কথায় তোকে ব্যাখ্যা করে বলি। মস্কোতে যাবার পর আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো অবিশ্বাস্যভাবে, বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। মেয়েটার প্রধান যে আত্মীয়, জেনারেলের বিধবা, অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে হঠাৎ একসঙ্গে দুই ভাইঝিকে হারালেন। এরা ছিল বিধবার নিকটতম আত্মীয়, তাঁর সম্পত্তির নিকটতম উত্তরাধিকারিণী। দুজনেই বসন্ত হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে মারা গেল। বৃদ্ধা শোকে আকুল, এমন সময় কাতিয়াকে পেয়ে তাঁর প্রাণ জুড়াল, তাকে কন্যা বলে গ্রহণ করলেন, কাতিয়া হয়ে উঠল তাঁর অন্ধের যষ্টি, তাকে তিনি আঁকড়ে ধরে রইলেন, তক্ষুনি উইল বদল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলেন কাতিয়ার নামে। কিন্তু সেটা সে পাবে ভবিষ্যতে, আপাতত সোজাসুজি তার হাতে দিলেন নগদ আশি হাজার, যেটা বলতে চাইলেন তা এই যে এই রইল তোমার যৌতুক, এই নিয়ে তোমার যা খুশি তাই করতে পার। মহিলা একটু হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ছিলেন, পরে আমি মস্কোয় তাঁকে দেখেছি, তখন লক্ষ করে দেখেছি। তা সে যাই হোক, এক দিন হঠাৎ আমি সাড়ে চার হাজার রুবল পেলাম। বলাই বাহুল্য, আমি একেবারে হতবুদ্ধি, এত অবাক হয়ে গেলাম যে আমার মুখ দিয়ে

কোনো কথা সরল না। এর তিন দিন পরে এলো তার প্রতিশ্রুত চিঠি। সেটা এখনও আমার কাছে আছে, সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, ওটা সঙ্গে নিয়েই আমি মারা যাব। চাস তো দেখাতে পারি। অতি অবশ্য পড়ে দেখিস আমার স্ত্রী হতে চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছে, নিজেই নিজেকে পাত্রী হিসেবে প্রস্তাব করছে। যা বলছে সেটা এই যে 'তোমাকে' পাগলের মতো ভালোবাসি। আমাকে তুমি না হয় ভালো না-ই বাসলে—তাতে কিছু এসে যায় না। আমার স্বামী হও—তার বেশি কিছু চাইনে। ভয় পেয়ো না—তোমাকে কোনো অসুবিধার মধ্যে আমি ফেলব না, আমি তোমার আসবাবপত্রের মতো হয়ে থাকব, হব তোমার ওই গালিচা যার ওপর দিয়ে তুমি পায়ে হেঁটে যাও। তোমাকে চিরকালের জন্য ভালোবাসতে চাই, তোমাকে তোমার নিজের কবল থেকে উদ্ধার করতে চাই। ' আলিয়োশা, এই ছত্রগুলো আমি আমার নিজের ভাষায় বলি সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমার সে ভাষার শব্দগুলো তো জঘন্য, আমার কথা বলার ঢংটাও জঘন্য ইতর ধরনের—চিরকালই ওরকম—ওটা আমি কখনও ছাড়তে পারিনি! চিঠিটা আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল, এই আজও বিঁধছে ছুরির ঘায়ের মতো। তুই কি মনে করিস এখন আমার পক্ষে সহজ? আজও কি আমার পক্ষে সহজ? আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তর লিখে ফেললাম তাকে। কোনোমতে মস্কোতে আসতে পারছিলাম না। চিঠিটা আমি লিখেছিলাম চোখের জলে। একটা ব্যাপারে চিরকালের জন্য একটা লজ্জা থেকে গেল: চিঠিতে উল্লেখ করেছিলাম, সে এখন ধনী, ভালোরকম স্ত্রীধনের অধিকারিণী, আর আমি তো স্রেফ একটা ভিখিরি বর্বর—দ্যাখ দিখি, টাকার কথাটা আবার তুলতে গেলাম কী বলতে! ওটা ভেতরে ভেতরে চুপচাপ সয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কলম থেকে বেরিয়ে গেল। সেই সময়, তৎক্ষণাৎ মস্কোয় ইভানিকেও একটা চিঠি লিখলাম, চিঠিতে আমার সাধ্যমতো সব কিছু ওকে খুলে জানালাম। ছয় পাতার চিঠি। ইভানকে ওর কাছে পাঠালাম। কী হল? অমন করে তাকিয়ে আছিস যে আমার দিকে? কী দেখছিস? তা হ্যাঁ, ইভান ওর প্রেমে পড়ে গেল, এখনও ওর প্রেমে মজে আছে। সে আমি জানি, তোদের ধারণায়, জাগতিক ধারণায়, ওটা আমার একটা বোকামি হয়েছিল—তা হবেও বা, কিন্তু বলা যায় না, এই একটা বোকামিই হয়তো এখন আমাদের সবাইকে বাঁচাবে! আহা, তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না কাতেরিনা তাকে কী পরিমাণ ভক্তি করে, কত সম্মান করে? আমাদের দুজনের মধ্যে তুলনা করার পর সে কি আর আমার মতো লোককে ভালোবাসতে পারবে—তাও আবার এখানে যা সব কাণ্ড ঘটে গেল তার পর?"

"কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে তোমার মতো লোককেই ভালোবাসে, ওর মতো লোককে নয়।"

"সে ভালোবাসে তার সৎগুণকে, আমাকে নয়", অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কিন্তু প্রায় রাগতস্বরেই হঠাৎ দমিত্রি ফিয়োদরভিচের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। সে হেসে

উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল। লজ্জায় আগাগোড়া লাল হয়ে গিয়ে সে প্রচণ্ড জোরে টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে বসল।

“হলফ করে বলছি আলিয়োশা”, নিজের ওপর সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে, প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল সে, “বিশ্বাস করিস আর না করিস, কিন্তু ঈশ্বর যেমন পবিত্র, খ্রিস্ট যেমন প্রভু—আমি তাঁদের সেই নামেই শপথ করে বলছি যে ওর মহৎ অনুভূতিকে আমি এই মাত্র হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমি জানি যে আমি মনের দিক থেকে ওর তুলনায় একেবারেই নগণ্য, ওর লক্ষ কোটি গুণ নীচে আমার স্থান, আর ওর এই মহৎ অনুভূতিগুলো স্বর্গের দেবদূতের অনুভূতির মতোই আন্তরিক। আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি—ট্র্যাজেডিটা তো এখানেই। কোনো মানুষ যদি একটু আধটু আবেগের ভাষায় কথা বলে তাতে দোষের কী আছে? আমি নিজেও কি তা করি না? কিন্তু আমি একপট, আমি কিন্তু অকপট। আর ইভানের কথা যদি বলিস, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি এখন সে প্রকৃতিকে কেমন বিষনজরে দেখতে পারে, শাপশাপান্ত করতে পারে—আরও বেশি করে পারে—তার ওই অমন বুদ্ধি নিয়ে তো বটেই! কী বেশি পছন্দের হতে পারে, কে বেশি পছন্দের হতে পারে, কী? একটা নরপিশাচ যে কিনা এখানেও, যখন সে একজন বিয়ের পাত্র এবং সকলের নজর যখন তার ওপর পড়ে আছে, তখনও লাম্পট্যকে সংযত করতে পারল না—শুধু তা-ই নয়, সেটা সে চালিয়ে যাচ্ছে তার বাগদত্তার সামনে, একেবারে তার চোখের ওপর! এই রকম, আমার মতো এই রকম একজন লোককেই কিনা পছন্দ করল, আর ইভান হয়ে গেল বরবাদ! কী কারণে? কারণ একটা মেয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে ঠিক করেছে সে তার নিজের জীবন ও ভবিষ্যতের ওপর বলাৎকার করবে। কোনো মানে হয়! আমি অবশ্য এ ব্যাপারে ইভানের সঙ্গে কখনও কোন কথা বলি নি, ইভানও বলাই বাহুল্য, এ সম্পর্কে আমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি, সামান্যতম ইঙ্গিত পর্যন্ত দেয়নি। কিন্তু ভাগ্যে যা ঘটার তা-ই ঘটতে চলেছে: যে যোগ্য সে তার জায়গায় টিকে থাকবে, আর যে অযোগ্য সে চিরকালের জন্য গা ঢাকা দেবে অন্ধকার নোংরা চোরাগলিতে, যেটা তার বড়ো আপন বড়ো প্রিয় জায়গা, যেখানে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যেখানে স্বেচ্ছায় নোংরা পাঁক আর পূতিগন্ধের মধ্যে ডুবে গিয়ে পরম সুখ উপভোগ করতে করতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। না, কী সব যা-তা বলছি! আমার কথার পুঁজি ফুরিয়ে গেছে, ঠিক যেন আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি, কিন্তু আমি যা যা বলেছি ঠিক তাই তাই হবে। আমি ওই চোরাগলির অন্ধকারে ডুবে যাব আর ও ইভানকে বিয়ে করবে।

“ভাই, থাম”, আলিয়োশা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার তাকে বাধা দিয়ে বলল, “যা-ই বল না কেন, একটা ব্যাপার কিন্তু তুমি আমাকে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলনি: তুমি যে বিয়ের পাত্র এটা তো ঠিক, ঠিক কিনা? যে কথা দেওয়া হয়েছে সেটা এখন ভাঙবে কী করে যদি তোমার কনে ভাঙতে রাজি না হয়?”

আমি পাত্র, আনুষ্ঠানিক ভাবে পাত্র, যথারীতি আশীর্বাদ করে বিগ্রহ সাক্ষী রেখে শোভাযাত্রা সহকারে মহা ধুমধামের সঙ্গে পাকা কথার সে সব অনুষ্ঠান হয়ে গেছে আমি মস্কোতে যাবার পর। জেনারেলের বিধবা আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন এবং—তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না—কাতিয়াকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানিয়েছিলেন: ওকে বলেছিলেন, 'তোমার পছন্দটা ভালো হয়েছে, আমি ওর ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।' আর বললে বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, ইভানকে ওঁর একেবারে পছন্দ হয়নি, ওকে কোনোরকম অভিনন্দনও জানাননি। মস্কোয় থাকতে কাতিয়ার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। আমি ওকে আমার সব কথা বলেছি—প্রাণ খুলে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, অকপটে বলেছি। সবই সে শুনেছে।

বিহ্বলতা ছিল সুমধুর,
ছিল স্নিগ্ধ কমনীয় কথা

তা গর্ব করার মতো কথাও ছিল বৈ কি। সে আমার কাছ থেকে তখন একটা বড়ো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল: আমাকে শোধরাতে হবে। আমি কথা দিলাম। তারপর এই এখন

"এখন কী?"

"এই তো এখন তোকে ডাকলাম, ডেকে তোকে এখানে টেনে আনলাম আজ—আজকের এই তারিখে—মনে রাখিস তারিখটা! উদ্দেশ্যটা এই যে আমি তোকে আবারও কিন্তু, এই আজই পাঠাতে চাই কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে এবং

"কী?"

"তাকে গিয়ে এই কথা বলবি যে আমি তার কাছে আর কখনও আসছি না, আর আমি তাকে আমার শেষ নমস্কার জানাতে বলেছি।"

"কিন্তু এটা কি সম্ভব?"

"কথাটা তো সেখানেই, অসম্ভব বলেই তো আমি নিজে না গিয়ে তোকে পাঠাচ্ছি, নইলে আমি নিজের মুখে কী করে তাকে একথা বলব?"

"কিন্তু তুমি যাবে কোথায় শুনি?"

"অন্ধকার চোরাগলিতে।"

"তার মানে ওই গ্রুশেন্‌কার কাছে!" দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়ে সখেদে বলে উঠল আলিয়োশা। "তাহলে কি রাকিতিন আসলে সত্যি কথা বলেছিল? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি অমনি অমনি ওর কাছে যেতে, এর বেশি কিছু নয়।"

"যে লোক একজনকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার কিনা এমন গতিবিধি? এটা কি সম্ভব?—বিশেষ করে বিয়ের কনে যখন অমন একটি মেয়ে! সমাজের সকলের চোখের সামনে দিয়ে! হাজার হোক, আমার একটা মানসম্মানবোধ আছে তো! যে মুহূর্তে আমি গ্রুশেন্‌কার কাছে যাতায়াত শুরু করেছি তখন থেকে আমি আর বিয়ের পাত্র নই, আমার সততা গেছে—এটা অন্তত আমি বুঝি। অমন

করে তাকিয়ে দেখছিস কী? বুঝলি কিনা, আমি প্রথমে ওর কাছে গিয়েছিলাম স্রেফ ওকে মারব বলে। আমি জানতে পেরেছিলাম এবং এখন বিশ্বস্তসূত্রে জানি যে বাবা তার দালাল ওই ক্যাপ্টেনের মারফত ওই গ্রুশেন্‌কোটার হাতে আমার হুণ্ডি তুলে দিয়েছে যাতে সে বেটি টাকা আদায়ের জন্য আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দাবিয়ে দেওয়া ও নিবৃত্ত করা। ওরা আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। তাই আমি চললাম গ্রুশেন্‌কাকে মারতে। এর আগে ক্যাপ্টেন লোকটাকে এক ঝলক দেখেছিলাম। আহামরি কিছু নয়। ওর সেই বুড়ো ব্যাবসাদারটার কথাও জানতাম। সে আবার এখন অসুস্থ, একেবারেই দুর্বল ও শয্যাশায়ী, কিন্তু তা হলেও গ্রুশেন্‌কার নামে বেশ একটা মোটা টাকা রেখে যাচ্ছে। এও জানতাম যে টাকাকড়ি উপায় করতে সে ভালোবাসে, সে-টাকা উপায় করে গলাকাটা সুদে টাকা ধার দিয়ে। বেজায় ধূর্ত, বজ্জাত। দয়ামায়াহীন। গেলাম গ্রুশেন্‌কাকে পেটাব বলে, কিন্তু পেটানো আর হল না, আমিও ওর কাছে থেকে গেলাম। ঝড়ঝঞ্ঝা আছড়ে পড়ল, শুরু হয়ে গেল প্লেগমহামারি। তার সেই রোগ জীবাণু আমার মধ্যে সংক্রামিত হল, এখনও সেই জীবাণু আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। কালচক্রের আবর্তন সমাপ্ত হল— এই হল গিয়ে আমার অবস্থা। যদিও আমি একটা পথের ভিখিরি, কিন্তু বুঝে বুঝে ঠিক সেই দিনই হঠাৎ দেখা গেল আমার পকেটে তিন হাজার রুবল আছে। ওকে নিয়ে চলে গেলাম মোক্রয়েতে—জায়গাটা এখান থেকে আট ক্রোশ মতন দূরে। সেখানে কিছু জিপসি নাচিয়ে গাইয়ে ধরলাম, চলল শ্যাম্পেন। সব কটা চাষাকে, তাদের মেয়ে বৌ ছুকরিগুলোকে মদ খাইয়ে চুর করে দিলাম আমার কয়েক হাজার রুবল উড়িয়ে দিয়ে। তিন দিন পরে আমি একেবারে ন্যাংটো, কিন্তু আমি তখন বীর। ভাবছিস বীরপুঙ্গবটি কি শেষ পর্যন্ত কিছু অর্জন করতে পারল? মোটেও না, তার কোনও আভাস-ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ওর কাছ থেকে। আমি তোকে বলছি: ওটা একটা মহা প্যাঁচাল। এই বজ্জাত গ্রুশেন্‌কাটার প্যাঁচ—ওর পা অবধি চলে গেছে, এমনকি বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের নখ পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। সেটা আমি দেখেছি, দেখে চুমো খেয়েছি, কিন্তু ওই পর্যন্তই—শপথ করে বলছি! 'যদি চাও তোমাকে বিয়ে করব, কিন্তু তুমি তো একটা ভিখিরি। বল যে মারধর করবে না, আমার যা খুশি তা-ই করতে দেবে, তাহলে হয়তো বা বিয়ে করব', হাসতে হাসতে বলল। সেই হাসি এখনও হাসছে!

বলতে বলতে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কেমন যেন শিশুর মতন হয়ে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মনে হল হঠাৎ যেন মাতাল হয়ে গেছে। তার চোখদুটো আচমকা লাল টকটকে হয়ে উঠল।

"তাই বলে তুমি কি সত্যি সত্যি ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?"

"ও যখন চাইবে তক্ষুনি করব। যদি না চায় তাহলে যেমন আছি তেমনি থাকব, ওর আঙিনায় ঝাড়ুদার হয়ে থাকব। তুই    আলিয়োশা, তুই    " চট করে

আলিয়োশার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তার কাঁধ খামচে ধরে হঠাৎই ভীষণ জোরে তাকে ঝাঁকাতে শুরু করে দিল। “তুই এমন সরল নিষ্পাপ ছেলে, তুই কী করে জানবি, কী করে বুঝতে পারবি যে এসবই আসলে বিকারগ্রস্তের ভুলবকা, এক ধরনের অর্থহীন প্রলাপ— আর সেখানেই তো ট্র্যাজিডি! জেনে রাখিস আলেক্সেই, আমি নীচাশয় হতে পারি, নীচ লালসাতাড়িত একটা উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষ হতে পারি, কিন্তু চোরছ্যাঁচড়, পকেটমার, ছিঁচকে চোর দ্মিত্রি কারামাজভ্ কখনও হতে পারে না। তাহলে জেনে রাখ, আমি এখন একটা চোর পকেটমার, একটা ছিঁচকে চোর! যেদিন গ্রুশেন্‌কাকে, আমি পেটাতে যাব সেই দিনই সকালে আমার সেখানে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে কাতেরিনা ইভানভ্‌না আমাকে ডেকে পাঠাল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে যাতে কাকপক্ষী টের না পায় এইভাবে রীতিমতো গোপনে—কেন গোপনে তা জানি না, মনে হয় সেটা ওর দরকার ছিল—আমাকে তিন হাজার রুবল দিয়ে অনুরোধ করল আমি যেন জেলা শহরে গিয়ে সেখানকার ডাকঘর থেকে টাকাটা মনি অর্ডার করে মস্কোতে আগাফিয়া ইভানভ্‌নার নামে পাঠিয়ে দিই। শহরে যেতে বলা এই কারণে যাতে এখানকার কেউ জানতে না পারে। ওই তিন হাজার রুবল পকেটে নিয়েই না আমি তখন গ্রুশেন্‌কার কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, ওই টাকাতেই আমরা মোক্রায়েতে গিয়ে মজা লুটি! তারপর আমি ভান করলাম আমি তুরন্ত শহরে গিয়ে কাজটা সেরে এসেছি, কিন্তু ডাকঘরের রসিদ তাকে দেখালাম না, বললাম পাঠিয়েছি, রসিদটা পরে এনে দেব। কিন্তু আজও দেওয়া হয়নি। বিলকুল ভুলে বসে আছি। এখন তোর কী মনে হয়, এই যে আজ তুই যাবি, গিয়ে তাকে বলবি: 'আপনাকে বিদায় আর শেষ নমস্কার জানিয়েছে', যদি সে তখন তোকে জিগ্‌গেস করে: 'কিন্তু আমার টাকাটা?' তুই হয়তো তাকে বললেও বলতে পারতিস: 'ওটা একটা নীচ প্রবৃত্তির ইতর কামাসক্ত প্রাণী, কোনো সংযমের বালাই ওর নেই। আপনার টাকা তখন ও পাঠায়নি, খরচ করে ফেলেছে, কারণ লোভ সংবরণ করতে পারেনি—জানোয়ারের মতো:—কিন্তু তা সত্ত্বেও তুই যোগ করলেও করতে পারতিস: 'তবে সে চোর নয়, এই নিন আপনার তিন হাজার, ফেরত পাঠিয়েছে। আপনি নিজেই পাঠান আগাফিয়া ইভানভ্‌নাকে। উনি আপনাকে তাঁর শেষ নমস্কার জানাতে বলেছেন।' তবে কিনা যদি সে হঠাৎ প্রশ্ন বসে: 'কিন্তু আমার টাকাটা?''

“মিতিয়া তুমি অসুখী লোক, হ্যাঁ তাই! কিন্তু তাহলেও ততটা নয়, যতটা তুমি ভাবছ। অমন করে হতাশায় ডুবে গিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলো না, ওই ভেবে নিজেকে শেষ কোরো না!”

“তুই কী ভাবছিস বল তো? ফেরত দেবার জন্য ওই তিন হাজার না পেলে আমি গুলি করে আত্মহত্যা করব? এখন সে ক্ষমতা নেই, পরে হয়তো হতে পারে, কিন্তু এখন আমি চললাম গ্রুশেন্‌কার কাছে। যা হবার তাই হবে।”

“কিন্তু ওর ওখানে গিয়ে কী করবে?”

"ওর স্বামী হব, যদি আমি ওর স্বামী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। তারপর যখন তার কাছে তার প্রেমিক আসবে তখন অন্য ঘরে চলে যাব। ওর বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে তাদের জলকাদামাখা গামবুট সাফ করব, সামোভারের আগুনে ফুঁ দেব, ফাইফরমাস খাটব।

"কাতেরিনা ইভানভ্না সব বুঝতে পারবেন", হঠাৎ সাড়ম্বরে ঘোষণা করল আলিয়োশা, "তোমার এই দুর্ভাগ্য যে কত গভীর তা বুঝতে পেরে মিটমাট করে নেবেন। তাঁর মনটা অনেক বড়ো, তিনি নিজেই দেখতে পাবেন যে তোমার চেয়ে বড়ো দুঃখী আর কেউ হতে পারে না!"

"সব কিছু মেনে নিতে পারবে না", দেঁতো হাসি হেসে মিতিয়া বলল। "এর মধ্যে এমন কিছু আছে ভাই যা কোনো মেয়েমানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সবচেয়ে ভালো হয় কী করলে জানিস?"

"কী?"

"তিন হাজার ওকে দিয়ে দিতে পারলে।"

"কোথা থেকে আসবে সে টাকা? শোন, আমার দু হাজার আছে, ইভানও দেবে এক হাজার। এই তো তিন হাজার হল। নাও, ফেরত দিয়ে দাও।"

"তা কবে আসবে তোর ওই তিন হাজার? অমনিতে তুই এখনও সাবালক নোস, তায় আবার অবশ্য, অতি অবশ্য আজই তোকে আমার বিদায়ের কথা জানানোর জন্য তার কাছে যেতে হবে—টাকা নিয়ে হোক আর না নিয়ে হোক, কেন না ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে আমার পক্ষে আর টানা সম্ভব নয়। কাল হলে দেরি হয়ে যাবে, বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাবে। তার আগে এখন তোকে বাবার কাছে পাঠাব।"

"বাবার কাছে।"

"হ্যাঁ, ওর কাছে যাবার আগে বাবার কাছে। গিয়ে ওই তিন হাজারই চা।"

"কিন্তু মিতিয়া, বাবা তো দেবেই না।"

"দিলে তো কথাই ছিল না। দেবে না তা জানি। মরিয়া হওয়া কাকে বলে জানিস তো আলেক্সেই?"

"জানি।"

"বলি শোন, আইনত তার কাছে আমার কোনো পাওনা নেই। পাওনা যা ছিল সব নিয়ে নিয়েছি, সব, সেটা আমি জানি। কিন্তু নীতগতভাবে আমার কাছে কিছু ঋণ তো ওর থেকেই যায়। ঠিক বলছি কিনা? মা'র আটাশ হাজার দিয়ে ব্যাবসা শুরু করে লাখ টাকা উপায় করেছে। ওই আটাশ হাজার থেকে আমাকে মাত্র তিন হাজারই দিক না কেন, মাত্র তিন—তাই দিয়ে আমাকে নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এতে তার অনেক পাপেরও স্খালন হবে! আমি তোকে কথা দিচ্ছি— বড়ো মুখ করেই বলছি—ওই তিন হাজার পেলে আমি পালা চুকিয়ে

দেব, আর কখনও, কোনো দিন আমার কোনও কথা শুনতে পাবে না। এই শেষ বার তাকে বাপ হতে পারার সুযোগ করি দিচ্ছি। তাকে বলিস ভগবান নিজে তাকে এই সুযোগ করে দিচ্ছেন।”

“যাই বল না কেন, মিতিয়া, কোনো মতেই দেবে না।”

দেবে না সে আমি জানি, ভালোমতোই জানি। বিশেষ করে এখন তো আরও। শুধু তা-ই নয়, আরও যেটা জানি তা এই যে এখন, মাত্র দিন কয়েক আগে, এমন কি হতে পারে সবে গতকাল, এই প্রথম সে সত্যি-সত্যি জানতে পেরেছে—‘সত্যি-সত্যি’ কথাটার তলায় দাগ দিতে পারিস—গ্রুশেন্‌কা হয়তো আসলে ঠাট্টা করছে না, আমাকে বিয়ে করার জন্য সত্যি সত্যি হামলে পড়তে পারে। ওর চরিত্র বাবার ভালো জানা আছে, ও চিজ তার চিনতে বাকি নেই। এই যখন অবস্থা তখন কিনা সে উপরন্তু টাকা দেবে, টাকা দিয়ে কিনা এমন একটা ঘটনা ঘটাতে সাহায্য করবে, যখন সে নিজেও ওর জন্য পাগল! কিন্তু এটাও কম করে বলা হল, আমি তোকে আরও বেশি কিছু জানাতে পারি: আমি জানি গত পাঁচ দিন হল ব্যাঙ্ক থেকে সে তিন হাজার রুবল তুলেছে, সেই টাকা এক শ রুবল করে ব্যাঙ্কনোটে ভাঙিয়ে একটা বড়ো খামের মধ্যে পুরে রেখে দিয়েছে। খামটা ক্রস করে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, পাঁচটা সিলমোহর দেওয়া। কেমন খুঁটিনাটি জানি দেখছিস তো! খামটার গায়ে আবার লেখা আছে: ‘আমার স্বর্গের দেবী গ্রুশেন্‌কাকে, যদি সে আসতে চায়।’ কলমের ওই আঁচড়টা তারই স্বহস্তের কীর্তি—কাজটা সারা হয়েছে নিঃশব্দে, গোপনে। ওর ওই টাকার কথা তাই কারও জানার কথা নয়, জানার মধ্যে জানে শুধু তার খাস চাকর স্মের্দিকোভ্, যার সততায় সে ততটাই বিশ্বাস করে যতটা সে নিজেকে বিশ্বাস করে। তা আজ তিন কি চার দিন হল সে গ্রুশেন্‌কার পথ চেয়ে বসে আছে, আশা করছে টাকা নিতে আসবে। তাকে খবর পাঠানো হয়েছে, আর সেও খবর পাঠিয়েছে: ‘এলেও আসতে পারি।’ তাই বলছিলাম কি সে যদি বুড়োর কাছে আসে তাহলে কি আর আমি তাকে বিয়ে করতে পারব? এখন বুঝতে পারছিস তো কেন আমি এখানে ঘাপটি মেরে বসে আছি, কীসের ওপর আমি নজর রাখছি?”

“গ্রুশেন্‌কার জন্য বুঝি?”

“হ্যাঁ, ওর জন্যেই। এখানকার বাড়িউলি যে দুই খানকি, আমাদের ফোমা তাদের কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ফোমা এখানকারই, স্থানীয় লোক, এককালে আমাদের সৈন্যদলে ছিল। ওদের দেখাশোনা করে, রাতে পাহারা দেয়, দিনের বেলায় পাখি শিকার করে বেড়ায়, ওটাই তার জীবিকা। আমি তারই ঘরে গেড়ে বসে আছি। আসল রহস্যটা, অর্থাৎ আমি যে এখানে বসে বসে নজর রাখছি সেটা ও যেমন জানে না, তেমনি বাড়িউলিদের দুজনের কেউও জানে না।

“শুধু স্মের্দিকোভ্‌ই জানে বলছ?”

"শুধু সে-ই জানে। গ্রুশেন্‌কা যদি বুড়োর কাছে যায় তখুনি সে আমাকে জানিয়ে দেবে।"

"ওই বুঝি সেই খামের কথা তোমায় বলেছে?"

"হ্যাঁ। একান্ত গোপনীয়। এমনকি ইভানও জানে না—টাকাকড়ির কথা জানে না, কোনো কিছুর কথাই জানে না। এদিকে বুড়ো আবার ইভানকে দু'তিন দিনের জন্য বেড়িয়ে আসতে পাঠাচ্ছে চেরমাশ্‌নিয়াতে সেখানকার জঙ্গল কেটে কিনে নেবার জন্য খদ্দের পাওয়া গেছে, আট হাজার দেবে কাঠের দাম। তাই ইভানকে সাধাসাধি করে বুড়ো বলছে 'একটু সাহায্য কর, নিজে উপস্থিত থেকে কাজটা সেরে আয়।' দু তিন দিনের মামলা আর কি। বুড়োর ইচ্ছে যেন ইভান না থাকতে গ্রুশেন্‌কা আসে।

"তার মানে আজও গ্রুশেন্‌কার জন্যে অপেক্ষা করে আছে?"

"না আজ সে আসবে না, দেখে তাই মনে হচ্ছে। না আসাই সম্ভব!" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মিতিয়া। "স্মের্দিকোভের তো তা-ই অনুমান। বাবা এখন মদ নিয়ে টেবিলে বসেছে, সঙ্গে আছে আমাদের ভাই ইভান। যা আলেক্সেই, এই বেলা যা, গিয়ে ওর কাছে ওই তিন হাজার চা।

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে সেখানে একটা উন্মত্ততার ভাব লক্ষ করে সেই মুহূর্তে আলিয়োশার মনে হল সে বোধহয় প্রকৃতিস্থ নয়; তাই সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আর্তচিৎকার করে বলল: "মিতিয়া, ভাই আমার, কী হল তোমার?"

"কী বলছিস তুই? আমার মাথা খারাপ হয়নি", একদৃষ্টে, এমনকি অনেকটা যেন গুরুগম্ভীর চালে আলিয়োশার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। "আমি কিন্তু তোকে ঠিকই বাবার কাছে পাঠাচ্ছি, আমি জানি আমি কী বলছি। আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি।"

"অলৌকিকে?"

"ঈশ্বরের অলৌকিক বিধানে। ঈশ্বর জানেন আমার হৃদয়, তিনি দেখতে পাচ্ছেন কত হতাশা আমার এই হৃদয়ে। সমস্ত ছবিটাই তাঁর চোখের সামনে আছে। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে পারে এটা তিনি কেমন করে হতে দিতে পারেন? আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি, আলিয়োশা, যা!"

"আমি যাচ্ছি। বল, তুমি এখানে অপেক্ষা করবে?"

"করব। বুঝতে পারছি শিগ্‌গির কিছু হবার নয়। এলাম আর একেবারে দুম্ করে হয়ে গেল তা হয় না। এখন নেশার ঘোরে আছে। অপেক্ষা করে থাকব তিন চার পাঁচ ছয় সাত—যত ঘণ্টাই হোক না কেন। শুধু জেনে রাখ আজ, অন্তত মাঝরাতে হলেও তোকে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে হাজির হতে হবে —

টাকা নিয়ে হোক আর না নিয়েই হোক; তাকে বলবি: 'আপনাকে 'শেষ নমস্কার' জানিয়েছে।''

''মিতিয়া! কিন্তু হঠাৎ যদি গ্রুশেন্‌কা আজ এসে পড়ে আজ যদি নাও হয় তো কাল বা পরশু?''

''গ্রুশেন্‌কা? সে আমি নজর রাখছি, তেমন হলে ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ব, বাধা দেব।

''কিন্তু যদি

''এরপরও যদি কোনো যদি থাকে তাহলে খুন করব। ও ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারব না।''

''কাকে খুন করবে?''

''বুড়োকে। গ্রুশেন্‌কাকে নয়।''

''এ কী কথা বলছ ভাই!''

''আমি ঠিক জানি নে, আমি জানি নে। হয়তো খুন করব না, হয়তো বা করব। আমার ভয় হয় পাছে ঠিক সেই মুহূর্তটিতে সে তার ওই মুখটা নিয়ে হঠাৎ আমার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমি ঘৃণা করি ওর কণ্ঠমণি, ওর নাক, ওর চোখ, ওর নির্লজ্জ বাঁকা হাসি। ব্যক্তিগত ভাবে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আমাকে পেয়ে বসে। এটাকেই আমার ভয়। সামলাতে পারব বলে মনে হয় না।

''আমি যাচ্ছি মিতিয়া। আমি বিশ্বাস করি যাতে সাংঘাতিক কিছু না ঘটে সেইজন্য ঈশ্বর যেমন ভালো মনে করেন সেইভাবে সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন।''

''আমি কিন্তু এখানে বসে বসে অলৌকিক ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকব। কিন্তু সেটা যদি না ঘটে তাহলে

আলিয়োশা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তার বাবার উদ্দেশে রওনা দিল।

## ছয়

## স্মের্দিকোভ্

আলিয়োশা কিন্তু সত্যি সত্যি গিয়ে দেখতে পেল তার বাবা তখনও খাবারের টেবিলের সামনে বসে। চিরটা কাল যেমন হয়ে আসছে এবারেও তেমনি দেখা গেল টেবিলটা পাতা রয়েছে বসার বড়ো হলঘরটায়, যদিও বাড়িতে যথারীতি আলাদা একটা খাবার ঘরও ছিল। এই ঘরটা বাড়ির সবচেয়ে বড়ো ঘর, এখানকার সাজসজ্জার মধ্যে এক ধরনের সাবেকিয়ানার ভান আছে। আসবাবপত্র সাদা রঙের, বহু পুরানো, গদিগুলি জরাজীর্ণ রংচটা লাল রেশমি জাতীয় এক ধরনের কাপড়ে মোড়া। জানলাগুলির মাঝে মাঝে দেয়ালে গাঁথা সাদা ও সোনালি গিল্‌টির সাবেকি ধাঁচের কারুকাজ করা ফ্রেমে বাঁধানো বড়ো বড়ো আয়না। সাদা ওয়াল পেপারে

মোড়া দেয়াল। দেয়ালের কাগজ বহু জায়গায় ইতিমধ্যে টুটো ফাটা হয়ে গেছে, তারই মাঝখানে শোভা পাচ্ছে দুটি বড়ো বড়ো পোর্ট্রেট—একটি কোনো এক প্রিন্সের যিনি বছর ত্রিশেক আগে এই অঞ্চলের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, অন্যটি অঞ্চলের কোনো এক ঊর্ধ্বতন পাদ্রি মশাইয়ের—তিনিও আজ বহুকাল হল গতাসু। ঘরের সামনের এক কোনায় স্থান পেয়েছে কয়েকটি বিগ্রহ, সেগুলির সামনে রাতের বেলায় বাতি জ্বালানো হয়—ভক্তিবশত ততটা নয় যতটা এই উদ্দেশ্যে যাতে রাতে ঘরে আলো থাকে। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ ঘুমোতে যায় অনেক রাত্রে, শেষ রাতে তিনটে চারটের সময়। তার আগে সচরাচর ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়, নয়তো হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে বসে ভাবে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় চাকরবাকরদের বাইরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়িতে সে সম্পূর্ণ একা একা রাত কাটাত, তবে বেশির সময়ই তার চাকর স্মের্দিকোভ রাত্রে তার সঙ্গে থেকে যেত, সামনের ঘরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোত।

আলিয়োশা যখন ঘরে ঢুকল ততক্ষণে ডিনারের আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তবে কফি আর ফলের মিষ্টি পরিবেশন করা হয়েছে। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ ভোজনের পর ব্র্যান্ডির সঙ্গে মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। ইভান ফিয়োদরভিচও সেখানে, খাবার টেবিলে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। গ্রিগোরি আর স্মের্দিকোভ্ দুই ভৃত্য টেবিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল যেমন দুই ভদ্রমহোদয়, তেমনি তাদের দুই ভৃত্যও দারুণ খোশমেজাজে আছে। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ হাসছে, সশব্দে হো হো করে অট্টহাসি হাসছে। বাইরের বারান্দা থেকেই আলিয়োশা তার কর্কশ উচ্চহাসি শুনতে পেল। এ হাসির সঙ্গে আলিয়োশার আগে থাকতেই ভালোমতো পরিচয় আছে। হাসির আওয়াজ থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল যে বাবাকে এখনও মোটে মাতাল বলা যায় না। আপাতত বেশ রঙে আছে—এইমাত্র।

"এই ত এসে গেছে! যাকে চাইছিলাম সে এসে গেছে!" আলিয়োশাকে দেখে হঠাৎ দারুণ উল্লসিত হয় বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ। "আয় রে, আমাদের সঙ্গে বসে যা। একটু কফি হয়ে যাক। সংযমব্রতের পর্ব চলছে তো কফিতে আপত্তি কীসের? গরম গরম দিব্যি চলতে পারে—তাই না? ব্র্যান্ডি অফার করছি না, কারণ তোর সংযমব্রত চলছে। তা হবে নাকি? চললে বল। না, বরং তোকে খানিকটা দামি মিষ্টি মদই দেওয়া যাক—আমাদের ভাঁড়ারে আছে। এই যে স্মের্দিকোভ্ যা দেখি, আমার আলমারির দ্বিতীয় তাকটায়, ডান দিকে আছে। এই নে চাবি। চট করে নিয়ে আয়!"

আলিয়োশা আপত্তি তুলল।

"সে যাই হোক, পরিবেশন করা হবে—তোর জন্যে না হোক, আমাদের জন্যে হবে", এক গাল হেসে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ বলল। "হ্যাঁ ভালো কথা, তোর খাওয়াদাওয়া হয়েছে তো?"

যদিও মঠাধ্যক্ষের রান্নাঘরে এক টুকরো রুটি আর ঘরে তৈরি এক গেলাস নির্দোষ ঠান্ডা পানীয় ছাড়া আর কিছুই তার খাওয়া হয়নি, তবু আলিয়োশা বলল, "খেয়েছি।... এই এখন গরম গরম এক গেলাস কফি—দিব্যি লাগবে।"

"শাবাশ বেটা! কফি চলবে। গরম করতে হবে নাকি? আরে না, এখনও তো ফুটছে দেখছি। জব্বর কফি, স্মের্দিকোভের হাতের তৈরি। যেমন কফি, তেমনি মাছ মাংসের পুর দেওয়া রুটি—স্মের্দিকোভ্ আবার দুটোতেই ওস্তাদ, আর হ্যাঁ, সত্যি বলতে গেলে কি মাছের স্যুপ বানাতেও। কোনো এক দিন এসে খেয়ে যাস ওর রান্না মাছের স্যুপ্। আগে থাকতে জানিয়ে আসবি। আরে দাঁড়া, দাঁড়া এই যে তোকে বললাম আজই বালিশ তোশক যা যা আছে সব বেঁধে ছেঁদে নিয়ে ওই মঠ ছেড়ে চলে আসতে—তার কী হল? তোশকটা এনেছিস তো, অ্যাঁ? হে-হে-হে।

"না আনিনি" আলিয়োশাও ঠোঁট উলটে হেসে উত্তর দিল।

"অ, তা যা-ই বলিস, ঘাবড়ে গিয়েছিলি তো? ঘাবড়ে গিয়েছিলি তো আজ সকালে? কী বলিস? ওরে বেটা আমার, আমি কি তোর মনে দুঃখ দিতে পারি রে? শুনছিস ইভান, ও যখন অমন করে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে তখন আমি আর পারি না, নিজেকে আর সামলাতে পারি না। ওকে দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটে যেন খিল ধরে যায়। কী ভালোই না বাসি ওকে! ওরে আলিয়োশা, এদিকে আয়, তোর বাপের আশীর্বাদ নিয়ে যা।"

আলিয়োশা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ততক্ষণে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ তার মত পালটে ফেলেছে।

"না, না, উঠতে হবে না তোকে, আমি আপাতত শুধু এই এখান থেকে তোর ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে কাজটা সারছি। হ্যাঁ হয়েছে, এবারে বসে পড়। আচ্ছা, এবারে শোন। শুনে মজা পাবি—বিষয়টা ঠিক তোরই লাইনের। প্রাণ ভরে হাসবি। আমাদের বালা আমের" গাধাটার মুখে কথা ফুটতে শুরু করেছে রে। কী কথাই না বলছে! ওঃ কী কথাই না বলছে!"

বালা আমের গাধা বলে যার উল্লেখ করা হল সে হচ্ছে খাসভৃত্য স্মের্দিকোভ্। লোকটার বয়স একেবারেই কম, বছর চব্বিশেক হবে, অসামাজিক ও মুখচোরা। এমন নয় যে জংলি অথবা লাজুক প্রকৃতির। না, চরিত্র বলতে যা বোঝায় তা ওর আছে, বরং অত্যন্ত দাম্ভিক, হাবভাব দেখে মনে হয় সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। এবারে কিন্তু তার সম্পর্কে অন্তত দু চার কথা না বললে নয়, হ্যাঁ বলতে হয় তো ঠিক এই এখনই।

তাকে মানুষ করেছিল মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না ও গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু বালক বড়ো হতে দেখা গেল তার মনে 'সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই'—যে কথা তার সম্পর্কে গ্রিগোরি বলে থাকে। জংলি স্বভাবের, দুনিয়ার সব কিছু আড়চোখে

দেখে। ছেলেবেলায় তার খুব প্রিয় খেলা ছিল বিড়াল ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া, তারপর মহা সমারোহে সেগুলোকে কবর দেওয়া। এই কাজ করার সময় সে পুরোহিতদের জোব্বার মতো করে একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিত তারপর গান গাইতে গাইতে মরা বিড়ালটার ওপর ধুনুচির মতো করে কিছু একটা নাড়াত। এসবই সে করত চুপে চুপে, অত্যন্ত গোপনে। একবার এরকম একটা অনুশীলনের সময় গ্রিগোরির কাছে সে ধরা পড়ে যায়, গ্রিগোরি তাকে আচ্ছা করে বেত মেরে শাস্তি দেয়। মার খেয়ে সাত দিন ঘরের এক কোণে বসে রইল, সেখান থেকে আড়চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নাকে গ্রিগোরি বলল, "এই জানোয়ারটা আমাদের ভালোবাসে না, কাউকেই ওটা ভালোবাসে না", তারপর হঠাৎ সোজা স্মের্দিকোভের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ করে বলল, 'তুই কি একটা মানুষ নাকি? তুই মানুষ নোস, স্নানঘরের ছাতলা থেকে তুই বেরিয়ে এসেছিস। এই তো তোর পরিচয় পরে দেখা গেছে এই কথাগুলির জন্য স্মের্দিকোভ্ তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি। গ্রিগোরি ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখায়, বছর বারো বয়স পেরোতে তাকে ধর্মগ্রন্থ পড়াতে শুরু করে, কিন্তু শুরুতেই তৎক্ষণাৎ সেই শিক্ষার সমাপ্তি। একবার, তখন মাত্র দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পাঠ চলছে, ছেলেটা হঠাৎ খিক খিক করে হেসে উঠল।

"কী হল?" চশমার ফাঁক দিয়ে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরি জিগ্‌গেস করল।

"ও কিছু না। প্রভু ঈশ্বর প্রথম দিনে আলো সৃষ্টি করলেন, সূর্য চাঁদ আর তারা সৃষ্টি করলেন চার দিনের দিন। তাহলে প্রথম দিন আলো এলো কোথা থেকে?"

গ্রিগোরি স্তম্ভিত। ছেলেটা কৌতুকভরে তাকাল তার গুরুর দিকে। সেই দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা উদ্ধত ভাবও ছিল। গ্রিগোরির আর সহ্য হল না। 'কোথা থেকে এলো এই দেখাচ্ছি তোকে!'—চিৎকার করে এই কথা বলে এক প্রচণ্ড চড় হাঁকাল তার শিষ্যটির গালে। একটি কথাও না বলে ছেলেটা নীরবে সেই চড় হজম করে নিল, কিন্তু আবার সেই ঘরের কোনায় গিয়ে লুকিয়ে রইল কয়েক দিন। ঠিক এই সময়, এই ঘটনার সাতদিন পরে প্রথম তার মূর্ছারোগের প্রকোপ দেখা দিল, যা এর পর তার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে রইল। একথা জানতে পেরে ছেলেটার প্রতি ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মনোভাব হঠাৎই যেন পালটে গেল। এর আগে অনেকটা উদাসীন দৃষ্টিতেই তাকে দেখত, যদিও বকাঝকা তাকে কখনও করত না এবং দেখা হলে সব সময় একটি করে কোপেক তাকে দিত। মেজাজ খুব ভালো থাকলে অনেক সময় খাবার টেবিল থেকে ছেলেটার জন্য দু একটা মিষ্টিও তুলে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু এখন ছেলেটার অসুস্থতার কথা জানতে পেরে তার যত্ন নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল, ডাক্তার বদ্যি এনে হাজির করল, চিকিৎসার উদ্যোগ নিল, কিন্তু দেখা গেল এ রোগ সারানো অসম্ভব। মাসে গড়পড়তা একবার করে

মূর্ছা হতে লাগল, কিন্তু মেয়াদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। মূর্ছার প্রাবল্যও হত নানা ধরনের —কোনো সময় হালকা, কোনো সময় বা বেশ কঠিন ধরনের। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ খুব কড়া করে গ্রিগোরিকে বারণ করে দিল ছেলেটাকে যেন সে কোনো শারীরিক শাস্তি না দেয়, ওকে ওপরে নিজের কাছে আসতেও দিতে লাগল। পড়াশুনাও, তা সে যে বিষয়েরই হোক না কেন, আপাতত বন্ধ করে দিল। কিন্তু একবার, ছেলেটার ততদিনে পনেরো বছর বয়স হয়েছে, ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ লক্ষ করল সে তার বইয়ের আলমারির কাছে ঘুর ঘুর করতে করতে কাচের ভেতর দিয়ে বইয়ের নামগুলো পড়ছে। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের ঘরে বেশ কিছু সংখ্যক বই ছিল—শ খানেকেরও বেশি হবে, তবে কেউ কখনও তাকে বই পড়তে দেখে নি। তৎক্ষণাৎ সে আলমারির চাবি স্মের্দিকোভের হাতে তুলে দিল। 'বেশ তো পড়, উঠোনে ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে বরং লাইব্রেরিয়ান হবি। বোস, বসে বসে পড়। এই নে এই বইটা পড়'—এই বলে ফিয়োদর পাভলভিচ আলমারি থেকে তাকে বের করে দিল 'দিকান্‌কার লাগোয়া পল্লিতে সন্ধ্যা'[২৪]।

ছোকরা বইটা পড়ল, কিন্তু পড়ে সন্তুষ্ট হতে পারল না। পড়ার সময় একবারও তার মুখে হাসি দেখা গেল না, বরং পড়া শেষ করে মুখ গোমড়া করে রইল।

"কী হল? মজার না?" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ জিগ্‌গেস করল।

স্মের্দিকোভ্ চুপ করে রইল।

"কথার জবাব দে হাঁদারাম।"

"গুচ্ছের মিথ্যে কথা লেখা আছে", বিদ্রুপের হাসি হেসে অস্ফুটস্বরে স্মের্দিকোভ্ বলল।

'চুলোয় যা তাহলে। চাকরের বুদ্ধি আর কত হবে! দাঁড়া, এই নে, স্মারাগ্‌দোভের 'সাধারণ ইতিহাস'[২৫]। এখানে যা আছে সব সত্যি। নে, পড়।"

কিন্তু স্মারাগ্‌দোভের বই দশ পাতাও পড়তে পারল না স্মের্দিকোভ্, বিরস লাগল। বইয়ের আলমারি আবার যেমনকার তেমন তালাবন্ধ হয়ে রইল।

এর কিছুদিন পরেই মার্ফা আর গ্রিগোরি ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে জানাল যে স্মের্দিকোভের আচরণে হঠাৎ একটু আধটু করে কেমন যেন একটা অদ্ভুত খুঁতখুঁতে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে: স্যুপ খেতে বসে চামচ হাতে নিয়ে স্যুপের মধ্যে আঁতি পাতি করে কী যেন খোঁজে। প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে, এক চামচ স্যুপ নিয়ে আলোর কাছে তুলে ধরে।

"আরশুলা-টারশুলা নাকি?" গ্রিগোরি জিগ্‌গেস করে।

"মাছি হবে হয়তো", মার্ফার মন্তব্য।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাতিকগ্রস্ত যুবকটি কখনও উত্তর দেয় না, কিন্তু কী রুটি কী মাংস যা খায় তাই নিয়ে এই একই কাণ্ড— যেন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে

দেখছে তেমনিভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, অনেকক্ষণ ধরে বিবেচনা করে দেখে শেষকালে সিদ্ধান্তে আসার পর মুখবিবরে পাঠিয়ে দেয়।

“আহা কী আমার নবাবপুত্তুর এলেন!” তাকে দেখে বিড়বিড় করে বলে গ্রিগোরি।

স্মের্দিকোভের এই নতুন গুণপনার কথা শোনামাত্র ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ স্থির করে ফেলল তাকে পাচক বানাবে, তাই রান্নার কাজ শেখার জন্য তাকে মস্কোয় পাঠিয়ে দিল। রন্ধনপ্রণালী শিক্ষায় কয়েক বছর মস্কোয় কাটিয়ে দেবার পর সে যখন ফিরে এলো তখন তার মুখের চেহারাই আশ্চর্যরকম ভাবে পালটে গেছে। হঠাৎ কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম বুড়িয়ে গেছে। বলিরেখা আঁকা, রক্তশূন্য হলদেটে চেহারা—একেবারেই তার বয়সের সঙ্গে মেলে না, এমনকি তাকে দেখতে হয়েছে একটা নপুংসকের মতো। মানসিকতার দিক থেকে অবশ্য মস্কোতে যাবার আগে যেমন ছিল ফিরেও এলো প্রায় সেই একই ভাব নিয়ে। সেই একই রকম একাচোরা, কোনো রকম সামাজিক মেলামেশার সামান্যতম প্রয়োজনও বোধ করে না। পরে আমরা জানতে পেরেছি মস্কোতেও নাকি সে সব সময় এরকম চুপচাপ থাকত। আর মস্কোর কথা যদি বলা যায়, তাতেও তার আগ্রহ ছিল যৎসামান্য, তাই সেই শহরের সামান্য একটু আধটুই সে জানতে পেরেছিল, বাকি আর কিছুতে তার কোনো মনোযোগ ছিল না। একবার অবশ্য সে থিয়েটারেও গিয়েছিল, ফিরে এসেছিল নীরবে, বিরক্তির ভাব নিয়ে। তবে মস্কো থেকে যখন সে এলো তখন তার পরনে ভালো পোশাক পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্রককোট এবং অন্যান্য জামাকাপড়। অবধারিতভাবে দিনে দুবার নিজে বুরুশ দিয়ে সে তার জামাকাপড় সাফসুতর করত। তার বুটজোড়া ছিল বাছুরের চামড়ার, বেশ কায়দাদুরস্ত। সেগুলিকে সে পালিশ করতে দারুণ ভালোবাসত—বিশেষ ধরনের ইংলিশ বুটপালিশ দিয়ে বুরুশ করত, বুরুশ করতে করতে আয়নার মতো চকচকে করে ফেলত। পাচক সে হয়ে এসেছে অতি উন্নত স্তরের। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ তাকে একটা মাইনে ঠিক করে দিয়েছে। মাইনের প্রায় পুরোটাই স্মের্দিকোভ খরচ করতে লাগল জামাকাপড়, পমেড সেন্ট—ইত্যাদি বিলাসদ্রব্যের পিছনে। কিন্তু যেমন পুরুষদের প্রতি, আমার মনে হয়, তেমনি স্ত্রী জাতির প্রতিও তার ছিল নিদারুণ বিতৃষ্ণা। এমন একটা গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাদের সঙ্গে চলত যে তারা কেউ তার নাগাল পেত না। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ এখন তাকে খানিকটা অন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ঘটনা এই যে তার মূর্ছারোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। সেই রোগটা যখন হয় সেই সেই দিনে তার হয়ে রান্না করে দেয় মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না। কিন্তু সে রান্না ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের আদৌ মুখে রোচে না।

অনেক সময় তার এই নতুন পাচকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তার মুখটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে সে বলে  তোর ওই মৃগীরোগ দেখি বেড়েই

চলেছে রে? একটা কাউকে বিয়ে করে ফেললেও পারতিস। চাও তো আমি তোমার বিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু এ ধরনের কথায় স্মের্দিকোভের মুখ কেবল বিরক্তিতে ফ্যাকাশে হয়ে যেত, কোনও জবাব সে দিত না। এরপর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ও হাল ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে যেত। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে ওর সততায় ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের আস্থা ছিল, চিরকালের জন্য তার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে ছেলেটা কোনও জিনিস পড়ে থাকলেও নেবে না, কোনও কিছু চুরি করবে না। একবার এমন হয়েছিল যে মাতাল অবস্থায় ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ যখন অসতর্ক ছিল তখন তার অজ্ঞাতে কোনো এক সময় তার নিজেরই বাড়ির উঠোনে জলকাদার মধ্যে পড়ে তিনটে একশ টাকার রংবেরংয়ের কাগজের নোট হারিয়ে যায়। টাকাগুলো সে সবে কোনো এক জায়গা থেকে পেয়েছিল। পরের দিনের আগে তার খেঁয়ালই হল না। সবে ছুটে গিয়ে জামাকাপড়ের পকেটগুলো খুঁজে দেখতে যাবে, এমন সময় দেখে ওই তিনটে রংবেরংয়ের কাগজই তার টেবিলের ওপর পড়ে আছে। কোথা থেকে এলো? স্মের্দিকোভ্‌ তুলে নিয়ে এসেছে, সেই গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই এনে রেখে দিয়েছে।

“না রে, মানতেই হবে তোর মতো আর কাউকে আমি কখনও দেখিনি”, এই বলে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ সেদিন তাকে দশটা রুবল পুরস্কারও দিয়েছিল।

এখানে যোগ করতে হয় যে শুধু ওর সততায় তার দৃঢ় আস্থা ছিল তা-ই নয়, এমনকি ওকে কেন যেন ভালোও বাসত, যদিও ছোকরা যেমন অন্যদের দিকে, তেমনি তার দিকেও টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাত আর সব সময় গুম মেরে থাকত। মুখ সে খুলত কদাচিৎ। এই সময় তার দিকে তাকিয়ে যদি কারও জানার ইচ্ছে হত কীসে এই ছোকরার আগ্রহ এবং সচরাচর তার মাথার মধ্যে কী কাজ করতে পারে, তাহলে সত্যি কথা বলতে গেলে কি তাকে দেখে তা স্থির করা অসম্ভব ছিল। অথচ মাঝে মাঝে দেখা যেত, বাড়িতে হোক বা বাড়ির উঠোনে হলে অন্তত সেখানেও, অথবা রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ-হঠাৎ সে কেমন যেন চিন্তিতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, থমকে মিনিট দশেক পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকছে। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ বাহ্য মুখাকৃতি দেখে লোকচরিত্র নির্ণয় করেন তাঁদের কেউ যদি এই অবস্থায় তাকে লক্ষ করে দেখেন, তাহলে বলবেন এর মধ্যে না আছে কোনো ভাবনা, না কোনো চিন্তা, যা আছে সেটা এক ধরনের আত্মমগ্ন অবস্থা। চিত্রশিল্পী ক্রাম্‌স্কোই-এর ‘আত্মমগ্ন’ নামে একটি অপূর্ব ছবি আছে, ছবিতে আঁকা আছে শীতের অরণ্য, সেই অরণ্যে বনের পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একাকী এক চাষি গায়ে লম্বা ঝুলের শতচ্ছিন্ন চাষাড়ে কোর্তা, পায়ে তার ঘরে বোনা ছালবাকলের চাষাড়ে জুতো। কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কোনো এক সুগভীর নির্জনতার মধ্যে, দেখে মনে হতে পারে যেন কোন গভীর

ভাবনায় ডুবে আছে, কিন্তু আসলে সে ভাবছে না, কোনো একটা কিছুতে তদ্‌গত হয়ে আছে। ওকে যদি ধাক্কা দেওয়া যায় তাহলে ও হয়তা চমকে উঠবে, হয়তো তোমার দিকে এমন ভাবে ফ্যালফ্যাল করে চাইবে যেন সবে তার ঘুম ভাঙল, কিছুই সে বুঝতে পারছে না। এটা ঠিক যে তার হুঁশ তক্ষুনি ফিরেও আসবে, কিন্তু তখন যদি ওকে শুধানো যায় ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কী ভাবছিল তাহলে সম্ভবত সে কিছুই মনে করতে পারবে না, কিন্তু তাহলেও তদ্‌গত হয়ে থাকার সময় যে ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা সে অবশ্যই নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে। এই ভাবগুলি কিন্তু তার কাছে পরম মূল্যবান, এগুলিকে সম্ভবত সে নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে, এমনকি অসচেতন ভাবে সঞ্চয় করে আসছে—কী কারণে, কী উদ্দেশ্যে সেটাও অবশ্যই সে জানে না: এমনও হতে পারে যে বছরের পর বছর ধরে এত সব ভাব মনের মধ্যে সঞ্চয় করার পর হঠাৎ দেখা গেল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মুক্তির সন্ধানে তীর্থযাত্রী হয়ে চলে গেল যেরুযালেমে। বলা যায় না হয়ত হঠাৎই বলা নেই কওয়া নেই তার জন্মের গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। আবার এমনও হতে পারে যে একসঙ্গে এটা ওটা দুটোই ঘটে গেল। সাধারণ লোকজনের মধ্যে এমন 'আত্মমগ্ন' কিছু সংখ্যায় যথেষ্ট। তা স্মের্দিকোভ্‌ও সম্ভবত তাদেরই একজন ছিল, সেও সম্ভবত প্রবল আগ্রহে মনের মধ্যে যত সব ভাব সঞ্চয় করে যাচ্ছিল—কেন, সেটা তার নিজেরও প্রায় জানা ছিল না।

## সাত
## বিতর্ক

কিন্তু বালাআমের গাধা হঠাৎ মুখ খুলেছে। বিষয়টা ছিল বিচিত্র। গ্রিগোরি সকালবেলায় জিনিসপত্র কিনতে ব্যবসায়ী লুকিয়ানভের দোকানে গিয়েছিল। সেখানে তার কাছ থেকে এক রুশ সৈনিকের কথা শুনে এসেছে। সৈনিকটি সুদূর কোনো এক সীমান্ত চৌকির কাছে এশীয়দের হাতে ধরা পড়ে। তারা তাকে এই বলে ভয় দেখায় যে সে যদি খ্রিস্টধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে তাহলে তাকে এক্ষুনি মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হবে। সৈনিক তার ধর্মবিশ্বাস পালটাতে রাজি হয় না। লোকগুলো যখন জীবন্ত অবস্থায় তার গায়ের ছালচামড়া ছাড়িয়ে নিতে থাকে তখন সে খ্রিস্টের নাম ও মহিমা কীর্তন করতে করতে শহিদের মৃত্যু বরণ করে। সেই দিন সকালে যে খবরের কাগজ পাওয়া গেছে সেখানেই ছাপা হয়েছে এই কীর্তিকাহিনি। খাবার টেবিলে ঠিক এই কাহিনিটিই বলছিল গ্রিগোরি। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ অমনিতেই সব সময় খাবারের পর মিষ্টির পাতে হাসিঠাট্টা ও খোশগল্প করতে ভালোবাসত—তা সে গ্রিগোরির সঙ্গে হলেও আপত্তি নেই। আজ আবার বিশেষ করে দিব্যি ঝাড়া-হাত-পা হয়ে হাল্‌কা মেজাজে আছে। ব্র্যাণ্ডিতে অল্প অল্প

করে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শোনার পর সে মন্তব্য করল গির্জার উচিত হবে সৈনিককে এই মুহূর্তে স্বর্গীয় মহিমা প্রদান করে খ্রিস্টীয় সাধু বলে ঘোষণা করা আর তার ওই ছাড়ানো চামড়াটা সংগ্রহ করে কোনো মঠে পাঠিয়ে দেওয়া: 'তাতে যেমন দঙ্গল বেঁধে লোকজন আসবে, তেমনি টাকাপয়সাও আসবে।'

গ্রিগোরি যখন দেখল এতে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মন এতটুকু গললই না, বরং এই নিয়ে চিরকালের অভ্যাসমতো সে পাষণ্ডোচিত হালকা ঠাট্টাতামাশা শুরু করে দিয়েছে তখন সে ভুরু কোঁচকাল। স্মের্দিকোভ্ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক এই সময় তাকেও হঠাৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে দেখা গেল। স্মের্দিকোভ্‌কে এর আগেও অমনিতেই বেশির ভাগ সময় খাবার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া হত, অর্থাৎ সেটা হত ডিনার শেষ হওয়ার মুখে। তবে আমাদের শহরে ইভান ফিয়োদরভিচের আগমনের সময় থেকে তাকে প্রায় রোজই ডিনারের সময় হাজির থাকতে দেখা যাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে ঠোঁট বাঁকানোটা লক্ষ করে এবং বলাই বাহুল্য সেটা যে গ্রিগোরির উদ্দেশ্যে তা বুঝতে পেরে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ জিগ্‌গেস করল, "তোর আবার কী হল?"

"আমি বলতে চাইছিলাম কি " হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে চড়া গলায় স্মের্দিকোভ্ বলতে শুরু করল, "এই যে সৈন্যটির এত সুখ্যাতি করা হচ্ছে তার কীর্তি যদি এত বিরাটই হত তাহলে আমার মনে হয়, যে যাই বলুক না কেন, এই অবস্থায় পড়ে যদি সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, যেমন ধরুন খ্রিস্টের নাম আর তার নিজের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা যদি অস্বীকারও করত তাতে কোনও পাপ হত না: এর ফলে সৎকাজের জন্য সে নিজের জীবনকে রক্ষা করতে পারত, আর তাইতে যথাসময়ে তার কাপুরুষতার পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে পারত।"

"সেটা পাপ কাজ হবে না তা কী করে হয়? বাজে কথা বললেই হল! এর জন্য সোজা তোর নরকে ঠাঁই হবে, সেখানে ভেড়ার মাংসের মতো তোকে আগুনে ঝলসাবে" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ বলে উঠল।

ঠিক এই সময়ই আলিয়োশা ঘরে ঢুকল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্, আমরা আগেও যেমন দেখেছি, এবারেও তাকে দেখে দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠল।

'বিষয়টা তোর লাইনের, তোরই লাইনের!" আলিয়োশাকে শোনার জন্য বসিয়ে দিয়ে খুশি হয়ে হি হি করে হাসতে হাসতে বলল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্।

"ভেড়ার মাংসের কথা যে বলছিলেন ওটা কিন্তু ঠিক হল না কর্তা। আরে এর জন্য ওখানে ওসব কিছুই হবে না, হওয়া উচিতও নয় যদি ন্যায়বিচার বলে কিছু থাকে" গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল স্মের্দিকোভ্।

"সেটা ন্যায়বিচার হবে? তা কেমন করে হয়?" হাঁটু দিয়ে আলিয়োশাকে ঠেলা মেরে আরও উল্লসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ।

ক্রোধে জ্বলে উঠল গ্রিগোরি, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সোজা তাকাল স্মের্দিকোভের চোখের দিকে। "ওটা একটা বজ্জাত! এছাড়া আর কী বলব!" হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

"একটু সবুর কর গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, ওসব বজ্জাত- টজ্জাত্ আপাতত রাখ," শান্ত সংযত কণ্ঠে পালটা জবাব দিল স্মের্দিকোভ্। "তার চেয়ে বরং নিজেই বিবেচনা করে দেখ, খ্রিস্টান জাতের ওপর যারা নির্যাতন চালায় একবার যখন তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছি, আর তারা যখন আমার কাছে এমন দাবি করছে যে আমি যেন আমাদের প্রভুর নামকে ধিক্কার দিই, পবিত্র খ্রিস্টধর্মে আমার দীক্ষিত হওয়ার কথা অস্বীকার করি, তখন আমার নিজের যুক্তি দিয়ে আমার তো মনে হয় সেটা করার পূর্ণ অধিকার আমার আছে, এতে কোন পাপ নেই।"

"আরে সে তো তুই আগেই বলেছিস! ওসব রং চড়ানো ছেড়ে প্রমাণ দে!" ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ চেঁচিয়ে উঠল।

"ব্যাটা রাঁধুনের আর কত বুদ্ধি হবে!" তাচ্ছিল্যভরে বিড়বিড় করে বলল গ্রিগোরি।

"ওসব রাঁধুনে-টাঁধুনেও আপাতত রাখ। বলি, গালিগালাজ না করে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বোঝার চেষ্টা কর গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্। কথাটা হচ্ছে এই যে যে-মুহূর্তে আমি আমার নির্যাতনকারীদের বললাম 'না, আমি খ্রিস্টান নই এবং আমার প্রকৃত ঈশ্বরকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি', অমনি ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারে আমি মুহূর্তের মধ্যে বিশেষ করে একজন অভিশপ্ত ও একঘরে লোক হয়ে গেলাম। অন্য জাতের একজন বিধর্মী লোকের মতো গির্জা আমাকে বের করে দিল খ্রিস্টীয় সমাজ থেকে—এমনকি এক লহমায়—এই নয় যে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, তারও আগে, যেই মাত্র বলব বলে ভেবেছি তখন থেকে, এক সেকেন্ডের সিকিভাগও যেতে না যেতে — হয়ে গেলাম জাতিচ্যুত। ঠিক বললাম কিনা, গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ?"

যদিও আসলে একমাত্র ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের প্রশ্নেরই উত্তর সে দিচ্ছিল, কিন্তু কথাগুলি গ্রিগোরিকে উদ্দেশ্য করে বলে সে স্পষ্টতই সুখ পাচ্ছিল। এটা সে বেশ ভালোমতো বুঝতেও পারছিল, তবু ইচ্ছে করেই এমন ভাব করতে লাগল যেন এই প্রশ্নগুলি গ্রিগোরিই তাকে করছিল।

"ওরে ইভান!" হঠাৎ ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ চেঁচিয়ে উঠল। "আমার কানের ঠিক কাছটায় ঝুঁকে পড় তো রে বাবা। তোর কানের জন্যেই না ওর এত সব আয়োজন! ও চায় তুই ওকে তারিফ কর। তা কর না।"

ইভান ফিয়োদরভিচ রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে বাপের ওই উচ্ছ্বসিত বার্তায় কর্ণপাত করল।

'দাঁড়া রে স্মের্দিকোভ্, একটু থাম", ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আবার চেঁচিয়ে উঠল।

‘ইভান, আরও একবার আমার কানের ঠিক কাছটায় ঝুঁকে পড় তো বাবা। শোন্ কী বলছে।’’

এবারেও ইভান রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে বাপের কথা শুনে যথাস্থানে ঝুঁকে পড়ল।

‘‘যেমন আলিয়োশাকে, তেমনি তোকেও আমি ভালোবাসি। তুই মনে করিস না যে আমি তোকে ভালোবাসি না। একটু ব্র্যান্ডি চলবে কি?’’

‘‘তা দিন।’’

তারপর বাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ মনে মনে বলল, ‘নিজে তো দেখছি বেশ টং হয়ে আছেন।’

স্মের্দিকোভ্‌কে কিন্তু সে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করতে লাগল।

‘‘তুই জাত খুইয়েছিস! উচ্ছন্নে গেছিস হারামজাদা!’’ গ্রিগোরি হঠাৎ ফেটে পড়ল। ‘‘ওরে হতভাগা, এর পরও কিনা তোর এতদূর আস্পর্ধা যে তর্ক করিস, যদি

‘‘গালাগাল দিয়ো না গ্রিগোরি, গালাগাল দিয়ো না!’’ বাধা দিয়ে বলল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্।

‘‘তুমি আরেকটু অপেক্ষা কর গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্—অন্তত সামান্য এই এতটুকু সময় দাও, এর পরের কথাগুলো মন দিয়ে শোন, কেন না আমার সব কথা এখনও শেষ হয়নি। আমার কথা হল, যে-মুহূর্তে ঈশ্বরের অভিশাপ আমার ওপর এসে পড়ল ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই চরম মুহূর্তটিতে আমার খ্রিস্টানত্ব ঘুচে গেল, আমি তখন বিধর্মী বলতে যা বোঝায় অমনিতেই কতকটা তা-ই হয়ে যাচ্ছি, দীক্ষালাভের ফলে যে সব নৈতিক বাধ্যবাধকতা আমার ছিল তা আমার ওপর থেকে উঠে যাচ্ছে, খ্রিস্টধর্মের কোনো বিধিই আর আমার ওপর খাটছে না। তাই কিনা?’’

‘‘শেষ কর হে ছোকরা, তাড়াতাড়ি শেষ কর’’, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাড়া দিয়ে বলল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ।

‘‘আমি যদি খ্রিস্টান না-ই হই, আমার খ্রিস্টানত্ব যখন ঘুচেই গেল তখন, দাঁড়াচ্ছে এই যে ‘আমার ওপর যারা অত্যাচার চালাচ্ছিল তারা যখন আমাকে জিগ্‌গেস করল আমি খ্রিস্টান কিনা তখন তার উত্তরে আমি যা বললাম তাতে মিথ্যে কথা বলা হল কোথায়? আমার খ্রিস্টানত্ব তো ইতিমধ্যে স্বয়ং ঈশ্বরই ঘুচিয়ে দিয়েছেন, সেটা তিনি করেছেন আমি যে মনে মনে মতলব করেছিলাম স্রেফ সেই কারণে, আমি আমার অত্যাচারীদের কাছে মুখ ফুটে কথাটা বলার ফুরসতও পাইনি—তারও আগে। আর বরখাস্তই যদি হয়ে গেলাম তাহলে কী উপায়ে, কোন্ বিচারে খ্রিস্টকে অস্বীকার করার জন্য পরলোকে একজন খ্রিস্টানের বেলায় যেমন হয় তেমনি আমার কাছ থেকেও কৈফিয়ত দাবি করা হতে পারে যখন অস্বীকার করারও আগে অমনিতেই একমাত্র মনে মনে চিন্তা করেছি বলে খ্রিস্টানত্ব ইতিমধ্যে চলে গেছে? আমি যখন

আর খ্রিস্টানই নই তখন খ্রিস্টকে পরিত্যাগও আমি করতে পারি না, যেহেতু তখন পরিত্যাগ করার মতো কিছু আমার থাকছেও না। একটা ম্লেচ্ছ তাতার যে খ্রিস্টান হয়ে জন্মায়নি এর জন্যে — হলই না হয় স্বর্গরাজ্যে—কে তার কাছ থেকে কৈফিয়ত দাবি করতে যাবে তুমিই বল দেখি গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ? একটা বলদের গা থেকে যেমন দুটো ছাল ছাড়ানো যায় না এই যুক্তিতে বল দেখি কেই বা এর জন্য তাকে শাস্তি দিতে যাবে? তাছাড়া ওই তাতার যখন মারা যাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে যদি তার কাছ থেকে কৈফিয়ত দাবি করেনও, তবে আমার ধারণা, যেহেতু তাকে একেবারে শাস্তি না দেওয়াটা উচিত হবে না সেই কারণে শাস্তির মাত্রাটা খুবই সামান্য হবে, কেননা তাঁর বিবেচনায় মনে হবে লোকটা যদি ম্লেচ্ছ মা বাবার ম্লেচ্ছ সন্তান হয়েই এই পৃথিবীতে এসে থাকে সেজন্য তো আর তাকে দোষ দেওয়া যায় না! প্রভু ঈশ্বর তো তাই বলে একজন তাতারকে জোর করে চেপে ধরে তার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারেন না যে লোকটা খ্রিস্টান ছিল। তাহলে এর অর্থ হত সর্বশক্তিমান প্রভু ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন। কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্যের অধিপতি সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর কি কখনও মিথ্যে বলতে পারেন, এক বর্ণও মিথ্যে বলতে পারেন?"

গ্রিগোরির চোখ কপালে উঠে গেল, স্তম্ভিত হয়ে সে তাকিয়ে রইল বক্তার মুখের দিকে। কী বলা হচ্ছে যদিও সে ভালোমতো বুঝতে পারছিল না, তবু এত সব ছাইভস্মের ভেতর থেকে হঠাৎ কী যেন একটা তার কাছে ধরা পড়ল। আচমকা দেয়ালে কপাল ঠুকে গেলে একটা মানুষের যে অবস্থা হয় সেও সেই রকম থমকে গেল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ মদের গেলাসটা শেষ করে কর্কশস্বরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

"আলিয়োশা, ওরে আলিয়োশা, কেমন বুঝছিস! ওরে আমার কুতার্কিক ক্যাজুইস্ট! নির্ঘাত কোথাও ভণ্ড ধার্মিক যেজুইটগুলোর" পাল্লায় পড়েছিল, বুঝলি ইভান। ওরে আমার কূটতার্কিক যেজুইট! তুই পূতিগন্ধ ছড়াচ্ছিস স্মের্দিকোভ্! কে তোকে এসব শেখাল বল তো? তবে যা-ই বলিস না কেন তর্কচূড়ামণি ক্যাজুইস্ট, তুই যা বলছিস তা মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! আহা গ্রিগোরি, কাঁদিস নে, আমরা এখনই এই মুহূর্তে ওকে তুলোধুনো করে ছাড়ছি। ওরে গর্দভ, তুই আমাকে একটা কথা বল দেখি: তোর অত্যাচারীদের সামনে তুই যা করলি তা না হয় ঠিকই হল, কিন্তু হাজার হোক, তুই নিজে তো মনে মনে তোর ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছিস! নিজের মুখেই তো বললি যে সেই মুহূর্তেই জাত খুইয়ে উচ্ছন্নে গেছিস। তা জাত যখন একবার খুইয়েছিস তখন এর জন্য তোকে নরকে তোর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবে না। এই বিষয়ে কী বলেন আমাদের তর্কচূড়ামণি যেজুইট?"

"আমি নিজেই যে ভেতরে ভেতরে ধর্মত্যাগ করেছি তাতে কোনো সন্দেহ

নেই, কিন্তু তবু বলি, বিশেষ কোনো পাপ তাতে হয়নি, আর পাপ যদি হয়েও থাকে সেটা অতি সাধারণ।"

"অতি সাধারণ? বললেই হল!"

"উচ্ছন্নে যা তুই, মিথ্যেবাদী কোথাকার!" জ্বালাধরা কণ্ঠে হিসহিস করে বলে উঠল গ্রিগোরি।

"নিজেই ভালো করে ভেবে দেখ, গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্", নিজের বিজয় সম্পর্কে সচেতন হলেও পরাজিত প্রতিপক্ষের প্রতি অনেকটা যেন মহানুভবতাবশতই গম্ভীর অবিচলিত কণ্ঠে স্মের্দিকোভ্ বলে চলল, "নিজেই ভালো করে ভেবে দেখ, গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ পবিত্র ধর্মগ্রন্থেই না বলা হয়েছে যে তোমার যদি অতি ক্ষুদ্র সরষে দানা পরিমাণও বিশ্বাস থাকে, তুমি সেই বিশ্বাস নিয়ে যদি কোনো পাহাড়কে তার জায়গা ছেড়ে সমুদ্রে গিয়ে ডুব দিতে বল তাহলে পাহাড় — এতটুকু দেরি না করে তোমার হুকুমমাত্র কাজ করবে। তাহলে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, আমি না হয় ঘোর অবিশ্বাসী, কিন্তু তুমি যে এত বড়ো ধর্মবিশ্বাসী যে আমাকে উঠতে বসতে গালাগালও দিয়ে যাচ্ছ, তুমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখ না, ওই পাহাড়টাকে গিয়ে বল না—সমুদ্রের কথা না হয় বাদই দিলাম, কেননা সমুদ্র এখান থেকে অনেক দূরে—ওর জায়গা ছেড়ে উঠে এসে আমাদের বাগানের পিছনে দুর্গন্ধময় নালামতন আমাদের এই যে ছোটো নদীটা বয়ে চলেছে অন্তত এখানেই ডুব দিক? কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের চোখেই দেখতে পাবে উঠে আসার কোনও নাম নেই, যেমনকার তেমন অটুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা তুমি যতই চেঁচাও আর যা-ই কর না কেন। তার মানে, উপযুক্ত পরিমাণ বিশ্বাস তোমারও নেই গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, অথচ ওই বিশ্বাসের অভাবের জন্যে অন্যদের কত ভাবেই না গালাগাল করছ! কেবল তুমি কেন, আমরা যদি তা-বড় তা-বড় মানুষ থেকে শুরু করে অতি সাধারণ চাষাভুসোদেরও ধরি, তাহলেও দেখতে পাব আমাদের কালে এমন কেউ নেই, একেবারেই নেই যে পাহাড়কে ঠেলে সমুদ্রে ফেলে দিতে পারে, হয়তো বা সারা দুনিয়ায় সাকুল্যে একজন, বড়ো জোর দুজন মানুষ ছাড়া যাঁরা আবার মিশরের কোনো এক নির্জন মরুভূমির এমন কোথাও গোপনে মুক্তির সাধনা করছেন যে তাঁদের সন্ধানই তুমি পাবে না, আর তা-ই যদি হয়, যখন দেখা যাচ্ছে বাদবাকি সকলেই অবিশ্বাসী, তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে যাকে আমরা করুণাময় বলে এত করে জানি আমাদের সেই প্রভু বাকি সকলকে, অর্থাৎ ওই জনা দুয়েক তপস্বী ছাড়া দুনিয়াসুদ্ধু আর সবাইকে অভিশাপ দেবেন, কাউকেই ক্ষমা করবেন না? ঠিক এই কারণেই আমি এই আশা বুকে ধারণ করে আছি যে আমি যদি একবার সন্দেহ প্রকাশ করে থাকিও, যখন অনুতপ্ত হয়ে চোখের জল ফেলব তখন তাঁর ক্ষমা থেকে আমি বঞ্চিত হব না।"

'দাঁড়া!" পরম পুলকিত হয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্।

"তাহলে এটা অন্তত তুই মনে করিস যে দুজন মানুষ আছে যারা পাহাড় টলাতে পারে? আছে তো? লিখে রাখ ইভান, লিখে তলায় ভালো করে দাগিয়ে রাখ। এই তো বেরিয়ে এসেছে পুরো রুশ মানুষটা।"

"একদম ঠিক ধরেছেন—জাতির ধর্মবিশ্বাসের এটাই বৈশিষ্ট্য", অনুমোদনসূচক হাসি হেসে ইভান ফিয়োদরভিচ স্বীকার করল।

"মেনে নিচ্ছিস তা হলে? তুই যদি মেনে নিস তাহলে তা-ই বলতে হবে। হ্যাঁ রে আলিয়োশা। তুই কী বলিস? সত্যি কিনা? রুশ ধর্মবিশ্বাস তা হলে ঠিক এই রকম?"

"না, স্মের্দিকোভের যেটা বিশ্বাস সেটা আদৌ রুশ ধর্মবিশ্বাস নয়", গুরুগম্ভীর ভাবে দৃঢ় কণ্ঠে আলিয়োশা বলে উঠল।

"আমি ওর ধর্মবিশ্বাসের কথা বলছি না, আমি বলছি ওই দুই তপস্বী সম্পর্কে ও যা বলছে তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে সে কথা—একমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যের কথা। এটা তো রুশি? রুশি কিনা?"

"হ্যাঁ, এই বৈশিষ্ট্যটা একেবারেই রুশি।" আলিয়োশা হাসল।

"তোর কথার দাম একটা সোনার মোহর রে গর্দভ। আজই তুই পেয়ে যাবি। তবে যাই বলিস না কেন তোর বাকি সব কথা মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! জেনে রাখ হাঁদারাম, ধর্মবিশ্বাসে আমাদের যে ঘাটতি আছে তার একমাত্র কারণ আমাদের চঞ্চল মতি, কারণ আমাদের সময় নেই। প্রথমত আমাদের কাজের চাপ, দ্বিতীয়ত, ভগবান সময় দিয়েছেন বড়ো কম—দিনে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা — এত কম যে ভালোমতো ঘুমানোর ফুরসত নেই, পাপের জন্য অনুতাপ করব কখন? কিন্তু তুই? তোর অত্যাচারীদের কবলে পড়ে ধর্মত্যাগ করেছিস, যখন ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু তোর ভাবার ছিল না ঠিক তখনই তো তোর ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। সেখানেই হল কথা। আমার তো তাই মনে হয়।"

"হল ত হল, কিন্তু নিজেই একবার বিবেচনা করে দেখ গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, কথাটা সেখানে বলেই না পাপের গুরুত্বটাও কমে যাচ্ছে। যতটা ধর্মবিশ্বাস থাকা উচিত সত্যি সত্যি সেই পরিমাণ ধর্মবিশ্বাস যদি তখন আমার থাকত তাহলে তখন বাস্তবিকই মহাপাপ হত যদি নিজের বিশ্বাসের খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ না করে আমি ম্লেচ্ছ মোহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করতাম। কিন্তু ওই অত্যাচার অবধি তখন তো গড়াতেই পারত না, কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে এই পাহাড়টাকে আমার একবার মুখ ফুটে বললেই হত: 'এদিকে চলে আয়, অত্যাচারীকে চেপ্‌টে দে'—তা হলেই সে এগিয়ে আসত, মুহূর্তের মধ্যে একটা আরশোলাকে চেপ্‌টে দেবার মতো করে তাকে চেপ্‌টে দিত, আর আমিও যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে দিব্যি সেখান থেকে চলে যেতে পারতাম ঈশ্বরের গুণগান করতে করতে। কিন্তু যদি দেখা যায় ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি এসবই পরীক্ষা করে দেখলাম, উদ্দেশ্য নিয়েই চেঁচিয়ে পাহাড়টাকে ডেকে বললাম 'এই অত্যাচারীগুলোকে চেপ্‌টে দে!' অথচ কোথায়?

পাহাড় তো এগিয়ে এলো না! — তাহলে আপনারাই বলুন দেখি, তখন আমার মনে সন্দেহ জাগবে না কেন?— তাও আবার কিনা মৃত্যুভয়ের অমন একটা বিভীষিকাময় মুহূর্তে! তাছাড়া ইতিমধ্যে আমার জানাও হয়ে গেছে যে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য পুরোপুরি লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, যেহেতু পাহাড় আমার কথায় নড়ল না— তার মানে আমার ধর্মবিশ্বাসের ওপর ওপারে তেমন একটা আস্থা নেই, আর পরকালে তেমন একটা বড়ো পুরস্কার আমার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। যখন কোনও উপকারই নেই তাহলে আর মিছিমিছি ছালচামড়া ছাড়াতে দিই কেন? দেখাই তো যাচ্ছে আমার পিঠের ছালচামড়া যদি ওরা অর্ধেকটাও ছাড়িয়ে ফেলে তবু আমার কথায় বা আমার চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাহাড়টা এক পাও নড়বে না। এরকম একটা মুহূর্তে মনের মধ্যে শুধু যে সন্দ দেখা দিতে পারে তা-ই নয়, মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি পর্যন্ত লোপাট হয়ে যেতে পারে, ফলে চিন্তাভাবনা করাও একেবারেই অসম্ভব। এই যখন অবস্থা, তখন না ইহলোকে না পরলোকে কোথাও কোনও সুবিধা বা পুরস্কারলাভের আশা দেখতে না পেয়ে আমি যদি অন্তুতপক্ষে আমার পিঠের চামড়াটাও বাঁচাতে যাই সেখানে আমার বিশেষ কী অপরাধ হল শুনি? তাই প্রভুর করুণার ওপর পুরোপুরি ভরসা রেখে আমি মনে মনে এই আশা পোষণ করি যে তিনি আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেবেন।

## আট

## ব্র্যাণ্ডির টেবিলে

তর্ক শেষ হল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ এতক্ষণ দিব্যি খোশমেজাজে থাকার পর একেবারে শেষে হঠাৎই গম্ভীর হয়ে ভুরু কোঁচকাল। ভুরু কুঁচকে আরও খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢালল। এই গেলাসটাই কিন্তু মাত্রার একদম বাইরে হয়ে গেল।

"যত সব কুতার্কিকের দল। হট এখান থেকে, ভাগ!" ভৃত্যদের উদ্দেশে সে চেঁচিয়ে বলল। "চলে যা স্মের্দিকোভ্। মোহর দেব বলে কথা দিয়েছিলাম, আজই পাঠিয়ে দেব, এখন যা। আর এই যে গ্রিগোরি, কান্নাকাটি করে কাজ নেই, মার্ফার কাছে চলে যাও, সে তোমাকে সান্ত্বনা দেবে, ঘুম পাড়িয়ে দেবে। খাওয়াদাওয়ার পর যে একটু শান্তিতে বসব এই ব্যাটাচ্ছেলেদের জ্বালায় কি তার জো আছে!" তার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যরা সরে পড়লে বিরক্তির সঙ্গে সে হঠাৎ বলে উঠল। "স্মের্দিকোভ্ এখন থেকে দেখছি ডিনারের সময় রোজ এখানে ঢুঁ মারছে। তোকে নিয়েই ওর এত কৌতূহল। কী দিয়ে ওর মন জয় করলি বল তো?" ইভান ফিয়োদরভিচকে উদ্দেশ করে সে যোগ করল।

"কিছু দিয়েই নয়", সে জবাব দিল। "কী ভেবে কে জানে, আমার সম্পর্কে

শ্রদ্ধা পোষণ করে। একটা চামচা, ইতর প্রকৃতির লোক। সামনের সারির বলির পাঁঠা —অবশ্য যথাসময়ে প্রকাশ পাবে।"

"প্রথম সারির?"

"অন্যেরাও থাকবে, এর চেয়ে উন্নতস্তরের লোকেরাও থাকবে, কিন্তু ওর মতো লোকও থাকবে। গোড়ায় এদেরই দেখা যাবে, যারা একটু উন্নত স্তরের তারা এদের পরে আসবে।"

"কিন্তু সেই সময়টা কখন আসবে?"

"হাউই জলে উঠবে ঠিকই, আবার কে জানে হয়তো নিঃশেষে নাও জ্বলতে পারে। সাধারণ লোকে এই সব রাঁধুনি-টাঁধুনির কথা এখনও শুনতে তেমন একটা ভালোবাসে না।"

"তা না হয় হল রে, ওর মতো বালাআমের গাধারাই কিন্তু কেবল ভাবে আর ভাবে, ভাবতে ভাবতে ভাবতে কতদূর পর্যন্ত সে যেতে পারে কে জানে ছাই!"

"আইডিয়া জমাচ্ছে।" মৃদু হাসল ইভান।

"দ্যাখ আমি ঠিক জানি ও আমাকেও দু চক্ষে দেখতে পারে না, ঠিক যেমন দেখতে পারে না আর দশজনকে। আর তোকেও ঠিক তেমনি, যদিও তোর মনে হচ্ছে কী ভেবে কে জানে ওর মাথায় তোকে শ্রদ্ধা করার খেয়াল চেপেছে। আলিয়োশাকে তো কথাই নেই, ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তবে হ্যাঁ, চুরি চামারি করে না এটা ঠিক, নিন্দাচর্চা করে না, মুখ বুজে থাকে, হাটে হাঁড়ি ভাঙার লোক নয়, চমৎকার মাংসের পুর দেওয়া রুটি বানাতে পারে, তা সে যাক গে, মরুক গে, জাহান্নামে যাক ব্যাটা, সত্যিই তো ও কি একটা আলোচনার যোগ্য লোক?"

"অবশ্যই নয়।"

"আর ওই ভেতরে ভেতরে মতলব পাকানোর প্রসঙ্গে বলতে হয় মোটের ওপর রুশ চাষাভুসোগুলোকে চাবকে সিধে রাখতে হয়। এটা আমি বরাবরই বলে আসছি। আমাদের চাষাভুসোগুলো একেকটা ঠগ, ওদের দয়ামায়া করার কোনো মানে হয় না। এখনও যে ওদের মাঝে মাঝে ধরে বার্চগাছের ডাল দিয়ে ধোলাই দেওয়া হয় সেটা ভালোই বলতে হবে। আমাদের রুশদেশের মাটির সম্পদ তার বার্চ গাছ। বার্চগাছের ডাল ওদের পিঠে আছড়ে মারতে গিয়ে বার্চবন যদি উজাড় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু রুশ দেশেরও হয়ে গেল। আমি বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষে। আমরা আজকাল বেশি বুদ্ধিমান হয়েছি, তাই চাষাভুসোদের চাবুক মারা বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের চাবকাচ্ছে। তা সেটা ভালোই করছে। 'যে পরিমাপ তুমি গ্রহণ করিবে তদ্দারা তোমারও পরিমাপন হইবে'—* ওই গোছেরই কী একটা

---

* মথিলিখিত সুসমাচার ৭:২

কথা আছে না? এক কথায়, ‘পরিমাপন হইবে’। কিন্তু রাশিয়া হল গিয়ে একটা শুয়োরে কারবার। ওরে, কী আর বলব তোকে, তুই যদি জানতিস রাশিয়াকে আমি কী পরিমাণ ঘেন্না করি মানে, রাশিয়াকে ঠিক নয়, তার যত দোষ আছে সেইগুলোকে বলা যায় না, হয়তো রাশিয়াকেও। Tout cela c'est de la cochonnerie। সবই হল শুয়োরেপনা জানিস, আমি কী পছন্দ করি? আমি রসিকতা পছন্দ করি।”

“আরও এক গেলাস খেলেন। অনেক হয়েছে, আর নয়।”

“দাঁড়া, আরেকটা, তারপর আরও একটা—ওখানেই শেষ করব। না, দাঁড়া, তুই আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলি। মোক্রয়ে হয়ে যাবার পথে আমি সেখানে এক বুড়োর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে বুড়ো আমায় বললে আমরা বেশির ভাগ সময় ছুকরি মেয়েদের চাবুক পেটা করে শাস্তি দিতে ভালোবাসি। তা চাবুক পেটা করার ভারটা ছেলেছোকরাদের হাতেই ছেড়ে দিই। এর পরই, আজ যে ছোকরা চাবুক পেটা করল দেখা কাল সে-ই আবার ওই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইছে। আমাদের এখানকার ছুকরিগুলোও এতে ভারি অভ্যস্ত।’ আহা, এ যে দেখছি একেকটি মার্কি দ্য সাদ[৩২], অ্যাঁ! তা যাই বল না বাপু, রসবোধ আছে বলতে হবে। আমাদেরও একবার গিয়ে দেখে আসলে কেমন হয়, অ্যাঁ? কী হল রে আলিয়োশা, লাল হয়ে উঠলি নাকি? লজ্জা পাবার কিছু নেই বৎস। দুঃখের কথা আজ মঠাধ্যক্ষের ওখানে ভোজের টেবিলে আমার আর বসা হল না, সন্ন্যাসীদের কাছে মোক্রয়ের ছুকরিগুলোর গল্পও বলা হল না। ওরে আলিয়োশা, তোর মঠাধ্যক্ষকে আজ আমি যে অমন অপমান করে ফেলেছি সেজন্য রাগ করিস নে। রাগ হলে আমি আবার সামলাতে পারি নে রে। ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি কোনো অস্তিত্ব থাকে, তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই দোষ আমার, আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, কিন্তু তিনি যদি না থাকেন, আদৌ না থাকেন তাহলে তোর ওই বাবাজিগুলোকে আরও বেশ খানিকটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, বুঝলি তো? সেক্ষেত্রে ওগুলোর মুণ্ডু কাটাই যথেষ্ট নয়, কেন না ওরা উন্নতির পথে বাধ সাধছে। বিশ্বাস কর ইভান, এটা আমার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। না, তুই বিশ্বাস করিস না, তা আমি তোর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। তুই লোকের এই কথায় বিশ্বাস করিস যে আমি একটা ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নই। আলিয়োশা, তুই বিশ্বাস করিস যে আমি শুধু একটা ভাঁড় নই?”

“বিশ্বাস করি যে শুধু একটা ভাঁড় নও।”

“বিশ্বাস করি যে বিশ্বাস করিস, অন্তর থেকে বলছিস। অন্তর দিয়ে দেখছিস, অন্তর থেকে বলছিস। কিন্তু ইভান তা করে না। ইভানটা হল গিয়ে দাম্ভিক। যাই বলিস না কেন, তোর ওই মঠের বাবাজিগুলোকে পারলে শেষ করে দিতাম। এক ধাক্কায় সারা রাশিয়া থেকে যত বুজরুকি সাবাড় করে ছাড়তাম, তাতে সবগুলো

বোকাহাঁদাকে পুরোপুরি যুক্তির পথে আনা যেত। আর সোনাদানা? কতই না জমা পড়ত আমাদের সরকারের টাকশালে!

"কিন্তু সাবাড় করে কী হবে?" ইভান বলল।

"যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সত্যের আলো প্রকাশ পায়—এই জন্যেই তো।"

"আরে সেই সত্যের আলো যদি প্রকাশ পায় তাহলে প্রথম ধাক্কাতে, সবার আগে তো তোমারই সর্বস্ব লুটপাট হয়ে যাবে—তারপর তুমিই সাবাড় হবে।"

"বাঃ! কিন্তু কথাটা বোধহয় তুই ঠিকই বলেছিস ওঃ, আমি একটা গাধা!" আলতো করে কপাল চাপড়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্। "তাই যদি হয় তাহলে থাক রে আলিয়োশা, তোর ওই মঠ যেমন আছে তেমনিই থাক। আর আমরা, বুদ্ধিমান লোকেরা দিব্যি আরাম করে বসে বসে ব্র্যান্ডির সদ্ব্যবহার করব। তুই জানিস ইভান, আমার তো মনে হয় স্বয়ং ভগবান নির্ঘাত ইচ্ছে করেই এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কী বলিস? আচ্ছা ইভান, সত্যি করে বল তো ভগবান আছেন কি নেই? দাঁড়া, ঠাট্টা নয়, সত্যি করে বলবি কিন্তু? ওই দেখ, আবারও হাসছিস যে?"

"হাসছি, পাহাড় টলাতে পারে এমন দুই মহাপুরুষের অস্তিত্বে স্মের্দিকোভের বিশ্বাস নিয়ে এই সবে যে একটা চতুর মন্তব্য আপনি করেছিলেন তার কথা ভেবে।"

"বলতে চাস, এখন আমাকেও ওর মতন মনে হচ্ছে?

"খুবই মনে হচ্ছে।"

"তার মানে বলতে চাস আমিও একজন রুশ মানুষ, আমারও বিশেষত্ব সেই রুশ চরিত্রের বিশেষত্ব। তাহলে তুই যে একজন দার্শনিক, ওই ভাবে দেখতে গেলে তোরও ওরকম বৈশিষ্ট্য ধরে ফেলা যায়। যদি চাস তো ধরি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি কালই ধরে দেখিয়ে দেব। না, না, তবু, বল না, ভগবান আছেন কি নেই? শুধু যা বলবি গুরুত্ব দিয়ে বলবি। আমার এখন এটা সত্যি সত্যি দরকার।"

"না, ভগবান নেই।"

"কী রে আলিয়োশা, ভগবান আছেন?"

"আছেন বৈ কি।"

"আচ্ছা ইভান, অমরত্ব? অমরত্ব আছে কি?—ধর কোথাও কোনো না কোনো ধরনে?—অন্তত ছিটেফোঁটা, সামান্য একরত্তি হলেও?"

"অমরত্ব নেই।"

"কোনো রকম নেই?"

"কোনও রকমই নেই।"

"মানে, পুরোপুরি শুন্যি, নাকি সামান্য কিছু? হয়তো সামান্য কিছু হলেও আছে? হাজার হোক নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো!"

"পুরোপুরি শুন্যি।"

"আলিয়োশা, তুই কী বলিস? অমরত্ব আছে?"

"আছে।"

"আর ঈশ্বর ও অমরত্ব?"

"ঈশ্বরও আছেন, অমরত্বও আছে। ঈশ্বরের মধ্যেই আছে অমরত্ব।"

"হুম্। না, খুব সম্ভব ইভানের কথাই সত্যি। হা ভগবান, একবার শুধু ভেবে দ্যাখ, মানুষ কত না বিশ্বাস করে এমন একটা স্বপ্নের পেছনে কতশত শক্তিই না খরচ করেছে—কী বিরাট অপব্যয়! আর এত সব কান্ড করেছে কিনা হাজার হাজার বছর ধরে! কে সে, যে মানুষকে নিয়ে এমন মশকরা করছে? ইভান! এই শেষ বার, চূড়ান্ত ভাবে আমি জিগ্‌গেস করছি ঈশ্বর আছেন কি নেই? এই শেষবার!"

"শেষবারই বলছি, নেই।"

"কে তাহলে মানুষকে নিয়ে মশকরা করছে ইভান?"

"শয়তান হবে।" ইভান ফিয়োদরভিচ মুচকি হাসল।

"শয়তান আছে নাকি তাহলে?"

"না, শয়তানও নেই।"

"কী দুঃখের কথা! যে মানুষ প্রথম ঈশ্বরকে বানিয়েছে তাকে যদি একবার হাতের কাছে পেতাম তাহলে যে কী করতাম শয়তানই জানে! একটা কাঁটাগাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিলেও শাস্তিটা কম হয়।"

"মানুষ যদি ঈশ্বরকে না বানাত তাহলে সভ্যতা বলেও আদৌ কিছু থাকত না।"

"থাকত না? ঈশ্বরকে ছাড়া থাকত না বলছিস?"

"না, থাকত না। ব্র্যান্ডিও থাকত না। তা যাই হোক আপনার ব্র্যান্ডির বোতলটা দিন, এবারে কিন্তু সরিয়ে নিতে হচ্ছে।"

"আরে না না, লক্ষ্মীটি দাঁড়া, আরেক গেলাস খেয়ে নিই। আমি আলিয়োশার মনে দুঃখ দিয়েছি। তুই রাগ করিস নি তো আলেক্সেই? আহা, লক্ষ্মী ছেলে আমার আলেক্সেই, বাপধন আমার!"

"না, রাগ করি নি। আমি আপনার মনের ভাব জানি। আপনার মনটা আপনার মাথার চাইতে ভালো।"

"আমার কথা বলছিস? বলছিস আমার মনটা আমার মাথার চাইতে ভালো? ঈশ্বর, কার মুখে শুনছি একথা? ইভান, তুই ভালোবাসিস আলিয়োশাকে?"

"ভালোবাসি।"

"ভালোবাসবি ওকে, ভালোবাসবি।"

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ বেশ ভালোমতো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সে বলে চলল, "শোন আলিয়োশা, আজ সকালে তোর মহাস্থবিরের সঙ্গে আমি অভদ্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমি তখন একটা উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম। তবে যাই বলিস না

কেন, মহাস্থবিরের বেশ রসিকতাবোধ আছে কিন্তু, তোর কী মনে হয় ইভান?"

"সম্ভবত আছে।"

"আছে মানে, আলবত আছে, il y a du piron là dedans—এখানে পিরোনকে টের পাওয়া যাচ্ছে। বুড়ো আসলে একজন কূটতার্কিক জেজুইট্—রুশি ধাঁচের আর কি। কোনও মহৎ প্রাণের বেলায় যেমন দেখা যায়, তেমনি তাঁর ভেতরেও গোপনে গোপনে ফুঁসছে এক ধরনের ঘৃণা আর ক্রোধ—এই ভেবে যে তাঁকে অভিনয় করতে হচ্ছে, পবিত্র অঙ্গবস্ত্র গায়ে জড়াতে হচ্ছে।"

"কিন্তু উনি ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন!"

"এক বিন্দুও নয়। তুই জানতিস না বুঝি? আরে নিজে একথা সবাইকে বলেও ত—মানে সকলের কাছে কি আর বলে? — বলে সেই সব বুদ্ধিমান লোকজনের কাছে, যারা ওর কাছে আসে। গভর্নর শুল্‌ৎসকে ত সোজাসুজি বলেইছিল 'Credo' — হ্যাঁ বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু কীসে যে বিশ্বাস করি তা জানিনে।"

"বলেন কী?"

"তাহলে আর কী বলছি? কিন্তু আমি ওকে সম্মান করি। ওর ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা মেফিস্টোফেলিস ধরনের, কিংবা আরও ভালো হয় যদি বলি 'আমাদের সময়কার নায়ক' -এর [৫] ওই যে আর্বেনিন না কে যেন অনেকটা তার মতন মানে তাহলেই দেখছিস কামনা বাসনা তার ঠিকই আছে, বড়ো বেশি পরিমাণে আছে। আমার মেয়ে বউ থাকলে তো বাপু পাপস্বীকারের জন্য ওর কাছে গেলে আমি ভয়ে ভয়েই থাকতাম। জানিস, যখন কথা শুরু করে এই তো গত বছরের আগের বছর চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল আমাদের। চা ছিল, সেই সঙ্গে দামি লিকিয়োরও দিল—বড়ো ঘরের ভক্ত দিদিমণিরা ওকে পাঠান কিনা—তা সেখানে পুরনো দিনের এমন সব গল্প আমাদের বলতে শুরু করল যে শুনে আমাদের পেটে খিল ধরে যায় আর কি! বিশেষ করে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মেয়েলোককে কী ভাবে সারিয়েছিল সেই গল্পটা। তাকে বলেছিল, 'আমার পায়ে যদি ব্যথা না থাকত তাহলে আমি আপনাকে একটা নাচ নেচে দেখাতাম।' কী? কেমন মনে হচ্ছে? বলেছিল, 'বয়সকালে আমি ঘাটে ঘাটে কম ঘুরি নি।' ব্যাবসাদার দেমিদভের কাছ থেকে ষাট হাজার ঝেড়েছে।"

"বলেন কী? চুরি করেছে?"

"লোকটা ভালোমানুষ মনে করে টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়েছিল, বলেছিল, 'যত্ন করে রেখে দাও ভাই, কাল আমার বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি হবে।' খুব যত্ন করেই রেখে দিল বটে। পরে সে টাকা ফেরত চাইতে এলে বললে, 'কীসের টাকা? ও টাকা তো তুই গির্জাকে দান করেছিস।' আমি তাকে বললাম: 'তুমি একটা পাজির পা ঝাড়া।' বলে কি, 'না, তা কেন হতে যাব? আমি লোকটা আসলে দরাজ।'... ওহো, লোকটা সে নয়, সেটা অন্য লোক। আমি আরেকজনের সঙ্গে গুলিয়ে

ফেলেছি। ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। হয়েছে, আরও এক পাত্তর, অনেক হয়েছে। বোতলটা সরিয়ে নে ইভান। আমি মিথ্যে কথা বলছিলাম, তা তুই আমাকে থামিয়ে দিলি না কেন, ইভান বললি না কেন যে আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

"জানতাম যে আপনি নিজেই এক সময় থামবেন।"

"বাজে কথা বলছিস। আমার ওপর তোর বিদ্বেষ আছে, স্রেফ বিদ্বেষ আছে বলেই তুই এটা করেছিস। তুই আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিস। আমার বাড়িতে এসেছিস, আমার বাড়িতে বাস করছিস, আমাকেই কিনা হ্যাটা করা?"

"বেশ তো আমি চলে যাব। ব্র্যান্ডি আপনাকে ধরেছে কিন্তু।"

"আমি তোকে এত করে বললাম, খ্রিস্টের দোহাই, একবার চের্‌মাশ্‌নিয়া থেকে ঘুরে আয় দু এক দিনের জন্যে, অথচ তুই যাচ্ছিস না।"

"কাল যাব, এতই যখন জোরাজুরি করছেন।"

"যাবি নে, জানি তুই যাবি নে। এখানে থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে আমার ওপর নজর রাখতে চাস, এটাই হল গিয়ে তোর ইচ্ছে, পাজি হতভাগা! এই কারণেই তো তুই যাবি নে—সে কি আর আমি বুঝি না?"

বুড়ো দমার পাত্র নয়। মাতলামির এমন একটা সীমায় সে পৌঁছে গেছে যখন একজন মাতালের, তা সে অমনিতে যত নিরীহ স্বভাবেরই হোক না কেন, হঠাৎ দপ করে রাগে জ্বলে ওঠার এবং নিজেকে জাহির করার সাধ না হয়ে যায় না।

"অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস? তোর ওই চোখ দুটো অমন দেখাচ্ছে কেন? ও চোখের দৃষ্টি আমাকে 'মোদো মাতাল' বলে ব্যঙ্গ করছে। না না তোর ওই চাউনি সন্দেহজনক, খুবই সন্দেহজনক। তুই মনে মনে কোনো একটা মতলব নিয়ে এখানে এসেছিস। এই তো আলিয়োশা আছে, কেমন তাকাচ্ছে, কেমন দীপ্তি ঝরে পড়ছে ওর দুচোখে। আলিয়োশা আমাকে হ্যাটা করে না। ওরে আলেক্সেই, ইভানটাকে ভালোবাসতে যাস নে।

"আহা দাদার ওপর রাগ করবেন না! ওর মনে আর দুঃখ দেবেন না", হঠাৎ বেশ জোর দিয়েই বলে উঠল আলিয়োশা।

"বেশ, বলছিস যখন তখন ছেড়েই দিলাম না হয়। উঃ মাথাটা বড়ো ব্যথা করছে। ব্র্যান্ডির বোতলটা সরিয়ে নিয়ে যা, ইভান, এই নিয়ে তোকে তিনবার বললাম" বলতে বলতে সে কেমন যেন ভাবনায় ডুবে গেল, তারপর হঠাৎ একটা ধূর্ত হাসির দীর্ঘ রেখা ফুটে উঠল তার মুখে। "রাগ করিস নে ইভান, বুড়ো হাবড়া মানুষ কী বলতে কী বলে ফেলেছি। জানি তুই আমাকে ভালোবাসিস না, তবু একটাই কথা—রাগ করিস নে। আমাকে ভালোবাসার কীই বা কারণ থাকতে পারে! তুই চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যা একবার, আমি নিজেও আসব তোর কাছে, একটা উপহার নিয়ে আসব তোর জন্যে। ওখানে আমি একটা খুকুমনিকে দেখিয়ে দেব তোকে, অনেক দিন হল নজর রেখেছি ওর ওপর। এখনও গেছো ধরনের, খালিপায়ে ঘুরে

বেড়ায়। আহা গেছো বলে ঘাবড়ে যাস নে, মুখ বাঁকাস নে—এসব মেয়ে একেকটা মুক্তো!... এই বলে নিজেই নিজের হাতে চুমো খেল।

“আমার কাছে এই মাত্র তার আলোচনার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়বস্তু পেয়ে পলকের মধ্যে তার নেশা কেটে গেল, হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠে সে বলল, “আমার কাছে, বুঝলি কিনা ওরে আমার ছেলেরা। বাছারা আমার, আহা আমার নধরকান্তি শুয়োরছানারা, আমার কাছে, এমন কি আমার সারা জীবনেও এমন একটি মেয়েমানুষকেও দেখিনি যাকে কুচ্ছিত্ বলা যায়। এই হল গিয়ে আমার বিধান! তোরা এর কী বুঝবি? কী করেই বা বুঝবি? এখনও তোদের নাক টিপলে দুধ বেরোয়, চোখই ফোটে নি ভালো করে। আমার বিধানে বলে, যে কোনও মেয়েমানুষের মধ্যে ধুত্তোর ছাই কী বলব, দারুণ মজার এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে যা অন্য আর কারও মধ্যে নেই। এর জন্য একমাত্র যেটা দরকার তা হল কী ভাবে সেটা খুঁজে পেতে হয়—আসল ব্যাপারটা তো সেখানেই। এর জন্য প্রতিভা দরকার। ‘মোভে’ বা মন্দ চেহারার বলতে যা বোঝায় এমন কাউকে আমি পাইনি সে যে একটা মেয়েমানুষ এতেই অর্ধেক মাত হয়ে যায়। আরে তোরা এসবের মর্ম কী বুঝবি! এমনকি যারা vielle fille—বয়স্থা আইবুড়ো তাদের মধ্যেও খুঁজলে অনেক সময় এমন জিনিস পাওয়া যাবে যাতে এই ভেবে স্রেফ আশ্চর্য হতে হয় লোকে কী করে বোকার মতো এতদিন তাদের দিকে নজর না দিয়ে তাদের এমন বুড়িয়ে যেতে দিল! মন্দ চেহারার আর গেছো মেয়েদের নিয়ে একেবারে গোড়াতে যা করতে হয় তা হল তাদের চমকে দেওয়া। এভাবেই তাদের পটাতে হয়! জানতিস না, তাই তো? তাকে এমন তাক লাগিয়ে দিতে হয় যে সে এই ভেবে পরম পুলকিত ও শিহরিত হবে, মরমে মরে যাবে যে তার মতো অমন একটা হতকুচ্ছিত মেয়েকে কিনা এরকম একজন ভদ্রলোক ভালোবেসেছে! যেটা সত্যি সত্যি চমৎকার ব্যাপার তা এই যে এই দুনিয়ায় সব সময় সেবাদাসীরা আছে আবার বাবুমশাইরাও আছে, আর থাকবেও, তাহলে ওরকম ঘর মোছার মেয়ে আর তার প্রভুও সব সময় থাকবেই—এই জীবনে সুখের জন্য এর চাইতে বেশি আর কী চাই! দাঁড়া, শোন্ রে আলিয়োশা, তোর যে মা ছিল তাকে আমি সব সময় চমকে দিতাম — অবশ্য সেটা হত অন্য কায়দায়। তাকে আদর-টাদর কখনও করতাম না, কিন্তু হঠাৎ যখন সেই মুহূর্তটি আসত তখন বলা নেই কওয়া নেই তার সামনে একেবারে গদগদ হয়ে হাঁটু মুড়ে হামা দিতে শুরু করতাম, তার পায়ে চুমো খেতাম, আর সব সময়, সব সময়েই—মনে হচ্ছে এই যেন আজকের ঘটনা—তাকে হাসিয়ে ছাড়তাম। সে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ত। তার সেই ছোটো মিষ্টি হাসি চড়া গলার হত না, কিন্তু তাতে ফুটে উঠত বিশেষ এক ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব। ওরকম হাসি একমাত্র সে-ই হাসতে পারত। জানতাম ওর মেয়েলি রোগের প্রকোপটা সব সময় এইভাবেই শুরু হত, কালই শুরু হয়ে

যাবে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের চিৎকার। এখনকার এই ছোট্ট মিষ্টি হাসিটাতে পুলকিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তা হলে কী হবে—প্রতারণা হোক আর যা-ই হোক, পুলক তো বটে! একেই বলে সবের মধ্যে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা! বেলিয়াভ্স্কি নামে সুন্দর চেহারার এক বড়োলোক তখন এখানে ছিল, তোর মার পেছনে ঘুর ঘুর করত, আমাদের বাড়িতে যাতায়াতের একটা সুযোগও করে নিল। একবার হঠাৎই আমারই বাড়িতে আমাকে চড় মেরে বসল, তাও আবার তোর মার সামনে। ওর বুদ্ধিটাও আবার এমন ভেড়ুয়া মার্কা যে আমি ভাবলাম হয়ে গেল—এই চড় খাওয়ার জন্যে আমাকে মেরে ধরে আর আস্ত রাখবে না। ঠিকই তাই। আমার ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কি চোটপাট! বলল 'তুমি মার খেয়েছ, তুমি এখন একটা মার খাওয়া লোক, ওর কাছে চড় খেলে! অ্যাঁ! তুমি ওর কাছে আমাকে বেচতে গিয়েছিলে।... ওর এত সাহস যে আমার সামনে তোমাকে মারল! আমার কাছে আর কখনও ঘেঁষো না, খবরদার বলছি, কক্ষনও না! যাও এখুনি ছুটে যাও, মুরোদ থাকে তো ডুয়েল লড় গিয়ে ওর সঙ্গে।' তা আমি কী আর করি, ওকে শান্ত করার জন্য মঠে নিয়ে গেলাম। মঠের পুণ্যাত্মা সাধুবাবারা সব ওকে সারিয়ে তোলার জন্য মন্ত্রতন্ত্র পড়লেন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আলিয়োশা, আমার উন্মাদিনীকে জীবনে আমি কখনও অপমান করিনি। হ্যাঁ একবার, শুধু একবারই, সেটাও আমাদের বিয়ের প্রথম বছরে। তখন পুজো আর্চা নিয়ে, বিশেষত পবিত্র দেবজননীর উৎসব হলে তাই নিয়েই বড়ো বেশি মেতে থাকত, সেই সময় আমাকে সামনে দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত আমার পড়ার ঘরে। আমি ভাবলাম, দাঁড়াও তোমার ওই সব বুজরুকি আমি বার করছি। একদিন তাই আমি ওকে বললাম, 'এই দেখ, দেখছ তো, দেখছ এই তোমার বিগ্রহ, এটাকে আমি তুলে আনছি। এবারে দেখ, তুমি তো মনে কর তোমার এই ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমি এই এখুনি তোমার সামনে এটাকে থু থু দিচ্ছি, তাতে কিন্তু আমার কিছুই হবে না!  যেই ও এটা দেখতে পেল, আমি ভাবলাম, হা ভগবান, এই বুঝি এখনই আমাকে খুন করে বসে! কিন্তু সে সব কিছুই না করে শুধু লাফিয়ে উঠে অসহায়ের মতো হাতে হাত চাপড়াল, তারপর হঠাৎই দুহাতে মুখ ঢাকল, ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে ঢলে পড়ল  একেবারে নেতিয়ে পড়ে গেল রে আলিয়োশা, আলিয়োশা! কী হল, কী হল তোর!"

বুড়ো ভয় পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জায়গা ছেড়ে। বাপ যখন তার মার কথা বলতে শুরু করেছে তখন থেকেই আলিয়োশার মুখে একটু একটু করে ভাবান্তর দেখা দিচ্ছিল। তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখ দুটো জ্বলতে থাকে, ঠোঁট কাঁপতে থাকে '  যতক্ষণ না হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের একটা কিছু আলিয়োশার ঘটে গেল ঠিক সেই মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত মাতাল বুড়োটার কিছুই নজরে পড়ে

নি। এতক্ষণ সে মুখের লালা ঝরিয়ে বকবক করে যাচ্ছিল। আলিয়োশার যেটা ঘটেছিল তা এই যে এইমাত্র বুড়ো 'উন্মাদিনী' সম্পর্কে যা বলল তার মধ্যেও হঠাৎ হুবহু সেই ভাবের পুনরাবৃত্তি দেখা দিল। আলিয়োশা আচমকা এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হুবহু তার মায়ের মতো সেও সখেদে হাতে হাত চাপড়াল, তারপর দু হাতে মুখ ঢাকল, কাটা গাছের মতো দড়াম করে আছড়ে পড়ল চেয়ারের ওপর, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মূর্চ্ছার তাড়সে হঠাৎ তার সর্বাঙ্গ থেকে থেকে খিঁচুনি দিয়ে অস্ফুট কান্নায় গুমড়ে গুমড়ে কেঁপে উঠতে লাগল। মার সঙ্গে ছেলের এই অস্বাভাবিক মিল দেখে বুড়ো বিশেষ করে অবাক হয়ে গেল।

'ইভান, ইভান! শিগ্গির ওকে একটু জল এনে দে। এ যে দেখছি ওরই মতো, হুবহু সেইরকম, যেমন ওর মায়ের হত। মুখে করে জল নিয়ে ওর চোখেমুখে ছিটো। তার বেলায়ও আমি এমনই করতাম। ও এমন করছে মায়ের কথা ভেবে, ওর মার কথা ভেবে করছে     বিড়বিড় করে সে ইভানকে বলল।

"তা আমারও তো মা। ওর মা, আমার তো মনে হয় সে আমারও মা। আপনার কী মনে হয়?" যে প্রচণ্ড ক্রোধ আর ঘৃণা এতক্ষণ মনের ভেতরে জমা হয়ে ছিল তা আর সামলাতে না পেরে হঠাৎ ফেটে পড়ল ইভান।

ইভানের দু চোখ এমন ধক ধক করে জ্বলতে লাগল যে সেদিকে তাকিয়ে বুড়ো চমকে উঠল।

কিন্তু এখানেই একটা অত্যন্ত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল—অবশ্য সত্যি বলতে গেলে কি এক মুহূর্তের জন্য। আলিয়োশার মা যে ইভানেরও মা ছিল এই বোধটা যেন বুড়োর মাথা থেকে সত্যি সত্যি বেরিয়ে গিয়েছিল।

"তোর মা মানে?" কথাটা বুঝতে না পেরে সে বিড়বিড় করে বলল। "এটা আবার কী বলছিস? কোন্ মায়ের কথা বলছিস তুই?     কিন্তু সে কী     আরে ধুত্তোর! তাও তো বটে, তোরও মা বটে! ধুত্তোর। মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল বাবা, এমন কখনও হয় না। মাফ্ করবি, আমি আবার ভেবেছিলাম ইভান তো     হে-হে-হে!" বলতে বলতে সে থেমে গেল। মাতালের প্রায় অর্থহীন কাষ্ঠহাসির দীর্ঘ রেখায় তার মুখখানা প্রশস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরের বারান্দায় প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল ও কোলাহল উঠল, ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল। দড়াম করে দরজা খুলে গেল, সবেগে হলঘরে এসে ঢুকে পড়ল দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ। তাকে দেখামাত্র বুড়ো ভয় পেয়ে ছুটে গেল ইভানের কাছে।

"মেরে ফেলবে, আমাকে মেরে ফেলবে! ওকে কাছে আসতে দিস না, সরিয়ে দে!" ইভান ফিয়োদরভিচের ফ্রককোটের খুঁটটা শক্ত করে চেপে ধরে সে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল।

## নয়

## কামাসক্তদের প্রসঙ্গে

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের পিছন পিছন ছুটে হলঘরে এসে ঢুকল গ্রিগোরি আর তার সঙ্গে স্মের্দিকোভ্‌। ওরা এতক্ষণ বাইরের বারান্দায় তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল, তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না, যেহেতু এই মর্মে কয়েক দিন আগেই স্বয়ং ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ তাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েই চারপাশের অবস্থাটা ভালো করে দেখার জন্য দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ মিনিট খানেকের জন্য থমকে দাঁড়াল। এই ফাঁকে গ্রিগোরি তাড়াতাড়ি টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে উলটো দিকে, ভেতরের ঘরগুলিতে ঢোকার যে দরজাটা ছিল তার দুটো পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে, যাকে বলে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করা, সেই ভঙ্গিতে বন্ধ দরজার সামনে ক্রুশবিদ্ধের মতো দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে ঢোকার পথ আগলানোর জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। সেটা দেখতে পেয়ে দ্‌মিত্রি ধেয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে; দ্‌মিত্রির মুখ দিয়ে এই সময় যে আওয়াজ বেরিয়ে এলো তা চিৎকার না হয়ে বরং অনেকটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মতোই শোনাল।

“তার মানে ওখানে আছে! ওখানে লুকিয়ে রেখেছে ওকে! হট্‌ এখান থেকে হারামজাদা!” গ্রিগোরিকে হেঁচকা টান মেরে সরাতে গেল সে, কিন্তু গ্রিগোরি উলটে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে দ্‌মিত্রি তার হাতখানা সামনে ছুড়ে দিয়ে সর্বশক্তিতে একটা ঘুষি মেরে বসল গ্রিগোরিকে। সে আঘাতে বুড়ো গ্রিগোরি একটা কাটা গুঁড়ির মতো ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে দ্‌মিত্রি জোর করে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। স্মের্দিকোভ্‌ সেই হলঘরেরই অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল, ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের গা ঘেঁষে জড়সড়ো হয়ে ফ্যাকাশে মুখে থরথর করে কাঁপছিল।

“ও এখানে আছে” চেঁচিয়ে বলল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, “এই মাত্র আমি নিজের চোখে বাড়ির দিকে মোড় নিতে দেখেছি, কেবল রাস্তায় ধরতে পারি নি। কোথায় ও? গেল কোথায়?”

‘ও এখানে আছে’ এই চিৎকারটা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের ওপর যে প্রভাব ফেলল তা ধারণা করা যায় না। মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল তার যত ভয়ডর।

“ধর, ধর ওটাকে!” গর্জন করে উঠে সে ধেয়ে গেল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের পিছন পিছন পাশের ঘরে। গ্রিগোরি ততক্ষণে মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তখনও ঠিক ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। বাপকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে ছুটল ইভান ফিয়োদরভিচ ও আলিয়োশা। তৃতীয় ঘর থেকে একটা প্রচণ্ড শব্দ কানে এলো: মনে হল যেন হঠাৎ কিছু একটা মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল। জিনিসটা আসলে ছিল একটা বড়ো আকারের কাচের ফুলদানি। আহামরি দামি কিছু নয়।

রাখা ছিল মার্বেলের একটা স্তম্ভের ওপর. পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের গায়ে লেগে পড়ে যায়।

"পাকড়াও ওটাকে!" বুড়ো হুঙ্কার দিয়ে উঠল। "কে আছ, বাঁচাও।"

ইভান ফিয়োদরভিচ ও আলিয়োশা শেষ পর্যন্ত বুড়োকে ধরে জোর করে হলঘরে ফিরিয়ে আনল।

"ওর পেছনে ধাওয়া করার কী আছে? ও তো আপনাকে কাছে পেলেই সোজা খুন করে বসবে!" রাগতস্বরে চেঁচিয়ে বাবাকে বলল ইভান ফিয়োদরভিচ্।

"ওরে ইভান, ওরে আলিয়োশা! শুনলি তোরা? ও তো তাহলে এখানেই আছে! গ্রুশেন্‌কা তা হলে এখানেই আছে, যখন বলছে স্বচক্ষে পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছে!..."

বলতে বলতে সে হাঁপাতে লাগল। এই সময় গ্রুশেন্‌কার এখানে আসাটা তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। এমন সময় কিনা এই সংবাদ যে ও এখানে!—এর ফলে তৎক্ষণাৎ তার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। দেখেশুনে মনে হল সে যেন পাগলই হয়ে গেছে।

"আরে আপনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন যে এখান দিয়ে যায়নি!" ইভান চেঁচিয়ে উঠল।

"এমনও তো হতে পারে যে অন্য গেটটা দিয়ে এসেছে?"

"ঢোকার ওই আরেকটা পথ, অন্য গেটটা তো তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা, তার চাবিও আবার আপনার কাছে

হঠাৎ আবার হলঘরে উদয় হল দ্‌মিত্রির। বলাই বাহুল্য সে দেখে নিয়েছে যে পিছনের দরজাটা তালাবন্ধ। ওই তালাবন্ধ দরজার চাবিও সত্যি সত্যি ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে, তার জামার পকেটে ছিল। সব ঘরের সবগুলো জানলাও বন্ধ, তাই গ্রুশেন্‌কা কোনো জায়গা দিয়ে ঢুকবে বা ঢুকে বেরিয়ে যেতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

"পাকড়াও ওটাকে!" এই মাত্র দ্‌মিত্রিকে আবার দেখতে পেয়ে হাউমাউ করে উঠল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্, "ওখানে আমার শোবার ঘর থেকে ও টাকা চুরি করেছে!" ইভানের হাত ছাড়িয়ে সে আবার দ্‌মিত্রির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু দ্‌মিত্রি দু হাত ওঠাল, বুড়োর যে কগাছা চুল তার দুপাশের জুলপিতে অবশিষ্ট ছিল হঠাৎ দু হাতের দু মুঠোয় তা গোছা করে চেপে ধরে তাকে এক ঝাঁকুনি মেরে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে ফেলে দিল। এরই মধ্যে ধরাশায়ী ব্যক্তির মুখে জুতোর গোড়ালি দিয়ে দু তিন ঘা লাথি কষাতেও ছাড়ল না। বুড়ো তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। ইভান ফিয়োদরভিচ যদিও তার ভাই দ্‌মিত্রির মতো অতটা বলশালী নয়, তবু দু হাতে তাকে জাপটে ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় বাপের কাছ থেকে

সরিয়ে দিল। আলিয়োশাও তার সামান্য যেটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে সাহায্য করল, সামনে থেকে চেপে ধরল ভাইকে।

ইভান চিৎকার করে উঠল, "পাগল নাকি? ওকে তো মেরে ফেললে দেখছি!"

"ওটাই ওর দরকার ছিল!" হাঁপাতে হাপাতে বলে উঠল দ্‌মিত্রি। "মেরে যদি নাও ফেলি, আবার আসব, তখন সত্যি সত্যি খুন করব। তখন আর বাঁচাতে হচ্ছে না!"

"দ্‌মিত্রি! চলে যাও এখান থেকে, এক্ষুনি চলে যাও!" হুকুমের সুরে চড়া গলায় বলে উঠল আলিয়োশা।

"আলেক্সেই! একমাত্র তুই-ই বলতে পারিস, একমাত্র তোকেই আমি বিশ্বাস করি: ও কি এই কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিল, নাকি আসেই নি? কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে যে আমি নিজের চোখে দেখলাম গলি থেকে বেরিয়ে বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে চট করে এই দিকটাতে ঢুকে পড়ল। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে পালিয়ে গেল।.."

"আমি শপথ করে বলতে পারি, এখানে সে আসেনি, তা ছাড়া এখানে কেউ তার অপেক্ষায় বসেও ছিল না!"

"কিন্তু আমি যে ওকে দেখেছি  তাহলে কি ও  আচ্ছা, আমি এক্ষুনি জেনে নেব ও কোথায় আছে।  চলি, আলেক্সেই! বলে রাখলাম এই বাক্যবাগীশ ইশপটাকে কিন্তু টাকাপয়সা নিয়ে একটি কথাও নয়। আর কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে এখুনি গিয়ে অতি অবশ্য বলবি: 'আপনাকে নমস্কার জানাতে বলেছে, নমস্কার জানাতে বলেছে, নমস্কার জানাতে বলেছে! হ্যাঁ নমস্কার, শেষ নমস্কার!' বিদায়বেলার নমস্কারের মতো করে কয়েকবার উচ্চারণ করবি। এখনকার এই দৃশ্যটা ওকে বর্ণনা করবি।"

ইতিমধ্যে ইভান ও গ্রিগোরি মিলে ধরাধরি করে বুড়োকে মাটি থেকে তুলে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। তার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে, কিন্তু জ্ঞান তার পুরোমাত্রায় আছে, দ্‌মিত্রির চিৎকার সে পরম আগ্রহ সহকারে শুনছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল গ্রুশেন্‌কা সত্যি-সত্যি এই বাড়িরই কোথাও আছে। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ চলে যেতে যেতে ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"তোমার রক্তপাত করেছি বলে আমার কিন্তু কোনও অনুশোচনা নেই!" উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল সে। "সাবধান বুড়ো, তোমার স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে চোলো, কেননা আমারও ওই রকম স্বপ্ন আছে! আমি নিজের মুখে তোমার সর্বনাশ চাইছি, তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছি..."

সে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

"ও এখানে, ও নির্ঘাত এখানে আছে! স্মের্দিকোভ্‌, এই স্মের্দিকোভ্‌", আঙুলের ইশারায় স্মের্দিকোভ্‌কে ডেকে শোনা যায় কি যায় না এমনই ক্ষীণ ভাঙা ভাঙা গলায় চিঁ চিঁ করে বুড়ো বলল।

"না, সে এখানে নেই। আচ্ছা পাগল বুড়ো তো!" রাগে তার ওপর খেঁকিয়ে উঠল ইভান। "এই দেখ, অজ্ঞান হয়ে গেল যে। জল নিয়ে এসো, আর একটা তোয়ালে! এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় দেখি স্মেদিকোভ্!"

স্মের্দিকোভ্ জল আনতে ছুটল। শেষ পর্যন্ত বুড়োর জামাকাপড় ছাড়িয়ে সকলে মিলে তাকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। মাথাটা একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হল। ব্র্যান্ডি, আবেগ অনুভূতির প্রাবল্য, প্রহার — এসবের ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই বালিশের সংস্পর্শে আসতে না আসতে পলকের মধ্যে উর্ধ্বনেত্র হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ইভান ফিয়োদরভিচ ও আলিয়োশা হলঘরে ফিরে এলো। স্মের্দিকোভ্ ফুলদানির ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল, গ্রিগোরি মনমরা হয়ে মাথা নীচু করে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমিও বরং মাথাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লে পারতে", গ্রিগোরিকে উদ্দেশ করে আলিয়োশা বলল। আমরা এখানে ওর ওপর নজর রাখছি। দাদা তো তোমাকে জোর এক ঘা বসিয়েছে একেবারে মাথায়।"

"ও কিনা আমার ওপর তেজ খাটাল!" বিষণ্ণ কণ্ঠে স্পষ্ট করে কথাগুলি উচ্চারণ করল গ্রিগোরি।

"তোমার ওপর কেন, সে 'তেজ' তো ও বাবার ওপরও খাটিয়েছে!" ঠোঁট বাঁকিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ মন্তব্য করল।

"ও যখন এই এতটুকু ছিল তখন আমি ওকে টবে চান করিয়েছি ও কিনা আমার ওপর তেজ খাটাল!" গ্রিগোরি আবার বলল।

'চুলোয় যাক! আমি যদি ওকে ছাড়িয়ে না দিতাম তাহলে খুনই করে বসত। বাক্যবাগীশ ইশপটাকে খতম করতে আর কী এমন লাগে?" নীচু গলায় ইভান ফিয়োদরভিচ বলল আলিয়োশাকে।

"ঈশ্বর রক্ষা করুন!" আলিয়োশা বলে উঠল।

"রক্ষা করার কী আছে?" ক্রোধে মুখ বাঁকিয়ে আগের মতোই নীচু গলায় বলে যেতে লাগল ইভান। "একটা কালসাপ আরেকটা কালসাপকে খাবে, দুটোরই ওই একই গতি!"

আলিয়োশা চমকে উঠল।

"অবশ্য বলাই বাহুল্য খুনোখুনি আমি হতে দেব না, যেমন এখনও দিইনি। তুই এখানে থাক আলিয়োশা, আমি একটু বাইরে উঠোনে ঘুরে আসি, মাথাটা ধরতে শুরু করেছে।"

আলিয়োশা শোবার ঘরে বাবার কাছে গেল, সেখানে বাপের শিয়রে পালঙ্কের পাতলা পর্দার আড়ালে ঘণ্টাখানেক বসে রইল। এক সময় বুড়ো হঠাৎ চোখ খুলল, অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আলিয়োশাকে, দেখে মনে হচ্ছিল কী

যেন ভাবছে বা মনে আনার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে আচমকা তার চোখেমুখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল।

"আলিয়োশা" শঙ্কিত কণ্ঠে ফিসফিস করে সে বলল, "ইভান কোথায় রে?"

"উঠোনে ঘুরতে বেরিয়েছে, ওর মাথা ধরেছে। ও আমাদের আগলাচ্ছে।"

"ওই যে আয়নাটা, ওই ওখানে আছে, ওটা আমায় দে।"

দেরাজ আলমারির ওপর একটা ছোট্ট গোল ভাঁজকরা আয়না রাখা ছিল। আলিয়োশা সেটা এনে বাবাকে দিল। বুড়ো আয়নায় নিজের মুখটা দেখল  নাকটা খুব বেশি রকম ফুলে গেছে আর কপালে, বাঁ দিকে ভুরুর ওপরে বেশ ভালো মতন লাল রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

"ইভান কী বলছে? ওরে আলিয়োশা, কেবল তুই আমার একমাত্র আদরের ধন, এই ইভানটাকে আমার বড়ো ভয়, ওটার চেয়েও বেশি ভয় পাই ইভানকে। একমাত্র তোকেই আমার ভয় নেই  "

"ইভানকেও ভয় করার কিছু নেই। ইভান রাগ করে বটে, কিন্তু ও আপনাকে বিপদের সময় বাঁচাবে।"

"আলিয়োশা, কিন্তু ওটা? ওটা কী করল? গ্রুশেন্‌কার কাছে ছুটল বুঝি? লক্ষ্মী ছেলে আমার, সত্যি করে বল্ দেখি, গ্রুশেন্‌কা কি কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিল?"

"কেউ ওকে দেখেনি। ওটা ভুল, আসেনি।"

"মিতিয়াটা তো ওকে বিয়ে করতে চায়, বিয়ে করতে চায়, জানিস?"

"গ্রুশেন্‌কা ওকে বিয়ে করবে না।"

"করবে না, করবে না, করবে না, কোনোমতেই করবে না, কোনোমতেই বিয়ে করবে না!"

বলতে বলতে বুড়ো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তার সর্বাঙ্গ এমনই শিহরিত হয়ে উঠল যে মনে হল এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড়ো আনন্দের সংবাদ তার কাছে আর হতে পারে না। পরম পুলকে আলিয়োশার একখানা হাত খপ করে ধরে সে নিজের বুকে চেপে ধরল। এমনকি চোখে তার আনন্দাশ্রু চিকচিক করে উঠল।

"ওই যে বিগ্রহটা আছে, দেব জননীর ওই বিগ্রহটা, যার কথা আমি এই সেদিন তোকে বলেছিলাম, ওটা আমি তোকে দিলাম, তুই নিয়ে যা। আর হ্যাঁ, তোকে আমি মঠে ফিরে যেতে দিচ্ছি  তখন ঠাট্টা করেছিলাম, রাগ করিস নে। মাথা ব্যথা করছে, আলিয়োশা  ওরে আলিয়োশা, তুই আমার মনকে শান্ত কর, লক্ষ্মীটি আমার, সত্যি করে বল!"

"ঘুরে ফিরে সেই একই কথা  এসেছিল কিনা — তাই তো?" আলিয়োশা সখেদে বলল।

"না, না, না, আমি তোকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু একটা কথা বলি তোকে একবার তুই নিজে গ্রুশেন্‌কার কাছে যা, না হয় যা হোক করে ওর সঙ্গে দেখা

কর। শিগগির করে গিয়ে তাকে জিগ্‌গেস করে জেনে নে, যত তাড়াতাড়ি পারিস, সম্ভব হলে নিজেই নিজের চোখ দিয়ে অনুমান করার চেষ্টা কর কাকে সে চায়— ওকে না আমাকে? কী বলিস? কী হল? পারবি? না কি পারবি না?”

“যদি দেখা পাই তাহলে জিগ্‌গেস করব”, থতমত খেয়ে বিড়বিড় করে বলল আলিয়োশা।

“না, সে তোকে বলবে না”, বাধা দিয়ে বুড়ো বলল, “ওর কোনো মতির ঠিক নেই— উলটে তোকে ধরে চুমো খেতে শুরু করবে, বলবে তোকেই চায়। ও একটা ধোঁকাবাজ, নির্লজ্জ বেহায়া। না ওর কাছে তোর যাওয়া চলবে না, চলবে না!”

“তাছাড়া ব্যাপারটা ভালোও হবে না বাবা, একেবারেই ভালো হবে না।”

“আচ্ছা এই যে তখন পালিয়ে যাবার সময় তোকে চিৎকার করে ডেকে ‘একবারটি যা’ বলল—সেটা তোকে কোথায় পাঠাচ্ছিল?”

“কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে পাঠাচ্ছিল।”

‘টাকার জন্যে? টাকা চেয়ে আনতে?”

“না, টাকার জন্যে নয়।”

“ছোঁড়ার আমার টাকাকড়ি নেই, কানাকড়িও নেই। শোন, আলিয়োশা, আজকের রাতটা আমাকে শুয়ে শুয়ে ভালোমতো ভাবনাচিন্তা করতে দে। আপাতত তুই যা। ওর দেখা পেলেও পেতে পারিস। শুধু একটাই কথা কাল কিন্তু অবশ্যই ভোরবেলা আমার কাছে একবারটি আসবি, অতি অবশ্য আসবি। কাল তোকে আমার কিছু একটা কথা বলার আছে। আসবি তো?”

“আসব।”

“যদি আসিসই তাহলে এমন ভান করবি যেন নিজে থেকে এসেছিস, আমাকে দেখতে এসেছিস। কাউকে বলবি না যে আমি ডেকেছি। ইভানকে একটি কথাও নয়।”

“বেশ।”

“যা তবে এখন লক্ষ্মী ছেলেটা আমার। আজ তুই আমার পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলি — সে কথা আমি সারা জীবন ভুলব না। কাল আমি তোকে একটা কথা বলব তবে কথাটা বলার আগে আরও একটু ভেবে দেখতে হয়।

“তা এখন আপনি কেমন বোধ করছেন?”

“দেখবি কালকেই, কালকে ঠিক উঠে পড়ব, উঠে চলাফেরা করব, দিব্যি সুস্থ সবল মানুষটি হয়ে!

উঠোন দিয়ে যেতে যেতে আলিয়োশা দেখতে পেল দাদা ইভান গেটের কাছে বেঞ্চিতে বসে পেন্‌সিল দিয়ে কী যেন লিখছে নোটবইতে। আলিয়োশা ইভানকে

জানাল যে বুড়োর ঘুম ভেঙেছে, সে সজ্ঞানেই আছে, আলিয়োশাকে মঠে ফিরে গিয়ে সেখানেই রাত কাটানোর অনুমতি দিয়েছে।

"কাল সকালে তোর সঙ্গে দেখা হলে ভারি খুশি হব আলিয়োশা", সৌজন্য দেখিয়ে বেঞ্চি থেকে একটু উঠে দাঁড়িয়ে ইভান বলল। এই সৌজন্যটা কিন্তু আলিয়োশার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল।

"কাল আমি খখ্লাকোভাদের কাছে যাচ্ছি", আলিয়োশা জবাব দিল। "হয়ত কাল কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছেও যেতে হতে পারে, যদি এখন তাকে না পাই..."

"ও, এখন তাহলে কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে যাচ্ছিস! সেই 'শেষ নমস্কার' জানাতে?" ইভানের মুখে হঠাৎ হাসি ফুটে উঠল। আলিয়োশা বিব্রত বোধ করল।

"আমার মনে হয় ওর আজকের এই চিৎকার চেঁচামেচি এবং এর আগেরও কিছু কিছু ঘটনা থেকে আমি সব বুঝতে পেরেছি। দ্মিত্রি খুব সম্ভব তোকে ওর কাছে গিয়ে জানাতে বলেছে যে সে মানে মানে, এক কথায়, ওর কাছ থেকে 'বিদায় নিচ্ছে'?"

"কিন্তু দাদা, বাবা আর দ্মিত্রির মধ্যে এই যে সাংঘাতিক ব্যাপার বেধে গেছে এটা কোথায় গিয়ে গড়াবে বল তো?" আলিয়োশা বলে উঠল।

"নিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। হয়তো কিছুই হবে না—সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওই মেয়েমানুষটা একটা জানোয়ার বিশেষ। সে যাই হোক না কেন, বুড়োকে ঘরে ধরে রাখতে হবে, আর লক্ষ রাখতে হবে দ্মিত্রি যেন বাড়িতে ঢুকতে না পারে।"

"আচ্ছা দাদা, আরেকটা কথা তোমাকে জিগ্গেস করতে পারি কি?—কোন্ লোক বেঁচে থাকার যোগ্য, কেই বা কম যোগ্য অন্যদের তা বিচার করার অধিকার কি কারও আছে?"

"যোগ্যতা দিয়ে বিচার করার প্রশ্ন কোত্থেকে আসছে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের বিচার হয়ে থাকে মানুষের হৃদয়ে—আদৌ যোগ্যতার ভিত্তিতে না হয়ে এমন সমস্ত কারণে যা অনেক বেশি স্বাভাবিক। আর অধিকারের কথা যদি বল, তাহলে কামনা করার অধিকার কার নেই বল?"

"তাই বলে অপরের মৃত্যু কামনা তো নয়?"

"কেনই বা নয়? নিজেকে মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে কী হবে যখন সব মানুষ এইভাবেই জীবনযাপন করে, এবং এছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভবত করতে পারবেও না। ওই যে আমি বললাম একটা কালসাপ আরেকটা কালসাপকে খাবে তুই আমার সেই কথা প্রসঙ্গে বলছিস বুঝি? তাহলে যদি কিছু মনে না করিস আমিও তোকে একটা প্রশ্ন করি: তুই কি মনে করিস দ্মিত্রির মতো আমিও বাক্যবাগীশ ইশপটার খুন ঝরাতে পারি, মানে তাকে খুন করতে পারি, অ্যাঁ?"

"এসব কী বলছ তুমি দাদা! কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি! আর দ্মিত্রির কথা যে বলছ তাকেও আমি মনে করি না

"অন্তত এটার জন্যও ধন্যবাদ", কাষ্ঠ হাসি হেসে ইভান বলল। "জেনে রাখ, আমি ওকে সব সময়ই বাঁচানোর চেষ্টা করব। কিন্তু আমার মনের যে কামনা, এক্ষেত্রে আমি তার পূর্ণ বিস্তারের অধিকার রাখছি। তাহলে কাল দেখা হবে, আজকের মতো বিদায়। আমাকে ছি-ছি করিস নে, গুন্ডা বদমাশ বলে ভাবিস নে", মুচকি হেসে সে যোগ করল।

ওরা দুজনে যে রকম গভীর আবেগে হাতে হাত মেলাল তেমনটি এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। আলিয়োশা উপলব্ধি করল যে তার ভাইই প্রথমে নিজে এই পদক্ষেপটি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এসেছে এবং এটা সে করেছে কোনো একটা কারণে, নির্ঘাত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

## দশ

## দুজনে একসঙ্গে

আলিয়োশা যখন পিতৃগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এলো তখন তার মন একেবারে ভেঙে গেছে, কিছু আগে যখন সে বাবার কাছে এসেছিল তখন তার মনের যে অবস্থা ছিল এখন তাকে তার চেয়েও বেশি মনমরা দেখাচ্ছে। তার বুদ্ধিসুদ্ধিও যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে, যদিও সেই সঙ্গে সে নিজেই এটাও উপলব্ধি করতে পারছিল যে সেই দিন যে পীড়াদায়ক পরস্পর বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা টুকরোগুলোকে জুড়ে সে সবের ভেতর থেকে একটা সাধারণ কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সে ভয় পাচ্ছে। সে যেন এক ধরনের হতাশার প্রায় চরম সীমায় এসে পড়েছে। এরকম উপলব্ধি এর আগে আলিয়োশার আর কখনও হয়নি। সব কিছুর ওপরে পর্বতপ্রমাণ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সবচেয়ে বড়ো, অমোঘ ও মীমাংসাতীত যে প্রশ্নটি তা এই যে ওই সাংঘাতিক স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে তার বাবা আর ভাই দ্মিত্রির ব্যাপারটার পরিণতি কী হবে? এখন তো সে নিজেই এই ঘটনার সাক্ষী। নিজে উপস্থিত থেকে আজ স্বচক্ষে দেখেছে ওদের দুজনকে মুখোমুখি দাঁড়াতে। তবে হতভাগ্য যদি কাউকে বলতে হয়, ভয়ঙ্কর ভাবে পুরোপুরি হতভাগ্য যদি কেউ হয় একমাত্র দ্মিত্রিরই তা হওয়ার সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে তার মাথার ওপর। এটাও দেখা গেল যে আরও লোক আছে যাদের সঙ্গে এ সবের সংশ্রব আছে এবং আলিয়োশার আগে যেমন মনে হলেও হতে পারত এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশিই আছে। এমনকি দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে রহস্যজনকও কিছু আছে। দাদা ইভান যে পদক্ষেপটি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো সেটা আলিয়োশা বহু দিন যাবত মনে মনে চাইছিল, অথচ আজ কেন যেন সে নিজেই উপলব্ধি করছে যে ঘনিষ্ঠতার এই পদক্ষেপটি তার মনে ভীতির সঞ্চার করছে। আর ওই

দুই স্ত্রীলোক? আশ্চর্যের কথা এই যে আজ মনে মনে রীতিমতো একটা অস্বস্তি নিয়েই সে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল, কিন্তু এখন তার এতটুকু চিহ্ন তো নেই-ই, বরং নিজেই এমনভাবে ত্রস্ত পায়ে সেদিকে চলতে লাগল যেন তার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাবার আশায় চলেছে। অথচ যে বার্তা বহন করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব সে নিয়েছে সেটা এখন কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে পৌঁছে দেওয়া স্পষ্টতই আগের চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে : তিন হাজারের ব্যাপারটা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে, এর পর ভাই দ্‌মিত্রি যখন উপলব্ধি করতে পারবে যে তার মানসম্মান খোয়া গেছে, আর কোনও আশা ভরসা তার নেই তখন তার পতন আর কোনো ভাবে ঠেকানো যাবে না। পরন্তু বাবার সঙ্গে সবে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল সেটাও আবার সে কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে জানাতে বলেছে।

বলশোই স্ট্রিটের ওপর একটা বেশ প্রশস্ত ও আরামপ্রদ বাড়িতে কাতেরিনা ইভানভ্‌না থাকে। আলিয়োশা যখন তার বাড়ির কাছে পৌঁছুল ততক্ষণে সাতটা বেজে গেছে, অন্ধকার হয়ে আসছিল। আলিয়োশা জানত কাতেরিনা ইভানভ্‌না তার দুই মাসির সঙ্গে থাকে। তাদের মধ্যে একজন অবশ্য আসলে তার বৈমাত্র দিদি আগাফিয়া ইভানভ্‌নার মাসি। এ হল তার বাপের বাড়ির মুখচোরা নিরীহ প্রকৃতির সেই মহিলাটি, কাতেরিনা ইভানভ্‌না ইনস্টিটিউট শেষ করে বাড়ি ফিরে এলে যে সেখানে তার দিদিকে দেখাশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে তারও দেখাশোনা করত। আরেক জন যে মাসি সে ছিল বেশ ওজনদার গোছের, গণ্যমান্য চেহারার, মস্কোর কোনো এক বড়ো ঘরের মহিলা, যদিও দৈন্যদশাগ্রস্ত। শোনা যায় ওরা দুজনেই সব ব্যাপারে কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে মেনে চলে, তাদের রাখা হয়েছে কেবল সৌজন্যরক্ষার খাতিরে। কাতেরিনা ইভানভ্‌না একমাত্র যাকে মেনে চলত তিনি হলেন তার পরম শুভানুধ্যায়িনী, অভিভাবিকাস্বরূপ, জেনারেলের সেই বিধবা, যিনি অসুস্থতার দরুন মস্কোতে রয়ে গেছেন। সপ্তাহে দু বার করে তাঁকে চিঠি লিখে নিজের বিশদ সংবাদ জানাতে হয়।

আলিয়োশা যখন বাড়ির সামনের ঘরে ঢুকল তখন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিতে সে তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে ভেতরে সংবাদ পাঠাতে বলল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে বাড়ির ভেতরের লোকেরা ইতিমধ্যেই তার আগমন বার্তা জেনে গেছে। হয়তো জানলা দিয়ে কেউ তাকে ঢুকতে দেখে থাকবে। তবে অন্তত আলিয়োশার হঠাৎ কানে এলো একটা কোলাহল, সে শুনতে পেল মেয়েদের হালকা পায়ের ত্রস্ত পদসঞ্চার আর তাদের পোশাকের খসখস শব্দ মনে হল দু তিন জন স্ত্রীলোক ছুটে পালাল। তার আগমন যে এরকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে এতে আলিয়োশা আশ্চর্য হয়ে গেল। তাকে অবশ্য তৎক্ষণাৎ বসার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরটা বেশ বড়ো, মার্জিত রুচির বেশ কিছু আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দর

সাজানো গোছানো— মফস্‌সলের কোনো বাড়ির মতো একেবারেই নয়। ছোটোবড়ো সোফা, কুশন, তেমনি ছোটো বড়ো নানা আকারের টেবিলও অনেক আছে। টেবিলে টেবিলে ফুলদানি ও বাতি, দেয়ালে ছবি। সর্বত্র অনেক ফুল, এমনকি জানলার ধারে একটা অ্যাকুয়ারিয়ামও আছে। পড়ন্ত বেলায় ঘরের মধ্যে ঝাপসা অন্ধকার। তারই মধ্যে আলিয়োশার চোখে পড়ল একটা সোফার ওপর পড়ে রয়েছে গা থেকে ছেড়ে রাখা সিল্কের আঙরাখা; সোফার সামনে টেবিলে খেতে খেতে ফেলে রেখে যাওয়া দুটি কাপে চকোলেট পানীয়, খানিকটা কেক, স্ফটিক কাচের একটি ডিশে কিছু নীলচে কিশমিশ, আরেকটিতে কিছু মিষ্টি। দেখে বোঝাই যায় এইমাত্র এখানে আরও কারা সব বসে ছিল। অর্থাৎ এখানে আরও কারা সব অতিথি আছে, তাদেরই আপ্যায়ন করা হচ্ছিল। অতিথি অভ্যাগতদের মাঝখানে এসে পড়েছে অনুমান করে আলিয়োশা ভুরু কোঁচকাল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের ওপাশের ভারী পর্দাটা সরে গেল, ব্যস্তসমস্ত দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল কাতেরিনা ইভানভ্‌না। তার মুখে উৎফুল্ল হাসির উদ্ভাস, সামনে আলিয়োশার দিকে সে দু হাত বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসীও দুটো জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকে সে দুটো টেবিলের ওপর রেখে গেল।

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষকালে এলেন তাহলে! একমাত্র আপনার প্রতীক্ষা করেই আজ সারা দিন ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি! বসুন।”

কাতেরিনা ইভানভ্‌নার রূপ দেখে এর আগেই মুগ্ধ হয়েছিল আলিয়োশা, যখন সপ্তাহ তিনেক আগে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার নিজেরই আগ্রহাতিশয্যে ভাই দ্‌মিত্রি আলিয়োশাকে প্রথম তার কাছে এনে হাজির করে এবং তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেবারের সাক্ষাতের সময় তাদের মধ্যে কথাবার্তা অবশ্য তেমন জমেনি। আলিয়োশা খুবই লজ্জা পাচ্ছে এই ভেবে সেবারে কাতেরিনা ইভানভ্‌না তাকে অনেকটা যেন অব্যাহতি দিয়েছিল, সর্বক্ষণ দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের সঙ্গে কথা বলেছিল। আলিয়োশা চুপ করে ছিল, তবে অনেক কিছু বেশ ভালোভাবে লক্ষও করেছিল। এই অহংকারী মেয়েটির কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাব, তার সাবলীল অহমিকা ও আত্মবিশ্বাস আলিয়োশাকে মুগ্ধ করেছিল। এসবই ছিল সন্দেহাতীত, আলিয়োশার মনে হয়েছিল এর মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। সে লক্ষ করে দেখেছিল যে মেয়েটির কালো জ্বলন্ত চোখদুটো ভারি সুন্দর, তার ওষ্ঠ পাণ্ডুর—এমনকি কতকটা হলদে আভার পাণ্ডুর, লম্বাটে মুখটার সঙ্গে বিশেষ করে মানানসই। কিন্তু ওই চোখ দুটোর মধ্যে ঠিক তার মাধুর্যপূর্ণ দুই ওষ্ঠরেখার মতোই এমন একটা কিছু ছিল যাতে ভাই দ্‌মিত্রির পক্ষে তার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু সে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। সেই সাক্ষাতের পর দ্‌মিত্রি যখন আলিয়োশার পেছনে লেগে থেকে এই বলে অনুনয় বিনয় করতে থাকে যে তার বাগ্‌দত্তাকে দেখে আলিয়োশার কেমন মনে হল তা যেন সে তার কাছ থেকে গোপন না রাখে,

তখন সে প্রায় দ্‌মিত্রির মুখের ওপরই স্পষ্ট ভাষায় তার নিজের এই ধারণাটা প্রকাশ করেছিল।

“ওকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে— তবে সে সুখ হয়তো হবে...”

“সেখানেই তো কথা, কথাটা তো ভাই সেখানেই! এ ধরনের মেয়েরা যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়, ভাগ্যকে এরা মেনে নিতে পারে না। তাহলে তুই মনে করিস আমি ওকে চিরকাল ভালোবাসতে পারব না?”

“না, তা বলছি না, হয়তো তুমি ওকে চিরকাল ভালোবাসবে, কিন্তু ওর সঙ্গে থেকে সব সময় সুখী হবে না।

আলিয়োশা তখন তার এই অভিমত প্রকাশ করে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল, ভাইয়ের অনুরোধের কাছে নতিস্বীকার করে এরকম ‘বোকার মতো’ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছিল বলে নিজের ওপর সে বিরক্তও হয়েছিল। তার কারণ এই যে কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাছেই যাচ্ছেতাই রকম বোকার মতো মনে হয়েছিল। তাছাড়া একজন মহিলা সম্পর্কে এক কথায় এরকম একটা মত দিয়েছে বলে তার লজ্জাও হল। এখন কাতেরিনা ইভানভ্‌না যে ভাবে তার কাছে ছুটে এলো তা দেখে প্রথম দর্শনেই সে বেশি করে অবাক হয়ে অনুভব করল তখন হয়তো সে খুবই ভুল করেছিল। এবারে সে দেখতে পেল অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের প্রসন্নতা এবং সরাসরি ও উদগ্র আন্তরিকতার ভাব উপচে পড়ছে তার সারা চোখে মুখে। তার আগেকার যত ‘সব দেমাক আর গর্ব’ যা সে সময়ে আলিয়োশাকে এতটা অবাক করে দিয়েছিল সে সবের ভেতর থেকে এখন যা বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে তা কেবল নির্ভীক দৃপ্ত মহিমা এবং নিজের ওপর এক ধরনের সুস্পষ্ট প্রবল আস্থা। তাকে প্রথম দেখেই, তার মুখের প্রথম কথাতেই আলিয়োশা বুঝতে পারল যে-মানুষটিকে সে এত ভালোবাসে তার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ট্র্যাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে সেটা তার কাছে একেবারেই গোপন নয়, হয়তো ইতিমধ্যে সবই তার জানা হয়ে গেছে, চূড়ান্ত ভাবে জানা হয়ে গেছে, অথচ তা সত্ত্বেও, এত কিছু সত্ত্বেও তার মুখে কিনা ফুটে উঠেছে এত দীপ্তি, ভবিষ্যতের ওপর তার এত আস্থা! আলিয়োশার হঠাৎ মনে হল সে যেন জেনেশুনে তার কাছে গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছে। আলিয়োশা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে তার আকর্ষণে পড়ে গেল। এসব ছাড়াও তার মুখের প্রথম কথাতেই আলিয়োশা লক্ষ করল সে যেন এমন একটা প্রবল উত্তেজনার ঘোরে, এমনকি, বলতে গেলে কেমন যেন একটা আত্মহারা অবস্থার মধ্যে আছে, যেটা হয়তো একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ।

“আমি এই কারণে আপনার জন্য এত করে অপেক্ষা করছিলাম যে একমাত্র আপনার কাছ থেকেই এখন পুরো সত্যটা জানতে পারব, আর কারও কাছ থেকে তা জানা যাবে না।”

"আমি এসেছি ..." আলিয়োশা তালগোল পাকিয়ে ফেলে বিড়বিড় করে বলল, "আমি  ও আমায় পাঠিয়েছে

"আচ্ছা, ও আপনাকে পাঠিয়েছে! আমার মন কিন্তু ঠিক তা-ই বলছিল। এখন আমি সব জানি, সব জানি!" বলতে বলতে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল তার দু চোখ। "দাঁড়ান আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমি তাহলে আগে থাকতে বলি, কেন আমি এমন আশা করছিলাম আপনাকে। দেখুন, আপনি নিজে যতটা জানেন আমি হয়তো তার চেয়েও ঢের বেশি কিছু জানি। তাই আপনার কাছ থেকে যেটা আমার দরকার তা খবর নয়। দরকারটা কী রকম বলি: আমার জানা দরকার তার সম্পর্কে আপনার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ও চূড়ান্ত মনোভাব, আমি চাই কোনো রকম রং না চড়িয়ে সোজাসুজি, এমনকি দরকার হলে স্থূলভাবে—সে আপনি যতটা স্থূল হতে চান হোন না কেন—আপনি আমাকে বলুন আপনি নিজে এখন ওকে কী চোখে দেখেন এবং এখন ওর যা অবস্থা ওর সঙ্গে আপনার আজকের সাক্ষাতের পর সেটাকেই বা কী চোখে দেখেন? আমি নিজে যদি ওর সঙ্গে খোলসা করতে যেতাম তার চেয়ে হয়তো এটাই ভালো হবে, যেহেতু ও যখন অমনিতে আমার কাছে আসতেও চাইছে না। আপনার কাছে আমি কী চাইছি বুঝলেন তো? আমি ঠিক জানতাম ও আপনাকে পাঠাবে! তা এখন কী বলে সে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে—বলুন, সোজাসুজি বলুন, আপনার একেবারে শেষ কথাই না হয় বলুন!..."

"সে আমাকে বলেছে  আপনাকে তার নমস্কার জানাতে, বলেছে যে আর কখনও আসবে না  আপনাকে শেষ নমস্কার।"

"নমস্কার? এই কথাই বলেছে? ঠিক তা-ই বলেছে?"

"হ্যাঁ, তা-ই।"

"অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভুল করে মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়নি তো? হয়তো কথায় ভুল হয়েছে। কী বলতে কী বলেছে?"

"না, ও আমাকে ঠিক এই কথা বলতে বলেছে, আমি যেন 'নমস্কার জানিয়েছে' —এই কথাটাই জানাই। তিন তিনবার বলেছে, যাতে আমি জানাতে ভুলে না যাই।"

কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল।

"এখন আমাকে সাহায্য করুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্। এখন সত্যি সত্যি আপনার সাহায্য আমার দরকার। আমি কী ভেবেছি আপনাকে বলব, আপনি শুধু আমাকে ধরিয়ে দেবেন আমি যা ভাবছি তা ঠিক কিনা। শুনুন, ও যদি কথায় কথায় আমাকে নমস্কার জানাতে বলত, যদি কথাটা জানানোর জন্য এত পীড়াপীড়ি না করত, তার ওপর এমন জোর না দিত তাহলে আর কিছু বলার থাকত না, সেখানেই সব চুকে বুকে যেত। কিন্তু ও যদি এই কথাটা নিয়েই বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করে, যদি আপনার ওপর বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়ে বলেন যে আপনি

আমাকে ওই 'নমস্কার' জানাতে ভুলে না যান—তার মানে এই যে সে তখন উত্তেজিত অবস্থায় ছিল, সে আর নিজেতে নেই—এমনও তো হতে পারে? মনস্থির করেছে, আবার নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই ভয় পেয়ে গেছে! আমার কাছ থেকে সে যে চলে গেছে তা দমদমিয়ে পা ফেলে নয়, পাহাড় থেকে গোত্তা খেয়ে সোজা নিচে পড়েছে। কথাটার ওপর জোর দেওয়া—এর মানে স্রেফ একটা বাহাদুরি নেওয়াও হতে পারে..."

"ঠিক, ঠিক!" সোৎসাহে সায় দিল আলিয়োশা। "আমার নিজেরই এখন ওরকম মনে হচ্ছে।"

"তাই যদি হয় তাহলে বলতে হয় ও এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি! ও কেবল একটা চরম হতাশার মধ্যে আছে, কিন্তু আমি এখনও ওকে বাঁচাতে পারি। ও হ্যাঁ, টাকাকড়ির কোনো কথা কি ও আপনাকে বলেছে? — তিন হাজার রুবলের কথা?"

"শুধু বলেছে তা-ই নয়, কিন্তু এটাই বোধহয় তাকে সবচেয়ে বেশি করে পীড়া দিচ্ছে। বলেছে যে এখন তার মানসম্মান খোয়া গেছে, এখন তার কাছে সব সমান", উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল আলিয়োশা। সে তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছিল প্রবল আশায় ভরে উঠছে তার বুকটা, হয়তো সত্যি সত্যি তার ভাইয়ের উদ্ধারের উপায় আছে। "কিন্তু তাই বলে আপনি   সেই টাকার কথা কি আপনি জানেন?" আলিয়োশা যোগ করল, তারপর হঠাৎই চুপ করে গেল।

"অনেক দিন আগে থেকে জানি এবং ভালোভাবেই জানি। আমি মস্কোতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি, অনেক দিন আগেই জেনেছি যে টাকাটা পাওয়া যায়নি। ও টাকা পাঠায়নি, কিন্তু আমি এ বিষয়ে ওকে কিছু বলিনি। গত সপ্তাহে আমি জানতে পেরেছি এর পরও ওর আরও টাকার দরকার।   এ সবের মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল একটাই  ও জানুক কার কাছে ফিরে আসা উচিত, কে ওর পরম বিশ্বস্ত বন্ধু। না, ও বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি ওর পরম বিশ্বস্ত বন্ধু, আমাকে চিনতে চাইল না, আমাকে কেবল একজন মেয়েমানুষ হিসেবে দেখে —এর বেশি কিছু নয়। সারাটা সপ্তাহ আমি একটা ভয়ঙ্কর চিন্তার বোঝা নিয়ে কাটিয়েছি  এই ভেবে মরেছি, কী এমন করা যেতে পারে যাতে ওই তিন হাজার উড়িয়ে দেবার জন্য আমার কাছে ওকে লজ্জা পেতে না হয়? মানে, বলতে চাই, লজ্জা পেতে হয় আর সকলের কাছে পাক, নিজের কাছে পাক, কিন্তু আমার কাছে নয়। ঈশ্বরের কাছে যখন ও সব কিছু খুলে বলে তখন তো লজ্জা পায় না! ওর জন্যে আমি কতদূর কষ্ট সইতে পারি আজ পর্যন্ত ও জানল না কেন? কেন, কেন ও আমাকে চিনতে পারল না, এত সব কাণ্ড ঘটে যাবার পরও ওর এত দূর স্পর্ধা যে আমাকে চিনতে পারছে না! আমি ওকে চিরকালের জন্য উদ্ধার করতে চাই। আমি ওর বাগ্‌দত্তা—সে কথা না হয় ভুলেই গেল! আমার কাছে

কিনা নিজের মান সম্মানের জন্য ওর এত ভয়! এই দেখুন না কেন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কোথায়, আপনার কাছে তো মনের কথা প্রকাশ করতে ভয় পেল না? এমনটা কী করে হল যে আজ পর্যন্ত আমি সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারলাম না?"

শেষের কথাগুলি বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল, অশ্রু ঝরে পড়ল তার দুচোখ বেয়ে।

"আপনাকে আমার জানানো উচিত বলতে বলতে আলিয়োশারও গলা কেঁপে উঠল। "বাবার সঙ্গে একটু আগে ওর কী হয়েছিল তা আপনাকে জানানো উচিত।" এরপর যা যা ঘটেছিল আগাগোড়া তার বিবরণ দিল বলল তাকে টাকার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তারপর ঝড়ের বেগে দ্মিত্রির আগমন, বাপকে ধরে প্রহার—এসবের পর দ্মিত্রি বিশেষ করে, একান্তভাবে আলিয়োশাকে আরও একবার জোর দিয়ে বলে সে যেন ওকে তার 'শেষ নমস্কারটা' অতি অবশ্য জানিয়ে আসে। ও গেল সেই মেয়েমানুষটির কাছে..." নিচু গলায় যোগ করল আলিয়োশা।

"আপনার কি মনে হয় ওই মেয়েমানুষটিকে আমি সইতে পারব না? ও ভাবছে, আমি সইতে পারব না? তবে ও তাকে বিয়ে করবে না", বলতে বলতে হঠাৎ নার্ভাস হাসি হাসল সে। "একজন কারামজভের মনে কি আর এরকম আসক্তির হুতাশন চিরকাল জ্বলতে পারে? এটা আসক্তি, ভালোবাসা নয়। ও বিয়ে করবে না, কারণ ওই মেয়েমানুষটিও ওকে বিয়ে করবে না " আবারও হঠাৎ ঠোঁট উলটে বিচিত্র এক ধরনের হাসি হাসল কাতেরিনা ইভানভ্না।

"মিতিয়া হয়তো বিয়ে করতে পারে" চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে আলিয়োশা বলল।

"ও বিয়ে করবে না, আমি আপনাকে বলছি। সে মেয়ে যা তা মেয়ে নয়, স্বর্গের দেবী—জানেন আপনি? আপনি কি তা জানেন?" হঠাৎ অদ্ভুত রকম উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাতেরিনা ইভানভ্না। "সে এক আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য, সৃষ্টির পরমাশ্চর্য! আমি জানি মানুষের মন সে কেমন ভোলাতে পারে, কিন্তু আমি এও জানি তার মনটা কত ভালো, কত দৃঢ়, কত মহৎ তার চরিত্র। অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ? হয়তো আমার এই কথায় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন, হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে—তাই না? এই যে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না লক্ষ্মীটি আমার!" পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কাউকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলল, "এদিকে আমাদের কাছে আসুন। এ হল আলিয়োশা, ভারি চমৎকার মানুষ। আমাদের ব্যাপার সবই জানে। ওর কাছে এসে একবার দেখা দিন!"

"আপনি ডাকবেন ঠিক এই আশাতেই আমি পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছিলাম", স্নিগ্ধ কোমল নারীকণ্ঠের এই উত্তরের মধ্যে যেন বেশ খানিকটা মাধুর্য ফুটে উঠল।

ভারী পর্দাটা সরে গেল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে হাসতে টেবিলের কাছে সশরীরে এগিয়ে এলো গ্রুশেন্‌কা। আলিয়োশার বুকের ভেতর থেকে কী যেন একটা ঠেলে উঠে এলো। গ্রুশেন্‌কার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকাল, চোখ ফেরাতে পারল না। এই তো সে, সেই সাংঘাতিক স্ত্রীলোক, যার সম্পর্কে এই আধঘণ্টা আগেও দাদা ইভানের মুখ ফসকে 'জানোয়ারবিশেষ' কথাটি বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না! এ ত দেখা যাচ্ছে অতি সাধারণ সাদাসিধে একটা মানুষ—বেশ ভালোমানুষগোছের মিষ্টি চেহারার এক মহিলা, সুন্দরীই বলা চলে, তবে দেখতে ভালো অথচ 'সাধারণ' আর দশটা সুন্দরীরই মতো! এটা সত্যি যে দেখতে বেশ ভালো, রীতিমতো ভালো — রুশি সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় তাই, যে সৌন্দর্য বহুজনের এত প্রিয় এবং বহুজনকে কামনায় আকুল করে তোলে। বেশ দীর্ঘাঙ্গী, তবে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার চেয়ে একটু খাটো। কাতেরিনা ইভানভ্‌না অবশ্য বড়ো বেশি লম্বা। গোলগাল নরম চেহারার এই স্ত্রীলোকটির অঙ্গে অঙ্গে কেমন যেন একটা নিঃশব্দ হিল্লোল, এমনই ঢল ঢল ললিত ভাব যা তার কণ্ঠস্বরের মতোই বিশেষ এক ধরনের মদিরতা সঞ্চার করে। তার হাঁটার ভঙ্গিতেও কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মতো দৃঢ়তা ও প্রফুল্লতার প্রকাশ ছিল না। সে এগিয়ে এলো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। মেঝেতে তার পা ফেলার শব্দ শোনা গেল না। কালো রঙের জমকাল রেশমি পোশাকের মৃদু খসখস আওয়াজ তুলে এবং দামি কালো পশমি শালে ফেনার মতো শুভ্র, ভরাট গ্রীবাদেশ ও প্রশস্ত কাঁধদুটো অলসমন্থর ভঙ্গিতে জড়াতে জড়াতে হালকা ভাবে সে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে দেহ ছেড়ে দিল। তার বয়স বাইশ, চেহারায় ঠিক সেই বয়সেরই ছাপ। মুখটা অতিরিক্ত ফরসা, দুই গালে অতিরিক্ত পরিমাণে হালকা গোলাপি ও মৃদু লাল আভা। মুখরেখা যেন বড়ো বেশি প্রশস্ত, এমনকি নীচের চোয়ালটা যেন সামান্য একটু সামনে বেরিয়ে আছে। ওপরের ঠোঁটটা পাতলা, কিন্তু নিচেরটা খানিকটা চোখে পড়ার মতো— দ্বিগুণ পুষ্ট, দেখে মনে হয় যেন ফুলে আছে। তার মাথার গাঢ় বাদামি রঙের অপূর্ব অজস্র কেশদাম, তার ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগল, আঁখিপল্লবের দীর্ঘ ঝালরে ঘেরা ধূসর নীল রঙের অপরূপ দুটি চোখ—এসবের জন্য একজন চরম উদাসীন ও অন্যমনস্ক মানুষ পর্যন্ত—তা সে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ভিড়ের মধ্যে, দোকানে বাজারে—যেখানেই হোক না কেন, এই মুখের সামনে থমকে না দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘকাল তাকে মনে না রেখে পারে না। এই মুখের মধ্যে আলিয়োশাকে যা সবচেয়ে অবাক করে দিল সেটা তার শিশুসুলভ সারল্যের প্রকাশ। তার দুচোখের দৃষ্টি শিশুর মতো, শিশুর মতোই কীসের যেন এক আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত, টেবিলের কাছে সে যে এগিয়ে এলো তাও খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে। তাকে এখন দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন শিশুর অধীরতা ও অসন্দিগ্ধ কৌতূহল নিয়ে কিছু একটার প্রতীক্ষায় আছে। তার চোখের দিকে তাকালে মনটা

আনন্দে ভরে ওঠে—আলিয়োশা এটা উপলব্ধি করতে পারছিল। তার ভেতরে আরও এমন কিছু ছিল যা আলিয়োশা নিরূপণ করতে পারে নি, সেটা বোধহয় তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না, কিন্তু তা হলেও হয়তো বা তার অজ্ঞাতসারে তাকে প্রভাবিতও করেছে—আর তা হল আবারও সেই নরম ভাব, স্নিগ্ধ কমনীয় দেহহিল্লোল, তার গতিবিধিতে সেই মার্জারসুলভ নৈঃশব্দ্য। অথচ দেহটা তীব্র শক্তিতে ও প্রাচুর্যে ভরপুর। শালের আড়াল থেকে প্রকাশ পাচ্ছে তার প্রশস্ত ভরাট দুটো কাঁধ, তার পীনোন্নত স্তনযুগল যা এখনও নিতান্তই কিশোরীসুলভ। এই দেহসৌষ্ঠব হয়তো বা মিলোর ভিনাসের আকৃতির প্রতিশ্রুতি বহন করে, যদিও অনুপাতটা যে ইতিমধ্যে অবশ্যই বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিত তা উপলব্ধি করা যায়। যাঁরা রুশ নারীসৌন্দর্যের রসজ্ঞ গ্রুশেন্‌কাকে দেখে তাঁরা অভ্রান্ত ভাবে বলে দিতে পারেন যে এখনও তরতাজা, অল্পবয়সের এই যে রূপ তা ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তার সৌষ্ঠব হারিয়ে ফেলবে, ধেবড়ে যাবে, মুখটাই থলথলে হয়ে যাবে, চোখের আশেপাশে আর কপালে অতি দ্রুত দেখা দেবে বলিরেখা, মুখের রঙে প্রকাশ পাবে একটা রুক্ষ ভাব, মুখটা হয়তো রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে—এক কথায়, এ সৌন্দর্য পলকের সৌন্দর্য, ধাবমান সৌন্দর্য যা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ঠিক এই রুশ নারীদের মধ্যেই। আলিয়োশা, বলাই বাহুল্য, একথা ভাবেনি; কিন্তু যদিও সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবু কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর অনুভূতিতে এবং এক ধরনের অনুকম্পাতে তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, সে নিজেকে প্রশ্ন করল: 'অমন টেনে টেনে কথা বলে কেন? স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে না?' এই টেনে টেনে উচ্চারণ, শব্দের মাঝখানে ও ধ্বনির মধ্যে অতিরিক্ত মাধুর্য সঞ্চারের ওপর জোর দেওয়ার এই যে প্রয়াস তা সে করছে স্পষ্টত এই কারণে যে এর মধ্যে সে সৌন্দর্যের সন্ধান পাচ্ছে। অবশ্যই এটা একটা কুশিক্ষা, খুবই বাজে ধরনের একটা অভ্যাস, শিক্ষার অভাবে ছোটোবেলা থেকে শিষ্টাচার সম্পর্কে যে তার সঠিক ধারণা গড়ে ওঠেনি তারই পরিচায়ক। তা সত্ত্বেও তার মুখের এই শিশুসুলভ সরল আনন্দোচ্ছল অভিব্যক্তি, তার দু চোখে কচি শিশুর মতো সুখানুভূতি ও প্রশান্তির এই যে দীপ্তি তা তার কথা বলার এই ভঙ্গি ও উচ্চারণের এই টানের এমনই বিরোধী যে আলিয়োশার কাছে দুটোকে মেলানো প্রায় অসম্ভব বলে মনে হল। কাতেরিনা ইভানভ্‌না চোখের পলকে তাকে আলিয়োশার মুখোমুখি একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে দিল, উচ্ছ্বসিত হয়ে কয়েকবার তার হাসি-হাসি মুখে চুমো খেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ওর প্রেমে পড়ে গেছে।

"আমাদের এই প্রথম দেখা, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ", আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাতেরিনা ইভানভ্‌না বলল, "আমি ওকে জানতে চেয়েছিলাম, দেখতে চেয়েছিলাম, ওর কাছে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেই যেচে এসেছে। আমি ঠিক জানতাম, আমরা দুজনে মিলে সব মীমাংসা করে

ফেলব, ঠিক মীমাংসা করে ফেলব! আমার মন তাই বলছিল। আমাকে অনেক করে বলা হয়েছিল আমি যেন এ পথে পা না বাড়াই, কিন্তু আমি মনে মনে ভেবে দেখেছিলাম এতে কাজ হবে, আমি ভুল করিনি। গ্রুশেন্‌কা সব কথা আমায় খুলে বলেছে, তার সমস্ত পরিকল্পনার কথা আমায় বলেছে। সে যেন স্বর্গের পরম উদার দেবীর মতো পাখা মেলে এখানে উড়ে এসেছে, পরম সুখশান্তি আর আনন্দ নিয়ে এসেছে

“কী ভালো যে আমাদের এই লক্ষ্মী দিদিমণিটি!—আমাকে দেখে নাক সিঁটকোল নি!” সেই আগের মতোই আহ্লাদে গদগদ মিষ্টি হাসি হেসে সুরেলা গলায় টেনে টেনে বলল গ্রুশেন্‌কা।

“আহা আমার মন মাতানো মায়াবিনী, অমন কথা তুমি বলতে পারলে কী করে! তোমাকে দেখে আমি নাক সিঁটকোব? এই যে তোমার নীচের ঠোঁটে আমি আরও একবার চুমো খাচ্ছি। তোমার ওই ঠোঁটটা অমনিতেই ঠিক যেন ফুলে রয়েছে, তা হোক, না হয় আরও আরও বেশি করেই ফুলুক। দেখুন, দেখুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কেমন হাসছে। স্বর্গের দেবীর মতো অমন মানুষকে দেখে বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে।

আলিয়োশা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। একটা শিরশিরে ভাব অলক্ষিতে তার মধ্যে সামান্য একটু কাঁপুনিও সঞ্চার করল।

“আমাকে বড়ো বেশি লাই দিচ্ছ গো দিদিমণি। বলা যায় না, আমি হয়তো তোমার আদরের একেবারেই যুগ্যি নই।”

“যোগ্য নয়! ও কিনা এর যোগ্য নয়!” সেই একই রকম উত্তেজিত কণ্ঠে কাতেরিনা ইভানভ্‌না আবার বলে উঠল। “জানেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্‌, আমাদের মতো লোকদের এই ছোটো মাথাটা ভারি অদ্ভুত! আমরা আমাদের খেয়াল খুশি মতো কাজ করি, কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে আবার কত অহংকারই না বাসা বেঁধে আছে! ও আমাদের কত বড়ো, কত উদার তা জানেন কি আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ? তবে ভাগ্যটাই শুধু মন্দ। বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে কোনো অযোগ্য ব্যক্তির জন্যে, হয়তো বা চপলমতি কারও জন্যও যে-কোনো রকম আত্মত্যাগে এই মানুষগুলো প্রস্তুত। একজন মানুষ ছিল—সেও একজন মিলিটারি অফিসার—যাকে ভালোবেসে সব কিছু উজাড় করে দিয়েছিল। সে আজ অনেককাল আগেকার কথা—বছর পাঁচেক হয়ে গেল। কিন্তু লোকটা ওকে ভুলে গেল, আরেকজনকে বিয়ে করল। এখন সে বিপত্নীক, চিঠি লিখে খবর পাঠিয়েছে যে এখানে আসছে। জানেন, ও আমার কেবল তাকে, একমাত্র তাকেই ভালোবেসেছে আজ পর্যন্ত, সারা জীবন ধরে তাকেই ভালোবেসে এসেছে। সে আসবে, গ্রুশেন্‌কা আবার তার সুখ ফিরে পাবে। পুরো এই পাঁচটা বছর কী অসুখীই না ও ছিল! কিন্তু কে ওকে নিন্দে করবে, কেই বা বড়াই করতে পারে ওর অনুগ্রহ লাভের জন্য? সে পারে কেবল

ওই বুড়ো পঙ্গু ব্যাবসাদারটা, যাকে বিশেষ করে ওর বাপের মতন বা বন্ধুস্থানীয় ও রক্ষক বলাই ভালো। ও আমাদের যাকে ভালোবাসত সে যখন ওকে ছেড়ে চলে গেল তখন হতাশায়, মনের দুঃখে ও জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। সেই সময় কিন্তু এই বুড়োই ওকে রক্ষা করে, ওকে প্রাণে বাঁচায়!"

"আমাদের লক্ষ্মী দিদিমণিটি, তুমি কিন্তু বড়ো বেশি আমার পক্ষ নিয়ে সওয়াল করছ", আবার টেনে টেনে বলল গ্রুশেন্‌কা।

"পক্ষ নিয়ে? আরে তোমার পক্ষ নেব কি? তোমার পক্ষ নেব সে অধিকার কি আমার আছে? গ্রুশেন্‌কা, আহা, স্বর্গের দেবী আমার, তোমার ওই হাতখানি দাও দেখি আমাকে। একবার তাকিয়ে দেখুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ এই নরম তুলতুলে ছোট্ট অপূর্ব হাতখানির দিকে! দেখছেন তো এটাকে, এটা আমাকে সুখ এনে দিয়েছে, আমাকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে, তাই এই যে, এটাকে আমি এখন চুমো খাব — চুমো খাব এই হাতের পিঠে, হাতের তালুতেও। এই যে, এই দেখুন, দেখুন!" এই বলে সে ভাবোন্মত্তের মতো সত্যি সত্যি তিনবার চুমো খেল গ্রুশেন্‌কার সেই হাতটিতে যা অপূর্ব হলেও হয়তো বা বড়ো বেশি মাত্রায় নরম তুলতুলে। অন্যদিকে গ্রুশেন্‌কাও স্নায়বিক উত্তেজনাবশত খিলখিল করে মধুর হাসি হাসতে হাসতে দিব্যি তার হাতখানি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে 'লক্ষ্মী দিদিমণিটির' হাবভাব লক্ষ করতে লাগল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার হাতে যে চুমো খাচ্ছে এটা তার ভালোই লাগছে। 'পুলকটা বড়ো বাড়াবাড়ি রকমের মনে হচ্ছে যেন', এরকম একটা চিন্তা আলিয়োশার মাথায় খেলে যেতে সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল, সর্বক্ষণই ভেতরে ভেতরে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের সামনে আমার হাতে অমন করে চুমো খেয়ে আর লজ্জা দেবেন না লক্ষ্মী দিদিমণি আমার।"

"আহা, এই করে কি তোমাকে লজ্জায় ফেলে দেওয়া আমার ইচ্ছে?" বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল কাতেরিনা ইভানভ্‌না। "ছিঃ! তুমি আমাকে এত খারাপ ভাবতে পারলে ভাই!"

"কিন্তু এও তো হতে পারে যে আপনিও আমাকে একদম বুঝতে পারছেন না লক্ষ্মী দিদিমণি আমার। এমনও ত হতে পারে যে আমাকে দেখে আপনার যা মনে হচ্ছে আমি তার চেয়ে অনেক বেশি মন্দ। আসলে আমার ভেতরটা খারাপ, আমি নিজের খেয়ালখুশি মতো চলি। বেচারি দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচকে স্রেফ মজা করার জন্যেই তখন বশ করতে গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু এখন? এখন তো তুমিই তাকে বাঁচাবে। তুমি কথা দিয়েছ। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলবে, তুমি তাকে খুলে বলবে যে তুমি অনেক কাল হল আরেকজনকে ভালোবাস, আর সেই লোক এখন তোমাকে গ্রহণ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে..."

"না, না অমন কোনো কথা আমি আপনাকে দিইনি। ও সব কথা আপনিই নিজে আমাকে বলেছেন, কিন্তু আমি দিইনি।"

"তাহলে বলছ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি।" বেশ খানিকটা যেন পাণ্ডুর হয়ে গেল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মুখ। মিনমিন করে সে বলল, "তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে..."

"না গো ভালোমানুষ দিদিমণি আমার, ওসব পিতিজ্ঞে-টিতিজ্ঞে কিছুই আমি আপনার কাছে করিনি", শান্ত ও মোলায়েম গলায় তাকে বাধা দিয়ে বলল গ্রুশেন্‌কা। সেই খুশি খুশি ও নিষ্পাপ ভালোমানুষি ভাব ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠস্বরে। "তাহলে মানী দিদিমণি আমার, আমি যে আপনার কাছে কী পরিমাণ বাজে আর খামখেয়ালি ধরনের জীব এখন তা দেখতে পাচ্ছেন তো? আমার যখন যা ইচ্ছে করে আমি তা-ই করি। হতে পারে কিছুক্ষণ আগে অমন একটা কথা আপনাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু এই এখন ফের ভাবছি : আবার যদি হঠাৎ ভালো লেগে যায় ওকে—আমাদের মিতিয়াকে?—বলা যায় না, একবার যখন আমার বড্ড ভালো লেগেছিল, এমনকি পুরো একটা ঘণ্টাই যখন সেই ভালোলাগাটা ছিল। বলা যায় না হয়তো এই এখনই যাব, গিয়ে তাকে এখন বলব আজ থেকেই সে যেন আমার কাছে থাকে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি কেমন অস্থিরমতি..."

"এই একটু আগে তুমি যা বলেছিলে সে তো একেবারে অন্য কথা ভাই", কাতেরিনা ইভানভ্‌না কোনো মতে আমতা আমতা করে বলল।

"আহা, সে তো একটু আগে! আমার মনটা যে একেবারে নরম, বড়ো বোকা আমি। একবার ভেবে দেখুন, আমার জন্যে তাকে কত কিছুই না সইতে হয়েছে! এরপর হঠাৎ যদি বাড়ি ফিরে গিয়ে তাই ভেবে তার জন্যে মনে দুঃখ্যু হয়—তখন কী হবে?"

"এটা আমি আশা করিনি

"আহা দিদিমণি, আমার পাশে আপনি—সে যে কত ভালো কত উদার মনের মানুষ! এখন আপনি খুব সম্ভব আমার মতো এমন একটা বোকা মেয়েকে তার এই স্বভাবের পরিচয় পেয়ে আর ভালোবাসবেন না। আপনার ওই সুন্দর হাতখানা আমাকে দিন, স্বর্গের দেবী, আমার দিদিমণি", স্নিগ্ধকণ্ঠে এই অনুরোধ জানিয়ে যেন পরম শ্রদ্ধাভরে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল। "এই যে দিদিমণি আমার, আপনার হাতটা ধরলাম, আপনি যেমন আমার হাতে চুমো খেয়েছিলেন তেমনি আমিও আপনার হাতে চুমো খাব। আপনি আমার হাতে তিনবার চুমো খেয়েছিলেন, শোধবোধ করতে হলে আমার উচিত হবে এর বদলে আপনার হাতে তিনশ বার চুমো খাওয়া। তাহলে তা-ই হোক, এরপর ঈশ্বরের যা ইচ্ছে। তেমন হলে আমি পুরোদস্তুর আপনার কেনা বাঁদি হয়ে থাকব, দাসীবাঁদির মতোই সব ব্যাপারে আপনার মন জুগিয়ে চলতে চাইব। আমাদের মধ্যে কী বোঝাপড়া

হয়েছে, কে কী আশ্বাস দিয়েছে সে সব বাদ দিয়ে ঈশ্বর যা ভালো মনে করেন তাই হোক। আহা আপনার এই হাতটা, এই মিষ্টি হাতটা দিন দেখি লক্ষ্মীটি আমার! লক্ষ্মী দিদিমণি আমার! এমন রূপের ডালি—এ যে ভাবাই যায় না!"

বলতে বলতে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার হাতটা সে আস্তে আস্তে তুলে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো, সত্যি সত্যি চুমো দিয়ে 'শোধবোধ' করার সেই অদ্ভুত উদ্দেশ্য নিয়ে। কাতেরিনা ইভানভ্‌না হাত সরিয়ে নিল না 'দাসী বাঁদির মতো' তার মন জুগিয়ে চলার শেষ যে প্রতিশ্রুতি গ্রুশেন্‌কা দিল, মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে সে তার শেষ কথাগুলি শুনল, যদিও প্রতিশ্রুতিটা যে-ভাবে প্রকাশ পেল সেটাও ছিল ভারি অদ্ভুত। কাতেরিনা ইভানভ্‌না উদগ্রীব হয়ে তাকাল তার চোখের দিকে সে চোখে দেখতে পেল সেই একই সহজ সরল মনের অসন্দিগ্ধ ভাব, সেই আগের মতোই নির্মল আনন্দ। 'মেয়েটা হয়তো বড়ো বেশি সরল।' এক ঝলক আশার আলো জেগে উঠল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মনে।

ইতিমধ্যে গ্রুশেন্‌কা যেন 'মিষ্টি হাতটা'র সৌন্দর্যে পুলকিত হয়েই ধীরে ধীরে সেটা তুলে তার নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়েও এসেছিল। কিন্তু একেবারে ঠোঁটের কাছটায় এনে হঠাৎ দু তিন পলকের জন্য এমন ভাবে ধরে রেখে দিল যেন কোনও গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে।

"তা হাঁ গো দিদিমণি, স্বর্গের দেবী আমার, বুঝলেন কিনা " হঠাৎ কণ্ঠে আরও বেশি করে কোমল ভাব ফুটিয়ে তুলে, সুধা ঢেলে দিয়ে টানা-টানা উচ্চারণে সে বলে উঠল, "বুঝলেন, আমি কিন্তু আপনার হাতে চুমো খেতে যাচ্ছি নে।" বলতে বলতে দারুণ খুশি হয়ে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

"সে তোমার যেমন ইচ্ছে। আরে কী হল?" হঠাৎ চমকে উঠল কাতেরিনা ইভানভ্‌না।

"তাহলে এই কথাই মনে রেখে দিন যে আপনি আমার হাতে চুমো খেয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমি আপনার হাতে চুমো খাইনি", বলতে বলতে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার চোখে। একটা ভয়ঙ্কর নির্নিমেষ দৃষ্টি হানল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার দিকে।

"বেহায়া বজ্জাত কোথাকার!" হঠাৎ কী যেন একটা বুঝতে পেরে ঝট করে বলে উঠল কাতেরিনা ইভানভ্‌না। তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, লাফ দিয়ে সে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে গ্রুশেন্‌কাও উঠে পড়ল।

"তাহলে মিতিয়াকে আমি এখনই এই গল্প বলব যে আপনি আমার হাতে চুমো খেয়েছিলেন, কিন্তু আমি আপনার হাতে একদম চুমো খাইনি। ওঃ যে হাসিটা ও হাসবে না!"

"পাজি হারামজাদি, বেরিয়ে যা!"

"ছি ছি কী লজ্জার কথা দিদিমণি, ইশ্ কী লজ্জার কথা! আপনার মতো বড়ো

ঘরের মেয়ের মুখে কিন্তু এরকম বাজে কথা একেবারেই মানায় না, যাই বলুন না কেন দিদিমণি।"

"দূর হয়ে যা, বাজারে মেয়েমানুষ কোথাকার!" উৎকট চিৎকারে ফেটে পড়ল কাতেরিনা ইভানভ্না। তার মুখটা একেবারে বিকৃত হয়ে উঠল, মুখের প্রতিটি রেখা কাঁপতে লাগল।

"বটে, আমি হয়ে গেলাম বাজারে? নিজে কুমারী মেয়ে হয়ে সন্ধের অন্ধকারে টাকা রোজগারের ধান্ধায় তোমার ওই নাগরগুলোর কাছে রূপযৌবন বেচতে যেতে সে আমি জানি নে বুঝি?"

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এলো কাতেরিনা ইভানভ্নার মুখ দিয়ে। সে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল গ্রুশেন্কার ওপর, কিন্তু আলিয়োশা তাকে সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরে রাখল।

"উঁহু এক পাও নয়, একটি কথাও নয়! কথা বলবেন না, ওর কথার কোনো জবাবও দেবেন না। চলে যাবে, এখনই চলে যাবে!"

ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার কানে যেতে কাতেরিনা ইভানভ্নার দুই মাসি ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে, তাদের পরিচারিকাও ছুটে এসেছে। সকলে ছুটে গেল তার দিকে।

"যাব তো বটেই", সোফা থেকে আঙরাখাটা খপ্ করে তুলে নিয়ে গ্রুশেন্কা বলল। "আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি আমার, একটু পৌঁছে দাও না আমাকে!"

"চলে যান, চলে যান বলছি, আর দেরি করবেন না!" তার সামনে হাত জোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল আলিয়োশা।

"আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি আমার, পৌঁছে দাও! চল না, পথে যেতে যেতে তোমাকে খুব খু-উ-ব ভালো একটা কথা বলব! এই যে কাণ্ডটা এখানে বাধালাম সেটা তোমারই মুখ চেয়ে গো আলিয়োশা। দাও না, একটু পৌঁছে দাও না সোনা আমার, পরে কিন্তু তোমার ভালোই লাগবে।"

আলিয়োশা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের হাত নিজেই মোচড়াতে লাগল। গ্রুশেন্কা খিল খিল করে হাসতে হাসতে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কাতেরিনা ইভানভ্না হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কান্নায় তার গলা বুঁজে এলো। সকলে তার চারধারে ছুটোছুটি করতে লাগল।

"আমি তোমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছিলাম", বড়ো মাসি তাকে বলল। অমন কাজ করতে না-ই করেছিলাম। তুমি আবার বড়ো রগচটা মানুষ।... অমন কাজ কেউ করতে যায়! এই জীবগুলোকে তুমি চেন না, আর এটা সম্পর্কে তো কোন কথাই নেই—লোকে বলে ওরকম নচ্ছার আর দুটি হয় না।... না বাপু, তোমার বড্ড বেশি গোঁ!"

"ওটা একটা বাঘিনী!" কাতেরিনা ইভানভ্না আর্তনাদ করে উঠল। "আমাকে

আটকাতে গেলেন কেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ? ওটাকে আমি মেরে পাট পাট করে দিতাম, ঠিক দিতাম!"

আলেক্সেইয়ের উপস্থিতিতেও নিজেকে সামলানোর সাধ্য তার ছিল না, হয়ত বা সে ইচ্ছাও তার ছিল না।

সবার সামনে মশানের মাচায় তুলে জল্লাদ দিয়ে বেত মারা উচিত ছিল!

আলিয়োশা পিছিয়ে দরজার কাছে সরে গেল।

"হা ঈশ্বর!" হঠাৎ দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়ে কাতেরিনা ইভানভ্না চেঁচিয়ে উঠল। "ও এটা কী করল! ও কী করে এমন বিবেকহীন, এমন অমানবিক হতে পারল! সে দিন চিরকালের অভিশপ্ত দিনটিতে, সেই সর্বনাশা দিনটিতে যা ঘটেছিল সে কথা ও কিনা এই বজ্জাত মেয়েমানুষটাকে বলেছে! বলে কিনা 'ওগো আমার বড়ো মানুষের মেয়ে, তুমি তো রূপ বিক্রি করতে যেতে!' এ বেটি জানে! আপনার দাদাটা একটা ইতর লোক আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ!"

আলিয়োশা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলার মতো কথা সে খুঁজে পেল না। তার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল

"আপনি চলে যান, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ! আমার লজ্জা হচ্ছে, এত খারাপ লাগছে আমার! আগামীকাল আপনার দুটি পায়ে পড়ি, কাল একবার আসুন। আমাকে মন্দ ভাববেন না, ক্ষমা করবেন, আমি জানি না এরপর আমি নিজেকে নিয়ে কী করব!"

আলিয়োশা অনেকটা যেন টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। কাতেরিনা ইভানভ্নার মতো তারও কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। হঠাৎ বাড়ির পরিচারিকা ছুটে এসে তার নাগাল ধরল।

"মাদাম খখ্‌লাকোভার একটা চিঠি আছে আপনার নামে। ডিনারের সময় থেকে দিদিমণির কাছে পড়ে আছে, আপনাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

আলিয়োশা যন্ত্রচালিতের মতো ছোট্ট গোলাপি খামটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে জামার পকেটে পুরল।

## এগারো

## আরও একটি ভূলুণ্ঠিত মানসম্ভ্রম

শহর থেকে মঠের দূরত্ব সিকি ক্রোশের খুব একটা বেশি নয়। এই সময়টাতে পথঘাট জনশূন্য থাকে। আলিয়োশা দ্রুত পা চালাল। এতক্ষণে বলতে গেলে রাত নেমে এসেছে। ত্রিশ পা মতন দূরের জিনিস পর্যন্ত অন্ধকারে ঠাহর করা বেশ কঠিন। প্রায় অর্ধেক পথ চলার পর চৌরাস্তার একটা মোড় পড়ল। মোড়ের মাথায় নিভৃত একটা উইলো গাছ, তার তলায় আবছায়া একটা মূর্তি চোখে পড়ল।

আলিয়োশা সবে মোড়ের মাথায় পা ফেলেছে এমন সময় মূর্তিটা এক ঝটকায় সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, উন্মত্ত কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে বলল

"হয় টাকার থলে দাও, নয়ত জান দাও!"

বেজায় চমকে উঠেছিল বটে আলিয়োশা। অবাক হয়ে সে বলল, "ও, মিতিয়া বুঝি"

"হাঃ-হাঃ-হাঃ! এখানে আশা করিস নি, তাই না? ভাবলাম, কোথায় তোর জন্য অপেক্ষা করা যায়? ওর বাড়ির কাছে কোথাও করব? ওখান থেকে আবার তিনটে রাস্তা তিন দিকে চলে গেছে—তোকে ফস্‌কানোর সম্ভাবনা আছে। শেষকালে ভেবেচিন্তে দেখলাম এখানে অপেক্ষা করাই ঠিক হবে, কেন না এখান দিয়ে ওকে যেতেই হবে, এছাড়া মঠে যাবার আর কোনও রাস্তা নেই। তা এবারে সত্যি কথাটা খুলে বল, আমাকে আরশুলার মতো পিষে মেরে ফেল তাও ভালো আরে হল কী তোর?"

"কিছু হয়নি, ভাই যা ভয়টা পেয়ে গিয়েছিলাম! ওঃ ভাই দ্‌মিত্রি! আজকে বাবার এই রক্তপাত দেখতে হল!" আলিয়োশা কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ হলই তার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তার বুকের ভেতরে হঠাৎ কী যেন একটা ছিঁড়ে গেল। "তুমি বাবাকে আরেকটু হলেই খুন করে বসেছিলে যা নয় তাই বলে তাকে শাপশাপান্ত করেছ... আর এখন এখন কিনা তুমি মজা করছ... হয় টাকার থলে দাও, নয়ত জান দাও!"

"কেন? তাতে কী হয়েছে? খারাপ দেখাচ্ছে নাকি? পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না বলতে চাস?"

"না না আমি অমনি

"দাঁড়া ভাই, একবার তাকিয়ে দ্যাখ এই রাতটা। দেখছিস কী ভীষণ অন্ধকারে ঢাকা, কী ঘন মেঘ, আর কী হাওয়া! এখানে এই উইলো ঝাড়ের তলায় ঘাপটি মেরে তোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হল—ঈশ্বর সাক্ষী, সত্যি বলছি।—এত কষ্ট করার কী আছে? কীসের এই প্রতীক্ষা? এই তো উইলো ঝাড়টা, রুমাল আছে গায়ে জামা আছে, পাকিয়ে একটা দড়ি বানিয়ে নিতে আর কতক্ষণ! তার ওপর একজোড়া গেলিসও তো আছে—তা হলে আর এই পৃথিবীর এমন বোঝা হয়ে থাকা কেন? আমার এই হীন উপস্থিতি দিয়ে তার সম্মানহানি ঘটানো কেন? এমন সময় শুনতে পেলাম তোর পায়ের শব্দ—তুই আসছিস সঙ্গে সঙ্গে হা ঈশ্বর, কী বলব তোকে! — কী একটা যেন উড়ে এসে আমার বুক জুড়ে বসল: মনে হল, আরে, এমন একজন মানুষ তো আছে যাকে আমিও ভালোবাসি! আর এই তো আসছে সে, সেই মানুষটি আমার আদরের ছোট্ট ভাইটি, যাকে আমি পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি! তোকে আমি এত ভালোবেসেছি,

সেই মুহূর্তে তোর জন্য ভালোবাসায় আমার বুক এমনই ভরে উঠল যে আমি ভাবলাম: এক্ষুনি গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরি! সঙ্গে সঙ্গে আবার বোকার মতো একটা চিন্তাও মাথায় খেলে গেল, মনে হল 'আচ্ছা ওকে একটু মজা করে ভয় পাইয়ে দিই না।' তাই আমি বোকার মতো চিৎকার করে তোকে বললাম 'টাকার থলি দাও!' আমার বোকামির কথা ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে দিস ভাই—স্রেফ আবোল তাবোল, কিন্তু আমার মনের কথা যদি বলিস সেখানেও ভালো বৈ মন্দ কিছু নেই। তা হ্যাঁ মরুক গে যা, এখন বল দেখি, ওখানে গিয়ে কী দেখলি। ও কী বলল? আমি আঘাত পাই তাও ভালো, আমাকে না হয় পিষেই মেরে ফেল, কিন্তু কোনও রকম দয়ামায়া না দেখিয়ে যা সত্যি তাই বল। মারাত্মক ক্ষেপে গিয়েছিল বুঝি?"

"না, ঠিক তা নয়। ওখানে যা ঘটেছিল সেটা একেবারেই অন্যরকম, মিতিয়া। ওখানে ওদের দুজনকেই আমি এখন ওখানে পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"দুজন? কোন্ দুজন আবার?"

"গ্রুশেন্‌কাকে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে পেয়ে গিয়েছিলাম।"

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"অসম্ভব!" সে চিৎকার করে উঠল। কী সব প্রলাপ বকছিস! গ্রুশেন্‌কা কিনা ওর কাছে?"

কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়িতে ঢোকার ঠিক মুহূর্তটি থেকে শুরু করে সেখানে যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল আলিয়োশা তার আনুপূর্বিক বিবরণ দিল। মিনিট দশেক সময় তার লেগেছিল এই বিবরণ দিতে। বেশ স্বচ্ছন্দে গুছিয়ে বলতে পেরেছিল এমন বলা ঠিক হবে না, তবে ঘটনার যে সব জায়গা অথবা সেখানে উল্লিখিত যে সমস্ত কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলিকে ধরে ধরে এবং অনেক সময় একেকটি রেখার টানে সে ব্যাপারে তার নিজের উপলব্ধিকেও যে রকম উজ্জ্বল ভাবে সে তুলে ধরছিল তাতে মনে হয় বিষয়টি সে স্পষ্ট করতে পেরেছিল। একটা ভয়ঙ্কর থমথমে নিথর ভাব ধারণ করে আলিয়োশার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিঃশব্দে কথাগুলি শুনতে লাগল দাদা দ্‌মিত্রি। কিন্তু আলিয়োশার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে দ্‌মিত্রি এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেছে, ঘটনাটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। কিন্তু কাহিনি যত এগিয়ে যেতে লাগল তার মুখের চেহারারও তত পরিবর্তন ঘটতে লাগল —ঠিক বিষণ্ণ নয়, কেমন যেন ভয়াল হয়ে উঠতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুটি করে রইল সে, তার নিথর দৃষ্টি যেন আরও বেশি নিথর, আরও একাগ্র, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। যেটা আরও বেশি অপ্রত্যাশিত ছিল তা এই যে এতক্ষণ যে-মুখে একটা ক্রুদ্ধ ও হিংস্র ভাব দেখা যাচ্ছিল সেটা হঠাৎ যেন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে চট করে একেবারে পালটে গেল, চাপা ঠোঁটজোড়া খুলে ফাঁক হয়ে গেল, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ আচমকা

রীতিমতো অসংযত ও অকৃত্রিম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আক্ষরিক অর্থেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, এমনকি হাসির দমকে অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না।

“তাহলে শেষ পর্যন্ত হাতে চুমো খেল না! চুমো খেল না ত খেলই না, অমনি অমনি পালিয়ে গেল!” বলতে বলতে কেমন যেন অসুস্থ ধরনের একটা উল্লাসে যে ভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল তাতে সেটাকেও প্রগল্‌ভই বলা যেত যদি উচ্ছ্বাসটা এমন অকৃত্রিম না হত। “আরেকজন কিনা এই বলে চেঁচাল যে ও একটা বাঘিনী! তা বাঘিনীই বটে! বলল, ওকে মশানের মাচায় তোলা উচিত? হ্যাঁ, তাই বটে, সেটাই উচিত। আমারও তা-ই মত—উচিত, অনেক দিন আগেই উচিত ছিল! দ্যাখ ভাই, মাচানে তুলে প্রকাশ্যে বেত মারতে হয় মারুক, কিন্তু আগে আমার সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার। বুঝতে পারছি বেহায়াপনার সাক্ষাৎ মহারানি, আগাপাশতলা তাই, ওই হাতে চুমো খাওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে তার পুরো চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। একটা পিশাচী! নরকের যত রকমের পিশাচী কল্পনায় আনা যেতে পারে তাদের সকলের শিরোমণি! এও এক ধরনের চমৎকারিণী বটে! তাহলে বাড়ি চলে গেল বলছিস? দেখি আমিও এখন যাই দেখি, ওর কাছেই ছুটে যাই! ওরে আলিয়োশা, আমার অপরাধ নিস না, আমি কিন্তু মেনেই নিয়েছি যে ওকে গলা টিপে মেরে ফেললেও কম করা হবে।

“কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্‌না! তার কী হবে?” বিষণ্ণকণ্ঠে আলিয়োশা বলে উঠল।

“তাকেও দেখা হয়ে গেছে, তারও স্বরূপটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেখা গেছে। অমন ভাবে আর কখনও দেখিনি! এ হল গিয়ে পৃথিবীর চার চারটি দেশের সবগুলির, অর্থাৎ কিনা পাঁচটি মহাদেশই আবিষ্কার করার মতন! এমনই এক পদক্ষেপ! এ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই কাতিয়া, ইনস্টিটিউটের সেই মেয়েটি যে তার বাবাকে বাঁচানোর মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে চূড়ান্ত ভাবে অপমানিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও কোথাকার কোন্ এক গোলমেলে, চোয়াড়ে আর্মি অফিসারের কাছে ছুটে আসতে ভয় পায়নি! কিন্তু একবার ভেবে দ্যাখ, কী তার দম্ভ! ঝুঁকি নেবার কী তার ঝোঁক! ভাগ্যের মুখোমুখি তার সেই রণরঙ্গিনী মূর্তি, সেই অপরিসীম অবজ্ঞা! বলছিস, ওর মাসি ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল? বুঝলি, এই মাসিটি আবার সেই মাসি যে নিজেই অন্যের ওপর কর্তৃত্ব ফলায়। এ হল মস্কোর সেই জেনারেলের বিধবার আপন বোন। এর নাক আবার তার বোনটির চাইতেও বেশি উঁচু ছিল। কিন্তু মহিলার স্বামীটি সরকারি তহবিল তছরুপের দায়ে ধরা পড়ে তার জমিদারি এবং যাবতীয় ধনসম্পত্তি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, তাইতে তার দেমাকি স্ত্রীরত্নটির কণ্ঠস্বর হঠাৎ নেমে আসে, এর পর থেকে তা আর কখনও চড়েনি। তা সে কিনা কাতিয়াকে সামলে সুমলে রাখতে গিয়েছিল, কিন্তু কাতিয়া তার কথা শোনেনি। ভাবটা এই যে ‘আমি সব কিছু জয় করতে পারি, সব কিছু আমার ক্ষমতাধীন,

চাইলে গ্রুশেন্‌কাকেও জাদু করতে পারি'—এই বলে সে নিজেই নিজের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছে, নিজেই নিজের ওপর জোর খাটিয়েছে—দোষটা তাহলে কার? তোর কি মনে হয় ও যে গ্রুশেন্‌কার হাতে প্রথম চুমো খেয়েছিল সেটা ইচ্ছে করে, কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে করেছিল? উঁহু, আসলে, সত্যি সত্যি সে গ্রুশেন্‌কার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, মানে, গ্রুশেন্‌কার ঠিক নয় — তার নিজেরই স্বপ্নে নিজেরই মোহে সে মশগুল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ভাবটা এই যে এ স্বপ্ন আমার স্বপ্ন, এ মোহ *আমার*! হ্যাঁ ভাই আলিয়োশা, ওদের হাত থেকে, অমন দুটো মেয়েমানুষের হাত থেকে কী করে রেহাই পেলি বল তো? জোব্বা গুটিয়ে তুলে ধরে দৌড় লাগালি বুঝি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

"দাদা, সে দিনের ঘটনার কথা গ্রুশেন্‌কাকে বলে দিয়ে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মনে যে দুঃখ তুমি দিয়েছ সেটা বোধহয় তুমি খেয়ালই করনি। তাইতেই না সে এখন ওর মুখের ওপর বলতে পারল 'তুমি তোমার নাগরগুলোর কাছে গোপনে নিজের রূপযৌবন বিকোতে যেতে'? এর চেয়ে চরম অপমানের আর কী হতে পারে বল তো দাদা?"

আলিয়োশার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে তার দাদা যেন কাতেরিনা ইভানভ্‌নার এই লাঞ্ছনায় খুশিই হয়েছে, যদিও সেটা অবশ্যই হওয়া সম্ভব নয়।

"বাঃ!" হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে কপাল চাপড়ে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ বলে উঠল। এই এখনই ব্যাপারটা সে খেয়াল করল, যদিও আলিয়োশা তাকে এই কিছুক্ষণ আগে এক নিশ্বাসে গড়গড় করে পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়েছে এবং তখনই কাতেরিনা ইভানভ্‌নার অপমানিত হওয়ার কথা আর সে যে 'আপনার দাদাটা একটা ইতর লোক' বলে চিৎকার করে উঠেছিল সে কথাও তাকে বলেছে।

"হ্যাঁ, কাতিয়া যাকে 'সর্বনাশা দিন' বলছে হয়তো আসলে আমিই সেই দিনটির কথা গ্রুশেন্‌কাকে বলেছিলাম। হ্যাঁ, তাই, ঠিকই বলেছিলাম, এখন মনে পড়ছে! সে তো সেই তখনকার কথা, যখন মোক্রয়েতে গিয়েছিলাম। তখন আমি মদের নেশায় চুর হয়ে ছিলাম, জিপ্‌সিগুলো গান গাইছিল। কিন্তু তখন আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কী কান্নাই না কেঁদেছিলাম! আমি নতজানু হয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে কাতিয়ার প্রতিমার পুজো করেছিলাম, গ্রুশেন্‌কাও আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। তখন ও সবই বুঝতে পেরেছিল আমার মনে পড়ছে, ও নিজেও কেঁদেছিল। গেল যা! এখন কিনা সব উলটে গেল? তখন কেঁদেছিল, আর এখন কিনা এখন 'বক্ষে ছুরিকাঘাত'। মেয়েমানুষ মাত্রেই অমন।"

মাথা নিচু করে সে কিছুক্ষণের মতো ভাবনায় ডুবে গেল।

"হ্যাঁ, আমি একটা ইতর লোক! নিঃসন্দেহে একটা ইতর লোক", হঠাৎ বিষণ্নকণ্ঠে সে বলে উঠল। "কেদেছিলাম কি কাঁদিনি তাতে কিছু আসে যায় না—ইতরই বটে! তাকে জানিয়ে দিস, এই আখ্যা আমি গ্রহণ করছি, যদি অবশ্য এতে সে মনে

সান্ত্বনা পায়। যাক, অনেক হয়েছে, এবারে বিদায়ের পালা। আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আনন্দ করার মতো কিছু নেই। তুই তোর পথে, আমি আমার পথে। তোর সঙ্গে আর দেখা করার তেমন একটা ইচ্ছে নেই, একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তখন দেখা যাবে। চলি আলেক্সেই!"

আলেক্সেইয়ের হাতটা সে শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর তখনও চোখ নামিয়ে রেখে, মাথা না তুলেই নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে শহরের দিকে দ্রুত পা বাড়াল। আলিয়োশা দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল, তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সে এই ভাবে, এমন আচমকা একেবারে চলে যেতে পারে।

"দাঁড়া, আলেক্সেই, তোর কাছে একান্তে আরও একটি কথা স্বীকার করার আছে আমার!" হঠাৎ ফিরে এসে আবার বলল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। "আমার দিকে তাকা, ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ  দেখতে পাচ্ছিস, এই এখানে, এই যে এখানটায়—একটা আয়োজন চলছে।" 'এই এখানে' বলার সময় দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ এমন একটা অদ্ভুত ভাব করে তার নিজের বুকে ঘুষি মারল যে মনে হলে সম্মানহানিটা যেন এই এখানে তার বুকের ওপরই কোথাও বসে আছে, সেখানে রাখা আছে—হয়তো তার বুকপকেটে, অথবা তার গলায় বাঁধা ডুরি থেকে ঝুলছে। "আমাকে তোর জানা হয়ে গেছে  আমি ইতর লোক। ইতর বলেই লোকে আমাকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু জেনে রাখ, ঠিক এখন, ঠিক এই মুহূর্তে সম্মানহানির যে বোঝা আমি এই যে এই এখানটায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, যে সম্মানহানির ঘটনাটা ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে, ঘটতে চলেছে, এর আগে আমি যা-ই করে থাকি না কেন, এখন অথবা এর পরেও যা-ই করি না কেন, নীচতার দিক থেকে এর সঙ্গে তার কোনোটারই কোনো তুলনা হতে পারে না, এতটুকু তুলনা হতে পারে না। অথচ সেটা বন্ধ করার পুরোপুরি স্বাধীনতা আমার আছে—ইচ্ছে করলে যেমন বন্ধ করতে পারি, তেমনি ঘটাতেও পারি,—খেয়াল রাখবি কিন্তু! কিন্তু এটাও জেনে রাখ, আমি তা ঘটিয়ে ছাড়ব, বন্ধ করতে যাব না। এই একটু আগে তোকে সবই বলেছি, কিন্তু এটা তখন বলা হয়নি, তার কারণ আমার মতো মানুষও অতটা আকাট হয়ে উঠতে পারে নি! আমি এখনও থামতে পারি, থামলে চাই কি কালই আমার হারানো সম্মানের পুরো অর্ধেকটাই ফিরিয়ে আনতে পারি, কিন্তু আমি থামব না, আমি আমার হীন সঙ্কল্প চরিতার্থ না করে ছাড়ব না। আমি যে আগে থাকতে জেনেশুনে একথা তোকে বলছি তুই ভবিষ্যতে তার সাক্ষী হয়ে রইলি! ধ্বংস আর অন্ধকার! ব্যাখ্যা করে বলার কিছু নেই, যথা সময়ে জানতে পারবি। পূতিগন্ধময় গলিঘুঁজি, একটা নরকের পিশাচী! চললাম। আমার জন্য প্রার্থনা করতে যাস নে, আমি তার যোগ্য নই। তাছাড়া দরকারও নেই, কোনও দরকার নেই, একেবারে দরকার নেই, আদৌ দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। এবার বিদায়!

হঠাৎ সে দূর হয়ে গেল, এবারে একেবারেই চলে গেল। আলিয়োশা মঠের

দিকে হাঁটা দিল। 'এ কেমন কথা? আর কখনও ওর দেখা পাব না এটা কেমন করে হয়? ও বলে কী?' সে ভাবতেই পারছিল না। 'বললেই হল? কালই অতি অবশ্য ওকে দেখতে পাব, খুঁজে বের করব। ঠিক খুঁজে বের করব। এ ও কী বলছে!...

মঠটা এক পাক ঘুরে পাইন বনের ভেতর দিয়ে সে সোজা আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হল। আশ্রমের দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হল, যদিও এরকম সময়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। মহাস্থবিরের প্রকোষ্ঠে ঢোকার সময় তার বুক কেঁপে উঠল। 'কেন, কেন সে বাইরে বেরোতে গিয়েছিল, কেনই বা উনি ওকে 'সংসারাশ্রমে' পাঠিয়েছিলেন? এখানে শান্তি, এটা পুণ্যস্থান, কিন্তু ওখানে পদে পদে বিভ্রান্তি, ওখানে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, পথভ্রষ্ট হতে হয়

আশ্রম প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের ব্রতচারী শিষ্য পর্‌ফিরি ও পুরোহিতব্রতধারী আশ্রমিক সাধু পাইসি। সাধু পাইসি সারা দিন ধরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসে সাধু জোসিমার স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে যাচ্ছেন। আলিয়োশা শুনে ভয় পেয়ে গেল যে সাধু জোসিমার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমনকি আশ্রমভ্রাতাদের সঙ্গে সন্ধ্যায় সচরাচর যে আলোচনা হত তাও আজ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সাধারণত সান্ধ্য প্রার্থনানুষ্ঠানের পর শয়নকালের আগে রোজই সন্ধ্যায় আশ্রমিক আশ্রমভ্রাতারা মহাস্থবিরের আশ্রম প্রকোষ্ঠে এসে জড় হত এবং তাদের প্রত্যেকে মহাস্থবিরের কাছে সরবে তাদের যার যার সেদিনকার পাপকর্ম, পাপচিন্তা, ভাবনা ও প্রলোভনের কথা স্বীকার করত, এমনকি, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিবাদ থাকলে তাও তার কাছে প্রকাশ করত। কেউ কেউ আবার নতজানু হয়ে পাপ স্বীকার করত। মহাস্থবির সমাধান বলে দিতেন, মিটমাট, করে দিতেন, সদুপদেশ দিতেন, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন, আশীর্বাদ করে তাদের সকলকে ছেড়ে দিতেন। আশ্রমভ্রাতাদের এই ধরনের পাপস্বীকারের বিরুদ্ধেই মঠে মহাস্থবির প্রতিষ্ঠান-বিরোধীদের বিদ্রোহ। তাদের কথায় এটা প্রায় অধর্মাচরণ, স্বীকারোক্তির গোপনীয়তা রক্ষার যে পবিত্র বিধান ধর্মশাস্ত্রে আছে এর দ্বারা তা লঙ্ঘিত হচ্ছে, যদিও এখানে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। এমন কি ধর্মীয় শাসন এলাকার উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানানোও হয়েছিল যে এই ধরনের স্বীকারোক্তি কোনো ভালো লক্ষ্য তো অর্জন করতেই পারে না, বরং বস্তুত এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই পাপ ও প্রলোভনের পথে মানুষকে পরিচালনা করে। ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকের কাছে নাকি মহাস্থবিরের কাছে যাওয়াটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইচ্ছে না হলেও তাদের যেতে হয়, যেহেতু সকলেই যাচ্ছে, তারা যদি না যায় তাহলে সেটা তাদের অহমিকা ও বিদ্রোহ চিন্তার প্রকাশ বলে মনে করা হতে পারে। এমনও শোনা গেছে যে

ভ্রাতাদের মধ্যে কেউ কেউ সায়ংকালীন স্বীকারোক্তি করতে যাবার সময় আগে থাকতে নিজেদের মধ্যে এই রকম একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে 'আমি বলব, আজ সকালে আমি তোর ওপর মেজাজ দেখিয়েছি, কথাটা তুই সমর্থন করবি।' এর কারণ কিছু একটা না বললে নয়, স্রেফ দায়সারা গোছের কিছু একটা বলে রেহাই পেতে হয়। আলিয়োশা জানত যে অনেক সময় সত্যি-সত্যিই এরকম ঘটে। আশ্রমিকদের নামে বাড়ি থেকে চিঠিপত্র এলেও আশ্রমের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সেগুলি পর্যন্ত প্রাপকদের হাতে পড়ার আগে মহাস্থবির যাতে খুলে পাঠ করেন সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হত: এর বিরুদ্ধেও যে ভ্রাতাদের মধ্যে একটা বড়ো রকমের ক্ষোভ আছে এটাও আলিয়োশার জানা ছিল। বলাই বাহুল্য, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন ও মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ সরল বিশ্বাসে ও স্বাধীন ভাবে অন্তর থেকেই এসব হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে দেখা যেত তার মধ্যে আন্তরিকতার কোনো নামগন্ধত নেই-ই বরং অনেক সময়ই সেটা হয়ে উঠছে রীতিমতো কৃত্রিম ও মিথ্যা। কিন্তু ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে যারা ওপরের দিকে আছে এবং যারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ তারা তাদের গোঁ ছাড়ে না। তাদের বিবেচনায় 'যারা মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অন্তরের তাগিদে এই চার দেয়ালের মাঝখানে প্রবেশ করেছে এই ধরনের আজ্ঞানুবর্তিতা ও এই সমস্ত কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে তাদের পরিত্রাণ করবে, তাদের পরম উপকার সাধন করবে। অন্য দিকে যাদের কাছে এটা অসহ্য, যারা এই নিয়ে খিটখিট করে তারা আর যাই হোক আশ্রমিক হওয়ার উপযুক্ত নয়, মঠে এসে তারা ভুলই করেছে, তাদের স্থান সংসারে। কেবল জগৎ সংসারে থেকে কেন, দেবালয়ে গিয়েও পাপ থেকে এবং শয়তানের হাত থেকে বাঁচা যায় না, সুতরাং পাপকে কোনোমতে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।'

আলিয়োশাকে আশীর্বাদ করে প্রভু পাইসি নিচু গলায় তাকে জানালেন, "উনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন, একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছেন। জাগানোই কঠিন। কিন্তু জাগিয়ে কাজও নেই। একবার মিনিট পাঁচেকের জন্য জেগে উঠেছিলেন, তখন আশ্রমভ্রাতাদের জন্য তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিতে বললেন আর তাঁদের কাছে অনুরোধ জানাতে বললেন যে তাঁরা যেন রাতের উপাসনার সময় তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন। ভোরবেলা নাগাদ আরও একবার মুখে প্রসাদি সুরা ও রুটি ঠেকানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তোমাকে স্মরণ করেছিলেন আলেক্সেই, জিগ্‌গেস করছিলেন তুমি চলে গেছ কিনা। শহরে গেছ শুনে বললেন, 'ওই জন্যেই ওকে আমি আশীর্বাদ করেছিলাম। ওর স্থান ওখানে, আপাতত এখানে নয়।' তোমার সম্পর্কে এই হল তাঁর উক্তি। পরম স্নেহে তোমাকে মনে করেছেন, তোমার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন — এটা যে তোমার পক্ষে কত বড়ো সম্মানের ব্যাপার তুমি বুঝতে পারছ আলেক্সেই? তবে কথাটা হল কী করে তিনি স্থির করলেন যে আপাতত তোমাকে গৃহাশ্রমে কাটাতে হবে? তার মানে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে ওরকম কিছু একটা তিনি আগে

থাকতে দেখতে পেয়েছেন। ভেবে দেখ, আলেক্সেই, সংসারে যদি ফিরেও যাও তাহলে অসার হাসিখেলায় মেতে থাকার জন্য নয়, জাগতিক সুখভোগের জন্যও নয়, তোমার গুরু মহাস্থবির যে কর্তব্যপালনের শিক্ষা তোমাকে দিয়েছেন সেটা হবে তারই জন্য।"

প্রভু পাইসি কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। মহাস্থবির যে চলে যাচ্ছেন এ বিষয়ে আলিয়োশার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, যদিও আরও দু একদিন বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। আলিয়োশা আবেগে উত্তেজিত হয়ে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করল বাবা কিংবা খখ্লাকোভাদের সঙ্গে, দাদা অথবা কাতেরিনা ইভানভ্নার সঙ্গে দেখা করবে বলে কথা দিলেও আগামীকাল সে মঠ থেকে একেবারে বের হবে না, গুরুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তাঁর শয্যার পাশেই থাকবে। গুরুর প্রতি ভক্তিতে প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তার অন্তর। নিজেকে সে এই বলে তীব্র ধিক্কার দিল যে পৃথিবীতে যাঁকে সে সবার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে তাঁকে যে মঠে মৃত্যুশয্যায় ফেলে রেখে এসেছে শহরে গিয়ে মুহূর্তের জন্য হলেও কী করে সেকথা সে এমন ভুলেই বা থাকতে পারল! মহাস্থবিরের ছোট্ট শোবার ঘরটিতে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসে আভূমি নত হয়ে নিদ্রাভিভূত মানুষটিকে সে প্রণতি জানাল। মহাস্থবির শান্তভাবে স্থির হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন, সমান তালে এত মৃদু নিশ্বাস ফেলছেন যে প্রায় লক্ষই করা যায় না, তাঁর মুখমণ্ডল শান্ত সমাহিত।

আলিয়োশা ফিরে গেল অন্য ঘরটিতে। এটা সেই ঘর যেখানে মহাস্থবির সেদিন সকালে অতিথিদের অভ্যর্থনা করেছিলেন। ঘরে ঢুকে বাইরের জামাকাপড় প্রায় না ছেড়েই, কেবল পায়ের বুটজোড়া খুলে চামড়ায় মোড়া সরু ফালি শক্ত তক্তপোশটার ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ অনেক দিন হল রোজ রাতে সব সময় এটার ওপরই সে ঘুমোয়। বাড়ি থেকে সঙ্গে করে বালিশ ছাড়া আর কিছু নিয়ে আসে নি। শুধু গায়ের ওপরের জোব্বাটা খুলে কম্বলের বদলে সেটা দিয়ে গা মুড়ি দিত। কিন্তু ঘুমোতে যাবার আগে সে নতজানু হয়ে বসে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করত। তার ঐকান্তিক প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের কাছে নিজের মনের বিভ্রান্তি ঘুচানোর জন্য কোনো নিবেদন থাকত না, শুধু থাকত তার আগেকার আপ্লুত হৃদয়ের, আনন্দে আপ্লুত হৃদয়ের এক তীব্র আকুতি, ঈশ্বরের প্রশংসা ও মাহাত্ম্য কীর্তনের পর যা সব সময় তার অন্তরে জাগরূক থাকত। শয়নের আগের মুহূর্তে তার যে প্রার্থনা সেটা সচরাচর আগাগোড়া এরকমটাই হত। এই আনন্দই তার অন্তরে জাগরূক থেকে তাকে সহজ স্বচ্ছন্দ ও শান্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন করত। এবারেও সে সেই রকমই প্রার্থনা করছিল—এমন সময় দৈবাৎ হঠাৎই পকেটে হাত চলে যেতে তার হাতে পড়ে গেল গোলাপি রঙের সেই ছোট্ট খামটা যা তখন ছুটতে ছুটতে এসে পথের মধ্যে তাকে ধরে কাতেরিনা ইভানভ্নার দাসী তার হাতে তুলে দিয়েছিল। আলিয়োশা বিমূঢ় হয়ে গেল, কিন্তু সে তার প্রার্থনা শেষ করল। খানিকটা ইতস্তত করার পর শেষ কালে খামটা খুলল। তার মধ্যে ছিল লিজের নিজের হাতে দস্তখত্ করা

আলিয়োশারই উদ্দেশে লেখা একটা চিঠি। এ সেই লিজে, মাদাম খখ্‌লাকোভার একেবারে বাচ্চা সেই মেয়েটি যে আজ সকালে মহাস্থবিরের সামনেই আলিয়োশাকে নিয়ে মজা করে হেসেছিল।

সে লিখেছে 'আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, সকলের কাছ থেকে গোপনে, এমনকি মার কাছ থেকেও গোপনে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। কাজটা যে কত অন্যায় তা আমি জানি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে অনুভূতি জেগে উঠেছে তা আপনাকে না বলতে পারলে আমার পক্ষে বাঁচা আর সম্ভব হচ্ছে না। আর এটা যথাসময়ের আগে আমাদের দুজনার ছাড়া আর কারও জানা ঠিক হবে না। কিন্তু আমি আপনাকে যা এত করে বলতে চাইছি তা আপনাকে কী করে বলব বলুন তো? লোকে বলে কাগজ নাকি রাঙা হয় না, বিশ্বাস করুন, কথাটা ঠিক নয়—আমি এখন যেমন লজ্জায় আগাগোড়া রাঙা হয়ে উঠেছি কাগজও কিন্তু ঠিক তেমনি হয়ে উঠেছে। প্রিয় আলিয়োশা, আমি আপনাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি সেই ছোট্টবেলা থেকে, যখন আমরা মস্কোয় থাকতাম তখন থেকে। তখন অবশ্য আপনি এখনকার মতো একেবারেই ছিলেন না। আমার এই ভালোবাসা সারা জীবনের। আমি আমার অন্তর থেকে এটাই স্থির করে নিয়েছি যে আপনার সঙ্গে আমি মিলিত হব এবং বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত একসঙ্গে যাপন করে আমাদের সে জীবনের অবসান ঘটবে— অবশ্যই এই শর্তে যে আপনাকে মঠ ছাড়তে হবে। আমাদের বয়সের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, আইনের যা নির্দেশ আছে সেই সময়টুকু পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে আমি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠব, হাঁটতে পারব, নাচতেও পারব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

"দেখছেন তো, আমি কেমন সব দিক ভেবেচিন্তে দেখেছি। কেবল একটা জিনিসই ভেবে পাইনে এ চিঠি পড়ার পর আমার সম্পর্কে আপনি কী ভাববেন? আমি তো শুধু হাসিতামাশা আর দুষ্টুমি করে বেড়াই, এই তো আজ সকালেও আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আপনাকে সত্যি করে বলছি এই এখন কলমটা হাতে নেওয়ার আগে আমি দেবজননীর মূর্তির সামনে প্রার্থনা করেছি এবং এখনও প্রার্থনা করছি, প্রায় চোখের জল ফেলতে ফেলতেই প্রার্থনা করছি।

"আমার গোপন কথা আপনার হাতে। কাল যখন আসবেন জানি না আমি আপনার মুখের দিকে কী ভাবে তাকাব। ওঃ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, কী হবে বলুন তো আবারও যদি বোকার মতো নিজেকে সামলাতে না পেরে আপনার দিকে তাকিয়ে এই আজকের মতোই হেসে ফেলি? তাহলে তো আপনি আমাকে একটা পরিহাসপ্রিয় বাজে মেয়ে বলে মনে করবেন, আমার চিঠির কথায় বিশ্বাস করবেন না। তাই দোহাই আপনার, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার প্রতি যদি আপনার এতটুকু সমবেদনা থাকে তাহলে কাল যখন আমাদের এখানে আসবেন তখন বড়ো বেশি সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাবেন না, কারণ বলা যায়

না, আপনার চোখে চোখ পড়ে যেতে আমি হয়তো দুম করে হেসেই ফেলব—তায় আপনি আবার সন্নেসীর ওই লম্বা জোব্বাটা পড়ে থাকবেন কিনা! এই ভেবে, এমনকি এখনই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাই বলছিলাম কি, ঘরে ঢোকার পর কিছুক্ষণের মতো আমার দিকে একেবারে না তাকিয়ে বরং মামণির দিকে বা জানলার দিকে কোথাও তাকাবেন।...

"এই আমি আপনাকে লিখলাম প্রেমপত্র। হে ঈশ্বর, এ আমি কী করলাম! আমাকে ঘেন্না করবেন না আলিয়োশা। আমি যদি খুব বাজে ধরনের কিছু একটা করে থাকি, যদি আপনার মনে দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন আমার গোপন কথা, আমার যে মান সম্ভ্রম যা হয়তো চিরকালের মতো ভূলুণ্ঠিত, তার গোপন রহস্য আপনারই হাতে।

"আজ আমি নির্ঘাত কাঁদব। আবার দেখা হবে। আমাদের সেই ভয়ঙ্কর সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত—আপাতত বিদায়। লিজে।

"পুনঃ আসবেন কিন্তু, অবশ্য অবশ্য অতি অবশ্যই আসবেন! লিজে।"

আলিয়োশা অবাক হয়ে চিঠিটা পড়ল, দুবার পড়ল। পড়ে একটু ভাবল। তারপর হঠাৎ মৃদু মধুর হাসি হেসে উঠল। আবার কেমন একটু চমকেও গেল—হাসিটা তার কাছে অন্যায় বলে মনে হল। কিন্তু এক লহমা পরেই আবার হাসল—ওই রকমই মৃদু, ওই রকমই সুখের সেই হাসি। চিঠিটা ধীরে ধীরে খামের মধ্যে রেখে দিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করে শুয়ে পড়ল। মনের অস্থির ভাবটা হঠাৎই কেটে গেল। 'হে প্রভু, এদের সকলকে ক্ষমা কর, এই হতভাগ্য ও বিক্ষুব্ধদের রক্ষা কর, তাদের পথ দেখাও। পথ তো তোমারই জানা আছে তোমার সেই সকল বিচিত্র পথের সাহায্যে তাদের উদ্ধার কর। তুমি প্রেমময়, তুমি সকলকে আনন্দ বিতরণ করবে!' ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করে অস্ফুটস্বরে কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে প্রশান্ত তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আলিয়োশা।

The Online Library of Bangla Books

# দ্বিতীয় পর্ব

## চতুর্থ অধ্যায়

## বুকফাটা হাহাকার

### এক

### প্রভু ফেরাপোন্ত্

খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের আগে ঘুম ভাঙিয়ে আলিয়োশাকে ডেকে তোলা হল। মহাস্থবিরের ঘুম ভেঙেছে। তিনি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছেন, যদিও শয্যা পরিত্যাগ করে তিনি একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি পূর্ণমাত্রায় সজ্ঞানে আছেন। তাঁর মুখে রীতিমতো ক্লান্তির ছাপ থাকলেও সেখানে একটা নির্মল এবং কতকটা প্রফুল্ল ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে আনন্দের উচ্ছলতা, অমায়িক ও সাদর আহ্বান। 'আজকের এই দিনটা হয়তো আমার আর কাটবে না', আলিয়োশাকে একথা বলার পর তিনি অবিলম্বে স্বীকারোক্তি করার এবং মুখে প্রসাদি রুটি ও সুরা ছোঁয়ানোর বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি গ্রহণের স্থায়ী পুরোহিত ছিলেন প্রভু পাইসি। গূঢ় রহস্যপূর্ণ দ্বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু হল তৈল লেপন ও মন্ত্রপাঠ অনুষ্ঠান। পুরোহিতব্রতধারী সাধুদের সমাগম হল, আশ্রম কক্ষ একটু একটু করে আশ্রমিকদের ভিড়ে ভরে উঠতে লাগল। ইতিমধ্যে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। মঠের অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হতে মহাস্থবির সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, সকলকে চুমো খেলেন। কক্ষে স্থানাভাব হওয়ায় যারা প্রথমে এসেছিল তারা বেরিয়ে গিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা করে দিল। আলিয়োশা মহাস্থবিরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। মহাস্থবির আবার হাতলওয়ালা চেয়ারে এসে বসলেন। তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, যতদূর সম্ভব উপদেশ দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর দুর্বল কিন্তু তখনও যথেষ্ট দৃঢ়।

মহাস্থবির তাঁর আশেপাশে ভিড় করে থাকা ভক্তবৃন্দের দিকে স্নেহবিগলিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে রসিকতা করে বললেন, "এত বছর ধরে আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়ে এসেছি, অর্থাৎ কিনা এত বছর ধরে গলাবাজি করে এসেছি এবং আজ পর্যন্ত

কথা বলে বলে তোমাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলাটা আমার এমন একটা অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে যে হে আমার পরম প্রিয় সাধুবৃন্দ ও ভ্রাতৃমণ্ডলী, আমার পক্ষে এমনকি এই এখনও, আমার এই দুর্বল অবস্থা সত্ত্বেও কথা বলার চাইতে চুপ করে থাকা প্রায় কঠিন।"

মহাস্থবির তখন যা বলেছিলেন আলিয়োশা পরে তার কিছু কিছু মনে করে রেখে দিয়েছিল। কথাগুলি যদিও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, যদিও তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব ছিল না, তবু তাঁর কথনে বেশ খানিকটা অসংলগ্নতা ছিল। অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন সারা জীবনে তিনি যা বলে শেষ করতে পারেন নি এখন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে সবই বলার জন্য, আরও একবার প্রকাশ করার জন্য তিনি উন্মুখ। সেটা যে কেবল শিক্ষাদানের খাতিরে তা-ই নয়। সকল মানুষকে ও সৃষ্টির সকলকে তাঁর নিজের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের অংশীদার করার এবং এই জীবনে আরও একবার নিজের হৃদয়কে উজাড় করে ঢেলে দেবার প্রবল তৃষ্ণায় তিনি যেন এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

আলিয়োশা পরে যতদূর মনে করতে পারে, মহাস্থবির উপদেশ দিয়েছিলেন: 'হে সাধুমণ্ডলী তোমরা একে অপরকে ভালোবাস, ঈশ্বরের সন্তান মানুষকে ভালোবাস। এখানে এসে এই মঠের চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বাস করছি বলে যে আমরা সংসারীদের চাইতে বেশি পুণ্যবান এমন মনে কোরো না, বরং আমরা যে এখানে এসেছি ঠিক এর দ্বারাই ইতিমধ্যে আমাদের প্রত্যেকের এই আত্মোপলব্ধি ঘটেছে যে যে-কোনো বিষয়ী মানুষের তুলনায়, পৃথিবীতে আর আর যারা আছে তাদের সকলের তুলনায় আমরা মন্দ। একজন সন্ন্যাসী যত বেশি কাল মঠের এই চার দেয়ালের মাঝখানে বাস করবে এই বিষয়ে সে তত বেশি সচেতন হবে, ততই বেশি করে তার এই আত্মোপলব্ধি ঘটবে, যেহেতু অন্যথায় তার এখানে আসার কোনো অর্থই হয় না। যখন যে উপলব্ধি করতে পারবে যে-কোনো বিষয়ী মানুষের চেয়ে সে যে কেবল মন্দ তা-ই নয়, সকল মানুষের কাছে, সব কিছুর জন্য, মানুষের যাবতীয় পাপকর্ম—জগৎসংসারের এবং মানুষের ব্যক্তিগত পাপের জন্যও অপরাধী, একমাত্র তখনই আমাদের এই সঙ্ঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। সেই হেতু হে আমার পরম স্নেহভাজনেরা, মনে রেখো, আমরা প্রত্যেকে এককভাবে সকলের জন্য এবং পৃথিবীর সব কিছুর জন্য নিঃসন্দেহে অপরাধী—কেবল সাধারণ পার্থিব অপরাধের মাধ্যমেই নয়—ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে সব মানুষের জন্য, এই ধরণীর প্রতিটি মানুষের জন্য সমান অপরাধী। এই বোধই সন্ন্যাসীর জীবনচর্যার—শুধু তা-ই বা কেন, পৃথিবীর যে-কোনো মানুষের জীবনের শীর্ষমুকুট। সেই কারণে, জেনে রাখবে, সন্ন্যাসীরা বিশেষ কোনো ধরনের মানুষ নয়, পৃথিবীর আর দশটা মানুষের যেমন হওয়া উচিত তারাও ঠিক তেমনি। একমাত্র এই বোধ হলেই আমাদের হৃদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত অসীম অনন্ত সেই প্রেমসুধায় আপ্লুত হতে পারে যার কোনো

শেষ নেই। তখন তোমরা প্রত্যেকে প্রেমের শক্তিতে সমস্ত জগৎ অধিকার করতে সক্ষম হবে, তোমাদের অশ্রু দিয়ে জগতের পাপ প্রক্ষালন করতে পারবে। তোমরা সকলে নিজ হৃদয়ে অনুসন্ধান কর, প্রত্যেকে নিরবধি মনে মনে পাপ স্বীকার কর। নিজের পাপকে ভয় পেয়ো না, এমনকি সে সম্পর্কে সচেতন হলেও—একমাত্র যেটা দরকার তা হল অনুতাপ, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে শর্ত করতে যাবে না। আবারও বলছি, অহঙ্কার কোরো না। ক্ষুদ্রের সম্মুখে অহঙ্কার করবে না, বৃহতের সম্মুখেও না। যারা তোমাকে ঘৃণা করছে, অগ্রাহ্য করছে, তোমাকে অপমান করছে, গালিগালাজ করছে, তোমার বদনাম রটাচ্ছে তাদেরও ঘৃণা কোরো না। যারা নিরীশ্বরবাদী, বস্তুতান্ত্রিক, যারা কুশিক্ষা প্রচার করে থাকে তাদের মধ্যে যারা ভালো—কেন না তাদের মধ্যে অনেক ভালো ভালো মানুষও আছেন—বিশেষত আমাদের সময়ে—শুধু তাদের তো বটেই, এমনকি যারা দুষ্ট, তাদেরও ঘৃণা কোরো না। তোমার প্রার্থনায় তাদের স্মরণ করে বোলো 'হে প্রভু, যাদের জন্য প্রার্থনা করার কেউ নেই তাদের সকলকে পরিত্রাণ কর, তাদেরও পরিত্রাণ কর যারা তোমার উদ্দেশে প্রার্থনা উচ্চারণ করতে চায় না।' সঙ্গে সঙ্গে এটাও যোগ কোরো হে প্রভু আমি যে এমত প্রার্থনা করছি তা আমার অহংকারবশত নয়, যেহেতু আমি নিজেই সর্বোপরি সর্বতোভাবে নীচাশয়।... ঈশ্বরের সন্তান মানুষকে ভালোবেসো, বহিরাগতদের এমন সুযোগ করে দিয়ো না যাতে তারা মেষপালকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এই কারণে যে তুমি যদি তোমার আলস্যবশত, তোমার অহংকারজনিত তাচ্ছিল্যবশত, অধিকন্তু স্বার্থপরতার দরুন তন্দ্রাচ্ছন্ন হও তাহলে তারা চতুর্দিক থেকে এসে তোমার মেষপাল ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। জনসাধারণ্যে নিরন্তর সুসমাচারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। অসৎ উপার্জনের পথ গ্রহণ কোরো না। সোনা রুপোর লোভ করবে না, সেগুলি মজুত করবে না। ধর্মের ধ্বজা ধারণ কর, তাতে বিশ্বাস রাখ, সেই ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রাখ।

এখানে যে ভাবে বলা হল অথবা পরে আলিয়োশা যেমন লিখে রেখেছিল মহাস্থবির অবশ্য তার চেয়ে অসংলগ্নভাবেই কথাগুলি বলেছিলেন। একেক সময় তাঁর কথা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল—তিনি যেন তখন শক্তি সঞ্চয় করছিলেন, তিনি হাঁপাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একটা ভাবের ঘোরে আছেন। সকলে তদ্‌গতচিত্তে তাঁর কথা শুনছিল, যদিও অনেকে তাঁর কথা শুনে অবাকও হয়ে যাচ্ছিল, সেগুলি তাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। পরে তাঁর সব কথাই তারা মনে করতে পেরেছিল।

আলিয়োশাকে একবার মিনিট খানেকের জন্য কক্ষ ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই সময় কক্ষের ভিতরে এবং তার আশেপাশে প্রতীক্ষারত আশ্রমিক ভ্রাতাদের ভিড়ের মধ্যে একটা সাধারণ উত্তেজনার ভাব লক্ষ করে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারও কারও প্রতীক্ষার মধ্যে প্রায় উদ্বেগের মতো কিছু একটা ছিল, কারও বা প্রতীক্ষা

ছিল্ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। সকলেই অপেক্ষা করে আছে মহাস্থবিরের তিরোধানের ঠিক পর পর, তৎক্ষণাৎ অলৌকিক মহিমান্বিত কিছু একটা ঘটবে। এই ধরনের প্রতীক্ষা এক দিক থেকে দেখতে গেলে অনেকটা যেন হালকা মনেরই পরিচায়ক, অথচ কৃচ্ছ্রসাধনকারী মঠবৃদ্ধরা পর্যন্ত এর বাইরে থাকতে পারেননি। সবচেয়ে কঠিন দেখাচ্ছিল মঠবৃদ্ধ সাধু পাইসির মুখটা। আলিয়োশাকে কক্ষ ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল একমাত্র এই কারণে যে একজন সন্ন্যাসীর মারফত রহস্যজনক ভাবে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল রাকিতিন। রাকিতিন মাদাম খখ্লাকোভার কাছ থেকে আলিয়োশার জন্য কী একটা অদ্ভুত চিঠি নিয়ে শহর থেকে এসেছে। মহিলা আলিয়োশাকে কৌতূহলজনক এবং প্রসঙ্গত অত্যন্ত সময়োচিত একটি সংবাদ জানিয়েছে। ব্যাপারটা এই যে গতকাল মহাস্থবিরকে প্রণাম জানাতে এবং তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য সাধারণ ঘরের যে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসী মহিলা এসেছিল তাদের মধ্যে প্রোখরভ্না নামে শহর থেকে আগত এক বৃদ্ধা ছিল। সে ছিল জনৈক অধস্তন সামরিক অফিসারের বিধবা স্ত্রী। ছেলে ভাসিলি চাকুরিসূত্রে দূর সাইবেরিয়ার ইর্কুৎস্ক শহরে গেছে, আজ এক বছর হতে চলল তার কাছ থেকে কোনো সংবাদ সে পাচ্ছে না। তাই মহাস্থবিরকে মহিলা জিগ্গেস করেছিল ছেলেকে মৃত ধরে নিয়ে তার আত্মার শান্তির জন্য গির্জায় প্রার্থনা করা ঠিক হবে কিনা। উত্তরে মহাস্থবির তাকে অমন কাজ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিয়ে বলেছিলেন যে এ ধরনের স্মৃতিতর্পণ ডাইনিদের তুক তাক করার শামিল হবে। তারপর মহিলার অজ্ঞতার জন্য তাকে ক্ষমা করে যেন 'ভবিষ্যতের কোন পুথির দিকে তাকিয়েই' (খখ্লাকোভা তার চিঠিতে এইভাবেই উল্লেখ করেছে) মহাস্থবির তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যোগ করেছিলেন : তার ছেলে ভাসিলি নিঃসন্দেহে বেঁচে আছে, শিগ্গিরই হয় সে নিজে বাড়ি ফিরে আসবে, নয়ত তাকে চিঠি লিখবে। তাই সে যেন বাড়ি ফিরে গিয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করে। এর পর কী হল ধারণা করতে পার? মাদাম খখ্লাকোভা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যোগ করেছে 'তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল তো হলই—এমনকি অক্ষরে অক্ষরে, এমন কি বলতে গেলে তার চেয়েও বেশি।' বৃদ্ধা বাড়ি ফিরেছে কি ফেরে নি অমনি সাইবেরিয়া থেকে পাওয়া একটা চিঠি তাকে দেওয়া হল। সেটা ইতিমধ্যেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তাও কম বলা হল চিঠিটা লেখা হয়েছে পথে, য়েকাতেরেনবুর্গ থেকে। তাতে ছেলে মাকে জানিয়েছে যে সে নিজে রাশিয়ায় আসছে, একজন সরকারি আমলার সঙ্গে দেশে ফিরছে এবং এই চিঠি পাবার পর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে 'মাকে আলিঙ্গন করতে পারবে' বলে সে আশা করছে। মাদাম খখ্লাকোভা সোৎসাহে আলিয়োশাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলেছে প্রভুর এই যে আরও একটি 'অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী' সফল হল এই ঘটনাটি যেন সে মঠাধ্যক্ষ এবং আশ্রমের সমগ্র ভ্রাতৃমণ্ডলীকে জানিয়ে দেয়। 'এটা সকলের জানা উচিত, সকলেরই জানা উচিত!' উচ্ছ্বসিত হয়ে এই বলে সে তার চিঠি শেষ করেছে।

চিঠিটা দ্রুত হাতে, খুবই তাড়াহুড়ো করে লেখা, তার প্রতিটি ছত্রে পত্রলেখিকার উত্তেজনা ফুটে উঠছে। কিন্তু আলিয়োশার পক্ষে ততক্ষণে সন্ন্যাসীভ্রাতাদের জানানোর মতো আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, যেহেতু সকলেই ইতিমধ্যে সব জেনে গেছে : আলিয়োশাকে ডেকে আনার জন্য যে সন্ন্যাসীকে রাকিতিন পাঠিয়েছিল তাকে এছাড়া আরও একটি কাজের ভার সে দিয়েছিল—বলেছিল সে যেন 'পরম পূজ্যপাদ প্রভু পাইসিকে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে' বলে যে প্রভুর কাছে তার, অর্থাৎ রাকিতিনের একটা কাজ আছে, তবে সেটা 'তাঁকে জানানো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা মুহূর্তের জন্যও স্থগিত রেখে কালবিলম্ব করার মতো সাহস তার নেই'—এই বলে 'এহেন, স্পর্ধার জন্য সে আভূমি নত হয় প্রভুর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।' যেহেতু সন্ন্যাসীটি আলিয়োশার সঙ্গে দেখা করার আগেই রাকিতিনের অনুরোধ প্রভু পাইসিকে জানায় সেই হেতু আলিয়োশা যখন তার জায়গায় ফিরে এলো তখন তার যা করণীয় ছিল সেটা স্রেফ এই যে চিঠিটা পড়ার পর তৎক্ষণাৎ তার বিষয়টি প্রভুর গোচরীভূত করা, যেটা নেহাৎই সাক্ষ্যপ্রমাণের মতো ছিল। সন্দেহপরায়ণ ও কড়া ধাঁচের মানুষ প্রভু পাইসি পর্যন্ত ভুরু কুঁচকে 'অলৌকিক ঘটনার' সংবাদটি পাঠ করার পর অন্তর থেকে যে-সমস্ত আবেগ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল তা পুরোপুরি চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁর অধরোষ্ঠে হঠাৎই খেলে গেল পরম মহিমাব্যঞ্জক ও উদ্দীপনাময় এক ঝলক হাসি।

"আরও কিছু দেখব আমরা!" তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এলো।

"আরও দেখব, আরও অনেক কিছু দেখব!" সন্ন্যাসীরা চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি করে উঠল। কিন্তু প্রভু পাইসি আবারও ভুরু কোঁচকালেন, তাদের অনুরোধ করলেন, অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও এই সম্পর্কে শোনা কথাটা যেন কাউকে জানানো না হয়। 'যতক্ষণ আরও ভালোমতো সমর্থিত না হয়, যেহেতু এই জগৎসংসারে মানুষের চটুলতার অভাব নেই, তাছাড়া এই ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেও ঘটতে পারে', তিনি সতর্কভাবে যোগ করলেন—অনেকটা যেন নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্য। কিন্তু তাঁর শ্রোতারা বেশ ভালো করেই টের পেল যে তিনি নিজেই তাঁর এই ব্যাখ্যানে কেমন একটা বিশ্বাস করেন না।

বলাই বাহুল্য ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সারা মঠে, এমনকি বাইরের যারা বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগ দিতে মঠে এসেছিল তাদের [illegible] কাছেও এই 'অলৌকিক ঘটনার' কথা জানাজানি হয়ে গেল। 'অলৌকিক ঘটনাটি' ঘটায় মনে হয় সকলের চেয়ে বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিল সুদূর উত্তরের অব্‌দোর্‌স্কের কোনো এক অখ্যাতপ্রায় আশ্রম 'সন্ত সিল্‌ভেস্তর মঠ' থেকে আগত গতকালের সেই তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীটি। আগের দিন মহাস্থবিরকে প্রণাম জানাতে এসে সে মাদাম খখ্‌লাকোভার পাশেই দাঁড়িয়েছিল এবং ভদ্রমহিলার 'রোগমুক্ত' মেয়ে লিজাকে দেখিয়ে অভিভূত হয়ে

মহাস্থবিরকে প্রশ্ন করেছিল 'কোন্ অসাধারণ ক্ষমতাবলে আপনি এই অসাধ্য সাধন করেন?'

ব্যাপারটা এই যে সে এখন খানিকটা ভেবাচেকা খেয়ে গেছে। কোন্টা যে বিশ্বাস করবে তা প্রায় বুঝতে পারছিল না। আশ্রমের যেখানটায় মৌমাছি পালন করা হয় তার পিছনে বিচ্ছিন্ন একটি আশ্রম কুঠুরিতে গতকাল সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমিক সন্ন্যাসী ফেরাপোন্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, সেই সাক্ষাৎকার তার মনে অসাধারণ ও ভয়াবহ রকমের ছাপ ফেলেছিল। এই মঠবৃদ্ধ, সাধু ফেরাপোন্তিই হলেন সেই বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী যিনি উপবাস ও মৌনব্রত উদ্যাপনের পরম ভক্ত, যাঁকে আমরা মহাস্থবির জোসিমার প্রতিপক্ষ বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আরও বড়ো কথা এই যে তিনি সামগ্রিকভাবে মহাস্থবির প্রথারই ঘোর বিরোধী। এই প্রথাটাকে তিনি ক্ষতিকর এবং অলসমস্তিস্কপ্রসূত অভিনবত্ব বলে মনে করেন। মহাস্থবিরের এই প্রতিপক্ষটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিলেন, যদিও মৌনব্রত অবলম্বন করতেন বলে প্রায় কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতেন না। তিনি বিপজ্জনক ছিলেন প্রধানত এই কারণে যে আশ্রমের বহু সংখ্যক ভ্রাতা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন, আর বাইরের যারা বিষয়ী লোকজন আসত তাদের মধ্যে বেশ একটা বড়ো অংশ তাঁকে মহাপুণ্যবান যোগীপুরুষ রূপে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, যদিও নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে ক্ষ্যাপাটে ভাবেরও প্রকাশ তারা দেখতে পেত। কিন্তু এই ক্ষ্যাপাটে ভাবটাই তাদের মুগ্ধ করত। মহাস্থবির জোসিমার কাছে এই সাধুটি কখনও যেতেন না। যদিও আশ্রমের মধ্যেই বাস করতেন, কিন্তু আশ্রমের নিয়মকানুনের তিনি বড়ো একটা ধার ধারতেন না, সেটাও আবার সেই কারণেই যে তাঁর ধরনধারণ ছিল একেবারে ক্ষ্যাপাটে। বয়স তাঁর বেশি না হলেও বছর পঁচাত্তর হবে। বাস করতেন আশ্রমের মৌমাছি পালনের জায়গার পিছনে, আশ্রমের দেয়ালের একটা কোনা ঘেঁষে, ভগ্নপ্রায় কাঠের একটা কুঠিরে, যেটা সুপ্রাচীন কোনো এক কালে, সেই বিগত শতাব্দীতে সাধু ইওনা নামে আরেকজন সাধকের জন্য তৈরি হয়েছিল। ইনিও উপবাস ও মৌনব্রত উদ্যাপনের পরম ভক্ত ছিলেন। দেড়শ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এমনকি আজও মঠে এবং তার আশেপাশের এলাকাতেও তাঁর কীর্তিকাণ্ড সম্পর্কে পরম কৌতূহলজনক নানা কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর বছর সাতেক আগে শেষ পর্যন্ত এই নির্জন পরিত্যক্ত কুঠিতেই উঠে আসার অনুমতি পান সাধু ফেরাপোন্ত। কুঠি বলতে স্রেফ একটা কুঁড়েঘর, তবে দেখতে দস্তুরমতো একটা ভজনালয়, যেহেতু তার অভ্যন্তরে ছিল তীর্থযাত্রীদের উৎসর্গ করা অজস্র বিগ্রহ এবং সেগুলির সামনে তাদের রেখে যাওয়া বাতি যা সর্বক্ষণ আলোকশিখা বিস্তার করছে। বিগ্রহগুলির দেখাশুনা করা আর ওই সব বাতিকে নিত্যপ্রজ্জ্বলিত রাখার জন্যই যেন সাধু ফেরাপোন্তকে সেখানে অধিষ্ঠিত করা হল। শোনা যায়— এবং কথাটা সত্যও বটে—আহার বলতে তার বরাদ্দ

ছিল দিনে বড়জোর দুই পাউণ্ড রুটি। প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর সে রুটি তাঁকে এখানেই এনে দিত মৌমাছি পালনের জায়গায় বসবাসকারী, মৌমাছিপালনকারী এক সাধু। কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানকারী এই লোকটির সঙ্গে পর্যন্ত সাধু ফেরাপোন্ত্ কদাচিৎ বাক্যালাপ করতেন। দিনান্তের উপাসনার পর রবিবারের প্রসাদি খাস্তা গজার সঙ্গে এই যে চার পাউন্ড রুটি মঠাধ্যক্ষ নিয়ম করে এই দিব্যোন্মাদ সাধুকে পাঠিয়ে দিতেন সেটাই ছিল তাঁর সারা সপ্তাহের বরাদ্দ খাবার। তাঁর সোরাইয়ের জল রোজ বদল করে দেওয়া হত। উপাসনা সভায় কদাচিৎ তাঁর আবির্ভাব ঘটত। ভক্তেরা যারা আসত তারা দেখতে পেত অনেক সময় সারা দিন তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে চলেছেন, একবারের জন্যও উঠে দাঁড়াতেন না, এদিক ওদিক কোথাও তাকাচ্ছেন না। তাদের সঙ্গে কখনও যদি কোনো আলোচনায় নামতেনও সে আলোচনা হত সংক্ষিপ্ত, কাটা কাটা, অদ্ভুত এবং সব সময় অমার্জিতপ্রায়। আবার এমনও দেখা গেছে—সেটা অবশ্য নিতান্তই কালেভদ্রে হত—তিনি আগন্তুক তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেয়াড়া ধরনের কোনো একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করে বসে থাকতেন, আর এই করে তাঁর দর্শনার্থীকে সব সময় একটা বড়ো রকমের হেঁয়ালির মধ্যে ফেলে দিতেন, এরপর কিন্তু শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কথাটা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি আর মুখ খুলতেন না। যাজকের পদমর্যাদা তাঁর ছিল না, তিনি ছিলেন এক সাধারণ সন্ন্যাসীমাত্র। এমন অদ্ভুত জনশ্রুতিও প্রচলিত ছিল—সে অবশ্য একেবারে অজ্ঞানতার অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকজনের মধ্যেই প্রচলিত ছিল—সাধু ফেরাপোন্তের নাকি স্বর্গীয় আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, একমাত্র তাঁদের সঙ্গেই তাঁর যত কথোপকথন, আর ঠিক এই কারণেই মানুষের সঙ্গে কথা না বলে চুপ করে থাকেন।

আশ্রমের মৌমাছি পালনের জায়গায় পৌঁছে অব্‌দোর্‌স্ক থেকে আগত ছোটোখাটো চেহারার এই সন্ন্যাসীটি মৌমাছি তত্ত্বাবধানকারীর দেখা পেল। এ লোকটিও খুব কম কথার এবং গোমড়ামুখো একজন সন্ন্যাসী। তার নির্দেশমতো তীর্থযাত্রী সাধু ফেরাপোন্তের কুটিরের জায়গা দেয়ালের সেই কোণটার উদ্দেশে রওনা দিল। মৌমাছি তত্ত্বাবধানকারী তাকে আগে থাকতে সাবধান করে বলে দিল, 'আপনি একজন বাইরের লোক বলে আপনার সামনে মুখ খুললেও খুলতে পারেন, আবার বলা যায় না হয়তো কিছুই বের করতে পারলেন না তাঁর কাছ থেকে।' তীর্থযাত্রী সাধুটি নিজেই পরে জানায় যে গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি হতে নিদারুণ আতঙ্কে তার হাত পা গুটিয়ে আসছিল। এদিকে সন্ধ্যাও অনেকক্ষণ হল উতরে গেছে। সাধু ফেরাপোন্ত্ তাঁর কুটিরের দ্বারপ্রান্তে একটা জলচৌকির ওপর বসে ছিলেন। তাঁর মাথার ওপর মৃদু সরসর আওয়াজ করছে একটা বিশাল ঝাঁকড়া প্রাচীন এল্‌ম গাছ। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ শীতল আমেজ লাগছে। অব্‌দোর্‌স্কের সাধু দিব্যোন্মাদ মহাপুরুষটির পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন

"ওহে সন্ন্যাসী, তোমার কি ইচ্ছে আমিও তোমার সামনে দণ্ডবৎ হই?" সাধু ফেরাপোন্ত্ বলে উঠলেন। "উঠে দাঁড়াও!"

অব্দোর্স্ক-এর সাধুটি উঠে দাঁড়াল।

"যে মানুষ আশীর্বাদ করে সে নিজেও আশীর্বাদ পায়। পাশে এসে বোসো। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

ছোটোখাটো চেহারার বেচারি সাধুটিকে যা অবাক করল তা এই যে এত বয়স সত্ত্বেও এবং এই বয়সে তিনি যে নিঃসন্দেহে বড়ো বড়ো উপবাসব্রত পালন করে আসছেন তা সত্ত্বেও এই বৃদ্ধ মানুষটি দেখতে কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ। সুদীর্ঘ ঋজুদেহ, এতটুকু ন্যুব্জ হয়ে পড়েননি। মুখে সতেজ ভাব, মুখ যদিও শীর্ণ কিন্তু সেখানে স্বাস্থ্যের আভা প্রকাশ পাচ্ছে। এখনও যে তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট আছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ব্যায়ামবীর সুলভ সুগঠিত দেহ। এত বয়স হয়ে গেছে তবু তার চুল দাড়ি এখনও রীতিমতো ঘন আছে, এমনকি আগেকার মতো একেবারে কাঁচা যদি নাও বলা যায় তবু তাতে যে পুরোপুরি পাক ধরেছে এমন কথাও বলা যায় না। চোখের রং ধূসর, বড়ো বড়ো চোখদুটো থেকে যেন দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে, কিন্তু সে চোখ এত বেশি বিস্ফারিত যে দেখে অবাকই হতে হয়। কথা বলার সময় 'ও' উচ্চারণের ওপর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। তার গায়ে মরচে ধরা রঙের, লম্বা ঝুলের চাষিকোর্তা—কয়েদিদের গায়ের মোটা বনাত কাপড় বলতে আগেকার দিনে যা বোঝাত সেই ধরনের কাপড়ে তৈরি, কোমরে মোটা পাকানো দড়ি। ঘাড় আর বুকের কাছটা খোলা। ভেতর থেকে উঁকি মারছে ইয়া মোটা শণ কাপড়ের ধোকড়া জামাটা—কালো চিটচিট করছে, দেখলেই বোঝা যায় মাসের পর মাস গা থেকে ছাড়া হয়নি। লোকে বলে আত্মনিগ্রহের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য তিনি নাকি পোশাকের নীচে ত্রিশ পাউন্ড ওজনের লোহার শিকল পরে থাকেন। পায়ে মোজা নেই, খালি পায়ের ওপর প্রায় শতচ্ছিন্ন পুরনো একজোড়া চটি।

"এসেছি অব্দোর্স্কের ছোটো আশ্রম 'সন্ত সেলিভেস্তর' থেকে" বিনীতভাবে জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা ভয়ে ভয়ে হলেও খুদে খুদে কৌতূহলী দুচোখে নির্জনবাসী সন্ন্যাসীঠাকুরকে লক্ষ করতে লাগল তীর্থযাত্রী সাধুটি।

"তোমার সেলিভেস্তরে আমি গেছি। থেকেওছি। ও! তোমাদের সেলিভের্স্ত বাবাজি ভালো আছে তো?"

সাধুটি থতমত খেয়ে গেল।

"তোমরা হলে গিয়ে সব মুখ্যুর দল। সাত্ত্বিক আহারের কী বিধিনিষেধ তোমরা মেনে চল?"

"প্রাচীনকাল থেকে আশ্রমে আহারের যেমন নিয়ম চলে আসছে। লেন্ট পরবে চল্লিশ দিনের মধ্যে সোম বুধ আর শুক্রবার কোনও খাবার চলে না। মঙ্গল আর বেস্পতিবার আমাদের সাধুভ্রাতাদের জন্য বরাদ্দ সাদা রুটি, সেদ্ধ করা ফল আর

সেই সঙ্গে মধু, কিছু ফল, না হয় নুনে জরানো বাঁধাকপি আর জইয়ের আটা গোলা। শনিবার দিন টাটকা বাঁধাকপির সাদা ঝোল, ডাল, জাউ, সবই তিসির তেলে রান্না। সপ্তার অন্য দিনগুলোতে বাঁধাকপির ঝোলের সঙ্গে শুকনো মাছ আর জাউ। পুণ্য সপ্তাহে সোমবার থেকে সেই শনিবার একেবারে সন্ধে অব্দি—মানে ছটা দিন—শুধুই জল আর রুটি, শাক সব্জি চলতে পারে, তাও সংযম রেখে, তবে সেদ্ধ করা চলবে না। তাছাড়া সম্ভব হলে রোজ না খাওয়াই ভালো, পরবের প্রথম হপ্তার বেলায় যেমন বলা আছে সেই মতো চলা যেতে পারে। পাঁচদিনের দিন, পুণ্য শুক্রবারে কিচ্ছুটি খাওয়া চলবে না, ঠিক তেমনি পুণ্য শনিবারেও—আমাদের উপোস করতে হয় একেবারে সেই তিনটে অবদি, এরপর খানিকটা জল আর অল্প খানিকটা রুটি, এক পাত্তর করে মদ। পুণ্য বেস্পতিবারে আমরা খাই সেদ্ধ খাবার, কোনো তেল মাখন চলবে না, আবার সেই মদ খাই, আর সব বাসি শুকনো খাবার দাবার খাই—এই বিবেচনায় যে লাওডিসিয়ার ধর্মসভায় এমত কথিত হয়েছে যে 'চল্লিশাহ পার্বণের শেষ সপ্তাহের চতুর্থাহতে নিয়মভঙ্গ বিধায় সমগ্র চল্লিশাহই অসম্মানিত হয়।' এই হল গিয়ে আমাদের আশ্রমের ধারা। তবে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে তুলনা করলে এসব তো কিছুই নয়, মহাপ্রভু", বেশ খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে সোৎসাহে সাধুটি যোগ করল, "আপনি তো বারোমাস, এমনকি পুণ্য ইস্টারের দিনেও স্রেফ জল আর রুটি খেয়ে কাটান, আর আমরা দুদিনে যে পরিমাণ রুটি খাই সেটা আপনার এক হপ্তার খোরাক। সত্যিই অবাক হতে হয় আপনার এই সংযম দেখে।"

"আর ব্যাঙের ছাতা?" সাধু ফেরাপোন্ত্ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল। তাঁর মুখ থেকে 'ছ' বর্ণটি প্রায় সঘোষ 'হ' উচ্চারণে বেরিয়ে এলো।

"ব্যাঙের ছাতা?" অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করল সাধুটি।

"সেটাই তো কথা। আমি বাপু ওদের ওই রুটিও ছেড়ে দিতে পারি, ওতে আমার মোটে কোনো দরকার নেই। পারলে বনে জঙ্গলে কোথাও চলে যাই, ওখানে গিয়ে বুনো ফলপাকড় নয়ত ব্যাঙের ছাতা খেয়েই জীবন কাটাতে পারি। অথচ এখানকার লোকজনের কাণ্ড দেখ—রুটি ছাড়া ওনাদের চলবেই না। তার মানে ওদের টিকি শয়তানের সঙ্গে বাঁধা আছে। আজকাল আবার হতভাগাগুলো বলে বেড়াচ্ছে অত সব উপোস-টুপোস কোনও কাজের কথা নয়। কতদূর স্পর্ধা হলে আর কতটা নোংরা হলে তারা এমন বিধান দিতে পারে বল তো!"

"ওঃ, তা যা বলেছেন।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাধু বলল।

"তা ওদের মধ্যে যেগুলো সাক্ষাৎ শয়তান সেগুলোকে দেখেছ তো?" সাধু ফেরাপোন্ত্ জিগ্‌গেস করল।

"ওদের মধ্যে মানে? কাদের কথা বলছেন?" বিনীত ভাবে জানতে চাইল সাধুটি।

"গত বছর পবিত্র আত্মার অবতরণের উৎসব উপলক্ষে আমি মঠাধ্যক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। এর পর আর যাইনি। সেখানে শয়তানের দেখা পেয়েছি কারও

বুকের ওপর বসে আছে, জোব্বার তলায় লুকিয়ে আছে, সেখান থেকে কেবল বদনখানা উঁকিঝুঁকি মারছে, কারও জেবের ভেতর থেকে জুলজুল করে তাকাচ্ছে, চোখদুটো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে—আমাকে ভয় পায় কিনা। কারও বা বুঝলে কিনা একেবারে গভ্ভে, তার নোংরা পেটটার ভেতরে সেঁধিয়ে বসে আছে, একজনের আবার গলা আঁকড়ে ধরে ঝুলঝুল করে ঝুলছে, লোকটা ওই ভাবেই তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, চোখে দেখতে পাচ্ছে না।"

"আপনি আপনি ওদের দেখতে পান প্রভু?" সাধুটি জানতে চাইল।

"তাহলে আর বলছি কি। দেখতে পাই, ওদের হাড়হদ্দ দেখতে পাই। মঠাধ্যক্ষের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, দেখি এক ব্যাটা দরজার পিছনে গিয়ে লুকোচ্ছে আমাকে দেখে। বেশ বড়োসড়, পালের গোদা যাকে বলে, হাত তিনেক লম্বা হবে। ইয়া মোটা ছাইরঙা লম্বা তার লেজটা। পালাতে গিয়ে লেজের আগাটা দরজার পাল্লার ফাঁকটাতে গিয়ে পড়ল। তা আমি কি আর অতই বোকা?— আমিও দরজাটা দড়াম করে দিলাম বন্ধ করে, চিপটে গেল বাছাধনের লেজটা! কাঁইমাই আওয়াজ করে সে কি ছটফটানি! আমি ক্রুশচিহ্ন এঁকে ওর ওপর তিনবার মন্ত্র পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে টেঁসে গেল পিষে ফেলা মাকড়সার মতো। এখন নির্ঘাত কোনা ঘুপচির মধ্যে কোথাও পড়ে পড়ে পচছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু তাহলে কী হবে, ওরা কেউ দেখতে পায় না, টেরও পায় না। এক বছর হয়ে গেল যাইনে। তুমি বিদেশি বলেই তোমার কাছে প্রকাশ করছি।"

"আপনার কথাগুলো বড়ো ভয়ঙ্কর! আচ্ছা, মহাপ্রভু", উত্তরোত্তর সাহস বেড়ে যেতে সাধুটি বলল, "আপনার এই যে এত খ্যাতি, এমন কি দূরদূরান্তেও এই বলে আপনার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে যে পবিত্র আত্মার সঙ্গে নাকি আপনার নিত্য যোগাযোগ আছে এটা কি সত্যি?"

"তিনি আসেন। উড়ে আসেন।"

"কী ভাবে আসেন? কী রূপে?"

"পাখির রূপে।"

"বলতে চান পবিত্র আত্মা আসেন পায়রার রূপ ধরে?"

"পবিত্র আত্মা তো পবিত্র আত্মা, পরমাত্মাও। পরমাত্মা হলেন গিয়ে অন্য, তিনি পাখির রূপও ধারণ করতে পারেন। কখনও চড়াই পাখি, কখনও ঘুঘু, আবার কখনও বা নীলকণ্ঠ পাখি।"

"কিন্তু নীলকণ্ঠ পাখি থেকে আপনি তাঁকে আলাদা করে চেনেন কী করে?"

"কথা বলেন।"

"কী ভাবে কথা বলেন? কোন্ ভাষায় বলেন?"

"মানুষের ভাষায়।"

"তা উনি আপনাকে কী বলেন?"

"এই তো আজই জানালেন, একটা আকাট মুখ্যু তোমার কাছে আসবে আর আজেবাজে সব প্রশ্ন করবে।... অনেক কিছু জানতে চাও হে সাধু।"

"আপনার কথাগুলি বড়ো ভয়ঙ্কর মহাপ্রভু!" মাথা ঝাঁকিয়ে সাধু বলল। তার ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টিতে অবশ্য একটা সন্দিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল।

"ওই যে গাছটা, দেখতে পাচ্ছ তো?" খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সাধু ফেরাপোন্ত্ জিগ্‌গেস করল।

"দেখতে পাচ্ছি মহাপ্রভু।"

"তোমার কাছে ওটা একটা গাছ, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি অন্য একটি ছবি।"

"সেটা কী?" প্রশ্ন করে বৃথাই উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে রইল সাধুটি।

"সেটা হয় রেতের বেলায়। দেখতে পাচ্ছ ওর ওই দুটো ডাল? রেতে তিনিই হন খ্রিস্ট, তেনার দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় খুঁজতে থাকেন। পষ্ট দেখতে পাই, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর, ওঃ কী ভয়ঙ্কর!"

"স্বয়ং খ্রিস্টই যদি হন তাহলে আবার ভয়ের কী?"

"তুলে যদি সগ্‌গে নিয়ে যান?"

"একেবারে জলজ্যান্ত?"

"পয়গম্বর এলাইয়াকে ঈশ্বর যেমন সশরীরে অগ্নিরথে সগ্‌গে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন"— শোননি তাঁর সেই গৌরবের কথা? তেমনি আমাকেও দু হাতে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে যাবেন

অব্‌দোর্‌স্কের ছোটোখাটো সাধুটি এই কথাবার্তার পর রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে মঠে তার জন্য আগে থাকতে জনৈক ভ্রাতার কাছে নির্দিষ্ট কুঠুরিতে ফিরে এলো বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধু জোসিমার তুলনায় সাধু ফেরাপোন্ত্‌কেই নিঃসন্দেহে তার বেশি মনে ধরেছিল। অব্‌দোর্‌স্কের সাধু সর্বোপরি সাত্ত্বিক আহার ও উপবাসব্রতের পক্ষপাতী, তাই সাধু ফেরাপোন্তের মতো একজন মানুষ যিনি অমন কঠোর ভাবে সেই নিয়ম পালন করেন তিনি যে 'অলৌকিক কিছুর সাক্ষাৎ' পাবেন সেটা তার কাছে আশ্চর্যের মনে হয়নি। তাঁর কথাগুলি অবশ্য কেমন যেন খাপছাড়া, কিন্তু সেগুলির নিহিতার্থ যে কী তা কেবল প্রভু ও ঈশ্বরই জানেন। তাছাড়া খ্রিস্টপ্রেমে যাঁরা উন্মত্ত তাঁদের কথা ও আচরণ যেমন হয় তার তুলনায় এ তো কিছুই নয়! আর 'শয়তানের লেজ চিপটে দেবার' যে কথা তিনি বললেন সেটাও সে মনেপ্রাণে ও সন্তুষ্টচিত্তে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত—কেবল আলঙ্কারিক অর্থে কেন, সরাসরি অর্থেও। পরন্তু এর আগেও, মঠে আসার আগে থাকতেই সে মনে মনে মহাস্থবির প্রথার ঘোর বিরোধী ছিল। এ সম্পর্কে অবশ্য আজ পর্যন্ত সে যা কিছু জেনেছে সে সবই তার শোনা কথা, তবে অন্য আরও অনেকের মতোই এটাকে নিশ্চিতভাবে একটা অনিষ্টকর অভিনবত্ব বলে মনে করত। মঠে একটা দিন কাটাতেই কিছু কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন ভ্রাতার মহাস্থবির প্রথা বিরোধী চাপা গুঞ্জনও সে লক্ষ না করে পারে

নি। পরন্তু সাধুটি ছিল ছটফটে স্বভাবের, যত্রতত্র উঁকিঝুঁকি মারা তার অভ্যাস ছিল, আর কোনো ব্যাপারেই তার কৌতূহলের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। ঠিক এই কারণে মহাস্থবির জোসিমা একটা নতুন 'অলৌকিক ঘটনা' ঘটিয়েছেন এত বড়ো একটা সংবাদ তাকে রীতিমতো হতচকিত করে দিয়েছিল। আলিয়োশা পরে মনে করে দেখেছে সে দিন মহাস্থবিরের কাছাকাছি এবং তাঁর কক্ষের কাছে যে সমস্ত সাধু ভিড় করে ছিল তাদের সামনে দিয়ে অব্‌দোর্স্ক থেকে আগত এই কৌতূহলী অতিথির মূর্তিটাকে এ দঙ্গল থেকে ও দঙ্গলের মধ্যে সর্বত্র অসংখ্যবার ইতস্তত উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াতে, কান পেতে সকলের কথা শুনতে এবং সকলকে প্রশ্ন করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আলিয়োশা তখন লোকটার দিকে তেমন একটা মনোযোগ দেয়নি, শুধু পরে সব কিছু মনে করতে পেরেছিল। তখন অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবকাশও তার ছিল না : মহাস্থবির জোসিমা আবার ক্লান্ত বোধ করতে আবারও শয্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে তাকিয়ে আলিয়োশাকে স্মরণ করলেন, তাকে ডেকে আনতে বললেন। আলিয়োশা কালবিলম্ব না করে ছুটে এলো। মহাস্থবিরের কাছাকাছি তখন থাকার মধ্যে ছিলেন শুধু সাধু পাইসি, পুরোহিতব্রতধারী সাধু ইওসিফ আর আশ্রমের ব্রতচারী শিষ্য পর্‌ফিরি। মহাস্থবির ক্লান্ত দুচোখে আলিয়োশার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ জিগ্‌গেস করলেন "তোমার বাড়ির লোক কি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে বাবা?"

আলিয়োশা ইতস্তত করতে লাগল।

"তোমাকে তাদের প্রয়োজন নেই তো? গতকাল কি তুমি তাদের কাউকে কথা দিয়েছিলে যে আজ গিয়ে দেখা করবে?"

"কথা দিয়েছিলাম বাবাকে ভাইদের আরও কয়েকজনকেও..."

"তাহলে? যাও, এক্ষুনি যাও। মন খারাপ করার কিচ্ছু নেই। জেনে রাখ, তোমাকে না দেখে, পৃথিবীতে আমার যা শেষ কথা বলার আছে তোমার উপস্থিতিতে তা না বলে আমি মারা যাচ্ছি না। তোমাকেই কথাটা বলব বাবা, আর সেটাই হবে তোমাকে আমার অন্তিম নির্দেশ। তোমাকেই দিয়ে যাব, আমার প্রিয়তম সন্তান, কেননা তুমি আমাকে ভালোবাস। আর এখন যা বলি শোন, যাদের যাদের কথা দিয়েছ আপাতত তাদের কাছে যাও।"

আলিয়োশা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা মেনে নিল, যদিও তাঁকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে প্রভুর যে শেষ কথা হবে তা শুনতে পাবার প্রতিশ্রুতি এবং বড়ো কথা সেটা যেন তাকে—আলিয়োশাকেই তাঁর অন্তিম নির্দেশ—এটা মনে হতেই তার সমস্ত অন্তর পুলকে শিহরিত হয়ে উঠল। সে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাতে শহরে যাবতীয় কাজকর্ম সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে পারে। ঠিক এই সময় আবার সাধু পাইসিও তার শুভকামনা করে এমন কিছু কথা

তাকে বললেন যা অপ্রত্যাশিত ভাবে তার মনে সুগভীর ছাপ ফেলে। সেটা ঘটে যখন তারা দুজনেই এক সঙ্গে মহাস্থবিরের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

কোনো রকম ভূমিকা না করে সাধু পাইসি সরাসরি বলতে শুরু করলেন, “মনে রেখো বৎস, সর্বক্ষণ এটাই মনে রেখো ইহজাগতিক যে বিজ্ঞান বিপুল শক্তিতে সংহত হয়ে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে দিব্যলোকের যা কিছু অনুশাসন আছে সে সবের পর্যালোচনা করেছে—বিশেষত গত শতাব্দীতে, বিশ্বের তাবৎ পণ্ডিতদের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর প্রাচীন পবিত্রতার বলতে গেলে কিছুমাত্র অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু তাঁদের সেই বিশ্লেষণ ছিল খণ্ডিত, যা অখণ্ড তা তাঁদের দৃষ্টির এতটাই অগোচরে থেকে গেছে এবং তাঁদের সে দৃষ্টি এতদূর অন্ধ যে ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ অখণ্ডতা তাদের চক্ষের সমক্ষেই যেমনকার তেমন অবিচল দাঁড়িয়ে আছে, নরকের দ্বারের সাধ্য নেই তার ওপর আধিপত্য খাটায়। উনিশ শতাব্দী ধরে তা কি বেঁচে ছিল না? মানুষের ব্যক্তিমনের এবং ব্যাপক জনমানসের এই এত আন্দোলনের মধ্যে আজও কি তা বেঁচে নেই? এমনকি যারা সর্ববিধ্বংসী, নিরীশ্বরবাদী, তাদের নিজেদেরই যে চিত্তবিক্ষোভ তার মধ্যেও তো তা পূর্ববৎ অবিচল টিকে আছে! কেননা যারা খ্রিস্টধর্মকে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারাও আসলে অন্তরে অন্তরে সেই খ্রিস্টেরই ছাঁচে ঢালা, তাঁরই মতো এবং তেমনই রয়ে গেছে, যেহেতু প্রাচীন কালে খ্রিস্ট মানুষের যে আদর্শ ও সদ্‌গুণের নির্দেশ দিয়ে গেছেন আজ পর্যন্ত না তাদের জ্ঞান, না হৃদয়ের উত্তাপ কোনোটাই তার চেয়ে মহত্তর, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। আর প্রয়াস বলতে যতটুকু যা হয়েছে তা এক ধরনের বিকৃতি বৈ অন্য কিছু নয়। তোমার মৃত্যুপথযাত্রী গুরু যখন তোমাকে সংসারে ফিরে যাবার বিধান দিয়ে গেলেন তখন বিশেষ করে এই কথাটা মনে রেখো বৎস। আজকের এই মহান দিনটিকে স্মরণ করার সময় হয়তো আমার এই কথাগুলিও ভুলে যাবে না, যা আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে তোমার যাত্রাপথের শুভেচ্ছাস্বরূপ তোমাকে দিচ্ছি, আরো দিচ্ছি এই কারণেই যে তোমার বয়স এখনও অনেক কম, কিন্তু সংসারে প্রলোভন বড়ো কঠিন, সে সব সহ্য করা তোমার সাধ্যাতীত। আচ্ছা, এবারে আসতে পার, অনাথ বৎস আমার।”

এই কথাগুলি বলে প্রভু পাইসি তাকে আশীর্বাদ করলেন। মঠ ছেড়ে পথে যেতে যেতে তাঁর আকস্মিক মুখনিঃসৃত কথাগুলি নিয়ে মনে মনে আন্দোলন করতে গিয়ে আলিয়োশা হঠাৎ অনুধাবন করতে পারল কৃচ্ছ্রসাধনকারী এই যে সাধুটি এতকাল তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে এসেছেন আজ তাঁর মধ্যে আলিয়োশা আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ পেয়েছে এক নতুন বন্ধুর, যিনি ওর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, নতুন এক শিক্ষাগুরু। মৃত্যুপথযাত্রী জোসিমার ‘অন্তিম নির্দেশের মতোই’ তাঁর এই কথাগুলি। ‘বলা যায় না হয়ত ওদের দুজনের মধ্যে সরাসরি এরকম একটা বোঝাপড়া ছিল!’

আচমকা মনে হল আলিয়োশার। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ যা এইমাত্র আলিয়োশা শুনল—অন্য আর কিছু যদি নাও হয়, যে-কিশোর মনের ভার তার ওপর ন্যস্ত হয়েছে এরকম একজন অপরিণত কিশোরের মনকে কী ভাবে, কত তাড়াতাড়ি প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা যায়, এমন কোন্ সুরক্ষাব্যবস্থা থাকতে পারে যা দিয়ে তাকে আগলে রাখা যায়, যার চেয়ে মজবুত কোনো আড়ালের কথা তাঁর নিজেরও কল্পনায় আসতে পারে না এই ভেবে তিনি যে এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, অন্ততপক্ষে এটাই এখন প্রভু পাইসির অন্তরের উষ্ণতার সাক্ষ্য বহন করছে।

## দুই

## পিতৃগৃহে

আলিয়োশা প্রথমেই গেল তার বাবার কাছে। পথে যেতে যেতে তার মনে পড়ল আগের দিন বাবা তাকে বারবার করে বলে দিয়েছিল সে যেন যে- কোনো ভাবে হোক তার দাদা ইভানের অলক্ষিতে বাড়িতে ঢোকে। 'তাই বা কেন?' এখন আলিয়োশার হঠাৎ মনে হল। 'বাবা যদি আমাকে একান্তে চুপি চুপি কোনো কথা বলতেই চায় তা হলেই বা কেন আমাকে গোপনে ঢুকতে হবে? খুব সম্ভব গতকাল উত্তেজিত অবস্থায় কী বলতে কী বলে ফেলেছে', এটাই সে ধরে নিল। তা সত্ত্বেও তার প্রশ্নের উত্তরে মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না যখন জানাল যে ইভান ফিয়োদরভিচ্ ঘণ্টা দুই আগে বাইরে গেছে তখন সে মনে মনে বেশ খুশিই হল। মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্নাই তাকে বাড়ির গেট খুলে দিয়েছিল, কেননা গ্রিগোরি অসুস্থ হয়ে বাইরের বাড়িতে শুয়ে ছিল।

"আর বাবা?" আলিয়োশা জিগ্গেস করল।

"উঠেছেন, কফি খাচ্ছেন", কেমন যেন শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না।

আলিয়োশা ঘরে ঢুকল। বুড়ো টেবিলের ধারে একা বসে আছে। পায়ে চটি, গায়ে একটা পুরনো ওভারকোট। কিছু করার না থাকায় বসে বসে কোথাকার কী সব হিসাবপত্রের কাগজ উলটে পালটে দেখছে—তেমন একটা মনোযোগ দিয়ে যে দেখছে তা নয়। স্মের্দিকোভ্ও ডিনারের জন্য কাঁচাবাজার করতে বেরিয়েছে। সারা বাড়িতে সে একেবারে একা। কিন্তু হিসাব তার মন টানতে পারছিল না। যদিও সে বেশ সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠেছে আর বাইরে একটা ফুর্তির ভাবও বজায় রাখার চেষ্টা করছে তবু তাকে বেশ ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছে। তার কপালটা রাতারাতি লাল টকটকে আঘাতের চিহ্নে ছেয়ে গেছে, সেটা একটা লাল রুমাল দিয়ে বাঁধা। নাকটাও রাতারাতি বেশ খানিকটা ফুলে গেছে, সেখানেও গোটাকয়েক দাগড়া-দাগড়া চিহ্ন ফুটে উঠেছে, যদিও সেগুলি তেমন একটা গণ্য করার মতো

নয়। কিন্তু সব মিলে গোটা মুখটাতে চূড়ান্ত ভাবে বিশেষ ধরনের কেমন একটা বীভৎস ও খিটখিটে ভাব সঞ্চার করেছে। বুড়ো নিজেও সে বিষয়ে সচেতন ছিল, তাই আলিয়োশাকে ঢুকতে দেখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

“কফি ঠান্ডা”, রুক্ষস্বরে চিৎকার করে সে বলল, “কফি তোকে দিতে যাচ্ছি না। আমি নিজেই বাপু এখন তেলছাড়া স্রেফ জলো মাছের স্যুপের ওপর আছি, কাউকে নেমন্তন্ন করছি না। কী মনে করে?”

“আপনার শরীর কেমন আছে জানতে এলাম”, আলিয়োশা বলে উঠল।

“হ্যাঁ। তাছাড়া কাল আমি নিজেই তোকে আসতে বলেছিলাম বটে। যত্ত সব! অত কষ্ট করার কোনো দরকার ছিল না। অবশ্য হ্যাঁ, আমি জানতাম তুই যা হোক তা হোক করে চটপট এসে যাবি।

বিদ্বেষের তীব্র জ্বালাধরা উপলব্ধি নিয়ে সে কথাগুলি বলল। বলতে বলতে সে জায়গা ছেড়ে উঠে উদ্বেগের সঙ্গে আরশিতে নিজের নাকটা আরও একবার দেখে নিল। সকাল থেকে এই নিয়ে বোধহয় চল্লিশবার হয়ে গেল। কপালে বাঁধা লাল রুমালটাও আরেকটু সুন্দর করে চেপে বাঁধল।

“লালটাই ভালো, সাদা হলে কেমন যেন হাসপাতাল-হাসপাতাল মনে হয়”, সুস্পষ্ট রায়দানের ভঙ্গিতে সে মন্তব্য করল। “তারপর তোর এখানকার খবর-টবর কী? তোর গুরু মহাস্থবিরের খবর কী?”

“ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ। আজই মারা যেতে পারেন”, আলিয়োশা জবাব দিল। কিন্তু বাবা যেন শুনেও শুনতে পেল না, নিজের প্রশ্নটা আবার তৎক্ষণাৎ ভুলেও গেল।

“ইভান বেরিয়েছে”, হঠাৎ সে বলে উঠল। “যে করে পারে মিতিয়ার কাছ থেকে তার বাগ্‌দত্তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য সে তেড়েফুঁড়ে লেগেছে—সেই তালেই এখানে রয়ে গেছে”, ক্ষিপ্তকণ্ঠে কথাগুলি যোগ করে মুখ বাঁকিয়ে সে আলিয়োশার দিকে তাকাল।

“নিশ্চয় নিজের মুখে আপনাকে একথা বলেনি?” আলিয়োশা বলল।

“বলেছে বৈকি, অনেক কাল আগেই বলেছে। তুই কী জানিস বল তো? — বলেছে সপ্তাহ তিনেক আগে। সে-ও আবার আমাকে গুপ্তখুন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এখানে আসেনি তো! তাহলে কী জন্যে এসেছে বল?”

“কী বলছেন কী! অমন কথা বলছেন কেন?” রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেল আলিয়োশা।

‘সত্যি কথা বলতে গেলে কি, টাকাপয়সা সে চাইছে না, অবশ্য হ্যাঁ, চাইলেও একটি কানাকড়িও সে আমার কাছ থেকে পাবে না। ওরে আমার বড়ো আদরের ছেলে, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, তোদের জেনে রাখা ভালো যে আমি এই পৃথিবীতে যত দীর্ঘকাল সম্ভব বেঁচে থাকতে চাই, এই কারণে প্রতিটি পাইপয়সা আমার কাছে

দরকারি, আর যত বেশি দিন বাঁচব ততই বেশি করে সেগুলো দরকার হবে”, গ্রীষ্মকালে পরার উপযোগী হলুদ ডোরাকাটা হালকা পশমি কাপড়ের ঢোলা তেলচিটে ওভারকোটের দুই পকেটে হাত পুরে ঘরের একোণ থেকে ও কোণে পায়চারি করতে করতে সে বলে চলল। “আমার বয়স এখন মোটে পঞ্চান্ন, হাজার হোক আমি এখনও একটা মরদ। কিন্তু আমি আরও বছর বিশেক পুরুষমানুষের দলেই থাকতে চাই। অথচ দ্যাখ, আমি যত বুড়ো হতে থাকব আমার চেহারাটাও তত বদখত হতে থাকবে, তখন তো আর তারা কেউ নিজের ইচ্ছায় আমার কাছে আসবে না, আর ঠিক তখনই তো আমার টাকাপয়সার দরকার হবে। সেইজন্যই না আমি এখন থেকে আরও বেশি বেশি করে টাকা জমাচ্ছি—জমাচ্ছি একমাত্র নিজের জন্যে, বুঝলে হে প্রিয় পুত্র আমার, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ—তোমাদের জেনে রাখা ভালো। তার কারণ, জেনে রাখ, আমার পাপাচারের শেষ সীমা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতে চাই। পাপাচার পরম মধুর। সকলে সেটাকে মন্দ বলে, অথচ সকলেই তাতে ডুবে আছে—শুধু তফাতটা এই যে সকলে সেটা করছে লুকিয়ে চুরিয়ে, কিন্তু আমি করছি খোলাখুলি। আমার এই সরল মনের জন্যেই না যারা জঘন্য কাজ করে বেড়ায় তারা সকলে আমাকে নিয়ে পড়েছে। আরে বাপু, তোর স্বর্গরাজ্যে আমি যেতে চাই নে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, এটা আমি তোকে জানিয়ে রাখছি। তাছাড়া তোর ওই স্বর্গ কোনো ভদ্দরলোকের উপযুক্ত জায়গাও নয়—এমনকি স্বর্গ বলে আদৌ যদি কিছু থাকেও। আমার মতে, ঘুমিয়ে পড়লাম, আর সে ঘুম ভাঙল না, তারপর আর কিছুই রইল না। চাস তো আমার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিস, না চাইলে করিস নে—জাহান্নামে যা। এই হল আমার দর্শন। গতকাল ইভান এখানে বেশ বলেছিল, যদিও আমরা সকলেই মাতাল অবস্থায় ছিলাম। ইভানটা একটা হামবড়া, পাণ্ডিত্য বলতে যা বোঝায় ওসব কিছুই ওর নেই তাছাড়া বিশেষ কোনো শিক্ষাদীক্ষাও ওর নেই। চুপচাপ থাকে, চুপচাপ মুখ টিপে তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে—এটা দিয়েই সে বাজিমাত্ করে।”

আলিয়োশা চুপ করে তার কথা শুনতে লাগল।

“আমার সঙ্গে ও কথা বলে না কেন? কথা যদি বলে তো এমন ভাবভঙ্গি করে যেন একটা কেউকেটা। বদমাইশের ধাড়ি তোর ইভানটা! আরে গ্রুশেন্‌কাকে তো আমি চাইলে এখনই বিয়ে করতে পারি। তার কারণ ওহে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ মহাশয়, টাকা যদি থাকে তাহলে ইচ্ছে হলেই হল, সব হবে। ঠিক এটাকেই তো ইভানের ভয়। তাই সে আমাকে পাহারা দিচ্ছে যাতে আমি বিয়ে করতে না পারি, আর মিতিয়াকে উস্‌কানি দিয়ে যাচ্ছে গ্রুশেন্‌কাকে বিয়ে করার জন্য। এই ভাবে গ্রুশেন্‌কাকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। আহা, ভাবটা দেখ, যেন গ্রুশেন্‌কাকে আমি যদি বিয়ে না করি তাহলে ওর জন্য আমি টাকা রেখে যাব! আবার অন্যদিকে দেখ, মিতিয়া যদি গ্রুশেন্‌কাকে বিয়ে করে তাহলে ইভান ওর

ধনী বাগ্‌দত্তাটিকে বাগাতে পারে—এই হল ওর হিসেব! তোর ইভানটা হল একটা হাড় বজ্জাত!”

“ইশ্, আপনার মেজাজটা দেখছি বড্ড তিরিক্ষি হয়ে আছে! গতকালের ঘটনার পর থেকে আপনার এই দশা। যান শুয়ে পড়ুন গে, আপনার বিশ্রাম দরকার” আলিয়োশা বলল।

“এই দ্যাখ না, এই যে তুই কথাটা বলছিস ” হঠাৎ বুড়ো এমন ভাবে বলল, যেন ব্যাপারটা সবে এই প্রথম তার মাথায় ঢুকেছে, “বলছিস, অথচ তাতে আমি তোর ওপর রাগ করছি না, কিন্তু ইভান যদি আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলত তাহলে আমি রাগ করতাম। একমাত্র তোরই সঙ্গে আমার দিব্যি ভালো সময় কাটে, নইলে আমি কিন্তু একটা বদমেজাজি লোক।”

“আপনি বদমেজাজি নন, আসলে বুদ্ধিভ্রংশ লোক।” আলিয়োশা হাসল।

“শোন, ভেবেছিলাম ওই গুন্ডা মিতিয়াটাকে আজ জেলে পোরার ব্যবস্থা করব, কিন্তু এখন পর্যন্ত জানি না ঠিক কী করব। এটা ঠিক যে আজকালকার যা ধারা তাতে বাপ মাকে অন্ধ কুসংস্কার বলে ধরা হয়, কিন্তু তাহলেও বুড়ো বাপকে তাদের নিজেদেরই বাড়িতে চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে মেঝেতে ফেলে জুতোর হিল দিয়ে মুখে ঘা বসানো, আবার বড়াই করে এমন কথাও বলা যে আবার আসবে এবং তখন এসে একেবারে খুনই করে যাবে—সে সবও কিনা রীতিমতো সাক্ষীসাবুদ রেখে—আমার তো মনে হয় আমাদের কালেও আইনে এর অনুমোদন নেই। আমি হলে, আমি চাইলেই বাছাধনকে নাকে খত্ দিয়ে ছাড়তাম, গতকাল যা করেছে তার জন্যে এখনই গারদে পুরতে পারতাম।”

“তাহলে এখন আর আদালতে নালিশ করতে চান না?”

‘ইভান আমাকে ক্ষান্ত করল। অবশ্য ইভানের কথায় আমার বয়েই গেছে। কিন্তু আমি নিজেই ভেবে দেখলাম, আরও একটা ব্যাপার আছে

এই বলে আলিয়োশার দিকে ঝুঁকে পড়ে গোপনীয়তার খাতিরে গলা খাটো করে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল

“আমি যদি হারামজাদাটাকে গারদে পুরি তাহলে ওই বেটি শুনতে পাবে আমি ওকে গারদে পুরেছি, শোনামাত্র ওর কাছে ছুটে আসবে। অন্য দিকে আজ যদি শুনতে পায় যে ব্যাটাচ্ছেলে আমার মতো এক দুর্বল বুড়োহাবড়াকে পিটিয়ে আধমরা করে ছেড়েছে তাহলে হয়তো ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই দেখার জন্য ছুটে আসবে।... ওটাই তার চরিত্রের অবদান—কেবল উলটোটা করা চাই। আমি ওর হাড় হদ্দ জানি! কিরে একটু ব্র্যান্ডি চলবে নাকি? নে না খানিকটা কফি — হলই না হয় ঠান্ডা। ওতে তোর জন্যে এক গেলাসের চার ভাগের এক ভাগ ব্র্যান্ডি ঢেলে দেব—আহা, খেতে যা হবে না রে!”

"না, কাজ নেই। ধন্যবাদ। আমি বরং ওই ছোট্ট রুটিটা নিই—যদি দেন। পরে খাব", এই বলে আলিয়োশা টেবিল থেকে তিন কোপেকের ফরাসি রুটিটা তুলে নিয়ে তার জোব্বার পকেটে পুরল। "আর ব্র্যান্ডিটা আপনার পক্ষেও এখন খাওয়া ঠিক হবে না", বুড়োর মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সশঙ্কিত হয়ে সে পরামর্শ দিল।

"যা বলেছিস। শান্ত তো করেই না, বরং উত্তেজিত করে তোলে। তবে খাচ্ছি তো মাত্র একটি গেলাস। এই যে বের করছি খাবারের আলমেরিটা থেকে।

চাবি দিয়ে খাবারের 'আলমেরিটা' খুলে সে এক গেলাস ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে পান করল, তারপর আলমেরি বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা আবার পকেটে রেখে দিল।

"এতেই হবে। এক গেলাসে তো আর কেলিয়ে যাব না—কী বলিস?"

"এই তো এইবারে আপনাকে ভালোমানুষ-ভালোমানুষ দেখাচ্ছে।" আলিয়োশার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"হুম্! তোকে ভালোবাসতে আমার কোনো ব্র্যান্ডির দরকার হয় না, কিন্তু পাজিগুলোর সঙ্গে ব্যবহারে আমিও পাজি। এ যে দ্যাখ্ না কেন, ইভান—চেরমাশ্নিয়াতে যাচ্ছে না কেন? গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না?—গ্রুশেন্কা যদি আসে তাহলে আমি তাকে কতটা দিই সেটা দেখতে হবে না? সব কটা হারামজাদা! ইভানটাকে তো আমি একদম মেনে নিতে পারছি না। কোথা থেকে অমন হল বল তো? মনের দিক থেকে একদম আমাদের গোত্রের নয়। ভেবেছে কি ওর জন্য আমি কিছু রেখে যাব? আরে বাপু উইল-টুইল ওসব কিছুই আমি করতে যাচ্ছি না—এটা তোদের জেনে রাখা ভালো। আর মিতিয়াটাকে আমি আরশুলার মতো টিপে মারব। আমি রাতের বেলায় চটি দিয়ে কালো-কালো আরশুলা পিষে মারি। চটাস করে বাড়ি মেরেছ কি অমনি পটাস। তোর মিতিয়াও অমনি পটাস মেরে যাবে। তোর মিতিয়া—বলছি এই কারণে যে তুই ওটাকে ভালোবাসিস। তা এই দ্যাখ, তুই ওকে ভালোবাসিস, কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না। ইভান যদি ওকে ভালোবাসত তাহলে কিন্তু সে যে ওকে ভালোবাসে এই জন্যে নিজের কথা ভেবে আমি ভয় পেতাম। তবে ইভান কাউকে ভালোবাসে না। ইভান আমাদের লোক নয়। ইভানের মতো এই লোকগুলো আমাদের গোত্রের নয়, ওরা হল গিয়ে ধুলোর মেঘ একটু হাওয়া উঠল কি এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। গতকাল আসলে বোকার মতো একটা চিন্তা আমার মাথায় ভর করেছিল, যখন আমি তোকে আজ আমার কাছে আসতে বলেছিলাম। ইচ্ছে ছিল মিতিয়ার ব্যাপারে তোর মারফত জেনে নিই ওকে যদি এখন হাজারখানেক—ধর না হয় দু হাজারই—দিই তাহলে ওই হাড়হাবাতে হতভাগাটা কি এই তল্লাট থেকে একেবারে দূর হয়ে যাবে—এই ধর বছর পাঁচেকের মতো, অবশ্য আরও ভালো হয় বছর পঁয়ত্রিশের মতো হলে—

তবে হ্যাঁ, গ্রুশেন্‌কাকে ছাড়া। তার আশা চিরকালের জন্যে ছাড়তে হবে। কী বলিস, অ্যাঁ?

"আমি  আমি জিগ্‌গেস করে দেখব  " বিড়বিড় করে বলল আলিয়োশা। "যদি পুরোপুরি তিন হাজার দাও তাহলে হয়তো  "

"বাজে কথা ছাড়! এখন আর জিগ্‌গেস করে কাজ নেই, ওসবের দরকার হবে না। আমি মত বদলেছি। সে ওই গতকাল আমার অপদার্থতার সুযোগে বোকামির ভূত ঢুকে পড়েছিল আমার এই খুপরিটার ভেতরে। কিছু দেব না, কিচ্ছুটি না। টাকা আমার নিজেরই দরকার হবে", বুড়ো হাত নেড়ে বলল। "ওসবের দরকার হবে না, আমি অমনিতেই ওটাকে ধরে আরশুলার মতো টিপে মেরে ফেলব। ওকে কিছু বলবি না, বললেই আশা করে বসে থাকবে। আর হ্যাঁ, তোরও আমার এখানে কিছু করার নেই, কেটে পড়। ওর সেই পাত্রীটি, সেই কাতেরিনা ইভানভ্‌না, যাকে সব সময় আমার কাছ থেকে অত যত্ন করে লুকিয়ে রাখছে, সে কি মিতিয়াকে বিয়ে করবে, না কি করবে না? তুই গতকাল মেয়েটার ওখানে গিয়েছিলি যেন মনে হচ্ছে?"

"মেয়েটি ওকে কোনো মতে ত্যাগ করবে না।"

"বোঝ কাণ্ড! ভদ্রঘরের কোমল স্বভাবের মেয়েগুলো কিনা বেছে বেছে এই সব পাজি বদমাশ ও লম্পটগুলোকেই ভালোবাসে! আরে ধুৎ! তোকে বলে রাখি, অতি রদ্দি মাল বড়ো ঘরের ফ্যাকাশে চেহারার ওই দিদিমণিগুলো। ব্যাপারটা হল গিয়ে  হুঁঃ! আমার যদি ওর যৌবন থাকত, আর আমার তখনকার সেই চেহারা —কারণ আটাশ বছর বয়সে আমি দেখতে ওর চাইতেও ভালো ছিলাম—তাহলে আর দেখতে হত না! আমিও ঠিক ওরই মতো করে বেড়াতাম। ওটা একটা কুলাঙ্গার! সে যাই হোক, গ্রুশেন্‌কাকে তাই বলে আর পেতে হচ্ছে না, মোটেই পেতে হচ্ছে না  ওটাকে থেঁতলে কাদা বানিয়ে ছাড়ব!"

শেষ কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

"যা, চলে যা, তুই চলে যা। আমার এখানে আজ আর তোর কিছু করার নেই", হঠাৎ তিক্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল।

আলিয়োশা তার কাছে এগিয়ে গেল, বিদায় নেবার জন্য বাবার কাঁধে চুমো খেল।

"এটা আবার কী হল?" বুড়ো খানিকটা অবাক হয়ে গেল। "আরে আবার তো দেখা হবেই। তুই কি মনে করিস আর দেখা হবে না?"

"না, না, ওরকম আমার একেবারেই মনে হয়নি। ওটা কোনো কিছু না ভেবেই করেছি।"

"তা বেশ, আমিও কিছু মনে করিনি, ওই অমনি আর কি  তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বুড়ো বলল। "আরে শোন শোন", আলিয়োশাকে চলে যেতে

দেখে পেছন থেকে চিৎকার করে তাকে বলল, "যত তাড়াতাড়ি পারিস কোনো একদিন আসিস কিন্তু, মাছের স্যুপ খেয়ে যাবি। মাছের স্যুপ রান্না হবে—আজকের মতো নয়, বিশেষ ধরনের হবে। অবশ্যই আসবি! কালই হোক না। শুনছিস, কালই আয়।"

আলিয়োশা দরজার আড়াল হতে না হতে বুড়ো আবার তার 'আলমেরির' দিকে পা বাড়াল, ঢকাস করে আরও আধ গেলাস গলায় ঢালল।

"আর খাব না!" বিড়বিড় করে এই কথা বলে, খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিয়ে আবারও চাবি দিয়ে আলমারি বন্ধ করল, চাবিটা আবার পকেটে পুরল। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকে অবসন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল, মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

## তিন

## স্কুল-পড়ুয়াদের খপ্পরে

'ভালো বলতে হবে যে গ্রুশেন্‌কার কথা আমাকে জিগ্‌গেস করেনি', বাবার কাছ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে মাদাম খখ্‌লাকোভার বাড়ির দিকে যেতে যেতে এদিকে আলিয়োশা মনে মনে ভাবল, 'তাহলে আবার হয়তো আমাকে গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে আমার গতকালের সাক্ষাতের কথা বলতে হত।' আলিয়োশা এই ভেবে বেদনা অনুভব করল যে এই যুযুধান লোকগুলি রাতারাতি নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করেছে, দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৃদয় আবার পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। 'বাবা রাগে ফুঁসছে, তার মন মেজাজ বিগড়ে আছে। কিছু একটা মতলব বের করেছে, সেটা নিয়ে পড়ে আছে। আর দ্‌মিত্রি? এক রাতের মধ্যে তারও বেশ জোরবল হয়েছে, সম্ভবত তারও মনমেজাজ বিগড়ে আছে, সেও রাগে ফুঁসছে, আর বলাই বাহুল্য, সেও কোনো একটা মতলব এঁটেছে। ওঃ আরে দেরি না করে, যে করেই হোক আজই, অতি অবশ্য ওকে খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু আলিয়োশা বেশিক্ষণ ভাবার অবকাশ পেল না। পথে আকস্মিক একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। ঘটনাটা দেখতে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও তাকে দারুণ অবাক করে দিয়েছিল। আমাদের গোটা শহরটাতে অসংখ্য নালা ছড়িয়ে আছে। বলশায়া স্ট্রিট আর তার সমান্তরালবর্তী মিখাইলভ্‌স্কায়া স্ট্রিটকেও ভাগ করে চলে গেছে স্রেফ এইরকমই একটি নালা। বাজার চত্বর ছাড়িয়ে মিখাইলভ্‌স্কায়া স্ট্রিটে পড়ার উদ্দেশ্যে আলিয়োশা তখন সবে একটা গলির ভেতরে মোড় নিয়েছে এমন সময় নীচের দিকে সরু খালের ওপরকার সাঁকোটার মাথাটায় স্কুলের ছেলেদের একটা ছোটোখাটো দঙ্গল তার চোখে পড়ল। ছেলেগুলি একেবারেই বাচ্চা—তাদের কারও বয়সই নয় থেকে বারো বছরের বেশি নয়। স্কুল থেকে

যে যার বাড়ি ফিরছে। কারও পিঠে ঝোলা, কারও বা কাঁধ বরাবর বেল্‌ট ঝুলছে চামড়ার ব্যাগ, কারও গায়ে ছোটো কোর্তা, কারও বা খাটো ঝুলের ওভারকোট, কারও কারও পায়ে গোড়ালি থেকে পায়ের গুল্‌ফ পর্যন্ত কুঁচি দেওয়া চাম্‌ড়ার হাইবুট যা পায়ে দিয়ে সচ্ছল মা বাবার আদুরে দুলালরা বাবুয়ানি করতে বিশেষ ভালোবাসে। গোটা দলটি উত্তেজিত ভাবে কী যেন আলোচনা করছে, দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো শলাপরামর্শ চলছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দেখলে আলিয়োশা কখনও উদাসীনভাবে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারত না, মস্কোতে থাকতেও তাই হত। যদিও তার বেশি প্রিয় ছিল তিন বছর বা তার কাছাকাছি বয়সের ছেলেমেয়েরা, তবু দশ এগারো বছর বয়সের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সে খুব পছন্দ করে। তাই এখনও তার মাথার মধ্যে যত চিন্তাই থাকুক না কেন, হঠাৎ তার ইচ্ছে হল ঘুরে ওদের কাছে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ জমায়। কাছে যেতে যেতে ওদের সকলের লাল টকটকে উত্তেজিত মুখগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, হঠাৎই তার নজরে পড়ল যে ছেলেগুলির প্রত্যেকের হাতে ঢিল, কারও কারও হাতে আবার দুটো করে। খালের ওপারে দলটা থেকে ত্রিশ পা মতন দূরে বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আরও একটি ছেলে, সে স্কুলের ছাত্র, তারও কাঁধের এক দিকে ঝুলছে স্কুলের ব্যাগ, উচ্চতা থেকে অনুমান করা যায় বছর দশেকের বেশি বয়স নয়—এমন কি তার কমও হতে পারে। ফ্যাকাশে, অসুস্থ ধরনের চেহারা, কালো চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। বেশ মনোযোগ দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছয়জন স্কুল ছাত্রের দলটিকে সে লক্ষ করছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এরা ওরই স্কুলের সহপাঠী, এই মাত্র তাদেরই সঙ্গে স্কুল থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু কোনো কারণে সম্ভবত তাদের সঙ্গে ওর রেষারেষি চলছে। আলিয়োশা এগিয়ে গেল। হালকা রঙের কোঁকড়া চুল একটি ছেলে, তার গাল দুটো গোলাপি রঙের, গায়ে কালো জ্যাকেট। তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকে লক্ষ করে আলিয়োশা মন্তব্য করল:

"আমি যখন এই তোমাদের মতো স্কুলে ব্যাগ বইতাম তখন আমরা ঝোলাতাম বাঁ কাঁধে, তাতে ডান হাতটা খালি থাকে—চট করে ব্যাগের নাগাল পাওয়া যায়; কিন্তু তোমাদের দেখছি ব্যাগ ঝুলছে ডান দিকে, এতে তোমাদের অসুবিধেই হওয়ার কথা।"

কোনো পূর্বপরিকল্পিত চাতুরি ছাড়াই সরাসরি এই কাজের কথা দিয়ে আলিয়োশা আলাপ শুরু করে দিল। কোনো বয়স্ক লোককে যদি সরাসরি কোনো শিশুর, বিশেষত পুরো একদল শিশুর আস্থা অর্জন করতে হয়, তাহলে অবশ্য তার পক্ষে এছাড়া আর কোনো ভাবে শুরু করা উচিতও নয়। এই ভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজের কথা বলে শুরু করলে তাদের সমানে সমানে চলা যায়। আলিয়োশা তার সহজবুদ্ধি দিয়ে এটা বুঝতে পারত।

"আরে, ও তো ন্যাটা", বছর এগারো বয়সের স্বাস্থ্যবান ডাকাবুকো গোছের

আরেকটা ছেলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল। আর যে বাকি পাঁচটা ছেলে তারা সকলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল আলিয়োশার দিকে।

"ও ত ঢিলও ছোড়ে বাঁ হাতে", তৃতীয় আরেকটি ছেলে মন্তব্য করল। ঠিক এই মুহূর্তে একটা ঢিল সাঁ করে উড়ে এসে পড়ল দলটার মধ্যে। ঢিলটা ন্যাটা ছেলেটার সামান্য গা ঘেঁষে ছুটে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, যদিও সজোরে এবং রীতিমতো তাক করেই ছোড়া হয়েছিল, ছুড়েছিল খালের ওপারের সেই ছেলেটা।

"লাগা লাগা, ওকে বসিয়ে দে, স্মুরভ্!" সকলে চেঁচিয়ে উঠল। স্মুরভ্ সেই ন্যাটা ছেলেটা। অমনিতেই বসে থাকার পাত্র সে নয়, প্রতিশোধ নিতে একমুহূর্ত দেরি করল না খালের ওপারের ছেলেটিকে লক্ষ করে ঢিল ছুড়ল, কিন্তু ঢিলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধপ্ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। খালের ওপারের ছেলেটাও কালবিলম্ব না করে দলটাকে লক্ষ করে আবারও ঢিল ছুড়ল, এবারে ঢিলটা সোজা আঘাত করল আলিয়োশাকে, সজোরে এসে লাগল তার কাঁধে। খালের ওপারের ছেলেটা পকেট বোঝাই ঢিল মজুত করে রেখেছিল। তার ওভারকোটের পকেট যে ভাবে ঢিলে বোঝাই হয়ে ফুলে ছিল ত্রিশ পা দূর থেকেও তা চোখে পড়ছিল।

"ওটা ও মেরেছে আপনাকে তাক করে, ইচ্ছে করেই আপনাকে তাক করেছে আপনি কারামাজভ্ কিনা তাই। কারামাজভ্, তাই না?" ছেলের দল হো-হো করে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠল। "ওরে তোরা সবাই লাগা, একসঙ্গে লাগা ওটাকে!"

দলের ভেতর থেকে একসঙ্গে ছটা ঢিল সাঁ সাঁ করে ছুটে গেল ছেলেটার দিকে, একটা গিয়ে লাগল তার মাথায়। সে পড়েও গেল, কিন্তু পলকের মধ্যে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে দলটাকে লক্ষ করে পালটা ঢিল ছুড়তে লাগল। দুই তরফ থেকেই অবিরাম বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। দেখা গেল দলের অনেকেরও পকেট বোঝাই ঢিল মজুত ছিল।

"এসব তোমরা কী করছ! তোমরা না ভদ্রসন্তান! লজ্জা করে না তোমাদের ! ছয় জনে মিলে একজনের পিছনে লেগেছ! ওকে তো মেরে ফেলবে তোমরা!" আলিয়োশা চিৎকার করে উঠল।

খালের ওপারের ছেলেটাকে নিজের গা দিয়ে আড়াল করার উদ্দেশ্যে সে একলাফে ছুটে এসে উড়ন্ত ঢিলগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। তিন চারটে ছেলে মুহূর্তের জন্য দমে গেল।

লাল শার্ট পরা একটা ছেলে বিরক্তিভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "ও-ই তো আগে শুরু করেছিল! আস্ত জানোয়ার একটা। এই তো সেদিন ক্লাসে ক্রাসোত্কিনের গায়ে পেন্সিল কাটা ছুরি বিঁধিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছিল। ক্রাসোত্কিন অবশ্য নালিশ করতে যাবে না, কিন্তু এটাকে মেরে ঠান্ডা করা দরকার। "

"কিন্তু কেন? তোমরা নিজেরাই হয়তো ওকে জ্বালাতন করছ?"

"দেখলেন, দেখলেন, আবারও একটা ঢিল ছুড়ল—এই যে আপনার পিঠে এসে

পড়ল'', ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল, ''এবারে কিন্তু ও আমাদের তাক করছে না—আপনাকেই করছে। আরে লাগা লাগা, সবাই মিলে আবারও লাগা ওটাকে। ওরে স্মুরভ্, দেখিস, ফসকাবি না কিন্তু!''

আবার শুরু হয়ে গেল ঢিল ছোড়াছুড়ি। এবারে সেটা রীতিমতো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। একটা ঢিল খালের ওপারের ছেলেটার বুকে এসে লাগল। সে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে টিলামতন জায়গাটার ওপরে উঠে মিখাইলভ্স্কায়া স্ট্রিটের দিকে ছুটে পালাল। ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠল 'হুঁ হুঁ, ভয় পেয়েছে বাছাধন! পালাচ্ছে। শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়া!'

''আপনি এখনও জানেন না কারামাজ়ভ্ ওটা কতবড় জানোয়ার। ওটাকে খুন করলেও কম করা হয়'', সেই যে জ্যাকেট পরা ছেলেটা যার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল সে বলল। দলের মধ্যে সে-ই সম্ভবত সকলের চেয়ে বড়ো।

''কিন্তু ছেলেটা কেমন?'' আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল। ''কথায় কথায় নালিশ করে বুঝি?''

ছেলেরা অনেকটা বিদ্রুপের হাসি হেসে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাউয়ি করল।

''আপনি ওই মিখাইলভ্স্কায়াতেই যাচ্ছেন তো?'' ওই ছেলেটাই আবার বলল। ''তাহলে তো ওকে পথেই পেয়ে যাবেন ওই দেখুন, ফের দাঁড়িয়ে পড়েছে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকিয়ে তাকিয়ে আপনাকেই দেখছে।''

''আপনাকে দেখছে, আপনাকে দেখছে!'' অন্য ছেলেরা তার কথার প্রতিধ্বনি তুলল।

''আচ্ছা ওকে জিগ্‌গেস করবেন তো শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়া ওর কেমন লাগে। শুনছেন? এ কথাই জিগ্‌গেস করবেন।

সকলে একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। আলিয়োশা ওদের দিকে তাকাল, ওরাও তার দিকে তাকাল।

''যাবেন না, আপনাকে মেরে বসবে'', চেঁচিয়ে তাকে সতর্ক করে দিল স্মুরভ্।

''ওহে ভদ্র সন্তানেরা, আমি ওকে শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়া নিয়ে কোনও প্রশ্ন করব না, কেননা বুঝতে পারছি ওই কথা বলেই তোমরা ওকে খ্যাপাও, তবে আমি ওর কাছ থেকে জেনে নেব কেন তোমরা ওকে অমন ঘৃণা কর।

''জেনে নিন, জেনে নিন!'' ছেলের দল হেসে উঠল।

আলিয়োশা সাঁকো পার হয়ে বেড়াটার পাশ দিয়ে উঁচু জায়গাটার ওপর উঠে সোজা সকলের ঘৃণার পাত্র ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল।

''দেখবেন কিন্তু'', পিছন পিছন তাকে সতর্ক করে দিয়ে সকলে চেঁচিয়ে বলল, ''আপনাকে ভয় পাবে না। লুকিয়ে চুরিয়ে কখন ছুরি বসিয়ে দেবে টেরই পাবেন না—যেমন দিয়েছিল ক্রাসোত্‌কিনকে।

ছেলেটা তার অপেক্ষায় ছিল, জায়গা থেকে নড়েনি। একেবারে কাছাকাছি এসে

সামনা সামনি হতে আলিয়োশা লক্ষ করে দেখল ছেলেটার বয়স বছর নয়েকের বেশি হবে না, বয়সের তুলনায় খাটো, রুগ্‌ণ চেহারা, ফ্যাকাশে, শীর্ণ, লম্বাটে মুখ, বড়ো বড়ো কালো দুটি চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছে তাকে। গায়ে শতচ্ছিন্ন পুরনো ওভারকোট—মাপে এত ছোটো যে দেহটা তার ভেতর থেকে কদর্যভাবে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দস্তানা-না-পরা খালি হাত দুটো বেরিয়ে আছে হাতা থেকে। প্যান্টের ডান হাঁটুতে মস্ত তালি, আর ডান পায়ের হাইবুটে, জুতোর ডগায়, বুড়ো আঙুলের জায়গাটাতে একটা বড়োসড় ফুটো—দেখাই যাচ্ছে বেশ কালো করে কালি দিয়ে সেই আঙুলটা লেপা। কোটের দুটো পকেটই ঢিলে বোঝাই হয়ে ফুলে আছে। আলিয়োশা ছেলেটার দুপা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল। আলিয়োশার চোখের দৃষ্টিতে ছেলেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে তাকে মারার কোনো অভিপ্রায় আলিয়োশার নেই। তাই উগ্র ভাবটাও তার কমে গেল, এমনকি নিজে থেকেই কথা বলতে শুরু করল।

"আমি একা, ওরা ছজন। আমি একা ওদের সবগুলোকে মেরে ঠান্ডা করব", হঠাৎ সে বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঝলক দিয়ে উঠল তার দুই চোখ।

"একটা ঢিল বোধহয় তোমার খুবই লেগেছিল তাই না?" আলিয়োশা বলল।

"তা আমিও স্মুরভের মাথায় জোর একটা ঝেড়েছি!" ছেলেটা চিৎকার করে উঠল।

"ওরা কিন্তু বলেছিল তুমি নাকি আমাকে চেন এবং কী একটা কারণে যেন আমাকে ঢিল মেরেছিলে, তাই কি?" আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

ছেলেটা মুখ গোমড়া করে আলিয়োশার দিকে তাকাল।

"আমি তোমাকে জানি না। তুমি কি আমাকে চেন?" আলিয়োশা তার কথার জের টেনে বলল।

"আমার পেছনে লাগতে আসবেন না তো!" হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। তবে জায়গা ছেড়ে নড়ল না, দেখে মনে হল যেন কিছু একটার প্রতীক্ষায় আছে। আবারও বিদ্বেষে জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখদুটো।

"ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি", আলিয়োশা বলল, "শুধু জেনে রেখো, আমি তোমাকে চিনি না, তোমাকে খ্যাপাচ্ছি না। তোমাকে কী করে খ্যাপাতে হয় ওরা আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি তোমাকে খ্যাপাতে চাই না। আচ্ছা, চলি তাহলে।"

"আহা, কায়দার পেন্টলুন পরা সন্নিসি আমার!" ছেলেটা চিৎকার করে বলে উঠল। সেই একই রকম ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধংদেহি দৃষ্টিতে আলিয়োশাকে লক্ষ করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়েও পড়ল, কেননা তার ধারণা হয়েছিল এরপর আলিয়োশা অবশ্যই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আলিয়োশা তার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে আবার যেমনকার তেমন চলতে লাগল। কিন্তু

আলিয়োশা তিন পা যেতে না যেতেই ছেলেটা পকেট থেকে সবচেয়ে বড় একটা পাথরের চাঁই বের করে সজোরে ছুড়ে মারল তার পিঠে।

"ও, তুমি তাহলে পিছন থেকে লোককে মার? ওরা দেখছি ঠিকই বলেছিল যে তুমি লুকিয়ে চুরিয়ে আচমকা আক্রমণ কর?" আবারও ঘুরে দাঁড়াল আলিয়োশা। কিন্তু এবারে ছেলেটা ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে আবার আরেকটা ঢিল ছুড়ে মারল, তবে এবারে সোজা তার মুখ লক্ষ করে। আলিয়োশা যথাসময়ে হাত দিয়ে ঠেকানোর অবকাশ পেল। ঢিলটা তার কনুইয়ে এসে লাগল।

"লজ্জা করে না তোমার? আমি তোমার কী করেছি?" চিৎকার করে উঠল আলিয়োশা।

ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে চুপচাপ কেবল একটি জিনিসেরই অপেক্ষা করতে লাগল: ভাবল এবারে আলিয়োশা নিঃসন্দেহে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু যখন দেখল এবারেও আলিয়োশা সে রকম কোনো গরজ দেখাচ্ছে না তখন একটা ছোটোখাটো বন্য জন্তুর মতো একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে নিজেই জায়গা ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে এসে আলিয়োশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলিয়োশা নড়াচড়ার কোনো অবকাশই পেল না—তার আগেই ক্ষিপ্ত ছেলেটা মাথা গোঁজ করে আলিয়োশার হাতটা দুহাতে চেপে ধরে তার মাঝের আঙুলে সজোরে একটা কামড় বসিয়ে দিল। দাঁত অনেকখানি ফুটিয়ে দিল, সেকেন্ড দশেক আঙুলটা ছাড়ার কোনো নাম নেই। আলিয়োশা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, প্রাণপণ শক্তিতে হেঁচকা টানে আঙুল ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলেটা শেষকালে আঙুল ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল সেই আগের দূরত্বে। ঠিক নখের তলায় গভীর ভাবে মাংস কেটে একেবারে হাড় পর্যন্ত বসে গেছে কামড়টা, রক্ত পড়ছিল। আলিয়োশা রুমাল বের করে তাই দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধল ক্ষত আঙুলটি। বাঁধতে প্রায় পুরো এক মিনিট লাগল। ছেলেটা সমস্তক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, অপেক্ষা করতে লাগল কী হয়। শেষকালে আলিয়োশা তার দিকে চোখ তুলে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

"বেশ ঠিক আছে", সে বলল, "দেখলে তো কী জোর কামড়টা আমাকে দিয়েছ, কী দারুণ লেগেছে আমার? অনেক হয়েছে, কী বল? এবারে বল দেখি, আমি তোমার কী করেছি?"

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"আমি কিন্তু তোমাকে এক দম চিনি না, এই প্রথম দেখছি", আলিয়োশা সেই রকমই শান্ত কণ্ঠে বলে চলল, "কিন্তু এমন তো হতে পারে না যে আমি তোমার কিছু করি নি—তুমি মিছিমিছি আমাকে অমন যাতনা দিতে যাবেই বা কেন? তাহলে বল, আমি কী করেছি, তোমার কাছে আমি কোন্ অপরাধে অপরাধী?"

উত্তরের বদলে ছেলেটি হঠাৎ গলা ছেড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, হঠাৎই আলিয়োশার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। আলিয়োশা তার পিছু পিছু আস্তে

আস্তে মিখাইলভ্স্কায়া স্ট্রিটের দিকে হাঁটা শুরু করে দিল, আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল—দেখতে পেল দূরে ছেলেটা পায়ের গতি এতটুকু না কমিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে, একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, নিশ্চয় এখনও তেমনি কাঁদছে। আলিয়োশা মনে মনে ঠিক করল এক দিন সময় করে অতি অবশ্য ছেলেটিকে খুঁজে বের করতে হবে, এই যে প্রহেলিকাময় ঘটনাটি তাকে এমন অবাক করে দিয়েছে তার ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এখন তার সময় নেই।

## চার

## খখ্লাকোভাদের বাড়িতে

আলিয়োশা অনতিবিলম্বে মাদাম খখ্লাকোভার বাড়িতে পৌঁছে গেল। এটা মহিলার নিজস্ব বাড়ি, দোতলা, সুদৃশ্য, পাথরের তৈরি। আমাদের শহরের চমৎকার বাড়িগুলির মধ্যে একটা। মাদাম খখ্লাকোভা অধিকাংশ সময় যদিও থাকত অন্য আরেকটা প্রদেশে, যেখানে তার জমিদারি ছিল, অথবা মস্কোতে, যেখানে তার নিজস্ব বাড়ি ছিল, কিন্তু আমাদের শহরেও তার নিজের একটা বাড়ি ছিল, যেটা সে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। তাছাড়া আমাদের মহকুমায় তার যে জমিদারি সেটাও আবার তার তিনটি জমিদারির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো; কিন্তু তা হলে কী হবে, আমাদের মহকুমায় সে এ পর্যন্ত খুবই কম এসেছে। আলিয়োশার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে সামনের বড়ো ঘরেই ছুটে এল।

"প্রভুর অলৌকিক ক্ষমতার নতুন পরিচয়ের কথা যে চিঠিতে লিখেছিলাম সেটা পেয়েছেন তো?" স্নায়বিক উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"হ্যাঁ পেয়েছি।"

"সর্বত্র জানানো হয়েছে? সকলকে দেখিয়েছেন তো? উনি মার সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন!"

"উনি আজ ইহলোক ছেড়ে চলে যাচ্ছেন", আলিয়োশা বলল।

"শুনেছি। জানি। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি! আপনার সঙ্গে হোক বা যে কারও সঙ্গেই হোক এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ছটফট করছি। না, না, আপনার সঙ্গে, আপনার সঙ্গেই বলতে চাই! বড়োই দুঃখের কথা যে আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করা কোনোমতে সম্ভব হচ্ছে না! সারা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, সকলে কিছু একটার প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু এখন আপনি জানেন কি, কাতেরিনা ইভানভ্না এখন আমাদের বাড়িতেই বসে আছেন?"

"বাঃ, এটা আমার পরম সৌভাগ্য!" আলিয়োশা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল। "তাহলে তো আপনাদের এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে। গতকাল উনি আমাকে বলেছিলেন আমি যেন আজ অতি অবশ্য তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।"

"জানি, আমি সব জানি। ওর বাড়িতে গতকাল যা যা হয়েছিল আমি খুঁটিনাটি সব শুনেছি আর ওই জঘন্য মেয়েমানুষটার সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডকারখানা সম্পর্কেও সব জেনেছি। C'est tragique—ট্র্যাজিক! ওর জায়গায় আমি হলে — জানি না আমি হলে কী করতাম। কিন্তু আপনার ভাইটিও বাপু—আপনার ওই দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্—ছি ছি!—সেই বা কেমন মানুষ! ও হ্যাঁ, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম, ভাবতে পারেন, ওর সঙ্গে আপনার দাদাও এখানে ভেতরের ঘরে বসে আছেন, মানে গতকালের সেই ভয়ঙ্কর দাদাটি নয়—আপনার অন্য দাদাটি—ইভান ফিয়োদরভিচ—বসে বসে ওর সঙ্গে কথা বলছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথাবার্তা। ওদের দুজনের মধ্যে যে এখন কী হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। যা চলছে তা সাঙ্ঘাতিক। আমি আপনাকে বলব—বুকফাটা হাহাকার। সে এক আজগুবি গল্পকথা, যা কোনো মতেই বিশ্বাস করা যায় না! দুজনেই কেন কে জানে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওরা সেটা নিজেরাও বোঝে, আবার নিজেরা সেটা উপভোগও করে। আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম! অধীর হয়ে আপনার অপেক্ষা করছিলাম! বড়ো কথা এই যে এটা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি এখনই আপনাকে সব কথা বলব, কিন্তু, এই মুহূর্তে অন্য কথা — সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা—ওঃ হো, দেখুন দেখি, যেটা সবচেয়ে বড় কথা সেটাই কিনা বেমালুম ভুলে বসে আছি! লিজে অমন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কেন বলুন তো? যেই শুনল যে আপনি এসেছেন অমনি মেয়ের আমার হিস্টিরিয়া শুরু হয়ে গেল!"

"মামণি, হিস্টিরিয়া তো এখন দেখছি তোমার, আমার নয়", পাশের ঘরের দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ কলবল করে ভেসে এলো লিজার কণ্ঠস্বর। পাল্লার ফাঁকটা খুবই ছোটো হলে কী হবে কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল কেমন যেন ভেতর থেকে দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে—ঠিক যেমন হয়ে থাকে ভীষণ হাসি পেয়ে গেলে সেই হাসি প্রাণপণে চেপে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে। আলিয়োশা তৎক্ষণাৎ সেই ছোট্ট ফাঁকটি লক্ষ করল। লিজে তার চেয়ারে বসে সম্ভবত সেখান থেকেই উঁকি মেরে তাকে দেখছিল, তবে ওটা আর আলিয়োশা ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

"বিচিত্র নয় লিজে, বিচিত্র নয় তোমার যা খামখেয়ালি আবদার তার পাল্লায় পড়ে আমিও যে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ব তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু ও যে বড়ো অসুস্থ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, সারাটা রাতে এত অসুস্থ ছিল, জ্বরে এমনই ছটফট করছিল আর কাতরাচ্ছিল! অনেক কষ্টে ভোরবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম —মনে হচ্ছিল যেন ভোরও হবে না আর ডাক্তার হের্‌ৎসেন্‌শটুবেও আসবেন না। তিনি এসে দেখেশুনে বললেন যে কিছুই বুঝতে পারছেন না, অপেক্ষা করতে হবে। এই হের্‌ৎসেন্‌শটুবের ওই এক ধারা—এসে বলেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। মেয়ে আমার যেই আপনাকে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখল অমনি চেঁচিয়ে-

মেচিয়ে সে এক কাণ্ড! এই বুঝি মূর্ছা যায়। বলল হুইল চেয়ারে করে ঠেলে তাকে যেন এখানে তার আগের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়

"মা, আমি কিন্তু মোটে জানতাম না যে উনি আসছেন। আমি যে এই ঘরটাতে আসতে চেয়েছিলাম সেটা মোটেই ওঁর আসার জন্যে নয়।"

"এটা কিন্তু সত্যি নয় লিজে। ইউলিয়া ছুটে এসে তোকে খবর দিয়েছে যে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ আসছেন। তুই তো ইউলিয়াকে পাহারায় রেখেছিলি।"

"ওঃ মা, এটা কিন্তু তোমার দিক থেকে একেবারেই বুদ্ধির কাজ হল না। যদি ভুলটা শুধরে এখন সত্যি সত্যি বুদ্ধিমতীর মতো কিছু বলতে চাও তাহলে ও গো মা, লক্ষ্মীটি, এই যে আমাদের মাননীয় আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ মহাশয় আমাদের বাড়িতে ঢুকলেন, তাঁকে বল গতকালের ঘটনার পর এবং তাঁকে নিয়ে লোকে যে হাসাহাসি করছে তা সত্ত্বেও তিনি যে আজ আমাদের কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একমাত্র এটাতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী নন।"

"লিজে, তোমার কিন্তু বড্ড বেশি বাড় বেড়েছে। আমি তোমাকে বলে রাখছি শেষকালে আমি কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। কে ওঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে? উনি এসেছেন বলে আমি কি খুশিই না হয়েছি! ওঁকে আমার দরকার আছে, ওঁকে ছাড়া আমার একদম চলবে না। ওঃ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, আমি বড়ো অসুখী মানুষ!"

"কী হল মামণি? কী হয়েছে তোমার?"

"ওঃ তোমার এই যত খামখেয়াল, লিজে, তোমার অস্থিরতা, অসুস্থতা, জ্বরের রুগী নিয়ে বিভীষিকাময় রাত কাটানো, তারপর সেই ভয়ঙ্কর, আমাদের সেই নিত্যকার ডাক্তার হের্ৎসেন্শ্টুবে—সবচেয়ে বড়ো কথা সব সেই নিত্যকার, নিত্যকার, সবই নিত্যকার! আসল কথা, সব তাই, সবই তাই। এমনকি এই অলৌকিক ঘটনাও! ওঃ এই অলৌকিক ঘটনা আমাকে যে কী রকম স্তম্ভিত করে দিয়েছে, কী ভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তা আপনাকে কী বলব আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্! তারপর ওখানে বসার ঘরে এখন এই ট্র্যাজিডি, যেটা আমি সহ্য করতে পারছি না, পারছি না, আপনাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, পারছি না। কে জানে হয়তো ট্র্যাজিডি নয়, কমেডিই হবে। আচ্ছা বলুন তো মহাস্থবির জোসিমা কি কাল অবধি বাঁচবেন? বাঁচবেন কি? হা ভগবান! আমার ভেতরে ভেতরে যে কী হচ্ছে! যখনই চোখ বুজি তখনই দেখি সব ফাঁকি, সবই ফাঁকি।"

তার কথার মাঝখানে হঠাৎ বাধা দিয়ে আলিয়োশা বলল, "আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল—এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় দয়া করে দিতে পারেন? এই আঙুলটা বাঁধতাম। বড়ো বেশি আঘাত লেগেছে, এখন দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে।"

কামড় খাওয়া আঙুলে জড়ানো রুমালটা খুলল আলিয়োশা। চাপ চাপ ঘন রক্তে

মাখামাখি হয়ে আছে সেটা। মাদাম খখ্‌লাকোভা সভয়ে আর্তনাদ করে চোখ বুজে ফেলল

‘‘ইশ্ কী কাণ্ড! এ কী রকম আঘাত? এ যে সাঙঘাতিক!’’

কিন্তু লিজে যেইমাত্র দরজার ফাঁক দিয়ে আলিয়োশার আঙুলটা দেখতে পেল অমনি দরজা একেবারে হাট করে খুলে দিল।

‘‘ভেতরে চলে আসুন, ভেতরে চলে আসুন, এখানে আমার কাছে আসুন দেখি’’, রীতিমতো জেদের সঙ্গে কর্তৃত্বের সুরে চিৎকার করে সে বলল, ‘‘এবারে আর বোকামি নয়। হা ভগবান, এতক্ষণ কিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন? যেরকম ভীষণ ভাবে রক্ত পড়ছে তাতে তো মারা যাবার সম্ভাবনা মামণি! কোথায়, কী ভাবে এটা হল? জল, জল! আগে জল নিয়ে এসো! জখমের জায়গাটা ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে, ব্যথা বন্ধ করার জন্য স্রেফ ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে, অনেকক্ষণ ধরে রেখে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি কর মা, চট করে জল নিয়ে এসো হাত ধোয়ার একটা পাত্র করে। বলছি তো জলদি কর’’, নার্ভাস হয়ে সে তার কথা শেষ করল। সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আলিয়োশার আঘাতটা দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত।

‘‘হেরৎসেনশ্টুবেকে একবার খবর দিলে হত না?’’ মাদাম খখ্‌লাকোভা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল।

‘সত্যি মা, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে দেখছি। তোমার হের্‌ৎসেনশ্টুব্‌কে আমার জানা আছে—এসে তো বলবে বুঝতে পারছে না! জল জল! ঈশ্বরের দোহাই মা, নিজেই যাও না, গিয়ে ইউলিয়াকে একটু তাড়া দাও। ধারে কাছেই কোথাও কিছু একটা নিয়ে আটকে আছে, তাড়াতাড়ি কখনই আসতে পারে না! বলছি কি, শিগগির কর মা, নয়তো আমি মারা যাব।

‘‘আহা, ওটা কিছু নয়!’’ ওদের ভয় দেখে আলিয়োশা নিজেই ভয় পেয়ে বলে উঠল।

ইউলিয়া ছুটে জলের পাত্র নিয়ে এলো। আলিয়োশা জলে আঙুল ডুবাল।

‘‘ঈশ্বরের দোহাই মা, খানিকটা ব্যানডেজের পাতলা কাপড় নিয়ে এসো। পাতলা কাপড় আর সেই সঙ্গে কাটা ঘা বন্ধ করার জন্য ঘোলা জলের মতো ওই ঝাঁঝাল জিনিসটা   কী যেন ছাই ওটার নাম! আরে আছে আছে, আমাদের আছে। মা, তুমি তো নিজেই জান শিশিগুলো কোথায় থাকে—তোমার শোবার ঘরে, আলমারিতে ডান দিকে। ওখানে ওই বড়ো শিশিটা আর ব্যান্‌ডেজের পাতলা কাপড়ও আছে।

‘‘এক্ষুনি. সব কিছু নিয়ে আসছি লিজে। শুধু একটাই কথা, অমন চেঁচামেচি করিস নে, উতলা হোস নে। দেখছিস তো আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কেমন মুখ

বুজে যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছেন। আঙুলটা এমন সাংঘাতিক জখম হল কী করে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ?"

খখ্‌লাকোভা ত্রস্ত বেরিয়ে গেল। লিজে এরই অপেক্ষায় ছিল।

"আগে প্রশ্নের উত্তর দিন", সে তাড়াতাড়ি আলিয়োশাকে বলল, "অমন করে আঙুলটা জখম হল কী করে? এরপর সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব। কী হল, বলুন!"

আলিয়োশা তার সহজাত বোধ দিয়ে বুঝতে পারল যে লিজার পক্ষে তার মা ফিরে আসার আগে পর্যন্ত এই সময়টি মূল্যবান। আলিয়োশা অনেক কাটছাঁট করে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে, তবে সুস্পষ্ট ও যথাযথ ভাবে, স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তার রহস্যময় সাক্ষাতের ঘটনাটি বলল। একথা শুনে লিজা দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়াল।

"আপনি কী বলুন তো? অমন করে কি স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে আছে? তাও আবার এই জোব্বা পরে!" ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে এমন ভাবে চিৎকার করে উঠল যে মনে হল আলিয়োশার ওপর যেন তার সেই অধিকার আছে। "এর পর তো বলতে হয় আপনি নিজেই একটা বাচ্চা ছেলে, একেবারেই বাচ্চা ছেলে! তবে ওই পাজি ছেলেটার খোঁজ অতি অবশ্য নেবেন, জেনে আমাকে সব কিছু বলবেন, কেন না এর মধ্যে কোনো একটা রহস্য আছে। এবারে দ্বিতীয় যে কথাটা, তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আচ্ছা বলুন তো আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনি যে ব্যথায় এত কষ্ট পাচ্ছেন তা সত্ত্বেও কি আপনি নেহাৎই তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন? বিবেচকের মতো কথা বলতে পারেন?"

"খুব পারি। তা ছাড়া ব্যথাটাও এখন আর তেমন টের পাচ্ছি না।"

"তার কারণ এই যে আঙুলটা জলে ডুবিয়ে রেখেছেন। জলটা এক্ষুনি পাল্টাতে হয়, কেননা মুহূর্তের মধ্যে ওটা গরম হয়ে যাবে। ইউলিয়া, চট করে আমাদের তলকুঠুরি থেকে এক টুকরো বরফ নিয়ে এসো তো, আর নতুন একটা হাত ধোয়ার পাত্রও নিয়ে এসো জলসুদ্ধ। আচ্ছা, এইবারে ও বিদেয় হয়েছে, এখন কাজের কথায় আসা যাক ওগো আমার প্রিয় আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, চটপট আমায় ফেরত দিয়ে দিন দেখি আমার সেই চিঠিটা যেটা গতকাল আপনাকে লিখেছিলাম—চটপট, কেন না এখনই মামণি এসে যেতে পারে, আমি চাই নে

"চিঠিটা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।"

"কথাটা সত্যি নয়, ওটা আপনার সঙ্গেই আছে। আমি ঠিক জানতাম, আপনি অমন কথাই বলবেন। ওটা আপনার কাছে, আপনার পকেটেই আছে। বোকার মতো ওই ঠাট্টাটা করার জন্যে সারা রাত ধরে আমি এমন অনুশোচনায় ভুগেছি যে কী বলব! চিঠিটা ফেরত দিন, এক্ষুনি দিন!"

"ওটা বাড়িতে রয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমার চিঠিতে ওই বাজে ঠাট্টার পর আপনি তো আর আমাকে বাচ্চা মেয়ে বলে, একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে বলে ভাবতে পারেন না! অমন বোকার মতো ঠাট্টা করার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, কিন্তু চিঠিটা অতি অবশ্য আমাকে এনে দেবেন—এখন যদি সত্যি-সত্যি আপনার কাছে নাও থাকে, আজই এনে দেবেন, অবশ্যই এনে দেবেন, অতি অবশ্য এনে দেবেন!"

"আজ কোনো মতে হচ্ছে না, কারণ আমি মঠে যাচ্ছি, আগামী দিন দুয়েকের মধ্যে, তিন, এমনকি চারদিনও হতে পারে, আপনাদের কাছে আসছি না, কেন না মহাস্থবির জোসিমা

"চার দিন! কী যে বলেন! আচ্ছা শুনুন, আমার কথা ভেবে খুব হেসেছিলেন, তাই না?"

"না তো, এতটুকু হাসিনি।"

"কেন বলুন তো?"

"এই কারণে যে চিঠিতে তুমি যা যা লিখেছ সবই আমি বিশ্বাস করছি।"

"আপনি আমাকে অপমান করছেন!"

"মোটেই না। যেই পড়লাম, অমনি ভাবলাম সব ঠিক তেমনি তেমনিই ঘটবে, কারণ মহাস্থবির জোসিমা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মঠ ছাড়তে হবে। তারপর আমি আবার পড়াশুনা শুরু করব, পরীক্ষা দেব। আইনসম্মত বয়স যখন হবে তখন আমাদের বিয়ে হবে। আমি তোমায় ভালোবাসব। আজ পর্যন্ত যদিও ভালো করে ভেবে দেখার অবকাশ হয়নি, তবু এটুকু ভেবে দেখেছি যে তোমার মতো ভালো বৌ কোথাও আমি আর পাব না। আর মহাস্থবির তো বলেইছেন আমাকে বিয়ে করতে হবে।

"কিন্তু আমি ত বিকলাঙ্গ, আমাকে চাকাওয়ালা চেয়ারে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়!" লিজা হাসতে হাসতে বলল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

"আমি নিজে তোমাকে চাকাওয়ালা চেয়ারে করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াব। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই সময়ের মধ্যে তুমি ভালো হয়ে উঠবে।"

"কিন্তু এ আপনার পাগলামি!" নার্ভাস হয়ে লিজা বলে উঠল, "আমি একটু ঠাট্টা করলাম আর তাই থেকে কি না দুম্ করে এরকম একটা যা-তা সিদ্ধান্ত করে বসলেন!   ও, এই তো মামণিও এসে গেছে, ঠিক সময়েই এসে গেছে মনে হচ্ছে। ওঃ মা, সব সময়ই এমন দেরি কর কেন বল তো? এত দেরি করলে কি চলে! এই যে ইউলিয়াও বরফ নিয়ে এসেছে!"

"ওঃ লিজে, চ্যাঁচাস নে, অত করে বলছি চ্যাঁচাস নে। তোর ওই চিৎকার চেঁচামেচিতে আমার   কী করতে পারি বল, তুই নিজেই যখন ব্যান্ডেজের কাপড় আরেক জায়গায় গুঁজে রেখেছিস।   খুঁজে খুঁজে হয়রান   আমার সন্দেহ হয় ইচ্ছে করেই এটা করেছিস।"

"বাঃ, উনি যে অমন কামড়ে ক্ষতবিক্ষত আঙুল নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উদয় হবেন সেটাত আর আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না! সেটা যদি হত তাহলে বলতে পারতে আমি সত্যি সত্যি ইচ্ছে করে করেছি। আহা, মামণি আমার, স্বর্গের দেবী, বলিহারি বুদ্ধি!"

"বলিহারি বুদ্ধি বলিস আর যা-ই বলিস লিজে, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের আঙুল আর এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে তোর মনের অনুভূতিটা কিন্তু দারুণ! ওঃ আমাদের প্রিয় বন্ধু আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কী বলব আপনাকে, আমার প্রাণ যা ওষ্ঠাগত করে তুলছে তা যে বিশেষ একটা কিছু তা নয়, কোনো হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে বা ওই ধরনের কেউ নয়—সব মিলে একসঙ্গে, সবসুদ্ধ—সেটাই আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"অনেক হয়েছে মা, অনেক হয়েছে হের্‌ৎসেন্‌শ্‌টুবের কথা", উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে হাসতে বলল লিজা, "এবারে জলদি করে দাও দেখি মা তোমার ওই ব্যান্‌ডেজের পাতলা কাপড় আর জল। এ হল স্রেফ গুলার লোশন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ—হ্যাঁ, এই বারে মনে পড়েছে নামটা—চমৎকার লোশন কিন্তু এটা। বোঝ কাণ্ড মামণি, উনি পথে আসতে আসতে রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করেছিলেন, তাতে একটা ছেলে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল ওঁর আঙুলে। আচ্ছা বল দেখি এরপর কী বলবে? বলবে না কি একটা বাচ্চা ছেলে? একেবারেই বাচ্চা ছেলে? এরপরও কি, তুমিই বল মামণি, ওর কি বিয়ে করা উচিত? বলছি এই জন্যে যে ভাবতে পার মামণি, উনি বিয়ে করতে চান? একবার ভেবে দেখ, উনি বিবাহিত— সেটা কি হাসির ব্যাপার নয়? সাংঘাতিক নয় কি?"

এই বলে লিজা হেসেই চলল, আড়চোখে আলিয়োশার দিকে তাকাতে তাকাতে নার্ভাস হয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

"বিয়ে? ও আবার কী কথা লিজে! বিয়ের কথা এখানে ওঠে কী করে? এ যে একেবারে অবান্তর কথা। তাছাড়া কে বলতে পারে ছেলেটা পাগলা ছিল না?"

"আঃ মা, কী যে বল! ছেলেও আবার পাগলা কুকুরের মতো পাগলা হয় নাকি?"

"না হওয়ারই বা কী আছে লিজে? এমন বললি না যেন আমি বোকার মতো কিছু বলেছি। ধর তোর ওই ছেলেটাকে কোনো পাগলা কুকুর কামড়াল, ছেলেটা পাগলা হয়ে গেল, তারপর সে এক সময় তার আশেপাশের কাউকে কামড়ে বসল।... বাঃ কী সুন্দর ব্যান্‌ডেজটা আপনাকে বেঁধে দিয়েছে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্! আমি হলে কখনই অমনটা পারতাম না। এখন কি ব্যথাটা বোধ করছেন?"

"না, এখন খুবই সামান্য।"

"দেখবেন আবার, জল দেখে ভয় করছে না তো?" লিজা জিগ্‌গেস করল।

"অনেক হয়েছে, লিজে। তাড়াহুড়োতে না হয় পাগলা ছেলের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেছে, তাই বলে তুই কিনা সেটা ধরে বসে থাকলি! কাতেরিনা ইভানভ্না এইমাত্র জানতে পেরেছ যে আপনি এসেছেন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্। শোনামাত্র এমন ভাবে আমার কাছে ছুটে এলো যে কী বলব! আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, রীতিমতো ব্যাকুল হয়ে আছে।"

"আঃ মামণি! তুমি একাই যাও ওখানে, উনি এখন যেতে পারবেন না, ব্যথায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন।"

"না, না, একেবারেই কষ্ট পাচ্ছি না, খুব যেতে পারি      আলিয়োশা বলে উঠল।

"সে কি! আপনি চলে যাচ্ছেন? এ কেমন কথা? আপনি কি এটাই বলতে চান?"

"আহা, যাব তো কী হয়েছে? ওখানে যখন কাজ মিটে যাবে তখন আবার ফিরে আসব, আর তখন আবার আমরা কথা বলতে পারব, তোমার যতক্ষণ খুশি গল্প করব, কেমন? এখন কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্নার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় দেখা করার আমার ভারি ইচ্ছে, কেন না যে করেই হোক আজই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মঠে ফিরে যাবার খুবই ইচ্ছে আমার।"

"মামণি যাও, ওঁকে শিগ্‌গির নিয়ে যাও। আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কাতেরিনা ইভানভ্নার সঙ্গে কথাবার্তার পর আপনাকে আর কষ্ট করে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না, ওখান থেকেই সটান চলে যান আপনার মঠে, ওটাই আপনার গতি! আমার এখন ঘুম পেয়েছে, সারা রাত ঘুম হয়নি।"

"ওঃ লিজে, এ তো তুই নেহাৎ ঠাট্টা করে বলছিস! কিন্তু আসলে সত্যি-সত্যি যদি তুই ঘুমোতে পারতিস!" শ্রীমতী খখ্‌লাকোভা বলে উঠল।

"জানি না, আমি কী এমন      আমি আরও মিনিট তিনেক থাকতে পারি, যদি চাও, এমনকি পাঁচ মিনিটও", বিড়বিড় করে বলল আলিয়োশা।

"এমন [illegible] পাঁচ! ওকে নিয়ে যাও, মামণি, এক্ষুনি নিয়ে যাও! মানুষ তো নয় —একটা দানব!"

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে লিজে। চলুন, চলুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আজ ওর খামখেয়ালিপনা বড্ড বেশি বেড়ে গেছে, ওকে ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছে না। ওঃ নার্ভাস মেয়েদের নিয়ে যে কত দুঃখ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ! আবার বলাও যায় না, আপনার সামনে যে ঘুম পাবার কথা বলল সেটা হয়তো সত্যিও হতে পারে। আহা, কত তাড়াতাড়ি যে আপনি ওর চোখে ঘুম এনে দিলেন! কত বড়ো সৌভাগ্যের কথা!"

"আহা মা, কী ভালো ভালো দরদভরা কথা তুমি বলতে শুরু করেছ! এর জন্যে তোমাকে চুমু খাই মামণি।"

"আমিও তোকে চুমু খাই লিজে। শুনুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ", আলিয়োশাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর চলে ছেড়ে চলে যেতে যেতে বেশ গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে রহস্যজনকভাবে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে মাদাম খখ্‌লাকোভা বলতে শুরু করল, "আমি আগে থেকে কিছু বলে আপনার মনের মধ্যে একটা ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চাই নে, এই পর্দাটা তুলতেও চাই নে, আপনি যান, গিয়ে নিজের চোখেই দেখুন ওখানে কী কাণ্ডকারখানা ঘটছে। যা ঘটছে তা সাঙ্ঘাতিক, অকল্পনীয় এক তামাশা: সে আপনার দাদা ইভান ফিয়োদরভিচকে ভালোবাসে, অথচ নিজেকে আপ্রাণ এই বলে বুঝ দিতে চাইছে যে আপনার আরেক দাদা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে ভালোবাসে। কী ভয়ঙ্কর! আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি এবং আমাকে যদি ওরা তাড়িয়ে না দেয় তাহলে এর শেষ কোথায় দেখে ছাড়ব।"

## পাঁচ
## বসার ঘরে বুকফাটা হাহাকার

কিন্তু বসার ঘরে আলোচনা ততক্ষণে শেষ হয়ে আসছিল। কাতেরিনা ইভানভ্‌না দারুণ উত্তেজিত, যদিও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার সংকল্পে অটল। আলিয়োশা ও মাদাম খখ্‌লাকোভা যখন ঘরে ঢুকল ঠিক সেই মুহূর্তটিতে দেখা গেল ইভান ফিয়োদরভিচ বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ বেশ খানিকটা ফ্যাকাশে। আলিয়োশা উদ্বিগ্ন হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। ঘটনাটা এই যে এখন, এই মুহূর্তে আলিয়োশার কাছে তার সেই সমস্ত সন্দেহের একটির, একটি অস্বস্তিকর সমস্যার সমাধান ঘটতে চলেছে যা বেশ কিছু কাল হল তাকে পীড়া দিচ্ছিল। এই এক মাস আগেও বেশ কয়েক বার বিভিন্ন মহল থেকে তার মনের মধ্যে এমন একটা ধারণার সঞ্চার করা হয়েছিল যে দাদা ইভান কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে ভালোবাসে এবং আরও বড়ো কথা এই যে মিতিয়ার কাছ থেকে সত্যি সত্যি সে তাকে 'ছিনিয়ে নেবার' মতলব আঁটছে। একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত ব্যাপারটা আলিয়োশার কাছে উদ্ভট বলেই মনে হয়েছিল, যদিও এতে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিল। দুই দাদাকেই সে ভালোবাসে—তাই দুজনের মধ্যে এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে। এরই মধ্যে এই গতকালই স্বয়ং দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ হঠাৎ তার কাছে সরাসরি ঘোষণা করে বসল যে ভাই ইভানের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছেই, পরন্তু সে এতে খুশিও এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাকে, মানে দ্‌মিত্রিকেই, প্রভূত ভাবে সাহায্য করবে। কী ভাবে সাহায্য করবে? গ্রুশেন্‌কাকে বিয়ে করার ব্যাপারে? কিন্তু সেটা আলিয়োশার কাছে শেষ ও মরিয়া পদক্ষেপ বলেই মনে হয়েছিল। এ সব ছাড়াও এই গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্তও আলিয়োশার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে কাতেরিনা ইভানভ্‌না নিজে একান্তভাবে, উদগ্রভাবে দাদা দ্‌মিত্রিকেই

ভালোবাসে—কিন্তু সে বিশ্বাসটা কেবল গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্তই ছিল। পরন্তু, আলিয়োশার কেন যেন মনে হয়েছিল যে ইভানের মতো লোককে কাতেরিনা ইভানভ্না ভালোবাসতে পারে না, সে দ্মিত্রিকেই ভালোবাসে—দ্মিত্রি যা ঠিক তার জন্যই তাকে ভালোবাসে, তা সেই ভালোবাসার মধ্যে যত অস্বাভাবিকতাই থাকুক না কেন। কিন্তু গতকাল গ্রুশেন্কার সঙ্গে যে কাণ্ডটা হল তাতে হঠাৎ যেন আলিয়োশার আরেক রকমের ধারণা হল। মাদাম খখ্লাকোভা এই মাত্র যে 'বুকফাটা হাহাকার' কথাটি উচ্চারণ করল সেটা শুনে আলিয়োশা প্রায় আঁতকে উঠেছিল, কেন না আজ রাতেই ভোরের দিকে তার ঘুমটা ভেঙে যেতে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় সম্ভবত স্বপ্নে দেখা কোনো কিছুর প্রত্যুত্তরেই সে হঠাৎ বলে উঠেছিল "ওঃ কী 'বুকফাটা হাহাকার'!" সারা রাত স্বপ্নের মধ্যে সে যা দেখেছে তা গতকাল কাতেরিনা ইভানভ্নার বাড়িতে ঘটে যাওয়া সেই দৃশ্য। এখন আলিয়োশা অবাক হয়ে গেল যখন মাদাম খখ্লাকোভা হঠাৎ জোর দিয়ে সোজাসুজি তার এই অভিমত প্রকাশ করল যে কাতেরিনা ইভানভ্না দাদা ইভানকে ভালোবাসে, কিন্তু নিজে শুধু যেন ইচ্ছে করেই, নিজেকে সে বঞ্চনা করছে, নিজেকে পীড়ন করছে দ্মিত্রির প্রতি তার এক ধরনের মনগড়া ভালোবাসার কথা ভেবে, যে ভালোবাসার জন্ম নাকি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে।—কে জানে এ তার কী খেলা, কী 'বুকফাটা হাহাকারে' যে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে কে জানে!—আলিয়োশা বিস্মিত হয়ে ভাবল: 'হ্যাঁ বলা যায় না, হয়তো আসলে পরিপূর্ণ সত্য ঠিক এই কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে!' আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে দাদা ইভানের অবস্থাটা কী হতে পারে? আলিয়োশা এক ধরনের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছিল যে কাতেরিনা ইভানভ্নার মতো চরিত্রের মেয়েদের যেটা দরকার তা হল কারও ওপর কর্তৃত্ব ফলানো, আর কর্তৃত্ব তার পক্ষে ফলানো সম্ভব একমাত্র দ্মিত্রির মতো চরিত্রের ওপর, ইভানের মতো কারও ওপর সেটা করা কদাচ সম্ভব নয়; যেহেতু কেবল দ্মিত্রিই শেষ পর্যন্ত—ধরে নেওয়া যেতে পারে দীর্ঘকালের জন্য—কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে নতি স্বীকার করতে পারে, যা তার নিজের পক্ষেও সুখের হবে—এমনকি আলিয়োশারও সেটাই ইচ্ছা। কিন্তু ইভানের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ইভান তার কাছে নতি স্বীকার করতে পারে না, তা ছাড়া ওভাবে নতিস্বীকার করে তার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। ইভান সম্পর্কে এরকমই একটা ধারণা আপনা হতেই কেন যেন আলিয়োশার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল। এখন বসার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত সন্দেহ ও ধারণাই তার মনের মধ্যে কয়েক পলক ঝলক দিয়ে গেল। আচম্বিতে ঝলক দিয়ে উঠল দুর্নিবার আরও একটি চিন্তা: 'আচ্ছা, এমন যদি হয় যে সে ওদের কাউকেই ভালোবাসে না—দ্মিত্রিকেও নয়, ইভানকেও নয়?' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত এক মাস হল এরকম চিন্তা যখন তার মনে উদয় হত তখন এর জন্য আলিয়োশা যেন মনে মনে লজ্জা

পেত এবং নিজেকে তিরস্কারও করত। যখনই এ ধরনের চিন্তা বা সন্দেহ তার মনে আসত প্রতিবারই সে নিজেকে এই বলে তিরস্কার করত 'কিন্তু প্রেমের বা নারীর আমি কীই বা বুঝি? কী করে আমি এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি?' অথচ না ভেবেও উপায় ছিল না। সহজাত বুদ্ধি দিয়ে সে অন্তত এটা বুঝতে পারছিল যে এখন তার দুই দাদার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের দুজনের জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে, বড় বেশি পরিমাণে নির্ভর করছে। 'একটা কালসাপ আরেকটা কাল সাপকে খাবে', গতকাল চটে গিয়ে বাবা আর দাদা দ্মিত্রি সম্পর্কে এমনই একটা কথা উচ্চারণ করেছিল ইভান। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইভানের চোখে তার দাদা দ্মিত্রি একটা কালসাপ—হয়তো অনেক কাল হলই তাই? তাহলে কি সেই তখন থেকে, যখন কাতেরিনা ইভানভ্নার সঙ্গে তার আলাপ হয়? কথাটা অবশ্যই গতকাল অনিচ্ছাকৃতভাবে ইভানের মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বলেই না আরও গুরুত্বপূর্ণ? তাই যদি হয় তাহলে আর শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? বরং দেখা যাচ্ছে তো তার উলটোটাই এগুলিই কি তাদের পরিবারে ঘৃণা ও শত্রুতার নতুন উপলক্ষ নয়? বড়ো কথা, এই অবস্থায় সে, আলিয়োশা কার জন্য মমতা করবে? ওদের কার জন্য কী সে কামনা করবে? ওদের দুজনকেই সে ভালোবাসে, কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর পরস্পরবিরোধিতার মধ্যে কার জন্য কী কামনা করা যেতে পারে? এই তালগোলের মধ্যে একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে, অথচ আলিয়োশার হৃদয় অনিশ্চয়তা সহ্য করতে পারে না, কারণ তার প্রেম ছিল সব সময় সক্রিয় প্রকৃতির। নিষ্ক্রিয় প্রেম তার ধাতে নেই। কাউকে সে ভালোবাসলে তৎক্ষণাৎ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সেটা করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার, সুনিশ্চিত ভাবে জানা দরকার তাদের কার জন্য কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা প্রয়োজনীয়। তার উদ্দেশ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই স্বাভাবিকভাবে ওদের দুজনকে সাহায্য করা সম্ভব। কিন্তু সুনিশ্চিত কোনো লক্ষ্যের বদলে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে তা অস্পষ্টতা ও জটিলতা ছাড়া আর কিছুই নয়— যাকে এইমাত্র 'বুকফাটা হাহাকার' বলা হয়েছে! কিন্তু এই যে 'বুকফাটা হাহাকার' অন্তত এর মধ্যেও কীই বা বোঝার সাধ্য তার আছে? এই এত সব জটিলতার মধ্যকার গোড়ার কথাটা পর্যন্ত যে সে বুঝতে পারছে না!

বিদায় নেবার জন্য ইতিমধ্যে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইভান ফিয়োদরভিচ, এমন সময় আলিয়োশাকে ঘরে ঢুকতে দেখে কাতেরিনা ইভানভ্না উৎফুল্ল হয়ে ইভান ফিয়োদরভিচকে বলল

“আর এক মিনিট! আরও এক মিনিট থেকে যান। এই যে মানুষটি যাকে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তার মতটা আমি শুনতে চাই। কাতেরিনা ওসিপভ্না, আপনিও যাবেন না” মাদাম খখ্‌লাকোভার উদ্দেশে সে যোগ করল।

আলিয়োশাকে সে নিজের পাশে বসাল। খখ্লাকোভা বসল তার মুখোমুখি, ইভান ফিয়োদরভিচের পাশে।

“এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই আমার বন্ধু, দুনিয়ায় আমার পরম বন্ধু বলতে আপনারাই আছেন”, এমনই বিহ্বলকণ্ঠে সে বলতে শুরু করল, তার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে এমন একটা আন্তরিক বেদনার ভাব ফুটে উঠল যে আলিয়োশার সমস্ত দরদ আবারও মুহূর্তের মধ্যে তারই ওপর এসে পড়ল।

কাতেরিনা ইভানভ্না বলতে লাগল, “আপনি, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনি গতকালের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সাক্ষী, আপনি দেখেছেন আমার কী অবস্থা হয়েছিল। আপনি সেটা দেখেননি ইভান ফিয়োদরভিচ, কিন্তু উনি দেখেছেন। আমার সম্পর্কে গতকাল উনি কী ভেবেছিলেন তা আমি জানি নে। শুধু এটাই জানি যে আজ, এখন আবার যদি সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটত তাহলেও গতকালের মতো—ওই রকমই অনুভূতির প্রকাশ আমার ঘটত—সেই একই অনুভূতি, একই কাজের পরিচয় আমি দিতাম। আমার আচরণের কথা আপনার মনে আছে, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। এরকম একটি আচরণ থেকে আপনি নিজে আমাকে নিবৃত্ত করেছিলেন...” বলতে বলতে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। আপনাকে বলে রাখি আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কোনোটার সঙ্গেই আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না। শুনুন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, এমনকি আমি এও জানি না আমি ওকে এখন ভালোবাসি কিনা। ও আমার কাছে করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা ভালোবাসার ভালো সাক্ষ্য বহন করছে না। আমি যদি ওকে ভালোবাসতাম এবং যদি এখনও ওকে ভালোই বাসতাম তাহলে আমি হয়তো এখন ওকে করুণা করতাম না, বরং ঘৃণাই করতাম

কাতেরিনা ইভানভ্নার গলা কাঁপতে লাগল। তার আঁখি পল্লবে চিকচিক করছে অশ্রুবিন্দু। তা দেখে আলিয়োশার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ‘এই মেয়েটি সত্যি বলছে, যা বলছে অন্তর থেকে বলছে’, সে ভাবল, ‘আর আর দ্মিত্রিকে সে আর ভালোবাসে না!’

“ঠিক কথা, ঠিক কথা!” মাদাম খখ্লাকোভা বলে উঠল।

“একটু সবুর করুন, আমার দরদি বন্ধু, কাতেরিনা ওসিপভ্না। আমি আসল কথাটা বলিনি, কাল রাতে অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তটি আমি নিয়েছি তার কথা আমি এখনও বলিনি। আমি উপলব্ধি করতে পারছি আমার এই সিদ্ধান্ত হয়তো ভয়ঙ্কর—আমার পক্ষে—কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কোনোমতেই এর কোনো রদবদল হবে না, কোনো মতেই নয়। আমার সারা জীবনেও এরকমই থেকে যাবে। আমার পরম প্রিয়, সদাশয়, আমার চিরকালের উদার পরামর্শদাতা, গভীর হৃদয়বেত্তা, এই পৃথিবীতে যিনি আমার একমাত্র বন্ধু, তিনি—ইভান ফিয়োদরভিচ্ আমাকে

পুরোপুরি সমর্থন করছেন এবং আমার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করছেন। উনি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানেন।"

"হ্যাঁ, আমি সমর্থন করছি", মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ইভান ফিয়োদরভিচ্ বলল।

"কিন্তু আমার ইচ্ছে আলিয়োশাও—ওহো, আপনাকে স্রেফ আলিয়োশা বলে ডেকে ফেললাম বলে ক্ষমা চাইছি আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ—আমি চাই যে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচও এখন আমাকে আমার দুই বন্ধুর সামনেই বলুন আমি ঠিক কিনা। আমি আমার সহজ বুদ্ধিতে আগে থাকতে অনুমান করতে পারছি যে আপনি, আলিয়োশা, ভাই আমার—কারণ আপনি আমার কাছে আমার প্রিয় ভাইই বটে", আলিয়োশার ঠান্ডা হাতটা তার উষ্ণ হাতে ধরে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল, "আমার মন বলছে, আপনার সিদ্ধান্ত, আপনার অনুমোদন, আমার এত সব জ্বালাযন্ত্রণা সত্ত্বেও আমার মনে শান্তি এনে দেবে, কেন না আপনার মুখের কথার পর আমি শান্ত হব, আমি আমার ভাগ্যের সঙ্গে আপস করে নেব—আমার মন একথাই বলছে!"

"আমি জানি না আমার কাছে আপনার কীসের প্রশ্ন" মুখ লাল করে আলিয়োশা বলল, "আমি শুধু একথাই জানি যে আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আমি নিজে নিজের জন্য যত না সুখ কামনা করি এই মুহূর্তে আপনার জন্য তার চাইতে বেশি সুখ কামনা করি! কিন্তু কথাটা হল এসব ব্যাপারে আমি যে কিছুই জানি নে হঠাৎ কেন যেন তড়বড় করে সে যোগ করল।

"এই ধরনের বিষয়ে, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, এই ধরনের বিষয়ে এখন বড়ো কথা হল আত্মসম্মান ও কর্তব্যবোধ এবং আরও বড়ো কিছু—সেটা কী আমি জানি নে, হয়তো বা কর্তব্যবোধের চাইতেও বড়ো। আমি ভেতরে ভেতরে সেই দুর্নিবার উপলব্ধি সম্পর্কে সচেতন। এই উপলব্ধিই আমার কাছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। সে যাই হোক, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি ও যদি বিয়ে করেও " সাড়ম্বরে সে বলতে শুরু করল, "ওই ওটাকেই বিয়ে করে, যাকে আমি কখনও ক্ষমা করতে পারি না, কখনই পারি না, তবু আমি ওকে ছেড়ে *যাব না!* এখন থেকে আমি কখনও ওকে ছেড়ে যাব না, কখনই না!" কেমন যেন একটা বুকফাটা বিবর্ণ বেদনায় উচ্ছ্বসিত আর্তকণ্ঠে সে বলে উঠল। "তার মানে এই নয় যে আমি ওর পেছন পেছন ঘুর ঘুর করে বেড়াব, যখন তখন ওর চোখে পড়ে ওকে যন্ত্রণা দেব। না, তা করব না! আমি যেখানে বলবেন চলে যাব, অন্য কোনও শহরে চলে যাব, কিন্তু আমি সারা জীবন, আমার সারা জীবন ধরে ওর ওপর অক্লান্ত নজর রাখব। যখন ওই স্ত্রীলোকের সঙ্গ তার দুঃসহ হয়ে উঠবে—আর সেটা অতি অবশ্য অচিরেই ঘটবে—তখন আসতে হয় সে আমার কাছে আসুক, আমাকে সে একজন বন্ধু হিসেবে, তার একজন বোন হিসেবে পাবে। অবশ্যই শুধু তার বোন হিসেবে, কিন্তু শেষকালে তার এই বোধ হবে যে তার

এই বোনটি সত্যি সত্যিই তার বোন যে তাকে ভালোবাসে, যে নিজের সমস্ত জীবন তারই জন্য উৎসর্গ করেছে। আমি এটা করে ছাড়ব। আমি এমন অবস্থা করে ছাড়ব যাতে সে বুঝতে পারে আমি কে এবং এতটুকু লজ্জা না করে আমাকে তার সব কথা বলে!" উন্মত্তের মতো সে চিৎকার করে উঠল। "আমি হব তার ভগবান, যার কাছে সে প্রার্থনা করতে পারে—আমার সঙ্গে যা বেইমানি ও করেছে এবং গতকাল ওর দরুন আমাকে যা ভুগতে হয়েছে তার জন্য আমার কাছে অন্ততপক্ষে এই ঋণ ওর থাকছেই। সারা জীবন ধরে ও দেখুক যে আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওর প্রতি অনুরক্ত থাকব এবং ওকে যে কথা আমি একবার দিয়েছি তা আমি রাখব, যদিও আমার বিশ্বাসের মর্যাদা ও রাখেনি, আমাকে বেইমানি করেছে। আমি হব   আমি নিজেকে এমন ভাবে তৈরি করে নেব যে আমি হব— জানি না কী ভাবে প্রকাশ করব—ওর সুখের একমাত্র উপায়, ওর সুখের যন্ত্র বলুন, হাতিয়ার বলুন, তা-ই হব। আর এটা হবে আমার সারা জীবনের, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার ব্রত। ভবিষ্যতে, সারা জীবন ও এটাই দেখতে পাবে! এই হল আমার জীবনের ব্রত। ইভান ফিয়োদরভিচ এ ব্যাপারে আমাকে পূর্ণ সমর্থন করছেন।"

বলতে বলতে সে হাঁপাতে লাগল। সে হয়তো আরও উপযুক্ত, আরও নিপুণ ও স্বাভাবিক কোনো উপায়ে তার ভাবনা প্রকাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা বেরিয়ে এলো বড়ো বেশি তাড়াহুড়োর, বড়ো বেশি নগ্নভাবে। তার প্রকাশের মধ্যে অল্পবয়সের অসংযম অনেক পরিমাণেই ছিল। এমন অনেক কিছুই ছিল যার মধ্যে নিছক তার গতকালের তিক্ততার, তার অহমিকাবোধের তাগিদের প্রতিধ্বনি ঘটেছিল। এটা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিল। হঠাৎ তার মুখে কেমন যেন বিষাদের ছায়া পড়ল, চোখের দৃষ্টিতে একটা অপ্রীতিকর ভাব ফুটে উঠল। এসবই সঙ্গে সঙ্গে আলিয়োশার নজরে পড়ল, তার বুকের ভেতরটা সমবেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। এই সময় আবার দাদা ইভানও আরও কিছু যোগ করল।

"আমি শুধু আমার মতটা বললাম", ইভান বলল। "অন্য যে কারও বেলায় হলে এর মধ্যে কষ্টকল্পনা বা জোর খাটানোর ভাব আছে বলে মনে করা যেত, কিন্তু আপনার বেলায় সেটা বলা যায় না। অন্য কোনো মহিলা বললে বলতাম ভুল বলছেন, কিন্তু আপনি ঠিক বলছেন। জানি না এর পক্ষে কী যুক্তি দেব, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি যা বলছেন তা অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলছেন, তাই আর সেই কারণেই না আপনার কথা ঠিক।

"কিন্তু সে তো কেবল এই মুহূর্তের ব্যাপার।   এ আর কী এমন? সে তো গতকালের সেই অপমান ছাড়া আর কিছু নয়—এটাই না এই মুহূর্তটির তাৎপর্য!" মাদাম খখ্‌লাকোভা আর থাকতে না পেরে আচমকা বলেই ফেলল। এটা ঠিক যে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না, কিন্তু অতি সঙ্গত এই

যে ভাবনাটি হঠাৎ তার মনে উদয় হয়েছিল সেটা প্রকাশ না করেও সে পারল না।

"ঠিক, ঠিক", ইভান তাকে বাধা দিয়ে হঠাৎ এমন উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল যে মনে হল কথার মাঝখানে বাধা পাওয়ায় সে বিরক্ত। "ঠিক, অন্যের বেলায় এই মুহূর্তটি গতকালের ঘটনার একটা ক্ষণিক প্রভাব মাত্র ঠিকই কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্‌নার যা চরিত্র তাতে এই মুহূর্তটির প্রভাব ওঁর সারা জীবনের। আর দশ জনের কাছে যা নিছক একটা প্রতিশ্রুতি ওঁর কাছে তা অনন্তকালের, গুরুভার — হয়ত বা দুর্বিষহ, কিন্তু নিরলস কর্তব্যপালন। কর্তব্যপালনের এই উপলব্ধিই হবে ওঁর জীবনের পাথেয়! আপনাকে বলে রাখছি কাতেরিনা ইভানভ্‌না, আজ থেকে আপনার জীবন আপনার নিজের উপলব্ধির, নিজের কীর্তি এবং নিজের দুঃখবেদনার কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে, কিন্তু পরিণামে এই দুঃখযন্ত্রণার লাঘব হবে, আপনার জীবন তখন পরিণত হবে চিরকালের জন্য গর্ব করার মতো এক দৃঢ় সঙ্কল্প পূরণের সুমধুর সাধনায়। সেটা বাস্তবিকই হবে এক ধরনের গৌরবের বিষয়—অন্তত দুঃসাহসিক তো বটেই; কিন্তু তাতে জয় আপনার হবেই। আর আপনার সেই চেতনা শেষ পর্যন্ত আপনাকে পরম তৃপ্তির সন্ধান দেবে, আর সব কিছুর সঙ্গে আপনার মিটমাট করিয়ে দেবে।"

তার কথাগুলির মধ্যে দৃঢ়তার ভাব ছিল, সেই সঙ্গে কেমন যেন একটি তিক্ততার ভাবও ছিল—সম্ভবত সেটা তার ইচ্ছাকৃতও বটে। এমনকি এও হতে পারে যে তার নিজের অভিপ্রায় গোপন করার, অর্থাৎ সে যে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ঠাট্টা করেই কথাগুলি বলছে তা গোপন করার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না।

"হা ঈশ্বর! এ সবই ভুল, একেবারে ভুল!" আবার বলে উঠল মাদাম খখ্‌লাকোভা।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, আপনি বলুন না! আমার ভীষণ জানার ইচ্ছে আপনি কী বলেন!" চেঁচিয়ে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই চোখের জলে ভাসিয়ে দিল কাতেরিনা ইভানভ্‌না। আলিয়োশা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ও কিছু না, ও কিছু না", কাঁদতে কাঁদতেই সে বলে চলল, "গতকাল রাত থেকে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিনা তাই। কিন্তু আপনি আর আপনার দাদার মতো দুজন বন্ধুকে পাশে পেয়ে আমি এখনও ভেতরে ভেতরে শক্তি অনুভব করি... কেন না আমি জানি আপনাদের দুজনের কেউই আমাকে কখনও ছেড়ে চলে যাবেন না।..."

"দুর্ভাগ্যবশত, আমাকে হয়তো কালই মস্কোয় চলে যেতে হচ্ছে এবং অনেক দিনের জন্য আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত এর কোনো রদবদল হবার নয়।..." ইভান ফিয়োদরভিচ হঠাৎ বলে উঠল।

"কাল! কালই মস্কো যাচ্ছেন!" আচম্বিতে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মুখটা

আগাগোড়া বেঁকে গেল। “কিন্তু  কিন্তু আহা, কী সৌভাগ্যের কথা!” আবার পরক্ষণেই সে যখন এই বলে চিৎকার করে উঠল তখন পলকের মধ্যে একেবারে পালটে গেল তার কণ্ঠস্বর, পলকের মধ্যে কোথায় দূর হয়ে গেল চোখের জল!—তার আর কোনো চিহ্নমাত্র রইল না। ঠিক এই এক পলকের মধ্যেই কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মধ্যে ঘটে গেল এমন এক বিস্ময়কর পরিবর্তন যে আলিয়োশা রীতিমতো হতবাক হয়ে গেল। এই মাত্র যেখানে হতভাগ্য একটি মেয়ে অপমানের জ্বালায় কেমন যেন একটা হাহাকারে ও কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সেখানে আবির্ভাব ঘটল এমন এক নারীর যে আত্মসংবরণে সম্পূর্ণ সক্ষম তো বটেই, এমনকি কেন যেন পরম সন্তুষ্টও, যেন হঠাৎই তার খুশি হওয়ার মতো কিছু একটা ঘটেছে।

“না, না, সৌভাগ্য এই কারণে নয় যে আমি আপনাকে হারাচ্ছি—অবশ্যই নয়”, অনেকটা যেন নিজেকে শুধরে নিয়ে হঠাৎ লোক সমাজে শোভনীয় মিষ্টি হাসি হেসে সে বলল। “আপনার মতো বন্ধু অবশ্য সে রকম ভাবতেও পারেন না। আমি যা বলছি তা একেবারেই উলটো  আপনাকে হারাতে হচ্ছে বলে আমার মনে দুঃখ হচ্ছে”  বলতে বলতে হঠাৎই সে তীরবেগে ইভান ফিয়োদরভিচের কাছে ছুটে গিয়ে তার দু হাত চেপে ধরে প্রচণ্ড আবেগভরে ঝাঁকুনি দিল। “কিন্তু যেটা সৌভাগ্যের কথা সেটা এই যে আপনি নিজে, ব্যক্তিগত ভাবে আপনি এখন মস্কোয় আমার মাসি আর আমার দিদি আগাফিয়াকে আমার বর্তমান অবস্থা, আমার এখনকার যাবতীয় বিভীষিকার কথা খুলে বলতে পারবেন; কোনো রাখঢাক না করে পুরোপুরিই খুলে বলবেন আগাফিয়াকে, অবশ্য আমার মাসিমাকে রেহাই দিয়ে—সেটা কী করে করতে হয় তা আপনার নিজেরই জানা আছে। আপনি ধারণা করতে পারবেন না কাল এবং আজ সকালেও আমি কী অসুখীই না ছিলাম!—ভেবেই কূল পাচ্ছিলাম না কী করে এমন একটা সাঙ্ঘাতিক চিঠি তাদের লিখব  কেন না চিঠিতে এটা কোনো মতে কোনো ভাবেই লিখে বোঝানো যায় না।  এখন আমার পক্ষে লেখা সহজ হবে, কারণ আপনি সশরীরে ওদের ওখানে হাজির থাকবেন, সব কিছু বুঝিয়ে বলবেন। ওঃ কী খুশিই যে আমি হয়েছি! আমি খুশি কিন্তু শুধু এই কারণে, আবারও বলছি, বিশ্বাস করুন! আপনার কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব, আমার কাছে আপনার জায়গা অবশ্যই আর কেউ নিতে পারে না।... যাই, এখুনি গিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলি” এই বলে হঠাৎ সে তার কথা শেষ করল, এমনকি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে পাও বাড়াল।

“আরে আমাদের আলিয়োশার, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের ব্যাপারটা কী হল? আপনি যে বলেছিলেন ওঁর মতটা অবশ্যই আপনাকে শুনতে হবে!” মাদাম খখ্‌লাকোভা চেঁচিয়ে উঠল। তার কথার সুরে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ ও রাগের ভাবটা প্রচ্ছন্ন থাকল না।

“সেটা আমি ভুলিনি”, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাতেরিনা ইভানভ্‌না।

"এরকম একটা মুহূর্তে আমার ওপর অমন চটেই বা উঠলেন কেন কাতেরিনা ওসিপভ্না?" উত্তেজিত হয়ে তীব্র ভর্ৎসনার সুরে সে বলল। "আমি যা বলেছি সেটাই সমর্থন করছি। ওর মতটা আমার জানা দরকার। শুধু তা-ই নয়, ওঁর সিদ্ধান্তটা আমার জানা দরকার! উনি যা বলবেন তা-ই হবে—তা হলে বুঝতেই পারছেন, যা ভাবছেন আদৌ তা নয়—আপনার মুখের কথা শোনার জন্য আমি যে কতদূর ব্যাকুল হয়ে আছি সে আপনাকে কী বলব আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্!... কিন্তু কী ব্যাপার আপনার বলুন তো?"

"আমি কখনও ভাবিনি, আমি এটা কল্পনাও করতে পারি না!" হঠাৎ তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল আলিয়োশা।

"কী? কী বলতে চান আপনি?"

"ও মস্কো যাচ্ছে, আর আপনি কিনা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন আপনি খুশি!—বললেন, ইচ্ছে করেই বলেছেন! তারপর তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন, "আপনি যে খুশি সেটা ওই কারণে নয়, বরং বন্ধুকে হারাতে হচ্ছে বলে আপনার দুঃখই হচ্ছে; কিন্তু যা-ই বলুন না কেন, এটাও আপনার ইচ্ছাকৃত একটা অভিনয়।... থিয়েটারে কমেডিতে অভিনয় করার মতো জোর অভিনয় করলেন বটে!

কাতেরিনা ইভানভ্নার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। "থিয়েটারে? তার মানে? সে আবার কী?" নিদারুণ বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে সে বলে উঠল।

"তা আপনি ওকে এই বলে যতই আশ্বস্ত করুন না কেন যে ওর মতো একজন বন্ধুকে হারানোর জন্য আপনার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু এটা ঠিক যে আপনি সরাসরি ওর মুখের ওপর জোর দিয়ে এই কথাই বলছেন যে ওর চলে যাওয়াটা ভাগ্যের কথা " আলিয়োশা একেবারে রুদ্ধশ্বাসে, কেমন যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলি বলে ফেলল। সোফাতে না বসে সে তখনও টেবিলের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল।

"আপনি কীসের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না!..."

"আমি নিজেও কি ছাই জানি!... হঠাৎই যেন আমার চোখের সামনে ঝলকে উঠল। আমি জানি আমার কথাটা ভালো শোনাচ্ছে না, কিন্তু তাহলেও আমি যা বলার সব বলব", আগের মতোই কাঁপা-কাঁপা গলায় কেটে কেটে সে বলে চলল, "আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা এই যে দাদা দ্‌মিত্রিকে আপনি সম্ভবত একেবারেই ভালো বাসেন না,.. একেবারে গোড়া থেকেই ভালোবাসেন না।... তাকে শুধু শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।... সত্যি বলতে গেলে কি, আমি জানি না এসব কথা আমি কোন্ সাহসে বলছি, কিন্তু সত্যি কথাটা তো কাউকে না কাউকে বলতেই হয়... কারণ এখানে সত্যি কেউ বলতে চাইছে না।..."

"কীসের সত্যি আবার?" কেমন যেন একটা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের ভাব ফুটে উঠল কাতেরিনা ইভানভ্নার চিৎকারের মধ্যে।

"তাহলে বলি", আলিয়োশা এমনভাবে মরিয়া হয়ে তড়বড়িয়ে বলতে শুরু করল যেন বাড়ির ছাদ থেকে মরিয়া ঝাঁপ দিয়েছে। "দ্‌মিত্রিকে ডেকে আনুন—আমি ওকে খুঁজে বের করব—ও এখানে আসুক, আপনার হাতটা ধরুক, তারপর ধরুক দাদা ইভানের হাতটা, আপনাদের দুজনের হাত সে নিজে হাতে এক করে দিক। কেন না, কাতেরিনা ইভানভ্‌না, আপনি ইভানকে কষ্ট দিচ্ছেন স্রেফ এই কারণে যে আপনি তাকে ভালোবাসেন আর কষ্ট দিচ্ছেন এই কারণে যে দ্‌মিত্রিকে আপনার যে ভালোবাসা সেটা এক ধরনের বুকফাটা হাহাকার ছাড়া আর কিছু নয় সত্যিকারের ভালোবাসা নয় ভালোবাসা বলে নিজের মনকে বুঝ দেওয়া।..."

আলিয়োশার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। সে হাসল।

কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মুখটা দেখতে দেখতে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, রাগে তার ঠোঁট বেঁকে গেল। "আপনি আপনি আপনি একটা পুঁচকে ন্যালাখ্যাপা সন্নেসি—এছাড়া আর কী বলব!" হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ইভান ফিয়োদরভিচ আচমকা হেসে উঠল, জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার টুপিটা তার হাতেই ছিল।

"ভুল করছ হে আমার ভালোমানুষ ভাইটি", কথা বলতে বলতে তার চোখেমুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা এর আগে আলিয়োশা এর মধ্যে মধ্যে আর কখনও দেখেনি—সেটা ছিল অল্পবয়সি মনের এক ধরনের আন্তরিকতার এবং এক প্রবল ও দুর্দমনীয় অকপট অনুভূতির প্রকাশ। "কাতেরিনা ইভানভ্‌না আমাকে কোনও দিন ভালোবাসেননি! উনি বরাবরই জানতেন যে আমি ওঁকে ভালোবাসি, যদিও আমি মুখে কোনো দিন আমার ভালোবাসা সম্পর্কে একটি কথাও ওঁকে বলিনি—উনি এটা জানতেন, কিন্তু আমাকে ভালোবাসেননি। ওঁর বন্ধুও আমি কখনও ছিলাম না, এক দিনের জন্যও নয় অহঙ্কারী মহিলা—আমার বন্ধুত্বের কোনও প্রয়োজন তার ছিল না। তবু আমাকে তাঁর পাশে পাশে ধরে রেখেছিলেন এই কারণে যাতে তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ধারা অব্যাহত থাকে। দ্‌মিত্রির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে শুরু করে এই এতকাল তার কাছ থেকে নিয়ত, যতবার যত অপমানের আঘাত উনি পেয়েছেন আমার ওপর এবং আমাকে দিয়ে সে সবের প্রতিহিংসা উনি নিয়েছেন। কারণ ওদের সেই প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর হৃদয়ে অপমান হয়ে বেজেছে। এমনই তাঁর মন! আমি এতকাল শুধু যা করে এসেছি তা হল দ্‌মিত্রিকে যে উনি কত ভালোবাসেন ওঁর মুখ থেকে সে কথা শুনে যাওয়া। আমি এখন যাচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখবেন কাতেরিনা ইভানভ্‌না, আপনি সত্যি সত্যি শুধু ওকেই ভালোবাসেন। আর তার কাছ থেকে যত বেশি অপমানিত হচ্ছেন ততই বেশি করে তাকে ভালোবাসছেন। এটাই আপনার বুকফাটা হাহাকারের উৎস। ও ওরই মতন এবং ও আপনাকে অপমান করে বলেই না আপনি ওকে ভালোবাসেন! ও

যদি নিজেকে শোধরাত তাহলে সেই মুহূর্তে আপনি ওকে পরিত্যাগ করতেন, ওর ওপর থেকে আপনার ভালোবাসা একেবারে চলে যেত। কিন্তু আপনার আনুগত্যের এই যে কীর্তি তা নিরন্তর সাধনার জন্য। আনুগত্যের অভাবের দরুন ভর্ৎসনা করার জন্য ওকে আপনার দরকার। আর এ সবেরই উৎস আপনার অহমিকা। ওঃ কী বিপুল পরিমাণ আত্ম অবমাননা ও লাঞ্ছনাই না এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, কিন্তু এ সবই এসেছে সেই অহমিকাবোধ থেকে। আমার বয়স বড় কম, আমি বড় বেশি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম। আমি জানি, এটা আপনাকে আমার না বললেই হত, আমার দিক থেকে বেশি মর্যাদার হত যদি আমি স্রেফ আপনাকে ছেড়ে চলে যেতাম; সেটা আপনার পক্ষেও তেমন অপমানজনক হত না। কিন্তু আমি তো চলে যাচ্ছি অনেক দূরে, আর কখনই ফিরে আসব না। যাচ্ছি চিরকালের জন্য।... যেখানে এমন বুকফাটা হাহাকার তার ধারেকাছে থাকার সাধ আমার নেই।... সে যাই হোক, আমার আর কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই, যা যা বলার ছিল সবই বলেছি। বিদায়, কাতেরিনা ইভানভ্না, আমার ওপর আপনার রাগ করা উচিত নয়, কেন না আমি আপনার চাইতে শতগুণ বেশি শাস্তি পেয়েছি আপনাকে যে আর কখনও দেখতে পাব না এর চাইতে বড়ো শাস্তি আর কী হতে পারে! বিদায়। আপনার হাতে হাত না হয় নাই রাখলাম। আপনি বড়ো বেশি সজ্ঞানে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছেন, তাই এই মুহূর্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারছি না। পরে ক্ষমা করব, কিন্তু এখন হাতে হাত মেলানোর দরকার নেই। ‘Den Dank Dame, begehr ich nicht’—পারিতোষিকের কোনো দরকার আমার নেই মহাশয়া”, বাঁকা হাসি হেসে সে যোগ করল। এই শেষ কথাটুকু বলে সে অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রমাণ করে দিল যে শিলার সে পড়ে এবং পড়ে দিব্যি মনে রাখতে পারে, যা আলিয়োশা আগে হয়তো বিশ্বাস করতে পারত না।

কথা শেষ করেই ইভান সোজা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, গৃহকর্ত্রী মাদাম খখ্লাকোভার কাছে বিদায়টুকু পর্যন্ত নিল না। আলিয়োশা দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়াল।

‘ইভান!” পিছন পিছন মরিয়া চিৎকার করে বলল আলিয়োশা। “ফিরে এসো ইভান! না, না, ও আর কোনোমতেই ফিরবে না!” গভীর দুঃখে এটা উপলব্ধি করে সে আবার আর্তনাদ করে উঠল। “কিন্তু দোষটা আমারই, আমারই দোষ, আমিই শুরু করেছিলাম! ইভান যা বলেছে তা রাগ করে বলেছে, ভুল বলেছে। অন্যায় বলেছে, রাগ করে বলেছে। ...” উদ্ভ্রান্তের মতো আলিয়োশা বলে উঠল।

কাতেরিনা ইভানভ্না হঠাৎ এক ফাঁকে অন্য একটা ঘরে চলে গেল।

“আপনি অন্যায় কিছু করেননি, চমৎকার কাজ করেছেন, সাক্ষাৎ দেবদূতের মতো কাজ করেছেন”, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে আলিয়োশাকে উদ্দেশ করে তাড়াতাড়ি

নিচু গলায় বলে উঠল মাদাম খখ্লাকোভা। 'ইভান ফিয়োদরভিচ্ যাতে চলে না যান তার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা আমি করব।

ভদ্রমহিলার মুখ যে রকম আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যে দেখে আলিয়োশা রীতিমতো মুষড়ে পড়ল। কিন্তু এই সময় হঠাৎ ফিরে এলো কাতেরিনা ইভানভ্না। তার হাতে দুটো রামধনুরঙা ব্যাঙ্ক নোট।

এতক্ষণ যেন কিছুই হয়নি এমনি শান্ত সংযত কণ্ঠে সরাসরি আলিয়োশাকে উদ্দেশ করে সে বলতে শুরু করল, "আপনার কাছে আমার একটা বড়ো অনুরোধ আছে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। এক সপ্তাহ—হ্যাঁ, সম্ভবত এক সপ্তাহ আগেই হবে—দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ ঝোঁকের মাথায় অতি জঘন্য ধরনের একটা অন্যায় কাজ করেছিল। এখানে একটা বাজে জায়গা—একটা নোংরা শুঁড়িখানা আছে। সেখানে সেই অবসরভোগী আর্মি অফিসারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। লোকটা এক সময় জুনিয়র ক্যাপ্টেন ছিল। আপনার বাবা তাকে দিয়ে তার কারবারের কিছু কিছু কাজ করিয়ে নিতেন। কী কারণে যেন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ তার ওপর চটে উঠে তার দাড়ি চেপে ধরে, সকলের সামনে এই অপমানজনক অবস্থাতেই তাকে হিড়হিড় করে রাস্তায় টেনে বের করে আনে, ওই ভাবে তার দাড়ি চেপে ধরে আরও বেশ কিছুক্ষণ তাকে রাস্তায় ঘুরিয়ে মারে। ভদ্রলোকের ছেলেটা একেবারেই বাচ্চা, স্থানীয় একটা স্কুলে পড়ে। শুনেছি ওই দৃশ্য দেখে সে নাকি ওদের পাশে পাশে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় যাকে পায় তাকেই ধরে ধরে তার বাবাকে রক্ষা করার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকে, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না, সকলেই হাসতে থাকে। আমাকে মাফ করবেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, ওর এই লজ্জাজনক আচরণের কথা মনে করতে গিয়ে আমার মনের মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব না জেগে পারে না। এ হল সেই ধরনের একটি আচরণ যা একমাত্র দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের পক্ষেই রাগের মাথায় ও উত্তেজনার বশে করা সম্ভব! ওই ঘটনার কথা কী আর বলব! বলার মতো অবস্থা আমার নেই। সে ভাষাও আমার নেই।... আমি সেই নিগৃহীত লোকটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি, জানতে পেরেছি সে অতি গরিব, নাম স্নেগিরিয়োভ্। চাকরির জায়গায় কী একটা অপকর্ম করে ফেলায় মিলিটারি থেকে তার চাকরিটা গেছে। ওসব বৃত্তান্ত অবশ্য আমি আপনাকে ঠিক বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে সে তার পরিবার নিয়ে—অসুস্থ ছেলেপুলে আর স্ত্রীকে নিয়ে—সে স্ত্রীও নাকি আবার পাগল—এমনই একটা হতভাগ্য পরিবার নিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করছে। অনেক দিন হলই এই শহরে আছে, টুকটাক কিছু কাজকর্ম করছে, কোথায় একটা কলমচির কাজও করছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তার দরুন কোনো টাকাই সে ইদানীং আর পাচ্ছে না। তা আমার নজরটা গিয়ে পড়ল আপনার ওপর অর্থাৎ কিনা, আমি ভাবলাম—জানি না, আমি কেমন যেন গুলিয়ে ফেলছি—বুঝলেন কিনা, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, পরম দরদি বন্ধু

আমার, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনার কাছে আমার অনুরোধ ছিল যে কোনো একটা অছিলা খুঁজে বের করে একবার ওদের কাছে যান, মানে এই জুনিয়র ক্যাপ্টেনটির কাছে যান—হা ভগবান! আমি যে একেবারেই তালগোল পাকিয়ে ফেলছি—যান, গিয়ে বেশ ভদ্রভাবে এবং সাবধানে—যেটা একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব (আলিয়োশা একথায় লজ্জায় লাল হয়ে গেল)—যে ভাবে হোক, সাহায্য হিসেবে এই দুশোটা রুবল তাকে দিয়ে আসুন। টাকাটা সম্ভবত সে নেবে... মানে, বলে কয়ে নিতে রাজি করাতে হবে। উঁহু, হয়তো ঠিক বললাম না। দেখুন, এটা কিন্তু আসলে সে যাতে নালিশ না করে—কেন না মনে হয় নালিশ করার ইচ্ছে তার আছে—সেই উদ্দেশ্যে আপসে মিটিয়ে ফেলার জন্য ক্ষতিপূরণবাবদ তাকে দেওয়া হচ্ছে না, আমার তরফ থেকে স্রেফ সহানুভূতিবশত, সাহায্য করার ইচ্ছাবশত দেওয়া হচ্ছে। এটা দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ নিজে দিচ্ছে না, দিচ্ছি আমি, দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের ভাবী বধূ আমি দিচ্ছি। মোট কথা, আপনি যা হোক করে বুঝিয়ে বলবেন। আমি নিজেই যেতে পারতাম, কিন্তু আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে কাজটা করতে পারবেন। অজিয়োর্নায়া স্ট্রিটে কাল্মিকোভা নামে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক মহিলার বাড়িতে ভাড়া থাকে।... ঈশ্বরের দোহাই, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমার হয়ে এই কাজটি করে দিন। তাহলে এখন এখন আমি বেশ খানিকটা ক্লান্ত। এবারে আসুন।

বলতে বলতে সে দ্রুত ঘুরে গিয়ে এমনই আচম্বিতে আবারও পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেল যে আলিয়োশা কিছু বলারই অবকাশ পেল না, যদিও কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল। আলিয়োশার ইচ্ছে ছিল তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে, অন্তত কিছু একটা বলে, কারণ তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল এবং এসব না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার এতটুকু ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু মাদাম খখ্লাকোভা তাকে নিজে হাতে ধরে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এলো। বাইরের ঘরে এসে সে তাকে যেতে না দিয়ে আবার সেই আগের মতোই ধরে রাখল।

"মেয়েটা অহংকারী, নিজের মনের সঙ্গে জুঝে চলেছে। কিন্তু ওর মনটা বড় ভালো, ভারি চমৎকার, বড় উদার!" উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রায় ফিসফিস করে মাদাম খখ্লাকোভা বলল। "ওঃ কী ভালোই যে ওকে বাসি, বিশেষত সময়-সময়—তা বলার নয়! আর এখন এই যা যা ঘটল তাতে আরও একবার ওর কথা ভেবে নতুন করে কী ভালোই যে লাগছে! আমাদের প্রিয়বন্ধু আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, একটি কথা কিন্তু আপনি জানেন না তাহলে জেনে রাখুন, আমরা সবাই, আমরা সকলে — আমি এবং ওর দুই মাসিও—মানে, আমরা সকলে, এমনকি লিজা পর্যন্ত, আজ পুরো এক মাস ধরে একমাত্র এটাই কামনা করে আসছি, প্রার্থনা করে আসছি ও যেন আপনার বড়ো পেয়ারের দাদা দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচকে পরিত্যাগ করে।

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ তো ওকে পাত্তাই দিতে চাইছে না, ওকে এতটুকু ভালোও বাসে না। তার চাইতে বরং ইভান ফিয়োদরভিচকে বিয়ে করুক। অতি চমৎকার, শিক্ষিত যুবক, কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। আমরা এখানে এই নিয়ে পুরো একটা ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করে ফেলেছি। এমনকি আমি যে এখান থেকে এখনও চলে যাচ্ছি না এটাও বোধহয় তার একটা কারণ।"

"কিন্তু উনি তো কাঁদছিলেন—আবারও অপমানের আঘাত তার মনে বেজেছে!" আলিয়োশা চেঁচিয়ে বলে উঠল।

"মেয়েদের চোখের জলে বিশ্বাস করবেন না, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্। এক্ষেত্রে আমি সবসময় মেয়েদের বিরোধী, আমি পুরুষদের পক্ষে।"

"মামণি, তুমি কিন্তু ওকে নষ্ট করছ, ওর মাথাটা খাচ্ছ" দরজার এপাশ থেকে লিজার মিহি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"না, না এসবের কারণ আমিই, ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে আমার!" নিজের আচরণের কথা ভেবে নিদারুণ লজ্জায় অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে, কোনও সান্ত্বনা খুঁজে না পেয়ে আলিয়োশা আওড়াল, এমনকি লজ্জায় দু হাতে মুখ ঢাকল।

"মোটেই না, কোনও অন্যায় তো আপনি করেননিইনি, আপনার আচরণ হয়েছে দেবদূতের মতো, একেবারে স্বর্গের দেবতার মতো—একথা আমি হাজার বার বলতে রাজি আছি।"

"কীসে উনি স্বর্গের দেবতার মতো আচরণ করলেন মামণি?" আবারও শোনা গেল লিজার রিনরিনে কণ্ঠস্বর।

লিজার কথা যেন শুনতেই পায়নি এই ভাবে আলিয়োশা বলে চলল, "এসব দেখেশুনে আমারও হঠাৎ কেন যেন মনে হল কাতেরিনা ইভানভ্‌না ইভানকেই ভালোবাসেন। তাইতেই না আমি অমন বোকার মতো কথা বলে ফেললাম। এখন কী হবে?"

"কার? কার কী হবে?" লিজা বলে উঠল, "মামণি, তোমরা করছটা কী বল তো? আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি? কত করে জিগ্‌গেস করছি—আমার কথার কোনো উত্তরই দিচ্ছ না তোমরা!"

সেই মুহূর্তে বাড়ির পরিচারিকাটি ছুটে এলো।

"কাতেরিনা ইভানভ্‌নার অবস্থা খারাপ। উনি কাঁদছেন মূর্ছা যাবার অবস্থা হয়েছে ওনার, ছটফট করছেন।"

"এ আবার কী হল?" লিজার গলায় এবারে স্পষ্ট উদ্বেগের সুর। "মামণি, এবারে দেখছি উনি নন, আমিই মূর্ছা যাব!"

"ঈশ্বরের দোহাই লিজা, অমন চেঁচাস নে, আর জ্বালাস নে আমাকে। ওই তো তোমার বয়স, বড়োরা যা জানে তার সব কিছু এই বয়সে তোমার জানা ঠিক নয়। এই আসছি, এসে তোমাকে যা যা জানানো উচিত সবই জানাব। হা

ভগবান! যাচ্ছি, যাচ্ছি  আহা, মূর্ছা যাচ্ছে!—এটা ভালো লক্ষণ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। কাতেরিনা ইভানভ্না যে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এ তো চমৎকার কথা! ঠিক এটাই তো দরকার! এক্ষেত্রে আমি বরাবরই মেয়েদের বিরোধী, এই সব হিস্টিরিয়া আর মেয়েদের এই সব চোখের জলের ঘোর বিরোধী। ইউলিয়া, এক ছুটে চলে যা, গিয়ে বলে আয় তুরন্ত চলে আসছি। আর ইভান ফিয়োদরভিচ্ যে ওই ভাবে চলে গেলেন তার জন্য ও নিজেই দায়ী। কিন্তু না, উনি যাবেন না। ওঃ লিজা, ঈশ্বরের দোহাই, অমন চেঁচাস নে, ও হ্যাঁ, অবশ্য তুই চেঁচাচ্ছিস না, চেঁচাচ্ছি বরং আমিই। তা ক্ষমা করে দে তোর মামণিকে, কিন্তু আমি একটা চরম আনন্দের মধ্যে আছি, একটা ভাবের ঘোরে আছি! আপনি লক্ষ করে দেখেছেন কি আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ এই যে বেরিয়ে গেলেন, কেমন যুবকের মতো বুকের পাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন! যা যা বলার সব বলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন! আমি তো ভেবেছিলাম উনি অতবড় একজন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত মানুষ। আর হঠাৎ দেখলাম কেমন অল্পবয়সির মতো, একেবারে অল্পবয়সি আর একজন অনভিজ্ঞ লোকের মতোই কেমন অকপটে, কেমন আবেগ দিয়ে কথাগুলো বলে দিয়ে গেলে! কী চমৎকার, আহা, কী চমৎকারই না লাগছিল! এসব ঠিক যেন আপনার মতো!

তারপর ওই যে জার্মান কবিতাটা বললেন, হুবহু আপনার মতো! যাক গে, আমি চললাম, চটপট গিয়ে দেখে আসি। আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সেটা চটপট সেরে আবার চটপট ফিরে আসুন এখানে। লিজা মা, তোমার কি কোনো দরকার আছে? ঈশ্বরের দোহাই, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচকে এখন আর আটকাস নে— এক মিনিটের জন্যও আটকাসনে, উনি এখনই আবার তোর কাছে ফিরে আসবেন।...”

মাদাম খখ্‌লাকোভা শেষ পর্যন্ত দ্রুত পায়ে ছুটে চলে গেল। চলে যাবার আগে পাশের ভেজানো দরজাটা খুলে লিজাকে একবার দেখার ইচ্ছে হল আলিয়োশার।

“কক্ষণও নয়!” লিজা চেঁচিয়ে উঠল, “এখন কোনোমতেই নয়! যা বলার দরজার আড়াল থেকেই বলুন। আপনি দেবদূতদের মধ্যে পড়লেন কী করে বলুন তো? আমি শুধু এটাই জানতে চাই।”

“আমার মারাত্মক বোকামির জন্য লিজে, চললাম।”

“অমন ভাবে চলে যাচ্ছেন যে বড়ো!” লিজা প্রায় চিৎকার করেই বলল।

“লিজে, আমি সত্যি সত্যি বড়ো দুঃখের মধ্যে আছি! আমি এখুনি ফিরে আসছি, কিন্তু আমার বড়ো দুঃখ, বড়োই দুঃখ!”

এই বলে সে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

## ছয়

## ভাঙা ঘরে বুকফাটা হাহাকার

আলিয়োশা সত্যি সত্যি নিদারুণ দুঃখের মধ্যে আছে, এ দুঃখ এমনই যে সেরকম এর আগে পর্যন্ত কদাচিৎ সে অনুভব করেছে। হুট্ করে একটা মূর্খামি করে ফেলেছে। করেছে কোন্ ব্যাপারে? না, প্রেমের অনুভূতি নিয়ে! 'কিন্তু প্রেমের আমি কী বুঝি? এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আমি কে?' লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে এই নিয়ে শতবার সে মনে মনে আওড়াল। 'ওঃ লজ্জা—সে তো কিছুই নয়; লজ্জা পাওয়া—সেটাই আমার একমাত্র যোগ্য শাস্তি। কিন্তু যেটা দুর্ভাগ্যের কথা তা এই যে আমি এখন নিঃসন্দেহে নতুন নতুন সব বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াব। অথচ মহাস্থবির আমাকে মিটমাট করার জন্য, ওদের একত্রে মেলানোর জন্যই না পাঠিয়েছিলেন? এই কিনা মেলানোর নমুনা?' এই সময় হঠাৎ আবার তার মনে পড়ে গেল কী ভাবে সে ওদের 'দুই হাত মেলাতে' গিয়েছিল। মনে হতেই আবার সে দারুণ লজ্জা বোধ করল। 'যদিও এসবের পেছনে আমার আন্তরিকতার এতটুকু অভাব ছিল না, তবু ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আমাকে আরও বুদ্ধিমান হতে হবে', হঠাৎ সে সিদ্ধান্ত করল। নিজের এই সিদ্ধান্তে কিন্তু তার মুখে এতটুকু হাসিও ফুটে উঠল না।

কাতেরিনা ইভানভ্না তাকে যে কাজের ভার দিয়েছিল সেটা নিয়ে তার যাবার কথা ছিল অজিয়োর্নায়া স্ট্রিটে। দাদা দ্মিত্রির আস্তানাটাও আবার ঠিক সেই পথেই পড়ে, অজিয়োর্নায়া স্ট্রিটেরই কাছাকাছি একটা গলিতে। আলিয়োশা ঠিক করল, যাই হোক না কেন, ক্যাপ্টেনের কাছে যাবার আগে একবার দ্মিত্রির কাছে যাবে, যদিও তার মন বলছিল যে দাদাকে পাওয়া যাবে না। আলিয়োশার সন্দেহ হচ্ছিল সে হয়তো এখন ইচ্ছে করেই যে ভাবেই হোক তার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে; কিন্তু যে করেই হোক ওকে খুঁজে বের করা দরকার। এদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে মঠ থেকে যখন সে বেরিয়েছে সেই তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুপথযাত্রী মহাস্থবিরের চিন্তাটা তার মাথা থেকে যায়নি।

কাতেরিনা ইভানভ্না তাকে যে কাজের ভার দিয়েছিল তার মধ্যে যে একটি ব্যাপার এক ঝলক তার মনে উদয় হয়েছিল এবং যা তার কাছে অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপকও বটে, সেটা এই যে কাতেরিনা ইভানভ্না যখন সেই ক্যাপ্টেনের ছেলে, স্কুলের ছাত্র সেই বাচ্চাটার কথা উল্লেখ করে যে গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে তার বাবার পাশে পাশে ছুটছিল, তখন হঠাৎই যেন আলিয়োশার মনের মধ্যে এমন চিন্তা খেলে গেল যে ওই বাচ্চাটা নির্ঘাত আজকের ওই স্কুলছাত্রটি যে আলিয়োশার আঙুল কামড়ে দিয়েছিল, যখন তার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল সে তার কী অনিষ্ট করেছে। এখন কিন্তু আলিয়োশা এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত, যদিও সে নিজে এখনও জানে না কেন। এই ভাবে বাইরের কতকগুলি উটকো ভাবনাচিন্তায় মগ্ন

হয়ে থাকার ফলে তার মনটা অন্য দিকে ঘুরে গেল। সে ঠিক করল এখন যে 'বিপদটা' সে বাধিয়ে তুলেছে তা নিয়ে আর 'চিন্তা করবে' না, অনুশোচনায় নিজেকে দগ্ধ করবে না, তার বদলে কাজ করে যাবে, তারপর যা হওয়ার হবে। এই ভেবে সে রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এদিকে দাদা দ্‌মিত্রির কাছে যাবে বলে পাশের গলিতে মোড় নিয়েছে, এই সময় তার খিদেও পেয়ে গেল। বাবার কাছ থেকে যে ফরাসি রুটিটা এনেছিল পকেট থেকে সেটা বের করে খেতে খেতে পথ চলতে লাগল। খেয়ে শরীরে বেশ জোরবলও পেল।

দ্‌মিত্রিকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বাড়ির লোকজন বলতে—বুড়ো কাঠের মিস্ত্রি, তার ছেলে, আর মিস্ত্রির বুড়ি স্ত্রী—সকলে আলিয়োশার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই তাকাল। আলিয়োশার প্রবল জেরার উত্তরে বুড়ো বলল, 'আজ তিন দিন হল এখানে রাত কাটাচ্ছেন না। হয়তো কোথাও চলেই গেছেন।' আলিয়োশা বুঝতে পারল বুড়ো শেখানো কথা বলছে। এবারে সে ইচ্ছে করেই কোনো রাখঢাক না করে খোলাখুলি প্রশ্ন করে বসল 'আচ্ছা গ্রুশেন্‌কার বাড়িতে নেই তো? না কি তোমার কাছে গিয়ে লুকিয়ে আছে?' এতে তারা তিন জনেই ঘাবড়ে গেল, এমনকি ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাল। 'দেখা যাচ্ছে ওরা ওকে ভালোবাসে', আলিয়োশা মনে মনে ভাবল, 'ওর পক্ষেই আছে। এটা ভালো বলতে হবে।'

শেষকালে অজিয়োর্‌নায়া স্ট্রিটে শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলা কাল্‌মিকোভার বাড়িটা সে খুঁজে বের করল। বাড়িটা একেবারে জরাজীর্ণ, একধারে হেলে পড়েছে, রাস্তার দিকে মোট তিনটে জানলা, বাড়ির উঠোনটা নোংরা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সবেধন একটা গোরু। উঠোন পেরিয়ে বার বারান্দায় ঢোকার পথ। বার-বারান্দার বাঁ দিকের ঘরে থাকে বাড়ির মালিক এক বুড়ি, তার সঙ্গে তার মেয়ে—সেও বুড়ি। দেখেশুনে মনে হয় দুজনেই কালা। জুনিয়ার ক্যাপ্টেনের কথা জিগ্‌গেস করতে—তাও আলিয়োশা বার কয়েক আওড়াতে—ওদের দুজনের একজন শেষকালে যখন বুঝতে পারল যে ভাড়াটিয়াদের কথা হচ্ছে তখন সে আঙুলের ইশারায় বারান্দার ওপাশে পরিচ্ছন্ন কুটিরটার ভেতরে ঢোকার একটা দরজা দেখিয়ে দিল। ক্যাপ্টেনের ভাড়া বাড়ি বলতে দেখা গেল আসলে সাধারণ একটা কুটির ছাড়া আর কিছুই নয়। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার জন্য লোহার হুড়কোতে হাত দিতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজার ওধারের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় সে অবাক হয়ে গেল। কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কথা থেকে ও অবশ্য জানত যে অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেনটি একজন সংসারী লোক। 'হয়তো সবাই ঘুমোচ্ছে, নয়ত এমনও হতে পারে যে আমি যে এসেছি তা শুনতে পেয়েছে, তাই অপেক্ষা করছে কখন আমি দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলব। তার চেয়ে বরং আমি দরজায় টোকা মারি', এই ভেবে সে টোকা মারল। জবাবটা পাওয়া গেল, তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়—সেকেন্ড পাঁচেক, এমন কি হয়তো বা সেকেন্ড দশেক পরে।

“কে ওখানে?” গলা উঁচিয়ে রাগতস্বরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

এই কথা শুনে আলিয়োশা দরজা খুলে চৌকাট ডিঙিয়ে ভেতরে পা বাড়াল। সে এসে পড়ল একটা কুটিরের ভেতরে। ঘরটা যদিও যথেষ্ট প্রশস্ত, কিন্তু ঘরসংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র আর রাজ্যের যত লোকজনে একেবারে বোঝাই হয়ে আছে। বাঁ দিকে ইটে গাঁথা একটা ঢাউস রুশি চুল্লি। চুল্লি থেকে সারা ঘর জুড়ে বাঁদিকের জানলা পর্যন্ত একটা দড়ি টাঙানো, তাতে নানা রকমের ন্যাতাকানি ঝুলছে। বাঁ আর ডান দিকের দুই দেয়াল ঘেঁষে দুটি চৌকি, কাঁথায় ঢাকা। একটি বিছানার ওপর ছিট কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া চারটে বালিশ—বড়ো থেকে ছোটো আকারে থাক করে সাজানো। আরেকটাতে—ডান দিকের বিছানাটাতে চোখে পড়ছে একটি মাত্র বালিশ, সেটাও আবার খুবই ছোটো। একটু দূরে, সম্মুখের কোনাটাতে খানিকটা জায়গা একটা পর্দা দিয়ে ঘেরা, সে পর্দা একটা চাদরও হতে পারে; সেটাও ওই কোনাটার আড়াআড়ি টাঙানো একটা দড়িতে ঝোলানো। এই পর্দাটার ওধারেও চোখে পরে এক পাশে একটা বেঞ্চি, তার সঙ্গে চেয়ার জুড়ে তৈরি আরেকটি বিছানা, চাষাভুসোদের ঘরে ব্যবহারের উপযোগী একটা সাধারণ কাঠের চারকোনা টেবিল সম্মুখের কোনাটা থেকে সরিয়ে মাঝের জানলার গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। তিনটে জানলার প্রত্যেকটিতে চারটি করে ছোটো ছোটো কাচের শার্সি, সবুজ ছাতলা ধরা, একেবারে ঝাপসা, আর এমনই আঁট করে বন্ধ করা যে ঘরের ভেতরটা রীতিমতো গুমোট হয়ে আছে, আলোও তেমন একটা ঢুকতে পারছে না। টেবিলের ওপরে একটা ফ্রাইং প্যান, তাতে পড়ে আছে ডিমের পোচ্-এর ভুক্তাবশেষ, আধ খাওয়া এক টুকরো রুটি, এছাড়াও আছে পার্থিব কল্যাণের জন্য যে সুধারসের সৃষ্টি, তারই আধ পাঁইটের একটা বোতল, তাতে তরল পদার্থ অবশ্য অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে, যেটুকু আছে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। বাঁ দিকের চৌকির ধারে চেয়ারে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক, বেশ ভদ্র চেহারার, পরনে ছিট কাপড়ের পোশাক। মহিলার মুখ অতি শীর্ণ, হলদে পাণ্ডুর বর্ণের। গালদুটো এত চোপসানো যে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে বাকি থাকে না যে সে অসুস্থ। কিন্তু আলিয়োশা যা দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেল তা হল বেচারি মহিলার চোখের দৃষ্টি—সে দৃষ্টি বড়ো বেশি প্রশ্নসূচক, তাতে ফুটে উঠছে অতিমাত্রায় দাম্ভিকতা। ভদ্রমহিলা নিজে কথা শুরু করার আগে পর্যন্ত এবং আপাতত গৃহকর্তার সঙ্গে আলিয়োশার যখন বোঝাপড়া চলছে সেই সময় থেকে থেকে বাদামি রঙের বড়ো বড়ো দু চোখের সেই দাম্ভিক ও প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে কথোপকথনকারীদের একজন থেকে আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছিল। তার কাছাকাছি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একটি অল্পবয়সি মেয়ে, মুখটা তার একেবারেই সুন্দর নয়, মাথার চুল অল্প, লালচে, দীন পোশাক, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আলিয়োশা ঘরে ঢুকতে মেয়েটি বিতৃষ্ণাভরে তার দিকে তাকাল। ডান দিকে আরও একটি বিছানার ধারে বসে আছে আরও একটি নারীমূর্তি—

সে এক বড়ো করুণ মূর্তি। এও কমবয়সির একটি মেয়ে, বছর বিশেক বয়স, কিন্তু কুঁজো, দুটো পা-ই তার অচল---আলিয়োশা পরে জানতে পেরেছে পক্ষাঘাতে শুকিয়ে গেছে। পাশেই, খাট আর দেয়ালের মাঝখানের এক কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে তার ক্রাচজোড়া। ভারি চমৎকার, প্রসন্ন দুটি চোখ মেলে হতভাগিনী মেয়েটি কেমন যেন শান্ত বিনম্র দৃষ্টিতে আলিয়োশার দিকে তাকাল। টেবিলের ধারে বসে বসে ডিমের পোচ খাওয়া সারছে এক ভদ্রমহোদয়—বেঁটেখাটো, শুঁটকো চেহারা, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে। গড়নটা দুর্বল গোছের, লালচে রঙের পাতলা দাড়ি—গা রগড়ানোর শুকনো 'ধুঁধুলের ছোবড়া' বড়ো বেশি বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হলে যেমন দেখায়। পরে আলিয়োশার মনে হয়েছিল কেন কে জানে, এই উপমাটা, বিশেষত ধুঁধুলের ছোবড়া কথাটা প্রথম দৃষ্টিতেই আলিয়োশার মাথার ভেতরে খেলে গিয়েছিল! বোঝাই যাচ্ছিল দরজার ওপাশ থেকে এই ভদ্রমহোদয়টিই হাঁক দিয়েছিল 'কে ওখানে?'—যেহেতু ঘরের ভেতরে আর কোনও পুরুষমানুষ ছিল না। কিন্তু আলিয়োশা ঘরে ঢুকতেই টেবিলের ধারে যে বেঞ্চটার ওপর সে বসেছিল এক ঝটকায় সেখান থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল, ন্যাপকিনটা দিয়ে তড়িঘড়ি মুখ মুছে নিয়ে আলিয়োশার দিকে ধেয়ে গেল।

"হুঁঃ সাধুবাবা এসেছেন আশ্রমের জন্যে ভিক্ষে চাইতে! আর লোক পেলেন না!" বাঁ দিকের কোনায় যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে উঁচু গলায় সে বলে উঠল।

কিন্তু যে ভদ্রলোকটি আলিয়োশার দিকে ধেয়ে গিয়েছিল চোখের পলকে জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে কেমন যেন স্খলিতকণ্ঠে তাকে উত্তর দিল, "না গো ভারভারা নিকলাভ্না, ঠিক ধরতে পারনি! রোসো, এবারে আমার জিগ্‌গেস করার পালা", হঠাৎ আলিয়োশার দিকে আবার ফিরে সে বলল, "আচ্ছা, এবারে বলুন দেখি, আমাদের এই ডেরায় আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা কী?"

আলিয়োশা লোকটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। তাকে সে এই প্রথম দেখছে। তার মধ্যে এক ধরনের আনাড়িপনা এবং তেড়েফুঁড়ে ওঠা খিটখিটে ভাব ছিল। যদিও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ সে মদ খাচ্ছিল, কিন্তু মাতাল সে হয় নি। তার চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে চূড়ান্ত ধরনের কেমন যেন একটা নির্লজ্জ ভাব, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে সেই সঙ্গে ভীরুতার চিহ্নও সুস্পষ্ট। কোনো মানুষ অনেক কাল মাথা নীচু করে অনেক কিছু সহ্য করার পর হঠাৎ যদি বেঁকে বসে এবং নিজেকে জাহির করতে চায় তাকেও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছিল। কিংবা আরও ভালো করে বলতে গেলে, তাকে দেখাচ্ছিল এমন একজন লোকের মতো যার ভীষণ ইচ্ছে আপনাকে এক ঘা বসিয়ে দেয়, অথচ মনে মনে দারুণ ভয় এই ভেবে যে পাছে উলটে আপনিই তাকে প্রথম মেরে বসেন। তার কথাবার্তার মধ্যে এবং

তার মাত্রাতিরিক্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উচ্চারণ ভঙ্গিতে এমন একটা খ্যাপাটে ধরনের হাস্যকর ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল যা কখনও কুটিল, কখনও বা নিরীহ ধরনের; কণ্ঠস্বর ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় কথায় কথায় সে হোঁচট খাচ্ছিল। 'আমাদের এই ডেরার' প্রশ্নটা যখন সে করল তখন তাকে দেখে মনে হল যেন তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, আর এই কথা বলতে বলতে চোখ দুটি গোল গোল করে পাকিয়ে এক লাফে আলিয়োশার এত কাছাকাছি চলে এলো যে আলিয়োশা সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো এক পা পিছিয়ে গেল। ভদ্রলোকটির গায়ে এক ধরনের সূতিকাপড়ের কালো, নোংরা দাগধরা, তালিমারা অতি ওঁচামার্কা একটা ওভারকোট, সেই সঙ্গে যে প্যান্টটা সে পরেছে সেটা আবার বড়ো বেশি ফিকে রঙের, চৌখুপি কাটা পাতলা জ্যালজেলে কাপড়ের—এমনই যে ওরকম জিনিস আজ বহুকাল হল আর কেউ পরে না, তলার দিক থেকে লাট হয়ে যাবার দরুন খাপি হয়ে এতই ওপরে উঠে গেছে যে মনে হয় ছোটোবেলা থেকে ওটাই পরে আছে এবং ওটা পরেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে।

"আমি আলেক্সেই কারামজভ্ " আলিয়োশা বলতে শুরু করেছে কি করে নি, অমনি ভদ্রলোক কথার মাঝখানে তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। "সেটা ভালোমতোই বোঝার ক্ষমতা আমার আছে মশাই", এই বলে বুঝিয়ে দিল সে যে কে অমনিতেই তার জানা আছে। "এবারে আমার পরিচয় দিয়ে দিই। আমি হলেম গিয়ে হুজুর, ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়োভ্। কিন্তু সে যাই হোক, আমার জানতে ভারি ইচ্ছে করছে কী এমন কারণ ঘটল যার বশবর্তী হয়ে আপনি

"আরে না না, এই অমনি এলাম আর কি। আসলে আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন তবেই

"তা-ই যদি হয় হুজুর, তাহলে এই যে চেয়ার আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়। 'আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়'—এ হল গিয়ে পুরনো ধাঁচের কমেডির ভাষা।... এই বলে ক্যাপ্টেন খপ্ করে একটা খালি চেয়ার তুলে নিল—চাষাভুসোদের ঘরের উপযোগী সাধারণ কাঠের একটা চেয়ার—সেটার না আছে কোন গদি, না কোন ঢাকনা। চেয়ারটা ঘরের মাঝখানটায় রাখল। তারপর ওরকমই আরও একটা চেয়ার নিজের জন্য টেনে এনে আলিয়োশার মুখোমুখি বসল। এবারেও সেই আগের মতো দুজনের মধ্যে প্রায় ঠোকাঠুকি হওয়ার উপক্রম হল—আলিয়োশার হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটু প্রায় ঠেকে যাচ্ছিল।

"অধমের নাম নিকলাই ইলিচ স্নেগিরিয়োভ্, রুশ পদাতিক বাহিনীর ভূতপূর্ব জুনিয়র ক্যাপ্টেন, মহাশয়, যদিও নিজের দোষে চাকরিটি খুইয়েছি, তবু ক্যাপ্টেন আখ্যাটা এখনও আমার আছে। তবে হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়োভ্ না বলে ফতো কাপ্তান 'জো হুজুর' বললেই বোধহয় ভালো হয়, কেননা এই সবে জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 'যে আজ্ঞে মহাশয়' বলে কথা বলতে শুরু করেছি। এটা, মহাশয়, লোকে তখনই অর্জন করে যখন মানসম্মান খুইয়ে নিচে নেমে যায়।"

"সেটা খুবই সত্যি", মুচকি হেসে আলিয়োশা বলল, "কিন্তু আমার প্রশ্ন হল নিজের ইচ্ছায় অর্জন করেছেন, না অনিচ্ছাকৃতভাবে?"

"মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমার ইচ্ছায় নয়। জীবনে কখনও 'যে আজ্ঞে মহাশয়' করিনি, তারপর হঠাৎ পতন, তখন থেকে 'জো হুজুর'দের দলে নাম লেখালাম। এটা সেই সর্বশক্তিমান ওপরওয়ালার হাত। তা সে যাই হোক না কেন, আছি তো দেখতেই পাচ্ছেন, এমন একটা অবস্থার মধ্যে যেখানে অতিথি আপ্যায়ন করা অসম্ভব; এই যেখানে আমার অবস্থা সেখানে আপনার এত কৌতূহল আমি কী করে জাগিয়ে তুলতে পারলাম জানতে পারি কি?"

"আমি এসেছি মানে সেই কাজেই এসেছি

"সেই কাজেই? কোন্ কাজে?" অসহিষ্ণুভাবে তাকে থামিয়ে দিল ক্যাপ্টেন।

"আমার দাদা দমিত্রি ফিয়োদরভিচের সঙ্গে আপনার ওই সাক্ষাতের প্রসঙ্গে", আনাড়ির মতো আলিয়োশা বলে উঠল।

"কীসের আবার সাক্ষাৎ হুজুর"? সেই সাক্ষাতের কথা বলছেন নাকি হুজুর? মানে, সেই শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়ার কথা বলতে চান নাকি?" বলতে বলতে আচমকা এতটাই কাছে সরে এলো যে এবারে সত্যি-সত্যিই আলিয়োশার হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটুর ঠোকাঠুকি লেগে গেল। এমন জোরে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল যে সে জায়গায় সুতোর মতো একটা রেখা ছাড়া দেখার মতো আর কিছু রইল না।

"শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়া-টোবড়া এসব কী বলছেন?" আলিয়োশা বিড়বিড় করে বলল।

"ও লোকটা আমার নামে নালিশ করতে এসেছে বাবা।" ঘরের কোনার পর্দার পিছন থেকে শোনা গেল শিশুকণ্ঠের চিৎকার। এ কণ্ঠস্বর আলিয়োশার খুবই চেনা—সদ্যপরিচিত সেই স্কুলছাত্রটির। "আমিই এই কিছুক্ষণ আগে ওর আঙুলটা কামড়ে দিয়েছি!"

পর্দা-সরে যেতে আলিয়োশা দেখতে পেল তার সদ্যপরিচিত শত্রুটি ঘরের কোনায়, বিগ্রহের কুলঙ্গির তলায় বেঞ্চি আর চেয়ার জুড়ে তৈরি করা একটা বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে সেই ওভারকোট, তার ওপরে একটা পুরনো লেপ চাপা দেওয়া। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ, চোখদুটো যেরকম ছলছল করছে তাতে মনে হচ্ছে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। এবারে আর সেই তখনকার মতো নয়—নিঃশঙ্ক দৃষ্টিতে সে তাকাল আলিয়োশার দিকে—ভাবটা এই যে 'এখন আমি বাড়িতে, সাধ্যি থাকে তো ধর আমাকে!'

"আঙুল কামড়েছিস—সে আবার কী কথা?" ক্যাপ্টেন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করল। "বলেন কি মহাশয়! আপনার আঙুল কামড়েছে?"

'হ্যাঁ, আমারই। এই একটু আগে রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে ঢিল ছুড়ে মারামারি

করছিল; ওরা ছ'জনে মিলে ওকে ইট মারছিল, অন্য দিকে ও একা। আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে ও আমাকেও ঢিল ছুড়ে মারল, তারপর আরও একটা মারল আমার মাথায়। আমি জিগ্‌গেস করলাম আমি ওর কী করেছি? একথায় হঠাৎ ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, জোর কামড় বসিয়ে দিল আমার আঙুলে-জানি নে কেন।"

"এইবারে আমি চাবকে লাল করব, হুজুর! এই এক্ষুনি, হুজুর, দেখুন না কেমন ঠ্যাঙাই", বলতে বলতে এবারে সত্যি-সত্যি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল ক্যাপ্টেন।

"আমি কিন্তু মোটেই অভিযোগ করছি না, আমি শুধু ঘটনাটা বললাম আমার মোটেই ইচ্ছে নয় যে আপনি ওকে শাস্তি দেন। তাছাড়া ছেলেটা তো মনে হচ্ছে অসুস্থও বটে

"আপনি কি ভেবেছিলেন আমি সত্যি সত্যি ওকে চাবকাব? আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য আমার ইলিউশ্‌কাকে ধরে আপনার সামনে পিঠের ছালচামড়া তুলব? আপনার আর তর সইছে না, তাই না, হুজুর?" হঠাৎ আলিয়োশার দিকে ফিরে ক্যাপ্টেন এমন ভাবে বলে উঠল যেন এই বুঝি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। "আপনার আঙুলের জন্য আমার দুঃখ হয় ঠিকই, কিন্তু আপনার কি এমন ইচ্ছে হচ্ছে না যে আমার ইলিউশাকে চাবকানোর আগে এক্ষুনি, আপনার চোখের সামনে এই যে এই ছুরিটা দিয়ে আমার হাতের চারটে আঙুল ঘচাঘচ কেটে দিয়ে আপনার মনোবাসনা ন্যায়সঙ্গত ভাবে চরিতার্থ করি? আমার তো মনে হয় আপনার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পক্ষে চারটে আঙুলই যথেষ্ট—পঞ্চমটার আর দরকার হবে না—কী বলেন?..." বলতে বলতে আচমকা এমন ভাবে থেমে গেল যেন তার দম আটকে আসছিল। তার মুখের প্রতিটি রেখা লম্ফঝম্প করে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল, একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধংদেহি ভাব ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খেপে গেছে।

"আমার মনে হয় আমি এখন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি" চেয়ারে বসে বসেই বিষণ্ণকণ্ঠে আস্তে আস্তে আস্তে আলিয়োশা জবাব দিল। "দেখা যাচ্ছে আপনার ছেলেটা সত্যি সত্যি বড়ো ভালো ছেলে। বাবাকে ভালোবাসে, তার বাবাকে যে অপমান করেছিল আমি তার ভাই, তাই আমার ওপর চড়াও হয়েছিল। ব্যাপারটা আমি এখন বুঝতে পারছি", চিন্তিতভাবে আলিয়োশা আবার বলল। "কিন্তু আমার দাদা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ তার আচরণের জন্য অনুতাপ করছে, আমি এটা জানি এবং আপনার কাছে আসা তার পক্ষে যদি একান্তই সম্ভব হয়, কিংবা আরও ভালো হয় যদি ওই একই জায়গায় আপনার সঙ্গে তার আবার দেখা হয় তাহলে সে সর্বসমক্ষে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে যদি আপনার তা-ই ইচ্ছে হয়।"

"বটে! দাড়ি ওপড়ানোর পর স্রেফ ক্ষমা চাইল আর তাইতেই সব সন্তোষজনকভাবে চুকে বুকে গেল—এই কথাই ত বলতে চান, হুজুর—তাই না?"

"না, না, বরং তার উলটোটাই বলছি। আপনি যা চান, যেমনটি চান তেমনটিই সে করবে!"

"তাহলে হুজুর কি এই কথাই বলতে চান যে আমি যদি আমাদের মহামহিমাময়কে ওই শুঁড়িখানাতেই—যার নাম হল গিয়ে 'মহানগর'—সেখানে, কিংবা হাটের মাঝখানের চত্বরে—যেখানেই হোক না কেন, আমার সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে বলি উনি কি তা-ই করবেন?"

"হ্যাঁ, হাঁটু গাড়বে বৈ কি।"

"আহা, শুনে আমার বুকটা জুড়িয়ে গেল হুজুর! দুচোখ আমার জলে ভরে এলো। আমি আবার বড়ো বেশি অনুভূতিপ্রবণ কিনা। এবারে আজ্ঞা হয় তো বাড়ির সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আমার পরিবার, আমার দুই কন্যা, আমার পুত্র—আমার আন্ডাবাচ্চা আর কি, হুজুর। আমি যদি আজ মারা যাই তাহলে কার গরজ পড়েছে ওদের ভালোবাসতে, বলুন দেখি হুজুর? আবার আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার মতন এমন হতচ্ছাড়া লোককে ওরা ছাড়া আর কেই বা ভালোবাসতে পারে বলুন হুজুর? আমার জাতের প্রতিটি মানুষের জন্য আমাদের প্রভু এই যে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন না এটা কিন্তু দারুণ—মানতেই হবে হুজুর। কেন না এটা তো ঠিকই হুজুর যে আমার জাতের মানুষেরও দরকার অন্তত কেউ একজন তাকে ভালোবাসে। "

"ওঃ সে কথা একশ বার সত্যি!" আলিয়োশা বলে উঠল।

"আঃ অনেক হয়েছে, ওসব ঢং ছাড় দেখি! কোথাকার কোন্ এক গণ্ডমূর্খ এসে ঢুকল আর তুমিও কিনা আমাদের সবাইকে লজ্জা দিতে শুরু করলে!" জানলার ধারের মেয়েটি অবজ্ঞা ও ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে বাবার দিকে ফিরে আচমকা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"একটু ধৈর্য ধরুন ভারভারা নিকলাভ্না, মা ঠাকরুন আমার, একটু ধৈর্য ধরে দেখুনই না আমি কী করি", বাপও পালটা চিৎকার করে মেয়েকে বলল—কর্তৃত্বের সুরেই বলল বটে, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে মেয়ের দিকে তাকাল তাতে বোঝা গেল মেয়ের কথায় তার পুরো সায় আছে। এর পর আবার আলিয়োশার দিকে ফিরে সে বলল, "মেয়ের আমার স্বভাবটাই ওরকম, মশাই।

প্রকৃতির কোন দান দেখে সুনজরে
কখনও হয়নি তার এহেন বাসনা।"

"কখনও হয়নি তার এহেন বাসনা'—এখানে অবশ্য হুজুর যার কথা বলা হচ্ছে সে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তা হুজুর, আপনার যদি অনুমতি হয় তো আমার সহধর্মিণীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিই ইনি হলেন আরিনা পেত্রোভ্না। ভদ্রমহিলার দুটো পা-ই গেছে, বছর তেতাল্লিশ বয়স। পা যদিও বা চলে, সে খুবই সামান্য, হুজুর। সাধারণ পরিবারের মেয়ে। আঃ হা, আপনার মুখের রেখাগুলো একটু মোলায়েম

করুন না আরিনা পেত্রোভ্না। এই যে আরিনা পেত্রোভ্না, ইনি হলেন গিয়ে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কারামজভ্। উঠে দাঁড়ান আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্", বলতে বলতে সে আলেক্সেইয়ের হাতটা চেপে ধরল, তারপর হঠাৎই এক ঝটকায় এমনভাবে তাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলল যে অতটা শক্তি তার কাছ থেকে রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ছিল। "আপনি একজন মহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছেন, হুজুর, উঠে দাঁড়াতে হবে না? তা ইনি সেই কারামাজ়ভ্ মহাশয় নন গিন্নি, যার সঙ্গে হুম্ আমার ওই ইয়ে ইনি তাঁর ছোটো ভাই—অতি শান্ত শিষ্ট সজ্জন, সদ্‌গুণের আধার। তা হ্যাঁ গো আরিনা পেত্রোভ্না, আপনার আজ্ঞা হয় তো, গিন্নি আমার, আজ্ঞা হয় তো প্রথমে আপনার হাতে চুমু খাই।"

এই বলে সে সসম্ভ্রমে, এমনকি অনুরাগের পরিচয় দিয়েই স্ত্রীর হাতে চুমু খেল। জানলার ধারের মেয়েটি পরম বিরক্তিভরে দৃশ্যটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু স্নেগিরিয়োভের সহধর্মিণীর মুখে এতক্ষণ যে উদ্ধত প্রশ্নসূচক ভাবটা ছিল সেটা কেটে গিয়ে সেখানে হঠাৎই অস্বাভাবিক রকমের বিগলিত ভাব প্রকাশ পেল।

"নমস্কার কালামাজন মহাশয়", মহিলা বলে উঠল।

"আহা গিন্নি, কালমাজন নয়, কারামাজ়ভ্",[১০] শুধরে দিয়ে কর্তা বলল। "আমরা হলেম গিয়ে হুজুর সাধারণ পরিবারের লোক", আবার সে চাপা গলায় বলল।

"তা সে কারামাজ়ভ্ হোক আর যাই হোক, আমি কিন্তু বাপু কালমাজনই বলব।... বসুন না, উনি আবার আপনাকে টেনে তুললেনই বা কেন? উনি বললেন, ভদ্রমহিলার দুটো পা-ই গেছে; যায় নি আছে বটে, কিন্তু ফুলে ঢোল, এদিকে শরীরটা গেছে একেবারে শুকিয়ে। আগে কী মোটাই না ছিলাম, এখন শুকিয়ে হয়েছি যেন খ্যাংরাকাঠি।

"আমরা সাধারণ, একেবারেই সাধারণ ছাপোষা মানুষ, হুজুর", ক্যাপ্টেন আরও একবার মৃদুস্বরে বলল।

ক্যাপ্টেনের কুঁজো মেয়েটা এতক্ষণ চুপচাপ তার চেয়ারে বসে ছিল, এবারে সে হঠাৎ বলে উঠল, "বাবা, আঃ বাবা!" সঙ্গে সঙ্গে রুমালে চোখ ঢাকল।

"ভাঁড়!" জানলার ধারের মেয়েটার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের হালচাল", দুহাত ছড়িয়ে মেয়েদের দেখিয়ে তাদের মা বলল। "এ যেন 'মেঘের আনাগোনা'। মেঘ কেটে যাবে, আবার আমরা আমাদের নিজেদের ছন্দে ফিরে যাব। আগে যখন আমরা কর্তার সঙ্গে আর্মিতে ছিলাম, তখন এরকম অনেক অতিথি আমাদের কাছে আসত। আমি বাপু এ ব্যাপারে কোনো তুলনার মধ্যে যাচ্ছি নে। যে যার খুশি তাকে ভালোবাসুক না কেন, আমার বলার কী আছে? এই দেখুন না কেন, গির্জার পুরুত ঠাকুরের বউ তখন আমার কাছে আসত, তা সে মহিলা বলত 'আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভিচ মানুষটির মনটি কিন্তু ভারি চমৎকার, কিন্তু নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না? তার কথা আর বলবেন না—তার

মনটা একটা নরককুণ্ড।' আমি তার জবাবে বলি 'কথাটা হল গিয়ে কে কাকে কী চোখে দেখে। তা তুমিও বাপু কম যাও না—স্তূপ যদিও ছোটো, গন্ধ, ছড়ায় বড়ো।' বলে কি জানেন? 'তোমার মতো লোককে বশে রাখা দরকার।' আমি বলি, 'তুমি হলে একটা বিষমাখা ছুরি। তুমি এসেছ আমাকে শেখাতে?' সে বলল, 'আমি ভালো হাওয়া ছাড়ি, কিন্তু তোমারটা ভালো নয়।' 'বটে! বেশ তো অফিসার মশাইদের সবাইকে জিগ্‌গেস করে দেখলেই তো হয় আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়াটা বিশুদ্ধ কিনা।' সেই তখন থেকে ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তা এই সেদিনের কথা, এখন যেমন বসে আছি ঠিক তেমনি এখানে বসে ছিলাম—দেখি এসে হাজির সেই জেনারেলটি, যিনি আমাদের এখানে পবিত্র উৎসবের সময় আসতেন। আমিও অমনি তাঁকে চেপে ধরলাম 'আচ্ছা মহামান্যবর আপনিই বলুন, ভদ্রঘরের কোনো মহিলার পক্ষে কি খোলা হাওয়া আসতে দেওয়া উচিত?' 'নাই বা কেন?' তিনি বললেন। 'ঘরের পুরো জানলা না হোক অন্তত শীতজানলাটা, নয়ত দরজাটা একটু খোলা দরকার—ঠিক এই কারণেই দরকার যে আপনাদের ঘরে তাজা হাওয়া বাতাস খেলছে না।' সকলেরই সেই এক রা! আমার হাওয়া বাতাস কী এমন দোষটা করল শুনি? আরে বাবা মরা মানুষের গন্ধ তো এর চাইতেও খারাপ। আমি বলি, আপনাদের হাওয়া বাতাস আমি নষ্ট করতে যাচ্ছি না, এই এক জোড়া জুতোর ফরমাস দিতে এসেছিলাম, ফরমাস দিয়েই চলে যাব।' ওরে বাছারা আমার, তোদের গর্ভধারিণী মাকে উঠতে বসতে আর কত শোনাবি! আর এই যে নিকলাই ইলিচ, আমার পতিদেবতাটি, তাঁরও আমি মন পেলাম না! আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু আমার খোকা ইলিউশা। ইস্কুল থেকে আসবে, এসে ঠিক আদর করবে। কাল আমার জন্যে একটা আপেল এনেছিল। ওরে বাছারা আমার, আমায় তোরা ক্ষমা করিস, ক্ষমা করিস তোদের গর্ভধারিণী এই মাকে। কেউ আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। জানি নে, আমার হাওয়া বাতাস কীসে সকলের অমন বিতৃষ্ণার কারণ হল!"

বলতে বলতে বেচারি মহিলা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দুই গাল বেয়ে। ক্যাপ্টেন দ্রুত ছুটে গেল তার কাছে।

"ওগো গিন্নি আমার, হয়েছে, অনেক হয়েছে। কে বলেছে, তোমাকে কেউ দেখতে পারে না? সবাই তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে ভক্তি করে!" সঙ্গে সঙ্গে সে আবারও স্ত্রীর দুহাতে চুমু খেতে লাগল, চোখে মুখে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতে লাগল। ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হঠাৎ তার মুখ থেকে চোখের জল মুছতে শুরু করল। আলিয়োশার এমনও মনে হল তার নিজেরও যেন চোখে জল এসে গেছে।

"দেখলেন তো মশাই, নিজের চোখে দেখলেন ত? শুনলেন তো?" এই বলে বেচারি জড়বুদ্ধি মহিলাটিকে দেখিয়ে আচমকা কেমন যেন ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে সে আলিয়োশার দিকে ফিরে তাকাল।

“দেখছি, দেখছি এবং শুনতেও পাচ্ছি”, আলিয়োশা বিড়বিড় করে বলল।

“বাপি, বাপি, তুমি কি তাই বলে ওর সঙ্গে  ছাড় ত, ওকে ছেড়ে দাও বাপি!” বিছানা থেকে উঠে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

“এবারে আর নয়, অনেক ভাঁড়ামি হয়েছে। ওসব বোকা-বোকা ঢং ছাড়ুন দেখি, ও দেখিয়ে কখনও কোনো কাজ হয় না!” এবারে ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঘরের আরেক কোনা থেকে চেঁচিয়ে উঠল ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌না, এমনকি রাগে মেঝেতে পাও ঠুকল।

“এবারে যে আপনি রাগে মাথা গরম করলেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণে, ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌না। আপনার সন্তুষ্টি বিধানে তাই আমি এতটুকু বিলম্ব করব না। আর কি, মাথার টুপিটা এবারে পরে নিন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমিও এই যে আমার মাথার টুপিটা নিচ্ছি। চলুন, হুজুর, বাইরে চলুন। একটা জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে, তবে সেটা এই চার দেয়ালের মাঝখানে বলা যাবে না। ওই যে মেয়েটি দেখছেন, ওই ওখানে বসে আছে, ওটি হুজুর, আমার আরেক মেয়ে— নিনা নিকলাইয়েভ্‌না। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভুলেই গেছি। মেয়ে আমার সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী  দৈবাৎ আমাদের এই মরণশীলদের মাঝখানে এসে পড়েছে  অবশ্য যদি সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা আপনার থাকে।

“সারা শরীর তো কাঁপছে দেখছি, যেন খিঁচুনি ধরেছে”, বিরক্তির সুরে বলে চলল ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌না।

“আর এই যে যিনি এই মাত্র আমাকে ভাঁড় আখ্যায় ভূষিত করলেন এবং মেঝেতে পা ঠুকে আমাকে এখন দাবড়ানি দিলেন ইনিও সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী, আর আমার ওই নাম যে দিয়েছেন সেটা ন্যায়সঙ্গত কারণেও বটে, হুজুর। চলুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, বিষয়টির একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়, মহাশয়।  ”

এই বলে আলিয়োশার হাত চেপে ধরে হিড়হিড় করে তাকে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে সোজা রাস্তায় এনে ফেলল।

## সাত

## এবং খোলা হাওয়ায়

“বাইরে তাজা হাওয়া, কিন্তু আমার অট্টালিকায় হুজুর আপনি দেখলেনই তো সব একেবারে বাসি—তা সে যে অর্থেই ধরুন না কেন। আসুন হুজুর, একটু আস্তে আস্তে পা চালানো যাক। আপনার আগ্রহ চরিতার্থ করার আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে, হুজুর।”

“আমার নিজেরই একটা জরুরি দরকার আছে আপনার কাছে  ” আলিয়োশা

মন্তব্য করল। ‘‘তবে কথাটা কী ভাবে আরম্ভ করব জানি নে।’’

‘‘আমার কাছে আপনার যে দরকার আছে সেটা আর না বোঝার কী আছে হুজুর? কাজ ছাড়া অমনি অমনি কখনই উঁকি মেরেও দেখতে আসতেন না আমাকে। তাহলে কি সত্যি-সত্যি স্রেফ ছেলেটার নামে নালিশ করতে হুজুরের আগমন? কিন্তু সেটাও তো ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না হুজুর। আর হ্যাঁ, আমার ছেলের কথা যদি বলেন—সেক্ষেত্রে আমি সব কিছু আপনাকে খুলে বলতে পারি নি, কিন্তু হুজুর, এখানে এখন ওই দৃশ্যটির বর্ণনা আপনাকে দিতে পারি। বুঝলেন কিনা, শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া ওরা যেটাকে বলছে—মানে আমার এই দাড়িটা, মাত্র এই হপ্তাখানেক আগেও কিন্তু বেশ ঘন ছিল হুজুর। আসলে আমার এই দাড়িটাকেই ওরা—তাদের বেশির ভাগই স্কুলের ছাত্র—শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া নাম দিয়েছে। তাহলে বলি হুজুর, আমার এই দাড়ি ধরেই সেদিন টেনেছিল আপনার ভাই দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্। দাড়ি ধরে হিড়হিড় করে শুঁড়িখানা থেকে আমাকে একেবারে হাটের মাঝখানে বাজার চত্বরে নিয়ে এলো। ঠিক সেই সময়ই ছেলের দল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, তাদের মধ্যে আমার ছেলে ইলিউশাও ছিল। আমাকে ওই অবস্থায় দেখামাত্র সে ‘বাবা বাবা’ বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসে আমাকে আঁকড়ে ধরল, আমাকে জড়িয়ে ধরে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল; আমার লাঞ্ছনাকারীকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল ‘ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ইনি আমার বাবা, ওঁকে ক্ষমা করে দিন’, হ্যাঁ, ‘ওঁকে ক্ষমা করে দিন’—এই কথাই ছেলেটা বলেছিল চেঁচাতে চেঁচাতে। শিশু তার কচি-কচি দুই হাতে তাকেও আঁকড়ে ধরল, ওই কচি-কচি হাতে তার ওই হাতখানি ধরে তাতে চুমুও খেল, মহাশয়। আমার মনে পড়ে বাচ্চাটার সেই মুহূর্তের কচি মুখখানি, এখনও ভুলিনি হুজুর, কখনও ভুলবও না!

আলিয়োশা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘‘আমি হলফ করে বলছি আমার দাদা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করবে—এমনকি যদি বলেন তো ওই বাজার চত্বরেই আপনার সামনে সর্বসমক্ষে নতজানু হয়ে বসেই তা করবে।... আমি ওকে দিয়ে এটা করিয়ে ছাড়ব, অন্যথায় সে আমার ভাই-ই নয়!’’

‘‘বটে, কিন্তু সেটা তো এখনও একটা পরিকল্পনার পর্যায়ে আছে। এও নয় যে সরাসরি তার কাছ থেকে আসছে। এ আপনার নিজের উদার মনের উচ্ছ্বসিত আবেগের প্রকাশ বৈ আর কিছু নয়। সে কথা বললেই তো হয় হুজুর। না, সেক্ষেত্রে আপনার ভাই তখন অতি উঁচুদরের একজন বীরপুরুষ ও সামরিক অফিসারের উপযুক্ত মহত্ত্বের যে পরিচয় দিয়েছিলেন আপনার আজ্ঞা হলে সে কথা আপনাকে বলি হুজুর। আমার এই শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া মার্কা দাড়ি ধরে টানাটানি ছেড়ে আমাকে রেহাই দিয়ে শেষকালে তিনি এই কথাই বললেন ‘তুমি অফিসার, আমিও অফিসার, পার তো ভালো দেখে ডুয়েলের জন্য একজন সেকেন্ড জোগাড় করে নিয়ে আমাকে ডুয়েল লড়ার আমন্ত্রণ জানিও—তোমার মনের সাধ মেটাব, যদিও

তুমি একটা বজ্জাত!’ এই হল গিয়ে তার কথা, হুজুর। সত্যিকারের একজন বীরপুরুষের মেজাজ আর কাকে বলে! ইলিউশাকে নিয়ে আমি ত তখন সেখান থেকে চলে এলাম, কিন্তু আমাদের পরিবারের বংশপরিচয়ের একটা ছবি হিসেবে দৃশ্যটা আমার ইলিউশার মনের গভীরে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে রইল। না, অভিজাত্যের দাবি করা আমাদের একেবারেই সাজে না হুজুর। তাছাড়া নিজেই বিবেচনা করে দেখুন না কেন, আমার অট্টালিকা থেকে তো এইমাত্র ঘুরে এলেন— কী দেখলেন হুজুর? তিনজন মহিলার অধিষ্ঠান সেখানে—একজনের পা নেই, জড়বুদ্ধি, আরেকজন—তারও পা নেই, সে আবার কুঁজো, আর তৃতীয়জন—তার পা আছে বটে, তবে বড়ো বেশি বুদ্ধিমতী, কলেজের ছাত্রী, আবার পেতের্বুর্গে ফিরে গিয়ে সেখানে নেভানদীর তীরে রুশ নারীর অধিকার সন্ধানের কাজে নামার জন্য বড্ড বেশি ছটফট করছে। ছেলে ইলিউশার কথা না হয় না-ই বললাম। মাত্র নয় বছর বয়স। সংসারে একেবারে একা। আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার এই পুরো অন্দরমহলের দশাটা কী হবে? — আমি শুধু এই কথাটাই আপনাকে জিগ্‌গেস করতে চাই হুজুর। তাই যদি হয় তাহলে ওর কথা শুনে আমি যদি ওকে ডুয়েল লড়তে ডাকি আর ও যদি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খুন করে বসে তাহলে বলুন তো কী হবে ওদের? ওদের কারোই তো তখন থাকার মতো কিছুই থাকছে না, হুজুর। আরও খারাপ হবে যদি ও আমাকে খুন না করে স্রেফ পঙ্গু করে দেয় তখন তো আমার রোজগারপাতি বন্ধ হয়ে যাবে, এদিকে অন্ন গ্রহণের মুখ তো থেকেই যাচ্ছে—কে তখন আমার সেই মুখে অন্ন জোগাবে? কেই বা তখন এদের সকলের মুখে অন্ন জোগাবে? তাহলে কি আমার ইলিউশাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রোজ পথে পথে ভিক্ষে করার জন্য পাঠাতে বলেন? ওকে ডুয়েল লড়তে ডাকার অর্থ এছাড়া আর কী হতে পারে আমার কাছে? অর্থহীন ছাড়া একে আর কী বলব, বলুন হুজুর?’’

আলিয়োশার চোখদুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল, ক্ষোভে চিৎকার করে সে আবার বলে উঠল, ‘‘আমি বলছি ও হাটের মাঝখানে আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে।’’

‘‘আমি ভেবেছিলাম আদালতে ওর নামে মামলা ঠুকব’’ ক্যাপ্টেন বলতে লাগল, ‘‘কিন্তু আমাদের আইনের ধারাগুলো একবার উল্টে পাল্টে দেখুন, ব্যক্তিগত মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি আমার নিগ্রহকারীদের কাছ থেকে কীই বা এমন পেতে পারতাম যাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি? এদিকে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিয়ে বলল, ‘অমন কথা ভুলেও মনে এনো না! ওকে যদি আদালতে টেনে আন তাহলে তোমাকে ভরাডুবি করে ছাড়ব, দুনিয়াসুদ্ধ সকলের সামনে এটা বেরিয়ে পড়বে যে তোমার নিজেরই কুকীর্তির জন্য তুমি ওর কাছে ধোলাই খেয়েছিলে। তখন কিন্তু উল্‌টে তোমারই বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।’ ঈশ্বর সাক্ষী, একমাত্র তিনিই জানেন কুকীর্তিটা আসলে কার, কার হুকুমে

আমার মতো একটা চুনোপুঁটি ও কাজ করেছিল—ওই মহিলা আর আপনার বাবা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ নির্দেশ দিয়েছিল বলেই না করেছিলাম? তার ওপর বলল, 'তাছাড়া এও বলি, তোমাকে একেবারে দূর করে দেব, এবপর কোনও কাজই আর তুমি পাবে না, আমার মহাজনকেও আমি বলে দেব ('আমার মহাজন'—এই নামেই সে তার বুড়োকে ডাকে কিনা), সেও তোমাকে খেদিয়ে দেবে।' তাইতেই না আমি ভেবে দেখলাম মহাজনও যদি আমাকে খেদিয়ে দেয় তাহলে আমি রোজগারের জন্য কার দ্বারস্থ হব? কেন না কাজ দেবার লোক বলতে তো মাত্র ওরা দুজনই আছে, যেহেতু আপনার পিতাঠাকুর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ তো আমার ওপর বিশ্বাস করা ছেড়েই দিয়েছে—সেটা অবশ্য একেবারে অন্য একটা কারণে—এছাড়া আমার সই করা কয়েকটি কাগজের জোরে নিজেও আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার তালে আছে। এই সব নানা কারণে চেপে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো গতি রইল না, হুজুর। আমার অন্দর মহলের অবস্থাটা তো আপনি স্বচক্ষেই দেখলেন। এবারে আপনার আজ্ঞা হয় তো একটি কথা জিগ্‌গেস করি আপনার ওই আঙুলটা কি ও—মানে আমাদের ইলিউশা—কি খুব জোরে কামড়েছিল? আমার ওই অট্টালিকার ভেতরে ওর উপস্থিতিতে এই বিষয়ের খুঁটিনাটিতে ঢোকার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

"খুব জোরেই কামড়েছিল বটে, একেবারে তিরিক্ষি হয়ে ছিল। আমি কারামাজভ্ বলে আপনার হয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। এটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার। কিন্তু স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে যেভাবে ঢিল ছোড়াছুড়ি করছিল তা যদি দেখতেন! খুবই বিপজ্জনক। ওরা ওকে মেরেও ফেলতে পারে। বাচ্চা ছেলেপুলে, ওদের কি আর বোধবুদ্ধি আছে? এভাবে ঢিল ছুড়লে তো হঠাৎ লেগে গেলে কারুর মাথাও ফাটতে পারে।"

"ঠিক, লেগেও ছিল বটে, হুজুর; তবে মাথায় নয়, একেবারে বুকে, হৃৎপিণ্ডের খানিকটা ওপরে। আজই লেগেছিল ঢিলটা। কালশিটে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বাড়ি ফিরেছে, এখন এই তো অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে।"

"জানেন, ও-ই কিন্তু প্রথম সকলের ওপর হামলা করে। আপনার কথা ভেবে ওদের সকলের ওপর ওর রাগ। ওরা বলছে ও নাকি এই কিছুদিন আগে ক্রাসোত্‌কিন নামে একটা ছেলের পাঁজরায় পেন্সিলকাটা ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল।

"এ কথাও শুনেছি। বিপদের কথা, ছেলেটার বাবা আবার এখানকার একজন সরকারি আমলা। এই নিয়ে ঝঞ্ঝাট না বেধে যায়।

আলিয়োশা উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, "আমার পরামর্শ যদি শোনেন তাহলে আপাতত যতদিন না রাগ পড়ে গিয়ে ওর মাথাটা ঠান্ডা হয়ে আসছে ততদিন স্কুলে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিন।

"রাগ! তা আর কী বলব হুজুর!" আলিয়োশার কথার খেই ধরে ক্যাপ্টেন

বলল। "একদম ঠিক কথা বলেছেন। ওইটুকু তো ছেলে, কিন্তু রাগের বহরটা একবার দেখুন! আপনি এর সবটা জানেন না হুজুর। আপনার আজ্ঞা হয় তো এই আখ্যানটা একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলি। ব্যাপারটা এই যে সেই ঘটনার পর থেকে স্কুলের সব ছেলে ওকে শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া বলে খ্যাপাতে শুরু করে দিল। স্কুলের বাচ্চারা এমন যে দয়ামায়া বলে কোনও পদার্থ ওদের মনের মধ্যে নেই। আলাদা আলাদা করে ধরুন—একেকটি যেন সাক্ষাৎ দেবদূত, কিন্তু যেই দলে পড়ল—বিশেষ করে স্কুলে, আর দেখতে হবে না—অনেক সময়ই দারুণ নিষ্ঠুর। ওরা ওকে খ্যাপাতে শুরু করে দিল, আর তাইতে ইলিউশার মধ্যে একটা মহৎ অনুভূতি জেগে উঠল। সাধারণ কোনো ছেলে হলে, বাপের দুর্বল ছেলে হলে হয়ত বাপের এই অপমান নতমস্তকে মেনে নিত, বাপের জন্য লজ্জাবোধ করত, কিন্তু এ ছেলে সে ছেলেই নয়—একাই বাপের পক্ষ নিয়ে সকলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল—বাপের হয়ে, সত্য ও ন্যায়-বিচারের খাতিরে; কারণ ও যখন আপনার ভাইয়ের হাতে চুমু খেতে খেতে 'বাপিকে ক্ষমা করে দিন, বাপিকে ক্ষমা করে দিন' বলে চেঁচাচ্ছিল তখন কী কষ্টটাই যে ও পেয়েছিল সে কেবল আমি জানি আর ঈশ্বরই জানেন। এমনই হল গিয়ে আমাদের বাচ্চারা—অর্থাৎ, আপনাদের নয়, আমাদের—ভদ্রঘরের নিঃস্ব লোকদের—যাদের আপনারা অবহেলা করেন; আমাদের সেই বাচ্চারা কিন্তু পৃথিবীতে সত্যটা যে কী এই নয় বছর বয়স থেকেই জেনে বসে আছে। বড়োলোকেরা এর জানবেটা কী? — জীবনে কখনও তারা অত গভীর অনুসন্ধান চালাতেই পারবে না, কিন্তু আমার ইলিউশা যে মুহূর্তে হাটের মাঝখানে আপনার ভাইয়ের হাতে চুমু খেল ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই দুনিয়ার সার কথাটা সে বুঝে ফেলল। এই বাস্তব সত্য ওর মনের ভেতরে ঢুকে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে রইল", উত্তেজিত হয়ে এবং আবারও কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে এই কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন তার ডান হাতের মুঠো পাকিয়ে বাঁ হাতের তালুতে দুম্ করে একটা ঘুষি মারল—যেন সত্যি সত্যি 'সত্যিটা' কী ভাবে ইলিউশার মনে গাঁথা হয়ে গেল সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইল। "সেই দিনই ছেলেটা জ্বরে পড়ল, সারা রাত জ্বরের ঘোরে ভুল বকল। সে দিন, দিনের বেলায়, সারাটা দিন আমার সঙ্গে কথা খুব কমই বলেছিল, এমন কি একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি লক্ষ করেছিলাম ওর কোনার জায়গাটা থেকে ও ফিরে ফিরে আমার দিকে তাকাচ্ছে, আরও বেশি করে জানলার দিকে ঝুঁকে পড়ছে—ভাবটা এমন যেন পড়া তৈরি করছে, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছিলাম ওসব পড়াটড়া কিছু নয়, ওর মাথার ভেতরে অন্য কিছু ঘুরছে। পর দিন আমি মদ খেলাম, অনেক কথাই তাই আর মনে নেই। পাপী তাপি মানুষ হুজুর, মনের দুঃখেই খেলাম। এদিকে গিন্নিও আমার কেঁদে কেটে সারা। গিন্নিকে তো আমি খুবই ভালোবাসি, তা দুঃখ ভুলে থাকার জন্য শেষ কপর্দকটুকুও ফুঁকে দিলাম। আপনি তাই বলে আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না মাননীয় মহোদয় আমার,:

আমাদের রাশিয়ায় মাতালরাই কিন্তু সবচাইতে ভালো লোক। আমাদের সবচাইতে ভালো লোকেরাই সবচাইতে বেশি মাতাল। তা আমি তো মাতাল হয়ে পড়ে রইলাম, ওই দিন ইলিউশা কোথায় কী করল তেমন একটা মনেও নেই ছাই। কিন্তু ঠিক ওইদিনই ছেলের দল স্কুলে সকাল থেকে ওকে নিয়ে মজা শুরু করে দেয়, সকলে মিলে চেঁচিয়ে ওকে বলতে থাকে 'ওরে আমার শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া তোর বাপকে যখন তার ওই শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া মার্কা দাড়ি ধরে শুঁড়িখানা থেকে টেনে বের করছিল তখন তুই তার পাশে পাশে ছুটতে ছুটতে তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষে করছিলি।' তৃতীয় দিনের দিন যখন সে আবার স্কুল থেকে ফিরে এলো তখন তাকিয়ে দেখি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ওর মুখ দেখে চেনার উপায় নেই। 'হল কী তোর?' আমি জিগ্‌গেস করলাম। কোনও কথা নেই। এদিকে আমাদের অট্টালিকার ভেতরের হালচাল এমনই যে সেখানে কথা বলার কোনো জো নেই—বলা শুরু করেছ কি অমনি গিন্নি আর মেয়েরা সবাই মিলে তাতে যোগ দেবে—তায় আবার মেয়েরা ইতিমধ্যে সব জেনেও গেছে—এমনকি সেই প্রথম দিনই জেনে গেছে। বড়ো মেয়ে ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌না তো এর মধ্যেই গজগজ শুরু করে দিয়েছে: 'যত সব ভাঁড় আর সং এসে জুটেছে—এদের কাছ থেকে আর কত বুদ্ধি আশা করা যেতে পারে? 'তা যা বলেছেন ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌না, আমাদের কাছ থেকে আর কত বুদ্ধি আশা করা যেতে পারে?' এই বলে তো তখনকার মতো পার পাওয়া গেল। যা হোক, সন্ধের দিকে আমি ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বের হলাম। আমাদের দুজনের কিন্তু, আপনার জানা দরকার হুজুর, এর আগে পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোবার অভ্যেস ছিল, বেড়াতাম ঠিক এই পথটা ধরেই যে পথে এই এখন আমি আর আপনি চলছি—আমাদের এই গেটটা থেকে শুরু করে ওই পর্যন্ত—ওই যে পাথরের ওই বিরাট চাঁইটা, যেটা পথের পাশে বেড়ার গায়ে একটা অনাথের মতো পড়ে রয়েছে, যেখান থেকে আমাদের শহরের গোরু ভেড়া চড়ানোর মাঠের শুরু জায়গাটা নির্জন আর চমৎকারও বটে। ইলিউশা আর আমি হাঁটতে হাঁটতে চলেছি, ওর ছোট্ট হাতটা যথারীতি আমার হাতের মুঠোয়। ছোট্ট এতটুকুন ওর হাতটা, হাতের আঙুলগুলো যেমন সরু তেমনি ঠান্ডা—ওর আবার বুকের অসুখ আছে কিনা। 'বাপি, ও বাপি!' ও বলল। 'কী বাবা?' আমি জিগ্‌গেস করলাম। দেখি ওর দু চোখে আগুন জ্বলছে। 'বাপি, লোকটা কিনা তখন তোমাকে নিয়ে অমন কাণ্ড করল!' 'কী আর করা যাবে বাবা?' আমি বললাম। 'ও লোকটার সঙ্গে আপস করতে যেয়ো না বাপি, আপস কোরো না। স্কুলের ছেলেরা বলে কি জান? বলে ও নাকি পরে তোমাকে দশ রুবল দিয়েছে এর জন্যে।' 'না বাবা, টাকা দেয়নি, তাছাড়া ওর কাছ থেকে এখন আমি কোনোমতেই কোনো টাকা নেব না।' একথায় ছেলের আমার সর্বাঙ্গ এমন কেঁপে উঠল না কী বলব! খপ্ করে দু হাতে আমার হাত চেপে ধরে আবার চুমু খেতে শুরু করল। বলল, 'বাপি,

ওকে ডুয়েল লড়তে ডাক বাপি। স্কুলে সবাই আমাকে এই বলে খেপাচ্ছে যে তুমি নাকি ভীতু লোকটাকে ডুয়েলে ডাকছ না, আর ওর কাছ থেকে দশ রুবল পেলে নাকি ঠিকই নেবে।' 'না বাবা, ওকে ডুয়েল লড়তে ডাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়', উত্তরে এই কথা শুনে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছুক্ষণ আগে যা যা বলেছি সে সবই সংক্ষেপে ওকে বললাম। সব শোনার পর ও বলল, 'বাপি তাহলেও আপস কোরো না কিন্তু বাপি। বড়ো হয়ে আমি নিজেই ওকে ডুয়েল লড়তে ডাকব, ওকে খুন করব।' ওর খুদে খুদে দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল, সেখানে ক্রোধের আগুন। কিন্তু হাজার হোক আমি ওর বাপ, তাই কিছু সত্য কথা ওকে আমার বলা উচিত। আমি ওকে বললাম, 'কাউকে খুন করা পাপ—তা সে ডুয়েলে হলেও।' ও বলল, 'বাপি, তাহলে আমি যখন বড়ো হব তখন আমার তলোয়ারের ঘায়ে ওকে মাটিতে ফেলে দেব, ওর হাতের তলোয়ার খসিয়ে নেব, ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মাথার ওপর আমার তলোয়ার ঘুরিয়ে ওকে বলব তোকে এক্ষুনি মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু যা, তোকে ক্ষমা করে দিলাম!' দেখছেন মাননীয় মহোদয়, দেখেছেন তো এই দুটো দিন ধরে ছেলেটার ছোট্ট মাথাটার মধ্যে কেমন জট পাকিয়েছিল। দিনরাত তলোয়ার দিয়ে এই প্রতিহিংসা নেবার কথাই ভাবছিল, আর রাতের বেলায় সম্ভবত এই নিয়েই প্রলাপ বকছিল। তবে ও যে বেদম মার খেয়ে খেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে এটা আমি মাত্র গত পরশুদিন জানতে পারলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর, এই স্কুলে আর আমি ওকে পাঠাব না। আমি যখন জানতে পারলাম ক্লাসের সমস্ত ছেলের বিরুদ্ধে ও একা লড়ে, নিজেই সবাইকে লড়তে ডাকে, রাগে তিক্ততায় ওর বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে তখন ওর কথা ভেবে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আবার সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। আমাকে জিগ্‌গেস করল, 'আচ্ছা বাপি, যারা বড়োলোক পৃথিবীতে তাদের জোর আর সবার চাইতে বেশি তাই নয়?' আমি বললাম 'হ্যাঁ বাবা, পৃথিবীতে বড়োলোকদের চেয়ে বেশি জোর আর কারও নেই।' বলল, 'বাপি আমি বড়োলোক হব, আমি অফিসার হব, সব্বাইকে হারিয়ে দেব, জার আমায় পুরস্কার দেবেন, আমি এখানে ফিরে আসব, তখন কিন্তু কারও সাহস হবে না '' তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার যখন কথা শুরু করল তখনও ওর ঠোঁটদুটো আগের মতো থরথর করে কাঁপছে। বলল, 'কী বাজেই না আমাদের এই শহরটা বাপি।' 'হ্যাঁ বাবা ইলিউশা, তেমন একটা সুবিধের নয় আমাদের এই শহরটা।' উত্তরে বলল, 'চল বাপি আমরা ভালো দেখে অন্য কোনো একটা শহরে চলে যাই, যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।' আমি বললাম, 'যাব, যাব, নিশ্চয়ই যাব, তবে আগে একটু টাকা কামিয়ে নিই।' বিষণ্ণ চিন্তা থেকে ওর মনটা সরাতে পেরে মনে মনে খুশিই হলাম। কী ভাবে বাস উঠিয়ে অন্য শহরে যাব দুজনে মিলে তার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম 'আমরা একটা ঘোড়া কিনব, আমাদের নিজেদের ঘোড়া

হবে, মালটানার গাড়িও হবে একটা। তোর মাকে আর বোনদের সেই গাড়িতেই ঢাকাঢুকি দিয়ে বসিয়ে দেব, আমরা নিজেরা পাশে পাশে হাঁটব, মাঝে মধ্যে তোকে বসতে দিলেও আমি নিজে কিন্তু পাশে পাশেই হাঁটব, কেননা ঘোড়াটারও যত্ন নেওয়া দরকার, সবাই বসলে চলবে কী করে? এমনি ভাবে আমরা চলে যাব এখান থেকে। এই শুনে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, বিশেষত এই ভেবে যে ওর নিজের একটা ঘোড়া হবে আর ও নিজে সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। আর তা হবেই বা না কেন? এটা তো জানা কথা যে রুশি ছেলে ঘোড়া নিয়েই জন্মায়। আমরা অনেকক্ষণ ধরে বকবক করলাম, আমি ভাবলাম যাক বাঁচা গেল, ওর মনটাকে আমি বাজে চিন্তা থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি, ওকে শান্ত করতে পেরেছি। এ হল পরশু বিকেলের কথা, কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা সব কিছু বদলে গেল। সকালে আবার যথারীতি ওই স্কুলেই গেল, ফিরে যখন এলো তখন দেখি মনমরা, ভীষণ মনমরা। সন্ধ্যাবেলায় ওর হাত ধরে আবার বেড়াতে নিয়ে গেলাম। চুপচাপ, কোনো কথা বলে না। একটু একটু হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন, সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে, আকাশে বাতাসে শরতের আভাস, গোধূলি ঘনিয়ে আসছে। দুজনে হাঁটতে লাগলাম, দুজনেরই মন ভার। ভাবলাম আমাদের গতকালের কথাটাই আবার পাড়ি। তাই বললাম, 'হ্যাঁ রে খোকা, আমরা পথে নামার জন্যে কী করে তৈরি হব বল তো?' কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না, কেবল টের পেলাম আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ওর হাতের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। বুঝলাম, গতিক খারাপ, নতুন একটা কিছু ঘটেছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলাম, এই এখন যেমন এসেছি, ঠিক এই পাথরটারই কাছে। আমি পাথরটার ওপর বসলাম। আকাশে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুড়ি উড়ছে, ঝটপট করছে, গুনগুন আওয়াজ তুলছে, গোটা তিরিশেক তো চোখেই পড়ছে। ঘুড়ি ওড়ানোর মরশুমই তো এটা। আমি বললাম 'ওরে ইলিউশা এই তো সময়, গত বছরের ঘুড়িটা বার করিস তো। আমাদেরও ঘুড়ি ওড়াতে হয় রে এইবার। একটু আধটু সারিয়ে নেব 'খন। কোথায় সরিয়ে রেখেছিস ওটা?' ছেলে আমার কোনো কথা বলে না। আমার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় আচমকা একটা দমকা হাওয়া গুঞ্জন তুলে বালি উড়িয়ে নিয়ে এলো।... সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ছুটে এসে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ছোটো ছোটো দুই হাতে আমার গলা জাপটে ধরল । জানেন যে সব বাচ্চা চুপচাপ আর অহংকারী ধরনের তারা অনেকক্ষণ চোখের জল ভেতরে চেপে রাখতে পারে, কিন্তু বড়ো রকমের দুঃখ পেলে হঠাৎ যখন তাদের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ে তখন তা হু হু করে স্রোতধারার মতো ঝরতে থাকে। ওর চোখের জলের সেই উষ্ণ ধারায় হঠাৎই সারা মুখ ভেসে গেল আমার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, দমকে দমকে এমন ভাবে কেঁপে ওঠে যেন খিঁচুনি ধরেছে, আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে। আমি পাথরের ওপর বসে থাকি। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে 'বাবা

গো, বাবা, লোকটা তোমাকে কী অপমানই না করল!’ সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। আমরা দুজনে জড়াজড়ি করে বসে থাকি, ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকি। ‘বাবা, বাবা গো।’ ছেলে কাঁদে। ‘ইলিউশা, খোকা আমার, ওরে ‘ইলিউশা!’ বলতে বলতে আমিও কাঁদি। সে দৃশ্য তখন কারও চোখে পড়ে নি হুজুর, একমাত্র ঈশ্বরই দেখেছেন। হয়তো এর জন্য তাঁর খাতায় আমার নাম তুলে রাখবেন হুজুর। এসবের জন্য আপনার ভাইকে ধন্যবাদ দেবেন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। না হুজুর, আমার ছেলেকে ঠেঙিয়ে আমি আপনার মনস্তুষ্টি করতে যাচ্ছি না হুজুর।”

লোকটা আবারও যথারীতি তার আগেকার সেই খ্যাপাটে ও খাপছাড়া ভাব ভঙ্গি করে রুক্ষস্বরে তার কথা শেষ করল বটে, কিন্তু আলিয়োশা অনুভব করতে পারল যে সে তাকে বিশ্বাস করছে এবং এবং এখন আলিয়োশার জায়গায় যদি আর কেউ থাকত তাহলে এই লোকটা তার সঙ্গে এমন ভাবে ‘কথাবার্তা’ বলত না, আলিয়োশাকে এখন যে সমস্ত তথ্য জানাল সেগুলিও জানাত না। আলিয়োশা এতে উৎসাহিত বোধ করল। তারও বুকের ভেতরটা এমন ভাবে মোচড় দিয়ে উঠেছিল যে চোখে জল এসে গিয়েছিল।

“আহা আপনার ছেলের সঙ্গে যদি আমি ভাব করতে পারতাম!” আলিয়োশা রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল। “আপনি যদি একবার সে ব্যবস্থা করে দিতেন।

“হুঁ, তা যা বলেছেন হুজুর”, বিড়বিড় করে বলল ক্যাপ্টেন।

“কিন্তু এবারে যা বলছি তা অন্য কথা, একেবারেই অন্য কথা, কথাটা শুনুন...”, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আলিয়োশা বলতে লাগল, “শুনুন! আমি একটা কাজের ভার নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। এই যে আমার দাদাটি, এই দ্‌মিত্রি, সে তার বাগ্‌দত্তাকেও অপমান করেছে। মেয়েটি খুব বড়ো মনের, তার কথা আপনি হয়তো শুনেও থাকবেন। সে যে কী ভাবে অপমানিত হয়েছে সে কথা আপনার কাছে খুলে বলার অধিকার আমার আছে, এমনকি সেটা বলা উচিত বলেও আমি মনে করি, কেন না আপনার লাঞ্ছনার কথা জানতে পেরে এবং আপনার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা সম্পর্কে সব কিছু জানার পর সে এখন, এই আজকেই তার কাছ থেকে এই সাহায্য আপনাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে কিন্তু সে সাহায্য একান্তভাবে তার কাছ থেকে একমাত্র তার কাছ থেকে তাকে যে ছেড়ে চলে গেছে সেই দ্‌মিত্রির কাছ থেকে নয়, একেবারেই নয়, দ্‌মিত্রির ভাই আমার কাছ থেকেও নয়—অন্য কারও কাছ থেকেও নয়—তার কাছ থেকে, একমাত্র তারই কাছ থেকে! তার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি যেন তার এই সাহায্য গ্রহণ করেন। আপনারা দুজনেই একজনের হাতে অপমানিত হয়েছেন। আপনার কথা কেবল তখনই তার মনে পড়ল যখন আপনার মতো তাকেও ওর কাছ থেকে একই রকম তীব্র অপমানের জ্বালা সহ্য করতে হল! অর্থটা এই যে বোন তার ভাইকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। আমাকে সে এই দায়িত্ব দিয়েই পাঠিয়েছে যে বোনের কাছ

থেকে সাহায্য হিসেবে এই যে এই দু'শটি রুবল তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে আমি যেন আপনাকে বলে কয়ে রাজি করাই। এ কথা কেউ জানতে পারবে না, কোনও অন্যায় গালগল্পের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা নেই এ থেকে। এই যে রইল এই দু'শ' রুবল। আমি দিব্যি করে বলছি এটা আপনাকে নিতেই হবে, যদি না নেন না হলে ধরে নিতে হবে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই সবাইয়ের শত্রু। কিন্তু পৃথিবীতে ভাইবন্ধুও আছে। আপনি বড়ো মনের মানুষ, আপনি যদি এটা না বোঝেন তো কে বুঝবে!

এই বলে রামধনু রঙের দুটো ঝকঝকে নতুন একশ রুবলের নোট আলিয়োশা ক্যাপ্টেনের সামনে ধরল। ওরা দুজনে তখন বেড়ার ধারে ওই মস্ত পাথরটার কাছেই দাঁড়িয়ে, কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। ব্যাঙ্ক নোট দুটি ক্যাপ্টেনের মনে যেন বিভীষিকা সঞ্চার করল সে চমকে উঠেছিল, কিন্তু গোড়ায় এটা ছিল স্রেফ একটা আশ্চর্যের বিষয়, এমনই একটা ঘটনা যা সে কখনও কল্পনাই করতে পারে নি, ঘটনার এরকম পরিণতি তার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। কারও কাছ থেকে সাহায্য, তাও আবার এতগুলো টাকার সাহায্য—এটা ছিল তার স্বপ্নেরও অতীত। টাকাগুলো হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত উত্তরে কোনো কথাই প্রায় সে বলতে পারল না, একেবারে নতুন ধরনের একটা ভাব ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

"আমাকে? বলছেন কী মহাশয়! এতগুলো টাকা—দু'শ রুবল! কী কাণ্ড! হা ভগবান, গত চার বছরের মধ্যে এতগুলো টাকা আমি একসঙ্গে চোখে দেখিনি! বলছেন কিনা উনি আমার বোন! এটা কি সত্যি? সত্যি বলছেন?"

"আমি দিব্যি করে বলছি যা যা আপনাকে বললাম সব সত্যি!" আলিয়োশা চিৎকার করে বলল। ক্যাপ্টেন লাল হয়ে উঠল।

"শুনুন বন্ধু আমার, শুনুন, এই টাকা যদি আমি নিই তা হলে কি ছোটোলোকের কাজ হবে না? আপনার চোখে কি আমি ছোটো হয়ে যাব না, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ? ছোটো হয়ে যাব না কি? না, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, ভালো করে শুনুন হুজুর, ভালো করে শুনুন", দু হাতে বারবার আলিয়োশাকে স্পর্শ করতে করতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে বলতে লাগল, "আপনি অনেক করে বলছেন বটে 'বোন' পাঠিয়েছে বলে এটা আমার নেওয়া উচিত, কিন্তু এই দানকে যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে সত্যি করে বলুন তো হুজুর, ভেতরে ভেতরে, মনে মনে আমাকে তাচ্ছিল্য করবেন না তো, অ্যাঁ?"

"না, না, তা কেন করতে যাব! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, আমি শপথ করে বলছি, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়! তাছাড়া কেউ কখনও একথা জানবে না। জানার মধ্যে জানবে শুধু আমি, আপনি আর সে, আর হ্যাঁ, আরও একজন মহিলা— তার বড়ো বন্ধু "

"বাদ দিন মহিলার কথা! শুনুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, শুনুন হুজুর, এখন

এমনই একটা মুহূর্ত এসেছে যে এখন সব কথা আপনার ভালোভাবে শোনা দরকার, নইলে এই দুশ রুবলের অর্থ যে আমার কাছে এখন কী হতে পারে তা আপনার ধারণাতেই আসবে না", বলতে বলতে ধীরে ধীরে এক ধরনের উদ্দাম আনন্দের উত্তেজনায় কেমন যেন এলোমেলো হয়ে উঠল তার ভাষা। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল বেচারির বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে! অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে এত তাড়াতাড়ি কথা বলে যেতে লাগল যেন তার আশঙ্কা হচ্ছিল পাছে তাকে সব কথা বলতে দেওয়া না হয়। "এই টাকা আমি আমার পরম পুজনীয়, পুণ্যবতী 'বোনের' কাছ থেকে সৎপথে অর্জন করেছি, কিন্তু এ ছাড়াও জানেন কি হুজুর, এ দিয়ে আমি এখন আমার গিন্নির আর স্বর্গের দেবীর মতো আমার বড়ো আদরের কুঁজি মেয়েটির—আমার নিনার চিকিৎসা করাতে পারি? আমার ওপর দয়া করে ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে তাঁর হৃদয়ের উদারতাবশত একবার আমার কাছে এসেছিলেন—ওদের দুজনকেই ঝাড়া এক ঘণ্টা পরীক্ষা করে দেখার পর বলেছিলেন 'নাঃ কিছুই বুঝতে পারছি না।' তবে আমার স্ত্রীর জন্য তিনি এক ধরনের খনিজ জল খাবার নির্দেশ লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন যা স্থানীয় ওষুধের দোকানে পাওয়াও যায় বটে। বলেছিলেন এতে নিঃসন্দেহে তার উপকার হবে; তাছাড়া গরমজলে একটা ওষুধ ফেলে সেই জলে পা ডুবিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। খনিজ জলের দাম তিরিশ কোপেক, কিন্তু তা হলে কী হবে, খেতে হবে হয়তো চল্লিশ কলসি। তাই ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রটা নিয়ে শেল্‌ফের মাথায় বিগ্রহের তলায় রেখে দিয়েছি, যেমনকার তেমন ওখানেই পড়ে আছে। আর আমার নিনার জন্য লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন গরমজলে ওই রকমই তরল একটা ওষুধ ফেলে দিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যায় সেই জলে স্নান করতে। কিন্তু অমন চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা কোথা থেকে করি বলুন দেখি হুজুর? আমাদের অট্টালিকার হালচাল দেখেইছেন—ঝি চাকরের কোনো বালাই নেই, কোনো সাহায্য নেই, না আছে কোনো জলের টব, না কোনো জলের ব্যবস্থা। এদিকে নিনার আবার সর্বাঙ্গে বাত—একথা আমি আপনাকে এখনও বলিনি—সারারাত বাতের যন্ত্রণায় ওর শরীরের সমস্ত ডান দিকটা কনকন করে, দারুণ কষ্ট পায়; বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না স্বর্গের দেবীর মতো মা আমার দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে পাছে আমরা ওর অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়ি, এতটুকু কাতরায় না পাছে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনও বাছবিচার নেই, আমরা যা পাই তা-ই খাই, কিন্তু ওরই মধ্যে আমাদের খাবার পর যেটুকু পড়ে থাকে তাই ও মুখে তোলে— সে খাবার দিতে গেলে শুধু কুকুরকেই দেওয়া যায়। ভাবটা এই যে 'এটা আমার প্রাপ্য নয়, আমি তোমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিচ্ছি, তোমাদের বোঝা হয়ে আছি।' স্বর্গের দেবীর মতো তার মধুর দৃষ্টিতে যেন এই কথাই ঝরে পড়ছে। আমরা ওর সেবাযত্ন করি, কিন্তু সেটা ওর কাছে অসহ্য, ভাবে 'এটা আমার প্রাপ্য নয়, একেবারেই প্রাপ্য নয়, আমি এর যোগ্য নই, আমি

পঙ্গু, আমি অথর্ব, অকর্মণ্য।' যোগ্য না বললেই হল আর কি? ওর ওই স্বর্গীয় নম্রতা দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এত এত করে প্রার্থনা করেই না ও আমাদের উদ্ধার করেছে? ওকে ছাড়া, ওর এই নরম কথাগুলো ছাড়া আমাদের বাড়িটা তো একটা নরক হয়ে দাঁড়াত হুজুর! আমাদের ভার্‌ভারা পর্যন্ত নরম হয়ে যায় ওর এক কথায়। কিন্তু ভারভারার নিন্দে করাটাও ঠিক নয় তাই বলে, ভার্‌ভারা নিকলাইয়েভ্‌নাও আমার স্বর্গের দেবী—সেও কম আঘাত পায় নি। গ্রীষ্মকালে যখন আমাদের কাছে এলো তখন সঙ্গে ছিল ষোল রুবল—পড়িয়ে রোজগার করা টাকা; সে টাকা সে আলাদা করে রেখেছিল ওই দিয়ে এই সেপ্টেম্বরে, মানে এখন পেতের্বুর্গে ফিরে যাবে বলে। কিন্তু ওই টাকা আমরা খেয়ে বসে আছি, ফলে এখন ওর আর ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। এই তো অবস্থা হুজুর। তা ছাড়া ফিরে যাবেই বা কী করে?—আমাদের সংসারে খাটতে খাটতেই তো হাড় কালি হয়ে গেল — আমরা ওকে সংসারে হালে জুতে সমানে হাঁকিয়ে চলেছি, বেহাল ঘোড়ার মতো অবস্থা করে ছেড়েছি ওর বাড়ির সকলের দেখাশোনা করে, সারাইয়ের কাজ করে, বাসন মাজে ঝাঁট দেয়, মাকে বিছানায় শোয়ায়—আর মা'টি কেমন খামখেয়ালি তা তো দেখলেনই হুজুর—কথায় কথায় কাঁদে, মাথাটাই তো খারাপ হুজুর! তাহলে বুঝুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, এখন এই দুশ রুবলে আমি একটা কাজের লোক রাখতে পারি, আমার পরম স্নেহের এই মানুষগুলোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি, ছাত্রীটিকে আবার পেতের্বুর্গে পাঠাতে পারব, মাংস কিনব, ভালোমতো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করব। ঈশ্বর, এ যে স্বপ্ন!"

হতভাগ্য লোকটি যে সুখী হতে রাজি হয়েছে এবং তাকে সে এমন সুখী করতে পেরেছে এই ভেবে আলিয়োশার দারুণ আনন্দ হল।

এমন সময় হঠাৎই আবার এক নতুন দিবাস্বপ্ন পেয়ে বসল ক্যাপ্টেনকে। "দাঁড়ান আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, দাঁড়ান!" খ্যাপার মতো তড়বড়িয়ে উঠে কথার পিঠে কথা সামলাতে না পেরে দ্রুত উচ্চারণে সে বলতে শুরু করল "হ্যাঁ, বলেছিলাম কি, জানেন, আমার খোকা ইলিউশার সঙ্গে মিলে আমি যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম এবারে সম্ভবত তাও দিব্যি সার্থক করতে পারব। একটা ঘোড়া কিনব, ছোটোখাটো একটা গাড়ি কিনব, ঘোড়াটা হবে কালো কুচকুচে, ছেলেটা বলেছিল বটে যে অবশ্যই কালো কুচকুচে হওয়া চাই—তারপর আমাদের গত পরশুদিনের কল্পনামতো আমরা যাত্রা করব। ক প্রদেশে আমার এক জানাশোনা উকিল আছে, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, হুজুর। একজন বিশ্বস্ত লোক মারফত জানিয়েছে যে আমি এলে তার অফিসে একটা মুহুরির কাজ জোগাড় করে দিলেও দিতে পারে—কে বলতে পারে বাপু, হয়তো দিতেও পারে। তা গিন্নিকে গাড়িতে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে, নিনাকেও বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে, আর ইলিউশাকে বসিয়ে দেব গাড়ি চালাতে; আমি হাঁটি-হাঁটি পা করে সঙ্গে সঙ্গে চলব—এই ভাবে সবাইকে নিয়ে যাব — মহাশয়।

আহা, আমার যে পাওনা টাকাটা এখানে মাঠে মারা যেতে বসেছে সেটাও যদি পাওয়া যেত তাহলে হয়তো এরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কী বলেন হুজুর?"

"হবে হবে, সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে!" আলিয়োশা উল্লসিত হয়ে বলল। "দরকার হলে কাতেরিনা ইভানভ্‌না আপনাকে আরও পাঠাবে। তাছাড়া জানেন, আমারও কিছু টাকা আছে, নিন না আপনার যা লাগে—মনে করুন ভাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছেন, একজন বন্ধুর কাছ থেকে নিচ্ছেন, পরে না হয় শোধ করে দেবেন। আপনি বড়োলোক হবেন, ঠিকই বড়োলোক হবেন! জানেন এখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে অন্য প্রদেশে চলে যাবার যে কথা আপনি ভেবেছেন এর চেয়ে ভালো কিছু আপনি কখনও ভাবতেও পারতেন না! এটাই আপনার উদ্ধারের রাস্তা — বড়ো কথা, আপনার ছেলের জন্য। জানেন, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তত ভালো, শীতের আগে, ঠান্ডা পড়ার আগেই চলে যান, গিয়ে ওখান থেকে আমাদের চিঠি লিখবেন, আমরা এই যে ভাইয়ের সম্পর্ক পাতালাম তাও থেকে যাবে। না না এটা স্বপ্ন নয়!"

আলিয়োশার এত ভালো লাগছিল যে তার মনে হচ্ছিল এক্ষুনি ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আলিয়োশা থমকে দাঁড়াল। লোকটা ঘাড় লম্বা করে, ঠোঁটজোড়া সামনের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাণ্ডুর মুখে ফুটে উঠেছে একটা ক্ষিপ্ত ভাব। ঠোঁটদুটো নাড়িয়ে সে চাপা গলায় কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছে না। নিঃশব্দে ক্রমাগত ঠোঁট নাড়িয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে।

"কী হল!" হঠাৎ কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পেরে চমকে উঠল আলিয়োশা।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ আমি আপনি " স্খলিতকণ্ঠে বিড়বিড় করতে করতে ক্যাপ্টেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো অদ্ভুতভাবে একদৃষ্টে আলিয়োশার দিকে তাকাল। তার চাহনি দেখে মনে হল সে যেন পাহাড়ের মাথা থেকে অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বদ্ধপরিকর; সেই সঙ্গে তার ঠোঁটেও যেন ফুটে উঠল একটা বাঁকা হাসি। "আমি, হুজুর, মানে আপনাকে হুজুর বলেন তো আপনাকে এখনই ছোটোখাটো একটা ভেল্‌কি দেখাই!" আচমকা দ্রুত ও দৃঢ় হয়ে উঠল তার চাপা কণ্ঠের উচ্চারণ, এখন আর সেখানে কোনো জড়তা নেই।

"একটা ছোটোখাটো ভেলকি, মজার খেলা ভেল্‌কিবাজি", ক্যাপ্টেন তখনও ফিসফিস করে বলে চলেছে। তার মুখের বাঁ দিকটা বেঁকে গেছে, বাঁ চোখটা কুঁচকে গেছে। আলিয়োশার ওপর থেকে দৃষ্টি এতটুকু না সরিয়ে এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল যেন তার চোখদুটো আলিয়োশার মুখের ওপর গেঁথে গেছে।

"কী বলছেন কী? কীসের ভেল্‌কি?" এবারে একেবারেই ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল আলিয়োশা।

"তাহলে এই দেখুন, একবার তাকিয়ে দেখুন!" ক্যাপ্টেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল।

যতক্ষণ ওদের দুজনের এই কথোপকথন চলছিল তার মধ্যে ক্যাপ্টেন সর্বক্ষণ রামধনু রঙা ব্যাঙ্কনোটদুটোর কোণা একসঙ্গে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে চেপে ধরে রেখেছিল। এবারে হঠাৎই কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে সেদুটো খপ্ করে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে শক্ত করে চেপে দলা পাকাতে লাগল।

"দেখলেন, দেখলেন হুজুর!" পাণ্ডুর হয়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে আলিয়োশার উদ্দেশে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে এই কথা বলতে বলতে হাতের পাকানো মুঠোটা ঝট করে মাথার ওপর তুলল, পরক্ষণেই দলা পাকানো দুটো ব্যাঙ্ক নোটই সজোরে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। "দেখলেন তাহলে হুজুর। এই হল ওগুলোর গতি! আঙুল দিয়ে নোটগুলি দেখিয়ে সে আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর চকিতে ডান পা'টা তুলে উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে নোট দুটো মাড়াতে শুরু করে দিল। প্রতিবার পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত চিৎকারে তার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

"এই রইল আপনার টাকা! এই রইল আপনার টাকা! এই রইল হুজুর, আপনার টাকা!" বলতে বলতে এক ঝটকায় পিছিয়ে গিয়ে আলিয়োশার মুখোমুখি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠল যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

"যারা আপনাকে পাঠিয়েছে তাদের বলবেন ধুঁদুল-দাড়ি তার সম্মান বিক্রি করে না, হুজুর!" আকাশের দিকে হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে সে বলল। তারপর দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উলটো দিকে ছুটতে শুরু করল, কিন্তু পাঁচ পা মতন ছুটে যেতে না যেতে বোঁ করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আলিয়োশার উদ্দেশে হাত নাড়াল। এর পর আবারও আরও চার পাঁচ পা ছুটে যাবার পর ফিরে তাকাল—এবারে অবশ্য শেষবারের মতো—কিন্তু এবারে তার মুখে আর সেই বাঁকা হাসিটা নেই, তার বদলে সারা মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে ধরা গলায় বিষম খেতে খেতে দ্রুত উচ্চারণে চিৎকার করে সে বলল:

"আমাদের এই লজ্জার বিনিময়ে যদি আপনাদের কাছে থেকে টাকা নিই তবে ছেলেটাকে আমি কী বলব বলুন তো?"

শেষ বারের মতো এই কথা উচ্চারণ করে লোকটা আবার দৌড়ুতে শুরু করল। এবারে কিন্তু আর পিছু ফিরে তাকাল না। এক অবর্ণনীয় বিষাদে ভরে গেল আলিয়োশার মনটা, ক্যাপ্টেনের অপস্রিয়মাণ মূর্তিটির দিকে সে তাকিয়ে রইল। আলিয়াশা বুঝতে পারছিল যে লোকটা একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেও জানত না যে ব্যাঙ্ক নোটগুলো ওরকম দলা পাকিয়ে পাক মেরে ফেলে দেবে। দৌড়ুতে

দৌড়ুতে একবারও পিছু ফিরে তাকাল না, আলিয়োশা জানত যে তাকাবেও না। পিছু ধাওয়া করে তাকে ডাকতে যাবার কোনো ইচ্ছে আলিয়োশার হল না—কেন, তা আলিয়োশা জানে। লোকটা চোখের আড়াল হয়ে যেতে আলিয়োশা মাটি থেকে নোট দুটি তুলল। দুমড়ে মুচড়ে ডেলা পাকিয়ে ধুলোবালির মধ্যে একেবারে চেপ্টে আছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষতই আছে, এমনকি আলিয়োশা যখন নোটদুটো খুলে হাতের তালু দিয়ে সমান করতে লাগল, তখন দেখা গেল আনকোড়া নোটের মতোই কড়কড় করছে। নোটদুটো পাট করার পর ভাঁজ করে পকেটে পুরে সে চলল কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে যে কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছিল তাতে কতদূর সফল হয়েছে সে বিবরণ তাকে দিতে হবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## পক্ষ-প্রতিপক্ষ

### এক

### বাগ্দান

এবারেও মাদাম খখ্লাকোভাই প্রথম দেখা করল আলিয়োশার সঙ্গে। ভদ্রমহিলা তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল। গুরুতর একটা ঘটনা ঘটে গেছে কাতেরিনা ইভানভ্নার মানসিক অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত মূর্ছায় গড়িয়েছে, এর পর দেখা দিয়েছে 'ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক দুর্বলতা। এখন চোখ উলটে পড়ে আছে, ভুল বকছে। জ্বর আছে। ডাক্তার হের্‌ৎসেন্‌শ্টুবেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, দুই মাসিকেও ডাকা হয়েছে। মাসিরা ইতিমধ্যে এসেও গেছে, কিন্তু হের্‌ৎসেন্‌শ্টুবের এখনও দেখা নেই। সকলে বসে আছে ওর ঘরে, অপেক্ষা করে আছে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এখনও সংজ্ঞাহীন। বলা তো যায় না, যদি এ জ্বর মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়!

উত্তেজিত ভাবে এসব কথা বলার সময় মাদাম খখ্লাকোভাকে রীতিমতো শঙ্কিত দেখাচ্ছিল। 'ব্যাপারটা গুরুতর, বড়োই গুরুতর।' বলতে গেলে প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে যোগ করতে লাগল যে দেখে মনে হল এর আগে যা যা ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল সেগুলির কোনো গুরুত্বই ছিল না। আলিয়োশা মহিলাকে তার নিজের অভিযানের বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আলিয়োশার প্রথম কথাতেই সে তাকে থামিয়ে দিল—ওসব কথা শোনার এখন তার কোনো অবকাশ নেই, বলল বরং সে যেন লিজের কাছে গিয়ে বসে এবং সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করে।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনি আমাদের পরম প্রিয়জন, লিজের কথাটা

আপনাকে বলি”, আলিয়োশার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে মাদাম খখ্‌লাকোভা বলল, “আমাদের লিজে আজ আমায় দারুণ অবাক করে দিয়েছিল, আবার আমার মনটাকে গলিয়েও দিয়েছিল, আর সেই কারণেই তো আমি আমার মন থেকে ওর সব কিছু ক্ষমা না করেও পারি না। ভেবে দেখুন একবার, আপনি তো গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে আমার খোলাখুলি এই বলে আক্ষেপ করতে লাগল যে ও নাকি গতকাল এবং আজও আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। কিন্তু ও তো আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করেনি, স্রেফ ঠাট্টা ইয়ার্কি বৈ তো আর কিছু করেনি। কিন্তু তা হলে কী হবে, ওর আক্ষেপের ধরনটার মধ্যে এতই গুরুত্ব ছিল যে ওর চোখে প্রায় জলই এসে গিয়েছিল, তাইতে আমিও একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এর আগে আমাকে নিয়ে তো কত হাসাহাসি করেছে, কোথায় কখনও তো তাতে অমন গুরুত্ব দেয়নি, তার জন্য হা-হুতাশও করতে দেখিনি, সে সবই ওর কাছে ছিল ঠাট্টা ইয়ার্কির শামিল। অথচ জানেন, ও উঠতে বসতে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু এই এবারেই কেন যেন গুরুত্ব দিচ্ছে, এটার ওপর ওকে গুরুত্ব দিতে দেখছি। আপনার মতামতের মূল্য ওর কাছে অনেক, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, তাই বলছিলাম কি, যদি পারেন তো ওর কথায় মনে কিছু করবেন না, কোনো অপরাধ নেবেন না। আমি নিজেও ওকে বরাবর ক্ষমা করেই আসছি, কেন না ও এতই বুদ্ধিমতী—আপনি বিশ্বাস করেন তো! এই তো আজই আমাকে বলছিল আপনি ওর ছোটোবেলার বন্ধু ছিলেন। ‘আমার ছোটোবেলাকার সব চাইতে বড়ো বন্ধু’—ভাবুন একবার—‘সব চাইতে বড় বন্ধু’—সেখানে আমি আর কে, বলুন? এই ব্যাপারে ওর যা অনুভূতি, এমনকি যে-সমস্ত স্মৃতি ওর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, সেগুলো খুবই গভীর, আর বড়ো কথা এই, যে-কথাগুলো ও বলে, যে-শব্দগুলো ও ব্যবহার করে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত—এমনই যা কোনমতে আশা করা যায় না, কেমন যেন আচমকা মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে! এই যেমন পাইন গাছের কথা বলতে গিয়ে এই কিছু দিন আগে ওর ছোটোবেলার প্রথম আমলের কথা—আমাদের বাগানে একটা পাইন গাছ ছিল—হয়তো বা সেটা এখনও আছে; তাই অতীত কালে বলার অবশ্য কোনো মানে হয় না। পাইনগাছ তো আর মানুষ নয়, খুব তাড়াতাড়ি ওরা বদলায় না, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ। তা মেয়ের আমার ওই গাছটার কথা নাকি মনে আছে, বলে কি ‘মাগো কী যে আছে আমাদের স্বপ্নের পাইনে, খুঁজে আমি পাইনে’—মানে, ‘পাইনে, খুঁজে আমি পাইনে’—এটাই হয়তো একটু অন্য ভাবে ও প্রকাশ করেছিল, কারণ ও জায়গাটা কেমন একটু গোলমেলে ঠেকছে; পাইন একটা অথহীন বাজে কথা, তবে হ্যাঁ এটাই বলতে পারি যে এ প্রসঙ্গে ও এমন কিছু মৌলিক কথা আমাকে বলেছিল যা আমি আপনাকে কোনোমতে বলে বোঝাতে পারব না। তা ছাড়া আমি সব ভুলেও গেছি। আচ্ছা চললাম। আমি একেবারে বিপর্যস্ত, মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে যাবে। ওঃ আলেক্সেই

ফিয়োদরভিচ, জীবনে দুবার আমার মাথা খারাপ হয়েছিল, দুবারই আমার চিকিৎসা হয়েছিল। যান, লিজের কাছে যান, ওকে আনন্দ দিন। এ কাজটা ত আপনি সব সময় চমৎকারভাবে করতে পারেন।" বলতে বলতে দরজার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে সে হাঁক দিল: "লিজে, এই দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি—যাকে তুই এত করে অপমান করেছিস তাকে, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচকে নিয়ে এসেছি। তোর ওপর এতটুকু রাগ করে নি কিন্তু—বিশ্বাস কর; বরং উলটে এই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে যে কী করে তুই অমন ভাবতে পারলি!"

"Merci, maman। ভেতরে আসুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ।"

আলিয়োশা ভেতরে ঢুকল। লিজাকে খানিকটা বিব্রত দেখাচ্ছিল, আলিয়োশাকে দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল কোনো একটা কারণে সে লজ্জায় পড়ে গেছে, আর এক্ষেত্রে সচরাচর লোকে যা করে সেও তাই করল — তড়বড় করে একেবারে অবান্তর এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল যেন এই মুহূর্তে একমাত্র সেগুলিতেই তার আগ্রহ।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, ওই দুশ রুবলের বিষয়ে সমস্ত কথা এবং আপনি যে কাজের ভার নিয়ে ওই গরিব অফিসারটির কাছে গিয়েছিলেন সে সবই মার কাছ থেকে এই এখন জানতে পারলাম আর লোকটিকে যে কী ভাবে অপমান করা হয়েছিল তার ভয়ঙ্কর বিবরণও মা আমাকে দিয়েছে। তবে জানেনই তো মা যে খুব একটা বোঝার মতো করে বলতে পারে তা নয় একটা থেকে আরেকটা বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায় কিন্তু তা হলে কী হবে, ওই শুনতে শুনতেই আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তারপর, কী হল? কেমন করে ওই টাকাগুলো ওকে দিলেন? ওই হতভাগ্য লোকটার অবস্থাটাই বা এখন কী?

"কথাটা তো সেখানেই। টাকাটা দেওয়া যায়নি, আর সে এক পুরো ইতিহাস", আলিয়োশা জবাব দিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার দিক থেকে টাকাটা যে সে দিতে পারেনি ঠিক এই ভেবেই যেন সে বড়ো বেশি উদ্বিগ্ন। কিন্তু লিজা ঠিকই লক্ষ করেছিল যে আলিয়োশাও আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে এবং সেও স্পষ্টতই অবান্তর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করছে।

আলিয়োশা টেবিলের ধারে এসে বসে তার বৃত্তান্ত বলতে শুরু করল। কথার শুরু থেকেই অপ্রস্তুত ভাবটা সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠল, লিজার মনোযোগও আকর্ষণ করতে পারল। আলিয়োশার কথার মধ্যে কিছু আগেকার এত বড়ো একটা অভিজ্ঞতার ছাপ এবং একটি গভীর অনুভূতির প্রভাব ছিল। বিবরণটা বেশ ভালো ভাবে, গুছিয়েই দিতে পারল। এর আগে মস্কোতে থাকার সময়, লিজা যখন ছোটো ছিল তখনও লিজার কাছে আসতে তার ভালো লাগত, এসে যখন যখন যা যা তার জীবনে ঘটেছে, যা যা সে পড়েছে সে সব কথা তাকে বলতে, অথবা তাদের আরও ছোটোবেলায় যে দিনগুলি তারা ফেলে এসেছে সে সবের স্মৃতিচারণ করতে সে

ভালোবাসত। এমনকি অনেক সময় তারা দুজনে একসঙ্গে মিলে দিবাস্বপ্ন দেখত, কল্পনায় কতশত কাহিনিরই না জাল বুনত—তবে সেগুলির বেশির ভাগই হত আনন্দের আর মজার মজার। এখন এই মুহূর্তে ওরা দুজনেই যেন হঠাৎ ফিরে পেয়েছে দু বছর আগে মস্কোয় ফেলে আসা তাদের সেই দিনগুলি। আলিয়োশার আজকের বিবরণ শুনে লিজার মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। আলিয়োশা প্রবল আবেগ ও সহানুভূতি দিয়ে ছোট্ট ইলিউশার ছবিটি লিজার সামনে ভালোভাবেই তুলে ধরতে পেরেছিল। সেই হতভাগ্য মানুষটি যে ভাবে টাকাগুলি পায়ে মাড়াল সেই দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আলিয়োশা যখন শেষ করল তখন লিজা হতবুদ্ধি হয়ে হাতে হাত চাপড়াল, মনের আবেগ আর সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল:

"তাহলে বলছেন টাকাটা ওকে দেননি! লোকটাকে কিনা অমনভাবে ছুটে পালিয়ে যেতে দিলেন! হা ভগবান! নিজে একবার পিছন পিছন ছুটে গিয়ে ওকে ধরলেও তো পারতেন

"না লিজে, আমি যে ছুটতে যাইনি সেটা ভালোই হয়েছে", এই বলে আলিয়োশা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

"ভালো মানে? কী ভালোটা হল শুনি? এখন তো দেখছি ওরা অনাহারে মারা যাবে!"

"মারা যাবে না, কেননা এই দুশ রুবল শেষ পর্যন্ত ওদের কাছে ছাড়া আর কোথাও যাবে না। যা-ই বল না কেন, লোকটা কালই টাকাটা নেবে। কাল ঠিক নেবে", চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে করতে আলিয়োশা বলল। "দ্যাখ লিজে", হঠাৎ লিজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে সে বলতে লাগল, "এখানে আমি নিজেই একটা ভুল করে ফেলেছি। তবে হ্যাঁ ভুল করে বোধহয় ভালোই করেছি।"

"কী ভুল? তাতে ভালোই বা হল কী করে?"

"ভালো কী করে হল বলছি। লোকটা ভীতু ও দুর্বল চরিত্রের। অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে, বড়োই ভালোমানুষ। এখন আমি শুধু ভাবছি, কেন সে অমন চট করে অপরাধ নিল আর টাকাগুলো পায়ে মাড়াল। কারণটা এই, আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেও ভাবতে পারেনি যে ওগুলো পায়ে মাড়াবে। এখন আমার মনে হচ্ছে ওর অপমানিত মনে হওয়ার অনেক কারণ ছিল হ্যাঁ, ওর যা অবস্থা তাতে এ ছাড়া অন্য কিছু হবার কথা নয়।

প্রথমত, ওর মনে দুঃখ হয়েছিল এই ভেবে যে এতগুলো টাকা পেয়ে আমার সামনেই ও বড়ো বেশি খুশির ভাব প্রকাশ করেছিল, এটা সে আমার কাছ থেকে লুকোতে পারেনি। খুশি যদি সে হতও, তবে খুব একটা বেশি নয়, খুশির ভাবটা যদি না দেখাত, যদি টাকাগুলো নিয়ে অন্যদের মতো, ঢং করত, নানা রকম কায়দা করত তাহলে হয়তো ব্যাপারটা ওর সহ্যসীমার মধ্যে থাকত, টাকাগুলো ও নিয়েও নিত, তা নয়তো সে বড়ো বেশি অকপট আনন্দ প্রকাশ করে ফেলেছিল, দুঃখটা

তার এখানেই। আহা লিজে, লোকটা বড়ো সৎ, বড়ো ভালোমানুষ। এসব ক্ষেত্রে যত বিপত্তি তো এখানেই! সেই সময় যতক্ষণ সে কথা বলছিল, তার কণ্ঠস্বর এত দুর্বল ছিল, এত ক্ষীণ ছিল, তার কথার মধ্যে এত বেশি তাড়াহুড়োর ভাব ছিল, কথা বলতে বলতে সে সারা সময় এমন হাস্যকরভাবে হি-হি করে হাসছিল, অথবা কেঁদেই ফেলেছিল... এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলেছিল...সে তার মেয়েদের কথা বলছিল অন্য শহরে গিয়ে যে-কাজটা পাবার সম্ভাবনা আছে তার কথাও বলছিল আর এত সব প্রাণের কথা বলে যেই তার মন খানিকটা হালকা হল অমনি আমার সামনে নিজের মনটাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে ফেলেছে ভেবে তার লজ্জা হল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর একটা প্রবল ঘৃণা ওর মনে জেগে উঠল। বেচারি আবার অমনিতেই বড়ো বেশি লাজুক স্বভাবের। বড়ো কথা, তার ক্ষোভটা এই কারণে যে বড়ো তাড়াতাড়ি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে এবং আমার কাছে ধরা দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। গোড়ায় আমার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, তারপর যেই টাকা দেখতে পেল অমনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করতে লাগল। তার মনের যখন এই অবস্থা নির্ঘাত ঠিক সেই মুহূর্তেই সে উপলব্ধি করতে পারল ব্যাপারটা তার পক্ষে কতটা অপমানজনক। আর ঠিক তখনই আমি এই ভুলটা করে বসলাম, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : আমি আচমকা বলে ফেললাম এ শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার মতো যথেষ্ট টাকা যদি ওর না থাকে, যদি এই টাকাতে ওর না কুলোয় তাহলে আরও টাকা ওকে দেওয়া হবে, এমনকি যত দরকার হয় আমি আমার নিজের টাকা থেকে দেব। এতেই হঠাৎ ও চমকে উঠল। ভাবল, বলা নেই কওয়া নেই আমি কেন ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলাম? একজন লোক যখন মনে আঘাত পায় তখন যদি সকলেই তার হিতৈষী হয়ে তাকে করুণার চোখে দেখে সেটা যে তার কাছে কী ভয়ঙ্কর, কী দুঃসহ জান লিজে? আমি এটা শুনেছি, মহাস্থবির জোসিমা একথা আমায় বলেছেন। আমি জানি নে কী করে এটা ভাষায় প্রকাশ করব, কিন্তু আমি এটা অনেক সময় নিজের চোখেও দেখেছি। তা ছাড়া আমি নিজেও কিন্তু মনে মনে ঠিক উপলব্ধি করতে পারি। তাছাড়া বড়ো কথা এই যে লোকটা নিজেও কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না যে ব্যাঙ্ক নোটগুলো পায়ে মাড়াবে, কিন্তু তা হলেও এমন একটা অনুভূতি যে আগে থাকতে ভেতরে ভেতরে তার মধ্যে ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। আগে থাকতে মনে মনে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই না তার মুগ্ধতাটা ছিল এত প্রবল! তাই পুরো ব্যাপারটা যত বাজেই হোক না কেন যা হয়েছে তা ভালোর জন্যই হয়েছে। এমনকি আমি এও মনে করি এটাই সবচাইতে ভালো হয়েছে, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না।

"কেন? এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না কেন বলছেন?" দারুণ অবাক হয়ে আলিয়োশার দিকে তাকিয়ে লিজা বলে উঠল।

"কেন না ও যদি টাকাগুলো পায়ে না মাড়াত, যদি নিয়েই নিত, তাহলে কিন্তু ঘরে ফিরে হয়তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিজের লাঞ্ছনার কথা ভেবে কেঁদে ফেলত। হ্যাঁ, নির্ঘাত তা-ই ঘটত। কাঁদত তো বটেই, হয়তো আগামীকাল ভোর হতে না হতে আমার কাছে এসে হাজির হত, আর বলা যায় না হয়তো এই এখনকার মতোই ব্যাঙ্কনোটগুলো আমার মুখের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে আচ্ছা করে পায়ে মাড়িয়ে চলে যেত। কিন্তু এখন দেখ, এখন ও গর্বভরে বুক ফুলিয়ে বাড়ি চলে গেল, যদিও জানে যে সে তার নিজের 'সর্বনাশ ঘটিয়েছে'। অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে আর দেরি না করে আগামীকালই যদি আমি এই দুশ রুবল নিয়েই ওর কাছে আবার যাই তাহলে সেটা ওকে নিতে ঠিক বাধ্য করতে পারব, কেননা একবার তো টাকা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে ও তার আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়েইছে। পায়ে মাড়ানোর সময় তো আর ওর জানার কথা নয় যে পরের দিনই আমি আবার নিয়ে আসব। এদিকে এই টাকাগুলো কিন্তু ওর ভীষণ দরকার। যদিও এখনও সে তার গুমর নিয়ে আছে, কিন্তু যা-ই বল না কেন, কত বড়ো সাহায্যটা যে তার হাতছাড়া হয়ে গেল এমনকি আজও তা ওকে ভাবতে হতে পারে। আরও বেশি করে ভাববে রাতের বেলায়, স্বপ্নে দেখবে, আর আগামীকাল সকালের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে আমার কাছে ছুটে এসে ক্ষমা চাইবার জন্য প্রস্তুত। আর ঠিক এমনি মুহূর্তেই আমারও আবির্ভাব ঘটবে। বলব, 'আপনার মানসম্মান বোধ আছে, আপনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। এখন কিন্তু এটা আপনাকে নিতেই হবে, আমাদের ক্ষমাঘেন্না করে দিন।' অমন করে বললে ঠিক নিয়ে নিবে।"

আনন্দে বিভোর হয়ে আলিয়োশা এমনভাবে 'ঠিক নিয়ে নেবে' কথাগুলি উচ্চারণ করল যে লিজা খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল।

"বাঃ এ তো সত্যি! বাঃ এটা আমি এই এখনই হঠাৎ কী দারুণভাবে বুঝতে পারলাম! বাঃ আলিয়োশা, এত সব আপনি জানলেন কী করে? আপনার বয়স এত কম, অথচ মানুষের মনের কথা ঠিক বুঝলেন কী করে! আমার মাথায় কিন্তু কখনই আসত না

"সবচেয়ে বড়ো কথা, ক্যাপ্টেনকে এখন এটাই বুঝিয়ে বলা দরকার যে আমাদের টাকা নিলে কী হবে, আমাদের সঙ্গে সমানে-সমানে চলার যোগ্যতা সে রাখে", এখনও নিজের ভাবনায় মশগুল হয়ে বলে চলল আলিয়োশা, "সমানে-সমানেই বা বলি কেন, বরং আরও বেশি দমদমিয়ে পা ফেলে চলার যোগ্যতা রাখে

"'আরও বেশি দমদমিয়ে পা ফেলার' কথা বলছেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ!— বাহবা, চমৎকার! তারপর, বলুন বলুন!"

"না, না আমার বলাটা হয়তো ঠিক হল না 'দমদমিয়ে পা ফেলাটা' হয়তো ঠিক খাটে না কিন্তু ওতে কিছু আসে যায় না, কেন না

"আহা, কিছু না, কিছু না, ওতে অবশ্যই কিছু আসে যায় না! আমায় ক্ষমা করবেন, আলেক্সেই, প্রিয় বন্ধু আমার জানেন, আমি আজ পর্যন্ত বলতে গেলে আপনাকে শ্রদ্ধা করিনি, মানে যেটুকু করেছি তা সমানে-সমানে দাঁড়িয়ে, কিন্তু এখন থেকে আরও বেশি দমদমিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা করব দোহাই আপনার, আমার এই 'রহস্য করার' জন্য রাগ করবেন না", তৎক্ষণাৎ খেয়াল হতে গভীর আবেগে সে বলে উঠল। "আমি একটা হাস্যকর বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু আপনি, আপনি শুনুন, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ হতভাগ্য লোকটার সম্বন্ধে আমাদের, অর্থাৎ আপনার না না বরং আমাদেরই বলব এই যে এত আলোচনা এ সবের মধ্য দিয়ে কি তার প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ পাচ্ছে না এই জন্যই কি পাচ্ছে না যে আমরা ঠিক যেন ওপরে কোথাও উঠে গিয়ে সেখান থেকে ওর মনের ভেতরটা বিশ্লেষণ করছি এবং একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছি যে এখন সে ওই টাকা ঠিকই নেবে? কী বলেন, অ্যাঁ?"

"না, লিজে, না, এটা অবজ্ঞা নয়", আলিয়োশা এমন দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল যে মনে হল এই প্রশ্নটার জন্য যেন সে প্রস্তুতই হয়ে ছিল। "এখানে আসতে আসতে আমি নিজেও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। একবার ভেবে দেখ, এখানে অবজ্ঞার কী আছে, যখন আমরা নিজেরাও তারই মতো, যখন আমরা সকলেই তার মতো। কারণ আমরাও তো সেই রকমই, তার চেয়ে উন্নত কিছু নই। আর উন্নত যদি হতামও তা হলে তার অবস্থায় ওই ওরকমই হতাম। তোমার কথা বলতে পারি না লিজে, কিন্তু আমার বিবেচনায় আমার নিজের অন্তরটা অনেকাংশে ছোটো। ওর মন ছোটো তো নয়ই বরং বড়ো কোমল। না লিজে, না, ওকে আমি অবজ্ঞা করছি না! জান লিজে, আমার প্রভু আমাকে একবার বলেছিলেন লোকে শিশুকে যে ভাবে যত্ন করে মানুষকেও ঠিক সেই ভাবে যত্ন করা উচিত, কোনো কোনো মানুষকে আবার হাসপাতালের রোগীর মতোই যত্ন করা উচিত।"

"ওঃ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, বন্ধু আমার, আসুন হাসপাতালের রোগীর যেমন যত্ন করা উচিত, সেই ভাবে আমরা মানুষের সেবা করি!"

"আমি প্রস্তুত, লিজে। কিন্তু তাই বা বলি কি—আমি নিজে যে একেবার প্রস্তুত একথা বলতে পারি নে। আমি অনেক সময় বড়ো বেশি অসহিষ্ণু, কখনও বা আবার সে ভাবে দেখার চোখও থাকে না আমার। কিন্তু তোমার কথা আলাদা।"

"ধুৎ, আমার বিশ্বাস হয় না! ওঃ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কী ভালোই যে লাগছে!"

"বড়ো ভালো লাগছে তোমার মুখে অমন কথা শুনে।"

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনি এত ভালো যে দেখে অবাক হতে হয়, কিন্তু

মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বিদ্যাবাগীশ গোছের   আবার কখনও কখনও তাকিয়ে দেখি আর ভাবি কোথায়, একেবারেই তো বিদ্যাবাগীশ বলে মনে হয় না। আচ্ছা যান তো, দরজার কাছে গিয়ে আস্তে করে দরজাটা খুলে একবার দেখুন দেখি মামণি আড়ি পেতে শুনছে কি না", দ্রুত ফিসফিস করে কেমন যেন খিটখিটে গলায় লিজা হঠাৎ বলে উঠল।

আলিয়োশা গিয়ে দরজা খানিকটা ফাঁক করে দেখে জানাল যে কেউ আড়ি পাতছে না।

"এদিকে আসুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্", বলতে বলতে লিজার গাল দুটি ক্রমেই বেশি করে লাল হয়ে উঠতে লাগল। আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন তো, হ্যাঁ এই ভাবে। এবারে শুনুন, আপনার কাছে একটা বড়ো রকমের স্বীকার করার আছে আমার। গতকাল আমি আপনাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা কিন্তু ঠাট্টা করে নয়, গুরুত্ব দিয়েই লেখা।

এই বলে সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। বোঝাই যাচ্ছিল এই স্বীকারোক্তি করার পর সে বেশ লজ্জা পাচ্ছে। হঠাৎ সে আলিয়োশার হাতটা ধরে কাছে টেনে নিয়ে চটপট সে হাতে তিনবার চুমু খেল।

"আহা লিজে, এ তো খুবই ভালো কথা!" আলিয়োশা সহর্ষে বলে উঠল। "আমি কিন্তু ঠিকই জানতাম যে তুমি গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলে।"

"ঠিক জানতেন! বোঝ কাণ্ড!" আলিয়োশার হাতটা হঠাৎ এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেও নিজের হাতের মুঠো থেকে ছেড়ে না দিয়ে লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গিয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছোট্ট করে হেসে সে বলল, "আমি ওনার হাতে চুমু খেলাম, আর উনি বললেন কি না 'এ তো খুবই ভালো কথা'!"

এভাবে তিরস্কার করাটা কিন্তু লিজার উচিত হয়নি; আলিয়োশা নিজেও একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

"আমি সব সময় তোমার পছন্দের মতো হতে চাই লিজে, কিন্তু কী ভাবে এটা করতে হয় তা আমার জানা নেই", কোনোমতে বিড়বিড় করে সে বলল, বলতে বলতে সেও লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

"আলিয়োশা, প্রিয় বন্ধু আমার, আপনি উদাসীন আর উদ্ধত প্রকৃতির। সে তো দেখাই যাচ্ছে। উনি অনুগ্রহ করে আমাকে ওঁর সহধর্মিণী নির্বাচন করলেন, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন! উনি ইতিমধ্যে ঠিক জেনে বসে আছেন যে আমি গুরুত্ব দিয়েই চিঠিটা লিখেছিলাম। কী কথাই না বললেন! এটাই তো আপনার ঔদ্ধত্য—এছাড়া আর কী হতে পারে!"

"কিন্তু আমি যে ঠিকই জানতাম এর মধ্যে মন্দটা কোথায় পেলে শুনি?" হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল আলিয়োশার।

"আহা, আলিয়োশা, বরং উল্‌টো   কী দারুণ ভালোই না লাগছে!" উৎফুল্ল

হয়ে কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল লিজা। আলিয়োশা দাঁড়িয়ে রইল, তখনও লিজা ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখেছে। হঠাৎই আলিয়োশা নিচু হয়ে সোজা লিজার ঠোঁটে চুমু খেল।

"এ আবার কী? কী হল আপনার?" লিজা বলে উঠল। আলিয়োশা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

"অন্যায় হয়ে গেলে মাপ করে দিয়ো। আমি হয়তো হদ্দ বোকার মতো একটা বাজে কাজ করে ফেললাম। তুমি বললে আমি উদাসীন প্রকৃতির, তাই চট করে চুমু খেয়ে ফেললাম। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি বোকামি হয়ে গেছে।...

লিজা হাসতে হাসতে দু হাতে মুখ ঢাকল।

"তাই বলে এই সাধুর পোশাকে!" হাসির ফাঁকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তার চেহারার মধ্যে আগাগোড়া একটা গম্ভীর, এমনকি অনেকটা কঠোর ভাব ফুটে উঠল।

"তা আলিয়োশা, আমাদের এসব চুমু-টুমু আপাতত থাক, কেননা আমাদের দুজনের কারোই এটা তেমন আসে না, তাছাড়া আমাদের এখনও অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে" লিজা অকস্মাৎ তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল। "বরং আমাকে বলুন দেখি, আপনি এমন একজন বুদ্ধিমান, এমন জ্ঞানীগুণী ও বিচক্ষণ লোক হয়ে আমার মতো একটা মুখ্যুকে, মুখ্যু আর রুগ্ণ মেয়েকে কী করে পছন্দ করলেন? ওঃ, আলিয়োশা, আমার বড়ো ভাগ্য, কারণ আমি আপনার একেবারে যোগ্য নই!"

"কে বলল যোগ্য নও? আর কিছু দিনের মধ্যে আমি একেবারে মঠ ছেড়ে দিয়ে চলে আসব। এরপর সংসারী হব, আর সংসারী হলে যে বিয়ে করতে হয় সেটা তো আমি জানি। 'উনি' আমাকে এই আজ্ঞাই করেছেন। বিয়ে করতে হলে তোমার চাইতে ভালো আর কাকে পাব? আর তুমি ছাড়া কেই বা আমাকে গ্রহণ করবে? এটা কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি। প্রথমত তুমি আমাকে ছোটোবেলা থেকে জান, দ্বিতীয়ত তোমার গুণের অন্ত নেই, তোমার ওসব গুণ আমার মধ্যে একদম নেই। তোমার মনটা আমার মনের তুলনায় অনেক বেশি আনন্দ ফূর্তিতে ভরা। সর্বোপরি, তুমি আমার চাইতে বেশি সরল। আমি আমার এই বয়সে পৃথিবীর অনেক, অনেক ভালোমন্দের সংস্পর্শে এসেছি। ওঃ সে তুমি জানবে কোত্থেকে! আমি যে কারামাজ়ভ্! তুমি যে হাসাহাসি কর, ঠাট্টা কর—এমনকি আমাকে নিয়েও কর তাতে কী হয়েছে? করলেই না হয় হাসিঠাট্টা—আমি বরং তাতে খুশিই। কিন্তু তোমার সেই ঠাট্টাতামাশা তো একটা বাচ্চা মেয়ের মতো, আসলে তুমি মনে মনে যা ভাব তা কিন্তু একজন শহিদের যন্ত্রণাভোগের মতোই যন্ত্রণাদায়ক।...

"একজন শহিদের মতো মানে? সেটা কী রকম?"

"হ্যাঁ লিজে, এই যে কিছু আগে তুমি প্রশ্ন করলে ওই বেচারি লোকটার মন যে আমরা এভাবে ব্যবচ্ছেদ করে দেখছি এর মধ্য দিয়ে তার প্রতি আমাদের অবজ্ঞা

প্রকাশ পাচ্ছে কি না—এই প্রশ্নটাই তো একজন শহিদের যন্ত্রণাকাতর প্রশ্ন। দেখ, কী ভাবে এটা প্রকাশ করব আমি কোনো মতেই বুঝতে পারছি না, কিন্তু এটা জানি যে যার মনে এরকম প্রশ্ন ওঠে সে-ই অমন কাতর হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তোমার ওই রুগির চেয়ারে বসে তুমি নির্ঘাত এরই মধ্যে অনেক বিষয় নিয়ে মনে মনে ভাবনাচিন্তা করেছ।

আবেগের আতিশয্যে লিজার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিল। স্খলিতকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে সে আলিয়োশাকে বলল, "আপনার হাতটা অমন করে সরিয়ে নিচ্ছেন কেন, আলিয়োশা? আমাকে দিন। যা বলি শুনুন আলিয়োশা মঠ ছেড়ে যখন আসবেন তখন আপনি কী পরবেন? কী ধরনের পোশাক পরবেন? হাসবেন না, রাগ করবেন না। এটা কিন্তু আমার জানা দরকার, খুবই জানা দরকার।"

"পোশাকের কথা বলছ লিজে—সেটা কিন্তু এখনও ভেবে দেখিনি। তবে তোমার যেমন অভিরুচি তেমনি পরব।"

"আমার ইচ্ছে আপনি পরেন গাঢ় নীল রঙের মখমলের কোট, শক্ত সুতিকাপড়ের সাদা ওয়েস্টকোট আর ছাইরঙা নরম পশমিনা টুপি। আচ্ছা বলুন তো, ওই যে আমি তখন গতকালের চিঠিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললাম যে আমি আপনাকে ভালোবাসি না তখন আপনি কি সে কথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছিলেন?"

"উঁহু, বিশ্বাস করিনি।"

"ওঃ আপনি সহ্যের বাইরে! আপনাকে শোধরান যাবে না!"

"দেখ, আমি জানতাম, তুমি আমাকে ভালোবাস বলেই মনে হয়, কিন্তু আমি এমন ভাব করলাম যেন বিশ্বাস করছি যে তুমি আমাকে ভালোবাস না, আর সেটা করলাম এই কারণে যে তাতে তোমার অস্বস্তিটা অনেক কম হবে

"সেটা তো আরও খারাপ! আরও খারাপ আবার সবচাইতে ভালোও বটে। আলিয়োশা, আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি। আজ সকালে আপনি যখন এলেন তার আগে আমি নিজেই মনে মনে একটা রহস্য করে ভাবছিলাম ওর কাছ থেকে গতকালের চিঠিটা চেয়ে নেব, যদি নিশ্চিন্তমনে পকেট থেকে বের করে আমাকে দিয়ে দেয়—যেমনটা ওর কাছ থেকে সব সময়ই প্রত্যাশিত—তাহলে বুঝে নেব আমাকে আদৌ ভালোবাসে না, আমার জন্য কোনো অনুভূতি ওর নেই, নেহাৎই মুখ্যু, একটা অপদার্থ বাচ্চা ছেলে, আর তাহলে আমার হয়ে গেল! কিন্তু আপনি চিঠিটা যে আপনার মঠের কুঠুরিতে ফেলে এসেছেন তাতে আমি মনে মনে স্বস্তি পেলাম। আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো, চিঠিটা যে আপনি আপনার কুঠুরিতে ফেলে এসেছেন সেটা কি এই কারণে নয় যে আপনার মন বলছিল যে ওটা আমি ফেরত চেয়ে বসব—তাই যাতে না দিতে হয় সেজন্যই আপনার এই ফন্দি? ঠিক কিনা? তাই তো?"

"আহা লিজে, মোটেই তা নয়। চিঠিটা তো এখনও আমার কাছে আছে, তখনও ছিল—এই যে এই পকেটে এই তো।"

আলিয়োশা হাসতে হাসতে চিঠিটা বের করে দূর থেকে লিজাকে দেখাল।

"তবে হ্যাঁ, তাই বলে এটা তোমাকে দিতে যাচ্ছি না, দেখার হয় এক হাত দূর থেকেই দেখ।"

"সে কী কথা! তখন তাহলে মিথ্যে বললেন কেন? সাধু হয়ে মিথ্যে কথা বললেন?"

"হয়তো তা-ই।" আলিয়োশা তখনও হাসছে। "চিঠিটা যাতে দিতে না হয় তার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ওটা আমার কাছে মহামূল্যবান", হঠাৎ গভীর আবেগের সঙ্গে একথা যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আবারও সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। "চিরকালের জন্য আমার কাছে রইল, কখনও কাউকে দেব না!"

লিজা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আলিয়োশা", আবার সে অস্ফুটস্বরে বলল, "একবার দরজার কাছে গিয়ে দেখুন তো মা দরজার বাইরে আড়ি পেতে শুনছে কিনা।"

"বেশ তা না হয় দেখব লিজে, তবে একটা কথা—না দেখতে গেলেই কি ভালো হত না? কী বল? মাকে সন্দেহ করে এতটা নীচ ভাবতে যাওয়া কেন?"

"নীচ ভাবার কী আছে? এর মধ্যে নীচতার কী আছে? দরজার আড়াল থেকে আড়ি পেতে যদি শুনেই থাকে সেটা তার অধিকার, নীচতার তো কিছু নেই এর মধ্যে!" লিজা দপ্ করে জ্বলে উঠল। "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমি নিজে যখন মা হব, আর আমারও যদি এই রকম একটি মেয়ে থাকে—এই যেমন আমি, তাহলে আমিও অবশ্যই সেক্ষেত্রে আড়ি পাতব।"

"বল কি লিজে? এটা কিন্তু ভালো কথা নয়।"

"হা ভগবান! এর মধ্যে নীচতাটা কোথায় পেলেন শুনি? হ্যাঁ যদি সাধারণ সাংসারিক কোনো কথাবার্তা হত, সেখানে যদি আমি আড়ি পাততে যেতাম তাহলে সেটা হত নীচতা, কিন্তু নিজের পেটের মেয়ে যখন দরজা বন্ধ করে দিয়ে একজন অল্পবয়সি পুরুষ মানুষের সঙ্গে   শুনুন আলিয়োশা, জেনে রাখুন, আমি কিন্তু আপনার ওপরও নজর রাখব, দাঁড়ান না, আমাদের বিয়েটা একবার হতে দিন না। হ্যাঁ, আরও জেনে রাখুন, আপনার যত চিঠি আসবে সব কিন্তু আমি খুলে খুলে পড়ব।   এটা আমি আপনাকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখলাম।   "

"বেশ তো, অবশ্যই, তাই যদি মনে করো" বিড়বিড় করে আলিয়োশা বলল, "তবে কিনা এটা ভালো নয়।

"ওঃ ব্যাপারটা কিনা এতই হেলাফেলার! আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি, এই নিয়ে একেবারে প্রথম দিন থেকে ঝগড়া করতে যাব না, আমি বরং আপনাকে আসল সত্যটা বলব  এটা অবশ্যই ঠিক যে আমি সত্যি বলিনি, আপনার কথাটাই সত্যি;

তবে সে যা-ই হোক না কেন, আমি কিন্তু আড়ি পাতব।”

“তা কর গে। তবে চুপি চুপি যতই নজর রাখ না কেন আমার মধ্যে দোষ ধরার মতো কিছু পাবে না।” আলিয়োশা হাসতে লাগল।

“আচ্ছা, আমাকে মেনে চলবেন তো আলিয়োশা? এটাও কিন্তু আগে থাকতে ঠিক করা দরকার।”

“খুবই খুশি মনে লিজে, অবশ্যই মেনে চলব, তবে মূল প্রশ্নে নয়, সেখানে তুমি যদি আমার সঙ্গে একমত নাও হও আমি কিন্তু আমার কর্তব্যের নির্দেশ মেনেই কাজ করব।”

“তা-ই তো চাই। তাহলে জেনে রাখুন, আমিও শুধু যে মূল প্রশ্নে আপনাকে মেনে চলতে রাজি তা-ই নয়, সব ব্যাপারে আপনার বাধ্য হয়ে চলব—এক্ষুনি দিব্যি করে বলছি—সব ব্যাপারে, সারা জীবন;” উৎফুল্ল কণ্ঠে লিজা চিৎকার করে বলল, “এটা আমি করব খুশিমনে, খুশিমনেই করব! শুধু তা-ই নয়, আমি দিব্যি করে বলছি, আপনি কি করছেন না করছেন তা শোনার জন্য কখনও আড়ি পাততে যাব না, কখনও, একবারের জন্যও আপনার একটি চিঠিও খুলে পড়ব না, কারণ আপনার কথাই সত্যি, আমি যা বলেছি তা ঠিক নয়। যদিও আড়ি পাতার খুবই ইচ্ছে আমার হবে—এটা আমি জানি—তবু ও কাজ আমি করব না, যেহেতু আপনি কাজটাকে ভালো মনে করেন না। এখন থেকে আপনি হবেন আমার ভাগ্যবিধাতা।... আচ্ছা আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, এই কয়েকদিন হল—গতকাল দেখেছি এবং আজও দেখছি—আপনি এমন মনমরা কেন বলুন তো? আমি জানি আপনার অনেক ঝামেলা চলছে, বেশ বিপাকের মধ্যে আছেন আপনি, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরও কোথায় যেন, অনেক বড়ো কোনো একটা কোনো দুঃখ আপনার আছে। তাই কি?”

“হ্যাঁ লিজে, গোপন দুঃখও আছে বৈ কি”, বিষণ্ণ কণ্ঠে আলিয়োশা বলল। “যেহেতু সেটা আন্দাজ করতে পেরেছ তাইতে বুঝতে পারছি তুমি আমাকে ভালোবাস।”

“কী সেই দুঃখ? কীসের দুঃখ? সেটা বলা যায় কি?” বিনীত ভঙ্গিতে অনুনয়ের সুরে লিজা জিগ্‌গেস করল।

“সে আমি তোমাকে পরে এক সময় বলব'খন লিজে, পরে বলব আলিয়োশা বিব্রত হয়ে বলল। “এখন বললে তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না। তাছাড়া আমি নিজেও হয়তো ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারব না!”

“আমি জানি, এ ছাড়াও আপনার দুঃখের কারণ আপনার ভাইয়েরা, আপনার বাবা—ঠিক কি না?”

“হ্যাঁ ভাইয়েরাও বটে।” আলিয়োশার কথার সুরে মনে হল যেন সে গভীর চিন্তিত।

"আপনার দাদা ওই ইভান ফিয়োদরভিচকে আমার ভালো লাগে না আলিয়োশা" লিজা ফস করে মন্তব্য করল।

আলিয়োশা বেশ খানিকটা অবাক হল বটে লিজার এই মন্তব্য শুনে, কিন্তু এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলল না।

"আমার ভাইয়েরা তাদের নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে", আলিয়োশা বলল, "আমার বাবাও সেই পথে চলেছে। নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও সর্বনাশ করছে। এটাই হল 'কারামাজ়ভ্‌দের সেই আদিম পার্থিব শক্তি' যার কথা সাধু পাইসি এই সেদিন বলেছিলেন—পৃথিবীর আদিম অমার্জিত পাশব শক্তি  এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছা এই আবেগের ওপর খাটে কিনা তাও আমার জানা নেই। জানি শুধু এইটুকুই যে আমি নিজেও একজন কারামাজভ্। আমি সাধু? কীসের আমি সাধু? আমি কি সাধু, লিজে? এই একটু আগে তুমি বললে না যে আমি সাধু?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

"কে জানে? আমি হয়তো ঈশ্বরেও বিশ্বাস করি নে।"

"আপনি বিশ্বাস করেন না? আপনার কী হয়েছে বলুন তো?" সন্তর্পণে, মৃদুকণ্ঠে লিজা জিগ্‌গেস করল। কিন্তু আলিয়োশা সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। ওর এই বড়ো বেশি আকস্মিক কথাগুলির মধ্যে, বড়ো বেশি রহস্যজনক, বড়ো বেশি ব্যক্তিগত এমন একটা কিছু ছিল যা হয়তো ওর নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়, কিন্তু তা না হলেও নিঃসন্দেহে তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করছিল।

"তা ছাড়া এখন, সব কিছুর ওপরে, সবচেয়ে বড়ো কষ্ট এই যে আমার পৃথিবীতে সবার সেরা যে মানুষটি, যিনি আমার পরম সুহৃদ, তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আমি যে কী বন্ধনে বাঁধা, আমি কী ভাবে মনেপ্রাণে গাঁথা হয়ে আছি তা যদি তুমি জানতে! ওঃ লিজে যদি তুমি জানতে! উনি চলে যাবেন, এখন আমি একা হয়ে পড়ব।  আমি তোমার কাছে আসব লিজে।  এর পর থেকে আমরা একসঙ্গে জীবন কাটাব।

"হ্যাঁ, একসঙ্গে, একসঙ্গে। এখন থেকে সব সময় একসঙ্গে, সারা জীবনের জন্য। শুনুন, আমায় চুমু খান, আমি অনুমতি দিচ্ছি।"

আলিয়োশা ওকে চুমু খেল।

"আচ্ছা, এবারে আসুন, খ্রিস্ট আপনার সহায় হবেন।" আলিয়োশার উদ্দেশে ক্রুশচিহ্ন এঁকে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সে বলল, "উনি জীবিত থাকতে থাকতে যত তাড়াতাড়ি পারেন ওঁর কাছে যান। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে ধরে রেখে আমি নিষ্ঠুরতার কাজ করে ফেলেছি। আজ আমি তাঁর জন্য এবং আপনার জন্যও প্রার্থনা করব। আলিয়োশা, আমাদের জীবন সুখের হবে। আমরা সুখী হব, কী বলেন—হব তো?"

"মনে হচ্ছে হব লিজে।"

লিজার ঘর থেকে বেরিয়ে আলিয়োশা বিবেচনা করে দেখল মাদাম খখ্‌লাকোভার সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াই ভালো, তাই তার কাছ থেকে আর বিদায় না নিয়ে ওদের বাড়ি ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করল। কিন্তু যেই দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল অমনি পড়বি তো পড় একেবারে মাদাম খখ্‌লাকোভারই মুখোমুখি সে পড়ে গেল। তার প্রথম কথা থেকে আলিয়োশা অনুমান করতে পারল যে তাকে ধরার জন্য সে ইচ্ছে করেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, এ কী সাঙ্ঘাতিক কথা! এ তো একেবারে অর্থহীন, যত সব ছেলেমানুষি। আশা করি আপনি স্বপ্নেও ভাবছেন না বোকামি, স্রেফ বোকামি!" আলিয়োশার ওপর মহিলা রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে উঠল।

"এটা কিন্তু আবার ওকে বলতে যাবেন না", আলিয়োশা বলল, "তাতে ওর উত্তেজনা বাড়বে, আর সেটা এখন ওর পক্ষে ক্ষতিকর হবে।"

"বেশ, বেশ, একজন বিচক্ষণ যুবকের মুখে বিচক্ষণ কথা শুনছি। তাহলে কি বাবা আমাকে এটাই বুঝে নিতে হবে যে ওর এই অসুস্থ অবস্থায় ওর বিরোধিতা করলে পাছে ও রেগে যায় একমাত্র সেই কারণে ওর প্রতি সমবেদনাবশত আপনি ওর কথায় রাজি হয়েছিলেন?"

"না না, আদৌ তা নয়, আমি সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েই ওর সঙ্গে কথা বলেছি", আলিয়োশা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল।

"এতে গুরুত্ব দেওয়া অসম্ভব, এটা অকল্পনীয়। প্রথমত এখন আমি আর আপনাকে তেমন ভাবে গ্রহণ করতে পারব না, একেবারেই পারব না, দ্বিতীয়ত আমি এখান থেকে চলে যাব এবং ওকেও নিয়ে যাব—এটাই জেনে রাখবেন।"

"আরে তার কী দরকার আছে?" আলিয়োশা বলল। সে তো এখনও বেশ দূরের কথা—আরও এক-দেড় বছর হয়ত অপেক্ষা করতে হবে।"

"ওঃ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ তা যা বলেছেন! এই বছর দেড়েকের মধ্যে ওর সঙ্গে আপনার হাজার বার ঝগড়া হয়ে যাবে, আপনাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে কী অভাগী, সে আপনাকে কী বলব! মানলাম না হয় এ সবই তুচ্ছ, কিন্তু এটা আমার পক্ষে একটা বড়ো আঘাত। এখন আমার অবস্থা 'বুদ্ধির দুর্গতি' নাটকের শেষ দৃশ্যের ফামুসভের মতো। আপনি চাৎস্কি, মেয়ে আমার সোফিয়া। একবার ভেবে দেখুন, আমি ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে ছুটে চলে এলাম সিঁড়িতে, নাটকেও কিন্তু সেই চরম মুহূর্তটি সিঁড়িতেই ঘটেছিল।[২১] আমি সব শুনেছি, সব শুনেও কোনো মতে খাড়া থেকেছি। তাহলে এই হল গিয়ে এই এতগুলো রাতের এত সব আতঙ্ক আর এখনকার এই মূর্ছারোগের আসল রহস্য! মেয়ের জন্য রইল ভালোবাসা আর মার জন্য মরণ। আর কি, এখন কবরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হল। এবারে দ্বিতীয় আরেকটি কথা—সবচেয়ে বড়ো কথা : আপনাকে

ওই যে চিঠিটা লিখেছে সেটা কী ব্যাপার? ওটা দেখান দেখি আমাকে, এক্ষুনি দেখান!"

"না, সে চিঠিতে আপনার কোনো দরকার নেই। এখন বলুন দেখি, কাতেরিনা ইভানভ্‌নার অবস্থাটা কী রকম? আমার জানা খুবই দরকার।"

"এখনও সেই রকমই বিছানায় পড়ে আছে, ভুল বকছে। জ্ঞান ফেরেনি। ওর মাসিরা এখানে, তারা শুধু 'আহা-উহু' করছে আর আমার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছে। এদিকে হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে এলেন বটে, কিন্তু সব দেখেশুনে উনি এমন ঘাবড়ে গেলেন যে আমি বুঝতে পারলাম না তাকে নিয়ে আমি কী করব, কী ভাবেই বা তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করব। এমনও মনে হয়েছিল যে তার জন্যই আবার একজন ডাক্তার ডেকে পাঠাতে না হয়। শেষ পর্যন্ত আমার গাড়ি করে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। তার ওপর ঠিক এই সময়ই কিনা আপনার এই ব্যাপার আর লিজার এই চিঠি! অবশ্য এটা ঠিক যে এ সব হতে হতে আরও দেড় বছর লেগে যাবে। যা কিছু আমাদের কাছে মহৎ, পরম পবিত্র, তার দোহাই, আপনার মৃত্যুপথযাত্রী গুরু মহাস্থবিরের দোহাই, চিঠিটা আমাকে দেখান, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমি ওর মা—আমাকে দেখতে দেবেন তো! আপনি যদি তেমন মনে করেন না হয় আপনার হাতে আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে রাখুন, আমি না হয় দূর থেকেই পড়ব।"

"না কাতেরিনা ওসিপভ্‌না দেখাব না, লিজা নিজে যদি অনুমতি দেয় তা হলেও না। কাল আমি আবার আসব, যদি চান অনেক বিষয়েই কথাবার্তা হতে পারে আপনার সঙ্গে, তবে আপাতত চললাম।"

আলিয়োশা এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

## দুই

## স্মের্দিকোভ্ ও তার গিটার বাজনা

বাস্তবিকই সময়ের অভাব ছিল আলিয়োশার। লিজার কাছ থেকে যখন সে বিদায় নিচ্ছিল সেই তখনই তার মাথায় একটা চিন্তা এক ঝলক খেলে গিয়েছিল। সেটা এই যে যত চালাকি খাটিয়ে হোক, যে করেই হোক, দাদা দমিত্রিকে ধরতে হবে। দেখা যাচ্ছে দ্‌মিত্রি তার কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়ে আছে। এদিকে বেলাও অনেক হল। দুটো পেরিয়ে তিনটের দিকে বেলা গড়িয়েছে। আলিয়োশার সমস্ত মনটা পড়ে আছে মঠে, যেখানে তার প্রভু 'মহাপুরুষ' জোসিমা মৃত্যুশয্যায় শয়ান। কিন্তু দাদা দ্‌মিত্রির সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনীয়তা আর সব দাবিকে ছাপিয়ে উঠল। আলিয়োশার মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত এরকম একটা আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে যে কোথায় যেন এমন একটা দারুণ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, যা আসন্ন ও অনিবার্য। বিপর্যয়টা যে ঠিক কী এবং এই মুহূর্তে ভাইকে সে কী বলতে চায় তার নির্দিষ্ট কোনো ধারণা হয়তো আলিয়োশার নিজেরও নেই। সে মনে মনে বলল, 'আমার

হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষটি আমার অনুপস্থিতিতে যদি দেহত্যাগ করেনও আমার অন্তত এই বলে সারা জীবন আক্ষেপ করার কোনো কারণ থাকবে না যে আমি হয়তো কিছু রক্ষা করলেও করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে আমার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি চলে গেলাম। আমি এখন যা করব ভেবেছি সেটা তাঁর মহৎ নির্দেশ মেনেই করব।

তার পরিকল্পনাটা ছিল এই যে গতকালের মতো আজও বেড়া ডিঙিয়ে বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢুকে আচমকা দ্‌মিত্রিকে ধরবে এবং ওই বাগানঘরের মধ্যে গিয়ে বসবে। আলিয়োশা মনে মনে ভাবল, ’যদি ও ওখানে না থাকে, তাহলে তোমাকে বা বাড়ির মেয়েদের কাউকে কিছু না জানিয়ে তাদের অজ্ঞাতসারে বাগান ঘরের ভেতরেই ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে হবে—সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাও সই। যদি সে আগের মতো গ্রুশেন্‌কার আসার ওপর নজর রাখে তাহলে এটা খুবই সম্ভব যে সে এই বাগানঘরেই আসবে। ’ আলিয়োশা অবশ্য তার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে খুব একটা বেশি মাথা ঘামায়নি, কিন্তু তা হলেও সে ঠিক করল যে মতলবটা কাজে লাগাতে হবে, যদিও এর ফলে এমনও হতে পারে যে মঠে যাওয়া তার আজ আর হয়তো হয়েই উঠল না।

সবই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। গতকাল যেখানে এসে পড়েছিল আজও বেড়া ডিঙিয়ে প্রায় সেখানেই এসে পড়ল। সকলের অগোচরে বাগানঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। কারও নজরে পড়ে যাবার ইচ্ছে তার ছিল না। বাড়ির কর্ত্রী বা ফোমা—ফোমা যদি ঘটনাক্রমে ওখানেই থাকে—ওরা দুজনেই দ্‌মিত্রির পক্ষ নিয়ে তার নির্দেশ মেনে চলবে বলে মনে হয়, সেক্ষেত্রে ওরা কেউই আলিয়োশাকে বাগানে ঢুকতে নাও দিতে পারে, অথবা সময়মতো এই বলে দ্‌মিত্রিকে সতর্ক করে দিতে পারে যে তার তত্ত্বতালাশ চলছে।

বাগান ঘরে কোনো জনপ্রাণী নেই। গতকাল যে জায়গায় বসেছিল সেখানেই বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল আলিয়োশা। ঘরের চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সেটা তার এত বাজে লাগতে লাগল যে কেন যেন গতকালের চেয়েও অনেক বেশি জীর্ণদশাগ্রস্ত বলে মনে হতে লাগল। আবহাওয়া গতকালের মতোই পরিষ্কার। সবুজ রং করা টেবিলটার ওপর ব্র্যান্ডির দাগ—গতকাল গ্লাস থেকে যে ব্র্যান্ডি চলকে পড়েছিল নিঃসন্দেহে তারই দাগ। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্তি এসে গেলে সব সময় যেমন হয়, আলিয়োশার মাথার মধ্যেও তেমনি রাজ্যের যত বাজে ও অর্থহীন চিন্তা এসে ভিড় করতে লাগল। যেমন, সে নিজেকে প্রশ্ন করল কেন সে আর কোনো জায়গায় না বসে ঠিক গতকালের এই জায়গাটিতেই বসে আছে। শেষকালে তার মন বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল, উদ্বেগে ও অজানা আশঙ্কায় বড়ো বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু পনেরো মিনিটও বসেছে কি বসেনি এমন সময় খুবই কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে গিটারের ঝঙ্কার কানে এসে বাজল।

আলিয়োশার বিশ পা মতন দূরে—তার বেশি কোনো মতে হবে না—কোথাও কোনো ঝোপের মধ্যে কে বা কারা এতক্ষণ বসে ছিল অথবা সবে মাত্র এসে বসেছে। আলিয়োশার হঠাৎ এক ঝলক মনে পড়ে গেল যে গতকাল বাগানঘর থেকে দাদাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় বাগানের বেড়ার গায়ে বাঁ দিকে ঝোপঝাড়ের মাঝখানে একটা জায়গায় সবুজ রঙের একটা নিচু বেঞ্চি তার চোখে পড়েছিল বটে, অন্তত সেই রকমই একটা কিছু যেন চোখের সামনে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল। ওখানেই তাহলে এসে বসেছে, এই আগন্তুকরা। কিন্তু কারা হতে পারে? এমন সময় একটা কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ কষ্ট করে গলায় মিষ্টত্ব আনতে গিয়ে হুইসিলের মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে গিটারের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল একটা চটুল গানের কয়েকটা কলি:

দুর্বার অনুরাগে প্রিয়া
তোমাতেই বাঁধা মোর হিয়া।
প্রভু মোর দয়াময়
ধন্য কর করুণায়!
ধন্য তুমি কর তারে!
ধন্য কর মোরে!

গান থামল। গানের সুরটা বেশ চড়া, কথাগুলিও খাপছাড়া ধরনের, নিম্নস্তরের— চাকরবাকরদের মহলে যেমন শোনা যায়। সেটা থামতেই হঠাৎ শোনা গেল আরেকটি গলা। এটা নারীকণ্ঠ—কোমল, কেমন যেন সলজ্জ—তবে বেশ খানিকটা ন্যাকা-ন্যাকা।

"এত দিন হয়ে গেল আপনার দেখা নেই কেন বলুন তো পাভেল ফিয়োদরভিচ? আমরা কি এতই হেলাফেলার হয়ে গেলাম?"

"না, না তা নয়", পুরুষকণ্ঠটি ভদ্রভাবে উত্তর দিল বটে, তবে সে কণ্ঠে সর্বোপরি ফুটে উঠল একটা দৃঢ়, অবিচল আত্মমর্যাদার সুর। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে পুরুষ মানুষটি এখানে তার আধিপত্য নিয়ে আছে, আর স্ত্রীলোকটি ছলাকলা করছে। 'পুরুষমানুষটি তো মনে হচ্ছে স্মের্দিকোভ্', আলিয়োশা মনে মনে ভাবল, 'অন্তত গলা শুনে তো তা-ই মনে হচ্ছে; কিন্তু মহিলাটি—সম্ভবত এই বাড়ির কর্ত্রীর মেয়ে—সেই যে মেয়েটি যে মস্কো থেকে এসেছে, যার পোশাকের আঁচল মাটিতে লুটায়, যে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার কাছে স্যুপ্ আনতে যায়।'

"আমি সব রকমের কবিতার ভারি ভক্ত—যদি তাতে ছন্দ আর মিল থাকে", নারীকণ্ঠটি বলে চলল। "থামলেন কেন, গাবেন না?"

পুরুষকণ্ঠটি আবার গান ধরল।

রাজার মুকুট যাক না চলে;
প্রিয়া আমার থাক কুশলে।
প্রভু মোর দয়াময়

ধন্য কর করুণায়!
ধন্য তুমি কর তারে!
ধন্য কর মোরে!

"সেবারেরটা কিন্তু আরও ভালো হয়েছিল", নারীকণ্ঠের মন্তব্য শোনা গেল। ওই 'রাজার মুকুটে'র পরে কিন্তু, 'প্রিয়া আমার'- এর জায়গায় আপনি গেয়েছিলেন 'পরান প্রিয়া'—সেটা কিন্তু শুনতে আরও মধুর হয়েছিল। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন।"

"ধ্যুৎ, ধ্যুৎ, কবিতা একটা বাজে জিনিস", স্মের্দিয়াকোভ্ কাটা জবাব দিল।

"না, না, কবিতা আমার ভারি পছন্দ।"

"কবিতার কথা যদি বলেন তো তা স্রেফ বাজে জিনিস—বাজে না হয়ে যায় না। নিজেই একবার চিন্তা করে দেখুন না দুনিয়ায় এমন কে আছে যে কবিতার কথা বলে? ধরুন আমরা সকলে যদি মিল দিয়ে ছন্দে কথা বলতে শুরু করতাম, এমনকি আমাদের ওপরওয়ালা সরকারের নির্দেশেই যদি তা করতে হত তাহলে কি খুব একটা বেশি কথা আমরা বলতে পারতাম? কবিতা কোন কাজের কথা নয় মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না।"

"সত্যি আপনার কত বুদ্ধি! এত বিষয় আপনি জানলেন কী করে বলুন তো?" উত্তরোত্তর আরও বেশি গদগদ হয়ে উঠল নারীকণ্ঠ।

"আমি যদি অন্য ভাষা নিয়ে জন্মাতাম তাহলে আরও অনেক কিছু করতে পারতাম, আরও অনেক কিছু জানতে পারতাম। তাহলে কেউ যদি মুখে এমন কথা উচ্চারণ করত যে আমি একটা ইতর, যেহেতু আমার কোনো পিতৃপরিচয় নেই এবং পূতিগন্ধ থেকে আমার জন্ম, তাকে আমি পিস্তল নিয়ে আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে বলতাম। মস্কোতে কিন্তু লোকে আমার মুখের ওপরই ও কথা বলত—এসব এখান থেকে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের কল্যাণে ছড়িয়েছে আর কি। গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্ এই বলে আমার নিন্দা করে বেড়ায় যে আমি জন্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। তার কথায়, আমি নাকি 'জরায়ু চিরে' বেরিয়ে এসেছি। বেশ তো জরায়ুর কথা সে যা বলছে না হয় মানলাম, কিন্তু পৃথিবীতে যাতে একেবারে আসতে না হয় সেই জন্য ওরা যদি গর্ভে থাকতে থাকতে আমাকে মেরে ফেলত তাতেও আমার আপত্তি হত না। হাটে বাজারে লোকের মুখেও এই কথা। এমনকি আপনার মাতা ঠাকুরানিও ভদ্রতার কোনো বালাই না রেখে আমাকে এমন কথাও বলতে এসেছিলেন যে আমার গর্ভধারিণীটি মাথাভর্তি চুলের জট নিয়ে ঘুরে বেড়াত, মাথায় সে হাত তিনেক, বাঁটকুল। বলি, বাঁটকুল কেন? লোকে তো বলে থাকে 'ছোটোখাটো'—সেটা বলতে আপত্তিটা কীসের শুনি? আসলে ঘটনাটা এমন ভাবে বলার ইচ্ছে যাতে সকলের চোখে জল এসে যায়। কিন্তু সে চোখের জল তো যাকে বলে চাষাভুসোদের চোখের জল, তা-ই, চাষাড়ে অনুভূতি আর কি। একজন

শিক্ষিত লোকের সঙ্গে তুলনা করলে রুশ চাষির আবার কোনও অনুভূতি আছে নাকি? কোনো শিক্ষাদীক্ষার বালাই না থাকায় কোনো অনুভূতিও তার থাকতে পারে না। সেই ছোটোবেলা থেকে 'বাঁটকুল' কথাটা শুনতে শুনতে রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করে ওঠে। সারা দেশটার ওপরই আমার ঘেন্না ধরে গেছে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না।"

"আপনি যদি মিলিটারির একজন ক্যাডেট হতেন বা কচি বয়সের একজন হুজ়ার সৈন্য হতেন তাহলে কিন্তু আপনি অমন কথা বলতেন না, আপনি তখন এই রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্যেই খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।"

"মিলিটারির হুজ়ার সৈন্য তো আমি হতেই চাই না মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না, এমন কি আমি যা করতে চাই সেটা তার উলটোটা—আমি সব সৈন্য ধ্বংস করতে চাই।"

"তাহলে শত্রু যখন আসবে তখন কে আমাদের রক্ষা করবে?"

"ওসবের আদৌ কোনো দরকার নেই। বারো সালে বর্তমান ফরাসি সম্রাটের পিতা[৮২] সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা বড়ো রকমের অভিযান চালিয়েছিলেন, তখন যদি ওই ফরাসিরা রুশদেশ জয় করতে পারত তাহলে ভালোই হত একটা বুদ্ধিমান জাতি একটা গণ্ডমূর্খ জাতিকে জয় করে দেশটাকে তাদের অধীনস্থ রাজ্য করে নিলেই পারত। আমাদের রীতিনীতি তাহলে একেবারে অন্য রকম হত।"

"আহা, ওদের দেশের লোকেরা বুঝি আমাদের চেয়ে এতই ভালো! আমি কিন্তু আমাদের যে-কোনো কেতাদুরস্ত যুবকের বদলে তিন জন ইংরেজ যুবককেও পছন্দ করতে রাজি নই", মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না এমনই বিগলিত কণ্ঠে কথাগুলি বলল যে তাতে মনে হল সেই মুহূর্তে সম্ভবত তার দুচোখে একটা কাতর ভাব ফুটে উঠেছে।

"তা যার যেমন ভক্তি।"

"আপনি নিজেই কিন্তু ঠিক যেন একজন বিদেশি—একজন অভিজাত বিদেশি ঠিক যেমন হয়। কথাটা আমি আপনাকে বলছি বটে, কিন্তু বলতে লজ্জাই হচ্ছে আমার।"

"যদি আপনার জানতে অভিরুচি হয় ত বলি—লাম্পট্যের বেলায় এখানকার ও ওখানকার দুই-ই সমান। দুই-ই সমান বদ। তবে তফাতটা এই যে ওখানকার ওরা পালিশ করা চকচকে জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়, আর আমাদের এরা হতভাগা, ভিখিরি, পূতিগন্ধময়—এবং এর মধ্যে মন্দ কিছু দেখতে পায় না। রুশিদের এই জাতটাকে চাবুক মেরে সিধে রাখতে হয়—গতকাল ফিয়োদর পাভ্লভিচ একথা বলেছিল—তা ঠিকই বলেছিল, যদিও লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, সেই সঙ্গে তার সব কটা ছেলেও।"

"কিন্তু আপনি নিজেই তো বলেছিলেন আপনি ইভান ফিয়োদরভিচকে খুব শ্রদ্ধা করেন।"

"না, আর করি নে। সে আমার সম্পর্কে বলেছে আমি নাকি একটা ওঁছামার্কা চাকরবাকর শ্রেণির লোক। আমার সম্পর্কে তার ধারণা আমি হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারি; কিন্তু এটা ওর ভুল ধারণা। আমার পকেটে যদি সে রকম টাকাকড়ি থাকত তাহলে আমি কখন কবে এখান থেকে চলে যেতাম! দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ নিজেই চাকর-বাকরেরও অধম—যেমন আচার ব্যবহারে, তেমনি বুদ্ধিতে, তেমনি তার ওই ভিখিরিপনায়। কোনো কাজের লোকও নয়, অথচ সকলের কাছে তার কী খাতির! ধরলাম না হয় আমি একটা রাঁধুনে মাত্র, কিন্তু তেমন কপাল হলে মস্কোর পেত্রোভ্‌কার মতো জায়গায় আমি কাফে-রেস্তোরাঁ খুলতে পারি, কেন না আমি বিশেষ ধরনের খাবার রান্না করতে পারি, আর মস্কোয় বিদেশিরা ছাড়া অন্য কেউ বিশেষ ধরনের খাবার পরিবেশন করতে পারে না। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ একটা ন্যাংটো ভিখিরি, কিন্তু তাও দেখুন, সে যদি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো ঘরের কাউন্টের ছেলেকে ডুয়েল লড়তে ডাকে তাহলে সেও তার ওই ডাকে সাড়া দেবে। অথচ কীসে সে আমার চেয়ে ভালো হল? তার কারণ সে এত বোকা যে আমার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। আজেবাজে খরচ করে কত টাকাই না উড়িয়ে দিল!"

"ডুয়েল লড়তে যাওয়া—আমার তো মনে হয় ভারি চমৎকার!" মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না হঠাৎ মন্তব্য করে বসল।

"তা কী করে হয়?"

"ভয়ঙ্কর আর দারুণ সাহসেরও বটে—বিশেষত যখন মিলিটারির দুই যুবক অফিসার পিস্তল হাতে নিয়ে একজন আরেক জনের মুখোমুখি হয়, কোনো এক মহিলার জন্য একে অন্যকে লক্ষ করে গুলি ছোড়ে। সে এক দৃশ্য! আহা মেয়েদের যদি দেখতে দিত! আমার যে কী ভীষণ দেখার ইচ্ছে!"

"ভালো, যখন মানুষ আরেকজনকে তাক করে, কিন্তু যখন তার নিজের মুখখানাকেই আরেকজন কেউ তাক করে তখন উপলব্ধিটা কেমন হবে?—সে তো একেবারে বোকার মতো অবস্থা! জায়গা ছেড়ে পালাতে পারলে ভালো হয়, মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না।"

"আপনি হলে কি পালিয়ে যেতেন নাকি?"

কিন্তু স্মের্দিকোভ্ উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না। মিনিট খানেক চুপচাপ, তারপর আবার গিটারের টুংটাং, আবার সেই একই রকম কৃত্রিম চড়া সুরের গান, ভেসে এলো স্মের্দিকোভের শেষ কয়েকটি চরণ

যা খুশি তাই তোমরা ভাব,
কিন্তু আমি দূরেই যাব।
অচিন দেশের দূর নগরে

গড়ব জীবন তৃপ্তি ভরে।
দুঃখ আমার নেই তো তাতে,
একটুকু নেই দুঃখ তাতে —
বলছি আমি সত্যি করে!

ঠিক এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। আলিয়োশা হঠাৎ হেঁচে ফেলল; সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চির লোকগুলিও চুপ মেরে গেল। আলিয়োশা অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। দেখা গেল লোকটা স্মের্দিকোভ্ই বটে। গায়ে বাহারি পোশাক, চুলে পমেড মেখেছে, চুল কায়দা করে পাকিয়ে পাকিয়ে বেশ খানিকটা কোঁকড়া করা, পায়ে পালিশ করা ঝকঝকে বুটজুতো। গিটারটা বাগানের বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে। মহিলাটি মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না, বাড়ির কর্ত্রীর মেয়ে; তার পোশাকটা ফিকে নীল রঙের, পেছনে হাত দুয়েক লম্বা লেজের মতো ভূলুণ্ঠিত। মেয়েটার বয়স বেশ কম, দেখতেও তাকে তেমন মন্দ বলা যায় না, তবে মুখটা বড়ো বেশি গোল ছাঁদের আর মুখময় বিশ্রী রকমের ফুট-ফুট দাগ।

আলিয়োশা যতদূর সম্ভব শান্ত ভাবে জিগ্গেস করল, "দাদা দ্মিত্রি কি শিগ্গির ফিরবে?"

স্মের্দিকোভ্ ধীরে ধীরে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্নাও উঠে দাঁড়াল।

"দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের খবর আমি কী করে জানব? আমার ওপর যদি তাকে চোখে-চোখে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হত তাহলে অবশ্য অন্য কথা ছিল—তাই না?" নিচু গলায় স্পষ্ট করে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে তাচ্ছিল্যভরে স্মের্দিকোভ্ জবাব দিল।

"না, আমি শুধু এটাই জিগ্গেস করছিলাম যে জান কিনা", আলিয়োশা খোলসা করে বলল।

"তিনি কোথায় অবস্থান করছেন তার বিন্দুবিসর্গ আমার জানা নেই, জানার কোনও বাসনাও নেই।"

"দাদা কিন্তু আমাকে এই কথাই বলেছিল যে বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সব সংবাদ তুমিই ওকে জানাও, আর এমন কথাও দিয়েছ যে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না এলে তুমি তাকে জানাবে।"

স্মের্দিকোভ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ধীরে ধীরে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

"কিন্তু তুমি বলবে কি, এই সময় তুমি কী করে ভেতরে ঢুকলে? ফটক তো এক ঘণ্টা আগে থেকে খিল দিয়ে আঁটা", তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আলিয়োশার দিকে তাকিয়ে সে জিগ্গেস করল।

"আমি এসেছি পেছনের গলি দিয়ে বেড়া টপকে সোজা বাগানঘরে। আশা করি এর জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?" মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্নাকে উদ্দেশ্য

করে আলিয়োশা বলল। "দাদাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ধরা দরকার।"

"বাঃ, আপনার ওপর কি আমরা রাগ করতে পারি!" আলিয়োশার ক্ষমাপ্রার্থনায় বিগলিত হয়ে টেনে টেনে বলল মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না। "দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ নিজেও তো অনেক সময় ওই পথেই বাগান ঘরে আসেন। এমনও হয়েছে যে আমরা জানিই না, অথচ উনি এসে বাগান ঘরে বসে আছেন।"

"আমি এখন ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওর সঙ্গে দেখা করার, নয়তো ও এখন কোথায় আছে আপনাদের কাছ থেকে তা জানার আমার ভারি ইচ্ছে। বিশ্বাস করুন, ওর নিজের জন্যই খুব জরুরি একটা দরকার আছে।"

"উনি আমাদের বলে যান না", আধো-আধো স্বরে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না বলল।

"আমি চেনাপরিচয়ের সূত্রে এখানে যাতায়াত করি বটে", স্মের্দিকোভ্ শুরু করল, "কিন্তু এখানেও তিনি আমার পিছু ধাওয়া করে আমার ওপর অমানুষিক চাপ সৃষ্টি করতে ছাড়েননি—কর্তা মশাই সম্পর্কে অনবরত প্রশ্ন করে যাচ্ছেন: কী হচ্ছে বাড়িতে? কে ঢুকছে, কে চলে যাচ্ছে? এছাড়াও আরও কিছু আমি ওঁকে জানাতে পারি কিনা। এমনকি এর মধ্যে দু বার আমাকে খুন করবে বলেও শাসিয়েছে।"

"খুন করবে!" আলিয়োশা অবাক হয়ে গেল।

"ওঁর যেমন স্বভাবচরিত্র তাতে ওঁর পক্ষে এটা আর এমন কি! তুমি নিজেই গতকাল তো তার পরিচয় পেয়েছ। বলেছেন, আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্নাকে যদি আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই আর সে এখানে রাত কাটায় তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। ওঁকে আমার ভীষণ ভয়, অত বেশি ভয় যদি না থাকত তাহলে শহরের পুলিশের বড়োকর্তার কাছে রিপোর্ট করাই আমার উচিত ছিল। ভগবানই জানেন কখন কী করে বসেন।"

"এই সেদিন ওঁকে বলে কি, গুঁড়িয়ে ছাতু বানিয়ে দেব", মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না যোগ করল।

"গুঁড়িয়ে ছাতু বানানোর কথা যদি হয় তাহলে ওটা হয়তো কেবল কথার কথা..." আলিয়োশা মন্তব্য করল। "এখন যদি ওর সঙ্গে আমার দেখা হত তাহলে এই ব্যাপারেও ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা হতে পারত।..."

"একমাত্র একটা কথাই জানাতে পারি", স্মের্দিকোভের কথার সুরে মনে হল সে যেন হঠাৎই ভেবেচিন্তে কিছু একটা স্থির করে ফেলেছে। "আমি এদের এতকালের একজন প্রতিবেশী ও চেনাজানা লোক—সেই হিসেবে আমি এখানে এসেছিলাম। আসবই বা না কেন? এদিকে ইভান ফিয়োদরভিচ আজ ভোর হতে না হতে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন অজ্জিয়োর্নায়া স্ট্রিটে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের বাড়িতে—না, কোনো চিঠি দিয়ে নয়—মুখে এই কথা বলে পাঠাতে যে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ যেন অবশ্যই আজ দুপুরে বাজারের হোটেলে আসেন, সেখানে দুজনে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাবেন। আমি গিয়ে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচকে তাঁর বাড়িতে পাইনি। আমি যেতে

যেতে আটটা হয়ে গিয়েছিল। 'ছিলেন, কিন্তু একেবারেই চলে গেছেন'—এই ছিল তাঁর বাড়িউলির কথা। ওঁদের দুজনের মধ্যে কোনো সাঁট আছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন ঠিক মুহূর্তে গিয়ে হয়তো দেখবে ওই হোটেলেই বসে আছেন ভাই ইভান ফিয়োদরভিচের সঙ্গে, কেন না ইভান ফিয়োদরভিচ দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি আসেননি, এদিকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ ঘণ্টাখানেক আগে একলাই খাওয়া দাওয়া সেরে এখন শুয়ে বিশ্রাম করছেন। তবে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার কথা তাঁকে বলবে না এবং আমিই যে এসব কথা জানিয়েছি ঘুণাক্ষরেও তাঁকে বলবে না, জানতে পারলে অযথা আমাকে মেরেই ফেলবে।"

"তাহলে বলছ দাদা ইভান দ্মিত্রিকে আজ হোটেলে খেতে নিমন্ত্রণ করেছে?" আলিয়োশা চটপট ঘুরিয়ে প্রশ্ন কর।

"ঠিক তা-ই।"

"বাজারের সেই 'মহানগর' হোটেলে তো?"

"হ্যাঁ, ওখানেই।"

"এটা খুবই সম্ভব।" আলিয়োশা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। "ধন্যবাদ স্মের্দিকোভ্। খবরটা অত্যন্ত জরুরি। এখনই ওখানে যাচ্ছি।"

"আমাকে ঝুলিয়ে দিয়ো না কিন্তু", আলিয়োশা যেতে উদ্যত হলে পিছন থেকে স্মের্দিকোভ্ বলে উঠল।

"না, না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি এই যেন ঘুরতে ঘুরতে হুট করে এসে পড়লাম এমনি ভাব করে হোটেলে ঢুকব।"

"আরে চললেন কোথায়? দাঁড়ান, আমি আপনাকে ফটকটা খুলে দিচ্ছি", মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে বলল।

"না, এই পথে বেশি কাছে হবে, এবারে বেড়া ডিঙিয়ে যাব।"

এই সংবাদে আলিয়োশা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি হোটেলের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু সন্ন্যাসীর জোব্বা পরে হোটেলে ঢোকা তার কাছে অশোভন বলে মনে হল, তবে হোটেলে ঢোকার পথে সিঁড়ির মুখ থেকে ভাইদের খোঁজখবর নিয়ে তাদের ডেকে পাঠানো যায় বটে। কিন্তু হোটেলের কাছাকাছি এসেছে কি আসে নি, অমনি হোটেলের একটা জানলা খুলে গেল, মুখ বাড়িয়ে ওপর থেকে তাকে চেঁচিয়ে ডাকছে আর কেউ নয়—স্বয়ং তার দাদা ইভান।

"এখন আমার কাছে এখানে একবার আসতে পারিস কি আলিয়োশা? এলে কিন্তু আমার খুবই উপকার হয়।"

"খুব পারি, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই পোশাক পরে আমার ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে কিনা

"তাতে কোনও অসুবিধে নেই, আমি আলাদা ঘর নিয়ে আছি। বাইরের বারান্দায় উঠে আয়, আমি একছুটে নেমে এসে তোর সঙ্গে দেখা করছি।

এক মিনিট পরে দেখা গেল আলিয়োশা তার দাদা ইভানের পাশাপাশি বসে আছে। ইভান একাই দুপুরের খাওয়া সারছিল।

## তিন

## ভাইয়ে-ভাইয়ে আলাপ পরিচয়

ইভান অবশ্য আলাদা ঘর নিয়ে হোটেলে ছিল না। ঘর বলতে ছিল জানলার ধারে ঘরের একটা অংশমাত্র—আলাদা করে পর্দা দিয়ে ঘেরা। তবে এমন ভাবে আলাদা করা যে পর্দার আড়ালে যারা বসে আছে বাইরে থেকে তাদের চোখে পড়ে না। এটা বাইরের ঘর, হোটেলে ঢোকার মুখে প্রথম ঘর, পাশের দেয়াল জুড়ে বার-কাউণ্টার। সেখানে ওয়েটাররা অনবরত যাতায়াত করছে। খদ্দের বলতে ঘরে আছে কেবল একজন বুড়োমতন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারির লোক—এক কোনায় বসে বসে চা পান করছে। তবে বাকি ঘরগুলিতে হোটেলের যথারীতি কর্মব্যস্ততা, কানে ভেসে আসছে ওয়েটারদের উদ্দেশে হাঁকডাক, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বিয়ারের ছিপি খোলার ফটাফট আর বিলিয়ার্ড বলে কাঠি মারার আওয়াজ। একটা অর্গ্যানও বাজছে। আলিয়োশা জানত যে ইভান সচরাচর এই সরাইখানায় আসে না—শুধু তা-ই নয়, এসব জায়গায় যাবার কোনো শখই তার নেই। আলিয়োশা মনে মনে ভাবল, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে দ্‌মিত্রির সঙ্গে দেখা করবে বলেই বিশেষভাবে এই জায়গাটা সে বেছে নিয়েছে। অথচ দ্‌মিত্রির দেখা নেই।

"তোর জন্য এখন মাছের স্যুপ্-টুপ কিছু একটা অর্ডার দেব। শুধু চা খেয়ে তো আর তুই থাকিস না", ইভান যে-ভাবে চিৎকার করে বলল তাতে মনে হল আলিয়োশাকে ধরে আনতে পেরে সে ভারি খুশি। তার নিজের অবশ্য ততক্ষণে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকে গিয়েছিল। আলিয়োশা যখন ঢুকল তখন সে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল।

"মাছের স্যুপ্ আনতে বল, পরে চাও চলবে। বড্ড খিদে পেয়েছে", আলিয়োশা -উল্লসিত হয়ে বলল।

"চায়ের সঙ্গে চেরির জ্যাম চলবে তো? ওদের এখানে তাও আছে। তোর মনে আছে, ছোটোবেলায় পলিয়েনভ্‌দের বাড়িতে থাকতে চেরির জ্যাম খেতে কত ভালোবাসতিস?"

"তোমার তাহলে মনে আছে? তা হ্যাঁ, চেরির জ্যামও বলে দাও। আমি এখনও ভালোবাসি।"

ইভান বেল বাজিয়ে ওয়েটারকে ডেকে মাছের স্যুপ, চা আর চেরির জ্যাম আনতে বলল।

"আমার সব মনে আছে আলিয়োশা। সেই তোর বয়স যখন এগারো আর

আমার পনেরো তত দিন পর্যন্ত। পনেরো আর এগারো—এটা এমনই তফাত যে বয়সের ওই তফাতে, ওই বয়সে ভাইয়ে-ভাইয়ে কখনও বন্ধুত্ব হয় না। এমনকি তোকে ভালোবাসতাম কিনা তাও জানি না। মস্কোতে চলে যাবার পর প্রথম কয়েক বছর তো তোর কথা আমার একবারও ভুলেও মনে হয়নি। তারপর তুই নিজেও যখন মস্কোতে এসে পড়লি তখন আমার যতদূর মনে পড়ে মাত্র একবারই কোথায় যেন আমাদের দেখা হয়েছিল। এই এখন এখানে তিন মাসের ওপরে আছি, আজ পর্যন্ত আমাদের দুজনের মধ্যে একটি কথাও হয়নি। কাল আমি চলে যাচ্ছি, এখন এখানে বসে বসে তাই ভাবছিলাম ওর সঙ্গে একবার দেখা হলে কী ভালোই না হত! ওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যেত। ঠিক এমন সময় দেখি তুই পাশ দিয়ে যাচ্ছিস।"

"আমাকে দেখার খুবই ইচ্ছে ছিল বুঝি তোমার?"

"খুব। আমি চাই চিরকালের জন্য তোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় আর তুইও আমাকে চিনে নিস। তারপর বিদায়। আমার মতে, কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে গেলে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগের মুহূর্তে করাটাই সব চাইতে ভালো। এই তিন মাস ধরে তুই আমাকে কী ভাবে দেখেছিস তা আমি লক্ষ করেছি। তোর সেই দৃষ্টির মধ্যে আমি লক্ষ করেছি নিরন্তর একটা প্রত্যাশার ভাব। কিন্তু ঠিক এটাই আমার সহ্যের বাইরে, এই কারণেই আমি আর এগোইনি। কিন্তু শেষকালে আমি তোকে শ্রদ্ধা করতে শিখলাম ভাবলাম, না, এই ছোটো মানুষটি তার নিজের জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে রাখবি, যদিও আমি হাসতে হাসতে বলছি, কিন্তু যা বলছি তা গুরুত্ব দিয়েই বলছি। তুই তোর নিজের জায়গায় অটল—ঠিক কিনা? এই ধরনের দৃঢ় চরিত্রের লোকই আমার পছন্দ—তা তার অবস্থান যা-ই হোক না কেন, আর সে লোক হলই না হয় তোর মতো একটা বাচ্চা ছেলে। তোর ওই দৃষ্টির মধ্যে যে প্রত্যাশার ভাব সেটাও শেষ কালে আমার কাছে আর অপ্রীতিকর ঠেকত না, বরং শেষকালে ভালোই লাগতে লাগল তোর চোখের ওই দৃষ্টি। আমার মনে হচ্ছে তুই কেন যেন আমাকে ভালোবাসিস—তাই না আলিয়োশা?"

"ভালোবাসি বৈ কি। দাদা দ্‌মিত্রি তোমার সম্পর্কে বলে—ইভান গোপন স্বভাবের, একেবারে কবরের মতো। কিন্তু আমি বলি তুমি একটা প্রহেলিকা। তুমি এখনও আমার কাছে একটা প্রহেলিকা, তবে কিছুটা তোমাকে যেন বুঝতে শুরু করেছি—তাও এই সবে আজ সকাল থেকে।"

"সেটা আবার কী রকম?" ইভান হাসল।

"তুমি রাগ করবে না তো?" আলিয়োশাও হাসতে লাগল।

"বলই না।"

"বুঝেছি এই যে তুমিও তেইশ বছরের আর দশটা তরুণের মতো, তাদের

মতোই তরুণ, একেবারে ছেলেমানুষ,. তরতাজা, চমৎকার একটি ছেলে, নিতান্তই কচি, পাখির ছানা যাকে বলে আর কি! কী হল? খুব অপমান বোধ করলে তো?”

“একদম না, বরং একটা জায়গায় কী করে অমন মিলে গেল ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি!” প্রবল উত্তেজনায় ও উল্লাসে ফেটে পড়ল ইভান। “তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, আজ সকালে কাতিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর থেকে নিজের সম্পর্কে আমি খালি এই কথাই ভেবেছি, আমি যে তেইশ বছরের একটা ছেলেমানুষ নেহাৎই একটা পাখির ছানা শুধু এই কথাই ভেবেছি—এমন সময় তুই কিনা ঠিক সেটা ধরে ফেললি আর এটা নিয়েই কথা শুরু করলি! আমি এখানে বসে বসে আপন মনে কী বলছিলাম জানিস? জীবনে যদি আমার কোনো আস্থা না থাকে, যে নারীকে আমি ভালোবেসেছিলাম তার ওপর যদি আমি বিশ্বাস হারিয়েও ফেলি, সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মের ওপর যদি আমার আস্থা চলে যায়, এমনকি উলটে যদি আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে থাকে যে সংসারের সব কিছু চরম বিশৃঙ্খল, অভিশপ্ত, হয়তো বা শয়তানের অনাসৃষ্টি, মানুষের মোহভঙ্গের যাবতীয় বিভীষিকা যদি আমাকে আচ্ছন্ন করে থাকে, তবু আমি কিন্তু বেঁচে থাকতে চাইব। জীবনের এই পানপাত্রে একবার যখন ঠোঁট ঠেকিয়েছি তখন পানীয়ের পুরোপুরি স্বাদ না নিয়ে আমি ছাড়ব না। তবে হ্যাঁ, ত্রিশ বছর বয়স হলে তখন পানপাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিলেও দিতে পারি, এমনকি নিঃশেষে পান না করতে পারলেও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে পারি—কোথায়, তা অবশ্য আমার জানা নেই। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি জানি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সব কিছুর ওপরে,—যে-কোনো মোহভঙ্গ, জীবনের যে-কোন বিতৃষ্ণাকে ছাড়িয়ে জয়ী হবে আমার যৌবনের শক্তি। আমি বহুবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি পৃথিবীতে এমন কোনো হতাশা আছে কি যা আমার ভেতরকার এই উন্মত্ত, হয়তো বা অসঙ্গত এই জীবনতৃষ্ণাকে জয় করতে পারে? শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ওরকম কোনো কিছু নেই বলেই মনে হয়—অর্থাৎ, আবারও বলছি, আমার সেই ত্রিশ বছর বয়সে পর্যন্ত—তারপর নিজেরই আর সাধ হবে না, আমি অন্তত তা-ই মনে করি। কোনো কোনো ক্ষয়রোগগ্রস্ত শিকনি ঝরা নীতিবাগীশ—বিশেষত কবিরা—এই জীবনতৃষ্ণাকে নীচুস্তরের কামনা বলে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য অংশত কারামাজভীয় বটে, এটা সত্য, জীবনের এই তৃষ্ণা—তা সে যা-ই হোক না কেন—তোর মধ্যেও অবশ্যই আছে—কিন্তু তাই বলে তা নিচুস্তরের হতে যাবে কেন? কেন্দ্রাভিগ শক্তি আমাদের এই গ্রহে এখনও ভয়ানক বেশি পরিমাণে আছে, আলিয়োশা। আমি বাঁচতে চাই এবং আমি বেঁচে আছি, যদিও এই বাঁচার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। মানলাম সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মের ওপর আমার কোন আস্থা নেই, কিন্তু বসন্তকালে যখন চটচটে কষ গায়ে মেখে কিশলয় বেরিয়ে আসে[৮৫] তখন সে দৃশ্য দেখতে আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি এই নীল আকাশ, ভালোবাসি কোনো কোনো মানুষকে, যাদের—

বললে বিশ্বাস করবি কিনা জানি না—কোনো কোনো সময়, কেন ভালোবাসি তাও আমার জানা নেই। আমার ভালো লাগে মানুষের কোনো কোনো মহৎ কীর্তি। সে সব নীতর ওপর হয়ত আজ বহুকাল হল আমার আর কোনো আস্থা নেই, কিন্তু তাহলেও পুরনো অভ্যাসবশত আমি মনে মনে সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি।

এই যে তোর মাছের স্যুপ এসে গেছে। নে, ভালো করে খা। মাছের স্যুপটা চমৎকার, এরা ভালোই করে।... ইউরোপটা একবার ঘুরে আসার ইচ্ছে আছে, আলিয়োশা। এখান থেকেই যাব। অবশ্য এও জানি যে আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা একটা সমাধিক্ষেত্র—তবে খুবই দামি সমাধিক্ষেত্র—এই যা! সেখানে যাঁরা আছেন তাঁরা সব নামিদামি লোকজন। প্রতিটি সমাধি ফলকে লেখা আছে প্রাচীনের কত শত উদগ্র জীবনের কাহিনি, কত মানুষের কত কীর্তিগাথা, তাদের কত সত্য, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনার কতই না নিদর্শন! আমি জানি, আমি আগে থাকতেই বলে দিতে পারি, এসব দেখেশুনে আমি বিহ্বল হয়ে সেখানকার মাটিতে লুটিয়ে পড়ব, সেই সব সমাধিফলক আমি চুম্বন করব, আবেগে সেগুলোর ওপর অশ্রুবিসর্জন করব, তবে আমার মনে মনে এই দৃঢ়বিশ্বাসও থাকবে যে এই জায়গাটা বহুকাল আগেকার এক সমাধিক্ষেত্র বৈ আর কিছু নয়। আর আমি যে চোখের জল ফেলব সেটা দুঃখে নয়, হতাশায় নয়, স্রেফ এই কারণে যে চোখের জল ফেলে আমি সুখ পাব। আমি আমার নিজের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেসে যাব। আমি যা ভালোবাসি তা হল চটচটে কষ মাখা বসন্তের কিশলয়, নীল আকাশ—আর কী চাই। কোনো বুদ্ধি নয়, যুক্তিতর্ক নয়, এখানে ভালোবাসতে হয় অন্ত্র দিয়ে, জঠর দিয়ে; এ ভালোবাসা যৌবনের প্রথম শক্তিকে ভালোবাসা।... আমার এই আগড়ম বাগড়ম কথার মাথামুণ্ডু কিছু কি তুই বুঝতে পারছিস আলিয়োশা?" ইভান হঠাৎ হেসে উঠল।

"বেশ ভালোই বুঝতে পারছি দাদা অন্ত্র দিয়ে, জঠর দিয়ে ভালোবাসার ইচ্ছে—এটা তুমি চমৎকার বলেছ কিন্তু। আর বেঁচে থাকার জন্য তোমার এই যে এত ব্যাকুলতা এতেও আমি দারুণ খুশি", আলিয়োশা উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল। "আমার মনে হয় পৃথিবীতে সকলের উচিত সবের ওপরে জীবনকে ভালোবাসা।"

"সবের ওপর জীবনকে ভালোবাসা—এর অর্থ কী?"

"অবশ্যই এই যে যুক্তিতর্কের ওপরে ভালোবাসা—যে কথা তুমি বলেছ। হ্যাঁ, অবশ্যই যুক্তিতর্কের ওপরে—একমাত্র তাহলেই এর অর্থ বোধগম্য হবে। এটাই তো আমি এতকাল হল ভেবে এসেছি। তোমার অর্ধেক কাজ কিন্তু এখানে সারা হয়ে গেল। যা পাবার তার অর্ধেক তুমি পেয়ে গেছ দাদা তুমি জীবনকে ভালোবেসেছ। এখন বাকি অর্ধেকটা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে তোমাকে—সেটা করতে পারলে তুমি উদ্ধার পেয়ে গেলে।"

"তুই উদ্ধার করবি কী রে! আমি সম্ভবত ধ্বংস হতে যাচ্ছিলামও না। তা তোর ওই বাকি অর্ধেকটা কী শুনি?"

"সেটা হল এই যে তোমার ওই মৃতদের পুনরুত্থান ঘটাতে হবে। এমনও হতে পারে তাদের আদৌ মৃত্যু হয়নি, কখনও হয়নি। আনো দেখি তোমার চা। আমরা যে কথা বলছি এর জন্য আমার আনন্দ হচ্ছে, দাদা।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি তোর মধ্যে কীসের যেন একটা প্রেরণা কাজ করছে। এ ধরনের 'professions de foi'—কারও নিজের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এই এরকম দীক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনতে আমার দারুণ ভালো লাগে। তোর চরিত্রের দৃঢ়তা আছে আলেক্সেই। আচ্ছা, একথা কি সত্যি যে তুই মঠ ছেড়ে আসতে চাইছিস?"

"হ্যাঁ সত্যি। আমার প্রভু আমাকে সংসারে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

"তাহলে সংসারে আবার আমাদের দেখা হবে। দেখা হবে আমার তিরিশ বছর বয়স হওয়ার মুখে, যখন আমি জীবনের পানপাত্র সরিয়ে রাখতে যাচ্ছি। বাবা অবশ্য ওটা সরিয়ে রাখতে রাজি নয় সত্তর বছরের আগে—শুধু তা-ই নয়, তার স্বপ্ন এই যে আশি বছরের আগে তা করবে না—একথা নিজের মুখে বলেছে। এদিকে ভাঁড় হলে কী হবে, রীতিমতো গুরুত্ব দিয়েই বলেছে। বাবা সবেতেই পাথরের মতো অনড়, তার কামনা বাসনার বেলাতেও তাই।... যদিও তিরিশ বছরের পর, সত্যি বলতে গেলে কি, সম্ভবত শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর কোথাও কোনও জায়গা থাকে না— কেবল এই একটি জায়গা ছাড়া। কিন্তু তাই বলে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত! নাঃ সেটা বড়োই যা-তা। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্তই ভালো ওই পর্যন্ত নিজেকে ফাঁকি দিয়ে নিজের 'মহত্ত্বের রেশটুকু' ধরে রাখা যেতে পারে। ভালো কথা, আজ দ্মিত্রিকে দেখেছিস নাকি?"

"না দেখিনি, তবে স্মের্দিকোভ্‌কে দেখেছি।" এরপর আলিয়োশা তাড়াতাড়ি করে সবিস্তারে স্মের্দিকোভের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বর্ণনা দিল। ইভান হঠাৎ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে শুনতে লাগল, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে আরও কিছু জেনে নিল।

"শুধু আমাকে অনেক করে বলেছে দ্মিত্রি সম্পর্কে যা বলেছে তা যেন দ্মিত্রিকে বলে না দিই", আলিয়োশা যোগ করল।

ইভান ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল।

"তুমি কি স্মের্দিকোভের কথা ভেবে ভুরু কোঁচকাচ্ছ নাকি?" আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

"হ্যাঁ, ওর কথা ভেবেই বটে। তা মরুক গে ওটা। দ্মিত্রির সঙ্গে আমি বাস্তবিকই দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর দরকার নেই ..." অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইভান কথাটা বলে ফেলল।

"তুমি কি সত্যি সত্যি শিগ্‌গিরই চলে যাচ্ছ না কি দাদা?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বাবা আর দ্‌মিত্রি—এদের কী হবে? দুজনের ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে?" আলিয়োশার কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

"তোর সেই এক কথা! আমি তার করবটা কী? আমি আমার ভাই দ্‌মিত্রির পাহারাদার নাকি?" বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল ইভান, কিন্তু পরক্ষণেই আচমকা তিক্ত হাসি হেসে সে বলল, "ভাই আবেল কোথায় — ঈশ্বরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভ্রাতৃহন্তা কেইন ত একথাই বলেছিল, তাই না? তুই কি এই মুহূর্তে ঠিক এটাই ভাবছিস নাকি? মরুক গে যা, তাই বলে তো আর আমি এখানে পাহারাদার হয়ে পড়ে থাকতে পারি না। কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবারে আমার যাবার পালা। ভুলেও এমন কথা ভেবে বসিস না যে দ্‌মিত্রিকে আমি হিংসে করি, আর এই তিন মাস ধরে তার সুন্দরী প্রেয়সী কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে আমি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। চুলোয় যাক! আমার নিজের কিছু কাজ ছিল। কাজ মিটে যেতে এখন চলে যাচ্ছি। সে কাজ যে এই আজ মিটল তুই তার সাক্ষী।"

"আজ কাতেরিনা ইভানভ্‌নার ওখানে যা ঘটল তার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ তাই, এবং আজ থেকে চিরদিনের জন্য আমি বন্ধনমুক্ত হলাম। আর কী? এর পর দ্‌মিত্রিকে দিয়ে আমার কোন্ দরকার? দ্‌মিত্রির কোনও প্রসঙ্গই এখানে উঠতে পারে না। যেটা ছিল তা কাতেরিনা ইভানভ্‌নার সঙ্গে, সে নেহাৎ আমার নিজস্ব কিছু কাজ। তুই নিজেই জানিস, বরং দ্‌মিত্রিই উলটে এমন আচরণ করেছে যাতে মনে হতে পারে যে আমার সঙ্গে তার কোনো সাঁট আছে। আমি ওর কাছে বিন্দুমাত্র অনুরোধ জানাইনি, কিন্তু ও নিজেই কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে ঘটা করে আমার কাছে চালান করে দিয়ে আমাদের দুজনকে ওর আশীর্বাদ জানাল। এ যে রীতিমতো হাস্যকর! না, আলিয়োশা, না, আমি যে এখন কতটা হাল্‌কা বোধ করছি তা তুই বুঝবি না। তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, এই এখানে বসে খেতে খেতে আমার মুক্তির আনন্দের প্রথম প্রহর উপলক্ষে আমি আরেকটু হলেই শ্যাম্পেন অর্ডার দিয়ে ফেলেছিলাম! উঃ, প্রায় ছয় মাস ধরে কী যন্ত্রণায় যে আমি ভুগেছি! সেই যন্ত্রণার উপশম যে এমনই হঠাৎ, এক নিমেষে ঘটে যাবে তা ভাবতে পারিনি! এমনকি গতকালও কি অনুমান করতে পেরেছিলাম যে ইচ্ছে থাকলে এই পালা চুকিয়ে দেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়।"

"তোমার ভালোবাসার কথা বলছ বুঝি?"

"তা চাস তো ভালোবাসাই বলতে পারিস। হ্যাঁ, আমি ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া দিদিমণিটির প্রেমে পড়েছিলাম। তাকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে আমার, সেও আমাকে কম যন্ত্রণা দেয়নি। ওর পেছনে কম সময় নষ্ট করিনি এক নিমেষে কোথায় সব উড়ে গেল। আজ সকালেও আমি যখন কথা বলছিলাম তখন আমার মধ্যে একটা প্রেরণা কাজ করছিল, কিন্তু বিশ্বাস কর, কথা শেষ করে বেরিয়ে আসার পর আমি হো-হো করে হেসেছি। না, আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি।"

"তুমি কিন্তু এখনও বেশ ফুর্তি করেই বলছ", ইভানের মুখে সত্যি সত্যি যে হঠাৎ একটা উৎফুল্ল ভাব ফুটে উঠেছে সেটা লক্ষ করে আলিয়োশা মন্তব্য করল।

"কিন্তু কী করেই বা আমি জানলাম যে আমি ওকে আদৌ ভালোবাসি না! হুঁ-হুঁ! দেখা যাচ্ছে ঠিক তা তো নয়। আহা, ওকে কী ভালোই না লাগত আমার! এমন কি এই কিছু আগেও, যখন আমি ওকে লম্বা চওড়া বক্তৃতা শোনালাম তখনও ওকে কী ভালোই না লাগছিল আমার! এটা জানিস কি, এই এখনও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে; অথচ তা সত্ত্বেও কত সহজেই না ওকে ছেড়ে চলে যাওয়া যায়! ভাবছিস আমি বড়াই করছি?"

"না। তবে এটা হয়তো ভালোবাসা ছিল না!"

"ওরে আলিয়োশা", হাসতে হাসতে ইভান বলল, "ভালোবাসার আলোচনা তুই আর করতে আসিস না। ওটা তোর শোভা পায় না। আজকে, এই আজ সকালেই সেই আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ে তো তুই দেখেছিস। হ্যাঁ, এর জন্য তোকে আদর করে চুমু খাওয়া উচিত ছিল আমার—সেটা ভুলে গেছি। তবে যাই বলিস কী ভোগানোই আমাকে ভুগিয়েছে মেয়েটা! বাস্তবিকই আমি ওর বুকফাটা হাহাকারের সাক্ষী। ওঃ, ঠিক জানত যে আমি ওকে ভালোবাসি! ভালোবাসত আমাকেই, দ্মিত্রিকে ও ভালোবাসত না", উল্লসিত হয়ে জোর দিয়ে বলল ইভান। দ্মিত্রি ওর মনের মধ্যে স্রেফ একটা বুকফাটা হাহাকার জাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র। কাতেরিনা ইভানভ্নাকে আজ যা যা বলেছি সে সবই খাঁটি সত্যি কথা। কিন্তু মুশ্‌কিল একটাই সবচেয়ে বড় কথা এই যে দ্মিত্রিকে সে যে মোটেই ভালোবাসে না, ভালো যদি কাউকে বেসে থাকে সে কেবল আমাকেই, যাকে সে এত যন্ত্রণা দিয়েছে। এটা বুঝতে বুঝতে হয়তো তার পনেরো এমনকি বিশ বছর লেগে যাবে। বলা যায় না, হয়তো কোনো কালেই তা আন্দাজ করতে পারবে না—এমন কি আজকের এই শিক্ষা সত্ত্বেও না। তা সে-ই বরং ভালো: উঠে পড়লাম, উঠেই সোজা বিদেয় হলাম, চিরকালের জন্য দূর হয়ে গেলাম। ভালো কথা, এখন ওর অবস্থাটা কী? আমি চলে যাবার পর ওখানে কী হল?"

আলিয়োশা কাতেরিনা ইভানভ্নার মূর্ছা যাবার কথা বলল, বলল সম্ভবত সে এখন অচৈতন্য অবস্থায় আছে, ভুল বকছে।

"খখ্‌লাকোভা মিথ্যে বলছে না তো?"

"তা তো মনে হয় না।"

"খোঁজ করে দেখতে হয়। তবে এটা ঠিক যে মূর্ছারোগে কেউ কখনও মরে না। হলই না হয় মূর্ছারোগ। ঈশ্বর ভালোবেসে মেয়েদের মূর্ছারোগ দিয়েছেন। আমি মোটেই ওখানে যাচ্ছি নে। কেনই বা আবার নাক গলাতে যাওয়া?"

"এদিকে তুমি আজই তাকে বললে যে সে কখনও তোমাকে ভালোবাসেনি।"

"সেটা আমি ইচ্ছে করে বলেছি। ওরে আলিয়োশা, বলিস তো শ্যাম্পেন আনাই।

আয়, আমার মুক্তির আনন্দে একটু খাওয়া যাক। আঃ কী আনন্দ যে আমার হচ্ছে যদি তুই জানতিস!”

“না ভাই, মদ বরং থাক”, আলিয়োশা হঠাৎ বলে উঠল, “তা ছাড়া আমার মনটাও তেমন ভালো নেই।”

“হ্যাঁ, ভালো অনেক দিন হল নেই, আমি অনেক দিন ধরেই লক্ষ করে আসছি।”

“তা হলে সত্যি সত্যি আগামীকাল সকালেই যাচ্ছ?”

“সকালে? না, সকালের কথা তো বলিনি। তবে হ্যাঁ, বলা যায় না, সকালে হলেও হতে পারে। বিশ্বাস করবি কিনা, আমি যে আজ এখানে দুপুরের খাওয়া খেলাম তার একমাত্র কারণ ওই বুড়োর সঙ্গে যাতে খেতে না হয়—লোকটার ওপর আমার এমনই বিতৃষ্ণা ধরে গেছে! ব্যাপারটা যদি একা তাকে নিয়ে হত তাহলে কবে আমি ওর সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতাম! তা আমি যে চলে যাচ্ছি সে জন্য তোর অত দুশ্চিন্তা কেন? যাবার আগে পর্যন্ত তোর সঙ্গে আমার কথা বলার মতো এখনও অনেক সময় আছে-কত সময় আছে ঈশ্বরই জানেন। অসীম অনন্তকাল পড়ে আছে!”

“কালই যদি চলে যাও তাহলে আর অসীম অনন্তের কথা কী করে আসে?”

“কিন্তু তোর আমার এর সঙ্গে কীসের সম্পর্ক?” ইভান হেসে উঠল। “আরে আমাদের যা কথা বলার আছে তা বলার অবকাশ ঠিকই পাব। কথা তো আমাদের নিজেদের—সেই কারণেই না এখানে আসা? কী হল, অমন অবাক হয়ে তাকাচ্ছিস কেন? আমার প্রশ্নের জবাব দে কী জন্যে আমরা এখানে এসে মিলেছি? কাতেরিনা ইভানভ্নাকে আমি কত ভালোবাসি সে কথা বলতে? বুড়ো আর দ্মিত্রির কথা আলোচনা করতে? বিদেশের প্রসঙ্গ বা রাশিয়ার বেহাল অবস্থা নিয়ে, নাকি সম্রাট নেপোলিয়নকে নিয়ে আলোচনা কর‌তে? তুই কী বলিস? এই জন্যেই কী?”

“না, এই জন্যে নয়।”

“তাহলে, নিজেই বুঝতে পারছিস কীসের জন্যে। অন্যদের কথা বাদ দে, তাদের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু আমরা যারা পাখির ছানার মতো কাঁচা তাদের সবার আগে দরকার সামনে যে অনন্তের প্রশ্ন রয়েছে তার সমাধান করা—এটাই আমাদের উদ্বেগের কারণ। রাশিয়ায় আজ যারা বয়সে কাঁচা ছেলেছোকরা তারা এখন শাশ্বতকালের প্রশ্ন ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আলোচনাই করে না—ঠিক এই আজকের দিনেই — যখন প্রাচীনেরা সবাই হঠাৎ বৈষয়িক সমস্যার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুই গত তিন মাস ধরে যে উৎসুক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতিস তা কীসের জন্যে বল তো? প্রশ্ন করে আমার কাছ থেকে এটাই কি জেনে নেবার উদ্দেশ্যে যে আমার বিশ্বাস কতটা, অথবা আমি একেবারেই অবিশ্বাসী কিনা?— তিন মাস ধরে আমার ওপর তোর চোখের যত দৃষ্টি তার অর্থ হল গিয়ে তাই, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ? তাই তো?”

“সম্ভবত তাই।” আলিয়োশা মৃদু হাসল। “তুমি কিন্তু এখন আমাকে নিয়ে মজা করছ দাদা।”

“আমি? আমি মজা করছি? আমার আদরের ছোটো ভাইটি অমন একটা প্রত্যাশা নিয়ে তিন মাস ধরে যদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সেজন্য কি আমি তার মনে দুঃখ দিতে পারি? আলিয়োশা, আমার দিকে সরাসরি মুখ তুলে তাকা: আমি নিজেও কিন্তু হুবহু তোরই মতো একটা বাচ্চা ছেলে—কেবল তফাতটা এই যে আমি আশ্রমের ব্রতচারী নই। আচ্ছা রুশি ছেলেছোকরাগুলো আজ অবধি যে কাজটা করে আসছে সেটা কী বল দেখি? আরও তো সব আছে? এই ধর না কেন, এখানকার এই পূতিগন্ধময় হোটেলটা—এই রকমই হোটেলে এসে তারা জোটে, একটা কোনার টেবিলে গিয়ে বসে। এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত, কস্মিনকালেও তাদের মধ্যে কোনো জানাশোনা ছিল না, হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার পর চল্লিশ বছরেও তাদের দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তাতে কী হয়েছে? এই যে হোটেলে এই মুহূর্তটি পাওয়া গেল এই সময়টুকুর মধ্যে তাদের আলোচনার বিষয় কী হতে পারে? কী আবার? ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা? অমরত্ব বলে কিছু আছে কি?—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই রকম সব প্রশ্ন না হয়ে যায় না। আবার যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তাদের আলোচনার বিষয় হয় সমাজতন্ত্র নৈরাজ্যবাদ, মানবজাতিকে নতুন করে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজানো—তা সে যা-ই হোক না কেন, হরেদরে দাঁড়াচ্ছে সেই একই একই প্রশ্ন—কেবল ঘুরিয়ে করা—এই যা তফাত। দস্তুরমতো মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী এমন অনেক, অনেক, অসংখ্য রুশ ছেলেছোকরা আছে যারা আজকাল, আমাদের এই সময় একমাত্র কাজ বলতে যা করে থাকে তা হল শাশ্বতকালের প্রসঙ্গে কথা বলা। ঠিক বললাম কিনা?”

“হ্যাঁ যা বলেছ। সত্যিকারের রুশিদের কাছে যেটা প্রশ্ন তা এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি না, অমরত্ব আছে কিনা, অথবা এই যেমন তুমি বললে—ওই প্রশ্নগুলোই ঘুরিয়ে করা। অবশ্যই, প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন। তা-ই তো হওয়া উচিত”, এই বলে আলিয়োশা সেই আগের মতো মৃদু হেসে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

“দ্যাখ আলিয়োশা, রুশ মানুষ হওয়া অনেক সময় আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কিন্তু সে যাই হোক না কেন রুশ ছেলেছোকরারা আজকাল যা নিয়ে মেতে থাকে, তার চেয়ে বোকামির কাজ আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু একটা রুশ ছেলে আছে—আলিয়োশা যাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।”

“আহা, কী চমৎকার গুছিয়ে বললে!” আলিয়োশা হঠাৎ হেসে উঠল।

“আচ্ছা এবারে বল কী দিয়ে শুরু করা যায়। তুই নিজেই বল, কী আজ্ঞা হয়। ঈশ্বর দিয়ে শুরু করব? ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা?”

“যা দিয়ে খুশি শুরু করতে পার—এমনকি ‘ঘুরিয়ে’ অন্য দিক থেকে করলেও

আপত্তি নেই। কিন্তু কালই তো তুমি বাবার ওখানে বলেছিলে যে ঈশ্বর নেই।” কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল আলিয়োশা।

“গতকাল বুড়োর ওখানে যাবার সময় ওকথা ইচ্ছে করে তোকে হটিয়ে দেবার জন্য বলেছিলাম, দেখলাম তোর চোখদুটো কেমন ধক্ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু এখন এ বিষয়ে তোর সঙ্গে আলোচনা করতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই। কথাটা কিন্তু আমি খুব গুরুত্ব দিয়েই বলছি। আমি চাই তোর সঙ্গে আমার মিলমিশ হোক, আলিয়োশা, কেন না আমার কোনো বন্ধু নেই, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। তা ভেবে দ্যাখ একবার, এমনও তো হতে পারে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি মেনে নিচ্ছি?” হাসতে হাসতে ইভান বলল, “এটা তুই আশাই করতে পারিস না— তাই তো?”

“হ্যাঁ তা বটে, অবশ্য এখনও যদি তুমি ঠাট্টা না করে থাক।”

“ঠাট্টা বলছিস? সে তো গতকাল মহাস্থবিরের ওখানে এমন মন্তব্য শুনেছি যে আমি নাকি ঠাট্টা করছি। বুঝলি ভাই, শোন তা হলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন পুরনো পাপী ছিল যে এমন উক্তি করেছিল যে ঈশ্বর যদি নাও থাকেন তাহলে তাকে উদ্ভাবন করে নিতে হয়—s'il n'existait pas Dieu it faudrait l' inventer[৬৪]। মানুষ বাস্তবিকই ঈশ্বরকে উদ্ভাবন করেছে। আর যা ভেবে অবাক হতে হয় যেটা বিস্ময়কর হতে পারত সেটা এই নয় যে ঈশ্বর সত্যি সত্যি আছেন; বিস্ময়কর এই যে এরকম একটা চিন্তা—ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা—যা এত পবিত্র, এত মর্মস্পর্শী, এত জ্ঞানগর্ভ, আর মানুষের পক্ষে এত সম্মানজনকও বটে, তা কী করে মানুষের মতো এমন একটা বন্য ও হিংস্র প্রাণীর মাথায় আসতে পারল! আমার কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে না ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে এই নিয়ে মাথা ঘামানো আমি আজ অনেক কাল হল ছেড়ে দিয়েছি। বলাই বাহুল্য, এই বিষয়ে আজকালকার রুশ ছেলেছোকরাদের যত স্বতঃসিদ্ধ আছে সেগুলির মধ্যে আমি যাচ্ছি না, ওই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধের সবগুলিই আবার ইউরোপীয়দের কাছে যা অনুমান, প্রমাণসাপেক্ষ পুরোপুরি সেখান থেকে উঠে এসেছে; কারণ ওদের কাছে যা প্রমাণসাপেক্ষ ছেলেছোকরারা তা চট করে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে। শুধু ছেলেছোকরারাই বা কেন, সম্ভবত তাদের আচার্যরাও, কেন না আমাদের রুশ আচার্যরাও আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই রুশ ছেলেছোকরাদেরই মতো। তাই যা অনুমান তাদের সবগুলোকেই আমি বাদ দিচ্ছি। তাহলে আমাদের কাজটা এখন কী? কাজটা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোর কাছে আমার আসল চরিত্রটাকে ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ কিনা আমি লোকটা আসলে কী, কী আমার বিশ্বাস, কী আশা নিয়ে আমি বেঁচে আছি—এই তো? ঠিক বলিনি? আর সেই কারণেই আমি জানাচ্ছি যে ঈশ্বরকে আমি সরাসরি, সহজভাবে গ্রহণ করছি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে ঈশ্বর যদি থাকেন এবং তিনি যদি বাস্তবিকই

পৃথিবী সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে আমরা যেটা খুব ভালো ভাবে জানি তা এই যে, তিনি তা সৃষ্টি করেছেন ইউক্লিডের জ্যামিতিক পদ্ধতিতে, আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তৈরি করেছেন স্রেফ স্থানের ত্রিমাত্রিক ধারণা দিয়ে। এদিকে আবার এমন সব জ্যামিতিবিদ ও দার্শনিক ছিলেন, এমনকি এখনও আছেন—শুধু তা-ই নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার অলোকসামান্যও বটে—যাঁরা এমন সন্দেহও পোষণ করেন যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আরও বিস্তৃত ভাবে, সমগ্র অস্তিত্বটাই হয়তো ইউক্লিডের জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, এমনকি তাঁরা এমন স্বপ্ন দেখারও সাহস রাখেন যে দুটি সমান্তরাল রেখা যা ইউক্লিডের তত্ত্ব অনুযায়ী এই পৃথিবীতে কখনই এক সঙ্গে মিলবে না, হয়তো বা অসীমে কোথাও গিয়ে মিলেমিশে যেতে পারে। আমি ভাই তাই এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমি যখন এটাই বুঝতে পারি না তখন ঈশ্বরকে বুঝতে পারব তা আমি আশা করি কী করে? আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি যে এ ধরনের প্রশ্ন সমাধান করার ক্ষমতা আমার নেই, আমার বুদ্ধিবৃত্তি ইউক্লিডীয়, পার্থিব, তাই যা এই জগতের বাইরে তার মীমাংসা আমরা করব কী করে? আর তোকেও পরামর্শ দিই ভাই আলিয়োশা, এই নিয়ে আর কখনও মাথা ঘামাস নে— বিশেষত ঈশ্বরকে নিয়ে—তিনি আছেন কি নেই এই ব্যাপারে। এসবই এমন ধরনের প্রশ্ন যা শুধুমাত্র ত্রিমাত্রিক ধারণা নিয়ে যে বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টি তার একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ। অতএব ঈশ্বরকে আমি স্বীকার করি, আর সেটা যে কেবল সাধ করে করি তা নয়, পরন্তু আমি স্বীকার করি তাঁর প্রজ্ঞাকে, তাঁর উদ্দেশ্যকে, যদিও সেগুলি আদৌ আমাদের পরিচিত নয়; আমি জীবনের অর্থ ও নিয়মশৃঙ্খলাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি চিরন্তন সুসংগতিতে যার মধ্যে আমাদের সকলেরই একদিন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবার কথা, আমি বিশ্বাস করি 'কথায়', যে কথার জন্য বিশ্বচরাচর নিরন্তর সাধনা করে চলেছে, যে-কথা 'ঈশ্বরে সংলগ্ন' ছিল, যে-কথা নিজেই ঈশ্বর, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এই করে করে অসীম অনন্তে চলে যাওয়া যেতে পারে। কথা তো অনেকই তৈরি আছে এ প্রসঙ্গে। মনে হয় আমি ঠিক পথেই আছি—তাই না? কিন্তু ভেবে দ্যাখ, শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই ঈশ্বরের জগৎটাকে আমি স্বীকার করি না। যদিও জানি তা আছে, কিন্তু আদৌ মেনে নিতে পারি না। আমার কথাটা তুই বোঝার চেষ্টা কর—এই নয় যে আমি ঈশ্বরকে স্বীকার করি না, আমি যা স্বীকার করি না তা হল তাঁর তৈরি এই জগৎটা। সেটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। তাহলে বুঝিয়ে বলি শোন। অবোধ শিশুর মতো আমিও বিশ্বাস করি যে দুঃখকষ্টের অবসান ঘটবে, তার কোনও চিহ্ন থাকবে না, মানুষে মানুষে যে বিরোধিতা, মানুষের অপমানের যে গ্লানি, যা প্রহসনেরই নামান্তর সে সব এক দিন মিথ্যা মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাবে, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ মানব মনের অণুপরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষীণ ঘৃণ্য অলীক চিন্তার মতোই অদৃশ্য হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত, পৃথিবীর অন্তিমদশায়, চিরন্তন সুসংগতির পরম লগ্নে এমনই

একটা কিছু ঘটবে যা প্রকটিত হয়ে উঠবে, যার মূল্য এতই বেশি যে মানবজাতির সমস্ত হৃদয়ের সেখানে স্থান হবে, আর তাতে মানুষের যত ক্ষোভ, যত জ্বালাযন্ত্রণা সে সবের উপশম ঘটবে, মানুষ আজ পর্যন্ত যত রক্ত ঝরিয়েছে যত অপরাধ সে করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং মানুষকে ক্ষমা করা তো বটেই, এমনকি মানবজাতির ইতিহাসে যা যা ঘটেছিল তার কৈফিয়ত দেওয়াও সম্ভব হবে। বেশ তো, তাই না হয় হল, এ সবই না হয় ঘটল, কিন্তু আমি এটা মেনে নিতে পারছি না, আমার মন এতে সায় দেয় না! এমনকি সমান্তরাল দুই রেখা কোথাও যদি মিলেও যায়, আমি যদি নিজের চোখে তা দেখিও এবং দেখে যদি বলিও হ্যাঁ মিলেছে, তবু আমি মানব না। এই হল আমার সার কথা। এটাই আমার তত্ত্বকথা, আলিয়োশা। এটা আমি গুরুত্ব দিয়েই তোকে বলছি। আমি ইচ্ছে করেই আমাদের আলোচনাটা যত দূর সম্ভব বোকার মতো ভাব করে শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ করলাম আমার অকপট স্বীকারোক্তি দিয়ে, কারণ ঠিক এটাই তোর জানা দরকার ছিল। তোর যেটা জানা দরকার ছিল তা ঈশ্বর প্রসঙ্গে নয়, আসলে তুই শুধু এটাই জানতে চেয়েছিলি যে তোর ভালোবাসার পাত্র এই দাদাটি কী ধরনের চিন্তাভাবনা নিয়ে জীবন ধারণ করছে। আমিও সে কথাই তোকে বললাম।”

বিশেষ ধরনের এক হৃদয়াবেগের সঙ্গে ইভান যে ভাবে আচমকা তার দীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তৃতা শেষ করল তা অপ্রত্যাশিত ছিল।

“কিন্তু ‘যতদূর সম্ভব বোকার মতো ভাব করে’ শুরু করেছিলে কেন বল তো?” চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আলিয়োশা জিগ্গেস কর।

“সে, প্রথমত, অন্তত রুশিয়ানার খাতিরে এই বিষয়ে রুশিদের যত কথা সে সবই চলে ‘যতদূর সম্ভব বোকার মতো’ পথে। দ্বিতীয়ত, আবার যত বেশি বোকার মতো তত বেশি কাজের কাছাকাছি। যত বেশি বোকার মতো তত বেশি পরিষ্কার। নির্বুদ্ধিতা স্বল্পস্থায়ী, ছলাকলাহীন, কিন্তু বুদ্ধি আঁকাবাঁকা পথে চলে, লুকিয়ে চুরিয়ে থাকে। বুদ্ধি শঠ, কিন্তু নির্বুদ্ধিতার পথ সোজা ও অকপট। আমি বিষয়টাকে যে পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছি সেটা আমার পক্ষে নৈরাশ্যজনক, আর যত বেশি আহাম্মকের মতো তাকে তুলে ধরেছি আমার পক্ষেই তা তত বেশি ভালো হয়েছে।”

“জগৎটাকে তুমি যে কেন স্বীকার কর এবারে তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলবে তো?” আলিয়োশা বলল।

“বলব বৈ কি, অবশ্যই বলব। এ কোনো গোপন কথা নয়। সেটা বলব বলেই তো এত কথা। আলিয়োশা, ভাই, আমি তোকে নষ্ট করতে চাই না; তোকে তোর জায়গা থেকে সরিয়ে আনতে চাই না; বলা যায় না, হয়তো তোর সাহায্যেই আমি নিজেকে নিরাময় করতে চাই।”

ইভান হঠাৎ একেবারে শান্তশিষ্ট একটা বাচ্চা ছেলের মতো হাসি হাসল। এমন হাসি ইভানের মুখে আলিয়োশা আর কখনও দেখেনি।

## চার

## বিদ্রোহ

ইভান বলতে শুরু করল "একটা কথা তোর কাছে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। লোকে তার নিকট প্রতিবেশীকে কী ভাবে ভালোবাসতে পারে আমি তা কখনও বুঝতে পারিনি। আমার মনে হত, যারা দূরের লোক তাদের যাও ভালোবাসা যায়, যারা কাছের তাদের তো একেবারেই অসম্ভব। আমি কোথায় যেন করুণাময় যোহান[৬৩] নামে এক সাধুর কথা পড়েছিলাম। কোনও এক সময়, ক্ষুধায় কাতর পথ চলতি একটি লোক রাস্তায় জমে গিয়ে তাঁর কাছে এসে উঠেছিল, সাধুকে সে তার নিজের শরীর সেঁক দিয়ে গরম করার প্রার্থনা জানালে সাধু তার সঙ্গে একই শয্যায় শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন এবং কোনো এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকটার গলিত ক্ষতভুক্ত মুখ থেকে উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও তার হাঁ-করা মুখের ভেতরে নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি এ কাজটা করেছিলেন মিথ্যা আকুলতা ও আবেগ থেকে, এর পেছনে ছিল প্রেমের কর্তব্যপালনের আজ্ঞানুসরণ, নিজেই নিজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া প্রায়শ্চিত্তের তাগিদ। কাউকে ভালোবাসতে গেলে ভালোবাসার সেই পাত্রটিকে আড়ালে থাকতে হয়, নইলে যেই সে তার মুখখানি একটু দেখাল, অমনি ভালোবাসাও উবে গেল।"

"এই কথাই তো একাধিকবার বলেছেন মহাস্থবির জোসিমা", আলিয়োশা মন্তব্য করল, "তিনি একথাও বলেছেন যে সব লোকের এখনও ভালোবাসার অভিজ্ঞতা হয়নি মানুষের মুখ অনেক সময় তাদের অনেকের ভালোবাসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা হলেও মানবজাতির মধ্যে প্রভূত পরিমাণ প্রেমের অতুলনীয় নিদর্শনও যে আছে তা আমি নিজে জানি, দাদা। সে প্রেম খ্রিস্টের প্রেমের সমতুল।

"হবেও বা। কিন্তু আমি এখনও তা জানিনে, বুঝতেও পারি না; আর আমার মতো অসংখ্য অগণিত মানুষও সে প্রেমের পরিচয় পায়নি। প্রশ্নটা আসলে এই যে এর কারণ মানুষের অপগুণ কিনা, নাকি মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা নিহিত। আমার ধারণা মানুষের প্রতি খ্রিস্টের যে প্রেম তা এক ধরনের অলৌকিক ব্যাপার যা এই পৃথিবীতে ঘটা সম্ভব নয়। অবশ্য এটা সত্যি যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু আমরা তো আর ঈশ্বর নই। মনে কর, এই ধর না কেন আমি—আমি হয়তো তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি, কিন্তু আমি যে কতদূর কষ্ট পাচ্ছি অন্যের পক্ষে তা কখনই জানা সম্ভব নয়, কারণ সে তো আর আমি নই, সে অন্য লোক। তার চেয়েও বড়ো কথা, মানুষ কদাচিৎ অন্য কাউকে পীড়িত বলে স্বীকার করতে রাজি হবে—ভাবটা এই যে ওই স্বীকৃতিটা যেন কোনো পদমর্যাদার স্বীকৃতি। কেন রাজি হবে না? তোর কী মনে হয়? তার কারণ, এই ধর না কেন, আমি একটা দুর্গন্ধের আধার, আমার মুখটা বোকা-বোকা, অথবা আমি কোনো এক সময় একবার তার

পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাছাড়া যন্ত্রণা তো যন্ত্রণা— আছে এমন যন্ত্রণা যা মানুষকে অসম্মানের দিকে ঠেলে দেয়, এই যেমন, ক্ষুধার জ্বালা—আমার মান সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে; এক্ষেত্রে আমি কোনো শুভানুধ্যায়ী পেলেও পেতে পারি। কিন্তু যেই যন্ত্রণাটা একটু উচ্চস্তরের হল—যেমন কোনো আদর্শের জন্য মানসিক যন্ত্রণা—তখন কদাচিৎ কোনো সমব্যথী পাওয়া যাবে। কারণ সে লোকটা আমার দিকে তাকাতে হঠাৎই দেখতে পেল তার কল্পনায় অমুক ভাবাদর্শের জন্য যে মানুষ যন্ত্রণা পায় তার চেহারা যেমন হওয়া উচিত আমাকে সে রকম দেখাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর থেকে তার সমবেদনা চলে গেল—তবে সেটা কিন্তু আদৌ তার কুটিল মনের পরিচায়ক নয়। ভিখিরি— যদি সে ভিখিরি বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত ধরনের হয় তা হলে অবশ্যই প্রকাশ্যে কখনও ভিখিরির ভাব দেখাবে না, তার উচিত হবে খবরের কাগজের মাধ্যমে ভিক্ষার জন্য আবেদন জানানো। তত্ত্বগত ভাবে কাছের মানুষকে ভালোবাসা গেলেও যেতে পারে, এমনকি অনেক সময় দূর থেকে পর্যন্ত ভালোবাসা যেতে পারে, কিন্তু কাছ থেকে, বলতে গেলে কখনও নয়। সব যদি মঞ্চের নৃত্যনাট্যের দৃশ্যের মতো হত, যেখানে ভিখারিদের ছেঁড়া লেসের কাজ করা শতচ্ছিন্ন রেশমি জামাকাপড় পরে ঘুরে ঘুরে, লীলায়িত ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে ভিক্ষা করতে দেখা যায়, তাহলে তখনও কিন্তু তাদের দেখে মুগ্ধ হওয়া যেত। মুগ্ধ হওয়া যেত, তাই বলে তাদের ভালোবাসা যেত না। যাক গে, অনেক কচকচানি হয়েছে এই নিয়ে। আমার শুধু যেটা দরকার ছিল তা হল আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা তোর সামনে তুলে ধরা। আমি চেয়েছিলাম সাধারণ ভাবে মানবজাতির দুঃখকষ্ট নিয়ে কথা বলতে, কিন্তু তা না করে বরং শুধু শিশুদের যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তাতে আমার যুক্তির ভাগ এক-দশমাংশ কমে যাবে। বলাই বাহুল্য, আমার সওয়ালটা একটু দুর্বল হয়ে যাবে বটে, কিন্তু তা হোক, শুধু ওদের নিয়েই না হয় বলি। কিন্তু প্রথমত বাচ্চাদের কাছ থেকে পর্যন্ত ভালোবাসা যায়—তারা যদি নোংরাও হয়, এমনকি যদি দেখতে খারাপ হয়, তাহলেও—আমার অবশ্য মনে হয় বাচ্চারা কখনও দেখতে খারাপ হয় না। দ্বিতীয়ত, বড়োদের কথা আমি আরও এই কারণে বলব না যে তারা বিতৃষ্ণাজনক আর ভালোবাসার অযোগ্য তো বটেই, এ ছাড়া তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছে: আপেল খাবার পর তাদের ভালোমন্দের জ্ঞান হয়েছে, তারা 'ঈশ্বর সমতুল' হয়ে গেছে। এখনও তাদের সেই ফল খাওয়া চলছে। কিন্তু বাচ্চারা ওসব ফল-টল কিছুই খায়নি, তাই তারা এখনও নিষ্পাপ। বাচ্চাদের তুই ভালোবাসিস আলিয়োশা, তাই না? জানি ভালোবাসিস, তাই বুঝতে পারবি কেন একমাত্র ওদের কথাই এখন বলতে চাই। ওদের যদি এই পৃথিবীতে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে ওদের পিতৃপুরুষের জন্য, যারা আপেল খেয়েছিল তাদের জন্য ওদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে—কিন্তু এই যুক্তিও তো আবার অন্য

জগতের; এখানকার, আমাদের এই পৃথিবীর মানবহৃদয়ের পক্ষে বোধগম্য নয়। অন্যের অপরাধে নিরপরাধের যন্ত্রণা ভোগ করা উচিত নয়—তাও আবার এরকম নিষ্পাপ নিরপরাধের। তুই শুনে অবাক হয়ে যাবি আলিয়োশা, আমিও বাচ্চাদের ভালোবাসি। আরও একটা জিনিস খেয়াল রাখবি, উদ্দাম আবেগ আর লালসা-পরায়ণ, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকজন, আমাদের এই কারামাজভ্ বংশের লোকেরাও অনেক সময় ছোটোদের খুবই ভালোবাসে। শিশুরা যতদিন পর্যন্ত ছোটো—এই ধর সাত বছর বয়স পর্যন্ত—ততদিন বয়স্কদের থেকে তাদের ভয়ঙ্কর ব্যবধান থাকে। মনে হয় যেন একেবারে অন্য জীব, সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। আমি জেলখানার কয়েদি এক ডাকাতকে চিনতাম, তার ডাকাতির জীবনে রাতের বেলায় লোকজনের বাড়িতে ঢুকে লুঠতরাজ চালাতে গিয়ে বাড়ির পরিবারসুদ্ধ সকলকে খুন করার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক শিশুকেও কাটতে সে বাদ রাখেনি। কিন্তু জেলখানায় বসে শিশুদের ওপর তার যে টান সেটা ভারি অস্বাভাবিক ছিল। সারাটা সময় তার একটাই কাজ ছিল—জানলার ধারে বসে দেখত জেলের প্রাঙ্গণে বাচ্চারা খেলা করছে। একটা বাচ্চা ছেলেকে তো সে এমন বশে এনেছিল যে ছেলেটি রোজ তার জানলার নীচে এসে দাঁড়াত, তার সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছিল সে। তুই জানিস না কী জন্যে আমি এই এত সব কথা বলছি, তাই না আলিয়োশা? আমার মাথাটা কেমন যেন ব্যথা করছে, মনটাও ভার হয়ে আছে।"

"তুমি কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব নিয়ে কথাগুলো বলছ" অস্বস্তিভরে আলিয়োশা মন্তব্য করল, "ঠিক যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছ।"

ভাইয়ের কথা যেন কানেই যায়নি এমন ভাব করে ইভান ফিয়োদরভিচ আবার বলতে লাগল, "ভালো কথা, কিছুদিন আগে মস্কোয় এক বুলগারীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেখানে সাধারণভাবে স্লাভ বিদ্রোহের আশঙ্কায় তুর্কি ও চেরকাসীয়রা সারা দেশ জুড়ে যে পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে সে কাহিনি তিনি আমাকে শোনালেন।[২৩] মানে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, মানুষজন মেরে কেটে সাফ করে দেয়, নারী ও শিশুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে, বন্দিদের কানে পেরেক মেরে বেড়ার গায়ে গেঁথে রাখে, সকাল পর্যন্ত সেই ভাবে রেখে পর দিন তাদের ফাঁসিতে লটকায়—এমনি আরও কত রকমের যে বীভৎস অত্যাচার কল্পনাও করা যায় না। আসলে আমরা অনেক সময় মানুষের নৃশংসতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'পাশবিক' শব্দটি ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এতে পশুদের প্রতি ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা হয়। পশু কখনও মানুষের মতো নৃশংস হতে পারে না, মানুষের মতো নৃশংসতার শিল্প ও কলানৈপুণ্য তার জানা নেই। বাঘ করার মধ্যে এটাই করে যে সে তার শিকারকে দাঁত দিয়ে কামড়ায় ও ছিন্নভিন্ন করে—এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। মানুষের কানে পেরেক মেরে তাকে সারা রাত বেড়ার গায়ে গেঁথে রাখা—এটা কখনই তার মাথায় আসত না—এমনকি তা করার

মতো ক্ষমতাও যদি তার থাকত। এদিকে ছুরি দিয়ে মাতৃজঠর চিরে ভ্রূণহত্যা থেকে শুরু করে দুধের শিশুকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে ছুড়ে দেওয়া এবং মায়ের চোখের ওপর শূন্য থেকে তাদের লুফে বেয়নেট দিয়ে গাঁথা—শিশুদের ওপর এরকম কত বীভৎস চালিয়েই না এই তুর্কিগুলো তাদের লালসা চরিতার্থ করে! মায়ের চোখের সামনে এসব করাতেই কিনা তাদের পরম সুখ! তাহলে বলি আরও একটি দৃশ্যের কথা যা আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। একবার কল্পনা করে দ্যাখ মা থরথর করে কাঁপছে, তার কোলে দুধের শিশু, তুর্কিরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। ওরা একটা মজার খেলা খেলার ফন্দি আঁটল: বাচ্চাটাকে আদর করল, ওকে হাসানোর জন্য ওরা নিজেরাও হাসল, শেষ পর্যন্ত ওদের উদ্দেশ্য সফল হল—ওদের দেখাদেখি বাচ্চাটাও হাসতে লাগল। ঠিক এই সময় একজন তুর্কি ছেলেটার মাত্র কয়েক আঙুল দূর থেকে তার মুখের ওপর একটা পিস্তল তাক করে তুলে ধরল। বাচ্চাটা মজা পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, তার কচি কচি হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা ধরতে গেল, অমনি শিল্পকুশলি খুনিটা সরাসরি বাচ্চার মুখের ওপর পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে ধরল, তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিল। কুশলি শিল্পীর কাজ, সত্যি কিনা? আর হ্যাঁ, লোকে বলে তুর্কিরা নাকি মিষ্টি বড়ো ভালোবাসে।"

"এসব কথা কেন বলছ বল তো দাদা?" আলিয়োশা জানতে চাইল।

"আমি বলতে চাই, শয়তান যদি না থাকে, অতএব মানুষই তাকে সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে তাকে সে নিজের আদর্শে তার নিজের মতো করেই সৃষ্টি করেছে।"

"সেক্ষেত্রে বলতে হয় ঠিক যেমন ঈশ্বরকেও সৃষ্টি করেছে।"

"সামান্য একটা কথাকে কী আশ্চর্য রকমের মোচড় দিয়েই না তুই ঘুরিয়ে দিতে পারিস!—সেই 'হ্যামলেট' নাটকে পলিনাস যেমন বলেছিল," ইভান হাসতে হাসতে বলল, তুই আমার কথা দিয়েই আমাকে প্যাঁচে ফেলে দিলি। তা ঠিক আছে। আমি খুশি হয়েছি। তোর ঈশ্বরকে মানুষ যদি তার নিজের আদর্শে, নিজের মতো করে তৈরি করে থাকে তা হলে তো তাঁকে ভালোই বলতে হবে। তুই এখনই জিগ্‌গেস করছিলি এসব কথা আমি কেন বলছি। তাহলে শোন, আমি হলেম গিয়ে কিছু টুকরো খবরের সংগ্রাহক ও রসিক। বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, আমি বিভিন্ন খবরের কাগজ ও কাহিনি থেকে—যখন যেখান থেকে পারি—এক ধরনের খোশখবর টুকে রাখি, সংগ্রহ করি: ইতিমধ্যে একটা বেশ ভালো সংগ্রহ আমি তৈরিও করে ফেলেছি। এই সংগ্রহের মধ্যে, বলাই বাহুল্য, তুর্কিরাও আছে। তবে এরা সব বিদেশি। আমার কাছে আমাদের নিজেদের নিদশর্ণও আছে—এমনকি সেগুলি তুর্কিদের তুলনায় বেশ খানিকটা ভালোও বটে। জানিস, আমরা বেশি করে যেটা বুঝি তা হল আরও বেশি মার, আরও বেশি বেত আর ছড়ি। এটা আমাদের জাতীয় চরিত্র। আমাদের এখানে কানে পেরেক মেরে বেড়ার গায়ে গেঁথে রাখা অকল্পনীয়—হাজার হোক

আমরা ইউরোপীয়; কিন্তু বেত, কিন্তু ছড়ি—এগুলো একান্তই আমাদের—আমরা এ থেকে বঞ্চিত হতে পারি না। বিদেশে আজকাল লোকে নাকি একেবারেই মারধর করে না। তাদের স্বভাবচরিত্র নির্মল হয়ে গেল কিনা, অথবা ইতিমধ্যে তাদের দেশে এমন কিছু আইন তৈরি হয়ে গেল কিনা যার ফলে মানুষ না কি আর মানুষকে চাবুক মারতে সাহস পায় না, বলতে পারি না। তবে এটা তারা পুষিয়ে নিয়েছে অন্য ভাবে—ঠিক আমাদেরই মতো এক ধরনের বিশুদ্ধ জাতীয় ভাবধারা দিয়ে। আর তা এত বেশি জাতীয় চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত যে মনে হতে পারে আমাদের দেশে বুঝি অনুসরণ করা বস্তুত অসম্ভব, যদিও, প্রসঙ্গত, আমার মনে হয় যে আমরাও তাতে রপ্ত হয়ে উঠছি—বিশেষত আমাদের উচ্চবর্গীয় সমাজে যখন থেকে ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা হয় তখন থেকে। আমার কাছে একটা চমৎকার পুস্তিকা আছে— ফরাসি থেকে অনুবাদ করা খুব একটা বেশি দিন আগেকার কথা নয়—বড়োজোর বছর পাঁচেক হবে—জেনেভায় রিশার নামে এক দুর্বৃত্ত ও নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। তারই কাহিনি সেখানে বলা হয়েছে। যতদূর মনে আছে, বছর তেইশের এক ছোকরা। শেষ পর্যন্ত তার মনে অনুশোচনা হয়, প্রাণদণ্ডের ঠিক আগের মুহূর্তে সে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত হয়। এই রিশার ছিল জারজ সন্তান, সে যখন বছর ছয়েকের বাচ্চা ছেলে তখন তার বাপ-মা সুইট্জারল্যান্ডের পাহাড়ি রাখালদের হাতে তাকে 'উপহার' হিসেবে তুলে দেয়। তারাই ওকে তাদের কাজে লাগানোর জন্য বড়ো করে তোলে। ওদের কাছেই ও বড়ো হয়ে উঠতে থাকে একটা ছোটোখাটো বন্য জন্তুর মতো। রাখালরা ওকে কিছুই শেখাল না, শুধু তা-ই নয়, সাত বছর বয়স হতে না হতে ভিজে আর ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো জামাকাপড় ছাড়া, প্রায় অভুক্ত অবস্থায় ওকে ভেড়া চড়ানোর কাজে পাঠাতে লাগল। আর, বলাই বাহুল্য, এ নিয়ে তারা কেউ মাথা ঘামাল না বা এর জন্য তাদের কারও কোনও অনুশোচনাও হল না, বরং তাদের মনে হল ছেলেটাকে নিয়ে এমন করার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে, যেহেতু রিশারকে তার বাপ-মা একটা সামগ্রীর মতোই উপহার হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এমনকি ছেলেটাকে খাওয়ানোর তেমন প্রয়োজন আছে বলেও তাদের মনে হল না। রিশার নিজে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে সেই সময় তার অবস্থাটা হয়েছিল সুসমাচারের পথভ্রষ্ট সন্তানের মতো, শুয়োরগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে বাজারে বিক্রি করার জন্য গামলায় করে তাদের যে খাবার দেওয়া হত ছেলেটা পারলে অন্তত তা-ই খায়। কিন্তু সে খাবার পর্যন্ত তার জুটত না, আর খিদের জ্বালায় যদি শুয়োরদের খাওয়া চুরি করত তাহলে ওরা তাকে ধরে পেটাত। এই ভাবে তার সমস্ত ছোটোবেলা এবং যৌবনটাও কাটতে কাটতে একজন শক্তসমর্থ বয়স্ক লোক হয়ে উঠে শেষ সে কালে চুরিতে হাত পাকাল। জানোয়ারটা জেনেভায় দিনমজুরি করে রোজগার করতে লাগল। যা পেত সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিত। জীবন কাটাতে লাগল একটা

হিংস্র জন্তুর মতো, পরিণামে সে এক বুড়ো মানুষকে খুন করে তার ধনসম্পত্তি লুট করল। সে ধরা পড়ল, ধরা পড়ার পর তার বিচার হল, আর বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হল। আদালত তো আর ওসব সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না! জেলখানায় দেখতে দেখতে বড়ো বড়ো সব ধর্মযাজক, নানা ধরনের খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের যত সদস্য, বড়ো ঘরের পরোপকারী মহিলার দল—ইত্যাদি লোকজন তাকে ঘিরে ধরল। জেলখানার মধ্যেই তারা তাকে লিখতে পড়তে শেখাল, বাইবেলের সুসমাচার ব্যাখ্যা করে শোনাল দিনের পর দিন তার বিবেকের কাছে আবেদন নিবেদন করে, তাকে নানা ভাবে বোঝানোর ও ভোলানোর চেষ্টা করল, তার ওপর নানা রকম চাপ সৃষ্টি করল আর তার কানের কাছে অবিরাম মন্ত্র পড়ে পড়ে তার অবস্থা এমন করে ছাড়ল যে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আনুষ্ঠানিক ভাবে তার অপরাধ স্বীকার করল। সে ধর্মান্তর গ্রহণ করল। এর পর সে নিজেই আদালতে লিখে পাঠাল যে সে একটা জানোয়ার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভেবে কৃতার্থ বোধ করছে যে প্রভু তাকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন, তার ওপর প্রভুর অপার করুণা বর্ষিত হয়েছে। জেনেভার সমস্ত মানুষ, সারা জেনেভা শহরের যত মানবপ্রেমিক আর ধর্মাত্মা—তারা সকলে তার জন্য চিন্তায় আকুল! শহরের অভিজাত ভদ্রমহলের শিষ্ট লোকজন জেলখানায় ভেঙে পড়ল। সকলে রিশারকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় আর বলতে থাকে: 'তোমার ওপর তাঁর করুণা বর্ষিত হয়েছে। তুমি ভাই, আমাদের লোক!' রিশার নিজেও ভাবে গদগদ হয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিল, মনে মনে ভাবল সত্যিই তো আমার ওপর তাঁর করুণা হয়েছে! আগে, আমার ছোটোবেলায় আর প্রথম যৌবনে, এই এতটা কাল কেবল শুয়োরের খাদ্য খেতে পেলেই আমি খুশি থাকতাম, কিন্তু এখন আমার ওপরও প্রভুর করুণা হয়েছে, প্রভুর নামে আমি মরতে যাচ্ছি।' বড়ো বড়ো ধর্মগুরু, বিচারপতি আর পরোপকারী সম্ভ্রান্ত মহিলার দল চেঁচিয়ে বলল 'হ্যাঁ, এটা তোমার পরম সুখের দিন, কেন না তুমি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছ।' জেলখানার যে অপমানজনক চক্রযানে চাপিয়ে রিশারকে প্রাণদণ্ডের মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিশাল বাহিনীর সকলে কেউ গাড়ি করে কেউ বা পায়ে হেঁটে শোভাযাত্রা করে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। বধ্যভূমির মঞ্চের কাছে আসার পর রিশারের উদ্দেশে জনতা চেঁচিয়ে বলল 'হ্যাঁ ভাই মর, প্রভুতে তোমার মৃত্যু হোক, যেহেতু তোমার ওপরও তাঁর করুণা বর্ষিত হয়েছে!' দেখতে দেখতে খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের যাজক-ভ্রাতাদের চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন ভ্রাতা রিশারকে মঞ্চের ওপর টেনে তোলা হল, গিয়োতিনের ওপর পেড়ে রেখে ভ্রাতৃভাবেই ঘচাং করে কেটে ফেলা হল তার মুণ্ডুটা—আর সেটা করা হল কিনা এই জনাই যে তার ওপর প্রভুর করুণা বর্ষিত হয়েছে! নাঃ, এটা চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য বটে। লুটারীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রুশদেশের সর্বোচ্চ মহলের একদল মানবপ্রেমিক এই ছোটো পুস্তিকাটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করে রুশ জনসমাজকে আলোকিত করে তোলার

উদ্দেশ্যে খবরের কাগজ এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকার সঙ্গে বিনামূল্যের ক্রোড়পত্র হিসেবে বিতরণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। রিশারের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এতে জাতীয় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ একজন আমাদের ভাইয়ে পরিণত হয়েছে, অথবা তার ওপর প্রভুর করুণা বর্ষিত হয়েছে—একমাত্র এই কারণে তার মাথা কেটে নিতে হবে আমাদের কাছে এটা কিন্তু একটা উদ্ভট চিন্তা। কিন্তু তা হলেও, আবার বলছি, আমাদেরও নিজস্ব কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে যাকে সেই তুলনায় কদাচিৎ খারাপ বলা যেতে পারে। মারধর করাটা আমাদের ইতিহাসেই আছে। এই ভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়ে আমরা আমাদের মানসিকতার অতি কাছাকাছি এক ধরনের সরাসরি আনন্দ উপভোগ করি। কবি নেক্রাসভ্[৬৭] তাঁর একটি কবিতায় একটা মরকুটে ঘোড়ার 'শান্ত নিরীহ' চোখের ওপর তার মালিক এক চাষির চাবুক মারার একটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এমন দৃশ্য আমাদের দেশে কে-ই বা না দেখেছে? এটাই রুশিয়ানা। নেক্রাসভের বর্ণনায় দেখতে পাই একটা দুর্বল মরকুটে ঘোড়ার গাড়ির ওপর এক চাষি এত বেশি মালের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল ঘোড়াটা চলতে চলতে এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, এই অবস্থায় রাস্তার ধারে ভেতর থেকে মালবোঝাই গাড়িটা সে আর টেনে তুলতে পারছিল না। চাষি তাকে প্রহার করতে থাকে, প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়াটাকে প্রহার করতে করতে এমনই একটা উন্মত্ততা তাকে পেয়ে বসল যে শেষকালে কী করছে না করছে কিছুই না বুঝতে পেরে অবিরাম নির্মম কশাঘাতে বেচারিকে জর্জরিত করে তুলতে লাগল। চাষির সেই এক কথা 'তোর শক্তি থাক আর না থাক, মরতে মরতে হলেও বোঝা তোকে টানতেই হবে।' ঘোড়াটা শরীর টানটান করে এগিয়ে যাবার কত চেষ্টাই না করল, কিন্তু আঘাতের এতটুকু বিরাম নেই। অসহায় প্রাণীটার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো, কিন্তু তার সেই 'শান্ত নিরীহ' চোখের উদ্গত অশ্রুধারার ওপরও চাবুকের ঘা পড়তে লাগল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়াটা এক সময় তার শেষ শক্তি প্রয়োগ করে এক ঝটকায় বোঝা টেনে তুলল। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। দম বন্ধ করে কেমন যেন একপাশে কাত হয়ে তিড়িং বিড়িং করে এমন ভাবে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল যা কোনো ঘোড়ার পক্ষে অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক।—নেক্রাসভের সে বর্ণনা বড়ো ভয়ঙ্কর! কিন্তু এ তো গেল একটা সামান্য ঘোড়ার কথা। আমরা চাবুক মারব বলেই না ঈশ্বর নিজে থেকে আমাদের ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন! তাতাররা উপহার দিয়ে গেছে।[৬৮] তবে হ্যাঁ, মানুষকেও চাবুক মারা যেতে পারে। এই তো দ্যাখ না, একজন সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী তাদের নিজেদের মেয়েকেই ছড়ি দিয়ে পেটাত—একেবারে বাচ্চা মেয়ে, বছর সাতেক বয়স। ঘটনাটা আমার কাছে সবিস্তারে লেখা আছে। কঞ্চিটা গাঁট-গাঁট দেখে বাপ খুশি। তার কথায়, 'জবর কেটে বসবে।' 'বসাতে লাগল তার নিজেরই মেয়ের গায়ে। আমি ঠিক জানি এমন সব

ঠ্যাঙাড়েও আছে যারা প্রত্যেকবার প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তাদের সেই উত্তেজনা লালসার পর্যায়ে চলে যায়—আক্ষরিক অর্থেই লালসার পর্যায়ে চলে যায়, প্রত্যেক বারের প্রহার আগেরটায় তুলনায় উত্তরোত্তর বেশি ও চড়ামাত্রার হতে থাকে। প্রথম বার এক মিনিট হলে পরের বার পাঁচ মিনিট, তার পর দশ মিনিট, যত বেশি দিন যায় তত বেশি মাত্রায়, তত বেশি ঘন ঘন, আরও বেশি কেটে বসার মতো। বাচ্চাটা মার খেয়ে পরিত্রাহি চেঁচাত, এক সময় চেঁচানোর ক্ষমতাও থাকত না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে থাকত 'বাপি, বাপি, বাবা গো, বাবা গো!' এদিকে কোন্ শয়তানের কারসাজি কে জানে, ঘটনাটা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে আদালতে উঠল। একজন উকিল নিয়োগ করা হল। রুশি লোকেরা এই উকিল জাতটাকে বহুকাল হল 'ভাড়াটে বিবেক' বলে আসছে। উকিল তার মক্কেলের পক্ষ সমর্থনে গলা ফাটাল। সে বলল, 'বাপ তার মেয়েকে ধরে ঠেঙিয়েছে এ তো অতি স্বাভাবিক, সাধারণ একটা পারিবারিক ঘটনা —এ ব্যাপারটা যে আদালতে গড়াবে সেটাই তো আজকের দিনের একটা লজ্জার কথা!' জুরির সদস্যরা উকিলের যুক্তির অকাট্যতা মেনে নিয়ে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শের জন্য আসন ত্যাগ করলেন, ফিরে এসে আসামি বেকসুর খালাস বলে রায় দিলেন। উৎপীড়নকারী বেকসুর খালাস পেয়ে যাওয়ায় উপস্থিত জনসাধারণ হর্ষধ্বনি করে উঠল। ইশ্, কী আপশোসের কথা, আমি সেখানে ছিলাম না! আমি উপস্থিত থাকলে গাঁক গাঁক করে ওই অত্যাচারীর সম্মানে তার নামে একটা বৃত্তি চালু করার প্রস্তাব দিতাম!... কী চমৎকার সব ছবি! কিন্তু বাচ্চাদের সম্পর্কে আমার কাছে আরও যা সব তথ্য আছে তা আরও চমৎকার। রুশদেশের শিশুদের সম্পর্কে অসংখ্য, ভূরি ভূরি তথ্য আমার সংগ্রহে আছে, আলিয়োশা। পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে। মা-বাপ দুজনেরই চক্ষুশূল। দুজনেই সমাজে প্রভূত সম্মান প্রতিপত্তির অধিকারী, শিক্ষিত ও মার্জিত। দ্যাখ, আমি আরও একবার ভালোমতো জোর দিয়েই বলছি, এই মানুষ জাতটার অনেকের মধ্যে একটা বিশেষ ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়—সেটা হল শিশু নির্যাতনে—কেবলই শিশু নির্যাতনে অনুরাগ। এই অত্যাচারীরাই আবার মানববংশোদ্ভূত আরও যারা আছে তাদের সকলের সঙ্গে আচরণে মার্জিত ও মানবদরদি ইউরোপীয়দের মতোই দিব্যি ভালো মানুষ, অমায়িক। অথচ শিশুদের নিগ্রহ করতে এরা বড়ো ভালোবাসে। এই অর্থে, তাদের এই অনুরাগ শিশুপ্রেমও বটে। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই শিশুরা যে আত্মরক্ষায় নিতান্তই অপরাগ এটাই তাদের উৎপীড়নকারীদের প্রলোভনের বড়ো কারণ। কোথায় কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ নিষ্পাপ এই স্বর্গীয় প্রাণগুলির জানা নেই, আর তাইতেই তো শিশু নির্যাতনকারীদের শরীরের দুষ্ট রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অবশ্যই লুকিয়ে আছে একটি জন্তু—সে জন্তু মানুষের প্রবল রোষ, নিগৃহীত শিকারের আর্তচিৎকারে তার লালসাপরায়ণ উত্তেজনা, বাঁধভাঙা অসংযম, উচ্ছৃঙ্খল

জীবনযাত্রার দরুন অর্জিত বাত, যকৃতের ব্যাধি ইত্যাদি নানা ধরনের রোগ। পাঁচ বছরের এই বেচারি বালিকাটির ওপর তার সুশিক্ষিত মা-বাপ যত রকমের সম্ভব উৎপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগল। ওরা ওকে ধরে পেটাত, চাবুক মারত, লাথি মারত—কেন, কী কারণে সে তারা নিজেরাও জানত না। মেয়েটার সর্বাঙ্গে কালশিটে পড়ে থাকত। এই করে করে হাত পাকিয়ে মেয়েটার মা-বাপ এক সময় সূক্ষ্মতার চরমে পৌঁছে গেল ঠান্ডায়, কনকনে হিমের মধ্যে ওরা তাকে সারারাত বাথরুমে আটকে রেখে দিল এই অপরাধে যে রাতের বেলায় সময়মতো বাথরুমে যাবার কথা সে বলতে পারেনি, যার ফলে বিছানা নষ্ট করে ফেলেছিল। বোঝ কাণ্ড, পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা যে একবার ঘুম পেলে দেখতে দেখতে নিষ্পাপ দেবশিশুর মতো পরম নির্ভাবনায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এইটুকু বয়সে সে কোথা থেকেই বা শিখবে যে বাথরুমের দরকার হলে ঘুম থেকে উঠে তা জানাতে হয়! কিন্তু এই অপকর্মের সাজা হিসেবে ওর সারা মুখে ওর নিজের বিষ্ঠা লেপে দেওয়া হল, সে বিষ্ঠা ওকে জোর করে খাইয়েও দেওয়া হল। আর এই কাজটা করল কিনা মেয়েটার মা, তার গর্ভধারিণী মা। এর পর সেই জঘন্য জায়গায় আটকে থেকে বেচারি যখন করুণ আর্তনাদ করতে লাগল তা শোনার পরও মা হয়ে রাতের বেলায় সে কী করে ঘুমোতে পারল! তুই এটা বুঝতে পারছিস কি, এইটুকু ছোটো একটা প্রাণী, তাকে নিয়ে যে কী হচ্ছে তা বোঝার মতো ক্ষমতা পর্যন্ত এখনও যার হয় নি, সেই জঘন্য জায়গাটাতে, অন্ধকারে ঠান্ডার মধ্যে বন্দি হয়ে থেকে খুদে খুদে হাতের মুঠি পাকিয়ে ভাঙা বুক চাপড়াচ্ছে, তার প্রিয় 'ভগবানের' শরণাপন্ন হয়ে শোণিতধারার মতো অঝোরে করুণ বিগলিত অশ্রু বিসর্জন করছে—বলি, ভাই আমার, বন্ধু আমার, ওরে বিনয়ের অবতার পুণ্যব্রতধারী আশ্রমিক ভাই আমার— বুঝতে পারছ কি এই উদ্ভট অর্থহীন কাণ্ডটা? বুঝতে পারছিস কি এর কী এমন প্রয়োজন? কীসের জন্যই বা এর সৃষ্টি? লোকে বলে এছাড়া নাকি মানুষ এই পৃথিবীতে থাকতেই পারত না, যেহেতু তাহলে ভালোমন্দ বোধ জন্মই হত না। বলি কী হবে ছাই ওই ভালোমন্দ বোধ দিয়ে, যখন তার জন্য এত মূল্য দিতে হচ্ছে? ওই যে বাচ্চা মেয়েটা চোখের জলে ভেসে গিয়ে তার প্রিয় 'ভগবানের' কাছে প্রার্থনা করছে তার এক ফোঁটা চোখের জলের কাছে আগাগোড়া এই জ্ঞানের জগৎটারই তখন কোনো মূল্য থাকছে না! আমি বড়োদের দুঃখকষ্টের কথা বলছি না, ওরা তো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে, তা খেয়ে মরুক গে, চুলোয় যাক ওরা সবাই। কিন্তু এরা! এই অবোধ শিশুরা! আমি তোকে কষ্ট দিচ্ছি আলিয়োশা, তাই না? তোকে যেন কেমন-দেখাচ্ছে। থাক, তুই যদি না চাস তাহলে না হয় নাই বললাম।"

"না, ও কিছু নয়। আমিও কষ্ট পেতে চাই", বিড়বিড় করে বলল আলিয়োশা।

"একটা, মাত্র আরও একটা ছবি, তাও সেটা বেশ কৌতূহলজনক বলেই বলছি।

খুবই চরিত্র বৈশিষ্ট্যসূচক, আর বড়ো কথা এই সবে পড়েছি আমাদের পুরাবৃত্তের এক সংগ্রহে—'সংগ্রহশালা' না 'পুরাকাল'—কোন্ পত্রিকায় পড়েছি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না[১২], তবে খুঁজে দেখা যেতে পারে। ঘটনাটা ঘটেছিল বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুতে—ভূমিদাস প্রথার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে। দীর্ঘজীবী হোন আমাদের জনগণের মুক্তিদাতা।[১৩] সেই সময়, শতাব্দীর শুরুতে আমাদের দেশে এক জেনারেল ছিলেন। বিশাল তাঁর যোগাযোগ, মস্ত তাঁর জমিদারি। অত্যন্ত ধনী জমিদার। তবে তাঁর মতো লোকজন, যাঁরা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও এই বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে তাঁরা তাদের জমিদারির প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, সত্যি বলতে গেলে কি, আমার মনে হয় না তখনকার দিনেও তাঁদের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল। তবে হ্যাঁ, ওরকম লোক তখন ছিল বটে। তা আমাদের এই জেনারেল তার নিজের জমিদারিতে থিতু হয়ে বসলেন। তার জমিদারিতে বেগার খাটা জনের সংখ্যাই দু হাজার। দিব্যি জাঁকজমক করে আছেন। চুনোপুঁটি প্রতিবেশীদের ওপর এমন দাপট দেখান যেন তারা ওঁর আশ্রিত বা মোসাহেব। তাঁর কুকুরের ঘরে শত শত শিকারি কুকুর, তাদের দেখাশোনা করার জন্য প্রায় শ খানেক উর্দিপরা ভৃত্য, তারা সকলেই আবার ঘোড়ায় চড়ে তদারকি করে। তা এক দিন হল কি ভূমিদার শ্রেণির একটা ছেলে, একেবারেই বাচ্চা ছেলে—মোটে আট বছর বয়স—খেলার ছলে ঢিল ছোড়ে। সেই ঢিল কী করে যেন জেনারেলের এক প্রিয় শিকারী কুকুরের পায়ে এসে লাগল। 'আমার আদরের কুকুরটা খোঁড়াচ্ছে কেন?' জেনারেল জিগ্গেস করল। ভৃত্যরা তাঁকে বলল 'ওই যে ওই ছেলেটাকে দেখছেন ও-ই ঢিল ছুড়ে ওর পা-টা ঘায়েল করেছে হুজুর।' জেনারেল আপাদমস্তক ছেলেটাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'বটে, তুই করেছিস?' হুকুম দিলেন, 'পাকড়াও কর ওটাকে!' পাকড়াও করা হল, মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওরা ছেলেটাকে। সারা রাত কাছারির হাজতে আটকে রেখে দিল। তার পরদিন সকাল হতে না হতে শিকারের সাজে পুরোদস্তুর সাজগোজ করে ঘোড়ায় চেপে জেনারেল বেড়িয়ে এলেন, সঙ্গে তার কুকুরের পাল, সেই সঙ্গে আশ্রিত লোকজন, কুকুরের তদারককারি ছোকরা আর শিকারীরা—সকলেই ঘোড়ায় চড়ে। বাড়ির চাকরবাকরকেও ডেকে চারপাশে জড় করা হল। সেটা করা হল ওদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল অপরাধী বালকের মাকে। এই বারে ওরা ছেলেটাকে হাজত থেকে বের করে আনল। শরৎকালের দিন, ঠান্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার। শিকারের পক্ষে প্রশস্ত। জেনারেল ছেলেটাকে বিবস্ত্র করতে হুকুম দিলেন। ওরা তার গায়ে কোনো জামাকাপড়ের বালাই না রেখে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিল তাকে। ঠান্ডায় সে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, আতঙ্কে তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। টুঁ শব্দটি করার সাহস সে পেল না। 'দৌড় করাও ওটাকে!' জেনারেল হুকুম দিল। 'দৌড়ো, দৌড়ো!' কুকুরের তদারককারিরা চিৎকার করে বলতে লাগল।

ছেলেটা ছুটতে শুরু করে দিল। 'ছু ছু!' জেনারেল গাঁক গাঁক করে হেঁকে গোটা কুকুরের পালকে তার পিছনে লেলিয়ে দিল। লেলিয়ে দিল মার চোখের সামনে, কুকুরের পাল বাচ্চাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। জেনারেলের সম্পত্তি, আমার যতদূর মনে হয়, অছির তত্ত্বাবধানে চলে যায়। এর বেশি তার আর কী হতে পারে? গুলি করে মারতে হত? আমাদের যা নীতিবোধ তা চরিতার্থ করার খাতিরে তাকে গুলি করে মারা উচিত ছিল? বল আলিয়োশা, তুই-ই বল!"

আলিয়োশার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি হেসে ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে সে বলে উঠল, "গুলি করে মারা উচিত!"

"বাহবা!" উল্লসিত হয়ে ইভান বলে উঠল। "তুইও যদি অমন কথা বলিস, তার মানে আহা, কী আমার কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসী এলেন! আরে তোর মনের মধ্যে তো একটা ইবলিশের বাচ্চা বাসা বেঁধে আছে রে আলিয়োশা কারামাজ়ভ্!"

"আমি একটা অনর্থক কথা বলে ফেলেছি, তবে

"ওই যে তবে বললি, কথাটা তো ওখানেই " ইভান চিৎকার করে উঠল। "জেনে রাখ হে ব্রতধারী আশ্রমিক, ওই অনর্থক জিনিসটাই দুনিয়াতে বড়ো বেশি দরকারি। অনর্থকের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এই জগৎটা, তা না হলে জগতে হয়তো কিছুই ঘটত না। আমরা জানি আমরা কী জানি!"

"কী তুমি জান?"

"আমি কিছুই বুঝি না।" ইভানের কথা শুনে মনে হল সে যেন প্রলাপ বকে চলেছে। "আমি এখন কিছু বুঝতে চাইও না। যা ঘটনা তাই মেনে নিয়ে চলতে চাই আমি। আমি অনেক দিন হল ঠিক করে নিয়েছি বোঝার কিছু নেই। আমি যদি কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা করতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে ফেলব, কিন্তু আমি স্থির করেছি আমাকে তথ্যনিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে।..."

"তুমি আমাকে অত পরীক্ষা করছ কেন বল তো?" বিপর্যস্ত আলিয়োশা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল। "শেষ পর্যন্ত বলবে কি আমাকে?"

"অবশ্যই বলব। সে কথা বলব বলেই না এত কথা! তুই আমার বড়ো আদরের ভাই, আমি তোকে ছাড়তে চাই নে। তোকে আমি তোর জোসিমার হাতে ছেড়ে দিতে পারব না।"

ইভান মিনিটখানেক চুপ করে রইল। হঠাৎ গভীর বিষাদের ছাপ ফুটে উঠল তার মুখে।

"শোন্ তাহলে, আমি যে কেবল শিশুদের উদাহরণই দিলাম তা শুধু আমার বক্তব্যকে বেশি স্পষ্ট করার জন্য। বাকি আরও কত মানুষের আরও কত অশ্রুধারা এই ধরণীর বক্ষস্থল থেকে মর্মস্থল পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেছে সে কাহিনি না হয় না-ই বললাম, আমি ইচ্ছে করেই বিষয়টাকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রেখেছি। আমি একটা ছারপোকার মতো অতি নগণ্য জীব, আমার সমস্ত রকম তুচ্ছতা স্বীকার

করেই বলছি, পৃথিবীটা যে কেন এই ভাবে তৈরি হয়েছে তা আমার কাছে একেবারে বোধগম্য নয়। দেখা যাচ্ছে দোষটা মানুষেরই তাকে স্বর্গরাজ্য দেওয়া হয়েছিল, সে চাইল মুক্তি, স্বর্গ থেকে সে আগুন চুরি করল, যদিও নিজেই জানত যে এতে তার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে। তা হলে আর তাকে করুণা করা কেন? ওঃ, আমার এই অকিঞ্চিৎকর ইউক্লিডীয় বুদ্ধি দিয়ে আমি শুধু এইটুকুই জানি যে দুঃখকষ্ট আছে, দোষী বলে কেউ নেই, জানি বস্তুমাত্রেই সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে একটি আরেকটি থেকে উদ্ভূত, এও জানি যে সবই জলবৎ প্রবহমান, সবেরই একটা মাত্রা আছে। কিন্তু এ তো নিছক ইউক্লিডীয় আগড়ম বাগড়ম। আমি কি আর তা বুঝি না? আর বুঝি বলেই তো ওই নিয়মে জীবন যাপন করতে আমি রাজি হতে পারছি না! দোষী বলে যে কেউ নেই এবং আমি যে তা জানি এতে আমার কী উপকারটা হল? আমি চাই অন্যায়ের বিচার, নইলে আমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাব। সে বিচার স্থানকালের সীমানা ছাড়িয়ে কোথাও কখনও হবে। হবে এমন কথা বললে চলবে না, সেটা হওয়া চাই এখানে, এই পৃথিবীতেই এবং আমি তা নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি নিজেই তা দেখতে চাই। কিন্তু তত দিনে আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার যেন পুনরুত্থান ঘটে, কারণ আমাকে ছাড়া যদি এসব ঘটে তাহলে তা বড়ো বেশি দুঃখের হবে। আমি এই যে এত কষ্ট ভোগ করলাম সে কি এই জন্যে যে আমি নিজে, আমার যাবতীয় দুষ্কর্ম, আমার যত যাতনা— সব সার হয়ে গিয়ে তার উর্বরতাশক্তি দিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কারও জীবনকে সুসংগত করে তুলবে? সিংহের শিকার হরিণটা তার পাশে পড়ে আছে, তার পর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে তার হত্যাকারীকে আলিঙ্গন করছে—এ দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। যেদিন সব মানুষ হঠাৎ বুঝতে পারবে এসবের উদ্দেশ্য কী ছিল সেদিন আমি এখানে থাকতে চাই। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মবিশ্বাস এই আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি একজন ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু ওই শিশুরা? ওদের নিয়ে তখন আমি কী করব? এটা একটা প্রশ্ন যার সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। একশ বার, আবারও আমি বলছি, প্রশ্ন অসংখ্য, কিন্তু আমি একমাত্র শিশুদেরই নিয়েছি কারণ এতে আমার যা বক্তব্য তা অবিসংবাদিত ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শোন, দুঃখের মূল্যে চিরন্তন সুসংগতি অর্জনের জন্য যদি সকলকেই দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাহলে শিশুরা সেখানে আসে কী করে বলতে পারিস? তাদেরও কেন দুঃখ ভোগ করতে হবে, কেনই বা তাদেরও দুঃখের মূল্য দিয়ে চিরন্তন সুসংগতি অর্জন করতে হবে— এ আমার বুদ্ধির অগম্য। ওরাও তাই বলে কী করে ভবিষ্যতে ওদের নিজেদের উর্বরাশক্তি দিয়ে অন্য কারও জীবনকে সুসংগত করে তোলার জন্য সার তৈরির উপকরণে পরিণত হল? পাপকর্মে লোকজনের মধ্যে এককাট্টা ভাব—এটা আমি বুঝি, প্রতিফল ভোগ করার বেলায় এককাট্টা হওয়া—তাও বুঝি; কিন্তু শিশুদের নিয়ে তো আর পাপকর্মে এককাট্টা হওয়া যায়

না! অবশ্য হ্যাঁ, একথা যদি সত্যি হয় যে বাপেদের যাবতীয় দুষ্কর্মের বেলায় তাদের সঙ্গে তারা এককাট্টা তা হলে আলাদা কথা। তবে এটা ঠিক যে এ সত্য ইহলোকের সত্য নয়, আমার পক্ষেও বোধগম্য নয়। কেউ হয়তো ভাঁড়ামি করে বলবে তাতে কী আসে যায়—শিশুরা অমনিতেই বড়ো হয়ে উঠে পাপ করার অনেক অবকাশ পাবে; কিন্তু এখানে তো দেখতে পাচ্ছি, ছেলেটা বড়ো হওয়ার সুযোগটা পেল কোথায়? ওর আট বছর বয়সেই তো কুকুর দিয়ে ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মেরে ফেলল ওরা! ওঃ আলিয়োশা, আমি কিন্তু ঈশ্বর নিন্দা করছি না। আমি বুঝতে পারছি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কী আলোড়নই না সৃষ্টি হবে যখন ত্রিভুবনের সকলে মিলিত হয়ে সমস্বরে একই স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠবে, যারা জীবিত আছে, যারা এক কালে, জীবিত ছিল তারা সকলে মিলে মুক্ত কণ্ঠে বলে উঠবে 'প্রভু হে তুমিই সত্য, যেহেতু তোমার মার্গ উন্মুক্ত হইয়াছে!' আর সেই যে ছেলেটিকে অত্যাচারী লোকটি শিকারি কুকুরের পাল লেলিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল তার মা যখন সন্তানের উৎপীড়নকারীকে আলিঙ্গন করবে, যখন তারা তিনজনেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠবে 'প্রভু হে, তুমিই সত্য' তখন অবশ্যই আমরা জ্ঞানের শীর্ষ মুকুটের অধিকারী হব, তখন সব কিছুরই ব্যাখ্যা মিলবে। কিন্তু এখানেই তো একটা 'কিন্তু' আছে, এটাই তো আমি গ্রহণ করতে পারছি না। তাই যত দিন আমি এই পৃথিবীতে আছি তারই মধ্যে নিজস্ব একটা মাপকাঠি তৈরি করে নেবার জন্যে আমার এত তাড়া। দ্যাখ আলিয়োশা, এমনও হতে পারে যে সত্যি সত্যি তা-ই ঘটল—সেই মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি বেঁচে রইলাম অথবা সেই মুহূর্তটি দেখার জন্য আমার পুনরুত্থান ঘটল, যখন মা তার সন্তানের নির্যাতনকারীকে আলিঙ্গন করছে—তখন তা দেখে আর সকলের সঙ্গে আমি নিজেও হয়তো সহর্ষে চেঁচিয়ে বলব 'প্রভু হে তুমিই সত্য!' কিন্তু এখন সেই হর্ষধ্বনি করার ইচ্ছে আমার নেই। এখনও যেটুকু সময় আছে তারই মধ্যে নিজের মাথাটা বাঁচানোর ভারি তাড়া আমার, এই কারণে চরম সুসংগতিকে আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আর সেই যে নিগৃহীত শিশুটি যে তার ছোটো ছোটো হাতের মুঠো পাকিয়ে নিজের বুক চাপড়াচ্ছিল, ওই দুর্গন্ধযুক্ত খোঁড়লটার ভেতরে বসে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে তার 'ভগবানের' কাছে প্রার্থনা করছিল, যার সেই অশ্রুধারা কোন কালে কোন মূল্যে পরিশোধ করা যায় না, শুধু তার কথাই যদি ধরি, অন্তত তার চোখের জলের কথাই যদি ধরি তার কাছে এর কীই বা মূল্য আছে বল? কোনও মূল্য নেই, কারণ সে চোখের জল অপরিশোধ্যই থেকে যাচ্ছে। অথচ যে কোনো মূল্যে তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত, তা নইলে সুসংগতিও হতে পারে না। কিন্তু কী দিয়ে, বল কী দিয়ে তুই তার প্রায়শ্চিত্ত করবি? সেটা কি সম্ভব? তাদের ওপর প্রতিহিংসা নিয়ে কি তা সম্ভব হবে? কিন্তু তাদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে আমার কী হবে? নির্যাতনকারীদের নরকবাস করিয়ে আমার কী হবে? নরক কত দূর কী শোধরাতে

পারে যখন ওই শিশুরা যা যন্ত্রণা ভোগ করার তা ইতিমধ্যেই করেছে? আর নরকই যদি থাকে তাহলে সুসংগতিটা থাকছে কী করে শুনি? আমি ক্ষমা করতে চাই, আমি আলিঙ্গন করতে চাই, আমি চাই না আর কেউ কষ্ট ভোগ করুক। শিশুদের কষ্ট যদি সত্যের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টের বোঝা পূরণ করতে চলে যায় তাহলে আমি আগে থাকতে জোর দিয়ে বলে রাখছি সেই সত্যের কোনো ভাবে ওই মূল্য হতে পারে না। শেষ কালে বলি যে ছেলেকে উৎপীড়নকারী শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে তার মা সন্তানের সেই উৎপীড়নকারীকে আলিঙ্গন করবে এ আমি চাই নে! সে লোকটাকে ক্ষমা করার স্পর্ধা যেন তার না হয়! ক্ষমা করতে হয় তার নিজের শোককে ভুলে করুক, তার নিজের মাতৃহৃদয়ের অপরিসীম যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে করুক; যে বালকের দেহ ওই ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার যে কষ্ট সেটা ভুলে গিয়ে উৎপীড়নকারীকে ক্ষমা করার অধিকার মার নেই, সে স্পর্ধা মার যেন কখনও না হয়—এমনকি সন্তান নিজে যদি সেই উৎপীড়নকারীকে ক্ষমাও করে! আর তা-ই যদি হয়, ক্ষমা করার স্পর্ধা যদি তাদের না থাকে তাহলে সুসংগতিটা আর কোথায়? পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী আছে কি যার ক্ষমা করার অধিকার আছে? চাই নে আমি সুসংগতি, মানবজাতিকে ভালোবাসি বলেই চাই নে। আমি প্রতিহিংসা বাদ দিয়ে দুঃখকষ্ট নিয়ে থাকব তাও ভালো। প্রতিহিংসা বাদ দিয়ে আমার যন্ত্রণা নিয়ে, আমার ঘৃণা ও ক্রোধ না মিটিয়ে তাই নিয়েই বরং আমি থাকব—*এমনকি সেটা যদি আমার ভুলও হয়ে থাকে*। তাছাড়া সুসংগতির মূল্যটাও বড়ো বেশি করে ধরা হয়েছে, মোটের ওপর প্রবেশমূল্যস্বরূপ অতটা গাঁটের কড়ি খরচ করা আমাদের সাধ্যে কুলোবে না। তাই প্রবেশপত্রটা আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফেরত দিতে চাই। আমি যদি সৎ লোক হয়ে থাকি তবে ওটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ফেরত দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি সেটাই করব। আমি যে ঈশ্বরকে গ্রহণ করছি না তা নয়, আলিয়োশা, আমি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে টিকিটটা ফেরত দিচ্ছি মাত্র।''

“এ তো বিদ্রোহ'', চোখ নামিয়ে মিনমিন করে বলল আলিয়োশা।

‘‘বিদ্রোহ? তোর মুখ থেকে কিন্তু এমন কথা আমি শুনতে চাইনি'', উদ্দীপিত হয়ে ইভান বলল। ‘‘বিদ্রোহ পুষে রেখে বাঁচা যায় নাকি? কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। তুই নিজে আমাকে সোজাসুজি বল তো, আমি তোকে যা বলছি তার জবাব দে। ধর তুই নিজে মানবজাতির ভাগ্যের ইমারত গড়তে চলেছিস, এর পেছনে তোর উদ্দেশ্য হল পরিণামে যাতে সব মানুষ সুখী হয়, শেষকালে তাদের সুখ শান্তি দেওয়া, কিন্তু এর জন্য যেটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হয়ে পড়ছে তা এমন কিছুই নয়—কেবল একটা ছোট্ট প্রাণকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা—ওই সেই ছোট্ট বাচ্চাটার মতো, যে তার ছোটো ছোটো হাতের মুঠো পাকিয়ে বুক চাপড়াচ্ছিল; ওর যে অশ্রুধারা, যার শোধ তোলা যায়নি, তারই ওপর তুলতে হবে ইমারতটা—

তাহলে ওই শর্তে তুই কি রাজি হতিস তার স্থপতি হতে? বল্, সত্যি করে বল্!"

"না, রাজি হতাম না", মৃদুস্বরে বলল আলিয়োশা।

"তুই কি এমন ধারণা মেনে নিতে পারিস যে চরম নির্যাতনের শিকার ওই কচি শিশুটিকে অন্যায়ভাবে যে-রক্ত ঢালতে হয়েছিল তারই ওপর ভিত্তি করে নিজেদের সৌভাগ্য মেনে নিতে ওই লোকগুলো নিজেরাই রাজি হবে এবং মেনে নেওয়ার পর তারা চিরকাল সুখে থাকতে পারবে বলে ভাবতে পারে?"

"না দাদা, এটা আমি মেনে নিতে পারি না", বলতে বলতে আলিয়োশার চোখ দুটি হঠাৎ জ্বলে উঠল। সে বলল "তুমি এই মাত্র বললে না, পৃথিবীতে এমন কোনও প্রাণী আছে কিনা যে ক্ষমা করতে পারে এবং যার ক্ষমা করার অধিকার আছে? কিন্তু আমি বলি, সে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, তিনি যে হোক সে হোক বা যা কিছু হোক তাকেই ক্ষমা করতে পারেন, সকলকে *সব কিছুর জন্য* ক্ষমা করতে পারেন, কেন না তিনি নিজে সকলের জন্য সব কিছুর জন্য তাঁর নিষ্কলুষ রক্ত দান করেছেন। তুমি তাঁর কথা ভুলে গেছ, অথচ তাঁরই ওপরে তৈরি হয়েছে এই ইমারত, আর তাঁর উদ্দেশেই লোকে সহর্ষে বলে উঠবে 'প্রভু, তুমিই সত্য, যেহেতু তোমার মার্গ উন্মুক্ত হইয়াছে।'

"ও! সেই 'একমাত্র নিষ্পাপ' আর তাঁর শোণিত! না, তাঁর কথা আমি ভুলি নি, বরং এতক্ষণ এই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেন তাঁকে টেনে আনছিস না, কেননা তোদের শ্রেণির সকলেই তাদের যুক্তিতর্কের মধ্যে সচরাচর তাঁকেই সর্বাগ্রে স্থাপন করে। জানিস আলিয়োশা, তুই কিন্তু হাসিস না, কোনো এক সময় আমি একটা কাব্য রচনা করেছিলাম—সে বছর খানেক আগেকার কথা। আমার সঙ্গে আরও মিনিট দশেক সময় নষ্ট করতে যদি তোর আপত্তি না থাকে তাহলে ওটা আমি তোকে বলতে পারতাম।"

"তুমি? তুমি কাব্য লিখেছ?"

"আরে না না লিখি-টিখিনি", ইভান হেসে উঠল, জীবনে কখনও দু ছত্র কবিতা পর্যন্ত রচনা করিনি। কিন্তু যে কাব্যটার কথা বলছি সেটা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, আর মনে করে দেখেও দিয়েছি। একটা দারুণ উত্তেজনার মাথায় বেরিয়ে এসেছিল আর কি। তুই হবি আমার প্রথম পাঠক মানে শ্রোতা আর কি। একজন লেখক তার শ্রোতাকে হারাবে—তা সে সবেধন একজন শ্রোতাই হোক না কেন—তা কী করে হয় বল তো?" ইভান মুচকি হাসল। "তাহলে বলি, কেমন?"

"আমি কান পেতে আছি", আলিয়োশা বলল।

"আমার কাব্যের নাম 'মহাবিচারক'[১], জিনিসটা অদ্ভুত গোছের বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে তোকে শোনাই।"

## পাঁচ

## মহাবিচারক

"কথাটা এই যে এখানেও কিন্তু একটা ভূমিকা ছাড়া—অর্থাৎ কিনা একটা সাহিত্যিক ভূমিকা ছাড়া—চলছে না", ইভান হাসতে হাসতে বলল। "ধুত্তোর! আমি আবার একটা লিখিয়ে লোক নাকি! দ্যাখ, আমার ঘটনার সময় ষোড়শ শতাব্দী, আর সেই সময়—হ্যাঁ, প্রসঙ্গত, স্কুলের পাঠ থেকে সম্ভবত তোর জানা আছে—তখনকার দিনে কবিতা লিখতে গেলে যেটা প্রথা ছিল তা এই যে সেখানে ঐশ্বরিক শক্তির ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গটি থাকতেই হবে। দান্তের কথা না হয় বাদই দিলাম। ফরাসি দেশে আদালতের কর্মচারী আর মঠের সন্ন্যাসীরাও নিয়মিত ভাবে মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিবেশন করত, সে সব অনুষ্ঠানে তারা এমন সমস্ত দৃশ্যের অবতারণা করত যেখানে মাতৃমূর্তিতে যিশু জননী, দেবদূত, সাধুসন্ত, খ্রিস্ট এমনকি স্বয়ং দেবতার চরিত্রও মঞ্চে হাজির করতে হত। সেই সময় এ সবই হত অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে। ভিক্তর য়ুগোর Notre Dame de Paris[১১]-এ একাদশ লুইয়ের রাজত্বকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্ম উপলক্ষে প্যারিসের টাউন হল-এ জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে আয়োজিত একটি শিক্ষামূলক নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা আছে।[১২] *Le bon jugement de la tre's sainte et gracieuse Vierge Marie**[১৩] নামে এই দৃশ্যটিতে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং মেরিমাতা সশরীরে দেখা দিয়ে তাঁর বিচারের রায় ঘোষণা করছেন। মস্কোতে প্রাচীনকালে, জার মহামতি পিয়োতরেরও আগের আমলে, বিশেষত বাইবেলের 'পুরাতন বিধি' থেকে নেওয়া আখ্যানের ভিত্তিতে এ ধরনের নাট্যাভিনয় সময় সময় অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু নাট্যাভিনয় ছাড়াও পৃথিবীর সর্বত্র তখন অগণিত উপাখ্যান ও 'গাথার' চল ছিল যেখানে প্রয়োজনের খাতিরে সাধুসন্ত ও দেবদূতদের এবং স্বর্গরাজ্যের যত বিভূতিরও ভূমিকা থাকত। আমাদের দেশের মঠগুলিতেও সাধু সন্ন্যাসীরা এ ধরনের কাব্যকথা অনুবাদ ও নকল করার কাজে, এমনকি রচনার কাজেও নিযুক্ত থাকতেন—তাও আবার এমন একটা সময়ে যখন আমাদের দেশটা তাতার দঙ্গলের কবলে। উদাহরণস্বরূপ বলি, 'দেবজননীর অগ্নিপরীক্ষা' নামে মঠের একটা খণ্ডকাব্য মঠগুলিতে প্রচলিত আছে বটে — বলাই বাহুল্য, গ্রিক থেকে অনুবাদ করা—যেখানে এমন সমস্ত ছবি আছে যা দান্তের বর্ণনার চেয়ে কোনো অংশে কম জোরাল নয়। দেবজননী নরক পরিদর্শনে এসেছেন, সেখানে তাঁর পথপ্রদর্শক দেবদূত-প্রধান মিখাইল তাঁকে নরকযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। দেবজননী পাপীদের এবং তাদের যন্ত্রণাভোগের পরিচয় পান। প্রসঙ্গত, সেখানে তিনি একটা জ্বলন্ত আগুনের সরোবরের মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহলজনক

---

* 'পুণ্যবতী ও পরম করুণাময়ী কুমারী মেরির সুবিচার' (ফরাসি)

এক শ্রেণির পাপীর সন্ধান পেলেন যারা সেই সরোবরের মধ্যে এমন ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে যে সেখান থেকে সাঁতার কেটে উঠে আসার কোনও উপায়ই তাদের নেই। অথচ 'ঈশ্বর তাদের ভুলেই যাচ্ছেন'। ঈশ্বর যে তাদের ভুলে যাচ্ছেন তাদের সম্পর্কে এই কথাগুলি কিন্তু অত্যন্ত গভীর এবং রীতিমতো জোরাল। আমাদের দেবজননী এই দেখে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঈশ্বরের আসনের সামনে লুটিয়ে পড়ে নরকের সকলের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, যাদের তিনি ওখানে দেখেছিলেন কোনো রকম বাছবিচার না করে তাদের সকলের জন্যই তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন চলে তা বিপুল আগ্রহোদ্দীপক। তিনি কাকুতি মিনতি করতে থাকেন, সেখান থেকে তাঁর নড়ার কোনো লক্ষণ নেই। ঈশ্বর যখন ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ তাঁর সন্তানের হাত ও পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মেরিমাতাকে জিগ্‌গেস করলেন: 'ওঁকে যারা নির্যাতন করেছিল তাদের আমি কী বলে ক্ষমা করি?'—তখন তিনি সাধু সন্ন্যাসী আর শহিদদের সকলকে, যত দেবদূত আর প্রধান প্রধান দেবদূত আছেন তাঁদের সকলকে তাঁরই সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়ে কোনো রকম বাছবিচার না করে সকলের জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করতে বললেন। কাতর প্রার্থনার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে যা চেয়ে নিলেন তা এই যে প্রতি বছর পুণ্য শুক্রবার থেকে শুরু করে একই অঙ্গে ঈশ্বরের তিন বিভূতি প্রকাশের দিন পর্যন্ত পাপীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ স্থগিত থাকবে। নরকের পাপীরাও অমনি প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'প্রভু হে তুমিই সত্য, ন্যায্য তোমার বিচার!' তা যা বলছিলাম, আমার খণ্ডকাব্যও অনেকটা এই ধরনেরই হত যদি অবশ্য তা সেই সময় প্রকাশ পেত। আমার কাব্যে মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটছে; কিন্তু সত্যি বলতে কি কাব্যে তিনি কোনো কথাই বলছেন না। তিনি শুধু এলেন, কিছু সময়ের জন্য একটু চলাফেরা করে চলে গেলেন। সেই যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যে তাঁর আগমন ঘটবে, তারপর পনেরো শতাব্দী পার হয়ে গেছে, পনেরো শতাব্দী আগে তাঁর প্রেরিত পুরুষ লিখেছিলেন: অবলোকন কর, অচিরেই আমার আগমন ঘটিবে। 'উহার প্রহর ও ক্ষণ পুত্র পর্যন্ত অবগত নহেন, যিনি আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা একমাত্র তিনিই অবগত'—এই ভবিষ্যদ্বাণীই স্বয়ং তিনি করেছিলেন যখন তিনি আমাদের এই মর্ত্যধামে ছিলেন। কিন্তু মানবজাতি সেই আগের মতো বিশ্বাস নিয়ে আগের মতোই ভক্তিগদগদচিত্তে আজও তাঁর প্রতীক্ষায় আছে। ওঃ, এমনকি আরও বেশি বিশ্বাস নিয়ে, কেন না তার পর থেকে পনেরোটা শতাব্দী চলে গেছে স্বর্গলোক থেকে মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতির আর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

হৃদয় যা বলে তাতে কর বিশ্বাস,
স্বর্গের কাছ থেকে নেই আশ্বাস।''

"থাকার মধ্যে আছে শুধু মনের কথায় বিশ্বাস! এটা সত্যি যে তখনকার দিনে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি ছিল। এমন সব সাধুসন্ন্যাসী ছিলেন যাঁরা অলৌকিক উপায়ে আরোগ্যসাধন করতেন। কোনো কোনো ধর্মাত্মার সঙ্গে আবার, তাঁদের জীবনকাহিনি থেকে জানতে পারি, স্বয়ং স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরীও অবতীর্ণ হয়ে দেখা করতেন। কিন্তু তাই বলে শয়তানও তো আর ঘুমিয়ে নেই, তাই দেখতে দেখতে মানুষের মনে ওই সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতে শুরু করল। ঠিক সেই সময় জার্মানির উত্তরে শাস্ত্রীয় আচার-বিরোধী নতুন এক ভয়ঙ্কর উপাসক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল।[৭৬] 'প্রজ্জ্বলিত প্রদীপতুল্য' বিশাল এক তারকা, অর্থাৎ উপাসনালয়, 'উৎসবারিধারায় পতিত হইলে উহাকে তিক্তস্বাদে পরিণত করিল।'[৭৭] ঈশ্বরনিন্দক এই অনাচারীরা অলৌকিক ঘটনাকে অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু যারা বিশ্বাসে অটুট তাদের বিশ্বাসও আরও লেলিহান হয়ে ওঠে। মানবজাতির অশ্রুধারা যথারীতি তাঁরই উদ্দেশে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। মানুষ তাঁর প্রতীক্ষা করে, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর ওপর আশাভরসা রাখে, আগের মতোই উদগ্র থেকে যায় তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা। এই ভাবে কত শত বছর ধরে কী অগাধ বিশ্বাস আর বিপুল উদ্দীপনা নিয়েই না মানুষ প্রার্থনা করে চলেছে 'হে প্রভু, আমাদিগের সমক্ষে প্রকটিত হও।' কত শত বছর ধরেই না তাঁর উদ্দেশে এই প্রার্থনা করে চলেছে যে পরম কারুণিক তিনি যেন প্রসন্ন হয়ে তাঁর সামনে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বে এই ধরাধামেই তিনি বেশ কিছু ধর্মাত্মা শহিদ ও কৃচ্ছ্রসাধক পুণ্যাত্মাদের কৃপা করেছেন, তাঁদের তিনি দর্শনও দিয়েছিলেন—সে সবের বিবরণ তাঁদের 'জীবনকাহিনিতে' লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের কবি ত্যুত্চেভ্[৭৮] তাঁর নিজের উক্তির সততায় অগাধ বিশ্বাস থেকে ঘোষণা করেছিলেন

ধন্য সেই জন্মভূমি আশীর্বাদে তাঁর
ক্রসের জোয়াল কাঁধে ক্লান্ত যে জন
স্বর্গরাজ্যে অধীশ্বর হয়ে বুকে যার
ক্রীতদাস রূপ ধরে করে বিচরণ।[৭৯]

বাস্তবিকই এটাই যে ঘটনা তা আমি তোকে বলে দিতে পারি। এক সময় সত্যি সত্যি জনসাধারণের সামনে আবির্ভাবের কথা তিনি ভাবলেন। তাঁর আবির্ভাব ঘটল—যদিও সে আবির্ভাব ছিল ক্ষণিকের জন্য। তিনি আবির্ভূত হয়ে দাঁড়ালেন সেই সমস্ত মানুষের পাশে, যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, যারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, কিন্তু তাঁর প্রতি যাদের ভালোবাসা শিশুর মতো অকপট। আমার ঘটনাস্থল স্পেনের সেভিলে, সেটা ছিল মহাবিচারের চরম বিভীষিকাময় সময়[৮০], যখন ঈশ্বরের গৌরবের নামে দেশে প্রতিদিন অগ্নিকুণ্ড জ্বলত এবং

বিশ্বাসের হুতাশন যখন প্রবল
তাতে দগ্ধ হয় যত দুষ্ট অনাচারী।[৮১]

না, দ্বিতীয়বার তাঁর যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা এটা অবশ্য তা ছিল না। তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো, কাল উত্তীর্ণ হলে তিনি তাঁর পূর্ণ স্বর্গীয় বৈভব নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর সেই আকস্মিক আবির্ভাব হবে 'আকাশের পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোক বিস্তারকারী ক্ষণপ্রভাতুল্য।' না, এই আবির্ভাবের পেছনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অন্তত ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁর সন্তানদের একবার দেখে যাওয়া—বিশেষত সেই জায়গায় গিয়ে, যেখানে অনাচারীদের জন্য মারণযজ্ঞের লেলিহান শিখা জ্বলছে। তিনি তাঁর অপার করুণাবশত সেই পনেরো শতাব্দী আগে মনুষ্যরূপ ধারণ করে যেমন তিন বছর জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করেছিলেন তেমনি আরও একবার অবতীর্ণ হয়ে তাদের মধ্যে বিচরণ করলেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে পদার্পণ করলেন দক্ষিণের সেই জনপদের 'তাপদগ্ধ পথের বুকে'। ঠিক এখানেই সবে গতকাল, 'ad majorem gloriam Dei'— 'প্রভুর পরম গৌরবের খাতিরে'—দেশের নৃপতি, তাঁর পাত্রমিত্র, বীরব্রতী পুরুষের দল, সর্বোচ্চ যাজকমণ্ডলী আর দরবারমহলের পরমাসুন্দরী, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উপস্থিতিতে, সেভিলেচের অগণিত অধিবাসীর চোখের সামনে 'বিশ্বাসের প্রবল হুতাশনে' প্রায় এক শ ধর্মদ্রোহীকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন মহাবিচারক কার্ডিনাল।

নিঃশব্দে ও অলক্ষিতে তাঁর আবির্ভাব, তবু আশ্চর্যের কথা এই যে সবাই তাঁকে চিনতে পারছে। এই বিষয়টা, অর্থাৎ কিনা লোকে কেন তাঁকে চিনতে পারছে এটাই আমার কাব্যের একটা সেরা অংশ হতে পারত। লোকে তাঁর প্রতি এক দুর্নিবার শক্তির আকর্ষণ বোধ করে, তারা তাঁকে ঘিরে ধরে, তাঁর চারপাশে লোকের ভিড় বেড়েই চলে, সকলে তাঁকে অনুসরণ করে। অপরিসীম সমবেদনার স্মিত হাসি হেসে তিনি তাদের মাঝখান দিয়ে চলেছেন। তাঁর অন্তরে জ্বলছে প্রেমের সূর্য, প্রেমের শিখা; জ্ঞান আর শক্তির আলোকশিখা তাঁর নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে সকলকে প্লাবিত করে দিয়ে প্রেমের আহ্বানে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে সকলের হৃদয়। তিনি তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, দু হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করছেন। তাঁর স্পর্শ, এমনকি নিছক তাঁর পোশাকের স্পর্শ পর্যন্ত মানুষকে সঞ্জীবিত করে তোলে। ভিড়ের মধ্য থেকে আশৈশব অন্ধ এক বৃদ্ধ চিৎকার করে বলছে 'হে প্রভু তুমি আমাকে নিরাময় করে তোল, আমি তোমাকে অবলোকন করি।' দেখতে দেখতে লোকটার চোখের ওপর থেকে যেন আঁশ খসে পড়ল, অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হয়ে তাঁকে দেখতে পেল। লোকে কেঁদে আকুল, যে মাটিতে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন তারা সে মাটি চুম্বন করছে। শিশুরা তাঁর পথের সামনে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে চলেছে, তারা সংকীর্তনে নেমেছে, তাঁর উদ্দেশে ধ্বনি তুলছে 'পার কর!' 'এ তো তিনি, এ সেই তিনি', সকলে বারবার করে বলছে, 'এ তিনি না হয়ে যান না, তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।' তিনি চলতে চলতে সেভিলের ক্যাথেড্রালের সামনের বারান্দায় পা রেখে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই সময় একটা খোলা সাদা কফিনে

একদল ক্রন্দনরত শবযাত্রী একটা শিশুর মৃতদেহ দেবালয়ে বয়ে নিয়ে আসছিল শিশুটির বয়স সাত বছর, স্থানীয় কোনো এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র কন্যা। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে। মা আকুল হয়ে কাঁদছে, তাই দেখে ভিড়ের মধ্য থেকে লোকে তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল: 'ইনি তোমার সন্তানের জীবন দান করবেন।' ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান সম্পাদনের উদ্দেশে ক্যাথেড্রেলের যে পুরোহিতটি কফিনের দিকে এগিয়ে এসেছিল সে হতভম্ব হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কিন্তু মৃত শিশুর জননী বিলাপ করতে করতে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ল। 'তাঁর দিকে দুহাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'তুমি যদি সে-ই হও, তাহলে আমার বাছাকে বাঁচিয়ে তোল!' শবযাত্রা থেমে গেল। কফিন বাহকরা কফিনটা বারান্দায় তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। তিনি সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, আবার সামান্য নড়ে উঠল তাঁর ঠোঁটদুটো, তিনি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন: 'জাগো কন্যা, জাগো[৮২]।' অমনি কফিনের ভেতরেই সেই কন্যা উঠে বসল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, চারপাশে এত লোকজন দেখে সে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল। তার হাতে শ্বেত গোলাপের স্তবক, সে যখন কফিনের ভেতরে শুয়ে ছিল সেই অবস্থায় লোকে ওটা তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। জনতার মধ্যে হূলস্থূল, চিৎকার চেঁচামেচি ও কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই হঠাৎ দেখা গেল মহাবিচারক, স্বয়ং কার্ডিনাল ক্যাথেড্রালের পাশ দিয়ে সংলগ্ন চত্বরটি পেরিয়ে যাচ্ছেন। বৃদ্ধ মানুষটির বয়স প্রায় নব্বই। দীর্ঘকায়, ঋজুদেহ, মুখটা তাঁর বিশীর্ণ, চোখ দুটি কোটরে বসা, কিন্তু এখনও জ্বলজ্বল করছে, দুচোখ থেকে আগুনের ফুলকি আর দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু না, রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের শত্রুদের পুড়িয়ে মারার সময় কার্ডিনালের যে জমকাল পোশাকটা পরে তিনি জনসাধারণের সামনে শোভাবর্ধন করছিলেন এখন আর তার গায়ে সেটা নেই। না, এই মুহূর্তে তিনি যা গায়ে দিয়েছেন সেটা নেহাৎই সন্ন্যাসীদের উপযোগী মোটা কাপড়ের একটা পুরনো জোব্বা। পিছন পিছন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে বিষণ্ণ বদনে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে তাঁর সহকারী ও সেবকের দল, আর তাঁর 'পবিত্র' রক্ষীদল। জনতার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করতে লাগলেন। সবই তাঁর নজরে পড়েছিল। দেখলেন শববাহকরা কফিনটা ওই মানুষটির পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখল, তারপর কীভাবে মেয়েটিকে কীভাবে বাঁচিয়ে তোলা হল তাও তিনি দেখলেন। তাঁর মুখে অন্ধকার ছায়া ঘনিয়ে এলো। তাঁর ঘন পাকা ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল, অলক্ষণসূচক ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তাঁর দু চোখে। কার্ডিনাল আঙুল তুলে ইশারায় লোকটিকে ধরার নির্দেশ দিলেন তাঁর রক্ষীদের। কার্ডিনাল ব্যক্তিটির ক্ষমতা এমনই, আর লোকেও তাঁর কথার বাধ্য হয়ে দুরুদুরু বুকে তাঁর আজ্ঞাপালনের এমনই শিক্ষা ইতিমধ্যে পেয়ে এসেছে যে জনতা আর কালবিলম্ব না করে দুপাশে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর রক্ষীদের জন্য পথ করে দিল। অকস্মাৎ যে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো তারই মাঝখানে

এই সুযোগে তারা দিব্যি মানুষটির গায়ে হাত তুলল, মারধর করে তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। সমগ্র জনতা মুহূর্তের মধ্যে একজোটে, একাত্মা হয়ে, আভূমি মাথা নত করে মহা বিচারক এই মহাস্থবিরটিকে প্রণাম জানাল, তিনিও নীরবে তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেলেন। রক্ষীদল তাদের বন্দিকে নিয়ে পবিত্র ধর্মাধিকরণের প্রাচীন ভবনে খিলান দেওয়া চাপা, অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা কুঠুরির মধ্যে এনে সেখানেই তাকে বন্ধ করে রেখে চলে গেল। দিন শেষ হল, নেমে এলো সেভিলের 'নিস্পন্দ' উত্তপ্ত অন্ধকার রাত। বাতাসে 'লরেলপাতা, লেবুর সুবাস'।[৮৫] ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ ঝনঝন শব্দে খুলে গেল কারাগারের লৌহকপাট। একটা আলো হাতে ধীর পদক্ষেপে কারাকক্ষে প্রবেশ করলেন স্বয়ং মহাবিচারক, সেই বৃদ্ধ কার্ডিনাল। তিনি একা। ভেতরে ঢুকতে তার পিছন পিছন দরজাও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। প্রবেশ পথের মুখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ—মিনিট পাঁচেক অথবা মিনিট দুয়েক হবে—বন্দির মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন, শেষ কালে মৃদু পায়ে এগিয়ে এসে বাতিটা টেবিলের ওপর রেখে তাঁকে বললেন "এ কি তাহলে তুমি? তুমিই কি?" কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, "তা না-ই বা দিলে উত্তর, চুপ করেই থাক। কীই বা বলার আছে তোমার? তুমি কী বলবে তা আমার বেশ ভালো জানা আছে। তাছাড়া ইতিপূর্বে, অতীতে তুমি যা বলেছ তার বাইরে বেশি আর কিছু যোগ করার অধিকারও নেই তোমার। তাহলে কেন আমাদের জ্বালাতে এলে বল তো? তুমি যে আমাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য এসেছ সে তুমি নিজেও জান। কিন্তু আগামীকাল কী হবে তুমি জান কি? আমি জানি না তুমি কে, জানতে চাইও না তুমিই সেই কিনা, নাকি স্রেফ তারই মতো আর কেউ, কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি যে আগামীকালই আমি তোমার দণ্ডবিধান করব, ঘোর পাষণ্ড হিসেবে ধুনির আগুনে তোমাকে পুড়িয়ে মারব, আর এই যে লোকগুলো আজ তোমার পদচুম্বন করছিল তারাই আবার কালই আমার সামান্যতম ইঙ্গিতে তোমার ওই চিতার আগুনে কয়লা খুঁচিয়ে দিতে ছুটে যাবে— তা কি তোমার জানা আছে? অবশ্য হ্যাঁ, তুমি হয়ত এটা জানও", মুহূর্তের জন্যও বন্দির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে গভীর ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যোগ করলেন।

"তুমি যে কী বলতে চাইছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না দাদা", এতক্ষণ ধরে নীরবে তার কথা শুনতে শুনতে শেষকালে মৃদু হেসে আলিয়োশা বলল। "এটা কি স্রেফ তোমার একটা সীমাহীন কল্পনা, নাকি বৃদ্ধের কোনো ভুল, quid pro quo—* 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ধরনের অসম্ভব কোনো ব্যাপার?"

"ওই শেষটাই ধর না কেন।" ইভান হেসে উঠল। "আজকের দিনের বাস্তবতা

---

* লাতিন

যদি তোর মাথাটা এমন খেয়ে ফেলে যে যে-কোনো রকম কল্পনাই তোর সহ্যের বাইরে তা হলে quid pro quo "বলতে হয় তা-ই বল না হয়", বলতে বলতে আবার সে হেসে উঠল। 'সত্যিই তো, বৃদ্ধের বয়স নব্বই। তাঁর যে ধ্যান ধারণা তাতে অনেক আগেই তার মাথা খারাপ হতে পারত। বন্দির চেহারাও তাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে থাকতে পারে। শেষকালে এমনও হতে পারে যে এটা স্রেফ তার একটা মনের বিকার, মারা যাবার আগে নব্বই বছরের এক বৃদ্ধের উদ্ভট কল্পনা, যেহেতু আগের দিন বিশ্বাসের কর্মযজ্ঞে এক শ জন ধর্মদ্রোহী পাষণ্ডকে পুড়িয়ে মারার পর এমনিতেই বড়ো বেশি উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন তিনি। কিন্তু উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে হোক আর সীমাহীন কল্পনাই হোক এতে তোর-আমার কী আসে যায় বল তো? এখানে আসল ঘটনা এই যে বৃদ্ধ তাঁর নব্বই বছরের জীবনে, এই এতকাল যা নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি, শেষ পর্যন্ত তাঁর মনের সেই কথাটি বলা দরকার এবং সরবেই বলা দরকার।"

"কিন্তু বন্দি? সেও তো চুপ করে আছে? তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে দেখছে, কিন্তু একটা কথাও বলছে না?"

"হ্যাঁ সেটাই তো হওয়া উচিত—এমনকি সর্বক্ষেত্রেই হওয়া উচিত।" ইভান আবারও হাসল। "বৃদ্ধ নিজমুখে লোকটাকে এমন কথাও বলেছেন যে ইতিপূর্বে, অতীতে সে যা বলেছে তার বেশি আর কিছু যোগ করার অধিকার তার নেই। যদি চাস তো বলা যেতে পারে এরই মধ্যে নিহিত আছে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য—অন্তত আমার তো তাই মত। তাদের কথাটা এই যে 'সবই তুমি তুলে দিয়েছ ধর্মগুরু পোপের হাতে, তাই সবই এখন তাঁর হাতে। তোমার আর এখন আসার কোনো দরকার নেই এবং অন্তত কিছুকালের জন্য আর আমাদের জ্বালাতে এসো না।' এই ধরনের কথা তারা যে শুধু মুখেই বলে তা নয়, লেখেও—অন্তত যিশুসমিতির অনুগামীরা[২৪] তো বটেই। এ আমি নিজে ওদের ঈশ্বরতত্ত্ববিদদের লেখায় পড়েছি। "যে জগৎ থেকে তোমার আগমন সেখানকার অন্তত একটি রহস্যও প্রকাশ করার অধিকার তোমার আছে কি?" আবার সেই বৃদ্ধ তাঁকে প্রশ্ন করেন, আবার নিজেই তাঁর হয়ে জবাব দেন "না, সে অধিকার তোমার নেই যেহেতু ইতিপূর্বে যা বলা হয়ে গেছে তার বেশি কিছু যোগ তুমি করতে পার না এবং তুমি যখন এই ধরাধামে বর্তমান ছিলে তখন যে স্বাধীনতার পক্ষ নিয়ে তুমি অত করে দাঁড়িয়েছিলে, মানুষের কাছ থেকে তা তুমি কেড়ে নিতে পার না। এখন তুমি নতুন করে যা কিছু ঘোষণা করবে সে সবই মানুষের ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে, যেহেতু তার প্রকাশ ঘটবে অলৌকিক ঘটনা রূপে, অথচ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা এই সেদিনও—মাত্র দেড় হাজার বছর আগের তোমার কাছে পরম মূল্যবান ছিল। তুমিই না তখন প্রায়শ বলতে 'আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিব।' কিন্তু এখন তো তুমি এই 'মুক্ত' মানুষগুলিকে দেখলে" কী যেন ভাবতে

ভাবতে বাঁকা হাসি হেসে বৃদ্ধ হঠাৎ যোগ করলেন। ‘‘হ্যাঁ একাজের জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে’’, কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি বলে যেতে লাগলেন, ‘‘কিন্তু তোমার খাতিরে কাজটা শেষ পর্যন্ত আমরা সম্পন্ন করেছি। পনেরোটি শতাব্দী ধরে তোমার ওই মুক্তি নিয়ে আমাদের কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এখন তার পালা শেষ হয়েছে, পাকাপাকি ভাবে চুকেবুকে গেছে। পাকাপাকি ভাবে চুকেবুকে গেছে—এটা বুঝি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি দেখতে পাচ্ছি কেমন বিনীত ভাব করে তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ, এতটুকু ক্রোধ বা ঘৃণার যোগ্য পর্যন্ত আমাকে মনে কর না! কিন্তু জেনে রাখ, এখন, ঠিক এই এখনই, সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছে বলে এই লোকগুলির যে বিশ্বাস তা আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় হয়েছে, তবু কিন্তু তারা নিজেরাই তাদের স্বাধীনতাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসে বিনীত ভাবে আমাদের পদতলেই ন্যস্ত করেছে। কিন্তু সেটা ঘটিয়েছি আমরা। তুমি কি সেটাই চেয়েছিলে? এই স্বাধীনতাই কি তোমার কাম্য ছিল?’’

‘‘আমি এবারেও বুঝতে পারছি না কিন্তু’’, আলিয়োশা বাধা দিয়ে বলল, ‘‘উনি কি বিদ্রূপ করছেন, মজা করছেন?’’

‘‘মোটেই নয়! উনি ওঁর নিজের এবং ওঁর অনুগামীদের এই কৃতিত্বই দাবি করতে চাইছেন যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতাকে তাঁরা কাবু করতে পেরেছেন এবং সেটা তাঁরা এই উদ্দেশ্যেই করেছেন যাতে লোকে সুখী হয়। ‘যেহেতু কেবল এই এখনই’—অর্থাৎ কিনা, বলাই বাহুল্য, ধর্মাধিকরণের মহাবিচার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—‘এই প্রথম, মানুষের সুখের কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে বিদ্রোহী করে। যে বিদ্রোহী সে কি সুখী হতে পারে? তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল’, বৃদ্ধ তাঁকে বললেন, ‘সাবধান বাণী, নির্দেশ বা লক্ষণের’ কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু সে সবে তুমি কর্ণপাত করলে না। একমাত্র যে পথে মানুষকে সুখী করা যেত, সে পথ তুমি অগ্রাহ্য করলে, কিন্তু ভালো বলতে হবে যে যাবার সময় তুমি তোমার কর্মভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলে। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তোমার কথা দিয়ে এটাই প্রতিষ্ঠা করেছিলে যে তুমি আমাদের বন্ধনের ও বন্ধনমোচনের অধিকার দিয়েছ; তাই, বলাই বাহুল্য, এখন আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা তোমার পক্ষে ভাবাই সম্ভব নয়। তাহলে কেন এসেছ আমাদের জ্বালাতে?’

‘‘কিন্তু ‘সাবধানবাণী, নির্দেশ বা লক্ষণের কোনো অভাব ছিল না’ বলতে কী বোঝায়?’’ আলিয়োশা জানতে চাইল।

‘‘আসল কথাটা তো সেখানেই—সেটাই তো বৃদ্ধের খোলসা করে বলা দরকার।’’

‘বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, ‘‘আত্মবিনাশ ও অনস্তিত্বের বুদ্ধিমান ও করাল ছায়ামূর্তিটি, সেই সুমহান ছায়ামূর্তিটি ঊষর মরুপ্রান্তরে তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল। শাস্ত্রগ্রন্থগুলি এ প্রসঙ্গে আমাদের যা জানাচ্ছে তা এই যে সে নাকি তোমাকে প্রলুব্ধ

করেছিল। তাই কি? কিন্তু তিনটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সে তোমার কাছে যে সত্য প্রকাশ করেছিল, যা কিনা তুমি অগ্রাহ্য করেছিলে এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে যা ‘প্রলোভন’ নামে আখ্যাত হয়েছে তার চাইতে বড়ো সত্য আর কিছু বলা সম্ভব ছিল কি?[৮৫] কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, পৃথিবীতে কখনও প্রচণ্ড বিস্ময়কর, সত্যিকারের অলৌকিক যদি কিছু ঘটে থাকে তা ঘটেছিল সেই সময়—ওই তিনটি প্রলোভনের সময়। অলৌকিক ঘটনা বলতে যদি কিছু থাকে তা ঠিক এই তিনটি প্রশ্ন ওঠার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ, নিছক তর্কের খাতিরে যদি এমন চিন্তা করা সম্ভব হত যে ওই ভয়াল ছায়ামূর্তি ওই যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তা শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে কোথাও বেমালুম হারিয়ে গেছে এবং সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করা ও নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা করে লিখে আবার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, আর এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যেখানে যত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আছেন—শাসক, সর্বোচ্চ যাজক মণ্ডলী, বিদ্বৎসমাজ, দার্শনিক, কবি—এঁদের সকলকে ডেকে একত্রিত করে যদি তাদের হাতে এই সমস্যাটি সমাধানের ভার দিয়ে বলা হয় আপনারা ভেবেচিন্তে এমন তিনটি প্রশ্ন তৈরি করুন যেগুলিকে শুধু ঘটনার বিস্তারের উপযোগী হলেই চলবে না, সেগুলির মধ্য দিয়ে এছাড়াও তিনটি কথায়, মানবিক তিনটি বাক্যবন্ধে বিশ্বের তথা মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রকাশ করতে হবে—তাহলে তোমার কী মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় প্রভা একসঙ্গে মিলে মাথা খাটিয়ে অন্তত এমন একটা কিছু বের করতে পারবে যা শক্তিতে ও গভীরতায় সেই তিনটি প্রশ্নের সমান, যেগুলি ওই বুদ্ধিমান ও পরাক্রান্ত ছায়ামূর্তি তখন শূন্য মরুপ্রান্তরে সত্যি সত্যি তোমার কাছে প্রস্তাব হিসেবে রেখেছিল? একমাত্র ওই প্রশ্নগুলি থেকেই, যে অলৌকিক পরিস্থিতিতে সেগুলির আবির্ভাব, শুধু তা থেকেই বোঝা যায় যে বুদ্ধির কথা আমরা বলছি তা কোনো পরিবর্তনশীল মানববুদ্ধি নয়, সে বুদ্ধি চিরন্তন ও নিরঙ্কুশ। তার কারণ এই তিনটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যেন মানবজাতির ভাবীকালের সমগ্র ইতিহাস সম্মিলিত হয়ে এক অখণ্ড সামগ্রিক রূপ ধারণ করেছে, তার সম্পর্কে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করার করা হয়ে গেছে, প্রকটিত হয়ে উঠেছে এমন তিনটি রূপ যেখানে সমগ্র পৃথিবীর মানবপ্রকৃতির মীমাংসিত যাবতীয় ঐতিহাসিক বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটবে। সেই সময় এটা এতটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি, যেহেতু ভবিষ্যৎ তখনও অজ্ঞেয়; কিন্তু এখন পনেরো শ বছর পার হওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে সব কিছু এমন নিখুঁত ভাবে অনুমান করা হয়েছে, আগে থাকতে বলে দেওয়া হয়েছে এবং সবই এতদূর সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে সেখানে যেমন আর কিছু যোগ করা যায় না, তেমনি সেখান থেকে আর কিছু বাদও দেওয়া যায় না।

‘তাহলে নিজেই বিচার করে দেখ কার কথা সত্যি—তোমার, না যে তোমাকে সেদিন প্রশ্ন করেছিল তার? প্রথম প্রশ্নটি মনে করার চেষ্টা কর আক্ষরিক অর্থে

না হলেও তার মোটামুটি অর্থটা এই রকম  জগৎ সংসারের মধ্যে ঢোকার ইচ্ছে তোমার, কিন্তু যাচ্ছ খালি হাতে, কোথাকার কী সব মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে, যা তাদের সরল প্রকৃতি আর জন্মগত অনাচারী স্বভাবের দরুন উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের নেই, যা তাদের মনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে—যেহেতু মানুষের কাছে, মানবসমাজের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে অসহ্য আর কিছুই কখনও ছিল না! অথচ এই নগ্ন তাপদগ্ধ মরুপ্রান্তরে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি তুমি দেখতে পাচ্ছ? সেগুলিকে রুটিতে পরিণত কর, তাহলেই দেখবে মানবজাতি কৃতজ্ঞচিত্তে, তোমার বাধ্য হয়ে একপাল মেষের মতো তোমার পিছন পিছন ছুটছে, যদিও চিরকাল এই আশঙ্কায় তাদের বুকও কাঁপতে থাকবে যে কখন আবার তুমি হাত গুটিয়ে নাও, তোমার রুটি থেকে তাদের বঞ্চিত কর। কিন্তু মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার প্রবৃত্তি তোমার হল না, তুমি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলে। ভাবলে, আজ্ঞানুবর্তিতা যেখানে রুটি দিয়ে কিনতে হয় সে আবার কীরকম স্বাধীনতা? তুমি আপত্তি জানিয়ে বললে, 'মানুষ কেবল রুটিতেই জীবনধারণ করে না।' কিন্তু তুমি এটা জান কি যে ঠিক এই পার্থিব রুটির নাম নিয়েই পৃথিবীর প্রেতমূর্তি তোমার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে নামবে, তোমাকে পরাস্তও করবে, সকলেই তাকে অনুসরণ করবে, উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে বলবে  'এই পশুশক্তি আমাদিগকে স্বর্গ হইতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে, ইহার সমকক্ষ কে আছে!' একথা জান কি, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবে, এক সময়ে মানবজাতি তার পরম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে ঘোষণা করবে যে অপরাধ বলে কিছু নেই, অতএব পাপও নেই, থাকার মধ্যে আছে শুধু ক্ষুধা। 'অগ্রে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর, তৎপর উহাদিগের নিকট হইতে সৎকর্ম যাচ্ঞা কর!'— তোমার বিরুদ্ধে যে বৈজয়ন্তী তারা উত্তোলন করবে এবং যার সাহায্যে তোমার দেবালয় ধ্বংস হবে এই কথাই তাতে লেখা থাকবে। যেখানে তোমার দেবালয় ছিল সেখানে উঠবে এক নতুন সৌধ, আবার উঠবে বাবেলের সেই ভয়ঙ্কর মিনার[৮৬], যদিও এটারও নির্মাণকর্ম আগেরটার মতোই শেষ হবে না, তা হলেও তুমি কিন্তু এই নতুন সৌধ নির্মাণের কাজটা এড়িয়ে যেতে পারতে এবং তাতে মানুষের যন্ত্রণাভোগও হাজার বছর কমাতে পারতে, অথচ দেখ, হাজার বছর ওদের ওই মিনার নিয়ে অত ভোগান্তির পর তারা কিন্তু ফের আমাদের কাছেই আসবে! তারা তখন মাটির তলায় হোক, ভূগর্ভের চোরাকুঠুরিতে আমাদের গুপ্তস্থানেই হোক সর্বত্র তন্ন তন্ন করে আমাদের খুঁজে বেড়াবে, কারণ আমরা তখন আবার ওদের নিগ্রহ ও নির্যাতনের কবলে পড়ব। ওরা আমাদের খুঁজে বের করবে, উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে আমাদের বলবে  'আমাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর, যেহেতু যাহারা আমাদিগকে স্বর্গ হইতে অগ্নি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহারা উহা প্রদান করে নাই।' তখন আমরাই কিন্তু তাদের ওই সৌধ নির্মাণের কাজ শেষ করব, যেহেতু যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে সে-ই নির্মাণকর্ম

সমাধা করবে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি যদি কেউ করতে পারে সে আমরাই—সেটা আমরা করব তোমার নামে—বলছি বটে তোমার নামে, কিন্তু সেটা মিছে কথা। না না, আমাদের বাদ দিয়ে ওরা নিজেরা নিজেদের ক্ষুধা মেটাতে পারবে না—কখনও না, কস্মিন কালেও না! যতক্ষণ তারা মুক্ত থাকছে ততক্ষণ কোনও বিদ্যাই তাদের রুটি জোগাতে পারবে না। কিন্তু শেষকালে অবস্থা এমন হবে যে তারা তাদের স্বাধীনতাকে আমাদের পদতলে অঞ্জলি দিয়ে আমাদের বলবে: 'বরঞ্চ আমাদিগকে দাসে পরিণত কর, কিন্তু আমাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।' অবশেষে তারা বুঝতে পারবে সকলের জন্য স্বাধীনতা আর পর্যাপ্ত পরিমাণে পার্থিব খাদ্যবস্তু একই সঙ্গে হয় না, কেন না কখনও, কস্মিনকালেও তারা তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগাভাগি করে নিতে পারবে না! তারা এ বিষয়েও নিশ্চিত হবে যে মুক্ত তারা কখনই হতে পারে না, কেন না তারা ক্ষীণবল, কলুষিত, নগণ্য ও বিদ্রোহী। তুমি তাদের স্বর্গীয় খাদ্যবস্তুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, কিন্তু আবারও বলছি যারা দুর্বল, যারা চিরকলুষিত, যারা চিরকালই অকৃতজ্ঞ সেই মানবগোষ্ঠীর চোখে কি পার্থিব খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তার কোনও তুলনা চলতে পারে? আর স্বর্গীয় খাদ্যবস্তুর নামে যদি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমাকে অনুসরণ করেও তাহলে আরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যে জীব, স্বর্গীয় খাদ্যবস্তুর খাতিরে পার্থিব খাদ্যবস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের দশা কী হবে বলতে পার কি? নাকি মাত্র ওই লাখ কয়েক মহাশক্তিমান মহাপুরুষ ব্যক্তি, কেবল ওরাই তোমার কাছে পরম মূল্যবান, আর বাকি যে কোটি কোটি মানুষ, সমুদ্র সৈকতে বালুকণার মতো অসংখ্য যে মানুষ, যারা দুর্বল, অথচ তোমাকে ভালোবাসে, তারা কিনা মহাশক্তিমান ও মহাপুরুষদের নিছক উপকরণ হয়ে কাজ করবে? না, যারা দুর্বল তারাও আমাদের কাছে মূল্যবান। তারা কলুষিত, তারা বিদ্রোহী, কিন্তু অন্তিমে তারাও অনুগত হবে। তারা আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবে, আমাদের ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করবে এই কারণে যে আমরা তাদের ওপরওয়ালা হয়েও স্বাধীনতা সহ্য করতে এবং তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে রাজি হয়েছি—আর তাইতে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হওয়াটাই তাদের কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হবে। কিন্তু আমরা বলব আমরা তোমার অনুগত, তোমার নামেই আমরা প্রভুত্ব করছি। আবারও আমরা তাদের ফাঁকি দেব, কারণ তোমাকে আর আমাদের কাছে ঘেঁষতে দেব না। আমাদের যা কিছু যন্ত্রণা তা নিহিত থাকবে এই ফাঁকিবাজির মধ্যে, যেহেতু আমাদের মিথ্যে বলতে হবে। এই হল মরুপ্রান্তরে তোমার উদ্দেশে করা সেই প্রথম প্রশ্নের তাৎপর্য, আর এটাই তুমি অগ্রাহ্য করেছিলে স্বাধীনতার খাতিরে, যে স্বাধীনতাকে তুমি সব কিছুর ওপরে স্থান দিয়েছিলে। অথচ এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে ইহজগতের পরম রহস্য। 'রুটি' গ্রহণ কালে তুমি যেমন একক ব্যক্তিসত্তা হিসেবে, তেমনি একই সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে মানবজাতি হিসেবেও সার্বিক ও শাশ্বত একটি মানবিক আকুলতা মেটাতে পারবে—সেটা হল, 'কার পূজা করা?'

মানুষ যখন একবার স্বাধীন হতে পারল তখন যাকে পূজা করা যায় এমন কাউকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করার যে তাগিদ নিরন্তর তার মধ্যে দেখা যায় তার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু মানুষ এমন একটা কিছুর উপাসনা করতে চায় যা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, তর্কাতীত, এতটাই তর্কাতীত যে সব মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে তাকে পূজা করতে রাজি হবে। আমার অথবা আরেক জনের উপাসনার বস্তুটা কী হবে কেবল সেটাই খুঁজে বের করার জন্য এই নগণ্য জীবগুলির যে এত চিন্তা তা নয়, তাদের চিন্তা এমন একটা কিছু খুঁজে বের করা যাকে সকলে বিশ্বাস করতে পারে, ভক্তিভরে পূজা করতে পারে, এবং বলাই বাহুল্য, সেটা *সকলে মিলে* সমবেত ভাবে করতে পারে। পূজার এই *বারোয়ারি ভাব*টার এই যে তাগিদ সেটাই যুগযুগান্তর ধরে যেমন ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি মানুষের তেমনি সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির যন্ত্রণার মূল উৎস। পূজার এই বারোয়ারি স্বার্থে তারা তরবারির সাহায্যে পরস্পরকে নিধনে প্রবৃত্ত হল। তারা দেবদেবী সৃষ্টি করে পরস্পরকে আহ্বান করে বলল 'তোমাদের দেবদেবীকে পরিহার করে আমাদের দেবদেবীর পূজা কর, নইলে তোমাদের তো বটেই, তোমাদের দেবদেবীরও মৃত্যু ঘটবে!' আর এরকমই চলতে থাকবে জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত, এমনকি তখনও, যখন দেবদেবীরাও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন তা সত্ত্বেও তারা দেবদেবীর মূর্তির সামনে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবে। একথা তুমি জানতে, এমন হতে পারে না যে মানবপ্রকৃতির এই মূল রহস্যটি তোমার জানা ছিল না। কিন্তু সকলে যাতে অকুণ্ঠচিত্তে তোমার উপাসনা করতে বাধ্য হয় তার জন্য অনন্য অদ্বিতীয় যে বৈজয়ন্তীটি তোমাকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল পার্থিব রুটির সেই বৈজয়ন্তীকে তুমি কিন্তু অগ্রাহ্য করলে, অগ্রাহ্য করলে স্বাধীনতা ও স্বর্গীয় রুটির নামে। একবার তাকিয়ে দেখ, তোমাকে বলে রাখছি, কী করে কাউকে খুঁজেপেতে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার হাতে তুলে দেওয়া যায় স্বাধীনতার সেই উপহারটি, যা নিয়ে এই হতভাগ্য জীবটি জন্মেছিল, এর চেয়ে বেশি মর্মান্তিক চিন্তা আর মানুষের হতে পারে না। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা একমাত্র তার পক্ষেই কুক্ষিগত করা সম্ভব যে ব্যক্তি মানুষের বিবেককে দমিয়ে রাখতে পারে। রুটির মধ্য দিয়ে প্রশ্নাতীত সেই বৈজয়ন্তীটি তোমার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল রুটি দাও, লোকে পূজা করবে, কেন না রুটির চেয়ে তর্কাতীত আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু সেই সময় তুমি ছাড়া আর কেউ যদি তার বিবেককে অধিকার করে বসে, তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না—মানুষ তখন তোমার এই রুটি পর্যন্ত ফেলে দিয়ে যে তার বিবেককে ভুলিয়েছে তাকেই অনুসরণ করবে। এটা তুমি ঠিকই ধরেছ, কারণ মানুষের অস্তিত্বের রহস্য শুধু জীবনধারণ করার মধ্যে নিহিত নেই, কীসের জন্য সে জীবন ধারণ করছে তার মধ্যে নিহিত আছে। কীসের জন্য তার বাঁচা সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকলে মানুষ বাঁচতে রাজি হবে না এবং এই পৃথিবীতে আর

না থেকে বরং সে নিজেকে বিনাশ করবে—যদিও তার চারপাশে রুটির কোনো অভাব ছিল না। এটা ঠিক, কিন্তু পরিণামে কী হল? কোথায় তুমি মানুষের স্বাধীনতাকে কুক্ষিগত করবে, তা নয়, বরং এই করে তুমি সেটা আরও বাড়িয়ে দিলে। নাকি তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে মানুষের কাছে মনের শান্তি, এমনকি মৃত্যুও স্বাধীনভাবে ভালোমন্দ বাছাই করার মতো জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে বেশি মূল্যবান? মানুষের কাছে তার বিবেকের স্বাধীনতার মতো মন মাতানো আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়কও আর কিছু হতে পারে না। অথচ দেখ, মানুষের বিবেককে চিরতরে শান্ত করে রাখতে গেলে যে দৃঢ় ভিত্তির দরকার তার বদলে যা যা অসাধারণ, প্রহেলিকাময় ও অনির্দিষ্ট এবং যা যা মানুষের শক্তির অসাধ্য তুমি বেছে বেছে সেগুলিই গ্রহণ করলে, তাই তুমি যে কাজ করলে তাতে মনে হল না তুমি আদৌ তাদের ভালোবাস। আর এটা করল কে?— করল কিনা সেই মানুষটি যে তাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে এসেছিল! মানুষের স্বাধীনতাকে কুক্ষিগত না করে তুমি তাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলে, মানুষের অন্তরের রাজত্বকে তার গুরুভারে চিরকালের জন্য ভারাক্রান্ত করে তুললে। তোমার একান্ত বাসনা ছিল মানুষের মুক্ত প্রেম, যাতে মানুষ তোমাতে মোহিত হয়ে, তোমার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে স্বাধীন ভাবে তোমাকে অনুসরণ করে। কঠোর প্রাচীন নিয়মের বদলে এর পর থেকে মানুষকে নিজেকেই তার মুক্ত মন নিয়ে স্থির করতে হবে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, আর তার সামনে পরিচালনায় থাকছে শুধুই তোমার মূর্তি। কিন্তু তুমি তাই বলে একবার ভেবেও দেখলে না যে নির্বাচকের স্বাধীনতার মতো অমন ভয়ঙ্কর বোঝার ভারে যদি তাকে উৎপীড়ন করা যায় তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা প্রত্যাখ্যান করবে, এমনকি তোমার মূর্তিতে আর তোমার সত্যেও আপত্তি জানাবে! শেষ পর্যন্ত তারা সরবে জানাবে যে সত্য আর তোমাতে নেই, যেহেতু এত সব দুর্ভাবনা, মীমাংসার অতীত এত সব সমস্যা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যে রকম বিহ্বল অবস্থা ও যন্ত্রণার মধ্যে তুমি তাদের ফেলে দিয়েছিলে তা আর তাদের পক্ষে চলতে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই ভাবে তুমি নিজেই তোমার নিজেরই রাজ্যের ধ্বংসের ভিত্তি স্থাপন করলে, তাই সে দোষ আর অন্য কারও ঘাড়ে চাপাতে যেয়ো না। অথচ এই প্রস্তাবই কি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল? তিনটি শক্তি আছে, পৃথিবীতে মাত্র তিনটি শক্তিই আছে যা এই ক্ষীণবল বিদ্রোহীদের বিবেক তাদের নিজেদেরই সুখের স্বার্থে জয় করতে পারে, বন্দি করে রাখতে পারে। অলৌকিকতা, রহস্য আর কর্তৃত্ব—এই হল সেই তিন শক্তি। তুমি একে একে তিনটেকেই অগ্রাহ্য করলে, নিজেই তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে। সেই ভীষণদর্শন মহাজ্ঞানী ছায়ামূর্তি যখন তোমাকে দেবালয়ের শীর্ষদেশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল: ‘তোমার যদি জানিবার বাসনা থাকে তুমি ঈশ্বরের পুত্র কিনা তাহা হইলে নিম্নমুখে নিক্ষিপ্ত হও, যেহেতু তাঁহার সম্পর্কে কথিত হইয়াছে যে দেবদূতবৃন্দ তাঁহাকে শূন্যপথে

গ্রহণপূর্বক বহন করিবেন এবং সে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইবে না, আঘাতপ্রাপ্ত হইবে না; তাহাতে পরিজ্ঞাত হইবে তুমি ঈশ্বরের পুত্র কিনা, অপিচ প্রমাণ দিবে তোমার পিতায় তোমার কী পরিমাণ বিশ্বাস রহিয়াছে।' কিন্তু তুমি সব শোনার পর সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিলে, তার কথা শুনে নিচে ঝাঁপ দিলে না। হ্যাঁ, একথা মানতেই হবে যে এ কাজ করে তুমি ঈশ্বরের মতোই গর্ব ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু মানুষ তো দুর্বল আর বিদ্রোহপরায়ণ জাত—তারা কি আর ভগবান? হ্যাঁ, তুমি তখন বুঝতে পেরেছিলে আর একটি মাত্র পাও যদি ফেল, নিজেকে নিক্ষেপ করার দিকে এক পাও যদি এগোও সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ হবে প্রভুকে প্রলুব্ধ করা, সঙ্গে সঙ্গে তুমি তার ওপর বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলতে, পৃথিবীকে পরিত্রাণ করতে এসে তারই বুকে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে, আর যে বুদ্ধিমান ছায়ামূর্তিটি তোমাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল এ দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত। কিন্তু আবারও আমার প্রশ্ন তোমার মতো লোকের সংখ্যা কি অনেক? সত্যি সত্যিই কি তুমি ঘুণাক্ষরেও মনের মধ্যে এমন ধারণার প্রশ্রয় দিতে পেরেছিলে যে এমন প্রলোভন সংবরণ করা মানুষেরও শক্তিসাধ্য হবে? মানুষের প্রকৃতি কি আর এমন ভাবে তৈরি যে অলৌকিক ঘটনাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে এবং জীবনের এমন সব ভয়ঙ্কর মুহূর্তে, তার আত্মার চরম বিভীষিকাময়, চরম যন্ত্রণাদায়ক মৌলিক সমস্যাগুলির সেই সব মুহূর্তে মীমাংসার জন্য শুধুই অন্তরের স্বাধীনতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে? না, না, তুমি জানতে যে তোমার কীর্তিকাহিনি শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে গাঁথা হয়ে থাকবে, যুগযুগান্তরের গভীরে এবং পৃথিবীর শেষতম প্রান্তে পৌঁছে যাবে; তোমার আশা ছিল যে তোমাকে অনুসরণ করে মানুষ ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে, অলৌকিকতার কোনো প্রয়োজন আর তার হবে না। কিন্তু তুমি জানতে না, মানুষ যেই অলৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করল অমনি সে ঈশ্বরকেও অগ্রাহ্য করল, যেহেতু মানুষ যত না ঈশ্বরের সন্ধান করে তার চাইতে বেশি সন্ধান করে অলৌকিকতার। যেহেতু অলৌকিকতা ছাড়া থাকার সাধ্য মানুষের নেই, সেই হেতু সে তার নিজের জন্য নতুন নতুন সমস্ত অলৌকিকতা গড়ে তুলবে—সেগুলি হবে তার নিজস্ব ধাঁচের, যার ফলে সে ওঝার তুকতাক আর ডাকিনীবিদ্যার কাছে মাথা নোয়াবে, যদিও সে ঘোর অনাচারী, পাষণ্ড, বিদ্রোহী ও নিরীশ্বরবাদী ছিল। কোথায়, তুমি তো ক্রুশ থেকে নামলে না, যখন তোমাকে উপহাস করে, তোমাকে খ্যাপানোর জন্য লোকে চেঁচিয়ে তোমাকে বলল, 'ক্রুশকাষ্ঠ হইতে অবতরণ কর তবেই আমাদিগের প্রত্যয় জন্মিবে তুমিই সেই।' তুমি নেমে এলে না, কারণ আবার সেই একই অলৌকিকতা দিয়ে লোককে দাসত্ববন্ধনে বাঁধার প্রবৃত্তি তোমার হল না; অলৌকিকতা থেকে নয়, মুক্ত মন থেকে যে বিশ্বাস আসে তুমি তার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে। যে পরাক্রম একজন পদাধীন মানুষের মনে চিরকালের জন্য ভীতির সঞ্চার করে তার সামনে দাসমনোভাবাপন্ন মুগ্ধ ভাবাবেগ তোমার কাম্য ছিল না,

তুমি ব্যাকুল হয়েছিল মুক্ত প্রেমের জন্য। এখানেই কিন্তু তোমার বিচারে তুমি মানুষকে বড়ো বেশি উঁচু আসনে বসালে, কেননা এটা তো ঠিকই যে তারা পরাধীন, যদিও স্বভাবে বিদ্রোহী। ভালো করে দেখেশুনে বিচার কর— পনেরোটা শতাব্দী পার হয়ে গেল, তাকিয়ে দেখ দেখি ওদের দিকে কাকে তুমি নিজের পর্যায়ে ওঠাতে পেরেছ? হলফ করে বলতে পারি, মানুষ সম্পর্কে তুমি যা ভেবেছিলে মানুষ স্বভাবে তার চেয়ে দুর্বল, তার চেয়েও নীচ! তুমি যা করেছিলে তা কি সে করতে পারে? পারে কি? তাকে এত বেশি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে তুমি যা করলে তাতে দাঁড়াল এই যেন তার ওপর তোমার আর সমবেদনা নেই, কেন না তার কাছ থেকে তোমার দাবিটা বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। এরকম একটা দাবি কে করল? না, সেই তুমি, যে কিনা মানুষকে তার নিজের চেয়েও বেশি ভালো বেসেছিল! তাকে আরেকটু কম শ্রদ্ধা করলে তার কাছে তোমার দাবিটাও আরও কম হত। সেটাই কিন্তু ভালোবাসার বেশি কাছাকাছি হত, তাতে তার বোঝা অনেকটা হালকা হত। মানুষ দুর্বল, সে নীচাশয়। এখন যে সে সর্বত্র আমাদের শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং বিদ্রোহ করছে বলে যে গর্ব করছে, তাতে কী হয়েছে? এই গর্ব একটা শিশুর গর্ব, একটা স্কুল-পড়ুয়ার গর্ব। এরা সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো যারা ক্লাসের মধ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তাদের গুরুমশাইকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের ওই ছেলেমানুষি পুলকের অবসান ঘটবে, এর জন্য তাদের ভালো মাশুল দিতে হবে। ওরা দেবালয় চূর্ণ করবে, রুধিরে আপ্লুত করবে এই ধরণী। কিন্তু ওরা, ওই অবোধ শিশুরা শেষ পর্যন্ত ধরতে পারবে তারা বিদ্রোহী হলে কী হবে, তাদের বিদ্রোহ ক্ষীণবলের বিদ্রোহ, তারা নিজে থেকে বিদ্রোহ করলেও সে বিদ্রোহ সামাল দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। অবোধ শিশুর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করবে যিনি তাদের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে তাদের নিয়ে মজা করতে চেয়েছিলেন। তারা হতাশ হয়ে একথা বলবে, অধার্মিকের মতো হবে তাদের কথাগুলি, যার ফলে তাদের দুঃখদুর্দশা আরও বাড়বে, কারণ মানুষের প্রকৃতিটাই এরকম যে ঈশ্বরনিন্দা তার সহ্য হয় না, তাই শেষকালে এর জন্য চিরকালই প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তাই যাদের স্বাধীনতার জন্য তুমি এত কষ্ট স্বীকার করলে এরপর আজ সেই লোকগুলির হাল কী হল? অস্থিরতা উদ্বেগ আর দুর্ভাগ্য—এই তো জুটল তাদের কপালে। তোমার সেই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষটি[৮৮] তাঁর কল্পনা ও আলঙ্কারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বলেছেন যে তিনি তাঁর দিব্যচক্ষুর সাহায্যে প্রথম পুনরুত্থানে যোগদানকারী সকলকে দেখতে পেয়েছিলেন: তাদের প্রতিটি গোত্র থেকে বারো হাজার করে মানুষ ছিল। কিন্তু তারা সংখ্যায় যদি অতজন হয়েও থাকে, তারা ঠিক মানুষ ছিল না, তারাও ভগবান। তারা তোমার ক্রুসের কষ্ট সহ্য করেছে, ঊষর মরু-প্রান্তরে কয়েক দশক ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে শেকড় বাকড় আর পঙ্গপাল খেয়ে কাটিয়েছে—আর মুক্তির এই সন্তানদের দেখিয়ে,

তাদের মুক্ত মনের ভালোবাসা এবং তোমার নামে মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ তাদের আত্মবলিদানের মহান নিদর্শন দেখিয়ে তুমি অবশ্যই গর্ব করতে পার। কিন্তু মনে রেখো, তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েক হাজার, পরন্তু তারাও ভগবান। কিন্তু বাদবাকিরা? বাকি যারা দুর্বল মানুষ তাদের অপরাধটা কীসের যে পরাক্রমকারীরা যা সহ্য করতে পারল তারা তা পারল না? দুর্বল আত্মার অপরাধটা কীসের বলতে পার যে এত সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক সব উপহার ধরে রাখার ক্ষমতা তার হল না? আচ্ছা, সত্যি সত্যি কি তুমি একমাত্র তোমার মনোনীতদের কাছে এবং তাদের জন্যই এসেছিলে? তাই যদি হয় তাহলে সেটা একটা রহস্য এবং সে রহস্য বোঝার সাধ্য আমাদের নেই। আর সেটা যদি রহস্যই হয় তাহলে আমাদেরও অধিকার আছে পালটা একটি রহস্য প্রচার করার এবং তাদের এটাই শেখানোর যে যা গুরুত্বপূর্ণ তা মুক্তমনের বিচার বা ভালোবাসা নয়; আসলে চাই এমন একটা রহস্য যাকে অন্ধভাবে তাদের মেনে চলতে হবে—এমনকি বিবেককে পাশ কাটিয়ে যেতে হলেও। সেটাই আমরা করেছি। আমরা তোমার কীর্তিকে শোধন করে নিয়ে *অলৌকিকতা, রহস্য* ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে তাকে স্থাপন করেছি। তাদের যে আবারও মেষপালের মতো পরিচালনা করা হচ্ছে এবং যে সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক উপহারগুলি বুকের বোঝা হয়ে তাদের অত যাতনা দিচ্ছিল তা যে শেষ পর্যন্ত অপসারিত হয়েছে সে জন্য লোকের আনন্দের আর সীমা রইল না। এই শিক্ষা দিয়ে, এ কাজ করে আমরা ঠিক করেছি কি না বল? মানুষের অক্ষমতাকে বিনম্র চিত্তে উপলব্ধি করে, প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বোঝা হালকা করে দিয়ে দুর্বল মানবপ্রকৃতিতে আমরা যদি পাপের প্রশ্রয় দিয়েও থাকি এবং আমাদের যদি তাতে অনুমোদনও থাকে তার অর্থ কি এই যে আমরা মানবজাতিকে ভালোবাসিনি? এখন তুমি তাহলে আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে কেন এলে? তোমার ও শান্ত বিনম্র দু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ বল তো? যত খুশি রাগ কর গে, তোমার ভালোবাসা আমি চাই নে, কেন না আমি নিজেই তোমাকে ভালোবাসি না। তাছাড়া তোমার কাছ থেকে আমার গোপন করার মতোই বা কী আছে? না কি ভাবছ কার সঙ্গে কথা বলছি তা আমার জানা নেই? তোমাকে আমার যা যা বলার আছে সে সবই তোমার বিলক্ষণ জানা আছে—তোমার চোখই তা বলে দিচ্ছে। আর আমাদের যা রহস্য আমি কি আর তোমার কাছ থেকে লুকোতে যাব? হয়তো বা তুমি ঠিক আমার মুখ থেকেই সেটা শুনতে চাও? তাই যদি হয় তাহলে শোন। যাকে নিয়ে আমাদের কাজ সে তুমি নও, আমরা আসলে আছি *তার সঙ্গে*—এটাই আমাদের রহস্য! সে আজ অনেক কাল হয়ে গেল—আট শতাব্দী হয়ে গেল আমরা আর *তোমার সঙ্গে নেই, তার সঙ্গে* আছি। তোমাকে সমগ্র পার্থিব সাম্রাজ্য দেখিয়ে সেই যে শেষ উপহারটি তোমাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব সে দিয়েছিল, যা তুমি সেদিন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলে আজ ঠিক আট শতাব্দী আগে” তার কাছ থেকে

আমরা তা গ্রহণ করেছি। আমরা তার কাছ থেকে সিজারের তরবারি ও রোম গ্রহণ করেছি, পার্থিব সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে, একচ্ছত্র অধিপতিরূপে নিজেদের ঘোষণা করেছি, যদিও আজ পর্যন্ত আমাদের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করে উঠতে পারিনি। কিন্তু দোষটা কার? হ্যাঁ, কাজটা এ পর্যন্ত মাত্র প্রাথমিক স্তরে আছে, তবে কাজ শুরু হয়েছে। সম্পন্ন হওয়ার জন্য আরও অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে, আরও অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের এই ধরণীকে, তবে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুব, আমরা সিজার হব, আর তখনই বিশ্বব্যাপী মানুষের সুখের কথা ভাবব। এই শেষ উপহারটা তুমি অগ্রাহ্য করতে গেলে কী বলে? পরাক্রান্ত ছায়ামূর্তির এই তৃতীয় পরামর্শটি যদি তুমি গ্রহণ করতে তাহলে কাকে পূজা করা যায়, কার কাছে নিজের বিবেক গচ্ছিত রাখা যায়, শেষ পর্যন্ত কী উপায়ে যাবতীয় বিতর্কের ঊর্ধ্বে, সর্বসাধারণের গ্রাহ্য ও উপযোগী একটি উইটিবিতে সকলকে জড় করা যায়, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যা যা মানুষের সন্ধানের বিষয়—সে সবই তুমি সম্পাদন করতে পারতে, যেহেতু বিশ্বজনীন ঐক্যবন্ধনের যে তাগিদ সেটাই মানুষের তৃতীয় ও সর্বশেষ যন্ত্রণার বিষয়। মানবজাতি চিরকাল তার সামগ্রিক রূপে অবধারিত ভাবে বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠা লাভের পিছনে ছুটেছে। পৃথিবীতে মহান ইতিহাসের অধিকারী মহা মহা জাতির সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যত বেশি উঁচুতে ছিল তাদের দুর্ভোগও তত বেশি ছিল, যেহেতু সকল জাতির বিশ্বজনীন ঐক্যবন্ধনের তাগিদ অন্যদের তুলনায় তারাই বেশি প্রবলভাবে উপলব্ধি করেছে। দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং ও চেঙ্গিজ খান বিশ্ববিজয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দাপিয়ে বেড়িয়েছে; কিন্তু তারাও সচেতন ভাবে না হলেও মানবজাতির বিশ্বজনীন ও সার্বিক ঐক্যের সেই একই উদগ্র বাসনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। পৃথিবীর ভার গ্রহণ করে, রাজকীয় ভূষণে ভূষিত হয়ে তুমি বিশ্বজনীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিশ্বশান্তির সন্ধান দিতে পারতে। কারণ এই যে, লোকের বিবেক যার নিয়ন্ত্রণে, তাদের রুটি যার হাতে সে ছাড়া আর কে-ই বা লোককে শাসন করতে পারে! তাই তো আমরা সিজারের তরবারি তুলে নিয়েছি, আর তা তুলে নিয়েছি বলে তোমাকে অগ্রাহ্য করে *তাকে* অনুসরণ করেছি। ওঃ, মানুষের মুক্ত মন, তার জ্ঞানবিজ্ঞান আর মানুষের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ির অনাচার আরও কত শতাব্দীই না চলতে থাকবে! কারণ আমাদের বাদ দিয়ে নিজেদের বাবেলের মিনার তৈরি করতে গেলে তা ওই খেয়োখেয়িতেই পরিণত হবে। আর তখনই কিন্তু আমাদের দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসবে জন্তুটি, আমাদের পা চাটবে, তার চোখ থেকে রক্ত হয়ে অশ্রুকণা ছিটকে পড়বে আমাদের পায়ে। আমরা সেই জন্তুটার পিঠে চেপে বসব, তুলে ধরব আমাদের পানপাত্র, তাতে লেখা থাকবে 'রহস্য!' কিন্তু তখন, একমাত্র তখনই মানুষের জন্য নেমে আসবে সুখ আর শান্তির রাজত্ব। তোমার গর্ব তোমার নির্বাচিতদের নিয়ে, কিন্তু তোমার নির্বাচিত—সে তো মাত্র

কয়েক জন! কিন্তু আমরা শান্ত করব সকল মানুষকে। শুধুই কি তাই? তোমার ওই নির্বাচিতদের মধ্যে কত জনেই না, যারা তোমার নির্বাচিত হতে পারত সেই রকম কত পরাক্রান্ত মানুষই না তোমার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে! তাদের অন্তরের যত শক্তি, হৃদয়ের যত উত্তাপ তারা এত দিন ধরে বয়ে বেড়িয়েছে এবং এখনও বয়ে নিয়ে চলেছে তা অন্য এক উর্বর ক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে; পরিণামে এই হবে যে তারা তোমার বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের স্বাধীনতার ধ্বজা তুলবে। কিন্তু সে পতাকা তুমি নিজেই তুলেছিলে। আমাদের আওতায় সকলে সুখে থাকবে, তোমার স্বাধীনতার বেলায় লোকে যেমন যত্রতত্র বিদ্রোহ করে বেড়াত, নিজেদের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটি করে বেড়াত তার কোনোটাই আর হবে না। হ্যাঁ, আমরা ওদের ঠিক বোঝাতে পারব যে ওরা একমাত্র তখনই মুক্ত হতে পারবে যখন ওরা ওদের স্বাধীনতা বর্জন করে তা আমাদের হাতে ন্যস্ত করবে এবং আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। তাহলে সত্যি না মিথ্যে—কোন্‌টা আমরা বলব বল তো? ওরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে আমাদের কাজটাই সত্যি, কেন না ওরা মনে করলেই দেখতে পাবে তোমার ও স্বাধীনতা কী ভয়ঙ্কর দাসত্ব ও বিভ্রান্তির মধ্যে তাদের ফেলে দিয়েছিল। স্বাধীনতা, মুক্ত মন ও মুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের এমন দুর্দশার হাল করে ছাড়বে, এমন সমস্ত অলৌকিকতার সামনে, সমাধানের অতীত এমন সমস্ত রহস্যের সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দেবে যার ফলে তাদের মধ্যে একদল—যারা অবাধ্য ও হিংস্র প্রকৃতির—নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে, আরেক দল—যারা অবাধ্য কিন্তু ক্ষীণবল—একে অন্যকে ধ্বংস করবে; আর বাকি যারা আছে—যারা দুর্বল ও হতভাগ্য—আমাদের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়বে, কাতরকণ্ঠে চেঁচিয়ে তারা বলবে: 'হ্যাঁ, তোমাদের কথাই সত্যি, তাঁর রহস্য একমাত্র তোমাদেরই অধিকারে ছিল; আমরা তাই তোমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করছি, আমাদের নিজেদের কবল থেকে তোমরা আমাদের উদ্ধার কর।' আমাদের কাছ থেকে যখন তারা রুটি পাবে তখন বলাই বাহুল্য, পরিষ্কার দেখতে পাবে আমরা তাদের হাতের, তাদেরই উপার্জন করা রুটি তাদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই বিতরণ করছি এবং কোনো রকম অলৌকিকতা ছাড়াই আমরা এটা করছি। তারা দেখতে পাবে যে আমরা প্রস্তরখণ্ডকে রুটিতে পরিণত করিনি, কিন্তু রুটিতে যতটা নয় তার চাইতেও বেশি ও যথার্থ আনন্দ তারা লাভ করবে এই জন্য যে তারা তা আমাদের হাত থেকে পাচ্ছে! তার কারণ তারা বেশ ভালোভাবে মনে করতে পারবে যে আগেকার দিনে তারা যখন আমাদের সহায়তা ছাড়া ছিল তখন যে রুটি তারা উপার্জন করত তা পর্যন্ত তাদের হাতে পড়ে প্রস্তরখণ্ড হয়ে যেত, কিন্তু যখন তারা আমাদের কাছে ফিরে এলো তখন তাদের হাতের প্রস্তরখণ্ডই রুটিতে পরিণত হল। চিরকালের জন্য, পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ এবং তার মূল্য যে কী তা তারা বেশ বুঝতে পারবে, খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে। লোকে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা বুঝতে

না পারবে ততক্ষণ তাদের সুখ নেই। তাদের এই না- বোঝার পেছনে সবচাইতে বেশি অবদান কার ছিল বল তো? কে এই পশুপালকে ছত্রখান করে নানা অজানা পথে ছড়িয়ে দিল? কিন্তু পশুপাল আবার এক জায়গায় এসে জড় হবে, আবার তারা বশ্যতা স্বীকার করবে, তবে এবারে চিরকালের জন্য। তখন আমরা তাদের এনে দেব নিরীহের সুখশান্তি। তাদের সে সুখ হবে ক্ষীণবল প্রাণীর সুখ। আর তারা জন্মেও ত ছিল ক্ষীণবল হয়ে। হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজ হবে তাদের এটাই বুঝিয়ে দেওয়া যে তারা যেন গর্ব না করে, কারণ তুমি তাদের ওপরে তুলেছিলে এবং তা করে তাদের গর্বিত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলে। আমরা তাদের কাছে এটাই প্রমাণ করব যে তারা ক্ষীণবল, তারা শিশুর মতো করুণার পাত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং শিশুর সুখের চেয়ে মিষ্টি আর কোনও সুখ হতে পারে না। তারা ভয়ে ভয়ে থাকবে, আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, মুরগির ছানারা যেমন ভয়ে জড়সড় হয়ে মা-মুরগির গা ঘেঁষে থাকে, তেমনি তারাও আমাদের গা ঘেঁষে থাকবে। আমাদের দিকে তাকিয়ে তারা অবাক হয়ে যাবে, ভয় পেয়ে যাবে, তাদের গর্ব হবে এই ভেবে যে আমরা এত পরাক্রান্ত, এত বুদ্ধিমান যে কোটি কোটি জীবের এরকম একটা দুরন্ত পালকে আমরা বাগে আনতে পেরেছি। আমাদের ক্রোধের সামনে পড়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে তারা থরথর করে কাঁপতে থাকবে, ভয়ে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে, নারী ও শিশুদের মতো তাদের দু চোখ জলে ভরে উঠবে; কিন্তু আমাদের আজ্ঞামাত্র তেমনি আবার অতি সহজেই সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে আমোদফুর্তি হাসিঠাট্টা, উচ্ছল আনন্দ আর সুমধুর ছেলেভুলানো গানের জগতে যোগ দেবে। হ্যাঁ, আমরা ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেব, তবে তাদের অবসর সময়ে আমরা তাদের জীবনটাকে ছেলেভুলানো গান, সমবেত শিশুকণ্ঠের গান, বাজনা আর নির্দোষ নৃত্যগীতে ভরিয়ে তুলে একটা ছেলেখেলার মতো করে গড়ে তুলব। আর হ্যাঁ তাদের পাপাচারেও আমাদের অনুমতি থাকবে। ওরা দুর্বল, ওরা শক্তিহীন, আমরা যে ওদের পাপাচার করতে দিচ্ছি এর জন্য ওরা শিশুর মতো আমাদের ভালোবাসবে। আমরা ওদের বলব ওদের যে কোনো পাপের স্খালন হবে, যদি তা আমাদের অনুমোদনক্রমে হয়ে থাকে। আমরা যে ওদের পাপাচার করতে দিচ্ছি তার কারণ আমরা ওদের ভালোবাসি। পাপের শাস্তির কথা যদি বল, বেশ তো, তার দায়িত্ব আমরাই না হয় নেব। সে দায়িত্ব আমরা নিজেরা নেব, আর আমরা যে ওদের পাপ নিজেদের দায়িত্বে ঈশ্বরের গোচরীভূত করেছি সেজন্য ওরা ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে আমাদের ভক্তি করবে। আমাদের কাছ থেকে ওদের কোনো রকম গোপনীয়তা থাকবে না। ওদের স্ত্রী ও প্রণয়িনীদের সঙ্গে ওদের থাকতে দেওয়া যাবে কি যাবে না, ওদের সন্তানাদি হওয়া উচিত হবে কি হবে না আমরাই তা স্থির করব। সে সবই স্থির হবে কে কত দূর বাধ্য তার নিরিখে। তারাও আনন্দে উল্লসিত হয়ে আমাদের কাছে নতি স্বীকার করবে। যে সব মর্মান্তিক

গোপন যন্ত্রণা তাদের বিবেককে অহরহ দগ্ধ করছে তার কোনোটাকে বাদ না দিয়ে সে সবই তারা আমাদের সামনে এনে হাজির করবে। আমরা সেগুলির সমাধান করব। সমাধান তারা সানন্দে বিশ্বাস করবে, যেহেতু নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যক্তিগত ক্ষমতায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বর্তমানে যে প্রচণ্ড উদ্বেগ ও ভয়ানক যন্ত্রণা তারা ভোগ করছিল এর ফলে তারা তা থেকে মুক্তি পাবে। এতে সকলেই সুখী হবে—যারা তাদের পরিচালনা করছে এমন লাখ খানেক প্রাণ ছাড়া আরও কোটি কোটি যারা আছে তারা সকলেই সুখী হবে। অসুখী বলতে যদি কেউ হয় সে হব একমাত্র আমরা— আমরা, যারা ওদের গোপন রহস্যকে আড়াল দিয়ে রাখছি। থাকবে কোটি কোটি ভাগ্যবান দুগ্ধপোষ্য শিশু আর থাকবে লাখ খানেক যন্ত্রণাভোগী মানুষ, যারা ভালোমন্দ বোধের অভিশাপ শিরোধার্য করে নিয়েছে। তারা শান্তিতে মারা যাবে, তোমার নাম নিয়ে শান্তিতে তাদের জীবনদীপ নির্বাপিত হবে, কিন্তু পরপারে তারা মৃত্যু বৈ আর কিছুর সন্ধান পাবে না। কিন্তু আমরা গোপনীয়তা বজায় রাখব এবং তাদেরই সুখের জন্য তাদের স্বর্গ ও শাশ্বত লাভের পুরস্কারের লোভ দেখাব, যদিও পরলোকে যদি অমন কিছুর সংস্থান থাকেও সেটা অবশ্যই তাদের মতো লোকদের জন্য নয়। লোকে বলে এবং এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করে যে তুমি নাকি আসবে, এসে আবারও জয়লাভ করবে, তোমার নির্বাচিতদের সঙ্গে নিয়ে, তোমার অহমিকাপূর্ণ পরাক্রান্তদের সঙ্গে নিয়ে নাকি তোমার আবির্ভাব ঘটবে, কিন্তু আমরা বলব ওরা শুধু নিজেদের উদ্ধার করেছে, কিন্তু আমরা সবাইকে উদ্ধার করেছি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভ্রষ্টা নারী পশুপৃষ্ঠে অবস্থান করে তার *রহস্যকে* হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে তাকে লজ্জা পেতে হবে, যারা ক্ষীণবল তারা আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, তার অঙ্গের শোভাবর্ধনকারী রাজেন্দ্রাণীসুলভ রক্তিম বসন ছিন্নভিন্ন করে তার 'ঘৃণ্য' শরীর অনাবৃত করে দেবে। কিন্তু আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখিয়ে দেব সেই কোটি কোটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, যারা সুখী, যারা পাপ বলে কিছু জানে না। আর আমরা, যারা তাদের সুখের জন্য তাদের পাপের বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলব 'যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, যদি তোমার স্পর্ধা থাকে তবে আমাদের বিচার কর। জেনে রেখো, আমি তোমাকে ভয় পাই না। জেনে রেখো, আমিও শূন্য মরুপ্রান্তরে কাটিয়েছি, পোকামাকড় আর শেকড়বাকড় খেয়ে প্রাণধারণ করেছি, যে স্বাধীনতার কামনায় তুমি মানুষকে আশীর্বাদ করেছ আমিও সেই একই আশীর্বাদ তাদের করেছিলাম, তোমার নির্বাচিতদের দলে যোগদানের জন্য আমিও প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তোমার ওই শক্তিশালী ও পরাক্রান্তদের 'সংখ্যা পূরণের' প্রবল বাসনা আমারও ছিল। কিন্তু আমার চমক ভেঙে যেতে পাগলামির সেবা করতে আমার আর প্রবৃত্তি হল না। আমি ফিরে এলাম, শামিল হলাম তাদের দলে যারা *তোমার কীর্তিকে সংশোধন করেছে।* যারা অহমিকাপূর্ণ তাদের সঙ্গ আমি পরিহার করলাম, যারা নিরীহ তাদের সুখের জন্য

ফিরে এলাম তাদের কাছে। আমি তোমাকে যা বলছি তা হবেই হবে, আমাদের রাজ্য সৃজিত হবে। আবারও বলছি, কালই তুমি দেখতে পাবে এই অনুগত পশুপালের কাণ্ড তুমি আমাদের উত্ত্যক্ত করতে এসেছ বলে কাল যখন তোমাকে আগুনে পোড়াতে যাব তখন দেখতে পাবে এই এরাই আমার সামান্যতম ইঙ্গিত মাত্র তোমার চিতার আগুনে জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপাকার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তার কারণ ওই আগুনে পুড়ে মরার যোগ্যতা তোমার চেয়ে বেশি আর কারও নেই। কালই তোমাকে পুড়িয়ে মারব, Dixi [১০]।"

ইভান থামল। কথা বলতে বলতে সে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, অন্য কোনো দিকে তার আর কোনও খেয়াল ছিল না। কথা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

আলিয়োশা এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। শেষের দিকে অবশ্য রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, দাদার কথার মাঝখানে বেশ কয়েকবার বাধা দিতে গিয়েও মনে হয় অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে রেখেছিল। এবারে আর যেন থাকতে না পেরে অকস্মাৎ কথার বন্যায় সে ভেসে গেল।

"কিন্তু ...এ তো অদ্ভুত কথা!" চোখমুখ লাল করে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। "তুমি চাইলে কী হবে, তোমার এই কাব্যের মধ্যে তো যিশুর প্রশংসা বৈ নিন্দার কিছু দেখতে পাচ্ছি না! আর স্বাধীনতা সম্পর্কে তুমি যা বললে তোমার সে কথায় কে বিশ্বাস করবে শুনি? স্বাধীনতাকে কি তাহলে এই ভাবে বুঝতে হবে? এভাবেই কি তাকে বুঝতে হবে? এটাই কি আমাদের সনাতন খ্রিস্টধর্মের ধারণা? তুমি যা বলছ সে তো রোমের কথা—তাও সর্বাংশে নয়। এটা ঠিক নয়—যিশুসমিতির ভণ্ড সদস্য, ক্যাথলিক ধর্মবিচার সভার মহাবিচারক—এ তো ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে যা নিকৃষ্ট তার কথা বলছ তুমি! তোমার যে মহাবিচারক ইনকুইজিটর, সে এমনই এক মনগড়া ব্যক্তি যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মানুষের কোন্‌ কোন্‌ পাপের কথা তুমি বলছ যার দায়িত্ব সে নিজের ওপর নিয়েছে? কারা সেই লোক যারা মানুষের গোপনীয়তার ধারক ও বাহক হয়ে মানবজাতির সুখের জন্য কোথাকার কী সব অভিশাপ নিজেদের ওপর তুলে নিয়েছে? কখন তাদের দেখা গেছে বলতে পার? আমরা যিশুসমিতির সদস্যদের কথা জানি—তাদের সম্পর্কে লোকে মন্দ কথা বলে থাকে; কিন্তু তোমার ওরা কি তারা? একেবারে নয়, আদৌ নয়। ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী পার্থিব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে রোমক সেনাবাহিনীর দরকার ওরা তো এছাড়া আর কিছু নয়; সে সাম্রাজ্যের যিনি সম্রাট, যিনি পুরোধা, তিনি রোমের প্রধান ধর্মগুরু এই হল তাদের আদর্শ। কিন্তু এখানে রহস্যের কোনো স্থান নেই, ভাবগম্ভীর বিষাদচিন্তারও কোনো সুযোগ নেই। এ হল নোংরা পার্থিব সুখের চিন্তা, অতি সাধারণ ক্ষমতালিপ্সা, ভূস্বামী হওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যদের দাসে পরিণত করার, ভবিষ্যতে এক ধরনের ভূমিদাসপ্রথা প্রচলনের প্রবল বাসনা

এর বেশি তাদের আর কী আছে! তারা হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাসই করে না। তোমার ওই যন্ত্রণাভোগী মহাবিচারকটি তোমার উদ্ভট কল্পনামাত্র।

"আরে দাঁড়া, দাঁড়া", ইভান হাসতে হাসতে বলল, "তুই এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস না! বলছিস, উদ্ভট কল্পনা? না হয় তা-ই হল। কল্পনা তো বটেই। কিন্তু একটা কথা আমাকে বল তো তোর কি সত্যি সত্যি মনে হয় যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের এই যে আন্দোলন এ সব নোংরা পার্থিব সুখের চিন্তা আর ক্ষমতা লিপ্সা ছাড়া আর কিছুই নয়? প্রভু পাইসি কি তোকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন?"

"না, না, বরং তার উলটো। প্রভু পাইসি বরং একবার এমন কথাও বলেছিলেন যা অনেকটা এই যেমন তুমি বললে তবে হ্যাঁ, অবশ্যই সে রকম নয়, একেবারেই সে রকম নয়", হঠাৎ টনক নড়তে আলিয়োশা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিল।

"তোর ওই 'একেবারেই সে রকম নয়' সত্ত্বেও খুবই মূল্যবান সমাচার বটে। তোর কাছে আমার প্রশ্নটা ঠিক এটাই যে তোর ওই যিশুসমিতির সদস্যরা আর ধর্মাধিকরণের মহাবিচারকরা কী বলে শুধুমাত্র ঘৃণ্য বৈষয়িক কল্যাণের খাতিরে এককাট্টা হল? আচ্ছা বল দেখি মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মানুষের অপরিমেয় দুঃখে কাতর হয়ে যারা কষ্ট ভোগ করতে পারে এমন একজন মানুষকেও কেন ওদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না? এই দ্যাখ না, নোংরা বৈষয়িক কল্যাণ ছাড়া আর কিছু যাদের কাম্য নয়, তাদের মাঝখান থেকেই ধর অন্তত এমন একজন লোকের— আমার ওই বৃদ্ধ মহাবিচারকের মতো একমাত্র একজনেরই সন্ধান পাওয়া গেল যে ব্যক্তি নিজে মরুপ্রান্তরে শেকড়বাকড় খেয়ে প্রাণ ধারণ করেছিল এবং আত্মার মুক্তি ও ও পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে রক্তমাংসের শরীরকে দমন করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও মানবজাতিকে সে সারা জীবন ভালোবেসে এসেছে— এমন যে মানুষটি, এক দিন হঠাৎ চোখ খুলে যেতে দেখতে পেল ইচ্ছাশক্তির পূর্ণতা অর্জনের মধ্যে তেমন একটা নৈতিক স্বর্গসুখ নেই, যখন সেই সঙ্গে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের সৃষ্টি আরও যে কোটি কোটি জীব আছে তারা কিন্তু যেমনকার তেমন পরিহাসের বস্তুমাত্র হয়ে থেকে যাচ্ছে, নিজেদের স্বাধীনতাকে নিয়ে কিছু করে উঠতে পারার মতো শক্তি তাদের কখনও হবে না, এই বিদ্রোহীগুলো এমনই করুণার পাত্র যে এরা কখনও দৈত্য দানব হয়ে উঠে মিনার তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে যাবে না, আর যে সুসঙ্গতির স্বপ্ন মহান আদর্শবাদী দেখেছিলেন তা এই বোকা হাঁদাগুলোর জন্য নয়। এই সব দেখেশুনে সে পিঠটান দিয়ে শেষকালে বুদ্ধিমানদের দলে গিয়ে ভিড়ল। এমনকি ঘটতে পারে না?"

"কার কাছে? কোন্ বুদ্ধিমানদের দলে গিয়ে ভিড়ল আবার?" প্রায় উত্তেজিত হয়ে গলা ফাটিয়ে আলিয়োশা বলল। "অমন কোনো বুদ্ধিটুদ্ধি ওদের নেই, কোনও গোপনীয়তা, কোনও রহস্যও নেই। থাকার মধ্যে আছে হয়তো স্রেফ নাস্তিকতা—

গোপন রহস্য বলতে যদি কিছু থাকে তো এটাই। তোমার ওই ধর্মাধিকরণের মহাবিচারকটি তো ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না—ওটাই তো তার গোপন রহস্য!''

''না হয় তা-ই হল! শেষকালে কিন্তু তুই ঠিকই ধরেছিস। সত্যি-সত্যি তাই, বাস্তবিকই, তার যত রহস্য শুধু এর মধ্যেই নিহিত আছে। কিন্তু তাই বলে সেটা কি কষ্টভোগ করা নয়—অন্তত তার মতো একজন মানুষের পক্ষে, যে মানুষ তার ব্রত পালনের জন্য নির্জন মরুভূমিতে সারাটা জীবন পাত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবপ্রেম থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেনি? জীবন সায়াহ্নে এসে তার পরিষ্কার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে একমাত্র ওই মহাশক্তিধর ভয়াল 'ছায়ামূর্তির পরামর্শই 'পরিহাসের বস্তুরূপে পরীক্ষামূলকভাবে সৃষ্টি অর্ধসমাপ্ত এই প্রাণীদের' জীবন, ক্ষীণবল এই হাঙ্গামাসৃষ্টিকারীগুলোর জীবন— যৎসামান্য হলেও সহনীয় করে তুলতে পারত। এই বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হওয়ার পর সে দেখতে পেল মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার মূর্তিমান বিগ্রহ, বিচক্ষণ ও ভয়াল ওই ছায়ামূর্তিটির পরামর্শ মেনেই চলা উচিত। এর জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, মানুষকে মৃত্যু ও ধ্বংসের পথে পরিচালনা করতে হয়—আর এখন এটা জেনেশুনে সজ্ঞানেই করতে হয়; পরন্তু সারাটা পথ তাদের প্রতারণার মধ্যে রেখে দিতে হয়, যাতে তারা ঘুণাক্ষরেও টের না পায় কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—উদ্দেশ্যটা এই, যেন করুণার পাত্র এই অন্ধগুলো অন্তত জীবনের চলার পথে নিজেদের সুখী বলে ভাবতে পারে। তবে এটাও খেয়াল রাখবি, সারা জীবন ধরে এত উদ্দীপনার সঙ্গে সার আদর্শকে সে বিশ্বাস করে এসেছিল, তার নাম করেই কিন্তু বৃদ্ধের এই প্রতারণা! এটাকে কি দুর্ভাগ্য বলব না? শুধুমাত্র নোংরাধরনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ক্ষমতালোলুপ' পুরো একটি বাহিনীর, তার নেতৃত্ব দিতে অন্তত এরকম একজনও কেউ যদি এগিয়ে আসে তাহলে সেই একজনই কি ট্র্যাজিডি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হবে না? শুধুই কি তাই? রোমান ক্যাথলিকদের যত কর্মকাণ্ড, তাদের যত বাহিনী আর যিশুসমিতির দলবলসমেত সমগ্র রোমান ক্যাথলিক জগতের যথার্থ নেতৃস্থানীয় ভাবধারা, তাদের কর্মযজ্ঞের সর্বোচ্চ আদর্শ যাতে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হতে পারে তারই জন্য এরকম একজন মাত্র ব্যক্তির নেতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকাটাই যথেষ্ট হবে। আমি তোকে সরাসরিই বলছি, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কোনো আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এ ধরনের একক ব্যক্তিত্বের কোনও অভাব কখনও দেখা যায়নি। বলা যায় না, হয়তো রোমান ধর্মগুরুদের মধ্যেও এরকম কেউ কেউ ছিলেন। এই যে অভিশপ্ত বৃদ্ধটি, যে এত নিজের মতো করে, এমন একরোখা ভাবে মানবজাতিকে ভালোবাসে, বলা যায় না, হয়তো আজও তার অস্তিত্ব আছে। কে বলতে পারে হয়তো আছে এরকম বহু সংখ্যক একেকটি বৃদ্ধের পুরো একটি দলের আকারে? হয়তো তাদের থাকাটাও মোটেই আকস্মিক নয়; তারা যাতে সুখে থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রহস্য গোপন রাখার জন্য এবং হতভাগ্য ও ক্ষীণবলদের কাছ থেকে গোপনীয়তা

রক্ষা করার জন্য হয়তো বা বহুকাল হল সংগঠিত এক ধরনের গুপ্ত সমিতির মতো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করেই তারা আছে। অবশ্যই তাই, হ্যাঁ, সেটাই হওয়া উচিত, আমার তো এমনও মনে হয় যে ম্যাসন[২১] নামে পরিচিত বিশ্বভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে তাদের ভিত্তিস্বরূপ যে রহস্য আছে তাও অনেকটা এই একই ধরনের। আর সেই কারণেই না ম্যাসনদের প্রতি ক্যাথলিকদের এত ঘৃণা! ওদের তারা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে, তারা মনে করে যেখানে একটি মাত্র পশুপাল আর একজন মাত্র পালক থাকা উচিত সেখানে ম্যাসনরা সেই ঐক্যবোধের মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে। সে যাই হোক, আমার ধ্যানধারণা যখন আমি সমর্থন করি তখন আমি এমনই এক জাতের রচয়িতা যে তোর ওই সমালোচনা আমার সহ্যের বাইরে। এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আর নয়।"

"তুমি নিজেই হয়তো একজন ম্যাসন!" হঠাৎ আলিয়োশার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। "তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না", সে যোগ করল, কিন্তু এবারে তার কথাগুলি বড়ো করুণ শোনাল। তাছাড়া তার এমনও মনে হল যে দাদা বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। "তা তোমার এই কাব্যের শেষ কোথায়?" মাটির দিকে তাকিয়ে সে ফস করে জিগ্‌গেস করল। "নাকি এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল?"

"আমি শেষ করতে চাইছিলাম এই ভাবে মহাবিচারক তাঁর কথা শেষ করার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলেন বন্দি উত্তরে তাকে কী বলে। তার নীরবতা বৃদ্ধ মানুষটির মন ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি দেখছিলেন কয়েদিটি সরাসরি তাঁর চোখে চোখ রেখে সারাক্ষণ রীতিমতো অভিভূত হয়ে শান্ত ভাবে তাঁর কথাগুলো শুনে যাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল না আপত্তি করার মতো কোনো ইচ্ছে তার আছে। বৃদ্ধের ইচ্ছে ছিল লোকটা তাঁকে কিছু একটা অন্তত বলে— তা সে তিক্তই হোক আর ভয়ঙ্করই হোক। কিন্তু সে সব কিছুই না করে সে আচমকা চুপচাপ বৃদ্ধের কাছ ঘেঁষে চলে এসে তার নব্বই বছরের জরাগ্রস্ত নিরক্ত ঠোঁটে চুমু খেল। উত্তরে যা বলার ছিল সব বলা হয়ে গেল। বৃদ্ধ চমকে উঠল। তাঁর ঠোঁটের দুই প্রান্তে কেমন যেন একটা আন্দোলন দেখা দিল। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, দরজার পাল্লা খুলে দিয়ে কয়েদিকে বললেন, 'চলে যাও, আর কখনও এসো না কখনও না, একেবারে না, একেবারেই না!' বন্দি ছাড়া পেয়ে নগরের অন্ধকার রাজপথে মিলিয়ে গেল।"

"আর বৃদ্ধ? তাঁর কী হল?"

"ওই চুম্বনের জ্বালায় তাঁর হৃদয় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর আগেকার ধ্যানধারণা ছাড়লেন না।"

"আর তুমি? তুমি কি সেই বৃদ্ধের সঙ্গে আছ? তুমিও?" তিক্তকণ্ঠে আলিয়োশা আর্তনাদ করে উঠল।

ইভান হাসল।

"দুর পাগল! এ তো কতকগুলো অর্থহীন আবোল তাবোল। ওরে আলিয়োশা, জীবনে যে দু ছত্র কবিতা লেখেনি এ তেমনি এক আনাড়ি ছাত্রের এলেবেলে কবিতা বৈ আর কিছু নয়। এটাকে অমন গুরুত্ব দিচ্ছিস কেন? তুই তাই বলে সত্যি সত্যি ভেবে বসলি নাকি যে আমি এখন সোজা চলে যাব ওই যিশুসমিতির লোকগুলোর কাছে, সেই সমস্ত লোকজনের দঙ্গলে গিয়ে ভিড়ব যারা তাঁর কাজের ধারা শোধরাতে যাচ্ছে? হা ঈশ্বর! ও করে আমার কী হবে! আমি তো তোকে বলেইছি টেনেটুনে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারলেই হল, তারপর—জীবনের পানপাত্র মাটিতে আছড়ে ফেলে দেব!"

"কিন্তু চটচটে কষমাখা বসন্তের কিশলয়, প্রিয়জনের সমাধি, নীল আকাশ, তোমার ভালোবাসার নারী—এ সবের কী হবে! কী নিয়ে থাকবে তুমি, কী এমন থাকবে তোমার যা দিয়ে তুমি এ সব কিছুকে ভালোবাসতে পার?" তীব্র বেদনা ফুটে উঠল আলিয়োশার কণ্ঠস্বরে। "বুক আর মাথার ভেতরে অমন নরকযন্ত্রণা বয়ে নিয়ে বেড়ান কী করে সম্ভব? না না তুমি নির্ঘাত ওদের দলেই ভিড়তে যাচ্ছ তা যদি না হয়, তা হলে তুমি নিজেই নিজেকে মেরে ফেলবে এ তুমি সহ্য করতে পারবে না!"

"এমন এক শক্তি আছে যা সব কিছু সহ্য করতে পারে!" বলতে বলতে এবারে ইভানের মুখে একটা নিস্পৃহ ধরনের কাষ্ঠহাসি ফুটে উঠল।

"কী সেই শক্তি?"

"কারামাজ়ভীয় শক্তি কারামাজ়ভ্ বংশের নীচতার শক্তি।"

"তাহলে তো ব্যভিচারের পাঁকে ডুবে যেতে হয়, অনাচারের কবলে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। তাই না? ঠিক বলছি কিনা?"

"সম্ভবত তাই, এবং এই এটাও মাত্র আমার ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত হয়তো এড়িয়ে যেতে পারব, তারপর না হয়

"কী ভাবে এড়াবে শুনি? কোন্ উপায়ে? তোমার যা ধ্যানধারণা দেখছি তাতে তো এ অসম্ভব!"

"আবারও সেই কারামাজ়ভীয় কৌশলে।"

"তার মানে, সবেরই অনুমোদন আছে, সবই বৈধ, এই বলতে চাও তো?"

ইভান ভুরু কোঁচকাল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা অদ্ভুতরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"ও, তুই আমার কালকের সেই কথাটা ধরে বসে আছিস, যে কথায় মিউসভ মনে অমন দুঃখ পেয়েছিল আর দাদা দমিত্রি সরল মনে সাগ্রহে লুফে নিয়ে বেটা নিজের মতো করে প্রকাশ করেছিল?" বাঁকা হাসি হাসল সে। হ্যাঁ, সম্ভবত তাই: 'সবেরই অনুমোদন আছে'—কথাটা একবার যখন উচ্চারণ করেই ফেলা হয়েছে, অস্বীকার করছি না। তাছাড়া মিতিয়ার সম্পাদনায় যা দাঁড়িয়েছিল সেটাও মন্দ নয়।"

আলিয়োশা কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকাল।

"আমি যখন যাব বলে মনস্থ করি তখন ভেবেছিলাম দুনিয়ায় আমার যদি

আর কেউ নাও থাকে তবে অন্তত তুই আছিস ভাই'', অপ্রত্যাশিত এক ধরনের অনুভূতিবশত ইভান হঠাৎ বলে উঠল, ‘‘কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ওরে আমার আদরের সন্ন্যাসীঠাকুরটি, তোর মনের মধ্যেও আমার ঠাঁই নেই। ‘সবেরই অনুমোদন আছে'—এই সূত্রটা আমি অস্বীকার করছি না—কিন্তু তাতে কী হল? তাই বলে তুই আমাকে ত্যাগ করবি? বল, তাই করবি?''

আলিয়োশা উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, কোনো কথা না বলে আলতো করে তার ঠোঁটে চুমু খেল।

‘‘আরে এ যে লেখা চুরি হয়ে গেল!'' ইভানের মেজাজ হঠাৎ পালটে গেল, কেমন যেন উল্লসিত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল। ‘‘এই দৃশ্যটা তো তুই আমার কাব্য থেকে চুরি করলি! যা হোক, তোকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ওঠ আলিয়োশা, আমাদের যেতে হয়। যাবার সময় হল—তোর আমার দু জনেরই।''

ওরা দুজন বেরিয়ে এলো, কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘‘যা বলি শোন আলিয়োশা'', দৃঢ়কণ্ঠে ইভান বলল, ‘‘যদি সত্যি সত্যি আমার মনের মধ্যে চটচটে আঠামাখা বসন্তের কিশলয়ের স্থান সঙ্কুলান হয় তাহলে শুধু তোর কথা মনে করেই আমি সেই কিশলয়দের ভালোবাসব। তুই যে এভাবেই কোথাও আছিস এবং জীবনে যে আমার এখনও বিতৃষ্ণা ধরে যায়নি এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোর পক্ষে এটা যথেষ্ট তো? যদি চাস, এটাকেই আমার ভালোবাসার প্রকাশ বলে ধরে নিতে পারিস। আচ্ছা, এবারে তুই যাবি ডান দিকে, আমি যাব বাঁ দিকে—অনেক হয়েছে, আর নয়। শুনছিস? অনেক হয়েছে। মানে, আমি এটাই বলতে চাই যে আমি যদি আগামীকালও চলে না যাই—অবশ্য মনে হয় খুব সম্ভব চলেই যাব—এবং আরও একবার যদি কোনোক্রমে আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা হয়ে যায়, তাহলে এই বিষয়ে আমার সঙ্গে আর একটি কথাও নয়। তোর কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আর ভাই দ্‌মিত্রির কথাও বলি, বিশেষ করে তোর কাছে আমার অনুরোধ—ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে কখনও কোনো কথা বলতে আসিস না।'' বলেই সে আচমকা বিরক্তির সঙ্গে যোগ যোগ করল, ‘সব চুকেবুকে গেছে। যা বলার সব বলা হয়ে গেছে। ঠিক কিনা? আর আমি, আমার তরফ থেকে এর বদলে একটা প্রতিশ্রুতিও তোকে দেব ত্রিশ বছরের বয়সে যখন ‘পানপাত্র মেঝেতে ছুড়ে ফেলার' বাসনা আমার হবে তখন তুই যেখানেই থাকিস না কেন, আমি ঠিক তোর কাছে চলে আসব, আরও একবার তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলব—এমন কি সে যদি আমি আমেরিকাতেও থাকি। এটা জেনে রাখিস। ইচ্ছে করে, উদ্দেশ্য নিয়েই আসব। সেই সময় তোকে একবার চোখে দেখা এবং তখন তুই কেমন হবি তা দেখতে পাওয়া খুবই আগ্রহজনক হবে। দেখছিস, কেমন একটা গুরুগম্ভীর প্রতিশ্রুতি। আর আসলে তো আমাদের যে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে সেটা হয়তো

দশ কি সাত বছরের জন্য। আচ্ছা এবারে তুই যা তোর Pater Seraphicus-এর কাছে। তিনি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। তোকে না দেখে যদি মারা যান তা হলে তো আবার এই বলে আমার ওপর রাগ করবি যে আমি তোর দেরি করিয়ে দিলাম। আবার দেখা হবে। আমাকে আরও একবার চুমু দে হ্যাঁ, এই ভাবে। এবারে আয়।

ইভান হঠাৎ ঘুরে গিয়ে দ্রুত নিজের পথ ধরল, আর পিছন ফিরে তাকাল না। গতকাল আলিয়োশার কাছ থেকে দাদা দ্‌মিত্রি যে ভাবে চলে গিয়েছিল অনেকটা সেরকমই হল, যদিও গতকালের ব্যাপারটা ছিল একেবারে অন্য ধরনের। আলিয়োশা যখন শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে সেই মুহূর্তে তার বিষণ্ণ চিন্তার মধ্যে তিরের ফলার মতো ঝলক দিয়ে চলে গেল এই সাদৃশ্যটা। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ভাইয়ের চলে যাওয়া দেখতে লাগল। কেন যেন হঠাৎ তার নজরে পড়ল দাদা ইভান কেমন যেন দুলে দুলে হাঁটছে, আর তার ডান কাঁধটা, পেছন থেকে দেখতে গেলে, বাঁ কাঁধের তুলনায় খানিকটা যেন বেশি ঝুলে পড়েছে। এর আগে সে কখনও এটা লক্ষ করেনি। কিন্তু এর পর আলিয়োশা নিজেও চট করে পিছন ফিরে তার পথ ধরল, প্রায় দৌড় দিল মঠের উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। কতকটা ভয়-ভয় করতে লাগল আলিয়োশার। তার ভেতরে ভেতরে এমন একটা নতুন ধরনের অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যার কোনও কারণ তার জানা ছিল না। গতকাল সন্ধ্যার মতোই আবার জোর হাওয়া উঠেছে। আলিয়োশা যখন আশ্রমের উপবনে প্রবেশ করল তখন তার চারধারে শতাব্দী প্রাচীন বিশাল বিশাল পাইনগাছগুলি সকরুণ মর্মরধ্বনি তুলছে সেই হাওয়ায়। আলিয়োশা বলতে গেলে ছুটতে ছুটতেই পথ চলছিল। 'Pater Seraphicus—এই নামটা ও কোথা থেকে নিল? কোথা থেকে হতে পারে?' ওই অবস্থাতেই আলিয়োশার মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে গেল। ইভান, আহা বেচারি ইভান, আবার কবে যে তোমার দেখা পাব?... ওঃ ভগবান, এই তো আশ্রমে এসে গেছি! ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই Pater Seraphicus—এই যে দেবদূততুল্য[১১] মহাপুরুষটি—উনিই আমাকে, রক্ষা করবেন... ওর কাছ থেকে রক্ষা করবেন, চিরকালের জন্য করবেন!

পরে জীবনে বেশ কয়েকবার যে কথা মনে হয়েছে সে রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেছে তা এই যে ইভানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর কী বলে সে অমন চট করে দ্‌মিত্রির কথাটা বেমালুম ভুলে বসে থাকল, যখন সে দিন সকালে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও সে ঠিকই করে নিয়েছিল যে দ্‌মিত্রিকে যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে, তার খোঁজখবর না নিয়ে সে কোথাও যাবে না—তাতে যদি সে দিন রাতে তার মঠে ফেরা সম্ভব নাও হয় তাও সই।

## ছয়

## এখনও তেমন স্পষ্ট নয়

এদিকে আলিয়োশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ্ চলল বাড়ির দিকে, তার পিতৃগৃহের উদ্দেশে। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা এই যে আচমকা একটা অসহনীয় ব্যাকুলতায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল; বড়ো কথা, বাড়ির যত কাছাকাছি হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে সেই ভাবটা বেড়েই চলেছে। যেটা আশ্চর্যের তা এই মন ভার হওয়া নয়, আশ্চর্যের কথা হল সেটা যে কী নিয়ে তা ইভান ফিয়োদরভিচ কিছুতেই নির্ধারণ করতে পারছে না। মন খারাপ তার এর আগেও অনেক সময় হয়েছে, আর এখন, এই মুহূর্তে যে তা হবে তাতে আর বিচিত্র কি! বিশেষ করে যে সবের টানে তার এখানে আসা হঠাৎ সে সবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কালই যখন সে আবার তার জীবনের গতি একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা নতুন এক পথে নামার জন্য তৈরি হচ্ছে, যেখানে সে আবারও আগের মতোই একেবারে নিঃসঙ্গ, সেক্ষেত্রে তো এটা হবেই। অনেক তার আশা ভরসা, কিন্তু কীসের ওপর, তা তার জানা নেই, জীবনের কাছ থেকে তার প্রত্যাশা অনেক—এমন কি বড়ো বেশি রকমের প্রত্যাশা নিয়েই এ পথে সে নামছে, কিন্তু কী, যে সেই প্রত্যাশা, এমনকি তার নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাই বা কী, তার কোনোটাই নির্ধারণ করার মতো কোনো ক্ষমতা তার নেই। তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে নতুন আর অচেনা অজানার কথা ভেবে তার মনের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু তার মর্মপীড়ার কারণ আদৌ সেটা নয়। 'তাহলে বিতৃষ্ণার কারণ কি পিতৃগৃহ?' সে মনে মনে ভাবল। 'তাই তো মনে হচ্ছে। এবাড়িটা এতই অসহ্য হয়ে উঠেছে যে যদিও আজ এই শেষবারের মতো এর জঘন্য চৌকাটটা মাড়াতে হবে, তাহলেও ভারি বিশ্রী লাগছে...' কিন্তু না, কারণ এটাও নয়। তাহলে কি আলিয়োশার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আর তার সঙ্গে ওই যে কথাবার্তা হল সেই ঘটনা? 'দুনিয়ার কাউকে কিছু না বলে কত বছর তো চুপ করে রইলাম, বলার মতো কিছু আছে বলে কখনও মনেও হয়নি, তারপর হঠাৎই কিনা অনর্গল গুচ্ছের আবোল তাবোল বকে গেলাম!' আসলে এটা হয়তো ছিল অর্বাচীনের অনভিজ্ঞতা আর আমার দম্ভের কথা ভেবে এক যুব মনের এক ধরনের আক্ষেপ—আক্ষেপ এই কারণে যে যা বলার ছিল তার সবটা বলা হয়ে উঠল না; শুধু তা-ই নয়, সে প্রাণ খুলে বলতে পারল না কিম্বা আলিয়োশার মতো এমন একজনের কাছে, যার ওপর নিঃসন্দেহে মনে মনে বড়ো রকমের আশা ভরসা তার ছিল। এটা ছিল, অবশ্যই এটাও ছিল, অর্থাৎ নিজের ওপর এই বিরক্তিও ছিল—এমনকি তা না হয়ে যায় না; কিন্তু এও ঠিক তা নয়, যত যা-ই বলি, তা নয়। 'এত বেশি মাত্রায় মন খারাপ লাগছে যে গা গুলিয়ে উঠছে, অথচ কী যে আমি চাই

সেটাই তো ঠিক করার মতো শক্তি আমার নেই। না ভাবাটাই বোধহয় ভালো...

ইভান ফিয়োদরভিচ 'না ভাবার' চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। বড়ো কথা, এটা—এই মন-কেমন-করা ভাবটা ভেতরে ভেতরে যে এমন বিরক্তি ও জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার কারণ এই যে এর প্রকৃতিটাই কেমন যেন আকস্মিক ও বাহ্য ধরনের। সেটা অনুভবও করা যাচ্ছে। যেন কোথাও কেউ একটা বা কোনো একটা বস্তু অবাঞ্ছিত ভাবে ঢুকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, অনেক সময় চোখের সামনে কিছু একটা ঘুর ঘুর করতে থাকলে যেমন হয় হয়তো তুমি কোনো একটা কাজে ব্যস্ত আছ বা উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যে এমনই ডুবে আছ যে সেদিকে তোমার নজর পড়ছে না, অথচ তা সত্ত্বেও সেটা কিন্তু স্পষ্টতই তোমার বিরক্তি উদ্রেক করছে, বলতে গেলে তোমার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এই অবস্থায় শেষকালে এক সময় না এক সময় ওই চক্ষুশূল বস্তুটিকে সরানোর কথা ভাবতে হয়, আর অনেক সময়ই দেখা যায় সেটা আর কিছুই নয়—ভুলক্রমে অজায়গায় পড়ে থাকা অতি বাজে ও হাস্যকর কোনো জিনিস : অসাবধানে মেঝেতে পড়ে যাওয়া একটা রুমাল, বইয়ের আলমারিতে তুলে না রেখে অন্য কোথাও ফেলে রাখা একটা বই বা ওই গোছের কিছু একটা। অবশেষে বেজায় খারাপ ও তিরিক্ষি- মেজাজ নিয়ে পিতৃগৃহে এসে পৌঁছুল ইভান ফিয়োদরভিচ। তখনই হঠাৎ, বাড়ির গেটের কাছে আসতে আরও পনেরো পা মতন যখন বাকি, এমন সময় ফটকের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র তার আর বুঝতে বাকি রইল না তার এত যে যন্ত্রণা, এত যে উদ্বেগ, এর আসল কারণটা কী।

ফটকের কাছে বাগানের একটা বেঞ্চির ওপর বসে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বায়ুতে শরীর জুড়োচ্ছে বাড়ির ভৃত্য স্মের্দিকোভ্। লোকটার দিকে তাকাতে, প্রথম দৃষ্টিতেই ইভান ফিয়োদরভিচের বুঝতে বাকি রইল না এই স্মের্দিকোভই তার বুকের ভেতর শেল হয়ে বিঁধে আছে, একেই সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। নিমেষে সব কিছু দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এই তো কিছুক্ষণ আগে আলিয়োশার মুখে স্মের্দিকোভের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বিবরণ যখন সে শুনেছিল তখনই কেমন যেন বিষণ্ণ ধরনের ন্যক্কারজনক কিছু একটা আচমকা খচ্ করে তার বুকে এসে বিঁধেছিল এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠেছিল। পরে এত সব কথাবার্তার মধ্যে স্মের্দিকোভের প্রসঙ্গটা সাময়িক ভাবে সে ভুলেই গিয়েছিল, যদিও সব সময়ই তার মনের ভেতরে কোথাও না কোথাও থেকে গিয়েছিল; কিন্তু এখন সবেমাত্র আলিয়োশার কাছে বিদায় নিয়ে একা-একা পিতৃগৃহ অভিমুখে যাবার পথে দেখা গেল সেই ভুলে যাওয়া উপলব্ধিটা হঠাৎ আবার বেরিয়ে আসার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। 'এমন একটা বাজে হতভাগা লোক কিনা আমাকে এতদূর অস্থির করে তুলতে পারে! তা কী করে হয়?' একটা অসহ্য ক্রোধের জ্বালা নিয়ে সে মনে মনে ভাবল।

ঘটনা এই যে ইভান ফিয়োদরভিচ এই লোকটাকে সম্প্রতি বাস্তবিকই একেবারে বরদাস্ত করতে পারছে না—বিশেষত গত কয়েক দিনে ধরে তো বটেই। এমন কি এই হতভাগা জীবটার প্রতি তার বিরূপ মনোভাব পুঞ্জীভূত হয়ে যে প্রায় ঘৃণার আকার নিতে শুরু করেছে এটাও সে মনে মনে টের পাচ্ছে। স্মের্দিকোভের প্রতি তার ঘৃণার অনুভূতির যে প্রক্রিয়া তা যে এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তার কারণ হয়তো ঠিক এটাই যে ইভান ফিয়োদরভিচ যখন সদ্য আমাদের এই এলাকায় এসেছিল তখন যা ঘটেছিল সেটা ছিল একেবারে অন্যরকম। সেই সময়, প্রথম প্রথম হঠাৎই স্মের্দিকোভ্ তার বিশেষ এক ধরনের সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল, এমন কি লোকটাকে বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণও মনে হয়েছিল। তখন সে নিজেই তাকে তার সঙ্গে কথাবার্তায় প্রবৃত্ত করত, অবশ্য এটাও ঠিক যে তার বুদ্ধির মধ্যে সব সময় যে কেমন একটা অসংলগ্নতা, অথবা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা যেত তাতে সে অবাকই হয়ে যেত। 'এই আত্মমগ্ন লোকটার' অহোরাত্র, নিরন্তর এরকম 'অস্থিরতার কারণ যে কী হতে পারে তা সে বুঝতে পারত না। দার্শনিক নানা বিষয়ের আলোচনাও তাদের মধ্যে হত; এমনকি সূর্য চন্দ্র আর নক্ষত্রের সৃষ্টি চতুর্থ দিনের আগে হল না, অথচ তারও আগে, প্রথম দিনেই আলো কী করে হল এবং এই ব্যাপারটাকে কী ভাবে বোঝা উচিত এরকম আলোচনা পর্যন্ত হত। কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ শিগ্‌গিরই স্পষ্ট বুঝতে পারল যে কথাটা আদৌ সূর্য চন্দ্র বা নক্ষত্র নিয়ে নয়; সূর্য চন্দ্র বা নক্ষত্র যদিও কৌতূহলের বিষয় বটে, কিন্তু স্মের্দিকোভের কাছে তা একেবারে তৃতীয় স্তরের—সম্পূর্ণ গৌণ ব্যাপার, এগুলিকে উপলক্ষ করে সে যা খুঁজছে তা একেবারে অন্য জিনিস। সে যাই হোক না কেন, মোটকথা এর মধ্য দিয়ে স্মের্দিকোভের সীমাহীন আত্মাভিমানের পরিচয়, পরন্তু তার আহত আত্মাভিমানের স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগল। ইভান ফিয়োদরভিচের এটা তেমন ভালো লাগল না। সেই মুহূর্ত থেকে লোকটার প্রতি তার বিতৃষ্ণার সূচনা। এর পর পরিবারে গণ্ডগোল বাধল, রঙ্গমঞ্চে গ্রুশেন্‌কার আবির্ভাব ঘটল, দাদা দ্‌মিত্রিকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল—এসব নিয়েও ওদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হত। যখনই এ প্রসঙ্গ উঠত, বরাবরই স্মের্দিকোভ্‌কে বড়ো বেশি উত্তেজিত হতে দেখা যেত, যদিও এক্ষেত্রেও সে যে কী চায়, তার আসল অনুভূতিটা যে কী সেটা কোনোমতেই বোঝা যেত না। এমনকি তার আরও কোনো কোনো বাসনা, যা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত, সেগুলির আভ্যন্তরীণ যুক্তি ও শৃঙ্খলার অভাব এবং যথারীতি একই সমান অস্পষ্টতা—তাও ছিল অবাক করে দেওয়ার মতো। স্মের্দিকোভ সব সময় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করত, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এমন সব প্রশ্ন করত যেগুলি স্পষ্টতই কষ্টকল্পিত—কিন্তু সেগুলির উদ্দেশ্য যে কী তা সে কখনও খুলে বলত না, আবার সচরাচর তার নিজেরই ওই সব তত্ত্বতল্লাশের চরম উত্তপ্ত মুহূর্তে আচমকা মুখে কুলুপ এঁটে

দিত অথবা একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেত। কিন্তু বড়ো কথা, যেটা শেষ পর্যন্ত ইভান ফিয়োদরভিচের চরম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং স্মের্দিকোভের প্রতি তার মনটা একেবারে বিষিয়ে দিয়েছিল তা এই যে স্মের্দিকোভ্ তার হৃদ্যতার সুযোগ নিয়ে বড়ো বেশি হয়ে তার কেমন যেন একটা কুৎসিত ও বিশেষ এক ধরনের গায়ে পড়া ভাব প্রকাশ করতে লাগল, আর এই অশোভনতার মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই চলল। এ নয় যে সে তার মনের মধ্যে রূঢ়তার কোনো প্রশ্রয় দিয়েছিল। বরং উলটে সব সময় রীতিমতো ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়েই তার সঙ্গে কথা বলত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে যা হয়ে দাঁড়াল তা এই যে—ঈশ্বর জানেন কেন—দেখেশুনে মনে হত স্মের্দিকোভ্ যেন শেষ পর্যন্ত ধরেই নিয়েছে যে ইভান ফিয়োদরভিচের সঙ্গে তার এক ধরনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। সব সময় কথায় কথায় এমন ভাবভঙ্গি প্রকাশ করত যেন ওদের দুজনের মধ্যে গোপন শলাপরামর্শের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কোনো এক সময় ওদের দুই পক্ষের মধ্যে কথাও হয়ে গেছে, সে কথা একমাত্র ওরা দুজনেই জানে—এমনকি ওদের ধারেকাছে মরণশীল আরও যারা সব কিলবিল করছে তাদের ধারণার একেবারে বাইরে। এতেও কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ বেশ কিছুকাল বুঝতে পারেনি তার ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণার আসল কারণটা কী হতে পারে, একমাত্র এই এখনই অনুমান করতে পারল ব্যাপারটা কী।

স্মের্দিকোভ্কে দেখে একটা প্রবল বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল ইভান ফিয়োদরভিচের মনটা। এবারে স্মের্দিকোভের সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ না করে, তার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল ইভান ফিয়োদরভিচ। কিন্তু তাকে দেখামাত্র স্মের্দিকোভ্ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার সেই উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই ছিল এমন যে ইভান ফিয়োদরভিচ্ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল যে তার সঙ্গে কোনো বিশেষ ব্যাপারে সে কথা বলতে ইচ্ছুক। ইভান ফিয়োদরভিচ তার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই মিনিট খানেক আগেও লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে তার ছিল, অথচ তা না করে সে যে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একথা মনে হতে রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। স্মের্দিকোভের মুখের দিকে সে তাকাল নপুংসকের মতো তার ক্ষয়িত শীর্ণ মুখখানা, মোরগঝুঁটির মতো করে আঁচড়ানো দু পাশের জুলপি আর কপালের ওপর পরিপাটি করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সামান্য চুড়ো করে তোলা চুলের গোছা—সব মিলিয়ে তার চেহারাটা ইভান ফিয়োদরভিচের মনে ক্রোধ ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করল। বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে পিটপিট করছে, সেখানে বিদ্রুপের হাসি—যেন বলতে চাইছে 'আরে যাচ্ছ কোথায়? আমাকে এড়িয়ে যাবে কোথায়? দেখছ না আমাদের এই দুই বুদ্ধিমান প্রাণীর মধ্যে কিছু কথা বলার আছে!' ইভান ফিয়োদরভিচ ধাক্কা খেল।

'দূর হয়ে যা হতভাগা! আমি তোর ইয়ার নাকি? মূর্খ কোথাকার!' ইভানের

জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই দারুণ অবাক হয়ে শুনতে পেল তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একেবারে অন্য কথা।

"বাবামশাই কি ঘুমিয়ে আছেন, নাকি উঠে পড়েছেন?" শান্ত সংযত কণ্ঠে যে ভাবে সে কথাগুলি বলল তা তার নিজের কাছেই অপ্রত্যাশিত। তারপর ঠিক সেই রকমই একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ বেঞ্চিতে বসে পড়ল। মুহূর্তের জন্য সে আতঙ্কে শিউরে উঠল। পরে এটা তার মনে হয়েছিল। স্মের্দিকোভ্ দুহাত পিছনে রেখে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চোখেমুখে গভীর আত্মবিশ্বাস আর কঠোর ভাব।

"এখনও নিদ্রা যাচ্ছেন বটে", আলস্যজড়িত কণ্ঠে যে ভাবে বলল তাতে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল, 'তুমিই নিজে যেচে কথা বললে, আমি বলতে যাইনি।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনেকটা ন্যাকা-ন্যাকা ভাব করে চোখ নামিয়ে, ডান পা'টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ঝকঝকে পালিশ করা জুতোর ডগাটা নাচাতে নাচাতে সে যোগ করল, "আপনাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, হুজুর।"

"আমাকে দেখে আশ্চর্য হওয়া কী আছে শুনি?" অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ছাড়াছাড়া ভাবে কঠিন স্বরে উচ্চারণ করল ইভান ফিয়োদরভিচ, তারপর হঠাৎই এই ভেবে তার বিতৃষ্ণা হল যে স্মের্দিকোভের কথাগুলি তার মনের মধ্যে বিপুল কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে এবং সে কৌতূহল চরিতার্থ না করে সে কোনোমতেই এখান থেকে নড়ছে না।

"আপনি চেরমাশ্‌নিয়াতে যাচ্ছেন না কেন, কর্তা?" আচমকা চোখ তুলে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গায়ে-পড়া ভঙ্গিতে মুচকি হাসল স্মের্দিকোভ্। ওর বাঁ চোখটা যে ভাবে কুঁচকে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন এটাই বলতে চাইছে 'আরে বাপু তুমি যদি বুদ্ধিমান লোকই হও তা হলে কেন হাসলাম তা তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।'

"চেরমাশ্‌নিয়াতে আমি যেতে যাব কেন?" ইভান ফিয়োদরভিচ্ অবাক হয়ে গেল।

স্মের্দিকোভ্ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ নিজে আপনাকে অত করে বললেন যে!" শেষকালে সে বলল, তবে ধীরে সুস্থে এমন ভাবে বলল যেন নিজেই নিজের জবাবটার তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভাবটা এই যে 'ও নেহাৎ দায়সারা গোছের গৌণ কারণ দেখিয়ে পার পাওয়া আর কি! কিছু বলতে হয় তাই বলা।'

"ধুত্তোর! যা বলার আরেকটু স্পষ্ট করেই বল না কেন ছাই!" শান্ত নিরীহ ভাব ছেড়ে দিয়ে শেষকালে রূঢ়তার আশ্রয় নিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ল ইভান ফিয়োদরভিচ।

স্মের্দিকোভ্ এবারে ডান পা'টা বাঁ পায়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে বুক টানটান করে দাঁড়াল,

তবে আগের মতোই সেই শান্ত ভাব আর বাঁকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

“আসলে তেমন কিছু নয়, হুজুর। ওই কথায়-কথায় বলা।

আবারও নেমে এলো নীরবতা। প্রায় মিনিটখানেক দুজনের কারও মুখে কোনো কথা নেই। ইভান ফিয়োদরভিচ জানত তার এখন রাগ করে উঠে দাঁড়ান উচিত, এদিকে স্মের্দিকোভ্ তার সামনে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন অপেক্ষা করছে: ‘আচ্ছা দেখি তো কেমন রাগ কর?’ ইভান ফিয়োদরভিচের অন্তত তা-ই মনে হচ্ছিল। অবশেষে সে গাত্রোত্থান করার জন্য নড়েচড়ে উঠল। স্মের্দিকোভ্ যেন ঠিক এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিল।

“আমার অবস্থা বড়োই শোচনীয়, হুজুর। কী করে যে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না”, হঠাৎ দৃঢ়স্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণে সে বলে উঠল। শেষ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসও ফেলল। ইভান ফিয়োদরভিচ আবার বসে পড়ল।

“দুজনেই একেবারে বিগড়ে গেছেন, কর্তা। ছেলেমানুষি আর কাকে বলে!” স্মের্দিকোভ্ বলতে লাগল। “আপনার পিতৃদেব আর দাদা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের কথা বলছি আর কি। এই তো আমাদের বড়ো কর্তা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের ঘুম ভাঙল বলে—উঠেই এখন থেকে মিনিটে মিনিটে আমাকে জ্বালাতন করে ছাড়বেন, কেবলই জিগ্‌গেস করবেন ‘ও কি আসেনি? কেন এলো না?’ একই প্রশ্ন চলবে সেই মাঝরাত অবধি—এমনকি মাঝরাত গড়িয়ে যাবার পরেও। আর আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না যদি না আসেন—কেন না কখনও আসার কোনো মতলব আছে বলে ত আমার একেবারেই মনে হয় না — তা হলে কাল সকালে উঠেই আমার ওপর আবার এক চোট নেবেন ‘কেন এলো না? কী কারণে এলো না? কখন আসবে?’ যেন উনি যে এলেন না সে দোষ আমারই। অন্য দিকে আবার আরও একটা ল্যাঠা—যে-ই অন্ধকার নেমে আসবে—এমনকি তার আগেও হতে পারে—আশেপাশে কোথাও বন্দুক হাতে আপনার দাদাটির উদয় হবে। ঠিক হাঁক পাড়বেন: ‘এই বদমাশ, ওরে ব্যাটা রাঁধুনে, নজর রাখবি ঠিক কখন গ্রুশেন্‌কা আসে। যদি তোর নজর এড়িয়ে যায় আর ও যে এসেছে সেই খবর আমাকে না জানাস তাহলে সবার আগে তোর প্রাণটা যাবে।’ রাত কেটে গেলে পর দিন ভোরবেলায় ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মতোই সেই তিনিও আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবেন ‘এলো না কেন? শিগ্‌গিরই দেখা দেবে কি?’ এবারেও সেই একই কথা— ওনার শ্রীমতীটির যে উদয় হয়নি তার জন্য ওর কাছে আমি অপরাধী। এরকম যদি রোজ রোজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওনাদের মেজাজ চড়তেই থাকে তাহলে কোথায় গিয়ে গড়াতে পারে আপনিই বলুন হুজুর। আমার তো কখনো-কখনো মনে হয় এই আতঙ্কেই আমি আত্মঘাতী হতে পারি। ওদের ওপর আমার কোনও ভরসা নেই, কর্তা।”

“কিন্তু নিজেকে জড়াতে গেলে কেন? দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের গোপন

সংবাদবাহক হতে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?" বিরক্ত হয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ বলল।

"না জড়িয়ে যাব কোথায় বলুন তো? আসল ঘটনাটা যদি জানতে চান হুজুর, তা হলে বলি, জড়াতে আমি মোটেই চাইনি। আমি একেবারে গোড়া থেকে সর্বক্ষণ মুখ বুজে ছিলাম, আপত্তি যে করব সে সাহস থাকলে তো! উনি নিজেই তো আমাকে 'লিচার্ড' বলে ডেকে আমাকে ওঁর খাসচাকর-বহাল করলেন। সেই থেকে ওঁর মুখে কেবল একটাই কথা 'ব্যাটা বজ্জাত, জেনে রাখিস, যদি তোর নজর এড়িয়ে যায় তাহলে তোকে খুন করে ফেলব কিন্তু।' আমার মনে হয় কি কর্তা, কাল সম্ভবত লম্বা একটানা মূর্ছা যেতে হবে আমাকে।"

"লম্বা একটানা মূর্ছাটা আবার কী রকম?"

"লম্বা একটানা মূর্ছাটা হল গিয়ে কর্তা, মূর্ছা গিয়ে বেজায় লম্বা সময়ের জন্য পড়ে থাকা। বেশ কয়েক ঘণ্টা আর কি, হয়তো একদিন, এমনকি দুদিন ধরেও চলতে পারে সে মূর্ছা। একবার আমার এরকম হয়েছিল—চিলেকোঠা থেকে পড়ে মূর্ছা গিয়ে দিন তিনেক অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। খিঁচুনি বন্ধ হয়ে যায়, তারপর আবার শুরু হয়ে যায় নতুন করে—তিন দিনের মধ্যে আমার হুঁশই ফিরল না। আপনার পিতাঠাকুর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ তখন স্থানীয় ডাক্তার হেরৎসেনশ্টুবে-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি মাথার চাঁদিতে বরফ লাগালেন, আরও একটা কী ওষুধ-টষুধ দিলেন।... মরেই যেতে পারতাম কর্তা।"

"কিন্তু লোকে যে বলে মূর্ছা রোগ নাকি কখন কোন্ সময় হবে, আগে থাকতে টের পাওয়া যায় না? তাহলে কী করে বলছ যে কালকেই হবে?" বিশেষ বিরক্তিপূর্ণ কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল ইভান ফিয়োদরভিচ।

"এটা ঠিক যে আগে থাকতে জানতে পারা যায় না, কর্তা।"

"তাছাড়া তখন তো তুমি চিলেকোঠা থেকে পড়ে গিয়েছিলে।"

"চিলেকোঠায় রোজই উঠি কর্তা, তেমন হলে কালই চিলেকোঠা থেকে পড়ে যেতে পারি। আর চিলেকোঠা থেকে যদি না পড়ি তো তলকুঠুরিতেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে পারি হুজুর, তলকুঠুরিতেও রোজ যাই কিনা—প্রয়োজনে যেতেই হয়।"

ইভান ফিয়োদরভিচ অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে রইল।

"যা নয় তাই বকে যাচ্ছ দেখছি। তোমার কথাগুলো তেমন একটা বুঝতেও পারছি না", নিচু গলায় হলেও বেশ খানিকটা ধমকের সুরেই সে বলল। "মূর্ছারোগের ভান করে কাল থেকে তিন দিনের নামে পড়ে থাকা—এই তো মতলব? না কি?"

স্মের্দিকোভ্ মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, আবারও খেলা করছিল তার ডান পায়ের জুতোর ডগা নাচিয়ে। এবারে ডান পাটা যথাস্থানে রেখে তার বদলে বাঁ পা সামনে এগিয়ে দিয়ে মুখ তুলে বাঁকা হাসি হেসে বলল

"আমি যদি অন্তত এই চালাকিটাও খাটাতে পারি, অর্থাৎ কিনা ভান করে পড়ে

থাকতে পারি—এবং একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যেহেতু এটা করা মোটেই কঠিন নয়—তাহলে সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে উপায় অবলম্বনের পূর্ণ অধিকার আমার আছে; যেহেতু আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি তখন আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না যদি বড়কর্তার কাছে আসেনও তাহলে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ একজন অসুস্থ লোককে তো আর জিগ্‌গেস করতে পারবেন না: 'জানাসনি কেন?' ওঁর নিজেরই লজ্জা হবে।

"ধুত্তোর! চুলোয় যা!" হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ইভান ফিয়োদরভিচ। রাগে তার মুখটাই বেঁকে গেল। "প্রাণের মায়া করে তুমি তো দেখছি ভয়ে ভয়েই মরলে! দাদা দ্‌মিত্রির এই সব শাসানি, ও হল গিয়ে নেহাৎ রাগের মাথায় কিছু কথার কথা— এর বেশি কিছু নয়। ও তোমাকে খুন করতে যাবে না, খুন সে করবে—তবে তোমাকে নয়!"

"মারবে, মারবে, মাছি মারার মতো চটাস করে মেরে ফেলবে হুজুর, আর সবার আগে আমাকেই মারবে। কিন্তু আরও বেশি ভয় অন্য একটা কারণে  উনি যদি আমাদের কর্তার সঙ্গে কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন তখন আবার লোকে আমাকে তার দুষ্কর্মের দোসর দায়ী না করে।"

"তোমাকে দুষ্কর্মের দোসর বলে ধরবে কেন?"

"এই কারণে যে বড়ো রকমের গোপন যে সমস্ত সঙ্কেত ছিল সেগুলো তো আমিই ওঁকে জানিয়ে দিয়েছি, কর্তা।"

"কীসের সঙ্কেত? কাকে জানিয়েছ? নিকুচি করেছি তোর! আরেকটু স্পষ্ট করে বল বাপু!"

"তাহলে পুরোপুরি স্বীকার করতেই হয়", বেশ বিজ্ঞের মতো ধীরস্থির ভাব করে টেনে টেনে বলল স্মের্দিকোভ্‌। "এখানে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে আমার একটা গোপন বোঝাপড়া আছে। আপনি হুজুর নিজেই জানেন—যদি অবশ্য এটা জানার মতো কিছু বলে মনে করেন—বেশ কিছু দিন হল রাতের বেলায়, এমনকি রাত হতে না হতে সন্ধ্যার সময়ই কর্তা ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দেন। আজকাল আপনি রোজই সকাল-সকাল ওপরে আপনার নিজের ঘরে ফিরে যেতে শুরু করেছেন, আর গতকাল তো ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোনই নি, তাই ইদানীং উনি যে কত যত্ন করে রাতের বেলায় ভেতর থেকে ঘরের দরজায় খিল আঁটতে শুরু করেছেন তা আপনার জানা নেই। এমনকি স্বয়ং গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচও যদি আসে গলা শুনে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকেও দরজা খুলবেন না। কিন্তু গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ আসে না কর্তা, তাই ঘরের ভেতরে এখন আমি একাই তাঁর দেখাশোনা করি। আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে এই রঙ্গটা শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে তিনি নিজে এই ব্যবস্থাটা চালু করেছেন। এদিকে রাতের বেলায় এখন ওঁর হুকুমে আমাকেও বেরিয়ে এসে বাড়ির বাইরের অংশে কাটাতে হয়। মাঝরাত

পর্যন্ত না ঘুমিয়ে পাহারায় থাকি। বিছানা ছেড়ে উঠে উঠোনে পায়চারি করে বেড়াই, অপেক্ষা করতে থাকি কখন আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না আসবেন। গত কয়েক দিন হল পাগল-পাগল হয়ে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁর বিচারটা হুজুর এই রকম: 'মিত্‌কাটার ভয়ে গ্রুশেন্‌কা আসতে পারছে না। (কর্তা আবার ওঁকে 'মিতিয়া' না বলে তুচ্ছ করে 'মিত্‌কা' বলেন কিনা), তাই রাতের বেলায় খিড়কি দিয়ে আমার কাছে আসবে।' কর্তার কথাটা হল 'তুই তাহলে একেবারে মাঝরাত অবধি, এমনকি তারও পরে ওর সন্ধানে পাহারা দিয়ে যা। যদি আসে তাহলে ছুটে এসে আমার ঘরের দরজায় নয়তো বাগানের দিক থেকে জানলায় টোকা মারবি। প্রথম দুবার আস্তে করে  এক-দুই, এর পর তিনবার একটু তাড়াতাড়ি  টুক-টুক-টুক।' তা বলেন কি, 'তাহলেই আমি বুঝে নেব ও এসেছে, আস্তে আস্তে তোকে দরজা খুলে দেব।' আরও একটা সঙ্কেত আমাকে জানিয়েছিলেন  হঠাৎ যদি কোনো জরুরি দরকার হয় তা হলে প্রথমে ঘন ঘন দু বার টোকা—টুক-টুক, তারপর একটু অপেক্ষা করে আরও একবার, তবে বেশ খানিকটা জোরে। তাহলেই উনি বুঝতে পারবেন হঠাৎ কিছু একটা ঘটেছে এবং তার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত দরকার। এক্ষেত্রেও উনি আমাকে দরজা খুলে দেবেন, আমি ভেতরে ঢুকে আমার যা বলার আছে ওঁকে বলব। এ সবই সেই ক্ষেত্রে যদি আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না নিজে আসতে না পেরে কোনো সংবাদ পাঠান। এ ছাড়া দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচও আসতে পারেন, সুতরাং তিনি যে কাছাকাছি কোথাও আছেন তাও তাঁকে জানাতে হবে। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে তাঁর ভারি ভয়। তাই আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না যদি ইতিমধ্যে এসেও থাকেন এবং তখন ওঁরা দুজনে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে বসে থাকেন, আর সেই সময় ধারে কাছে কোথাও যদি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের আবির্ভাব ঘটে তাহলেও আমার অবশ্য কর্তব্য হবে কোনো রকম গড়িমসি না করে তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদটি তাকে জানানো, আর সেটা করতে হবে তিনটে টোকা মেরে। তার মানে, পাঁচটা টোকার প্রথম সঙ্কেতের অর্থ হবে 'আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না এসেছেন' আর, তিন টোকার দ্বিতীয় সঙ্কেতের অর্থ হবে 'খুব জরুরি দরকার'। তা কর্তামশাই বেশ কয়েকবার উদাহরণ দিয়ে আমাকে শিখিয়ে দিলেন, ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি আর আমাদের কর্তামশাই—কেবল এই দুজন যখন এই সঙ্কেতগুলোর অর্থ জানি, তখন তিনি আর এতটুকু সন্দেহ না করে, কোনো রকম ডাকাডাকির মধ্যে না গিয়ে (জোর গলায় ডাকাডাকিতে তাঁর দারুণ ভয়ও আছে বটে) দরজার খিল খুলে দেবেন। তা এখন এই সঙ্কেতগুলোই আপনার দাদা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের জানা হয়ে গেছে।"

"কী করে জানা হয়ে গেল? তুমি জানিয়ে দিয়েছ? কোন্ সাহসে এ কাজ করলে?"

"কোন্ সাহসে আবার? সেই ভয়ে, হুজুর। ওর সামনে চুপ করে থাকব সে

বুকের পাটা আমার কোথায়? 'তুই আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস, তুই আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোচ্ছিস, আমি তোর দুটো ঠ্যাংই ভেঙে দেব'—বারবার এই সব বলে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ আমাকে চাপাচাপি করতে লাগলেন। তখন কী আর করি? দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ যাতে আমার মধ্যে গোলামের পা চাটা স্বভাবের পুরো পরিচয় পান, আর আমি যে ওঁকে ধাপ্পা না দিয়ে এটা ওটা সবই জানাচ্ছি এই দেখে যাতে সন্তুষ্ট হন সেই জন্যই আমি এই গুপ্ত সঙ্কেতগুলো ওঁর কাছে ফাঁস করে দিয়েছি।"

"তোমার যদি মনে হয় এই সঙ্কেতগুলো কাজে লাগিয়ে সে ভেতরে ঢুকতে চাইবে তাহলে তাকে ঢুকতে না দিলেই তো হল।"

"কিন্তু আমি নিজেই যখন মূর্চ্ছার ঘোরে পড়ে থাকব তখন ওঁকে ঢুকতে বাধা দেব কী করে, হুজুর? এমনকি উনি যে অত বেপরোয়া তা জানা সত্ত্বেও ওঁকে বাধা দেবার মতো সাহস যদি আমার থাকত তাহলেও তো পারতাম না হুজুর!"

"মোলো যা! চুলোয় যাও তুমি! মূর্চ্ছা যে যাবেই এতটা নিশ্চিত তুমি হলে কী করে, অ্যাঁ? আমাকে নিয়ে মজা করছ নাকি?"

"কী যে বলেন কর্তা! আপনাকে নিয়ে আমি মজা করব সে সাহস কি আমার আছে? তা ছাড়া মজা করার মতো অবস্থাটাই বা কোথায় যেখানে ভয়ে এমন কুঁকড়ে আছি? আমার মন বলছে নির্ঘাত মূর্চ্ছা যাব, মন একথাই বলছে একমাত্র এই ভয়ের চোটেই মূর্চ্ছা এসে যাবে কর্তা।"

"ধুত্তোর! তুমি পড়ে থাকবে তো কী হবে? তখন গ্রিগোরি পাহারা দেবে। গ্রিগোরিকে আগে ভাগে বলে রাখলেই হল, সে তো আর ঢুকতে দেবে না।"

"বলেন কি! ওই যে সঙ্কেতগুলো—কর্তার হুকুম ছাড়া গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্‌কে সেগুলো জানানোর মতো স্পর্ধা আমার কোনোমতেই হবে না হুজুর। আর গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের কথা যে বলছেন যে ওঁর সাড়া পেলেই এগিয়ে এসে ঢুকতে বাধা দেবে, তা ঠিক এই আজই, গতকাল থেকে সে অসুস্থ, মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না আগামীকাল ওর চিকিচ্ছে করবেন বলে ঠিক করেছেন। আপাতত এরকমই স্থির হয়েছে। ওদের চিকিচ্ছে কিন্তু ভারি অদ্ভুত। এমন একটা আরক মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার জানা আছে, যেটা সব সময় সে কাছে কাছে রাখে গাছগাছড়া থেকে তৈরি, বেশ কড়া ওষুধ। ওষুধ তৈরির প্রণালীটা মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না কারও কাছে ফাঁস করে না। ওই টোটকা দিয়েই বছরে বার তিনেক গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের চিকিচ্ছে করেন যখন ওর কোমর আগাগোড়া এমন অবশ হয়ে আসে যে আর নড়তে চড়তে পারে না, দেখেশুনে মনে হয় বুঝি পঙ্গুই হয়ে গেল—এই অবস্থায়, ওই যে বললাম হুজুর, বছরে বার তিনেক একটা তোয়ালে নিয়ে সেটা ওই আরকে ভেজায়, তারপর আধঘণ্টা ধরে ভেজা তোয়ালেটা দিয়ে তার সাড়া পিঠ রগড়াতে থাকে, রগড়াতে রগড়াতে তোয়ালেটা' একেবারে শুকনো খটখটে করে ফেলে, গ্রিগোরি

ভাসিলিয়েভিচের পিঠ লাল টকটকে হয়ে ওঠে, এমনকি ফুলেও যায়; পরে বাদবাকিটা যা শিশিতে পড়ে থাকে, মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না তাকে খাওয়ায়—খাওয়ানোর সময় আবার কী সব মন্ত্রতন্ত্রও পড়ে—তবে হ্যাঁ, সবটা খাওয়ায় না; এমন ঘটনা যেহেতু সচরাচর ঘটে না, তাই অতি সামান্য একটু ভাগ নিজের জন্য রেখে দেয় এবং বলব কি কর্তা, সেটাও খেয়ে ফেলে। তা আপনাকে বলি কর্তা, ওঁদের দুজনের কেউই কিন্তু কখনও মদ-টদ খায় না, তাই ওই ওষুধ খেতে না খেতে দুজনেই এলিয়ে পড়ে, বহুক্ষণ ধরে বেঘোরে পড়ে পড়ে দুজনেই ঘুমোয়। গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের ঘুম যখন ভাঙে তখন প্রায় সব সময়ই দেখা যায় এরপর দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর পর মার্ফা ইগনাতিয়েভ্‌নার ঘুম ভাঙলে ঠিক দেখা যাবে তার মাথা ব্যথা করছে। তাই কর্তা, কথাটা হল গিয়ে এই যে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না যদি আগামীকাল তার এই সঙ্কল্প কাজে লাগাতে যায় তাহলে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্ কতদূর কী শুনতে পাবে, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকেই বা কী ভাবে আটকাবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তারা তখন ঘুমে কাদা হয়ে থাকবে, কর্তা।"

"আহা, কী কথাই শোনালে! তুমি মূর্ছা যাবে, ওরা দুজনেও অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকবে—ঠিক বুঝে বুঝে সব একসঙ্গে এসে জুটবে!" ইভান ফিয়োদরভিচ ঝাঁঝিয়ে উঠল। বুঝে বুঝে যাতে সব একসঙ্গে এসে মেলে তুমি নিজেই তলে তলে সে মতলব করছ না ত?" তার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কঠোর ভ্রুকুটি হানল।

"আমার মতলব কী করে হবে হুজুর! ওসব আমি করতে যাবই বা কোন্ দুঃখে, যখন সব কিছু নির্ভর করছে একমাত্র দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের ওপর, শুধু তারই ভাবনাচিন্তার ওপর। উনি যদি কোনো কাণ্ড বাধাবেন বলে মনে করেন তাহলে বাধাবেন, আর তা যদি না করেন তা হলে কি আর আমি যেচে ওঁকে নিয়ে এসে ওঁর পিতৃদেবের ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেব?"

"কিন্তু বাবার কাছে ওর আসার কী আছে, চুপে চুপেই বা কেন আসতে যাবে, যখন তুমি নিজেই বলছ যে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না কখনই আসবে না?" ক্রোধে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল ইভান ফিয়োদরভিচের মুখ। সেই অবস্থাতেই সে বলে চলল, "তুমি নিজেই তো একথা বলছ, তাছাড়া এ বাড়িতে বাস করে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে এসব ওই বুড়োর উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়, ও চিজ আর ওর কাছে আসছে না। তা সে যদি না-ই আসে তাহলে দ্‌মিত্রি বুড়োর ওপর হামলা করতে যাবে কেন? কী হল, বল! আমি তোমার মনের কথাটা জানতে চাই।"

"কেন আসবেন সে আপনি নিজেই ভালো জানেন হুজুর। আমার মনের কথা দিয়ে কী হবে? উনি আসবেন স্রেফ রাগের মাথায়, নয়তো মনে মনে একটা সন্দেহ নিয়ে—এই ধরুন না কেন, আমার অসুস্থতাকে উপলক্ষ করেই, সেই গতকালের

মতোই অস্থির হয়ে এ ঘর ও ঘর তোলপাড় করে তল্লাশ করতে থাকবেন—সেটা করবেন এই সন্দেহের বশে যে শ্রীমতীটি কোন্ এক ফাঁকে চুপচাপ যে সরে পড়ে নি তা কে বলতে পারে? উনি এটাও খুব ভালোভাবে জানেন যে আমাদের কর্তা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ একটা খামের ভেতরে তিন হাজার রুবলের নোট পুরে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নার নামে রেখে দিয়েছেন। খামটা একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা, তিন-তিনটে সিলমোহর দিয়ে সাঁটা। ওপরে বড়ো বড়ো করে কর্তার নিজের হাতে লেখা: 'আমার স্বর্গের দেবী গ্রুশেন্‌কাকে—যদি সে আসতে চায়।' পরে অবশ্য, দিন তিনেক বাদে তার সঙ্গে যোগ করেছেন 'আমার ছোট্ট কুঁকড়ি সোনাকে।' সন্দেহটা তো এখানেই, হুজুর।"

"রাবিশ!" রাগে প্রায় ফেটে পড়ল ইভান ফিয়োদরভিচ। 'দ্‌মিত্রি তাই বলে টাকাকড়ি লুট করতে যাবে না, টাকাকড়ির জন্য বাবাকে খুন করবে তাও সম্ভব নয়। খুন করতে হলে গতকালই খেপে গিয়ে, হিংসায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে বোকার মতো বাবাকে খুন করতে পারত, কিন্তু চুরি বাটপারি করার লোক সে নয়।"

"ওঁর এখন বড়োই টাকার দরকার, কর্তা, চূড়ান্ত রকম টানাটানি চলছে, ইভান ফিয়োদরভিচ। কী পরিমাণ দরকার আপনি জানেন না", অত্যন্ত শান্ত সংযত কণ্ঠে, দিব্যি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল স্মের্দিকোভ। "তাছাড়া ওই যে তিন হাজার রুবল—দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ মনে করেন ওটা তাঁর নিজেরই টাকা। উনি নিজেও আমাকে বলেছেন 'ঠিক তিন হাজার রুবলই বাবার কাছে আমার পাওনা।' তাছাড়া আরও একটা দিক চিন্তা করে দেখুন ইভান ফিয়োদরভিচ—আরও একটা জিনিস যাকে খাঁটি সত্য বলে মানতে হয় কর্তা। বলতে গেলে এটা প্রায় নিশ্চিত যে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না একবার যদি ইচ্ছে করেন তা হলে কর্তাকে, মানে আমাদের ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে, তিনি অবশ্যই বাধ্য করবেন তাঁকে বিয়ে করতে। একবার চাইলেই হল, হুজুর। তা হ্যাঁ, বলা যায় না, হয়তো চাইবেনও। আমি অমনিতে বলছি বটে যে উনি আসবেন না, কিন্তু বলা যায় না হয়তো আরও বড়ো কোনো দাঁও মারার মতলব তাঁর আছে, হুজুর—মানে, সরাসরি এ বাড়ির কর্ত্রী হয়ে বসতে চান। আমি নিজে জানি, ওঁর মালিক, ব্যাবসাদার সাম্‌সোনভ্ কোনো রকম রাখঢাক না করে খোলাখুলি এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, কথায়-কথায় হাসতে হাসতে এমনও বলেছে যে আইডিয়াটা নেহাৎ মন্দ নয়। আর সে মহিলা নিজেও খুব একটা বোকা নন হুজুর। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মতো ন্যাংটো ভিখিরিকে বিয়ে করতে তাঁর বয়েই গেছে। তাই বলি কি, ইভান ফিয়োদরভিচ্, এইটে ধরে নিয়ে এবারে নিজেই বিবেচনা করে দেখুন, সেক্ষেত্রে আপনার জন্মদাতা পিতার মৃত্যুর পর আপনাদের কারও কপালে একটা কানাকড়িও জুটবে না—না দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের, এমনকি আপনার নিজের বা আপনার ভাই আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্—কারোই না। কারণটা এই যে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না এই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার বাবাকে

বিয়ে করবেন যাতে যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়া যায় আর পুঁজি বলতে যা আছে তাও নিজের নামে বদল করে নেওয়া যায়। কিন্তু এখন এসব কিছু হওয়ার আগেই, এই মুহূর্তে আপনার জন্মদাতা পিতা যদি মারা যান তাহলে আপনারা—তাঁর ছেলেরা প্রত্যেকে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চল্লিশ হাজার করে পাবেন, এমনকি যে দ্‌মিত্রিকে কর্তা অমন বিষ নজরে দেখেন, তিনিও বাদ যাবেন না, কেন না কর্তার কোনও উইল নেই। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ কিন্তু এসব বেশ ভালো করেই জানেন, হুজুর।

ইভান ফিয়োদরভিচের চোখে মুখে কেমন যেন একটা শিহরন খেলে গেল, তার মুখটা যেন বেঁকে গেল, হঠাৎ লাল হয়ে উঠল।

স্মের্দিকোভ্‌কে তার কথার মাঝখানে আচমকা বাধা দিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ বলে উঠল, "এত কিছুর পর তাহলে আমাকে চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাবার পরামর্শ দিচ্ছ কেন? এর পেছনে তোমার মতলবটা কী বল তো? আমি এখান থেকে চলে যাব তারপর দেখতেই তো পাচ্ছ এখানে কী ঘটবে।" ইভান ফিয়োদরভিচ কষ্ট করে দম নিল।

"তা যা বলেছেন, হুজুর", শান্ত কণ্ঠে বিজ্ঞের মতো বলে উঠল স্মের্দিকোভ্, তবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচের ভাব ভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল।

"'তা যা বলেছেন' মানে?" রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল ইভান ফিয়োদরভিচ।

"আপনার জন্যে দুঃখু হল বলেই বললাম, হুজুর। আপনার জায়গায় আমি হলে এই নিয়ে বসে না থেকে এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে করে চলে যেতাম! " ইভান ফিয়োদরভিচের জ্বলন্ত দৃষ্টির মুখে পড়েও তার চোখের দিকে একান্তই অকপট দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মের্দিকোভ্ জবাব দিল।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"দেখেশুনে মনে হচ্ছে তুমি একটা আকাট মুখ্যু। শুধু তা-ই বা কেন একটা পাকা বদমাশও বটে!" ইভান ফিয়োদরভিচ্ চট করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়ল। গেট পেরিয়ে তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঢুকতে গিয়েও হঠাৎ থমকে স্মের্দিকোভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এর পরই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় ইভান ফিয়োদরভিচ আচমকা কেমন যেন খিঁচিয়ে উঠল, ঠোঁট কামড়ে হাতের মুঠো পাকাল একটি পলকের অপেক্ষামাত্র—তারপরই আর দেখতে হত না—ইভান ফিয়োদরভিচ নির্ঘাত স্মের্দিকোভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তবে ওর এই মতলবটা স্মের্দিকোভের অন্তত তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ে গিয়েছিল; সে চমকে উঠে চোখের পলকে এক ঝটকায় সর্বাঙ্গ হেলিয়ে পেছনে হটে গেল। যাই হোক, মুহূর্তটি স্মের্দিকোভের পক্ষে ভালোয়-ভালোয় কেটে গেল। ইভান ফিয়োদরভিচও

শেষ পর্যন্ত কেমন যেন ভেবাচেকা খেয়ে একটি কথাও না বলে নীরবে ঘুরে গেটের দিকে পা বাড়াল।

"তোমার যদি জানার ইচ্ছে থাকে তো বলি, আমি কালই মস্কোয় চলে যাচ্ছি—কাল ভোরে। এটাই হল কথা!" ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে হঠাৎ সে বলে উঠল। পরে অবশ্য নিজেই এই ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কী এমন তার ঠেকা পড়েছিল তখন স্মের্দিকোভ্‌কে এই কথাগুলি বলার!

যেন এটাই তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল এমন ভাবে কথাগুলি লুফে নিয়ে স্মের্দিকোভ্ বলে উঠল, "সেটাই সব চাইতে ভালো হবে কর্তা।  তবে হ্যাঁ সে রকম কোনো ঘটনা ঘটলে এখান থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অতিষ্ঠ করে মস্কো থেকেও আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারে, কর্তা।"

ইভান ফিয়োদরভিচ আবারও থমকে দাঁড়াল, এবারেও দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল স্মের্দিকোভের দিকে। কিন্তু এবারে স্মের্দিকোভ্‌কে দেখে মনে হল তারও যেন ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে গেছে। পলকের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল তার যত অশালীন আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব! তার সারা চোখেমুখে ফুটে উঠল গভীর মনোযোগ ও প্রত্যাশার ভাব—সেটা অত্যন্ত তীব্র বটে, কিন্তু বিনম্র ও খোশামুদি ধরনের। যে ভাবে ইভান ফিয়োদরভিচের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে তাকিয়ে ছিল তাতে যেন এটাই পড়া যাচ্ছিল  আরও কিছু বলবে কি? আরও কিছু যোগ করার আছে?"

"কিন্তু আমি যদি চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যেতাম  সে রকম কোনো ঘটনা ঘটলে সেখান থেকেও আমাকে ডেকে পাঠানো যেত না?" ইভান ফিয়োদরভিচ হঠাৎ গর্জন করে উঠল। কেন যে সে আচমকা অমন ভীষণ রকম গলা চড়াল সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

"তা হুজুর চের্‌মাশনিয়া থেকেও সম্ভব  অতিষ্ঠ করে তোলা খুবই সম্ভব, হুজুর", অস্ফুটস্বরে প্রায় ফিসফিস করে যেভাবে স্মের্দিকোভ্ বলল তাতে মনে হচ্ছিল সে যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। তবে এই অবস্থাতেও আগের মতোই স্থির অপলক দৃষ্টিতে সরাসরি তাকিয়ে রইল ইভান ফিয়োদরভিচের চোখের দিকে।

"শুধু কথাটা এই যে চের্‌মাশ্‌নিয়া কাছেই, আর মস্কো অনেক দূর—তাই কিনা আমার ট্রেনভাড়া বাবদ খরচের কথা চিন্তা করে আমাকে চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাবার জন্য অত করে বলছ, না কি খামোকা অত বড়ো একটা ঘোরানো পথ ধরতে যাচ্ছি বলে আমার জন্য তোমার দুঃখ হচ্ছে?"

"তা যা বলেছেন হুজুর  " বিড়বিড় করে সে বলল। তার কণ্ঠস্বর ততক্ষণে ভেঙে পড়েছে। একটা বিশ্রী রকমের হাসি-হাসি মুখ করে সে আবার চমকে উঠে সময় মতো লাফ মেরে পিছু হটার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু স্মের্দিকোভ্‌কে অবাক করে দিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ হঠাৎ হেসে উঠল এবং সেই রকম হাসতে হাসতেই দ্রুত

গেটের ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেই সময় কেউ যদি তার মুখের দিকে তাকাত তাহলে হয়তো দেখতে পেত তার হাসিটা আদৌ এই কারণে নয় যে তার মনে মনে আনন্দ হচ্ছে। সেই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে যে কী ছিল সে নিজেও হয়তো তা বুঝিয়ে বলতে পারত না। সে পা চালাল, ভীষণ ছটফটে একটা ভাব ফুটে উঠল তার চলার মধ্যে।

## সাত

## 'বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ আছে'

ওই অবস্থায় চলতে চলতে সে কথাও বলছিল। বসবার ঘরে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তার উদ্দেশে হাত নেড়ে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল: ''আমি ওপরে আমার ঘরে যাচ্ছি। আপাতত তোমার তোমার কাছে আর আসছি না, পরে দেখা হবে।'' এই বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, বাপের দিকে ফিরে তাকানোর কোনো গরজ পর্যন্ত দেখাল না। এমনটা খুবই হতে পারে যে সেই মুহূর্তে বুড়োর প্রতি তার মনটা বড়ো বেশি বিষিয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিরূপ মনোভাবের এহেন অশোভন প্রকাশ ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঠেকল। এদিকে বুড়োকে দেখে কিন্তু এটাই মনে হচ্ছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ছেলেকে একটা কিছু জানাতে চায়, যার জন্য তাকে ধরবে বলে ইচ্ছে করেই সে বেরিয়ে বসবার ঘরে এসে অপেক্ষা করছে। ছেলের মুখ থেকে এমন অভ্যর্থনা শুনতে পেয়ে সে একটি কথাও না বলে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছেলে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত কৌতুকের দৃষ্টিতে অনুসরণ করে তাকে সিঁড়ি দিয়ে দেড়তলার ঘরে উঠে যেতে দেখল।

ইভান ফিয়োদরভিচের পর পর স্মের্দিকোভ্‌ও ঘরে এসে ঢুকেছিল। তার দিকে তাকিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে জিগ্‌গেস করল, "এর আবার কী হল?"

"কীসে যেন রাগ হয়েছে। কে জানে কেন?" প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে সে বলল।

"মরুক গে! রাগ করলে করুক! সামোভারটা নিয়ে আয়, আর তুই নিজে চটপট বিদেয় হ। জলদি। বলি, নতুন কোনো খবর আছে কি?"

এরপরই শুরু হয়ে গেল প্রশ্নের পর প্রশ্ন, এমন সব প্রশ্ন যা নিয়ে এইমাত্র স্মের্দিকোভ অনুযোগ করছিল ইভান ফিয়োদরভিচের কাছে। অর্থাৎ সেই মহিলাটিকে নিয়ে যার পথ চেয়ে সে বসে আছে। সে সব জিজ্ঞাসাবাদের উল্লেখ আর এখানে না-ই করলাম।

আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ির দরজায় তালা চাবি পড়ে গেল। খ্যাপা বুড়োটা একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে অপেক্ষা

করতে লাগল কখন তার বন্ধ দরজায় সঙ্কেত হিসেবে স্থির করা সেই পাঁচটি টোকা পড়বে। থেকে থেকে জানলার ভেতর দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে লাগল, কিন্তু রাতের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

রাত অনেক হয়ে গেছে। ইভান ফিয়োদরভিচের চোখে ঘুম নেই, সে কেবল ভেবেই চলেছে। সেই রাতে সে দেরি করে শুতে গেল। যখন শুতে গেল তখন রাত প্রায় দুটো। সে যা-ই হোক, আমরা তার চিন্তাভাবনার গতিবিধির বিবরণ দিতে যাচ্ছি না, তা ছাড়া তার মনের ভেতরে আমাদের প্রবেশ করার সময় এটা নয়, সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে আসবে।

এমনকি সে চেষ্টা যদি এখন করিও সেটা একেবারেই বুদ্ধিমানের হবে না, কেন না তার এখনকার এই চিন্তাগুলিকে ঠিক চিন্তা বলা যায় না, সবই ছিল কেমন যেন একেবারেই অনির্দিষ্ট, আর সর্বোপরি বড়ো বেশি উত্তেজনায় ভরপুর। সে নিজে উপলব্ধি করতে পারছিল যে সে সব কিছু খুইয়ে বসে আছে। কোথা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত যত ইচ্ছা, বলতে গেলে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে উড়ে এসে তাকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলতে লাগল। এই যেমন, মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, এমন সময় নাছোড়াবান্দার মতো এমন একটা দুর্বিষহ ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল যে এখনই নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে বাইরের বাড়িতে স্মের্দিকোভের আস্তানায় গিয়ে তাকে ধরে পেটায়। কেউ যদি তাকে জিগ্‌গেস করত কী কারণে, তা হলে সে নিজেও এর পেছনে সঠিক কোনো কারণ আদৌ দেখাতে পারত না। এই হুকুমের চাকাটি যে তাকে নিদারুণ অপমান করেছে এবং ফলে তার এত বড়ো ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুনিয়ার যার জুড়ি মেলা ভার—এ ছাড়া আর কীই বা বলতে পারত? অন্যদিক থেকে এই রাতের মধ্যে তার মনকে বারবার অভিভূত করে ফেলতে লাগল কেমন যেন একটা ভীরুতা যা তার কাছে অবমাননাকর, যার কোনও ব্যাখ্যা তার জানা ছিল না। আর এর ফলে—সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিল—হঠাৎই যেন সে তার শারীরিক শক্তি পর্যন্ত হারাতে শুরু করল। তার মাথা ব্যথা করতে লাগল, মাথা ঘুরতে শুরু করল। কেমন যেন একটা ঘৃণার ভাব এমন ভাবে তার বুকের ভেতরে চেপে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন কারও ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যাচ্ছে। আলিয়োশার সঙ্গে সবে তার যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা মনে হতে আলিয়োশার প্রতিও তার ঘৃণা জেগে উঠল। এমনকি কোনো কোনো মুহূর্তে সে নিজেকে পর্যন্ত প্রচণ্ড ঘৃণা করতে শুরু করল। কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কথা ভাবতেও সে প্রায় ভুলে গেল। পরে অবশ্য এতে সে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—বিশেষত এই ভেবে যে সে নিজেই বেশ ভালোভাবে মনে করতে পারছিল যে এই গতকাল সকালেও সে যখন অত বড়ো মুখ করে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে বড়াই করে বলেছিল যে কালই মস্কোতে চলে যাবে, তখনই তার

অন্তরের অন্তস্তল থেকে আরেকটা কণ্ঠস্বর যেন কানে কানে তাকে বলছিল 'যত সব বাজে কথা! যেতে তুমি পারবে না। এখন অত জাঁক করলে কী হবে, এ বাঁধন ছেঁড়া অত সহজ হবে না।'

আরও অনেক কাল পরে সেই রাতের কথা মনে পড়তে বিশেষ করে একটা কথা ভেবে নিজের ওপর তার বিতৃষ্ণা হত কী করে এমন হল কে জানে—হঠাৎ হঠাৎ সে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ছিল, পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে এই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চুপিচুপি দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে নিচের তলার ঘরের দরজার সামনে কান পেতে শুনছিল ফিয়োদর পাভ্লভিচ ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করছে, পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত কৌতূহল তখন তাকে পেয়ে বসেছিল। তার বুক ঢিপঢিপ করছিল। অনেকক্ষণ ধরে—একেক বার প্রায় মিনিট পাঁচেক করে সে রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনছিল। কেন যে সে এই সব করতে গিয়েছিল, কেন কান পেতে শুনতে গিয়েছিল তা সে নিজেও জানত না। পরে সারা জীবন সে তার এই 'আচরণকে' 'নীচতা' আখ্যা দিয়ে এসেছে। সারা জীবন ধরে, মনে মনে, মনের গহনে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে এটাকে সে তার জীবনের হীনতম আচরণ বলে গণ্য করে এসেছে। সেই মুহূর্তে বাবার প্রতি তার যে মনোভাব হয়েছিল তা, ঘৃণার এতটুকু ধারে কাছে ছিল না। যে কারণেই হোক, যে অনুভূতিটা তার মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল তাকে একটা অদম্য কৌতূহল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বাবা নিচের ঘরে কী ভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, এই মুহূর্তে ওখানে তার পক্ষে কী করা সম্ভব—জানতে তার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল। সে মনে মনে অনুমান করতে লাগল, কল্পনা করতে লাগল বুড়ো নিচে নির্ঘাত জানলার ভেতর দিয়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মারছে, একেক সময় আচমকা ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে—করছে তো করছেই—কখন দরজায় টোকা পড়ে। এই কাজে ইভান ফিয়োদরভিচ বার দুয়েক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসেছিল। রাত প্রায় দুটো নাগাদ যখন সব শান্ত হয়ে এসেছে, এমন কি ফিয়োদর পাভ্লভিচও শুয়ে পড়েছে তখন ইভান ফিয়োদরভিচও শুয়ে পড়ল। তার একান্ত মনোবাসনা ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমিয়ে পড়া, যেহেতু মারাত্মক ক্লান্তি বোধ করছিল সে। আর হলও ঠিক তাই চট করে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল, ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্নও দেখল না। তবে ঘুম তার ভাঙল বেশ সকাল-সকাল, সকাল সাতটা নাগাদ। ততক্ষণে চারদিকে ফরসা হয়ে এসেছে। চোখ খুলতে অবাক হয়ে হঠাৎ সে ভেতরে ভেতরে অসাধারণ উদ্দীপনার প্রবল জোয়ার অনুভব করল। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে চট করে জামাকাপড় পরে নিল। তারপর নিজের সুটকেসটা বের করে কালবিলম্ব না করে চটপট তার ভেতরে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। জামাকাপড় সব ঠিক সময়মতো গতকাল সকালেই ধোপাবাড়ি থেকে পাওয়া গেছে।

সব যেমন যেমন হওয়া উচিত তেমনি যে মিলে গেছে, তার আকস্মিক যাত্রার বেলায় যে কোনও বিলম্ব ঘটেনি এই ভেবে ইভান ফিয়োদরভিচ বরং মুচকি হাসলও। তার চলে যাওয়াটা কিন্তু সত্যি সত্যি আকস্মিকই ছিল। যদিও ইভান ফিয়োদরভিচ গতকালও বলেছিল—কাতেরিনা ইভানভ্নাকে বলেছিল, আলিয়োশাকে এবং পরে স্মের্দিকোভ্কেও বলেছিল যে কালই সে চলে যাচ্ছে, কিন্তু রাতে শুতে যাবার সময় — তার বেশ ভালোমতো মনে আছে—সেই মুহূর্তে যাত্রার কথা তার মনেই আসেনি; অন্তত একথা তার মনেও স্থান পায়নি যে সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার প্রথম কাজ হবে তড়িঘড়ি সুটকেস গোছান। অবশেষে সুটকেস আর ব্যাগ গোছগাছ হয়ে গেল। প্রায় নটা বাজে, এমন সময় মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না ঘরে ঢুকে যথারীতি তার রোজকার প্রশ্ন করল 'কোথায় চা-জলখাবার খেতে আজ্ঞা হয়? নিচে যাবেন, না এখানে এনে দেব?'

ইভান ফিয়োদরভিচ নিচে নামল। তাকে প্রায় খুশি-খুশিই দেখাচ্ছিল, যদিও তার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি কেমন যেন এলোমেলো ও ব্যস্তসমস্ত ধরনের। বাপকে সাদর সম্ভাষণ জানাল, এমনকি তার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে খোঁজখবরও নিল, কিন্তু তা হলেও বাপের উত্তরটা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য অপেক্ষা না করে তার আগেই চট করে সে ঘোষণা করল যে সে আর এক ঘণ্টার মধ্যে মস্কো যাত্রা করছে, এখান থেকে একেবারে চলে যাচ্ছে, তাই বাপের কাছে তার প্রার্থনা সে যেন এখনই ঘোড়া আনতে লোক পাঠিয়ে দেয়। বুড়ো সংবাদটা শুনল, শুনে এতটুকু অবাক হল না, এমনকি এতদূর অভব্যতার পরিচয় দিল যে ছেলে চলে যাচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। বরং ঠিক এই প্রসঙ্গে নিজের খুব জরুরি একটা কাজের কথা মনে পড়ে যেতে সে হঠাৎ দারুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"বোঝ কাণ্ড! এ কেমন কথা! গতকাল বললি না তো! তা সে যাই হোক, এখনও একটা ব্যবস্থা করা যায়। যাচ্ছিসই যখন, আমার একটা কাজ করে দিয়ে যা বাবা আমার, তাহলে আমার বড্ড উপকার হয়। যাবার পথে একবার চেরমাশনিয়া না। এমন আর কি, ভলোভিয়া স্টেশন থেকে তোকে শুধু একটু বাঁয়ে ঘুরতে হবে—আর মাত্র ক্রোশ চারেক পথ—তাহলেই তোমার চেরমাশনিয়া।"

"রক্ষে কর। ও আমার দ্বারা হবে না। রেলপথ সেখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে, এদিকে স্টেশন থেকে মস্কোর গাড়ি ছাড়ছে সন্ধে সাতটায়। পড়িমরি করে ধরার মতো অবস্থা আর কি!"

"সে ধরতে হয় কাল ধরতে পারবি, নয়তো পরশুও ধরতে পারিস। কিন্তু আজ একবার চেরমাশনিয়া ঘুরে যা। বুড়ো বাপের একটু না হয় উপকারই করলি, এতে তোর ক্ষতিটা কী বল তো! আমার যদি এখানে কাজ না থাকত তাহলে আমি নিজে অনেক আগেই পড়িমরি করে ছুটে যেতাম, কেননা ওখানকার কাজটা বড্ড জরুরি, আর ফেলে রাখা যায় না, অথচ এখানে আমি এমন ফেঁসে আছি

যে সে সময় আমার নেই। দ্যাখ, ওখানে আমার জঙ্গল মহাল আছে—দুটো অংশে—একটা বেগিচেভোতে, আরেকটা দিয়াচ্কিনোতে—দুটোই পতিত জমি। মাস্‌লভ্‌রা—বাপ আর ছেলে—দুই ব্যাবসাদার কাঠের দাম বাবদ মোটে আট হাজার দিচ্ছে, অথচ সবে এই গত বছরই একজন খরিদ্দার পাওয়া গিয়েছিল—বারো দিতে চেয়েছিল। লোকটা স্থানীয় নয়, আসল কথাটা কিন্তু সেখানেই। তার কারণ স্থানীয় লোকদের আজকাল বাজার নেই। লাখপতি মাস্‌লভরা বাপ ব্যাটায় সব কিছু হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে। ওরা যা দর দেবে তা-ই নিতে হবে, ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর হাঁকবে এমন বুকের পাটা স্থানীয় কোনো লোকের হবে না। এদিকে ইলিইন্‌স্কোয়ের পুরুতঠাকুর হঠাৎ দেখি গত বৃহস্পতিবার এখানে লিখে জানিয়েছে যে গোরস্তকিন নামে একজন সেখানে এসেছে। সে লোকটাও একজন কারবারি, তাকে আমি চিনি। তার একমাত্র মূল্য এই যে সে স্থানীয় লোক নয়, এসেছে পোগ্রেবোভো থেকে। তার মানে, মাস্‌লভ্‌দের ভয় পায় না, যেহেতু স্থানীয় নয়। বলছে জঙ্গলের কাঠবাবদ এগারো হাজার দেবে। শুনছিস? এদিকে পুরুতঠাকুর লিখছে লোকটা মোট সাতদিন মাত্র চের্‌মাশ্‌নিয়াতে থাকবে। তাই বলছিলাম কি তুই যদি গিয়ে দেখা করে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে আসিস

"তা তুমি তোমার ওই পুরুতঠাকুরকে লেখ না কেন, সে-ই বন্দোবস্ত করে দেবে।"

"ও তার কম্ম নয়। তাহলে আর বলছি কি! ওসব দিকে ওই পুরুতঠাকুরের নজর নেই। মানুষ তো নয়, সোনা। আমি এখনই ওর হেফাজতে রাখার জন্য বিশ হাজার রুবল বিনা রসিদে ওর হাতে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু ওই যে বললাম, ওদিকে কোনো নজর নেই। ও কি একটা লোক হল! একটা কাকও ওকে ঠকিয়ে দিতে পারে। অথচ ভেবে দ্যাখ, মানুষটা কিন্তু পণ্ডিত। আর ওই গোর্‌স্তকিন লোকটা—দেখতে চাষার মতো, গায়ে তার নীল রঙের, আঁটোসাঁটো, কুঁচি দেওয়া চাষাড়ে কোর্তা, কিন্তু স্বভাবচরিত্রের কথা যদি বলিস—হাড় বজ্জাত। আমাদের বিপদটা এই যে এটাই আমাদের সাধারণ চরিত্র। কথায় কথায় মিথ্যে বলা—এই হল তার ধর্ম। সময় সময় এমন মিথ্যে বলে যে কেন বলতে গেল ভেবে অবাক হতে হয়। এই তো তিন বছর আগেকার কথা মিথ্যে করে বলল যে ওর বউ মারা গেছে, ইতিমধ্যে আরেক জনকে বিয়েও করেছে, অথচ ভেবে দ্যাখ, ওসব কিছুই হয়নি। ওর বউ কস্মিনকালে মারা যায়নি, দিব্যি বেঁচে আছে, এখনও বহাল তবিয়তে আছে, এখন প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর একবার করে ওকেই ধরে পেটায়। তাই কথাটা এই যে ও যে কিনতে চায় এবং এগারো হাজার দেবে বলছে এক্ষেত্রেও জানা দরকার সেটা সত্যি না মিথ্যে।"

"সেক্ষেত্রে আমারও কিছু করার নেই—আমারও সে চোখ নেই।"

"দাঁড়া, দাঁড়া! তোকে দিয়েও হবে। গোরস্তকিন্ লোকটার সবগুলো লক্ষণ তোকে

বলে দেব, তাহলেই দেখবি পারবি। ওর সঙ্গে আমি এর আগেও কারবার করেছি। দ্যাখ, বলে দিচ্ছি, ওর দাড়ির ওপর নজর রাখবি। কটা রঙের, বিচ্ছিরি নোংরা, পাতলা দাড়ি। যদি দেখিস তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলছে, আর কথা বলার সময় দাড়িটা কাঁপছে তাহলে বুঝবি ঠিক আছে, যা বলছে তা সত্যি, কারবার করার ইচ্ছে আছে। আর যদি দেখিস বাঁ হাত দিয়ে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর মুখ টিপে টিপে হাসছে তাহলে বুঝবি ঠকানোর তালে আছে, ফন্দি ফিকির আঁটছে। ওর চোখের দিকে কখনও তাকাবি না কিন্তু, চোখ দেখে কিছু বুঝতে পারবি না— গভীর জলের মাছ, ঠগবাজ। দাড়ির দিকে তাকাবি। ওর জন্য দু ছত্র লিখে তোর হাতে দিচ্ছি, ওকে দিবি। গোরস্তকিন বলছি বটে... তবে গোরস্তকিন নয়, আসলে হল গিয়ে খোচর। তাই বলে তুই আবার 'খোচর' বলে বসিস না— রাগ করবে। কথাবার্তা বলে যদি দরে পোষায়, যদি দেখিস সব ঠিক আছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একখানা চিঠি লিখবি এখানে। চিঠিতে শুধু এই কথাই লিখবি: 'মিথ্যে বলছে না।' এগারো ধরে থাকবি, বড়জোর এক হাজার ছাড়তে পারিস, এর বেশি ছাড়িস না। কোথায় আট, কোথায় এগারো—ভেবে দ্যাখ একবার! তিন হাজারের তফাত। এই তিন হাজার তো এখন বলতে গেলে আমার কাছে পড়ে পাওয়া। খদ্দের কি আর চট করে পাওয়া যায়? এদিকে টাকার আমার দারুণ দরকার। একবার জানিয়ে দিবি যে গুরত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে, তাহলে আমি নিজেই ধাঁ করে গিয়ে মিটমাট করে আসব—কোনোমতে সময় বের করে নেব 'খন। কিন্তু এখুনি আমি ছুটতে যাব কেন বল? বলা তো যায় না এসব সেই পুরুতঠাকুরের মনগড়া ধারণা?"

"না, অত সময় আমার নেই, রেহাই দিন।"

"ওরে, বুড়ো বাপকে একটু অনুগ্রহ কর, মনে থাকবে! তোদের কারও হৃদয় বলে কিছু নেই। এছাড়া আর কী বলব! এক দিন বা দুদিন—তাতে তোর কী আসে যায় শুনি? এখন তুই চললি কোথায়? ভেনিস যাচ্ছিস নাকি? দুদিনে তোর ভেনিস তো আর ভেসে যাচ্ছে না। আলিয়োশাটাকে আমি পাঠাতে পারতাম, কিন্তু আলিয়োশা এসব লেনদেনের কী বোঝে? আমি একমাত্র এই কারণেই তোকে বলছি কারণ তুই বুদ্ধিমান লোক। এটা কি আর আমি দেখতে পাই না? কাঠের ব্যাবসা তুই করিস না বটে, কিন্তু তোর চোখ আছে। এখানে যা দরকার সেটা হল দেখা— লোকটার কথার মধ্যে গুরুত্ব আছে কি নেই। বললাম তো, দাড়ির ওপর নজর রাখবি—দাড়ি যদি কাঁপে তাহলে বুঝবি গুরুত্ব দিয়ে বলছে।

"সেই পোড়ার চের্মাশ্‌নিয়াতেই আমাকে ঠেলে পাঠাচ্ছেন তাহলে?" কাষ্ঠহাসি হেসে ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ইভান ফিয়োদরভিচ।

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ ছেলের রাগের দিকে কোনো নজর দিল না, অথবা সে দিকে নজর দেওয়ার কোনো ইচ্ছাও তার ছিল না, তবে হাসিটা ঠিক লুফে নিল।

“তার মানে, যাচ্ছিস? যাচ্ছিস তো? এই এখুনি চটপট দু ছত্র লিখে তোর হাতে দিচ্ছি।”

“জানি নে, যাব কিনা এখুনি বলতে পারছি নে। পথে ঠিক করব।”

“আরে পথে ঠিক করার কী আছে! যা ঠিক করার এখনই করে নে বাবা! বোঝাপড়া হয়ে গেলে আমাকে দুটো ছত্র লিখে জানিয়ে দিবি। পুরুতঠাকুরের হাতে দিস, তোর চিঠিটা তুরন্ত আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আর তোকে ধরে রাখব না। ভেনিস যাবার হয় যা। ফিরতি পথে পুরুতঠাকুর তার গাড়িতে করে তোকে ভলোভিয়া স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

বুড়ো রীতিমতো উল্লসিত। চটপট চিঠি লিখে ফেলল, গাড়িতে ঘোড়া জোতার হুকুম দিল। জলখাবার এবং তার সঙ্গে ব্র্যান্ডিও এলো। বুড়ো যখন খুশি হয় তখন সচরাচর লাগামছাড়া হয়ে পড়ে, কিন্তু এবারে তাকে কেমন যেন সংযত দেখাল। যেমন, ছেলে দ্‌মিত্রি সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করল না। আবার ইভানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার জন্য কোনো আবেগও প্রকাশ করল না। এমনকি মনে হল যেন বলার মতো কথাও খুঁজে পাচ্ছিল না। ইভান ফিয়োদরভিচ এটা খুবই লক্ষ করল। ‘আমি ওর বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছি দেখছি’, সে মনে মনে ভাবল। শুধু বাইরের বারান্দায় ছেলেকে যখন এগিয়ে দিতে গেল কেবল তখনই বুড়ো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গেল, কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ সম্ভবত তার ওই সোহাগ এড়ানোর উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি করে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পেরে নিজেকে গুটিয়ে নিল।

“আচ্ছা, ঈশ্বর সহায় হোন, ঈশ্বর সহায় হোন!” বারান্দার ধাপ থেকে সে বার কয়েক আওড়াল। “তা আমি বেঁচে থাকতে থাকতে কোনো এক সময় আবার আসবি তো? আসবি কিন্তু। তুই এলে সব সময়ই খুশি হব। আচ্ছা, খ্রিস্ট তোর সহায় হোন!”

ইভান ফিয়োদরভিচ গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

“বিদায় ইভান, বিদায়! বুড়ো বাপের ওপর অত রাগ করিস নে বাবা!” শেষ বারের মতো বাপ চেঁচিয়ে বলল।

স্মের্দিকোভ্, মার্ফা, গ্রিগোরি—বাড়ির সকলেই তাকে বিদায় জানানোর জন্য বেরিয়ে এসেছিল। ইভান ফিয়োদরভিচ সকলকে দশটা করে রুবল বখশিশ দিল। গাড়িতে যখন সে উঠে বসেছে এমন সময় স্মের্দিকোভ্ গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল গালিচাটা ঠিক করে পেতে দেবার জন্য।

“দেখছ তো চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাচ্ছি কেমন যেন আলটপকা ইভান ফিয়োদরভিচের মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো—আবার সেই গতকালের মতোই আপনা

আপনি ছুটে বেড়িয়ে এলো — তবে এবারে সেই সঙ্গে তার মুখে কেমন একটু নার্ভাস হাসিও ফুটে উঠল। পরে অনেক দিন এটা তার মনে ছিল।

"তাই তো বলি, সাধে কি আর বলে, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ আছে!" উদ্দেশ্যেপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইভান ফিয়োদরভিচের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল স্মের্দিকোভ্।

গাড়ি ছেড়ে দিল, দেখতে দেখতে গাড়িতে গতি সঞ্চারিত হল। ভ্রমণকারীর মনটা ঝাপসা হয়ে আছে। তবু সে পরম আগ্রহে চারদিকের মাঠঘাট পাহাড়পর্বত আর গাছপালা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল; দেখতে পেল মাথার ওপর, মেঘমুক্ত ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁক। এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মনটা বেশ হাল্কা হয়ে এলো। গাড়োয়ানের সঙ্গে সে কিছুটা গল্পসল্প করারও চেষ্টা করল। প্রশ্নের উত্তরে লোকটা যা যা বলছিল তার মধ্যে কী যেন একটা প্রসঙ্গ ইভান ফিয়োদরভিচের মনে দারুণ আগ্রহের সঞ্চার করেছিল, কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই তার মনে হল সব এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং সত্যি কথা বলতে কি, লোকটার উত্তরটাই সে ধরতে পারেনি। সে চুপ করে গেল। এটাই ভালো। তাজা ফুরফুরে বাতাস, ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। তার মাথার ভেতরে আরেকটু হলেই ঝলকে উঠতে যাচ্ছিল আলিয়োশা আর কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মূর্তি; কিন্তু মৃদু হেসে সে তার প্রিয় ছায়ামূর্তিদের আস্তে করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল, তারা মিলিয়ে গেল। 'ওদের সময় পরে আরও আসবে'—সে মনে মনে বলল। দ্রুত ঘোড়া বদলের ঘাঁটি পার হল, সেখানে ঘোড়া বদল করে গাড়ি ছুটল ভলোভিয়ার দিকে। 'বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ আছে'—কেন? ওর এই কথা বলার উদ্দেশ্যটা কী?' কথাটা মনে হতেই তার নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। 'কেন যে আমি ওকে জানাতে গেলাম যে চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাচ্ছি!' ততক্ষণে গাড়ি ভলোভিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ইভান ফিয়োদরভিচ গাড়ি থেকে নামল, সঙ্গে সঙ্গে চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাবার গাড়ির গাড়োয়ানেরা তাকে ছেঁকে ধরল। ডাকের গাড়ির নয়, ব্যক্তিগত মালিকানার গাড়ির গাড়োয়ান এরা সব. পাড়াগাঁয়ের চার ক্রোশ মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাবার জন্য দরকষাকষি করে একটা গাড়িও ভাড়া নেওয়া গেল। গাড়ির গাড়োয়ানকে সে ঘোড়া জুততে বলল। স্টেশনের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, স্টেশনমাস্টারের বউয়ের দিকে কটাক্ষে এক ঝলক তাকাল, তক্ষুনি আবার অমনি কী মনে হতে হঠাৎ ফিরে এলো দরজার বাইরের সিঁড়িতে।

"না, চের্‌মাশ্‌নিয়াতে গিয়ে কাজ নেই। সাতটার মধ্যে রেল স্টেশনে পৌঁছুতে পারব তো? তোমরা কী বল ভাই? দেরি হয়ে যাবে না তো?"

"ঠিক পৌঁছে যাব কর্তা। তাহলে ঘোড়া লাগাই?"

"লাগাও চটপট। তোমাদের মধ্যে কেউ কি কাল শহরে যাচ্ছে?"

"যাবে না কেন? এই ত মিস্ত্রিই যাচ্ছে।"

"ওহে মিস্ত্রি, তুমি কি আমার একটা উপকার করতে পারবে? একবার আমার বাবা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ কারামাজভের কাছে যেতে হবে, গিয়ে তাকে এই খবরটি জানাবে যে আমার চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাওয়া হল না। কী হল, পারবে তো?"

"যাব না কেন, একশ বার যাব। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে বহুকাল হল চিনি।"

"তাহলে এই নাও তোমার বক্‌শিশ, কেন না বাবার কাছ থেকে সম্ভবত কিছুই পাবে না", খুশি হয়ে হাসতে হাসতে বলল ইভান ফিয়োদরভিচ।

"আজ্ঞে, সে আর বলতে!" মিস্ত্রিও হেসে উঠল। 'আপনার মঙ্গল হোক হুজুর, আপনার হুকুম অবশ্যই তামিল করব।

সন্ধ্যা সাতটায় ইভান ফিয়োদরভিচ মস্কোগামী ট্রেনের এক কামরায় চেপে বসে মস্কো রওনা দিল। 'যাক, উড়ে যাক যা কিছু পুরাতন। অতীত জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক অবশ্যই চিরকালের জন্য চুকে গেল। তার কাছ কোনো সমাচার, কোনো প্রতিধ্বনি যেন আমার কাছে আর না আসে। সামনে নতুন জগৎ, নতুন নতুন দেশ আর পিছু ফিরে দেখা নয়!' কিন্তু কোথায় এতে উল্লসিত হবে, তা নয়, হঠাৎ তার সারাটা অন্তর জুড়ে নেমে এলো এমনই কালো অন্ধকার, এমনই গভীর বেদনায় মুচড়ে উঠল তার বুকের ভেতরটা যে সে রকম তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনও হয়নি। সারা রাত ধরে কত ভাবনা আর ভাবনা। ট্রেন উড়তে উড়তে চলেছে। সবে ভোর হয়ে এসেছে এমন সময় ট্রেন যখন মস্কোয় ঢুকছে, একমাত্র তখনই হঠাৎ যেন তার সংবিৎ ফিরে এলো।

"আমি একটা হতভাগা!" আপন মনে ফিসফিসিয়ে সে বলল।

এদিকে ছেলেকে বিদায় দিয়ে দিব্যি খোশ মেজাজে আছে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ। এর পর পুরো দু ঘণ্টা তার মনে হতে লাগল সে মোটামুটি সুখেই আছে। থেকে থেকে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে লাগল। তারপরই অতর্কিতে বাড়িতে সকলের পক্ষে নিদারুণ বিরক্তিকর ও রীতিমতো অপ্রীতিকর এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ মুহূর্তের মধ্যে একটা বড়ো রকমের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেল। স্মের্দিকোভ্ কেন যেন ভাঁড়ার ঘরে, বাড়ির তল কুঠুরিতে ঢুকেছিল, ঢুকতে গিয়ে সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপ থেকে উলটে নিচে পড়ে গেছে। ভালো বলতে হবে যে এই সময়টাতে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না বাড়ির উঠোনেই ছিল, তাই সময় মতো ওর আর্তনাদ শুনতে পায়। পড়াটা সে দেখতে পায়নি, তবে আর্তনাদটা তার কানে গিয়েছিল—বিশেষ এক ধরনের অদ্ভুত সেই আর্তনাদ, কিন্তু মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার বহুকালের চেনা—মূর্ছা যাবার সময় মৃগীরোগীর আর্তনাদ। যখন সিঁড়ির ধাপ বয়ে নীচে নামছিল সেই মুহূর্তে রোগের প্রকোপটা এসেছিল কি না—যা হলে অবশ্য তৎক্ষণাৎ হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার

কথা, না কি বরং তার রোগের আক্রমণটা হয়েছিল আচমকা পা ফসকে পড়ে গিয়ে ভেতরে ভেতরে আকস্মিক ধাক্কা খাওয়ার দরুন, যেটা স্মের্দিকোভের মতো মৃগী রোগীর ক্ষেত্রে একটা পরিচিত প্রবণতা—তা বোঝার কোনও উপায় ছিল না। দেখা গেল তলকুঠুরির ভেতরে মেঝের ওপর পড়ে সে ছটফট করছে, থেকে থেকে খিঁচুনি দিয়ে উঠছে, হাত পা ছুঁড়ছে, তার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি পড়ে গিয়ে হাত পা কিছু একটা ভেঙেছে, কিংবা কোথাও কোন চোট লেগেছে, কিন্তু দেখা গেল সেসব কিছু নয়। 'ভগবান রক্ষে করেছেন', মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না বলল। সে সব কিছু নয় বটে, কিন্তু তলকুঠুরি থেকে তাকে উদ্ধার করে পৃথিবীর আলোতে বের করে নিয়ে আসাটাই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। যা হোক পাড়াপড়শিদের ডেকে এনে তাদের সাহায্যে কোনো মতে সে কাজটা সারা হল। এই অনুষ্ঠানটির গোটাপর্বে স্বয়ং ফিয়োদর পাভ্‌লভিচও উপস্থিত ছিল, নিজেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল রীতিমতো ভীত ও বিপর্যস্ত। এদিকে রুগীর চেতনা ফিরে আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খিঁচুনি অবশ্য সময় সময় বন্ধ থাকছিল, কিন্তু থেকে থেকে আবার নতুন করে দেখা যাচ্ছিল। সকলে সিদ্ধান্ত করে বসল গত বছরও যখন সে, অসতর্ক ভাবে চিলেকোঠা থেকে পড়ে গিয়েছিল তখন যেমন হয়েছিল এবারেও অবস্থাটা তেমনি দাঁড়াবে। মনে পড়ে গেল সেই সময় ওর মাথার চাঁদিতে বরফ লাগানো হয়েছিল বটে। তলকুঠুরিতে খুঁজে পেতে এখনও কিছুটা বরফ পাওয়া গেল। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না তদারকি করতে লাগল। এদিকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ সন্ধে নাগাদ ডাক্তার হেরৎসেন্‌শ্টুবেকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাল। অনতিবিলম্বে ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটল। ডাক্তারটির বয়স অনেক হয়েছে। ছোটোখাটো চেহারার এই বৃদ্ধটি এখানকার পরম সম্মানিত ব্যক্তি, সারা তল্লাটের মধ্যে এর মতো এত যত্নবান ও মনোযোগী ডাক্তার আর দুটি হয় না। বেশ মনোযোগ দিয়ে রুগীকে পরীক্ষা করার পর তার সিদ্ধান্ত হল যে রোগের প্রকোপটা বড়োই বাড়াবাড়ি ধরনের, 'এমনকি বিপদের আশঙ্কা থাকলেও থাকতে পারে', কিন্তু তার মতো ডাক্তারও আপাতত সবটা বুঝতে পারছে না; তবে প্রতিকারের যে সমস্ত উপায় সে এখনকার মতো বাতলাল তাতে যদি কাজ না হয় তা হলে কাল সকালে তাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বাইরের বাড়িতে গ্রিগোরি ও মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না যেখানে থাকে তারই পাশের একটা ঘরে রোগীর শয্যা হল। এর পর সারা দিন ধরে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কপালে কেবল দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ। খাবার রান্না করেছে অগত্যা মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না। স্মের্দিকোভের রান্নার তুলনায় ঝোল যা হয়েছে তাকে 'বাসন ধোয়া জল' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, মুরগির মাংসটা এমনই শুকনো চচ্চড়ে যে তাতে দন্তস্ফুট করে সাধ্য কার! কর্তামশাই সঙ্গত কারণেই মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার ওপর তিরিক্ষি হয়ে খিঁচিয়ে উঠল। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না তাতে প্রতিবাদ করে জানাল যে মুরগিটা অমনিতেই

বড্ড বুড়ো ছিল, তা ছাড়া তালিম পাওয়া রাঁধুনিও সে নয়। সন্ধ্যার দিকে এসে জুটল আরেক ঝামেলা: ফিয়োদর পাভ্লভিচের কাছে খবর এলো এই নিয়ে তিন দিন হল ভোগার পর আজ কোমরের ব্যথায়, বলতে গেলে, একেবারে শয্যা নিয়েছে গ্রিগোরি। ফিয়োদর পাভ্লভিচ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চায়ের পাট শেষ করে একলা ঘরের মধ্যে কুলুপ এঁটে বসে রইল। ভয়ঙ্কর উত্তেজনাময় প্রতীক্ষা। ঘটনা এই যে ঠিক এই দিন সন্ধ্যাতেই গ্রুশেন্কার আগমন প্রায় নিশ্চিত জেনে তার জন্য সে অপেক্ষা করছে। অন্ততপক্ষে ভোরবেলাতেই স্মের্দিকোভ্ তাকে এক রকম আশ্বস্ত করে জানিয়েছিল 'উনি নিশ্চিত আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, হুজুর।' অশান্ত প্রতীক্ষায়, উদ্বেগে উত্তেজনায় বুড়োর বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করতে লাগল। শূন্য বাড়ির এ ঘর ও ঘর পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতে লাগল। কান খাড়া রাখতে হবে  বলা যায় না দ্মিত্রিটা হয়তো কোথা থেকে ওর ওপর নজর রাখছে। গ্রুশেন্কা অবশ্য দরজায় টোকা দেবে—স্মের্দিকোভ্ দু দিন আগেও ফিয়োদর পাভ্লভিচকে এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে কোথায় কী ভাবে টোকা দিতে হবে গ্রুশেন্কাকে সে তা জানিয়েছে। টোকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়ে ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাইরের বারান্দায় এক মুহূর্তও দাঁড় করিয়ে রাখা কোনও কাজের কথা হবে না  ভগবান না করুন, কখন কীসে ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়। ফিয়োদর পাভ্লভিচের পক্ষে এ এক ঝঞ্ঝাট বটে, কিন্তু এর আগে তার হৃদয় আর কখনও এমন সুমধুর প্রত্যাশায় এত বেশি আপ্লুত হয়ে ওঠেনি। এবারে সম্ভবত বলা যেতে পারে ও যে আসবে তা প্রায় নিশ্চিত!

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## রুশ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রসঙ্গে

### এক

### মহাস্থবির জোসিমা ও তাঁর দর্শনার্থী অতিথিরা

প্রবল উদ্বেগ ও বেদনাভারাক্রান্ত মন নিয়ে মহাস্থবিরের আশ্রম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল আলিয়োশা। ঘরে ঢুকেই কিন্তু বিস্ময়ে প্রায় থমকে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আশঙ্কা ছিল মৃত্যুপথযাত্রী এক রোগীকে দেখতে পাবে, এমনকি এতক্ষণে বুঝিবা তাঁকে সংজ্ঞাহীন নিশ্চল অবস্থাতেই দেখতে পাবে; কিন্তু তার বদলে হঠাৎ দেখতে পেল তিনি একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন। দুর্বলতার দরুণ তাঁর মুখে ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ লেগে আছে বটে, কিন্তু সেখানে একটা আনন্দ ও সজীবতার আভাও প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁকে ঘিরে আছে দর্শনার্থী অতিথিরা, তিনি মৃদুকণ্ঠে তাদের

সঙ্গে দিব্যি আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে বসেছেন আলিয়োশা আসার বড়জোর মিনিট পনেরো আগে। অতিথিরা অবশ্য তারও আগে থাকতে তাঁর আশ্রম-প্রকোষ্ঠে এসে জড় হয়েছিল, অপেক্ষা করছিল কখন তাঁর ঘুম ভাঙে। প্রভু পাইসি জোর দিয়ে তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে 'গুরুদেব নিঃসন্দেহে উঠে বসবেন। আজ সকালেই তিনি নিজের মুখে বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর পরম প্রিয়, ভক্তদের সঙ্গে অন্তত শেষবারের মতো আরও একবার কথা বলবেন।' মৃত্যুপথযাত্রী মহাস্থবিরের এই প্রতিশ্রুতিতে, বস্তুত তাঁর যে-কোনো কথাতেই প্রভু পাইসির অগাধ বিশ্বাস—বিশ্বাসটা এতই দৃঢ় যে মহাস্থবিরকে যদি তিনি অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় দেখতেন, এমনকি যদি দেখতে পেতেন যে তার নিশ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে, অথচ তিনি কথা দিয়ে গেছেন যে তাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার জন্য আরও একবার উঠে বসবেন, তাহলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না—হয়তো মহাস্থবির মারা গেলেও বিশ্বাস করতেন না, অপেক্ষা করে থাকতেন কখন মুমূর্ষু ব্যক্তিটির জ্ঞান ফিরে আসবে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। ভোরবেলায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার মুখে মহাস্থবির তাঁকে নিশ্চয় করে বলেছিলেন: 'আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়জনেরা, আরও একবার প্রাণভরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার তৃষ্ণা না মিটিয়ে, তোমরা, যারা আমার প্রিয়পাত্র, তাদের মুখের দিকে একবার না তাকিয়ে, আরও একবার তোমাদের সামনে আমার প্রাণের কথা উজার করে ঢেলে না দিয়ে আমি মারা যাচ্ছি না।' ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মহাস্থবিরের সম্ভবত এটাই সর্বশেষ আলাপ। সেই উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছে মহাস্থবিরের পরম অনুরক্ত তাঁর বহুকালের পুরানো বন্ধুজন। এঁরা চারজন। তাঁদের মধ্যে পুরোহিতব্রতধারী আশ্রমিক সাধু—সাধু পাইসি, সাধু ইওসিফ আর সাধু মিখাইল। সাধু মিখাইল এই আশ্রমের রক্ষক। খুব একটা বৃদ্ধ এখনও হননি, তেমন একটা পণ্ডিতও তাঁকে বলা যায় না। নিতান্ত সাধারণ বংশে জন্ম। তবে দৃঢ় ও অটল মনোবলের অধিকারী, সরল ধর্মবিশ্বাসী। বাইরে রুক্ষ, কিন্তু তার হৃদয় গভীর কোমল অনুভূতিতে আপ্লুত, যদিও অন্তরের সেই করুণা যেন তিনি গোপন রাখতে চান, এমনকি এর জন্য যেন তাঁর ভেতরে ভেতরে কেমন একটা কুণ্ঠাও আছে। চতুর্থ অতিথি অতি সাদাসিধে, ছোটোখাটো গড়নের এক সন্ন্যাসী—আশ্রমভ্রাতা আন্‌ফিম। অতি বৃদ্ধ। দীনতম কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। এমনকি অতি অল্প শিক্ষিতই তাকে বলা ভালো। স্বল্পবাক, শান্ত, কদাচিৎ কারও সঙ্গে কথা বলেন। নিরীহদের মধ্যেও অতি নিরীহ। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন বিরাট ও ভয়ঙ্কর এমন একটা কিছু তাঁকে চিরকাল ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখে দিয়েছে, যা তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। এই যে কেমন যেন ভয়ে থরথর এই মানুষটি, একেই কিন্তু মহাস্থবির জোসিমা অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সারা জীবন তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল এতই বিরল যে তত কম কথা বোধহয় পরিচিত আর কারও সঙ্গে তাঁর কখনও হয়নি, যদিও

এক সময় দুজনে একসঙ্গে বছরের পর বছর সারা রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মক্ষেত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে অনেক অনেক কাল আগেকার কথা, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মহাস্থবির জোসিমা যখন কস্ত্রমার এক স্বল্পখ্যাত দীন মঠে তাঁর সন্ন্যাস জীবন শুরু করেন, তখনকার কথা। কিছুকালের মধ্যেই সাধু আন্‌ফিম যখন তাঁদের কস্ত্রমার দীন দরিদ্র মঠের চাঁদা সংগ্রহের জন্য পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

পুরো দলটা—গৃহকর্তা এবং তাঁর অতিথিরাও—এখন রয়েছে মহাস্থবিরের দ্বিতীয় ঘরটিতে, যেখানে তাঁর শয্যা পাতা রয়েছে। এ ঘরের কথা আগেও বলা হয়েছে: বড়ো বেশি চাপাচাপি, এতই চাপাচাপি যে সামনের ঘর থেকে যে চারটি চেয়ার আনা হয়েছিল মহাস্থবিরের হাতলওয়ালা চেয়ারটার চারপাশে কোনোমতে সেগুলির স্থান হয়। এছাড়া দীক্ষার্থী পর্‌ফিরিও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে অবশ্য দাঁড়িয়েই ছিল।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ঘরের ভেতরে জ্বালানো বাতি আর সেই সঙ্গে উপাস্য দেবমূর্তিগুলির সামনে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

ঘরে ঢোকার মুখে, দোরগোড়ায় থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আলিয়োশা। এই অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন মহাস্থবির।

"এই তো তুমিও এসে গেছ। এসো বাবা এসো, শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলেটি আমার। আমি জানতাম তুমি আসবে।"

আলিয়োশা তাঁর সামনে গিয়ে আভূমি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলল। তার ভেতর থেকে কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, ভেতরে ভেতরে সে একটা শিহরন বোধ করল। তার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল।

"ছিঃ বাবা, এখনও আমার জন্য শোক করার মতো কিছু হয়নি," ডান হাতটা তার মাথার ওপর রেখে মহাস্থবির হেসে বললেন। "দেখছ, কেমন বসে আছি, দিব্যি কথাবার্তা বলছি, বলা যায় না, হয়তো আরও কুড়ি বছর বাঁচব। ভিশেগোরিয়ে থেকে সেই যে ভারি চমৎকার, ভালোমানুষ মা টি তার বাচ্চা মেয়ে লিজাভিয়েতাকে কোলে করে এসেছিল সে তো গতকাল আমার জন্য এটাই কামনা করেছিল। মা আর তার বাচ্চা মেয়ে লিজভিয়েতাকে স্মরণে রেখো হে করুণাময় প্রভু!" বলতে বলতে তিনি ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করলেন, তারপর পর্‌ফিরির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহে পর্‌ফিরি, ওর দান আমি যেখানে পৌঁছে দিতে বলেছিলাম সেখানে পৌঁছে দিয়েছ তো?"

গতকাল যে হাসিখুশি পল্লি-রমণীটি ভক্তিভরে যাটটি কোপেক চাঁদা তাঁর হাতে

তুলে দিয়ে বলেছিল 'আমার চাইতেও যে গরিব তাকে ওগুলো দান করবে বাবা'— সে কথা মনে পড়ে যেতে এটা তিনি বললেন। এক ধরনের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই দান, যার দায়িত্ব দাতা স্বেচ্ছায় নিজের ওপর তুলে নেয়, আর সেটাকে অতি অবশ্য নিজের শ্রমে উপার্জিত টাকায় হতে হবে। গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই পর্‌ফিরিকে ওই টাকা দিয়ে মহাস্থবির পাঠিয়েছিলেন ওই এলাকার এক মধ্যবিত্ত ঘরের সহায় সম্বলহীনা এক বিধবা মহিলার কাছে। বিধবাটির ঘর সম্প্রতি আগুনে পুড়ে গেছে, যার ফলে দু দুটো সন্তানকে নিয়ে তাকে পথে ভিক্ষায় নামতে হয়েছে। পর্‌ফিরি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল যে কাজ হয়ে গেছে 'অজানা উপকারী মহিলাটির' সেই টাকা মহাস্থবিরের নির্দেশমতো যথাস্থানে চলে গেছে।

"ওঠো বাবা ওঠো", আলিয়োশাকে মহাস্থবির বলতে লাগলেন। "দেখি দেখি, তোমার মুখটা একবার দেখি। বাড়ি গিয়েছিলে? দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

আলিয়োশা এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে উনি কী ভাবে এমন নিশ্চিত হয়ে, এত দৃঢ়তার সঙ্গে দাদাদের মধ্যে কেবল একজনের কথাই জিগ্‌গেস করছেন। কিন্তু কোন্ দাদা? তাহলে সম্ভবত সেই দাদাটির কথা ভেবেই মহাস্থবির গতকাল এবং আজকেও আলিয়োশাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

"দুই দাদার মধ্যে একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল", আলিয়োশা জবাব দিল।

"আমি গতকালের, তোমার সেই বড়ো দাদার কথা বলছি, যাকে আমি আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়েছিলাম।"

"তাকে শুধু গতকালই দেখেছিলাম, কিন্তু আজ কোনো মতে খুঁজে পাচ্ছি না", আলিয়োশা বলল।

"আর দেরি না করে এখনই খুঁজে বের কর। কাল আবার যাও। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি কর। এখনও সময় আছে, হয়তো ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ নিবারণ করতে পারবে। আমি গতকাল ওর কাছে যে মাথা নুইয়েছিলাম সেটা ভবিষ্যতে ওর কপালে যে প্রচণ্ড দুঃখ আছে সেই কথা ভেবেই করেছিলাম।"

একথা বলেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল কী যেন ভাবছেন। সাধু ইওসিফ গতকাল মহাস্থবিরের আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানানোর এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। সাধু পাইসির সঙ্গে তিনি মুখ চাওয়াচাউয়ি করলেন। আলিয়োশা আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

"আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার গুরু", অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সে বলে উঠল, "কিন্তু আপনার কথাগুলো বড়ো বেশি অস্পষ্ট। কী সেই দুঃখ যা ওর কপালে আছে?"

"প্রশ্ন কোরো না। গতকাল ওর মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখতে পেয়েছিলাম... মনে হয়েছিল গতকাল যেন ওর চোখের দৃষ্টিতে ওর ভবিষ্যতের পুরো ছবিটা ধরা পড়েছিল। এক সময় ওর দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যে

মানুষটা যে নিজের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটা আঁচ করতে পেরে মুহূর্তের মধ্যে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। দু একজন মানুষের চেহারায় এমন ভাব আমি জীবনে একবার কি দুবার দেখেছিলাম যার মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের সম্পূর্ণ চিত্রটা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, আর বলব কি, বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। আলেক্সেই, আমি যে তোমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম তার কারণ আমি ভেবেছিলাম ভাইয়ের মুখখানি ওকে সাহায্য করবে। কিন্তু সব তাঁর দান, আমাদের ভাগ্য বল, যা-ই বল, সবই আমাদের প্রভুর দান। ‘গমের বীজ ক্ষেত্রে পতিত হইলে উহার বিনাশ না ঘটিলে একাকী রহিয়া যায়; বিনাশ ঘটিলে তবেই প্রভুত ফল প্রসব করে।’* কথাটা মনে রেখো। আমি কিন্তু তোমার এই নির্মল মুখখানির জন্য আমার জীবনে মনে মনে অনেকবার তোমাকে আশীর্বাদ করেছি, আলেক্সেই। এটা জেনে রাখবে”, মৃদু হেসে মহাস্থবির বললেন। তোমার সম্পর্কে মনে মনে যেটা ভাবি সেটা এই মঠের এই প্রাচীরের বাইরে তুমি চলে যাবে, কিন্তু সংসারী হয়েও তুমি সাধু সন্ন্যেসির মতো কাটাবে। জীবনে তোমার প্রতিপক্ষ অনেক হবে, কিন্তু তোমার অতি বড়ো শত্রুও তোমাকে ভালোবাসবে। জীবনে অনেক দুর্ভাগ্য তোমার আসবে, কিন্তু সেগুলির মধ্যেই আবার তুমি তোমার সুখের সন্ধান পাবে, তুমি জীবনের মঙ্গল কামনা করবে, আর সবচাইতে বড়ো কথা হল, অপরকেও মঙ্গলকামনায় প্রবৃত্ত করবে। এই হল তোমার পরিচয়। আমার ভক্তিভাজন সাধুগণ ও শিক্ষকগণ”, মধুর হাসি হেসে সমবেত অতিথিদের দিকে ফিরে এবারে তিনি বললেন, “এই ছেলেটির মুখখানি আমার কেন এত প্রিয় আজ পর্যন্ত কোনো দিন আপনাদের বলিনি, এমনকি ওকেও বলিনি। আজ কিন্তু সে কথাই বলব ওর মুখখানি আমার মনের মধ্যে যেন একটা স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, আমার কাছে যেন একটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। আমার জীবনের উষালগ্নে, যখন আমি একেবারে ছোটো, তখন এক দাদা ছিল। কিশোর বয়সে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে আমার চোখের সামনে তার মৃত্যু হয়। পরে, জীবনের পথ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে আমার এই দাদাটি যেন আমার জীবনে ঊর্ধ্বলোক থেকে পূর্বনির্ধারিত কোনো এক নির্দেশের মতোই ছিল, যেহেতু আমার জীবনে যদি তার আবির্ভাব না ঘটত, তার যদি কোনো অস্তিত্বই না থাকত তাহলে হয়তো আমি কখনই—আমার অন্তত তা-ই মনে হয়—এই সংসারত্যাগীর ব্রত গ্রহণ করতাম না, এত বড়ো পথে পা বাড়াতাম না। আমার জীবনে তার প্রথম আবির্ভাবের ঘটনা ছিল আমার সেই শৈশবে, আজ এখন যখন আমি পথ পরিক্রমার অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি তখন আবার যেন নতুন করে তার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছি। আমার ভক্তিভাজন শিক্ষকগণ সাধুবৃন্দ এবং আমার

---

* উৎসর্গ ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্র.

সাধুভ্রাতারা, আশ্চর্যের ঘটনা এই যে দেখতে ততটা তার মতো না হয়ে তার চেহারার সঙ্গে সামান্য মাত্র মিল থাকা সত্ত্বেও আলেক্সেইয়ের মধ্যে তার সঙ্গে এত বেশি আধ্যাত্মিক মিল আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে ও যেন ঠিক সেই কিশোরটি, আমার সেই দাদা—যেন রহস্যজনকভাবে আমার পথযাত্রার শেষে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। এটা এমনই অলৌকিক যে আমার এই অদ্ভুত কল্পনাবিলাসে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। কী বলছি শুনছ পর্ফিরি?" মহাস্থবির তাঁর সেবাশুশ্রূষাকারী দীক্ষার্থী শিষ্যটির দিকে ফিরে বললেন। "তোমার মুখ দেখে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে আলেক্সইকে আমি তোমার চাইতে বেশি ভালোবাসি বলে তোমার মনে মনে যেন একটা ক্ষোভ আছে। এখন তুমি জানলে এর কারণ কী। তবে জেনে রেখো, আমি তোমাকেও ভালোবাসি, তোমার ওই ক্ষোভ দেখে আমি অনেক বার মনে দুঃখ পেয়েছি। আপনারা, যাঁরা আমার প্রিয় বন্ধু, তাঁদের আমি বলতে চাই সেই কিশোরের কথা, আমার সেই দাদার কথা, কারণ আমার জীবনে তার আবির্ভাবের মতো এত বেশি মূল্যবান, ভবিষ্যৎ তাৎপর্যপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী আর কিছু ঘটেনি। এই মুহূর্তে আমার হৃদয় গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে এবং আমি যেন তদ্‌গত চিত্তে আমার সমগ্র জীবনের কথা চিন্তা করতে করতে নতুন করে সেই জীবন যাপন করতে যাচ্ছি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মহাস্থবিরের জীবনের শেষ দিনে তাঁর দর্শনার্থী অতিথিদের সঙ্গে তাঁর এই শেষ আলোচনা অংশত লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মহাস্থবিরের মৃত্যুর কিছুকাল পর নিজের স্মৃতির ওপর নির্ভর করে কথাগুলি লিখে রেখেছিল আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কারামজভ্। কিন্তু এটা আগাগোড়া মহাস্থবিরের সেদিনকার আলোচনার অনুলিখন ছিল কিনা, না কি সে তার গুরুর আগেকার আরও সমস্ত আলোচনা থেকে তার লিপিবদ্ধ আরও কোনো কোনো বিবরণের অংশ এর সঙ্গে জুড়েছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই বিবরণীতে মহাস্থবিরের কথন যে রকম একটানা চলেছে তাতে মনে হতে পারে তিনি যেন তাঁর বন্ধুদের সামনে উপাখ্যানের আকারে তাঁর জীবনের বিবরণ দিয়েছিলেন; অথচ এর পরের যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ আমরা পাচ্ছি তা থেকে নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আসলে যা ঘটেছিল তা খানিকটা অন্যরকম। এর কারণ সেই সন্ধ্যার আলোচনাটা ছিল সাধারণ প্রকৃতির, আর অতিথিরা যদিও তাদের আমন্ত্রণকর্তার কথায় তেমন কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি, তবু এটা ঠিক যে তারাও তাদের তরফ থেকে কখনও সখনও দু চার কথা বলেছিল, তার কথার মাঝখানে যোগ দিয়েছিল, এমনকি হয়তো বা তাদের নিজস্ব কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, কোনো বিবরণও হয়তো দিয়েছিল। তা ছাড়া এক

নাগাড়ে এরকম বিবরণ দেওয়া মহাস্থবিরের পক্ষে সম্ভবও ছিল না, যেহেতু থেকে থেকে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল, তাঁর কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ছিল, এমন কি তাঁকে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতেও হচ্ছিল, যদিও তিনি ঘুমে ঢলে পড়ছিলেন এমন নয়, আর অতিথিরা যে স্থানত্যাগ করেছিল তাও নয়। মাঝখানে একবার কি দুবার সাধু পাইসি সুসমাচার থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেছিলেন, এর ফলেও আলোচনায় বাধা পড়েছিল। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারোই কিন্তু এমন ধারণা হয়নি যে ওই রাতেই মহাস্থবিরের মৃত্যু হবে। হয়নি আরও এই কারণে যে সেদিন গভীর দিবানিদ্রার পর যে বিশ্রাম তিনি পেয়েছিলেন তা যেন হঠাৎ তাঁকে নতুন শক্তি জুগিয়েছিল, যার ফলে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সান্ধ্য আলোচনা সম্ভব হয়েছিল। এ যেন ছিল তাঁর অন্তিম ভাবোচ্ছ্বাস যা তাঁর মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ওই অল্প সময়ের জন্য, কারণ এর পর অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর প্রাণস্পন্দন।

তবে সে প্রসঙ্গ পরে আসছে। এখন আমার যেটা নিবেদন তা এই যে আমার বিবেচনায়, আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে বরং আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কারামাজভ্ তার পাণ্ডুলিপিতে মহাস্থবির সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করেছে একান্ত ভাবে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই সমীচীন। তাতে বিষয়টা অনেকটা সংক্ষিপ্ত হবে, ততটা ক্লান্তিকরও হবে না; যদিও এটা ঠিকই—আবারও বলছি—আলিয়োশা আগেকার সমস্ত আলাপ-আলোচনা থেকেও অনেক কিছু তুলে এনে এখানে যোগ করেছে।

## দুই

## **কৈবল্যধামপ্রাপ্ত মহাপুরুষ মহাস্থবির জোসিমার জীবনকাহিনি থেকে তাঁর মুখ নিঃসৃত উক্তির আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ কারামাজভ্ কর্তৃক লিখিত সংকলন**

### *জীবনসংক্রান্ত তথ্য*

### ক) মহাস্থবির জোসিমার কিশোর বয়সি দাদার প্রসঙ্গে

আমার পরমপ্রিয় সাধু ও শিক্ষকবৃন্দ, উত্তরের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে, ভ. শহরে আমার জন্ম। পিতা অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন বটে, তবে নামডাক বা পদমর্যাদা কোনোটাই তাঁর বিশেষ ছিল না আমার বয়স যখন মাত্র দুবছর তখন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে আমার একেবারেই মনে পড়ে না। আমার বিধবা মাতৃদেবীর জন্য তিনি রেখে যান একটা ছোটোখাটো কাঠের বাড়ি আর কিছু পুঁজি— খুব একটা বড়ো না হলেও ছেলেপুলে নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট। আমার মার ছেলেপুলে

বলতে ছিলাম আমরা দুজন আমি জিনোভি আর আমার দাদা মার্কেল। দাদা ছিল আমার বছর আষ্টেকের বড়ো। রগচটা ও খিটখিটে স্বভাবের হলে কী হবে তার মনটা কিন্তু বেশ নরম ছিল। ঠাট্টা বিদ্রুপ করে কাউকে কোনো কথা বলত না। অত্যন্ত কম কথা বলত, বিশেষত অদ্ভুত এই যে বাড়িতেও— আমার বা মার সঙ্গে, অথবা ভৃত্যদের সঙ্গেও। পড়াশুনা করছিল উচ্চ বিদ্যালয়ে, বেশ ভালো ছিল পড়াশুনায়। তবে সহপাঠীদের সঙ্গে তার বনত না, যদিও তাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটিও সে করত না। তার সম্পর্কে অন্তত এরকম কথাই মার মুখে শুনেছি। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে, তার বয়স তখন সতেরো, আমাদের শহরের এক জায়গায় নিভৃতে বসবাসকারী একজন লোকের কাছে যাতায়াত করাটা তার নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা এক ধরনের রাজনৈতিক নজরবন্দি, স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের অপরাধে মস্কো থেকে নির্বাসনদণ্ড দিয়ে তাকে আমাদের শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নির্বাসনদণ্ডভোগীটি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিল—যেমন তেমন পন্ডিত নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে দার্শনিক হিসেবে তার রীতিমতো নামডাক ছিল। কেন, কে জানে মার্কেলকে তার ভালো লেগে যায়, তার ঘরে সে সব সময়ই ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানাত। আমার কিশোর দাদাটি সে বার গোটা শীতকালটাই সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা তার সঙ্গে বসে কাটিয়ে দিল। শেষকালে অবশ্য নির্বাসনদণ্ডভোগীটির নিজেরই অনুরোধে তাকে ফের সরকারি কাজে পেতের্বুর্গে ডেকে পাঠানো হল, যেহেতু সরকারি মহলেও তার পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না।

ইস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চল্লিশ দিনব্যাপী সংযম ব্রত পালনের পর্ব শুরু হয়ে গেল। এদিকে মার্কেল বলে বসল সে এই অনুষ্ঠান পালন করবে না। গালিগালাজ করে ধর্মের অনুশাসন হেসে উড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'যত সব প্রলাপ, ভগবান বলে কিছু নেই।' এ কথায় মা আঁতকে উঠলেন, সেই সঙ্গে বাড়ির চাকরবাকরও, এমনকি আমি যে অত ছোট—আমার অবস্থাও তাই। আমার বয়স যদিও তখন মোটে নয় বছর, আমিও ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম তার মুখে একথা শুনে। আমাদের চাকরবাকর বলতে ছিল চারজন। তারা সকলেই ভূমিদাস, আমাদের এক পরিচিত জমিদারের নামে তাদের কেনা হয়েছিল। আমার তখনও মনে আছে ওদের চারজনের মধ্যে একজন ছিল আমাদের রাঁধুনি আফিমিয়া—খোঁড়ামতন বয়স্থা মেয়েমানুষ—আমাদের মা ষাট রুবলে তাকে বেচে দিয়ে তার বদলে ভূমিদাস শ্রেণির বাইরের স্বাধীন বৃত্তিধারী এক চাকরকে বহাল করেছিল। তা সে যাই হোক, সংযমব্রত পালনের অনুষ্ঠান যখন ছয় সপ্তাহে পড়ল এমন সময় দাদার শারীরিক অবস্থার অবনতি হল। অমনিতেই সে ছিল চিরকাল রুগ্‌ণ। বুকের দোষ ছিল, গড়ন দুর্বল, যক্ষ্মারোগের প্রবণতাও ছিল। দৈর্ঘ্যে নেহাৎ ছোটোখাটো ছিল না, কিন্তু রোগা পাতলা, দুর্বলগোছের। তবে ভারি সৌম্যদর্শন ছিল। ঠাণ্ডা লেগেছিল কি না কে জানে। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার এসে দেখেই মা'র কানে কানে বললেন : দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ—

দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, বসন্তকালটা পার করতে পারবে না। মা কাঁদতে শুরু করল, পাছে দাদা ভয় পেয়ে যায় বিশেষত এই ভেবে মা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাকে মিনতি করে বলতে লাগল, এখনও খাড়া থাকতে থাকতে সে যেন শুদ্ধাচার পালন করে গির্জার উপাসনায় যোগ দেয় এবং শুদ্ধ মনে প্রসাদি সুরা ও রুটি মুখে ছুঁইয়ে ঈশ্বরের পরম পবিত্র রহস্যের মহিমা উপলব্ধি করে। একথা শুনে দাদা চটে উঠল, ঈশ্বরের ভজনালয়কে যা মুখে এলো তাই বলে এক চোট গালাগাল করল। তবে এটাও ঠিক যে সে চিন্তায় পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে তার অসুখটা মারাত্মক এবং এই কারণেই আপাতত যখন তার শক্তি আছে তখন, এই অবস্থায় গর্ভধারিণী মা তাকে শুদ্ধাচার পালন করে উপাসনায় যোগ দিতে বলছেন এবং প্রসাদি সুরা ও রুটি মুখে ছুঁইয়ে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করার জন্য গির্জায় পাঠাতে চাইছেন। প্রসঙ্গত, অমনিতে সে নিজেও জানত যে অনেক দিন থেকেই সে সুস্থ নেই। এই ঘটনার আরও বছরখানেক আগে এক দিন খাবার টেবিলে নিরাসক্ত কণ্ঠে আমাকে আর মাকে বলল 'পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে আমি আর বেশি দিন নেই। হয়তো আর এক বছরও বাঁচব না।' ঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর মতো ফলে গেল। তিন দিন পরে পুণ্য সপ্তাহ পড়ল। মঙ্গলবার সকাল থেকে দাদা শুদ্ধাচার পালন করতে লাগল, চিত্তশুদ্ধি ও প্রার্থনার জন্য গির্জায় গেল। মাকে সে বলল, 'এটা কিন্তু বিশেষ করে তোমার মুখ চেয়ে আমি করছি মা—তুমি খুশি হবে, মনে শান্তি পাবে বলে।' যুগপৎ আনন্দে ও দুঃখে মা কেঁদে ফেলল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'হঠাৎ যখন ওর মধ্যে অমন পরিবর্তন ঘটেছে তার মানে শেষ ঘনিয়ে এসেছে।' কিন্তু বেশি দিন আর ওকে গির্জায় যেতে হল না, একেবারে শয্যা নিল—ঘরে শুয়ে শুয়েই প্রার্থনা করত, পুরোহিতের কাছে স্বীকারোক্তি করত ও প্রসাদ গ্রহণ করত।

সে বছরের ইস্টার একটু দেরিতে এসেছিল। উজ্জ্বল, নির্মল, পুষ্পগন্ধে মাতোয়ারা ইস্টারের সেই দিনগুলি শুরু হল। আমার মনে আছে সে দিন সারা রাত ধরে দাদা কেশেছে, ভালোমতো ঘুমোতে পারেনি। সকালে অবশ্য সে রোজই পরিষ্কার জামাকাপড় পরে নরম গদিওয়ালা চেয়ারটাতে গিয়ে বসার চেষ্টা করবে। দাদার সেই চেহারাটা আমার ঠিক মনে আছে বসে আছে, শান্ত বিনম্র ভাব, মুখে প্রসন্ন হাসি। এত অসুস্থ, তবু হাসিখুশি আনন্দোচ্ছল। হঠাৎই এমন এক আশ্চর্য পরিবর্তন শুরু হয়েছে তার অন্তরলোকে, যেন মনের দিক থেকে সে আগাগোড়া পালটে গেছে! বুড়ি ধাইমা তার ঘরে ঢুকে বলল 'লক্ষ্মী সোনা আমার, ঘরের বিগ্রহের সামনে প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিই, কী বল?' আগে হলে জ্বালতে দিত না, এমনকি জ্বালা হলেও ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিত। এখন বললে, 'হ্যাঁ গো, জ্বাল, জ্বাল। আগে আমি একটা পাষণ্ড ছিলাম, তোমাকে জ্বালতে তখন বারণ করতাম। দেব্‌তার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে দেখে আনন্দ পাই, প্রার্থনা করি। তার

মানে একই ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তাই না?' ওর এই কথাগুলি আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হত। মা শুনে নিজের ঘরে গিয়ে কেঁদে আকুল। চোখমুখ মুছে হাসি-হাসি ভাব নিয়ে তবেই আবার ফিরে আসে ছেলের কাছে। দাদা বলত, 'মা মা গো, কেঁদো না মা। আরও অনেক দিন আমাকে বাঁচতে হবে, তোমাদের সঙ্গে থেকে এখনও অনেক আনন্দ করার বাকি আছে আমার। জীবন কতই না আনন্দের, খুশিতে আনন্দে কতই না ভরপুর!' 'ওরে বাছা আমার, কীসের অত আনন্দ তুই পাস, যখন দেখতে পাচ্ছি সারা রাত জ্বরে তোর গা পুড়ে যাচ্ছে, কেশে কেশে তোর বুক ফেটে যাচ্ছে!' উত্তরে দাদা বলত, 'কেঁদো না, জীবন একটা স্বর্গরাজ্য। আমরা সবাই স্বর্গরাজ্যে আছি, অথচ সেটা আমরা জানতে চাই না। কিন্তু জানতে যদি পারতাম তাহলে কালই সারা পৃথিবীটা স্বর্গরাজ্য হয়ে যেত।' কথাগুলি সে এমন অদ্ভুত ভাবে, এত দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বলত যে সকলে অবাক হয়ে যেত, ভাবে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে থাকত। চেনাপরিচিত লোকজন দেখা করতে এলে তাদের সে বলত, 'ওগো আমার প্রিয়জনেরা, তোমাদের ভালোবাসার যোগ্য হওয়ার মতো কী কাজটা আমি করেছি বল তো? আমার মতো লোককে ভালোবাসার কী আছে? এমন কী করে হল যে আগে তা জানতাম না এবং তোমাদের সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য দিইনি?' ভৃত্যরা তার ঘরে এলে তাদের প্রতি মুহূর্তে বলত 'ওরে আমার সোনারা, তোরা আমার অত সেবাশুশ্রূষা করছিস কেন? আমি কি তার যোগ্য? ঈশ্বরের যদি করুণা হত, যদি তিনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেন তা হলে আমি নিজেই তোদের সেবা করতাম, কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সেবা করবে—এটাই তো হওয়া উচিত।' মা এই কথা শুনে মাথা নাড়তেন, বলতেন 'ওরে বাছা আমার, তুই অসুস্থ বলেই অমন ধারা কথা বলছিস।' দাদা বলত, 'মা গো, তুমি আমার জীবনের আনন্দ। প্রভু-ভৃত্য বলে কিছু থাকবে না এ তো আর হতে পারে না। তা হোক, তাহলে আমিই না হয় বরং আমার ভৃত্যদেরও ভৃত্য হই—ওরা আমার যা আমি ওদের তা-ই হতে চাই। এ ছাড়া, মা গো, তোমাকে আরও বলি, আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রত্যেকের কাছে সর্বতো ভাবে অপরাধী—আর আমার অপরাধটা সবার চাইতে বেশি।' এমনও দেখা গেছে যে একথায় মা বাঁকা হাসি হেসেছে, চোখের জলের ফাঁকে ওইভাবেই হাসতে হাসতে বলেছে 'কীসে তুই সকলের কাছে সবার চাইতে বেশি অপরাধী হলি? দুনিয়ায় খুনে ডাকাতের অভাব আছে নাকি? তুই কী পাপটা করেছিস যে নিজেকে সবার চাইতে বেশি অপরাধী বলে ভাবছিস?' 'মা গো, গর্ভধারিণী মা জননী আমার', (সেই সময় হঠাৎ-হঠাৎ করে এরকম সব দরদভরা কথা বলতে শুরু করেছিল দাদা) 'আনন্দময়ী মা আমার, জেনে রাখ, যেটা সত্য তা হল প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে, সকলের জন্য এবং সব কিছুর জন্য অপরাধী। কী ভাবে তোমাকে বোঝাব জানি না, কিন্তু এটা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি, উপলব্ধি করে কষ্ট পাচ্ছি। এ কী করে সম্ভব হল

যে এত দিন আমরা জীবন কাটালাম, এত রাগ দ্বেষ প্রকাশ করলাম, তখন কিনা এর কিছুই বুঝতে পারলাম না?' এই ভাবে রোজ সকালে সে ঘুম থেকে জেগে উঠত। যত দিন যেতে লাগল তার সমস্ত মন প্রাণ যেন ততই বেশি করে প্রেমের মধুর উপলব্ধিতে ও আনন্দে পুলকিত ও বিগলিত হয়ে উঠতে লাগল। হয়তো ডাক্তার এসেছেন—ডাক্তার আমাদের আইজেন্‌শ্‌মিড নামে এক বৃদ্ধ জার্মান—দাদা তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্টা শুরু করে দিল 'তা, ডাক্তারবাবু, আপনি কী বলেন? এই পৃথিবীতে আরও একটা দিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে কি আমার?' 'একটা দিন কেন, আরও অনেক মাস, অনেক বছর বাঁচবেন।' 'বছর মাস এ সব দিয়ে কী হবে?' দাদা চেঁচিয়ে বলে ওঠে। 'দিন গুনেই বা কী হবে, যখন জীবনের সমস্ত সুখ জানার জন্য মানুষের পক্ষে একটা দিনই যথেষ্ট। আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা বল তো, কেন আমাদের এত ঝগড়াবিবাদ? কেন আমরা একে অন্যের সামনে অমন আত্মপ্রশংসা করি, অন্যের বিরুদ্ধে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখি? আমরা সোজা চলে যাই না কেন আমাদের সুন্দর প্রমোদোদ্যানটিতে, এসো না ঘুরে বেড়াই, হাসি খেলায় মাতি, একে অন্যের গুণগানে মুখর হই, একে অন্যকে ভালোবাসি, চুম্বন করি, আমাদের জীবনের মঙ্গল কামনা করি।' 'আপনার পুত্র এই পৃথিবীর বাস উঠিয়ে দিয়েছে', ডাক্তারকে বিদায় দেওয়ার জন্য মা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলে ডাক্তার তাকে বললেন। 'রোগ থেকে এখন সে পাগলামির কবলে গিয়ে পড়েছে।' ওর ঘরের জানলা খুললেই বাগান। আমাদের এই বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন, সেখানে বহুকালের পুরনো সব গাছ, গাছে গাছে ধরেছে বসন্তের নবীন মঞ্জরী। বসন্তের প্রথম পাখির দল উড়ে এসেছে, তারা ওর জানলার কাছে কিচিরমিচির করছে, কলতান ধরেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের ডেকে দাদা হঠাৎ তাদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে বলতে থাকে 'আনন্দের দূত, ঈশ্বরের দান পাখিরা, তোমরাও আমাকে ক্ষমা কোরো, কারণ তোমাদের কাছেও আমি পাপ করেছি।' এটা কিন্তু তখন আমাদের কারও কাছেই বোধগম্য হত না। এদিকে ও তখন আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করছে। আমাদের সে বলত 'হ্যাঁ এই গাছপালা এই পাখপাখালি, ওই সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ—এমনই সব ঐশ্বরিক মহিমা আমার চারপাশে ছিল, কিন্তু একা আমিই যাপন করছিলাম এক কলঙ্কের জীবন, একমাত্র আমিই এ সবের অমর্যাদা করেছি, এদের কোনো সৌন্দর্য কোনো মহত্ত্ব আমার একেবারে নজরে পড়েনি।' 'বেছে বেছে আর কত পাপ নিজের ওপর টেনে নিবি বল তো!' মা কাঁদতে কাঁদতে বলত। 'মা গো, আনন্দময়ী মা আমার, ভেবো না আমি দুঃখে কাঁদছি। এ আমার আনন্দের অশ্রু। আমার নিজেরই যে বড্ড ইচ্ছে করছে ওদের সামনে নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে। শুধু তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না, কারণ ওদের কী করে ভালোবাসতে হয় তাও আমি জানি নে। যদি আমি সকলের

কাছে পাপ করেও থাকি, তবু সকলের মার্জনা যদি আমি পেয়ে যাই, তাতেই তো স্বর্গীয় আনন্দ! এখন আমি স্বর্গে নেই তো কোথায় আছি?'

এছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল যা আমি মনে করতে পারছি না, আমার এই বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। মনে পড়ে, এক দিন দাদার ঘরে আমি একা গেছি। ওখানে তখন আর কেউ ছিল না। তখন সন্ধ্যা। তবে পরিষ্কার দিনের আলো আছে। সূর্য পাটে যেতে বসেছে, সূর্যের তির্যক কিরণে সারা ঘর আলোয় ঝলমল করছে। আমায় দেখতে পেয়ে দাদা হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। আমি এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতে দু হাতে আমার দু কাঁধ চেপে ধরে গভীর মমতায়, পরম স্নেহভরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটি কথাও না বলে এই ভাবে কেবল মিনিট খানেক চেয়ে রইল। তারপর আমায় ছেড়ে দিয়ে শুধু বলল 'এবারে যা, খেলা কর গে, আমার হয়ে জীবন উপভোগ কর গে।' আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে খেলতে চলে গেলাম। দাদা সেই যে আমাকে তার হয়ে জীবন উপভোগ করতে বলল, এর পর জীবনে কতবার যে তার সেই কথা মনে পড়ছে, মনে করে কতবারই না চোখের জল' ফেলেছি! আরও অনেক সব আশ্চর্যের ও চমৎকার চমৎকার কথা দাদা বলত, যা আমরা অবশ্য তখন বুঝতে পারতাম না। মারা গেল ইস্টারের পরের তৃতীয় সপ্তাহে। সজ্ঞানেই মারা গেল, যদিও কথা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আনন্দোচ্ছল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, দু চোখে খুশির ছটা, দৃষ্টি দিয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, আমাদের কাছে ডাকছে। এমনকি শহরেও লোকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলাবলি করতে লাগল। সেই সময় এসব আমার মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছিল ঠিকই, তবে ততটা নয়, যদিও তাকে যখন সমাধিস্থ করা হয়েছিল তখন আমি দারুণ ভাবে কেঁদেছিলাম। আমার বয়স তখন কম, শিশুই বলা যেতে পারে আমাকে, কিন্তু এসব আমার মনের মধ্যে এমন এক ছাপ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল যা কখনও মুছে যাবার নয়, মনের গভীরে সংগোপনে এমন এক উপলব্ধি হয়ে থেকে যায় যা সময় হলেই সাড়া দিয়ে উঠে আসে। ঠিক তা-ই ঘটল।

## খ) সাধু জোসিমার জীবনে পবিত্র ধর্মশাস্ত্র

রয়ে গেলাম আমরা দুজন—আমি আর আমার মা। দাদার মৃত্যুর পর পর আমাদের সৎপরামর্শদাতা পরিচিত জনেরা আমাকে পেতের্বুর্গে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন মাকে। তাঁদের কথা হল 'এখন তোমাদের এই একটিই সন্তান। তোমরা গরীব নও, পুঁজি তোমাদের আছে। এক্ষেত্রে আর দশটা মা-বাবা যা করে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে

তুমিই বা কেন তোমার ছেলেকে পেতের্বুর্গে পাঠাও না? বলা তো যায় না, হয়তো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা সম্ভাবনা ওর ছিল, কিন্তু ওকে এখানে রেখে দিয়ে তুমি তা মাটি করে দিচ্ছ।' মাকে তাঁরা খুব করে বোঝালেন যে আমাকে পেতের্বুর্গে অভিজাত শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ সামরিক বিদ্যালয়ে[১৪] পাঠানো সমীচীন হবে, যাতে ভবিষ্যতে আমি রাজকীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারি। একমাত্র সম্বল, শেষ সন্তানকে ছেড়ে কী ভাবে থাকবেন এই ভেবে মা দীর্ঘকাল ইতস্তত করতে থাকেন, কিন্তু শেষকালে ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনস্থির করে ফেললেন, যদিও চোখের জলও কম ফেললেন না। তিনি নিজে আমাকে পেতের্বুর্গে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেলেন। তারপর আমি আর কখনও তাঁকে দেখিনি, কারণ বছর তিনেক পরে তিনি নিজেই মারা গেলেন। ওই তিনটি বছর তাঁর দুই সন্তানের শোকে দুঃখে তিনি কণ্টকিত হয়ে ছিলেন।

আমি আমার পিতৃগৃহ থেকে কিছু সুমধুর স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি, কারণ পিতৃগৃহে মানুষের প্রথম শৈশবের যে স্মৃতি তার চেয়ে মধুর স্মৃতি আর কিছু হতে পারে না। প্রায় সব সময়ই তাই—এমনকি পরিবারে যদি অন্তত ছিটেফোঁটা ভালোবাসা এবং এতটুকু মিলমিশও থাকে। তাছাড়া অতি নিকৃষ্ট পরিবার থেকেও মধুর স্মৃতি থেকে যেতে পারে আর সেটা সম্ভব একমাত্র তখনই যখন মানুষের নিজের মন সেই মাধুর্যকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা রাখে। সংসার জীবনের স্মৃতির মধ্যে আরও যেটা গণনা করতে হয় তা হল পবিত্র ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত কাহিনির স্মৃতি। আমি যদিও তখন নেহাৎ শিশু, কিন্তু পিতৃগৃহে থাকতে সে সব কাহিনি জানতে আমার ভারি কৌতূহল হত। সেই সময় আমার একটা প্রিয় বই ছিল নানা ধর্মকাহিনির বই, তার পাতায় পাতায় চমৎকার সব ছবি। বইটার নাম 'পুরাতন ও নতুন নিয়ম হইতে সংকলিত একশত চারিটি ধর্মকাহিনি'। ওটা দিয়েই আমি পড়তে শিখেছিলাম। বইটা এখনও আমার কাছে এখানে, আমার বইয়ের তাকে আছে, অতীতের মহামূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রক্ষা করে আসছি। কিন্তু যখন আমি পড়তে শিখেছি তারও আগে, আমার মনে আছে, এক ধরনের ভক্তিভাবের প্রেরণা আমি প্রথম লাভ করি যখন আমার বয়স মাত্র আট বছর। ইস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সপ্তাহের সোমবার দিন সকালের উপাসনার জন্য মা আমাকে প্রভুর ভজনালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাদা তখন কোথায় ছিল মনে করতে পারছি না। পরিষ্কার দিনটি। আমার এখনও মনে আছে, ঠিক যেন আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ধূপদানি থেকে ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়া ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। এদিকে মাথার ওপরে গম্বুজের তলাকার ছোট্ট একফালি কাচের জানলা ভেদ করে আমাদের ওপর ঝরে পড়ছে ঈশ্বরের দান সূর্যকিরণ, আর সেই আলোকবন্যার পানে উঠতে উঠতে সুগন্ধী ধোঁয়ার তরঙ্গমালা যেন তারই মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তদ্‌গতচিত্তে আমি সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

তখনই—জীবনে এই প্রথম সচেতন ভাবে আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করলাম ভগবদ্‌কথার বীজমন্ত্র। মস্তবড় একটা বই হাতে উপাসনাগৃহের মাঝখানে এসে দাঁড়াল এক কিশোর। বইটা এত বড়ো যে আমার তখন এমনও মনে হয়েছিল কিশোরটি যেন কষ্টে সৃষ্টে সেটা বয়ে নিয়ে এলো। যাজকীয় ভাষণ ও উপদেশাবলী পাঠের খাড়া উঁচু ডেস্কের ওপর বইটা রেখে পাতা উলটে সে পড়তে শুরু করে দিল। তখনই হঠাৎ, জীবনে সেই প্রথম মনে হল আমি কিছু যেন একটা বুঝতে পারছি, উপাসনালয়ে যা পড়া হয়ে থাকে জীবনে প্রথম তার মর্মোদ্ধার করতে পারছি। উজ্ দেশে এক সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু লোকের বাস ছিল। অতুল বৈভবের অধিকারী তার কত যে উট, কত মেষ আর কত গর্দভই না ছিল! তার পুত্ররা আমোদফুর্তি করে দিন কাটাত। বাপ তাদের খুব ভালোবাসত, তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত, তার মনে হত আমোদপ্রমোদে মত্ত থেকে তারা হয়ত পাপ করছে। তা এক দিন ঈশ্বরের পুত্রদের সঙ্গে সঙ্গে শয়তানও ঈশ্বরের কাছে এলো। প্রভুকে সে জানাল যে মর্ত্যলোকের সর্বত্র এবং পাতালও ঘুরে এসেছে। ঈশ্বর তাকে জিগ্‌গেস করলেন, ‘আমার দাস যোবের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?’ এই বলে ঈশ্বর তাঁর মহাপুণ্যবান দাসকে দেখিয়ে শয়তানের কাছে তার প্রশংসা করলেন। ঈশ্বরের কথায় ক্রূর হাসি হেসে শয়তান বলল, ‘ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে তোমার ওই দাসটি তোমার বিরুদ্ধে কেমন গুঞ্জন করছে, কী পরিমাণ শাপশাপান্ত করছে তোমার নামে। ঈশ্বর তাঁর এত প্রিয়, সত্যনিষ্ঠ এই মানুষটিকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দিলেন। শয়তানের কোপে পড়ে যোবের সব ক’টি সন্তান গেল, তার পশুপাল গেল, তার ধনসম্পদ সব ছারখার হয়ে গেল। সবই হল অকস্মাৎ। যেন আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো দৈবদুর্বিপাক। যোব তখন তার গাত্রবস্ত্র পরিহার করে মাটিতে আছড়ে পড়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ‘মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই ফিরে যাব মৃত্তিকা গর্ভে। ঈশ্বর দিয়েছিলেন, ঈশ্বরই ফিরিয়ে নিলেন। হে প্রভু, ধন্য হোক চিরতরে পুণ্য তব নাম!’ সাধু ও শিক্ষকবৃন্দ, আমাকে আজকের এই চোখের জলের জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যদি চোখের জল ফেলে থাকি তার কারণ আমার সামনে আবার যেন পরিপূর্ণ রূপে উঠে এসেছে আমার ছেলেবেলার সেই দিনটি, আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন ওঠানামা করছে সেই তখনকার আট বছরের বাচ্চা ছেলেটির বুকের পাঁজর, সেদিনের মতোই আজও আমি বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ছি, অভিভূত হয়ে পড়ছি। তাছাড়া আরও যা যা সেদিন আমার কল্পনারাজ্য জুড়ে বসেছিল!—সেই উটের দল, সেই যে শয়তান, যে ঈশ্বরের সঙ্গে অমনভাবে কথা বলেছিল, সেই ঈশ্বর, যিনি তাঁর দাসানুদাসকে বিনাশের মুখে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁর সেই দাসানুদাস যে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিল ‘তুমি আমাকে শাস্তি দিলেও, হে প্রভু, তবু বলি, ধন্য হোক, পুণ্য তব নাম’, আর তারপর দেবালয়ের সেই

মৃদুকণ্ঠের সুমধুর ভজন 'পূর্ণ কর দয়াময়, মম নিবেদন', তারপর আবারও পুরোহিতের ধূপদানি থেকে সুগন্ধী ধুনোর ধোঁয়া উদ্‌গীরণ, আর সমবেত ভক্তজনের নতজানু হয়ে প্রার্থনা! তখন থেকে, যখনই আমি বইটা হাতে নিয়ে পড়তে গিয়েছি— এমনকি গতকালও হাতে নিয়েছিলাম—চোখের জল না ফেলে কখনই পড়তে পারিনি এই পরম পবিত্র আখ্যানটি। কত কি মহান, রহস্যময় কত কি যে এর মধ্যে নিহিত আছে তা অকল্পনীয়! পরে কুকথায় ওস্তাদ ঠাট্টাবিদ্রুপকারীদের মুখে কত কথাই না শুনেছি, কত অহঙ্কার করেই না তারা বলেছে এটা কেমন কথা হল যে প্রভু তাঁর অত প্রিয় একজন সাধুপুরুষকে, তাঁর অমন একনিষ্ঠ ভক্তকে শয়তানের মর্জির ওপর ছেড়ে দিলেন? কী বলে তিনি শয়তানকে সেই মানুষটির সন্তানদের ছিনিয়ে নিতেন, তাকে রোগগ্রস্ত করে এমনই বিষাক্ত ক্ষতে তার সর্বাঙ্গ জর্জরিত করতে দিলেন যে সে বেচারিকে খাপরা দিয়ে শরীরের ঘায়ের পুঁজরক্ত সাফ করতে হত? কেন তিনি এত সব কাণ্ড করতে গেলেন? 'আমার সাধুপুরুষ ভক্ত আমার খাতিরে কী না সহ্য করতে পারে দেখলে তো!'— এরকম একটা ভাব করে স্রেফ শয়তানের সামনে নিজেকে জাহির করা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে এর পিছনে? কিন্তু এর মাহাত্ম্য এখানেই যে এর মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য নিহিত আছে এখানে একই সূত্রে ধরা পড়েছে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী রূপ আর চিরন্তন সত্য। পার্থিব সত্যের মুখে সংঘটিত হয় চিরন্তন সত্যের কর্মপ্রয়াস। এখানে সৃষ্টির সেই প্রথম দিনগুলির মতোই সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি দিন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তারিফ করে বলেন 'আমি যা সৃষ্টি করেছি তা কিন্তু বেশ।' বলে তিনি যোবের দিকে তাকান, তারপর আবার তাঁর নিজের সৃষ্টির তারিফ করেন। এদিকে প্রভুর প্রশংসা করে জোব যে শুধু তাঁরই সেবা করছে তা নয়, ঈশ্বরের যা কিছু সৃষ্টি, বংশপরম্পরায়, যুগযুগান্তরে তারই সেবায় নিযুক্ত থাকবে, কারণ এটাই তার বিধিলিপি। হে প্রভু, কী অসাধারণ গ্রন্থ, কী গভীর তত্ত্বকথা! আহা, কী কথাই না লেখা আছে এই পবিত্র গ্রন্থে! কী অলৌকিক, কী আশ্চর্য শক্তিই না মানুষ তা থেকে আহরণ করতে পারে! এ যে বিশ্বজগতের, মানুষের, সমগ্র মানব-চরিত্রের ছাঁচে ঢালা এক প্রতিমূর্তি। সবেরই উল্লেখ আছে, যুগযুগান্তরের জন্য সব কিছুর নির্দেশ আছে এর মধ্যে! কত রহস্যেরই না সমাধান ও উদ্‌ঘাটন এতে আছে! ঈশ্বর আবার জোবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, ফিরিয়ে দিলেন তার ধনসম্পদ। তারপর আবার বহু বছর কেটে গেল, নতুন সন্তান সন্ততি পেল যোব। যাদের পেল তারা অন্য। ঈশ্বরের কৃপায়, যোব তাদের ভালোবাসে। মনে হতে পারে কী করে সে এই নতুনদের ভালোবাসতে পারে যখন তার আগের সন্তানরা আর নেই, যখন তাদের সে হারিয়েছে? এই নবজাতকরা তার যত আদরেরই হোক না কেন, আগেকার সন্তানদের কথা মনে হলে তার পক্ষে সেই আগের মতো পরিপূর্ণ সুখী হওয়া কি সম্ভব? কিন্তু না, সম্ভব বৈ কি, খুবই সম্ভব! মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্য এই যে পুরাতন শোক ক্রমে স্নিগ্ধ কোমল আনন্দে স্তিমিত হয়ে আসে,

যৌবনের উত্তপ্ত রক্তের চাঞ্চল্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসে, নেমে আসে শান্ত সমাহিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বার্ধক্য। আজও আমি প্রতিদিন প্রভাতের সূর্যোদয়কে সাদরে বরণ করি, আমার হৃদয় তাকে দেখে গীত মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকাল আমি বেশি ভালোবাসি সূর্যাস্তকে। অস্তগামী সূর্যের তেরছা হয়ে পড়া কিরণের দীর্ঘ রেখা শান্ত স্নিগ্ধ কোমল কত স্মৃতি, আমার এত কালের দীর্ঘ ও আশীর্বাদ-ধন্য এই জীবনের কত মধুর ভাবমূর্তিই না জাগিয়ে তোলে আমার মনে! আবার এই সমস্ত কিছুকেই ছাপিয়ে ওঠে ঈশ্বরের সেই চিরন্তন সত্য যা কারুণ্যে ক্ষমায় আর তিতিক্ষায় মনকে আপ্লুত করে তোলে! আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি দিন আমি অনুভব করছি আমার এই পার্থিব জীবন যেন ইতিমধ্যেই সান্নিধ্য লাভ করতে চলেছে এক নতুন জীবনের, যে জীবন অনন্ত অজ্ঞেয়, কিন্তু যার আসন্ন আগমনের পূর্বাভাসে আমার মন পরম পুলকিত, পরম আলোকে উদ্ভাসিত আমার অন্তর, আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত আমার হৃদয়।...

আমার বন্ধুবর্গ ও আচার্যবৃন্দ, একাধিকবার আমার কানে এসেছে এবং এখন, সম্প্রতি আরও বেশি করে কানে আসছে যে ঈশ্বরের সেবাইত আমাদের পুরোহিতরা, বিশেষত আমাদের পল্লী অঞ্চলের পুরোহিতরা তাঁদের ভরণপোষণ বাবদ সাহায্যের স্বল্পতা এবং চরম অবহেলিত অবস্থার কথা বলে সাশ্রুনয়নে সর্বত্র অনুযোগ করে বেড়াচ্ছেন, এমনকি ছাপার অক্ষরে সোজাসুজি প্রকাশ করছেন—আমি নিজে পড়েছি—ভরণপোষণের পরিমাণের স্বল্পতার দরুন ইদানীং তাঁরা আর জনসমক্ষে ধর্মকথা প্রচার করতে পারছেন না, তাই ল্যুটারপন্থী বা ধর্মদ্রোহী যারাই আসুক না কেন, তারা যদি মেষপাল ছিনিয়েও নিতে থাকে তো কিছু করার নেই, কারণ সেই একই কথা—ভরণপোষণের পরিমাণ বড়ো কম। হা ঈশ্বর! আমি মনে মনে ভাবি, ভরণপোষণের প্রশ্নটাই যদি তাঁদের কাছে এত মূল্যবান হয়, ঈশ্বর না হয় তা বাড়িয়েই দিন, যেহেতু তাঁদের অভিযোগও যুক্তিসঙ্গত বটে! কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এই ব্যাপারে দোষ যদি কারও থাকে তার অর্ধেক কিন্তু আমাদের নিজেদের! কারণ, মানলাম, সময় তাঁর নেই, মানলাম তাঁর এই অভিযোগও সত্যি যে নানা কাজ আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের চাপে তিনি সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু সময় একেবারে নেই একথা মানা যায় না। ঈশ্বরকে স্মরণ করার জন্য সারা সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একটি ঘণ্টা সময় তো পাওয়াই যেতে পারে। তা ছাড়া এমনও নয় যে তাঁকে বছরের বারো মাস কাজ করতে হচ্ছে। সপ্তাহে অন্তত একবার সন্ধ্যাবেলায় কোনো এক সময় তিনি তাঁর নিজের জায়গায় লোকজনের জমায়েত করুন না কেন— প্রথম না হয় শিশুদের জমায়েত দিয়েই শুরু করলেন—বাবাদের কানে গেলে পরে তারাও আসতে থাকবে। এর জন্য কোনো অট্টালিকা তোলার তো দরকার নেই— নিজের কুটিরেই তাদের ডাকা যায়। কুটির নোংরা হওয়ারও

কোনো ভয় নেই, কেন না স্রেফ এক ঘণ্টার মামলা। এবারে আপনার শ্রোতাদের সামনে এই গ্রন্থটা খুলে ধরুন, বড়ো বড়ো জ্ঞানের কথা না বলে, নিজেকে জাহির না করে, তাদের ওপরে ওঠার চেষ্টা না করে বিনম্র ও তদ্গত চিত্তে পড়তে শুরু করুন। আপনি যে ওদের পড়ে শোনাচ্ছেন এবং ওরাও যে আপনার কথা শুনছে, শুনে বুঝতে পারছে এর জন্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ুন, পাঠের কথাগুলিকে নিজেও ভালোবাসতে শিখুন; শুধু এখানে ওখানে দু একটি কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য না হলে মাঝেমধ্যে থেমে ব্যাখ্যা করুন। কোনো চিন্তা নেই—তারা সব বুঝতে পারবে, আমাদের সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের হৃদয় সে সব উপলব্ধি করতে পারবে। ওদের পড়ে শোনান আব্রাহাম আর সারা'র কথা, ইসাক আর রেবেকার কথা, ইয়াকবের সেই কাহিনি যেখানে ইয়াকব লাবানে গিয়ে স্বপ্নে প্রভুর সঙ্গে কুস্তি লড়ার পর বলেছিল 'কী ভয়ঙ্কর এই স্থান!'—সাধারণ ভক্ত মানুষজনের মন এতে মুগ্ধ হবে। ওদের পড়ে শোনান, বিশেষত ছোটোদের পড়ে শোনান স্বপ্নদ্রষ্টা ও দিব্যবক্তা মহাপুরুষ যোসেফের কাহিনি, যেখানে যোসেফ নামে মিষ্টি চেহারার কিশোরটিকে তারই সহোদর ভ্রাতারা দাসব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়ে তার রক্তমাখা জামাকাপড় বাড়িতে নিয়ে এসে বাপকে দেখিয়ে মিথ্যে করে বলেছিল যে তার ছেলেকে বন্যজন্তুতে ছিন্নভিন্ন করে মেরে ফেলেছে। তাদের পড়ে শোনান, পরে কেমন করে ঘটনাচক্রে যোসেফের ভাইদের শস্যের সন্ধানে আসতে হয়েছিল ইজিপ্ট দেশে, যেখানে তাদের ভাই যোসেফ ইতিমধ্যে রীতিমতো প্রভাবশালী সভাসদ। তার ভাইরা তাকে চিনতে পারল না। এদিকে যোসেফ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাদের ওপর অত্যাচার চালাল, ভাই বেন্‌নামিনকে আটকে রেখে দিল। অথচ এই এতকাল সে কিন্তু তার ভাইদের ভালোও বেসে এসেছে। 'আমি তোমাদের ভালোবাসি এবং ভালোবেসেই তোমাদের উৎপীড়ন করছি।' কারণ সেই যে কোন উত্তপ্ত তৃণপ্রান্তরে কোনো এক ইঁদারার ধারে তাকে ওরা ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দিয়েছিল, তখন সে যে হাতে পায়ে ধরে, কেঁদে কেটে কত কাকুতি মিনতি করে ভাইদের বলেছিল তারা যেন বিদেশ বিভুঁইয়ে তাকে ক্রীতদাস করে বেচে না দেয়—সারা জীবন ধরে, ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, সে তা স্মরণ করে এসেছে। এখন এত বছর বাদে সেই তাদেরই দেখতে পেয়ে কিন্তু আবার তাদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় তার মন উথলে উঠল। তাদের সে ভালোবাসল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কষ্ট দিতে এবং নাকাল করতেও ছাড়ল না। শেষকালে এক সময় নিজেই নিজের হৃদয়ের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে তাদের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল, নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। পরে চোখমুখ মুছে বেরিয়ে এসে উৎফুল্ল ও উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তাদের জানাল 'ভাই, তোমরা আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের ভাই যোসেফ!' এর পর আরও পড়ে শোনান বৃদ্ধ ইয়াকবের আনন্দের কথা। ইয়াকব যখন জানতে

পারল তার আদরের দুলাল বেঁচে আছে তখন তার ভারি আনন্দ হল, ওই বৃদ্ধ বয়সেও নিজের দেশ ছেড়ে ইজিপ্ট চলে গেল। ভিন দেশেই তার মৃত্যু হল। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে চিরকালের জন্য এমন এক সুমহান ভবিষ্যতের কথা সে উচ্চারণ করল যা সে তার শান্ত ভীরু হৃদয়ের মধ্যে সারা জীবন সংগোপনে ধারণ করে আসছিল। সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে তার বংশধর যুদা জগতে বিপুল আশা আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করবে, সে-ই হবে জগতের শান্তিদাতা, তার পরিত্রাতা। সাধুগণ ও শিক্ষকগণ, যা আপনারা অনেক কাল হল জানেন এবং আমার চেয়ে শত গুণ নৈপুণ্যসহকারে, সুচারুরূপে উলটে আমাকেই শেখাতে পারেন, একটা বাচ্চা ছেলের মতো আমি যে আপনাদের সামনে তাই নিয়ে বকবক করছি সে জন্য আমার ওপর রাগ করবেন না, আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। এ নেহাৎই আমার মনের উচ্ছ্বাস, তাই আমার চোখে যদি জল এসে থাকে সে জন্যও ক্ষমা করবেন, কারণ এই গ্রন্থটি আমি ভালোবাসি। ঈশ্বরের পূজারি, পুরোহিত মহাশয়ও না হয় কাঁদুন, তিনি তাহলে দেখতে পাবেন যে তার প্রত্যুত্তরে তাঁর শ্রোতাদের হৃদয়ও অনুরূপভাবে নাড়া দিচ্ছে। যা দরকার তা শুধু একটি ছোটো, একরত্তি বীজ সাধারণ মানুষের মনের জমিতে একবার ফেলে দিলেই হল—সে বীজের যদি বিনাশ না ঘটে তাহলে তা সারা জীবনের মতো তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকবে, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, তার পাপ যখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে সেই অবস্থাতেও মহৎ কিছু একটা মনে করিয়ে দেবার মতো এক সমুজ্জ্বল আলোকবিন্দু হয়ে তার মনের গহনে লুকিয়ে থাকবে। বড়ো রকমের কোনো ব্যাখ্যার বা শেখানোর কোনো দরকার নেই, লোকে সহজেই সব বুঝতে পারবে। আপনাদের কি মনে হয় সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না? একবার চেষ্টা করেই দেখুন না, এরপর তাদের পড়ে শোনান না[১৫] পরমা সুন্দরী গ্রন্থের আর দাম্ভিক ভাশ্‌তির মর্মস্পর্শী, আবেগমথিত কাহিনি, নয়ত তিমিগর্ভে নিপতিত ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ যোনার অপূর্ব আখ্যান[১৬]! আমাদের প্রভুর নীতিকাহিনিগুলোর কথাও ভুলে যাবেন না, বিশেষত বেছে নিন সন্ত লুক লিখিত সুসমাচার থেকে—আমি যেটা করেছিলাম—তারপর ধরবেন ঈশ্বরপ্রেরিত প্রচারকবৃন্দের কীর্তিকাহিনি[১৭] থেকে সায়ুল্-এর ধর্মান্তরগ্রহণপ্রসঙ্গ[১৮] এটা অবশ্যই, অতি অবশ্য পড়ে শোনাবেন; অবশেষে 'সন্তকাহিনি' থেকে—আর কিছু না হোক অন্তত ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ আলেক্সেইয়ের জীবনকাহিনি এবং ঈশ্বরদ্রষ্টা ও খ্রিস্টগতপ্রাণা, মাতৃরূপিণী, ইজিপ্টদেশীয় যে মহীয়সী মেরি, যিনি হাসিমুখে শহিদত্ব বরণ করেছিলেন তাঁর জীবন কথা—এই রকম সব সাধারণ আখ্যান সহজেই তাদের অন্তর স্পর্শ করবে। মোটে তো সপ্তাহে এক ঘণ্টা। ভরণপোষণের পরিমাণ কম ঠিকই, কিন্তু তা হলেও মাত্র তো একটি ঘণ্টা। নিজেই দেখতে পাবেন আমাদের লোকজন কত সদয়, কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ। যা পেয়েছে প্রতিদানে কৃতজ্ঞচিত্তে তার শতগুণ ফিরিয়ে দেবে। পুরোহিতের ভক্তির উচ্ছ্বাস আর তাঁর আবেগমথিত কথাগুলি স্মরণ করে তারা স্বেচ্ছায় তাঁর

খেতের কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে, ঘরগৃহস্থালির কাজেও তাঁকে সাহায্য করবে, আগের চেয়েও অনেক বেশি সম্মানও তাঁকে দেবে—এই তো এখানেই তো বেড়ে গেল তাঁর ভরণপোষণের পরিমাণ! বিষয়টা এতই সাধারণ যে অনেক সময় সে ভাবে খুলে বলতেই ভরসা হয় না—ভয় হয় পাছে লোকে হাসে। অথচ এসব কতই না সত্য! যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে কখনও ঈশ্বরের সন্তান মানুষদেরও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তানদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে সে তাঁর পবিত্রতাও প্রত্যক্ষ করবে— এমনকি এর আগে পর্যন্ত আদৌ যদি তাতে তার কোনো বিশ্বাস নাও থাকে। আমাদের দেশের যারা নিরীশ্বরবাদী, যারা স্বদেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, একমাত্র দেশের জনসাধারণ আর তাদের ভাবী অধ্যাত্মশক্তিই সেই মানুষগুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তা ছাড়া দৃষ্টান্তই যদি স্থাপন না করা গেল তা হলে খ্রিস্টের বাণীর কী অর্থ হতে পারে? ঈশ্বরের বাণী ব্যতিরেকে মানুষ বিনষ্ট, যেহেতু মানুষের অন্তরাত্মা সেই মহতী বাণীর জন্য, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু গ্রহণীয় তার জন্য তৃষিত হয়ে থাকে।

অনেক দিন আগে, আজ থেকে সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা—তখন আমার যুবা বয়স—মঠের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাধু আন্‌ফিমের সঙ্গে আমি রাশিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই সময় একবার নৌচলাচলের উপযোগী এক বড়ো নদীর ধারে জেলেদের কুটিরে আমাদের রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। জেলেদের সঙ্গে একটি সুদর্শন কিশোরও এসে বসেছিল। চাষি পরিবারের ছেলে, দেখে মনে হয় বছর আঠারো বয়স। তাকে কালই তাড়াতাড়ি করে ফিরে যেতে হবে তার নিজের জায়গায়—এক ব্যাপারীর সওদার নৌকো গুণ টেনে নিয়ে যেতে হবে। তার দিকে তাকাতে দেখতে গেলাম স্নিগ্ধ কোমল উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে চেয়ে আছে। জুলাই মাসের উষ্ণ উজ্জ্বল শান্ত রাত্রি। প্রশস্ত নদীবক্ষ থেকে কুয়াশার বাষ্প উঠে আমাদের শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও সখনও দু একটা মাছের মৃদু ছলাত্ ছলাত্ শব্দ। পাখিদের সাড়াশব্দ নেই। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ সুগম্ভীর। বিশ্বচরাচর যেন ধ্যানমগ্ন। শুধু আমার আর ওই ছেলেটার—আমাদের দুজনের চোখে ঘুম নেই। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগতের সৌন্দর্য আর তার নিগূঢ় রহস্যের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। প্রতিটি তৃণ, প্রতিটি কীটপতঙ্গ, পিপড়ে, সোনালি মৌমাছি—বুদ্ধিবৃত্তি বলতে যা বোঝায় তা এদের কারোরই নেই, অথচ কেমন আশ্চর্যজনক ভাবে তারা তাদের যাত্রাপথ ঠিক জানে। নিরন্তর রহস্যজনক কাজ সম্পাদন করে তারাই তো ঈশ্বরের রহস্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে! আমি দেখলাম, এসব কথায় আমার সঙ্গী মিষ্টি ছেলেটার মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। সে আমাকে জানাল যে সে অরণ্যকে ভালোবাসে, অরণ্যের পশুখাখিকে ভালোবাসে। আসলে সে বনে

জঙ্গলে পাখি ধরে বেড়াত। প্রতিটি পাখির ডাক তার চেনা, যে কোনো পাখিকে সে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলতে পারে। সে বলল, 'বনে আমার যেমন ভালো লাগে তার চেয়ে ভালো আর কোথাও লাগে না! তবে হ্যাঁ, সবই ভালো।' আমি তাকে উত্তরে বললাম, 'বাস্তবিকই। সব ভালো, সবই চমৎকার, কারণ সবের মধ্যে নিহিত আছে সত্য। এই ঘোড়াকেই দেখ না। মহৎ জীব। মানুষের কাছাকাছি, তার পাশে পাশে আছে; নয়তো ধর না কেন একটা বলদ—মানুষের কাজ করে দিচ্ছে, তার খাদ্য জোগাচ্ছে—কেমন যেন মনমরা আর আনমনা তাকে দেখতে; একবার তাকিয়ে দেখ ওদের মুখের দিকে; একবার তাকিয়ে দেখ ওদের মুখের দিকে কেমন বিনম্র ভাব আর মানুষের কেমন বাধ্য বল তো। মানুষ তাকে অনেক সময়ই নির্দয় ভাবে প্রহার করে, অথচ কী কোমলতা, কী পরিমাণ বিশ্বস্ততা আর কী সৌন্দর্যই না প্রকাশ পাচ্ছে তার চেহারায়! এমন কি এটা জেনেও অভিভূত হতে হয় যে এই পশুদের মধ্যে কোনো পাপ নেই, কারণ ঈশ্বরের সব সৃষ্টি পরিপূর্ণ—সব—তাদের কারও মধ্যে কোনো পাপ নেই—কেবল মানুষ বাদে। আর খ্রিস্ট আমাদের কাছে আমারও আগে ওদের সঙ্গেই ছিলেন।' 'বলেন কী!' কিশোর শুধোল। 'খ্রিস্টও ওদের সঙ্গে আছেন বলছেন?' 'এর অন্যথা হতে পারে না', আমি তাকে বলি, 'কারণ তাঁর বাণী—সে তো সকলেরই জন্য। সমস্ত সৃষ্টি, সকল প্রাণী, প্রতিটি কিশলয় তো তাঁর সেই বাণীর জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে, তাঁর বন্দনা গাইছে, খ্রিস্টের জন্য কাঁদছে, তাদের নিজেদের নিষ্পাপ জীবনের রহস্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের অগোচরেই একাজ তারা সম্পন্ন করছে। এই দেখ না আমি ওকে বলি, 'একটা ভয়ঙ্কর ভালুক বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভীষণ, ভয়াল, হিংস্র, কিন্তু তাতে তাকে কোনোমতে দোষ দেওয়া যায় না।' তারপর আমি ওকে একটা ঘটনার উল্লেখ করলাম। এক সন্ন্যাসীপ্রবর যখন বনের ভেতরে একটা ছোট্ট কুঠিরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন সময় সেখানে এক ভালুকের আবির্ভাব ঘটল। ভালুকটাকে দেখে সন্ন্যাসীপ্রবরের মনে করুণার উদ্রেক হল। তিনি এতটুকু ভয় না করে বেরিয়ে এসে তাকে এক টুকরো রুটি দিয়ে বললেন 'যা, তোর জায়গায় চলে যা। খ্রিস্ট তোর সহায় হোন।' হিংস্র জন্তুটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার বাধ্য হয়ে বিনীতভাবে সরে গেল, তাঁর কোনো ক্ষতি সে করল না। সে যে কোনো ক্ষতি না করে চলে গেল এবং খ্রিস্ট যে তার সঙ্গেও আছেন এই শুনে কিশোরটির মনও গলে গেল। সে ভাবের আবেগে বলে উঠল, 'আহা, কী ভালো! ঈশ্বরের সব কিছুই কী ভালো, কী চমৎকার!' শান্ত মধুর ভাবাবেশে মগ্ন হয়ে সে বসে রইল। দেখতে দেখতে এক সময় আমারই পাশে নিষ্পাপ নিরুদ্বেগ ঘুমে ঢলে পড়ল। হে প্রভু, যৌবন তোমার আশীর্বাদধন্য হোক! এরপর আমি নিজেও ঘুমিয়ে পড়লাম। নিদ্রা যাবার আগে তার জন্য প্রার্থনা করলাম। হে প্রভু, তোমার শান্তি তোমার আলো সর্বভূতে সঞ্চার কর!

## গ) মহাস্থবির জোসিমার পূর্বাশ্রমের কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি।

### দ্বন্দ্বযুদ্ধ

পেতের্বুর্গে সামরিক শিক্ষানবিশ বিদ্যালয়ে আমার দীর্ঘকাল কেটেছিল। প্রায় আট বছর। সেখানকার শিক্ষার নতুন পরিবেশে আমার শৈশবের অনেক ভাব চাপা পড়ে গেল, যদিও আমি কিছুই ভুলিনি। আগেকার সমস্ত অনুভূতির বদলে এত সব নতুন নতুন অভ্যাস এমনকি মতামতও গ্রহণ করে ফেললাম যে আমি প্রায় বুনো বর্বর, নিষ্ঠুর ও অদ্ভুত একটা জীবে পরিণত হলাম। ফরাসি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উঁচু মহলের আচার ব্যবহার ও শিষ্টতার বাহ্য চাকচিক্য আমি রপ্ত করলাম। এদিকে কোর্-এ যে সমস্ত সাধারণ সৈন্য আমাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল তাদের আমরা সকলে একেবারে গোরুভেড়া বলে গণ্য করতাম—আমিও বাদ ছিলাম না। শুধু তা-ই নয়, আমি হয়তো এ ব্যাপারে আমার সঙ্গীসাথীদের মধ্যে সবার চাইতে এক কাঠি ওপরেই ছিলাম, যেহেতু তাদের সকলের তুলনায় আমার গ্রহণক্ষমতাটাও একটু বেশি ছিল। আমরা যখন অফিসার হয়ে বেরিয়ে এলাম তখন আমরা আমাদের নিজের নিজের রেজিমেণ্টের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত। কিন্তু আসল সম্মান কাকে বলে তা আমাদের কেউই প্রায় জানত না, আর কেউ যদি জানতে পারতও তাহলে সবার আগে সে নিজেই হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে হেসে উড়িয়ে দিত। মদ্যপান, ব্যভিচার আর বেপরোয়াভাব—এ ছিল আমাদের প্রায় গর্ব করার মতো বস্তু। এমন কথা বলব না যে আমরা খারাপ ছিলাম! এই যুবকদের সবাই ভালো ছিল, কিন্তু তাদের আচরণ ভালো ছিল না, তাদের মধ্যে আবার আমিই ছিলাম চূড়ান্ত অভব্য। আসলে পৈতৃক সূত্রে বেশ কিছু অর্থ আমার হাতে এসে গিয়েছিল, তাই যৌবনের লাগাম-ছাড়া উদ্দীপনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। খোলা হাওয়ায় পাল উড়িয়ে দিয়ে আমি ভেসে পড়লাম, বিলাসে গা ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তখনও কিন্তু আমি বই পড়তাম—এমনকি বই পড়ে খুব আনন্দও পেতাম। তবে বাইবেলই একমাত্র গ্রন্থ যা সেই সময় আমি প্রায় খুলেই দেখিনি, যদিও গ্রন্থটি আমি কখনও হাতছাড়া করতাম না, সর্বত্র সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াতাম। বাস্তবিকই যত্ন করে রেখেছিলাম, কিন্তু 'একদিনের জন্য বলুন, কোনো এক প্রহরের জন্য বলুন মাসের বা বছরের কোনো এক সময়ের জন্যই বলুন' নিজে আমি কখনও এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। এই ভাবে বছর চারেক চাকরি করার পর আমাদের রেজিমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে শেষ কালে আমিও বদলি হয়ে চলে এলাম 'ক' শহরে। শহরের বিত্তশালী সমাজ, বিচিত্র ধরনের অসংখ্য লোকজনের আনাগোনা সেখানে, অতিথি আপ্যায়ন, আমোদ ফুর্তি লেগেই আছে।

সর্বত্রই আমি সাদরে গৃহীত হলাম, কারণ অমনিতে জন্ম থেকে আমি হাসিখুশি স্বভাবের, পরন্তু আমি যে গরিব নই এটাও কারও অবিদিত নয়। সমাজের উঁচু মহলে এর মূল্য অবশ্যই নেহাৎ কম নয়। ঠিক এখানেই এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল যেখান থেকে আমার পরবর্তী জীবনের সমস্ত কিছুর সূচনা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক বুদ্ধিমতী ও গুণবতী এবং উজ্জ্বল ও সৎ চরিত্রের সুন্দরী কন্যার প্রতি আমি আসক্ত হয়ে পড়লাম। হেলাফেলা করার মতো পরিবার নয়, যেমন বিত্তশালী, তেমনি সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিও তাঁদের কম নেই। তাঁরা সব সময় খুশি হয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনাও জানাতেন। আমার মনে হল মেয়েটি যেন মনেপ্রাণে আমাকেই কামনা করছে। এই মনে করে আমার হৃদয়ও উদ্দীপিত হয়ে উঠল। পরে অবশ্য আমি নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, মনে মনে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে ওর প্রতি আমার ভালোবাসা আদৌ তেমন প্রবল নয় এবং যাকে আমি ভালোবাসা বলে মনে করছি সেটা আসলে ওর উন্নত চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৈ আর কিছু নয়—যা না করে উপায়ও ছিল না। সে যা-ই হোক, সেই সময় আমি যে তার পাণিপ্রার্থনা করতে পারিনি তার কারণ আমার আত্মাভিমান। এত কম বয়সে, উপরন্তু এত টাকাকড়ি থাকতে স্বাধীন, বাধাবন্ধনহারা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রলোভন ছেড়ে দিতে হবে ভাবতেই মনটা মুষড়ে পড়ল, ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। আকারে ইঙ্গিতে আমি আমার মনোভাব অবশ্য প্রকাশ করেছিলাম। যা-ই হোক না কেন অন্তত কিছুকালের জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে আমি বিরত থাকলাম। এমন সময় হঠাৎ দু মাসের জন্য আমাকে অন্য এক জেলায় কাজে চলে যেতে হল। দু মাস বাদে ফিরে এসে হঠাৎ জানতে পারলাম মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে শহরের উপকণ্ঠস্থ এক ধনী জমিদারের সঙ্গে। স্বামীটি আমার চাইতে বেশ কয়েক বছরের বড়ো হলেও এখনও যুবক। রাজধানী পেতির্বুর্গে তার ভালো যোগাযোগ আছে, এবং সমাজের উঁচু মহলেই আছে, যেটা আমার নেই। অতি সজ্জন, তদুপরি সুশিক্ষিত। এই শিক্ষাটাই আবার আমার একেবারে নেই। এই আকস্মিক ঘটনায় আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়লাম যে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি তখনই যা জানতে পারলাম তা এই যে মেয়েটি বহুদিন থেকে এই যুবক জমিদারটির বাগ্‌দত্তা ছিল। ওদের বাড়িতে তাকে আমি নিজেও বহুবার দেখেছি, কিন্তু নিজের গুণপনা সম্পর্কে আমার এমনই একটা অন্ধ ধারণা ছিল যে কিছুই আমার নজরে পড়েনি। এটাই কিন্তু আমার মনে বেশি করে আঘাত করল। এটা কেমন হল যে সকলে জানত অথচ একা আমিই কিছু জানতাম না? হঠাৎ একটা দুর্বিষহ ক্রোধ আমাকে পেয়ে বসল। আমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। আমি মনে করতে শুরু করলাম কতবার আমি তার প্রতি আমার অনুরাগ একরকম প্রকাশ করে ফেলেছি, কিন্তু যেহেতু সে আমাকে কিছু বলেনি, আমাকে বাধা দেবার বা সতর্ক করে দেবার

কোনো চেষ্টা করেনি, আমি সিদ্ধান্ত করলাম, তার মানে এই যে সে মনে মনে আমাকে নিয়ে হেসেছে। পরে অবশ্য ভেবে দেখেছিলাম এবং আমার মনেও পড়ে গিয়েছিল যে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করা তো দূরের কথা, বরং সে এ ধরনের কথাবার্তা হাসিঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছে, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছে। কিন্তু এখন সে কথা আমার মনে এলো না, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলতে লাগলাম। আমি এই মনে করে অবাক হয়ে যাই যে আমার এই ক্রোধ বা প্রতিহিংসাগ্রহণের এই প্রবৃত্তি আমার একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ, আমার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক, কারণ আমি হালকা স্বভাবের মানুষ, কারও ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারি নে; তাই অনেকটা যেন কৃত্রিম উপায়ে নিজেই নিজেকে উস্‌কে দিলাম, আর তাতে আমার অবস্থাটা শেষকালে অদ্ভুত ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল।

আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। একবার সমাজের গণ্যমান্য লোকজনের সমক্ষে এক বড়ো আসরে হঠাৎই আমার 'প্রতিদ্বন্দ্বীকে' অপমান করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কারণটা একেবারে অবান্তর—কারণ না বলে অছিলা বলাই ভালো। তখনকার দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা—১৮২৬ সালের ঘটনা[১১] নিয়ে — ভদ্রলোকের একটি মতের উল্লেখ করে আমি তাকে বিদ্রূপ করলাম। লোকে বলে, আমার সেই ঠাট্টাটা নাকি বেশ সরস ও জুতসই হয়েছিল। তারপর ভদ্রলোকের কাছ থেকে এর একটা কৈফিয়ত আদায় করার জন্য ঝোলাঝুলি করতে গিয়ে আমার অভদ্রতা এতটা মাত্রাছাড়া হয়ে পড়ল যে আমি তাকে আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে আহ্বান জানালাম। আমার চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করলেন, যদিও আমাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট, কারণ আমি বয়সে তাঁর চেয়ে ছোটো, তাঁর তুলনায় আমি নগণ্য এবং পদমর্যাদায়ও ছোটো। পরে আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি যে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন সেটা আসলে তার দিক থেকে আমার প্রতি কতকটা ঈর্ষাবশত। আগেও, মেয়েটি যখন তাঁর বাগ্‌দত্তা ছিল তখন থেকেই, তাকে নিয়ে আমার প্রতি তাঁর এক ধরনের ঈর্ষা ছিল। ভদ্রলোক ভাবলেন এখন যদি তিনি মুখ বুজে আমার কাছ থেকে অপমান সহ্য করে যান, যদি ডুয়েলে নামতে মনস্থ না করেন, আর তাঁর স্ত্রী যদি তা জানতে পারে তাহলে সে তাঁকে অবজ্ঞার চোখে না দেখে পারবে না এবং তার ভালোবাসার মধ্যেও দ্বিধার ভাব দেখা দিতে পারে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের একজন সহকারীকেও অচিরেই খুঁজে বার করলাম—আমার বন্ধুস্থানীয় এক অফিসার, আমাদেরই রেজিমেন্টের একজন লেফটেনান্ট। যখনকার কথা বলছি সেই সময় ডুয়েল লড়ার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সেনা মহলে এ ধরনের ডুয়েল লড়া কতকটা যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা নৃশংস কুসংস্কারকে বাড়তে দিলে অনেক সময় তা যে কতদূর দৃঢ়মূল ও প্রসারিত হতে পারে এতেই তা প্রমাণিত হয়।

জুন মাস শেষ হয়ে এলো। আগামীকালই আমরা মুখোমুখি হব। শহরের বাইরে

কোনো এক জায়গায় সকাল সাতটায় আমাদের লড়াই হবে। ঠিক এই সময় আমার জীবনে সত্যি-সত্যি এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যাকে বোধহয় নিয়তি-নির্ধারিত বলাই ভালো। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার মনমেজাজ বেজায় খারাপ ও তিরিক্ষি হয়ে আছে। আমি আমার আর্দালি আফানাসির ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়লাম। অকারণে আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এমন প্রচণ্ড ভাবে তার মুখে দু দুবার ঘুষি মারলাম যে তার সারা মুখটা রক্তে ভেসে গেল। বেশি দিন হল সে আমার কাছে কাজ করছিল না। এর আগেও যে তাকে মারিনি তা নয়, তবে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস ভাবে কখনও মারিনি। আমার প্রিয়জনেরা, আপনারা বিশ্বাস করবেন কি, সেই থেকে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও সে কথা মনে হতে আমি লজ্জায় যন্ত্রণায় মরে যাই।

শুতে গেলাম। ঘণ্টা তিনেক ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠলাম, ততক্ষণে দিন শুরু হয়ে গেছে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, আর ঘুমানোর ইচ্ছে ছিল না। জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম, জানলা খুলে দিলাম। খুলতেই বাগান। দেখি পূব আকাশে সূর্য উঠছে চারদিকে সুন্দরের সমারোহ, উষ্ণতার আমেজ, পাখিদের কলকাকলি। আমি মনে মনে ভাবি, কিন্তু এ কী হল, ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা লজ্জা, কীসের যেন একটা গ্লানি আমার অন্তরকে ছেয়ে ফেলছে কেন? খুন ঝরাতে যাচ্ছি—এই কারণে কি? এই কারণে কি যে আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি, খুন হয়ে যেতে পারি বলে ভয় পাচ্ছি? উঁহু, তা নয়, একেবারেই তা নয়। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, হঠাৎ আমি ধরতে পারলাম আসল ব্যাপারটা কী ওই যে গতকাল সন্ধ্যায় আফানাসিকে বেধড়ক মেরেছিলাম না! গোটা দৃশ্যটা হঠাৎ আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, যেন নতুন করে তার পুনরাবৃত্তি হল: বেচারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি সপাটে সোজা তার মুখে ঘুষি মারলাম। লোকটা অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে দু হাত দুদিকে ঝুলিয়ে, মাথা সোজা রেখে চোখ বড়ো বড়ো করে দাঁড়িয়ে রইল—যেমন তাকে শেখানো হয়েছিল ফ্রন্টে। একেকটি আঘাত পড়ছে আর আঁতকে উঠছে। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য হাতদুটো উঁচু করবে সেটুকু সাহস পর্যন্ত তার নেই। একটা মানুষের কিনা এই হাল করে ছাড়া হয়েছে, আর একটা মানুষ কিনা আরেকটি মানুষকে এই ভাবে প্রহার করছে! কী সাঙ্ঘাতিক অপরাধ! একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচ যেন আমার বুকের ভেতরটা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়ে চলে গেল। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার মতো অবস্থা হল, আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদিকে বাইরে দিব্যি সূর্য কিরণ দিচ্ছে, কিশলয় আনন্দে ঝিলমিল করছে, আর পাখিরা—আহা, তারা সব ঈশ্বরের বন্দনায় মেতে উঠেছে!... আমি দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে অসংযত কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল আমার দাদা মার্কেলকে, মৃত্যুর আগে ভৃত্যদের উদ্দেশে তার কথাগুলো ‘ওরে আমার সোনারা, তোরা আমার অত সেবাশুশ্রূষা

করছিস কেন? আমাকে অমন ভালোবাসিস কেন বল তো? আমি কি তোদের সেবা পাবার যোগ্য?' 'আমি কি তার যোগ্য?' হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল। সত্যিই তো আমার কী এমন যোগ্যতা আছে যে আমারই মতন ঈশ্বরের প্রতিরূপ মনুষ্যদেহধারী আরেকজন আমার সেবা করতে যাবে? তখনই জীবনে এই প্রথম এই প্রশ্নটি আমার চেতনায় গাঁথা হয়ে গেল। সে বলেছিল 'মা গো, গর্ভধারিণী মা জননী আমার, যেটা সত্য তা হল প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে, সকলের জন্য এবং সব কিছুর জন্য অপরাধী। শুধু লোকে এটা জানে না—এই আর কি। যদি জানত তাহলে এখনই সারা পৃথিবীটা স্বর্গরাজ্য হয়ে যেত!' চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি ভাবি 'হা ঈশ্বর, এটাও কি মিথ্যে হতে পারে না কি? সকলের সব কিছুর জন্য আমি হয়তো সত্যি সত্যি সবার চাইতে বেশি অপরাধী এবং এই পৃথিবীতে নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম লোক!' সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক চরম সত্য। এ আমি কী করতে চলেছি? একজন বুদ্ধিমান, সদাশয় ভদ্র ব্যক্তি যে আমার কাছে কোনো অপরাধেই অপরাধী নয় তাকে হত্যা করতে আর তার সহধর্মিণীকে সারা জীবনের মতো সুখ থেকে বঞ্চিত করে তাকেও যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলতে চলেছি! এই ভাবে আমি বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম, লক্ষই করলাম না কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল। এমন সময় আবির্ভাব ঘটল আমার ডুয়েলের সহকারী লেফটেনাণ্ট বন্ধুটির। আমাকেই ডাকতে এসেছে। সঙ্গে পিস্তল নিয়ে এসেছে। বলল, 'বাঃ চমৎকার! ঘুম ভেঙেছে দেখছি। তা হলে আর কি, চল, আর দেরি নয়।' আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম, কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সে যাই হোক গাড়িতে উঠব বলে আমরা বেরিয়ে এলাম। এমন সময় আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, এখানে একটু দাঁড়াও, টাকার ব্যাগটা ভুলে ফেলে এসেছি। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আসছি।' একাই তাড়াতাড়ি ফের বাড়ির মধ্যে ঢুকে সোজা আফানাসির ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তাকে বললাম, 'ওরে আফানাসি, কাল আমি দু বার তোর মুখে বাড়ি মেরেছিলাম। তুই আমাকে ক্ষমা কর।' আমার কথায় সে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে আঁতকে উঠল, আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমি দেখলাম, এটা কম হল, খুবই কম হল, তাই যেমন অফিসারের ধড়াচুড়ো পরে ছিলাম সেই অবস্থাতেই ধপ করে তার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লাম। 'আমাকে ক্ষমা কর!' আমি বললাম। লোকটা এবারে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। 'হুজুর, মালিক, আপনি আমার মনিব! এ কী করছেন!... আমি কি এর যোগ্য? ' বলতে বলতে ঠিক আমি যেমন এই কিছুক্ষণ আগে কেঁদেছিলাম তেমনি হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিল। আমিও দৌড়ে আমার সঙ্গীর কাছে ফিরে এসে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। চেঁচিয়ে

তাকে বললাম, 'চালাও, কোথায় যাবে চল! দেখে রাখ ভায়া, বিজয়ী বলে যদি কেউ থাকে, সে তোমার এই চোখের সামনে!' আমি তখন এতই উত্তেজিত যে সারা রাস্তা অবিরাম হাসি ঠাট্টা আর বক বক করে চললাম। কী কথা বলেছিলাম তা অবশ্য মনে নেই! আমার ফুর্তি দেখে আমার বন্ধুটি আমার দিকে চেয়ে বলল, 'বাহবা ভাই, শাবাশ বলতে হবে। এই ইউনিফর্মের মর্যাদা তুমি রাখতে পারবে দেখছি।'

নির্ধারিত জায়গায় আমরা পৌঁছে গেলাম। এসে দেখি প্রতিদ্বন্দ্বী তার সহকারীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। মাঝে বারো পার ব্যবধান রেখে আমাদের দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। প্রথম গুলি করার পালা আমার প্রতিপক্ষের। আমি হাসিমুখে সরাসরি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে ঠিক জানি কী আমি করব। ভদ্রলোক গুলি ছুড়লেন, গুলিটা গালে সামান্য আঁচড় দিয়ে কান ছুঁয়ে চলে গেল মাত্র। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কোনো নরহত্যা ঘটে নি!' বলেই কিন্তু আমি আমার নিজের পিস্তলটা আঁকড়ে ধরলাম, তারপর পিছনে ফিরে গিয়ে শূন্যে পাক মেরে সেটা জঙ্গলের ভেতরে ছুড়ে ফেলে দিলাম। চেঁচিয়ে বললাম 'ওটাই তোর গতি!' প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ফিরে বললাম 'মাননীয় মহাশয়, এই নির্বোধ যুবকের অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে অপমান করেছি সে আমার নিজের দোষে। তারপর এখন আবার আমার গায়ে গুলি ছুড়তেও আপনাকে বাধ্য করেছি। আমি নিজেই আসলে একটা বাজে লোক, আপনার চাইতে দশগুণ, এমনকি হয়তো বা আরও বেশিই খারাপ। আমার এই কথাটা জানিয়ে দেবেন আপনার সেই তাঁকে, যিনি পৃথিবীতে আপনার পরম প্রিয়পাত্রী।' আমি এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত তিনজনেই হাঁ-হাঁ করে উঠল! আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো রীতিমতো রেগে গেলেন। বললেন, 'মাফ করবেন, আমার কথা হল, লড়তে যদি না-ই চান তাহলে বিরক্ত করতে গেলেন কেন?' উত্তরে উৎফুল্ল হয়ে আমি বললাম 'গতকাল পর্যন্ত আমি মূর্খ ছিলাম, আজ খানিকটা বুদ্ধিমান হয়েছি।' তিনি বললেন, 'গতকালের কথা যদি বলেন সেটা বিশ্বাস করছি, কিন্তু আজকের ব্যাপারে যা বললেন, আপনার মতে সায় দেওয়া কঠিন।' 'বাহবা!' আমি হাততালি দিয়ে চিৎকার করে বললাম। 'এ ব্যাপারেও আমি আপনার সঙ্গে এক মত। এটাই আমার প্রাপ্য ছিল।' 'তা মাননীয় মহাশয়, গুলি ছুড়বেন কি ছুড়বেন না?' আমি বললাম, 'ছুড়ব না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি চান তো আরও একবার গুলি ছুড়তে পারেন, যদিও আপনার পক্ষে সেটা না করাই ভালো।' আমাদের ডুয়েলের দুই সহযোগী—বিশেষত আমার সহযোগীটি—চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল। 'ছি! ছি! ডুয়েলের মাটির সীমারেখায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া! রেজিমেন্টের নাম ডোবালে দেখছি। যদি জানতেম যে তোমার মনে এই ছিল!' এবারে আর হাসির কথা নয়— সকলের

মুখোমুখি হয়ে আমার জবাব দেবার পালা। আমি বললাম, 'ভদ্রমহোদয়রা, কেউ যদি নিজের মূর্খতার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে এবং নিজের অন্যায়কে উপলব্ধি করে সর্ব্বসমক্ষে দোষ স্বীকার করে সেটা কি তাহলে আজকের দিনে একটা আশ্চর্য ঘটনা হবে?' 'কিন্তু তাই বলে ডুয়েল লড়তে এসে?' আবার চেঁচিয়ে উঠল আমার সহযোগীটি। 'কথাটা তো সেখানেই', আমি তার জবাবে বলি, 'আশ্চর্যের কথা তো এটাই, যেহেতু আমার উচিত ছিল এখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দোষ স্বীকার করা—উনি গুলি ছোড়ার আগেই সেটা করা উচিত ছিল; তা হলে আর ওঁকে মারাত্মক রকমের এবং এত বড়ো একটা পাপের ভেতরে টেনে আনার দরকার হত না। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবনকে এমন যা তা করে তুলেছি যার ফলে সেটা করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এর কারণ, বারো পা দূরত্বের ব্যবধানে আমি ওর গুলির মুখোমুখি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলাম বলেই না এখন আমার এই কথাগুলির কোনো তাৎপর্য ওঁর কাছে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তা না করে এখানে আমার সঙ্গে সঙ্গে, উনি গুলি ছোড়ার আগে, যদি আমি এমন কথা বলতাম তা হলে ওঁরা স্রেফ বলতেন আমি একটা কাপুরুষ, পিস্তল দেখে ঘাবড়ে গেছি, তাই আমার কথায় আমল দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। ভদ্রমহোদয়গণ', আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে হঠাৎ আর্তি হয়ে বেরিয়ে এলো 'একবার চারিদিকে চেয়ে দেখুন! চারদিক জুড়ে ঈশ্বরের দানের কী মহিমা! স্বচ্ছ আকাশ নির্মল বায়ু, শ্যামল তৃণশষ্প, পাখিদের সমাগম। কী মধুর, কী নিষ্পাপ এই প্রকৃতি। শুধু আমরা, একমাত্র আমরা মানুষেরাই নিরীশ্বর, একমাত্র আমরাই মূর্খ। আমরা বুঝতে পারি না যে জীবন এক স্বর্গরাজ্য। একবার যদি আমাদের বুঝতে মন চায় তাহলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ মাধুর্য নিয়ে তার প্রকাশ ঘটবে, তখন, মানুষ মানুষকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবে। ' আরও কিছু যোগ করার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু পারলাম না। যৌবনের উদ্দীপনার মধুর আবেশে, একটা সুখের অনুভূতিতে আমার হৃদয় এমন উদ্বেলিত হয়ে উঠল যে তেমন উপলব্ধি আমার জীবনে কখনও হয়নি। আমার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। 'এসবই বিচক্ষণ ও সাধু বটে', আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমাকে বললেন। 'যাই হোক না কেন, আপনার মধ্যে একটা মৌলিকতা আছে।' 'হাসতে হয় হাসুন', আমিও হাসতে হাসতে তাঁকে বলি। 'পরে আপনি নিজেই কিন্তু প্রশংসা করবেন।' তিনি বললেন, 'তা কেন? আমি এখনই আপনার প্রশংসা করতে প্রস্তুত। আসুন, আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিই, কেন না আমার মনে হচ্ছে আপনি যথার্থই আন্তরিক।' আমি বললাম, 'না, এখন দরকার নেই, বরং পরে হাত মেলাব। যখন আমি আরও ভালো হব, আপনার শ্রদ্ধার যোগ্য হব তখন হাত বাড়িয়ে দেবেন— সেটা ভালো হবে।'

আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আমার সহযোগী বন্ধুটি তো সারা রাস্তা আমাকে

গালিগালাজ করতে করতে চলল, আমি কিন্তু ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম। সমস্ত ঘটনা দেখতে দেখতে সেনাবাহিনীতে সহকর্মী অফিসারদের সকলের কানে পৌঁছে গেল। সেই দিনই তারা আমার আচরণের বিচার করতে বসে গেল। তাদের কথা হল 'ইউনিফর্মকে কলঙ্কিত করেছে। ইস্তফা দিক।' কেউ কেউ আবার আমার পক্ষ নিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা বলল, 'হাজার হোক, সাহস করে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তো।' 'তা ঠিক, কিন্তু আর গুলি চালাতে ভয় পেয়ে গেল। ডুয়েলের মাটির সীমারেখায় দাঁড়িয়ে কিনা ক্ষমা চেয়ে নিল!' আমার পক্ষসমর্থনকারীরা তাতে আপত্তি তুলে বলল, 'কিন্তু গুলির ভয় যদি করত তাহলে তো প্রথমে নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ত, তারপর ক্ষমা চাইত। অথচ তা না করে গুলিভরা অবস্থাতেই সেটা জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল কেন? না না যা-ই বল, এর মধ্যে মৌলিক ধরনের অন্য একটা কিছু আছে।' আমি ওদের কথা শুনি। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে বেশ মজাও লাগছিল। আমি বললাম, 'আমার পরম প্রিয় বন্ধুরা ও সহকর্মীরা, আমার ইস্তফা দেওয়া উচিত কিনা এই নিয়ে আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, কেন না সে কাজটা আমি ইতিমধ্যে সেরে ফেলেছি। আজ সকালেই আমি আমার চিঠি সেনাবাহিনীর দপ্তরে দিয়ে দিয়েছি। যে মুহূর্তে ছাড়া পাব তখনই কোনো মঠে চলে যাব—এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি রেজিমেণ্ট ছাড়ছি।' আমার এই কথা শোনামাত্র সকলে একযোগে হো-হো করে হেসে উঠল। 'আরে একথা আগে বলতে হয় তো! এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সাধুবাবার বিচার চলে না।' সকলে হাসতে থাকে, হাসি আর থামে না, তবে তাদের এ হাসির মধ্যে আদৌ কোনো ঠাট্টাবিদ্রুপ নেই, আছে আনন্দ ও প্রীতিমধুর ভাব। হঠাৎই সবাই আমাকে ভালোবেসে ফেলল—এমনকি আমার ঘোরতর বিরোধী যারা আমার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ করছিল তারাও। তারপর পদত্যাগপত্র যত দিন পর্যন্ত গৃহীত না হল সেই সময়ের মধ্যে, পুরো একটা মাস ওরা আমাকে একেবারে মাথায় করে রাখল। 'আহা, তুমি হলে আমাদের সাধুবাবা!' ওরা বলতে লাগল। প্রত্যেকে আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলে, আমাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত হতে বলে, এমনকি আমার প্রতি মমতাও দেখায়। 'নিজেকে নিয়ে এ তুমি কী করছ?' কেউ বা বলে 'না, ওর বুকের পাটা আছে বলতে হবে! গুলির মুখে ডরায়নি, নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুড়তে পারত। কিন্তু আগের দিন রাতে স্বপ্নে সন্ন্যাসী হওয়ার আদেশ পেয়েছিল, তাইতেই তো এটা স্থির করেছে।'

শহরের সমাজেও আমাকে নিয়ে প্রায় এই একই কাণ্ড। এর আগে পর্যন্ত আমি সেখানে বিশেষ ভাবে মনোযোগের পাত্র ছিলাম না—লোকে শুধু সাদরে আমাকে গ্রহণ করত—এই যা। কিন্তু এখন আমার সঙ্গে চেনাপরিচিত হওয়ার জন্য সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সকলেই আমাকে নিমন্ত্রণ করে কাছে ডাকে। অমনিতে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে বটে, কিন্তু আমি তো জানি আমাকে ভালোও বাসে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিয়ে সেই সময় লোকজনের মধ্যে প্রকাশ্যে, সরব আলোচনা চলছিল ঠিকই, কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যায়, কারণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের জেনারেলের নিকট আত্মীয় ছিলেন, আর যেহেতু ঘটনাটা রক্তপাত ছাড়া অনেকটা হাসি তামাশার মধ্য দিয়েই মিটে গেছে এবং আমি শেষ পর্যন্ত ইস্তফাও দিয়েছি তাই সকলে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বিষয়টাকে প্রকৃত অর্থে হাসিঠাট্টার সামগ্রী করে তুলল। তাই তাদের হাসিঠাট্টা সত্ত্বেও আমিও তখন নির্ভয়ে খোলাখুলি আমার মনের কথা বলতে শুরু করলাম, কারণ আর যা-ই হোক, ওদের সেই হাসিঠাট্টার মধ্যে কোনো মন্দ অভিপ্রায় বা কোনো বিদ্বেষ ছিল না।

এসব কথাবার্তা বেশির ভাগ হত সান্ধ্য আসরে, মহিলা সমাজের উপস্থিতিতে। তখন মহিলারাই আমার কথা শুনতে বেশি পছন্দ করত, পুরুষদের তারা শুনতে বাধ্য করত। আমার মুখের ওপর হাসতে হাসতে ওরা বলল 'সকলের দোষের দায় আমার—তা কী করে হয়? এই ধরুন না কেন, আপনি যদি কোনো অন্যায় করেন তার দায় কি আমার হতে পারে?' উত্তরে আমি বললাম 'আপনাদের সেই বোধ হবে কী করে যখন গোটা দুনিয়াটা আজ বহুকাল হল চলেছে অন্য এক পথে, এমনই এক পথে যেখানে ডাহা মিথ্যাকেই আমরা সত্য বলে চিনতে শিখেছি এবং সেই রকম মিথ্যাই দাবি করছি? এই দেখুন না, আমি জীবনে একবার অন্তর থেকে একটা ভালো কাজ করে বসলাম, অমনি আপনাদের সকলের চোখে আমি হয়ে গেলাম একটা আস্ত খ্যাপা। যদিও আমাকে আপনারা ভালোবাসেন, কিন্তু আবার আমাকে নিয়ে হাসাহাসিও করেন।' 'আপনার মতো মানুষকে ভালো না বেসে পারা যায় নাকি?' গৃহকর্ত্রী সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাসতে হাসতে বললেন। বহুজন সমাগমে পরিপূর্ণ ছিল মহিলার আয়োজিত সেদিনকার সেই আসরটি। এমন সময় তাকিয়ে দেখি মহিলাদের দলের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সেই বিশিষ্ট তরুণীটি, যার কারণে এই সেদিন আমি ডুয়েল লড়তে গিয়েছিলাম, যাকে মাত্র অল্প কিছু দিন আগেও আমি নিজের ভাবী বধূ বলে ভাবতাম। কখন কী ভাবে সে এই আসরে এলো তা আমার নজরে পড়েনি। উঠে এগিয়ে আমার কাছে এসে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলল 'আপনার অনুমতি হয় তো বলি, আর যে কেউ হাসুক না কেন, আমি কিন্তু হাসছি না, বরং আপনি তখন যে কাজ করেছিলেন সেজন্য চোখের জলে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।' এই সময় তার স্বামীও এগিয়ে এলেন। এরপর হঠাৎ উপস্থিত সকলে আমাকে ঘিরে ধরে প্রায় চুমু খায় আর কি। আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু সেই সময় হঠাৎই সবার চাইতে বেশি করে আমার নজরে পড়ে গেলেন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়। অন্যদের সঙ্গে তিনিও আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। যদিও এর আগে

আমি তাঁকে জানতাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কখনও পরিচিত ছিলাম না এবং সেদিন সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কখনও একটি বাক্যবিনিময়ও আমার হয়নি।

### ঘ) রহস্যময় আগন্তুক

যে ভদ্রলোকের কথা আমি বলছি তিনি বহুকাল হল শহরের এক রাজকর্মচারী। বিশিষ্ট পদাধিকারী। সকলের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, ধনী, দানশীলতার জন্য তাঁর খ্যাতি আছে। ভিক্ষুকদের আশ্রয় ও অনাথভবনের জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থ দান করেছেন। এ ছাড়াও গোপনে, সকলের অগোচরে আরও বহু জনহিতকর কাজ তিনি করেছেন, যা পরবর্তীকালে, তাঁর মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায়। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখতে প্রায় কঠিন প্রকৃতির, স্বল্পবাক। বিয়ে অবশ্য দশ বছরের বেশি আগে হয়নি। সহধর্মিণী এখনও যুবতী, ভদ্রলোকের তিনটি শিশু সন্তানের জননী। পর দিন সন্ধ্যাবেলা আমি আমার ঘরে বসে আছি, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে এসে প্রবেশ করলেন এই ভদ্রলোকটি।

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা দরকার যে আমি তখন আর আগেকার কোয়ার্টারে বাস করছি না। মিলিটারিতে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্যত্র উঠে এসেছিলাম। একজন সরকারি আমলার বিধবা স্ত্রী, এক বৃদ্ধার বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। তাঁর বাড়ির পরিচারিকাটিই আমার দেখাশোনা করে। আমি যে এখানে উঠে এসেছি তার একমাত্র কারণ এই যে সেই দিনই, ডুয়েল থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আফনাসিকে আমি কোম্পানিতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি, যেহেতু আগের দিন ওর সঙ্গে যে ব্যবহার আমি করেছিলাম তার পর থেকে ওর চোখের দিকে তাকাতেই আমার লজ্জা করছিল। যে কোনো সাধারণ গৃহী মানুষের লজ্জার প্রবণতাটাও আবার এত বেশি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কোনো কাজ করেও সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, 'গত কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন বাড়িতে আপনি যে সব কথা বলছেন আমি বেশ মনোযোগ সহকারে তা শুনে আসছি। শেষকালে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে হল, যেহেতু আপনার সঙ্গে আরও বিশদে আলাপ-আলোচনা করতে চাই। মাননীয় মহাশয় কি আমার এই মহৎ উপকারটুকু করতে পারেন?' গোড়াতেই তিনি আমাকে এমন হতভম্ব করে দিয়েছিলেন, যে আমার তখন ঘাবড়ে যাবার মতো অবস্থা। থতমত খেয়ে বললাম, 'পারব না কেন? সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! এটাকে আমি বিশেষ সম্মান বলে গণ্য করব।' আসল কথাটা এই যে লোকে যদিও এতদিন আমার কথা শুনেছে, আগ্রহ সহকারেই শুনেছে, কিন্তু এতটা গম্ভীর ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এসব কথা জানার জন্য এর আগে আর কেউ আমাকে ধরেনি। তাও আবার কিনা

সশরীরে আমার ঘরে এসে হাজির! ভদ্রলোক বসলেন। তিনি বলতে লাগলেন 'আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। আপনি সত্যের সেবা করেছেন, সত্যের জন্য সকলের সাধারণ অবজ্ঞা লাভ করার ঝুঁকি নিতেও আপনি ভয় পাননি।' 'আপনি হয়ত বড়ো বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসা করছেন আমার', আমি তাঁকে বললাম। 'না, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না', তিনি আমাকে জবাব দিলেন। 'বিশ্বাস করুন, এ ধরনের কাজ করা, আপনি যতটা ভাবছেন তার চাইতে অনেক কঠিন।' তিনি আরও বললেন, 'বস্তুত আমি তো এতেই দারুণ অবাক হয়ে গেছি, আর সেই জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। আমার একটা কৌতূহল আছে। যেটা হয়ত বেশি রকমের অশোভন মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি কুণ্ঠা বোধ না করেন তাহলে ডুয়েলের সময় আপনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে স্থির করলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার উপলব্ধিটা কী ছিল তা আপনি আমার কাছে বর্ণনা করুন—অবশ্য যদি মনে থাকে, তাহলেই। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা আমার কোনো চটুল প্রশ্ন নয়। বরং আপনাকে আমি যে এই প্রশ্ন করছি তার পিছনে আমার একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে—ঈশ্বরের কৃপায় আপনার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ যদি আমার ঘটে তাহলে পরে কোনো এক সময় আমার সেই উদ্দেশ্যের কথা সম্ভবত আপনাকে খুলে বলবও।'

যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন ততক্ষণ আমি সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই তার প্রতি অত্যন্ত প্রবল একটা আস্থা আমার মনে জাগল, আবার আমার দিক থেকে প্রচণ্ড কৌতূহলও জাগল, কারণ আমার মনে হল এ লোকটার মনের ভেতরে তার নিজস্ব, বিশেষ কোনো রহস্য আছে।

'আপনি জানতে চাইছেন আমি যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলাম সেই মুহূর্তে আমার উপলব্ধিটা কী ছিল', আমি তাঁকে উত্তর দিই। 'কিন্তু তার আগে আমি বরং একেবারে শুরু থেকে বলি—যা ইতিপূর্বে আমি আর কাউকে বলিনি', এই বলে আফানাসির সঙ্গে আমার যা যা ঘটেছিল এবং আমি যে আভূমি নত হয়ে তাকে প্রণাম করেছিলাম সে সবেরই বিবরণ তাঁকে দিলাম। উপসংহারে আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'তাহলে নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, ডুয়েলের সময় যখন এলো ততক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে এসেছিল, কারণ শুরুটা আমার বাড়িতেই হয়ে গিয়েছিল, আর একবার যখন এই পথে পা ফেললাম তারপর থেকে বাকি যা কিছু তা কঠিন তো রইলই না, বরং পরম সুখ ও আনন্দের সঞ্চার করল।'

বেশ ভালো করে আমার কথাগুলি তিনি শুনলেন, বড়ো মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'এ সবই রীতিমতো আগ্রহ জাগানোর মতো। আবার আমি আপনার কাছে আসব, মাঝে মাঝেই আসব।'

এর পর থেকে ভদ্রলোক প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই আমার কাছে আসতে লাগলেন।

আমাদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারত যদি তিনি নিজের সম্পর্কেও কিছু বলতেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে প্রায় কোনো কথাই তিনি বলতেন না, অথচ আমার সম্পর্কে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেন। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে আমার খুবই ভালো লেগেছিল, আমি তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করে আমার সমস্ত অনুভূতির কথা তাঁকে বলতাম। মনে মনে ভাবতাম ওঁর কাছ থেকে আমার গোপন করার কী আছে? দেখতেই তো পাচ্ছি লোকটা সৎ। তাছাড়া অমন একজন রাশভারী প্রকৃতির মানুষ, আমার সমবয়সিও নন, অথচ আমার মতন একজন অল্পবয়সির কাছে যাতায়াত করছেন, আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। তাঁর কাছ থেকে আমি আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম; তিনি ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তাই তাঁর সে সব শিক্ষা আমার কম উপকারে লাগেনি। একদিন তিনি কথায়-কথায় হঠাৎ আমাকে বললেন, 'জীবন যে একটা স্বর্গরাজ্য, এ কথা আমি অনেক দিন হলই ভেবেছি...' তারপর হঠাৎই যোগ করলেন 'শুধু একথাই ভাবি।' কথাগুলি বলে মুগ্ধ হেসে আমার দিকে তাকালেন। 'আমার এই বিশ্বাস আপনার চাইতেও দৃঢ়। কেন, সে পরে জানতে পারবেন', তিনি বললেন। আমি শুনি আর মনে মনে ভাবি, বুঝি কোনো গোপন কথা আমাকে খুলে বলতে চাইছেন। একটু পরে আবার বললেন, 'স্বর্গরাজ্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে গোপনে অবস্থান করছে—এই এখন, আমার অন্তরেও লুকিয়ে আছে। আমি যদি ইচ্ছে করি তাহলে কালই তার উদ্‌ঘাটন ঘটবে— চির জীবনের জন্য ঘটবে।' দেখি ভাবে আপ্লুত হয়ে তিনি কথা বলে চলেছেন, রহস্যজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন—যেন কোনো প্রশ্ন করছেন আমাকে। 'আর এই যে আপনি বললেন, মানুষের নিজের যা পাপ আছে তাছাড়াও প্রতিটি মানুষ প্রত্যেকের কাছে, সকলের জন্য এবং সব কিছুর জন্য অপরাধী—আপনার এ বিচার সম্পূর্ণ যথার্থ। এই সত্যকে তার এমন পরিপূর্ণ রূপে, মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে আপনি আলিঙ্গন করতে পারলেন তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। আর এটা যথার্থই সত্য যে মানুষ যখন তা বুঝতে পারবে তখনই সে স্বর্গরাজ্যের, সূচনা হবে—তখন আর তা স্বপ্ন থাকবে না, বাস্তব হয়ে উঠবে।' 'কিন্তু কবে?' ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি বলে উঠলাম। 'কবে তা হবে? কোনও কালে তা হবে কি? না কি স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে?' তিনি বললেন, 'তা হলে তো দেখছি আপনি বিশ্বাস করেন না। আপনি যা প্রচার করছেন তাতে আপনার নিজেরই আস্থা নেই। জেনে রাখুন, এই যে যাকে আপনি স্বপ্ন বলছেন তা নিঃসন্দেহে বাস্তবে পরিণত হবে—মনে মনে এই বিশ্বাস রাখুন—তবে এখুনি নয়, কেন না প্রতিটি কাজেরই একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। এটা মানুষের একটা আত্মিক ও মানসিক প্রক্রিয়া। পৃথিবীকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হলে মানুষকে নিজেকেই মানসিক ভাবে অন্য পথে মোড় নিতে হবে। মানুষ যত দিন না সত্যি সত্যি একে অপরের ভাই হতে পারছে তত দিন অমনি অমনি ভ্রাতৃত্ব আসছে না। বিজ্ঞানের যত শিক্ষা বলুন আর যত রকম লাভের

কথাই শোনান না কেন, মানুষ কখনও ভালো মনে তার সম্পত্তি ও অধিকার অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারবে না। প্রত্যেকে বলবে তার ভাগে কম পড়েছে, এই নিয়ে গুঞ্জন চলবে, একে অন্যকে হিংসা করবে, উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাবে। আপনি প্রশ্ন করছেন সে দিন কবে আসবে। আসবে, কিন্তু প্রথমে মানুষের একাকিত্বের কালটা আমাদের পূর্ণ করতে হবে।' 'কী ধরনের একাকিত্বের কথা আপনি বলছেন?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'সেই একাকিত্ব যা এখন সর্বত্র বিরাজ করছে—বিশেষত আমাদের যুগে, তবে তা এখনও একেবারে সম্পন্ন হয়নি, তার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। এই দেখুন না কেন, আজকাল প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে যতদূর সম্ভব আলাদা করে তুলে ধরার জন্য কী পরিমাণ তৎপর। প্রত্যেকে যে যার মতন জীবনের পরিপূর্ণ সুখ উপভোগ করতে চায়। অথচ মানুষ তার এই এত প্রয়াসের পরিণামে জীবনের পরিপূর্ণতার বদলে যা অর্জন করছে তাকে পুরোমাত্রায় আত্মহনন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, কারণ মানুষ পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির বদলে সম্পূর্ণ একাকিত্বের গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। আমাদের যুগের সমগ্র মানবসমাজ পৃথক পৃথক একেকটি টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে, প্রত্যেকে যে যার বিবরে একা একা আশ্রয় নিয়ে বসে আছে, একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, আত্মগোপন করে আছে, যার যা আছে অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে, পরিণামে নিজে অন্যদের কাছ থেকে ধাক্কা খাচ্ছে, আবার নিজেও অন্যকে নিজের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। সে নিভৃতে সম্পদ সঞ্চয় করে আর ভাবে 'আমার কত শক্তি, এখন আমার কত সঙ্গতি!' কিন্তু মূর্খ জানে না যে যত বেশি সঞ্চয় করবে ততই বেশি করে আত্মবিধ্বংসী অক্ষমতা তাকে গ্রাস করবে। কারণ এই যে সে শুধু তার নিজের ওপর ভরসা করতে অভ্যস্ত, সমগ্রতা থেকে ভেঙে টুকরো হয়ে সে বেরিয়ে এসেছে, মানুষকে, মানবজাতিকে বা অপরের সাহায্যে বিশ্বাস করার মতো মানসিকতাই তার নেই, তার মন সে ভাবে তৈরি হয়নি। তাই সে শুধু ভয়ে কাঁপে, এই বুঝি তার টাকাপয়সা, তার অর্জিত সুযোগ সুবিধা সব গেল। আজকাল সর্বত্র মানুষ এই ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে, ব্যক্তির যথার্থ সঙ্গতি যে তার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রয়াসের মধ্যে না হয়ে বরং সর্বসাধারণের অখণ্ডতার মধ্যে আছে মানুষের মন তা মানতে চাইছে না। কিন্তু এমন একটা দিন অবশ্যই আসবে যখন এই ভয়ঙ্কর একাকিত্বেরও অবসান ঘটবে। সে দিন সকলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা কী অস্বাভাবিক কাজই না হয়েছিল। সময়ের হাওয়াই হবে এরকম, আর লোকেও অবাক হয়ে ভাববে কী করে তারা এতকাল অন্ধকারের মধ্যে বসে ছিল, এতকালের মধ্যে আলোর সন্ধান তারা পায়নি। তখনই সুরলোকে মানবপুত্রের আবির্ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

কিন্তু তবু ততদিন পর্যন্ত তো তাঁর পতাকা আমাদের সযত্নে রক্ষা করতে হবে, নয় নয় করে একজনও যদি কেউ থাকে তাকেই একা একক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে

হবে—মানুষের আত্মাকে তার নিভৃতলোক থেকে বের করে নিয়ে এসে তাকে ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মে নামাতে হবে। তাতে যদি লোকে তাকে খ্যাপার দলে ফেলে তো ফেলুক। এটা তাকে এই জন্যই করতে হবে যাতে মহৎ আদর্শের মৃত্যু না হয়।

দিনের পর দিন সন্ধ্যাবেলা এই রকম সব আবেগ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ আলোচনা আমাদের মধ্যে হত। আমি লোকসমাজে যাতায়াত পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম, চেনাপরিচিতদের বাড়ি গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ একেবারেই কমে গেল। তা ছাড়া আমাকে নিয়ে লোকের মাতামাতি করা যে একটা দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাও থিতিয়ে আসতে শুরু করেছিল। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য কিন্তু কাউকে নিন্দা করা নয়, কারণ তারা আগের মতোই আমাকে ভালোবাসত, আমার সঙ্গে রীতিমতো ভালো ব্যবহার করত; কিন্তু যে যাই বলুক না কেন, এ জগতে দস্তুরের আধিপত্য যে বাস্তবিকই কম নয় একথা না মেনে উপায় নেই। এদিকে আমার এই রহস্যজনক আগন্তুকের প্রতি আমার মুগ্ধতা দিনের পর দিন বেড়ে চলল। তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা আমি উপভোগ করছিলাম, কিন্তু এছাড়াও আমার মন বলছিল যে তিনি যেন তাঁর মনের মধ্যে কোনো একটা গোপন অভিপ্রায় লালন পালন করে আসছেন এবং সম্ভবত কোনো মহৎ কীর্তি সম্পাদনের জন্য তিনি ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর গোপন বিষয় নিয়ে আমি বাইরে কোনো কৌতূহল দেখাতাম না, এ বিষয়ে না সরাসরি না আভাসে ইঙ্গিতে তাঁকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ আমি করতাম না। আমার এই ব্যবহারটা মনে হয় ভদ্রলোকের ভালো লেগেছিল। কিন্তু শেষ কালে আমি লক্ষ করেছিলাম তিনি যেন আমার কাছে কোনো এক গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কাতর হয়ে পড়েছেন। যেদিন থেকে তিনি আমার কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন অন্তুতপক্ষে তার মাসখানেক পরে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। এক দিন তিনি আমাকে বললেন, 'জানেন আমাদের দুজনের ব্যাপারে শহরের লোকদের দারুণ কৌতূহল, আমি যে আপনার কাছে এত ঘন ঘন যাতায়াত করি এতে তারা বিস্মিত। তা হোক গে, *শিগগিরই এসবের ব্যাখ্যা মিলবে।*'

কোনো কোনো সময় হঠাৎ হঠাৎ একটা দারুণ উত্তেজনা তাঁকে পেয়ে বসত। এসব ক্ষেত্রে তিনি প্রায় সর্বদা উঠে পড়তেন, আর কথাবার্তা না চালিয়ে বিদায় নিতেন। অনেক সময় আবার অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টিতে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যে মনে হত এই বুঝি কিছু একটা বলবেন। কিন্তু তিনি অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পালটে পরিচিত ও সাধারণ কোনও কথা পাড়তেন। প্রায়ই মাথাব্যথার অনুযোগও করতে লাগলেন।

অবশেষে এক দিন—এমনকি একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই—অনেকক্ষণ বেশ উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই হঠাৎ দেখি তিনি কেমন পাণ্ডুর হয়ে গেলেন, তার মুখটা বেঁকে গেল, স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'কী হল আপনার?' আমি জিগ্‌গেস করলাম। 'আপনি কি খারাপ বোধ করছেন?'

সেদিনও কিন্তু তিনি সেই মাথাব্যথার অনুযোগই করছিলেন।

'আমি জানেন আমি মানুষ খুন করেছি।'

কথাটা বলে তিনি মৃদু হাসলেন, কিন্তু তাঁর মুখটা খড়ির মতো সাদা হয়ে গেছে। ভালোমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই যে চিন্তাটা আচমকা খচ্ করে আমার বুকে বিঁধল তা হল, 'কিন্তু এতে হাসার কী আছে?' সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'এ আপনি কী বলছেন?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

সেইরকমই ম্লান মুখে কাষ্ঠহাসি হেসে তিনি আমাকে জবাব দিলেন 'যদি জানতেন, এই প্রথম কথাটি উচ্চারণ করতে কী পরিমাণ মূল্য আমাকে দিতে হয়েছে! এখন বললাম, বলার পর মনে হচ্ছে এবারে আমি পথে এসেছি। আজ চলি।'

অনেকক্ষণ তাঁর কথায় আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তাঁর একবারের কথায় তো বিশ্বাসই হল না। বিশ্বাস হল একমাত্র তার পরই যখন পর পর তিন দিন আমার কাছে এসে সমস্ত কাহিনিটি আমাকে সবিস্তারে বললেন। প্রথমে ভেবেছিলাম লোকটা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু শেষকালে তাঁর কথায় বিশ্বাস না করে আর উপায় থাকল না। তাঁর কাহিনি শুনে আমি স্পষ্টতই পরম বিস্ময় ও গভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

যে সময়কার কথা হচ্ছে তারও চোদ্দ বছর আগেকার ঘটনা। এক বড়ো রকমের ও ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছিলেন তিনি। কোনো এক জমিদারের বিধবা, এক সুন্দরী ও ধনী যুবতীর আমাদের শহরে মাঝে মধ্যে এসে বসবাসের জন্য এক নিজস্ব বাড়ি ছিল। ভদ্রলোক তাকে খুন করেন। মেয়েটির প্রতি তিনি গভীর ভাবে আসক্ত হয়েছিলেন, বারবার প্রণয় নিবেদন করেন, তাঁকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু মেয়েটি ইতিমধ্যেই অপর একজনকে হৃদয় নিবেদন করেছে। তার প্রণয়ী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় সামরিক কর্মচারী, পদমর্যাদায় নেহাৎ হেলাফেলার নয়। সেই সময় অভিযানে অন্যত্র রয়েছে। তবে মেয়েটি আশা করছে শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে। মেয়েটি ভদ্রলোকের প্রস্তাবে রাজি হল না এবং তাঁকে অনুরোধ করল তিনি যেন তার কাছে আর আসা যাওয়া না করেন। আসা যাওয়া বন্ধ করলেন বটে, কিন্তু বাড়ির আটঘাট ভালো জানা থাকায় যে কোনো সময় ধরা পড়ে যাবার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এক দিন রাতে বাগান দিয়ে ছাদে উঠে বাড়ির ভেতরে ঢুকে চরম স্পর্ধার পরিচয় দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়—যে-সমস্ত অপরাধ সংঘটনের পেছনে অসাধারণ স্পর্ধার পরিচয় থাকে সেগুলি আবার অন্যগুলির তুলনায় বেশি সফলও হয়। চিলেকোঠার একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তিনি মই বয়ে নেমে এলেন নিচের তলার অন্দরে, যেখানে মেয়েটি আছে। জানতেন যে সিঁড়ির ধাপের শেষপ্রান্তের দরজাটা অনবধানবশত অনেক সময়ই তালাবন্ধ থাকে

না। এই অসতর্কতার ওপর তিনি ভরসা করেছিলেন এবং এবারেও দেখা গেল তাঁর অনুমানে ভুল হয়নি। বসবাসের ঘরগুলির ভিতর দিয়ে অন্ধকারে মধ্যে পথ করে নিয়ে তিনি ঢুকলেন মেয়েটির শোবার ঘরে। ঘরের ভিতরে বিগ্রহের সামনে টিপটিপ করে একটি দীপ জ্বলছে। বুঝে বুঝে ঠিক এই সময়টিতেই আবার তার একান্ত নিজস্ব দুই কাজের মেয়ের একজনও সেখানে নেই। গৃহকর্ত্রীর কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে তারা চুপিসারে বাড়ি ছেড়ে ওই একই রাস্তার ওপর এক প্রতিবেশীর বাড়িতে একজনের জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় যোগ দিতে চলে গেছে। বাদবাকি দাসদাসীরা কেউ দাসদাসীদের মহলে, কেউ রান্নাঘরে, কেউ বা নিচের তলার কোনো কুঠুরিতে ঘুমোচ্ছে। নিভৃত ঘরে মেয়েটিকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ভেতরে কামনার আগুন জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই ঈর্ষাকাতর প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধের জ্বালা তাঁকে অস্থির করে তুলল। তাঁর তখন মাতালের মতো বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা। মেয়েটির শয্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি সোজা তার বুকের মধ্যে ছুরি বিঁধিয়ে দিলেন। টুঁ শব্দটি করার অবকাশ পেল না মেয়েটি। এর পর ঘৃণ্যতম অপরাধীর মতো নারকীয় দুষ্টবুদ্ধিতে প্রণোদিত হয়ে হিসাব করে এমন একটা ব্যবস্থা করলেন যাতে লোকের মনে হতে পারে এটা বাড়ির চাকরবাকরের কাজ। মেয়েটির টাকার ব্যাগটা হাতাতে তাঁর এতটুকু কুণ্ঠা হল না। বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা নিয়ে তাই দিয়ে দেরাজ আলমারি খুলে সেখান থেকে কিছু কিছু জিনিস সরালেন—তবে বেছে বেছে ঠিক সেই ধরনের জিনিস যা কোনো অজ্ঞ চাকর হলে সরাত; দামি কাগজপত্রে হাত দিলেন না, নিলেন শুধু নগদ টাকাপয়সা, গোটাকতক ভারী ভারী সোনার জিনিস। কিন্তু তার দশ গুণ মূল্যবান, মহার্ঘ অথচ আয়তনে যেগুলি খুবই ছোটো সেগুলি ছুঁয়েও দেখলেন না। তার পর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আরও দু একটি জিনিস সরালেন। তবে সে বিষয়ে পরে কথা হবে। এই ভয়ঙ্কর কাজ সমাধা করে তিনি যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

যখন হুলস্থূল পড়ে গেল সে দিন তো নয়ই, এমনকি পরেও তাঁর জীবনে কখনও আসল দুর্বৃত্তকে কোনো লোক কোনো দিন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি! তা ছাড়া মেয়েটির প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা কেউ জানতও না, কারণ ভদ্রলোক অমনিতেই বরাবর স্বল্পবাক ও অসামাজিক প্রকৃতির, তাঁর এমন একটিও বন্ধু ছিল না যার সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন। সকলে জানত তিনি নিহত ব্যক্তির পরিচিত— এই মাত্র, তাও আবার তেমন একটা ঘনিষ্ঠও তাঁকে বলা যায় না, কারণ ঘটনার আগে প্রায় দু সপ্তাহ তিনি তার বাড়িতে একবারও যাননি। তৎক্ষণাৎ সন্দেহ গিয়ে পড়ল ভূমিদাস ভৃত্য পিয়োতরের ওপর। আর পারিপার্শ্বিক সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ এমন ভাবে মিলে গেল যে তাতে এই সন্দেহটাই সমর্থিত হল। কারণ এই যে ভৃত্যটি জানত—এবং কর্ত্রীও একথা গোপন করেনি

যে এবারে সরকারি হুকুমে তার ভূমিদাসদের মধ্য থেকে একজন কোনো চাষিকে যখন রিক্রুটে পাঠাতেই হবে তখন এই পিয়োতরকেই পাঠাবে বলে সে মনে মনে ভেবে রেখেছে, যেহেতু লোকটার তিন কুলে কেউ নেই, তার ওপরে আবার তার ব্যবহারও খারাপ। শুঁড়িখানায় সে যে মাতাল অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্ত্রীকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল একথাও লোকে শুনেছে। কর্ত্রী যেদিন খুন হয় তার দু দিন আগে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, কোথায় কাটিয়ে ছিল কেউ জানে না। হত্যাকাণ্ডের পরের দিন তাকে শহরের বাইরে একটা রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখন সে মদে চুর হয়ে আছে, তার পকেটে একটা ছুরি পাওয়া যায়, আর তার ডান হাতের তালুটা কেন যেন রক্তে মাখামাখি। সে অবশ্য বলেছিল যে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু তার সেই কথা লোকে বিশ্বাস করেনি। এদিকে বাড়ির কাজের মেয়ে দুটি স্বীকার করেছিল যে তারা একটা খানাপিনার আসরে গিয়েছিল এবং বাইরের বারান্দার সদর দরজা তাদের ফেরার আগে পর্যন্ত খোলা রেখে দিয়েছিল। পরন্তু এ ধরনের অসংখ্য আরও এমন সব সূত্র বেরিয়ে এলো যাতে নির্দোষ ভৃত্যটিই দোষী বলে সাব্যস্ত হল। তাকে গ্রেপ্তার করা হল, তার বিরুদ্ধে বিচারও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহ পরেই লোকটা জ্বরে পড়ল, তার জ্ঞান আর ফিরল না, জেল-হাসপাতালে তার মৃত্যু হল। সবই ভগবানের ইচ্ছা বলে মামলার এখানেই নিষ্পত্তি ঘটল। আর বিচারকমণ্ডলী, কর্তৃপক্ষ এবং সমাজের অন্যান্য লোকজন—সকলের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রয়ে গেল যে হাসপাতালে মৃত বিচারাধীন ভৃত্যটি ছাড়া আর কেউ এ কাজ করেনি। এর পরই আসল শাস্তির শুরু।

রহস্যজনক আগন্তুকটি—ততদিনে তিনি আমার বন্ধুও হয়ে গেছেন—আমাকে জানালেন যে গোড়ার দিকে বিবেকের এতটুকু দংশন পর্যন্ত তিনি অনুভব করেন নি। মনে মনে অনেক দিন ধরে যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন বটে, কিন্তু তার কারণ অন্য। তাঁর একমাত্র আক্ষেপ ছিল এই যে তিনি তাঁর প্রিয় প্রেমকেও হত্যা করেছেন, কিন্তু বাসনার দাহ তাতে নিবৃত্ত না হয়ে এখনও শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু তিনি যে একজন নিরপরাধের রক্তপাত করেছেন, মানুষ খুন করেছেন এ চিন্তা তখন তাঁর মনে প্রায় স্থান পায়নি। অন্য দিকে যাকে তিনি হত্যা করেছেন সে যে আরেক জনের স্ত্রী হতে পারে এই চিন্তা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। তাই তিনি দীর্ঘকাল তাঁর মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়ে এসেছেন যে এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় তাঁর ছিল না। নির্দোষ ভৃত্যটি ধরা পড়ায় তিনি গোড়ার দিকে খানিকটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন বটে, তবে ধৃত ব্যক্তি দেখতে দেখতে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং শেষ কালে মারাও গেল দেখে তিনি সান্ত্বনা পেলেন, কারণ তিনি তখন মনে মনে বিবেচনা করে দেখলেন এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে লোকটা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে মারা যায়নি, অথবা ভয় পেয়েও মারা যায়নি। মারা গেছে

ঠান্ডা লেগে অসুখ বাধিয়ে ফেলে, আর বাধিয়েও ছিল ঠিক সেই কয়েক দিনে যখন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং বদ্ধ মাতাল অবস্থায় সারা রাত ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। যে টাকাপয়সা বা জিনিসপত্র তিনি চুরি করেছিলেন সেগুলি তাঁর তেমন একটা দুশ্চিন্তার কারণ হল না, যেহেতু তিনি আবারও মনে মনে বিবেচনা করে দেখলেন যে চুরি তিনি কোনো লাভের জন্য করেননি, করেছিলেন সন্দেহটা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। চুরির মোট পরিমাণও ছিল অতি সামান্য, তিনি শীঘ্রই পুরো টাকাটা এমনকি তার অনেক বেশি টাকাই আমাদের শহরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি আতুরালয়ে দান করে দিলেন। চুরির ব্যাপারে বিবেককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এ কাজ করেছিলেন, আর উল্লেখযোগ্য এই যে সাময়িক ভাবে, এমনকি দীর্ঘকাল এতে সত্যি সত্যি সান্ত্বনাও পেয়েছিলেন—এটা তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন। ঠিক তখনই চাকুরির জায়গায় তাঁর বিপুল কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেল, নিজে বেছে বেছে গায়ে পড়ে যত ঝামেলার ও শ্রমসাধ্য কাজের ভার নিতে লাগলেন। দু বছর এই নিয়ে পড়ে রইলেন। দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন, তাই অতীতে যা ঘটেছিল তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, কখনও মনে পড়ে গেলে সে চিন্তা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। পরোপকারে আত্মনিয়োগ করলেন। আমাদের শহরে জন কল্যাণমূলক অনেক কাজ সংগঠন করলেন, অনেক অর্থ দান করলেন। মস্কোতে এবং পেতের্বুর্গেও তাঁর নাম অজানা রইল না। দুই মহানগরেই তিনি সেখানকার জনহিতকর সভাসমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন। তা হলে কী হবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু অতীতের কথা চিন্তা করে তিনি মনে মনে কষ্ট পেতে লাগলেন, অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে তা কাটিয়ে ওঠার সাধ্য তাঁর হল না। এই সময় এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়েকে তাঁর পছন্দ হয়ে গেল, কালবিলম্ব না করে তাকে বিয়েও করে ফেললেন। ভাবলেন বিবাহবন্ধনের ফলে তাঁর নিঃসঙ্গতার মানসিক অবসাদ ঝেড়ে ফেলতে পারবেন এবং নতুন জীবনের পথে নেমে তিনি যদি উৎসাহের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালন করেন তাহলে হয়তো পুরনো স্মৃতির যাতনা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু তিনি যা আশা করেছিলেন ঘটল ঠিক তার বিপরীত। বিবাহের প্রথম মাস থেকেই একটি চিন্তা অনবরত তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল: আমার স্ত্রী, আমাকে এত ভালোবাসে, কিন্তু সে যদি জানত? ’ স্ত্রী যখন তাঁর প্রথম সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে এবং যখন তাঁকে এ কথা জানাল তখন তিনি হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, ভাবলেন: একটা নতুন জীবনের জন্ম দিতে চলেছি, অথচ আমি নিজে হাতে একটা জীবন নাশ করেছি। তারপর আরও সব সন্তানের জন্ম হল। কিন্তু তাঁর মনে ভাবনা: ‘কোন্ সাহসে আমি ওদের ভালোবাসব, শিক্ষা দেব, মানুষ করে তুলব? কোন্ অধিকারে আমি ওদের সততার কথা বলব? আমি নিজেই তো একটা খুনি!’ সুন্দর ছেলেমেয়েরা, ওরা বড়ো হয়ে উঠছে, ওদের আদর করতে ইচ্ছে করে ‘কিন্তু

ওদের নিষ্পাপ নির্মল মুখগুলোর দিকে আমি তাকাতে পারি না, সে যোগ্যতা আমার নেই।'

অবশেষে যাকে তিনি হত্যা করেছিলেন তার রক্ত, তাঁর হাতে বিনষ্ট সেই উদ্ভিন্ন নবীন জীবন, প্রতিশোধের দাবিতে সেই রক্তের আর্ত চিৎকার—যে ভাবে তাঁর মনের মধ্যে হানা দিতে লাগল তাতে ভদ্রলোকের জীবন নিদারুণ তিক্ত ও বিভীষিকাময় হয়ে উঠল। তিনি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় তিনি দীর্ঘকাল এই যন্ত্রণা সহ্য করলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'এই গোপন যাতনাভোগের মধ্য দিয়েই আমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।' কিন্তু এই আশাও বৃথা। যন্ত্রণা দিনে দিনে বেড়েই চলল। এদিকে জনহিতকর কাজের জন্য সমাজের সকলে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছে, যদিও তাঁর কঠোর ও গম্ভীর প্রকৃতির জন্য লোকে তাঁকে ভয়ও করত। কিন্তু তাঁর প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা যত বাড়তে লাগল ততই তাঁর পক্ষে সেটা বেশি করে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। এক সময় আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলেন—একথা তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার বদলে তাঁকে পেয়ে বসল অন্য এক বিচিত্র ভাবনা—প্রথম প্রথম তাঁর কাছে অসম্ভব ও পাগলামি বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে বসল যে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার কোনও উপায় থাকল না। তাঁর ভাবনাটা ছিল এই রকম: উঠে দাঁড়াতে হবে, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি মানুষ খুন করেছেন। বছর তিনেক তিনি এই স্বপ্ন নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। কার্যসিদ্ধির বিচিত্র সমস্ত উপায় বারবার তাঁর মনে হানা দিতে লাগল। শেষ কালে মনে প্রাণে দৃঢ় নিশ্চিত হলেন যে নিজের অপরাধের কথা ঘোষণা করলে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর মনের ব্যাধি দূর করতে পারবেন এবং চিরকালের জন্য মনে শান্তি পাবেন। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা ভেবে তিনি মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন তা এই যে কী ভাবে কাজটা করবেন। ঠিক এই সময় আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের এই ঘটনাটি ঘটল। তিনি বললেন, 'আপনাকে দেখে আমি এখন মনস্থির করে ফেলেছি।' আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি তো অবাক হয়ে হাতে হাত চাপড়ে তাঁকে বললাম, 'বলেন কী! এরকম একটা সামান্য ঘটনা আপনার মনের মধ্যে কী করে এমন দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলতে পারল?'

'সঙ্কল্প তো আজ তিন বছর হল আমার মনের মধ্যে আছেই', তিনি জবাব দিলেন। 'আপনার ঘটনাটি শুধু তাতে উৎসাহ সঞ্চার করল—এই যা। আপনাকে দেখে আমার ঈর্ষা হল, আমি নিজেকে ধিক্কার দিলাম', বেশ খানিকটা কঠিন স্বরেই যেন তিনি আমাকে শেষ কথাগুলি বললেন।

আমি বললাম, 'কিন্তু লোকে তো আপনার কথা বিশ্বাসই করবে না। চোদ্দ বছর পার হয়ে গেছে।'

'অকাট্য প্রমাণ আছে আমার কাছে। সবাইকে দেখাব।'

আমার চোখে জল এসে গেল, আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

'শুধু একটা কথা আমাকে বলুন, একটি বিষয় আমাকে স্থির করে দিন!' এমন ভাবে তিনি বলে উঠলেন যেন এখন আমার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে। 'আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে—তাদের কী হবে? স্ত্রী হয়তো শোকে দুঃখে মারা যাবে। ছেলেমেয়েরা তাদের আভিজাত্য ও ভূসম্পত্তি হারাবে না ঠিকই—কিন্তু দাগী আসামির বংশধর বলে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আর আমার সম্পর্কে, আমার নিজের সম্পর্কে কোন্ স্মৃতি রেখে যাব তাদের মনের মধ্যে!'

আমার মুখে কোনো কথা জোগাল না, আমি চুপ করে রইলাম।

'আর তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, চিরকালের জন্য তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া! এ যে জন্মের মতো, সারা জন্মের মতো বিদায়!'

আমি বসে বসে আপন মনে বিড়বিড় করে প্রার্থনা আওড়াই। শেষকালে আমি উঠে পড়লাম। আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

'কী হল, বলুন?' তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'যান আপনি, গিয়ে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করুন। সব চলে যায়; একমাত্র সত্য থেকে যায়। আপনার সন্তানরা বড়ো হয়ে বুঝতে পারবে কত বড়ো মহৎ প্রাণ ছিল আপনার এই মহৎ সঙ্কল্পের মধ্যে।

তিনি তখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। দেখে মনে হল যেন তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। কিন্তু তাহলে কী হবে, এর পরও আরও দু সপ্তাহের বেশি আমার কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন; তখনও একের পর এক রোজ সন্ধ্যায় তিনি প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন, কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। তাঁর জ্বালায় আমার মনের শান্তি নষ্ট হল। একবার হয়তো এলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে বললেন, 'আমি জানি, আমি স্বর্গ পেয়ে যাব, যে মুহূর্তে আমি পাপস্বীকার করব সেই মুহূর্তে স্বর্গ পেয়ে যাব। চোদ্দ বছর নরকের মধ্যে ছিলাম। আমি দুঃখ ভোগ করতে চাই। দুঃখ বরণ করে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করব। অসত্য নিয়ে পৃথিবীতে চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু সেখান থেকে পেছনে ফেরার আর কোনো উপায় থাকে না। এখন শুধু আমার নিকট পড়শিকে কেন, আমার নিজের সন্তানদেরও যে ভালোবাসব সে সাহস আমার নেই। হে প্রভু, আমার এই দুঃখবরণের জন্য যে কত মূল্য আমাকে দিতে হয়েছে আমার ছেলেমেয়েরা হয়তো একদিন তা বুঝতে পারবে, আমাকে তখন আর তারা ধিক্কার দেবে না! প্রভু তো আর শক্তির মধ্যে নেই, তিনি সত্যস্বরূপ।'

'বুঝতে পারবে বৈ কি, সকলেই বুঝতে পারবে আপনার এই আত্মদান', আমি

তাকে বলি। 'এখন যদি নাও হয় পরে বুঝতে পারবে, কারণ আপনি সত্যের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছেন, আর সে সত্য ছিল পরম সত্য, অপার্থিব সত্য।...'

সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন, চলে যান, মনে হয় যেন সান্ত্বনা পেয়েছেন। কিন্তু পর দিনই হঠাৎ আবার তাঁর উদয়। এবারে ক্রুদ্ধ, মুখ ফ্যাকাশে। উপহাস করে আমাকে বললেন: 'যতবার আপনার কাছে আসছি, ততবারই কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, 'এখনও পাপ স্বীকার করল না লোকটা?' একটু অপেক্ষা করুন, অতটা ঘৃণা আমাকে না হয় না-ই করলেন। কাজটা করা যত সহজ বলে আপনার মনে হচ্ছে অত সহজ কিন্তু নয়। আমি হয়তো আদৌ করব না। আপনি তো আর তাই বলে আমার নামে লাগাতে যাবেন না, কী বলেন?'

এসব ক্ষেত্রে আমি তার দিকে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তো তাকাতামই না, এমনকি তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আমার ভয় করত। আমার মানসিক যন্ত্রণা অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেল, অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে উঠল আমার অন্তর। আমার রাতের ঘুম পর্যন্ত টুটে গেল।

সেদিন তিনি তাঁর কথার জের টেনে বলে চললেন, 'আমি এখন আসছি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। স্ত্রী কাকে বলে আপনি জানেন? আমি যখন বেরোচ্ছি তখন আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে ডেকে বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু বাপি, আমরা এক সঙ্গে 'শিশুপাঠ'-এর গল্প পড়ব।' না, এটা আপনার বোধগম্য হবে না! একের দুর্গতি থেকে অন্যের বুদ্ধি হয় না।'

তাঁর চোখদুটি জ্বলছে, ঠোঁট কাঁপছে। হঠাৎ টেবিলে দুম করে এমন এক ঘুষি মেরে বসলেন যে টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলি লাফিয়ে উঠল। এত নরম স্বভাবের মানুষ, এই প্রথম এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু এর কি কোনো প্রয়োজন আছে? কী দরকার বলুন তো? বিচারে কারও সাজা হয়নি, আমার অপরাধের দরুন কাউকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি, আর ভৃত্যটির কথা যদি বলেন—সে তো অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। যে রক্তপাত আমি করেছি তার জন্য আমি তো যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে শাস্তি পেয়েছি। তা ছাড়া আমার কথায় কেউ বিশ্বাসই করবে না, আমার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণেও নয়। তাহলে জানানোটা কি দরকার? একান্তই দরকার কি? রক্তপাতের জন্য সারাজীবন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাও সই, কিন্তু তাতে আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তো অন্তত রেহাই পাবে! নিজের সঙ্গে ওদেরও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া—সেটা কি কোনো কাজের কাজ হবে? আমরা ভুল করছি না তো? এখানে সত্যটা কোথায়? তা ছাড়া লোকে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে কি? তার মূল্য দেবে কি? যোগ্য মর্যাদা দেবে কি?'

'হা ঈশ্বর!' আমি মনে মনে ভাবলাম। 'এমন একটা মুহূর্তে লোকটা কিনা নিজের মান সম্মানের কথা ভাবছে!' সেই সময় তাঁর জন্য আমার এত মায়া হল যে

আমার মনে হয়েছিল তাঁর ভাগ্য ভাগ করে নিলে তাঁর মনের ভার অন্তত খানিকটা যদি লাঘব করা যেত, তাহলে, আমার মনে হয়, আমি তা-ই করতাম। দেখি তিনি উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছেন। আমি আঁতকে উঠলাম। এবারে আর শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, আমার সমস্ত জীবন্ত সত্তা দিয়ে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম এই সঙ্কল্পের জন্য কী মূল্য দিতে হতে পারে।

‘কী হল? আমার ভাগ্য নির্ধারণ করুন!’ তিনি আবার আর্তনাদ করে উঠলেন।

‘যান, পাপ স্বীকার করুন’, আমি অস্ফুটস্বরে তাঁকে বললাম। আমার কণ্ঠস্বরে কুলোচ্ছিল না বটে, কিন্তু কথাগুলি আমি কঠিন স্বরেই বললাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত বাইবেলের নতুন নিয়মের গ্রন্থটি তুলে নিয়ে যোহান কথিত সুসমাচারের দ্বাদশ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকটি তাঁকে খুলে দেখালাম ‘আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যথার্থই কহিতেছি গমের বীজ ক্ষেত্রে পতিত হইলে উহার বিনাশ না ঘটিলে একাকী রহিয়া যায়; বিনাশ ঘটিলে তবেই প্রভূত ফল প্রসব করে।’ এই মাত্র, উনি আসার আগে ঠিক এই শ্লোকটাই আমি পড়ছিলাম।

তিনি পড়লেন। তিক্ত হাসি হেসে বললেন, ‘সত্যিই তো।’ একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ‘হ্যাঁ এই সব বইতে এরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে। আর এগুলো কারও নাকের সামনে ঠেলে দেওয়া বেশ সহজ। কিন্তু বলি এগুলো কাদের লেখা? মানুষের লেখা হতে পারে নাকি?’

‘এসব পবিত্র আত্মার রচনা’, আমি বললাম।

‘আপনি তো বুকনি ঝেড়ে খালাস।’ আবারও তিনি কাষ্ঠহাসি হাসলেন, তবে এবারে অনেকটা যেন ঘৃণামিশ্রিত।

আমি গ্রন্থটা আবার তুলে নিয়ে আরও একটি জায়গা খুললাম। তাঁকে দেখালাম ‘ইব্রীয়দিগের প্রতি’, নামে দশম অধ্যায়ের ৩১ সংখ্যক শ্লোক, যেখানে লেখা আছে: ‘জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে নিপতিত হওয়া ভয়াবহ।’

তিনি পড়লেন, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। এমনকি তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

‘এ যে ভয়ঙ্কর শ্লোক দেখছি!’ তিনি বললেন। ‘কিছু বলার নেই, খুঁজে খুঁজে বের করেছেন বটে।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আচ্ছা চলি। হয়তো আর আসবও না।... স্বর্গে দেখা হবে। তার মানে, চোদ্দ বছর ‘জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে নিপতিত’—এই চোদ্দ বছরকে তাহলে এই নামেই উল্লেখ করতে হয়। কাল আমি এই হাতকে অনুনয় করে বলব আমাকে যেন ছেড়ে দেয়।

ইচ্ছে করছিল তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই। কিন্তু তার মুখটা এত বেঁকে গিয়েছিল, এমন কঠিন দেখাচ্ছিল যে তাঁর দিকে তাকিয়ে সে সাহস আমার হল না। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

BengaliBook.org

'হা ঈশ্বর!' আমি ভাবলাম। 'লোকটা গেল কোথায়!' আমি তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বিগ্রহের সামনে বসলাম, আমাদের আশু দুর্গতিনাশিনী, আমাদের পরম সহায়, পরম গুণবতী দেবজননীর সামনে সাশ্রুনয়নে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বসে গেলাম। চোখের জল ফেলতে ফেলতে আধঘণ্টা ধরে প্রার্থনা করলাম। ততক্ষণে রাত অনেক হয়ে গেছে, প্রায় বারোটা। এমন সময় দেখি ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। আবার তিনি ভেতরে এসে ঢুকলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'আপনি কোথায় ছিলেন?' আমি তাকে জিগ্‌গেস করলাম।

তিনি বললেন, 'আমি   আমি   আমার মনে হল রুমাল না কী যেন একটা ভুলে ফেলে গেছি।   বেশ তো, না হয় কিছুই ভুলে ফেলে যাইনি, কিন্তু একটু বসতে দেবেন তো।

চেয়ারে বসলেন। আমি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আপনিও বসুন না', তিনি বললেন।

আমি বসলাম। এই ভাবে আমরা মিনিট দুয়েক বসে রইলাম। তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, হঠাৎ ম্লান হাসি হাসলেন—এটা আমার বেশ মনে আছে—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে চুমু খেলেন।...

'মনে রেখো', তিনি বললেন, 'আমার এই দ্বিতীয়বার আসার ঘটনাটা মনে রেখো। শুনছ? এটা মনে রেখো!'

এই প্রথম আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন। বলেই চলে গেলেন। 'কাল হবে', আমার মন বলল।

ঠিক তা-ই হল। সেদিন সন্ধ্যায় আমি জানতাম না যে পরের দিনটা ছিল তাঁর জন্মদিন। শেষের দিকে আমি নিজে কোথাও তেমন একটা বেরোতাম না, তাই কারও কাছ থেকে জানার উপায়ও ছিল না।

প্রতি বছর এই দিনটিতে তাঁর বাড়িতে একটা বড়ো রকমের সমাবেশের আয়োজন হত, শহরের সমস্ত লোক তাতে যোগ দিত। এবারেও তেমনি এসে জড়ো হয়েছে। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি কক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা কাগজ—তাঁর দপ্তরের কর্তার উদ্দেশে লেখা একটা আনুষ্ঠানিক বার্তা। কর্তাব্যক্তিটি যেহেতু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাই ভদ্রলোক সেখানেই সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে উচ্চকণ্ঠে লিখিত কাগজটি পড়ে শোনালেন। ওই কাগজে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁর সমস্ত অপরাধের পূর্ণ বিবরণ আছে।

পাঠ শেষ করে তিনি বললেন, 'আমি মনুষ্যসমাজে অপাংক্তেয় এক নরপিশাচ। ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়েছেন। আমি আমার পাপের জন্য দুঃখ বহন করতে চাই!'

এরপর চোদ্দ বছর ধরে যে সব জিনিস তিনি সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন এবং যেগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর অপরাধের প্রমাণ দেবেন বলে মনে করেছিলেন সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে এনে টেবিলের ওপর জড় করে রাখলেন। নিহত নারীর কয়েকটি

সোনার জিনিস, যা তিনি সন্দেহটা যাতে তাঁর ওপর এসে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে অপহরণ করেছিলেন, মেয়েটির গলা থেকে খুলে নেওয়া লকেট আর ক্রস—লকেটের ভেতরে তার প্রেমাস্পদের প্রতিকৃতি, একটা নোটবই, অবশেষে দুটি চিঠি  একটি মেয়েটিকে লেখা তার প্রেমাস্পদের চিঠি, যেখানে সে তার শীঘ্র আগমনের বার্তা জানিয়েছে, অন্যটি সেই চিঠির উত্তর, যা মেয়েটি লিখতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করে যেতে পারে নি—পরের দিন ডাকে পাঠাবে বলে টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল। দুটি চিঠিই তখন তিনি হস্তগত করেছিলেন—কেন, কে জানে? অপরাধের প্রমাণস্বরূপ সেগুলিকে কোথায় নষ্ট করে ফেলবেন তা না করে কেন যে পরে চোদ্দ বছর ধরে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন তাই বা কে জানে?

এর ফলে যা ঘটল তা এই যে সবাই তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল, আতঙ্কে শিউরে উঠল, কিন্তু কারোই বিশ্বাস করতে মন চাইল না, যদিও সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে শুনল—তবে তারা ধরে নিল যে ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর দিন কয়েক বাদে পাড়াপ্রতিবেশীরা সকলে এই স্থির সিদ্ধান্তে এলো এবং চূড়ান্ত রায় দিল যে হতভাগ্য লোকটির মাথাটা একেবারে গেছে। আদালতে মামলা না তুলে কর্তৃপক্ষের কোনো উপায় ছিল না ঠিকই, কিন্তু সে মামলা তাদের তুলেও নিতে হল  যে-সমস্ত জিনিস আর ওই যে চিঠিদুটো উপস্থিত করা হয়েছিল সেগুলি তাদের কাছে ভাবিয়ে তোলার মতো ছিল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও করা হল যে এই নিদর্শনগুলি যদি প্রামাণ্য হয়ও, একমাত্র তার ওপর ভিত্তি করে কোনো চূড়ান্ত অভিযোগ দাঁড় করানো যায় না। তা ছাড়া জিনিসগুলির কথা যদি ওঠে সে তো তিনি মেয়েটির কাছ থেকেই পেতে পারেন—এমনও তো হতে পারে যে একজন ভালো বন্ধু বলে বিশ্বাস করে সে নিজেই ওগুলি তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। প্রসঙ্গত, এও শুনেছি যে জিনিসগুলি যে ওই মেয়েটিরই, মৃতার চেনাপরিচিত ও আত্মীয়স্বজন পরে তা শনাক্ত করে। সেগুলির প্রামাণিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাতেও এই মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার নয়।

দিন পাঁচেক পরে সবাই জানতে পারল যে দুখি মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর জীবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কী সেই অসুখ তা আমি বলতে পারব না। লোকে বলাবলি করতে লাগল যে হৃদ্‌রোগ। কিন্তু প্রকাশ পেল, তাঁর স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের যে দলটিকে দিয়ে রোগীর মানসিক অবস্থাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। আমি কারও কাছে কোনও কথা ফাঁস করিনি, যদিও অনেকে আমার কাছে ধেয়ে এসে নানা প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করে তুলতে লাগল। কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম, অনেক দিন পর্যন্ত দেখা করতে দেয়নি—বিশেষত তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার কথা হল  'ওঁকে যদি কেউ বিগড়ে দিয়ে

থাকে সে আপনি। অমনিতে উনি আগেও মনমরা হয়ে থাকতেন, কিন্তু এই শেষ বছর খানেক হল সবাই লক্ষ করেছে তিনি অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন, অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করছিলেন—এই রকম যখন তাঁর অবস্থা ঠিক তখনই আপনি তাঁর সর্বনাশ করলেন। আপনি রাজ্যের কী সব পড়ে পড়ে শুনিয়ে ওঁর মাথাটা খেয়েছেন। পুরো একটা মাস উনি রাতদিন আপনার কাছে পড়ে থাকতেন।' কী আর বলব? শুধু ভদ্রমহিলা কেন শহরের সব লোকে আমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। 'এসব আপনার কীর্তি', এই বলে তারা আমাকে দুষল। আমি চুপ করে থাকি। আবার যে মানুষটি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেই নিজের দণ্ডবিধান করছে তার প্রতি ঈশ্বরের করুণা যে নিঃসন্দেহে প্রকাশ পেয়েছে এই দেখে আমার মনে মনে আনন্দও হচ্ছিল। লোকটার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

শেষকালে এক সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিলল। উনি নিজে আমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবেন বলে জিদ ধরলেন। ওঁর ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পেলাম শুধু দিন কেন প্রহরও তাঁর গোনাগুনতি। দুর্বল হয়ে গেছেন, হলদেটে দেখাচ্ছে তাঁকে, হাত কাঁপছে, হাঁপাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে আনন্দ ও উল্লাস।

'হল তা হলে!' তিনি আমাকে বললেন। 'কত দিন হল তোমাকে দেখার জন্য ছটফট করছি। এত দিন আসনি কেন?'

আমাকে যে তাঁর কাছে আসতে দেওয়া হয়নি একথা আর আমি তাঁকে জানালাম না।

'ঈশ্বর আমাকে করুণা করেছেন, তাঁর কাছে যাবার ডাক এসেছে। জানি আমি মারা যাচ্ছি, কিন্তু এত বছরের মধ্যে এই প্রথম আনন্দ উপলব্ধি করছি, মনে শান্তি পাচ্ছি। আমার যা করা দরকার ছিল যে মুহূর্তে আমি তা সম্পন্ন করলাম একমাত্র তখনই, তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরে স্বর্গরাজ্যের উপলব্ধি ঘটল। এখন কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসার এবং তাদের জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার স্পর্ধা আমি করতে পারি। আমার কথায় লোকে বিশ্বাস করেনি, কেউ বিশ্বাস করেনি—না আমার স্ত্রী, না আমার বিচারকরা। আমার ছেলেমেয়েরাও কখনও বিশ্বাস করবে না। এর মধ্যে আমি আমার সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করছি। আমি মারা যাব, কিন্তু আমার নাম ওদের কাছে কলঙ্কশূন্য হয়ে থাকবে। এবারে ঈশ্বরের আগমন আসন্ন উপলব্ধি করে স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠছে আমার হৃদয়।... আমি আমার কর্তব্য করেছি।

কথা বলতে পারছিলেন না, কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠছিলেন। আন্তরিক উষ্ণতায় তিনি আমার হাতে চাপ দিলেন, প্রদীপ্ত দৃষ্টি মেলে তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা বেশিক্ষণ চলল না, তাঁর স্ত্রী অনবরত ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি

মেরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছিলেন। তবু এরই মধ্যে ভদ্রলোক এক সময় নিচু গলায় আমাকে বলার অবকাশ পেলেন

'মনে আছে সেই যে সেবার মাঝরাত করে আরেকবার তোমার কাছে ফিরে এলাম? তোমাকে ঘটনাটা মনে রাখতে বলেছিলাম? জান, কেন আমি আবার এসেছিলাম? তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলাম!'

শুনে দারুণ চমকে উঠলাম আমি।

'আমি তখন তোমার ঘর ছেড়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে এসে এ রাস্তায় সে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে নিজেই নিজের সঙ্গে জুঝতে লাগলাম। হঠাৎই তোমার ওপর এমন একটা তীব্র ঘৃণা আমাকে পেয়ে বসল যে আমার হৃৎপিণ্ডের পক্ষে তা ধারণ করা প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠল। আমি মনে ভাবলাম, 'এখন আমি যদি কারও কাছে বাঁধা পড়ে থাকি তা হলে শুধু এই লোকটারই কাছে, একমাত্র এ-ই আমার বিচারক। আগামীকালের শাস্তির মুখোমুখি হতে আমি এখন অস্বীকার করি কী করে? এ লোকটা তো সব জানে।' কথাটা এই নয় যে তুমি আমার নামে লাগাতে পার বলে আমার মনে ভয় ছিল—এ কথা আমার কখনও মনেও আসে নি—কিন্তু ভাবলাম 'আমি যদি নিজের দোষ স্বীকার করতে না পারি তাহলে ওর মুখের দিকে তাকাব কী করে?' যদি তুমি সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীর পারেও থাক, তাহলেও তুমি বেঁচে তো আছ! তুমি যে বেঁচে আছ এবং সব কিছু জান, আমার বিচার করছ—যা-ই বল না কেন, এই চিন্তা আমার কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। তোমার প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা আমার মনে জেগে উঠল, আমার মনে হতে লাগল যেন তুমিই এসবের কারণ, সব দোষ তোমার। আমি তখন তোমার কাছে ফিরে এলাম। মনে পড়ে গেল তোমার টেবিলে একটা ছোরা পড়ে আছে। আমি বসলাম, তোমাকেও বসতে বললাম। তারপর পুরো এক মিনিট ধরে বিষয়টা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। আমি যদি তোমাকে খুন করে বসতাম তাহলে আগের হত্যাকাণ্ডের কথা যদি প্রকাশ নাও করতাম অমনিতে এই একটার জন্যই তো আমি খতম হয়ে যেতাম। তবে সে মুহূর্তে আমি ও নিয়ে আদৌ ভাবছিলাম না, ভাবতে চাইছিলামও না। আমি কেবল মনে মনে তোমাকে ঘৃণা করছিলাম এবং যা কিছু ঘটেছে সে সবের জন্য মনেপ্রাণে তোমার ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রভুর কৃপায় আমার ভেতরকার এই শয়তানটা পরাস্ত হল। শুধু জেনে রেখো, আর কখনও কিন্তু তোমাকে মৃত্যুর এত কাছাকাছি হতে হয়নি।'

এক সপ্তাহ পরে ভদ্রলোক মারা গেলেন। শহরসুদ্ধ সব লোক তাঁর শবানুগমন করল। প্রধান পুরোহিত আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। নিদারুণ ব্যাধিতে তাঁর আয়ু এই ভাবে ফুরিয়ে গেল বলে সকলে শোক করল। কিন্তু তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর থেকে শহরসুদ্ধ লোক আমার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল, এমনকি তাদের বাড়ির দরজাও আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য এটাও ঠিক যে এরই মধ্যে কেউ

কেউ—প্রথম প্রথম এক আধজন—কিন্তু পরে একটু একটু করে আরও বেশি সংখ্যায় লোকজন তাঁর সাক্ষ্যপ্রমাণের সত্যতায় বিশ্বাস করতে শুরু করে দিল এবং ঘন ঘন আমার কাছে এসে অত্যন্ত কৌতূহল আর আনন্দ সহকারে তাঁর ওই ঘটনা নিয়ে আমাকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, কারণ একজন নিষ্ঠাবান মানুষের অধঃপতন বা বদনামের মতো কিছু দেখতে পেলে লোকে খুশি হয়। কিন্তু আমি মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম, তাছাড়া অচিরেই আমি সেই শহরও পরিত্যাগ করলাম। এর পাঁচ মাস পরে পরম করুণাময় প্রভু তাঁর অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে সুস্পষ্টভাবে আমাকে যে পথের নির্দেশ দিলেন, পরম কৃতজ্ঞচিত্তে আমি সেই সুনিশ্চিত ও গৌরবময় পথে পদক্ষেপ করলাম। আর ঈশ্বরের সেবক, অশেষ দুঃখপীড়িত, মিখাইল নামে ওই মানুষটিকে আমি আজও ভুলিনি, আজও প্রতিদিনের প্রার্থনায় আমি তাকে স্মরণ করি।

## তিন

## মহাস্থবির জোসিমার আলোচনা ও উপদেশাবলী থেকে

### ঙ) রুশ সন্ন্যাসী ও তাঁর সম্ভাব্য তাৎপর্য প্রসঙ্গে

সাধু ও শিক্ষকবৃন্দ, সন্ন্যাসী কাকে বলে? আলোকপ্রাপ্ত জগতে, আজকের দিনে কেউ কেউ এই শব্দটিকে ঠাট্টার সঙ্গে উচ্চারণ করে, কারও কারও কাছে এটা আবার গালাগালসূচক। যত দিন যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি সমাজের এই অবজ্ঞা তত বাড়ছে। এটা অবশ্য সত্য, দুঃখের কথা হলেও এ সত্য না মেনে উপায় নেই যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে অলস অকর্মণ্য, উদরসর্বস্ব, দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত ছন্নছাড়া লোক নেহাৎ কম নেই। তাদের দিকেই আঙুল দেখিয়ে শিক্ষিত পার্থিব লোকসমাজ বলে: 'তোমরা সব সমাজের অলস অকর্মণ্য লোক, তোমরা পরান্নভোজী, নির্লজ্জ বেহায়া ভিক্ষুক।' অথচ সন্ন্যাসীদের মধ্যে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা বিনয়ী বিনম্র, যারা নির্জনে শান্তিতে নিরলস আরাধনার জন্য ব্যাকুল, তাঁদের নজির কিন্তু কমই দেওয়া হয়, এমনকি তাঁদের প্রসঙ্গ লোকে চুপচাপ এড়িয়ে যায়। অথচ লোকে শুনলে খুবই অবাক হয়ে যাবে যদি বলি এই যে বিনীত মানুষগুলি যাঁরা নির্জনে সাধনা করার জন্য এত ব্যাকুল, সম্ভবত তাঁদের দ্বারাই একদিন আমাদের মাতৃভূমি রাশিয়ার মুক্তি ঘটবে। কারণ শান্তি ও নীরবতার মধ্যে যথার্থই তাঁদের 'প্রতি দিবস, প্রতিটি প্রহর এবং প্রতিটি মাস ও বর্ষের' নিরন্তর প্রস্তুতি। সেই সুপ্রাচীন মুনিঋষি, ঈশ্বরপ্রেরিত প্রচারক আর শহিদদের কাছ থেকে ঈশ্বরের সত্যোপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে, বিজনে খ্রিস্টের যে ভাবমূর্তি তাঁর যে সুষমা আজও তাঁরা অবিকল রক্ষা করে চলেছেন, সময় যখন আসবে তখন দ্বিধাগ্রস্ত এই জাগতিক সত্যের সামনে

তা তাঁরা ঠিক তুলে ধরবেন। এ এক মহতী চিন্তা। পূর্ব দিগন্ত থেকে এই তারকার আলোক বিচ্ছুরণ ঘটবে।

সাধু সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে এই হল আমার ধারণা। এটা মিথ্যা? এটা কি স্পর্ধার কথা? একবার চেয়ে দেখুন বৈষয়িকদের দিকে, ঈশ্বরের এই জগতের মানুষগুলির ঊর্ধ্বে যারা নিজেদের তুলে ধরছে, তাদের সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কি ঈশ্বরের ভাবমূর্তি, তাঁর সত্য বিকৃত হচ্ছে না? তাদের আছে বিজ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞান—সে তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাত্র। মানবচেতনার উন্নততর যে অপরার্ধ, অতীন্দ্রিয় জগৎ—বিজ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অবহেলিত, অনেকটা যেন সাড়ম্বরে, এমনকি ঘৃণাভরেই উপেক্ষিত। পৃথিবী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে—বিশেষত সম্প্রতি। কিন্তু এই জাগতিক স্বাধীনতার মধ্যে আমরা কী দেখে থাকি?—দাসত্ব আর আত্মহনন ছাড়া আর কিছুই না! কারণ এ জগৎ বলছে 'তোমার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন তুমি মেটাও, কেন না সমাজে যারা ধন সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী তাদের যে অধিকার আছে সে অধিকার তোমারও আছে। তাই তোমার প্রয়োজন মেটাতে তুমি ভয় পেয়ো না, বরং সে দাবি ক্রমাগত বাড়িয়ে চল।' এই হল বর্তমান জগতের শিক্ষা। এরই নাম স্বাধীনতা। তা চাহিদা বাড়িয়ে চলার এই অধিকারের পরিণাম কী দাঁড়িয়েছে? ধনীদের কাছে তা *নিঃসঙ্গতা*, আত্মার আত্মহনন, আর দরিদ্রদের কাছে হিংসা ও হত্যা, কেন না অধিকার দেওয়া হলে কী হবে চাহিদা পরিতৃপ্ত করার উপায় যে কী তা কিন্তু এখনও কেউ বাতলে দেয়নি। আমাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা হচ্ছে যে যে-জগৎ যত দূরের সে জগৎ তত বেশি করে আমাদের কাছের জগতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চলেছে, বেশি করে গড়ে উঠছে মানুষে মানুষে মেলামেশা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, যেহেতু দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে, বেতারে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের ভাবনাচিন্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষে মানুষে এই যে ঐক্যবন্ধনের কথা বলা হচ্ছে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। স্বাধীনতাকে মানুষের চাহিদা বাড়িয়ে তোলা এবং চাহিদার আশু পরিতৃপ্তিবিধান বলে ধরে নেওয়ার অর্থ হবে মানুষের নিজের প্রকৃতির বিকার, যেহেতু এ থেকে মানুষের মনের মধ্যে বহু অর্থহীন কুপ্রবৃত্তি, বাসনা ও অভ্যাসের এবং অতি উদ্ভট সমস্ত কল্পনার জন্ম নেয়। মানুষ তখন শুধু পরশ্রীকাতরতা, উদরসর্বস্বতা ও আহ্লাদের নিয়ে বেঁচে থাকে। জাতিভেদ, গাড়ি ঘোড়া, পদমর্যাদা, সেবাদাস তখন এমনই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় যে সে প্রয়োজন মেটানোর জন্য লোকে মান সম্ভ্রম, মানবপ্রেম, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, তা মেটাতে না পারলে আত্মহননের পথ পর্যন্ত গ্রহণ করে। যারা ধনী নয় তাদের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক এই একই জিনিস দেখি। যারা দরিদ্র তারা মদ্যপানে তাদের অতৃপ্ত বাসনা আর হিংসার জ্বালার উপশম ঘটায়। কিন্তু অচিরেই মদ্যপানের বদলে রক্তপানের নেশা তাদের পেয়ে বসে, তারা সেই দিকেই পরিচালিত হয়। তা হলে বলুন, এমন মানুষকে কি স্বাধীন বলা যায়? আমি এমন একজন আদর্শবাদী সংগ্রামীকে

জানতাম যিনি আমাকে নিজমুখে বলেছেন যে বন্দি অবস্থায় কারাগারে তামাক না পেয়ে তিনি এতদূর কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে সামান্য একটু তামাক পেলে আরেকটু হলে তিনি তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতেন। এই মানুষই কিনা আবার বলে 'মানবজাতির জন্য সংগ্রাম করতে যাচ্ছি।' বলি, কোন্ সংগ্রামের সে উপযুক্ত? হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় কিছু একটা করে ফেলতে পারে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যদি স্বাধীনতার বদলে সে দাসত্বের কবলে গিয়ে পড়ে, মানবজাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃপ্রেমের স্বার্থে আত্মনিয়োগ না করে বরং বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে গিয়ে পড়ে—যে-কথা আমার যৌবনে আমাকে বলেছিলেন সেই রহস্যময় আগন্তুক, আমার সেই গুরু। এই কারণে পৃথিবীতে মানবজাতির সেবা এবং অখণ্ড মানবসত্তা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে, শুধু তাই নয়, এমনকি এ সব ধ্যানধারণা সত্যি সত্যি হেসে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু ইচ্ছাশক্তিহীন এই মানুষ কত আর পিছিয়ে পড়ে থাকবে তার অভ্যাস থেকে, তাকে ছেড়ে সে যাবেই বা কোথায়, যখন নিজের জন্য এই যে অসংখ্য চাহিদা সে নিজেই তৈরি করে রেখেছে সেগুলির তৃপ্তিসাধনে সে এত অভ্যস্ত? সে ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটাচ্ছে, এই অবস্থায় অখণ্ড মানবসত্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তার বয়েই গেছে। লাভের মধ্যে লাভ এই হল যে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় হল বটে, কিন্তু জীবনের আনন্দ হ্রাস পেল।

সাধু সন্ন্যাসীদের পন্থা—সে অন্য কথা। তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতা সংযমব্রত, তাঁদের প্রার্থনা লোকের উপহাসের বস্তু পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায়, অথচ যথার্থ স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রকৃত পন্থা কিন্তু একমাত্র এগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। এই পথেই আমি আমার বাড়তি ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা খর্ব করতে পারি, কর্তব্যপরায়ণতার সাহায্যে আবার আত্মাভিমানী ও গর্বোদ্ধত যথেচ্ছাচারকে দমন করতে পারি, তাকে শোধরাতে পারি, পরিণামে ঈশ্বরের সহায়তায় লাভ করতে পারি আত্মার বন্ধনমুক্তি, তারই সঙ্গে সেই *মুক্তির* পরমানন্দ! তাহলে বলুন, নিঃসঙ্গ ধনী, না পার্থিব বস্তু ও অভ্যাসের স্বৈরাচার থেকে মুক্ত এই মানুষটি—এদের দুজনের মধ্যে কে সেই মহতী চিন্তা তুলে ধরতে এবং তার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে বেশি সক্ষম? সন্ন্যাসীর নির্জনতাকে কটাক্ষ করে লোকে বলে 'তুমি তো তোমার নিজের মুক্তির জন্য নিরিবিলিতে মঠের প্রাচীরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাক, ভ্রাতৃভাবে মানুষের সেবার কথা তোমার কি আর মনে আছে?' বেশ তো দেখা যাক, ভ্রাতৃপ্রেমের প্রেরণায় মানুষের সেবা করার উৎসাহটা কার বেশি। কারণ, আমি বলব, যে নির্জনতার অন্তরালের কথা হচ্ছে সেটা আমাদের নয়, ওদের; কিন্তু ওরা তা দেখতে পাচ্ছে না। জাতীয় জীবনে যাঁরা কর্মবীর সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের এই সাধু সম্প্রদায় থেকেই তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে, আজও তা ঘটবে না কেন? সেদিনকার মতো সেই শান্ত সংযত বিনম্র, সংযমব্রতধারী ও মৌনব্রতীরাই মাথা

তুলে উঠে দাঁড়াবে, মহৎ কর্মে ব্রতী হবে। রুশদেশের মুক্তির উৎস তার জনগণ। রুশদেশের মঠগুলি স্মরণাতীতকাল থেকে জনসাধারণের সঙ্গে ছিল। জনগণ যদি নিজেকে নির্জনে গুটিয়ে নেয় তা হলে আমরাও নিজেদের নির্জনে গুটিয়ে নিয়ে পড়ে থাকি। জনগণ আমাদের পন্থায় বিশ্বাস করে, তাই কোনো অবিশ্বাসী সমাজকর্মীর সাধ্য কি আমাদের রুশ দেশে কিছু করতে পারেন—তা তাঁর ইচ্ছা যত আন্তরিকই হোক, তিনি যত বড়ো প্রতিভারই অধিকারী হোন না কেন। এটা মনে রাখবেন। জনগণ নিরীশ্বরবাদীর মুখোমুখি হলে তাকে ঠিক দমন করবে, রাশিয়া সনাতন ধর্মবিশ্বাসে অটুট ও ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তাই জনগণের যত্ন নিন, জনগণের হৃদয়কে বাঁচান। শান্তিতে তাদের শিক্ষা দান করুন। আপনারা যাঁরা সন্ন্যাসী সেটাই হবে আপনাদের মহৎ কীর্তি, কেননা এই জনগণের অন্তরেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান।

### চ) প্রভু-ভৃত্য প্রসঙ্গে এবং তারা মনেপ্রাণে একে অপরের ভ্রাতা হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে দু চার কথা

আবার এটাও ঠিক যে সাধারণ মানুষের মধ্যেও পাপ আছে। দুর্নীতি তাদের মধ্যে প্রতিদিন, এমনকি দৃশ্যত প্রতি প্রহরে লেলিহান অগ্নিশিখার মতো হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে। সেটা আসছে ওপরতলা থেকে। জনজীবনকেও গ্রাস করছে বিচ্ছিন্নতার শক্তি। জোতদার আর মহাজনরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে ব্যাবসাদার শ্রেণির লোকেরা উত্তরোত্তর বেশি করে সামাজিক মানমর্যাদা লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে, নিজেদের শিক্ষিত বলে জাহির করার চেষ্টা করছে, যদিও শিক্ষাদীক্ষার লেশমাত্র তাদের নেই। তারা যে শিক্ষিত সেটা দেখানোর জন্য প্রাচীন রীতিনীতিকে তারা নিদারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখে, এমনকি পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাসের জন্যও লজ্জা বোধ করে। প্রিন্সদের কাছে তাদের যাতায়াত, অথচ তারা নিজেরা উচ্ছন্নে যাওয়া চাষাভুসো শ্রেণির লোক ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষ পচে মরছে, মদের নেশায় ডুবে আছে, সে নেশা কাটিয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারছে না। আর পরিবারের লোকজনের ওপর, স্ত্রী আর সন্তানদের ওপর কী দারুণ নির্যাতন!—এ সবই সে মদের নেশা থেকে। আমি কলকারখানায় দশ বছরের শিশুদেরও দেখেছি রোগা, হাড়জিরজিরে, ন্যুব্জদেহ, ইতিমধ্যে কলুষিত। কারখানা ঘরের দম আটকানো পরিবেশ, যন্ত্রপাতির ঘর্ঘর আওয়াজ, সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, অশ্লীল কথাবার্তা আর মদ্যপান, আবার মদ্যপান — এতটুকু একটা শিশুর মনের কি এটা চাহিদা হতে পারে? তার যা দরকার তা হল সূর্যের আলো, খেলাধুলো; তার চারদিকে চাই উজ্জ্বল সমস্ত দৃষ্টান্ত আর ভালোবাসা—অন্তত একরত্তি ভালোবাসা। সাধুগণ, এমনটা আর কতকাল চলতে দেওয়া যেতে পারে? কতদিন আর চলতে থাকবে এই শিশু নির্যাতন? আপনারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান, এখুনি, এই

মুহূর্তে এর প্রতিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন! কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর রাশিয়াকে উদ্ধার করবেন, কারণ এই সাধারণ চাষাভুসো মানুষগুলো যদিও লম্পট প্রকৃতির এবং যে পাপপঙ্কে তারা ডুবে আছে সেখান থেকে উঠে আসার ক্ষমতা যদিও তাদের নেই, তবু তারা জানে যে তাদের এই নোংরা পাপের জন্য তারা ঈশ্বরের অভিশাপ কুড়োচ্ছে, তারা যা করছে তা মন্দ, পাপাচার। তাই বলছিলাম কি, আমাদের দেশের মানুষ এখনও সত্যে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরকে স্বীকার করে, ভক্তিগদগদ চিত্তে অশ্রুবিসর্জন করে। ওপরতলার লোকদের মতো নয়। ওপরতলার লোকেরা বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে, একমাত্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে, তবে আগেকার দিনের মতো খ্রিস্টকে বাদ দিয়েই নিজেদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চায়। ইতিমধ্যে তারা ঘোষণাও করেছে যে অপরাধ বলে কিছু নেই, পাপেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। তা তাদের বিচারে ঠিক বৈ কি। ঈশ্বরই যদি না থাকেন তাহলে আর অপরাধ কীসের? ইউরোপে জনসাধারণ ইতিমধ্যে ধনীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, বলপ্রয়োগ করছে। জননায়করা সর্বত্র তাদের খুনোখুনির পথে পরিচালনা করছে, এই বলে তাদের বোঝাচ্ছে যে তাদের এই রোষানল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু 'অভিশপ্ত উহাদিগের রোষ, যেহেতু উহা নিষ্ঠুর।' রাশিয়াকে উদ্ধার করবেন প্রভু, এর আগেও বহুবার যেমন করেছেন। মুক্তি আসবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, তাদের বিশ্বাস আর নম্রতা থেকে। সাধুগণ ও শিক্ষকগণ, আপনারা জনসাধারণের বিশ্বাসকে সযত্নে রক্ষা করুন, তাদের বিশ্বাস নিছক স্বপ্ন নয়। সারা জীবন ধরে আমাদের দেশের সুমহান জনগণের মধ্যে যথার্থ ও অতুলনীয় মর্যাদাবোধের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি অবাক হয়েছি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নিজে আমি তার সাক্ষ্যও দিতে পারি। দেখেছি, দেখে বিস্মিত হয়েছি, এমন কি দেশের সাধারণ মানুষের চরম দৈন্যদশা এবং তাদের জঘন্যতম পাপ সত্ত্বেও তারই মধ্যে দেখতে পেয়েছি। দু শতাব্দী ধরে তারা ভূমিদাস ছিল[১৭১], অথচ দাসমনোভাবাপন্ন তারা নয়। তাদের হালচাল, আচার আচরণ স্বাধীন, কিন্তু কোন অবজ্ঞার ভাব তাদের মধ্যে নেই। তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, ঈর্ষাপরায়ণ নয়। তাদের কথা হল 'তুমি ধনী, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান—বেশ তো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমাকে আমি সম্মান করছি, কিন্তু আমি জানি আমিও একজন মানুষ। তোমাকে যে আমি ঈর্ষা না করে সম্মান করছি সেটাই তো তোমার সামনে আমার মনুষ্যত্ববোধের পরিচয়।' বস্তুত একথা যদি তারা মুখে নাও বলে—যেহেতু তারা এখনও জানে না কী ভাবে বলবে—তাদের *আচার আচরণের* মধ্য দিয়ে যে অন্তত তা প্রকাশ পায় এটা আমি নিজে দেখেছি, নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি; আর আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমাদের রুশিদের মধ্যে যে মানুষ যত গরিব, সমাজে যার স্থান যত নিচে তারই মধ্যে তত বেশি করে এই পরম সত্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায়; তার কারণ, যারা ধনী—জোতদার আর লুঠেরা শ্রেণির সেই মানুষগুলি—ইতিমধ্যেই বহুলাংশে কলুষিত, যার অনেকটাই আবার ঘটেছে আমাদের

নিজেদের অবহেলা ও অনবধানতার দরুন! কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মানুষগুলিকে উদ্ধার করবেন, কেন না রাশিয়ার মহত্ত্ব তার নম্রতায়। আমার স্বপ্ন আমি যেন দেখতে পাই আমাদের আগামী ভবিষ্যতের রূপটি এবং এখনই যেন তা পরিষ্কার দেখতেও পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি এক দিন আসবে যেদিন অতি বড়ো দুরাচারী ধনীরও এমন অবস্থা হবে যে দরিদ্রদের সামনে সে তার ঐশ্বর্যের জন্য লজ্জা বোধ করবে, আর যে দরিদ্র সে ধনীর এই নম্রতা দেখে তাকে বুঝতে পারবে, তার এই গৌরবান্বিত লজ্জার মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে সানন্দে, সাদরে তাকে মেনে নেবে। বিশ্বাস করুন, শেষ পর্যন্ত তাই হবে, ঘটনা সে দিকেই গড়াচ্ছে। সাম্য একমাত্র মানবাত্মার গরিমাবোধের মধ্যে নিহিত, আর সেটা শুধু আমাদের দেশের মানুষই বুঝতে পারবে। মানুষ যদি মানুষের ভাই হয়ে উঠতে পারে তবেই না ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে! কিন্তু যতক্ষণ না ভ্রাতৃত্ববোধ দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ সম্পদের যথার্থ বণ্টন হবে না, কখনও হতে পারে না। আমরা খ্রিস্টের মূর্তিকে আগলে রেখেছি। মহামূল্যবান হীরকের দ্যুতির মতো তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সমগ্র বিশ্বচরাচর। তথাস্তু, তথাস্তু!

সাধু ও শিক্ষকবৃন্দ, আমার জীবনে একবার একটা আবেগময় ঘটনা ঘটেছিল। আমি তখন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে ঘুরতে ঘুরতে জেলাশহর ক-তে এসেছি, সেখানে আমার এক কালের আর্দালি আফানাসির সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে ততদিনে আট বছর কেটে গেছে। ঘটনাচক্রে বাজার এলাকায় আমাকে দেখতে পায়। দেখে চিনতে পেরে আমার কাছে ছুটে এলো। যে ভাবে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে এলো সে আর কী বলব! 'ভগবান! কর্তা, আপনি? আপনাকেই দেখছি কি?' এই বলে তার বাড়িতে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

ততদিনে সে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছে, বিয়ে করেছে, দুটি ছোটো বাচ্চাও আছে তার। সে আর তার স্ত্রী দুজনেই গলায় বাক্স ঝুলিয়ে বাজারে খুচরো জিনিসপত্র ফিরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। দরিদ্রের ঘর, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আনন্দোচ্ছল। আমাকে বসিয়ে চায়ের জন্য সামোভার গরম করতে বসাল, স্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাল, এমন ভাব করতে লাগল যেন আমার আগমনটা ওদের কাছে একটা উৎসবের ব্যাপার। বাচ্চা দুটোকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'ওদের আপনি আশীর্বাদ করুন প্রভু!'

'আমি আশীর্বাদ করব কী?' ওর কথায় আমি বললাম। 'আমি একজন অতি সাধারণ দীনহীন সন্ন্যাসী। ঈশ্বরের কাছে ওদের জন্য প্রার্থনা করব। আর তোমার প্রসঙ্গে বলি, আফানাসি পাভ্লভিচ্ সে দিনের সেই ঘটনার পর থেকে রোজ, প্রতিটি দিন তোমার নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আসছি, কারণ সবই এসেছে তোমার কাছ থেকে। এই বলে আমি যে ভাবে পারলাম বিষয়টি ওকে ব্যাখ্যা করে বললাম। কী হল ভাবতে পারেন? লোকটা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, কিছুতেই

ধারণা করতে পারে না যে আমি তার এক কালের মনিব, একজন অফিসার কিনা এখন এমন রূপ ধরে, এমন বেশ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত! এমনকি কেঁদেই ফেলল।

'আরে কাঁদার কী আছে?' আমি ওকে বললাম। 'তুমি এমন একজন লোক যাকে আমি কখনও ভুলতে পারি না। ওহে আমার দরদি বন্ধু, বরং প্রাণ খুলে আমার জন্য আনন্দ কর, কারণ আমি যে পথ গ্রহণ করেছি তা আনন্দোচ্ছল ও আলোকোজ্জ্বল।'

বেশি কথা সে বলল না। বারবার আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগল, বিগলিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

'আপনার বিষয়সম্পত্তির কী হল?' সে আমাকে জিগ্‌গেস করল।

উত্তরে আমি বললাম, 'মঠে দিয়ে দিয়েছি। ওখানে আমরা সব এক সঙ্গে থাকি।'

চা পানের পর আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি এমন সময় সে মঠে দান করার জন্য একটা আধুলি আমার হাতে তুলে দিল। তারপর দেখি আরও একটা আধুলি তাড়াতাড়ি করে আমার হাতে গুঁজে দিচ্ছে। 'এটা কিন্তু আপনাকে', সে বলল। 'আপনি পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী, আপনার কাজে লাগতে পারে প্রভু।'

আমি সেই আধুলিটা গ্রহণ করে তাকে এবং তার স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে সানন্দ চিত্তে তাদের বাড়ি ছেড়ে আবার পথে নামলাম। পথে যেতে যেতে ভাবলাম 'এই তো এখন এই আমরা দুজনে— সে তার বাড়িতে বসে আর আমি পথ চলতে চলতে— অবশ্যই আহা-উহু করছি, ঈশ্বর কী করে আমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিলেন এই মনে করে কেমন ঘন ঘন মাথা নাড়ছি, মনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুজনেই মুচকি মুচকি হাসছিও।'

এর পর তার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। আমি তার প্রভু ছিলাম, সে ছিল আমার ভৃত্য, কিন্তু এখন আমি যখন অধ্যাত্ম চেতনায় আকুল হয়ে তাকে চুম্বন করেছি, প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছি তখন আমাদের দুজনের মধ্যে এক উদার মানবিক ঐক্যের বন্ধন গড়ে উঠেছে। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু এখন আমার একটা কথাই মনে হয়  আচ্ছা, আমাদের রুশ দেশের সকল মানুষের মধ্যে যথাসময়ে এবং সর্বত্র ঠিক এই রকম উদার ও সরল মনের ঐক্য যে গড়ে উঠলেও উঠতে পারে এটা কি বুদ্ধির একেবারেই অগম্য? আমার বিশ্বাস এটা ঘটবে, সে দিন আসন্ন।

দাস-দাসীদের প্রসঙ্গে আরও যোগ করি : অল্পবয়সে চাকরবাকরদের ওপর আমি খুব রাগারাগি করতাম। 'রাঁধুনি বড্ড বেশি গরম খাবার দিয়েছে, আর্দালি পোশাকটা ভালোমতো বুরুশ করে নি'—এই রকম নানা অজুহাত থাকত তার পিছনে। সেই সময় হঠাৎ একদিন ছোটোবেলায় আমার বড়ো আদরের দাদার মুখে শোনা একটি চিন্তা আমার মনকে আলোকিত করে তুলল। দাদা বলেছিল  'একজন লোক আমার

সেবা করবে আর আমি তার দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর হম্বিতম্বি করব এটা কি আমার এতটুকু মানায়?' অত্যন্ত স্পষ্ট, অতি সাধারণ এমন একটা চিন্তা যে এত দেরি করে আমাদের মাথায় আসতে পারে তা ভেবে আমি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দাস-দাসী ছাড়া এ পৃথিবীতে চলে না ঠিকই, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে তোমার ভৃত্য যদি ভৃত্য না হত তাহলে মনেপ্রাণে যতটা স্বাধীন থাকতে পারত তার চেয়ে যেন বেশি স্বাধীন থাকতে পারে। কেন আমি আমার ভৃত্যের ভৃত্য হতে পারি না, এমনকি সেভাবে হতে পারি না যাতে সেটা ঠিক তার চোখে পড়ে এবং সেখানে আমার কোনো গর্ব বা তার দিক থেকে কোনো অবিশ্বাসের ভাব না থাকে? কেন আমার ভৃত্য আমার একজন আত্মীয়ের মতো হবে না? কেন এমন হবে না যে আমি তাকে শেষ পর্যন্ত আমার পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারি? এমনকি এই এখনও কিন্তু এটা করা সম্ভব, এবং করতে পারলে তা ভবিষ্যতে মানুষে মানুষে সুমহান ঐক্যবন্ধনের এমন এক ভিত্তি হয়ে উঠবে যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ আর তার নিজের জন্য ভৃত্যের সন্ধান করবে না, অথবা আজকের দিনে লোকে যেমন করে থাকে সেই ভাবে তারই স্বজাতির একজনকে ভৃত্যে পরিণত করতে তার প্রবৃত্তি তো হবেই না বরং সে নিজেই সুসমাচারের আজ্ঞামতো মনপ্রাণ দিয়ে সকলের ভৃত্য হতে চাইবে। ঔদরিকতা, ভ্রষ্টাচার, দম্ভ, আত্মশ্লাঘা এবং অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আজকের দিনের এই সব নিষ্ঠুর মাতামাতির মধ্যে আনন্দের সন্ধান না করে অবশেষে মানুষ যেন জ্ঞানালোক ও করুণার বশবর্তী হয়ে কীর্তি সম্পাদন করে একমাত্র তারই মধ্যে আনন্দের সন্ধান পায়—এই যে চিন্তা, এটা কি নিছক স্বপ্ন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা নয়, সে দিন আসন্ন। আমার একথা শুনে লোকে হাসে, প্রশ্ন করে 'তা সে কবে আসবে? আসবে বলে দেখেশুনে মনে হচ্ছে কি?' আমার কিন্তু মনে হয় খ্রিস্টের সহায়তায় আমরা এই মহৎ কর্ম সাধন করব। এই পৃথিবীতে, মানবজাতির ইতিহাসে কত বিচিত্র সব চিন্তাধারাই না দেখা গেছে যা সেগুলির আবির্ভাবের দশ বছর আগে পর্যন্ত অভাবনীয় ছিল কিন্তু পূর্বনির্ধারিত রহস্যময় মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা প্রকাশ পেয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল! আমাদের দেশেও তাই হবে। আমাদের জনগণ বিশ্বজগৎকে আলোকিত করবে। সকলে তখন বলবে 'যে প্রস্তরখণ্ডকে নির্মাণকারীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল তা ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।' আর যারা আমাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে তাদেরও আমরা প্রশ্ন করতে পারি বেশ তো, আমাদেরটা যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে তা হলে তোমরাই বল না খ্রিস্টকে বাদ দিয়ে, একমাত্র তোমাদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বল করে কবে তোমরা তোমাদের ইমারত খাড়া করতে পারবে এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারবে? আর তারা নিজেরা যদি জোর দিয়ে এমন কথা বলেও যে বরং তারাই ঐক্যের দিকে চলেছে তাহলে

তাদের মধ্যে যারা অতি সরলমতি কেবল তারাই সে কথায় সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করে। আর তাদের সেই বিশ্বাস এমনই যে তাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। বস্তুত তাদের কল্পনাশক্তি আমাদের চেয়ে বেশি প্রখর। তারা নিজেদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে, কিন্তু খ্রিস্টকে অস্বীকার করার পরিণাম এই হবে যে পৃথিবীকে তারা রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবে, যেহেতু খুনের বদলা খুন, আর তরবারি যে কোষমুক্ত করেছে, তরবারিতেই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। খ্রিস্টের দৈব প্রতিশ্রুতি যদি না থাকত তা হলে তো আর দেখতে হত না—নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে মরত, পৃথিবীতে মানুষ বলতে থাকত শেষ দুজন। সেই শেষ দুজনও আবার তাদের নিজেদের অহংকারবশত কেউ কাউকে সামলানোর কথা ভাবত না, ফলে শেষ মানুষটি তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী মানুষটিকে খতম করত এবং পরে নিজেই নিজেকে খতম করত। এটাই হত, যদি খ্রিস্টের এই অঙ্গীকার না থাকত যে যারা বিনম্র, যারা শান্ত প্রকৃতির তাদের মুখ চেয়ে এই ব্যাপারটি হ্রাস পাবে।

আমার সেই ডুয়েলের পর, তখনও অফিসারের ইউনিফর্ম আমার গায়ে, আমি সমাজে ভৃত্যদের প্রসঙ্গে এই সব কথা বলে বেড়াতে লাগলাম। তাতে, আমার মনে আছে, সবাই অবাক। সকলেই প্রশ্ন করে 'তাহলে কী করতে বল? চাকরকে সোফায় বসিয়ে চা পানে আপ্যায়ন করতে বল নাকি?' উত্তরে আমি তাদের বলি: 'তা নয়ই বা কেন? অন্তত কখনও-সখনও তো হতেই পারে।' সবাই তখন হেসে খুন। তাদের প্রশ্ন ছিল হালকা মেজাজের, আমার জবাবটাও ছিল অস্পষ্ট ধরনের, কিন্তু আমার মনে হয় তার মধ্যে একটা সত্যও ছিল।

## ছ) প্রার্থনা, প্রেম এবং অন্য জগতের সান্নিধ্য প্রসঙ্গে

হে যুবক, প্রার্থনা করতে ভুলো না। তোমার প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয় তা হলে যত বার তুমি প্রার্থনা করবে ততবার তোমার সেই প্রার্থনার মধ্যে ঝলক দেবে এক ধরনের অনুভূতি আর তার মধ্যেই থাকবে এমন এক নতুন চিন্তা যা ইতিপূর্বে তোমার জানা ছিল না। সেই চিন্তা তোমাকে উদ্দীপিত করে তুলবে, তুমি বুঝতে পারবে প্রার্থনা এক ধরনের শিক্ষা। আরও মনে রাখবে, প্রতিদিন এবং যখনই সময় পাবে তখনই মনে মনে বলবে 'হে প্রভু, আজ তোমার সম্মুখে যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের সকলকে তুমি করুণা কর।' কারণ এই যে প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিটি মুহূর্তে এই পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ত্যাগ করছে, তাদের আত্মা ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে এমন কতশত মানুষই না আছে যারা সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শোক দুঃখ ও বিষণ্ণতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছে, যাদের জন্য দুঃখ করার মতো কেউ নেই, এমনকি তারা বেঁচে ছিল কিনা সে ধারণা পর্যন্ত কারও নেই।

তাই ইহলোকের এই প্রান্ত থেকে তাদের আত্মার শান্তির জন্য তুমি যদি প্রার্থনা কর তাহলে তোমার সেই প্রার্থনাও হয়তো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে, যদিও সেই মানুষগুলিকে তুমি আদৌ কখনও জানতে না এবং তারাও তোমাকে জানত না। ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়ে আত্মা যখন তটস্থ, সেই মুহূর্তে যদি কোনো মানুষ উপলব্ধি করে যে তার জন্যও প্রার্থনা করার মতো কেউ আছে, পৃথিবীতে এমন মানবসত্তাও আছে যে তাকে ভালোবাসে তখন সে ভেতরে ভেতরে কী দারুণ উচ্ছ্বসিতই না হয়ে উঠবে! আর ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম যেহেতু তোমার তুলনায় অনেক বেশি, যেহেতু তার কোনো সীমাপরিসীমা নেই, সেই হেতু তুমি যখন তার প্রতি এত করুণা প্রদর্শন করেছ তখন তোমাদের দুজনের প্রতিই ঈশ্বরের আরও কত বেশি করুণাই না বর্ষিত হবে! তিনি তাই তোমার খাতিরে তাকে ক্ষমাও করবেন।

ভ্রাতৃগণ, মানুষের পাপকে ভয় করবে না। মানুষকে তার পাপ সত্ত্বেও ভালোবাসবে, কারণ সেটাই স্বর্গীয় প্রেমের তুল্য এবং পার্থিব প্রেমের পরাকাষ্ঠা। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসবে, সামগ্রিক ভাবে ভালোবাসবে, প্রতিটি বালুকণাকে ভালোবাসবে। বৃক্ষের প্রতিটি পত্রকে, ঈশ্বরের সূর্যালোকের প্রতিটি রশ্মিকে ভালোবাসবে। জীবে প্রেম কর, উদ্ভিদে প্রেম কর, সর্বভূতে প্রেম কর। সর্বভূতে প্রেম প্রসারিত হলে তবেই না সর্বভূতে পরমাত্মার লীলা উপলব্ধি করতে পারবে! একবার যদি সে বোধ হয় তা হলে যত দিন যাবে তত বেশি করে, অনুক্ষণ, অহরহ তুমি তোমার অন্তরে তা উপলব্ধি করতে থাকবে। পরিণামে সমগ্র বিশ্বজগৎ একান্তভাবে তোমার সর্বগ্রাসী প্রেমের আলিঙ্গনে ধরা দেবে। জীবে প্রেম কর। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবকে মননের বীজমন্ত্র ও শান্ত সমাহিত আনন্দ দান করেছেন। সেখানে বিক্ষোভের উদ্রেক কোরো না, জীবকে কষ্ট দিয়ো না, আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোরো না, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরোধিতা কোরো না। হে মানুষ, নিজেকে জীবজন্তুর ঊর্ধ্বে স্থাপন কোরো না। তারা নিষ্পাপ, কিন্তু তুমি এই ধরণীতে আবির্ভূত হয়ে তোমার গরিমা দিয়ে তাকে পঙ্কিল করে তুলছ এবং তোমার পরেও সেই পঙ্কিলতা ধরণীর বুকে রেখে যাচ্ছ। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই এটা সত্য! বিশেষ করে শিশুদের ভালোবাসতে শেখো, কারণ স্বর্গীয় দেবদূতদের মতো তারাও নিষ্পাপ। এই পৃথিবীতে থেকে তারা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে কোমল করে, আমাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করে এবং আমাদের এক ধরনের পথের নির্দেশ দেয়। যে মানুষ শিশুকে অবহেলা করে তাকে ধিক! সাধু আনফিম আমাকে শিশুদের ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। আমাদের প্রব্রজ্যার সময় দরদি ও নীরব এই মানুষটিকে আমি অনেক সময়ই দেখেছি যে কয়েক কপর্দক ভিক্ষা আমাদের মিলত তাই দিয়ে তিনি মিষ্টি রুটি লজেন্স এই সব কিনে ওদের মধ্যে বিলি করতেন। মানুষটি এমন যে কোনো শিশুকে তিনি উদাসীন ভাবে এড়িয়ে যেতে পারতেন না, তারা তার অন্তরে বিপুল আলোড়ন সঞ্চার করত।

মানুষের কোনো কোনো চিন্তার সামনে পড়ে, বিশেষত তার পাপের নমুনা দেখে হতবুদ্ধি হতে হয়। তখন তোমার নিজের মনেই প্রশ্ন জাগবে 'শক্তি, না বিনম্র ভালোবাসা—কোন্‌টা এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা ঠিক হবে?' চিরকালের জন্য এটাই স্থির সঙ্কল্প করবে 'বিনম্র ভালোবাসা দিয়ে জয় করব।' একবার যদি মনে মনে এই সঙ্কল্প কর তা হলে দেখবে সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হবে। প্রেমের এই যে নম্রতা এ এক ভয়ঙ্কর শক্তি, যে-কোনো শক্তির চেয়ে প্রবল, তার কোনও তুলনা নেই। প্রতিদিন, প্রতিটি প্রহর, প্রতি মুহূর্ত নিজের কাছাকাছি ঘুরে ঘুরে দেখ, নিজের প্রতি লক্ষ করে দেখ, তোমার ভাবমূর্তি যেন শোভন সুন্দর হয়। হয়তো তুমি কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে আছ, এই অবস্থায় ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বাজে কথা উচ্চারণ করতে করতে একটা ছোটো বাচ্চার পাশ দিয়ে চলে গেলে, বাচ্চাটাকে তুমি হয়তো লক্ষও করলে না। কিন্তু সে তোমাকে ঠিক লক্ষ করেছে, আর যেহেতু তার কাঁচা মনের কোনো রক্ষাকবচ নেই তাই তোমার যেই কদর্য নোংরা চেহারাটা তার ওপর ছাপ ফেলেও রেখে যেতে পারে। তুমি সেটা জানতেও পারলে না, অথচ তোমার এই আচরণের ফলে তুমি হয়তো ইতিমধ্যে তার মনের মধ্যে বিষের বীজ বপন করলে, যা কালে অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সবেরই কারণ এই যে বাচ্চাটার সামনে তুমি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দাও নি, যেহেতু বিচক্ষণ ও সক্রিয় প্রেমের শিক্ষা তোমার কখনও হয়নি। ভ্রাতৃগণ, প্রেম আমাদের শিক্ষাদাত্রী, কিন্তু তাকে কী করে অর্জন করতে হয় তা জানা দরকার, কেন না তাকে আয়ত্তে আনা কঠিন। অনেক মূল্যে, বহু দিনের বহু পরিশ্রমে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায়, কারণ এ প্রেম চিরন্তন প্রেম, নিছক মুহূর্তকালের আকস্মিক প্রেম নয়। আকস্মিক প্রেম তো যে কারও মনেই জাগতে পারে—একজন দুর্বৃত্তের মনেও জাগতে পারে। আমার সেই কিশোর দাদাটি পাখিদের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। সেটা অর্থহীন মনে হতে পারে, অথচ সত্য, কেন না সব সেই মহাসাগরের তরঙ্গমালার মতো—একে অন্যের সংস্পর্শে এসে একাকার হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তাই পৃথিবীর একটা জায়গা স্পর্শ করলে আরেক প্রান্তে অনুরণন জাগে। পাখিদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা পাগলামি মনে হতে পারে—তা হোক; কিন্তু তাতে পাখিরা আরও একটু স্বচ্ছন্দ বোধ তো করতই। আর তোমার নিজের দিক থেকে, তুমি এখন যেমন আছ, যদি তার চেয়ে মহৎ ও উদার হতে পার তাহলে শিশুরা—শুধু শিশুরাই বা কেন—তোমার আশে পাশের আর সমস্ত জীবই আরেকটু স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারত—তা হলই না হয় যৎসামান্য। তোমাদের তো বলছিই, সব সেই মহাসাগরের মতো। তখন সর্বভূতে অখণ্ড প্রেমের অনুভূতি তোমাকে আকুল করে তুলবে, এক ধরনের পরম পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে তুমি পাখিদের কাছেও প্রার্থনা করবে, প্রার্থনা করবে যেন তারাও তোমাকে তোমার পাপ থেকে উদ্ধার করে।

এই পরমানন্দের মূল্য দিয়ো—তা সে লোকের কাছে যত নিরর্থকই মনে হোক না কেন।

হে আমার বন্ধুরা, ঈশ্বরের কাছে আনন্দ যাচ্ঞা কর। শিশুর মতো আনন্দ কর, দ্যুলোকের মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো আনন্দ কর। অন্যদের পাপ তোমাদের কর্মের পথে যেন বিভ্রান্তি না ঘটায়। এই ভেবে ভয় পেয়ো না যে অন্যের পাপ তোমাদের পুণ্যকর্মকে মুছে ফেলবে, তা সম্পন্ন করতে দেবে না। একথা বোলো না যে ‘পাপের শক্তি প্রবল, অন্যায়ের শক্তি প্রবল, দুর্নীতিময় পরিবেশের শক্তি প্রবল—এ সবের মাঝখানে আমরা নিঃসঙ্গ, সহায় সম্বলহীন। দুর্নীতিময় পরিবেশ আমাদের ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে, আমাদের শুভকর্ম সম্পন্ন করতে দেবে না।’ বৎসগণ, এই রকম হতাশ ভাব সত্বর মন থেকে দূর কর! এক্ষেত্রে পরিত্রাণের উপায় একটাই : নিজেরাই নিজেদের হাল ধর, মানুষের সমস্ত পাপের জন্য নিজেদের দায়ী কর। বিশ্বাস কর বন্ধু, এটাই সঠিক পন্থা। যেই মাত্র সকলের এবং সব কিছুর দায় অন্তর থেকে নিজের ওপর গ্রহণ করলে অমনি দেখবে আসলেও ঠিক তাই সকলের সব দায় তো তোমারই। কিন্তু তোমার নিজের অকর্মণ্যতা ও অক্ষমতার দায় যদি অন্যের ঘাড়ে চাপাতে যাও তাহলে পরিণামে শয়তানের অহমিকার সঙ্গে তোমার সংযোগ ঘটবে এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিরাগের ভাবই প্রকাশ পাবে। শয়তানের অহমিকার কথা যদি বল, আমার মনে হয় আমাদের এই পৃথিবীতে তাকে বুঝতে পারা শক্ত, আর সেই কারণে আমরা যখন কোনো উত্তম ও মহৎ কাজ করছি বলে মনে মনে ভাবছি, এমনকি তখনও অতি সহজে শয়তানের অহমিকা আমাদের পেয়ে বসতে পারে, আমরা ভুলভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতে পারি। তা ছাড়া প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রকৃতির অনেক কিছু, গভীরতম অনুভূতি ও প্রেরণার অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা এই পৃথিবীতে এখনও অনুধাবন করতে পারি না; কিন্তু তাতেও প্রলুব্ধ হয়ো না, এমন ভেবে বোসো না যে তা তোমার যা খুশি করার পিছনে কোনো যুক্তি হতে পারে, কারণ যিনি চরম বিচারক তোমার কাছে তাঁর প্রশ্ন নিয়ে তুমি যা উপলব্ধি করতে পেরেছ তাই নিয়ে। যা পারনি তা নিয়ে নয়। তোমার নিজের তখন সেই বোধ হবে, কেন না তখন তোমার চোখে সত্য প্রতিভাত হবে, তুমি আর তর্ক তুলবে না। সত্যিই তো, এই পৃথিবীতে আমরা অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের সামনে যদি খ্রিস্টের মহামূল্যবান রূপটি না থাকত তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতাম, মহাপ্রলয়ের মুখে মানবজাতির মতো অবস্থা হত আমাদের। পৃথিবীর অনেক কিছু আমাদের কাছে থেকে গোপন রাখা আছে, কিন্তু তার বিনিময়ে ঈশ্বরের দানস্বরূপ আমরা লাভ করেছি এক সুদুর্লভ নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা অন্য এক জগতের সঙ্গে, মহত্তর ও লোকোত্তর এক জগতের সঙ্গে আমাদের প্রাণের বন্ধন রচনা করছে। এই কারণেই না দার্শনিকরা বলে থাকেন যে বস্তুর অন্তর্নিহিত মর্মোদ্ধার এই পৃথিবীতে সম্ভব নয়। ঈশ্বর অন্য সব জগৎ থেকে

বীজ সংগ্রহ করে আমাদের এই পৃথিবীর মাটিতে বপন করেছেন, তাঁর উদ্যান রচনা করেছেন, সেখানে যে যে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সে সবই অঙ্কুরিত হয়েছে। কিন্তু যা বৃদ্ধি পায় তা কেবল সেই সব অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় জগতের সঙ্গে তার সান্নিধ্যের অনুভূতির মধ্য দিয়েই বাঁচে এবং সজীব থাকে। তোমার সেই চেতনা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার অন্তরে যার বৃদ্ধি ঘটেছিল তারও মৃত্যু হবে। তখন তুমি জীবনবিমুখ হয়ে পড়বে, এমনকি জীবনের প্রতি তোমার মনে প্রবল বিতৃষ্ণার সঞ্চার হবে। আমি তো তা-ই মনে করি।

### জ) মানুষ তার সগোত্রের বিচারক হতে পারে কিনা। ধ্রুব বিশ্বাস প্রসঙ্গে

বিশেষত মনে রেখো, কারও বিচারক তুমি হতে পার না, কারণ পৃথিবীতে অপরাধীর বিচারক কেউ হতে পারে না, যতক্ষণ না সেই বিচারক নিজে বুঝতে পারছে তার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সে নিজেও ঠিক তারই মতো একজন অপরাধী এবং যাকে অপরাধী বলে তার সামনে হাজির করা হয়েছে, এমনও হতে পারে যে তার অপরাধের জন্য সবার চেয়ে বেশি দোষ তার নিজের। যখন সে এটা উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তার বিচারক হওয়া সাজে। শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক না কেন, কথাটা সত্য। তার কারণ, আমি নিজে যদি সৎ হতাম তাহলে হয়তো কোনো অপরাধীকে আমার সামনে দাঁড়াতে হত না। তোমার সামনে উপস্থিত, তোমার বিচারাধীন আসামিটির অপরাধ যদি তুমি অন্তর থেকে নিজের ওপর গ্রহণ করতে পার তা হলে কালবিলম্ব না করে তা কর, তার কথা ভেবে তুমি নিজেও কষ্ট ভোগ কর, তাকে কোনো তিরস্কার না করেই ছেড়ে দাও। এমনকি আইনই যদি তোমাকে তার বিচারকের আসনে বসায় তাহলেও তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব সেই মনোভাব নিয়ে কাজ কর। তখন দেখবে সে ছাড়া পেয়ে চলে যাবে বটে, কিন্তু তোমার বিচারে তাকে যতটা দোষী সাব্যস্ত করেছ তার চেয়েও বেশি তিক্ততার সঙ্গে সে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছে। যদি দেখ তোমার স্নেহচুম্বনের প্রত্যুত্তরে আবেগ অনুভূতির পরিচয় দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে তোমাকেই উপহাস করে দূরে সরে যাচ্ছে তাতেও কিন্তু প্রলুব্ধ হয়ো না। এর অর্থ, তার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু এক দিন সে সময় আসবে। আর যদি নাও আসে তাতেও কিছু আসে যায় না সে যদি নাও হয়, তার জায়গায়, তার হয়ে আরেকজন তা উপলব্ধি করবে, কষ্টভোগ করবে, বিচার করবে, বিচারে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করবে আর তাইতে সত্যের পরিপূর্ণতা হবে। এতে বিশ্বাস রাখ, কোনো রকম সন্দেহ না করে বিশ্বাস কর, কারণ এরই মধ্যে সাধুসন্তদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের সমস্ত বিশ্বাস নিহিত আছে।

তুমি তোমার কাজে অটল থাক। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে যদি তোমার মনে পড়ে যায় 'আমার যা করার কথা ছিল তা করিনি' তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে

পড়ে সে কাজটা কর। তোমার আশেপাশের লোকজন যদি দুষ্ট প্রকৃতির ও অনুভূতিশূন্য হয় তারা যদি তোমার কথা শুনতে না চায় তাহলে তাদের পায়ে পড়ে তাদের কাছে ক্ষমা চাও, কেন না তারা যে তোমার কথা শুনতে চায় না তার জন্য সত্যিকারের দোষী যদি কেউ হয় সে তো তুমিই। আর যারা কোপন স্বভাবের তাদের সঙ্গে নেহাৎই যদি কথা বলতে না চাও তাহলেও ওই লাঞ্ছনার মধ্যেই মুখ বুজে তাদের সেবা করে যাও। কখনও হাল ছাড়বে না। যদি সকলে তোমাকে ছেড়ে চলে যায়, এমন কি জোর করে তোমাকে তাড়িয়েও দেয় তাহলে সেই নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যেই সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে মাটি চুম্বন কর, তাকে তোমার চোখের জলে ভিজিয়ে দাও, দেখবে তোমার চোখের জলে ধরণী ফল প্রসব করবে, যদিও তোমার নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমাকে কেউ দেখেনি, তোমার কথা কেউ শোনেও নি। তুমি তোমার বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত অটল থাকবে—যদি এমনও হয় যে পৃথিবীর সবাই উচ্ছন্নে গেছে, তুমি একাই তোমার বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে আছ তাহলেও বিচলিত হবে না। তা-ই যদি হয়, তবু নিজেকে উৎসর্গ কর। একমাত্র তুমিই রয়ে গেছ, তুমিই তো ঈশ্বরের গুণগান করবে! আর তোমার মতো দুজন যদি একসঙ্গে মিলিত হতে পারে তাহলে সেটা হবে একটা সমগ্র জগৎ—প্রাণবন্ত প্রেমের জগৎ। উচ্ছ্বসিত হয়ে তোমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন কর, প্রভুর গুণগান কর, কারণ তোমরা দুজন হলে কী হবে, তোমাদের দুজনের মধ্য দিয়েই তাঁর পরম সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

যদি তুমি নিজে পাপ করে থাক, এমনকি তোমার নিজের পাপের জন্য অথবা আকস্মিক কোনো স্খলনের জন্য আমরণ অনুতাপ কর তাহলে আনন্দ কর অন্যের কথা ভেবে, আনন্দ কর পুণ্যবান লোকের কথা ভেবে, আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি পাপ করলে কী হবে একজন সৎ মানুষ আছেন, যিনি কোনও পাপ করেন নি।

মানুষের দুষ্কর্ম যদি তোমার মনকে ক্রোধে ঘৃণায়, অসহনীয় যন্ত্রণায় এতদূর বিক্ষুব্ধ করে তোলে যে তোমার মধ্যে দুর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে তাহলে তোমাকে সর্বোপরি ভয় পেতে হবে তোমার সেই অনুভূতিকে। তাও, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য যন্ত্রণাভোগের এমন উপায় খুঁজে বার কর যাতে তোমার মনে হবে মানুষের ওই দুষ্কর্মের জন্য তুমি নিজেই দোষী। সে যন্ত্রণা মাথা পেতে গ্রহণ কর, বহন কর, তোমার হৃদয় প্রশমিত হবে, তুমি বুঝতে পারবে তুমি নিজেও অপরাধী, কেন না তুমি যখন একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তি, তখন তুমিই তো ওই দুর্বৃত্তদের আলোকিত করে তুলতে পারতে, অথচ তুমি তা করনি। যদি করতে পারতে তাহলে তোমার সেই আলোকে অন্যদের পথও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারত, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম করেছে সে হয়তো তোমার আলোক প্রাপ্ত হয়ে আর তা করত না। এমনকি তুমি যদি আলোকপাত করেও থাক, কিন্তু দেখ যে তোমার ওই আলোতেও মানুষের পরিত্রাণ সম্ভব হচ্ছে না, তা হলেও তোমার আদর্শে তুমি অটল থাক, স্বর্গীয় আলোকের শক্তিতে কোনো সন্দেহ পোষণ কোরো না; মনে মনে এই বিশ্বাস রাখ

যে এখন তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হল না, কিন্তু পরে এক সময় সম্ভব হবে। পরেও যদি উদ্ধার না পায় তাহলে তাদের সন্তানসন্ততিরা উদ্ধার পাবে, কারণ তোমার জীবনদীপ নির্বাপিত হলেও তোমার আলোকবর্তিকা অনির্বাণ থাকবে। পুণ্যাত্মার তিরোধান ঘটে, কিন্তু তার আলোকশিখা থেকে যায়। সর্বদাই দেখা গেছে মানবজাতির উদ্ধারের জন্য যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর তিরোধানের পর মানুষ উদ্ধার পায়। মানবজাতি এমনই যে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের তারা কখনও গ্রহণ করে না, তাদের নিগ্রহ করে, হত্যা করে, অথচ তারা তাদের শহিদদের ভালোবাসে, তাদেরই হাতে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা করে।.তুমি তো সমগ্রের জন্য কাজ করছ, তুমি যা করছ তা ভাবীকালের জন্য করছ। কখনও কোনও পুরস্কারের প্রত্যাশা কোরো না, কেন না অমনিতেই এই পৃথিবীতে তুমি বিপুল পুরস্কারের অধিকারী সে পুরস্কার তোমার আত্মার আনন্দ যা একমাত্র একজন সাধুপুরুষই অর্জন করতে পারেন। নামিদামি লোকদের ভয় পাবে না, শক্তিমানদেরও নয়, জ্ঞানবুদ্ধি ধারণ করবে, সর্বদা মহত্ত্বের পরিচয় দেবে। মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখবে, জানবে সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে, সব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রার্থনা করবে নির্জনে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে ধরিত্রীকে ভালোবেসে চুম্বন কর। তাকে চুম্বন কর, অক্লান্তভাবে তাকে ভালোবাস, এমনভাবে ভালোবাস যে ভালোবাসার আশ কখনও মেটে না। সবাইকে ভালোবাস, সর্বভূতে তোমার প্রেম বিস্তার কর। সেই পরমানন্দ ও উন্মাদনার সন্ধান কর। ধরিত্রীকে তোমার আনন্দাশ্রুতে নিষিক্ত কর এবং তোমার সেই অশ্রুকে ভালোবাসতে শেখো। তোমার ভাবোন্মাদনায় তোমার লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, তাকে মূল্য দিতে শেখো, কেন না তা ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরের সেই দান মহৎ, তা স্বল্পসংখ্যক মানুষই পেয়ে থাকে, তাঁর নির্বাচিত শুধু স্বল্প কয়েক জনের ভাগ্যে জোটে।

### ঝ) নরক ও নরকাগ্নি প্রসঙ্গে। একটি মরমি আলোচনা

সাধু ও শিক্ষকবৃন্দ, আমি মনে মনে ভাবি, নরক কাকে বলে? আমার যুক্তিতে মনে হয়: ভালোবাসতে না পারার যন্ত্রণাই নরকযন্ত্রণা। স্থান ও কালের পরিধিতে অপরিমেয়, অসীম অনন্ত অস্তিত্বের মাঝখানে পরমাত্মার কোনো এক অংশকে একবারই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে এই কথা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হল যে 'আমি আছি, আমি ভালোবাসি।' একবার, মাত্র একবারই তাকে জীবন্ত ভালোবাসার সক্রিয় একটি মুহূর্ত দান করা হল, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে পার্থিব জীবন এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীতে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ আর পৃথিবীর ঋতুপর্যায়ও তাকে দান করা হল। কিন্তু তার ফল কী হল? দেখা গেল সেই ভাগ্যবান জীবাত্মাটি ঈশ্বরের সেই অমূল্য দান প্রত্যাখ্যান করল, তার কোনো মূল্য দিল না, তাকে ভালো চোখে দেখল না, পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখল, তার প্রতি উদাসীন হয়ে রইল। এমনই একজনের কথা আমাদের বলা হয়েছে বাইবেলের ধনবান ও লাজারের নীতকথায়[১০২]। ধরণীর

বক্ষ থেকে তিরোহিত হওয়ার পর সেই জীবাত্মাটি আব্রাহামের বক্ষে আশ্রয়ের মহিমা প্রত্যক্ষ করে, আব্রাহামের সঙ্গে তার কথোপকথনও হয়। তখনই স্বর্গলোকের মাহাত্ম্য সে অনুধাবন করতে পারে। ঊর্ধ্বলোকে প্রভুর আসনের কাছে উদিত হতেও সে পেরেছিল। কিন্তু তার মর্মবেদনার কারণ এটাই যে যার সঙ্গে তার প্রেমের কোনো সম্পর্ক ছিল না সেই প্রভুর কাছেই তাকে শেষকালে উঠে আসতে হবে এবং যারা প্রেমের পূজারি, যাদের সে এতকাল উপেক্ষা করে এসেছিল তাদেরই সংস্পর্শে তাকে আসতে হবে, কারণ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং এখন নিজে মনে মনে বলছেও: 'আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, প্রেমের তৃষ্ণায় আমি আকুল ঠিকই, কিন্তু তা হলে কী হবে, এখন তো আমি আর প্রেমের নিদর্শন স্থাপন করতে পারি না, প্রেমের জন্য আত্মবলিদানও আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, যেহেতু আমার পার্থিব জীবনের অবসান ঘটেছে, আর আব্রাহামও অন্তত এক ফোঁটা জিয়ন বারিও নিয়ে আসবেন না, অর্থাৎ নতুন করে আবার আমার জীবন দান করবেন না, আধ্যাত্মিক প্রেমের যে তৃষ্ণায় আমি আকুল, যার লেলিহান শিখা আমাকে দগ্ধ করছে তার সেই জ্বালা জুড়োতে তিনি আসবেন না; আমার জীবনই তো আর নেই, সে সময়ও আর হবে না! যদিও এখন আমি সানন্দে অপরের জন্য আমার জীবন দিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়, যেহেতু যে জীবন প্রেমের বেদিতে উৎসর্গ করা সম্ভব ছিল তা পেরিয়ে এসেছি, এখন সেই জীবন আর আমার এখনকার এই অস্তিত্বের মাঝখানে অতলস্পর্শ গহ্বরের ব্যবধান।'

লোকে বলে নরকে আগুন যে জ্বলে সে আগুন নাকি বাস্তব জগতের আগুন। সেই রহস্যের মধ্যে যাবার সাহস আমার নেই, অতএব তার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু আমার মনে হয় বাস্তব জগতের আগুন যদি সেখানে জ্বলেও তা যথার্থই আনন্দের বিষয় হত, কেন না আমার কল্পনায়, মানুষের অধ্যাত্ম জগতের যে যন্ত্রণা, যা বাস্তব জগতের যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, বাস্তবের আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার মধ্যে মানুষ অন্তত ক্ষণিকের জন্য হলেও তা ভুলে থাকতে পারত। তবে আত্মার সেই যন্ত্রণা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়াও অসম্ভব, যেহেতু সে যন্ত্রণা বাইরের নয়, তাদের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা। আর অব্যাহতি দেওয়া যদি সম্ভবও হত তাহলে আমার তো মনে হয় তার ফলে সেই হতভাগ্যদের দশা আরও শোচনীয় হত। তার কারণ, সুরলোকের পুণ্যাত্মারা যদি তাদের কষ্ট দেখে তাদের ক্ষমাও করতেন, অপার ভালোবাসাবশত তাদের কাছেও ডেকে নিতেন, তবু তাতেই কিন্তু তাদের যন্ত্রণা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেত, যেহেতু এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সক্রিয় ও সকৃতজ্ঞ প্রেমের তৃষ্ণা লেলিহান শিখা বিস্তার করে, আরও প্রবল হয়ে জেগে উঠত, অথচ সেটা আর মেটানো সম্ভব নয়। আমি সভয়ে বলি, আমার অন্তর থেকে অবশ্য মনে করি যে এটা যে অসম্ভব এই চেতনাই শেষ পর্যন্ত সেই মানুষগুলির মনের ভার হালকা করতে সাহায্য করবে, কারণ পুণ্যাত্মাদের প্রেমের প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব জেনেও তা গ্রহণ করে সেই বশ্যতার মধ্যে এবং নম্রতার

প্রকাশের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত তারা খুঁজে পাবে কতকটা সেই ধরনের সক্রিয় প্রেম, কতকটা তারই সমতুল কার্যকলাপের একটা প্রতিরূপ যা তারা পৃথিবীতে থাকতে উপেক্ষা করেছিল।... আমার ভ্রাতৃবৃন্দ ও বন্ধুগণ, আমার দুঃখ এই যে বিষয়টা এর চেয়ে বেশি প্রাঞ্জল করে বলার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, যারা পৃথিবীতে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধন করে, দুর্ভাগ্য তাদের, যারা আত্মঘাতী! আমার তো মনে হয় তাদের চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে না। ওদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে যাওয়া নাকি পাপ, গির্জাও বাহ্যত যেন ওদের প্রত্যাখ্যানই করে, কিন্তু আমি আমার মনের গহনে একান্তভাবে বিশ্বাস করি, ওদের জন্যও প্রার্থনা করা যেতে পারে। ভালোবাসা বলে কথা, তার জন্য খ্রিস্ট অপরাধ নেবেন কেন? ওই ধরনের লোকদের জন্য আমি আমার সারা জীবন ভিতরে ভিতরে প্রার্থনা করে এসেছি—সাধু ও শিক্ষকবৃন্দ, একথা আমি অকপটে আপনাদের কাছে স্বীকার করছি; এমনকি এখনও নিত্য প্রার্থনা করে থাকি।

তবে হ্যাঁ, এমন অনেক মানুষ আছে যারা তাদের সন্দেহাতীত জ্ঞান এবং অকাট্য সত্য সম্পর্কে তাদের বোধ সত্ত্বেও নরকে গিয়েও তাদের গর্ব ও নৃশংসতা ছাড়ে না। এমন সমস্ত ভয়ঙ্কর লোক আছে যারা একান্তরূপে শয়তান আর তার গর্বিত আত্মার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দিয়েছে। নরককে তারা স্বেচ্ছায় বরণ করেছে, নরকের আশ আর তাদের কিছুতে মেটে না। তারা তাদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার বলি; কারণ ঈশ্বর আর জীবনকে অভিশাপ দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের অভিশপ্ত করেছে। মরুভূমিতে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যেমন নিজেই তার নিজের শরীরের রক্ত শুষে খেতে পারে এরাও তেমনি তাদের নিজেদের বিদ্বেষবিষদুষ্ট গর্বকে আহার্যরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তারা চির-অপরিতৃপ্ত, তারা ক্ষমাকে প্রত্যাখ্যান করে, ঈশ্বর যখন তাদের আহ্বান করেন তখন তারা তাঁকে অভিশাপ দেয়। মূর্তিমান ঈশ্বরকে তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে ছাড়া আর কোনো দৃষ্টিতে দেখতে পায় না, তাদের দাবি জীবন রূপী ঈশ্বর যেন না থাকেন, তিনি যেন নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করেন, সেই সঙ্গে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিরও। এরা সব নিজেদের ক্রোধের আগুনে অনন্তকাল ধরে দগ্ধ হতে থাকবে, মৃত্যু ও অনস্তিত্বের কামনায় ছটফট করতে থাকবে। কিন্তু মৃত্যু তারা অর্জন করতে পারবে না।

আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্ কারামাজ়ভের পাণ্ডুলিপির এখানেই শেষ। আবারও বলছি, এটা অসম্পূর্ণ ও ছাড়া-ছাড়া। যেমন, জীবনের তথ্য বলতে যা বোঝায় তার মধ্য থেকে মহাস্থবিরের প্রথম যৌবনের প্রসঙ্গমাত্র পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর তাঁর উপদেশাবলী ও মতামতের মধ্য থেকে, দেখাই যাচ্ছে, নানা সময়ে, নানা উপলক্ষে তিনি যা যা বলেছিলেন সেগুলি এখানে একত্রিত করে এক ধরনের সামগ্রিকতা দান করা হয়েছে। সে যাই হোক, মহাস্থবির তাঁর জীবনের সেই শেষ কয়েক ঘণ্টায় ঠিক কী বলেছিলেন তা পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা নেই, যেটুকু দেওয়া

হয়েছে তা স্রেফ সেই আলোচনার মেজাজ ও চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা, যা মহাস্থবিরের আগেকার যে সমস্ত উপদেশ আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃত হয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই নির্বাপিত হল মহাস্থবিরের জীবনদীপ। তাঁর জীবনের সেই শেষ সন্ধ্যায় যাঁরা তাঁর পাশে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই যদিও বেশ বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে, তবু তা যে এমন আচমকা এসে পড়বে সেটা কেউ ধারণা করতে পারেননি। বরং তাঁর বন্ধুরা, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই রাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে এতটা প্রফুল্ল এবং কথাবার্তায় তাঁর এত উৎসাহ দেখে যেন স্থির নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিলেন যে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও তাঁর শারীরিক অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি ঘটেছে। পরে তাঁরা সকলে আশ্চর্য হয়ে এমন কথাও বলাবলি করছিলেন যে মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও তার কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তিনি বুকে ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন, তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, তিনি শক্ত করে দুহাতে বুক চেপে ধরলেন। উপস্থিত সকলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু অত যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়লেন। তার পর নত হয়ে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন, দু বাহু দুদিকে প্রসারিত করলেন, যেমন তিনি অন্যদের শিখিয়েছিলেন সেই ভাবে ভূমানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরিত্রীকে চুম্বন করে প্রার্থনা করতে করতে শান্ত সমাহিত ও সানন্দ চিত্তে ঈশ্বরের চরণে তাঁর আত্মাকে সমর্পণ করলেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেখতে দেখতে আশ্রম কুঠুরিতে ছড়িয়ে পড়ল, মঠেও পৌঁছে গেল। পরলোকগত মহাত্মার ঘনিষ্ঠ জনেরা, সেই সঙ্গে সন্ন্যাসীদের মধ্যে পদাধিকারবলে যাঁদের উচিত তাঁরা প্রাচীন ধর্মীয় প্রথামতো তাঁর মরদেহের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে নিযুক্ত হলেন, আর আশ্রমভ্রাতারা সকলে মঠের বড়ো উপাসনালয়ে সমবেত হলেন। এমনকি ভোরের আগেই, পরে লোকপরম্পরায় জানা গিয়েছিল, মহাস্থবিরের সদ্য পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ নাকি শহরেও পৌঁছে যায়। পর দিন সকাল নাগাদ এ সংবাদ শহরের প্রায় সকলের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল, অসংখ্য শহরবাসীর বিপুল স্রোতধারা মঠের অভিমুখে ধাবিত হল। কিন্তু সে সব কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব। আপাতত শুধু একটু আগ বাড়িয়ে যোগ করছি যে একটা দিন যেতে না যেতে সকলের পক্ষে এমনই অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটল, মঠের সন্ন্যাসীমহলে এবং শহরবাসীদের মনে তা এমনই এক অদ্ভুত ছাপ ফেলল যা এত উদ্বেগজনক, এতই বিভ্রান্তিকর এবং অস্বস্তিকর ছিল যে আমাদের শহরের লোকজনের স্মৃতিতে রীতিমতো জীবন্ত হয়ে আছে।

# টীকা-টিপ্পনী

(১) আন্না গ্রিগোরিয়েভ্না দস্তইয়েভ্স্কায়া (১৮৪৬  ১৯১৮) পিতৃকুলের পদবি স্নিত্‌কিনা। লেখকের দ্বিতীয় স্ত্রী (১৮৬৭ সাল থেকে)। এক সময় তাঁর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন, পরবর্তীকালেও স্টেনোগ্রাফার হিসেবে তাঁর রচনাকর্মে প্রভূত সহায়তা করেন। দস্তইয়েভ্স্কির মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলি প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দস্তইয়েভ্স্কি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও স্মৃতিকথার রচয়িতা।

(২) বাইবেলের সুসমাচার থেকে গৃহীত এই উদ্ধৃতির সাহায্যে দস্তইয়েভ্স্কি এই দৃঢ় বিশ্বাসই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে রাশিয়া তার বর্তমান 'অসুস্থতা' (দস্তইয়েভ্স্কির নিজের ভাষায়, 'অবক্ষয়', 'বিশৃঙ্খলা' 'বিনাশ' ইত্যাদি) কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

শুধু তা-ই নয়, এই উপন্যাসের একাধিক স্থানে—অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে লেখক এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের মর্মবস্তু উদ্ধারের একটি চাবিকাঠিও হতে পারে। প্রসঙ্গত এই উক্তিটি সাংক্ত পেতের্বুর্গে লেখকের সমাধি – শিলাগাত্রেও উৎকীর্ণ আছে।

(৩) 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হিসেবে দস্তইয়েভ্স্কি অবশ্য আলিয়োশা কারামাজভের কথাই ভেবেছিলেন। দ্মিত্রি ভ্লাদিমিরভিচ্ কারাকাজ়ভ্ নামে এক বাস্তব চরিত্রের আদলে আলিয়োশাকে রচনা করার অভিপ্রায় ছিল লেখকের। দারিদ্র্যদশাপ্রাপ্ত কোনো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, জনৈক ছাত্র এই কারাকাজ়ভ সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল। কিন্তু উক্ত দলের অহিংস রাজতন্ত্র বিরোধিতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষপর্যন্ত সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যার প্রতি দস্তইয়েভ্স্কির আদৌ কোনো সমর্থন ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ৬০-৭০ এর দশকে রাশিয়ার রাজনীতিতে এ ধরনের সন্ত্রাসবাদের ব্যাপক প্রবণতা দেখা দেয়। কারাকাজ়ভ্ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দ্রকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সেই অনুযায়ী, সম্রাট যখন তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ভ্রমণে নির্গত হন সেই সময়, ১৮৬৬ সালের ৪ এপ্রিল তাঁকে লক্ষ করে গুলিবর্ষণ করে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কারাকাজ়ভ্ ধৃত হয়ে পরে যথারীতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রিক মুখ্য চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁর সমগ্র অবক্ষয়ী যুগের যুবমানসের ট্র্যাজিডি

উদ্‌ঘাটনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারাকাজ়ভ্ তাই কারাকাজ়ভ্ -এরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ।

(৪) কারামাজ়ভ্‌সংক্রান্ত দ্বিতীয় কাহিনির উপজীব্য হওয়ার কথা ছিল সত্তর-আশির দশকে আলিয়োশার কার্যকলাপ (ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল ১৮৭৮ সালে, আর 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' যে রূপে আমরা পাচ্ছি তা রচিত হয় ১৮৭৯-৮০ র মধ্যে)। আন্না গ্রিগোরিয়েভ্‌না দস্তইয়েভ্‌স্কায়া এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন "...তিনি যখন বাস্তবিকই সৃজনী পরিকল্পনায় ভরপুর তখনই মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।"

১৮৭৩-৮০ সালে লেখক 'দিনলিপি' রচনামালা পর্যায়ের কিছু রচনা লেখেন। সেগুলি মুখ্যত সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যামূলক হলেও সৃজনী সাহিত্য—গল্প নক্‌শা স্মৃতিকথা জাতীয় রচনাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দস্তইয়েভ্‌স্কির আশা ছিল ৮১ সালটা পুরোপুরি 'দিনলিপি' রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন, পরের বছর, ৮২ সালে 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাসের পরবর্তী অংশ লেখায় হাত দেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' অসমাপ্ত থেকে যায়।

(৫) দস্তইয়েভ্‌স্কি তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলির ব্যাপারে সচরাচর অত্যন্ত নিখুঁত। ভূমিকা সম্ভবত লেখা হয়েছিল ১৮৭৮ সালের কোনো এক সময়, প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালের জানুয়ারিতে। উপন্যাসের ঘটনাবলি ১৮৬৬ সালের আগস্টের শেষ থেকে নভেম্বরের সূচনা পর্যন্ত—ন্যূনাধিক দু মাস সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ সময় আগস্টের শেষ দিকে, উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে শীতের সূচনায়। প্রথম তুষারপাত ও তুষারঝড়—এমনই এক সন্ধ্যায় স্মের্দিকোভের সঙ্গে ইভানের তৃতীয় সাক্ষাৎকার। পর দিন অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের নভেম্বরের সূচনায় দ্‌মিত্রি কারামাজভের বিচার।

(৬) মিখাইল ল্যের্‌মন্তভের একটি কবিতা (১৮৩৯) থেকে গৃহীত।

(৭) পিয়ের - জ়োজ়েফ প্রুদোঁ (১৮০৯-১৮৬৫) নৈরাজ্যবাদের অন্যতম বিশিষ্ট প্রবক্তা। বাকুনিন, গের্ৎসেন ও ল্যেভ্ তল্‌স্তোয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

(৮) মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ্ বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের রুশ দার্শনিক আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিশিষ্ট বাগ্মী ও হেগেলবাদের প্রচারক হিসেবে সম্ভবত চল্লিশের দশকেই দস্তইয়েভ্‌স্কি অন্তত নামে তাঁকে চিনতেন। সমালোচক বেলিন্‌স্কি, চিন্তাবিদ গের্ৎসেন ও লেখক তুর্গেনেভের বন্ধু ছিলেন। ষাটের দশকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড ভোগের সময় সেখান থেকে পালিয়ে বিদেশে চলে যান। বিদেশে থাকাকালে যখন তিনি নৈরাজ্যবাদের মতাদর্শ ও কৌশল প্রচার করেন তখন তাঁর নাম রাজনৈতিক পত্রপত্রিকায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। নৈরাজ্যবাদী বলে তিনি প্রলেতারিয়েত পার্টি গঠনের বিরোধী ছিলেন, মার্ক্‌স-এর বিরোধিতা করেন, প্রথম 'আন্তর্জাতিক'

-এর কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে তাঁর সঙ্গে দস্তইয়েভ্স্কির সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৮৬৭ সালে জেনেভাতে থাকাকালে দস্তইয়েভ্স্কি 'শান্তি ও স্বাধীনতা লিগ্'-এর প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে বর্তমানে টিকে থাকা সকল রাষ্ট্রের বিনাশ সম্পর্কে বাকুনিনের ভাষণ শোনেন। এই সময় নাগাদ রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীমহলের কোনো কোনো অংশে বাকুনিনের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

(৯) ১৮৪৮ সালে পারিতে এই স্বল্পস্থায়ী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ২২ ফেব্রুয়ারি, যখন ফ্রান্সের মেহনতি জনসাধারণ ফ্রাঁসোয়া গিজো পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও অর্থনৈতিক অভিজাততন্ত্রের প্রভুত্বের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল সমাবেশের ওপর সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ওই দিনটিতে তার প্রতিবাদে রাজধানীর হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে নেমেছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে জনতার সঙ্ঘর্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের আকার ধারণ করে, পরন্তু জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিক্ষোভ মিছিলকারীদের ওপর গুলিবর্ষণে অস্বীকার করে। লুই ফিলিপ (১৮৩০ সাল থেকে ফরাসি দেশের সম্রাট। ফরাসি বিপ্লব যে বুর্বোঁ রাজবংশের ষোড়শ লুইকে উৎখাত করেছিল সেই বংশেরই ছোটো তরফের) তখন উপায়ান্তর না দেখে গণ আন্দোলন রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী গিজোকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি রাস্তার লড়াই ব্যাপক গণ অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে, শহরের রাস্তার ঘাঁটিগুলি বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। সম্রাট সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৮৫২ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত একের পর এক বিপ্লবী ঘটনাবলি চলতেই থাকে এবং এই সুযোগে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট লুই বোনাপার্ত (সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র) কু' দে তা করে ক্ষমতা দখল করেন; ১৮৫২ সালে সম্রাট উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

(১০) রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন যে সমস্ত মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রশাসনের পক্ষপাতী পশ্চিমে তাদের 'ক্ল্যারিকাল' বলা হত। এখানে স্থানীয় মঠের সেই সব সাধুদের বোঝান হয়েছে, উদারনৈতিক মিউসভ্ যাদের ইউরোপীয় পরিভাষায় ধর্মীয় রাষ্ট্রতন্ত্রী দল বলে উল্লেখ করেছে।

(১১) ১৮৬৪ সালে রাশিয়ায় বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের সময় যাজকীয় বা ধর্মীয় বিচারব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আইনপ্রণয়নের কাজ শুরু হয়ে যায়, যা বাস্তবিকই তখনকার পত্রপত্রিকায় ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ষাট ও সত্তরের দশকে এর পক্ষে বিপক্ষে নানা পত্রিকায় ছোটোবড়ো অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

(১২) দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জাঁকজমক, ভোগবিলাস ও নীতিহীনতা রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগের বৈশিষ্ট্য, যা ফিয়োদর কারামাজভের আদর্শস্থানীয়।

(১৩) বিখ্যাত ফরাসি রূপকথাকার শার্ল পেরো (১৬২৮ — ১৭০৩) ও তাঁর ভ্রাতৃযুগলের লেখা 'এনেইদের উলটো পিঠ' নামে প্যারডি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত চার ছত্রের একটি কবিতার স্বচ্ছন্দ গদ্য রূপ।

(১৪) দ্বাদশ ভগবদ্বাক্য প্রচারকদের অন্যতম, একমাত্র তিনিই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পুনরুত্থানের কথা লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করেননি, বলেছিলেন যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তর দেহের ক্ষতে অঙ্গুলিচালনা করে তবেই তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব যে উক্ত ব্যক্তির বাস্তবিকই মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থান ঘটেছিল।

(১৫) বাইবেলের পুরাতন নিয়ম খণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রন্থভুক্ত বাবেল মিনার সংক্রান্ত একটি প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে নোআর বংশধররা ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ বাবিলোনিয়ার (বর্তমান ইরাক দেশের কেন্দ্রস্থলে, আধুনিক বাগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) শিনার সমভূমিতে এসে পৌঁছায়। সেখানে এসে তারা বিশ্বস্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে, এমন একটি মিনার তৈরির পরিকল্পনা করে যার উচ্চতা স্বর্গ স্পর্শ করবে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের এই স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হয়ে মিনার নির্মাণরতদের ভাষার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেন, তারা একে অপরের ভাষা আর বুঝতে পারে না, ফলে নির্মাণের কাজও আর অগ্রসর হতে পারে না। মানুষগুলি তখন পৃথিবীর এদিক-ওদিক ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। এই ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব— এমন একটি ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। 'বাবেল' ও 'বাবিলন' প্রাচীন সেমেটিক নাম 'বাব্-ইলি'-র বিভিন্ন রূপ, যার অর্থ 'দেবদ্বার'।

(১৬) ১৪৫৩ সালের ২৯ মে তুরস্কের সুলতান মহম্মদ কন্‌স্টানটিনোপল (তুরস্ক দেশে স্তাম্বুল নামে পরিচিত) দখল করেন। দস্তইয়েভ্‌স্কির কল্পনায় কন্‌স্টানটিনোপল রুশিদের কাছে পুণ্যনগরী, কেন না এই শহর থেকেই দশম শতাব্দীতে রুশভূমিতে খ্রিস্টধর্মের আগমন।

(১৭) পাইসি ভেলিচ্‌কোভ্‌স্কি (১৭২২-১৭৯৪) রুশদেশের অন্যতম বিশিষ্ট মহাস্থবির।

(১৮) কালুগা প্রদেশের তৎকালীন বিখ্যাত মঠ, যেখানে অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানী বহু বিশিষ্ট আচার্য, 'মহাস্থবির' অর্থাৎ নির্জনবাসী সন্ন্যাসীরা অবস্থান করতেন, ধর্মীয় শিক্ষার্থী আশ্রমিকদের শিক্ষাদান করতেন।

(১৯) ইনি পার্থেনিউম্ নামে এক সন্ন্যাসী, যিনি মলদাভিয়া, তুরস্ক ও পালেস্তিন ভ্রমণের ওপর গ্রন্থ লিখেছিলেন।

(২০) রাজধানী সাংক্ত পেতের্বুর্গের একটা সস্তার সরাইখানায় ফন্ জোহান নামে জনৈক ব্যক্তির নৃশংস হত্যার মামলা ১৮৭০ সালের ২৮-২৯ মার্চে সেখানকার জেলা আদালতে উঠেছিল। মামলাটি সে সময় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল।

(২১) ফ্রান্সের রাজা (১৮১৪-১৮২৪) অষ্টাদশ লুই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র বলে ঘোষণা করেন।

(২২) এ. এফ. নাপ্রাভ্নিক (১৮৩৯-১৯১৬) পেতের্বুর্গ অপেরার সুরকার ও কন্ডাকটর।

(২৩) ফরাসি লেখক ও বিশ্বকোষ আন্দোলনকারী দনি দিদ্রো (১৭১৩-১৭৮৪), জ্ঞানালোকবাদের বিশিষ্টতম প্রতিনিধি, বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণির ভাবাদর্শী, অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদের সমর্থক, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং শিল্পে বাস্তবতার পৃষ্ঠপোষক। ১৮৬৯ সালের শীতকালে বিদেশে থাকাকালে দস্তইয়েভ্স্কি গভীরভাবে তাঁর রচনা অধ্যয়ন করেন। দস্তইয়েভ্স্কি যাকে মানুষের বিবেকের জটিল অবস্থা' বলতেন তার প্রতি দিদ্রোর তীব্র আগ্রহ, সমস্যাজড়িত প্রাণবন্ত সংলাপ রচনার দিদেরোর অসামান্য দক্ষতা, তাঁর রচনায় অসংলগ্ন ধরনের কাটা-কাটা বর্ণনামূলক ভঙ্গি যা আবার জীবনেরই বিশৃঙ্খল গতিপ্রকৃতি নতুন করে তুলে ধরে—এ সবই ছিল দস্তইয়েভ্স্কির অত্যন্ত কাছের বস্তু।

(২৪) দিদ্রো ১৭৭৩ সালে রাশিয়ায় এসেছিলেন। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় য়েকাতেরিনাকে তিনি দেশের প্রগতিশীল রূপান্তর সূচনায় উৎসাহিত করেছিলেন। রুশ জাতির মহৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে রাজধানীর প্রধান ধর্মযাজক প্লাতোনের সঙ্গে ফরাসি দার্শনিকের সাক্ষাৎকারের যে উল্লেখ ফিয়োদর কারামাজভ্ করেছে সেটা নিছক গল্পকথা—অভিজাত মহলের প্রতিক্রিয়াশীল একটি অংশের প্রচার দিদ্রোর নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদের প্রতি তাঁদের বিরূপতাই এর কারণ।

(২৫) রাজকুমারী য়েকাতেরিনা রমানভ্না দাশ্কোভা (১৭৪৩-১৮১০) — ১৭৬২ সালে সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় য়েকাতেরিনা রাজনীতি ক্ষেত্রে যে বিরাট ওলটপালট ঘটিয়েছিলেন তার সমর্থক। পরবর্তীকালে রুশ একাডেমির প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেন। বিদেশ ভ্রমণের সময় দিদ্রো ও ভল্তেরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে।

(২৬) বাইবেলের 'সৃষ্টিতত্ত্বে' দিব্যদ্রষ্টা যেরেমিয়া কোনো এক জননী রাখিলের বর্ণনা দিয়েছেন, যে তার সন্তানদের বন্দি অবস্থায় দেখে বিলাপ করেছিল। বিশদে দ্র. 'নতুন নিয়মের' মথিলিখিত সুসমাচার ২ (৮-১৮)।

(২৭) ইতিপূর্বে 'শিশুটির তিন বছর বয়স হয়েছিল' এবং এখানে 'আমার প্রার্থনায় আমি তোমার মৃত শিশুকে স্মরণ করব' বলে মহাস্থবিরের সান্ত্বনা প্রদান—এসবই ১৮৭৮ সালে লেখকের শিশুসন্তানের মৃত্যুর প্রতিফলন। তাঁর পুত্রটিরও 'আর মাত্র তিন মাস গেলেই তিন বছর পূর্ণ হত'। সেই বছরই 'কারামাজভ্ ভাইয়েরা' রচনার সূত্রপাত। আবার ওই সময়ই ওপ্তিন আশ্রমে গিয়ে লেখক সেখানকার মহাস্থবির আম্ভ্রোসিয়ার কাছে সদ্যমৃত সন্তানের জন্য শোক প্রকাশ করলে তিনিও তাঁকে এই ভাবেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আন্না গ্রিগোরিয়েভ্নার লেখা থেকে এই তথ্য জানা যায়।

(২৮) এম. ই. গর্চাকভ্ লিখিত 'যাজকীয় বিচারালয়ের অধিকারের বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা' শীর্ষক প্রবন্ধ (১৮৭৫ সালে প্রকাশিত)।

(২৯) উল্ত্রামন্তানবাদ : উল্ত্রামন্তান—পর্বতমালার (অর্থাৎ আল্পস পর্বতমালার) ওপারে, প্রাচীন পোপ সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধারা, সেই মধ্যযুগেই যার উদ্ভব ঘটেছিল এবং যার দাবি ছিল কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, নাগরিক শাসন ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রেও পোপের সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

(৩০) পোপ সপ্তম গ্রিগোরি (১০৭৩-১০৮৬) ধর্মতান্ত্রিক আদর্শের (অর্থাৎ জাগতিক ব্যবস্থা হিসেবে ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা) সমর্থক। উক্ত আদর্শ অনুসারে ঐহিক ও পারত্রিক—উভয় ক্ষমতার তরবারিই তাঁর হাতে।

(৩১) অর্থাৎ ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্তের সঙ্ঘটিত কু দে তা'র অব্যবহিত পরে (৯ সংখ্যক টীকা দ্র.)।

(৩২) বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়াতে ছোটোখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য নিযুক্ত বিচারপতি।

(৩৩) লেখক এখানে 'ডায়ালেক্টিক্স' (Dialectics) কথাটাই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই সময় রুশ ভাষায় শব্দটি শুধু 'দ্বান্দ্বিকতার' পরিবর্তে প্রতিপক্ষের যুক্তির দ্বান্দ্বিকতা অর্থেই প্রযুক্ত হত।

(৩৪) শিলারের 'ডাকাত' (১৭৮১) ট্র্যাজিডি। নায়ক কার্ল মোওর। রুশ ভাষায় এই রচনার শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কির দাদা মিখাইল দস্তইয়েভ্স্কি। এই ট্র্যাজিডির মুখ্য বিষয়—ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পিতৃহত্যা—লেখকের শেষ উপন্যাসটিতেও বিকশিত হয়েছে।

(৩৫) বিখ্যাত রুশ ব্যঙ্গ লেখক সাল্তিকভ্-শ্যেদ্রিনের 'পাড়াগাঁয়ের নির্জনতা' (১৮৬৩) গল্প থেকে গৃহীত একটি বৈশিষ্ট্যসূচক অভিব্যক্তি। উক্ত লেখকের সঙ্গে দস্তইয়েভ্স্কির যে বাদ প্রতিবাদের সম্পর্ক ছিল ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনৈক সুযোগসন্ধানী শিক্ষার্থীর মুখে এই অভিব্যক্তির প্রয়োগ অবধারিতভাবে তারই সাক্ষ্যবহ।

(৩৬) রুশ ভাষায় ইহুদি বলতে দুটি শব্দের প্রচলন আছে 'এভ্রেই' (হিব্রীয়) ও 'জ়িদ্' (আরবি 'য়হুদ্' বা 'Jehuda')। প্রথমটি সদর্থক, কিন্তু দ্বিতীয়টি মন্দ অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 'জ়িদ' কথাটির মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা' এবং ইহুদিদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ আছে। রুশ সাহিত্যে গোগল দস্তইয়েভ্স্কি তল্স্তোয়—সকলের রচনাতেই এই শব্দটির হামেশা প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। শব্দটির ('জ়িদিশ্কা' ইত্যাদি) আরও ইতরায়ন আছে। তবে লেখক এখানে আরও একটি নতুন শব্দ—একটি নামধাতুরই প্রয়োগ করেছেন 'অজ়িদভিয়েত্'—যার অর্থ 'ইহুদিত্বপ্রাপ্তি' বা 'ইহুদি বনে যাওয়া'। গোগলের লেখাতেও এর প্রয়োগ আছে।

(৩৭) একটি গুপ্ত ধর্মসম্প্রদায়, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রুশদেশে

যার উদ্ভব। রুশ ভাষায় খ্‌লিস্ত্‌' শব্দের অর্থ বেত বা চাবুক। রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের মত ও পথ থেকে ভিন্ন, মূল স্রোত বহির্ভূত এই ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ নিজেকে শাস্তিদানের (শরীরে বেত্রাঘাত, হাতে পায়ে শৃঙ্খল ও বেড়ি পরা ইত্যাদি) ভিতর দিয়ে চিত্তশুদ্ধিকে সাধনার অন্যতম মার্গ হিসেবে গণ্য করত। যেমন আনুষ্ঠানিক গির্জা তেমনি সরকারও 'খ্‌লিস্তি'দের উৎপীড়ন করত। প্রসঙ্গত জার-সাম্রাজ্যের পতনের জন্য পরোক্ষভাবে যাকে দায়ী করা হয় সেই রাসপুতিনও 'খ্‌লিস্তি' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

(৩৮) শিলারের 'ডাকাত' পালার দ্বিতীয় দৃশ্যে কার্ল মোওর-এর উক্তি।

(৩৯) বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম'-এর অন্তর্ভুক্ত, যেখানে বিনা প্রতিবাদে বিধাতার দেওয়া দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নিয়ে জনৈক সাধুপুরুষের কঠিন কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনি আছে।

(৪০) সপ্তদশ শতাব্দীর জনৈক নির্জনবাসী সন্ন্যাসী। পাপ পুণ্য, সততা ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি শিক্ষামূলক গ্রন্থের রচয়িতা।

(৪১) নেক্রাসভের 'যখন তমস থেকে ভ্রান্তি জাগে মনে' কবিতার দুটি ছত্র। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত। কবিতাটি তার মানবিক ভাবাদর্শের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে রাশিয়ার যুবমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। দস্তইয়েভ্‌স্কির আরও কয়েকটি রচনায় এখান থেকে উদ্ধৃতি আছে।

(৪২) একটি লোক কথা। এর নীতিকথা 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'। সোনার মাছের কল্যাণে, তার বরে বুড়ো জেলে অনেক কিছুই পেয়েছিল, কিন্তু বুড়ির বাড়াবাড়ি রকমের লোভের ফলে শেষ পর্যন্ত সব কিছু খুইয়ে দুই বুড়ো-বুড়িকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে হয়। এই লোককথা অবলম্বনে রুশ দেশের জাতীয় কবি আলেক্সান্দ্র পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭) ছড়ায় একটি অনবদ্য রূপকথা রচনা করেন।

(৪৩) গ্যাথের ঐশ্বরিক (১৭৮৩) কবিতা থেকে।

(৪৪) শিলারের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা। ১৭৮৫ সালে কবির যুবক বয়সে লেখা। ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের আনন্দযজ্ঞে সকল মানুষকে সামিল হওয়ার যে আহ্বান এই কবিতায় জানানো হয়েছে সেই জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অগ্রণী যুবমহলে কবিতাটি ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করে, এমনকি এক ধরনের লোককাব্যে পরিণত হয়, যদিও এর শিল্পগুণ সম্পর্কে কবি নিজে পরবর্তীকালে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

(৪৫) গ্রিক পুরাকাহিনির সুরাদেবতা বাক্‌খুস-এর পালক পিতা ও গুরু।

(৪৬) দ্‌মিত্রি কারামাজভ্‌ তার স্বীকারোক্তি শিলারের 'আনন্দস্তোত্র' দিয়ে শুরু না করে শুরু করেছে কবির 'এলেউজিনিয়া উৎসব' (১৭৮৯) দিয়ে। উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে কবিতার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তবক এবং ষষ্ঠ স্তবকের অর্ধেক। দ্‌মিত্রি

কারামাজ়ভ্ জার্মান জানে না, তাই বলাই বাহুল্য এগুলি রুশ অনুবাদে উদ্ধৃত। অনুবাদক তৎকালীন বিখ্যাত কবি জুকোভ্স্কি।

(৪৭) গ্রিক পুরাকাহিনির অন্তর্গত ফসলের দেবী সেরেস ও তার কন্যা — বসন্তের প্রতীক প্রসেরপিনের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(৪৮) দ্মিত্রি কারামাজ়ভ্ শিলারের 'আনন্দস্তোত্র' থেকে দুটি স্তবক আবৃত্তি করেছে, তবে প্রথমে চতুর্থ, পরে তৃতীয় স্তবক। কবিতাটিতে মোট আটটি স্তবক আছে। রুশ ভাষায় উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে কবি ফেত্-এর করা অনুবাদ থেকে।

(৪৯) বাইবেলে উল্লিখিত একটি শহর। অধিবাসীদের চরম নীতিহীনতা ও ভ্রষ্টাচারের দরুন অগ্নিবর্ষণ ও ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(৫০) Paul de kock—সমসাময়িক জনৈক ফরাসি লেখক। ব্যভিচারপূর্ণ রগরগে প্রেমের উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে তাঁর বহু উপন্যাস রুশ ভাষায় ব্যাপক অনূদিত ও প্রচারিত হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর একটি উপন্যাসে ('আমার স্ত্রীর পুত্র') পিতৃহত্যার বিষয়টিও আছে, যা দস্তইয়েভ্স্কির 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাসেও পাওয়া যাচ্ছে।

(৫১) কোনো এক বালাআম সম্পর্কে বাইবেলের কিংবদন্তি। বালা আম-এর গাধা প্রহারের জবাবে মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠেছিল।

(৫২) বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক নিকলাই গোগলের (১৮০৯-১৮৫২) একটি গল্প সংকলন।

(৫৩) স্মারাগ্দোভ্-এর 'সাধারণ ইতিহাস' আলেক্সান্দ্র উচ্চ শিক্ষায়তনের শিক্ষক এস. এন. স্মারাগ্দোভ্ সংকলিত 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সাধারণ ইতিহাসের রূপরেখা' (১৮৪৫)।

(৫৪) চিত্রশিল্পী ই. এন. ক্রাম্স্কোই (১৮৩৭-১৮৮৭) উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে রুশদেশের বাস্তববাদী শিল্প আন্দোলনের পুরোধা। দস্তইয়েভ্স্কির উল্লিখিত ছবিটি শিল্পীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি।

(৫৫) যেজুইট (Jesuit) ও ক্যাজুইস্ট (Casuist) Jesuit — ১৫৩৩ সালে ইগ্নাটিয়াস লোইয়োলা প্রতিষ্ঠিত যিশুসমিতি সাধারণের মধ্যে এই নামেই প্রচলিত। আদতে ক্যাথলিক। সংস্কারের বিরোধিতা ও বিধর্মীদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলেও অতিরিক্ত শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে এত বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় যে সাধারণ নাগরিক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দুয়ের সঙ্গেই অচিরে তার সংঘাত ঘটে। দেখতে দেখতে ফ্র্যান্স, ইংলন্ড, স্পেন ইত্যাদি দেশ থেকে তারা বিতাড়িতও হয়। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ চতুর্দশ ক্লিমেন্ট অবদমন করেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরাবির্ভাব ঘটে। প্রতিষ্ঠানের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় Casuistic পদ্ধতি (Sophist ধরনের) কূটতর্কের আশ্রয়

গ্রহণ করেন, ফলে এক সময় Protestant ও Catholic—উভয় সম্প্রদায়েরই বিরাগভাজন হয়।

(৫৬) Marquis de Sade (১৭৪০-১৮১৪) ফরাসি লেখক। নিষ্ঠুর আচরণজনিত আনন্দের এক ধরনের মানসিক বিকৃত অবস্থার মনস্তত্ত্ব যাঁর Justisne (১৭৯১) ও Les Crimes de l' amour (১৮০০) উপন্যাসের বিষয়বস্তু, যা থেকে 'Sadism'-এর উদ্ভব।

(৫৭) রুশ কবি মিখাইল ল্যের্‌মন্তভের ক্লাসিক গদ্যরচনা 'আমাদের সময়কার নায়ক' (১৮৪০)। কিন্তু ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ উক্ত কাহিনির প্রধান চরিত্র পেচোরিনের সঙ্গে ল্যের্‌মন্তকেই অপর একটি বিখ্যাত রচনা 'মুখোশ' নৃত্যনাট্যের আর্বেনিন চরিত্রটিকে গুলিয়ে ফেলেছে।

(৫৮) এলাইয়া হিব্রু পয়গম্বর। বাইবেলের 'পুরাতন নিয়মে' তাঁর উল্লেখ আছে। ইজরাইলের রাজা আহাবকে পৌত্তলিকতার জন্য ধিক্কার জানিয়েছিলেন। অগ্নিময় পথে স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

(৫৯) কবি আলেক্সান্দ্র পুশ্‌কিনের 'দানব' (১৮২৩) কবিতার শেষ দুই ছত্র।

(৬০) রুশ ভাষায় এখানে যে কথার খেলাটা ছিল বাংলা অনুবাদে তা প্রায় অক্ষুণ্ণ।

(৬১) রুশ নাট্যকার আলেক্সান্দ্র গ্রিবইয়েদভের বিখ্যাত নাটক 'বুদ্ধির দুর্গতি'র (১৮২৪) শেষ দৃশ্য।

(৬২) ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ প্রসঙ্গে। এখানে লেখকের অনবধানবশত একটি ত্রুটি থেকে গেছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন ফ্রান্সে রাজত্ব করছেন প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন (১৮০৮-১৮৭৩)। প্রথম নেপোলিয়নের পুত্র জোয়েফ্ ফ্রাঁসুয়া শার্ল নেপোলিয়ন (১৮১১-৩২) ১৮১৫ সালে তাঁর পিতার সিংহাসনত্যাগের পর ফ্রান্সের সম্রাটরূপে ঘোষিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি কখনও দেশ শাসন করেননি, তাঁর মাতামহ অস্ট্রীয় সম্রাট ফ্রান্‌ৎস-এর প্রাসাদেই বসবাস করতেন।

(৬৩) কবি পুশ্‌কিনের একটি কবিতা (১৮২৮) থেকে।

(৬৪) ভল্‌ত্যেরের একটি বিখ্যাত উক্তি।

(৬৫) সম্ভবত যোহান নয়, করুণাময় যুলিয়ান। তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত ফরাসি লেখক ফ্লোবের যে কিংবদন্তিটি লিখেছিলেন সেটি রুশ ঔপন্যাসিক তুর্গেনেভের অনুবাদে 'রুশবার্তা' পত্রিকার ১৮৭৭ সালের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ফ্লোবেরের কাহিনির শেষ দৃশ্যে যেখানে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকটিকে আশ্রয়দান এবং সাধুর ক্রিয়াকলাপের যে বর্ণনা আছে, যার উল্লেখ দস্তইয়েভ্‌স্কি করেছেন তা সম্ভবত নিকট জনের প্রতি মানুষের ভালোবাসার সীমা সম্পর্কে লেখকের ভাবনাচিন্তার প্রেরণাস্থল।

(৬৬) চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কিরা বুলগারিয়া জয় করে সেখানে যে সামন্ততান্ত্রিক

সামরিক প্রভুত্ব কায়েম করে তা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জাতীয় ও ধর্মীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশে বারবার অসংখ্য অভ্যুত্থান ঘটা সত্ত্বেও তুর্কিদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালে দেশব্যাপী যে ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হয় তার ফলে সেখানকার শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর অমানুষিক অত্যাচার চলে। ইউরোপের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বিশদ বিবরণও প্রকাশিত হয়। সম্ভবত তারই উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

(৬৭) নিকলাই নেক্রাসভের (১৮২১-১৮৭৭) 'গোধূলির পুরোভাগে' (১৮৫৯) কবিতা থেকে এই কবিতার অনুসরণে ঠিক এই ধরনেরই একটি দৃশ্যের বর্ণনা আছে দস্তইয়েভ্স্কির 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসের রাস্‌কোল্‌নিকভের স্বপ্ন দৃশ্যে। সেখানে অবশ্য নেক্রাসভের নামের উল্লেখ নেই।

(৬৮) রাশিয়ায় তাতার- মোঙ্গল অভিযান ও সুদীর্ঘকালীন তাতার-মোঙ্গল শাসনের জোয়ালের (১২৪৩-১৪৮০) প্রতি ইঙ্গিত। চাবুকই ছিল তাদের শাসনের একমাত্র অস্ত্র।

(৬৯) 'রুশ সংগ্রহশালা' ও রুশ 'পুরাকাল' ইতিহাস সংক্রান্ত সমসাময়িক দুটি সাময়িক পত্র। তবে ইভান কারামাজ়ভ্ এখানে যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল 'রুশ বার্তা' নামে অন্য একটি সাময়িকীর ১৮৭৭ সালের ৯ সংখ্যায়।

(৭০) জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দ্র প্রসঙ্গে। তাঁর রাজত্বকালে (১৮৫৫-১৮৮১) ভূমিদাসপ্রথা আইন জারি করে বিলুপ্ত হয়।

(৭১) গ্র্যান্ড ইন্‌কুইজিটর—মধ্যযুগে স্পেনে রাষ্ট্রীয় তদন্ত বিভাগের প্রধান। এই বিভাগের কাজ ছিল নিরঙ্কুশতন্ত্র ও ক্যাথলিক গির্জার বিরোধীদের শাস্তি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত করা। আদিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আদালত। সাক্ষ্য প্রমাণ আদায়ের উপায় হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর নির্যাতনও এই আদালতে অনুমোদিত ছিল। এই বিচারব্যবস্থা সর্বাধিক সক্রিয় ছিল দক্ষিণ ইউরোপে; বিশেষত স্পেনে ১২৩৭-১৮২০ সাল পর্যন্ত এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। ১৭৭২ সালে ফ্রান্সে অবদমিত। বর্তমানে 'পবিত্র করণ' নামে পরিচিত 'ইনকুইজিশন'-এর প্রধান কাজ ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা রক্ষা করা। অন্যান্য কাজের মধ্যে পড়ে ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে বিপজ্জনক পুস্তকাদি পরীক্ষা করে দেখা এবং প্রয়োজন হলে সেগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

(৭২) য়ুগোর উপন্যাসের সূচনায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্যারিসে আদালত ভবনে কুমারী মেরির 'ন্যায়বিচার' সংক্রান্ত 'রহস্য নাটিকা' বা 'নীতিনাট্য' পরিবেশনা দিয়ে লোক উৎসব উদ্‌যাপনের যে বর্ণনা আছে ইভান কারামাজ়ভ্ তার উল্লেখ করেছে। তবে উপন্যাসে এই অনুষ্ঠানটি শুধু প্রস্তাবনা হিসেবে আছে।

(৭৩) য়ুগোর উপন্যাসে প্রসঙ্গটি অন্য—সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্ম নয়,

প্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে ফ্লেমিশ দূতদের আগমন। আর য়ুগোর বর্ণনা অনুযায়ী, এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে যে প্রাচীন লোকাভিনয়ের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল সেটা ছিল বিদূষকদের অভিনয়। তৃতীয়ত, অনুষ্ঠান স্থল টাউন হল নয়, বিচারালয়ের প্রেক্ষাগৃহ।

(৭৪) এই নামে বাইবেলের অনুমোদিত পাঠ-বহির্ভূত একটি অপ্রামাণিক অংশ। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা। গ্রিক ভাষায় রচিত। এই সব প্রক্ষিপ্ত অংশ Apocrypha নামে পরিচিত।

(৭৫) শিলারের 'বাসনা' (১৮০১) কবিতা থেকে। উপন্যাসে বিখ্যাত রুশ কবি ভাসিলি জুকোভ্স্কির (১৭৮৩-১৮৫২) অনুবাদে উদ্ধৃত।

(৭৬) বলাই বাহুল্য, সংস্কার-আন্দোলন।

(৭৭) Apocalypse বা 'রহস্যোদ্ঘাটন' থেকে।

(৭৮) বিখ্যাত রুশ কবি ফিয়োদর ইভানভিচ্ ত্যুত্চেভ্ (১৮০৩-১৮৭৩)।

(৭৯) ত্যুত্চেভের একটি শিরোনামহীন কবিতার (১৮৫৫) শেষ স্তবক।

(৮০) এ ছিল ইনকুইজিশনের চরম বিভীষিকাময় সময়, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের (১৫২৭-১৫৯৮) রাজত্বকাল।

(৮১) মহাবিচারকের বিচারে তখনকার দিনে শাস্ত্রীয় আচার বিরোধীদের যে সর্বসমক্ষে পুড়িয়ে মারার দণ্ড দেওয়া হত এখানে তারই কথা বলা হয়েছে। Auto da Fe বা Act of Faith নামে সেই সময় স্পেনদেশে প্রচলিত এই মহাবিচারসভা শাস্ত্রীয় মতবিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত করত, তার রায়দান করত, দণ্ডদান কার্যকর করত। শাস্ত্রবিরোধীদের অন্য কোনও উপায়ে চরম দণ্ড বিধান না করে পুড়িয়ে মারার পক্ষে যে যুক্তি ছিল তা এই যে রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিধিমতে Ecclesia non novit sanguinem, অর্থাৎ গির্জা শোণিতের কলঙ্কমুক্ত। তবে দস্তইয়েভ্স্কির গবেষকরা এই দুই ছত্রে কবিতাটির কোনো উৎস খুঁজে পাননি। খুব সম্ভব লেখকের নিজেরই রচনা।

(৮২) মৃত কন্যা সংক্রান্ত এই অংশটি বাইবেলের একটি সুসমাচার থেকে গৃহীত।

(৮৩) পুশ্কিনের 'পাষাণ অতিথি' কাব্য নাটিকা থেকে।

(৮৪) উগ্রপন্থী ক্যাথলিক 'যিশু ভ্রাতৃসঙ্ঘ'। সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। যেন তেন প্রকারেণ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সিদ্ধি করা এদের মূলমন্ত্র ছিল। ৫৫ সংখ্যক টীকা দ্র।

(৮৫) শয়তান যিশুকে যে তিনটি প্রলোভন দেখিয়েছিল বাইবেলের সুসমাচারে (মথিলিখিত ৪ ও লুকলিখিত ৪) তার উল্লেখ আছে। সেই প্রসঙ্গে মহাবিচারকের উক্তি।

কথিত আছে, দীক্ষিত হওয়ার পর জর্ডান থেকে যেরুসালেমে প্রত্যাবর্তনের পথে যিশুকে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত মরুভূমির মধ্যে অনাহারে কাটাতে হয়। সেই

সময় শয়তান তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেছিল 'তুমি যদি যথার্থই ঈশ্বরের পুত্র হও তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ডগুলিকে রুটিতে পরিণত কর।' জবাবে যিশু বলেছিলেন 'লিখিত হইয়াছে যে মনুষ্য একমাত্র রুটিতেই জীবনধারণ করে না, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণীতে জীবন ধারণ করে।' শয়তানের প্রলোভনের তাৎপর্য ছিল এই যে জনসমক্ষে ইহজাগতিক কল্যাণের সন্ধান দিতে পারলে, তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারলে তারা তাঁকে অনুসরণ করবে। কিন্তু যিশু খ্রিস্ট শয়তানের এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

দ্বিতীয়বার যিশু দাঁড়িয়ে ছিলেন উঁচু পাহাড়ের মাথায়। সেখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ে ইহজগৎ ও তার যাবতীয় বৈভব। শয়তান তা দেখিয়ে যিশুকে জানাল যে তিনিই এই পৃথিবী শাসনের অধিকারী যিনি মানুষের মনের অন্ধকার শক্তির আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে তাকে পরিচালনা করতে পারেন। শয়তান তাঁকে এই রাজ্য দিতে চেয়েছিল, বলেছিল তিনি যদি ইহজাগতিক এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হন তাহলে মানুষ তার পদতলে লুটিয়ে পড়বে। তাতে যিশুর উত্তর ছিল 'তোমার প্রভুর সম্মুখে আনত হও এবং একমাত্র তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত হও।'

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল যখন যিশু সুউচ্চ স্থানে অবস্থিত একটা দেবালয়ের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শয়তান তাঁকে সেখান থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্ররোচনা দিল। তার কথায়, জনতা যখন দেখতে পাবে অত উঁচু থেকে পাথরের ওপর আছড়ে পড়া সত্ত্বেও লোকটা অক্ষত থেকে গেল তখন তাঁকে অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু মানুষের মন জয় করার জন্য এরকম মিথ্যার আশ্রয় নিতেও যিশু রাজি হলেন না। তিনি নিজের শক্তি সর্বদাই গোপন রাখবেন, মানুষের ওপর পরমার্থিক বলপ্রয়োগও তাঁর পন্থা নয়।

সুসমাচার মতে, শয়তান নিরস্ত হয়ে সাময়িক ভাবে খ্রিস্টকে রেহাই দেয়। খ্রিস্টের জীবনে শয়তানের প্রলোভন অবশ্য কেবল এই তিনটি প্রলোভনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

(৮৬) ১৫ সংখ্যক টীকা দ্র.

(৮৭) দিব্যবক্তা যোহান। 'রহস্যোদ্‌ঘাটন' নামে বাইবেলের শেষ পুস্তকের (প্রক্ষিপ্ত বিধায় পরিত্যক্ত) রচয়িতা। সেখানে পৃথিবীর অন্তিমকাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

(৮৮) কিংবদন্তির ঘটনাকাল যেহেতু ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, তাই পোপের 'পার্থিব রাজায়' পরিবর্তিত হওয়ার মুহূর্তটিকে দস্তইয়েভ্‌স্কি সঠিক ভাবেই অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি বলে নির্ণয় করেছেন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের তৎকালীন রাজা তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তৎকালীন ধর্মগুরু দ্বিতীয় স্তেফানকে মধ্য ইতালিতে তাঁর অধিকৃত একটি ভূখণ্ড প্রদান করে পোপের ঐহিক শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেন। সেই মুহূর্ত

থেকে খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুরা গির্জার অথবা পোপের অধিকারভুক্ত প্রদেশের শাসনকর্তা হলেন, অর্থাৎ তখনই প্রতিষ্ঠিত হল ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(৮৯) বাইবেলের 'রহস্যোদ্‌ঘাটন' অংশ থেকে।

(৯০) 'বলে রাখলাম' (লাতিন)।

(৯১) মধ্যযুগে যে সমস্ত রাজমিস্ত্রি (mason) যুরোপের বিভিন্ন দেশে সুন্দর সুন্দর ক্যাথেড্রাল এবং অন্যান্য রাজকীয় ভবন নির্মাণ করেন তাঁদের সংগঠিত গিল্‌ড বা সঙ্ঘ থেকে আধুনিক স্বাধীন ভ্রাতৃসঙ্ঘের (Free masonry) উদ্ভব। উক্ত কারিগর ও স্থপতিরা তাঁদের প্রতিভা ও শিল্পনৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীন ভাবে য়ুরোপের এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াতের অনুমতি লাভ করেন। স্থপতিদের এই বিশ্বব্যাপী গিল্‌ডে পরবর্তীকালে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহিরাগতরাও সদস্যপদ লাভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে শ্রেণি হিসেবে উক্ত স্থপতিদের অবলুপ্তি ঘটলেও বহিরাগতদের বলে সঙ্ঘ টিকে থাকে। সংগঠনের উদ্দেশ্যও পালটে যায়। ঈশ্বর পরিবার প্রতিবেশী ও দেশের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের বিশ্বসংগঠনরূপে পরবর্তীকালে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। মধ্যযুগীয় বীরব্রতী নাইটদের আচরণবিধির সঙ্গে সঙ্ঘের সদস্যদের আচরণবিধির কিঞ্চিৎ মিল ছিল। সাঙ্কেতিক ও গোপন ধরনের কিছু আচরণবিধি সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় অনেকে এটিকে একটি গুপ্তসমিতি বলে মনে করে। বর্তমান রূপে ইংলন্ডে প্রথম দেখা দেয় ১৭১৭ সালে। রোমান ক্যাথলিকরা যাতে এ সংস্থার সভ্য না হয় সে-মর্মে পোপ আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ এর অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো দেশে—বিশেষত রাশিয়াতে তো বটেই—রাজশক্তির রোষানলে পড়ে।

(৯২) গ্যেথের 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় অংশের শেষ দৃশ্যে Pater Seraphicus বা দেবদূততুল্য পিতার উল্লেখ আছে। আলিয়োশার গুরু জোসিমাকে ইভান এই নামে অভিহিত করেছে।

(৯৩) দীর্ঘ পথযাত্রার সময় এই সব ঘাঁটিতে ঘোড়া বদল হত, যাত্রীদের বিশ্রামের বন্দোবস্তও থাকত। বিশেষভাবে ডাক চলাচলের জন্য এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

(৯৪) 'ক্যাডেট কোর' নামে পরিচিত, সুবিধাভোগী শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট সামরিক বিদ্যালয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ অভিজাত সন্তানদের পরে প্রশিক্ষণ দিয়ে সরাসরি অফিসার পদে নিযুক্ত করা হত।

(৯৫) অনাথা কন্যা এস্থিরের রূপের সামনে তার স্বামী পারসিক রাজ ভাশ্‌তির গৌরবও ম্লান হয়ে যায়। পরবর্তী কালে সে তার জাতিকে পরিত্রাণ করে।

(৯৬) বাইবেলে উল্লিখিত অন্যতম সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। ধর্মপ্রচারক হিসেবে নিনেভিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে, সমুদ্র-যাত্রাকালে প্রতিপক্ষের লোকেরা তাকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে একটি তিমি তাকে

গ্রাস করে। অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিমিগর্ভ থেকে তিনি উদ্ধার পান এবং তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।

(৯৭) বাইবেলের সুসমাচারের পরিশিষ্ট। ১২ খ্রি পূ অব্দে লুক সংকলিত সুসমাচারের এই অংশে আদি খ্রিস্টীয় সমাজের অবস্থা এবং তার প্রচারক ও শহিদদের বিবরণ আছে।

(৯৮) খ্রিস্টধর্ম ও তার প্রচারকদের চরম শত্রু সায়ুল দামাস্ক-এর পথে খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্ম বরণ করার পর সন্ত পল নামে পরিচিত হন। খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টের শিক্ষার অন্যতম প্রচারক।

(৯৯) ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে অভিজাত সমাজের একাংশের যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল সম্ভবত সেই প্রসঙ্গে। তৎকালীন রাশিয়ার বহু বিশিষ্ট ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি এতে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

(১০০) 'হিব্রীয়দের প্রতি সন্ত পলের বার্তা'—বাইবেলের 'নতুন নিয়ম'-এর অন্যতম পরিচ্ছেদ। যারা 'সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও' ইচ্ছাপূর্বক পাপে লিপ্ত হয় দশম অধ্যায়ে, শেষ বিচারে তাদের জন্য বিধানের উল্লেখ আছে।

(১০১) দুশ বছর কেন, আরও অনেক বেশিকাল ধরেই—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে—রাশিয়ার ভূমিদাসপ্রথা চলে আসছিল। তবে ১৬৪৯ সালে তা বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ সালে সংস্কার আইনের বলে এই প্রথা অবলুপ্ত হলেও সমাজে তার জের আরও দীর্ঘকাল টিকে ছিল।

(১০২) লুক লিখিত সুসমাচার। কোনো এক সময়ে এক ধনী ব্যক্তি মহামূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ভোগবিলাসে দিন যাপন করত। তার গৃহদ্বারের সামনে লাজার নামে এক ঘা দগদগে দীন দরিদ্র ভিখিরি ধরনা দিয়ে পড়ে থাকত—যদি ধনীর পাত থেকে দৈবাৎ পড়ে যাওয়া খাবারের কোনো টুকরো তার ভাগ্যে মেলে। কিন্তু সেটা তো কখনও হতই না বরং ধনী গৃহের ভৃত্যরা তাকে দেখতে পেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত।

এক সময় ভিখিরি মারা গেল। দেবদূতেরা তাকে আব্রাহামের বক্ষে স্থান দিলেন। কিছু দিন বাদে ধনীও মারা গেল, কিন্তু তার ভাগ্যে জুটল নরকযন্ত্রণা। নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে করতে এক সময় চোখ তুলে ঊর্ধ্বে তাকাতে দূরে আব্রাহামকে এবং তাঁরই বক্ষলগ্ন লাজারকে দেখতে পেল। ধনী কাতরকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল 'হে পিতঃ আব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপাপরবশ হউন, লাজারকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, তাহাকে আজ্ঞা করুন সে যেন অঙ্গুলির অগ্রভাগ বারিসিক্ত পূর্বক আমার নিকট আগমন করে, আমার জিহ্বার জ্বালা প্রশমিত করে, যেহেতু আমার সর্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ, আমি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।' কিন্তু আব্রাহাম জবাব দিলেন 'বৎস, স্মরণ রাখিও তুমি ইতিপূর্বেই তোমার জীবদ্দশায় সুখ সম্পদ ভোগ করিয়াছ, কিন্তু লাজার মন্দ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সে এই স্থানে সুখ শান্তি উপভোগ করিতেছে, তুমি

যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ; অপিচ আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে অতলস্পর্শ ব্যবধান রহিয়াছে, 'সেই কারণে ইচ্ছা থাকিলেও তথায় গমন করা যে রূপ সম্ভব নহে, তদরূপ তথা হইতে আগমনও সম্ভব নহে।' তখন সেই ধনী ব্যক্তি বলল: 'তাহাই যদি হয়, হে পিতঃ, আমার প্রার্থনা উহাকে আমার পিতৃগৃহে প্রেরণ করুন, কারণ তথায় আমার পঞ্চজন ভ্রাতা রহিয়াছে; এই ব্যক্তি উহাদিগকে অবগত করুক উহারা যেন ভ্রমেও এই যন্ত্রণাদায়ক স্থানে আগমন না করে।' আব্রাহাম তাকে বললেন: 'উহাদিগের নিমিত্ত মোজেস এবং পয়গম্বরগণ রহিয়াছেন, উহারা তাঁহাদিগকে শ্রবণ করুক।' তাতে সে বলল 'না, পিতা আব্রাহাম। কিন্তু মৃতদিগের মধ্যে কেহ যদি তাহাদিগের নিকট আগমন করে তাহা হইলে উহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে।' আব্রাহাম বললেন 'যখন মোজেস এবং পয়গম্বরদিগকেও শ্রবণ করে না তখন মৃতদিগের মধ্যে কেহ পুনরুত্থিত হইলে তাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।'

The Online Library of Bangla Books

# কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা

দ্বিতীয় খণ্ড

ফিয়োদর দস্তইয়েভ্স্কি

রুশ থেকে অনুবাদ

অরুণ সোম

The Online Library of Bangla Books

সাহিত্য অকাদেমি

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

# তৃতীয় পর্ব

## সপ্তম অধ্যায়

## আলিয়োশা

### এক

### গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ

পূর্বনির্দিষ্ট প্রথা অনুসারে চিরনিদ্রায় শায়িত মহাপুরুষ সাধু জোসিমার মরদেহ সমাধির জন্য প্রস্তুত করা হল। সকলেরই জানা আছে যে সাধু সন্ত বা কৃচ্ছ্রসাধনকারী সন্ন্যাসীদের মৃত্যু হলে তাঁদের দেহ সমাধির পূর্বে প্রক্ষালন করা রীতিবিরুদ্ধ। বৃহৎ ধর্মানুষ্ঠানবিধিতে বলা হয়েছে 'সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কাহারও প্রভুতে বিলয় ঘটিলে ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, অর্থাৎ উক্ত ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট সন্ন্যাসী সর্বাগ্রে উষ্ণ জলে একটি শোষ-উপকরণ, অর্থাৎ গ্রিসীয় শোষ-উপকরণ সিক্ত করিয়া অতঃপর তাহার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে মৃতের ললাটদেশ, তাহার বক্ষ হস্তপদ ও জানুদেশের উপর ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন পূর্বক তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জন করিবেন এবং উহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।' চিরনিদ্রায় শায়িত সাধু জোসিমার জন্য এই কাজটি নিজে হাতে সম্পন্ন করলেন সাধু পাইসি। গাত্র মার্জনের পর সাধুর পোশাক পরিয়ে দিলেন তাঁকে, আঙরাখায় জড়িয়ে দিলেন তাঁর দেহ, বিধিমতে ক্রুশাকারে অঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য সেটাকে কয়েক জায়গায় কাটতে হল। মাথায় আটকোনা ক্রুশচিহ্ন দেওয়া একটা ঘোমটা পরিয়ে দেওয়া হল। ঘোমটাটা খোলাই রাখা হল, তবে মৃতের মুখটা একটা কালো রঙের পাতলা জালি কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হল। তাঁর হাতে গুঁজে দেওয়া হল পরিত্রাতার একটি বিগ্রহ। কফিন অনেক আগেই তৈরি করা ছিল। বিধিমতো সব ক্রিয়া সমাপনের পর প্রভাতে দেহটি কফিনের মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হল। ঠিক করা হল কফিনটা সারা দিন আশ্রমের প্রকোষ্ঠের প্রথম বড়ো ঘরটাতে রেখে দেওয়া হবে। পরলোকগত মহাস্থবির এই ঘরটাতেই আশ্রম ভ্রাতাদের এবং বহিরাগত গৃহীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। চিরনিদ্রায় শায়িত মানুষটি যেহেতু কৃচ্ছ্রসাধক সিদ্ধপুরুষ শ্রেণিভুক্ত ছিলেন সেই কারণে তাঁর প্রয়াণ উপলক্ষে মঠবাসী—

সাধু এবং মঠের অন্যান্য সেবাইতদের স্তোত্র পাঠ না করে সুসমাচার পাঠ করাই বিধেয়। মৃত আত্মার শান্তির জন্য সমবেত প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধু ইওসিফ্ পাঠ শুরু করলেন। এদিকে সাধু পাইসির ইচ্ছে ছিল পরে তিনি নিজেই প্রভুর শিয়রে বসে অষ্টপ্রহর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবেন; কিন্তু তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে আশ্রমের রক্ষক সাধুকেও আপাতত রীতিমতো ব্যস্ততা ও ঝামেলার মধ্যে থাকতে হচ্ছিল, কারণ মঠের সন্ন্যাসীভ্রাতাদের এবং মঠের ধর্মশালা আর শহর থেকে আগত গৃহী লোকজনের যে ভিড় উপছে পড়ছিল হঠাৎই দেখা গেল যত বেলা বাড়ছে তাদের মধ্যে ততই যেন বেশি করে এক ধরনের অস্বাভাবিক ও অশ্রুতপূর্ব, এমনকি কেমন যেন একটা 'বেমানান ধরনের' উত্তেজনা ও অধীর প্রতীক্ষার ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। আশ্রমের রক্ষক সাধু ও সাধু পাইসি—তাঁরা দুজনেই প্রবল উত্তেজনায় বিক্ষুব্ধ এই জনতাকে শান্ত রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

পর্যাপ্ত পরিমাণ দিবালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শহর থেকে এমন কিছুসংখ্যক লোকেরও আগমন ঘটতে লাগল যারা তাদের নিজেদের রুগ্‌ণ লোকজন বিশেষত রুগ্‌ণ শিশুদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তারা যেন এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করে ছিল। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল তাদের মনে নিশ্চিত ধারণা এই সময় রুগ্‌ণ মানুষের রোগ নিরাময়ের একটা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ অবশ্যই ঘটবে। এটা অবিলম্বে না হয়ে যায় না বলেই তাদের বিশ্বাস। পরলোকগত মহাস্থবিরকে তাঁর জীবদ্দশাতেই আমরা সকলে একজন মহাপুরুষ বলে ভাবতে যে কী পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম একমাত্র এই এখনই তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হল। যারা এসেছিল তারা যে সকলে সাধারণ সম্প্রদায়ের লোক এমনও নয়। ধর্মবিশ্বাসীদের এই বিপুল প্রত্যাশার এত দ্রুত ও এত বেশি মাত্রায়, এমনকি অসহিষ্ণু প্রকাশ ঘটল যে তা প্রায় তাদের দাবির মতো শোনাতে লাগল। সাধু পাইসির কাছে এই আচরণ নিঃসন্দেহে একটা অসঙ্গত প্রলোভন বলে মনে হল। যদিও এ ধরনের কিছু একটা যে ঘটতে পারে তা তিনি অনেক আগে থাকতে মনে মনে আঁচ করেছিলেন, কিন্তু সেটা যে আসলে এতদূর গড়াতে পারে তা আশা করেন নি। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা এমন অবাঞ্ছিত উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল সাধু পাইসি তাঁদের মৃদু তিরস্কার করে এমন কথাও বললেন 'অচিরেই অলৌকিক কিছু একটা ঘটবে এরকম আশা করা চপলমতিদেরই শোভা পায়, একমাত্র গৃহী লোকদের মধ্যে এমন চিন্তা সম্ভব, কিন্তু আমাদের পক্ষে অশোভন।' কিন্তু তাঁর কথায় বিশেষ কেউ কর্ণপাত করল না। এটা লক্ষ করে সাধু পাইসি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তবে বড় বেশি অধীর হয়ে লোকজনের এই যে প্রতীক্ষা এতে সাধু পাইসি যদিও বিরক্ত, যদিও এর মধ্যে তিনি মানুষের লঘুচিত্ততা ও অন্তঃসারশূন্য ব্যস্ততার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে কি তিনি নিজেও যে মনের গহনে কোথাও সংগোপনে ওই উত্তেজিত লোকদের মতো প্রায় একই রকম প্রত্যাশার ভাব পোষণ করছেন

তা তাঁর নিজেরও অস্বীকার করার কোনও উপায় ছিল না। সে যা-ই হোক না কেন, কারও কারও উপস্থিতি কিন্তু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। এদের সম্পর্কে যেন আগে থাকতে কিছু একটা টের পেয়ে তাঁর মনের মধ্যে বড়ো রকমের সন্দেহের উদ্রেক হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাস্থবিরের কক্ষের অত্যন্ত গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে যে দুজনকে দেখে তিনি মনে মনে বিতৃষ্ণা বোধ করলেন এবং যার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নিজেকে তিরস্কারও করলেন, তাদের একজন রাকিতিন, অন্যজন দূরাগত অতিথি, অবদোর্স্ক্ -এর সেই সন্ন্যাসীটি যার এখনও মঠ ছেড়ে যাবার কোনও নাম নেই। ওদের দুজনকেই সাধু পাইসির হঠাৎ কেন যেন সন্দেহজনক বলে মনে হল, যদিও সেই অর্থে, শুধু তাদের সম্পর্কে কেন, অন্যদের সম্পর্কেও তাঁর এরকম মনে হতে পারত।

অব্দোর্স্ক-এর সন্ন্যাসীটির ব্যস্ততা আবার জনতার সকলের উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। সর্বত্র, যেখানে-সেখানে তাকে দেখা যাচ্ছে, একে ওকে জিগ্‌গেসবাদ করছে, সব জায়গায় সব কথায় কান পাতছে, কেমন যেন একটা রহস্যজনক হাবভাব করে এর ওর সঙ্গে কানাকানি করছে। তার মুখের ভাব যতদূর সম্ভব অসহিষ্ণু, এমন কি ইতিমধ্যে যেখানে এক ধরনের বিরক্তিও প্রকাশ পাচ্ছে, আর সেটা এই কারণে যে যার জন্য সকলে হা পিত্যেশ করে আছে এতটা সময় পার হয়ে যাবার পর এখনও সেই ঘটনা ঘটার কোনো লক্ষণ নেই।

আর রাকিতিনের কথা বলতে গেলে, পরে জানা গেছে, সে যে এই এত ভোরে আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা খখ্‌লাকোভা মহাশয়ার কাছ থেকে বিশেষ কাজের ভার নিয়ে। মহিলা অমনিতে ভালো, কিন্তু দুর্বল চরিত্রের মানুষ। তিনি দেখলেন তাঁর পক্ষে আশ্রমে প্রবেশ করা অসম্ভব, কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই মহাস্থবিরের প্রয়াণের সংবাদ জানতে পেরে হঠাৎ এমন দারুণ কৌতূহল তাঁকে পেয়ে বসল যে তিনি আর কালবিলম্ব না করে রাকিতিনকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর নিজের জায়গায় তাকেই আশ্রমে পাঠালেন, উদ্দেশ্যটা এই যে রাকিতিন সেখানে সব কিছুর ওপর নজর রাখবে, সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর তাঁকে লিখে জানাবে। রাকিতিনকে তিনি অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক যুবক বলে মনে করতেন। রাকিতিন সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে এত ওস্তাদ ছিল যে যদি তার মধ্য থেকে ফায়দা তোলার সামান্যতম সুযোগও দেখতে পেত তাহলে লোকের যার যেমন রুচি ঠিক সেই অনুযায়ী রূপ পরিগ্রহ করতে পারত।

পরিষ্কার আলো ঝলমলে দিন। আশ্রমের এখানে ওখানে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য সমাধি, আরও বেশি নিবিড় হয়ে আছে ভজনালয়ের চারপাশে। আগন্তুক ভক্তদের অনেকে সেগুলির ধারে কাছে দল বেঁধে জটলা করছে। আশ্রমের পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে যেতে সাধু পাইসির হঠাৎ মনে পড়ে গেল আলিয়োশার কথা। অনেকক্ষণ তিনি ওকে দেখেননি, প্রায় গতকাল রাত থেকেই তার দেখা

নেই। যেইমাত্র তার কথা মনে পড়ল অমনি লক্ষ করলেন আশ্রমের বেশ দূরের একটা কোনায় পাঁচিলের ধার ঘেঁষে অতুল কীর্তির জন্য এক কালে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও বিখ্যাত এক প্রাচীন ঋষির সমাধি শিলার ওপর সে বসে আছে। আলিয়োশা বসে ছিল আশ্রমের দিকে পিঠ করে, তার মুখটা পাঁচিলের দিকে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সমাধিস্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে আছে। কাছে যেতে সাধু পাইসি দেখলেন আলিয়োশা দুহাতে মুখ ঢেকে গলা ছেড়ে না হলেও অঝোরে কাঁদছে, গুমরে গুমরে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। সাধু পাইসি বেশ খানিকক্ষণ নীরবে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"আর নয়, বৎস, আর নয় বৎস আমার", আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শেষকালে তিনি বলে উঠলেন। "কাঁদছ কেন? কেঁদো না, আনন্দ কর। তুমি কি জান না এই দিনটি তাঁর পরম শুভ দিন? একবার ভেবে দেখ, এই মুহূর্তে তিনি কোথায়।"

আলিয়োশার মুখ একটা বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে কেঁদে উঠেছিল। মুখ থেকে হাত সরিয়ে সে সাধু পাইসির দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটি কথাও না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার দু হাতে মুখ ঢাকল।

"কে জানে, হয়তো এটাই ভালো", সাধু পাইসি তদ্‌গতভাবে বলে উঠলেন। "না হয় কাঁদ। যিশু তোমাকে এই অশ্রু পাঠিয়েছেন।" তারপর আলিয়োশাকে ছেড়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করতে করতে এবং প্রেমমুগ্ধ চিত্তে তার কথা ভাবতে ভাবতে মনে মনে যোগ করলেন 'তোমার ওই ভাবাকুল অশ্রুধারা তো তোমার মনের বিশ্বাস বৈ আর কিছু নয়! এতে তোমার হৃদয় শেষ পর্যন্ত আনন্দতৃপ্ত হবে।' অবশ্য যতদূর সম্ভব শীঘ্র তিনি স্থানত্যাগ করলেন, যেহেতু মনে মনে অনুভব করতে পারছিলেন যে তাঁর নিজেরই চোখে জল এসে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে সময় অতিবাহিত হচ্ছে। মঠের ধর্মানুষ্ঠান এবং মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া যথারীতি চলছে। সাধু পাইসি আবার সাধু ইওসিফের জায়গায় শবাধারের পাশে এসে বসে তার বদলে সুসমাচার পাঠের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু বেলা তিনটে বাজতে না সেই ঘটনাটি ঘটল যার উল্লেখ আমি বিগত অধ্যায়ের শেষ করেছিলাম, যা আমাদের কেউ এতটাই আশা করতে পারেনি এবং সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার এতটাই প্রতিকূলে গিয়েছিল যে আবারও বলতে হচ্ছে, যা ঘটেছিল তা এতই চাঞ্চল্যকর ছিল যে আমাদের শহরের আর আশেপাশের সমস্ত এলাকার লোকজন আজও অত্যন্ত স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা মনে করতে পারে। এখানে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের তরফ থেকে আরও একবার যোগ করতে পারি মানুষকে প্রলুব্ধ করার মতো ওই চাঞ্চল্যকর ঘটনা স্মরণ করতে আমি কতকটা বিতৃষ্ণাই বোধ করছি, যদিও আসলে যা ঘটেছিল তা নিতান্তই তাৎপর্যহীন, অতি স্বাভাবিক একটি ঘটনা। আমার কাহিনিতে এই ঘটনার উল্লেখ অবশ্য না করলেও পারতাম, যদি না কাহিনির মুখ্য চরিত্র যে আলিয়োশা—যদিও আপাতত সে ভবিষ্যতের

নায়ক—তার হৃদয়ে, তার অন্তরের অন্তস্থলে তা এত প্রচণ্ড, এতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলত, যার ফলে তার মনোজগতে এমন একটা ওলটপালট ঘটে গেল, এমনই এক সন্ধিক্ষণের সূচনা হল যা তার চেতনাকে নাড়া দিয়ে শেষ পর্যন্ত সারা জীবনের মতো এক দৃঢ় ভিত্তিতে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকে ঠেলে দেয়।

এবারে প্রসঙ্গে আসা যাক। ভোরের আলো প্রকাশ পেতে না পেতে সমাধিস্থ করার জন্য প্রস্তুত মহাস্থবিরের মরদেহ যখন শবাধারে রেখে অভ্যর্থনা কক্ষ হিসেবে এক সময়ে ব্যবহৃত সামনের ঘরটাতে এনে রাখা হল তখনই শবাধারের সামনে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে যাচ্ছিল ঘরের জানলাগুলি খুলে দেওয়া দরকার কিনা। কিন্তু এই প্রশ্নটি অমনিতে তেমন কোনো ভাবনাচিন্তা না করে কথায়-কথায় কেউ একজন করে থাকলেও তা আড়ালে চাপা পড়ে যায়, তার কোনো জবাব পাওয়া যায় না। লোকটাকে তারা যে কেউ নজরে আনল না শুধু তাই-ই নয়, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ যদি নজরে এনেও থাকে সে কেবল ভেতরে ভেতরে এই মনোভাব নিয়ে যে এমন একজন নমস্য সাধুব্যক্তির মৃতদেহে পচন ধরবে এবং তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে এটাই ত রীতিমতো একটা উদ্ভট চিন্তা, আর কারও মনে যদি এই প্রশ্নের উদয় হয় তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিশ্বাস ও চপলমতির যে পরিচয় পাওয়া যায় সেজন্য তাকে যদি বিদ্রুপ নাও করা যায় তো অন্তত তাকে করুণা করা উচিত, কারণ এই যে লোকটা যখন এই কথা ভাবছে, উপস্থিত আর সকলের প্রতীক্ষা তখন সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কিন্তু দুপুরের পর পরই এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল যা ওই ঘরে যাতায়াতকারী লোকজন গোড়ার দিকে চুপচাপ মেনে নিয়ে মনের কথা মনের ভেতরে চেপে রেখে দিচ্ছিল, কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছিল প্রত্যেকেই মনের মধ্যে যে চিন্তার উদয় হয়েছে এক ধরনের ভীতিবশত অপরের কাছে তা প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে সেই চিহ্ন এমনই প্রকট হয়ে উঠল যে তাতে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। মুহূর্তের মধ্যে সংবাদটা আশ্রমের কুটিরে সর্বত্র এবং আগন্তুক ভক্তদের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মঠের ভেতরেও প্রবেশ করল, মঠের সাধু সন্ন্যাসীদের সকলকে হতচকিত করে দিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষকালে শহরেও পৌঁছে গিয়ে শহরবাসী বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করল। যারা অবিশ্বাসী তারা তো উল্লাসে মত্ত হলই, কিন্তু বিশ্বাসীদের কথা যদি বলতে হয় তাহলে তাদের মধ্যেও উল্লসিত হওয়ার মতো—এমনকি প্রবল অবিশ্বাসীদের চেয়েও বেশি মাত্রায় উল্লসিত হওয়ার মতো লোকের সন্ধান পাওয়া গেল, কেন না লোকে ধার্মিক ব্যক্তির অধঃপতন ও অপযশে খুশি হয়'—কথাটা পরলোকগত মহাস্থবির নিজেই একবার উপদেশ ছলে বলেছিলেন।

ঘটনা এই যে শবাধারের মৃতদেহ থেকে একটু একটু করে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু

করেছে, যত বেলা বাড়ছে ততই তা বেশি করে জানান দিচ্ছে। বেলা তিনটের মধ্যে বড়ো বেশি মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠল, উত্তরোত্তর প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। এমন কি এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সাধুদের নিজেদের মধ্যেই যে ভাব প্রকাশ পেল, যে রকম লাগামছাড়া বিশ্রী প্রলোভনের মধ্যে তাদের পড়তে দেখা গেল, যা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হয়তো একেবারে অসম্ভব ছিল, সে রকম আর অনেক কালের মধ্যে কখনও শোনা যায়নি, এমনকি আমাদের মঠের এতকালের ইতিহাসে কখনও ঘটেছিল বলে কেউ মনেও করতে পারে না। পরবর্তীকালে, এমনকি আরও অনেক বছর পরে আমাদের কোনো কোনো বিচক্ষণ সাধু সন্ন্যাসী ওই দিনটির কথা স্মরণ করে, আগাগোড়া ওই ঘটনার বিশদ পর্যালোচনা করে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে ভেবেছেন কোন্ প্রলোভনে পড়ে তাঁরা তখন ঘটনাকে অতদূর গড়াতে দিয়েছিল। এর আগেও দেখা গেছে, পরম নিষ্ঠাপরায়ণ জীবনযাপনকারী এমন অনেক সাধু সন্ন্যাসী, ধর্মভীরু মহাস্থবিরও মারা গেছেন যাদের নিষ্ঠা সকলের কাছেই নজর কাড়ার মতো ছিল, অথচ শবাধারে শায়িত তাঁদের সকলেরই শান্ত সমাহিত মরদেহ থেকেও যে পচনের গন্ধ বের হয়নি এমন নয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তা হয়েছে, যেমন আর দশটা মৃতদেহের বেলায় হয়ে থাকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তো কোথায়, কেউ কখনও এভাবে প্রলুব্ধ হয়নি, এমনকি লোকজনের মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনারও সঞ্চার হয়নি। অবশ্য হ্যাঁ, আমাদের এখানেও সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে এমন কোনো কোনো সাধু ছিলেন যাঁরা দেহরক্ষা করার পর তাঁদের স্মৃতি এখনও মঠে সযত্নে রক্ষিত হয়ে আসছে এবং তাঁদের সম্পর্কে কিংবদন্তি এই যে তাঁদের দেহাবশেষের নাকি কোনো রকম পচন লক্ষ করা যায়নি। আশ্রমভ্রাতারা এর মধ্যে গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়ে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত। তাঁরা এটাকে পরম মঙ্গলজনক ও অলৌকিক কিছু একটা বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা উক্ত মহাত্মাদের সমাধিমন্দিরগুলি ভবিষ্যতে আরও বড়ো কোনো গৌরবের প্রতিশ্রুতি বহন করছে—অবশ্য ঈশ্বরের কৃপায় সে সময় যদি আসে তবেই তা প্রকাশ পাবে।

এমনই একজন সন্ন্যাসী, যিনি একশ পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, যাঁর স্মৃতি লোকে বিশেষ ভাবে বহন করে আসছিল তিনি প্রাতঃস্মরণীয় সাধক, কঠোর সংযমব্রতধারী ও মৌনব্রতী মহাস্থবির যোব। অনেক কাল হল, বর্তমান শতাব্দীতে বেশ কয়েক দশক আগে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন, কিন্তু কোনো তীর্থযাত্রী প্রথম এখানে এলে সেই মহাপুরুষের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অগাধ ভক্তিবশত লোকে আগন্তুককে তাঁর সমাধিটা দেখাত এবং তাঁর সঙ্গে বিজড়িত বিপুল ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করত। প্রসঙ্গত, এটাই সেই সমাধিটা যার ওপর সাধু পাইসি সকালে আলিয়োশাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন। পুরনো দিনের সেই নমস্য মহাস্থবিরের কথা ছেড়ে দিলেও অপেক্ষাকৃত হাল আমলে ইহলীলা সংবরণকারী, দেবতুল্য আরও একজন মহাস্থবির, মহাত্মা ভার্সোনফির স্মৃতিও মঠের

সকলের মনে জাগরূক ছিল। ইনি সেই মহাস্থবির যাঁর উত্তরসাধক হিসেবে প্রভু জোসিমা মঠের মহাস্থবির হন। তাঁর জীবদ্দশায় মঠে যে সমস্ত তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটত তারা তাঁকে ক্ষ্যাপা সাধক বলে দস্তুরমতো শ্রদ্ধা করত। যাঁদের কথা উল্লেখ করলাম এঁদের দুজনের সম্পর্কেই কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে তাঁরা যখন শবাধারে শায়িত ছিলেন তখন তাঁদের একেবারে জীবন্ত দেখাচ্ছিল এবং সমাধিস্থ করার সময় তাঁদের দেহে এতটুকু পচন ধরেনি, এমন কি শবাধারের মধ্যেও তাঁদের চোখেমুখে যেন জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছিল। কেউ কেউ আবার জোর দিয়ে বলে যে তাদের মনে আছে যে ওই মহাপুরুষদের মরদেহ থেকে সত্যি সত্যি একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল।

এই সব স্মৃতিকথা মানুষের মনে যত প্রভাবই ফেলুক না কেন, তা সত্ত্বেও মহাস্থবির জোসিমার শবাধারকে নিয়ে যে এত চটুল মনোভাবের এমন উদ্ভট ও বিদ্বেষমূলক কাণ্ডকারখানা ঘটতে পারে তার সরাসরি কারণ কিন্তু ব্যাখ্যা করা কঠিন ছিল। তবে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে অনেক কিছু, বহু বিচিত্র সমস্ত কারণ এক কালে এক সঙ্গে মিলেমিশে এক যোগে প্রভাব ফেলেছে। সে মঠের মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি ছিল মঠে মহাস্থবির পদ প্রচলনের প্রতিই একটা জাতক্রোধ, অনেকে এটাকে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটা নববিধান বলে মনে করত, মঠের বহু সাধু সন্ন্যাসীর মস্তিষ্কের গভীরে এই ধারণাটা প্রচ্ছন্নভাবে গেঁথে বসেছিল। এছাড়া, বলাই বাহুল্য এবং যেটা প্রধান তা হল মৃত ব্যক্তির সাধুসুলভ পবিত্রতার প্রতি ঈর্ষা। জীবদ্দশায় তিনি এমনই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন যে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই যেন নিষিদ্ধ ছিল। পরলোকগত মহাস্থবির অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন ঠিকই এবং এটাও ঠিক যে তা অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে ততটা নয়, যতটা ভালোবাসা দিয়ে, তাঁকে ঘিরে তাঁর ভক্তবৃন্দের একটা পরিপূর্ণ পরিমণ্ডলও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এমনকি বস্তুত সেই কারণেই তিনি কারও কারও মনে ঈর্ষারও উদ্রেক করেছেন, পরিণামে তাঁর একদল নির্মম শত্রু জুটেছে—কেউ প্রকাশ্যে তাঁর শত্রুতা করেছে, কেউ বা গোপনে। আর শুধু মঠেই বা বলি কেন, বাইরের গৃহী লোকজনের মধ্যেও তাঁর শত্রু ছিল। কারও কোনও ক্ষতি তিনি করেছেন এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু কারও কারও প্রশ্ন: 'লোকে ওঁকে এমন পুণ্যাত্মা মনে করে কেন?' একমাত্র এই প্রশ্নটি ধীরে ধীরে এর ওর মুখে ফিরতে ফিরতে এমন একটা বিদ্বেষের আকার ধারণ করেছে যা কোন তল নেই, যা কোন কিছুতেই সেটার নয়। ঠিক এই কারণে, আমার মনে হয়, তাঁর মরদেহের পচনের গন্ধ টের পেয়ে—তাও আবার তাঁর মৃত্যুর পর একটা দিন যেতে না যেতে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দেখে—উপস্থিত অনেকের মনেই আনন্দ আর ধরে না। ঠিক তেমনি আবার যারা মহাস্থবিরের অনুরাগী ভক্ত ছিল এবং যারা এ পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছিল তাদের মধ্যে

থেকেও তৎক্ষণাৎ এমন কাউকে কাউকে পাওয়া গেল যারা এই ঘটনায় ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষুব্ধ হয়, মনে মনে দুঃখ পায়। ঘটনা নিম্নলিখিত ক্রমান্বয়ে ঘটেছিল।

পচনের লক্ষণ যেই প্রকাশ পেতে শুরু করল অমনি মৃতের আশ্রম প্রকোষ্ঠে যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীর আগমন ঘটতে লাগল তাদের যা ভাবভঙ্গি তাতেই কিন্তু ঠিক ধরা পড়ে যাচ্ছিল কেন তারা সেখানে আসছে। ভেতরে ঢুকে তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর বাইরে অপেক্ষমাণ অন্য সব সাধু সন্ন্যাসীর ভিড়ের মধ্যে চটপট জানিয়ে দেয় যে সংবাদটি সত্য। প্রতীক্ষারতদের মধ্যে কেউ কেউ এতে দুঃখ পেয়ে মাথা নাড়ায়, কিন্তু অন্যদের মধ্যে উল্লাস চেপে রাখার এতটুকু চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায় না, তাদের জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্টতই ফুটে ওঠে বিদ্বেষের আগুন। তাতে কিন্তু কেউ তাদের এতটুকু তিরস্কার করল না, তাঁর হয়ে দুটো ভালো কথা বলে কেউ এর বিরুদ্ধে সরব হল না—অথচ এটা বড়ো আশ্চর্যের ছিল, যেহেতু মঠের অধিকাংশ সন্ন্যাসীই ছিল পরলোকগত মহাস্থবিরের ভক্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বয়ং প্রভুর বিধান এই যে সাময়িকভাবে হলেও এবারে সংখ্যালঘুদেরই জিত হবে।

দেখতে দেখতে ওই একই রকম গোপন সুলুক সন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত শ্রেণির বহিরাগত আগন্তুকদের আগমন ঘটতে লাগল আশ্রম প্রকোষ্ঠে। সাধারণ লোকজনের মধ্যে বিশেষ কেউ ভেতরে গেল না, যদিও আশ্রমের গেটের সামনে তাদের ভিড়ও কম ছিল না। বেলা তিনটের পর পর বহিরাগত গৃহী দর্শনার্থীদের জোয়ার যে প্রবল মাত্রায় বৃদ্ধি পেল তার কারণ নিঃসন্দেহে এই মুখরোচক সংবাদটি। যে সমস্ত লোক হয়তো সেদিন আদৌ আসত না, আসার কথা কখনও মনেও আনেনি, তারা এখন ঠিক এসে হাজির হয়েছে, তাদের মধ্যে আবার বিশিষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তিও আছেন। অবশ্য বাহ্য শালীনতা তখনও বজায় ছিল, সাধু পাইসি থমথমে গম্ভীর মুখে দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টোচ্চারণে সরবে সুসমাচার পাঠ করে চলেছেন, ভাবটা এমন যে চারদিকে কোথায় কী ঘটছে লক্ষ করেননি, যদিও অস্বাভাবিক কিছু একটা যে ঘটছে তা কিন্তু অনেক আগেই তাঁর নজরে পড়েছে। কিন্তু সে সব কণ্ঠস্বর শেষ কালে তাঁর কাছেও এসে পৌঁছুতে লাগল, প্রথম প্রথম অত্যন্ত চাপা গুঞ্জনের আকারে, তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ় ও উৎসাহব্যঞ্জক সুরে। 'হুঁ হুঁ, এ বাবা মানুষের বিচার নয়, ভগবানের বিচার বলে কথা!' হঠাৎ সাধু পাইসির কানে গেল। কথাগুলি সবার আগে প্রথমে উচ্চারণ করলেন শহরবাসী একজন গৃহী ভদ্রলোক, সরকারি আমলা। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়, যতদূর জানা যায় অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা অনেকক্ষণ হল নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে যা বলছিল, কথাটা প্রকাশ্যে বলে তিনি আসলে তার পুনরাবৃত্তি করলেন মাত্র। হতাশাব্যঞ্জক এই কথাটা অনেক আগে তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল বটে এবং সবচেয়ে খারাপ যেটা তা এই যে শব্দটা প্রতিবার উচ্চারণের সঙ্গে

সঙ্গে, প্রতিটি মুহূর্তে এক ধরনের উল্লাসের ভাব লক্ষ করা গেছে, আর উত্তরোত্তর তা বেড়েও চলেছে। দেখতে দেখতে এমন হয়ে দাঁড়াল যে বাইরের যেটুকু শালীনতা বজায় ছিল তারও কোনো বালাই রইল না, এমনকি দেখেশুনে মনে হচ্ছিল সকলেরই যেন উপলব্ধিটা এই যে তা লঙ্ঘন করার একরকম অধিকার তাদের আছে।

'কিন্তু এটা কী করে হতে পারল?' সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ অনেকটা যেন সহানুভূতির সুরেই বলাবলি করতে লাগল। 'ওইটুকু তো শরীর, শুকনো, হাড়সর্বস্ব। পচা গন্ধ আসবে কোথা থেকে?'

'তার মানে ঈশ্বর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করেছেন', অন্যেরা চটপট যোগ করল। তাদের এই মত অবিসংবাদিত ভাবে তৎক্ষণাৎ গৃহীতও হল, কারণ এই যে তারা আবার এমন যুক্তিও দেখাল যে কোনো পাপীতাপীর মৃতদেহের বেলায় যেমন হয়ে থাকে এই মৃতদেহের গন্ধও যদি তেমনি স্বাভাবিক ভাবে বের হত তাহলেও কিন্তু আরেকটু দেরি করেই হত, এত স্পষ্টভাবে, এত বেশি তাড়াতাড়ি না হয়ে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা পরে হত; অথচ এঁর বেলায় ব্যাপারটা 'স্বাভাবিকতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে', অর্থাৎ এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দেশ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এটা তাঁর বিধান। এই মত অকাট্য বলে বিবেচিত হল।

বিনম্র সাধু, গ্রন্থাগারিক ইওসিফ পরলোকগত মহাস্থবিরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি এই বিষোদ্‌গারকারীদের, মন্তব্যে আপত্তি তুলে তাদের কাউকে কাউকে এই বলে বোঝাতে যাচ্ছিলেন যে 'সবক্ষেত্রে এক রকম হয় না', কোনো পুণ্যাত্মার মরদেহকে যে অবিকৃত থাকতেই হবে এই নিয়ে আমাদের সনাতন খ্রিস্টধর্মে কোনো বাধ্যবাধকতা বা গোঁড়ামি নেই, এটা একটা সংস্কারমাত্র। তা ছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে পর্যন্ত, এই যেমন আখোস্-এর মতো জায়গাতেও, দেহের পচন ধরলে তার গন্ধে লোকে এতটা বিভ্রান্তও হয় না; সেখানে মোক্ষপ্রাপ্ত সাধুপুরুষের মরদেহের পচন না ধরাকে নয়, বহু বছর ধরে মৃত্তিকাগর্ভে পড়ে থাকার পর, এমনকি সেখানে পড়ে থেকে সম্পূর্ণ পচে যাবার পর তার যে বর্ণ হয় সেটাকেই তাঁর মাহাত্ম্যের প্রধান লক্ষণ বলে ধরা হয়। 'অস্থি যদি মোমের মতো হরিদ্রাভ বর্ণ ধারণ করে তাহলে পরলোকগত পুণ্যাত্মাকে প্রভু যে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন সেটাই তার প্রধানতম লক্ষণ। যদি হরিদ্রাভ না হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে তার অর্থ হবে এই যে প্রভু তাকে গৌরবান্বিত করার উপযুক্ত বলে মনে করেননি — এই হল আমাদের সেই মহাতীর্থ আয়োস — এ প্রচলিত বিশ্বাস যেখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্মের অনির্বাণ শিখা দেদীপ্যমান', সাধু ইওসিফ্ তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন।

কিন্তু এই বিনম্র সাধুর কথায় কারও চৈতন্যোদয় হল না, এমনকি তাঁকে সকলে উপহাসভরে নস্যাৎ করে দিল। 'এসব পাণ্ডিত্যের কচকচানি, এক ধরনের নূতনত্ব জাহির করা। শুনে কাজ নেই', সাধু-সন্ন্যাসীরা মনে মনে তা-ই ঠিক করল। 'আমরা বাপু শুকনোপন্থী। নতুন কত কিছুই না আজকাল হয়েছে, তাই বলে সে সব নকল

করতে হবে নাকি?' আরেক দল যোগ করল। যারা অত্যন্ত রসিক তারা আবার তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, 'ওঁদের ওখানে যত পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষ ছিলেন আমাদের এখানে তাঁদের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। ওঁরা গেছেন তুর্কীদের তাঁবে, বিলকুল সব ভুলে বসে আছেন। ওদের সনাতন ধর্মবিশ্বাস ঘোলাটে! তাছাড়া ওঁদের ভজনালয়ে ঘণ্টার পর্যন্ত বালাই নেই।

সাধু ইওসিফ্ ক্ষুণ্ণ মনে স্থানত্যাগ করলেন। এর কারণ আরও এই যে তিনি তাঁর নিজের মতটা তেমন দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারেননি—মনে হচ্ছিল যেন তাঁর নিজেরই তাতে খুব একটা আস্থা ছিল না। কিন্তু সব দেখেশুনে এই পূর্বাভাস পেয়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন যে রীতিমত অমঙ্গলজনক কিছু একটার সূচনা হতে চলেছে, এমনকি অবাধ্যতা যতদূর সম্ভব মাথা চাড়া দিয়ে দিতে উঠল বলে। সাধু ইওসিফের পর অল্প অল্প করে আরও সব বিচক্ষণ সাধু সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরও স্তিমিত হয়ে এলো। এমনও দেখা গেল যারা মহাস্থবিরের অনুরক্ত ছিল, ভক্তিগদগদচিত্তে মঠে মহাস্থবির পদের প্রচলন এবং তাঁর আজ্ঞানুবর্তিতা মেনে নিয়েছিল তারা সকলেই এখন হঠাৎ কেন যেন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, নিজেদের মধ্যে দেখা হয়ে গেলে কেবল ভয়ে ভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউয়ি করতে লাগল। আর যারা মহাস্থবিরতন্ত্র একটা নতুন নিয়ম বলে এত দিন তার শত্রুতা করে এসেছে তারা এখন সগর্বে মাথা উঁচু করে বেড়াতে লাগল। হিংস্র উল্লাসে তারা অন্যদের মনে করিয়ে দিতে লাগল 'মহাস্থবির ভার্সোনোফি যখন মারা যান তখন তাঁর দেহ থেকে এরকম কোনো গন্ধ ত আসেই নি বরং একটা অপূর্ব সৌরভ ভেসে আসছিল, তা সে গৌরব তিনি অর্জন করেছিলেন মহাস্থবির ছিলেন বলে নয়, আসলে তিনি ছিলেন সত্যিকারের পুণ্যাত্মা।'

এর পরই সদ্যোমৃত মহাস্থবির জোসিমার বিরুদ্ধে নানা রকম সমালোচনা, এমন কি অভিযোগের তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

'যত সব মিথ্যে শিক্ষা দিয়েছে! জীবন যে অশ্রুসিক্ত আত্মনিবেদন তা না বলে শিখিয়েছে জীবন পরম আনন্দময়।' যারা একটু বোকা ধরনের তাদের কারও কারও মন্তব্য। আরও বেশি বোকা আরেক দল তাদের সঙ্গে জুটে বলল, 'ওর ধর্মবিশ্বাসটা ছিল ভারি কেতাদুরস্ত। বলে কিনা, বাস্তব জগতের আগুন বলতে যা বোঝায় নরকে নাকি তা নেই।' 'উপোসের কোনো কড়াকড়ি নিয়ম মানত না, মিষ্টি খাবারের প্রতি দুর্বলতা ছিল, চায়ের সঙ্গে চেরির জ্যাম খেতে খুব ভালোবাসত, বড়ো ঘরের মহিলাদের কাছ থেকে সব ভেট আসত। একজন কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীর কিনা চায়ের ওপর এত ঝোঁক!' ঈর্ষাপরায়ণদের মধ্যে কারও কারও মুখে শোনা গেল। হিংস্র উল্লাসে যারা সবচাইতে বেশি মেতে উঠেছিল, অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তারা কড়া ভাষায় মন্তব্য করল 'নিজেকে পুণ্যাত্মা বলে মনে করত। লোকে দলে দলে এসে তার সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করত, আর সে ভাবত এটা বুঝি

তার প্রাপ্য সম্মান।' যারা মহাস্থবির প্রথার ঘোর বিরোধী তারা হিংসায় জ্বলেপুড়ে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে বলতে লাগল 'যারা গোপনে, তার কাছে এসে স্বীকারোক্তি করত লোকটা তার অপব্যবহার করত।' এদের মধ্যে আবার অতি বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত ধর্মভীরু এমন সব সাধুসন্ন্যাসী আর মৌনব্রতীও ছিলেন যাঁরা মৃতব্যক্তির জীবিত কালে একেবারে চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু এখন আচমকা মুখ খুললেন। এর ফল হল মারাত্মক, কেননা যারা এখনও সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই অল্পবয়স্ক ব্রতচারীদের ওপর তাদের মুখের এই কথাগুলি গভীর প্রভাব ফেলল।

অব্‌দোর্‌স্ক-এর সন্ত সিল্‌ভেস্তর মঠ থেকে আগত সেই অতিথি সন্ন্যাসীটি এই সব আলোচনা অনেক দূর, বেশ করে শোনার পর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়াল। 'না:, দেখেশুনে মনে হচ্ছে সাধু ফেরাপোন্ত কাল ঠিকই বলেছিলেন', মনে মনে সে ভাবল। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটল সাধু ফেরাপন্তের। যে তুলকালাম কাণ্ড ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে তাকে আরও জটিল করে তোলার উদ্দেশ্যেই যেন বুঝে বুঝে ঠিক এই সময়টিতে তাঁর আগমন।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি মৌমাছি পালনের জায়গার কাছাকাছি যে কাঠের প্রকোষ্ঠটিতে তিনি বাস করতেন তার বাইরে তিনি বড়ো একটা যেতেন না, এমন কি গির্জাতেও তাঁর আবির্ভাব ঘটত কালেভদ্রে, তবে এ ব্যাপারে তাঁকে এই বলে রেহাই দেওয়া হত তিনি একজন খ্যাপাসাধক, তাই আর সকলের জন্য যে নিয়ম সে নিয়ম তাঁর ওপর খাটে না। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে কি তাঁকে যে সব রকম নিয়মের আওতার বাইরে রাখা হত তা অনেকটা এই কারণে যে, এটা একটা আবশ্যকতাও হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেহেতু তাঁর, এত বড়ো একজন নিষ্ঠাবান সাধক, যিনি কঠোর সংযমব্রত ও মৌনব্রত পালন করে আসছেন, দিনরাত প্রার্থনা করছেন, এমনকি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে করতে সেই অবস্থাতেই নিদ্রা যাচ্ছেন, তিনি নিজে না চাইলে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মকানুন তাঁর ওপর চাপিয়ে তাঁকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলা কেমন যেন বেমানানও দেখায়। ওসব তাঁর ওপর চাপিয়ে দিতে গেলে অন্য সন্ন্যাসীরাই বলত 'উনি আমাদের সবারই চাইতে বেশি পুণ্যবান, আমাদের বিধানে যা আছে তার চাইতে অনেক কঠিন ব্রত উনি পালন করেন। আর গির্জায় যে যান না, তার অর্থ তিনি নিজেই জানেন কখন তাঁর যাওয়া উচিত। উনি ওঁর নিজের নিয়মে চলেন।' এই নিয়ে কিছু বলতে গেলে পাছে গুঞ্জন ওঠে বা অপ্রীতিকর কোনো কিছুর ইন্ধন জোগানো হয় এই কারণে সাধু ফেরাপোন্ত্‌কে কেউ ঘাঁটাত না।

সকলেই জানে যে মহাস্থবির জোসিমাকে সাধু ফেরাপোন্ত্ দু চক্ষে দেখতে পারতেন না। এখন তাঁর প্রকোষ্ঠেও সহসা এই সংবাদ পৌঁছে গেল যে 'হুঁ হুঁ এ ত আর মানুষের বিচার নয়, এ হল গিয়ে ভগবানের বিচার, দেখছ না, এমনকি প্রকৃতির নিয়মকেও ছাড়িয়ে গেছে।' অনুমান করা যেতে পারে এই সংবাদ নিয়ে

প্রথম যারা তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অব্‌দোর্‌স্ক-এর ওই দূরাগত অতিথিটিও ছিল, যে গতকাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল এবং আতঙ্কিত হয়ে তাঁর বাসস্থান ত্যাগ করে।

আমি ইতিপূর্বে এও উল্লেখ করেছি যে সাধু পাইসি দৃঢ় ও অবিচলিত পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে শবাধারের সামনে সুসমাচার পাঠ করছিলেন, তাই মহাস্থবিরের প্রকোষ্ঠের বাইরে কী ঘটছিল তা তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না, দেখতেও পাচ্ছিলেন না, কিন্তু তা হলে কী হবে মুখ্যত সবই তিনি মনে মনে অনুমান করতে পারছিলেন এবং তাঁর অনুমানে কোনও ভুল ছিল না, যেহেতু তিনি তাঁর আশেপাশের লোকজনকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। বিভ্রান্ত অবশ্য তিনি হননি, আরও যা যা ঘটতে পারে তার জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। উত্তেজনা ইতিমধ্যে তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন এর ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে।

এমন সময় আচমকা বাইরের বারান্দা থেকে এমন একটা অস্বাভাবিক কোলাহল তাঁর কানে এসে বিঁধল যা স্পষ্টতই শালীনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে যায়। কুটিরের দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল, দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন সাধু ফেরাপোন্ত্। তাঁর পেছনে লক্ষ করা যাচ্ছিল, এমনকি প্রকোষ্ঠ থেকে স্পষ্ট চোখেও পড়ছিল নিচে বারান্দার মুখে সঙ্গীসাথী বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীর একটা ভিড় আর সেই সঙ্গে বাইরের একদল নাগরিক। সঙ্গীসাথীরা অবশ্য ভেতরে ঢুকল না, বাইরের বারান্দায়ও উঠল না, কিন্তু ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল সাধু ফেরাপোন্ত্ এর পর কী বলেন বা কী করেন, কেন না তাদের মন বলছিল, এমনকি নিজেদের এতদূর ধৃষ্টতা সত্ত্বেও, মনে মনে এই ভেবে তাদের কতকটা ভয়ও হচ্ছিল যে তিনি অমনি-অমনি সেখানে আসেননি। সাধু ফেরাপোন্ত্ দু হাত তুলে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তার ডান হাতের তলা থেকে উঁকি মারছে অব্‌দোর্‌স্ক-এর অতিথিটির কৌতূহলী খুদে খুদে দুই চোখ। এই জনমণ্ডলীর মধ্যে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে তার কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে সাধু ফেরাপোন্ত্‌কে অনুসরণ করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ছুটে ওপরে উঠে এসেছে। সে ছাড়া অন্য যারা ছিল তারা বরং দরজাটা সশব্দে সটান খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে আরও জড়সড়ো হয়ে পিছিয়ে গেল। দুহাত উর্ধ্বে তুলে সাধু ফেরাপোন্ত্ হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন:

"দূর হ দুরাচার, দূর হয়ে যা!" বলার সঙ্গে সঙ্গে একে একে চার দেয়ালের চারদিকে ফিরে প্রকোষ্ঠের চার কোনাতে হাত দিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে লাগলেন। সাধু ফেরাপোন্তের সঙ্গে যারা এসেছিল তাঁর এই কাজের তাৎপর্য বুঝতে তাদের এতটুকু বিলম্ব হল না, যেহেতু তারা জানত যে তিনি যেখানে যান সেখানেই

সর্বদা এ কাজটি করে থাকেন এবং অশুভ শক্তিকে দূর না করা পর্যন্ত তিনি যেমন বসবেন না তেমনি একটি কথাও বলবেন না।

“বেরো শয়তান, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে!” প্রতিবার ক্রুশচিহ্ন আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আওড়াতে লাগলেন। “দূর হ, দূর হয়ে যা বলছি!” আবার তিনি বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন।

পরনে তাঁর যথারীতি মোটা খসখসে কাপড়ের জোব্বা, কোমরে দড়ির কোমরবন্ধনী। ছেঁড়া চটকাপড়ের জামাটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে তাঁর সাদা লোমে আচ্ছন্ন খোলা বুকটা। পায়ে জুতোর কোনো বালাই নেই। যেই হাত নাড়াতে শুরু করলেন অমনি জোব্বার তলায় অঙ্গে বাঁধা কঠিন লোহার বেড়িগুলি ঝাঁকুনি খেয়ে ঝনঝন শব্দে বাজতে লাগল। সাধু পাইসি পাঠ বন্ধ রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

“কী মনে করে সদাচারী প্রভুর হেথায় আগমন শুনি? অনুষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করছ কেন বল ত? কেন মেষপালের শান্তি ভঙ্গ করছ?” কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে শেষকালে সাধু পাইসি বললেন।

“কী মনে করে এসেছি? এই কথা? কী তোমার ধর্মবিশ্বাস?” ক্ষিপ্ত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন সাধু ফেরাপোন্ত্। “তোমাদের অতিথি হয়ে যারা এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সেই হতচ্ছাড়া শয়তানগুলোকে খেদিয়ে দূর করে দেব বলে এসেছি। আমি দেখতে এসেছি আমি না থাকায় কতগুলো শয়তান এখানে বাসা বেঁধেছে। ওগুলোকে বার্চের ঝ্যাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে ছাড়ব।”

“পাপ আত্মাকে দূর করতে এসেছ বলছ? কিন্তু কে বলতে পারে তুমি নিজেই তার সেবা করছ না?” সাধু পাইসি কোনো রকম ভয়ডর না করে বলে চললেন, “কার এমন বুকের পাটা আছে যে হলফ করে বলতে পারে, ‘আমি পুণ্যাত্মা’? তুমি কি নিজেকে তাই মনে কর নাকি ঠাকুর?’

“আমি? আমি একটা পাপিষ্ঠ, সাধু পুরুষ আমি নই। আমি ওই আরামের চেয়ারে বসতে যাব না, পৌত্তলিকদের দেবমূর্তির মতো উচ্চাসনে বসে থেকে ভক্তদের পুজো নিতে যাব না।” সাধু ফেরাপোন্ত্ বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন। “আজকাল লোকে ধর্মের পবিত্র অনুশাসনকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।” এরপর জনতার দিকে ফিরে আঙুল দিয়ে শবাধার দেখিয়ে বললেন, “তোমাদের ওই মৃত পুণ্যাত্মাটি গো উনি তো শয়তানকে স্বীকারই করতেন না। শয়তানদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জোলাপ-টোলাপ কী সব টোটকা দিতেন। তার ফলে হয়েছে ওই যে শয়তানগুলো সব মাকড়সার মতো তোমাদের এই ঘরের আনাচে কানাচে ছেয়ে আছে। আর এখন তিনি নিজেও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছেন। এ সবের মধ্যেই তো প্রভুর লীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাচ্ছে।”

এক সময় সাধু জোসিমার জীবদ্দশাতেই সত্যি সত্যি এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল।

কোনো এক সন্ন্যাসী বারবার পাপ আত্মার স্বপ্ন দেখতে লাগল, শেষকালে জাগরণেও তার উপস্থিতি অনুভব করতে লাগল। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে যখন সে মহাস্থবিরকে সব খুলে বলল, তখন মহাস্থবির তাকে অবিরাম প্রার্থনা করার এবং কঠোর সংযমব্রত পালন করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাতেও যখন কোনো কাজ হল না তখন তিনি প্রার্থনা ও সংযমব্রত যথারীতি চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধরনের একটা ওষুধও সেবন করতে বললেন। এই নিয়ে সেই সময় অনেকেই বেশ মুখরোচক আলোচনায় মেতে উঠেছিল, মাথা নাড়িয়ে আপত্তি জানিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক কথা বলাবলি করেছিল—সকলের চেয়ে বেশি করে বলেছিলেন সাধু ফেরাপোন্ত্। কুকথায় ওস্তাদ কেউ কেউ তখন মহাস্থবিরের এমন এক বিশেষ ধরনের 'অস্বাভাবিক' নিদানের কথা ফেরাপোন্তের কর্ণগোচর করতে এতটুকু কালবিলম্ব করেনি।

"বেরিয়ে যাও বলছি ঠাকুর!" কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে সাধু পাইসি বলে উঠলেন।" মানুষ বিচার করার মালিক নয়, বিচার করার মালিক ভগবান। কে বলতে পারে হয়তো আমরা এমন একটা নির্দেশ দেখতে পাচ্ছি যা তোমার আমার কারোরই বোঝার সাধ্য নেই। চলে যাও ঠাকুর, মেষপালের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় তুলো না!" তিনি দৃঢ়স্বরে আবারও বললেন।

"মঠে তাঁর আসন ছিল মুনিঋষিতুল্য সাধকের, অথচ সেই মতো সংযমব্রত পালন করতেন না, ফলে যে নির্দেশ আসার তাই এসেছে। এ তো স্পষ্ট, এটা লুকোতে যাওয়া মহাপাপ!" অদম্য উৎসাহে উচ্ছ্বসিত ধর্মোন্মাদ সাধু বিচারবুদ্ধি হারিয়ে বলে উঠল। "মিষ্টির লোভ কম ছিল না, বড় ঘরের মেয়েরা কোঁচর ভরে নিয়ে আসত তাঁর জন্যে। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি চলত। পেটপুরে মিষ্টি খেয়ে দিব্যি পেটপুজো করতেন, আর মনটা তাঁর যত দুর্বিনীত ভাবনাচিন্তায় ভরাট থাকত। এই জন্যেই না এমন লজ্জার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

"তোমার কথাগুলো একেবারে ছেলেমানুষের মতো, ঠাকুর!" সাধু পাইসিও গলা চড়ালেন। "তোমার সংযমব্রতপালন আর কৃচ্ছ্রসাধনা দেখে অবাক হতে হয় ঠিকই, কিন্তু তোমার কথাগুলো বাপু মানতেই হচ্ছে, একেবারে চটুল ধরনের, এ তো জাগতিক ছেলেছোকরাদের মুখের কথা—ঠুনকো, ছেলেমানুষি। চলে যাও বলছি ঠাকুর, তোমাকে আমি আজ্ঞা করছি, যাও!' সাধু পাইসি হুঙ্কার দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন।

"তা আমি ত যাবই!" বেশ খানিকটা ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েই যেন সাধু ফেরাপোন্ত্ বললেন, তবে তিক্ততা তাঁর তখনও যায়নি। তাই বললেন, "তা তো বলবেই। তোমরা সব জ্ঞানীগুণী লোক! মহা মহা দিগ্‌গজ বলেই না আমাকে তুচ্ছ করছ, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছ না। সামান্য বিদ্যেবুদ্ধি সম্বল করে আমি এখানে এসেছি, যাও বা ছিল তাও এখানে এসে ভুলে বসে আছি। স্বয়ং করুণাময় প্রভু আমার

মতো ক্ষুদ্র এই মানুষটিকে তোমাদের বিজ্ঞতা থেকে রক্ষে করেছেন।

সাধু পাইসি তাঁর ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাধু ফেরাপোন্ত্ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে গিয়ে ডান হাতের তালু গালে ঠেকিয়ে মৃত মহাস্থবিরের শবাধারের দিকে দৃষ্টিপাত করে সুর করে বলে উঠল

"কাল সকালে ওর জন্যে লোকে আমাদের 'সহায় ও রক্ষক' বলে জম্পেশ স্তোত্র আওড়াবে, কিন্তু আমি টেঁসে গেল আমার জন্যে গাইবে শুধু 'মধুময় আহা এ জীবন' গোছের এক চিলতে ভজন", অশ্রুসজল নয়নে সখেদে তিনি বললেন। "অহঙ্কারে তোমরা সব ধরাকে সরা জ্ঞান করছ, মাটিতে তোমাদের পা পড়ে না। এটা একটা ফাঁকা জায়গা!" হঠাৎ পাগলের মতো হাউমাউ করে চেঁচিয়ে হাত নাড়া দিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত পায়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বারান্দা থেকে নীচে নেমে গেলেন। যারা নিচে ভিড় করে অপেক্ষা করছিল তারা নড়েচড়ে উঠল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুসরণ করল, কিন্তু আরেক দল গতি মন্থর করে দিল, কারণ প্রকোষ্ঠের দরজা তখনও খোলা আর সাধু পাইসি সাধু ফেরাপন্থের পিছন পিছন ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত বৃদ্ধ এখানেই ইতি টানলেন না। বিশ পা মতো যাবার পর হঠাৎ তিনি অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দু হাত মাথার ওপর তুললেন, তারপর বিকট চিৎকার করে কাটা গাছের মতো দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়লেন।

"আমার প্রভুর জয় হয়েছে! অস্তগামী সূর্যের ওপর খ্রিস্টের জয় হয়েছে!" সূর্যের দিকে দু হাত বাড়িয়ে ক্রোধান্ধ চিৎকারে তিনি ফেটে পড়লেন, উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে দু হাত মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, কান্নার বেগে তাঁর সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে গেল তাঁর দিকে, বিস্ময়সূচক চিৎকার, সহানুভূতিসূচক চাপা কান্না উথলে উঠল।... এক ধরনের বিহ্বলতা সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

'ইনিই তো প্রকৃত সাধু! ইনিই ত পুণ্যাত্মা!" আর ভয়ডরের বালাই না রেখে মুখরিত হয়ে উঠল বেশ কিছু কণ্ঠ। "এঁরই তো বসা উচিত ছিল মহাস্থবিরের আসনে", এবারে রীতিমতো উষ্মার সঙ্গেঁ আরেক দল যোগ করল।

"মহাস্থবিরের আসনে উনি বসতে যাবেন না। বসাতে গেলেও উনি নিজে প্রত্যাখ্যান করবেন। এই যে পোড়ার নতুন নিয়ম চালু হয়েছে উনি এর দাসত্ব করবেন না। ওদের ওসব মূর্খামির নকল করতে ওঁর বয়েই গেছে", সঙ্গে সঙ্গে আরেক দল মানুষ তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে উঠল। এরা যে কতদূর যেতে পারত তা ধারণায় আনাও কঠিন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রার্থনা সভায় আহ্বানের ঘণ্টা বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ সকলে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করতে লাগল। সাধু ফেরাপোন্ত্ও ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন, আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে

ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করতে করতে নিজেকে আড়াল করে তাঁর কোটরের দিকে পা বাড়ালেন। তখনও অবশ্য উচ্ছ্বাসসূচক কী সব উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেগুলি ছিল একেবারে অসংলগ্ন ধরনের। কেউ কেউ তাঁকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল—সংখ্যায় তারা নেহাৎই কম; তবে অধিকাংশ লোকই সেখান থেকে সরে যেতে লাগল, প্রার্থনা সভায় যাবার তাড়া ছিল তাদের। সাধু পাইসি গ্রন্থপাঠের ভার সাধু ইওসিফের ওপর অর্পণ করে প্রকোষ্ঠ ছেড়ে নিচে নামলেন। ধর্মান্ধদের উন্মত্ত চিৎকার তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, কিন্তু এখন হঠাৎই কেন যেন বিশেষভাবে তাঁর মনটা বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—এটা তিনি বেশ অনুভব করতে পারলেন। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ নিজেকে প্রশ্ন করলেন: 'কেন আমার এই বিষাদ, যাতে আমি একেবারে মনমরা হয়ে পড়ছি?' সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করলেন তাঁর এই আকস্মিক বেদনার কারণ বাহ্যত খুবই ছোটো, বিশেষ একটি ঘটনা। ঘটনাটা এই যে এই মাত্র আশ্রম প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথের সামনে যে উত্তেজিত জনতার ভিড় দেখা গিয়েছিল তাদের মধ্যে আলিয়োশাকেও তাঁর নজরে পড়েছিল, তাঁর মনে পড়ে গেল তিনি তখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আলিয়োশাকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ কেমন যেন একটা বেদনায় তাঁর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। 'এই ছেলেটি কি তাহলে আমার মনের মধ্যে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে?' হঠাৎ অবাক হয়ে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন।

ঠিক এই সময় দেখা গেল আলিয়োশা তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোথায় যেন যাবার তাড়া আছে, তবে ভজনালয়ের দিকে সে যাচ্ছে না। দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। আলিয়োশা তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল, মাটিতে চোখ নামিয়ে নিল। ছেলেটার মুখের যা ভাব একমাত্র তা থেকেই সাধু পাইসি অনুমান করতে পারলেন এই মুহূর্তে তার ভেতরে ভেতরে কী বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।

"তুমিও কি প্রলোভনে পড়লে?" হঠাৎ সাধু পাইসি তাকে ডেকে বললেন। "নাকি তুমিও ওই ঠুনকো বিশ্বাসীদের দলে?" দুঃখের সঙ্গে তিনি যোগ করলেন।

আলিয়োশা থমকে দাঁড়াল, এমন ভাবে সাধু পাইসির দিকে তাকাল যার অর্থ কেমন যেন অস্পষ্ট। কিন্তু তারপরই আবার দ্রুত চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল, মাটিতে চোখ নামিয়ে নিল। দাঁড়িয়ে রইল সে একপাশে কাঠ হয়ে, প্রশ্নকর্তার দিকে মুখ ফিরে তাকাল না। সাধু পাইসি মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন।

"অমন তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছ কোথায়? প্রার্থনা সভায় যাবার ঘণ্টা বাজছে যে", তিনি আবার জিগ্‌গেস করলেন। কিন্তু আলিয়োশা এবারেও কোনো জবাব দিল না।

"তুমি কি আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছ? কাউকে কিছু না বলে, আমাদের কারও আশীর্বাদ না নিয়ে—তা কী করে হয়?"

আলিয়োশা বাঁকা হাসি হাসল, একটা অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল প্রশ্নকর্তা সাধুটির দিকে, যাঁর হাতে মৃত্যুর পূর্বে আলিয়োশাকে সমর্পণ করে গেছেন তাঁর এক কালের পথপ্রদর্শক, যিনি এক সময়ে তার হৃদয় ও মনের অধীশ্বর ছিলেন, তার পরম ভক্তিভাজন গুরু সেই মহাস্থবির জোসিমা। আলিয়োশা আগের মতোই প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না, আচমকা শুধু একবার হাতটা নাড়াল, এমন ভাবে নাড়াল যে তাতে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোর কোনও গরজ পর্যন্ত প্রকাশ পেল না। দ্রুত পদক্ষেপে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, দেখতে দেখতে বড়ো গেট ছাড়িয়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

"আবার ফিরে আসতে হবে!" আলিয়োশার অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্ষোভে বিস্ময়ে আপনমনে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন সাধু পাইসি।

## দুই

## এমনই এক মুহূর্ত

সাধু পাইসি যখন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তাঁর 'আদরের ছেলেটি' আবার ফিরে আসবে তখন তাঁর অবশ্যই ভুল হয়নি। হয়তো এমনও হতে পারে যে তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণটা না হলেও অন্তত কিছু পরিমাণে তো বটেই আলিয়োশার মানসিক অবস্থার প্রকৃত অর্থ ভেদ করতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাকে অকপটে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আমার অমন প্রিয়পাত্র আমার কাহিনির এত অল্প বয়সের এই নায়কটির জীবনের সেই অদ্ভুত ও অনির্দিষ্ট মুহূর্তের সঠিক অর্থ যে কী হতে পারে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা এখন আমার নিজের পক্ষেই অত্যন্ত দুরূহ হবে। সাধু পাইসি সখেদে আলিয়োশার উদ্দেশে যে ব্যাকুল প্রশ্ন করেছিলেন: 'না কি তুমিও ওই ঠুনকো বিশ্বাসীদের দলে?' তার উত্তরে আমি অবশ্যই আলিয়োশার হয়ে জোর দিয়ে বলতে পারতাম 'না, ঠুনকো বিশ্বাসীদের দলে ও নেই।' শুধু তা-ই নয়, এমনকি এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একেবারে বিপরীত তার এতটা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ ঠিক এটাই যে তার বিশ্বাস ছিল অগাধ! কিন্তু তবু বিভ্রান্ত সে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও বিভ্রান্তি তার ঘটেছিল, আর তা ছিল এতটাই মর্মান্তিক যে এমনকি এর পরও আরও অনেক বছর বাদেও সেই দুঃখের দিনটিকে আলিয়োশার কাছে তার জীবনের তিক্ততম ও চরম দুঃসহ দিনগুলির একটি বলে মনে হয়েছে। কেউ যদি সরাসরি প্রশ্ন করে 'তাহলে এই মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা—এ সবই ভেতরে ঘটা সম্ভব হয়েছিল সেটা কি একমাত্র এই কারণে যে তার গুরুদেব মহাস্থবিরের মরদেহ কোথায় সঙ্গে সঙ্গে রোগনাশক বিভূতির প্রকাশ ঘটাতে শুরু করবে, তা না করে অকাল পচনের লক্ষণ প্রকাশ করতে লাগল?'—তার উত্তরে আমি নির্দ্বিধায় বলব 'হ্যাঁ, বাস্তবিকই তাই।' তবে পাঠকের কাছে আমার অনুরোধ

শুধু এই যে তিনি যেন এ থেকে চটপট কোনো সিদ্ধান্ত না করে বসেন—আমার এই নবীন যুবকের নিষ্কলুষ হৃদয় নিয়ে বেশি হাসাহাসি না করেন। আবার তার এই যে সরল মনের বিশ্বাস সে জন্য তার কাঁচা বয়সের অনভিজ্ঞতা অথবা ইতিপূর্বে যে-সমস্ত বিদ্যার চর্চা সে করেছিল তাতে তার অকিঞ্চিৎকর সাফল্য ইত্যাদি ইত্যাদির দোহাই পেড়ে আমি নিজে যে তার হয়ে ক্ষমা চাইব বা তাকে ক্ষমা করতে এবং তার সাফাই গাইতে যাব তাও না। শুধু তা-ই নয়, আমি যা করব সেটা তার বিপরীত: আমি বরং দৃঢ়কণ্ঠে এটাই ঘোষণা করব যে তার হৃদয়ের ওই প্রকৃতির জন্য তার প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ওরই মতো অল্পবয়সি আরও এমন কেউ যদি হত যে হৃদয়াবেগ দিয়ে কোনো কিছু গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক, যার ভালোবাসা সেই কারণে উদগ্র না হয়ে ঈষদুষ্ণ মাত্র হতে পারে, যার বুদ্ধিবৃত্তি যদিও বিশ্বাসযোগ্য, তবে বয়সের তুলনায় বড়ো বেশি বিচক্ষণ, আর ঠিক সেই কারণে সুলভও বটে—তার ক্ষেত্রে, আমি বলব, আমার এই যুবকের বেলায় যা ঘটেছিল তা সে এড়াতে পারত; কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কি, অযৌক্তিক হলেও ক্ষেত্রবিশেষে কোনো ঘটনার প্রতি প্রবল অনুরাগবশত আবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া আদৌ তার কবলে না পড়ার চেয়ে বেশি কৃতিত্বের। আর বয়সে নবীন হলে তার পক্ষে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য, যেহেতু ওই বয়সের কেউ যখন সব সময় বড়ো বেশি বুদ্ধিবিবেচনা করে চলে তখন তার মূল্য কমে যায়—এই হল আমার মত!

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবেন 'কিন্তু তাই বলে যে কোনো নবীন যুবককে ওরকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে হবে নাকি! আপনার ওই যুবক অন্যদের আদর্শ হতে পারে না।'

এর উত্তরে আমি আবারও বলব 'হ্যাঁ আমার নায়ক এই ছেলেটার একটা অটল বিশ্বাস ছিল যা ছিল তার কাছে পরম পবিত্র, কিন্তু তা হলেও আমি তার হয়ে কোনো আর্জি করতে যাচ্ছি না।

দেখুন, এইমাত্র আমি যে ঘোষণা করলাম—হয়তো বা বড়ো বেশি তাড়াহুড়ো করেই করে ফেলেছি—বলেছি যে আমার নায়কের হয়ে কৈফিয়ত দিতে, তার হয়ে ক্ষমা চাইতে বা তার পক্ষ সমর্থন করতে আমি যাব না, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি কাহিনির পরবর্তী অংশ বোঝার জন্য কিছু একটা ব্যাখ্যা না দিলেও নয়। তা হলে বলি প্রশ্নটা অলৌকিকতা নিয়ে নয়। তার অসহিষ্ণুতার মধ্যে কিন্তু অলৌকিক ঘটনার জন্য ছেলেমানুষি প্রত্যাশা ছিল না, আর সেই সময় বিশেষ কোনো জয়যাত্রার জন্য কোনো অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন আলিয়োশার ছিল না—আর যা-ই থাক, এটা অন্তত ছিল না; আবার আগে থাকতে ধরে নেওয়া, পূর্বনির্ধারিত কোনো মতাদর্শ যা অচিরেই অন্য মতাদর্শের ওপর জয়লাভ করতে পারত, তার কথা ভেবে যে এমন হয়েছিল তাও নয়—উঁহু, একেবারেই নয়। এখানে, এই সময়, কিছুর মধ্যে

এবং সর্বোপরি, সর্বাগ্রে তার সামনে ছিল একটি ব্যক্তিত্ব, শুধুই ব্যক্তিত্ব—তার পরম প্রিয় গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব, সত্যধর্মের পূজারী সেই মহাস্থবিরের ব্যক্তিত্ব যাঁকে সে অশেষ ভক্তিভরে পূজা করত। কথাটা তো এখানেই যে তার অল্প বয়সের নিষ্কলুষ হৃদয়ে 'সবার জন্য এবং সবের জন্য' প্রেমের যে সঞ্চয় সংগোপনে ছিল সেই সময় এবং তার আগে এক বছর যখন সে মঠে ছিল তখনও—যেন হয়তো বা বেঠিক ভাবেই—সর্বক্ষণ, অন্তত তার হৃদয় যখন প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠত তখন তো বটেই, তা ঠেকে থাকত একটা জায়গাতে, মুখ্যত একটিমাত্র সত্তার ওপর, তার পরম প্রিয় গুরুদেব সেই মহাস্থবির জোসিমার ওপর, যিনি এখন মৃত। এটা ঠিক যে এই সত্তা এত দীর্ঘকাল তার সামনে অবিসংবাদিত আদর্শ হয়ে টিকে ছিল যে তার তারুণ্যের সমস্ত শক্তি, সব উৎসাহ উদ্দীপনা বিশেষ করে এই আদর্শটির দিকে ধাবিত না হয়ে পারেনি এবং কোনো কোনো মুহূর্তে এমনও হয়েছে যে তার ফলে 'সবার জন্য এবং সবের জন্য' পর্যন্ত তাকে বিস্মৃত হতে হয়েছে। পরে সে নিজেও মনে করে দেখেছে যে দুর্বিষহ ঘটনার আগের দিন যে দাদা দ্মিত্রির জন্য তার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না সেই দিনটিতে কিন্তু তার কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল; আর ইলিউশার বাবাকে দুশ রুবল দিয়ে আসার কাজটা করে দেবে বলে অত উৎসাহের সঙ্গে আগের দিন যে দায়িত্ব সে নিয়েছিল তাও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু আবারও বলতে হচ্ছে, কোনো অলৌকিক ঘটনার দরকার তার ছিল না, যেটা দরকার ছিল তা 'চূড়ান্ত ন্যায়বিচার' ছাড়া আর কিছু নয়, যা, তার বিশ্বাস, সে দিন নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, যার অতর্কিত রূঢ় আঘাত তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। তাহলে কি আলিয়োশা যে ন্যায়বিচারের প্রতীক্ষা করছিল ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়েই তা এমন অলৌকিক রূপ পরিগ্রহ করল যা কিনা তার এক কালের গুরু, অশেষ ভক্তিভাজন এই মানুষটির দেহাবশেষ থেকে অবিলম্বে প্রত্যাশিতই ছিল? তা হলে যে মঠের সকলে ওই একই চিন্তা, একই আশা মনে মনে পোষণ করেছিলেন—এমনকি স্বয়ং সাধু পাইসির মতো লোক পর্যন্ত, যাঁদের বুদ্ধিমত্তার সামনে আলিয়োশা মাথা নত করত? আর তাইতেই তো আলিয়োশা সন্দেহের খোঁচা দিয়ে নিজেকে এতটুকু উত্ত্যক্ত না করে নিজের স্বপ্নকেও সেই রূপ দান করেছিল যা করেছিল আর সকলে। তা ছাড়া আজ বহুকাল হল, মঠে তার জীবনযাত্রার পুরো এক বছরের মধ্যে এটা এই ভাবেই তার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার মন এইভাবে প্রতীক্ষা করাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু যার জন্য তার ব্যাকুলতা ছিল তা ন্যায়, ন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়, নিছক অলৌকিক ঘটনা নয়!

অথচ এখন দেখা যাচ্ছে আলিয়োশার প্রত্যাশা অনুযায়ী সারা পৃথিবীর সকলের মাথার ওপর সম্মানের আসনে যাঁর থাকার কথা সেই মানুষটিকেই কিনা তাঁর প্রাপ্য গৌরবের বদলে হঠাৎ নিচে নামিয়ে দেওয়া হল, তাকে কালিমালিপ্ত করা

হল! কীসের জন্য? কে তাঁকে বিচার করেছে? এই ভাবে বিচার করার ক্ষমতা কার হতে পারে? ঠিক এই প্রশ্নগুলিই সেই মুহূর্তে তার অনভিজ্ঞ ও অপাপবিদ্ধ হৃদয়কে যন্ত্রণায় অস্থির করে তোলে। ধার্মিকদের মধ্যে পরম ধার্মিক তাঁর মতো একজন মানুষকে যে তাঁর তুলনায় অতি নিকৃষ্টস্তরের, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন জনতার বিদ্বেবিষপনা ঠাট্টা বিদ্রূপ উপহাস ও লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেওয়া হল এটা আলিয়োশার সহ্যের বাইরে। সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এমনকি ক্রোধে তার বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল। অলৌকিক ঘটনা আদৌ না হলে না-ই ঘটল, অলৌকিকতার কোনো লক্ষণ না হয় প্রকাশ না-ই পেল, অচিরেই কিছু একটা ঘটবে বলে লোকের যে প্রত্যাশা ছিল তার সত্যতা না হয় প্রমাণিত না-ই হল, কিন্তু যা প্রকাশ পেল সেটা তো তাঁর মর্যাদাহানিকর! তা কেন হল? এরকম কলঙ্কই বা তাঁর কপালে জুটল কেন? কেন তাঁর দেহের এই শীঘ্র পচন, যাকে বিদ্বেষপরায়ণ সন্ন্যাসীরা 'প্রকৃতির নিয়মকেও ছাড়িয়ে গেছে' বলে উল্লেখ করেছে? কেন এই 'অঙ্গুলি নির্দেশ' যা তারা এখন সাধু ফেরাপোন্তের সঙ্গে মিলে এত জাঁক করে ঘোষণা করছে? কেনই বা তাদের বিশ্বাস যে এমন সিদ্ধান্তে আসার অধিকার পর্যন্ত তারা পেয়ে গেছে। তাহলে কোথায় বিধাতার বিধান, কোথায় তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ? আলিয়োশা মনে করেছিল এটাই তো ছিল 'অতি প্রয়োজনীয় একটি মুহূর্ত', অথচ ঠিক এই সময়ই কিনা তিনি তাঁর আঙুল গুটিয়ে নিলেন? তাহলে কি নিজে ইচ্ছে করে অন্ধ মূক ও নিষ্করুণ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতা মেনে নিলেন?

আলিয়োশার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের এটাই ছিল কারণ, এবং সর্বোপরি, আমি আগেও বলেছি এখানে তার সামনে ছিলেন সেই মানুষটি যিনি পৃথিবীতে আলিয়োশার সবচাইতে প্রিয়জন। তিনিই কিনা আজ 'কলঙ্কিত', তাঁর গৌরবই কিনা 'ভূলুণ্ঠিত'! আমার নায়ক এই নবীন যুবকের অস্ফুট উক্তি হলই না হয় ছেলেমানুষি ও অবিবেচনাপ্রসূত, কিন্তু এই নিয়ে তিনবার হল, আমি আবারও বলছি এবং আগে থাকতে স্বীকার করতেও রাজি আছি যে কথাটা হয়তো বা ছেলেমানুষিই হয়ে যাচ্ছে— আমি খুশি যে আমার নায়ক এই রকম একটা মুহূর্তে ততটা বিবেচনাবোধের পরিচয় দিতে পারেনি, যেহেতু মানুষ যদি নেহাৎ বোকা না হয় তাহলে সময়মতো তার বিচারবুদ্ধি ঠিকই হবে, কিন্তু এমন একটা বিশেষ মুহূর্তে একজন যুবকের মনে যদি ভালোবাসার প্রকাশ না ঘটে, তবে আর তা কবে হবে? অবশ্য আলিয়োশার জীবনের অমোঘ ও বিভ্রান্তিকর মুহূর্তটিতে চকিতে হলেও অদ্ভুত গোছের এমন একটা কিছুর উদয় তার মনের মধ্যে হয়েছিল, এখানে তারও উল্লেখ না করে পারছি না। এই যে একটা কিছু, যা বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিয়েছিল তা ছিল দাদা ইভানের সঙ্গে তার গতকালের কথাবার্তার বেশ খানিকটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। সেটা এখন আলিয়োশার বড়ো বেশি করে অনবরত মনে পড়ছে। ঠিক এখনই মনে পড়ছে! না, এর অর্থ এই নয় যে তার মনের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি বা

স্বতঃস্ফূর্ততা বলতে যা বোঝায় সেখানে কোনো দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছিল। সে তার ঈশ্বরকে ভালোবাসত, তাঁতে তার অচলা ভক্তি ছিল, যদিও হঠাৎ সে তাঁর বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গতকাল দাদা ইভানের সঙ্গে কথাবার্তার পর সেই যে একটা অস্পষ্ট অথচ বেদনাদায়ক ও জ্বালাধরা অনুভূতি তার মনে ছাপ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল সে কথা মনে হতে এখন সেটা আবার ভেতরে ভেতরে নড়েচড়ে উঠে যেন বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ক্রমেই বেশি করে আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। আশ্রম থেকে মঠের দিকে পাইনকুঞ্জের পথ দিয়ে চলছিল রাকিতিন। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা গাছের তলায় মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে আলিয়োশা। নিশ্চল, দেখে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। সে কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকল।

"তুমি এখানে, আলেক্সেই? শেষকালে কিনা তোমার " অবাক হয়ে সে কথাটা বলতে বলতেও শেষ না করে থেমে গেল। আসলে বলতে চাইছিল 'শেষকালে কিনা তোমার এই দশা?'

আলিয়োশা তার দিকে মুখ তুলে তাকাল না। তবে তার সামান্য নড়াচড়া দেখে রাকিতিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে আলিয়োশা তার কথা শুনতে পাচ্ছে, সে কি বলতে চায় তাও বুঝতে পেরেছে।

"আরে তোমার কী হয়েছে বল তো?" তখনও তার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর, তবে তার মুখে বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে সে জায়গায় হাসি ফুটতে শুরু করছে, আর সে হাসি উত্তরোত্তর বেশি করে বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠছে।

"আরে শোন, শোন, দুঘণ্টার ওপরে হয়ে গেল, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি ওখান থেকে উধাও হয়ে গেছ। তা এখানে কী করছ বল তো? এসব কি ছেলেমানুষি তোমার, শুনি? একবার মুখ তুলে তাকাবে তো আমার দিকে

আলিয়োশা মাথা তুলল, উঠে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসল। সে কাঁদছিল না, কিন্তু তার মুখে বেদনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল বিরক্তি। প্রসঙ্গত, রাকিতিনের মুখের দিকে না তাকিয়ে সে পাশ ফিরে অন্য কোথাও তাকিয়েছিল।

"দেখ দেখি, তোমার মুখের চেহারাই তো একদম পালটে গেছে! সেটা জান কি? যে বিনীত ভাবের জন্য তোমার এত নাম, তোমার আগেকার সেই ভাবটা একেবারে নেই। কারও ওপর রাগ করেছ নাকি? কেউ তোমার মনে দুঃখ দিয়েছে?"

"আমাকে একা থাকতে দাও!" আগের মতোই রাকিতিনের মুখের দিকে না তাকিয়ে ক্লান্ত ভাবে হাত নেড়ে ভঙ্গি করে আলিয়োশা বলে উঠল।

"বটে, এই কথা! এই তো দিব্যি আর দশটা নশ্বর মানুষের মতোই গলা চড়াতে শুরু করেছ। দেবদূতদের মুখ থেকে এ কী শুনছি! না আলিয়োশা, তুমি আমাকে

অবাক করে দিলে। শুনতে পাচ্ছ? আমি কিন্তু অন্তর থেকেই বলছি। এখানে অনেক কাল কোনো কিছুতে এত অবাক হইনি। তোমাকে আমি বরাবর একজন শিক্ষিত লোক বলেই জানতাম

আলিয়োশা অবশেষে রাকিতিনের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মনে হচ্ছিল সে এখনও বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

"তোমার ওই বুড়ো মানুষটির দেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে—স্রেফ এটাই কি কারণ? তুমি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছিলে যে উনি অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটাতে শুরু করবেন?" আবারও অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে রাকিতিন বলে উঠল।

"বিশ্বাস করেছিলাম, বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করতে চাই এবং বিশ্বাস করবও। শুনলে তো? হয়েছে এবার?" বিরক্তির সঙ্গে চিৎকার করে উঠল আলিয়োশা।

"না হে, কিছুই বলার নেই। ছিঃ ছিঃ, কী বলব, বারো-তেরো বছরের একটা স্কুলের ছেলেও এখন অমন বিশ্বাস করে না। তা যাক গে তুমি তাহলে এখন তোমার ওই ভগবানের ওপর রাগ করেছ, তাই না? তার বিরুদ্ধে তোমার বিদ্রোহ, এই কারণে যে পদমর্যাদা দিলেন না, উৎসব উপলক্ষ্যে শিরোপা দিলেন না। বোঝ কাণ্ড!'

আলিয়োশা চোখ দুটো কেমন যেন কুঁচকে দীর্ঘক্ষণ রাকিতিনের দিকে তাকাল, তার দুচোখ হঠাৎ ঝলকে উঠল, কিন্তু তাতে রাকিতিনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পেল না।

"ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্রোহ নেই। আমার কথা শুধু এই যে আমি তাঁর জগৎকে মানি না'", বাঁকা হাসি হেসে হঠাৎ আলিয়োশা বলে উঠল।

"জগৎকে মান না—এ আবার কেমন কথা?", রাকিতিন সামান্য একটু ভেবে প্রত্যুত্তরে বলল। "কী সব আবোল তাবোল কথা?"

আলিয়োশা জবাব দিল না।

"যাক গে, ওসব আজেবাজে কথা অনেক হয়েছে। এখন কাজের কথায় আসা যাক। আজ কিছু খাওয়া হয়েছে কি তোমার?"

"মনে নেই বোধহয় খেয়েছি।"

"তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না। তোমাকে খেয়েদেয়ে একটু চাঙ্গা হতে হবে। তোমাকে দেখলে দুঃখ হয়। রাতেও ত তোমার ঘুম হয়নি। শুনেছি তোমাদের নাকি একটা সভাও হয়েছিল। তার ওপর এত সব ঝুট ঝামেলা। খাবার মধ্যে তো ওই প্রসাদ-ট্রসাদ একটু আধটু যা দাঁতে কেটেছ। আমার পকেটে কিন্তু সসেজ আছে, কাজে লাগলেও লাগতে পারে. এই ভেবে, এখানে আসার সময় শহর থেকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু সসেজ কি আর তোমার চলবে? "

"দাও, তোমার ওই সসেজই দাও।"

"বল কি! অ্যাঁ! এ যে রীতিমতো বিদ্রোহ! একেবারে ব্যারিকেড তুলে বিদ্রোহ! তা ভাই ভালো কথা, তবে তো কোনো কিছুতেই অরুচি হবার কথা নয়। চল, আমার বাড়ি চল। খানিকটা ভোদ্‌কা না হলে আমার আবার চলছে না। যা পরিশ্রমটা গেছে একেবারে মরার হাল হয়েছে আমার! ভোদ্‌কা তোমার নিশ্চয়ই চলবে না?... নাকি খাবে?"

"তা খাব, দাও, ভোদ্‌কাও খাব।"

"বাহবা! এ যে অবাক কাণ্ড ভাই।" রাকিতিন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। "তা ওই একই হল, ভোদ্‌কাই বল আর সসেজই বল—দুর্দান্ত ব্যাপার, বহুত আচ্ছা! এমন মোক্ষম সুযোগ ছাড়া যায় না। চল!"

আলিয়োশা চুপচাপ ভূমিশয্যা ছেড়ে রাকিতিনকে অনুসরণ করল।

"তোমার দাদা ভানিয়াটা যদি তোমাকে এখন দেখত তাহলে কী অবাকই না হয়ে যেত! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার দাদা ইভান ফিয়োদরভিচ্ আজ সকালে মস্কোয় সটকান দিয়েছে, জান তো?"

"জানি", নিস্পৃহ কণ্ঠে আলিয়োশা বলল। হঠাৎ তার মনশ্চক্ষে এক ঝলক খেলে গেল দাদা দ্‌মিত্রির মুখটা, কিন্তু সে ওই এক ঝলক মাত্র—যদিও তাকে মনে করিয়ে দিল কী একটা জরুরি কাজ যেন তার পড়ে আছে, যেটা তার একটা বড়ো কর্তব্য, একটা বিরাট দায়িত্ব, যা আর এক মুহূর্তও ফেলে রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু মনে পড়লে কী হবে, এই স্মৃতিও তার মনে কোনো ছাপ ফেলল না, তার তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছুল না, নিমেষে মন থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। তবে পরে এই ঘটনাটি আলিয়োশার দীর্ঘকাল মনে পড়ত।

"তোমার ইভান দাদাটি তো একবার বড়ো মুখ করে আমার সম্পর্কে বলেছিল আমি নাকি 'একটা অপদার্থ উদারপন্থী ভুষোমাল'। তুমিও বাপু একবার নিজেকে সামলাতে না পেরে আমাকে বুঝিয়ে দিতে ছাড়্ নি যে আমি একটা 'মানসম্ভ্রমহীন' লোক। বেশ তো, না হয় তা-ই হলাম! এখন দেখব তোমাদের কার কত প্রতিভা, কার কত মানসম্ভ্রমবোধ।" এই কথাগুলি অবশ্য রাকিতিন আপন মনে বিড়বিড় করেই শেষ করল। "ওহো, শোন!" এরপর জোর গলায় আবার বলে উঠল, "চল তো দেখি, মঠ পেরিয়ে ওই পায়ে-চলা-পথটা ধরে সোজা শহরের দিকে যাই একবার।... হুম্। ভালো কথা, আমাকে একবার খখ্‌লাকোভার কাছ থেকে ঘুরে আসতে হয়। একবার ভেবে দেখ যা কাণ্ডকারখানা ঘটেছিল সে সবই আমি তাঁকে লিখে জানিয়েছি। মহিলা আবার চিরকুট লিখতে ভারি পছন্দ করেন। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার লেখার উত্তরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিলে লিখে জানান যে 'প্রভু জোসিমার মতো অমন সম্মানীয় একজন মহাস্থবিরের কাছ থেকে অমন আচরণ তিনি কোনোমতে আশা করতে পারেন নি!' হ্যাঁ, 'আচরণ!'—ঠিক এই কথাই লিখেছিলেন। উনিও কিন্তু রেগে গেছেন। ওঃ কী যে সব তোমরা হয়েছ! আচ্ছা,

দাঁড়াও তো!” আচমকা আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আলিয়োশার কাঁধ ধরে তাকেও থামিয়ে দিল।

কোথা থেকে আরও একটা নতুন চিন্তা চট করে রাকিতিনের মাথায় খেলে গিয়েছিল। উৎসুক দৃষ্টিতে আলিয়োশার চোখের দিকে তাকিয়ে সেই নতুন আকস্মিক চিন্তায় বিভোর হয়ে সে বলে উঠল, “জান আলিয়োশা ” মনের কথাটা প্রকাশ করতে গিয়ে বাইরে হাসি-হাসি ভাব দেখাল বটে, কিন্তু দেখেশুনে মনে হল ওই আকস্মিক নতুন চিন্তাটা সে মুখ ফুটে বলতে ভয় পাচ্ছে, কেন না আলিয়োশাকে এখন যে মেজাজে সে দেখতে পাচ্ছে তা এমনই আকস্মিক, রাকিতিনের কাছে এতই অদ্ভুত যে তখন পর্যন্ত কোনোমতে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। “কোথায় গেলে এখন সবচেয়ে ভালো হয় জান আলিয়োশা?” অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে শেষকালে ভয়ে ভয়ে সে মুখ ফুটে বলেই ফেলল।

“এক জায়গায় হলেই হল, যেখানে তোমার খুশি।”

“চল, গ্রুশেন্‌কার কাছে যাওয়া যাক। কী বল? যাবে ত?” আসল মতলবটা সে প্রকাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়মিশ্রিত একটা প্রত্যাশায় তার সর্বাঙ্গ কেমন যেন কেঁপেও উঠল।

“তা চল, গ্রুশেন্‌কার কাছেই চল”, শান্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ আলিয়োশা জবাব দিল।

আর যেটা হোক না হোক, এটা, অর্থাৎ এমন চট করে রাজি হয়ে গিয়ে এত শান্ত কণ্ঠে সে কথা বলা, রাকিতিনের কাছে এত বেশি অপ্রত্যাশিত ছিল যে সে হকচকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে পিছু হটতে যাচ্ছিল।

“বাঃ! এই তো চাই!” বিস্ময়ের আতিশয্যে সে চেঁচাতে গেল, কিন্তু তারপর হঠাৎই আলিয়োশার হাতটা খপ করে চেপে ধরে তাকে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে পায়ে-চলা-পথটার ওপর এনে ফেলল। রাকিতিনের তখনও ভীষণ ভয় এই বুঝি আলিয়োশা আবার মত বদলায়।

দুজনে চুপচাপ পথ চলতে লাগল। রাকিতিন কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছিল।

“আহা কী খুশিই না হবে গ্রুশেন্‌কা তোমাকে দেখলে! কী খুশিই যে হবে বিড়বিড় করে কথাগুলি বলতে বলতে আবারও চুপ করে গেল। এ ছাড়া গ্রুশেন্‌কার কাছে আলিয়োশাকে যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা আদৌ গ্রুশেন্‌কাকে খুশি করার জন্য নয়। রাকিতিন লোকটা আসলে ঘোর বাস্তববাদী, নিজের লাভের সম্ভাবনা যেখানে নেই সেখানে এক পা-ও বাড়ানোর পাত্র সে নয়। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিবিধ। প্রথমত প্রতিহিংসামূলক, অর্থাৎ সে দেখতে চায় একজন ‘সাধুব্যক্তির কলুষতা’ এবং ‘পুণ্যবান থেকে পাপীতে’ আলিয়োশার সম্ভাব্য ‘পতন’, যার আশায় সে আগে থাকতেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও তার মনে মনে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল যেটা নিতান্তই বৈষয়িক, তার কাছে অত্যন্ত লাভজনক। সে বিষয়ে পরে আমরা বলছি।

BanglaBoi.org

'তার মানে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি এসেছে', বিদ্বেষভরা খুশি নিয়ে সে মনে মনে ভাবল, 'হুঁ হুঁ, এই যে মওকাটি পাওয়া গেছে একে একবার হাতের মুঠোয় ধরতে পারলে হয়! ঠিক এটাই তো আমাদের চাই!'

## তিন

## পিঁয়াজকলি

শহরের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত অঞ্চলে, ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের কাছে মরোজভ্ নামে এক ব্যবসায়ীর বিধবা স্ত্রীর বাড়িতে গ্রুশেন্কার বাস। বাড়ির উঠোনের সংলগ্ন বহির্বাটির অংশ ছোটো একটা কাঠের কুঠি সে ভাড়া নিয়েছিল। মরোজভ্দের বাড়িটা অবশ্য ছিল একটা দোতলা পাকা দালান, বেশ বড়োসড়ো, পুরনো, দেখতে বড়ই কদাকার। বাড়িতে নিরিবিলি জীবন যাপন করে বাড়ির কর্ত্রী বৃদ্ধ বিধবা মহিলা নিজে, তার সঙ্গে তার দুই অবিবাহিতা ভাইঝি—তারাও রীতিমতো বয়স্থা। উঠোন সংলগ্ন বহির্বাটির ওই অংশ ভাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন মহিলার ছিল না, কিন্তু সবাই জানে, আজ থেকে বছর চারেক আগে গ্রুশেন্কাকে যে তার বাড়িতে ভাড়া থাকতে দিয়েছে সে কেবল তার এক আত্মীয়, সাম্সোনভ্ নামে এক ব্যবসায়ীর খাতিরে। সাম্সোনভ্ খোলাখুলিভাবেই মেয়েটির মুরুব্বিগিরি করত। লোকে বলত বুড়ো সাম্সোনভ্ ছিল ঈর্ষাকাতর, তাই তার এই 'প্রিয়পাত্রীটিকে' বিধবা মরোজভার হেফাজতে রাখার সময় প্রাথমিকভাবে মহিলার তীক্ষ্ণ নজরদারির কথা ভেবে তার মনে হয়েছিল মহিলা তার নতুন ভাড়াটিয়া মেয়েটির হালচালের ওপর কড়া নজর রাখবে। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই গ্রুশেন্কাকে চোখে চোখে রাখার আর কোনো আবশ্যকতা দেখা গেল না। তার সঙ্গে মরোজভার দেখাসাক্ষাৎই কদাচিৎ হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এবং মরোজভাও তার ওপর তদারকি করে তাকে উত্ত্যক্ত করা একদম ছেড়ে দিল। বুড়ো যখন প্রদেশের এক ভিন্ন শহর থেকে তাকে এই বাড়িতে এনে তোলে তখন সে ছিল রোগাপাতলা, লাজুক ও মুখচোরা স্বভাবের, ভাবালু ও বিষাদের প্রতিমূর্তি এক অষ্টাদশী তন্বী। এটা সত্যি যে তারপর চার বছর কেটেছে, অনেক জল গড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, এই মেয়েটির জীবনকথা আমাদের শহরের খুব কম লোকেই জানত, যাও বা জানত তাও অস্পষ্ট, ছাড়াছাড়া। সাম্প্রতিক কালেও যে তার চেয়ে বেশি জানতে পেরেছে তা নয়—আর তাও কিনা সেই সময় যখন গ্রুশেন্কা নামে পরিচিত, আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না চার বছরের মধ্যে এমন এক 'পরমা সুন্দরী' যুবতীতে রূপান্তরিত হয়েছে যে বহু লোকে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। শুধু লোকমুখে শোনা গেছে যে তার যখন সতেরো বছর বয়স তখন কে একজন — লোকটা নাকি কোন এক সামরিক অফিসার— তার সঙ্গে ছলনা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করে। অফিসারটি নাকি তাকে ছেড়ে

চলে যায়, পরে কোথায় একটা বিয়েও করে, এদিকে গ্রুশেন্‌কা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করতে লাগল। প্রসঙ্গত, লোকে বলাবলি করত, গ্রুশেন্‌কাকে যদিও তার ওই বুড়ো নিঃসম্বল অবস্থা থেকে তুলে এনেছিল, তবু সে ভদ্রঘরের মেয়ে, যাজকশ্রেণির কোনো এক পরিবার থেকে এসেছে, তার বাপ ছিল কোনো এক ছোটখাটো গির্জার একজন আচার্য বা ওই গোছের কিছু।

এখন এই চার বছরের মধ্যে ভাবপ্রবণ লাঞ্ছিতা ও করুণার পাত্রী সেদিনকার সেই অনাথা কিশোরীটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে, সে এখন হয়ে উঠেছে সুপুষ্ট দেহলাবণ্যময়ী দুঃসাহসী দুধে আলতা মেশানো এক আদর্শ রূশ সুন্দরী, ও দৃঢ় চরিত্রের এক নারী, প্রগল্‌ভ ও অহমিকাপূর্ণ। টাকাপয়সার ব্যাপারটা সে বেশ ভালো বোঝে, অর্থ উপার্জন আর সঞ্চয় করতে জানে, কৃপণ ও হুঁশিয়ার। তার সম্পর্কে লোকে বলে সৎপথে বা অসৎ পথে যে ভাবেই হোক, এরই মধ্যে সে নিজের একটা ছোটখাটো পুঁজি জমিয়ে ফেলেছে। একমাত্র একটা ব্যাপারে সকলে একমত: গ্রুশেন্‌কার নাগাল পাওয়া ভার, ওর রক্ষাকর্তা সেই বুড়ো ছাড়া এই চার বছরের মধ্যে এমন একজনকেও দেখা যায় নি যে তার অনুগ্রহভাজন হয়েছে বলে গর্ব করতে পারে। এই তথ্যটির ভিত্তি অবশ্যই দৃঢ়, কারণ তার অনুগ্রহ লাভের জন্য এক লাফে এগিয়ে আসার মতো উৎসাহী লোকের কোনো অভাব ছিল না — বিশেষত গত দু বছরের মধ্যে তো বটেই। কিন্তু সকলের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। কোনো কোনো অন্বেষণকারীকে আবার এই দৃঢ়চেতা বিশিষ্ট যুবতীটির কঠিন ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত হয়ে তার কাছ থেকে কঠিন প্রত্যাঘাত পেয়ে কৌতুককর ও অমর্যাদাকর পরিণতি পর্যন্ত মেনে নিয়ে পিছু হটতে হয়েছে। লোকে এও জানত যে এই যুবতীটি বিশেষত হালে এমন একটা কারবারের মধ্যে ঢুকেছে যাকে 'ফাটকাবাজি' বলা হয়, আর এক্ষেত্রে তার এত বেশি দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে যে শেষকালে অনেকে এমন কথাও বলতে শুরু করেছে যে ইহুদিদের চেয়ে সে কোনো অংশে কম যায় না। এই নয় যে লোককে টাকা ধার দিয়ে সে সুদ আদায় করত, তবে এটা সুবিদিত, এই যেমন ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ কারামাজভের সঙ্গে মিলে এক সময় কিছুকালের জন্য সে সত্যি সত্যি নামমাত্র মূল্যে—রুবল পিছু দশ ভাগের এক ভাগ মূল্যে হুন্ডি কিনে বাজারে লগ্নি করে পরে সেই হুন্ডিগুলো থেকেই দশ গুণ ফায়দা উঠিয়েছে।

বুড়ো বিপত্নীক সাম্‌সোনভ্ ছিল বেজায় ধনী, লাখোপতি, যেমন হাড়কঞ্জুস, তেমনি নির্দয়। তার বয়স্ক ছেলেদের ওপরও সে তার স্বৈরাচার খাটাত। শেষ এক বছর সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ফোলা পা নিয়ে কোথাও নড়তে চড়তে পারত না। এই অবস্থায় সে তারই অভিভাবকাত্বধীন গ্রুশেন্‌কার প্রবল প্রভাবে পড়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে কৌতুকপ্রিয় লোকেরা যাবে 'নিরামিষাশী করে রাখা' বলত গ্রুশেন্‌কাকেও সে প্রথম প্রথম সেই রকম চরম দুর্দশার মধ্যে শক্ত হাতে

ধরে রাখতে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রুশেন্‌কা তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বুড়োর মনে অগাধ বিশ্বাসের উদ্রেক করে নিজেকে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। বিশাল কারবারি এই বুড়ো আজ বহুকাল হল গত হয়েছে। এরও চরিত্রটি ছিল চমৎকার—বড়ো কথা, যেমন কৃপণ, তেমনি কঠিন তার হৃদয়। গ্রুশেন্‌কা তাকে বশ করেছিল বটে—এমনই বশ করেছিল যে তাকে ছাড়া সে থাকতেই পারত না—বিশেষত শেষ দু বছর অবস্থাটা এরকমই দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু তাহলে কী হবে, খুব একটা উল্লেখযোগ্য, বড়ো রকমের কোনো পুঁজি তার নামে লিখে দিয়ে যায়নি। এমনকি লিখে যে দেয়নি এর জন্য গ্রুশেন্‌কা যদি তাকে একেবারে ছেড়ে চলে যাবার হুমকিও দিত তাহলেও সে তার প্রতি কোনো দয়ামায়া দেখাত না। তবে অল্পস্বল্প হলেও কিছু পুঁজি সে গ্রুশেন্‌কাকে আলাদা করে দিয়েছিল। আর সেটা জানাজানি হতে সেটাও সকলের কাছে আশ্চর্যের মনে হতে লাগল।

তাকে আট হাজার রুবল বরাদ্দ করে দিয়ে বুড়ো বলল, "জলে পড়ার মতো মেয়েমানুষ তুমি নও, নিজেই নিজের পথ দেখ। তবে জেনে রেখো, ভরণপোষণ বাবদ যে বার্ষিক বরাদ্দ তা আমি যত দিন বেঁচে আছি আগের মতোই দিয়ে যাব, এর বেশি কিছু আমার কাছ থেকে পাবে না। আর হ্যাঁ, আমার উইলেও তোমার জন্য আর কিছু বরাদ্দ করছি না।'

বুড়ো তার কথা রেখেছিল। মরার সময় সব সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে গেল তার ছেলেদের, যাদের সে সারাজীবন তাদের স্ত্রী আর ছেলেপুলে সমেত চাকরবাকরের মতো করে রেখেছিল। উইলে গ্রুশেন্‌কার নামোল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। এসবই পরে জানা গিয়েছিল। তবে গ্রুশেন্‌কাকে তার 'নিজস্ব পুঁজি' সম্বল করে কাজে নামার যে পরামর্শ সে দিয়েছিল সেটা কম কাজের হয়নি, গ্রুশেন্‌কাকে সে 'কাজের' পথই দেখিয়েছিল।

দৈবাৎ একটা 'ফাটকার' সুযোগ এসে যাওয়াতে সেই সূত্রেই গোড়ায় গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের যোগাযোগ। পরিণামে যা ঘটল সেটা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল—গ্রুশেন্‌কার প্রেমে সে পাগল হয়ে উঠল, তার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেল। বুড়ো সাম্‌সোনভ্ তখন মৃত্যুর দিন গুনছে, কিন্তু একথা শুনে সেও বেশ একচোট হাসল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বুড়োর সঙ্গে এতকালের পরিচয়ের মধ্যে গ্রুশেন্‌কা কখনও কোনো কথা তাকে গোপন করেনি, সে তাকে পুরোপুরি, এমনকি বলা যেতে পারে অকপটে প্রাণ খুলে মনের সব কথা বলত। সে-ই বোধহয় পৃথিবীতে একমাত্র লোক যার সঙ্গে গ্রুশেন্‌কা তা করতে পারত। অতি সম্প্রতি যখন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচও গ্রুশেন্‌কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল তখন কিন্তু বুড়োর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। উলটে একবার গুরুগম্ভীর ভাবে কড়াভাষায় গ্রুশেন্‌কাকে পরামর্শ দিল 'দেখ, বাপ-ব্যাটা দুজনের মধ্যে একজনকে যদি বেছে নিতে হয়

তবে বাপটাকেই বেছে নাও, তবে হ্যাঁ দেখবে সেক্ষেত্রে বুড়ো হারামজাদাটা যেন অবশ্যই তোমাকে বিয়ে করে আর আগে থেকেই অন্তত কিছু পরিমাণ ধনসম্পত্তি তোমার নামে লিখে দেয়। ওই কাপ্তেন ছোকরাটার সঙ্গে মাখামাখি কোরো না, ওতে ভালো কিছু হবে না।’

এই ছিল লম্পট বুড়োটার কথা। তখনই অবশ্য বুড়ো মনে মনে টের পেয়ে গিয়েছিল যে তার দিন ঘনিয়ে আসছে। এই উপদেশ দেবার ঠিক পাঁচ মাস পরে সে মারা গেল।

কথায় কথায় এও উল্লেখ করতে হয় যে কারামাজ়ভ্দের বাপ-ছেলের এই যে উদ্ভট ও কুৎসিত ধরনের রেষারেষি, যার লক্ষ্যবস্তু ছিল গ্রুশেন্কা, সে কথা যদিও সেই সময় আমাদের শহরের অনেকেই জানত, তবু বুড়ো কারামাজ়ভ্ আর তার ছেলে — এদের দুজনের কার সঙ্গে গ্রুশেন্কার কী সম্পর্ক, সে সম্পর্কের আসল তাৎপর্যই বা কী তা বোঝার সাধ্য বিশেষ কারও ছিল না। এমনকি গ্রুশেন্কার দুই পরিচারকই পরে আদালতে এই সাক্ষ্য দিয়েছিল যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না যে গ্রহণ করেছিল তার একমাত্র কারণ এই যে তাকে সে ভীষণ ভয় করত, কেননা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ নাকি তাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল। এটা অবশ্য সেই দুর্ঘটনাটি ঘটে যাবার পরের ঘটনা, যার কথা আমরা এর পরেই বলব। গ্রুশেন্কার পরিচারিকা বলতে দুজন—একজন থুত্থুড়ে বুড়ি এক রাঁধুনি, গ্রুশেন্কার বাপের বাড়ি থেকে এসেছে, অসুস্থ, প্রায় কালা; আরেকজন ওই রাঁধুনিরই নাতনি—বেশ চটপটে কচি বয়সের একটি মেয়ে, বছর কুড়ি বয়স হবে—সে-ই গ্রুশেন্কার সর্বক্ষণের দাসী। খুবই হিসেব করে সে চলত, তার জীবনযাপনের মধ্যে বিলাসিতার কোনও চিহ্ন ছিল না। বহির্বাটিতে তার মোট কামরা ছিল তিনটে, ঘরে আসবাবপত্রও ছিল, সেগুলি কাঠের, শুধু কাঠের নয়—মেহগনি কাঠের, বাড়িউলির সম্পত্তি, বিশের দশকে প্রচলিত সাবেকি ফ্যাশনের।

রাকিতিন আর আলিয়োশা যখন পৌঁছুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু গ্রুশেন্কার ঘরে তখনও আলো জ্বলেনি। বসার ঘরে মেহগনি কাঠের পিঠ দেওয়া, ঢাউস, কদাকার এবং বহুকালের পুরনো রং চটা, টুটোফাটা একটা শক্ত সোফার ওপর গ্রুশেন্কা শুয়ে ছিল। তার মাথার নিচে বিছানা থেকে তুলে আনা দুটো নরম পালকের বালিশ। চিত হয়ে দু হাত মাথার পেছনে ভাঁজ করে শরীর টানটান করে নিশ্চলভাবে সে শুয়ে ছিল। দস্তুরমতো ভালো জামাকাপড় পরা। দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি কারও প্রতীক্ষায় আছে। পরনে কালো সিল্কের পোশাক, মাথায় ফুরফুরে লেসের জাল, যা যা তাকে ভারি মানাচ্ছে। কাঁধের ওপরে ছড়ানো একটা লেসের ওড়না মস্ত একটা সোনার ব্রোচ্ দিয়ে আটকানো। বাস্তবিকই সে কারও অপেক্ষায় ছিল। তার শুয়ে থাকার মধ্যে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ব্যাকুলতা ও অধৈর্যের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। মুখটা বেশ ফ্যাকাশে, ঠোঁট আর চোখ জোড়া উত্তপ্ত, অধীর

হয়ে ডান পায়ের পাতা অল্প অল্প করে সোফার হাতলে ঠুকছে। রাকিতিন আর আলিয়োশা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে একটা ছোটখাটো হুলস্থুল বেধে যাচ্ছিল প্রায়। ঢোকার মুখের বড়ো ঘরটা থেকে তারা শুনতে পেল গ্রুশেন্‌কা তড়াক করে সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল 'কে? কে ওখানে?' কিন্তু পরিচারিকা মেয়েটি আগন্তুকদের দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকেই সাড়া দিয়ে তার দিদিমণিকে জানিয়ে দিল

"না, না সে নয়, এরা অন্য লোক। ও কিছু নয়।"

আলিয়োশার হাত ধরে তাকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাকিতিন বিড়বিড় করে আপন মনে বলল, 'এর আবার হল কী?'

গ্রুশেন্‌কা সোফার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার ভয়ের ভাবটা এখনও কাটেনি। তার গাঢ় বাদামি রঙের চুলের বিনুনির একটা গোছা মাথায় আটকানো লেসের জালির ভেতর থেকে হঠাৎ আলগা হয়ে বেরিয়ে তার ডান কাঁধের ওপর এসে পড়ল, কিন্তু সেটা সে লক্ষই করল না, আগন্তুকদের ভালো করে দেখে তাদের চিনতে পারার আগে পর্যন্ত গোছালও না।

"ওঃ রাকিতিন, তুমি? কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলে! কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ? তোমার সঙ্গে এ কে? হা ভগবান, কাকে নিয়ে এসেছ!" আলিয়োশাকে ভালো করে দেখার পর চিনতে পেরে সে বলে উঠল।

"আরে একটা মোমবাতি তো আনতে বল!" এমন একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রাকিতিন বলে উঠল যে দেখে মনে হচ্ছিল সে বুঝি গ্রুশেন্‌কার ঘনিষ্ঠ পরিচিত কেউ, এমন কি এত কাছের লোক যে এ বাড়িতে হুকুম করার অধিকার তার আছে।

"মোমবাতি হ্যাঁ তাই তো ওরে ফেনিয়া, শিগ্‌গির একটা মোমবাতি নিয়ে আয়। এই তোমার ওকে আনার সময় হল!" আবার আলিয়োশার দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করে সে বলল। তারপর আয়নার দিকে ফিরে চটপট দু হাতে চুলের বিনুনিটা গোছাতে শুরু করল। দেখে মনে হল সে অসন্তুষ্ট।

"খুশি করতে পারলাম না বুঝি?" মুহূর্তের মধ্যে কতকটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রাকিতিন জিগ্‌গেস করল।

"আর কিছু নয়, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে গো রাকিতিন।" তারপর আলিয়োশার দিকে ফিরে হাসিমুখে বলল, "আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি আমার, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কী ভীষণ খুশিই না আমি হয়েছি! তোমার মতো একজন অতিথিকে আমি আশাই করতে পারিনি। তুমি কিন্তু বাপু রাকিতিন আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আমি তো ভেবেছিলাম মিতিয়া বুঝি জোর জবরদস্তি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। দেখ, এই কিছুক্ষণ আগে আমি ওকে ধোঁকা দিয়েছি, ওকে দিয়ে সত্যি করিয়ে নিয়েছি আমাকে যেন বিশ্বাস করে; কিন্তু আসলে মিথ্যে বলেছি

ওকে। ওকে বলেছি কুজ্মা কুজ্মিচের কাছে যাচ্ছি, সারাটা সন্ধে আমাকে বুড়োর সঙ্গে থাকতে হবে, অনেক রাত অবধি বসে ওর টাকাপয়সার হিসেব করে দিতে হবে। হপ্তায় একবার সারা সন্ধের মতো ওর কাছে যাই কিনা, হিসেব মিলিয়ে দিয়ে আসি। দরজায় তালাচাবি এঁটে আমরা ঘরের ভেতরে বসি। বুড়ো টাকাপয়সা গোনার সাবেকি সরঞ্জামটার কাঠিতে গাঁথা ঘুঁটিগুলো খটাখট শব্দে এ ধার ওধার করে হিসেব কষে, আমি বসে বসে খাতায় হিসেব তুলি। আর কাউকে তার বিশ্বাস নেই। মিতিয়া ঠিক বিশ্বাস করল আমি এখনও ওখানে, এদিকে আমি ফিরে এসে বাড়িতেই দরজা বন্ধ করে বসে আছি, একটা খবরের অপেক্ষায় আছি। ফেনিয়া তোমাদের ভেতরে ঢুকতে দিল কী বলে! ফেনিয়া, ফেনিয়া, এক ছুটে গেটের কাছে গিয়ে গেটটা খুলে একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে আয় তো কাপ্তানকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে কিনা। বলা যায় না, হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে নজর রাখছে। উঃ, ভয়ে মরে যাচ্ছি!"

"কেউ নেই আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না। আমি এখনই চারপাশে উঁকি মেরে দেখে এসেছি। মিনিটে মিনিটে গেটের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে আসছি। আমি নিজেই তো ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।"

"খড়খড়িগুলো ভালোমতো বন্ধ আছে তো রে ফেনিয়া? পরদাটা ফেলে দিলে তো হয়—এই যে এই ভাবে!" বলতে বলতে সে নিজেই ভারী পরদাগুলি ফেলে দিল। "তা না হলে আলো দেখলেই ঠিক উড়ে আসবে। ওই যে মিতিয়া, তোমার ভাইটি গো, আলিয়োশা, ওকেই আজ আমি ভয় পাচ্ছি।" গ্রুশেন্কা জোরে জোরে কথা বলছিল, তার কথা বলার মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল বটে, কিন্তু তাকে দেখে কেমন যেন পুলকিতও মনে হচ্ছিল।

"কেন, মিতিয়াকে তোমার আজ এত ভয় কেন?" রাকিতিন জানতে চাইল। "আমার তো মনে হয় ওকে তুমি তো ভয় পাওই না, বরং তুমিই ওকে নাচাও।"

"তোমাকে বলছি কি, একটা খবরের অপেক্ষায় আছি। ভারি দামি খবর, ঠিক এই সময় মিতিয়াকে আমি একদম চাইছি না। আর হ্যাঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি যে কুজ্মা কুজ্মিচের কাছেই গেছি সেটা ও বিশ্বাস করেনি। খুব সম্ভব এখন ফিয়োদর পাভ্লভিচের বাড়ির পেছন দিকের ওই বাগানটাতে ওর নিজের জায়গায় ওত পেতে বসে আছে, আমার ওপর নজর রাখছে। যদি ওখানে বসে থাকে তাহলে অবশ্য ভালোই বলতে হবে, এদিকে আর আসছে না! এদিকে হয়েছিল কি জান, কুজমা কুজমিচের কাছে আমি এক ছুটে গিয়েছিলাম, গিয়ে চলে এসেছি, মিতিয়াই আমাকে সঙ্গে করে ওখানে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি তখন ওকে বলেছিলাম মাঝরাত অবধি আমাকে ওখানে বসতে হবে, ও যেন অতি অবশ্য মাঝরাতে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য আসে। ও চলে যেতে মিনিট দশেক আমি বুড়োর ওখানে বসে থেকে ফের বাড়ি চলে এলাম। কী ভয় করছিল, ওঃ কী ভয় যে করছিল!—

ভয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসেছি, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়!”

“তা তোমার এত সাজগোজই বা কেন বল তো? বাঃ তোমার মাথার টুপিটা তো বেশ নজর কাড়ার মতো!”

“আহা, তোমার তো সবেতেই নজর দেখছি রাকিতিন! বললাম না, একটা খবরের আশায় আছি। খবরটা এলেই এক লাফে উঠে পড়ে পাখনা মেলে উড়ে পালাব— আর তোমরা আমাকে এখানে দেখতে পাবে না। সেইজন্যই তো সাজগোজ করে তৈরি হয়ে বসে আছি।”

“তা পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছটা কোথায় শুনি?”

“অত জেনে কাজ নেই, অকালে বুড়িয়ে যাবে।”

“বাব্বাঃ, আনন্দ আর ধরে না দেখছি! এর আগে কিন্তু আর কখনও তোমাকে এমনটি দেখিনি। সাজগোজ করেছে দেখ, যেন নাচের আসরে চলেছে”, আপাদমস্তক তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাকিতিন বলল।

“হুঃ নাচের আসরের কী তুমি বোঝ?”

“তুমি অনেক বোঝ বলতে চাও?”

“নাচের আসর আমার দেখা আছে বৈ কি। এই তো গত বছরের আগের বছর, কুজমা কুজ়্মিচ তার ছেলের বিয়ে দিল, জলসাঘরের গ্যালারি থেকে দেখেছি। না: রাকিতিন, তুমি কি চাও তোমার সঙ্গে বকবক করি, যখন এখানে এমন একজন প্রিন্স দাঁড়িয়ে আছেন! অতিথি বলে কথা! তা আলিয়োশা, বাছা আমার, তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাকে দেখছি, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কী করে আমার এখানে তুমি উদয় হলে! সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আশা করিনি, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি, আগে কখনও বিশ্বাসও করতে পারতাম না যে তুমি এখানে আসতে পার। যদিও এটা ঠিক সেরকম সময় নয়, তবু আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে! বোসো, বোসো, সোফায় এসে বোসো, এই এখানটায় বোসো! বাঃ এই তো, আমার সোনার চাঁদ। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এখনও আমার যেন ঠিক ধারণায় আসছে না। ইশ্, রাকিতিন, তুমি যদি ওকে কাল বা গত পরশুও নিয়ে আসতে! তা যাক গে, এতেও আমি খুশি। গত পরশু না এসে এখন, এরকম একটা মুহূর্তে যে এসেছে হয়তো সেটা ভালোই হয়েছে।

বলতে বলতে গ্রুশেন্‌কা চটপট সোফাতে আলিয়োশার গা ঘেঁষে তার পাশটিতে বসে পড়ল, আনন্দে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল। খুশি সে সত্যি সত্যি হয়েছিল, কথাটা সে মিথ্যে বলেনি। তার চোখদুটি জ্বলজ্বল করছিল, ঠোঁটে হাসি, কিন্তু প্রাণোচ্ছল হাসি, খুশির হাসি। তার মুখে যে এমন প্রসন্ন ভাব ফুটে উঠতে পারে আলিয়োশা কিন্তু সেটা আশাই করতে পারেনি। গতকালের আগে পর্যন্ত তার সঙ্গে আলিয়োশার তেমন একটা দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, তার সম্পর্কে আলিয়োশার মনের মধ্যে একটা দারুণ বিভীষিকাময় ধারণাই গড়ে

উঠেছিল। আর গতকাল তার যে ধরনধারণ আলিয়োশা দেখেছে, কাতেরিনা ইভানভ্নার বিরুদ্ধে ক্রূরতা ও বিদ্বেষের যে পরিচয় সে দিয়েছিল তা আলিয়োশাকে ভীষণ স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন গ্রুশেন্কা যেন একেবারে অন্য মানুষ। তার এই রূপ আলিয়োশার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে হঠাৎ তা দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক। আলিয়োশার মন তার ব্যক্তিগত শোকে যত ভারাক্রান্তই হোক না কেন তার দু চোখের মনোযোগী দৃষ্টি কিন্তু আপনা থেকেই গ্রুশেন্কার মুখের ওপর এসে থমকে রইল। গতকালের পর থেকে গ্রুশেন্কার ভোল যেন পুরোপুরি পালটে গিয়ে ভালোর দিকে ঘুরেছে। তার বাচনভঙ্গির মধ্যে গতকালের মধু ঢালা আমন্ত্রণের ওই সব ন্যাকামি ও ঢংয়ের প্রায় কোনো চিহ্নই নেই। এখন তার সব কিছু সহজ সরল, অকপট, তার ভাবভঙ্গি চটপটে, সোজা ধরনের, অন্যের প্রতি বিশ্বাসপ্রবণ। তবে সে দারুণ উত্তেজিত।

"বোঝ কাণ্ড, যা কিছু সব কিনা আজকের দিনেই ঘটে যাচ্ছে!" আবার আধো-আধো গলায় সে বলতে শুরু করল। "আর তোমাকে দেখে কেন যে আমার এত আনন্দ হচ্ছে, আলিয়োশা, তা আমি নিজেই জানি নে! আমাকে জিগ্গেস করলে কিন্তু বলতে পারব না।"

"আহা কেন আনন্দ হচ্ছে জান না বললেই হল?" রাকিতিন বাঁকা হাসি হাসল। এর আগে তো 'নিয়ে এসো, আমার কাছে একবার নিয়ে এসো' বলে আমার পিছু লেগে ছিলে। উদ্দেশ্য তো একটা ছিলই।"

"আগের কথা যদি বল, তখন একটা অন্য উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু এখন সেটা চলে গেছে। সময়টা অন্য। কথাটা এই যে আমি তোমাদের ভালোমতো আদর আপ্যায়ন করব। আমি এখন ভালোমানুষ হয়ে গেছি গো রাকিতিন। আরে রাকিতিন, তুমিও বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ও, এর মধ্যেই বসে পড়েছ? তা আর হবে না, রাকিতিন কি আর নিজেকে ভুলে থাকার পাত্র? দেখ না আলিয়োশা, ওই তো ওখানে, আমাদের মুখোমুখি বসে আছে, বাবুর রাগ হয়েছে, কেন আমি তোমাকে বসতে বলার আগে ওকে বসার আমন্ত্রণ জানালাম না। আহা রাকিতিন বাবু আমার অভিমানী, বড্ড অভিমানী!" গ্রুশেন্কা হাসতে লাগল। "রাগ কোরো না ভাই রাকিতিন, এখন আমার মনটা উদার। এই যে আলিয়োশা, বাছা আমার, অমন মুখ ভার করে বসে আছ কেন, আমাকে ভয় পাচ্ছ নাকি?" মজা করে হাসতে হাসতে আলিয়োশার চোখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে বলল।

"ওর বড় দুঃখ। খেলাতটা মিলল না", রাকিতিন ফস্ করে গম্ভীর কণ্ঠে হেঁকে উঠল।

"কীসের খেলাত?"

"ওর গুরু মহাস্থবিরের গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।"

"দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মানে? কী সব আজেবাজে বকছ! বিচ্ছিরি কিছু একটা বলতে

চাইছ মনে হচ্ছে। আচ্ছা বোকা তো চুপ কর! তোমার কোলে আমাকে বসতে দেবে আলিয়োশা এই যে এই ভাবে!" বলতে বলতে আচমকা চোখের নিমিষে চট করে জায়গা ছেড়ে উঠে হাসতে হাসতে এক লাফে একটা আদুরে বিড়ালছানার মতো আলিয়োশার কোলে চড়ে বসল, সোহাগভরে ডান হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। ওরে আমার ঠাকুরভক্ত লক্ষ্মী ছেলেটি, তোমার মন আমি ভালো করে দিচ্ছি! না, সত্যি বল ত, আমাকে তোমার কোলে বসতে দিচ্ছ তো? রাগ করলে না তো? হুকুম করলেই নেমে যাব।"

আলিয়োশা কোন কথা বলল না। সে চুপচাপ বসে রইল। তার নড়তে চড়তে ভয় হচ্ছিল 'হুকুম করলেই নেমে যাব'—গ্রুশেন্‌কার একথা তার কানে গেছে, কিন্তু সে জবাব দিল না, মনে হল যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য রাকিতিন তার নিজের জায়গায় বসে লোলুপ দৃষ্টিতে আলিয়োশাকে লক্ষ করতে করতে তার কাছ থেকে এখন যা আশা করতে পারছিল অথবা তার সম্পর্কে যে কথা ভাবতে পারছিল তেমন ভাবনা তাই বলে আলিয়োশার মনের মধ্যে ছিল না। আলিয়োশার অন্তরে যা যা অনুভূতির সঞ্চার হওয়া সম্ভব ছিল একটা নিদারুণ শোকের উপলব্ধি তার সবগুলিকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে কোনো কিছু সুস্পষ্ট ভাবে ভাবার মতো ক্ষমতা যদি তার থাকতও তাহলে সে নিজেও বুঝতে পারত যে-কঠিন শোকের উপলব্ধি সে এখন ধারণ করে আছে তা যে কোনো প্রলোভন ও কামনা বাসনার তীব্রতম আঘাতকে প্রতিহত করতে সক্ষম। তাহলেও, এই মুহূর্তে তার মনের এই যে এত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অবস্থা এবং এই যে শোক যা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এত কিছু সত্ত্বেও তার মনের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের, নতুন যে একটা উপলব্ধি জেগে উঠেছে তাতে কিন্তু সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। এর আগে কখনও এক লহমার জন্য হলেও তার মনের মধ্যে নারী জাতি সম্পর্কে কোনো চিন্তার উদয় হলে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত, কিন্তু এখন কোথায়, এই 'ভয়ঙ্কর' স্ত্রীলোকটিকে তো তার কোন ভয় হচ্ছে না! বরং যাকে অন্য যে কোনো নারীর চেয়ে তার বেশি ভয় ছিল, যে এখন দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার কোলের ওপর বসে আছে, আলিয়োশার মধ্যে সে চকিতে জাগিয়ে তুলেছে একেবারে অন্য ধরনের অতি বিচিত্র ও অভাবনীয় এক উপলব্ধি—তার প্রতি অকপট ও বিশুদ্ধ মনের অদ্ভুত এক ধরনের দুর্নিবার কৌতূহল, যেখানে ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই, আগেকার সেই আতঙ্কের লেশমাত্র নেই। এটাই ছিল সবচাইতে বড়ো কথা, আর তাতে আলিয়োশা বিস্মিত না হয়ে পারছিল না।

"হয়েছে, বাজে কথা অনেক হয়েছে", রাকিতিন চেঁচিয়ে উঠল, "বরং একটু শ্যাম্পেন খাওয়াও দেখি। এটা কিন্তু তোমার কাছে আমার পাওনা, সে তুমি নিজেও জান!"

"সত্যিই তো, পাওনা ত বটেই। জান আলিয়োশা, সব কিছুর ওপরে আমি

তোমার জন্য এমন কথাও ওকে দিয়েছিলাম যে ও যদি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে তাহলে ওকে শ্যাম্পেন খাওয়াব। চালাও শ্যাম্পেন, আমিও খাব! ফেনিয়া, ওরে ফেনিয়া, শ্যাম্পেন নিয়ে আয় আমাদের জন্যে—ওই যে সেই বোতলটা যেটা মিতিয়া রেখে গেছে। যা দেখি তাড়াতাড়ি ছুটে নিয়ে আয়। আমি কৃপণ হলে কী হবে বোতল ঠিকই দেব, তবে তোমাকে নয় গো রাকিতিন। তুমি হলে গিয়ে একটা ব্যাঙের ছাতা, কিন্তু এই ছেলেটা রাজপুত্তুর! যদিও আমার মনটা এখন অন্য চিন্তায় ভরপুর হয়ে আছে, তা সে যা-ই হোক, তোমাদের সঙ্গে আমিও খাব। হুল্লোড়বাজি করার একটু সাধ হয়েছে!"

"কিন্তু আজ কী তোমার ব্যাপার বল তো? কী তোমার সেই 'খবর' জানতে পারিকি? নাকি গোপনীয়?" তার ওপর অবিরাম যে সব চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষিত হচ্ছিল সে দিকে যেন কোনো আমলই দিচ্ছে না যতদূর সম্ভব এমন একটা ভাব প্রকাশ করে আবার ঘুরে ফিরে কৌতূহল প্রকাশ করল রাকিতিন।

"ধুৎ, গোপনীয়তার কী আছে? তুমি নিজেও তা জান", আলিয়োশার গলা জড়িয়ে ধরে তার কোলের ওপর ঠিকই বসে রইল বটে, কিন্তু ওই অবস্থাতেই রাকিতিনের দিকে ফিরে আলিয়োশার কাছ থেকে সামান্য সরে গিয়ে হঠাৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে গ্রুশেন্‌কা বলে উঠল, "অফিসার আসছে রাকিতিন, আমার অফিসার আসছে!"

"আসছে যে তা শুনেছি। কিন্তু তাই বলে এত কাছাকাছি চলে এসেছে নাকি?"

"এখন মোক্রয়ে-তে আছে। ওখান থেকে একজনকে এখানে পাঠাবে, এরকমই লিখেছে। আজ চিঠি পেয়েছি। বসে বসে ওর পাঠানো সেই দূতের অপেক্ষা করছি।"

"হল কী! তা মোক্রয়-তে কেন?"

"ও সে বলতে গেলে অনেক কথা। অনেক হয়েছে, আর শুনে কাজ নেই।"

"মিতিয়া ছোকরা তো তাহলে এখন কী করে বসে তার ঠিক নেই! সে কি জানে, না কি জানে না?"

"সে জানবে কী! এক দম জানে না! জানলে তো খুনোখুনি হয়ে যাবে। তবে আমি এখন আর সে ভয় করি নে, ওর ছুরির ভয় আর করি নে এখন। ও কথা থাক রাকিতিন, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো না, আমার বুকটা সে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমি সে কথা ভাবতেও চাই নে। ভাবতে পারি এই যে আমাদের এই আলিয়োশার কথা, তাকিয়ে তাকিয়ে এই তো আলিয়োশাকেই দেখছি। আরে কী হল, লক্ষ্মীটি, আমার দিকে তাকিয়ে একবারটি হাস, আমার এই সব বোকামি দেখেই না হয় খুশি হও, আমার আনন্দ দেখে না হয় একটু হাসলেই। এই ত মুখে হাসি ফুটেছে, লক্ষ্মী ছেলের আমার মুখে হাসি ফুটেছে! আহা, কী মমতাভরা দু চোখে আমাকে দেখছে, দেখ! জান আলিয়োশা, আমি খালি ভাবছিলাম গত পরশুদিন ওই দিদিমণির সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছি সেজন্য তুমি আমার ওপর রেগে আছ। তখন আমি একটা

খেঁকি কুকুরের মতো হয়ে উঠেছিলাম—এ ছাড়া আর কী বলব! কিন্তু তাহলেও, অমনটা যে হয়েছিল সেটা ভালোই বলতে হবে। যাচ্ছেতাই ঠিকই, তবে ভালোও বটে।” মনে মনে কী যেন ভেবে গ্রুশেন্‌কা হঠাৎ মুখ টিপে হাসল। তার সেই হাসির মধ্যে আচমকা কেমন যেন একটা কুটিল রেখা খেলে গেল। “মিতিটা বলছিল সে মেয়ে নাকি বলেছে যে আমাকে চাবুক মারা দরকার! তাইতে তখন রাগে অপমানে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠেছিল। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কেন? না, আমার ওপর টেক্কা মারতে চেয়েছিল ওর ওই চোকোলিটের লোভ দেখিয়ে।... না, না, এ-ই ভালো, যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে”, বলতে বলতে সে আবার হাসল। “তবে আমার কেবলই ভয়, তুমি আমার ওপর ভীষণ রেগে আছ।

“সেটাই তো কথা!” বেশ ভারিক্কি চালে বিস্মিত কণ্ঠে ফস করে বলে উঠল রাকিতিন। “তোমার মতো এমন একটা পুঁচকে মুরগিছানাকে ও সত্যি সত্যি দারুণ ভয় পায় আলিয়োশা।”

“ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়া রাকিতিন! মুরগিছানা যদি হয় সে তোমার কাছে হতে পারে কেন না সোজা কথা হল এই যে তোমার বিবেকের কোনো বালাই নেই! আমি, দেখ, আমি ওকে ভালোবাসি, মনে প্রাণে ভালোবাসি, এটাই হল কথা! আলিয়োশা, তুমি বিশ্বাস কর তো যে আমি তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি?”

“ওঃ কী নির্লজ্জ মেয়ে রে বাবা! দেখছ কি আলিয়োশা, ও যে তোমাকে প্রেম নিবেদন করছে!”

“হলই না হয়। আমি ওকে ভালোবাসি যে!”

“কিন্তু তোমার অফিসার? মোক্রয়ে থেকে সেই যে সোনা বাঁধানো সুসংবাদটি, যার আশায় তুমি রয়েছ?”

“সে এক ব্যাপার, এ আরেক।”

“তা তো বটেই। এই না হলে মেয়েমানুষের মন!”

“আমাকে রাগিও না বলছি রাকিতিন”, তার এই কথায় দপ্ করে উঠল গ্রুশেন্‌কা। “বলছি তো, সে এক, এ আরেক। আমি আলিয়োশাকে যে ভালোবাসি সেটা আরেক ভাবে। এটা ঠিক আলিয়োশা, যে এর আগে তোমার ওপর একটা কূটকৌশল খাটাব বলেই ভেবেছিলাম। দেখ, আমি নীচ, আমার মাথা গরম ঠিকই, কিন্তু এমন এক একটা মুহূর্তও আমার এসেছে আলিয়োশা, যখন আমি আমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, খালি ভেবেছি তোমার মতো একজন লোকের পক্ষে এখন আমার মতো এমন একটা নোংরা মেয়েকে ঘৃণা করাই তো উচিত। ওই বড়মানুষের মেয়ের বাড়ি থেকে পালিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন বাড়ি আসছিলাম সেই তখন থেকে শুরু করে আজ তিনদিন হল একথাই ভাবছি। তোমার সম্পর্কে অনেকদিন হল এই রকম ভেবেছি আলিয়োশা,

মিতিয়াও জানে, ওকে আমি বলেছি। মিতিয়া এটা বেশ বোঝে। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সত্যি বলছি আলিয়োশা, কোনো কোনো সময় তোমার দিকে তাকালে নিজের কথা ভেবে আমার লজ্জা হয়, আমি লজ্জায় মরে যাই। কী করে, কোনো সময় থেকে তোমার সম্পর্কে আমার এই সব চিন্তার শুরু তা জানি নে, মনেও করতে পারিনে।

ফেনিয়া ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। ট্রেতে একটা ছিপি-খোলা শ্যাম্পেনের বোতল, শ্যাম্পেন ভরা তিনটে গ্লাস।

"শ্যাম্পেন এসে গেছে!" রাকিতিন চেঁচিয়ে উঠল। "তা আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না মহাশয়া, তুমি বাপু আর তোমাতে নেই, বেশ উত্তেজিত হয়ে আছ। এক গেলাস খেলেই নাচের জন্যে পা বাড়াবে। এঃ হে, দ্যাখ কান্ড! সামান্য একটা কাজ সেটাও যদি ঠিকমতো করতে পারে", বোতলটা ভালো করে দেখার পর সে যোগ করল। ঢালবি তো ঢাল, বুড়ি রান্নাঘরে ঢেলেছে, আর বোতলটাও এনেছে গরম, খোলার পর ছিপিটাও আটকায়নি। যাক গে, তা-ই হোক।"

টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সেটা শেষ করল, আরও এক গ্লাস ঢালল।

"শ্যাম্পেন তো আর যখন তখন মেলে না", ঠোঁট চাটতে চাটতে রাকিতিন বলল। "আচ্ছা, আলিয়োশা, এবারে গেলাসটা হাতে নাও দেখি, দেখি তোমার কেরামতিটা। কীসের জন্যে আমরা খাব বল তো? স্বর্গের সিংহদ্বারের জয় বলে খাব নাকি? নাও গ্রুশেন্‌কা, তুমিও গেলাস তুলে নাও, তুমিও জয় সিংহদ্বারের জয়' বলে খেয়ে নাও।"

"কোন্ স্বর্গদ্বারের কথা বলছ?"

গ্রুশেন্‌কা তার গ্লাস হাতে নিল, আলিয়োশাও তার নিজেরটা নিল। এক ঢোক খেয়েই আলিয়োশা তার গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিল।

"নাঃ, বরং না খাওয়াই ভালো!" মৃদু হেসে সে বলল।

"বাঃ, খুব যে বড়াই করছিলে একটু আগে!" রাকিতিন চেঁচিয়ে উঠল।

"তা-ই যদি হয়, তাহলে আমিও খাব না", আলিয়োশার কথার খেই ধরে গ্রুশেন্‌কা বলল, "তা ছাড়া খেতে ইচ্ছেও করছে না। খাও রাকিতিন, পুরো বোতলটা তুমিই খাও। আলিয়োশা যদি খায় তাহলেই আমি খাব।"

"আহা, সোহাগে একেবারে গদগদ দেখছি!" টিপ্পনী কাটল রাকিতিন। "বসে তো আছ দিব্যি ওর কোলের ওপর! ও বেচারি না হয় ধরলাম শোকে মুষড়ে আছে, কিন্তু তোমার কী হয়েছে শুনি? ও ওর ভগবানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সসেজ পর্যন্ত খেতে যাচ্ছিল

"সে আবার কী?"

"আরে ওর গুরু, পুণ্যাত্মা মহাস্থবির জোসিমা আজ মারা গেছেন।"

"অ্যাঁ, মহাস্থবির জোসিমা মারা গেছেন!" আর্তনাদ করে উঠল গ্রুশেন্‌কা। "হা ভগবান, আমি কিনা জানতাম না!" সে ভক্তিভরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করল। "হা ভগবান, এ আমি কী করছি! ওর যখন এই দশা চলছে তখন আমি কিনা ওর কোলের ওপর বসে আছি!" এবারে এমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। চোখের পলকে একলাফে আলিয়োশার কোল থেকে নেমে সোফায় গিয়ে বসল।

আলিয়োশা অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার চোখমুখ যেন উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

"রাকিতিন", হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে সজোরে বলে উঠল আলিয়োশা, "আমি আমার ভগবানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি এই কথা বলে আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না বলছি। তোমার ওপর রাগ করতে আমি চাইনে, তাই তোমারও উচিত একটু ভালো ব্যবহার করা। আমি এমন এক অমূল্য রতন হারিয়েছি যা তোমার কখনও ছিল না, তাই তুমি এখন আমার বিচার করতে পার না। বরং একবার চেয়ে দেখ এর দিকে দেখেছ কি আমাকে কী ভাবে অব্যাহতি দিল? আমি এখানে এসেছিলাম একটা কুটিল মনের দেখা পাব বলে—ওটাই আমাকে টানছিল, কেন না তখন একটা নীচতা ও কুটিলতা আমাকে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু এখানে এসে আমি আমার একজন বোনকে পেলাম, পেলাম এক অমূল্য সম্পদ—এক কোমল হৃদয়ের স্পর্শ। আমার ওপর তার এখন করুণা হয়েছে। আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না, আমি তোমার কথাই বলছি। তুমি এখন আমার মনটাকে চাঙ্গা করে তুললে।"

আলিয়োশার ঠোঁট জোড়া থরথর করে কাঁপছিল, তার নিশ্বাস আটকে আসছিল। সে কথা বন্ধ করল।

"আহা তোমাকে একেবারে উদ্ধার করে দিল!" কুটিল হাসি হাসল রাকিতিন। "কিন্তু ও যে তোমায় গিলে ফেলতে চেয়েছিল সেটা জান কি?"

"থাম দেখি, রাকিতিন!" হঠাৎ লাফিয়ে উঠল গ্রুশেন্‌কা। "তোমরা দুজনেই চুপ কর। এখন আমিই সব খুলে বলব। তোমাকে আমি চুপ করতে বলছি আলিয়োশা, এই জন্যে যে তোমার মুখে এরকম সব কথা যখন শুনি তখন আমি লজ্জায় মরে যাই, তার কারণ আমি একটা কুটিল মেয়ে, ভালো আমি মোটেই নই—এই তো আমার পরিচয়। আর তুমি রাকিতিন, তোমাকে আমি চুপ করতে বলছি এই কারণে যে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। হ্যাঁ, ওকে গিলে খাবার একটা জঘন্য চিন্তা মনের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু এখন তুমি যা বলছ সে সবই মিথ্যে, এখন আমার মনোবৃত্তি একেবারেই সে রকম নয় তোমার মুখে এর পর আর কিছু যেন একদম না শুনি, রাকিতিন!" কথাগুলি বলতে বলতে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল গ্রুশেন্‌কা।

"বাহবা। দেখ কাণ্ড, দুটোতেই খেপে গেছে দেখছি!" অবাক হয়ে ওদের দুজনকে দেখতে দেখতে ফিসফিস করে বলল রাকিতিন। "পাগলের কারবার। পাগলা গারদে এলাম নাকি? দুজনেই দুজনকে দুর্বল করে দিয়েছে, এখন ওদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল বলে।"

"কাঁদব, কাঁদবই তো!" গ্রুশেন্‌কা আওড়াল। "ও আমাকে বোন বলে ডেকেছে, একথা আমি জীবনে ভুলব না! শুধু একটি কথাই বলি রাকিতিন, আমি খারাপ হতে পারি, কিন্তু একটা পিঁয়াজ আমিও এক দিন দান করেছিলাম।"

"পিঁয়াজ? সে আবার কী? ধুত্তোর! চুলোয় যাও তোমার! মাথা-টাথা একেবারেই গেছে দেখছি!"

ওদের দুজনের এত উচ্ছ্বাস দেখে রাকিতিন অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মনের দুঃখে সে রাগে জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল, যদিও সে বুঝলেও বুঝতে পারত যে ওদের দুজনের সবেতেই ঠিক এমন একটা জায়গায় বনিবনা হয়েছে আর তার ফলে ওদের মন এমন ভাবে নাড়া খেয়েছে যে সেরকম ঘটনা কারও জীবনে কদাচিৎ ঘটে। নিজের বেলায় বোধশক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাকিতিনের ছিল বটে, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠদের আবেগ অনুভূতি বোঝার ব্যাপারে সে ছিল অত্যন্ত স্থূল—কতকটা তার অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতার দরুন, কতকটা বা তার ভয়ানক স্বার্থপরতার কারণে।

"দেখ আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি আমার " বিব্রতবোধের হাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ আলিয়োশাকে উদ্দেশ করে গ্রুশেন্‌কা বলে উঠল, "ওই লক্ষ্মীছাড়া রাকিতিনটার কাছে আমি বড়াই করে বলেছিলাম যে আমি একটা পিঁয়াজ দান করেছিলাম, তবে তোমার কাছে আমি ওই নিয়ে বড়াই করছি না। তোমাকে আমি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এটা বলব। এটা একটা গল্পকথা মাত্র, তবে সুন্দর গল্পকথা। আমার বাড়িতে যে এখন রাঁধুনির কাজ করছে, আমাদের সেই মাত্রিয়োনার মুখে সেই ছোটোবেলায় শোনা। তা গল্পটা এই রকম এক ছিল চাষি বৌ, হাড় বজ্জাত। এক সময় সে মারা গেল। মারা যাবার পর দেখা গেল পৃথিবীতে সে ভালো কাজ বলে কিছুই রেখে যায় নি। তাই যমদূতরা তাকে পাকড়াও করে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। এদিকে তার রক্ষাকর্তা দেবদূতটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন ওর এমন কোন্ সুকৃতি তিনি মনে আনতে পারেন ঈশ্বরের কাছে যার উল্লেখ করা যায়? শেষকালে মনে পড়ে যেতে তিনি ঈশ্বরকে বললেন এই স্ত্রীলোকটি তার খেত থেকে একটা পিঁয়াজকলি তুলে একবার এক ভিখারিনিকে দিয়েছিল। ঈশ্বর উত্তরে তাঁকে বললেন: 'বেশ তো, তুমি তাহলে ওর ওই পিঁয়াজকলিটা নিয়ে হ্রদের ধারে গিয়ে ওটা তার দিকে বাড়িয়ে দাও, হাত বাড়িয়ে চেপে ধরুক, দেখ যদি টেনে তুলতে পার অগ্নি-হ্রদ থেকে। তাহলে আসুক স্বর্গরাজ্যে। পিঁয়াজকলিটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে কিন্তু এই বেটিকে এখন যেখানে আছে সেখানেই থেকে যেতে

হবে।' দেবদূত ছুটে গেলেন চাষি বৌয়ের কাছে, পিঁয়াজকলিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন 'নাও গো মেয়ে, হাত বাড়িয়ে চেপে ধর।' দেবদূত তাকে খুব সাবধানে টেনে তুলতে লাগলেন, প্রায় তুলে এনে ফেলেছিলেন, কিন্তু মেয়েমানুষটাকে যে এই ভাবে টেনে তোলা হচ্ছে এমন সময় অগ্নি হ্রদের অন্য পাপীদের তা চোখে পড়ে যেতে তারা সকলে মিলে তাকে চেপে ধরতে লাগল, যাতে তার সঙ্গে সঙ্গে তারাও উঠে আসতে পারে। কিন্তু চাষি বৌটা, বললামই তো, ছিল হাড় বজ্জাত। সে আর সবাইকে লাথি মারতে লাগল, আর বলতে লাগল 'টেনে তুলছে আমাকে, তোমাদের নয়। ওটা আমার পিঁয়াজকলি, তোমাদের নয়।' যেই এই কথা বলা অমনি পিঁয়াজকলিটা গেল ছিঁড়ে। চাষি বৌও অমনি আবার গড়িয়ে পড়ল অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। আজও সেখানেই পুড়ছে। দেবদূত আর কী করেন? কাঁদতে কাঁদতে সরে গেলেন তার কাছ থেকে। এই হল সেই গল্প আলিয়োশা। ও গল্প আমার মুখস্থ, কেন না আমি নিজেই সেই পাজি আর বজ্জাত মেয়েমানুষ। ওই রাকিতিনটার কাছে আমি বড়াই করে বলেছিলাম বটে যে আমি একদিন একটা পিঁয়াজ দান করেছিলাম, কিন্তু তোমাকে যা বলব তা অন্য: আমার সারা জীবনে দেবার মধ্যে দিয়েছি তো শুধু ওই একটা পিঁয়াজ—এটাই আমার একমাত্র সুকৃতি। তাই বলছি কি আলিয়োশা, এর পর আমার প্রশংসা করতে যেয়ো না, আমাকে ভালো মনে করার কোনো কারণ নেই, আমি পাজি, বজ্জাত, হাড় বজ্জাত। তা সত্ত্বেও যদি আমার প্রশংসা কর আমি তাতে লজ্জাই পাব। নাঃ, আমাকে সব কিছু স্বীকার করতে হবে। তা হলে শোন, আলিয়োশা, তোমাকে বাগে আনার ইচ্ছে আমাকে এত বেশি করে পেয়ে বসেছিল আর এই রাকিতিন ছোঁড়ার পিছনে এমন ভাবে লেগে ছিলাম যে ওকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে আমার কাছে এনে দিতে পারলে ওকে পঁচিশ রুবল দেব। দাঁড়াও গো রাকিতিন, একটু সবুর কর!" বলতে বলতে দ্রুত পায়ে সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের ড্রয়ার খুলে সেখান থেকে একটা মনিব্যাগ বের করল। মনিব্যাগের ভেতর থেকে পঁচিশ রুবলের একটা নোটটা বের করে রাকিতিনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

"কী হচ্ছে! এ সব কী যা তা হচ্ছে!" হতভম্ব হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রাকিতিন।

"ধর, রাকিতিন, ধর। এটা আমার ঋণ। আশা করি 'না' করবে না। তুমি নিজেই তো চেয়েছিলে", এই বলে রাকিতিনের দিকে নোটটা সে ছুড়ে দিল।

"'না' করতে যাব কোন্ দুঃখে!" খানিকটা ভেবাচেকা খেয়ে গেলেও সম্ভবত নিজের লজ্জাটা ঢাকার উদ্দেশ্যে বেশ ভারিক্কি চালে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল রাকিতিন। "দিব্যি কাজে লাগবে। বুদ্ধিমানদের মুনাফার জন্যেই না বোকারা আছে!"

"আচ্ছা, এবারে চুপ কর দেখি, রাকিতিন। এবারে যা যা বলব সে সব তোমার কাজের জন্যে নয়। ওই কোনোটাতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাক। আমাদের তুমি ভালোবাস না, তাই বলি কি চুপ করে থাক।"

"তোমাদের ভালোবাসার কী কারণ থাকতে পারে বল তো?" রাগ চেপে রাখতে না পেরে খেঁকিয়ে উঠল রাকিতিন।

পঁচিশ রুবলের নোটটা সে পকেটে গুঁজল। আলিয়োশার সামনে তার দস্তুরমতো লজ্জা হচ্ছিল। সে ধরে নিয়েছিল পাওনাটা সে আলিয়োশার অসাক্ষাতে পরে কোনো সময়ে পাবে। তাহলে আলিয়োশা জানতে পারত না। কিন্তু এখন লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়াতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রুশেন্‌কার শত টিপ্পনী সত্ত্বেও তার কথার তেমন একটা বিরোধিতা না করার কৌশল বজায় রেখে চলা রাকিতিনের কাছে অত্যন্ত বিচক্ষণ কাজ বলে মনে হচ্ছিল, কেন না স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল তার ওপর গ্রুশেন্‌কার একটা কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু এখন সে খেপে লাল হয়ে গেল।

"লোকের ভালোবাসার পিছনে একটা কারণ থাকে, কিন্তু তোমাদের দুজনের কথাই বলি—তোমরা আমার জন্যে কী করেছ শুনি?"

"ভালোবাসতে হলে তোমাকে ভালোবাসতে হবে অকারণে, যেমন আলিয়োশার ভালোবাসা।"

"কিন্তু কোথায় দেখলে তুমি ওর ভালোবাসা? ভালোবাসার কী এমন নমুনা সে দেখাল যে তুমি অমন পাগল হয়ে গেলে?"

গ্রুশেন্‌কা দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে। সে কথা বলছিল উত্তেজিত স্বরে। তার কণ্ঠস্বরে স্নায়বিক বিকারের ভাব ফুটে উঠছিল।

"ওরে ছোঁড়া রাকিতিন, তুই চুপ কর তো! তুই আমাদের কী বুঝিস? খবরদার, আমাকে আর কখনও তুই-তোকারি করবি না বলে দিচ্ছি! আমি বরদাস্ত করব না। এত বড়ো আস্পর্ধা হয় কী করে, শুনি? ওই কোনোটিতে গিয়ে আমার হুকুমবরদারের মতো চুপটি করে বসে থাক! এবারে শোন আলিয়োশা, আমি তোমাকে—একমাত্র নির্ভেজাল সত্যিটা আগাগোড়া তোমাকে বলব, তাতেই তুমি বুঝতে পারবে আমি কতদূর ইতর জীব! ওই রাকিতিন ছোঁড়াকে নয়, তোমাকেই বলছি। আমি তোমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলাম আলিয়োশা, এটা সত্য, দস্তুর মতো সত্য। আমি সর্বস্ব পণ রেখেছিলাম। ইচ্ছেটা এত দূর ছিল যে রাকিতিনটাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিলাম যাতে সে তোমাকে আমার কাছে এনে দেয়। কিন্তু কেন আমি এমন কাজ করতে চেয়েছিলাম? তুমি আলিয়োশা এ সবের বিন্দুবিসর্গ জানতে না, আমাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিতে, পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার চোখে চোখ পড়লে চোখ নামিয়ে নিতে। এদিকে আমি এর আগে পর্যন্ত একশ বার তোমার দিকে চেয়ে দেখেছি, একে ওকে সকলকে জিগ্‌গেস করতে শুরু করেছি, তোমার কথা। তোমার মুখটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে খালি ভেবেছি 'আমাকে ঘৃণা করে, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত চায় না।' ভাবতে ভাবতে শেষকালে এমন একটা উপলব্ধি আমাকে পেয়ে বসল যে আমি

নিজেই নিজের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম  ভাবলাম, আরে অমন একটা পুঁচকে ছোকরাকে আমার ভয়টা কীসের? তাকে হাসতে হাসতে টপ করে গিলে ফেলব। একেবারে খেপে গেলাম। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এখানে কিন্তু কারও এমন কথা বলার বা ভাবার মতো স্পর্ধা হবে না যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নার কাছে ঘেঁষতে পেরেছে। এই কুজ্‌মা বুড়োই আমার একমাত্র লোক যার কাছে আমি বাঁধা, যার কাছে আমি নিজেকে বেচে দিয়েছি, শয়তান আমাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তোমাকে দেখে আমি ভাবলাম  নাঃ, একে গ্রাস করতে হয়। এ আর এমন কি—হাসতে হাসতে গিলে ফেলব।  তা হলে দেখছ ত, যাকে তুমি তোমার বোন বলে ডেকেছ সেই আমি কী সাঙ্ঘাতিক একটা খেঁকি কুকুর! আবার এই এখন দেখ, যে লোকটা আমার ওপর এত বড়ো একটা অন্যায় করেছিল সে ফিরে আসতে আমি এখন বসে আছি তার ডাকের অপেক্ষায়। সে লোকটা আমার কাছে কতখানি তা কি তুমি জান আলিয়োশা? পাঁচ বছর আগে কুজ্‌মা যখন আমাকে এখানে নিয়ে এলো তখন আমি লোকজনের কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে বসে থাকতাম— কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়, আমার কোনো সাড়াশব্দ না পায়। আমি তখন ছিলাম রোগা পাতলা গড়নের বোকাসোকা একটা মেয়ে! বসে বসে কাঁদতাম, রাতের পর রাত ঘুমোতে পারতাম না। ভাবতাম  'আচ্ছা, যে লোকটা আমার ওপর এত বড়ো একটা অন্যায় করল সে এখন কোথায় হতে পারে? হয়তো আমার কথা মনে করেই আরেক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলে খুব এক চোট হাসাহাসি করছে!' মনে মনে ভাবি, 'একবার যদি তার দেখা পাই, আবার যদি কখনও তার সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে আমি এর শোধ নেব, ওর ওপর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব!' রাতের অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে কাঁদি, এই নিয়ে মনে মনে কেবল ভাবি আর ভাবি। আমি ইচ্ছে করে নিজেকে যাতনা দিতাম, আমার বুক ফেটে যেত, হিংসায় ছটফট করতে করতে হৃদয়ের জ্বালা মিটিয়ে আমি বলতাম  'দেখে নেব, দেখে নেব, ওর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব!' এমনও হত যে অন্ধকারের মধ্যে আমি চেঁচিয়ে উঠতাম। তারপর হঠাৎ যখন মনে হয় আমি ওর কীই বা করতে পারি, ওদিকে ও তো এখন আমাকে নিয়ে বেশ হাসাহাসি করছে, আবার এমনও হতে পারে যে আমার কথা কিছুই ওর মনে নেই, আমাকে সে একেবারে ভুলে গেছে—অমনি বিছানা ছেড়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ি, অসহায়ের মতো কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে সকাল পর্যন্ত পড়ে পড়ে ছটফট করতে থাকি। ভোর বেলায় যখন উঠে পড়ি তখন আমি একটা খেঁকি কুকুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর, পারলে বিশ্বসুদ্ধ সব কিছু গ্রাস করি। তারপর কী হল ভাবতে পার? আমি পুঁজি জমাতে শুরু করলাম, আমার মন থেকে স্নেহ মায়া মমতা চলে গেল, আমি দিব্যি গায় গতরে হয়ে উঠলাম—তাতে কী হল? ভাবলে এতে আমার

বুদ্ধি পাকল। উঁহু, এতটুকু না। কেউ দেখতে পায় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউ জানে না—যেই রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে অমনি আমার অবস্থা হয়ে ওঠে সেই কিশোরী মেয়েটির মতো, সেই পাঁচ বছর আগে আমি যেমন ছিলাম একেক দিন এমন হয় যে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকি, সারা রাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে মনে মনে বলি, 'দেখে নেব, দেখে নেব, আমি ওকে ঠিক দেখে নেব!' শুনলে তো এত সব কথা? আচ্ছা এবারে তুমি আমাকে কী ভাবে নেবে বল তো? মাস খানেক আগে হঠাৎ তাঁর চিঠি পেলাম সে আসছে, এখন সে বিপত্নীক, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার বুকের নিঃশ্বাস তখন বন্ধ হয়ে গেল। হা ভগবান! হঠাৎ আমার এও মনে হল তাহলে কি এসে শিস দিয়ে ডাকবে আর আমিও অমনি মার খাওয়া পোষা কুকুরের মতো কাচুমাচু হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ব! ভাবি, আবার নিজেই নিজেকে বিশ্বাসও করতে পারি না 'আমি কি এতই নীচ? এতই হীন আমি? ওর কাছে ছুটে যাব? না কি যাব না? নাকি যাব না?' এই পুরো একটা মাস নিজের ওপরই রাগে আমি এমন জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলাম যে আমার অবস্থা পাঁচ বছর আগে যা ছিল এখন তার চেয়েও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। আমি যে কী ভয়ঙ্কর, কী সাঙ্ঘাতিক এখন তা তুমি দেখতেই পাচ্ছ আলিয়োশা। আমি তোমাকে যা যা বললাম সব সত্যি! মিতিয়াকে নিয়ে আমি যে খেলায় মেতেছিলাম তার উদ্দেশ্য ছিল আরেকজনের পিছনে ছোটার আকর্ষণকে এড়ানো। তুমি চুপ করে থাক রাকিতিন, আমার বিচার তোমাকে করতে হবে না। এসব কথা আমি তোমাকে বলছি না। তোমরা আসার আগে পর্যন্ত আমি এখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিলাম, মনে মনে ভাবছিলাম, আমার পুরো ভবিষ্যৎ জীবনটা কেমন হতে পারে তারই একটা সমাধান খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলাম। আমার বুকের ভেতরে যে কী হচ্ছিল তা তোমরা কখনও জানতে পারবে না। হ্যাঁ, আলিয়োশা, তুমি তোমার ওই দিদিমণিকে বোলো সে যেন গত পরশু দিনের কথা মনে করে আমার ওপর রাগ না করে! আমার যে এখন কী অবস্থা চলছে এই দুনিয়ায় এমন একজনও কেউ নেই যে তা জানে, জানতে পারেও না। তাই বলা যায় না, এখানে যাবার সময় আমি হয়তো একটা ছুরি সঙ্গে নেব। আমি এখনও মনস্থির করতে পারছি না।

এই 'করুণ' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রুশেনকা হঠাৎ ভেঙে পড়ল। কথা পুরোপুরি শেষ না করে দু হাতে মুখ ঢেকে সোফার ওপর আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজল, একটা ছোটো বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আলিয়োশা জায়গা ছেড়ে উঠে রাকিতিনের কাছে গেল।

"শোন মিশা", রাকিতিনকে সে বলল, "রাগ কোরো না। ও তোমার মনে দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে তুমি রাগ কোরো না ভাই। এইমাত্র কী বলল সব

শুনলে তো? মানুষের সহ্যশক্তির কাছে খুব বেশি আশা করতে নেই, একটু সদয় হতে হয়।

আলিয়োশা তার আপন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে কথাগুলি বলল। মনের কথা কাউকে খুলে বলতে হয়, তাই সে রাকিতিনকে উদ্দেশ করে বলল। রাকিতিন যদি না থাকত তাহলে সে একা একা হাওয়াতেই তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত। কিন্তু রাকিতিন ব্যঙ্গভরে তার দিকে তাকাল। তাই দেখে আলিয়োশাও চট করে থেমে গেল।

"কাল রাত্রে তোমার গুরু তোমাকে যে মন্ত্রণা দিয়েছেন তোমার মগজ তো দেখছি এখন তাতে ঠাসা হয়ে আছে—সেগুলো এখন আমার ওপর ঝাড়ছ, বাবা আলিয়োশা, ঈশ্বরের সুসন্তান আমার!" ঘৃণামিশ্রিত হাসি হেসে রাকিতিন বলল।

"হেসো না রাকিতিন, ঠাট্টা কোরোনা স্বর্গত গুরুর নামে অমন কথা বোলো না। পৃথিবীর যে কোনো মানুষের চেয়ে তিনি মহান ছিলেন!" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আলিয়োশা চেঁচিয়ে উঠল। "কোনো বিচারকের আসনে বসে আমি তোমাকে একথা বলছি না, আমি নিজেই বিচারাধীন। ওর পাশে আমি কী? আমি তো মরব বলেই এখানে এসেছিলাম, মনে মনে বলেছিলাম 'হোক, যা হবার তাই হোক!'—সেটা আমার এক ধরনের কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে দেখ—পাঁচ বছর ধরে যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে, কিন্তু প্রথম যে মানুষটি এসে খোলা মনে ওকে একটি কথা বলল, অমনি তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিল, সব ভুলে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল! যে মানুষটা ওর ওপর অন্যায় করেছিল সে এখন ফিরে এসেছে, ওকে ডাকছে, ও তার সব দোষ ক্ষমা করে দিল। আনন্দে এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে যে তার সঙ্গে দেখা করার তর ওর সইছে না। না, ছুরি ও নেবে না, মোটেই নেবে না! না আমি ওরকম নই। তুমি কী রকম আমি জানি নে মিশা, কিন্তু আমি সে রকম নই! আমি আজ, এই এখন এই শিক্ষাটা পেলাম। প্রেমের কথা যদি বল তাহলে ও আমাদের চেয়ে ওপরে।... এখন যে সমস্ত কথা ও বলল তা কি এর আগে কখনও ওর মুখে শুনেছ? না, শোননি। যদি শুনতে তাহলে অনেক কাল আগেই সব বুঝতে পারতে। আর ওই যে অন্য আরেকজন, যে গত পরশুদিন ওর কাছ থেকে মনে আঘাত পেয়েছিল সে-ও ওকে ক্ষমা করে দিক! জানি, জানতে পারলে সে-ও ক্ষমা না করে পারবে না জানবেও। ওর হৃদয় এখনও অশান্ত, ওকে তাই ক্ষমার চোখে দেখতে হয়। কে বলতে পারে, হয়তো ওর ওই অন্তরের গভীরে কোথাও পরম সম্পদ লুকিয়ে আছে!

বলতে বলতে আলিয়োশা থেমে গেল, কারণ তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। রাকিতিনের মেজাজ যতই তিক্ত হোক না কেন, সে আশ্চর্য হয়ে আলিয়োশার

দিকে তাকাল। আলিয়োশার মতো এমন শান্ত নিরীহ লোকের মুখে এরকম লম্বা চওড়া বক্তৃতা সে কখনও আশা করেনি।

“আহা, কী আমার উকিল মশাই এলেন রে! বলি তুমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেলে নাকি? কী গো আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না, আমাদের তপস্বীটি যে তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে! তাহলে তোমারই জয় হল!” নির্লজ্জের মতো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সে চেঁচিয়ে বলল।

গ্রুশেন্‌কা বালিশ থেকে মুখ তুলে আলিয়োশার দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে চোখের জলে ভিজে তার যে মুখ হঠাৎ কেমন যেন ফুলে উঠেছিল এখন তা আবেগে উচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

“আলিয়োশা আমার, তুমি আমার নিষ্পাপ দেবশিশু! ওর কথা ছাড় তো। ও যে কী দেখতেই তো পাচ্ছ। কাকে কী বলছে ঠিক নেই।” এবারে রাকিতিনের দিকে ফিরে সে বলল, “এই যে মিখাইল ওসিপভিচ্ মহাশয়, “তোমাকে গালমন্দ করেছিলাম বলে একবার ভেবেছিলাম তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, কিন্তু এখন আর চাই না। আলিয়োশা, আমার কাছে এসো দেখি, এইখানটায় বোসো”, ইশারায় তাকে কাছে ডেকে উল্লসিত হয়ে হেসে সে বলল। “হ্যাঁ, এই যে, এই এখানে বোসো। আচ্ছা এবারে বল দেখি আলিয়োশার হাতখানি ধরে হাসিমুখে তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে সে বলল, “এবারে আমায় বল তো, আমি তাকে ভালোবাসি কিনা। যে আমার সর্বনাশ করেছে তার কথা বলছি গো—তাকে আমি ভালোবাসি কিনা—তোমার কী মনে হয়? তোমার আসার আগে পর্যন্ত আমি এখানে শুয়ে ছিলাম, অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কেবলই আমার হৃদয়কে জেরা করছিলাম—ওকে ভালোবাসি কিনা। তুমিই ঠিক করে দাও আলিয়োশা, এই তো সময়। তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি ওকে ক্ষমা করব কি করব না?”

“কিন্তু ক্ষমা তো তুমি করেই দিয়েছ”, হাসতে হাসতে বলল আলিয়োশা।

“তা বটে, ক্ষমা করেছি বৈ কি।” চিন্তিতভাবে বিড়বিড় করে বলল গ্রুশেন্‌কা। “ওঃ কী ইতর আমার এই মনটা! তা আমার এই ইতর মনের খাতিরেই না হয়...” বলতে বলতে খপ্ করে টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে এক চুমুকে সেটা উজাড় করে দিল, তারপর খালি গ্লাসটা শূন্যে তুলে ধরে আছড়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। ঝনঝন শব্দে সেটা ভেঙে গেল। গ্রুশেন্‌কার মুখের হাসিতে কেমন যেন একটা কুটিল রেখা গেল।

“বলা যায় না, হয়তো এখনও ক্ষমা করিনি।” তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভয়াল হয়ে উঠল। মাটিতে চোখ নামিয়ে এমন ভাবে সে বলে উঠল যেন একা একা আপন মনে কথাগুলি বলছে। “এমনও হতে পারে যে আমার মনটা ক্ষমা করার জন্যে সবে তৈরি হচ্ছে। আমাকে আমার মনের সঙ্গে আরও খানিকটা জুঝতে হবে। দেখছ কি আলিয়োশা, আমার এই পাঁচ বছরের চোখের জলে আমার একটা ভীষণ

ভালোবাসা জন্মে গেছে। আমি হয়তো শুধু আমার এই অপমানের জ্বালাকেই ভালোবাসি, আদৌ ওকে ভালোবাসি না!"

"ওর আসনে বসার সাধ যেন আমার কখনও না হয়!" চাপা গলায় হিসহিস করে বলে উঠল রাকিতিন।

"সে সুযোগ তোমার হবে না গো রাকিতিন, ওর আসনে তোমাকে কখনও বসতে হচ্ছে না। তুমি করবে কী জান? তুমি আমার জুতো সেলাই করবে হতচ্ছাড়া! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই কাজেই তোমাকে বহাল রাখব। আমার মতো কোনো মেয়ের দেখা তোমাকে কখনই পেতে হচ্ছে না,... হয়তো তাকেও আর পেতে হচ্ছে না। "

"তা সে তোমার 'ও'র কথা বলছ? তাহলে অমন সাজগোজের ঘটা কেন বল তো?" তাকে খেপানোর জন্য টিপ্পনী কাটল রাকিতিন। আমার এই মনটার সব কিছু এখনও তোমার জানা নেই।

"সাজগোজ নিয়ে আমাকে খোঁটা দিতে এসো না, রাকিতিন। আমার এই মনটার সব কিছু এখনও তোমার জানা নেই। আমার মন চাইলে আমি আমার সব সাজগোজ ছিঁড়ে ফেলে দেব, এখুনি, এই মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলে দেব", বলতে বলতে চিৎকারে ঝনঝন করে বেজে উঠল তার গলা। "কীসের জন্যে এসব সাজগোজ তুমি তার কী জানবে রাকিতিন! এমনও ত হতে পারে যে আমি বেরিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়ে বলব: 'কী, এমন রূপে আমায় আগে কখনও দেখেছ কি?" কথাটা এই যে সে আমাকে যখন ফেলে চলে গিয়েছিল তখন আমি ছিলাম ক্ষয়রোগীর মতো রোগা পাতলা, সতেরো বছরের এক ছিঁচকাঁদুনে কিশোরী। হ্যাঁ তার পাশটিতে গিয়ে বসব, তার মন ভোলাব, তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে ছাড়ব। বলব 'দেখলে তাহলে এখন আমি কেমন হয়েছি। হয়েছে, ওই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন মাননীয় মহাশয়। ওই যে কথায় বলে না, গোঁফে লাগাই সার, মুখ পেল না স্বাদ।'—বুঝলে তো, হয়তো এই জন্যেই আমার সাজগোজের এত ঘটা রাকিতিন" তিক্ত হাসি হেসে রাকিতিনের উদ্দেশে কথাগুলি সে শেষ করল। তারপর আলিয়োশার দিকে ফিরে বলল "আলিয়োশা আমার রাগ কিন্তু ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড। আমার এই সাজগোজ আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারি, আমি নিজের হাতে নিজেকে, আমার এই রূপকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারি, আমার মুখ পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে পারি, ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কেটে ফেলতে পারি, তারপর পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে পারি। যদি ইচ্ছে করি, এখন কোথাও যাব না, কারও কাছে যাব না। যদি ইচ্ছে করি, কুজ্‌মার কাছ থেকে যা যা উপহার পেয়েছি, সেই সঙ্গে তার সমস্ত টাকা কালই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেব, সারা জীবন দিন মজুরি করে কাটাব! ভাবছ কি, রাকিতিন, ওরকম কাজ আমি করব না, ও করার মতো বুকের পাটা আমার হবে না? তা-ই করব, এখুনি করব, শুধু দোহাই তোমার, আমাকে

জ্বালিয়ো না... আর ওকে? ওকে আমি কচুপোড়া দেব। ও আমার দেখাই পাবে না!"

শেষ কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু আবার ভেঙে পড়ল, আবারও দু হাতে মুখ ঢেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজল, গুমরে গুমরে কাঁদতে কাঁদতে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

রাকিতিন জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"এবারে যেতে হয়", সে বলল, "দেরি হয়ে গেছে, এরপর মঠে আর ঢুকতে দেবে না।"

গ্রুশেন্‌কা সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

"বল কী! তুমিও চলে যেতে চাও নাকি আলিয়োশা!" শোকবিহ্বল বিস্মিত কণ্ঠে সে বলে উঠল। "আমাকে নিয়ে এ তুমি কী করছ বল তো? তুমিই তো আমার বুকের আগুন জ্বালিয়ে দিলে, আমাকে এত যাতনা দিলে—এখন কিনা আমাকে আবার সারা রাত একা একা কাটাতে হবে!"

"তাই বলে তোমার কাছে রাত কাটাবে নাকি! তবে হ্যাঁ, যদি চায় থাকুক, আমার কী! আমি একাই যাই তাহলে!" ঠাট্টা করে খোঁচা দিয়ে বলল রাকিতিন।

"চুপ্! বড়ো কুচুটে তো তোমার মনটা!" ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল গ্রুশেন্‌কা। "ও আমাকে যে সব কথা বলতে এসেছে তেমন কথা তুমি আমাকে কখনও বলনি।"

"কী এমন কথা ও তোমাকে বলল?" রাকিতিন বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলল।

"সে আমি জানি নে। কী এমন কথা ও আমাকে বলেছে সে আমার জানা নেই, তার কিছুই জানা নেই, কিন্তু তা সোজা আমার অন্তরে গিয়ে বিঁধেছে। ও আমার বুকের ভেতরটা ওলটপালট করে দিয়ে গেছে। একমাত্র লোক, এই প্রথম এমন একজন মানুষের দেখা পেলাম আমার ওপর যার করুণা হয়েছে—এই হল কথা! আহা, আমার নিষ্পাপ দেবশিশুটি কেন তুমি আগে এলে না? " হঠাৎ কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো আলিয়োশার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে বলতে লাগল, "তোমারই মতো এমন একজনের জন্য আমি সারাটা জীবন আমি প্রতীক্ষা করে ছিলাম। জানতাম তোমার মতো এমন কেউ একজন আসবে যে আমাকে ক্ষমা করবে। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যতই নোংরা হই না কেন কেউ না কেউ আমাকেও ভালোবাসবে—শুধুই যে আমার লজ্জার জন্য তাও নয়! "

"কী এমন আমি তোমার করেছি?" গ্রুশেন্‌কার দিকে ঝুঁকে পড়ে মমতাভরে তার দু হাত চেপে ধরে বিগলিত হাসি হেসে আলিয়োশা জবাবে বলল, "আমি তোমাকে শুধু একটা পিঁয়াজকলি দিয়েছি—ছোট্ট, খুবই ছোট্ট এইটুকুন—এর বেশি কিছু নয়। "

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই কেঁদে ফেলল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে বাইরের বারান্দায় হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল, কে একজন সামনের ঘরে এসে ঢুকল। একটা ভীষণ আতঙ্কে গ্রুশেন্কা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল। হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে ঘরের মধ্যে ছুটে এলো পরিচারিকা ফেনিয়া।

"দিদিমণি, ওগো দিদিমণি, আপনার সেই জরুরি ডাক এসে গেছে!" উল্লসিত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে উঠল। "মোক্রয়ে থেকে গাড়ি এয়েছে আপনাকে নিতে। তিন ঘোড়ার গাড়ি, তিমফেই তার গাড়োয়ান, এখন ঘোড়া বদল করে নতুন ঘোড়া জোগ হচ্ছে। চিঠি, চিঠি গো দিদিমণি! এই আপনার চিঠি!"

চিঠিটা ছিল ফেনিয়ার হাতে। যতক্ষণ চেঁচাচ্ছিল সেই সময়ের মধ্যে সর্বক্ষণ সেটা সে শূন্যে তুলে ধরে নাড়াচ্ছিল। গ্রুশেন্কা খপ্ করে চিঠিটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মোমবাতির আলোর কাছে গিয়ে তুলে ধরল। চিঠি বলতে যা ছিল যে কয়েক ছত্রে লেখা একটা চিরকুটমাত্র। গ্রুশেন্কা এক লহমায় তা পড়ে ফেলল।

তার সারা মুখ নীরক্ত পাণ্ডুর। এক বিচিত্র ধরনের ম্রিয়মাণ হাসিতে বিকৃত হয়ে উঠল তার সেই মুখ। সে চিৎকার করে উঠল "ডেকেছে! শিস দিয়ে ডেকেছে—আয় আয় তু তু, আমার কুকুরছানাটি!"

কিন্তু সে কেবল একটি মুহূর্ত, মাত্র একটি মুহূর্তই এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন তার মন দ্বিধাগ্রস্ত। পরক্ষণেই হঠাৎ তার মাথার ভেতরে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, তপ্ত আগুনের মতো আরক্ত হয়ে উঠল তার দুই গাল।

"চললাম!" আচমকা সে বলে উঠল। "আমার পাঁচ পাঁচটি বছর রইল পিছে পড়ে! বিদায়! বিদায় আলিয়োশা, আমার ভাগ্য স্থির হয়ে গেছে। চলে যাও, তোমরা সবাই এখন চলে যাও, দূর হয়ে যাও আমার কাছ থেকে, আর যেন তোমাদের সঙ্গে দেখা না হয়! গ্রুশেন্কা এবারে পাখনা মেলে উড়ে চলল নতুন জীবনের পথে। তোমাকেও বলছি রাকিতিন, আমার মধ্যে মন্দ কিছু দেখলে তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ো। হয়তো আমি মৃত্যুর পথে চলেছি। কে বলতে পারে? উঃ! মনে হচ্ছে যেন আমি মদের নেশায় চুর হয়ে আছি।"

হঠাৎই ওদের দুজনকে ছেড়ে এক দৌড়ে শোবার ঘরে ছুটে গেল গ্রুশেন্কা।

"হয়েছে, এখন আর আমাদের কথা ভাবার সময় এখন নেই!" বিড়বিড় করে বলল রাকিতিন। "চল যাওয়া যাক, বলা যায় না, যদি আবার সেই মেয়েলি চিৎকার ওঠে? ওঃ, এই সব কান্নাকাটি আর চেঁচামেচি কী বিরক্তিই না ধরিয়ে দিল!

আলিয়োশা যন্ত্রচালিতের মতো চালিত হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। উঠোনে একটা চাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটাতে নতুন ঘোড়া জোতা হচ্ছে। সহিসরা লণ্ঠন হাতে ছোটাছুটি করছে। বাইরের খোলা গেটটা দিয়ে নতুন ঘোড়া ভেতরে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু আলিয়োশা আর রাকিতিন দেউড়ির ধাপ বয়ে নিচে নেমে এসেছে কি আসেনি, এমন সময় গ্রুশেন্কার শোবার ঘরের জানলাটা

খুলে গেল, সেখান থেকে ঝঙ্কৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে আলিয়োশাকে পিছু ডেকে গ্রুশেন্‌কা বলল

“আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি, তোমার দাদা মিতিয়াকে আমার নমস্কার জানিয়ো, আর বোলো যেন আমার মধ্যে, তার এই দুষ্টগ্রহটির মধ্যে মন্দ কিছু তার চোখে পড়লে তা যেন সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। হ্যাঁ, তাকে এও জানিয়ে দিয়ো — আমার জবানিতেই জানিয়ে দিয়ো 'গ্রুশেন্‌কা তোমার মতো মহৎ লোকের কপালে না জুটে জুটেছে একটা দুর্বৃত্তের কপালে।' হ্যাঁ, সেই সঙ্গে আরও যোগ করে দিয়ো যে গ্রুশেন্‌কা তাকে ভালোবেসেছিল মাত্র একটি প্রহরের জন্য, সামান্য একটুকুন একটা প্রহরের জন্য—আর সেই প্রহরটুকুই যেন সে আজ থেকে সারা জীবন মনে রাখে—মানে, সারা জীবনের মতো তোমাকে এই পরওয়ানা দিয়ে গেছে গ্রুশেন্‌কা!...”

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে তার কথা শেষ করল। জানলাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

“হুম্, বটেই তো!” হাসতে হাসতে গাঁক গাঁক করে রাকিতিন বলে উঠল, “তোমার দাদা মিতিয়াটার বুকে ছুরি মারল, তার পরও আবার বলে কিনা সারা জীবন যেন মনে রাখে! রাক্ষসী কোথাকার!”

আলিয়োশা কোনো জবাব দিল না, এমন ভাব দেখাল যেন শোনেনি। রাকিতিনের পাশে পাশে দ্রুত পা ফেলে সে চলতে লাগল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বড়ো বেশি তাড়া আছে তার। তাকে আচ্ছন্নের মতো দেখাচ্ছিল, হাঁটছিল সে যন্ত্রচালিতের মতো। রাকিতিন হঠাৎ যেন কীসের একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করল, মনে হল তার কাটা ঘায়ে কারও আঙুলের ছোঁয়া লেগে গেছে। আজ যখন আলিয়োশার সঙ্গে গ্রুশেন্‌কাকে সে মিলিয়ে দিয়েছিল তখন তার ফল যে এরকম হতে পারে তা সে আশাই করতে পারেনি। যা ঘটে গেল তা একেবারে অন্য রকম—সে অত করে যা চেয়েছিল তার ধারেকাছে নয়।

নিজেকে সংযত করে সে আবার বলতে শুরু করল “ওর ওই অফিসারটা একটা পোল। অবশ্য এখন আর কোনো অফিসারও নয়। সাইবেরিয়াতে, ওই ওখানকার চিন সীমান্তে কোথায় যেন, শুল্ক বিভাগে সরকারি চাকরি করত। পুঁচকে ল্যাগবেগে কোনো পোল বলেই তো আমার মনে হয়। শোনা যাচ্ছে চাকরিটি খুইয়েছে। এখন খবর পেয়েছে গ্রুশেন্‌কার অনেক টাকা পয়সা হয়েছে, তাই ফিরে এসেছে। এর মধ্যে আর আশ্চর্যের কী আছে?”

আলিয়োশা এবারেও ভাব দেখাল যেন শুনতে পায়নি। রাকিতিন আর সামলাতে পারল না। আলিয়োশার দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টি হেনে হাসতে হাসতে বলল, “তা কী হল? পাপীকে ফেরালে তাহলে? ভ্রষ্টা নারীকে সৎপথে ফেরালে? তার ঘাড় থেকে সাতটা শয়তানের ভূত নামালে তাহলে?' এই তো, এখানেই ত সেই

পরমাশ্চর্য, এই মাত্র যার আশায় তুমি ছিলে—এইবারে তা ঘটল—কী বল?"

"তুমি থাম রাকিতিন", প্রত্যুত্তরে ব্যথিত কণ্ঠে আলিয়োশা বলল।

"ও, ওই পঁচিশ রুবলের জন্যে বুঝি এখন আমাকে অমন 'ঘেন্না করছ'? মানে বলতে চাও সত্যিকারের বন্ধুটাকে বেচে দিলাম? তা ভাই, তুমি খ্রিস্ট নও, আমিও জুডাস নই।"

"আঃ রাকিতিন, বিশ্বাস কর, ও কথা আমি ভুলেও গেছি", আলিয়োশা বলে উঠল, "তুমি নিজেই আবার তা মনে করিয়ে দিলে।

কিন্তু এবারে রাকিতিন দস্তুরমতো খেপে উঠল।

"চুলোয় যাও তোমরা সবাই—তোমরা সকলে!" হঠাৎ সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। "কেন যে ছাই তোমার সঙ্গে জড়াতে গিয়েছিলাম! আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রাখতে চাই নে। যাও একাই যাও, ওটাই তোমার পথ!"

এই বলে ঝট করে ঘুরে আরেকটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল রাকিতিন। আলিয়োশাকে অন্ধকারের মধ্যে একা ফেলে রেখে গেল। আলিয়োশা শহর ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে মঠের দিকে পা বাড়াল।

## ছয়

## গ্যালিলির কানাঁ

আলিয়োশা যখন আশ্রমে ফিরল তখন মঠের পক্ষে অনেক রাত। দারোয়ান তাকে বিশেষ একটা প্রবেশ পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে দিল। ন'টা বেজে গেছে। সারাদিন এত ধকল আর উত্তেজনার পর এখন সকলের শান্তিতে বিশ্রাম করার সময়। আলিয়োশা কুণ্ঠিতভাবে মহাস্থবিরের প্রকোষ্ঠের দরজাটা আস্তে করে খুলে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে এখন তাঁর শবাধারটি রাখা আছে। কোন সাধু পাইসি নিরিবিলিতে শবাধারের ধারে বসে একমনে সুসমাচার পাঠ করে চলেছেন। গত রাত্তের আলোচনা আর আজকের দিনের বেলাকার এত কর্মব্যস্ততার পর পরফিরি নামে ব্রতচারী ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে পাশের ঘরের মেঝেতে শুয়ে যৌবনের ঘুমে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। এই দুজন ছাড়া প্রকোষ্ঠে জনপ্রাণী বলতে আর কেউই নেই। আলিয়োশা যে ঘরে ঢুকেছে সাধু পাইসি সেটা টের পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আলিয়োশা ঘুরে দরজার ডান দিকের কোনটিতে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল।

আলিয়োশার অন্তর নানা উপলব্ধিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সবই কেমন যেন অস্পষ্ট, কোনোটাই সুনির্দিষ্ট ভাবে বোঝার উপায় নেই; তাদের প্রভাব এত বেশি যে তাতে বরং এটাই হয়েছে যে কেমন যেন শান্ত ধীরগতিতে সমান তালে

ঘুরতে ঘুরতে একটা আরেকটাতে ঠেলে দিয়ে অবিরাম পাক খেয়ে চলেছে। কিন্তু একটা মধুর আবেশে ভরে উঠেছে তার হৃদয়, অথচ আশ্চর্য এই যে আলিয়োশা তাতে অবাক হচ্ছে না। আবার সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এই শবাধারটি, শবাধারের ভেতরে চারদিক থেকে ঢাকা তার প্রিয় গুরুর মৃতদেহ। কিন্তু আজ সকাল বেলার সেই কান্না সেই অসহ্য টনটনে বেদনা বা দুঃখের লেশমাত্র এখন আর তার মনে নেই। এবারে ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শবাধারের সামনে যে ভাবে সে লুটিয়ে পড়ল তাতে মনে হল সেটা যেন তার কাছে একটা পুণ্য বেদি। কিন্তু তার মনে, তার সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে যা উজ্জ্বল আভা বিস্তার করে চলছিল তা আনন্দ, শুধুই আনন্দ। প্রকোষ্ঠের একটা জানলা খোলা, তাজা বাতাস, বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। আলিয়োশা মনে মনে ভাবল, 'ওরা যখন মনস্থির করে জানলা খুলেছে তার মানে পূতিগন্ধটা আরও উৎকট হয়ে উঠেছিল।' কিন্তু পচনধরা দেহের গন্ধ নিয়ে যে চিন্তা মাত্র কিছু সময় আগেও এত ভয়ঙ্কর ও অগৌরবের বলে তার মনে হয়েছিল, এখন তার মধ্যে আর তখনকার সেই বিষণ্ণতা, সেই বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল না। সে নিঃশব্দে প্রার্থনা করতে লাগল, কিন্তু শিগ্‌গিরই অনুভব করল তার প্রার্থনা প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক টুকরো টুকরো চিন্তা তার মনের মধ্যে আকাশের তারার মতো দপ করে জ্বলে উঠেছে, কিন্তু পরক্ষণেই নিভে যাচ্ছে, অন্য একটি চিন্তা তার জায়গা নিচ্ছে। কিন্তু ভাবলে কী হবে, অন্তরে বিরাজ করছে এমন এক অখণ্ডতা বোধ, এমন এক দৃঢ়তা ও প্রশান্তির ভাব যা সে নিজে বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল। থেকে থেকে সে উদ্দীপিত হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, কৃতজ্ঞতা জানানোর ভালোবাসর একটা বাসনা তাকে প্রবল ভাবে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু প্রার্থনা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার মন ঘুরে গেল অন্য দিকে, বিভোর হয়ে সে যেমন প্রার্থনা ভুলে যেতে লাগল সেই সঙ্গে যে কথা ভেবে প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটেছিল তাও ভুলে যেতে লাগল। সাধু পাইসি কী পড়ছেন তাতে কান দিতে গেল, কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে অল্প অল্প করে তার ঝিমুনি এসে গেল।

সাধু পাইসি তখন পড়ছেন

*'তৃতীয় দিবসে গ্যালিলির কানা-তে এক বিবাহ-অনুষ্ঠান। যিশু-মাতা মেরি তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিবাহে যিশু এবং তাঁহার শিষ্যগণও আহূত হইয়াছিলেন।'*

'বিবাহ? সে আবার কী? কীসের বিবাহ? ' আলিয়োশার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো এলোমেলো ঘুরতে লাগল। হ্যাঁ, গ্রুশেন্‌কারও তা তো বড়ো সুখের দিন ভোজসভায় গেছে ... না, না, ছুরি সে সঙ্গে নেয় নি, ছুরি নেয়নি।... ওটা সে নিছক মনের দুঃখে বলেছিল আর কি। তা মনের দুঃখে লোকে যে কথা বলে তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া উচিত, অবশ্যই উচিত। মনের দুঃখ থেকে লোকে যা বলে তাতে মন শান্ত হয় তা নইলে দুঃখ মানুষের বুকে ভারী হয়ে

চেপে বসে থাকত। রাকিতিন গলির ভেতরে সটকে পড়ল। রাকিতিন যদি শুধুই তার অপমানের জ্বালা নিয়ে ভাবতে থাকে তাহলে তাকে সব সময়ই গলিপথে ঢুকতে হবে। কিন্তু পথ যাকে বলি সে তো বিরাট প্রশস্ত, সোজা রাস্তা, উজ্জ্বল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, আর তার শেষে আছে সূর্য তাই না? কী যেন পড়ছেন সাধু পাইসি?'

*এবং মদ্য অপ্রতুল হইলে যিশু-মাতা তাঁহাকে কহিলেন মদ্য নাই* আলিয়োশার কানে এলো।

'ওঃ হো, এই জায়গাটা আমি ছেড়ে গেছি। ছেড়ে যাবার ইচ্ছে অবশ্য আমার ছিল না—আমার বেশ ভালো লাগে এই জায়গাটা গ্যালিলির কানা শহর এখানেই তিনি প্রথম অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন! আহা, সেই অলৌকিক ঘটনা, সেই মধুর অলৌকিক ঘটনাটি! মানুষের দুঃখের সময় নয়, আনন্দের সময় খ্রিস্ট উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনের প্রথম অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়েছিলেন। ... 'মানুষকে যে ভালোবাসে সে তার আনন্দকেও ভালোবাসে...' একথা মৃত ব্যক্তি কতবার যে বলেছেন! এটা তাঁর অন্যতম মুখ্য চিন্তা ছিল।... আর মিতিয়া? এটা তাঁর অন্যতম মুখ্য চিন্তা ছিল। আর মিতিয়া? আনন্দ ছাড়া বাঁচা যায় না, একথা মিতিয়া বলে। হ্যাঁ, মিতিয়া যা সত্য, যা সুন্দর তা সব সময় সর্বতোভাবে ক্ষমাশীল—একথাও আবার সেই তিনিই বলতেন।

*'যিশু তাহাকে কহিলেন হে নারী, উহাতে তোমারই বা কী আর আমারই বা কী? আমার লগ্ন এখন পর্যন্ত আইসে নাই। তাঁহার মাতা ভৃত্যদিগকে কহিলেন: উনি তোমাদিগকে যেমত কহিলেন সেই মত কর।'*

'কর, কর, তাই কর কোনো দরিদ্রকে, হতদরিদ্র কোনো মানুষকে আনন্দ দাও, তাকে আনন্দিত কর। অবশ্যই, দরিদ্র বৈ কি, নইলে বসবাসকারী লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল— এত দরিদ্র কল্পনাই করা যায় না। বিবাহ উৎসবে পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে মদ জোটে না! ঐতিহাসিকরাও লিখেছেন যে তখনকার গেনিসাবেত্ হ্রদের ধারে এবং তার আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল—এত দরিদ্র যে কল্পনাই করা যায় না। সেখানে যে আরও একটি মহৎ হৃদয়, আরও একটি মহাপ্রাণ, তাঁর জননী উপস্থিত ছিলেন তিনি ঠিকই জানতেন ইনি যে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তা কেবল তাঁর ভয়ঙ্কর আত্মবলিদানের মহৎ কীর্তি স্থাপনের জন্য নয়। জানতেন, অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন সাদাসিধে মানুষগুলি যখন তাদের হতদরিদ্র বিয়ের আসরে তাঁকে আদর করে ডাকে তখন সেই মানুষগুলি যা-ই হোক না কেন তাদের সরল হৃদয়ের অনাড়ম্বর আনন্দ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। 'আমার লগ্ন এখন পর্যন্ত আইসে নাই', মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন — অবশ্যই বিনম্র হাসি হেসেছিলেন মা'র মুখের দিকে চেয়ে।

এটা তো আর ঠিক নয় যে দরিদ্রদের বিয়েতে মদের প্রাচুর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি

ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! কিন্তু তাহলে কী হবে, তিনি তা-ই করলেন, মা'র মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। আঃ ওই যে উনি আবার পড়ছেন।'

*যিশু তাহাদিগকে কহিলেন 'জলপাত্রগুলি জল দ্বারা পরিপূর্ণ কর।' এবং তাহারা সেইগুলিকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিল।*

*'এবং তাহাদিগকে কহিলেন 'অতঃপর পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ আহরণপূর্বক প্রধান নিমন্ত্রিতকে পরিবেশন কর। উহারা পরিবেশন করিল।*

*প্রধান নিমন্ত্রিত যখন মদ্যে পরিণত জলের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন তখন তিনি অবগত ছিলেন না কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি—যদিও ভৃত্যরা, যাহারা জল আহরণ করিয়াছিল, এই বিষয়ে অবগত ছিল—সেই হেতু তিনি বিবাহের পাত্রকে আহ্বান করিলেন।*

*'এবং তাহাকে কহিলেন 'মনুষ্যমাত্রেই সর্বপ্রথম উত্তম মদ্য প্রদান করে এবং অতিথিরা পানোন্মত্ত হইলে নিকৃষ্ট মদ্য প্রদান করে। কিন্তু তুমি এই পর্যন্ত উত্তম মদ্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।'*

'কিন্তু এ কী? এ কি হল? ঘরটা ক্রমশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে কেন? ও হ্যাঁ... বিয়ে হচ্ছে যে, এটা বিয়ের অনুষ্ঠান। হ্যাঁ, তাই তো। ওই ত সব নিমন্ত্রিতের দল, ওই তো বসে আছে বরবধূ খুশিতে উপছে পড়া লোকজনের ভিড় আর... কিন্তু কোথায় গেলেন সেই পরম জ্ঞানী প্রধান অতিথিটি? কিন্তু কে ইনি? ইনি কে? আবার ঘরের দেয়ালগুলি সরে যাচ্ছে, ঘরটা বড়ো হয়ে গেল। ওই ওখানে বড়ো টেবিলটার ধারে যিনি উঠে দাঁড়ালেন উনি কে? সে কী! এখানেও তিনি? তিনি তো কফিনে শুয়ে আছেন। কিন্তু এখানেও তিনি। উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমাকে দেখতে পেয়েছেন, এদিকেই আসছেন। হা ভগবান!

এগিয়ে এলেন, ওর কাছেই এগিয়ে এলেন তিনি। শীর্ণকায় ছোটোখাটো বৃদ্ধ মানুষটি, সূক্ষ্ম বলিরেখাঙ্কিত তার মুখ, আনন্দে উদ্ভাসিত, মৃদু মৃদু হাসছেন। কফিনটা আর নেই। পরনে সেই পোশাক, যে পোশাকে তিনি গতকাল বসে ছিলেন তাদের সঙ্গে যখন তাঁর কাছে অতিথিদের সমাগম হয়েছিল। মুখমণ্ডলে সরল অকপট ভাব, দু চোখে দীপ্তি। তা কী করে হয়? দেখা যাচ্ছে তিনিও এই ভোজসভায় উপস্থিত! গ্যালিলির কানা-র এই বিয়ের আসরে তিনিও আমন্ত্রিত।

"হ্যাঁ বৎস, আমাকেও ডেকেছে, শুধু ডেকেছে তা-ই নয়, এত করে ডেকেছে যে আমাকে আসতে হয়েছে", আলিয়োশা তাঁর শিয়রে শুনতে পেল মৃদু কণ্ঠস্বর। "কিন্তু তুমি এখানে এক কোনায় অমন মুখ লুকিয়ে আছ কেন? তোমাকে তো দেখাই যায় না। চল তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, চল।"

এই কণ্ঠস্বর গুরুদেব জোসিমার সেই কণ্ঠস্বর। তা ছাড়া ডাকছেন যখন, তখন তিনি না হলে আর কে হবেন? মহাস্থবির হাত বাড়িয়ে আলিয়োশাকে নতজানু অবস্থা থেকে তুলে দাঁড় করালেন।

"আমরা আনন্দ করছি, শীর্ণকায় ছোটোখাটো বৃদ্ধটি বললেন। "আমরা সুরা পান করছি, পান করছি নবীন আনন্দের, পরম আনন্দের সুরা। দেখতে পাচ্ছ কত অতিথি উপস্থিত হয়েছে এই আসরে? এই দেখ না, বরবধূ, আর ইনি হলেন আমাদের পরম পরম জ্ঞানী সেই প্রধান অতিথি, নবীন সুরার আস্বাদ নিচ্ছেন। আমাকে দেখে অবাক হচ্ছ যে বড়ো? আমি একটা পিঁয়াজকলি দিয়েছিলাম, তাই আমি এখানে। এখানে যারা আছে তাদের অনেকেই শুধু একেকটা পিঁয়াজকলি দিয়েছিল—কেবল একটা করে ছোট্ট এইটুকু আমাদের কাজ আর কী? আর তুমি বৎস, আমার শান্ত নম্র ছেলেটি, তুমিও আজ লোভাতুর নারীকে একটা পিঁয়াজকলি দিতে সক্ষম হয়েছ। শুরু কর বৎস, বিনীত বৎস আমার, তোমার কাজ শুরু কর! আমাদের সূর্যকে কি দেখছ না, দেখতে পাচ্ছ না কি তাকে?"

"ভয় করে। তাকিয়ে দেখার মতো সাহস নেই", আলিয়োশা ফিসফিস করে বলল।

"তাঁকে ভয় পেয়ো না। মহত্ত্বে তিনি ভয়ঙ্কর, ভয়াল তাঁর মহিমা, কিন্তু তাঁর করুণা অপার। প্রেমের আকর্ষণে তিনি আমাদের সদৃশ হয়ে আমাদের সঙ্গে আনন্দ করছেন। অতিথিদের আনন্দে যাতে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য তিনি জলকে সুরায় পরিণত করছেন, নতুন নতুন অতিথির প্রতীক্ষা করছেন, কত নতুন মানুষকে নিরন্তর আহ্বান করছেন—অনন্তকাল ধরে তাঁর এই লীলাখেলা চলছে। এই যে নবীন সুরা নিয়ে আসছে। দেখছে পাচ্ছ, পাত্র ভরে নিয়ে আসছে

আলিয়োশার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধক্ করে জ্বলে উঠল, একটা অব্যক্ত বেদনায় ছেয়ে গেল। তার হৃদয় বিদীর্ণ করে উৎসারিত হতে লাগল আনন্দের অশ্রুধারা। দুহাত প্রসারিত করে সে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তার ঘুম ভেঙে গেল।

আবার সেই শবাধার, খোলা জানলা, মৃদু গম্ভীর সুস্পষ্ট স্বরে সাধু পাইসির সেই সুসমাচার পাঠ। কিন্তু তিনি কী পাঠ করছেন আলিয়োশা এখন আর তাতে কর্ণপাত করল না। আশ্চর্যের কথা এই যে সে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে ওই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবারে সে সোজা উঠে দাঁড়াল, ঝটিতি জায়গা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তিন পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল সোজা জোসিমার শবাধারের কাছে। তার কাঁধটা যে সাধু পাইসির গায়ে লেগে গেল সেটা পর্যন্ত সে খেয়াল করল না। সাধু পাইসি গ্রন্থ থেকে চোখ তুলে মুহূর্তের জন্য একবার তাকাতে গিয়েও পরক্ষণেই আবার সরিয়ে নিলেন, বুঝতে পারলেন ছেলেটির মনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। আলিয়োশা আধ মিনিট খানেক তাকিয়ে রইল শবাধারের দিকে। ভিতরে শবাচ্ছাদনে ঢাকা টানটান, নিথর মৃতদেহ, মাথায় সন্ন্যাসীদের টুপি—সাতকোনা তারকাচিহ্নিত, বুকের ওপর বিগ্রহ। আলিয়োশা এইমাত্র তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছিল, সে কণ্ঠস্বর এখনও কানে বাজছে। আরও কিছুক্ষণ

কান পেতে শুনল, তখনও আশা করছিল আরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে... কিন্তু হঠাৎ ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আশ্রম প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেল।

সে আর সিঁড়ির ধাপের ওপরও থামল না, কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেল। এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্বেলিত তার মন খানিকটা পরিসরের জন্য, বিস্তার আর মুক্তির তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠেছে। তার মাথার ওপর উপুড় হয়ে আছে, অসংখ্য তারকার মৃদু আলোকমালা শোভিত অসীম অনন্ত প্রসারিত নভোমণ্ডল, শীর্ষবিন্দু থেকে আদিগন্ত প্রসারিত ছায়াপথের দ্বিখণ্ডিত ধারা, যা এখন পর্যন্ত তেমন স্পষ্ট নয়। পৃথিবীর বুক লেপ্‌টে আছে তরতাজা শান্ত রাত্রি—এত শান্ত যে নিথর নিস্তব্ধ। কালচে নীল আকাশের গায়ে ক্যাথেড্রালের সাদা মিনার আর সোনালি চূড়াগুলি ঝলক দিচ্ছে। বাড়ির আশেপাশের ফুলের কেয়ারিগুলিতে শরতের রাশি রাশি পুষ্পসম্ভার এখন নিদ্রামগ্ন, সকালের আগে তাদের নিদ্রাভঙ্গ হবে না। পার্থিব নিস্তব্ধতা যেন অন্তরীক্ষের নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নক্ষত্রলোকের রহস্যের ছোঁয়া লেগেছে পার্থিব রহস্যের বুকে। আলিয়োশা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎই কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আলিয়োশা বুঝতে পারছিল না কেন সে দু হাত বাড়িয়ে ধরণীকে অমন ভাবে আলিঙ্গন করল। কেন তাকে চুম্বন করার, সমগ্র ধরণীকে চুম্বন করার অমন একটা অদম্য বাসনা তাকে পেয়ে বসল তার পক্ষে তা বলা সম্ভবও ছিল না, কিন্তু সে কাঁদতে কাঁদতে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুজলে ধরণী ভিজিয়ে দিল, তাকে চুম্বন করতে লাগল, বিহ্বল হয়ে বারবার প্রতিজ্ঞা করতে লাগল তাকে ভালোবাসবে, চিরকাল ভালোবাসবে।

'তোমার স্পষ্ট আনন্দের অশ্রুধারায় ধরণীকে নিষিক্ত কর, ভালোবাস তোমার এই অশ্রুকে এই বাণী তার হৃদয়বীণায় ঝঙ্কৃত হল। কীসের এই কান্না? সে কাঁদছিল তার নিজের এক অনির্বচনীয় আনন্দে—এমনকি স্পষ্ট আকাশের ওই তারকাদের কথা ভেবে, যারা মহাশূন্যের অতল গহ্বর থেকে তার ওপর আলোক বিস্তার করছে; তাই তারও তার নিজের এই বিহ্বলতায় আর কোনো সঙ্কোচ নেই'। যেন ঈশ্বরের ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ভুবনের সঙ্গে একই সূত্রে তার হৃদয় গাঁথা হয়ে গেছে, আর ওই অন্য সব ভুবনের সংস্পর্শে এসে তার সমগ্র অন্তরাত্মা রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিহরিত হচ্ছে, রোমাঞ্চিত হচ্ছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সকলকে, সকলের সব দোষ সে ক্ষমা করে, সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। না, নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য, প্রত্যেকের জন্য, 'আর আমার জন্য — সে তো অন্যেরাই প্রার্থনা করছে'! তার হৃদয়তন্ত্রীতে আবার ঝঙ্কার উঠল। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছিল এবং যেন সচেতন ভাবেই উপলব্ধি করতে পারছিল যেন নভোমণ্ডলের ওই খিলানটার মতোই দৃঢ় ও অবিচলিত কিছু একটা নেমে এসে

তার অন্তরে গেঁথে বসছে। কীসের যেন একটা ধারণা বা ওই গোছের কিছু একটা যেন তার মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করতে চলেছে আর তা করতে চলেছে চিরকালের জন্য, তার সারা জীবনের জন্য। সে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল তখন সে ছিল দুর্বল বালকমাত্র, কিন্তু যখন উঠে দাঁড়াল তখন সারা জীবনের মতো সে হয়ে উঠেছে এক দৃঢ়চেতা সংগ্রামী। এটা সে তার অনির্বচনীয় আনন্দের ওই মুহূর্তটিতেই অকস্মাৎ বুঝতে পেরেছিল, মনে মনে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আলিয়োশা পরে, সারা জীবন তার এই পরম মুহূর্তটি ভুলতে পারেনি, কখনই ভুলতে পারেনি। 'সেই মুহূর্তে কার যেন অধিষ্ঠান ঘটেছিল আমার মধ্যে', পরে আলিয়োশা এই কথা বলত। কথাগুলির মধ্যে তার দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠত।

তিন দিনের মধ্যে সে মঠ ছেড়ে দিল। তার পরলোকগত গুরুদেব মহাস্থবিরের কথামতোই তা করল। তিনি আলিয়োশাকে 'সংসারধর্ম পালনের' নির্দেশ দিয়েছিলেন।

# অষ্টম অধ্যায়
# মিতিয়া

## এক
## কুজ়্মা সাম্‌সোনভ্

এদিকে গ্রুশেন্‌কা তো উড়ে চলে গেল নতুন জীবনের পথে, যাবার সময় 'নির্দেশ' দিয়ে গেল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে যেন তার শেষ শুভেচ্ছা জানিয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে তাকে এও জানিয়ে দেওয়া হয় যে সে যেন গ্রুশেন্‌কার ক্ষণিকের ভালোবাসা চিরকাল মনে রাখে। সেই মুহূর্তটিতে গ্রুশেন্‌কার যে কী হয়েছিল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কিন্তু তার কিছুই জানতে পারল না। সেও একটা ভয়ঙ্কর উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা ও ঝামেলার মধ্যে ছিল। গত দুদিন ধরে যে অবস্থা তার চলছিল তা ধারণায় আনা যায় না। সেটা এমনই, যে পরে সে নিজেও বলেছিল, সেই সময় তার সত্যি সত্যি মস্তিষ্কের প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে চৈতন্য লোপের প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আগের দিন সকালে আলিয়োশা তাকে খুঁজে বের করতে পারেনি, এদিকে দাদা ইভানও ওই দিনই হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করেও তার দেখা পায়নি। যাদের বাড়িতে সে ভাড়া থাকত তারা তারই নির্দেশে তার গতিবিধি গোপন করে রেখেছিল।

ওই দুদিন সে আক্ষরিক অর্থে ছটফট করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়িয়েছে, তার নিজের কথায়—পরে সে নিজমুখে একথা বলেওছে—'নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় ভাগ্যের সঙ্গে জুঝে' বেড়িয়েছে। এমনকি কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা জরুরি কাজে

চট করে একবার শহরের বাইরে থেকে ঘুরেও এসেছে, যদিও এক মুহূর্তের জন্য হলেও গ্রুশেন্‌কাকে চোখের নজরের বাইরে রেখে কোথাও যাবার কথা ভাবাটাই তার পক্ষে ভয়ের ছিল। এসবই তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা পরবর্তীকালে বিশদ ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার অদৃষ্টে হঠাৎ করে যে দুর্ভোগ নেমে এলো সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার আগের—তার জীবনের বিভীষিকাময় সেই দুর্দিনের যে ঘটনা, আমরা আপাতত সেখান থেকে বস্তুতপক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় কয়েকটির উল্লেখমাত্র করব।

তার প্রতি গ্রুশেন্‌কার যে ভালোবাসা তা ক্ষণিকের হলেও এটা সত্য যে সে তাকে যথার্থই অন্তর থেকে ভালোবাসত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে কখনও কখনও সত্যি সত্যি নিষ্ঠুর ও নির্মম যন্ত্রণাও দিত। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রুশেন্‌কার প্রকৃত অভিপ্রায়ের রহস্যভেদ দ্‌মিত্রির সাধ্যের একেবারে বাইরে ছিল। আদর দিয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে তাকে বাগে আনা—সেটাও অসম্ভব ছিল। কোন মতেই নতিস্বীকার করার পাত্রী সে নয়। ওরকম কোন প্রয়াস তার ওপর খাটাতে গেলে তাতে সে কেবল খেপেই উঠত, দ্‌মিত্রির কাছ থেকে একেবারে মুখ ঘুরিয়ে নিত—এটা অন্তত দ্‌মিত্রির ভালো জানা ছিল। দ্‌মিত্রির তখন যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয়েছিল যে গ্রুশেন্‌কার নিজেরও ভেতরে ভেতরে কোনো সংঘাত চলছে, একটা অস্বাভাবিক দ্বিধার মধ্যে সে আছে, কোনো কোনো ব্যাপারে মনস্থির করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই করতে পারছে না, তাই সঙ্গত কারণেই এই চিন্তা করে তার মনটা দমে গেল যে কোন কোন মুহূর্তে গ্রুশেন্‌কা যে তাকে এবং তার আবেগকে স্রেফ ঘৃণা করে — এ না হয়ে যায় না। হয়তো তাই, তাহলেও কিন্তু ঠিক কী নিয়ে তার এই বিষণ্ণ ব্যাকুলতা গ্রুশেন্‌কা তা বুঝতে পারত না। বস্তুত যে প্রশ্নটি তাকে এত যাতনা দিচ্ছিল তা উঠে এসেছে মাত্র দুটি জিনিসের মধ্যে মীমাংসা নিয়ে 'হয় আমি, মিতিয়া, নয়তো ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌।'

এখানে, প্রসঙ্গত একটি সুনিশ্চিত ঘটনা চিহ্নিত করা উচিত। সেটা এই যে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ অবশ্যই গ্রুশেন্‌কাকে আইনসম্মত বিয়ের প্রস্তাব দেবে—যদি অবশ্য ইতিমধ্যে তা দিয়ে না থাকে। মুহূর্তের জন্যেও তার মনে এই বিশ্বাস স্থান পায়নি যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বুড়োটা মাত্র তিন হাজার রুবলের ওপর দিয়ে পার পাবার আশা রাখে। গ্রুশেন্‌কাকে এবং তার স্বভাবচরিত্র দ্‌মিত্রি জানে বলেই তার এই সিদ্ধান্ত। ঠিক এই কারণেই সময় সময় তার এমনও মনে হতে পারত যে গ্রুশেন্‌কার এই যে এত মানসিক যন্ত্রণা, এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসবেরও মূলে আছে একমাত্র এটাই যে সে জানে না এই দুজনের মধ্য থেকে কাকে বেছে নেবে, কাকে নির্বাচন করাটা তার পক্ষে বেশি লাভজনক হবে।

আশ্চর্যের কথা এই যে গ্রুশেন্‌কার জীবনের ওপর যার এমন মারাত্মক প্রভাব, এত আতঙ্ক আর উত্তেজনা নিয়ে গ্রুশেন্‌কা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল সেই লোকটির, অর্থাৎ 'অফিসারটির' প্রত্যাবর্তন যে এমন আসন্ন হয়ে উঠতে পারে দ্‌মিত্রি

কিন্তু তা ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারেনি। এটাও সত্যি, অতি সম্প্রতি গ্রুশেন্‌কা এ বিষয়ে তার সঙ্গে একেবারেই কোনো কথা বলত না। তা হলেও গ্রুশেন্‌কা যে এক মাস আগে তার এক কালের ওই প্রলোভনকারী লোকটির কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিল সেটা দ্‌মিত্রি ভালো করেই জানত—গ্রুশেন্‌কা নিজ মুখে সে কথা তাকে বলেছে। চিঠির বিষয়বস্তুও তার অংশত জানা ছিল। সেই সময় একবার রাগের মাথায় গ্রুশেন্‌কা তাকে চিঠিটা দেখিয়েছিল, কিন্তু গ্রুশেন্‌কা দেখে অবাক হয়ে গেল যে চিঠিটার তেমন কোনো মূল্যই সে দিল না। কেন, তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়াও বেশ কঠিন। হতে পারে স্রেফ এই কারণে যে এই নারীকে নিয়ে জন্মদাতা বাপের সঙ্গে যে সংঘাতে সে জড়িয়ে পড়েছে তার যাবতীয় কদর্যতা ও বিভীষিকার কথা ভেবে সে এতদূর বিপর্যস্ত যে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক আর কিছু—অন্তত সেই সময় ত বটেই—তার পক্ষে ধারণায় আনাই সম্ভব ছিল না। আর পাঁচ বছর নিরুদ্দেশ থাকার পর যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীটির হুট্‌ করে কোথা থেকে উদয় হল, তাকে ওর আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেও হয়নি—বিশেষত সে যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে তা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। তা ছাড়া অফিসারের ওই যে প্রথম চিঠিটা যেটা মিতিয়াকে দেখানো হয়েছিল, সেখানে মিতিয়ার এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীটির আগমন সম্পর্কে খুব একটা নির্দিষ্ট করে কিছু বলা ছিল না। চিঠিটা খুবই ভাসা-ভাসা, রীতিমতো বাগাড়ম্বরপূর্ণ, শুধুই ভাবাবেগে পরিপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে গ্রুশেন্‌কা সেবার চিঠির সেই শেষ ছত্রগুলি তার কাছ থেকে গোপন রেখেছিল যেখানে লোকটার প্রত্যাবর্তনের কথা কতকটা সুনির্দিষ্ট ভাবে লেখা ছিল। পরে মিতিয়া মনে করে এও দেখেছে যে সাইবেরিয়া থেকে আসা এই বার্তাটির প্রতি গ্রুশেন্‌কার নিজের অজান্তেই কেমন যেন একটা অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞার ভাব সেই মুহূর্তে তার মুখে ধরা পড়েছিল। এর পর আর যতবার তাদের যোগাযোগ হয়েছে তার মধ্যে একবারও এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীটি সম্পর্কে কোনো কথাই সে মিতিয়াকে জানায়নি। ফলে মিতিয়া একটু একটু করে অফিসারটির কথা একেবারে ভুলেও গিয়েছিল।

মিতিয়ার শুধু ভাবনা ছিল এই যে পরিণতি যা-ই হোক না কেন, ঘটনা যে দিকেই মোড় নিক না কেন, ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে তার যে চূড়ান্ত সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছে সেটা ঘটতে আর এতটুকু দেরি নেই। এর মীমাংসা আর সব কিছুর মীমাংসা হওয়ার আগে হবে বলেই মনে হয়। রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্তে সে অপেক্ষা করতে লাগল গ্রুশেন্‌কা কী সিদ্ধান্ত নেয়। তার সব সময় এই বিশ্বাস ছিল যে ঘটনাটা মুহূর্তের আবেগে, কতকটা আচমকা ঘটে যাবে। হঠাৎ গ্রুশেন্‌কা তাকে বলে বসবে 'আমাকে তুমি কাছে ডেকে নাও গো, আমি চিরকাল তোমারই'— আর কী? সব কিছুর অবসান ঘটবে তখন। মিতিয়া তৎক্ষণাৎ ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে যাবে পৃথিবীর এক প্রান্তে। তা তো বটেই, তৎক্ষণাৎ তাকে

তুলে নিয়ে তো যাবেই, যত দূরে সম্ভব নিয়ে চলে যাবে, যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে নাও হয়, রাশিয়ার কোনও এক প্রান্তে তো বটেই; সেখানে সে তাকে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে অজ্ঞাতবাস করবে — এখানে বল, ওখানে বল, কোনও খানেই কেউ আর কখনও তাদের কোনও কথাই জানতে পারবে না। তখন, আহা, তখন, সেই মুহূর্তে শুরু হবে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন!

নতুন করে ঢেলে সাজানো সে এক অন্য জীবন, যা 'সৎ হওয়া চাই, অবশ্যই সৎ হওয়া চাই'। সেই 'সৎ' জীবনযাত্রার স্বপ্ন তাকে প্রতিনিয়ত ব্যাকুল করে তুলত। সেই নবরূপপ্রাপ্তির জন্য, পুনরুজ্জীবনের জন্য তার চিত্ত পিপাসিত। যে জঘন্য পাকদহের মধ্যে সে নিজের ইচ্ছায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা তার কাছে বড়ো বেশি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি সংখ্যক মানুষের মতো তারও সর্বোপরি আস্থা জন্মেছিল স্থান পরিবর্তনে। শুধু এই মানুষগুলি, এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা না থাকলেই হল, শুধু এই অভিশপ্ত জায়গাটা থেকে কোনো মতে পালাতে পারলেই হল—তাহলেই সব কিছুর নবজন্ম হবে, সব নতুন পথে চলতে থাকবে! এই ছিল তার বিশ্বাস, এরই জন্য তার আকুলতা।

কিন্তু, এটা হতে পারত কেবল মাত্র প্রথম ক্ষেত্রে, সমস্যার সমাধানটা যদি 'সুখের' হয় তবেই। তবে সমাধানসূত্র ছিল, যেটা একেবারেই অন্য রকম, ভয়ঙ্কর এক পরিণতি। যদি সে হঠাৎ তাকে বলে বসে 'কেটে পড়। আমি এখন ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে মিলে যা করার স্থির করে ফেলেছি। তাকেই বিয়ে করব, তোমাকে আমার আর দরকার নেই।' তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু তাহলে যে কী হবে মিতিয়ার জানা ছিল না, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জানা ছিল না—মিতিয়ার পক্ষে এটাই কৈফিয়ত হতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না, কোনো অপরাধের পরিকল্পনাও তার ছিল না। সে কেবল নজর রাখছিল, গোয়েন্দাগিরি করছিল, কষ্ট পাচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভাগ্যে যাতে ওই প্রথম ও সুখী পরিণতিটিই ঘটে একমাত্র তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমনকি এর খাতিরে অন্য ধরনের আর সব চিন্তা সে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে আবার শুরু হয়ে গেল একেবারেই অন্য আরেক যন্ত্রণা, উদ্ভব ঘটল একেবারে নতুন, উটকো ধরনের আরেক পরিস্থিতি, কিন্তু সেটাও মারাত্মক, সেটাও মীমাংসাতীত।

আচ্ছা, গ্রুশেন্‌কা যদি তাকে এমন কথা বলত 'আমি তোমার, তুমি আমাকে নিয়ে চল' তাহলে সে কী ভাবে তাকে নিয়ে যেত? এর জন্য যে টাকাপয়সা ও সঙ্গতির দরকার সে সব তার কোথায়? আজ এত বছর ধরে তার আয় বলতে ছিল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছ থেকে যে অনুদান সে পেয়ে আসছিল, যা এত বছরের মধ্যে কখনও বন্ধ হয়নি, কিন্তু বুঝে বুঝে ঠিক এই সময়টাতেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা ঠিক যে গ্রুশেন্‌কার টাকা আছে, কিন্তু এ ব্যাপারে হঠাৎ মিতিয়ার আত্মসম্মানে ভীষণভাবে বাধল। সে তো নিজেই গ্রুশেন্‌কাকে এখান থেকে তুলে

নিয়ে গিয়ে নিজের সঙ্গতিতে তার সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছিল—গ্রুশেন্‌কার টাকাকড়ির ভরসায় ত আর নয়! ওর কাছ থেকে টাকাকড়ি নেবে এটা সে কল্পনায়ও আনতে পারছিল না। এই কথা ভেবে ভেবে তার মনে এত কষ্ট হতে লাগল যে নিজের ওপরই তার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। এই তথ্যটি এখানে আর বিশদ করে বলছি না, এর বিশ্লেষণও করতে যাচ্ছি না, শুধু উল্লেখ করছি যে সেই মুহূর্তে এটাই ছিল তার মনের ভাব। এসবই পরোক্ষভাবে, এমনকি গোপনে গোপনে, বিবেকের এই দংশন থেকে, অনেকটা তার অবচেতন মনের এই ভাবনা থেকেও হতে পারত যে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছ থেকে সে চোরের মতো অসৎ উপায়ে টাকা হাতিয়েছিল। পরে সে স্বীকারও করেছে যে তখন তার মনে হয়েছিল: 'একজনের কাছে অমানুষ হয়ে গেছি, আবার আরেকজনের কাছেও সঙ্গে সঙ্গে অমানুষ হতে যাব! তাছাড়া গ্রুশেন্‌কা জানতে পারলে অমনিতেই এরকম অমানুষকে আর চাইবে না।'

এই যখন অবস্থা তাহলে কোথায় গেলে সেই আর্থিক সঙ্গতি মিলতে পারে? কোথায় গেলে পাওয়া যেতে পারে সেই টাকা যার ওপর তার ভাগ্য নির্ভর করছে? না পারলে তো সব রসাতলে গেল, কিছুই দাঁড়াবে না—'কেন? না, একমাত্র এই কারণে যে টাকায় কুলোল না! ওঃ কী লজ্জার কথা!'

এবারে খানিকটা আগ বাড়িয়েই বলি। ঘটনা এই যে সে হয়তো জানত টাকা কোথায় গেলে পাওয়া যেতে পারে, এই মুহূর্তে তা কোথায় আছে সম্ভবত তাও জানত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত এখন আর কিছু বলব না, যেহেতু পরে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, মিতিয়ার পক্ষে প্রধান বিপত্তিটা যে কোথায় ছিল, অস্পষ্টভাবে হলেও তার ব্যাখ্যা আমি দেব। কোনো এক জায়গায় পড়ে থাকা ওই টাকা নিতে গেলে, তা নেবার *অধিকার পেতে হলে* প্রথমে যেটা দরকার তা হল কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে তার ওই তিন হাজার রুবল ফেরত দেওয়া। তা না করতে পারলে 'আমি একটা ছিঁচকে পকেটমার, একটা ইতর লোক আর ইতর লোক হয়ে আমি নতুন জীবন শুরু করতে চাই নে।' এই হল মিতিয়ার সিদ্ধান্ত। তাই সে মনে মনে স্থির করেছে দরকার হলে সারা দুনিয়া তোলপাড় করতে হয় তাও সই, কিন্তু তার *সর্বপ্রথম* কাজ হবে যেখান থেকে হোক সেই টাকা জোগাড় করে অতি অবশ্য কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে ফেরত দেওয়া। মিতিয়ার এই যে সমাধান সূত্র, তার চূড়ান্ত প্রক্রিয়াটি, বলা যেতে পারে, ঘটেছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে—গ্রুশেন্‌কা যখন কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে অপমান করে সেই ঘটনার পর, দুদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় বড় রাস্তার ওপর আলিয়োশার সঙ্গে তার যে শেষ সাক্ষাৎকার হয়েছিল ঠিক সেই সময় থেকে। আলিয়োশার মুখে সেই ঘটনার বিবরণ শোনার পর মিতিয়াকে স্বীকার করতে হয় যে সে একটা ইতর লোক এবং এই কথাটা সে কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে জানিয়ে দিতে বলে—'তাতে যদি তার মন অন্তত খানিকটা হালকা হয়।' তখনই,

সেই রাতেই, ভাইয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর উম্মত্ততার বশবর্তী হয়ে সে মনে মনে উপলব্ধি করল, 'কাউকে খুন করব, তার টাকাকড়ি ছিনতাই করে নেব তাও ভালো, কিন্তু কাতেরিনার ঋণ শোধ করতে হবে।' 'যার ওপর আমি ডাকাতি করব বা আমার হাতে যে খুন হবে তার কাছে এবং আরও দশ জনের চোখে আমি বরং চোর বাটপার হব, খুনি হব, বরং সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে যাব, কিন্তু কাতিয়া যেন একথা বলার অধিকার না পায় যে আমি তার সঙ্গে বেইমানি করেছি, তার টাকা চুরি করেছি এবং তারই টাকায় গ্রুশেন্‌কাকে নিয়ে পালিয়েছি সৎপথে জীবনযাত্রা শুরু করব বলে। না, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়!' দাঁতে দাঁত ঘষতে মিতিয়া এই কথাই বলল। সময় সময় তার মনের মধ্যে এমন ধারণার উদয় হলেও হতে পারত যে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হয়ে তার সংজ্ঞা লোপ পাবে। কিন্তু আপাতত সে জুঝতে লাগল।

একটা কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই রকম একটা সিদ্ধান্ত যখন সে নিয়েছে তখন এটাই মনে হতে পারে একটা হতাশার ভাব ছাড়া তার আর কিছুই থাকছে না—ঠিকই ত, চট করে অতগুলো টাকা মিলবে কোথা থেকে? তার মতো এমন একজন চালচুলো ছাড়া লোককে দেবেই বা কে? এদিকে সর্বক্ষণ চূড়ান্ত ভাবে সে এই আশা করে এসেছে যে ওই তিন হাজার জোগাড় হয়ে যাবে, ঠিক এসে যাবে, কোনো না কোনো ভাবে আপনা আপনি উড়ে এসে তার হাতে পড়বে, এমনকি, বলা যায় না, আকাশ থেকেও পড়তে পারে। তবে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মতো যারা সারাটা জীবন উত্তরাধিকার সূত্রে পড়ে পাওয়া টাকা নিয়ে নয় ছয় করা বা সে টাকা দু হাতে ওড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে শেখেনি এবং টাকা কী করে রোজগার করতে হয় সে সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই নেই তাদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনই হয়ে থাকে। এখন, আজ তিন দিন হতে চলল, আলিয়োশার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে তার মাথার ভেতরে অতি উদ্ভট সমস্ত চিন্তার ঘূর্ণিঝড় উঠল। তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলি সব তালগোল পাকিয়ে গেল। এই ভাবে অবস্থা এমন হায় দাঁড়াল যে সে রীতিমতো অকল্পনীয় ও অদ্ভুত ধরনের একটা উদ্যোগ নেবার তোড়জোড় করল। তা এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে ঠিক এ ধরনের মানুষের কাছেই বোধহয় রীতিমতো অসম্ভব ও অলীক সমস্ত পরিকল্পনা সর্বাধিক সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে হয়।

হঠাৎ সে স্থির করল গ্রুশেন্‌কার অভিভাবক ব্যবসায়ী সাম্‌সোনভের কাছে যাবে, তাকে একটা 'পরিকল্পনা'র কথা বলবে, সেই 'পরিকল্পনা' কাজে লেগে গেলে যে পরিমাণ টাকা মিতিয়ার দরকার, তার সমস্তটাই সে সাম্‌সোনভের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। তার এই পরিকল্পনার বাণিজ্যিক দিকটি নিয়ে তার মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সন্দেহ ছিল শুধু এখানেই যে কেবল বাণিজ্যিক দিকটিই যদি দেখতে না চায় তাহলে মিতিয়ার এই চাতুরিকে সাম্‌সোনভ্ নিজে কী ভাবে নেবে। সাম্‌সোনভের

মুখটা মিতিয়ার জানা ছিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মিতিয়ার পরিচয় ছিল না, এমন কি কস্মিনকালে বাক্যালাপও হয়নি। অথচ কেন যেন মিতিয়ার মনের আজ বহু দিন হল এই দৃঢ়বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে গ্রুশেন্‌কা যদি কোনোমতে তার নিজের জীবনকে সৎ ভাবে গড়ে তুলতে পারে, সে যদি 'নির্ভরযোগ্য কাউকে' বিয়ে করে তাহলে এই ঘাটের মড়া বুড়ো লম্পটটা, যে মরার আগে ইতিমধ্যেই ধূপধুনোর গন্ধে শ্বাস নিচ্ছে, হয়তো এই মুহূর্তে আদৌ তার বিরোধিতা করবে না। শুধু তাই নয়, লোকটার নিজেরও হয়ত তা-ই ইচ্ছে, কেবল সুযোগের অপেক্ষা মাত্র—সুযোগ পেলেই সে নিজে সহায়তা করবে। কোনো শোনা কথায় কিনা কে জানে, অথবা গ্রুশেন্‌কার মুখের কোনো কথা থেকেও হতে পারে তার আরও ধারণা হয়েছে যে গ্রুশেন্‌কার জন্য ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের তুলনায় বুড়োর হয়তো তাকেই বেশি পছন্দ হবে।

এধরনের সাহায্যের ওপর ভরসা করা এবং পাত্রীর অভিভাবকের হাত থেকে তাকে গ্রহণ করা বলতে যা বোঝায় দ্‌মিত্রির এই রকম যে একটা অভিপ্রায়, আমাদের উপন্যাসের অনেক পাঠকের কাছে হয়তো তার দিক থেকে বড়ো বেশি স্থূলতা অথবা সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাব বলে মনে হতে পারে। এখানে শুধু এটাই উল্লেখ করতে পারি যে গ্রুশেন্‌কার অতীতকে দ্‌মিত্রির কাছে সম্পূর্ণ ভাবে অতীত বলেই মনে হয়েছিল। এই অতীতটাকে সে অপরিসীম সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখত, আর ভাবাবেগের প্রবল উচ্ছ্বাসবশত সে মনে মনে স্থিরই করে নিয়েছিল যে গ্রুশেন্‌কা যদি একবার মুখ ফুটে বলে যে তাকে ভালোবাসে, তাকেই সে বিয়ে করবে তা হলে তৎক্ষণাৎ একেবারে নতুন এক গ্রুশেন্‌কার এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রকম দোষত্রুটি মুক্ত, পরিপূর্ণ সৎ গুণের আধার, সম্পূর্ণ নতুন এক দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচেরও সূচনা ঘটবে। তারা দুজনে পরস্পরকে ক্ষমা করবে এবং সম্পূর্ণ নতুন ভাবে জীবনযাত্রা শুরু করবে। আর কুজ্‌মা সাম্‌সোনভের কথা বলতে গেলে মিতিয়ার মনে হয়েছে গ্রুশেন্‌কার অতীতের গর্ভে অন্তর্হিত এক কালের এই মানুষটি ওর জীবনে সর্বনাশই ডেকে এনেছে, গ্রুশেন্‌কা তাকে কখনও ভালোবাসেনি, আর বড়ো কথা এই যে মানুষটি নিজেও ইতিমধ্যে চলার পথে, ফুরিয়ে গেছে, তাই এখন আর ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। পরন্তু মিতিয়া এখন আর তাকে মানুষ বলেও গণ্য করতে পারছে না, কারণে শহরের সকলে, প্রতিটি মানুষই জানত যে সে এখন একটা ভগ্নদশাগ্রস্ত অসুস্থ মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে আগে তার যে সম্পর্ক ছিল তার চরিত্র একেবারে পালটে গেছে, এখন যেটুকু বজায় আছে সেটা বলতে গেলে নিছক বাৎসল্যের সম্পর্ক; আজ অনেক দিন হল সে রকম চলছে—তা সে প্রায় বছরখানেক হবে।

সে যাই হোক, এসবের মধ্যে মিতিয়ার দিক থেকে অনেক সরলীকরণও ছিল, শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও মিতিয়া মানুষটি ছিল বড়ো বেশি সরল মনের। প্রসঙ্গত,

মিতিয়া তার এই সারল্যের কারণে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে বসেছিল যে বুড়ো কুজ্মা অতীতে গ্রুশেন্কাকে নিয়ে যা করেছিল এখন লোকান্তরিত হওয়ার মুখে তার জন্য সে আন্তরিক অনুতপ্ত এবং তার দিক থেকে ক্ষতির আর কোনো আশঙ্কা নেই; তাই এই নিরীহ বুড়োটির চাইতে বড়ো অভিভাবক বা বেশি অনুরক্ত বন্ধু এখন গ্রুশেন্কার আর কেউ নেই।

রাস্তার ধারের মাঠে আলিয়োশার সঙ্গে তার কথাবার্তার পর মিতিয়া প্রায় সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ সাম্সোনভের বাড়িতে হাজির হয়ে সে ভেতরে কর্তাকে তার আগমন বার্তা জানাতে বলল। বাড়িটা পুরনো, থমথমে, বেশ প্রশস্ত, দোতলা; মূল বসতবাড়ি এবং সেই সঙ্গে বাইরের বাড়িও আছে। নিচতলায় থাকে সাম্সোনভের দুই বিবাহিত পুত্র, আর তাদের পরিবার, তার এক প্রৌঢ়া ভগ্নী আর অবিবাহিতা কন্যা। বাইরের বাড়িতে থাকে তার দুই কর্মচারী, যাদের একজনের আবার বেশ বড়ো পরিবার। ছেলেমেয়েরা আর কর্মচারীরা—সকলেই তাদের নিজেদের অংশে গাদাগাদি করেই থাকত। কিন্তু বাড়ির ওপরতলাটা ছিল বুড়োর একার দখলে। বুড়োর দেখাশোনা করত তার মেয়ে। এমনকি তাকেও সে তার সঙ্গে বাস করতে দিত না। অথচ তার মেয়ের ছিল বহুকালের হাঁপানি রোগ এবং তা সত্ত্বেও বারবার নির্দিষ্ট সময়ে, আবার যখন তখন ডাক পড়লে তখনও তাকে নিচ থেকে ওপরে ছুটতে হত।

এই 'ওপরটাতে' ছিল দেখানোর জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা বেশ কিছু সংখ্যক বড়ো বড়ো ঘর। সেগুলির আসবাবপত্র ব্যবসায়ী বাড়িতে প্রচলিত সাবেকি ফ্যাশনের— দেয়ালের গা ঘেঁষে রাখা মেহগনি কাঠের একঘেয়ে দীর্ঘ সারি বাঁধা বেঢপ কতকগুলি সাধারণ চেয়ার ও হাতলওয়ালা চেয়ার। ছিল ঢাকনা দিয়ে রাখা পলতোলা কাচের কিছু ঝাড়লণ্ঠন আর বিষণ্ণতা জাগিয়ে তোলার মতো কতকগুলি দেয়াল-আয়না। সবগুলি ঘরই একেবারে ফাঁকা, জনশূন্য; কারণ অসুস্থ লোকটি গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকত মাত্র একটি ঘরে, একটা পৃথক ছোটো ঘরে, যেটি ছিল তার শোবার ঘর। সেখানে তার পরিচর্যায় থাকত এক বুড়ো পরিচারিকা। তার মাথার চুল সব সময় রুমালে ঢাকা দিয়ে রাখত। এছাড়া একটা 'ছোকরাও' ছিল। সে সামনের ঘরের রোয়াকে বসে থাকত। বুড়োর পা দুটি ফুলে গেছে। ফোলা পা নিয়ে সে হাঁটাচলা করতে পারে না বললেই হয়। শুধু কদাচিৎ যখন তার চামড়ার গদি আঁটা আরামের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে তখন তার বুড়ি তাকে ধরে ধরে বার কয়েক ঘরের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। কুজ্মা লোকটা কড়া ধাঁচের, স্বল্পবাক—এমনকি বুড়ির সঙ্গে ব্যবহারেও।

গৃহকর্তাকে যখন 'ক্যাপ্টেনের' আগমনবার্তা জানানো হল, সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাঁকিয়ে দিল। কিন্তু মিতিয়া নাছোড়বান্দা, আরও একবার খবর পাঠাল। কুজ্মা কুজ্মিচ্ ছোকরা চাকরটিকে জিগ্গেসবাদ করে জানতে চাইল লোকটা কেমন, দেখে

কী মনে হয়, মাতাল কিনা, হাঙ্গামা করছে কিনা। উত্তরে জানা গেল 'প্রকৃতিস্থই আছেন, তবে যেতে চাইছেন না।' বুড়ো আবারও হাঁকিয়ে দিতে বলল। এরকম যে হতে পারে তা মিতিয়ার আগে থাকতে জানা ছিল, তাই সাবধানের মার নেই—এই ভেবে সে ইচ্ছে করেই কাগজ পেন্সিল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। 'আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত জরুরি একটা কাজে', এক চিলতে কাগজে এই একটি ছত্র লিখে সে বুড়োর কাছে পাঠিয়ে দিল।

বুড়ো একটু ভেবে নিয়ে আগন্তুককে বসার ঘরে নিয়ে আসতে বলল ছোকরা চাকরটিকে। বুড়িকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে বলল সে যেন এক্ষুনি ছোটো ছেলেকে ওপরে তার কাছে হাজির হতে বলে। এই ছোটো ছেলেটি উচ্চতায় ছয় ফুটের ওপর, আসুরিক শক্তির অধিকারী। নিখুঁত দাড়ি গোঁফ কামানো, জার্মান ধরনের পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত, সাম্‌সোনভ্ নিজে যদিও ঢোলা হাতার লম্বা ঝুলের রুশি পোশাক পরে থাকে এবং দাড়িও রাখে। বাপের ডাক শুনে বিনা বাক্য ব্যয়ে তৎক্ষণাৎ তার আবির্ভাব ঘটল। বাপের সামনে তারা সকলেই থরহরি কম্পমান। এই বীরপুরুষটিকে সামসোনভ্ যে ডেকে পাঠাল তার কারণ এই নয় যে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি হতে সে ভয় পাচ্ছিল। ভীরু প্রকৃতির লোক সে আদৌ নয়। একজন সাক্ষী থাকা ভালো এই ভেবেই সাবধানতার খাতিরে তাকে ডাকা। বুড়োর ছেলের হাত ধরে, তার এবং ছোকরা চাকরটির সঙ্গে মিতিয়া শেষ কালে মৃদুমন্থর গতিতে বসার ঘরে এসে ঢুকল। এখানে ভাবাই যেতে পারে মিতিয়া মনে মনে রীতিমতো তীব্র এক ধরনের কৌতূহল উপলব্ধি করল। বসার ঘর বলে যেখানে মিতিয়া অপেক্ষা করতে লাগল সেটা ছিল জলসাঘর। বিশাল, থমথমে একটা ঘর, যার পরিবেশ একটা বিষণ্ণ ব্যাকুলতায় মানুষের মন ভারাক্রান্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। 'মর্মর পাথরের আদলে' তৈরি দেয়াল ঘরের জানলাগুলির বাইরে ভেতরে দুটি করে থাক, দেয়াল বরাবর গান বাজনার দলের জন্য নির্দিষ্ট অর্ধচক্রাকার অলিন্দ, ঢাকনার ভেতরে পলতোলা কাচের বিশাল বিশাল তিনটি ঝাড়লণ্ঠন।

মিতিয়া ঘরে ঢোকার মুখে একটা ছোট্ট চেয়ারে বসে ছিল। উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে অপেক্ষা করছিল তার ভাগ্যে কী আছে। মিতিয়ার চেয়ার থেকে সত্তর ফুট মতো ব্যবধানে বিপরীতে দিকের দরজা দিয়ে বুড়ো সামসোনভের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিতিয়া চট করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল এবং মিলিটারিতে শেখা কেতায় লম্বা লম্বা পা ফেলে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। মিতিয়ার বেশভূষা বেশ ভদ্রস্থ। বোতাম আঁটা ফ্রককোট, মাথার গোল টুপিটা হাতে ধরা, দু হাতে কালো দস্তানা—ঠিক যেমনটি ছিল তিন দিন আগে, যখন ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আর ভাইদের সঙ্গে পারিবারিক পরামর্শ সভায় মিলিত হওয়ার জন্য মঠে মহাস্থবিরের কাছে গিয়েছিল। বুড়ো কঠোর গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মিতিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারল যতক্ষনে

সে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সময়ের মধ্যে বুড়ো তাকে বেশ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। শেষ সময়ে এসে কুজ্‌মা কুজ্‌মিচের চোখমুখ যেমন সাঙ্ঘাতিক রকম ফুলে উঠেছে তা দেখেও মিতিয়া বিস্মিত হল। তার নিচের ঠোঁটটা অমনিতেই যথেষ্ট পুরু, সেটা এখন একটা গোল রুটির মতো ঝুলে রয়েছে। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে নীরবে মাথা নুইয়ে অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে সেই ইঙ্গিতে সোফার কাছাকাছি একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে তাকে বসার নির্দেশ দিল। নিজে সে ছেলের হাতের ওপর ভর দিয়ে রোগযন্ত্রণায় কঁকাতে কঁকাতে ধীরে ধীরে মিতিয়ার উলটো দিকে বসার আয়োজন করতে লাগল। তার এই কষ্টকর প্রয়াস মিতিয়ার নজরে এড়াল না। যে লোকটা তার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, যাকে সে এমন উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে, তার সামনে সে নিজে যে কতটা নগণ্য এই কথা ভেবে এখন সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অনুতাপ ও একটা সূক্ষ্ম লজ্জাবোধ তাকে পেয়ে বসল।

“কী মনে করে আমার কাছে মহাশয়ের আগমন?” আসন গ্রহণ করে শেষ কালে ধীরে সুস্থে বুড়ো জানতে চাইল। ভেঙে ভেঙে কঠিন স্বরে হলেও ভদ্রভাবেই সে কথাগুলি উচ্চারণ করল।

মিতিয়া চম্‌কে উঠল। জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়তে গিয়েও আবার বসে পড়ল। পরক্ষণেই একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে, স্নায়বিক উত্তেজনায় অধীর হয়ে নানা রকম ভঙ্গি করে উঁচু গলায় দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। দেখাই যাচ্ছিল শেষ সীমানায় এসে পৌঁছুছে, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, এখন শেষ অবলম্বন খুঁজছে, আর সেটা যদি পাওয়া সম্ভব না হয় তা হলে এখনই, এই মুহূর্তে তলিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। এসবই বুড়ো সাম্‌সোনভ্ সম্ভবত এক নিমিষেই বুঝে ফেলল, যদিও তার মুখের ভাব প্রস্তরমূর্তির মতো ভাবলেশহীন ও অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

“মহামান্য কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ্, আমার গর্ভধারিণী জননীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার যা প্রাপ্য আমার পিতা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ কারামাজ়ভ্ তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় তার সঙ্গে আমার যে বিরোধ সে সম্পর্কে আশা করি আপনি ইতিমধ্যে একাধিকবার শুনে থাকবেন যেহেতু শহরের সর্বত্র এরই মধ্যে এই নিয়ে রীতিমতো গুঞ্জন চলছে, কারণ এখানে প্রতিটি মানুষই একথা বলাবলি করছে, যা তাদের করাটা অবশ্য অসমীচীন তাছাড়া এটা অমনিতেই আপনার কানেও পৌঁছুন বিচিত্র নয় খুবই সম্ভব, গ্রুশেন্‌কার মারফত অপরাধ নেবেন না, মাফ করবেন, আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না মানে, আমার অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্রী আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মারফত আপনার কানেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে...” এই ভাবে শুরু করে প্রথম কথাটি থেকেই মিতিয়া বাধ-বাধ গলায় বলল।

তবে আমরা তার পুরো ভাষণটি এখানে অক্ষরে অক্ষরে তুলে দিতে চাই না, কেবল তার মূল বক্তব্য বিষয়টি উপস্থিত করব। মিতিয়া যা বলল তার মোদ্দা কথাটা এই যে মাস তিনেক আগে ইচ্ছাকৃত ভাবে—হ্যাঁ, 'ইচ্ছে হতে চলে গেলাম'

নয়, 'ইচ্ছাকৃতভাবে' কথাটাই বেরিয়েছিল তার মুখ থেকে—সে, মিতিয়া, শহরের এক নামজাদা উকিলের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করতে গিয়েছিল। "উকিলের নাম পাভেল পাভ্‌লভিচ্ কর্নেপ্লোদভ্—শুনলে শুনে থাকতে পারেন কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ্। ইয়া চওড়া কপাল, মস্তিষ্কটা প্রায় রাষ্ট্রীয় নেতার তুল্য। আপনাকে জানেনও দেখলাম। আপনার সম্পর্কে বেশ ভালো ভালো কথাই বললেন বলতে বলতে আবার তার কথা বেধে গেল। কিন্তু এ ভাবে বারবার বেধে গেলেও সে নিবৃত্ত হল না—পরক্ষণেই এক লাফে সেই বাধা টপকে দূরে, আরও দূরে তার লক্ষ্যের দিকে ধেয়ে চলল।

তা কর্নেপ্লোদভ্ নামে এই উকিলটি নাকি মিতিয়াকে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং যা যা দলিল মিতিয়া সেদিন তার সামনে হাজির করতে পেরেছিল সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেনও। দলিলের প্রসঙ্গে এসে মিতিয়া অবশ্য বিশেষ ভাবে তাড়াহুড়ো করে বিষয়টা কেমন যেন অস্পষ্ট করে দিল। সব দেখার পর কর্নেপ্লোদভ্ এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে চের্‌মাশ্‌নিয়া গ্রামটি মা'র কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে মিতিয়ার অবশ্যই প্রাপ্য, তাই এ ব্যাপারে বাস্তবিকই মামলা দায়ের করে বুড়ো বদমাশটাকে টিট করা যায় "কারণ সব দরজা এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি এবং কোথা দিয়ে কী ভাবে ঢুকতে হয় আইনের তা জানা আছে।" এক কথায়, ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছ থেকে আরও হাজার ছয়েক, এমনকি সাত হাজারও পাওনা আশা করা যেতে পারে, যেহেতু চের্‌মাশ্‌নিয়ার মূল্যই অন্ততপক্ষে পক্ষে পঁচিশ হাজার, অর্থাৎ কিনা, সম্ভবত আটশ হাজার, "তিরিশ, কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ, তিরিশ, আর আমি কিনা, ধারণা করতে পারেন, এই নিষ্ঠুর লোকটার কাছ থেকে সতেরো হাজারও পাইনি! কিন্তু আমি মিতিয়া, বলতে গেলে আইনের কীই বা বুঝি? তাই মামলা মোকদ্দমার মধ্যে তখন আর গেলাম না। এদিকে এখানে আসার পর উলটে আমারই বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে দেখে আমি তো থ।

এখানে এসে মিতিয়া আবার তালগোল পাকিয়ে ফেলল, কিন্তু এবারেও চট করে সে বাধা টপকে বেরিয়ে গেল। বলল, "তাই বলছিলাম কি মহামান্য কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ, ওই নৃশংস অত্যাচারীটার বিরুদ্ধে আমার যা দাবি তার সমস্ত অধিকার অধিগ্রহণ করে যদি আমাকে শুধু হাজার তিনেক দেন এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো মতেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই—একথা আমি আমার সম্মানের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি; বরং উল্‌টে তিন হাজারের বদলে ছয় এমনকি সাত হাজারও লাভ করতে পারেন।

সবচেয়ে বড়ো কথা, কাজটা 'এমনকি আজই' সে চুকিয়ে ফেলতে চায়।

"আমি তাহলে আপনাকে এই যে আপনাদের নোটারি না কী বলে, তার কাছে এক কথায়, আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। সব দলিলপত্র আমি আপনার হাতে তুলে দেব যা যা চান সব যেখানে যেখানে সই করতে বলেন সই করব। এই চুক্তিপত্র আমরা এখনই করে ফেলতে পারি যদি সম্ভব হয়

ভালো হয় যদি আজ সকালেই সম্ভব হয়। তাহলে আপনি আমাকে ওই তিন হাজার দিয়ে দিতে পারতেন কারণ আপনার সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন পুঁজির মালিক এ শহরে আর কে-ই বা আছে? আপনি এই ভাবে আমাকে বাঁচাতে পারতেন এক কথায়, আমার মতো এক বেচারির মাথাটা বাঁচাতে পারতেন অতি মহৎ এক কাজের খাতিরে, বলতে গেলে এক অতি সম্মানজনক কাজের খাতিরে সেটা করতে পারতেন কারণ বিশেষ পরিচিত একজন মহিলার প্রতি, যাকে আপনিও বেশ ভালো করেই জানেন, যার ওপর আপনি পিতৃস্নেহে অভিভাবকত্ব করেন, তার প্রতি আমি সুমহান অনুভূতি পোষণ করি। সেই পিতৃস্নেহ যদি আপনার না থাকত তাহলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। বলতে পারেন, এখানে তিন জনের কপালে কপালে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কারণ মানুষের ভাগ্য—এ বড়ো ভয়ঙ্কর, কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ্! বাস্তবতা, কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ, বাস্তবতা! তবে আপনাকে যখন অনেক দিন আগেই বাদ দেওয়া উচিত, তখন থাকছে দুজনের কপাল—মানে, আমি যে ভাবে ব্যাপারটা প্রকাশ করেছি তার কি—হয়তো আনাড়ি গোছের হয়ে গেল, কিন্তু আমি সাহিত্যিক নই। অর্থাৎ কিনা একটা কপাল আমার, আরেকটা ওই নরপিশাচটার। তাহলে এবার বেছে নিন। কাকে বেছে নেবেন? আমাকে, না ওই নরপিশাচটাকে? সব এখন আপনার হাতে—তিনজনের ভাগ্য আর দুজনের অদৃষ্ট মাফ্ করবেন, আমার সব ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন আপনার ওই শ্রদ্ধা উদ্রেককারী চোখ দুটি দেখে আমি বুঝতে পারছি আপনি সব বুঝছেন। আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আজই আমি সাত বাঁও জলের তলায় ডুবে গেলাম... এই হল কথা!"

'এই হল কথা' বলে মিতিয়া তার গোলমেলে বক্তৃতা শেষ করল। জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তার বোকাটে প্রস্তাবের উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। একেবারে শেষ যে কথাটি বলল তা থেকে তার নিজেরই হঠাৎ এই হতাশাজনক উপলব্ধি হল যে সব ভেস্তে গেল, সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে বেজায় রকম আগড়ম বাগড়ম একগাদা কথা সে বলে ফেলেছে। 'অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল সব ঠিক আছে, তারপর এখন কিনা এই সব আগড়ম বাগড়ম!' হঠাৎ খেলে গেল তার হতাশ মাথার ভেতরে।

মিতিয়া যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ সারাটা সময় বুড়ো সাম্‌সোনভ্ স্থির হয়ে বসে ছিল, হিমশীতল দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করে যাচ্ছিল। সে যাই হোক, মিনিটখানেক তাকে অপেক্ষা করার মতো অবস্থায় ধরে রেখে কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ অবশেষে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নিরানন্দ কণ্ঠে উচ্চারণ করল

"মাফ করবেন মহাশয়, ওরকম কারবার আমরা করি না।"

মিতিয়ার হঠাৎ উপলব্ধি হল তার পা দুটো অবশ হয়ে আসছে।

"এখন তাহলে আমার কী দশা হবে কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ?" ম্লান হাসি হেসে বিড়বিড়

করে সে বলল। "আমি তো এখন তাহলে মারা গেলাম—আপনার কী মনে হয়?"

"মাফ করবেন মহাশয়

মিতিয়া ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষ করল বুড়ো সাম্‌সোনভের মুখে কেমন কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য খেলে গেল। মিতিয়া চমকে উঠল।

"দেখুন মহাশয় এ ধরনের কারবার আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়", ধীরে ধীরে বুড়ো বলল, "মামলা মোকদ্দমা, উকিল—সে এক মহা ঝামেলা। তবে যদি চান তবে বলি, এরকম একজন লোক আছে বটে, আপনি বরং তার কাছে গিয়ে একবার দেখুন

"বলেন কী! কে সেই লোক? আপনার কথা শুনে আমার ধড়ে প্রাণ এলো, কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ", জড়িয়ে জড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠল মিতিয়া।

"স্থানীয় লোক নয়, এই মুহূর্তে এখানে নেইও। অমনিতে চাষি সম্প্রদায়ের লোক, কাঠ কেনাবেচা করে। খোচর ডাকনামে লোকে চেনে। আজ এক বছর হল আপনার ওই চেরমাশ্‌নিয়ার জঙ্গল নিয়েই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে দর কষাকষি চলছে, দরে বনছে না — শুনে থাকবেন হয়তো। এখন আবার ফিরে এসেছে সেখানে, ভলোভিয়া স্টেশন থেকে বোধ করি চার ক্রোশ মতন দূর হবে ইল্‌ইন্‌স্কোয়ে গ্রাম—সেখানকার পুরুতঠাকুরের কাছে গিয়ে উঠেছে। আমার কাছে এখানেও লিখেছিল—এই ব্যাপারে অর্থাৎ জঙ্গলের কাঠের ব্যাপারেই আমার পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাই বলছিলাম কি, আপনি যদি ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে সতর্ক করে দেন এবং আমাকে এই যে প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন সেটা যদি খোচরকে দেন তাহলে সে সম্ভবত

"দুর্দান্ত আইডিয়া!" তাকে বাধা দিয়ে সহর্ষে বলে উঠল মিতিয়া। "এই তো সেই লোক! ঠিক এটাই তো তার চাই! লোকটা দরাদরি করছে, চড়া দর হাঁকছে তার কাছ থেকে, ঠিক এই সময়ে কিনা তার হাতে এসে যাচ্ছে একেবারে স্বত্বভোগের দলিল! হাঃ-হাঃ-হাঃ!" বলতে বলতে মিতিয়া তার স্বভাববশত আচম্‌কা শুষ্ককণ্ঠে ছোট্ট করে কাষ্ঠহাসি হেসে উঠল। সেটা এত অপ্রত্যাশিত ছিল যে সাম্‌সোনভ্ পর্যন্ত চমকে উঠল, তার মাথাটা কেঁপে উঠল।

"আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব, কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ!" উৎসাহে টগবগে করছিল মিতিয়া।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" সাম্‌সোনভ্ মাথা নোয়াল।

"কিন্তু আপনি জানেন না, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওঃ আগে থাকতেই আমার মন বলছিল, আর সেই টানেই না চলে এলাম আপনার কাছে! তাহলে এখন যেতে হয় সেই পুরুত মশাইয়ের কাছে!"

"ধন্যবাদ জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই মহাশয়।"

"যত তাড়াতাড়ি পারা যায় যাই, পারলে উড়ে চলে যাই। আপনার স্বাস্থ্যের অপব্যবহার করলাম। জীবনে কখনও ভুলব না। একজন রুশি আপনাকে এই কথা বলছে কুজ্মা কুজ্মিচ! একজন র্-রুশি বলছে!"

"বিলক্ষণ!"

মিতিয়া বুড়োর হাতটা চেপে ধরতে যাচ্ছিল, ভেবেছিল সেটা ধরে ঝাঁকুনি দেবে, কিন্তু লোকটার দু চোখে কেমন যেন একটা বিদ্বেষের জ্বালা ঝলক দিয়ে উঠল। মিতিয়া হাত গুটিয়ে নিল, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা তারই নিজের মনের ভুল বলে নিজেকে ধিক্কার দিল। 'আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আর কি' এই ভাবনাটাই চট করে তার মাথায় খেলল।

"ওর খাতিরে! যা করছি সব ওই ওরই খাতিরে কুজ্মা কুজ্মিচ্! বুঝতে পারছেন, এটা কিন্তু ওর খাতিরে!" হঠাৎ এমন ভাবে গাঁক গাঁক করে উঠল যে সারাটা ঘর গমগম করতে লাগল। মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আগের মতোই লম্বা লম্বা পা ফেলে পিছন ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রমণপথের দিকে ধাবিত হল। সে পুলকে শিহরিত হয়ে উঠছিল।

'সবই তো পণ্ড হতে বসেছিল, আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে বাঁচিয়েছেন', একথাই তার মনে হল। 'আহা, কী মহৎ এই বুড়ো মানুষটি। কী দারুণ মর্যাদা ফুটে উঠছে তাঁর হাবভাবে! ওঁর মতন একজন অভিজ্ঞ কারবারি যখন এই পথের সন্ধান দিয়েছেন তখন অবশ্যই বাজিমাৎ হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। তুরন্ত যেতে হয়, এখনই যেতে হয়। রাতের আগে ফিরে আসব, রাতের বেলাতেই ফিরে আসব, ততক্ষণে কেল্লা ফতে! না, না, এ তো আর হতে পারে না যে বুড়ো আমাকে নিয়ে মজা করল?' বাসার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে মনে মনে এই সব আন্দোলন করতে লাগল মিতিয়া।

হায় রে! একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য চিন্তা বলতে যদি কিছু থাকে সে তো ওই দ্বিতীয় চিন্তাটাই। পরে, ওই দুর্ঘটনাটা যখন পুরো মাত্রায় ঘটে গেল তারও অনেক কাল পরে বুড়ো সাম্সোনভ্ হাসতে হাসতে নিজ মুখে স্বীকার করেছিল যে সেই সময় ক্যাপ্টেনকে সে বোকা বানিয়েছিল। সাম্সোনভ্ লোকটা ছিল বিদ্বেষপরায়ণ, তাপ উত্তাপহীন, পরিহাসপ্রিয়, আর তার বিদ্বেষের প্রকাশটা হদ্দ অসুস্থ ধরনের। ক্যাপ্টেনের চেহারায় উচ্ছ্বসিত ভাব, নাকি এই 'উচ্ছৃঙ্খল ও উড়নচণ্ডেটার' বোকার মতো এই বিশ্বাস যে 'পরিকল্পনা' বলে যে গাঁজাখুরি গল্পটা সে হাজির করছে তাতে সে, মানে সাম্সোনভের মতো লোক কুপোকাত হয়ে পড়তে পারে, নাকি যে গ্রুশেন্কার নাম করে 'এই নচ্ছারটা' যত সব আজগবি গপ্পো ফেঁদে তার কাছে টাকা চাইতে এসেছে তাকে নিয়ে একটা ঈর্ষার অনুভূতি—ঠিক কোন্টা তখন বুড়োকে একাজে প্রবৃত্ত করেছিল জানি না, তবে মিতিয়া যখন তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি

করছিল যে তার পা দুটো অবশ হয়ে আসছে এবং অর্থহীন ভাবে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল যে সে মারা গেল, সেই মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে বুড়ো তার দিকে অপরিসীম বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, আর তখনই ভেবে নিয়েছিল তাকে নিয়ে একটু মজা করবে। মিতিয়া বেরিয়ে যাবার পর নিদারুণ ক্রোধে পাণ্ডুর হয়ে গিয়ে কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ তার ছেলের দিকে ফিরে তাকে এই আজ্ঞা জারি করতে বলল যে ওই ওঁছা ভিখিরিটার ছায়ামাত্র যেন এর পর আর কখনও দেখা না যায়, তাকে যেন বাড়ির আঙিনায় ঢুকতে না দেওয়া হয়, নইলে কিন্তু

'নইলে যে কী সেটা আর শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করল না, কিন্তু তার ছেলে, যে তার বাবাকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় প্রায়শই দেখেছে, সে পর্যন্ত ভয়ে আঁতকে উঠল। এর পর ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে বুড়োর সর্বাঙ্গ রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল 'বদ্যি' ডেকে পাঠাল।

## দুই

## খোচর

এখন তাহলে 'জোর কদমে' ছুট লাগাতে হয়। এদিকে ঘোড়ার পিছনে খরচ করার মতো এক কপর্দকও তার নেই। নেই মানে, থাকার মধ্যে ছিল দুটো সিকি। এত বছরের স্বচ্ছল জীবন যাপনের পর তার আগেকার সম্পদের এইটুকুই মাত্র অবশিষ্ট ছিল! কিন্তু ঘরে তার একটা পুরনো রুপোর ঘড়ি পড়ে আছে—বহুদিন যাবৎ অচল। বাজারে এক ইহুদি ঘড়িওয়ালার একটা দোকান ছিল। কালবিলম্ব না করে ঘড়িটা নিয়ে মিতিয়া তার কাছে গেল। ঘড়িওয়ালা তাকে এর জন্য ছয় রুবল দিল।

"এটাও আশা করিনি!" মিতিয়া আহ্লাদিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সে তখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছে। খপ্ করে তার পাওনা ছয় রুবল তুলে নিয়ে সে বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়িতে এসে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে তিন রুবল ধার নিয়ে সেই টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করল। মিতিয়াকে তারা এত ভালোবাসত যে তারা সানন্দে তাকে টাকা ধার দিল, যদিও সে টাকা তাদের শেষ সম্বল ছিল। মিতিয়া তার ওই পরম পুলকিত অবস্থার মধ্যে তক্ষুনি তাদের কাছে প্রকাশ করল যে তার ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে। এই বলে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে সাম্‌সোনভের কাছে যে 'পরিকল্পনা' সে রেখেছিল তার প্রায় আগাগোড়া বিবরণ সে দিল—বলাই বাহুল্য, ভীষণ তাড়াহুড়ো করে। তারপর সাম্‌সোনভের সিদ্ধান্ত এবং তার নিজের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদির কথাও তাদের বলল। এরা এর আগেও তাদের ভাড়াটিয়ার জীবনের অনেক গোপন বিষয়ে অবগত ছিল। এই কারণে ওকে তাদের 'নিজেদেরই একজন' বলে মনে করত। তারা দেখেছিল, রীতিমতো ভদ্রসন্তান হলে কী হবে, লোকটার মনে এতটুকু অহঙ্কার নেই। এই ভাবে

মোট নয় রুবল জোগাড় হয়ে গেলে মিতিয়া ভলোভিয়া স্টেশন পর্যন্ত যাবার জন্য ডাক গাড়ির ঘোড়া চেয়ে লোক পাঠাল।[৫] কিন্তু এই ভাবে যে তথ্যটি লোকে মনে করে রেখেছিল এবং যা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা এই যে 'ওই বিশেষ ঘটনার প্রাক্কালে সেদিন দুপুর পর্যন্ত একটি কপর্দকও মিতিয়ার কাছে ছিল না, টাকা জোগাড় করার জন্য সে তার ঘড়ি বিক্রি করে, তার বাড়ির কর্ত্রীদের কাছ থেকে তিন রুবল ধার নেয়। আর এ সবই হয় প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে।'

আগে থাকতেই এই তথ্যটির উল্লেখ করছি, কেন করছি পরে তার ব্যাখ্যা মিলবে।

মিতিয়া গাড়ি হাঁকিয়ে ভলোভিয়া স্টেশনের উদ্দেশে ছুটল বটে, যেতে যেতে আগে থাকতে এই আনন্দানুভূতিতে তার মনও ভরে উঠছিল বটে যে শেষকালে এ সবের অবসান ঘটবে, 'এ সব ঝামেলার জট খুলে যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনুপস্থিতিতে গ্রুশেন্‌কা যে এখন কী করে বসে সেই ভয়ে তার ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি ধরছিল। কে বলতে পারে, যদি বেছে বেছে ঠিক আজই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে যাবে বলে শেষকালে মনস্থির করে? ঠিক এই কারণেই তো গ্রুশেন্‌কাকে না বলে কয়ে চলে এসেছে, আর বাড়ির লোকদের বলে রেখেছে যেখান থেকেই হোক না কেন, কেউ যদি এসে তার কথা জিগ্‌গেস করে তাহলে ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায় সে কোথায় গেছে।

'অবশ্য, অতি অবশ্যই আজ সন্ধ্যা নাগাদ ফিরতে হবে', গাড়ির ভেতরে বসে বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে সে বারবার আওড়াল। 'আর এই খোচরটাকে এখানে টেনে আনতে হবে    দলিলপত্র তৈরি করতে হবে তো    ' ভাবতে ভাবতে মিতিয়ার বুকের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। কিন্তু হায়, তার এই সাধের স্বপ্ন তার 'পরিকল্পনা' অনুযায়ী বাস্তবে পরিণত হওয়ার নয়।

প্রথমত, ভলোভিয়া স্টেশন থেকে গ্রামের মেঠো পথ ধরে রওনা দিতে গিয়েই তার দেরি হয়ে গেল। মেঠো পথটা দেখা গেল চার ক্রোশ তো নয়, ছয় ক্রোশ। দ্বিতীয়ত, ইল্‌ইনস্কোয়ের পুরুতঠাকুরকে সে বাড়ি পেল না, সে তখন পাশের একটা গ্রামে গেছে। গাড়ির সেই একই ঘোড়া সম্বল করে মিতিয়া যখন পাশের গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিল ঘোড়াগুলো ততক্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। সেখানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে যতক্ষণে পুরুতঠাকুরকে বের করা হল ততক্ষণে প্রায় রাত হয়ে এসেছে।

পুরুতঠাকুর দেখতে ছোটোখাটো, লাজুক ও মধুর স্বভাবের মানুষ। মিতিয়াকে সে তৎক্ষণাৎ জানাল যে খোচর নামে ওই লোকটার গোড়ার দিকে তার কাছেই ওঠার কথা ছিল বটে, কিন্তু সে এখন আছে সুখোই পল্লীতে, সেখানে আজ রাতটা কাটাচ্ছে বনরক্ষকের কুটিরে, কেন না সেখানেও জঙ্গলের কাঠ কিনছে। মিতিয়া এই মুহূর্তে তাকে খোচরের কাছে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানিয়ে পুরোহিতকে বলল যে এই উপকারটুকু করলে তার 'প্রাণ বাঁচে'। পুরোহিত গোড়ার দিকে ইতস্তত করলেও মিতিয়া এত করে অনুরোধ করায় শেষ পর্যন্ত তাকে সুখোই পল্লীতে নিয়ে

যেতে রাজি হল—সম্ভবত তার নিজেরও মনে মনে একটা কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু কোন্ কুক্ষণে কে জানে সেখানে 'হাঁটি-হাঁটি' যাবার পরামর্শ দিল, কেন না মোটে তো সিকি ক্রোশটাক, বড়জোর 'সামান্য একটু বেশি' হবে। মিতিয়া বলাই বাহুল্য, রাজি হয়ে গেল। সে তার অভ্যাসমতো লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল, ফলে বেচারি পুরোহিতকে প্রায় তার পিছন পিছন ছুটতে হচ্ছিল। পুরোহিত মানুষটি তেমন বুড়ো না হলেও বেশ হুঁশিয়ার।

মিতিয়া তার সঙ্গেও তৎক্ষণাৎ নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলা শুরু করে দিল। সারা রাস্তা বকবক করতে করতে চলল, মহা উৎসাহে ও উত্তেজিত ভাবে খোচরের ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইল। পুরোহিত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কিন্তু পরামর্শ তেমন একটা দিচ্ছিল না। মিতিয়ার প্রশ্নের উত্তরে বারবার এড়িয়ে যাবার মতো করে 'জানি না, না জানি না সে আমি জানব কী করে?'—এই রকম সব কথা বলে যাচ্ছিল। মিতিয়া যখন উত্তরাধিকার নিয়ে বাপের সঙ্গে তার বিরোধের প্রসঙ্গ শুরু করল তখন ঠাকুর মশাই দস্তুর মতো ঘাবড়ে গেল, কেন না ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে তার সম্পর্কটা এমনই যে কোনো কোনো বিষয়ে সে তার ওপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত, সে বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল গোর্‌স্তকিন নামে এই কারবারি চাষিটিকে কেন মিতিয়া খোচর বলে উল্লেখ করছে, উপযাচক হয়ে মিতিয়াকে ব্যাখ্যা করে একথাও বুঝিয়ে দিল যে লোকটা বাস্তবিকই খোচর বটে, কিন্তু আবার খোচর নয়ও, তাই এই নামে তাকে ডাকলে সে দারুণ ক্ষুণ্ণ হয়, তাকে অবশ্যই গোর্‌স্তকিন বলে ডাকা উচিত। 'তা নইলে তার সঙ্গে আপনার কোনো কারবার চলবে না, আপনার কথা সে কানেই তুলবে না', পুরোহিত রায় দিল।

মিতিয়া একথায় সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা অবাক হয়ে গেল এবং ব্যাখ্যা করে বলল যে সাম্‌সোনভ্ নিজে তাকে এই নামেই উল্লেখ করেছে। এই তথ্যটা শোনার পর পুরোহিত মহাশয় তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল, যদিও যেটা করলে ভালো হত সেটা এই যে তখনই যদি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে সে তার নিজের অনুমানটা খুলে বলত অর্থাৎ সাম্‌সোনভ নিজে যদি খোচর নামে উল্লেখ করে এই চাষি লোকটার কাছে তাকে পাঠিয়ে থাকে তার মানে কি এই নয় যে কোনো কারণে সে রসিকতা করেছে এবং এর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে? তবে 'এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে' থমকে দাঁড়ানোর মতো সময় মিতিয়ার ছিল না। তার বড়ো তাড়া ছিল, বড়ো বড়ো পা ফেলছিল। কেবল সুখোই পল্লীতে আসার পরই সে আন্দাজ করতে পারল যে সিকি ক্রোশ নয়, আধ ক্রোশও নয়, সম্ভবত পুরো এক ক্রোশ পথ পার হতে হয়েছে। এতে সে বিরক্ত হল কিন্তু সংযত হয়ে থাকল।

ওরা দুজনে কুটিরের ভেতরে ঢুকল। বনরক্ষক লোকটা পুরোহিতের পরিচিত। কুটিরের একটা অর্ধাংশে তার স্থান হয়েছে, গলি বারান্দা পেরিয়ে বাকি যে অর্ধাংশটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছে গোর্‌স্তকিন। সেই পরিষ্কার

অংশটিতে ওরা ঢোকার পর একটা চর্বির বাতি জ্বালানো হল। ঘরে পাইন কাঠের একটা টেবিল, তার ওপর একটা সামোভার, সেটার আঁচ নিভে গেছে। এখানেই দেখা যাচ্ছে একটা ট্রে, ট্রের ওপর কতকগুলো কাপ, রামের খালি বোতল, ভোদ্‌কার এক লিটারি বোতল—সেটা এখনও একেবারে খালি হয়নি আর আটার রুটির কিছু ভুক্তাবশেষ। এদিকে আগন্তুক ব্যক্তিটি সটান বেঞ্চের ওপর শুয়ে আছে, গায়ের ওপরের পোশাকটা দলমোচড়া পাকিয়ে বালিশ করে মাথার তলায় গোঁজা। ঘোর নাসিকা গর্জন করছে লোকটা। মিতিয়া কী করবে বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'অবশ্যই ঘুম ভাঙাতে হয়। আমার কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এত তাড়াহুড়ো করে এলাম। আজই আমার ফিরে যাবার তাড়া আছে।' মিতিয়া রীতিমতো উদ্বিগ্ন। কিন্তু পুরুতঠাকুর আর বনরক্ষক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারা তাদের মত প্রকাশ করল না। মিতিয়া এগিয়ে গিয়ে নিজেই তার ঘুম ভাঙাতে উদ্যোগী হল, যথেষ্ট উদ্যমের পরিচয় দিল, কিন্তু ঘুমন্ত লোকটির ঘুম ভাঙল না।

'লোকটা মাতাল হয়ে গেছে', মিতিয়া মনে মনে বিবেচনা করে দেখল। হা ভগবান, এখন আমি কী করি! কী করা উচিত আমার?' এর পরই হঠাৎ ভীষণভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ঘুমন্ত লোকটির হাত পা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল, তার মাথাটা ধরে কয়েক বার ঝাঁকুনিও দিল, তাকে ধরে উঠিয়ে বেঞ্চিতে বসাতে গেল। এত সব সত্ত্বেও, দস্তুরমতো চেষ্টা চরিত্র করার পর মাত্র এইটুকু সাড় মিলল যে লোকটা কতকগুলি অর্থহীন হুঁ হাঁ উচ্চারণ করল, যদিও অস্পষ্ট ভাবে হলেও তার মুখ দিয়ে গালিগালাজ বেরিয়ে আসছিল।

"না, আপনি বরং আরও কিছু সময় অপেক্ষা করুন', পুরোহিত শেষকালে বলে উঠল, "দেখাই যাচ্ছে, কিছু বলার মতো অবস্থা ওর নেই।"

"সারাটা দিন বসে বসে মদ খেয়েছে", তার কথায় সায় দিয়ে বনরক্ষক বলল।

"হা ভগবান!" অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মিতিয়া। "আমার যে কী পরিমাণ দরকার, আর আমার এখন যে কী মরিয়া দশা আপনারা যদি সেটা অন্তত জানতেন!"

"না, আপনি বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন", পুরুত ঠাকুর আবার বলল।

"সকাল পর্যন্ত? দোহাই আপনাদের, এটা অসম্ভব!" বলতে বলতে সে মরিয়া হয়ে আবার ছুটে যাচ্ছিল মাতালটাকে জাগানোর উদ্দেশ্যে, কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বুঝতে পারল সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল। পুরুতঠাকুর চুপ করে রইল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু বনরক্ষকের মুখটা থমথম করছে।

"বাস্তবতা কী ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডিই না নিয়ে আসে মানুষের জীবনে!" একেবারে হতাশ হয়ে গিয়ে মিতিয়া বলে উঠল। তার মুখ বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরতে লাগল। মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে পুরুতঠাকুর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে জানাল ঘুমন্ত লোকটাকে যদি জাগানো সম্ভবও হত তবু যেহেতু সে মাতাল অবস্থায় আছে, কথা

বলার কোনো ক্ষমতা তার নেই। ‘এদিকে আপনার কাজটাও গুরুত্বপূর্ণ, তাই যদি হয় তাহলে সকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখলেই বোধহয় ভালো হয় ’ মিতিয়া অগত্যা মেনে নিয়ে নাচারের ভঙ্গিতে দু হাত ছুড়ল।

“আমি, ঠাকুরমশাই, একটা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে তাই নিয়ে এখানে থেকে যাব, অনুকূল মুহূর্তটি ধরার চেষ্টা করব। ও জেগে উঠলেই আমি শুরু করব। ” তারপর বনরক্ষকের দিকে ফিরে বলল, “বাতির দাম আমি তোমাকে দেব, থাকার জন্যও দেব, যা দেব তাতে দ্‌মিত্রি কারামাজভ্‌কে তোমার মনে থাকবে। কিন্তু শুধু একটাই কথা, ঠাকুরমশাই’ আপনাকে নিয়ে যে কী করা যায় জানি নে। আপনি শোবেন কোথায়?”

“না না, আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।” বনরক্ষককে দেখিয়ে বলল, “এই তো ওর ঘোড়াটা নেব, ওটার পিঠে চেপে দিব্যি চলে যাব। যাক, আপাতত চলি তাহলে। আপনার পরিপূর্ণ সুখ কামনা করি।”

সেই রকমই স্থির হল। যাক, শেষকালে রেহাই পাওয়া গেছে এই ভেবে পুরুত মশাই খুশিমনে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি রওনা দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্বস্তিভরে মাথা নাড়তে লাগল, একটা চিন্তা তাকে ভাবিত করে তুলল সময় থাকতে থাকতে, কালই এই কৌতূহলজনক ঘটনাটা তার পরম উপকারী ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের গোচরীভূত করা প্রয়োজন কিনা। ‘নইলে, কে বলতে পারে, কখন কোন্ কুক্ষণে জেনে ফেলেন, তাহলে তো খেপে লাল হয়ে যাবেন, আমাকে যে দয়াদাক্ষিণ্য করেন সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।’

বনরক্ষক মাথা চুলকোতে চুলকোতে নীরবে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল, এদিকে মিতিয়া, যাকে সে ‘অনুকূল মুহূর্তটি ধরা’ বলেছে, তারই আশায় বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসল। ভারী কুয়াশার মতো একটা গভীর মন-কেমন—করা ভাব তার বুকের ভেতরটা লেপ্‌টে ধরেছে। গভীর, ভয়ঙ্কর, মন-কেমন-করা একটা অনুভূতি! বসে বসে সে ভাবতে লাগল, কিন্তু ভেবে কোনো কূল কিনারা পেল না। বাতি জ্বলছে, জ্বলতে জ্বলতে বাতির পলতে পুড়ছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে, ঘরটা বড়ো বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এমন একটা দমচাপা ভাব যে অসহ্য লাগছে। হঠাৎ তার সামনে ভেসে উঠল বাগানের ছবি, বাগানের পেছনের খিড়কি দুয়ার, রহস্যজনকভাবে খুলে যাচ্ছে তার বাবার বাড়ির দরজাটা আর তার ভেতর দিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে গ্রুশেন্‌কা। মিতিয়া এক লাফে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়ল।

“ট্র্যাজিডি!” দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে বলল। যন্ত্রচালিতের মতো ঘুমন্ত লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল। লোকটা ছিল শুকনো রোগা চেহারার এক চাষি, বুড়ো তাকে এখনও বলা যায় না। মুখটা বেশ লম্বাটে, লালচে বাদামি রঙের, কোঁকড়ানো মাথার চুল, পাতলা গোছের লম্বা লালচে দাড়ি। গায়ে ছিটকাপড়ের জামা আর একটা কালো ওয়েস্টকোট, সেটার পকেট থেকে উঁকি

মারছে রুপোর ঘড়ির চেইন। ভেতরে ভেতরে একটা নিদারুণ ঘৃণা নিয়ে মিতিয়া তার চেহারাছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল এবং কেন কে জানে তার কাছে বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল লোকটার মাথার কোঁকড়া চুল। যেটা সবচাইতে বড়ো দুঃখের কথা, যা সহ্যসীমার বাইরে তা এই যে এত সব ছেড়েছুড়ে জলাঞ্জলি দিয়ে সে, মিতিয়া যখন নিজের এমন একটা জরুরি কাজ হাতে নিয়ে এই লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন এই অকর্মণ্যটা কিনা, যার ওপর এখন মিতিয়ার ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে, সেই লোকটাই কিনা, যেন কিছুই হয়নি, যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে এমনি ভাব নিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে! 'ওঃ ভাগ্যের পরিহাস আর কাকে বলে!' মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে যেতে মাতাল চাষিটার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টায় আরও একবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটাকে জাগানোর জন্য কেমন যেন ক্ষিপ্ততা তাকে পেয়ে বসল। সে তাকে ধরে টানাটানি করল, ধাক্কা দিল, এমনকি মারধরও করল তাকে, কিন্তু মিনিট পাঁচেক ধরে এত সব কাণ্ডকারখানার পর এবারেও যখন কোনো ফল হল না তখন একেবারে হতাশ হয়ে, অসহায়ের মতো তার নিজের বেঞ্চে ফিরে গিয়ে বসে পড়ল।

"বোকামি! স্রেফ বোকামি!" মিতিয়া চিৎকার করে উঠল। "আর আর কতটা যে অসম্মানজনক এ সব!" হঠাৎ কেন যেন সে যোগ করল। ভয়ঙ্কর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল তার। 'তাই বলে ছেড়ে দেওয়া? একেবারে চলে যাওয়া...' বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মাথার মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল। 'না, বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষাই করা যাক। না না, থাকব, ইচ্ছে করেই থাকব, দেখি কী হয়! আর কীসের জন্যই বা আমি এখানে এসেছি? তা ছাড়া যাবই বা কীসে করে? এখন এখান থেকে যাই কী করে? ইশ্, কী নির্বুদ্ধিতা!'

এতে কিন্তু তার মাথার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। স্থাণু হয়ে বসে রইল। এই ভাবে বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঝিমুতে শুরু করল তা আর তার মনে নেই, হঠাৎ বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। সম্ভবত ঘণ্টা দুয়েক বা তার কিছু বেশি সময় সে ঘুমিয়েছিল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় তার চটকা ভেঙে গেল। যন্ত্রণাটা এত অসহ্য যে তার শুধু চিৎকার করা বাকি ছিল। দু পাশের রগ দপ দপ্ করছে, মাথার চাঁদি ব্যথা করছে। চটক ভাঙার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ধাতস্থ হতে পারছিল না, বুঝতে পারছিল না তার কী ঘটেছে। শেষকালে অনুমান করতে পারল চুল্লির কাঠকয়লা পুড়ে পুড়ে তেতে ওঠা ঘরটার ভেতরে বেজায় রকম বিষাক্ত বাষ্প জমেছে, অইতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে সে মারাও যেতে পারত। কিন্তু মাতাল চাষিটা যথারীতি শুয়ে আছে, পড়ে পড়ে নাসিকা গর্জন করছে। মোমবাতিটা গলে গিয়ে নিভু-নিভু হয়ে এসেছে। মিতিয়া চিৎকার করে উঠল, টলতে টলতে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সরু গলি বারান্দাটা দিয়ে বনরক্ষকের

ঘরের ভেতরে ঢুকল। লোকটা তৎক্ষণাৎ জেগে উঠল কিন্তু অন্য ঘরটাতে যে কাঠকয়লা পোড়ার ধোঁয়া জমেছে শোনার পর তার একটা বিহিত করার জন্য সেখানে গেল ঠিকই, তবে মিতিয়া অবাক হয়ে গেল এবং তার মনে দুঃখও হল যখন দেখল ঘটনাটাকে সে আশ্চর্যরকম উদাসীন ভাবে গ্রহণ করল।

"কিন্তু এ মারা গেছে, মারা গেছে! তাহলে? আমার তা হলে কী গতি হবে"? ক্ষিপ্তকণ্ঠে তার সামনে আর্তনাদ করে উঠল মিতিয়া।

ওরা ঘরের দরজা খুলে দিল, জানলা খুলল, চিমনির ঢাকনাও খুলল। মিতিয়া বারান্দা থেকে এক বালতি জল নিয়ে এলো। প্রথমে নিজের মাথাটা ভিজোল, তারপর এক জায়গায় কীসের একটা ন্যাকড়া পেয়ে সেটা জলে ভিজিয়ে খোচরের কপালে জলপটি লাগাল। এদিকে সমস্ত ঘটনাটার প্রতি বনরক্ষকের মনোভাব সেই আগের মতোই, এমনকি কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণও বটে। জানলাটা খুলে দিয়ে কঠিন স্বরে বলল 'ঠিক আছে, এ-ই থাক ' এই বলে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে মিতিয়ার কাছে রেখে শুতে চলে গেল। বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় মাতালটার মাথায় বারবার জলপটি লাগিয়ে আধঘণ্টাখানেক তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার পর সে বেশ গুরুত্ব দিয়ে মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিল যে সারা রাত আর ঘুমোবে না। কিন্তু এত দূর ধকল গিয়েছিল তার ওপর দিয়ে যে একটু দম নেওয়ার জন্য মিনিটখানেকের জন্য যেই একটু বসেছে অমনি, মুহূর্তের মধ্যে তার দু চোখ বুজে এলো, তৎক্ষণাৎ নিজের অজ্ঞাতসারে বেঞ্চের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল এবং শুতে না শুতে মড়ার মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বড়ো বেশি দেরিতে তার ঘুম ভাঙল। তখন সকাল প্রায় নয়টা। কুটিরের দুটো ছোটো ছোটো জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে প্রখর দীপ্তি দিচ্ছে। গতকালের সেই কোঁকড়া চুল চাষিটি বেঞ্চে বসে আছে, ইতিমধ্যে সে তার আঁটোসাঁটো কুঁচি দেওয়া কোর্তাটাও গায়ে চাপিয়েছে। তার সামনে চায়ের জন্য নতুন আরেকটা সামোভার এবং নতুন আরেকটা বোতল। গতকালের পুরানোটা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, আর নতুনটাও অর্ধেকের বেশি খালি হয়ে গেছে। মিতিয়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে দেরি হল না যে হতভাগা চাষিটা আবার মাতাল হয়ে পড়েছে, বদ্ধ মাতাল অবস্থায় আছে, ফেরানোর কোনো উপায় নেই। চোখ বড়ো বড়ো করে সে মুহূর্তখানেক তার দিকে তাকাল। এদিকে চাষিটা চোরা দৃষ্টিতে নীরবে তাকে দেখতে লাগল। তার চাউনির মধ্যে ফুটে উঠেছিল অবজ্ঞাসূচক কেমন যেন একটা শান্ত অবিচল ভাব, এমনকি এক ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ তাচ্ছিল্য—মিতিয়ার অন্তত তা-ই মনে হল। সে তার দিকে ছুটে গেল।

"মাফ করবেন, দেখুন আমি এখানকার পাহারাদার, পাশের কুঠুরির ওই লোকটির কাছ থেকে আপনি সম্ভবত শুনে থাকবেন—আমি লেফটেনাণ্ট দ্মিত্রি

কারামাজ়ভ্, যার কাছ থেকে জঙ্গলের কাঠ কিনছেন সেই বুড়ো কারামাজভের ছেলে...”

“মিথ্যে কথা!” দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠে হঠাৎ স্পষ্ট উচ্চারণে বলে উঠল লোকটা

“মিথ্যে মানে? বেশ তো, ফিয়োদর পাভ্লভিচ্‌কে যে জানেন একথা মানবেন তো?”

“তোমার কোনও ফিয়োদরভিচ্‌কে জানি বলে মানতে পারছি নে বাপু”, বেশ খানিকটা কষ্ট করে আড়ষ্ট জিভ নাড়িয়ে সে বলল।

“আরে বাবা জঙ্গলের কাঠ, জঙ্গলের কাঠ নিয়ে আপনি তার সঙ্গে ব্যবসায়ে নেমেছেন। জাগুন, জাগুন, সুস্থির হোন, মাথা ঠান্ডা করুন। ইল্‌ইন্‌স্কোয়ের পাভেল ঠাকুরমশাই আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আপনি সাম্‌সোনভ্‌কে লিখেছিলেন, উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।” মিতিয়া হাঁপাতে লাগল।

“ম-মিথ্যে কথা!” খোচরের আবারও স্পষ্ট জবাব। মিতিয়ার পা অবশ হয়ে এলো।

“আপনার অনুগ্রহ হোক। আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না! আপনি হয়তো নেশার ঘোরে আছেন। তবু আপনি কথা তো বলতে পারেন, বুঝতেও পারেন নইলে... নইলে আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না!”

“তুমি হলে গিয়ে রঙের মিস্ত্রি!”

“আপনার অনুগ্রহ হোক, আমি কারামাজ়ভ্, দ্‌মিত্রি কারামাজ়ভ্। আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে লাভজনক প্রস্তাব অত্যন্ত লাভজনক এই জঙ্গলের কাঠের ব্যাপারেই বলছিলাম।”

লোকটা এবারে গম্ভীর ভাবে দাড়িতে হাত বুলাল।

“না, তোমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল তুমি একটা বদমাশ। পাজি, হতভাগা!”

“বলছি তো আমি আপনাকে, বিশ্বাস করুন, আপনি ভুল করছেন!” হতাশ হয়ে হাতে হাত মোচড়াতে লাগল মিতিয়া। লোকটা তখনও দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিল। তারপর হঠাৎই চালাক-চালাক ভাব করে সে চোখ কোঁচকাল।

“না, না তুমি আমাকে একটা জিনিস দেখাও তো বাপু, তুমি আমাকে এমন একটা আইন দেখাও যেখানে ত্যাঁদড়ামি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে! শুনছ কী বলছি! তুমি একটা বজ্জাত, এটা বোঝ তো তুমি?”

মিতিয়া বিষণ্ণ মনে পিছিয়ে গেল। এমন সময় আচমকা কেমন করে—পরে সে নিজেই বলেছিল—‘কী একটা যেন তার কপালে ঘা মারল’। এক পলকে তার মাথার মধ্যে একটা আলোর চমক খেলে গেল, ‘দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা আলো, আর সে আলোয় সব কিছু আমার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠল’। স্তম্ভিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। আর যাই হোক সে একজন বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু সে বুঝতেই

পারছিল না কী করে তার মতন এমন একজন লোক এরকম বাজে কথায় ভুলতে পারল, এমন একটা দুঃসাহসিক অভিযানে নেমে পড়ল, প্রায় পুরো একটা দিন এ সব চালিয়ে গেল, এই খোচরটাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, তার মাথায় জলপটি লাগাতে পারল 'লোকটা মাতাল, বেহেড মাতাল, আরও এক হপ্তা একটানা মদ খাওয়া চালিয়ে যাবে। এখানে বসে থেকে কী হবে? আর, আর কী হবে ওদিকে ও যদি হা ভগবান, এ আমি কী করলাম!

লোকটা বসে বসে তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। অন্য কোনো সময় হলে মিতিয়া হয়তো রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এই আহাম্মকটাকে খুনই করে ফেলত, কিন্তু এখন সে নিজেই একেবারে শিশুর মতো দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে শান্তভাবে বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ওভারকোটটা তুলে নিল, কোনো কথা না বলে সেটা গায়ে দিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য ঘরটিতে পাহারাদার লোকটির দেখা মিলল না, সেখানে কেউ ছিল না। পকেট থেকে খুচরো পঞ্চাশ কোপেক বার করে রাতের আশ্রয় আর বাতির দরুন এবং ঝামেলা পোহানোর জন্য সেগুলি টেবিলের ওপর রেখে দিল। কুটির ছেড়ে বেরিয়ে সে দেখতে পেল চতুর্দিকে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল, আর কিছুই নেই। সে আন্দাজে পথ চলতে লাগল, কুটির থেকে বেরিয়ে যে কোনো দিকে যাবে—বাঁয়ে যাবে না ডাইনে যাবে তা পর্যন্ত বুঝতে পারছিল না। কাল রাতে পুরুতঠাকুরের সঙ্গে আসার সময় তাড়াহুড়োতে রাস্তাটা সে ঠাহর করে রাখতে পারেনি। কারও ওপরই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোনো ভাব তার মনের মধ্যে, ছিল না—এমনকি সাম্সোনভের ওপরেও নয়। 'উদ্দেশ্য হারিয়ে' উদ্ভ্রান্তের মতো লক্ষ্যহীন ভাবে বনের ভেতরের সরু পায়ে-চলা পথে পা ফেলে ফেলে সে চলতে লাগল—কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছে সে দিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেহে এবং মনে সে হঠাৎই এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে যে-কোন শিশু মুখোমুখি তাকে ধাক্কা মেরে কুপোকাত করে ফেলতে পারত। সে যাই হোক, কোনো মতে সে বন থেকে বেরিয়ে আসতে পারল। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেল ফসল কাটার পর একেবারে ন্যাড়া, আদিগন্ত প্রসারিত ধু ধু খোলা মাঠ। 'ওঃ কী হতাশার ছবি! চতুর্দিকে কী মৃত্যুর ছবি!' সামনে আরও সামনে পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে সে বারবার আওড়াতে লাগল।

পথ চলতি এক ভাড়াগাড়ির একজন যাত্রীর কৃপায় সে উদ্ধার পেল। কোনো এক বুড়ো ব্যবসায়ীকে নিয়ে গাড়িটা গ্রামের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি নাগালের মধ্যে চলে আসতে মিতিয়া পথের কথা জিগ্গেস করল। দেখা গেল গাড়িটা ভলোভিয়াতেই যাচ্ছে। কথাবার্তার পর মিতিয়াকে পথের সঙ্গী করে গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। ঘণ্টা তিনেক পর গাড়ি স্টেশনে পৌঁছুল। ভলোভিয়া স্টেশনে মিতিয়া সঙ্গে সঙ্গে শহরে যাবার ডাক গাড়ি বুক করল। আর তখনই হঠাৎ তার খেয়াল

হল প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ঘোড়া যতক্ষণ গাড়িতে জোতা হচ্ছিল সেই সময়ের মধ্যে তার জন্য একটা ওম্‌লেটও তৈরি হয়ে গেল। চক্ষের নিমিষে সে সবটা খেয়ে ফেলল, বিশাল এক টুকরো রুটি—সেটারও সবটা খেয়ে ফেলল, একটা সসেজ পাওয়া যেতে তাও বাদ গেল না, তিন গ্লাস ভোদকা খেল। খাওয়া দাওয়া সেরে চাঙ্গা হওয়ার পর তার মেজাজ হালকা হয়ে গেল, মনের মধ্যে আবার জেগে উঠল আশার আলো। এখন তার উড়ে পথ পাড়ি দেওয়ার মতো মনের অবস্থা, পথে পথে গাড়োয়ানকে অনবরত তাড়া দিয়ে চলল। আর সেই সময়ই, আজকে, আজ সন্ধ্যার আগেই কী করে 'ওই অলুক্ষুনে টাকাগুলো' জোগাড় করা যায় তার এমন একটা নতুন পরিকল্পনা হঠাৎ সে তৈরি করে ফেলল যাকে একেবারে 'মোক্ষম' বলা যেতে পারে। 'ভেবে দেখ, একবার ভেবেই দেখ না, এই তুচ্ছ তিন হাজার টাকার জন্য কিনা একটা মানুষের জীবন নষ্ট হতে বসেছে!' অবজ্ঞা ভরে সে চিৎকার করে উঠল। 'আজই হেস্তনেস্ত করব।' গ্রুশেন্‌কার কথা এবং তার কিছু হল কিনা এই চিন্তা যদি অবিরাম তার মনের মধ্যে ঘুরঘুর না করত তাহলে সে হয়তো আবার হাসিখুশিতে সম্পূর্ণ উচ্ছল হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু গ্রুশেন্‌কার চিন্তাটা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতো অহরহ তার বুকে বিঁধছে।

শেষকালে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুন গেল। মিতিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রুশেন্‌কার কাছে ছুটল।

## তিন

## সোনার খনি

এটা ছিল মিতিয়ার সেই সাক্ষাৎ, মনের মধ্যে অত শঙ্কা নিয়ে গ্রুশেন্‌কা যার কথা রাকিতিনকে বলেছিল। গ্রুশেন্‌কা তখন তার 'জরুরি ডাকের' অপেক্ষায় ছিল। মিতিয়া যে কাল আসে নি এবং আজও আসে নি তাতে সে খুবই খুশি। তার আশা ছিল ঈশ্বরের কৃপায় তার রওনা হওয়ার আগে মিতিয়া সম্ভবত আর আসবে না; কিন্তু মিতিয়া বলা নেই কওয়া নেই হুট করে এসে হাজির। অতঃপর যা যা ঘটেছিল সে সব আমাদের জানা আছে ওর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য গ্রুশেন্‌কা সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌সোনভের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে বলেকয়ে রাজি করাল। সেখানে নাকি 'টাকাপয়সা গোনার জন্য' তার যাওয়াটা ভীষণ দরকার। মিতিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গে করে তাকে সেখানে পৌঁছে দিতে কুজ্‌মার বাড়ির গেটের সামনে এসে গ্রুশেন্‌কা তার কাছ থেকে বিদায় নিল এবং এই কথা আদায় করে নিল যে মিতিয়া রাত বারোটার সময় তাকে নিতে আসবে, সেখান থেকে ফের তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। এই ব্যবস্থাতেও মিতিয়া খুশি। মনে মনে ভাবল 'কুজ্‌মার কাছে যখন বলছে, তার মানে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে যাবে না...' তবে তৎক্ষণাৎ এটাও

যোগ করল যে 'অবশ্য যদি মিথ্যে কথা না বলে থাকে।' কিন্তু তার চোখে মনে হয়েছিল মিথ্যে বলছে না।

মিতিয়া এক বিচিত্র ধরনের ঈর্ষাকাতর মানুষ। তার প্রিয় নারীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঠিক মুহূর্তটিতে সে নারী যে এখন কী করতে পারে, কী কী ভাবে তাকে 'ছলনা' করতে পারে, তার মনের মধ্যে এমন অদ্ভুত ও ভয়াবহ কত যে ভাবনার উদয় হতে পারে তা ভগবান জানেন। তার প্রণয়িণী যে এই ফাঁকে ছলনা করেছে এ বিষয়ে যখন সে দৃঢ় নিশ্চিত এবং তার এই ধারণা যে আর পাল্টানোর নয়—এই যখন তার মনের অবস্থা, যখন সে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত, ম্রিয়মাণ, তখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে আবার সে তারই কাছে ছুটে আসছে, তার আনন্দ উচ্ছ্বাসময়, মধুমাখা হাসি-হাসি মুখচন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই, মুহূর্তের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে, তৎক্ষণাৎ ঘুচে যাচ্ছে তার সমস্ত সন্দেহ; সে তখন তার এই ঈর্ষাকাতরতার জন্য মনে মনে লজ্জাবোধ করছে, লজ্জাবোধের জন্য মনে মনে আনন্দ পাচ্ছে, নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে।

গ্রুশেন্‌কাকে ছেড়ে আসার পর সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ছুটল। ইশ্, তার সামনে এত কাজ পড়ে রয়েছে যে আজকের মধ্যে সব সেরে উঠতে পারলে হয়! কিন্তু সে যাই হোক, তার বুক থেকে অন্তত একটা বোঝা নেমে গেছে। 'এখন শুধু একবার তাড়াতাড়ি করে স্মের্দিকোভের কাছ থেকে জেনে নিতে হয় গতকাল সন্ধ্যাবেলায় ওখানে কিছু ঘটেছিল কিনা, কে জানে, বাপু, গ্রুশেন্‌কা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে এসেছিল কিনা! ওঃ!' এ চিন্তাটা বিদ্যুৎচমকের মতো তার মাথায় ঝলক দিয়ে উঠল। ফলে এক ছুটে বাড়িতে পৌঁছে যাবে কি, তার আগেই আবার তার বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ঈর্ষা! 'ওথেলো ঈর্ষাপরায়ণ ছিল না, সে ছিল বিশ্বাসপ্রবণ', এটা পুশ্‌কিনের মন্তব্য”। এই একটি মন্তব্যই আমাদের মহাকবির অসাধারণ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করছে। ওথেলোর ক্ষেত্রে স্রেফ যেটা হয়েছিল তা এই যে তার মনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু তার 'আদর্শের মৃত্যু ঘটেছে'। কিন্তু ওথেলো তাই বলে আড়ালে গা ঢাকা দেবে না, গোয়েন্দাগিরি করতে যাবে না, এখানে ওখানে উঁকি ঝুঁকি মারতে যাবে না সে বিশ্বাসপ্রবণ। ছলনার ব্যাপারটা যাতে অন্তত সে অনুমান করতে পারে, অনেক ঠেলাঠেলির পর, অনেক কষ্টে তাকে উত্তেজিত করে সেই পথে নামানো সম্ভব হয়েছিল। যারা আসল ঈর্ষাপরায়ণ তারা এরকম হয় না। বিবেকের এতটুকু দংশন না করে, লাজলজ্জার কোনো বালাই না রেখে একজন ঈর্ষাপরায়ণ লোকের নৈতিক অধঃপতন যে কতদূর হতে পারে তা ধারণায় আনা যায় না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তাদের মন কেবলই নীচতা ও নোংরামির আধার। তা ত নয়ই, বরং তারা উন্নতহৃদয়, দেখা গেছে তাদের প্রেম ছিল বিশুদ্ধ,

প্রেমের জন্য তারা আত্মত্যাগও করেছে। আবার সেই একই সঙ্গে কিন্তু টেবিলের তলায় গিয়ে লুকানো, অতি নীচাশয়দের উৎকোচে বশীভূত করা এবং গোয়েন্দাগিরি বা আড়ি পাতার মতো জঘন্য নোংরা কাজে প্রবৃত্ত হওয়াও সম্ভব।

ওথেলো বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে কোনোমতে আপস করতে পারত না—এই নয় যে ক্ষমা করতে পারত না—যা পারত না সেটা হল আপস করা, যদিও তার মনে বিদ্বেষের কোনো জ্বালা ছিল না, সে ছিল একটা ছোট শিশুর মতোই নিষ্পাপ। একজন যথার্থ ঈর্ষাপরায়ণের বেলায় যা হয়ে থাকে এখানে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কোনো কোনো ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ যে কতদূর যেতে পারে কত দূর পর্যন্ত আপস করতে পারে এবং তাদের পক্ষে যে কী কী ক্ষমা করা সম্ভব তা ধারণায় আনা কঠিন। যে মানুষ যত বেশি ঈর্ষাপরায়ণ সে-ই কিন্তু তত তাড়াতাড়ি ক্ষমাও করতে পারে—এ কথা সব নারীরই জানা আছে। একজন ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ হয়তো—অবশ্য বলাই বাহুল্য, গোড়ায় তুলকালাম কান্ড বাধানোর পর—তার প্রিয় নারীর ব্যভিচারকে ক্ষমাও করে দিতে পারে, যেমন যে ব্যভিচার প্রায় প্রমাণিত হয়ে গেছে, যার প্রমাণস্বরূপ আলিঙ্গন ও চুম্বনের দৃশ্যও সে স্বচক্ষে দেখেছে তাও সে ক্ষমা করে দিতে পারে— একমাত্র তখনই পারে যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনোমতে তার মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় যে যা ঘটে গেছে তা 'এই শেষবারের মতো' এবং যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুহূর্তে সেখান থেকে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়, অথবা সে নিজে যদি সেই নারীকে নিয়ে এমন কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে যেখানে ওই ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বীটির আর কখনও আবির্ভাব ঘটবে না। বলাই বাহুল্য, এ আপস নিতান্তই ক্ষণিকের। কারণ এই যে প্রতিদ্বন্দ্বী যদি সত্যি সত্যি অদৃশ্য হয়েও যায় কালই সে নতুন আরেক জন কাউকে উদ্ভাবন করবে এবং সেই নতুন জনের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে। তাহলে মনে হতেই পারে কী আছে সেই ভালোবাসার মধ্যে যাকে এত চোখে চোখে রাখতে হয়, কী মূল্য সেই ভালোবাসার যাকে এত কষ্ট করে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়? কিন্তু কথাটা ত এখানেই—যে ব্যক্তি সত্যিকারের ঈর্ষাপরায়ণ এটাই ত সে কখনও বুঝতে পারবে না! অথচ তাদের মধ্যেও কিন্তু, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এমন লোকজনেরও সাক্ষাৎ মেলে যারা উন্নত হৃদয়ের অধিকারী। এটাও উল্লেখযোগ্য যে উন্নত হৃদয়ের অধিকারী এই লোকগুলি নিজেরাও আবার যখন কোনো চোরা কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে আড়ি পাতে, গোয়েন্দাগিরি করে তখন তারা স্বেচ্ছায় যে অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়েছে তা যে কতদূর লজ্জার তাদের 'উন্নত মন দিয়ে' যদিও সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারে, তবু আপাতত যখন চোরা কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্তত সেই মুহূর্তটিতে বিবেকের দংশন তারা অনুভব করে না।

গ্রুশেন্কাকে দেখামাত্র মিতিয়ার ঈর্ষা কেটে যেত, মুহূর্তের মধ্যে সে বিশ্বাসপ্রবণ

ও উদার হয়ে পড়ত, এমনকি নিজের বিশ্রী অনুভূতির জন্য সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কারও দিত। কিন্তু এর অর্থ শুধু এটাই যে ওই নারীর প্রতি মিতিয়ার যে ভালোবাসা তার মধ্যে, সে নিজে যা মনে করত তার চেয়েও অনেক উঁচুদরের কিছু একটা ছিল। সেটা নিছক অদ্ভুত একটা কিছু নয়, বা আলিয়োশার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তার অঙ্গে অঙ্গে যে 'প্যাঁচের' উল্লেখ সে করেছিল একমাত্র তা-ই নয়। কিন্তু এও ঠিক যে গ্রুশেন্‌কা চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিতিয়ার মনের মধ্যে আবারও এই সন্দেহ বাসা বাঁধতে শুরু করত যে সে অত্যন্ত হীন প্রকৃতির এবং কুটিল উপায়ে তাকে প্রতারণা করছে। এক্ষেত্রে কিন্তু বিবেকের এতটুকু দংশন সে অনুভব করত না।

কাজেই ঈর্ষা তার মধ্যে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যাই হোক না কেন, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হয়। প্রথম কাজ হল যৎসামান্য হলেও অন্তত কিছু টাকা আপাতত ধার চাই। গতকালের নয় রুবলের প্রায় সবটাই যাতায়াতের পেছনে চলে গেছে। এ কথা কে না জানে যে একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কোথাও এক পাও ফেলা সম্ভব নয়। তবে সে যখন গাড়িতে ছিল তখনই তার নতুন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য কোথায় ধার যেতে পারে তাও মনে মনে ভেবে রেখেছিল। তার কাছে কার্তুজসমেত একজোড়া ভালো ডুয়েল লড়ার পিস্তল ছিল। আজ পর্যন্ত ওগুলো সে কখনও বন্ধক রাখে নি, কারণ তার কাছে আর যা জিনিস ছিল সেগুলোর মধ্যে ওই দুটো তার সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

'মহানগর' হোটেলে বেশ কিছুকাল আগে এক অল্পবয়সি সরকারি আমলার সঙ্গে অল্প স্বল্প পরিচয় তার হয়েছিল। হোটেলেই সে কী করে যেন জানতে পারে যে রীতিমতো স্বচ্ছল, অকৃতদার এই লোকটির অস্ত্রশাস্ত্রের দারুণ শখ আছে। পিস্তল রিভল্‌ভার ছোরা ইত্যাদি কিনে তার বাড়ির দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, পরিচিত কেউ এলে তাকে দেখায়, এই নিয়ে গর্ব করে, রিভল্‌ভারের কারিগরির সে একজন মস্ত বোদ্ধা, কী ভাবে গুলি ভরতে হয়, গুলি ছুড়তে হয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সে ভালোই বোঝে। এই নিয়ে আর বেশিক্ষণ ভাবনাচিন্তা না করে মিতিয়া তৎক্ষণাৎ তার কাছে চলে গেল, পিস্তল দুটো দশ রুবলের বিনিময়ে বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিল। লোকটা খুশি হয়ে একেবারে বিক্রি করে দেবার জন্য মিতিয়াকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু মিতিয়া রাজি হল না। কাজেই সে তাকে দশটা রুবল দিল, তবে এও জানিয়ে দিল যে সুদ সে কোনো মতেই নেবে না। তারা বন্ধুভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

মিতিয়ার তাড়া ছিল। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়ির দিকে, বাড়ির পিছন দিকের উঠোনে তার নিজের সেই উদ্যান গৃহটির দিকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্মের্দিকোভ্‌কে ডেকে পাঠানো দরকার। কিন্তু এই ভাবে আবারও যা দাঁড়াচ্ছে তা এই যে এরপর যে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটির কথা আমি বলব সেটা ঘটার মাত্র

তিন চার ঘণ্টা আগেও মিতিয়ার কাছে একটি কপর্দকও ছিল না এবং সে দশ রুবলে তার প্রিয় জিনিস বন্ধক দিয়েছিল, এদিকে তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ করে তার হাতে কয়েক হাজার এসে গেল। কিন্তু এটা আবার আমার আগ বাড়িয়ে বলা হয়ে যাচ্ছে।

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের প্রতিবেশিনী, জীর্ণদশাগ্রস্ত বসতবাড়ির কর্ত্রীর মেয়ে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নার কাছ থেকে স্মের্দিকোভের অসুস্থতার যে সংবাদ তার জন্য অপেক্ষা করছিল তাতে সে রীতিমতো বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গেল। মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরে তার পা হড়কে পড়ে যাওয়া, তারপর তার মূর্ছারোগের প্রকোপ, ডাক্তারের আগমন, ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের উদ্বেগ— এ সব ঘটনাই সে শুনল। দাদা ইভান ফিয়োদরভিচ যে ওই দিন সকালেই মস্কো চলে গেছে একথা জানতে পেরেও সে কৌতূহল বোধ করল। ভাবল, 'দেখা যাচ্ছে, আমার আগে ভলোভিয়ার ওপর দিয়ে চলে গেছে।' তবে তাকে ভয়ানক দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল স্মের্দিকোভ্। 'এখন তা হলে কী হবে? কে নজরদারি করবে? কে আমাকে জানাবে?' ওই মহিলাদের ধরেই ব্যাকুল হয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানার চেষ্টা করতে লাগল গতকাল সন্ধ্যাবেলায় তারা চোখে পড়ার মতো কিছু দেখেছে কিনা। তারা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল সে আসলে কী জানতে চায়। তাকে এই বলে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করল যে কাউকে দেখা যায় নি, রাতে থাকার মধ্যে ছিল ইভান ফিয়োদরভিচ, 'সব দস্তুরমতো ঠিকঠাক ছিল'। মিতিয়া চিন্তায় পড়ে গেল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আজও নজর রাখা দরকার। কিন্তু সেটা কোথায়?— এখানে, না সাম্‌সোনভের বাড়ির গেটের কাছে? সে ঠিক করল এখানে ওখানে দু জায়গাতেই নজর রাখতে হবে। তার বিচারবিবেচনায় তা-ই বলে। কিন্তু আপাতত, আপাতত... কথাটা এই যে আপাতত তার সামনে রয়েছে এখনকার এই নতুন 'পরিকল্পনাটা'। একেবারে মোক্ষম পরিকল্পনা— গাড়িতে আসতে আসতে সে ভেবে রেখেছে। সেটা হাসিল করা দরকার, আর ফেলে রাখা সম্ভব নয়। মিতিয়া ঠিক করল এর পেছনে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করবে। 'এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলব, সব জেনে নিতে হবে। তাহলে, তাহলে প্রথমে যেতে হয় সাম্‌সোনভের বাড়িতে। জানতে হবে গ্রুশেন্‌কা সেখানে আছে কিনা। তারপর পলকের মধ্যে ফিরে আসতে হবে এখানে। এগারোটা অবধি এখানে থাকব। তারপর গ্রুশেন্‌কাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য ওকে আনতে ফের সাম্‌সোনভের কাছে যাব।' এরকমই সে স্থির করল।

সে দ্রুত বাড়ি চলে গেল। হাতমুখ ধুল, চুল আঁচড়াল, বুরুশ দিয়ে আঙরাখাটা সাফ করল, জামাকাপড় পরে মাদাম খখ্‌লাকোভার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। হায়, এই মহিলার ওপর ভরসা করেই কিনা তার 'পরিকল্পনা'! ঠিক করেছে তার কাছ থেকে তিন হাজার রুবল ধার নেবে। আর বড় কথা এই যে হঠাৎ, কেমন যেন আচম্বিতে, তার মনের মধ্যে এই অসাধারণ দৃঢ় বিশ্বাস দেখা দিয়েছে যে মহিলা

তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। লোকে হয়ত এই ভেবে অবাক হতে পারে যে তার যদি এতই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহলে কেন আগে থাকতে এখানে— যাকে বলা যেতে পারে তার নিজের সমাজ— সেখানে না এসে সে গেল সাম্‌সোনভের কাছে, যে লোকটা একেবারে ভিন্ন গোত্রের, যার সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় সেটা পর্যন্ত তার জানা ছিল না। কিন্তু ঘটনা এই যে গত এক মাসে খখ্‌লাকোভার সঙ্গে তার জানাশোনার পাট বলতে গেলে পুরোপুরি উঠে গেছে, অবশ্য আগেও যে খুব একটা জানাশোনা ছিল তাও নয়। তাছাড়া সে বেশ ভালোভাবেই জানে খখ্‌লাকোভা নিজেও তাকে বরদাস্ত করতে পারে না। একেবারে শুরু থেকেই তার প্রতি মহিলার নিদারুণ বিদ্বেষ, স্রেফ এই কারণে যে সে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাগ্‌দত্ত প্রেমিক, এদিকে খখ্‌লাকোভার হঠাৎই কেন যেন সাধ হয়েছিল কাতেরিনা ইভানভ্‌না যেন মিতিয়াকে ছেড়ে দিয়ে 'একজন খাঁটি বীরপুরুষের মতো ধীর ও উদাত্ত, আচার ব্যবহারে মার্জিত ও মধুর স্বভাবের ইভান ফিয়োদরভিচকে' বিয়ে করে। মিতিয়ার আচার আচরণ তার দু চক্ষের বিষ। মিতিয়া তাকে নিয়ে হাসাহাসি পর্যন্ত করে, একবার ত তার সম্পর্কে এমন মন্তব্যও করেছিল যে এই ভদ্রমহিলা 'যতটা অমার্জিত ততটাই জীবন্ত ও গায়ে পড়া গোছের।' তা, সেদিন সকালে গাড়িতে বসে বসে একটা অসাধারণ চিন্তা মিতিয়ার মাথায় খেলে গেল 'আমি কাতেরিনাকে বিয়ে করি এতে যখন তার এতই অনিচ্ছা, সেই অনিচ্ছার মাত্রা যখন এতটাই'—মিতিয়া জানে যে ওই প্রসঙ্গ উঠলে ভদ্রমহিলার অবস্থা প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হয়ে ওঠে—'তাহলে এখন এই তিন হাজারের ব্যাপারে আমাকে তার বিমুখ করার কী থাকতে পারে, বিশেষত যখন এই টাকাটা নিয়ে আমি কাতিয়াকে ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য এখান থেকে সরে পড়তে পারি? বড় ঘরের এই আদরে নষ্ট হয়ে যাওয়া মহিলারা যখন কোনো কিছু চাই বলে জেদ ধরে বসে থাকে তখন তাদের সেই খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তারা হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। তা ছাড়া ইনি আবার বেজায় বড়লোক।' এই ছিল মিতিয়ার যুক্তি।

'পরিকল্পনার' কথা যদি বলতে হয় সেটা ছিল সেই আগেরটারই মতো। অর্থাৎ, চের্‌মাশ্‌নিয়ার ওপর তার নিজের যে অধিকার আছে সেটা মহিলাকে দেবার প্রস্তাব, তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়—গতকাল সাম্‌সোনভের বেলায় যেটা সে করেছিল। তিন হাজারের বদলে দ্বিগুণ বড়ো অঙ্কের টাকা—ছয়-সাত হাজার বাগানোর সম্ভাবনার যে লোভ গতকাল সাম্‌সোনভ্‌কে সে দেখিয়েছিল একে সেই লোভ না দেখিয়ে স্রেফ ঋণের পরিবর্তে ভদ্রগোছের একটা গ্যারাণ্টি হিসেবে প্রস্তাবটা দিতে হবে। মিতিয়া তার এই নতুন চিন্তাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে তুলতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। অবশ্য তার যে কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে, যে কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বরাবর এরকম প্রতিক্রিয়াই তার হয়ে থাকে। তার যে কোনো নতুন চিন্তা তাকে আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও মাদাম খখ্‌লাকোভার

বাড়ির দেউড়ির ধাপে যখন সে পা রাখল তখন আতঙ্কে তার মনে হচ্ছিল তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন আচমকা একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। এই একটিমাত্র মুহূর্তেই সে পরিপূর্ণ ভাবে এবং একেবারে গাণিতিক নিয়মের মতো স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারল এটাই তার শেষ আশাভরসাস্থল, এটা যদি বানচাল হয়ে যায় তা হলে 'ওই তিনশ রুবলের জন্য কাউকে খুন করা এবং কারও ওপর লুটতরাজ করা ছাড়া' এই দুনিয়ায় তার আর কিছু করার থাকছে না। দরজায় যখন সে ঘণ্টি বাজাল তখন সাড়ে সাতটা।

তার আগমনবার্তা ঘোষিত হতে না হতে অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে যে ভাবে তাকে গ্রহণ করা হল তাতে প্রথমে মনে হয়েছিল ভাগ্য বুঝি তার প্রতি প্রসন্ন। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন আমারই অপেক্ষায় ছিল', মিতিয়ার মাথার মধ্যে ঝলক দিল। এর পর তাকে যখন সবে বসার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে এমন সময় বাড়ির কর্ত্রী নিজেই প্রায় প্রায় ছুটে এসে সেখানে ঢুকল এবং সরাসরি ঘোষণা করল যে সে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল।

"অপেক্ষা করছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম! জানেন, আমি কিন্তু ভাবতেও পারি নি যে আপনি আসবেন, আপনি নিজেও সেটা মানবেন। অথচ দেখুন, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার সহজাত বোধের পরিচয় পেয়ে আপনি অবাক হয়ে যাবেন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। সারাটা সকাল আমি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম যে আপনি আজ আসবেন।"

"এটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের মাদাম", বস্তার মতো ধপ্ করে বসে পড়ে মিতিয়া বলে উঠল! "কিন্তু আমি এসেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে যতদূর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সে রকম একটা কাজে অর্থাৎ কিনা মাদাম আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ— একমাত্র একা আমারই পক্ষে আমার বড়ো তাড়া

"জানি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নিয়েই এসেছেন। এর মধ্যে আগে থাকতে মনে মনে টের পাবার কোনো ব্যাপার নেই, এটা বোঝার জন্য পিছিয়ে গিয়ে অলৌকিকতার ভেতরে ঢোকারও কোনও প্রয়োজন নেই। মহাস্থবির জোসিমার কথা শুনেছেন ত? এখানে, এখানে যা আছে তা স্রেফ গণিতের হিসাব কাতেরিনা ইভানভ্‌নার জীবনে এই যে এত কিছু ঘটে গেল তার পর আপনি না এসে পারতেন না। পারতেন না, পারতেন না, পারতেন না একেই বলে গণিতশাস্ত্র।"

"প্রকৃত জীবনের বাস্তবতা, মাদাম। এ ছাড়া আর কী বলব! তবে সে যা-ই হোক, আপনি যদি অনুমতি দেন ত নিবেদন করি

"বাস্তবতা— ঠিক তাই, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আমি এখন পুরোদস্তুর বাস্তবতার পক্ষে। অলৌকিকতার ব্যাপারে আমাকে বড্ড বেশি শেখানো পড়ানো হয়েছে। মহাস্থবির জোসিমা মারা গেছেন, আপনি শুনেছেন কি?"

“না মাদাম, এই প্রথম শুনছি।” মিতিয়াকে খানিকটা অবাক হতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলিয়োশার চেহারাটা তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

“আজ রাতে। ভাবুন একবার

“মাদাম”, তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মিতিয়া বলল, “আমি শুধু এটাই ভাবতে পারি যে আমি একটা নিদারুণ হতাশার মধ্যে আছি এবং আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে সব রসাতলে যাবে, সর্বপ্রথম যাব আমি। যে রকম মামুলি ভাবে আমি কথাটা প্রকাশ করলাম তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু কী করব বলুন? আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি, ঘোর বিকারের মধ্যে আছি...”

“জানি, জানি আপনি ঘোর বিকারের মধ্যে আছেন। এছাড়া অন্য কোনো অবস্থা আপনার মনের হতে পারে না। আপনি যে কথাই বলুন, সব আমি আগে থাকতে জানি। আপনার ভাগ্য আমি অনেক দিন হল আমার চিন্তাভাবনার মধ্যে রেখেছি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আমি তার ওপর নজর রাখছি, তাই নিয়ে চর্চা করছি আহা, বিশ্বাস করুন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, আমি একজন মনের ডাক্তার, অভিজ্ঞ ডাক্তার।”

“তা মাদাম, আপনি যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার হন তাহলে আমি একজন অভিজ্ঞ রোগী”, সাধ্যাতীত বিনয় প্রকাশ করে মিতিয়া বলল, “এবং আমার মন বলছে, আপনি যখন আমার ভাগ্যের ওপর এতই নজর রাখছেন তাহলে আমার ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় উদ্ধার পেতেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। তবে এর জন্য, আপনি অনুমতি দিলে, শেষকালে আপনার সামনে আমি আমার পরিকল্পনাটা খুলে বলতে পারি। ওটা নিয়েই আমি আপনার সামনে উপস্থিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছি... এবং এটাই আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা আমি এসেছি মাদাম

“খুলে বলার কিছু নেই। ওটা গৌণ। আর সাহায্যের কথা যদি বলেন, এমন তো নয় যে আপনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি সাহায্য করছি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্। আপনি সম্ভবত আমার জ্ঞাতি সম্পর্কের বোন বেল্‌মেসভার কথা শুনে থাকবেন। তার স্বামী ধ্বংস হতে বসেছিল— আপনার ভাষায়, ‘রসাতলে যাচ্ছিল’, যে কথাটির মধ্য দিয়ে আপনি এ অবস্থার সঠিক চরিত্রটি নির্ধারণ করেছেন, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আমি তাকে অশ্বপ্রজননের কারবারে নামতে বললাম, এখন তার রমরমা অবস্থা। অশ্বপ্রজনন সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ?”

“বিন্দুমাত্র নেই মাদাম। ওঃ মাদাম, বিন্দুমাত্র নেই!” অসহিষ্ণু হয়ে স্নায়বিক উত্তেজনাবশত চেঁচিয়ে উঠল মিতিয়া, এমনকি চেয়ার ছেড়ে উঠেও পড়তে যাচ্ছিল। “আপনার কাছে আমার কেবল এইটুকুই মিনতি মাদাম, আমার কথাটা একটু শুনুন, স্বচ্ছন্দে কথা বলার মতো শুধু দুটি মিনিট সময় আমাকে দিন যাতে যে পরিকল্পনা নিয়ে আমার এখানে আসা, তার সব কিছু আমি সর্বাগ্রে আপনাকে খুলে বলতে পারি। তা ছাড়া সময় আমার কাছে দরকারি। আমার বড়ো তাড়া আছে!

খখ্লাকোভা এখুনি আবার কথা বলতে শুরু করবে এটা উপলব্ধি করে এবং পাল্টা চিৎকারে তাকে বসিয়ে দিতে পারবে এই ভরসায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে বলল মিতিয়া। "আমি হতাশাগ্রস্ত, হতাশার একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে আপনার কাছে এসেছি তিন হাজার রুবল ধার চাইতে। ধার, তবে বিশ্বাসযোগ্য, খুবই বিশ্বাসযোগ্য একটা বন্ধক রেখে, মাদাম। অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য একটা গ্যারান্টির বিনিময়ে! কেবল আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে দিন

"আহা, এ সবই হবে, পরে হবে!" খখ্লাকোভা তার পালা আসতে হাত নেড়ে মিতিয়াকে চুপ থাকতে বলে মন্তব্য করল। "তাছাড়া আপনি যা যা বলতে পারেন সে সবই আমার আগে থাকতে জানা আছে—এ কথা তো আমি আপনাকে বলেইছি। আপনার কত যেন টাকা চাই বললেন, তিন হাজার দরকার আপনার, তা আমি আপনাকে তার চাইতে বেশি দেব, অগুনতি পরিমাণ বেশি দেব, আমি আপনাকে উদ্ধার করব, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। কিন্তু আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে!"

মিতিয়া আবার জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করল।

"সত্যিই আপনার এত দয়া, মাদাম!" প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিতিয়া। "ভগবান, আপনি আমাকে বাঁচালেন! পিস্তলের গুলি থেকে, অপমৃত্যু থেকে একজন মানুষকে আপনি উদ্ধার করছেন মাদাম আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ

"আমি আপনাকে তিন হাজারের চাইতে অগুনতি পরিমাণ বেশি, অফুরান টাকা দেব!" মাদাম খখ্লাকোভা চিৎকার করে বলল। মিতিয়ার উৎফুল্ল ভাব দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

"অগুনতি? কিন্তু না, অতটা আমার দরকার নেই। আমার যা একান্ত দরকার তা কেবল ওই তিন হাজার, যার ওপর নির্ভর করছে আমার ভাগ্য। আমি আমার তরফ থেকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ওই পরিমাণ অর্থের জন্য আপনাকে গ্যারান্টি দিতে এসেছি, আমি আপনাকে একটা পরিকল্পনার প্রস্তাব দিচ্ছি যা

"অনেক হয়েছে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, যেমন বলা তেমনি কাজ।" তাকে থামিয়ে দিল মাদাম খখ্লাকোভা। কণ্ঠস্বরে একজন উপকারী মানুষের চাপা উল্লাসের ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলল, "আমি কথা দিয়েছি আপনাকে উদ্ধার করব, ঠিকই উদ্ধার করব। বেল্‌মেসভ্‌কে যে ভাবে করেছিলাম সেই ভাবে করব। আচ্ছা, সোনার খনি সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ?"

"সোনার খনির কথা বলছেন মাদাম? ও নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি।"

"তাহলেই দেখুন, আপনার হয়ে ওই নিয়ে আমি কিন্তু ভেবেছি! ভেবেছি, বারবার নানা ভাবে ভেবে দেখেছি! এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আজ পুরো এক মাস হল আপনার ওপর নজর রেখে যাচ্ছি। আপনি যখন পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেছেন তখন একশবার আপনাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি আর বারবার নিজের মনে

বলেছি: হ্যাঁ এই একজন উদ্যোগী পুরুষ ইনিই তো সোনার খনির সন্ধানে যাবেন। আমি আপনার হাঁটাচলা পর্যন্ত লক্ষ করে দেখেছি, তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই মানুষটি অনেক সোনার খনির সন্ধান পাবে।"

"হাঁটাচলা দেখে বলছেন, মাদাম?" মিতিয়া মৃদু হাসল

"হাঁটাচলা দেখেও বৈ কি। মানুষের হাঁটাচলার ভঙ্গি থেকে যে তার চরিত্র জানা যেতে পারে এটা কি আপনি অস্বীকার করতে চান দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ? বিজ্ঞানও কিন্তু এটাই সমর্থন করছে। আমি কিন্তু এখন পুরোপুরি বাস্তববাদী দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। মঠে যা সব কাণ্ডকারখানা হল তাতে আমার মন মেজাজ এত বিগড়ে গেছে যে সে সবের পর আজ থেকে আমি দস্তুরমতো বাস্তববাদী হয়ে গেছি, আমি ব্যাবহারিক কাজের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। আমার অসুস্থতা সেরে গেছে। 'অনেক হয়েছে!'— যেমন বলেছিলেন তুর্গেনেভ্।"

"কিন্তু মাদাম্, সেই তিন হাজার, যা আপনি অমন মহানুভবতা দেখিয়ে আমাকে ধার দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন

"আপনি ফাঁকে পড়বেন না, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে মাদাম খখ্‌লাকোভা বলে উঠল। "ওই তিন হাজার, ধরে নিতে পারেন, আপনার পকেটে এসে গেছে— তিন হাজার কেন, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, তিরিশ লক্ষ, অতি শীঘ্রই এসে যাচ্ছে। আমি আপনাকে আপনার আইডিয়াটা বলব আপনি সোনার খনি খুঁজে বার করবেন, কোটি কোটি টাকা উপার্জন করবেন, ফিরে এসে একজন কর্মবীর হয়ে বসবেন, আমাদেরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন, কল্যাণের পথে আমাদের পরিচালনা করবেন। আপনি দালানকোঠা বানাবেন, নানারকম উদ্যোগ গড়ে তুলবেন। ওই ইহুদিগুলোর হাতে সব ছেড়ে দিতে হবে নাকি? আপনি গরিবদের সাহায্য করবেন, তারা আপনাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ জানাবে। আজকের যুগ রেলপথের যুগ, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আপনি নাম করবেন, অর্থমন্ত্রকের একজন অপরিহার্য লোক হয়ে দাঁড়াবেন। আজকের দিনে এরকম একজন লোকের সেখানে বড্ড অভাব। রুবল যে হারে পড়ে যাচ্ছে তাতে আমার চোখের ঘুম চলে গেছে, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আমার এই দিকটি কম লোকেই জানে "

"মাদাম, মাদাম!" কীসের যেন একটা আশঙ্কা বুকে অস্বস্তিভরে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ আবার তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল। আমি আপনার উপদেশ, আপনার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সম্ভবত, অবশ্য, অতি অবশ্যই মেনে চলব, মাদাম এবং... হয়ত যাত্রাও করব ওখানে ওই সোনার খনির সন্ধানে আরও একবার এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আসবও এমনকি অনেকবার আসব... কিন্তু এখন ওই তিন হাজার, যা আপনি অমন দিলদরাজ হয়ে ওঃ ওটা পাওয়া গেলে আমি বন্ধনমুক্ত হতে পারতাম এবং সম্ভব হলে আজই অর্থাৎ, দেখুন, আমার এখন এক মুহূর্তও সময় নেই, নষ্ট করার মতো এক মুহূর্তও নেই "

"হয়েছে, অনেক হয়েছে, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ!" নাছোড়বান্দার মতো জোর করে তাকে থামিয়ে দিল মাদাম খখ্‌লাকোভা। "প্রশ্নটা হল সোনার খনির সন্ধানে আপনি যাচ্ছেন কি যাচ্ছেন না, আপনি পুরোপুরি মনস্থির করেছেন কিনা — গণিতের হিসাবে আমাকে উত্তর দিন— হ্যাঁ, কি না।"

"যাচ্ছি মাদাম, পরে যাচ্ছি যেখানে যেতে বলেন সেখানে যাব, মাদাম কিন্তু আপাতত

"বলি, একটু সবুর করুন!" মাদাম খখ্‌লাকোভা চেঁচিয়ে এই কথা বলে এক লাফে উঠে পড়ে ছুটে গেল তার দেরাজওয়ালা জমকাল লেখার টেবিলটার কাছে। অসংখ্য দেরাজের মধ্য থেকে একটার পর একটা টেনে ভীষণ তাড়াহুড়ো করে কী যেন খুঁজতে লাগল।

'তিন হাজার!' মিতিয়ার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। সে ভাবল, 'আর সেটা কিনা এই এখুনি এসে যাবে কোনো রকম কাগজপত্র, কোনো লেখাপড়া ছাড়াই!... আহা, এই না হলে ভদ্রলোকের মুখের কথা! দারুণ মহিলা কিন্তু, তবে কিনা এতটা বাচাল যদি না হত

"এই যে!" মিতিয়ার কাছে ফিরে আসতে আসতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মাদাম খখ্‌লাকোভা। "এই যে এটাই খুঁজছিলাম!"

যেটা খুঁজে পেতে বার করল সেটা ছিল ছোট্ট এক রত্তি একটা রুপোর বিগ্রহ, ডুরি দিয়ে বাঁধা, যেমনটা গলায় ঝুলিয়ে রাখা ক্রুসের সঙ্গে লোকে অনেক সময় পরে থাকে।

"এটা কিয়েভ্ থেকে আনা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", পরম শ্রদ্ধাভরে সে বলে চলল, "পবিত্র শহিদ পরমা প্রকৃতি ভার্‌ভারার পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন। আসুন, আপনার অনুমতি হোক, আমি নিজের হাতে এটা আপনার গলায় পরিয়ে দিই এবং সেই সঙ্গে নতুন জীবনের পথে যেন নব নব কীর্তিসাধন করতে পারেন এই আশীর্বাদ জানাই।"

বলতে বলতে সত্যি সত্যিই বিগ্রহটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সেটা ঠিকঠাক করে দিতে গেল। মিতিয়া বড়ই বিব্রত বোধ করতে লাগল। সে ঝুঁকে পড়ে মহিলাকে সাহায্য করতে লাগল। অবশেষে নেকটাই আর জামার কলারের ওপর দিয়ে গলিয়ে ঠিকমতো বুকের ওপর ঝোলানো হল।

"বেশ, এবারে আপনি যেতে পারেন!" এই বলে মাদাম খখ্‌লাকোভা গুরুগম্ভীর ভাবে আবার তার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

"মাদাম, আমি এতই অভিভূত আমার প্রতি আপনার এই অনুভূতির জন্য... কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব তাও জানি নে, কিন্তু ... আপনি যদি জানতেন, আমার কাছে এখন সময়ের দাম কতটা। সেই টাকাটা, যার জন্য আমি আপনার মহানুভবতার কাছে এত প্রত্যাশা করে আছি ওঃ মাদাম, আপনার যদি এতই

দয়া, আমার জন্য আপনার উদার হৃদয় যদি এতই কাতর হয়ে থাকে...” হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় মিতিয়া বলে উঠল, “তাহলে আমাকে আপনার কাছে প্রকাশ করতে দিন অবশ্য আপনি বহুকাল হলই জানেন আমি এখানে একজনকে ভালোবাসি

আমি কাতিয়ার সঙ্গে, মানে, বলতে চাই, কাতেরিনা ইভানভ্নার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছি। ও তার সঙ্গে আমি ইতরের মতো আচরণ করেছি, অসাধু আচরণ করেছি। কিন্তু এখানে আমি অন্য একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি... অন্য এক নারীকে, মাদাম যাকে আপনি সম্ভবত ঘেন্না করেন, কারণ আপনি ইতিমধ্যেই সব অবগত আছেন। কিন্তু তাকে আমি কোনোমতে ফেলতে পারি না, কোনোমতেই না, আর এই কারণেই এখন ওই তিন হাজার

“ছাড়ুন দেখি ওসব, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্!” রীতিমতো দৃঢ়স্বরে তাকে বাধা দিল মাদাম খখ্‌লাকোভা। “ছাড়ুন—বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের। আপনার লক্ষ্য—সোনার খনি, ওখানে স্ত্রীলোকদের নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। পরে যখন আপনি ধনসম্পদ ও যশগৌরব নিয়ে ফিরে আসবেন তখন আপনি সমাজের একেবারে ওপর মহলে আপনার জীবন সঙ্গিনী খুঁজে পাবেন। সে মেয়ে হবে অশেষ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্না, আধুনিক ও সংস্কারমুক্ত। নারীর অধিকারের যে প্রশ্নের এখন সূত্রপাত হয়েছে ততদিনে তা ঠিক দানা বেঁধে উঠবে, নতুন নারীর আবির্ভাব ঘটবে।...

“কথাটা তা নয়, মাদাম, তা নয় ” মিতিয়া অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় করতে যাচ্ছিল।

“ঠিক তাই, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, ঠিক যেটা আপনার দরকার, যার জন্য আপনি এত ব্যাকুল, যদিও আপনি নিজেই সেটা জানেন না। নারীর প্রশ্নে আজকের যে আন্দোলন আমি তার বিরোধী নই, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। নারীর বিকাশ, এমনকি অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতিতে তার ভূমিকা—এই হল আমার আদর্শ। আমার নিজেরই মেয়ে আছে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, লোকে আমার সেই দিকটা কমই জানে। আমি এই বিষয়ে লেখক শেচদ্রিনকে[১] একটা চিঠি লিখেছি। এই লেখক আমাকে কত কিছুই না শিখিয়েছেন, নারীর বৃত্তি সম্পর্কে কত সব নির্দেশই না দিয়েছেন! তাই গত বছর আমি তার কাছে বেনামিতে দু ছত্রের একটা চিঠি লিখে পাঠাই ‘হে আমার শিক্ষাগুরু লেখক, আধুনিক নারীর হয়ে আপনাকে আলিঙ্গন করি, চুম্বন করি। চালিয়ে যান।’ আর নিচে লিখি ‘কোনো এক জননী’। লিখতে চেয়েছিলাম ‘সমকালীন জননী’; ইতস্তত করলাম, শুধু জননীই রেখে দিলাম—এর মধ্যে অনেক বেশি নৈতিক সৌন্দর্য আছে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, আর হ্যাঁ ‘সমকালীন’ কথাটা তাঁকে ‘সমকালীন’ পত্রিকার কথা[২] মনে করিয়ে দিতে পারত, যার স্মৃতি, সেন্সরের দরুন তাঁর কাছে অপ্রীতিকর। হা ভগবান, কী হল আপনার?”

“মাদাম!” শেষ কালে লাফিয়ে উঠে অসহায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে মহিলার সামনে

হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মিতিয়া বলে উঠল। “আপনি আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়বেন মাদাম, যদি আপনি ওই কাজটা মুলতুবি রাখেন, যেটা কিনা আপনি অমন দিল দরাজ হয়ে

“তা কাঁদতে হয় কাঁদুন না, কাঁদুন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ! ওটা ত একটা মহৎ অনুভূতি  আপনার সামনে এরকম একটা পথ খোলা! চোখের জলে আপনার মন হাল্‌কা হয়ে যাবে, পরে ফিরে এসে আনন্দ করবেন। ইচ্ছে করে সাইবেরিয়া থেকে ছুটে আসবেন আমার সঙ্গে আনন্দ করার জন্য।

“কিন্তু আমাকেও আপনি মঞ্জুর করুন”, মিতিয়া হঠাৎ হাউমাউ করে উঠল। “এই শেষবারের মতো আপনার পায়ে পড়ছি, যে টাকার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, বলুন, সেটা কি আমি আজ আপনার কাছ থেকে পেতে পারি? আজ যদি না হয় তাহলে ঠিক কবে তা নিতে আসব বলবেন কি?”

“টাকা? কীসের টাকা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ?”

“সেই যে আপনার ওই তিন হাজারের প্রতিশ্রুতি  যা আপনি অমন দিল দরাজ হয়ে

“তিন হাজার? রুবল বলতে চান? আরে না না, তিন হাজার আমার নেই”, কেমন যেন শান্তভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে মাদাম খখ্‌লাকোভা বলল। মিতিয়া স্তম্ভিত।

“সে কী! আপনি এখনই  এইমাত্র  আপনি বললেন  এমন কথাও বললেন যে ধরে নিতে পারি আমার পকেটে এসে গেছে

“আরে না, আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারেননি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। তাই যদি বলেন তাহলে বলব আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি বলছিলাম সোনার খনির কথা।  এটা ঠিক যে আমি আপনাকে আরও বেশি, তিন হাজারেরও বেশি, অগুনতি বেশি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন আমার সব মনে পড়ছে, কিন্তু সে তো শুধু সোনার খনির প্রসঙ্গেই বলেছিলাম।”

“কিন্তু টাকা? তিন হাজার?” আনাড়ির মতো বলে উঠল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ।

“আপনি যদি টাকা বলে ধরে নেন তাহলে বলব তা আমার নেই। আমার এখন একদম টাকা নেই, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। ঠিক এই এখনই আমার নায়েবের সঙ্গে আমার তুলকালাম চলছে। আমি নিজেই এই দিন কয়েক আগে মিউসভের কাছে পাঁচশ রুবল কর্জ করেছি। না, না, টাকা আমার নেই। আর জানেন কি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, যদি থাকতও আমি আপনাকে দিতাম না। প্রথমত ধার আমি কাউকে দিই না। ধার দেওয়া মানেই ঝগড়াঝাটি বাধানো। আর আপনাকে, বিশেষ করে আপনাকে তো দিতামই না, আপনাকে পছন্দ করি বলেই দিতাম না, আপনাকে উদ্ধার করতে চাই বলেই দিতাম না, কারণ আপনার দরকার শুধু একটাই—সোনার খনি, সোনার খনি, সোনার খনি!

"ওঃ চুলোয় যাক! " মিতিয়া হঠাৎ গর্জন করে উঠে সর্বশক্তিতে টেবিলের ওপর ঘুষি মারল।

"উঃ!" ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল খখ্‌লাকোভা, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল ঘরের অপর প্রান্তে।

'ধুত্তোর' বলে মাটিতে থুতু ফেলে মিতিয়া দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আচ্ছন্নের মতো সে পথ চলতে লাগল। চাপড়াতে লাগল বুকের ঠিক সেই জায়গাটা যেখানে সে চাপড় মেরেছিল দু দিন আগে, আলিয়োশার সামনে, যখন শেষবারের মতো সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার রাস্তায় আলিয়োশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। নিজের বুক চাপড়ানো, *বুকের ঠিক এই জায়গাটাতেই* আঘাত করার অর্থ যে কী হতে পারে, এর দ্বারা সে কীই বা দেখাতে চাইছিল সেটা আপাতত, এখনও একটা গোপন রহস্য, যা পৃথিবীতে কারও জানা নেই, যা তখন সে আলিয়োশার কাছে পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করেনি। কিন্তু সেই রহস্যের মধ্যে তার পক্ষে যা নিহিত ছিল তা লজ্জা বা অপমানের চেয়েও বেশি কিছু, এর নিহিতার্থ ছিল ধ্বংস, আত্মহত্যা। এমনটাই সে ঠিক করে রেখেছিল যে বুকের ওপর কলঙ্কের যে বোঝা সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যা ঋণ শোধ করে বুক থেকে, *'বুকের ঠিক সেই জায়গাটি'* থেকে সরাতে গেলে যে তিন হাজার দরকার তা যদি সে জোগাড় করে উঠতে না পারে তাহলে এ ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। পাঠককে এ সমস্তই পরে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে বলা হবে। কিন্তু এখন যখন তার শেষ আশাও অন্তর্হিত হল তখন শারীরিক শক্তিতে এত শক্তিমান এই লোকটি খখ্‌লাকোভার বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ একটা ছোটো বাচ্চার মতো কেঁদে ভাসিয়ে দিল। আচ্ছন্নের মতো পথ চলতে চলতে সে হাতের মুঠোর পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগল। এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে বাজার চত্বরের ওপর এসে পড়ল, এমন সময় অনুভব করল কিছু একটার গায়ে আচমকা তার গোটা শরীরটা সজোরে ধাক্কা খেল। কোন এক বুড়ির খ্যানখ্যানে গলার একটা আর্ত চিৎকার কানে এসে বাজল। বুড়িকে আরেকটু হলেই সে উলটে ফেলে দিয়েছিল।

"ওঃ ভগবান, আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিল! চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? কোথায় পা ফেলছ দেখতে পাও না হতচ্ছাড়া?"

"আরে, এ যে তুমি দেখছি", অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করে বুড়িকে চিনতে পেরে মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

এ ছিল সেই বুড়ি চাকরানি যে সামসোনভের সেবাশুশ্রূষা করত। গতকাল মিতিয়া তাকে ভালো করে দেখে রেখেছিল।

"কিন্তু আপনি কে বটে?" এবারে বুড়ির গলা একেবারে অন্য শোনাল। "অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।"

“তুমি কুজ্‌মা কুজ্‌মিচের বাড়িতে থাক, তার বাড়িতে কাজ কর, তাই তো?”

“ঠিক তাই বাবুমশাই। এখন এই সবে বেরিয়ে প্রোখরিচের কাছে ছুটে যাচ্ছিলাম।... কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না বাপু।”

“তা মাসি, বল তো, আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না কি এখন তোমাদের বাড়িতে আছেন?” উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে মিতিয়া বলল। “কিছুকাল আগে আমি নিজে ওকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে দিয়েছিলাম।”

“ছিল বটে বাবুমশাই। এসেছিল, একটু বসে থেকে চলে গেল।”

“অ্যাঁ? চলে গেছে?” আর্তনাদ করে উঠল মিতিয়া। “কখন গেল?”

“সেই তখনই তো চলে গেল। শুধু মিনিটখানেক আমাদের ওখানে ছিল। কুজ্‌মা কুজ্‌মিচকে একটা গপ্পো শোনাল, তাকে খুব একচোট হাসাল, তারপরই ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।”

“উচ্ছন্নে যাও তুমি, মিথ্যে কথা বলছ!” মিতিয়া গর্জন করে উঠল।

“উঃ!” বুড়ি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে মিতিয়ার চিহ্নমাত্র সেখান থেকে উধাও। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে মরোজভার বাড়ির দিকে ছুটল। গ্রুশেন্‌কা এখানেই থাকত। এটা ছিল ঠিক সেই সময় যখন গ্রুশেনকা মোক্রয়ের পথে পাড়ি দিয়েছে। তার রওনা দেবার পর সিকি ঘণ্টারও বেশি সময় পার হয়নি। ফেনিয়া তার দিদিমা রাঁধুনি মাত্রিয়োনার সঙ্গে রান্নাঘরে বসে ছিল। এমন সময় ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল ‘ক্যাপ্টেন’। তাকে দেখতে পেয়ে ফেনিয়া তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

“চ্যাঁচালেই হল?” মিতিয়া গর্জে উঠল। “কোথায় গেল বল।” কিন্তু আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাওয়া ফেনিয়া জবাবে কিছু বলবে কি, তাকে সে সুযোগ না দিয়ে মিতিয়া আচমকা আছড়ে তার পায়ে গিয়ে পড়ল।

“ফেনিয়া, আমাদের প্রভু খ্রিস্টের দোহাই, বল ও কোথায়।”

“ওগো দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্, বাবু গো, কিছু জানি নে, কিছুই জানি নে। মারো আর কাটো, কিচ্ছু জানি নে”, দিব্যি গেলে, শপথ করে ফেনিয়া বলতে লাগল। “আপনি নিজেই তো তখন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন”

“সে ফিরে এসেছে!

“আসেনি গো বাবু, ভগবানের দিব্যি, আসেনি!”

“মিছে কথা!” মিতিয়া চিৎকার করে বলল। “তুমি যে রকম ভয় পেয়ে গেলে ওতেই বুঝে নিয়েছি কোথায় আছে! ”

মিতিয়া ছুটে বেরিয়ে গেল। ফেনিয়া যা ভয় পেয়ে গিয়েছিল! অল্পের ওপর দিয়ে যে গেছে এতেই সে খুশি। কিন্তু সে খুব ভালো করেই বুঝতে পারল যে আসলে তার সময় ছিল না, তা না হলে ফেনিয়ার ভোগান্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতেও মিতিয়া এমন একটা কাজ করে বসল, যেটা

এত বেশি আকস্মিক ছিল যে ফেনিয়া এবং বুড়ি মাত্রিয়োনা দুজনেই তাতে হকচকিয়ে গেল। টেবিলের ওপর একটা হামনদিস্তা রাখা ছিল, তার ভেতরে ছিল একটা নোড়া—খুব একটা বড়ো নয়, বড়জোর বিঘতখানেক হবে, সে জিনিসটাও তামার। ছুটতে ছুটতে মিতিয়া ততক্ষণে এক হাতে দরজার পাল্লা ধরে দরজা খুলে ফেলেছে, এমন সময় অন্য হাতটা দিয়ে ছুটন্ত অবস্থাতেই ছোঁ মেরে নোড়াটা তুলে নিয়ে তার পাশপকেটে গুঁজে ফেলল। এমন কাজ তার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

"হা ভগবান, কাউকে খুন করার মতলব!" ফেনিয়া দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়াল।

## চার

## অন্ধকারে

ছুটে কোথায় যাচ্ছিল সে? জানাই আছে 'ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা থাকতে পারে? সাম্‌সোনভের কাছ থেকে সোজা তার কাছে ছুটে গেছে, এখন তো এটা, পরিষ্কার। পুরো ষড়যন্ত্রটা, আগাগোড়া এই ফাঁকিবাজিটা এখন প্রত্যক্ষ ' সব ঘুরতে লাগল তার মাথার ভেতরে, ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। তাদের সেই উঠোনে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নার কাছে একটি বারের জন্য ছুটে যাবার আর কোনো প্রয়োজন দেখল না। 'ওখানে যাবার দরকার নেই... আদৌ দরকার নেই এতটুকু ঘাঁটানো চলবে না সঙ্গে সঙ্গে খবর চালাচালি হয়ে যাবে, ধরিয়ে দেবে। মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে, স্মের্দিকোভ্‌ও আছে, সেও আছে, সব কটাকে কিনে ফেলেছে!'

সে অন্য একটা পন্থা অবলম্বন করল : গলির ভেতর দিয়ে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়ি পাশে রেখে অনেকখানি ঘুরপথ ধরল। দ্‌মিত্রিয়েভ্‌স্কায়া স্ট্রিট ধরে ছুটতে ছুটতে ছোটো ব্রিজটা পেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল পিছনের সেই নির্জন গলিটায়। জায়গাটা নিরিবিলি, জনবসতিহীন। এক দিকে প্রতিবেশীদের আনাজ খেতের বেড়া, আরেক পাশে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাগানের চারপাশ ঘিরে বেশ মজবুত উঁচু বেড়া। এখানে এসে সে একটা জায়গা বেছে নিল। লোকশ্রুতি থেকে সে জানত এটাই ঠিক সেই জায়গাটা যেখান থেকে দুর্গন্ধ লিজাভিয়েতা কোনো এক সময় বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকেছিল। ঈশ্বর জানেন কেন যেন তার মাথায় খেলল: 'সে যখন টপকাতে পেরেছিল তখন আমি পারব না তা কেমন করে হয়?' আর বাস্তবিকই সে এক লাফে চোখের পলকে বেশ কায়দা করে বেড়ার মাথাটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল, তারপর গায়ের জোর খাটিয়ে গোটা শরীরটাকে টেনে তুলে দেখতে দেখতে বেড়ার ওপরে গিয়ে উঠে বসল। বাগানের ভেতরে কাছাকাছি জায়গায় ছিল বাড়ির স্নান ঘর, কিন্তু বেড়ার ওপর থেকে বাড়ির জানলার আলোও চোখে পড়ছিল।

'যা ভেবেছি তাই, বুড়োর শোবার ঘরে আলো জ্বলছে, তার মানে ও ওখানেই আছে।' আর কথা নয়, বেড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে সে বাগানে গিয়ে পড়ল। যদিও সে জানত যে গ্রিগোরি অসুস্থ এবং স্মের্দিকোভ্ও সম্ভবত সত্যি সত্যিই অসুস্থ, তাই তার আসাটা কেউ টের পাবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে ঘাপটি মেরে রইল, রুদ্ধশ্বাসে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু চারদিকে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা এবং ঠিক যেন বুঝে বুঝেই নেমে এসেছে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা, এতটুকু হাওয়া নেই।

'নৈঃশব্দ্যের কানাকানি শুধু চরাচরে', কেন যেন একটা কবিতার লাইন তার মাথায় এসে গেল। 'শুধু কেউ না শুনতে পেলেই হল কী ভাবে আমি লাফিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। মনে হয় শুনতে পায়নি।' মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে ঘাসের ওপর মৃদু পা ফেলে ফেলে সে বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। গাছপালা ঝোপঝাড় এড়িয়ে প্রতি পদে গুঁড়ি মেরে, নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ কান পেতে শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগল। জানলার আলোর কাছে পৌঁছুতে মিনিট পাঁচেক সময় লেগে গেল। তার মনে পড়ল বাইরে জানলার ঠিক নিচেই এল্ডার ফুল আর থোকা থোকা সাদা ফুলের বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো, লম্বা ও ঘন ঝাড় আছে। বাড়ির সামনের অংশের বাঁ পাশে, বাড়ি থেকে বাগানে যাবার সদর দরজাটা বন্ধ। এটা সে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দেখে রেখেছিল। শেষকালে ঝোপঝাড়ের কাছে পৌঁছে সেগুলির আড়ালে লুকিয়ে রইল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। 'এখন অপেক্ষা করা দরকার', সে ভাবল। দেখা যাক, ওরা আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে কি না, নিশ্চিত হওয়ার জন্য কান পেতে শুনছে কিনা এখন শুধু কাশি বা হাঁচি না পেলেই হয়

মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা ভীষণভাবে ধুকপুক করতে লাগল, মুহূর্তে মুহূর্তে তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। 'না, বুকের এই ধুকপুকানিটা যাবে না', সে মনে মনে ভাবল। 'আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' ঝোপের ভেতরে ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝোপের সামনের অর্ধাংশ জানলার আলোয় আলোকিত। 'আহা কী লাল ঝোপের থোকা থোকা বেরিগুলো!' সে ফিসফিস করে বলল—কেন সে নিজেই জানে না। আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে এক পা দুপা করে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। ফিয়োদর পাভ্লভিচের পুরো শোবার ঘরটা এখন যেন তার করতলে। ঘরটা তেমন একটা বড়ো নয়, পুরোটা আড়া আড়ি ভাবে একটা লাল পর্দা দিয়ে ভাগ করা। 'চিনে' কেন যেন পর্দাটার এই নাম দিয়েছিল ফিয়োদর পাভ্লভিচ। 'চিনে', মিতিয়ার মাথার ভেতরে চমক দিয়ে উঠল। 'ওই পর্দার আড়ালেই তো গ্রুশেন্কা আছে।' সে ফিয়োদর পাভ্লভিচের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। ফিয়োদর পাভ্লভিচ পরে রয়েছে তার নতুন ডোরাকাটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন,

যেটা মিতিয়া এর আগে কখনও তার গায়ে দেখেনি। ড্রেসিং গাউনটার কোমরে ডুরি বাঁধা, সেটাও সিল্কের, সেখান থেকে ফুলের আকারে সুতোর গোছা ঝুলছে। ড্রেসিং গাউনের কলারের তলা থেকে উঁকি মারছে মিহি শণকাপড়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কেতাদুরস্ত জামা, জামার কলারের গায়ে সোনার বোতাম। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মাথায় এখনও সেই লাল ফেটি যেটা আলিয়োশা তার মাথায় দেখেছিল।

'সাজের ঘটা দেখ!' মিতিয়া মনে মনে বলল।

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন চিন্তায় ডুবে আছে। এক সময় হঠাৎ ঝট করে মাথাটা ওঠাল, কানটা সামান্য একটু খাড়া করল, কিন্তু শোনার মতো কিছুই না পেয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল, একটা ডিক্যান্‌টার থেকে আধ গ্লাসটাক ব্র্যান্ডি ঢেলে ঢক করে খেয়ে ফেলল। এর পর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, অন্যমনস্ক ভাবে দেয়ালের গায়ে লাগানো আরশির দিকে এগিয়ে গেল, ডান হাত দিয়ে কপালের ফেটিটা সামান্য তুলে কালশিটে আর কাটা ঘায়ের জায়গাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এখনও সেগুলি একেবারে যায় নি।

'একাই আছে', মিতিয়া ভাবল। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে একাই আছে।'

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আরশির কাছ থেকে সরে এসে আচমকা জানলার দিকে ফিরল, জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল। মিতিয়া চোখের পলকে তড়াক করে ছায়ায় সরে গেল।

'বলা যায় না হয়তো এই ঘরেই পর্দার ওপাশে ঘুমিয়ে আছে', ভাবতেই মিতিয়ার বুকের ভেতরটা খচ্ করে উঠল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ জানলার কাছ থেকে সরে গেল। 'উঁচু জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে ওরই খোঁজ করছিল, তার মানে ও ওখানে নেই। তা নইলে অন্ধকারের মধ্যে কী এমন দেখার আছে? অর্থাৎ আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছে না মিতিয়া তৎক্ষণাৎ সুরুৎ করে বেরিয়ে এসে আবার জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। বুড়ো এখন টেবিলের সামনে বসে আছে। দেখাই যাচ্ছে, দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছে। শেষকালে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে ডান হাত গালে ঠেকাল। মিতিয়া সাগ্রহে লক্ষ করতে লাগল।

'একা, একাই আছে!' সে আবার বলল। 'ও যদি এখানে থাকত তাহলে মুখের চেহারাই আলাদা হত।'

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে গ্রুশেন্‌কা যে এখানে নেই তাতে মিতিয়ার বুকের মধ্যে এমন একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল যা কেমন যেন অর্থহীন এবং বিস্ময়করও বটে। 'এই কারণে নয় যে ও এখানে নেই', বুঝতে পেরে উত্তরে তৎক্ষণাৎ নিজেই নিজের কাছে ব্যাখ্যা দিল 'কারণ এই যে ও এখানে আছে কি নেই কোনো মতে নিশ্চিত জানতে পারছি না।' মিতিয়া নিজে পরে মনে করে দেখেছে সেই

মুহূর্তে তার বুদ্ধি অসাধারণ পরিষ্কার ছিল, সব কিছু সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করতে পারছিল, প্রতিটি খুঁটিনাটি ধরতে পারছিল। কিন্তু একটা বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, দৃঢ়সঙ্কল্পের অভাব এবং অজ্ঞতার দরুন একটা বিষণ্ণতা তার মনের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত পুঞ্জীভূত হতে লাগল। 'শেষ পর্যন্ত ও কি এখানে আছে, না নেই?' রাগে সে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। হঠাৎ সে মনস্থির করে ফেলল। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে জানলার গায়ে টোকা মারল। স্মের্দিকোভের সঙ্গে বুড়ো যে সঙ্কেতের ব্যবস্থা করে রেখেছিল সেই মতোই সে টোকা মারল—দু বার আস্তে আস্তে, তারপরই তিনবার ঘন ঘন—টুক-টুক-টুক—যে-সঙ্কেতের অর্থ 'গ্রুশেন্কা এসেছে!'

বুড়ো চমকে উঠল, ঝট করে মাথা তুলে এক লাফে উঠে পড়ে দ্রুত জানলার দিকে ছুটল। মিতিয়া সুরুৎ করে ছায়ায় সরে পড়ল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ জানলা খুলে পুরো মাথাটা বাইরে গলিয়ে দিল।

"তুমি গ্রুশেন্কা? তুমি?" কেমন একটা কাঁপা কাঁপা অর্ধস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল। "কোথায় গো, ওগো আমার স্বর্গের দেবী, তুমি কোথায়?" ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ল, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

'একাই আছে তাহলে!' মিতিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করল।

"কোথায় গেলে তুমি?" আবারও চিৎকার করে ডাকল বুড়ো, আরও বেশি করে গলা বাড়িয়ে দিল, একেবারে কাঁধসুদ্ধ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে, চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। "এদিকে এসো, আমি তোমার জন্য উপহার তৈরি করে রেখেছি, একবারটি এসো, দেখাব!

'তাহলে ওই তিন হাজারের প্যাকেটের কথা বলছে!' মিতিয়ার চট করে খেয়াল হল।

"তুমি কোথায় বল তো? দরজার কাছে নাকি? দাঁড়াও এখুনি খুলে দিচ্ছি।...

এই বলে বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় জানলার বাইরে বেরিয়ে এলো, ডান দিকে যেখানে বাগানে ঢোকার দরজাটা ছিল সেদিকে উঁকি মেরে দেখল, অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করল। গ্রুশেন্কার উত্তরের অপেক্ষা না করে আর এক মুহূর্ত পরে সে নির্ঘাত ছুটে দরজাটা খুলতে যেত।

মিতিয়া এতটুকু নড়াচড়া না করে এক পাশ থেকে দেখতে লাগল। মিতিয়ার কাছে নিদারুণ বিতৃষ্ণাজনক বুড়োর মূর্তির পাশ থেকে দেখা সমগ্র প্রতিকৃতিটি, আগাগোড়া ঝুলে পড়া তার কণ্ঠমণিটি, বাঁশির মতো বাঁকা নাক, কামার্ত প্রতীক্ষারত তার হাসি হাসি মুখখানা, তার ঠোঁটজোড়া—এ সবই বাড়ির ভেতরের বাঁ দিক থেকে বাতির উজ্জ্বল আলো তেরছাভাবে পড়ে রীতিমতো আলোকিত হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর উন্মত্ত ক্রোধে মিতিয়ার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। 'এই তো সেই লোকটা! এই তো তার প্রতিদ্বন্দ্বী, এই সেই অত্যাচারী যে তাকে উৎপীড়ন করেছে, তার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছে!' চারদিন আগে বাগানের

ঘরে তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আলিয়োশা যখন তাকে প্রশ্ন করেছিল 'বাবাকে খুন করবে একথা তুমি বলতে পারলে কী করে?' তার উত্তরে নিজের মনের কথা আগে থাকতেই যেন টের পেয়ে অকস্মাৎ যে প্রতিহিংসামূলক প্রচণ্ড ক্ষোভ আলিয়োশার কাছে সে প্রকাশ করেছিল এটা ছিল ঠিকই তারই তরঙ্গোচ্ছ্বাস। তখন সে বলেছিল, 'আমি ঠিক জানি নে, আমি জানি নে। হয়তো খুন করব, হয়তো বা করব না। আমার ভয় হয় পাছে ঠিক *সেই মুহূর্তটিতে সে তার ওই মুখটা নিয়ে* হঠাৎ আমার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমি ঘৃণা করি ওর কণ্ঠমণি, ওর চোখ, ওর নির্লজ্জ বাঁকা হাসি। ব্যক্তিগত ভাবে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আমাকে পেয়ে বসে। এটাকেই আমার ভয়। সামলাতে পারব বলে মনে হয় না। এই ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণাটা বাড়তে বাড়তে অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। মিতিয়া দিশেহারা হয়ে পড়ল, চট করে পকেট থেকে টেনে বার করল হামানদিস্তার সেই তামার নোড়াটা।

মিতিয়া পরে নিজমুখেই বলেছিল 'ঈশ্বর আমাকে সে দিন চোখে চোখে রেখেছিলেন।' ঠিক সেই মুহূর্তটিতে রোগশয্যায় শায়িত গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচর নিদ্রাভঙ্গ হল। ওই দিন সন্ধ্যার দিকে সে তার নিজের ওপর পরিচিত সেই চিকিৎসাপদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছিল যার কথা স্মের্দিকোভ্ ইভান ফিয়োদরভিচকে বলেছিল। অর্থাৎ সে তার সহধর্মিণীর সাহায্যে অত্যন্ত কড়া কোনো এক গোপন আরকের সঙ্গে ভোদকা মিশিয়ে সর্বাঙ্গে মালিশ করেছিল, এর পর তার সহধর্মিণী যখন তাকে উপলক্ষ করে বিড়বিড় করে 'কিছু প্রার্থনা' আওড়ায় সেই সময় মিশ্রণের বাকি অংশটুকু খেয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। জিনিসটা মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নাও কিছুটা চেখে দেখেছিল, কিন্তু মদ্যপানের অভ্যাস না থাকায় স্বামীর পাশেই বসে ঘুমে ঢলে পড়েছিল। মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল।

এদিকে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাতে গ্রিগোরির চটকা ভেঙে গেল। মিনিটখানেক সে ভেবে দেখল, যদিও তৎক্ষণাৎ ফের কোমরে একটা জ্বালাধরা যন্ত্রণা অনুভব করল, তবু বিছানায় উঠে বসল। তারপর আবারও কী যেন চিন্তা করল, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে চটপট জামাকাপড় পরে নিল। হয়তো এই ভেবে বিবেকের দংশনে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল যে 'এমন একটা বিপদের সময়' বাড়ি ঘরদোর পাহারা ছাড়া পড়ে রয়েছে আর সে কিনা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে! মূর্ছারোগের প্রকোপে বিধ্বস্ত স্মের্দিকোভ্ আরেকটি খুপরিতে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই। তার দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ ভাবল, 'মেয়েমানুষটা নেতিয়ে পড়েছে দেখছি।' বেরিয়ে সে দেউড়ির ধাপে গিয়ে দাঁড়াল। নিঃসন্দেহে তার অভিপ্রায় ছিল ওই ওখান থেকেই একটু নজর করা, কেন না হাঁটার মতো শক্তি তার ছিল না, কোমরে আর ডান পায়ে অসহ্য

যন্ত্রণা। কিন্তু ঠিক তখনই হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাগানের গেটটাতে সন্ধ্যাবেলায় তালা দেওয়া হয়নি। গ্রিগোরি লোকটা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ, যে নিয়মশৃঙ্খলা একবার চালু হয়ে গেছে এবং তার বহু বছরের যা অভ্যাস তা সে ঠিক ঠিক মেনে চলে। যন্ত্রণায় তার শরীর মোচড়াচ্ছিল। এই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেউড়ির ধাপ বয়ে নিচে নেমে বাগানের দিকে চলল। ঠিক তাই, গেটটা একেবারে হাঁ করে খোলা। যন্ত্রচালিতের মতো সে বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। হয়তো তার মনের ভুল হতে পারে, হয়তো বা কোনো শব্দ তার কানে গিয়ে থাকবে, কিন্তু বাঁ দিকে চোখ পড়তেই সে দেখতে পেল মনিবের ঘরের জানলাটা খোলা, অথচ ফাঁকা, সেখান থেকে কেউ যে বাইরে মুখ বাড়িয়ে কিছু দেখছে তাও নয়।

'খোলা কেন? এখন তো গরম কাল নয়!' গ্রিগোরি ভাবল। ঠিক সেই মুহূর্তে সরাসরি তার চোখের সামনে বাগানের ভিতরে অস্বাভাবিক ধরনের কিছু একটা ঝলক দিয়ে উঠল। তার চল্লিশ পা মতন দূরত্বে অন্ধকারের মধ্যে কোনো একটা মানুষ যেন ছুটে যাচ্ছে, ছায়া-ছায়া কী একটা অতি দ্রুত সরে যাচ্ছে।

'হা ভগবান!' গ্রিগোরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। নিজের কোমরের ব্যথা ভুলে গিয়ে ছুটন্ত মূর্তিটার আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে পথ আটকানোর জন্য সে দ্রুত পা বাড়াল। গ্রিগোরি একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরল। এটা স্পষ্ট, যে-লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে গ্রিগোরির কাছে বাগানটা বেশি পরিচিত। ছায়ামূর্তিটা স্নানঘরের দিকে ছুটল, স্নানঘরের পিছনটায় গিয়ে বাগানের বেড়া লক্ষ করে ছুটতে লাগল। সব ভুলে গিয়ে সেও ছুটল। ছুটতে ছুটতে সে বেড়ার কাছে এসে পৌঁছুল ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন পলাতক লোকটি বেড়ার ওপরে উঠে পড়েছে। গ্রিগোরি দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে গর্জন করে উঠে তার দিকে ধেয়ে গেল, দু হাতে তার একটা পা চেপে ধরল।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। তার মন যা বলছিল তাতে ভুল ছিল না। গ্রিগোরি চিনতে পেরেছে, এ সেই 'পিতৃঘাতী নরপিশাচটা!'

"পিতৃঘাতী!" বুড়ো এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে আশেপাশের সকলের শুনতে পাবার কথা, কিন্তু ওই একবারই চেঁচানোর অবকাশ পেল, হঠাৎ বজ্রাহতের মতো ধপ করে পড়ে গেল।

মিতিয়া লাফিয়ে আবার বাগানের ভেতরে ফিরে এল। ভূপতিত লোকটার কী হল দেখার জন্য তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। তামার নোড়াটা তখনও মিতিয়ার হাতে ধরা ছিল, মিতিয়া সেটাকে যন্ত্রচালিতের মতো ঘাসের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। নোড়াটা গ্রিগোরির দু পা দূরে গিয়ে পড়ল, তবে ঠিক ঘাসের মধ্যে নয়—পায়ে চলা পথের ওপর—একেবারে চোখে পড়ার মতো জায়গায়। সে তার সামনে ধরাশায়ী মূর্তিটা কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করল। বুড়োর মাথাটা আগাগোড়া রক্তে

ভেসে যাচ্ছে। মিতিয়া হাত বাড়িয়ে হাতড়ে মাথার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। পরে সে পরিষ্কার মনে করতে পেরেছিল যে সেই মুহূর্তে যেটা 'সম্যকরূপে নিশ্চিত হওয়ার' ভীষণ ইচ্ছে তার হচ্ছিল তা এই যে নোড়াটা দিয়ে সে বুড়োর মাথার খুলিটা ভেঙে দিয়েছে, নাকি অন্ধকারের মধ্যে লোহাটা দেখিয়ে স্রেফ তাকে 'ভড়কে দিয়েছিল'। কিন্তু রক্তের ধারা বয়ে চলেছে, ভীষণ ভাবে গলগল করে বয়ে চলেছে। মিতিয়ার আঙুল কাঁপছিল, মুহূর্তের মধ্যে উষ্ণ রক্তের ধারায় তার আঙুল ভিজে যাচ্ছিল। তার মনে আছে খখ্লাকোভার বাড়িতে যাবার সময়, বিশেষ করে তার কাছে যাবে বলেই যে নতুন সাদা রুমালটা সে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেটা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে সে তখন বুড়োর কপালে লাগিয়ে অর্থহীন ভাবে তার কপাল আর মুখ থেকে রক্ত মোছার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রুমালটাও মুহূর্তের মধ্যে রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেল।

'হা ভগবান! এসব খামোকা কেন করতে যাচ্ছি?' হঠাৎ মিতিয়ার সংবিৎ ফিরে এলো। 'ভেঙেই যদি থাকি তো এখন সেটা জানব কী করে? আর, তা ছাড়া এখন তাতে কীই বা আসে যায়?' হঠাৎ সে হতাশ ভাবে যোগ করল। 'খুন যখন করেছি তখন তো করেইছি। বিপাকেই পড়লে বুড়ো। তা থাক, ওখানেই পড়ে থাক!' জোর গলায় এই কথাগুলি উচ্চারণ করে হঠাৎ সে বেড়ার দিকে ধেয়ে গেল, এক লাফে বেড়ার গায়ে উঠে পড়ে বেড়া টপকে ওপাশের গলিতে গিয়ে পড়ে ছুটতে লাগল। রক্তে ভেজা রুমালটা তখনও দলা পাকানো অবস্থায় তার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল, ছুটতে ছুটতে সেটা সে তার ঝুলকোটের পিছনের পকেটে গুঁজে রেখে দিল। সে ছুটছিল পড়িমরি করে। মাঠের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ যে কয়েকজন পথচারী তখন অন্ধকারের মধ্যে তাকে দেখতে পেয়েছিল পরে তারা মনে করে দেখেছে সেদিন রাতে একটা লোককে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে দেখেছিল বটে। আবার সে ছুটছে সেই মরোজভার বাড়ির দিকে।

সেদিন সন্ধ্যায় মিতিয়া চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেনিয়া মরোজভার বাড়ির বড়ো দারোয়ান নাজার ইভানভিচের কাছে ছুটে গিয়ে 'খ্রিস্টের দোহাই' পেড়ে অনুনয় বিনয় করে তাকে বলল 'আজ কিংবা কাল যেদিনই হোক ক্যাপ্টেনকে যেন আর কখনও ভেতরে ঢুকতে দেওয়া না হয়।' নাজার ইভানভিচ তার কথা ভালোমতো শোনার পর রাজিও হল, কিন্তু দোষের মধ্যে দোষ করে বসল এই যে ঠিক তখনই অকস্মাৎ ওপরে কর্ত্রীর কাছে তার ডাক পড়ায় তাকে জায়গা ছেড়ে সেখানে চলে যেতে হল। যেতে যেতে ভাইপোর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে তাকে কিছু সময় উঠোনে পাহারায় থাকতে বলল। ভাইপোটি বছর বিশেকের ছোকরা, সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। কিন্তু যাবার সময় নাজার তাকে ক্যাপ্টেনের কথাটাই বলতে ভুলে গেল। এদিকে মিতিয়া ছুটতে ছুটতে উঠোনের গেটের কাছে হাজির। গেটের দরজায় ঘা মারল। ছেলেটা তৎক্ষণাৎ তাকে চিনতে পারল। মিতিয়া বেশ কয়েকবার তাকে

বখশিস দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে তাকে ভিতরে ঢুকতে দিল, খুশি মনে হাসতে হাসতে তাকে সতর্ক করে দিয়ে তড়িঘড়ি জানাল 'কিন্তু আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না যে এখন বাড়ি নেই সে তো জানেনই হুজুর।'

"তাহলে এখন কোথায় বলতে পার প্রোখর?" হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মিতিয়া।

"এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেল—ঘণ্টা দুয়েক আগে হবে। তিমফিয়েইয়ের সঙ্গে মোক্রয়েতে চলে গেছে।

"কেন?" মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

"সে আমি কী করে জানব? কোনো এক অফিসারের কাছে। ওখান থেকে কে যেন তাকে গাড়ির ঘোড়াও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মিতিয়া তাকে ছেড়ে দিয়ে অর্ধোন্মাদের মতো ফেনিয়ার কাছে ছুটে গেল।

## পাঁচ

## একটি আকস্মিক সিদ্ধান্ত

সে তখন তার দিদিমার সঙ্গে রান্নাঘরে বসে ছিল। দুজনেই শুতে যাবার আয়োজন করছিল। নাজার ইভানভিচের ওপর ভরসা করে এবারেও তারা আর ভেতর থেকে দরজায় আগল দেয়নি। মিতিয়া হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ফেনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্ত হাতে তার গলা টিপে ধরল।

"বল্, এক্খুনি বল্ কোথায় গেল? এখন মোক্রয়েতে কার সঙ্গে আছে?" ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে গর্জন করে উঠল।

দুটি মেয়েমানুষ হাউমাউ করে উঠল।

"আঃ! বলছি, বলছি। উঃ! লক্ষ্মী সোনা আমার, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, এখুনি সব বলছি। কিচ্ছু লুকোব না! মোক্রয়েতে গেছে, তার অফিসারের কাছে", হড়বড় করে এক নিশ্বাসে ফেনিয়া বলে গেল। ভয়ে তখন তার প্রাণ উড়ে যাবার মতো অবস্থা।

"কোন্ অফিসারের কাছে?" গাঁক গাঁক করে উঠল মিতিয়া।

"আগেকার অফিসারটির কাছে, ওর ওই লোকটার কাছে, আগেকার সেই মানুষটির কাছে গো, যে তাকে পাঁচ বছর আগে ছেড়ে চলে গিয়েছিল", ওই রকমই দ্রুত এক নিশ্বাসে কিচির মিচির করে বলল ফেনিয়া।

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ এতক্ষণ দুহাতে ফেনিয়ার গলা টিপে ধরে রেখেছিল, এবারে মুঠি আলগা করে হাত সরিয়ে নিল। ফেনিয়ার সামনে সে মড়া মানুষের মতো ফ্যাকাশে মুখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে পেরেছে, পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, মুখের কথা

পড়তে না পড়তেই বুঝে নিয়েছে এবং শেষ খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব অনুমান করতে পারছে। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ বুঝেছে কি বোঝেনি সেই মুহূর্তে সেটা লক্ষ করার মতো অবস্থা অবশ্য বেচারি ফেনিয়ার ছিল না। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ যখন ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ঢুকেছিল তখন ফেনিয়া যেমন তোরঙ্গের ওপর বসে ছিল এখনও সেই ভাবে সেখানেই বসে রইল। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল, হাত দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে যে ভাবে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল ঠিক সেই ভঙ্গিতেই মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইল। আতঙ্কে বিস্ফারিত তার ভয়ার্ত চোখের তারা স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মুখের ওপর। এদিকে ঠিক তখনই চোখে পড়ল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের দুটো হাতই রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। পথে, যখন সে ছুটছিল, খুব সম্ভবত সেই হাত কপালে লাগিয়ে সে তার মুখের ঘাম মুছতে গিয়েছিল, ফল হয়েছে এই যে রক্ত মাখামাখি হয়ে গিয়ে তার কপালে আর ডান দিকের গালে রক্তের দাগ লেগে গেছে। ফেনিয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল বলে। বুড়ি রাঁধুনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের দিকে তাকাল, তারও মূর্ছা যাবার জোগাড়।

দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ যন্ত্রচালিতের মতো ধপ করে ফেনিয়ার পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চেয়ারে যে সে বসে ছিল তার অর্থ এই নয় যে সে তার ভাবনাচিন্তা গুছিয়ে নিচ্ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল নিদারুণ আতঙ্কে সে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ওই যে অফিসার, তার কথা সে জানত, জেনেছে গ্রুশেন্‌কারই কাছ থেকে। জেনেছে যে এক মাস আগে গ্রুশেন্‌কাকে একটা চিঠি লিখেছে। তার মানে এক মাস, পুরো একটা মাস ধরে, এই নতুন লোকটির এখনকার এই আগমনের একেবারে আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এই ব্যাপারটা তাকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে রেখে তলে তলে ঠিক চলছিল, আর সে কিনা এই নিয়ে ভাবেইনি! কিন্তু সে কী করে হয়? কী করে এমন হল যে তার কথা সে ভাবেনি? যাই হোক না কেন, কেন সে তখন ওই অফিসারটার কথা ভুলে গেল? তার কথা যেই জানতে পারল, অমনি, সেই মুহূর্তে কিনা ভুলে গেল? এটাই তো প্রশ্ন, যে প্রশ্নটি এখন এক উৎকট দানবীয় আকার ধারণ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই উৎকট বস্তুটিকে নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করতে গিয়ে সে সত্যি সত্যি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, আতঙ্কে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে।

কিন্তু এমন সময় বড়ো শান্ত ও কোমল স্বভাবের একটা শিশুর মতো এমন শান্ত ও বিনম্র স্বরে ফেনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল যে মনে হল এই এখনই যে তাকে এত ভয় দেখিয়েছিল, এত লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ করেছিল তা যেন বেমালুম ভুলে গেছে সে হঠাৎ এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফেনিয়াকে প্রশ্ন করতে লেগে গেল যে তার এই অবস্থাতে সেটা বেশ বাড়াবাড়ি রকমের, এমনকি বিস্ময়করই

বলতে হয়। এদিকে ফেনিয়াও অমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে থাকলে কী হবে, আশ্চর্যের কথা এই যে সেও কিন্তু যেরকম আগ্রহের সঙ্গে, চটপট তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছে যে এমনও মনে হচ্ছিল যেন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের সামনে সত্য, 'একমাত্র প্রকৃত সত্য' উজাড় করে ঢেলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অল্প অল্প করে, এমনও দেখা গেল কেমন যেন উল্লসিত হয়েই সে সবিস্তারে প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে শুরু করল—সেটা যে তাকে যন্ত্রণা দেবার উদ্দেশ্যে আদৌ তা নয়, অনেকটা যেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যতদূর পারা যায় তার উপকারে লাগার জন্যই এই ব্যস্ততা। রাকিতিন আর আলিয়োশার আগমন থেকে শুরু কর আজকের পুরো দিনের ঘটনা ফেনিয়ার পাহারায় মোতায়েন থাকা; দিদিমণির চলে যাওয়া এবং জানলা দিয়ে তার চেঁচিয়ে আলিয়োশাকে বলা যে মিতিয়াকে যেন তার নমস্কার জানিয়ে দেয় এবং এও জানিয়ে দেয় যে ঘণ্টাখানেকের জন্য তাকে সে যে ভাবে ভালোবেসেছিল তা যেন তার চিরকাল মনে থাকে—এ সবেরই সর্বশেষ খুঁটিনাটির কোনোটাই ফেনিয়ার বর্ণনায় বাদ পড়ল না। নমস্কারের কথাটা শোনার পর মিতিয়া, হঠাৎ কাষ্ঠ হাসি হাসল, তার পাণ্ডুর গালে রক্তিমাভা ফুটে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে আর এক ফোঁটাও ভয় না করে ফেনিয়া তার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল

"ঈশ্, আপনার হাতের এ কী অবস্থা, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ! একেবারে রক্তে মাখামাখি যে!"

"তা বটে", যন্ত্রচালিতের মতো মিতিয়া উত্তর দিল। অন্যমনস্ক ভাবে একবার নিজের হাতদুটোর দিকে তাকাল, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর কথা এবং ফেনিয়ার প্রশ্নটাও ভুলে গেল।

আবার সে নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গেল। যখন সে এখানে ছুটে এসেছিল তার পর থেকে ইতিমধ্যে মিনিট কুড়ি পার হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ আগেও যে ভয়টা তার মনের মধ্যে ছিল তা কেটে গেছে, কিন্তু এতক্ষণে সম্ভবত সম্পূর্ণ নতুন কোনো এক দৃঢ় সঙ্কল্প তার মনকে অধিকার করে বসেছে। হঠাৎ সে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হাসল।

"আপনার কী হয়েছে গো বাবু?" আবারও তার হাতের দিকে ইঙ্গিত করে ফেনিয়া বলে উঠল—এমন সমবেদনার সুরে বলল যেন এখন এই মানুষটির দুঃখে সে নিজেকে তার বড়ো কাছের লোক বলে মনে করছে। মিতিয়া আবার তাকিয়ে দেখল তার নিজের দুই হাত।

"এটা রক্ত ফেনিয়া", অদ্ভুত একটা ভাব নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল। "মানুষের রক্ত। ওঃ ভগবান! কেন যে এই রক্তপাত হল! কিন্তু ফেনিয়া... এখানে একটা বেড়া আছে " বলতে বলতে ফেনিয়ার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন তাকে একটা হেঁয়ালি ধরিয়ে দিচ্ছে। "বেশ উঁচু একটা বেড়া", সে বলল,

"দেখতেও ভয়ঙ্কর, কিন্তু কাল ভোরে যেই সূর্য শূন্যে ডানা মেলবে অমনি মিতেন্‌কা সেই বেড়াটা লাফিয়ে পার হবে। কোন্ বেড়া বুঝতে পারছ না ফেনিয়া, তাই তো? ও কিছু নয় তাতে কিছু আসে যায় না, কাল অমনিতেই শুনতে পাবে, তখন সব বুঝতে পারবে এখন তাহলে বিদায়! ব্যাঘাত ঘটাব না, সরে যাব, কী করে সরে যেতে হয় জানি। আমার আনন্দ তুমি, তুমি বেঁচে থাক এক প্রহরের জন্য তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে, তা চিরকাল এই ভাবেই মনে রেখো তোমার মিতেন্‌কা কারামাজভ্‌কে। 'মিতেন্‌কা'—আদর করে 'মিতেন্‌কা' বলেই তো ডাকত আমাকে, মনে আছে তো তোমার?"

এই বলে হঠাৎ সে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এদিকে এই কিছুক্ষণ আগে মিতিয়া যখন ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে ফেনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন সে ভয়টা সে পেয়েছিল মিতিয়ার এই আকস্মিক প্রস্থানে যেন তার চেয়েও একটু বেশিই ভয় সে পেয়ে গেল।

ঠিক দশ মিনিট পরে দ্‌মিত্রি গিয়ে হাজির হল পিয়োতর ইলিচ পের্‌খোতিন নামে সেই যুবক আমলাটির বাড়িতে, যার কাছে এই সবে সে তার পিস্তলজোড়া বন্ধক রেখেছিল। তখন সাড়ে আটটা বেজেছে, পিয়োতর ইলিচ বাড়িতে ভালোমতো সান্ধ্য চাপানের পর সবে ফের ঝুলকোটটা গায়ে চাপিয়েছে, উদ্দেশ্য ছিল 'মহানগর' হোটেলে গিয়ে একটু বিলিয়ার্ড খেলবে। বেরিয়ে যাবার মুখে মিতিয়া তাকে ধরল। লোকটা তাকে দেখে, তার রক্তমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠল।

"হা ভগবান! কী হল কী আপনার?"

"কথাটা এই যে মিতিয়া দ্রুত বলে উঠল, "আমার পিস্তলদুটো ফেরত নিতে এসেছি, টাকা নিয়ে এসেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বড়ো তাড়া আছে পিয়োতর ইলিচ, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন।"

পিয়োতর ইলিচের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। হঠাৎ সে লক্ষ করে দেখল মিতিয়ার হাতে এক গাদা টাকা, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এই নোটের তাড়া হাতে করেই সে ঘরে ঢুকেছিল। এইভাবে কেউ টাকা হাতে ধরে রাখে না, কেউ এই ভাবে নোটের তাড়া হাতে নিয়ে কোথাও ঢোকে না। সবগুলো নোট তার ডান হাতে এবং ঠিক যেন দেখানোর উদ্দেশ্যেই হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে। সামনের বারান্দায় সরকারি আমলা ভদ্রলোকের যে ছোকরা চাকরটির সঙ্গে মিতিয়ার দেখা হয়েছিল সে পরে বলেছিল যে ওইভাবেই টাকা হাতে নিয়ে নাকি সে সামনের বারান্দাতেও ঢুকেছিল। দেখা যাচ্ছে তাহলে রাস্তাতেও সে ওই ভাবে ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিতে সেই হাতে টাকা বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সবগুলি নোটই একশ রুবলের, রামধনু রঙের। রক্তাক্ত হাতের আঙুলেই সেগুলিকে ধরে রেখেছে।

পরে, আরও অনেক দেরিতে আগ্রহী ব্যক্তিরা যখন পিয়োতর ইলিচকে প্রশ্ন

করে কত টাকা ছিল, তখন সে জানায় যে সেই সময় চোখে দেখে তা বলা মুশকিল ছিল, হয়তো দু হাজার, আবার তিনও হতে পারে, তবে নোটের তাড়াটা বেশ বড়সড় আর বেশ 'মোটাও' ছিল। পরে সে তাঁর সাক্ষ্যে এমন কথাও বলেছিল যে 'দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর তার নিজের মধ্যে নেই। এমন নয় যে মাতাল, ঠিক যেন একটা তুরীয়ানন্দের মধ্যে আছেন। খুবই অন্যমনস্ক, আবার সেই সঙ্গে যেন একাগ্রভাবে কোনো একটা ভাবনার মধ্যে ডুবে আছেন, যেন কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভাবছেন, কীসের যেন সন্ধান করছেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। বড্ড তাড়াহুড়ো করছিলেন, ভারি অদ্ভুত-অদ্ভুত কাটা-কাটা জবাব দিচ্ছিলেন, কোনো কোনো মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন আদৌ কোনো বিপদ আপদ হয় নি, এমনকি বেশ খুশি-খুশিই দেখাচ্ছিল তাঁকে।'

"কিন্তু আপনার এ কী দশা? কী হয়েছে বলুন তো?" পিয়োতর ইলিচ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে অতিথিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আবার চিৎকার করে উঠল। "এরকম রক্তাক্ত অবস্থা কেন আপনার? রাস্তায় কোথাও পড়ে গিয়েছিলেন নাকি? একবার চেয়ে দেখুন নিজের দিকে!"

এই বলে সে তার কনুই চেপে ধরে টানতে টানতে আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

আয়নায় নিজের রক্তমাখা মুখটা দেখে মিতিয়া শিউরে উঠল, ক্রোধে ভ্রূকুটি করল।

"ধুত্তোর! এটাই বাকি ছিল!" রাগে সে বিড়বিড় করে বলল। নোটগুলো চট করে ডান হাত থেকে বদল করে বাঁ হাতে রাখল, ছটফট করতে করতে টান মেরে পকেট থেকে রুমালটা বের করল। কিন্তু দেখা গেল রুমালটাও আগাগোড়া রক্তমাখা—এটা সেই রুমাল যেটা দিয়ে সে গ্রিগোরির মাথা আর মুখ মুছিয়েছিল। এর প্রায় কোনো জায়গাই সাদা নেই, শুধু যে শুকোতে শুরু করেছে তাই নয়, শুকিয়ে চড়চড় করে কেমন যেন ডেলা পাকিয়ে গেছে, এখন আর খুলতেই চায় না। মিতিয়া রেগে ওটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল।

"ধুত্তোর! আপনার কাছে কোনো ন্যাতা-ট্যাতা হবে কি? মুছতে পারলে হত।..."

"ও, তার মানে শুধু রক্ত লেগেছে? লাগে-টাগেনি? তাহলে বরং ধুয়ে ফেলুন", পিয়োতর ইলিচ উত্তরে বলল। "এই যে, ওধারে হাত ধোবার জলের পাত্রটা আছে' আসুন, আমি আপনাকে ঢেলে দিচ্ছি।"

"হাত ধোবার জলের পাত্র? সে তো ভালো কথা। কিন্তু এটা আমি কোথায় রাখি বলুন তো?" একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তার এক শ রুবলের নোটের বান্ডিলটা পিয়োতর ইলিচকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল। এমন

ভাবে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল যেন তার নিজের টাকা সে কোথায় রাখবে সেটাও পিয়োতর ইলিচকেই ঠিক করে দিতে হবে।

"পকেটে পুরুন, নয়ত এই যে এখানে, টেবিলের ওপর রাখুন, মার যাবে না।"

"পকেটে পুরতে বলছেন? তা হ্যাঁ, পকেটেই থাক। এই ভালো। দেখুন, এ সবই তুচ্ছ ব্যাপার!" হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক ভাব কাটিয়ে উঠে হুঁশ ফিরে আসতে সে চেঁচিয়ে বলল। "দেখুন, আগে কাজের ব্যাপারটা চুকিয়ে নেওয়া যাক। আমার ওই পিস্তল-দুটো ও দুটো তো আমায় দিন, আর এই যে আপনার টাকা কারণ ওগুলো আমার দরকার, খুবই দরকার এদিকে আমার সময় নেই, এক ফোঁটাও নেই

এই বলে বান্ডিলটা থেকে ওপরের এক শ রুবলের একটা নোট বার করে পিয়োতর ইলিচের দিকে বাড়িয়ে দিল।

"কিন্তু আমার কাছে অত টাকার ভাঙানি তো হবে না", সে বলল, "দেখুন না, ছোটো খাটো কিছু আছে কিনা।"

"নেই", বান্ডিলটার দিকে আরেক বার একটুখানি তাকিয়ে দেখে সে বলল। তারপর নিজের কথায় যেন তেমন আস্থা স্থাপন করতে না পেরে ওপর থেকে দুটো তিনটে নোট আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। "না, সব ওই একশ'র", যোগ করে আবার প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পিয়োতর ইলিচের দিকে তাকাল।

"রাতারাতি অমন বড়লোক হয়ে গেলেন কী করে বলুন তো?" পিয়োতর ইলিচ জিগ্‌গেস করল। "একটু দাঁড়ান, আমি আমার ছোঁড়াটাকে এক ছুটে প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানে গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে বলছি। ওরা দেরিতে বন্ধ করে— দেখা যাক ভাঙিয়ে দেয় কিনা। ওরে মিশা!" সামনের বারান্দার দিকে গলা উঁচিয়ে সে হাঁক দিল।

"প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানে? আহা, অতি উত্তম!" যেন কী একটা খেয়াল মাথায় চাপতে মিতিয়াও চিৎকার করে উঠল। ছেলেটা এই সময় ঘরে ঢুকতে তার দিকে ফিরে বলল, " মিশা দেখ, এক ছুটে প্লোত্‌নিকভদের দোকানে গিয়ে বল দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ নমস্কার জানিয়েছেন, নিজে তিনি এখুনি আসছেন আর হ্যাঁ, শোন, শোন, বোলো যে আমি আসার আগে যেন তিন ডজন শ্যাম্পেন তৈরি রাখে, বেশ ভালোভাবে প্যাক করে রাখে, যেমন আমার মোক্রয়েতে যাবার সময় প্যাক করে দিয়েছিল। সেই সময় আমি ওদের কাছ থেকে চার ডজন নিয়েছিলাম", হঠাৎ পিয়োতর ইলিচকে উদ্দেশ করে সে বলল। তারপর আবার ছেলেটার দিকে ফিরে বলল, "ওরা সব জানে, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, মিশা। আর হ্যাঁ, শোন, শোন! সেই সঙ্গে কিছুটা চিজ, স্ট্রাস্‌বুর্গ পাই, স্মোক্‌ড ফিশ, হ্যাম, ক্যাভিয়ার এবং আরও সব যা যা ওদের কাছে আছে, সব—এক শ বা এক শ কুড়ি রুবলের মধ্যে—সেই আগের মতো আর হ্যাঁ, শোন, ফল বা মিঠাই জাতীয়

জিনিসও যেন দিতে ভুল না করে — এই যেমন টফি চকোলেট, নাশপাতি, তরমুজ তা এই দুটো তিনটে অথবা চারটা—না, না, তরমুজ তো একটাই যথেষ্ট, তবে চকোলেট, টফি, লজেন্স, ফ্রুট ড্রপ লজেন্স—মোট কথা আমি মোক্রয়েতে যাবার সময় শ্যাম্পেনের সঙ্গে আরও যা যা ওরা প্যাক করে দিয়েছিল সে সবই, সব মিলিয়ে যাতে মোট তিনশ রুবলের হয়। এবারেও ঠিক সেই রকমই যেন হয়। হ্যাঁ মনে থাকে যেন মিশা যদি তুমি মিশা হও... ওর নাম মিশা তো?" আবার পিয়োতর ইলিচের দিকে ফিরে সে জিগ্‌গেস করল।

পিয়োতর ইলিচ এতক্ষণ অস্বস্তির সঙ্গে তার কথা শুনছিল এবং ভালো করে তাকে লক্ষ করছিল। এবারে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আরে, একটু দাঁড়ান। আপনি নিজেই যখন যাবেন তখন বললেই তো ভালো হয়। ও ভুলভাল করে বসবে।"

"ভুলভাল করবে, দেখতে পাচ্ছি ভুল ভাল করবে! ওঃ মিশা, তুমি কমিশন বাবদ কিছু পাবে বলে আমি তো তোমাকে চুমু খেয়ে অভিনন্দনই জানাতে গিয়েছিলাম।... কোনো ভুলভাল যদি না কর তা হলে দশ রুবল তোমার। যাও, ছুটে যাও, চটপট। শ্যাম্পেন, আসল কথা শ্যাম্পেনটা যেন দেয়, আর ব্র্যান্ডি, মদ— তা সে লাল সাদা দুইই, মোট কথা সব মিলিয়ে ওই গত বার যেমন ছিল। ওরা ঠিক জানে কী কী ছিল তখন।"

"আঃ হা যা বলছি শুনুন!" আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে বাধা দিল পিয়োতর ইলিচ। "আমি বলি কি শুধু এক ছুটে গিয়ে টাকাটা ভাঙিয়ে নিয়ে আসুক আর ওদের বলে আসুক যেন বন্ধ না করে, এর পর আপনি গিয়ে নিজেই ওদের বলবেন।... দিন, এখন আপনার নোটটা দিন। ঝটপট! একটা পা এখানে থাকতে থাকতে আরেকটা পা যেন ওখানে গিয়ে পড়ে!"

পিয়োতর ইলিচ যেন ইচ্ছে করেই মিশাকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদায় করল, কেন না ছেলেটা সেই যে অতিথির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই ছিল, বিস্ময়ে হাঁ করে, চোখ বড়ো বড়ো করে অতিথির রক্তাক্ত মুখ, তার হাত আর কাঁপা-কাঁপা আঙুলে ধরে রাখা টাকার বান্ডিলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, মিতিয়া তাকে যে যে নির্দেশ দিয়েছিল সে সবের বিশেষ কিছুই সম্ভবত সে বুঝতে পারে নি।

"আচ্ছা এবারে চলুন, হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন", কঠিন স্বরে বলল পিয়োতর ইলিচ। টাকাগুলো টেবিলের ওপর রাখুন, নয়ত কোটের পকেটে গুঁজে ফেলুন।... হ্যাঁ, এই তো, চলে আসুন। তবে কোটটা খুলে রাখুন।

এই বলে সে তাকে কোট খুলতে সাহায্য করতে গেল। হঠাৎ আবার চেঁচিয়ে উঠল

"দেখুন, দেখুন, আপনার কোটটাতেও তো রক্ত দেখছি!"

"না, না ঠিক কোটে নয়। শুধু এই এখানে হাতার গায়ে একটু লেগেছে

আর কি। আর এটা মাত্র এখানেই, যেখানে রুমালটা ছিল। পকেটের ভেতর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে। রুমালটা আমার ঝুলকোটের পেছনের পকেটে ছিল, ফেনিয়ার ওখানে গিয়ে তারই ওপর বসে পড়েছিলাম, তাইতে রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে", কেমন যেন সহজ সরল বিশ্বাসে মিতিয়া তৎক্ষণাৎ যে ভাবে ব্যাখ্যা দিল সেটা বিস্ময়কর। পিয়োতর ইলিচ ভ্রূকুটি করে মনোযোগ দিয়ে শুনল।

"কিছু একটা কান্ড বাধিয়েছেন মনে হচ্ছে। সম্ভবত কারও সঙ্গে মারপিট করেছেন", বিড়বিড় করে সে বলল।

ধোয়া শুরু হল। পিয়োতর ইলিচ হাত ধোয়ার জলের জগটা ধরে জল ঢালতে লাগল। মিতিয়া তাড়াহুড়ো করছিল, হাতে তেমন একটা ভালো করে সাবান লাগাচ্ছিল না। তার হাত কাঁপছিল—পরে পিয়োতর ইলিচ তা মনে করে দেখেছে। পিয়োতর ইলিচ তৎক্ষণাৎ তাকে আরও বেশি করে সাবান লাগিয়ে আরও ভালো করে রগড়াতে বলল। এই মুহূর্তটিতে তাকে মিতিয়ার ওপর বেশ খানিকটা প্রতিপত্তি খাটাতে দেখা গেল এবং যত সময় যেতে লাগল সে যেন ততই বেশি করে তা খাটাতে লাগল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই যুবকটি ভীরু স্বভাবের লোক নয়।

"এই দেখুন, নখের তলায় সাফ করা হয়নি। আচ্ছা, এবারে মুখটা রগড়ান, এই যে এখানে—রগের পাশে, কানের কাছটায়। আপনি কি এই শার্ট পরেই যাবেন নাকি? কোথায় যাচ্ছেন? দেখুন আপনার শার্টের ডান দিকের হাতার কিনারা পুরোটাই রক্তাক্ত।"

"হ্যাঁ রক্তাক্ত", শার্টের হাতার কিনারাটা ভালো করে দেখার পর মিতিয়া মন্তব্য করল।

"তাহলে জামাটা পালটান।"

"সময় নেই। বুঝলেন কিনা, আমি " তোয়ালে দিয়ে হাত আর মুখ মুছতে মুছতে, লম্বা ঝুলকোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে ওই রকমই সহজ সরল বিশ্বাসে মিতিয়া বলে চলল। "আমি এই এখানে হাতার কিনারাটা না হয় গুটিয়ে নেব, কোটের তলায় ওটা চোখে পড়বে না। এই দেখুন না!"

"এখন বলুন, কোথায় কী বাধিয়ে এসেছেন? কারও সঙ্গে মারপিট করেছিলেন নাকি? আবার কি সেই সেবারের মতো হোটেলে? আবার সেই সেবারের মতো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিছু হয়েছিল নাকি? ধরে পিটিয়েছেন? টানা হ্যাঁচড়া করেছেন ওকে?" অনেকটা যেন ভর্ৎসনার সুরেই তাকে মনে করিয়ে দিল পিয়োতর ইলিচ। "আর আবার কাকে পেটালেন? না কি সম্ভবত খুনই করলেন?"

"যত বাজে কথা!" মিতিয়া বলে উঠল।

"কেন? বাজে কথা কেন?"

"থাক না", এই বলে মিতিয়া হঠাৎ মুচকি হাসল। "বাজার চত্বরে আমি এইমাত্র এক বুড়িকে চেপটে ফেলেছিলাম।"

“চেপটে ফেলেছিলেন? এক বুড়িকে?”

“বুড়োকে!” সোজা পিয়োতর ইলিচের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে চিৎকার করে বলল। এমন চিৎকার করল যে মনে হল পিয়োতর ইলিচ যেন একটা কানা লোক।

“দূর ছাই! একবার বলছেন বুড়ো, আরেকবার বলছেন বুড়ি। সত্যি সত্যি খুন করেছেন নাকি কাউকে?’

“মিটমাট হয়ে গেছে। একচোট হয়েছিল বটে, তবে মিটমাট হয়ে গেছে। হয়েছে একটা জায়গায়। বন্ধুভাবে যে যার জায়গায়ে চলে গেছি একটা বোকা হাঁদা লোক... সে আমায় ক্ষমা করে দিয়েছে এখন, এতক্ষণে নির্ঘাত ক্ষমা করে দিয়েছে।... যদি উঠে দাঁড়াত তাহলে অবশ্যই ছেড়ে কথা বলত না।” কথার মাঝখানে হঠাৎ চোখ টিপল মিতিয়া, তার পর বলল, “শুধু বলি কি জানেন, চুলোয় যেতে দিন ওটাকে, পিয়োতর ইলিচ, শুনছেন চুলোয় যেতে দিন! ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই! ঠিক এই মুহূর্তে অন্তত চাইনে!” দৃঢ়কণ্ঠে কড়া জবাব দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল মিতিয়া।

“আমি কিন্তু এটাই বলতে চাইছিলাম যে সকলের সঙ্গেই একটা না একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে সাধও হয় আপনার! সেই যেমন সেবার তুচ্ছ ব্যাপারে এই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আপনি করেছিলেন। তা মারপিট করার পর এখন ছুটলেন মজা লুটতে—এই তো আপনার চরিত্র! তিন ডজন শ্যাম্পেন—এত আপনার কোথায় লাগছে শুনি?”

“শাব্বাশ! হয়েছে, এবারে আমার পিস্তলদুটো দিন দেখি। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি, লক্ষ্মী ভাইটি, তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করার ইচ্ছে আমার ছিল বৈ কি, কিন্তু কী করব, সময় নেই। তাছাড়া দরকারও নেই, কথা বলার পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আরে। টাকাগুলো আবার গেল কোথায়? কোথায় রাখলাম?” চিৎকার করে উঠে সে এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

“টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। নিজেই রেখেছিলেন ওই তো পড়ে আছে। এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? টাকাপয়সা দেখছি আপনার কাছে ধুলোমাটির মতো। এই নিন আপনার পিস্তল। অদ্ভুত ব্যাপার, ছয়টার সময় এসে দশ রুবলে বন্ধক দিলেন, এর এখন কিনা এরই মধ্যে আপনার হাতে এসে গেছে কয়েক হাজার — দুই অথবা তিনই হবে বা?”

“তিনই হবে”, টাকাগুলো পাতলুনের পাশ পকেটে গুঁজতে গুঁজতে হাসতে হাসতে বলল মিতিয়া।

“এগুলোও যাবে। সোনার খনি আছে নাকি আপনার?”

“খনি? সোনার খনি!” সর্বশক্তিতে গলা-ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিতিয়া। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। “তাহলে আর কী? একবার মুখ ফুটে বলুন যাবেন, এখানে

একজন মহিলা আছেন যিনি অমনি তিন হাজার ঢেলে দেবেন। আমাকে দিয়েছেন। খনি এতই ভালোবাসেন তিনি! খখ্‌লাকোভাকে জানেন তো?"

"আলাপ নেই, তবে শুনেছি, দেখেওছি। আপনি বলতে চান এই তিন হাজার উনি আপনাকে দিয়েছেন? বললেন, আর উনিও অমনি ঢেলে দিলেন?" সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল পিয়োতর ইলিচ।

"তাহলে আপনি কাল সূর্য শূন্যে ডানা মেলার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের দেবাদিদেবের চিরনবীন পুত্র সূর্যদেব যেই শূন্যে ডানা মেলবেন, অমনি ঈশ্বরের গুণকীর্তন ও যশোগান করতে করতে, চলে যান তাঁর কাছে, ওই খখ্‌লাকোভার কাছে, গিয়ে তাঁকেই গিয়ে খোঁজ করেই দেখুন না।"

"জানি না আপনাদের সম্পর্কটা ঠিক কী তবে আপনি যখন এত জোর দিয়ে বলছেন তার মানে, দিয়েছেন। টাকা তো আপনি হাতে পেয়েছেন, কিন্তু সাইবেরিয়ায় ঘানি টানার বদলে তো সেই টাকা নিয়ে নয় ছয় করে বেড়াচ্ছেন... তা এখন সত্যি বলুন তো আসলে এখন কোথায় চললেন, অ্যাঁ?"

"মোক্রয়েতে।"

"মোক্রয়েতে? কিন্তু এখন তো রাত।"

"সব ছিল শর্মার, সব গেছে শর্মার!" হঠাৎ মিতিয়া বলে উঠল।

"সব গেছে কী করে বলছেন? এরকম তিন-তিন হাজার থাকতে কিনা আপনি এমন কথা বলছেন?"

"আমি হাজার-টাজারের কথা বলছি না, চুলোয় যাক ওসব হাজার! আমি বলছি স্ত্রী চরিত্রের কথা।

রমণীর মন অতি সহজে বিশ্বাসী
এবং বিশ্বাসঘাতী, দূষিতও বটে।'

ইউলিসিসের সঙ্গে আমি একমত, এটা তার কথা।

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না!"

"মাতাল বলতে চান?"

"মাতাল নন, কিন্তু তার চাইতে খারাপ।"

"আমি মন মাতালে মাতাল পিয়োতর ইলিচ, মন মাতালে মাতাল! কিন্তু সে যাক গে, অনেক হয়েছে!

"এ আপনি কী করছেন? পিস্তলে গুলি ভরছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, পিস্তলে গুলি ভরছি।"

মিতিয়া সত্যি সত্যি পিস্তলের কেস্‌টা খুলে বারুদের হর্ন থেকে বেশ যত্ন করে বারুদ ভেতরে ঢেলে ভালো করে ঠাসল। তার পর একটা বুলেট নিয়ে ভেতরে গোঁজার আগে দু আঙুলে নিজের সামনে মোমবাতির আলোর কাছে তুলে ধরল।

"বুলেটটার মধ্যে দেখার কী আছে বলুন তো?" অস্বস্তিকর কৌতূহলের সঙ্গে পিয়োতর ইলিচ নজর রাখছিল।

"অমনি। মনে মনে কল্পনা করছি আর কি। এই দেখ না, এই বুলেটটা তুমি তোমার মস্তিষ্কের ভেতরে চালান করে দেবে বলে যদি মনে মনে ভেবে থাকো তাহলে পিস্তলটা চার্জ করার সময় তুমি ওটা একবার দেখে নেবে কি নেবে না?"

"ওটা দেখতে যাব কেন?"

"আমার মস্তিষ্কের ভেতরে গিয়ে ঢুকবে, তাই সেটা জিনিসটা কেমন তা দেখার জন্য আগ্রহ হবে বৈ কি। তবে হ্যাঁ, কোনো মানে হয় না ঠিকই, ক্ষণিকের মূর্খামি। এই যে এবারে কাজ শেষ হল", বুলেটটা পুরে শলাকা দিয়ে একেবারে ভেতরে চালান করে দিয়ে সে যোগ করল। "পিয়োতর ইলিচ, লক্ষ্মী ভাই আমার, বাজে, সব বাজে, ওঃ কী পরিমাণ বাজে তা যদি তুমি জানতে! এখন আমাকে এক টুকরো কাগজ দাও দেখি ভাই।"

"এই যে কাগজ।"

"না, আমার চাই মোলায়েম পরিষ্কার কাগজ, লেখার কাগজ। হ্যাঁ, এটাতে চলবে।"

এই বলে টেবিল থেকে ঝট করে একটা কলম তুলে নিয়ে দ্রুত দুটি ছত্র কাগজে লিখে ফেলে কাগজটা চার ভাঁজ করে ওয়েস্টকোটের পকেটে রেখে দিল। পিস্তল দুটো কেসে রেখে দিয়ে চাবি দিয়ে কেস বন্ধ করে সেটা হাতে তুলে নিল। তারপর পিয়োতর ইলিচের দিকে তাকাল, তার চিন্তামগ্ন মুখে দীর্ঘ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

"এবারে আসুন, যাওয়া যাক", সে বলল।

"কোথায় যাব? না, না, দাঁড়ান আপনি হয়তো এটা, এই বুলেটটা আপনার মাথার ভেতরে চালান করতে চান, তাই না? অস্বস্তিভরে পিয়োতর ইলিচ বলে উঠল।

"বুলেট নিয়ে আমি মজা করছিলাম! আমি বাঁচতে চাই, আমি জীবনকে ভালোবাসি! এটা জেনে রেখো। ওই স্বর্ণকেশী সূর্যদেব আর তার উষ্ণ আলো আমি ভালোবাসি। পিয়োতর ইলিচ, বন্ধু আমার, কী করে সরে যেতে হয় তুমি কি জান?"

"সরে যেতে হয় মানে? কী বলতে চান আপনি?"

"পথ করে দেওয়া, তোমার প্রিয়জনের জন্য এবং যাকে তুমি ঘৃণা কর তার জন্য পথ কর দেওয়া, যাতে যাকে তুমি ঘৃণা কর সে তোমার আদরের ধন হয়ে ওঠে—একেই বলে পথ করে দেওয়া! এবং তাদের বলতে হয় ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন, যাও, তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমার পাশ দিয়ে চলে যাও, আমি

"আপনি কী?"

“হয়েছে। যাওয়া যাক।”

“দোহাই আপনার!” তার দিকে তাকিয়ে পিয়োতর ইলিচ বলল, “দেখি, তাহলে কাউকে বলতে হয়, যাতে আপনার সেখানে যাওয়া আটকায়। এখন এই অসময়ে আপনার মোক্রয়েতে যাবার উদ্দেশ্যটা কী?”

“একটি স্ত্রীলোক আছে সেখানে, বুঝলে হে, স্ত্রীলোক। যথেষ্ট হয়েছে, পিয়োতর ইলিচ। বন্ধ কর!”

“শুনুন, আপনি যদিও বুনো স্বভাবের, কিন্তু কেন যেন আপনাকে আমার বরাবরই পছন্দ। আপনার জন্য আমি উদ্বেগ বোধ করছি।”

“তোমাকে ধন্যবাদ, ভাই। আমি বুনো স্বভাবের, তাই বলছ তো। বুনো, বুনো, বুনো! এই একটা কথাই আমি বারবার জোর দিয়ে বলছি বুনো! আরে এই যে, এই তো মিশা। দেখা কাণ্ড, ওর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।”

মিশা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাতে একগাদা ভাঙানি টাকা। সে জানাল যে প্রোত্‌নিকভ্‌দের দোকানে ‘সবাই লেগে পড়েছে’, বোতল নামাচ্ছে, মাছ আর চা-ও। এক্ষুনি সব তৈরি হয়ে যাবে। মিতিয়া ঝট করে দশ রুবলের একটা নোট বার করে পিয়োতর ইলিচকে দিল, তারপর আরও দশ রুবলের নোট বার করে সেটা মিশার দিকে ছুঁড়ে দিল।

“অমন কাজটিও করবেন না!” পিয়োতর ইলিচ চেঁচিয়ে উঠল “আমার বাড়িতে চলবে না। এটা একটা বাজে অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেওয়া। আপনার টাকাগুলো উঠিয়ে রাখুন, এই যে এই এখানে রাখুন। কী সব বাজে খরচ করছেন? কালকেই তো দরকার হবে, তখন আবার দশ রুবলের জন্য হাত পাততে আসবেন। এগুলোকে আবার পাশের পকেটে গুঁজতে যাচ্ছেন কেন? ওঃ, হারাবেন দেখছি!”

“শোন ভাই, লক্ষ্মীটি, চল একসঙ্গে মোক্রয়েতে যাই। কী বল?”

“আমার কথা বলছেন? আমি কেন সেখানে যেতে যাব?”

“শোন, বল তো এখনই একটা বোতল খুলে ফেলি। এসো না, জীবনের খাতিরে পান করি! আমার বড্ড ইচ্ছে করছে, বিশেষ করে তোমার সঙ্গে খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে আমি কখনও মদ খাইনি, কী বল?”

“বেশ তো হোটেলে হতে পারে, চলুন। আমি নিজেও এখন সেখানেই যাচ্ছিলাম।”

হোটেলে যাবার মতো সময় নেই। তা প্রোত্‌নিকভ্‌দের দোকানের পিছনের ঘরে হলে কেমন হয়? চাও তো আমি এখন তোমাকে একটা ধাঁধা ধরি।”

“তা ধর।”

মিতিয়া তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে ভাঁজ খুলে দেখাল। বেশ বড়ো বড়ো স্পষ্ট হস্তাক্ষরে তাতে লেখা আছে

'আমি সারা জীবনের জন্য নিজের দণ্ডবিধান করছি, আমার সারাটা জীবনকে আমি শাস্তি দিচ্ছি।'

"না: সত্যি বলছি, কাউকে না কাউকে না জানালে নয়। এক্ষুনি যাব, গিয়ে বলে আসব", কাগজের লেখাটা পড়ার পর পিয়োতর ইলিচ বলল।

"সে সময় তুমি পাবে না ভাই। চল, একটু মদ খাওয়া যাক। নাও, চটপট!"

প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানটা রাস্তার কোনায়, বলতে গেলে পিয়োতর ইলিচের বাড়ির মাত্র একটা বাড়ি পরে। ধনী ব্যবসায়ীদের এই দোকানটা ছিল আমাদের শহরের সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান মুদিদোকান, অমনিতেও একেবারে মন্দ নয়। বিখ্যাত 'এলিসেইয়েভ্ ব্রাদার্স কর্তৃক বোতলজাত মদ্য', নানারকম ফলমূল, সিগার, চা, চিনি, কফি ইত্যাদি মুদিখানার যা যা জিনিস রাজধানী পেতের্বুর্গের যে কোনো দোকানে পাওয়া যায় এখানেও সে সবই পাওয়া যেত। তিনটি দোকান কর্মচারী সব সময় মোতায়েন থাকত, দুটো ফুটফরমাইসের ছেলেকে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে হত। যদিও আমাদের এই অঞ্চলটা বেশ গরিব হয়ে পড়েছে, জমিদাররা সব এলাকা ছেড়ে অন্যান্য জায়গায় চলে গেছে, ব্যবসাবাণিজ্য মন্দার দিকে, তবু মুদিখানাগুলি কিন্তু সেই আগের মতোই রমরমিয়ে চলছে, এমনকি বছরে বছরে তাদের রমরমা যেন বেড়েই চলেছে। এই জিনিসগুলির ক্রেতার কোনো অভাব ছিল না।

দোকানের লোকেরা অধীর হয়ে মিতিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিন চার সপ্তাহ আগে সে যে ঠিক এইভাবে এক খেপে নানারকম পণ্যজাত আর মদ মিলিয়ে বেশ কয়েক শ রুবলের মাল পুরোপুরি নগদে নিয়েছিল একথা তাদের বেশ মনে আছে। অবশ্য ধার হলে বিশ্বাস করে তারা তাকে দিতও না। তাদের এও মনে আছে যে আজকের মতো সে দিনও তার হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল রামধনু রঙের পুরো একটা বাণ্ডিল, টাকাগুলো সে দু হাতে এদিক ওদিক ছড়িয়েছিল, কোনো দরকষাকষির মধ্যে যায়নি, এত মদ, এত পণ্যসামগ্রী ইত্যাদি দিয়ে তার কী হবে সে নিয়ে তারা কোনো ভাবনাচিন্তা করেনি, করতে চায়ওনি। গোরা শহরে পরে কথা উঠেছিল যে সে তখন গ্রুশেন্‌কাকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে মোক্রয়েতে গিয়েছিল, সেখানে 'এক রাতে এবং তার পরের এক দিনে সে এক ফুঁয়ে তিন হাজার উড়িয়ে দেয়, উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসবের শেষে যখন ফিরে আসে তখন সে একেবারে কপর্দকশূন্য, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো ন্যাংটো, ফকির।' পথে সে জিপসিদের পুরো একটা দঙ্গলকে উঠিয়ে নিয়েছিল। তারা সেই সময় আমাদের অঞ্চলে ছাউনি ফেলেছিল। তার মাতাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে জিপসিগুলো নাকি দুদিন ধরে তার কাছ থেকে অগুনতি টাকা বার করে নিয়েছে, কত যে দামি দামি মদ ওর পয়সায় গিলেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মোক্রয়েতে সে যে জংলি চাবাভুসোগুলোকে আর গ্রামের ছুঁড়িগুলোকে শ্যাম্পেন খাইয়েছিল এবং চাষি বৌগুলোকে ঠেসে শহরের নানারকম মিষ্টি আর স্ট্রাসবুর্গ পাই খাইয়েছিল, তাকে

নিয়ে লোকে মজা করে হাসতে হাসতে এই সব গল্প করত। মিতিয়া যে তখন নিজমুখে অকপটে এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিল যে অতটা সময়ের ওই 'রঙ্গতামাশার' মধ্যে গ্রুশেন্‌কার কাছ থেকে সে যা পেয়েছিল তা শুধু এই যে 'গ্রুশেন্‌কা তাকে তার পায়ে চুমো খেতে দিয়েছিল, এর বেশি আর কিছুর অনুমতি দেয়নি', তার এই কথা নিয়েও আমাদের এখানে লোকে হাসাহাসি করত—বিশেষত হোটেলে—অবশ্য বলাই বাহুল্য তার মুখের ওপর নয়, তার মুখের ওপর হাসাহাসি করা বেশ খানিকটা বিপজ্জনক ছিল।

পিয়োতর ইলিচের সঙ্গে মিতিয়া যখন দোকানে পৌঁছুল তখন তারা দেখতে পেল দোকানে ঢোকার মুখে ইতিমধ্যেই একটা তিন ঘোড়ার গাড়ি তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছোটো বড়ো নানা আকারের ঘণ্টা আর ঘুণ্টির মালায় সাজানো ঘোড়াগুলো গালিচায় ঢাকা গাড়িটাতে জোতা হয়ে গেছে, গাড়োয়ান আন্দ্রেই অপেক্ষা করছে মিতিয়া কখন আসে। দোকানের লোকেরা এতক্ষণে জিনিসপত্র সমেত একটি বাক্সের প্রায় পুরোটাই 'গুছিয়ে এনেছে', এখন শুধু মিতিয়ার আগমনের প্রতীক্ষা। সে এলেই বাক্সটা পেরেক লাগিয়ে বন্ধ করে গাড়িতে তুলে দেওয়া হবে। পিয়োতর ইলিচ তো অবাক।

"আরে, এত তাড়াতাড়ি গাড়ি এসে গেল কী করে?" মিতিয়াকে সে জিগ্‌গেস করল।

তোমার কাছে যখন ছুটতে ছুটতে আসছিলাম সেই সময় পথে এই আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে দেখা, ওকে বললাম গাড়িটা নিয়ে যেন সোজা এখানে এই দোকানে চলে আসে। সময় নষ্ট করার উপায় নেই। গত বার তিমফিয়েইকে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিমফিয়েই তো এখন উধাও, আমার আগেই এক মায়াবিনীকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে! আমাদের কী খুব একটা দেরি হয়ে যাবে? কী বল তুমি আন্দ্রেই?"

"বড়জোর আমাদের এক ঘণ্টা আগে পৌঁছুবে, তাও হবে না, কুল্যে এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকলেও থাকতে পারে!" আন্দ্রেই তড়বড়িয়ে বলে উঠল। "তিমফেইয়ের যাবার আগে আমিই তো তার সব বন্দোবস্ত করে দিলাম, কী ভাবে যাবে জানি। ওদের চলা আর আমাদের চলা এক নয়, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আমাদের আগে ওরা যাবে বললেই হল? এক ঘণ্টা আগে পৌঁছুনোর সাধ্যিই হবে না!" উত্তেজিত ভাবে তাকে বাধা দিয়ে বলল আন্দ্রেই। আন্দ্রেই নামে এই গাড়োয়ানটা তেমন একটা বুড়ো নয়, শুকনো রোগা চেহারা, তার মাথার চুল কাটা, পরে আছে আঁটোসাঁটো ধরনের কুঁচি দেওয়া একটা কোর্তা, বাঁ হাতের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে ওপরে পরার উপযোগী মোটা কাপড়ের ঢোলা চাষাড়ে জামা।

"মাত্র এক ঘণ্টাও যদি পিছিয়ে থাক তাহলে ভোদ্‌কার জন্য পঞ্চাশ রুবল পাবে।"

"এক ঘণ্টার ভরসা তো দিতেই পারি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ।

মিতিয়া যদিও ব্যস্তসমস্ত হয়ে তদারক করতে লেগে গেল, তবু যে ভাবে কথা বলছিল বা হুকুম দিচ্ছিল তা কেমন যেন বেখাপ্পা ও এলোমেলো গোছের হয়ে যাচ্ছিল, সেগুলির মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। একটা শুরু করে তার শেষটা ভুলে যাচ্ছিল। পিয়োতর ইলিচ দেখল লোকটাকে উদ্ধার করার জন্য একাজে তার জড়িয়ে না পড়লেই নয়।

"চারশ রুবলের হওয়া চাই, চারশ'র কম নয়, হুবহু সেবারের মতো হয় যেন", মিতিয়া হুকুম দিল। চার ডজন শ্যাম্পেন, একটা বোতলও কম হলে চলবে না।"

"অত কেন? কী হবে অত দিয়ে? দাঁড়াও, দাঁড়াও!" পিয়োতর ইলিচ্ হুঙ্কার' দিয়ে উঠল। "এটা কীসের বাক্স? কী আছে এর মধ্যে? বলতে চাও, চারশ রুবলের জিনিস আছে এর মধ্যে?"

কর্মব্যস্ত দোকান-কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ মিষ্টি কথায় তাকে বুঝিয়ে বলল যে এই প্রথম বাক্সটাতে মাত্র আধ ডজন শ্যাম্পেন এবং কিছু টুকটাক হালকা খাবার, মিষ্টি, ফলের রসের লজেন্স ইত্যাদি 'প্রাথমিক ভাবে যে সব জিনিস দরকার হতে পারে' একমাত্র সেগুলোই রাখা হয়েছে। কিন্তু 'ভোগ্যপণ্যের' যেটা বড়ো অংশ সেটা এখন প্যাক করা হচ্ছে এবং এক্ষুনি সেই আগের বারের মতো বিশেষ উপায়ে, একটা বিশেষ গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সে গাড়িটাও একটা তিন ঘোড়ার গাড়ি, যথাসময় তুরন্ত জায়গায় পৌঁছে যাবে, 'দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ যখন পৌঁছুবেন তার মাত্র এক ঘণ্টা পরে, এর বেশি নয়।'

"এক ঘণ্টার বেশি নয়, এক ঘণ্টার বেশি যেন না হয়, মিষ্টি ফলের রসের লজেন্স একটু বেশি করে, আর ওই নরম হাওয়া মিঠাইও রাখবে—ওখানকার ছুঁড়িরা আবার ওগুলো ভালোবাসে কিনা", মিতিয়া উত্তেজিত হয়ে জোর দিল।

"হাওয়া মিঠাই—তা না হয় রইল। কিন্তু চার ডজন শ্যাম্পেন তোমার কীসের দরকার? এক ডজনই যথেষ্ট।" পিয়োতর ইলিচ এবারে প্রায় চটেমটেই বলল। সে দরাদরি করতে লেগে গেল, হিসাব চাইল, কিছুতেই সন্তুষ্ট হওয়ার পাত্র সে নয়। এত করে মোটে একশ রুবল বাঁচাতে পারল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল সব মিলিয়ে তিন শ রুবলের বেশি দামের মাল যেন পাঠানো না হয়।

"ধুত্তোর, চুলোয় যাক!" হঠাৎ যেন টনক নড়তে চেঁচিয়ে উঠল পিয়োতর ইলিচ। আরে, আমার এখানে করার কী আছে? টাকা তোমার, মুফতে যখন পেয়ে গেছ তখন ফেলে দিলে দাও না।"

"এদিকে, ওগো আমার ভান্ডারী, এদিকে। রাগ কোরো না", এই বলে মিতিয়া তাকে টানতে টানতে দোকানের পিছনের ঘরটাতে নিয়ে এলো। "এই যে এখানে, এখুনি বোতল এনে দেবে, খেয়ে দেখা যাবে। আহা পিয়োতর ইলিচ, চলই না, একসঙ্গে যাওয়া যাক। কেননা তুমি লোকটা বড়ো ভালো, এরকম লোককেই আমার পছন্দ।"

মিতিয়া একটা বেতের চেয়ারে গিয়ে বসল। সেটার সামনে একটা ছোট্ট টেবিল— একটা নোংরা ন্যাপকিনে ঢাকা। পিয়োতর ইলিচ তার মুখোমুখি বসল। চোখের পলকে শ্যাম্পেন চলে এলো। দোকানের লোকেরা জিগ্‌গেস করল মহাশয়রা ঝিনুক খেতে ইচ্ছা করেন কিনা—'অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণির ঝিনুক' এই শেষ চালানে পাওয়া গেছে।'

"নিকুচি করেছি তোমাদের ঝিনুকের! ওসব আমি খাই নে। তাছাড়া কিছুর দরকারও নেই", প্রায় রেগে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল পিয়োতর ইলিচ

"ঝিনুক খাবার সময় নেই", মিতিয়া বলল, "তাছাড়া খিদেও নেই। জান বন্ধু..." হঠাৎ সে আবেগভরে বলে উঠল, "এই সব বিশৃঙ্খলা আমি কখনও পছন্দ করতাম না।"

"কেই বা করে! তিন ডজন, মাফ কর ভাই, ওই চাষাভুসোগুলোর পিছনে... যে কাউকে খেপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।"

"না না আমি সে কথা বলছি না, আমি বলছি পরম শৃঙ্খলার কথা। আমার কোনো শৃঙ্খলার বালাই নেই, পরম শৃঙ্খলার কোনো বোধ আমার মধ্যে নেই কিন্তু... সে সবই তো শেষ হয়ে গেছে ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। বড়ো দেরিতে হল। মরুক গে যা! সারাটা জীবনই তো কাটল বিশৃঙ্খলার মধ্যে, শৃঙ্খলা আনা দরকার। কথার খেলা বলছ, অ্যাঁ?"

"কথার খেলা নয়, প্রলাপ বকছ।"

"জগতে পরম যিনি তাঁর হোক জয়,
আমাতে পরম যিনি তাঁর হোক জয়!

এই কবিতাটা কোনো এক সময় আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কবিতা তো নয়, চোখের জল নিজেরই রচনা তবে হ্যাঁ তখন নয় যখন ক্যাপ্টেনকে দাড়ি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম

"হঠাৎ তার কথা উঠল কেন?"

"হঠাৎ তার কথা উঠল কেন? ও কিছু নয়! সবের শেষ আছে, সব এক সমতলে চলে আসে, সেটাই সীমা, সেখানেই দাঁড়ি।"

"সত্যি কথা বলতে গেলে কি, তোমার পিস্তল দুটো কিন্তু কেবলই আমার মনের মধ্যে হানা দিচ্ছে।"

পিস্তল—আরে ওটা কিছু নয়। নাও, খাও। ওসব উদ্ভট কল্পনা ছাড় তো। জীবনকে ভালোবাসি, বড়ো বেশিই ভালোবেসে ফেলেছি জীবনকে, নির্লজ্জের মতো বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। যাক; অনেক হয়েছে! এসো ভায়া, জীবনের জন্য পান করি, জীবনের জন্য আমি প্রস্তাব করছি, জীবনের জন্য! আমার এত আত্মতুষ্টি কেন? আমি একটা নীচাশয়, কিন্তু আমি আত্মতুষ্ট। তবে একটা কথা এই যে আমি যে নীচাশয় একথা ভেবে আমি কষ্ট পাই, কিন্তু আমি আত্মতুষ্ট। এই সৃষ্টির,

মঙ্গল কামনার জন্য মনে মনে তৈরি, কিন্তু   একটা অনিষ্টকর কীট যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে সেটাকে ধ্বংস করতে হবে, যাতে সেটা আর কিলবিল করতে না পারে, অন্যদের জীবন নষ্ট করতে না পারে।   এসো, এসো আমার ভাইটি, জীবনের জন্য পান করি! জীবনের চাইতে দামি আর কী হতে পারে! কিছু না, কিছুই না! জীবনের জন্য, একজন রাজরাজেশ্বরীর জন্য, এসো আমরা পান করি।”

“জীবনের জন্য অবশ্যই, সম্ভবত তোমার ওই রাজরাজেশ্বরীর জন্যও।”

এক গ্লাস করে খেল। মিতিয়াকে যদিও উচ্ছ্বসিত এবং খোলামেলা গোছের দেখাচ্ছিল, তবু সে কেমন যেন বিষণ্ন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা দুর্নিবার চিন্তার ভারী বোঝা তার ওপর চেপে বসে আছে।

“মিশা   এই যে তোমার মিশা এসে ঢুকল বুঝি? মিশা, লক্ষ্মী বাবা আমার, এদিকে এসো তো, আগামীকাল যে স্বর্ণকেশী জ্যোতির্ময় সূর্যদেবতার উদয় হবে তার জন্য আমার হয়ে এই গেলাসটা খেয়ে ফেল

“আরে এসব আবার ওকে দিতে যাচ্ছ কেন?” পিয়োতর ইলিচ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

“আহা, এটা অন্তত করতে দাও। আমি চাই, এটা আমার ইচ্ছে।”

“ওঃ কী যে কর!”

মিশা গ্লাসটা খালি করে দিয়ে, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

“অনেক দিন মনে রাখবে”, মিতিয়া মন্তব্য করল। “আমি মেয়েদের ভালোবাসি, তাদের আমি ভালোবাসি! স্ত্রী জাতি কী? ধরণীর অধীশ্বরী! আমার মন খারাপ, বড়ো খারাপ, পিয়োতর ইলিচ। হ্যামলেটের কথা মনে আছে? ‘আমার মন এত খারাপ, এত খারাপ, হোরাশিও   আহা, বেচারি ইওরিক!’ হয়তো আমিই ইওরিক। ঠিক এই মুহূর্তে আমিই ইওরিক পরে মড়ার মাথার খুলি।’

পিয়োতর ইলিচ চুপচাপ শুনে গেল, পরে মিতিয়াও কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইল।

“এটা তোমাদের কোন্ জাতের কুকুর?” ঘরের কোনায় বেশ সুন্দর দেখতে কালো চোখের, সোনালি রঙের একটা ছোট্ট কুকুর, দেখতে পেয়ে হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে সে জিগ্‌গেস করল।

“এটা আমাদের মালকিন ভার্‌ভারা আলেক্সইয়েভ্‌নার কোলের কুকুর”, দোকান-কর্মচারীটি জবাব দিল, “এই কিছুক্ষণ আগে নিজেই নিয়ে এসেছিলেন, ভুলে ফেলে গেছেন আমাদের এখানে। এখন কোলে করে তুলে নিয়ে ফেরত দিয়ে আসতে হবে।”

“এরকম একটা কুকুর আমি এর আগে একবার পেয়েছিলাম   রেজিমেন্টে...” স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো মিতিয়া বলল, “তবে সেটার পেছনের একটা পা ভাঙা ছিল।...

ভালো কথা পিয়োতর ইলিচ, আমি তোমাকে একটা কথা জিগ্‌গেস করতে চাই: তুমি কি জীবনে কখনও কিছু চুরি করেছ?"

"এ আবার কী প্রশ্ন?"

"না, না, ওই অমনি। মানে, কারও পকেট থেকে? অন্য কারও পকেট থেকে? আমি সরকারি টাকার কথা বলছি না, সরকারি টাকা সবাই মারে সে তুমিও মারবে তাতে আর বিচিত্র কী?

"চুলোয় যাও তুমি।"

"আমি বলছি অন্যদের টাকার কথা। সরাসরি কারও পকেট থেকে বা মানিব্যাগ থেকে। কী বল?"

"একবার করেছিলাম, টেবিল থেকে মা'র একটা সিকি চুরি করেছিলাম, তখন আমার বয়স নয় বছর। চুপেচুপে সরিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রেখেছিলাম।"

"তারপর? তারপর কী হল?"

"কী আবার হবে? কিছুই হল না। তিন দিন ধরে চেপে রেখে দিলাম, তারপর নিজেরই লজ্জা হল, দোষ স্বীকার করে ফেরত দিলাম।"

"তারপর কী হল?"

"স্বাভাবিক ভাবেই, চাবকানি খেলাম। কিন্তু একথা কেন? তুমি নিজে কিছু চুরি করনি তো?"

"করেছি।" চালাক-চালাক ভাব করে চোখ টিপল মিতিয়া।

"কী চুরি করেছ?" পিয়োতর ইলিচ কৌতূহল প্রকাশ করল।

"মা'র কাছ থেকে একটা সিকি চুরি করেছিলাম, তখন আমার বয়স নয় বছর, তিন দিন পরে ফেরত দিয়ে দিলাম", এই বলে মিতিয়া চট করে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল।

"দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, একটু তাড়াতাড়ি করলে হয় না?" দোকানের দরজার বাইরে হঠাৎ আন্দ্রেই ডেকে বলল।

"কী? তৈরি? চল, যাওয়া যাক!" মিতিয়া চঞ্চল হয়ে উঠল। "হ্যাঁ, আরও একটা শেষ কথা বলার আছে এবং আন্দ্রেইকে পথ যাত্রার আগে, এখুনি, এক গ্লাস ভোদ্‌কা দিতে হয়। আর খানিকটা ব্র্যান্ডিও একটা ছোট গ্লাসে! আর এই বাক্সটা..." পিস্তলের বাক্সটা দেখিয়ে বলল, "এটা আমার সিটের তলায় দিয়ে দাও। চলি, পিয়োতর ইলিচ, যদি কোনো অপরাধ করে থাকি ভুলে যেয়ো।"

"কাল ফিরে আসছ তো?"

"অবশ্যই।"

"মাফ করবেন, হিসেবটা?" এক লাফে সামনে এগিয়ে এলো দোকান-কর্মচারীটি।

"ও হ্যাঁ, হিসেব! অবশ্যই!"

আবার সে নোটের বান্ডিলটা পকেট থেকে টেনে বার করল, তিনটি রামধনুরঙা

নোট বার করে কাউন্টারে ছুড়ে দিয়ে দ্রুত দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সকলে তাকে অনুসরণ করল, মাথা নুইয়ে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সবেমাত্র ব্র্যান্ডি গলাধঃকরণ করার পর আন্দ্রেই হেঁচকি তুল এক লাফে কোচবক্সে গিয়ে উঠে বসল। কিন্তু মিতিয়া যেই গাড়িতে বসতে যাবে অমনি একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, আচমকা তার সামনে এসে হাজির হল ফেনিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে মিতিয়ার সামনে হাত জোড় করে সে ধপ করে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

"দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, বাবু গো, লক্ষ্মী বাবু আমার, দিদিমণির কোনো ক্ষেতি করবেন না! আমি তো আপনাকে সবই খুলে বললাম। ওর ওই মনের মানুষটিরও কোন ক্ষতি করবেন না, মানুষটি এককালে ত ওরই ছিল, ওরই মানুষ। এবারে আগ্রাফেনা ইভানভ্‌নাকে বিয়ে করবে, দোহাই আপনার, আরেক জনের জীবন নষ্ট করবেন না!"

"বটে, বটে, এই তা হলে ব্যাপার! মানে, কিছু একটা পাকানোর মতলবে তুমি ওখানে যাচ্ছ!" পিয়োতর ইলিচ আপন মনে বিড়বিড় করে বলল। "এবারে সব বোঝা গেল। এখন আর না বোঝার কী আছে? দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, যদি তুমি মানুষ হও তাহলে ওই পিস্তলজোড়া দিয়ে দাও বলছি, এখুনি দাও", জোর গলায় সে চেঁচিয়ে মিতিয়াকে বলল। "শুনছ দ্‌মিত্রি?"

"পিস্তলের কথা বলছ? সবুর কর ভায়া, ও আমি পথে কোনো জলা জায়গায় ফেলে দেব 'খন", মিতিয়া জবাব দিল। "এই ফেনিয়া উঠে দাঁড়াও দেখি, আমার সামনে অমন পড়ে থেকো না। আরে বাবা মিতিয়া কারও কোনও অনিষ্ট করবে না, এই বোকা লোকটা এর পর আর কারও অনিষ্ট করতে যাচ্ছে না।" এরই মধ্যে গাড়িতে উঠে জায়গায় বসে ফেনিয়ার উদ্দেশে চেঁচিয়ে সে বলল, "শোন ফেনিয়া, এইমাত্র আমি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কোরো, দয়া কর এই নরাধমকে। কিন্তু যদি নাও কর, তাতেও কিছু আসে যায় না! কারণ এখন আমার কাছে সব সমান! হাঁকাও আন্দ্রেই, উড়িয়ে নিয়ে চল!"

আন্দ্রেই গাড়ি ছেড়ে দিল। ঝুন্‌ঝুন্ বাজতে লাগল গাড়ির ঘণ্টা।

"চললাম, পিয়োতর ইলিচ! তোমার জন্য রইল আমার শেষ অশ্রুবিন্দু!

'মাতাল নয়, অথচ কী গাঁজাখুরিই না ছাড়তে পারে!' ওকে চলে যেতে দেখে পিয়োতর ইলিচ মনে মনে ভাবল। একবার ভেবেছিল তিন ঘোড়ারই অন্য যে মালবাহী গাড়িটা সেটাতে বাদবাকি খাদ্য সামগ্রী ও মদ কতটা কী ভাবে তোলা হয় তা দেখার জন্য থেকে যায়, কেন না তার মন বলছিল গোনাগুনিতে কারচুপি করবে, মিতিয়াকে নির্ঘাত ঠকিয়ে দেবে। কিন্তু হঠাৎ নিজের ওপরই তার রাগ ধরে গেল, 'ধুত্তোর' বলে মাটিতে থুতু ফেলে বিলিয়ার্ড খেলতে তার সেই হোটেলে চলে গেল।

'বোকা কোথাকার! যদিও লোকটা অমনিতে ভালোই!' পথে চলতে চলতে সে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল। 'গ্রুশেন্কার 'এককালের' সেই লোকটি, সেই যে কোনো এক অফিসার—তার কথা আমি শুনেছি বটে। কিন্তু সে যদি এসেই থাকে, তাহলে   ইশ্, ওই পিস্তল দুটো! ধুৎ, মরুক গে যা! আমি ওর দেখাশোনা করার চাকর নাকি? যা খুশি করুক গে! তা ছাড়া, কিছু হবেও না। ওই গলাবাজিই সার। এ সব লোক প্রাণ ভরে মদ খায়, মারপিট করে, মারপিট করতে করতে আবার মিটমাটও করে ফেলে। এরা কি কোনো কাজের লোক নাকি? 'সরে যাব', 'নিজেই নিজের দণ্ডবিধান করছি'—এসব আবার কেমন ধারা কথা? — কিছুই হবে না! এই কথাগুলো সে মাতাল অবস্থায় হাজারবার হোটেলে চেঁচিয়ে বলেছে। এখন অবশ্য মাতাল নয়। 'মন মাতালে মাতাল'—আহা, কথার জাহাজ এই পাজির পা-ঝাড়াগুলো! আমি ওর দেখাশোনা করার চাকর নাকি? মারামারি যে করেছে তা না হয়ে যায় না। সারাটা মুখ তো রক্তে মাখামাখি। কার সঙ্গে হতে পারে? হোটেলে গেলেই জানা যাবে। রুমালটাও রক্তে ভেজা।   ছিঃ, কী যাচ্ছেতাই! আমার ঘরের মেঝেতে এখনও লেগে রয়েছে!   থাক গে।'

হোটেলে যখন সে এলো তখন তার মনমেজাজ রীতিমতো খিচড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিল। এক হাত খেলার পর মনের প্রফুল্লতা ফিরে এলো। আরেক হাতও খেলল, তারপর হঠাৎই খেলার সঙ্গীদের একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, তাকে বলল যে দ্মিত্রি কারামাজভের হাতে আবার টাকা এসেছে, হাজার তিনেক হবে, সে তার নিজের চোখে দেখা, আবার চলল মোক্রয়েতে, গ্রুশেন্কাকে নিয়ে হুল্লোড়বাজি করতে।   এই সংবাদটিতে উপস্থিত শ্রোতাদের প্রায় সকলেই এত বেশি কৌতূহল প্রকাশ করল যা অপ্রত্যাশিত ছিল। এই নিয়ে তাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, কেউ হাসল না, কেমন যেন অদ্ভুত রকমের একটা গুরুত্ব দিয়েই সংবাদটা গ্রহণ করল। এমনকি খেলাও বন্ধ হয়ে গেল।

"তিন হাজার? কিন্তু তিন হাজার ও কোত্থেকে পেতে পারে?"

এরপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। খখ্লাকোভা সংক্রান্ত খবরটি নিয়ে তারা সন্দেহ প্রকাশ করল।

"বুড়ো বাপের ওপর ডাকাতি করেনি তো? বলা যায় না।"

"তিন হাজার! কিছু একটা গোলমাল আছে।"

"বড়াই করে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল না যে বাবাকে খুন করবে? সে কথা তো এখানে সবাই শুনেছে। ঠিক তিন হাজারের কথাই কিন্তু তখন বলেছিল।..."

পিয়োতর ইলিচ ওদের এসব কথা শুনে যেতে লাগল। ওদের জেরার উত্তরে তার কথাগুলো হঠাৎ নীরস ও সংক্ষিপ্ত ধরনের হয়ে দাঁড়াল। মিতিয়ার হাতে ও মুখে যে রক্ত লেগে ছিল তার উল্লেখমাত্র সে করল না, অথচ এখানে আসার

সময় গোড়াতে সেটাই বলবে বলে ভেবেছিল। তৃতীয় দফার খেলা শুরু হয়ে গেল। অল্প অল্প করে মিতিয়ার প্রসঙ্গ থিতিয়ে এলো। কিন্তু তিন হাত খেলার পর পিয়োতর ইলিচ আর খেলতে চাইল না। নৈশ ভোজনটা এখানে সারবে বলেই ভেবেছিল, কিন্তু তা না করে খেলা শেষ করার পর বিলিয়ার্ডের লাঠিটা রেখে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাজার চত্বরে চলে আসার পর কেমন একটা ধন্ধ লেগে যেতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, এমনকি নিজের কথা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, আরে তাই তো, সে যে এখন ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতে যেতে চাইছিল, উদ্দেশ্য ছিল সেখানে কিছু ঘটেছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া! 'নাঃ, শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখা গেল নেহাৎ একটা আজেবাজে ব্যাপারে অন্যের বাড়ির লোকজনকে জাগিয়ে তুলে একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেললাম! ধুত্তোর, মরুক গে! আমি কি ওদের দেখাশোনা করার চাকর নাকি?'

মন মেজাজ যখন ভয়ঙ্কর খিচড়ে গেছে এই অবস্থায় সে সোজা বাড়ির পথ ধরল। এমন সময় তার মনে পড়ে গেল ফেনিয়ার কথা। 'ওঃ হো, তাই তো, এখন ওকে জিগ্‌গেসবাদ করে দেখলে হত না!' এই ভেবে তার আক্ষেপ হল। 'তাহলে হয়তো সব জানা যেত।' ফেনিয়ার সঙ্গে কথা বলে সব কিছু জানার এমন একটা অদম্য স্পৃহা আর অসহিষ্ণু একরোখা ভাব তাকে পেয়ে বসল যে বাড়ি পৌঁছুতে তখনও অর্ধেক পথ বাকি, এমন সময় ঝট করে ঘুরে গিয়ে সে চলল মরোজ়ভার বাড়ির দিকে যেখানে গ্রুশেন্‌কা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত।

গেটের কাছে এসে গেটের দরজায় করাঘাত করল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করে করাঘাতের যে আওয়াজ উঠল তাতে যেন সে আবারও হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল, আবার তার রাগও হল। এদিকে কেউ সাড়াও দিচ্ছে না। বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমোচ্ছে।

'এখানেও একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ছাড়ব!' এই ভেবে মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু কোথায় তার একেবারে চলে যাবার কথা, তা নয়, সে আবারও হঠাৎ দরজায় দুমদাম ঘা মারতে লাগল—এবারে সর্বশক্তিতে। সারা রাস্তা গমগম করে উঠল।

'নাঃ, কিছু হবার নয়! ঠিক আছে, ঘা মারতে মারতে দেখাই যাক না কত দূর গড়ায়।' একেক বার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে সে বিড়বিড় করতে লাগল। গেটের ওপর করাঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে চলল।

## ছয়

## নিজেই আসছি!

এদিকে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ ঝড়ের বেগে রাস্তায় উড়ে চলল। মোক্রয়ে জায়গাটা সাত ক্রোশের সামান্য একটু বেশি দূরে হবে, কিন্তু আন্দ্রেইয়ের তিন ঘোড়ার গাড়িটা

এত জোর ছুটল যে তাতে সোয়া এক ঘণ্টার মধ্যে সে দূরত্ব পাড়ি দেওয়া যায়। গাড়ির এই দ্রুত গতিতে মিতিয়া হঠাৎ যেন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। স্নিগ্ধ বাতাস, একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা, নির্মল আকাশে জ্বলজ্বল করছে বড়ো বড়ো তারা। এটা ছিল ঠিক সেই রাতটি, হয়তো বা ঠিক সেই ক্ষণটি যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আলিয়োশা বিহ্বল হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তাকে ভালোবাসবে, চিরকাল ভালোবাসবে।

কিন্তু মিতিয়ার মনের মধ্যে সব অস্পষ্ট, বড়ো অস্পষ্ট। যদিও এখন অনেক কিছুই তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে তার সমগ্র সত্তা দুর্বার বেগে ধাবিত হচ্ছিল মাত্র একটি লক্ষ্যে। মিতিয়ার একমাত্র লক্ষ্য তার হৃদয়ের সেই অধীশ্বরী, যার কাছে সে উড়ে চলেছে ঝড়ের বেগে, শেষবারের মতো তাকে একবার চোখের দেখা দেখবে বলে। এখানে শুধু একটি কথা বলে রাখি এই নিয়ে কিন্তু তার মনের মধ্যে মুহূর্তের বিতর্কেরও কোনও অবকাশ ছিল না। লোকে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না যদি আমি বলি এই যে নতুন লোকটি, তার প্রতিদ্বন্দ্বী এই 'অফিসারটি' বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে ভুঁইফোঁড়ের মতো যার উদয়, এত ঈর্ষাকাতর স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও মিতিয়া কিন্তু তার প্রতি লেশমাত্র ঈর্ষা বোধ করল না। অন্য যে কোনো লোক হলে এরকম কারও আবির্ভাব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঈর্ষা করে বসত, হয়তো তার এই রুধিরাপ্লুত ভয়ঙ্কর হাত দুটো আরও একবার রক্তে ভেজাত। কিন্তু এখন মিতিয়া তার তিন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঝড়ের বেগে উড়ে যেতে যেতে ওই লোকটির প্রতি, প্রেয়সীর 'প্রথম মানুষটির' প্রতি বিদ্বেষের ভাব তো পোষণ করছেই না, এমনকি বৈরভাবও উপলব্ধি করছে না—অবশ্য এটাও ঠিক যে লোকটাকে সে এখনও চোখেও দেখেনি।

'এখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই যে এটা তাদের দুই নারী পুরুষের অধিকার। এটা ছিল ওর প্রথম প্রেম, যে প্রেম পাঁচ বছরেও সে ভুলে যায়নি। তার মানে এই পাঁচটি বছর ও শুধু সেই মানুষটিকেই ভালোবেসেছিল! তাহলে আমি? আমি সেখানে আসি কী করে? আমি এখানে কী? কী করার আছে আমার? সরে দাঁড়াও মিতিয়া, পথ করে দাও! তাই তো আমার এখন কী ভূমিকা? এখন তো অফিসারের কথা যদি ছেড়েও দিই, অমনিতেই সব চুকে বুকে গেছে। অফিসারটির আবির্ভাব যদি আদৌ না ঘটত তাতেই বা কী? সব শেষ হয়ে যেত...'

মোটামুটি ভাবে এই রকম সব কথা দিয়েই সে তার মনের উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারত, যদি অবশ্য বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা তার থাকত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বিচার বিবেচনা করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। মিতিয়ার এখনকার এই যে সঙ্কল্প তার সবটাই ছিল বিচারবিবেচনাহীন। এই কিছুক্ষণ আগে ফেনিয়ার মুখের প্রথম কথাতে মিতিয়ার মনে যে অনুভূতির উদ্ভব ঘটেছিল পূর্ণমাত্রায় তারই বশবর্তী হয়ে মুহূর্তের মধ্যে সে সঙ্কল্প করে বসেছিল এবং তার যা যা পরিণতি হতে পারে তাও মেনে নিয়েছিল। তবু যে সঙ্কল্পই সে গ্রহণ করে থাকুক না কেন,

তার মনের মধ্যে সবই অস্পষ্ট, এতটা অস্পষ্ট ও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক যে তার সঙ্কল্পও তাকে স্বস্তি দিতে পারছে না। পিছনে এমন অনেক কিছু ছিল, বড়ো বেশি মাত্রায় ছিল যা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। কোনো কোনো মুহূর্তে এটা তার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, কেন না সে নিজেই ও নিজের দণ্ডবিধান করে কাগজে কলমে লিখে দিয়েছিল 'নিজেই নিজের দণ্ডবিধান করছি, নিজেকে শাস্তি দিচ্ছি'! সেই কাগজটা এই তো, তার পকেটেই আছে, তৈরিই আছে। পিস্তলে গুলি ভরা আছে, আগামীকাল সকালে 'স্বর্ণকেশী জ্যোতির্ময় আদিত্যদেবের' প্রথম উষ্ণ কিরণকে কী ভাবে অভ্যর্থনা জানাবে তাও সে ইতিমধ্যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে অথচ অন্যদিকে, এতদসত্ত্বেও, আগেকার সব কিছুর সঙ্গে পিছনে যা পড়ে রইল, যা তাকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলছে তার সঙ্গে হিসাব চুকিয়ে দেওয়া... যে অসম্ভব এটাও সে উপলব্ধি করতে পারছিল, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছিল; আর সেই চিন্তা তার মনের মধ্যে গেঁথে বসে তাকে হতাশায় জর্জরিত করে তুলছিল। পথে এমন একটা মুহূর্তও এসেছিল যখন হঠাৎ তার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল আন্দ্রেইকে গাড়ি থামিয়ে দিতে বলে এক লাফে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে এবং গুলি ভরা পিস্তলটা বার করে ভোর পর্যন্ত আর অপেক্ষা না করে সব চুকিয়ে দেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তটি নিমেষে স্ফুলিঙ্গের মতো উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যায়। আর তিন ঘোড়ার গাড়িটাও উড়তে উড়তে 'স্থানের দূরত্ব গ্রাস করে' এগিয়ে চলতে থাকে। আর লক্ষ্যের যত কাছাকাছি এগিয়ে আসতে থাকে ততই ঘুরে ফিরে আবার সেই তার চিন্তা, একমাত্র তারই চিন্তা উত্তরোত্তর বেশি করে মিতিয়ার মনকে অধিকার করতে থাকে এবং শেষকালে এমন হল যে বাকি যে সমস্ত বিভীষিকাময় অপচ্ছায়া তার মনে হানা দিচ্ছিল, সেগুলি দূর করে দিতে লাগল। আহা, একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে তার কী যে ইচ্ছে করছিল!—দূর থেকে হোক, তাও সই!

'ও এখন সেই *তার সঙ্গে*', মিতিয়া মনে মনে ভাবল, 'তাই একবার না হয় চেয়েই দেখি তার সঙ্গে, ওর আগেকার সেই মনের মানুষটির সঙ্গে ও কেমন আছে। আমার চাওয়ার মধ্যে শুধু এইটুকুই চাওয়া।' যে নারী তার জীবনে অমোঘ নিয়তি হয়ে দেখা দিয়েছিল তার প্রতি এত প্রেম এর আগে আর কখনও মিতিয়ার বুক থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। এই অভিজ্ঞতা আগে তার কখনও হয়নি এবং তা এতই অভিনব যে তার নিজের কাছে পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত। এই অনুভূতি সেই নারীর সামনে করুণ মিনতি পর্যায়ের, তার সামনে 'মিলিয়ে যাবার' মতো এক কোমল অনুভূতি। 'মিলিয়েই যাব না হয়!' কেমন যেন একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে সে আচমকা বলে উঠল।

প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল গাড়ি ছুটে চলেছে। মিতিয়া চুপচাপ। আন্দ্রেই নামে এই চাষাটা অমনিতে যদিও কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেও একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। মনে হচ্ছিল কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, শুধু তার

লালচে বাদামি রঙের ঘোড়া তিনটের ওপর বিপুল উদ্যমে চাবুক হাঁকিয়ে চলেছে। ঘোড়াগুলো রোগা শুকনো চেহারার হলেও বেশ চটপটে।

এমন সময় মিতিয়া বেজায় অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে আন্দ্রেইকে বলল, "আচ্ছা, আন্দ্রেই, ওরা যদি ঘুমিয়ে পড়ে?" এখনই হঠাৎ তার মনে এ চিন্তার উদয় হল, এর আগে পর্যন্ত কিন্তু এ নিয়ে সে ভাবেনি।

"তা মনে করা যেতেই পারে যে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ।"

মিতিয়া যন্ত্রণাক্লিষ্টের মতো ভ্রূকুটি করল  তাই তো, তার মনের মধ্যে যখন এরকম উপলব্ধি  এই অবস্থায় যখন ছুটতে ছুটতে সে আসছে  তখন কিনা তারা ঘুমোচ্ছে!... সেও ঘুমোচ্ছে, হয়তো সেখানেই ঘুমোচ্ছে! ... একটা প্রচণ্ড ক্রোধের উপলব্ধি তার বুকের ভেতরে ফুঁসতে লাগল।

"হাঁকাও আন্দ্রেই। চালাও, চালাও, চটপট!" দিশেহারা হয়ে সে চিৎকার করে উঠল।

"বলা যায় না, হয়তো এখনও শুতে যায়নি", একটু চুপ করে থাকার পর আন্দ্রেই ভেবেচিন্তে বলল। "তিমফিয়েই তো তখন বলল যে ওখানে লোক জুটেছে..."

"কোথায়? স্টেশনে?"

"না, স্টেশনে নয়, প্লাস্তুনোভ্‌দের সরাইখানায়, মানে সেটাও ঘোড়া বদলের একটা ঘাঁটি, তবে বেসরকারি।"

"জানি। তাহলে বলছ অনেক লোকজন? কী রকম? তারা কারা?" এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন হয়ে মিতিয়া চিৎকার করে উঠল।

"হ্যাঁ, তিমফিয়েই বলছিল, তারা সব ভদ্দরলোক! আমাদের শহরের দুজন আছে। কারা—তা জানি নে—ওই শুধু তিমফিয়েই বলছিল আর কি  দুজন ভদ্রলোক এখানকার, দুজন বুঝি বাইরে থেকে, হয়তো বা আরও কারা সব আছে। তেমন ভাবে আমি জিগ্‌গেসও করিনি। বলছিল তারা নাকি তাস খেলতে শুরু করেছিল।"

"তাস?"

"তাই বলছিলাম কি, হয়তো ঘুমোচ্ছে না—তাস খেলতে যখন শুরু করেছে। ভেবে দেখুন একবার, এখন মোটে এই এগারোটা পেরোল, এর বেশি নয়।"

"হাঁকাও আন্দ্রেই, হাঁকাও!" আবার উত্তেজনায় অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠল মিতিয়া।

"আপনাকে একটা কথা জিগ্‌গেস করব কর্তা?" একটু চুপ করে থাকার পর আন্দ্রেই আবার শুরু করল, "শুধু আমার ভয় হচ্ছে আপনি আবার আমার কথায় রাগ না করেন কর্তা।"

"কী কথা?"

"এই যে কিছুক্ষণ আগে ফেদোসিয়া মার্কভ্‌না—মানে, ফেনিয়া, আপনার পায়ে

পড়ে আপনাকে অত মিনতি করে বলল যে আপনি যেন তার দিদিমণির, তাছাড়া আরও কার যেন, কোনো ক্ষতি না করেন  তাই বলছিলাম কি কর্তা, আপনাকে আমি ওখানে নিয়ে তো যাচ্ছি  কিন্তু  মাফ করবেন, কর্তা, আমার বিবেক বলছে... হয়তো বোকার মতো কী বলতে কী বলে ফেললাম।"

মিতিয়া হঠাৎ পেছন থেকে খপ করে তার কাঁধ চেপে ধরল।

"তুমি একজন গাড়োয়ান। গাড়োয়ান তো?" ক্ষিপ্ত হয়ে সে প্রশ্ন করল।

"হাঁ কর্তা, গাড়োয়ান

"তুমি তো জান, পথ করে দিতে হয়। কী তুমি বলবে সেই গাড়োয়ানকে যে কারও জন্য পথ করে দেয় না, যার ভাবটা এই যে আমি চলেছি, লোকে পিষে মরে তো মরুক! না হে, গাড়োয়ান ভায়া, কাউকে পিষে মেরো না! মানুষকে পিষে মারা উচিত নয়, মানুষের জীবন নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কারও জীবন নষ্ট করে থাক তাহলে নিজেকে শাস্তি দাও  কেবল যদি নষ্ট করে থাক, কেবল যদি কারও জীবন ধ্বংস করে থাক, তাহলে নিজের দণ্ডবিধান কর এবং সরে যাও।"

কথাগুলি একজন পুরোপুরি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো মিতিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। আন্দ্রেই কর্তার ভাবগতিক দেখে অবাক হয়ে গেল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাবার্তা চালিয়ে গেল।

"ঠিক বটে বাবু মশাই, আপনি ঠিকই বলেছেন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, কোনো মানুষকে পিষে ফেলা বা তাকে যন্ত্রণা দেওয়াও উচিত নয়, ঠিক তেমনি, কোনো ইতর প্রাণীকেও নয়, কেন না যে-কোনো প্রাণীই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই একটা ঘোড়ার কথাই ধরুন না কেন—বলছি এই জন্য যে এমন কেউ কেউ আছে যারা মিছিমিছি দাবড়ায়—আমাদের এই গাড়োয়ানদের মধ্যেই এমন লোক আছে বটে।... ওদের কোনো লাগাম নেই, জোরজার করে বেপরোয়া সোজা হাঁকাবে, হাঁকাবেই হাঁকাবে।"

"কোথায়? নরকে নাকি?" মিতিয়া আচমকা কথার মাঝখানে বলে বসল, তারপর সে যেমন হাসে তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে সামান্য হাসল। "আন্দ্রেই, তোমার মনটা বড়ো সরল, আবারও শক্ত করে তার কাঁধ চেপে ধরে সে বলল, "তুমিই বল তো এই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কারামাজভ্ শর্মার গতি কোথায় হবে? নরকে না স্বর্গে? তোমার কী মনে হয়?"

"সে আমি জানি নে গো বাবু। সেটা নির্ভর করছে আপনার ওপর, কেন না আপনি হলেন গিয়ে আমাদের  এই দেখুন না কেন কর্তা, ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে বেঁধা হলে যখন তিনি মারা গেলেন তখন ক্রুশ থেকে নেমে সটান চলে গেলেন নরকে, যে সব পাপী তাপী সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিল তাদের সবাইকে মুক্তি দিলেন। নরকের শয়তান তখন এই ভেবে আঁতকে উঠে কাতরাতে

শুরু করে দিল যে এখন তো তাহলে আর কোনো পাপীই এখানে আসবে না! প্রভু তখন তাকে বললেন, 'ওরে দুঃখু করিস নে, এখন থেকে তা বড়ো তা বড়ো যত রাজপুরুষ, যারা আমাদের চালাচ্ছে, যারা আমাদের বিচারের মাথা, যারা বড়লোক, তারা সবাই তোর কাছে আসবে, তাই যতদিন আমি ফের না আসি ততদিন তোর রাজ্য যুগ যুগ ধরে যেমন ছিল ঠিক তেমনই জমজমাট থাকবে।' যা বলছি ঠিক বলছি, ঠিক এই কথাই তিনি বলেছিলেন।

"সাধারণ লোকসমাজে চলতি কিংবদন্তি। আহা, কী চমৎকার! হাঁকাও, বাঁয়েরটাতে চাবুক হাঁকাও, আন্দ্রেই!"

"তা হলেই দেখছেন তো কর্তা, নরক কাদের জন্য", বাঁয়েরটাতে চাবুক মেরে আন্দ্রেই বলল। "আপনি বাবু আমাদের, একটা বাচ্চা ছেলের মতো আমরা আপনাকে এই ভাবেই দেখি। তা আপনি একটু বদরাগী গোছের বটে কর্তা, কিন্তু আপনার সরল মনের জন্য প্রভু আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

"কিন্তু তুমি? তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে আন্দ্রেই?"

"আপনাকে আমার ক্ষমা করার কথা আসছে কেন? আপনি তো আমার কোনও ক্ষেতি করেননি।"

"না না সবার হয়ে, সবার হয়ে তুমি একা, এই এখন এখানে, এই পথের ওপরে, তুমি কি সকলের হয়ে ক্ষমা করবে আমাকে? না না, বল, সরল মানুষের সরল মনেই বল!"

"ওঃ কর্তা! আপনাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতেও কিন্তু ভয়-ভয় লাগছে, আপনার কথাবার্তাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত।"

কিন্তু ও কথা মিতিয়ার কানে গেল না। সে তখন একটা ঘোরের মধ্যে খ্যাপার মতো আপন মনে ফিসফিস করে প্রার্থনা আউড়ে চলেছে।

"হে প্রভু, আমার সব অনাচার ভুলে আমাকে গ্রহণ কর প্রভু। আমার বিচার কোরো না। আমাকে তোমার বিচারের পাশ কাটিয়ে যেতে দাও বিচার কোরো না, কেন না আমি নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছি। বিচার কোরো না, কারণ, হে প্রভু তোমাকে আমি ভালোবাসি! আমি নিজে একজন পাপিষ্ঠ, কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি। যদি তুমি আমাকে নরকে পাঠাও সেখানেও তোমাকে ভালোবাসব, যুগ যুগ ধরে তোমাকে ভালোবেসে আসছি। কিন্তু তুমি আমাকেও ভালোবাসতে দাও, আমার ভালোবাসাকে সম্পূর্ণ করতে দাও এখানে, এখন সম্পূর্ণ করতে দাও, আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে, তোমার উষ্ণ আলোর কিরণ বেরিয়ে পড়ার আগেই আমাকে তা করতে দাও কেননা আমি আমার হৃদয়ের অধীশ্বরীকে ভালোবাসি।. ভালোবাসি, ভালো না বেসে পারি নে। তুমি নিজেই তো আমার সব কিছু দেখতে পাচ্ছ। ছুটে এসে তার সামনে লুটিয়ে পড়ে বলব 'তুমি যে আমাকে ফেলে রেখে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেলে সেটা ঠিকই করেছ।... বিদায়,

ভুলে যাও তোমার ভালোবাসার বলিকে, আমার কথা মনে করে কখনও তোমার মনের শান্তি নষ্ট কোরো না!”

“মোক্রয়ে!” হাতের চাবুকটা বাড়িয়ে সামনে দিক দেখিয়ে আন্দ্রেই চেঁচিয়ে বলল।

রাতের ফিকে অন্ধকার ভেদ সুবিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অকস্মাৎ জেগে উঠল দালান কোঠার এক জমাট কালো পুঞ্জ। মোক্রয়ে পল্লীতে বাসিন্দা বলতে দু হাজার মানুষ। কিন্তু এই সময়টাতে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল অন্ধকারের মধ্যে কোথাও কোথাও কদাচিৎ দু একটি বাতি টিমটিম করে জ্বলছে।

“চালাও, চালাও আন্দ্রেই, আমি আসছি!” বিকারের ঘোরে মিতিয়া যেন ভুল বকে উঠল।

“ঘুমিয়ে পড়েনি!” গ্রামে ঢোকার ঠিক মুখটাতে এই মুহূর্তে প্লাস্তুনভ্‌দের সরাইখানাটা দেখা যেতে সে দিকে চাবুক উঁচিয়ে আন্দ্রেই আবার বলে উঠল। রাস্তার মুখোমুখি ছয়টা জানলাতেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

“ঘুমিয়ে পড়েনি!” মিতিয়াও তার সুর ধরে বলে উঠল। “জোর আওয়াজ তুলে জোর কদমে ছুটাও আন্দ্রেই বাজাও ঘণ্টা, বাজাও, গড়গড়িয়ে, ঘর্ঘরিয়ে চালাও। সবাই যেন জানতে পারে আমি এসেছি! আমি আসছি! আমি নিজে আসছি!” উচ্ছ্বসিত হয়ে আচ্ছন্নের মতো বলে উঠল মিতিয়া।

আন্দ্রেই তার শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়া তিনটেকে জোর কদমে ছুটিয়ে দিল, আর বাস্তবিকই এক ধাক্কায় গড়গড়িয়ে, ঘর্ঘরিয়ে এগিয়ে গেল দালানের দেউড়ির সামনের উঁচু ধাপ লক্ষ করে, কেবল সেখানে এসেই আন্দ্রেই তার গলদঘর্ম ও অর্ধমৃত ঘোড়াগুলির রাশ টানল। মিতিয়া এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সরাইখানার মালিক সত্যি সত্যি ঠিক তখনই শুতে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময়ে কে আবার গাড়িয়ে হাঁকিয়ে এলো তা দেখার জন্য কৌতূহলের সামনের বারান্দায় ওঠার ধাপ থেকে সে উঁকি মারল।

“এই যে, ত্রিফন বরিসভিচ্ নাকি?”

ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখার পর সরাইওয়ালা পড়িমরি করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে এলো, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিথির দিকে ছুটে গেল।

“দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্! কর্তা, আপনি! আবার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে?”

এই ত্রিফন বরিসভিচ্ গাঁট্টাগোট্টা, স্বাস্থ্যবান চাষিভুসো গোছের লোক। মাঝারি বয়সি। মুখখানা বেশ ভারী। দেখতে রুক্ষ, আপসহীন ধরনের—মোক্রয়ে অঞ্চলের চাষাদের যেটা বৈশিষ্ট্য। তবে লাভের এতটুকু আভাস পেলে চটপট মুখের সে ভাব পালটে পরম বিগলিত ভাব ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা এ লোকটার আছে। রুশি স্টাইলে বুকের একপাশে বোতাম আঁটা জামা আর আঁটসাঁট কুঁচি দেওয়া চাষাড়ে কোর্তা পরে ঘুরে বেড়ায়। টাকাপয়সা ভালোই জমিয়েছে, সমাজে উঁচুদরের ভূমিকা

গ্রহণ করতে পারা তার দিবারাত্রের স্বপ্ন। অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি চাষী তার হাতের মুঠোয় ছিল, আশে পাশের সকলে তার কাছে ঋণগ্রস্ত। আশেপাশের জমিদারদের কাছ থেকে সে জমির ইজারা নিত, নিজেও জমি কিনত, স্থানীয় চাষিরা তার কাছ থেকে ধার নিয়ে সেই টাকার বিনিময়ে তার জমিতে মজুর খাটত, কখনও আর সেই ঋণের দায় থেকে মুক্ত হতে পারত না। লোকটা বিপত্নীক, তার চারটি বয়স্থা মেয়ে। একটা ইতিমধ্যে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতেই থাকে। তার দুটো ছোটো ছোটো বাচ্চা, অর্থাৎ বাড়ির কর্তার নাতি নাতনি। মেয়ে বাপের বাড়িতে দিন মজুরি খাটে। আরেকটা মেয়ে, সেটা একটা চাষাড়ে, তার বিয়ে হয়েছিল কোনো এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে। লোকটা ঘষে ঘষে কলম পেষা কেরানি না কী যেন হয়েছিল, কিন্তু তাহলে কী হবে সরাইখানার একটা ঘরের দেয়ালে পারিবারিক ছবির মধ্যে সরকারি কর্মচারীর ধড়াচুড়ো পরা আর কাঁধপটি লাগানো এই লোকটিরও একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ছবি দেখতে পাওয়া যায়। দুই ছোটো মেয়ে গির্জার কোনো উৎসব উপলক্ষে ছুটি ছাঁটার দিনে বা কারও বাড়িতে গেলে হাল ফ্যাশনের ছাঁদে সেলাই করা নীল অথবা সবুজ রঙের পোশাক পরত, তার পেছনটা হত টান টান আর সেখানে হাত দেড়েক লম্বা একটা লেজুড় থাকত; কিন্তু পরদিন সকালে আর দশটা দিনের মতোই ভোর হতে না হতে উঠে বার্চগাছের ঝাঁটা হাতে বাড়ির ঘরদোর ঝাঁট দিত, বাইরে গিয়ে এঁটোকাঁটা ফেলে আসত আর অতিথিরা চলে যাবার পর রাজ্যের আবর্জনা সাফ করত।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার রোজগার করে ফেললে কী হবে তার সরাইখানার যে সমস্ত অতিথি উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসবে মেতে থাকত তাদের টাকাপয়সা ঝাড়তে ত্রিফন বরিসভিচের ভারি ভালো লাগে। তার মনে আছে, এই তো এক মাসও হয় নি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ যখন তার দলবল নিয়ে এখানে গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে হুল্লোড়বাজি করছিল সেই সময় চব্বিশ ঘণ্টায় তার কাছ থেকে সে পুরোপুরি তিন যদি নাও হয়, নয়-নয় করে দুশরও বেশি রুবল কামাই করেছিল। তাই মিতিয়া যে গাড়ি হাঁকিয়ে তারই দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছে একমাত্র এই কারণে নতুন করে শিকারের গন্ধ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে সে এখন তড়িঘড়ি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে এলো।

"দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্, কর্তামশাই, আবার কি তাহলে আপনাকে আমরা আমাদের মাঝখানে পাচ্ছি?"

"দাঁড়াও, ত্রিফন বরিসভিচ্", মিতিয়া কথা শুরু করল, 'সবার আগে, সবচেয়ে বড়ো কথা হল—সে কোথায়?"

"আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না?" মিতিয়ার মুখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে সরাইওয়ালা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল। "তা হ্যাঁ এখানেই বটে, এখানেই আছে..."

"কার সঙ্গে? আর কে কে আছে?"

"কিছু লোকজন, হুজুর। একজন আবার এক আমলা, সম্ভবত জাতে পোল লোকটার কথাবার্তা থেকে অন্তত তাই মনে হয়। সে-ই তো ওকে আনার জন্য এখান থেকে ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছিল; আর তার সঙ্গে অন্য যে লোকটা সে তার একজন বন্ধু, আবার তার চলার পথের কোনো সাথীও হতে পারে—কে জানে বাপু? তবে বেশভূষা তাদের কারোরই মিলিটারির লোকের মতো নয়

"জোর আমোদফুর্তি চলছে? মালকড়ি আছে?"

"কীসের আমোদফুর্তি! বড়ো আকারের কিছু নয়, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ।"

"বড়ো আকারের কিছু নয় বলছ? বেশ, অন্য আর কারা আছে?"

"আছেন এই দুজন ভদ্রলোক, শহর থেকে এসেছেন। চেওর্নি থেকে ফিরছিলেন, এখানে এসে উঠেছেন, এখানেই আছেন। একজন তো একেবারেই কমবয়সি, মিউসভ্ মহোদয়ের কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় হবে, তবে তার নামটাই ছাই ভুলে গেছি আর অন্য জন, অনুমান করা যেতে পারে, আপনিও তাকে চেনেন: জমিদার মাক্সিমভ্। বলছিলেন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে নাকি আপনাদের ওখানকার মঠেও গিয়েছিলেন, মিউসভ্ মহোদয়ের এই অল্পবয়সি আত্মীয়ের সঙ্গেই বেড়াতে বেরিয়েছেন।..."

"বলতে চাও এ-ই সব?"

"হ্যাঁ, এ-ই সব।"

"দাঁড়াও, চুপ কর ত্রিফন বরিসভিচ, এবারে আসল কথাটা বল দেখি ওর কী খবর? কী করছে?"

"এই তো কিছু আগে এলো। ওদের সঙ্গে বসে আছে।"

"হাসিখুশি? হাসছে?"

"না, খুব একটা হাসছে বলে মনে হয় না। এমনকি একেবারেই বেজার হয়ে বসে আছে। ওই কমবয়সি লোকটার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল।"

"বলছ ওই পল লোকটার? অফিসারের?"

"সে আবার কমবয়সি হল কোথায়? তাছাড়া লোকটা মোটেই অফিসার নয়। না, তার নয়, কর্তা। চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল মিউসভের ভাগ্নে না কে, সেই কমবয়সি ছেলেটার এই দ্যাখ, শুধু নামটাই ভুলে যাচ্ছি।"

"কালাগানভ্?"

"ঠিক ঠিক, কালাগানভ্ই বটে।"

"বেশ। আমি নিজেই দেখছি। তাস খেলছে নাকি?"

"খেলছিল, এখন আর খেলছে না। চা পানের পালা শেষ হল, আমলা শ্রেণির ভদ্রলোকটি এখন আবার হালকা মিষ্টি মদ চেয়ে পাঠিয়েছে।"

"থাম ত্রিফন বরিসভিচ্, থাম হে বন্ধু, আমি নিজেই দেখছি। এবারে আসল প্রশ্নটার জবাব দাও জিপ্‌সিরা এখানে আছে কি?"

"জিপ্‌সিগুলোর একদম কোনো সাড়াশব্দ আজকাল শুনতে পাবেন না, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, ওপরওয়ালা কর্তাদের হুকুমে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে যদি ইহুদিগুলোর কথা বলেন সেই হতভাগাগুলো এখানে আছে, রজ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কায়া গাঁয়েই আছে, ঝাঁঝ-করতাল বেহালা বাজায়। যদি বলেন এখনই তাদের ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাতে পারি। ডাকলেই চলে আসবে।"

"তা-ই পাঠাও! অবশ্যই পাঠাবে!" মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। "আর পারলে ছুকরিগুলোকেও তুলে নিয়ে আসবে—সেই তখনকার মতো। বিশেষ করে মারিয়াকে, স্তেপানিদাকেও, আর আরিনাকে। গান বাজনার দলের জন্য দুশ রুবল!"

"না হয় লোকজন এখন শুতে চলে গেছে, কিন্তু ওই টাকার জন্য আপনি বললে পাড়াসুদ্ধ সবাইকে উঠিয়ে ছাড়ব, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। তা আপনাকেও বলি কর্তা, এখানকার চাষাভুসোগুলো আর ওই ছুঁড়িগুলো—এরা কি আপনার অত আদর ভালোবাসার যুগ্যি? এই ইল্লুতে বর্বর লোকগুলোর পেছনে কিনা অতগুলো টাকা! কোথাকার কোন্ চাষা—সিগারের মর্ম সে কী বোঝে? অথচ তুমি কিনা ওদের তা-ই দিয়েছিলে! ওগুলো তো সব একেকটা ডাকাত, ওদের গায়ে বোটকা গন্ধ। আর ছুঁড়িগুলো? তা যত ছুঁড়িই থাক না কেন, সবগুলো উকুনে। আরে, অত টাকার কথা ছেড়ে দাও, তেমন হলে আমি আমার মেয়েদের টেনে তুলে মাগনা তোমার হাতে দিয়ে দেব। ওরা এই সবে শুতে গেছে, কিন্তু আমি ওদের পিঠে লাথি কষিয়ে তোমার জন্য গাইয়ে করে ছাড়ব। সেদিন ওই চাষাগুলোকে প্রাণ ভরিয়ে শ্যাম্পেন খাইয়ে দিলে। কোনো মানে হয়?"

মিতিয়ার জন্য ত্রিফন বরিসভিচের এই দরদটা কিন্তু অর্থহীন। যেদিনকার কথা হচ্ছে সেদিন ত্রিফন বরিসভিচ্ নিজেই কারচুপি করে আধ ডজন শ্যাম্পেনের বোতল সরিয়ে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, আর টেবিলের তলায় একশ রুবলের একটা নোট পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে সেই যে হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছিল সেই ভাবে তার হাতের মুঠোর মধ্যেই থেকে যায়।

"ত্রিফন বরিসভিচ, সেদিন আমি শুধু এখানেই হাজারেরও বেশি উড়িয়ে দিয়েছি। মনে আছে?"

"উড়িয়েছিলেন বৈ কি। মনে না থেকে পারে কর্তা? আমাদের এখানে বুঝি বা আপনার তিন হাজারই চলে গিয়েছিল।"

"বেশ, এবারেও সেই একই জিনিস করতে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ?"

এই বলে সে তার নোটের বান্ডিলটা বার করে সরাইওয়ালার একেবারে নাকের ডগায় তুলে ধরল।

"এবারে শোন, শুনে বুঝে নাও। এক ঘণ্টার মধ্যে মদ এসে যাবে, টুকটাক খাবার, মাংসের পুর দেওয়া ভাজাভুজি, মিষ্টি খাবার—এসবও থাকবে। এলেই সঙ্গে সঙ্গে ওপরে নিয়ে আসবে। আর আন্দ্রেইয়ের কাছে ওই যে বাক্সটা আছে সেটাও

এক্ষুনি ওপরে তুলে দিতে হবে, খুলে তৎক্ষণাৎ শ্যাম্পেন বার করে পরিবেশন করতে হবে। আর হ্যাঁ, বড় কথা—সেই ছুকরিগুলো, ছুকরিগুলোকে চাই, বিশেষ করে মারিয়াকে অতি অবশ্য।

গাড়িতে ফিরে গিয়ে সিটের তলা থেকে সে তার পিস্তলের বাক্সটা টেনে বার করল।

"এই যে আন্দ্রেই হিসেবটা চুকিয়ে ফেলা যাক। এই তোমার পনেরো রুবল —গাড়ির জন্য, আর এই হল গিয়ে পঞ্চাশ—ভোদ্‌কার জন্য তুমি যে রাজি হয়েছিলে সেই জন্য, তোমার ভালোবাসার জন্য। এই কারামাজ়ভ্ শর্মাকে মনে রেখো!"

"আমার ভয় হচ্ছে কর্তা " আন্দ্রেই ইতস্তত করতে লাগল। "বখশিস বরং পাঁচ রুবল থাক — এর বেশি নিতে পারব না। ত্রিফন বরিসভিচ সাক্ষী। বোকার মতো কথা বলে থাকলে মনে কিছু করবেন না হুজুর, ক্ষমা করে দেবেন।..."

"আরে ভয়ের কী আছে?" আগাপাশতলা তার ওপর চোখ বুলিয়ে মিতিয়া বলল। "তাই যদি মনে করিস, মরগে যা!" পাঁচটা রুবল তার দিকে ছুড়ে দিয়ে মিতিয়া চটেমটে বলে উঠল। "আচ্ছা, এবারে ত্রিফন বরিসভিচ, আমাকে চুপিসারে নিয়ে চল তো, প্রথম প্রথম একবার চোখের দেখা দেখতে দাও ওদের সকলকে— এমন ভাবে, যাতে ওরা আমাকে দেখতে না পায়। ওরা কোথায়? নীল ঘরে নাকি?"

ত্রিফন বরিসভিচ আশঙ্কাভরে মিতিয়ার দিকে তাকাল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাধ্য ছেলের মতো আজ্ঞা পালন করল। সাবধানে তাকে পথ দেখিয়ে বার বারান্দায় নিয়ে এলো, আগন্তুকরা যে ঘরে বসে ছিল তার সংলগ্ন প্রথম বড়ো ঘরটায় সে নিজে প্রথমে ঢুকে সেখান থেকে জ্বলন্ত মোমবাতিটা বের করে নিয়ে এলো। তারপর নিঃশব্দে মিতিয়াকে ভেতরে এনে অন্ধকারের মধ্যে ঘরের একটা কোনায় দাঁড় করিয়ে দিল। সেখান থেকে সে নিজে অন্য ঘরের কথোপকথনকারীদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে স্বচ্ছন্দে তাদের লক্ষ করতে পারে। কিন্তু মিতিয়া বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখল না, তা ছাড়া ভালোমতো দেখতেও পাচ্ছিল না, ওকে দেখামাত্রই তার বুক টিপটিপ করতে লাগল, সে চোখে অন্ধকার দেখল।

গ্রুশেন্‌কা টেবিলের একটা পাশে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে, তার পাশে সোফায় বসে আছে দেখতে শুনতে বেশ ভালো, অতি অল্পবয়সের যুবক কালাগানভ্। গ্রুশেন্‌কা তার হাত ধরে আছে, মনে হচ্ছে হাসছে। এদিকে যুবক তার দিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে কী যেন বলছে—মনে হয় দুঃখ করেই বলছে। গ্রুশেন্‌কার মুখোমুখি, টেবিলের ওপাশে বসে আছে মাক্সিমভ্, কথাগুলি সে তাকে লক্ষ করে বলছিল। মাক্সিমভ্ আবার কেন যেন খুব হাসছে। সোফায় বসে আছে সেই লোকটা, সোফার পাশের একটা চেয়ারে, দেয়াল ঘেঁষে আরও কে একজন—লোকটা অচেনা। যে লোকটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বসে ছিল সে

একটা লম্বা পাইপ ধরিয়ে ধূমপান করছে। মিতিয়ার শুধু এক ঝলক মনে হল লোকটা কেমন যেন একটু মোটাসোটা মতন, মুখটা তার চওড়া, মাথায় সম্ভবত খুব একটা উঁচু নয়, আর তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কী কারণে যেন রেগে আছে। তার সঙ্গী, অন্য যে অচেনা লোকটি, তাকে দেখে মিতিয়ার মনে হল যেন বড় বেশি ঢ্যাঙা। কিন্তু এর বেশি কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকার মতো ধৈর্য তার হল না, তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল, হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হওয়ার উপক্রম। এই অবস্থায় পিস্তলের বাক্সটা একটা দেরাজ আলমারির মাথার ওপর রেখে কথোপকথনকারীদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সে সোজা নীল ঘরে গিয়ে ঢুকল।

"উঃ মা গো!" গ্রুশেন্‌কাই তাকে প্রথম দেখতে পেয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

## সাত

## প্রাক্তন এবং অবিসংবাদিত সেই প্রেমিকপ্রবর

মিতিয়া যথারীতি লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুতগতিতে সোজা টেবিলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

"ভদ্রমহোদয়গণ", বেশ জোর গলায় প্রায় চেঁচিয়েই সে শুরু করল, তবে প্রতিটি শব্দে সে হোঁচট খেতে লাগল। "আমি   আমি   কিছু না   ভয়, পাবার কিছু নেই আমাকে! আমাকে দেখে কিন্তু কিছু ভাববেন না   কিছু না।" এবারে সে হঠাৎ গ্রুশেন্‌কার দিকে ফিরল। গ্রুশেন্‌কা তখন কালাগানভের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার হাতটা সজোরে আঁকড়ে ধরে চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। "আমি   আমিও আসছি", সে বলল। "আমি সকাল পর্যন্ত থাকছি। ভদ্রমহোদয়গণ, একজন পর্যটনকারী যাত্রী কি সকাল পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারে না? শুধু সকাল পর্যন্ত, শেষ বারের মতো, এই ঘরটিতেই?"

কথাগুলি সে শেষ করল মোটাসোটা বেঁটেখাটো সেই লোকটির দিকে চেয়ে, যে ধূমপানের পাইপ মুখে দিয়ে সোফায় বসে ছিল। একথা শোনার পর লোকটা গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে কঠোর স্বরে বলল

"এই জায়গাটা আমাদের প্রাইভেট, পান।* আরও তো কত ঘর পড়ে আছে।"

"আরে, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ যে! অতশত বলার কী আছে?" হঠাৎ বলে উঠল কালাগানভ্। "বসুন না আমাদের সঙ্গে। নমস্কার!"

"নমস্কার, প্রিয় বন্ধু   প্রিয়, এবং অমূল্যও বটে! আমি সব সময়ই আপনাকে

---

*পোল ভাষার শব্দ। মহাশয়। সম্বোধনে ব্যবহৃত। 'পানি'—মহাশয়া।

শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম'', উল্লসিত হয়ে চটপট এই বলে সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওধার থেকে মিতিয়া তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

''উঃ কী জোরে হাতটা চেপ্‌টে দিয়েছেন! আঙুলগুলো যে একেবারে ভেঙে দিলেন!'' কালাগানভ্ হেসে উঠল।

''সব সময় এইভাবে হাতে চাপ দেয়। সব সময়!'' খুশিতে সায় দিয়ে এই বলে সলজ্জ হাসিও হাসল গ্রুশেন্‌কা। দেখে মনে হল মিতিয়ার হাবভাব দেখে সে হঠাৎ ভালো করেই বুঝে নিয়েছে যে সে কোনো হাঙ্গামা বাধাবে না। দারুণ কৌতূহল নিয়ে এবং তখনও বেশ খানিকটা অস্বস্তিকর সঙ্গেও বটে, গ্রুশেন্‌কা তাকে লক্ষ করতে লাগল। তার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা গ্রুশেন্‌কাকে রীতিমতো অভিভূত করল, তা ছাড়া এমন একটা মুহূর্তে সে যে এইভাবে ঘরে ঢুকবে এবং এই ভাবে কথা বলতে শুরু করে দেবে এটা তার কাছ থেকে সে একেবারেই আশা করেনি।

''নমস্কার'', বাঁ ধার থেকে মিষ্টি গলায় জমিদার মাক্সিমভ্‌ও বলে উঠল। মিতিয়া সোৎসাহে তার দিকে এগিয়ে গেল।

''নমস্কার। আপনিও এখানে! আহা, কী খুশিই না হলাম আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে! ভদ্রমহোদয়গণ, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি '' মনে হয় পাইপ মুখে এই পোল জাতীয় মহোদয়টি যে এখানে মুখ্য ব্যক্তি তাই ভেবে তাকেই উদ্দেশ করে সে আবার বলল, ''আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি আমার ইচ্ছে ছিল আমার শেষ দিনটি, শেষ মুহূর্তটি এই ঘরটাতে কাটাই ঠিক এই ঘরটাতেই যেখানে আমিও আমার হৃদয়ের অধীশ্বরীকে আমার ভক্তি নিবেদন করেছিলাম! মাফ করবেন পান!'' উন্মত্তের মতো সে চিৎকার করে উঠল। ''আমি তুরন্ত চলে এসেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি না না ভয় পাবেন না, এটাই আমার শেষ রাত! আসুন পান, আমাদের মধ্যে মিটমাটের নামে পান করি! মদ এখুনি এসে যাবে। আমি নিয়ে এসেছি এই যে এই জিনিসটা '' হঠাৎ কেন যেন নোটের বান্ডিলটা বার করে সে বলল, ''অনুমতি করুন পান! আমি চাই গান বাজনা, হৈ হল্লা—সেই আগে যেমন হয়েছিল।... কিন্তু সেই কীটটি, অবাঞ্ছিত কীটটি মাটিতে কিলবিল করতে করতে কোথায় চলে যাবে, সে আর থাকবে না! আমার জীবনের এই শেষ রাতে আমি আমার সুখের দিনটি স্মরণ করব!

তার গলা প্রায় বুজে আসছিল। অনেক, অনেক কথা সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু যা বেরিয়ে এলো তা নেহাৎ কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত আবেগসূচক ধ্বনি। পোল ভদ্রলোকটি স্থির দৃষ্টিতে মিতিয়ার দিকে এবং মিতিয়ার হাতে ধরা নোটের বান্ডিলের দিকে তাকাল, তারপর গ্রুশেন্‌কার দিকে তাকাল। স্পষ্টই বোঝা গেল সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

''মোহারানির যদি মোত হয় সে সবে বলতে শুরু করেছিল।

"'মোহারানি' আবার কোন্ দেশি কথা? মহারানি বলুন!" তাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে গ্রুশেন্কা বলে উঠল। "সত্যি কী ভাবে যে সব কথা বলেন, শুনলেও হাসি পায়। বোসো দেখি মিতিয়া। তা কী বলছিলে বল। দোহাই তোমার, ভয় দেখিয়ো না কিন্তু। ভয় দেখাবে না তো? দেখাবে না, বল? যদি না দেখাও তাহলে বলব, তোমাকে দেখে আমি কী খুশিই না হয়েছি

"আমি? আমি ভয় দেখাব?" দুহাত শূন্যে ছুঁড়ে চিৎকার করে বলল মিতিয়া। "যাও না, আমার পাশ দিয়েই চলে যাও না তোমরা, কারও বাদ সাধব না!..."

তার পর আচমকা, উপস্থিত সকলের কাছে তো বটেই, নিঃসন্দেহে তার নিজের কাছেও যেটা অপ্রত্যাশিত ছিল তা এই যে সে একটা চেয়ারের ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল, উলটো দিকের দেয়ালে মুখ ঘুরিয়ে চেয়ারের পিঠটা দুহাতে জড়িয়ে ধরার মতো করে সজোরে আঁকড়ে ধরল।

"এই দেখ, এই দেখ, আরে তুমি কী, বল তো!" ভর্ৎসনার সুরে গ্রুশেন্কা বলে উঠল। "আমার কাছে যখন আসত, তখনও ঠিক এই অবস্থা হত ওর — হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নে। একবার ঠিক এই ভাবে কেঁদেও ফেলেছিল, এই আরেকবার হল — কী লজ্জার কথা! কাঁদছ কেন বল ত? কোন একটা কারণ থাকলেও না হয় বুঝতাম!" কেমন যেন বিরক্তির সঙ্গে জোর দিয়ে প্রতিটি কথা চেপে চেপে উচ্চারণ করে হঠাৎ রহস্যজনক ভাবে সে যোগ করল।

"আমি    আমি কাঁদছি না    বেশ বেশ, সবাইকে নমস্কার!" চোখের নিমিষে চেয়ারে ঘুরে বসে হঠাৎ হেসে উঠল, কিন্তু সে হাসি তার সেই দমকে দমকে কাষ্ঠ হাসি হাসা নয়, অনেকটা চাপা ধরনের একটানা, নার্ভাস কাঁপা-কাঁপা হাসি।

"এই দেখ, আবারও    আরে চলে এসো, আনন্দ ফুর্তি কর, মজা কর!" গ্রুশেন্কা তাকে অনুনয় করল। "তুমি যে এসেছ আমার বড় ভালো লাগছে, মিতিয়া। শুনছ? আমার বড় ভালো লাগছে। আমার ইচ্ছে ও যেন এখানে, আমাদের সঙ্গে বসতে পারে।" দাপটের সুরে এই কথাগুলি সে কতকটা উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলল বটে, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল সোফায় উপবিষ্ট ব্যক্তিটি। "আমার ইচ্ছে, এটা আমার ইচ্ছে! ও যদি চলে যায় তা হলে আমিও চলে যাব, বলে রাখলাম!" এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার দু চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"আমার রানি যা বলেন সেটাই নিয়ম!" উদাত্ত বীরপুরুষের ভঙ্গিতে গ্রুশেন্কার হাতে চুমো খেয়ে পোল ভদ্রমহোদয়টি বলল। "আসুন পান, আমাদের দলে যোগ দিন!" মিতিয়ার দিকে ফিরে সৌজন্য দেখিয়ে সে বলল।

মিতিয়া আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—দেখে মনে হল আরেক দফা বক্তৃতাবাজি করার মতলবে আছে, কিন্তু যা দাঁড়াল তা অন্য।

"আসুন 'পান', পান করা যাক!" বক্তৃতার বদলে অতর্কিতে এমন ভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো যে সবাই হেসে উঠল।

"হা ভগবান! আমি তো ভেবেছিলাম, আবার কিছু বলতে চাইছে!" নার্ভাস হয়ে গ্রুশেন্কা বলে উঠল। "শুনছ মিতিয়া", সে জেদ ধরে বলল, "আর দাপাদাপি করে বেড়িয়ো না বাপু। তবে শ্যাম্পেন যে এনেছ সেটা খুবই ভালো কথা। আমি নিজে ওই শ্যাম্পেনই খাব, এখানকার এই মিষ্টি মদ আমার অসহ্য। অবশ্য সবচেয়ে ভালো কথা এই যে তুমি নিজে চলে এসেছ, নয়ত বড্ড বোর লাগছিল। তা তুমি মজা লুটতে এলে নাকি আবার? আরে, টাকাগুলো পকেটে ঢোকাও তো! অত টাকা তোমার কোত্থেকে এলো?"

ডেলা পাকানো নোটের তাড়াটা তখনও মিতিয়ার হাতের মুঠোয় ধরা আর সেটা উপস্থিত সকলেরই বিশেষ করে পোল ভদ্রলোকদুটির খুব ভালো করে চোখে পড়ছিল। গ্রুশেন্কার কথায় থতমত খেয়ে মিতিয়া তাড়াতাড়ি টাকাগুলো পকেটে গুঁজে ফেলল। তার মুখ লাল হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে সরাইওয়ালা একটা ট্রেতে করে খোলা এক বোতল শ্যাম্পেন আর কয়েকটি খালি গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। মিতিয়া ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে নিল, কিন্তু সে এতটাই ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল যে ওটা নিয়ে কী করবে তা-ই ভুলে গেল। তাই দেখে কালাগানভ্ তার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে তার হয়ে গ্লাসে গ্লাসে ঢালতে লাগল।

"আরেকটা, আরও একটা বোতল!" সরাইওয়ালাকে হাঁক দিয়ে মিতিয়া বলল এবং মিটমাটের নামে যে তখন অত জাঁক করে পানটিকে তার সঙ্গে মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সে কথা ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি না করে, কারোই অপেক্ষা না করে মিতিয়া হঠাৎ এক নিশ্বাসে নিজের গ্লাসটা শেষ করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব আগাগোড়া পালটে গেল। যে গুরুগম্ভীর ও, করুণ ভাব নিয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল তা উধাও হয়ে গিয়ে তার চোখেমুখে একটা বাচ্চা ছেলের হাবভাব ফুটে উঠল। হঠাৎ তাকে কেমন যেন শান্ত ও নিরীহ গোছের মনে হতে লাগল। সলজ্জ ও আনন্দোচ্ছল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে সকলকে দেখতে লাগল, মাঝে মাঝে নার্ভাস হয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। একটা বাচ্চা কুকুর দোষ করে ফেললে তাকে শাস্তি দেওয়ার পরও আবার যখন আদর করে ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় তখন তার মধ্যে যে ধরনের কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে ওঠে মিতিয়াকে দেখেও তেমনি মনে হচ্ছিল। সে যেন সব ভুলে গেছে এমনি ভাবে পরম আনন্দে এবং মুখে শিশুসুলভ হাসি-হাসি ভাব নিয়ে সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকে দেখতে লাগল। সে অনবরত হাসতে হাসতে গ্রুশেন্কাকে দেখছিল, তার নিজের চেয়ারটা গ্রুশেন্কার হাতলওয়ালা চেয়ারের একেবারে কাছ ঘেঁষে সরিয়েও আনল। একটু একটু করে পোলজাতীয় ভদ্রলোকদের দুজনকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, যদিও তাদের ভাবগতিক যে খুব একটা বুঝতে পারল এমন নয়।

সোফায় উপবিষ্ট 'পানটির' গুরুগম্ভীর ভাবভঙ্গি আর তার উচ্চারণে পোলীয় টান মিতিয়াকে অবাক করে দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা তার ওই পাইপটা। কিন্তু বেশ তো, তাতে কী হয়েছে? ভালোই তো যে পাইপ টানে, মিতিয়া মনে মনে অনুধাবন করার চেষ্টা করল। কতকটা থলথলে মুখ, যা দেখে মনে হয় বয়স প্রায় চল্লিশ হবে, ছোট্ট নাকটা যার তলা থেকে নির্লজ্জভাবে উঁকি মারছে কলপ দেওয়া অতি সূক্ষ্ম এক জোড়া গোঁফ—এগুলিও মিতিয়ার মনে এখন পর্যন্ত বিন্দুমাত্র প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে পারে নি। এমনকি 'পান্'-এর মাথার ওই যে অতি বজ্জাত ধরনের পরচুলাটা, যা সাইবেরিয়ায় তৈরি এবং সেটার দুপাশের জুলপি যে আনাড়ির মতো আঁচড়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া—তাতেও মিতিয়া বিশেষ আশ্চর্য হয়নি। তার মানে, পরচুলা যখন তখন ওরকমই হওয়া উচিত, এই ভেবে মনে মনে তার ভারি আহ্লাদ হল। আরেকজন যে পোল, যে দেয়ালের কাছটাতে বসে ছিল, যার বয়স সোফায় বসে থাকা পোলটির চেয়ে কম, সে পুরো দলটার দিকে উদ্ধত ও উত্তেজিত ভাব নিয়ে তাকাচ্ছিল। এও কিন্তু মিতিয়াকে তেমন একটা অবাক করল না, যেটুকু করল সে কেবল অত্যন্ত বেয়াড়া ধরনের উচ্চতার জন্য, যা অন্য জনের আকারের সঙ্গে দারুণ বেমানান। 'উঠে দাঁড়ালে সাড়ে চার হাত মতো হবে', মিতিয়ার মাথার মধ্যে এই চিন্তাটা এক ঝলক উঁকি মারল। তেমনি আবার এক ঝলক এও মনে হল যে এই ঢ্যাঙা পোলটি সম্ভবত অন্য জনের বন্ধু ও ছায়াসঙ্গী, 'তার দেহরক্ষী' গোছের এবং পাইপ মুখে ছোটো 'পান'টি নির্ঘাত ঢ্যাঙা 'পান'টির ওপর হুকুম জারি করে। কিন্তু এসবও মিতিয়ার কাছে দারুণ ভালো ও তর্কাতীত বলেই মনে হল। মিতিয়ার মধ্যে একটা ছোট্ট কুকুরের আত্মনিবেদনের যে ভাবটি ছিল তা তার মনের সমস্ত রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে দিল।

গ্রুশেন্‌কার ভাবগতিক দেখে এবং যে কয়েকটি কথা সে বলেছিল, তার মধ্যে যে প্রহেলিকার সুর ছিল তা থেকে মিতিয়া ওর কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু নিজের বুকের ভেতরটা আগাগোড়া তোলপাড় করে তার সম্পর্কে শুধু এটুকুই বুঝতে পারল যে সে তাকে প্রীতির চোখেই দেখে, তাকে সে 'ক্ষমা করেছে' এবং নিজের পাশে বসিয়েছে। মিতিয়া পরম আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল যখন সে তাকে গ্লাস থেকে ঢকঢক করে মদ খেতে দেখল। কিন্তু দলের সকলে অনেকটা যেন আচমকাই যে ভাবে চুপ করে গেল তাতে সে বিস্মিত হল। কীসের যেন প্রত্যাশায় সে একে একে সকলের ওপর চোখ বুলাল। 'কী হল? আমরা অমনি অমনি হাত গুটিয়ে বসে আছি কেন? কিছু একটা শুরু করছেন না কেন, ভদ্রমহোদয়রা?' তার দাঁত বের করা হাসি-হাসি দৃষ্টি যেন একথাই বলছে।

"এই যে উনি গুচ্ছের মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছেন, তাই শুনে আমরা খুব হাসাহাসি

করছিলাম”, যেন মিতিয়ার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরে মাক্সিমভ্‌কে দেখিয়ে কালাগানভ্ হঠাৎ বলে উঠল।

মিতিয়া তৎক্ষণাৎ চোখ তুলে অপলক দৃষ্টিতে তাকাল কালাগানভের দিকে, পরক্ষণেই মাক্সিমভের দিকেও।

“মিথ্যে বলছেন?” আবার হাসল তার সেই সংক্ষিপ্ত কাষ্ঠহাসি, সঙ্গে সঙ্গে কী কারণে কে জানে, উৎফুল্ল হয়ে ‘হাঃ-হাঃ’ করে হেসে উঠল।

“তাই তো। ভেবে দেখুন একবার, উনি জোর দিয়ে বলছেন যে বিশের দশকে আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সবাই নাকি পোল মেয়েদের বিয়ে করে। এ তো একেবারে বাজে কথা, ঠিক বলিনি কি?”

“পোল মেয়েদের?” দস্তুরমতো পুলকিত হয়ে মিতিয়া কথাটা আওড়াল।

গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে মিতিয়ার যে কী সম্পর্ক কালাগানভ্ সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছিল, পোল ভদ্রলোকটির ব্যাপার স্যাপারও আন্দাজ করতে পারছিল, কিন্তু এসব তার কাছে তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিল না; শুধু তা-ই নয়, হয়তো একেবারেই আকর্ষণীয় ছিল না, তাকে বেশি আকর্ষণ করছিল মাক্সিমভ্। মাক্সিমভের সঙ্গে সে এখানে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে, পোল ভদ্রলোকদের সঙ্গেও এই সরাইখানাতেই জীবনে তার প্রথম সাক্ষাৎ। গ্রুশেন্‌কাকে অবশ্য আগেও জানত, এমনকি একবার কার সঙ্গে যেন তার কাছে গিয়েও ছিল; সেই সময় গ্রুশেন্‌কার তাকে ভালো লাগে নি। কিন্তু এখানে গ্রুশেন্‌কা বেশ সোহাগের দৃষ্টিতেই থেকে থেকে তার দিকে তাকাচ্ছে। এমনকি মিতিয়া আসার আগে তাকে আদরও করেছে, তবে কালাগানভ্‌কে কেমন যেন নিস্পৃহ দেখা গেছে। কালাগানভ্ নবীন যুবক, বছর বিশেকের বেশি বয়স নয়। বেশভূষায় শৌখিন। ভারি মিষ্টি তার ফুটফুটে মুখখানি, মাথার চুল বেশ ঘন, বাদামি রঙের। কিন্তু সেই ফুটফুটে মুখের ওপর হালকা নীল রঙের অপূর্ব এক জোড়া চোখ ভারি বুদ্ধিদীপ্ত, অনেক সময় আবার তাতে এমন গভীর ভাবের প্রকাশ ঘটত যা তার ওই বয়সের অতিরিক্তই বলা যেতে পারে, যদিও কখনো-কখনো যুবকের চাউনিতে একেবারে বাচ্চাদের ভাব ফুটে উঠত এবং সে কথাও বলত বাচ্চাদের মতো, আর তাতে সে এতটুকু সঙ্কোচও বোধ করত না— এমনকি এ বিষয়ে সে নিজে সচেতন থাকা সত্ত্বেও না। মোটের ওপর তার বেশ একটা নিজস্ব ধরন ছিল, এমনকি সে খামখেয়ালি প্রকৃতির ছিল, যদিও তার স্বভাবটা মিষ্টি ছিল। অনেক সময় তার মুখের ভঙ্গিতে একেক ঝলক কেমন যেন অনড় ও একগুঁয়ে ভাব প্রকাশ পেত, এমনও দেখা যেত যে সে লোকজনের দিকে তাকাচ্ছে, তাদের কথাবার্তাও শুনে যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একরোখার মতো জেদ ধরে তার নিজের কোনো স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। এই হয়তো দেখা গেল নিস্তেজ ও অলস ভাব, আবার হয়তো হঠাৎ উত্তেজনা প্রকাশ করতে শুরু করল—তাও আবার অনেক সময় নেহাৎ তুচ্ছ কোনো কারণে।

“একবার ভেবে দেখুন, গত চারদিন হল আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি”, কেমন যেন অলসমন্থর ভাবে টেনে টেনে সে বলে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার কথাগুলি ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এতটুকু কৃত্রিমতা সেখানে ছিল না। “আপনার মনে আছে, সেই যে তখন আপনার ভাই ওঁকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এবং উনি ছিটকে বেরিয়ে গেলেন, সেই তখন থেকে। এতে আমি ওঁর প্রতি খুবই আগ্রহ বোধ করি, আমি ওকে গ্রামে নিয়ে যাই, কিন্তু এখন উনি এমন সব মিছে কথা বলে যাচ্ছেন যে ওঁর সঙ্গে থাকতেই আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমি ওঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসছি।...”

“এই ভোদ্দোরলোক পোল মোহিলাদের দেখেননি, যা বইলছেন তা অসম্ভব”, পাইপ মুখে পোলটি মাক্সিমভের উদ্দেশে মন্তব্য করল।

পাইপ মুখে এই পোলটি রুশি যে একেবারে মন্দ বলে তা নয়, অন্তত যেমন ভান করছিল তার চেয়ে অনেক ভালোই বলে। কিন্তু রুশি শব্দ ব্যবহার করতে গেলেই পোল ভাষার ঢঙে বিকৃত করে উচ্চারণ করে।

“আরে আমি নিজেই তো এক পোল মহিলাকে বিয়ে করেছিলাম”, উত্তরে চাপা হাসি হেসে মাক্সিমভ্ বলল।

“আপনি কি তাই বলে ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে চাকরি করেছেন নাকি? আপনিই তো ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লোকদের কথা বলছিলেন। আপনি কি তাহলে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অফিসার ছিলেন বলতে চান?” কালাগানভ্ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে লেগে পড়ল।

“হ্যাঁ ঠিকই তো, উনি আবার ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে ছিলেন কবে? হা-হা!” এতক্ষণ ধরে তাদের কথাবার্তা গোগ্রাসে গিলছিল মিতিয়া, এবারে চিৎকার করে কথাগুলি বলার পর যারা কিছু বললেও বলতে পারে একের পর এক দ্রুত তাদের সকলের মুখের ওপর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কী যে প্রত্যাশা করতে লাগল তা ঈশ্বরই জানেন।

“না, মানে, দেখুন ” তার দিকে ফিরে মাক্সিমভ্ বলল। “আমি যা বলতে চাই তা এই যে এই পোল মহিলারা আহা, ভারি চমৎকার কিন্তু আমাদের একজন উলান ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে মাজুর্কার তালে তালে যা নাচ নাচল না... আহা, কী নাচই নাচল! কী ফুটফুটে একটা ছোট্ট বিড়াল ছানার মতো তড়াক করে লাফিয়ে তার হাঁটুর ওপর উঠে গেল এদিকে পোল বাবাটি আর পোল মা'টিও দিব্যি চেয়ে চেয়ে দেখল তাদের মেয়ের কাণ্ডকারখানা, সায় দিল, তারা এতে সায় দিল কিন্তু আর সেই ঘোড়সওয়ার সৈন্যটিও পরদিন যথারীতি গিয়ে পাণি প্রার্থনা করবে আর কী, পাণিপ্রার্থনা করল, আর হয়ে গেল। হি-হি!” মাক্সিমভ্ হাসতে হাসতে শেষ করল।

“এই ‘পান'টা একটা ফচ্‌কে!” যে ঢ্যাঙা পোলটি চেয়ারে বসে ছিল এবারে

সে পায়ের ওপর পা তুলে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল। মিতিয়ার শুধু চোখে পড়ে গেল লোকটার কাদামাখা বিশাল বুটজোড়া আর নোংরা পুরু জুতোর তলিটা। তাছাড়া দুই 'পান'-এরই জামাকাপড় মোটের ওপর বড় বেশি তেলচিটে।

"বাঃ, তাই বলে 'ফচকে'! গালাগাল দেবার কী আছে?" গ্রুশেন্‌কা সঙ্গে সঙ্গে চটে উঠল।

"পানি আগ্রিপিনা, এই পান পোলদেশে যাদের দেখেছেন তারা সব ঝি চাকরের মেইয়ে, বোড়ো ঘরের 'পানি'দের দেখেননি", পাইপমুখে 'পান'টি গ্রুশেন্‌কার কথার জবাবে মন্তব্য করল।

"তা তাদের লিয়েই থাক!" অবজ্ঞাভরে ঢ্যাঙা 'পান'টি বলে উঠল।

"এই দেখ, আবারও! আরে ওকে ওর কথা বলতে দিন না! লোকে কথা বলছে, তাতে বাধা দেবার কী আছে? যা-ই বলুন না কেন, এদের সঙ্গে কিন্তু মজাই লাগছে।" গ্রুশেন্‌কা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল।

"আমি বাধা দিচ্ছি না 'পানি'," পরচুলা লাগানো পোলটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রুশেন্‌কাকে দেখতে দেখতে বলল, তারপর গুরুগম্ভীর ভাবে কথা বন্ধ করে চুপচাপ আবার তার মুখের পাইপটা চুষতে লাগল।

"ন্, না, 'পান' এখন যা বললেন ঠিকই বললেন।" কালাগানভ্ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা যে আসলে কী নিয়ে যেন একমাত্র ভগবানই তা জানেন। "উনি তো পোল্যান্ডে যানই নি কখনও, তাহলে সেখানকার কথা উনি বলেন কী করে? আপনি তো আর পোল দেশে বিয়ে করেননি? করেননি তো?"

"ন্-না, আমার বিয়ে হয়েছিল স্মলেন্স্ক প্রদেশে। শুধু ব্যাপারটা এই যে হাল্‌কা 'উলান' ঘোড়সওয়ার সৈন্যদলের একজন তার আগে ওকে, মানে, মহাশয়, আমার ভাবী বধূকে এখানে নিয়ে এসেছিল। তা সেই মহিলার সঙ্গে তার মা ঠাকুরানি, মাসি ঠাকুরানি, এছাড়াও আবার একজন আত্মীয়া, সেই সঙ্গে তার বয়স্ক ছেলে। 'উলান' দলের সেই লোকটি অবশ্য ওদের সোজা পোলদেশ থেকে, হ্যাঁ সোজা যেখান থেকে নিয়ে এসেছিল, এনে আমার হাতেই ছেড়ে দিল। যার কথা বলছি সে একজন লেফ্‌টেনান্ট, ভারি চমৎকার এক অল্পবয়সি ছোকরা। প্রথমে ভেবেছিল নিজেই বিয়ে করবে, কিন্তু করল না, কারণ দেখা গেল মেয়েটা খোঁড়া।

"তাহলে খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বলছেন?" কালাগানভ্ চেঁচিয়ে বলল।

"যা বলেছেন, খোঁড়া মেয়েকে। তখন ওরা দুজনেই আমাকে কিঞ্চিৎ ঠকিয়েছিল, আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিল। আমি ভাবলাম ও বুঝি অমনই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে কেবল উচ্চিংড়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়েই চলত, কিন্তু আমি ভাবলাম বুঝি আনন্দ হচ্ছে তাই

"আপনার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সেই আনন্দে বুঝি?" কালাগানভের গলায় কেমন যেন শিশুসুলভ রিনরিনে সুর বেজে উঠল।

"তা হ্যাঁ মশাই, আনন্দেই বটে। তবে দেখা গেল কারণটা একেবারে অন্য। পরে, আমাদের যখন বিয়ে হল, বিয়ের অনুষ্ঠানের পর সে দিন সন্ধ্যায়ই সে স্বীকার করল আর বড়ো করুণ কণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলল যে ছোটোবেলায় একবার একটা ডোবা লাফিয়ে পার হতে গিয়েছিল তাইতে পা'টা নষ্ট হয়েছে। ছি-ছি!"

এই শুনে কালাগানভ্ একেবারে একটা বাচ্চা ছেলের মতো হেসে কুটিপাটি, হাসতে হাসতে সোফার ওপর প্রায় গড়িয়ে পড়ে। গ্রুশেন্‌কাও খুব হাসতে লাগল। দেখে শুনে মিতিয়ার আনন্দ আর ধরে না।

"জানেন, জানেন, এবারে কিন্তু উনি যা বলছেন তা সত্যি, এখন উনি মিথ্যে বলছেন না!" মিতিয়ার দিকে ফিরে উল্লসিত হয়ে কালাগানভ্ বলল। "আর জানেন কি, উনি দু দুবার বিয়ে করেছিলেন। এটা উনি ওঁর প্রথম স্ত্রীর কথা বলছেন। আর ওর যে দ্বিতীয় স্ত্রী, জানেন কি, পালিয়ে গেছে, এখনও বেঁচে আছে। সেটা আপনারা জানেন কি?"

"তাই নাকি?" চোখেমুখে নিদারুণ বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে চট করে মাক্সিমভের দিকে মুখ ঘোরাল মিতিয়া।

"হ্যাঁ মশাই, পালিয়ে গেছে, এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে বটে", বিনীত ভাবে একথা সমর্থন করে মাক্সিমভ্ বলল। "একেবারে গোড়াতেই যা করেছিল সেটা হল আমার যেটুকু ছোটখাটো জমিদারি ছিল তার পুরোটাই আগে থাকতে তার একার নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তার কথাটা হল, 'তুমি একজন শিক্ষিত লোক, তোমার নিজের অন্ন তুমি নিজেই ঠিক জোগাড় করে নেবে।' তাতেই দিল বসিয়ে। আমাকে একবার একজন শ্রদ্ধেয় আচার্যমশাই ঠিকই বলেছিলেন "তোমার এক স্ত্রী ছিল খোঁড়া, কিন্তু আরেকজন পা আবার বড়ো বেশি হাল্‌কা।' হি-হি!"

"আপনারা শুনুন, শুনুন একবার!" কালাগানভের উৎসাহ আর ধরে না। "উনি যদি মিছে কথা বলেনও—অবশ্য প্রায়ই বলেন—সেটা একমাত্র সবাইকে আনন্দ দেবার জন্যই বলেন। এটাকে কি নীচতা বলব? বলব না, তাই না? জানেন, কখনও কখনও ওঁকে কিন্তু আমার বেশ লাগে। লোকটা অত্যন্ত নীচ ধরনের, কিন্তু ওর পক্ষে এটা স্বাভাবিক, তাই না? আপনাদের কী মনে হয়? কোনো কোনো মানুষ নীচতায় নামে কিছু একটার স্বার্থে, তাতে কিছু লাভ হবে বলে। কিন্তু এ মানুষটি অমনি-অমনি, তার স্বভাববশত ভাবুন একবার, এই যেমন উনি দাবি করেন, গতকাল সারাটা রাস্তা এই নিয়ে তর্ক করতে করতে এসেছেন যে গোগল তাঁর 'মৃত আত্মা'য় ওঁর কথা লিখেছেন। মনে আছে, সেখানে মাক্সিমভ্ নামে এক জমিদারের চরিত্র আছে? সেই যে যাকে নজ্‌দ্রিয়োভ্ আচ্ছা করে চাবকেছিল, যার ফলে 'পানোন্মত্ত অবস্থায় বেত্রাঘাত দ্বারা ভূস্বামী মাক্সিমভ্‌কে ব্যক্তিগত ভাবে নিগ্রহ

করিবার দরুন' তাকে মোকদ্দমায় সোপর্দ করা হয়েছিল? ধারণা করুন এখন ওনার দাবি উনিই সেই মাক্সিমভ্ এবং ওঁকেই চাবুক মারা হয়েছিল! কিন্তু তা কী করে হয়? চিচিকভ্ যে ঘুরতে বেরিয়েছিল সেটা খুব কম করে ধরলেও বিশের দশকের গোড়ার দিকে—বছরের হিসেবে একেবারে মিলছে না। ওঁকে সেই সময় চাবুক মারতে পারে না। মারতেই পারে না, তাই না?"

কী কারণে যে কালাগানভ্ অত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল তা ধারণা করা কঠিন, কিন্তু তার উত্তেজনাটা ছিল আন্তরিক। মিতিয়াও নিঃস্বার্থভাবে কালাগানভের স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগল।

"কিন্তু যদি চাবুক মেরে থাকে!" হো-হো করে হাসতে হাসতে সে চেঁচিয়ে বলল।

"ঠিক যে চাবুক মেরেছিল তা বলব না, তবে " মাক্সিমভ্ হঠাৎ ফুট কাটল।

"তার মানে? কী বলতে চান? মেরেছিল, কি মারেনি?"

"কটা বাজে বলুন ত 'পান'?" পাইপ মুখে 'পান'টি তার ঢ্যাঙা সঙ্গীটিকে বিরসবদনে জিগ্‌গেস করল। উত্তরে সে কাঁধ ঝাঁকাল। ওদের দুজনের কারোই ঘড়ি ছিল না।

"লোকে একটু কথা বলবে তাতে আপত্তির কী আছে? অন্যদেরও কথা বলতে দিন। আপনার যদি বেজার লাগে তাই বলে কি অন্যেরা কথা বলবে না?" গ্রুশেন্‌কা আবারও তার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল, দেখে মনে হল যেন ইচ্ছে করেই তার পিছনে লেগেছে। এবারে মিতিয়ার মাথার ভিতরে কী যেন একটা চিন্তা এই যেন প্রথম ঝলক দিয়ে উঠল। এবারে 'পান' যে উত্তর দিল তাতে রীতিমতো বিরক্তির ভাব ফুঠে উঠল।

সে তার নিজের ভাষাতেই বলল, "পানি, আমি বিরোধিতা করছি না, আমি কিছু বলিনি।"

"বেশ ভালো কথা। এবারে তুমি তোমার কথা বল", মাক্সিমভের উদ্দেশে চেঁচিয়ে গ্রুশেন্‌কা বলল। "আরে আপনারা সবাই চুপ করে গেলেন যে!"

"বলার মতো আর কী আছে? কারণ, যা সবই তো বাজে কথা", গ্রুশেন্‌কার কথাটা লুফে নিয়ে যে ভাবে চটপট মাক্সিমভ্ বলে উঠল তাতে স্পষ্টতই বোঝা গেল সে এতে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং সেজন্য সামান্য একটু ঢংও করছে। "তা ছাড়া গোগলের মধ্যে যা আছে সে সব শুধু রূপকের ছলে, কেন না নামটামগুলো যা দিয়েছেন সেও রূপক—সেগুলোর এককটা অর্থ আছে। নজ্‌দ্রিয়োভ্—সে তো অর্থ করলে দাঁড়ায় নাসারন্ধ্র, কিন্তু আসলে তো সে ছিল নোসভ্। আর 'কুভ্ত' যার নাম দিয়েছেন তার আসল নাম ও একেবারে ধারে কাছে নয়—সে নাম ছিল চক্রধুরা। তবে ফেনার্দি—সে অবিশ্যি সত্যি সত্যি ফেনার্দি ছিল, কিন্তু হ্যাঁ, ইতালীয় নয়—রুশি। আর মাম্‌জেল ফেনার্দি—দিব্যি দেখতে কিন্তু মেয়েটি। আহা, গা লেপ্‌টে

থাকা পাতলা মোজা পরা কী চমৎকার তার ছিপছিপে পায়ের গোছা, তার সেই চুমকি বসানো খাটো স্কার্ট! কী ঘুরপাকই যে খেল মেয়েটা! তবে চার ঘণ্টা নয়, মাত্র চার মিনিট,... আর তাতেই মোহিত করে দিল সব্বাইকে

"কিন্তু চাবুক যে মেরেছিল, সেটা কী জন্য?" কালাগানভের মুখ থেকে আর্তচিৎকারের মতো বেরিয়ে এলো।

"পিরোঁর জন্য", মাক্সিমভ্‌ জবাব দিল।

"কোথাকার পিরোঁ আবার?" মিতিয়া চিৎকার করে উঠল।

"বিখ্যাত ফরাসি লেখক পিরোঁ তাঁর কথাই বলছি। আমরা সেই সময় এক বিরাট দঙ্গল বেঁধে একটা মেলাতে গিয়ে সেখানকার একটা সরাইখানায় বসে বসে মদ খাচ্ছিলাম। আমি আবার ওদের নিমন্ত্রিত ছিলাম কিনা। প্রথম-প্রথম এটা ওটা চুটকি কবিতা শোনাতে লাগলাম। বললাম সেই কবিতাটা[১০] 'কাকে দেখি? বুআলো কি?[১১] কী মজার সাজ!" আর বুআলো উত্তর দিচ্ছে যে সে মুখোশ নাচের আসরে যাচ্ছে, অর্থাৎ কিনা স্নানঘরে যাচ্ছে। ছি-ছি! ওরাও সঙ্গে সঙ্গে এটা ওদের নিজেদের গায়ে নিল। বেগতিক দেখে আমি চটপট অন্য আরেকটাতে চলে গেলাম—বেশ কটু ধরনের সেটা—শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই ভালো জানা আছে।

তুমি সাফো, আমিও ফাওন্‌—কোনো বিতর্কে যাব না!
তবু বড় দুঃখ মনে, এটাই ভাবনা
সাগরের পথ হায় তুমি তো জান না![১২]

এতে ওরা আরও রেগে গেল এবং আমাকে যা নয় তাই বলে অভদ্র ভাষায় গালাগাল দিতে লাগল। এদিকে আমার দুর্ভাগ্য এমনই যে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আমি ওঁদের পিরোঁ সম্পর্কে অত্যন্ত মার্জিত রুচির একটা চুটকি বললাম, যেখানে ফরাসি অকাদেমিতে স্থান না পাওয়ায় প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের সমাধিশিলার ওপর লেখার জন্য কবি একটা বয়ান তৈরি করেছিলেন

Ci-gît Piron qui ne fut rien
pas même académician.*[১৩]

আর যায় কোথায়! ওরা আমাকে উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিল।

"কিন্তু কী জন্য? কী কারণে?"

"কারণ এই যে আমি একজন শিক্ষিত লোক। কাউকে পিটুনি দিতে গেলে কি আর কারণের অভাব হয়?" সংক্ষেপে নীতিগর্ভ রায় দিল মাক্সিমভ্‌।

"আঃ! অনেকে হয়েছে। একেবারে যাচ্ছেতাই! আর শোনার ইচ্ছে নেই। আমি ভেবেছিলাম মজার কিছু হবে।" গ্রুশেন্‌কা হঠাৎ ওদের থামিয়ে দিল।

মিতিয়া হকচকিয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ হাসি থামিয়ে দিল। ঢ্যাঙা 'পান'টি জায়গা

---

* এখানে শায়িত পিরোঁ চিরনিদ্রায় —
কিছুই ছিল না কভু, আকাদমি-সদস্যও নয়। (ফরাসি)

ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দলের মধ্যে নিজেকে বেমানান মনে হলে একজন লোকের যে অবস্থা হয় সেই ভাবে মুখ ভার করে উদ্ধত ভঙ্গিতে, দুহাত পিছনে রেখে সে ঘরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

“আহা, বাবুর হাঁটার বহর দেখ!” তাচ্ছিল্যভরে তার দিকে তাকাল গ্রুশেন্‌কা। মিতিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তাছাড়া সে এও লক্ষ করেছিল যে সোফায় বসে থাকা পোলটি বিরক্তিভরে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

“‘পান’!” মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। “আসুন পান করা যাক! অন্য আরেকজন যে ‘পান’ উপস্থিত আছেন, তাকেও বলি, আসুন! চোখের নিমিষে সে তিনটি গ্লাস টেনে নিয়ে সেগুলিতে শ্যাম্পেন ঢালল।

“পোল্যান্ডের জন্য ‘পান’, আপনাদের পোল্যান্ডের জন্য, পোলদেশের জন্য!” মিতিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল।

“শুনে বড্ড ভালো লাগছে ‘পান’। আসুন”, গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে ও প্রসন্ন ভাবে এই বলে তার গ্লাসটা তুলে নিল।

“আর ওই যে উনি, কী যেন ওঁর নামটা? এই যে মশাই, আমাদের রাজপুরুষরত্নটি, এই নাও, ধর তোমার গেলাস!” মিতিয়া ব্যস্ত হয়ে বলল।

“পান ভুব্‌লিয়োভ্‌স্কি”, প্রথম জন ধরিয়ে দিল।

পান ভুব্‌লিয়োভ্‌স্কি হেলে দুলে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার গ্লাসটা তুলে নিল।

“পোল্যান্ডের জন্য মহোদয়রা!” মিতিয়া তার হাতের গ্লাস উঁচুতে তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, “হুররা!”

তিনজনেই পান করল। মিতিয়া খপ্ করে বোতলটা তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ আরও তিন গ্লাস ঢালল।

“এবারে আসুন মহোদয়রা, রাশিয়ার জন্য, আমাদের ভাই-ভাই সম্পর্কের জন্য!”

“আমাদের জন্যও ঢাল”, গ্রুশেন্‌কা বলল, “রাশিয়ার জন্য হলে আমিও আছি।”

“আমি, আমিও”, কালাগানভ্ বলল।

“আমিও কিন্তু   আরে রাশিয়া হল গিয়ে আমাদের বুড়ি দিদিমা   তার জন্য খাব না তো কি?” হি হি করে হাসতে হাসতে মাক্সিমভ্ বলল।

“সবাই! সবাই!” মিতিয়া উল্লসিত হয়ে উঠল। এই যে সরাইওয়ালা, আরও বোতল!”

মিতিয়া সঙ্গে করে যে পেটিটা নিয়ে এসেছিল তার ভেতরের অবশিষ্ট আরও তিন বোতলও আনা হল। মিতিয়া গ্লাসে গ্লাসে ঢালল।

“রাশিয়ার জন্য! হুররা!” আবার সে ঘোষণা করল। সকলেই পান করল—কেবল ওই দুই পোল ছাড়া। গ্রুশেন্‌কা তো এক চুমুকে পুরো গ্লাসটাই সাবাড় করে দিল। কিন্তু ওরা দুজন তাদের গ্লাস স্পর্শ পর্যন্ত করল না।

"কী হল? আপনাদের ব্যাপারটা কী?" মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। "কী হল আপনাদের বলুন তো?"

ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল, গলা চড়িয়ে বলে উঠল, বাহাত্তর সালের আগে[১৪] যেই রাশিয়া ছিল তার জন্য।

"হাঁ হাঁ, এটাই ভালো!" ওর সঙ্গীটিও চেঁচিয়ে বল উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে এক নিঃশ্বাসে তাদের গ্লাস খালি করে ফেলল।

"আপনারা তো বড়ো আহাম্মক মশাই!" মিতিয়ার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে এলো।

দুই পোলপুঙ্গবই দুই মোরগের মতো মিতিয়ার ওপর রুখে উঠে তাকে শাসাল। বিশেষ করে ফুঁসে উঠল ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি।

"নিজের দেশকে ভালো না বেসে কি পারা যায়?" সে গলা চড়িয়ে বলল।

"চুপ্। ঝগড়া করবেন না। কোনো ঝগড়াঝাঁটি চলবে না!" মেঝেতে পা ঠুকে গ্রুশেন্কা দাপটের সুরে দাবড়ানি দিয়ে উঠল। তার মুখ জ্বলজ্বল করছে, দুই চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে। এইমাত্র যে এক গ্লাস খেয়েছে তা জানান দিচ্ছে। মিতিয়া দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

"আমায় ক্ষমা করুন মহোদয়রা। দোষ আমারই। আর হবে না। ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি, পান ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি, কথা দিচ্ছি আর হবে না!

"আহা, তুমি অন্তত চুপ কর তো! বোসো বলছি! মুখ্যু কোথাকার!" দারুণ বিরক্ত হয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধমকে উঠল গ্রুশেন্কা।

সবাই বসে পড়ল। সকলে নীরবে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাউয়ি করতে লাগল।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমিই এ সবের কারণ!" গ্রুশেন্কার ওই চড়াসুরের কথার অর্থ যে কী হতে পারে তার কিছুই বুঝতে না পেরে মিতিয়া আবার শুরু করল। "বলি, আমরা অমনি অমনি বসে আছি কেন? কী ধরনের আমোদফূর্তি করা যায় আপনারাই বলুন না। কী করলে মনে আনন্দ পাওয়া যায়? আবার আগের মতো আনন্দ পাওয়া যায়?"

"ওঃ যা সব হচ্ছে, তাতে সত্যি-সত্যি আর যা-ই হোক, আনন্দের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না", অলসভাবে মিনমিন করে বলল কালাগানভ্।

"তাসের বাজি খেললেই তো হয়, এই যেমন খেলছিলাম হঠাৎ খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল মাক্সিমভ্।

"তাসের বাজি? সে তো চমৎকার!" মিতিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। তবে আমাদের 'পান'রা যদি

"বোড্ডো দিরি মোশাই"। কতকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার কথায় সাড়া দিয়ে সোফায় বসা পোলটি বলে উঠল।

"তা ঠিক।" তার কথায় সায় দিয়ে ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি বলল।

"দিরি? দিরি আবার কোন্ দিশি কথা?" গ্রুশেন্কা জিগ্গেস করল।

"তার মানে, পানি, মানে হল গিয়ে দেরি, মানে অনেক রাত হয়ে গেছে আর কি", সোফায় বসা পোলটি ব্যাখ্যা করে বলল।

"ওঁকে যা বলতে যাও তাতেই বলবেন দেরি হয়ে গেছে, এখন আর হবে না, করা উচিত হবে না!" ক্ষোভে দুঃখে প্রায় হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল গ্রুশেন্কা। "নিজে বসে আছেন মুখ বেজার করে, ভাবছেন অন্যেরাও যেন ওরকম বেজার হয়ে বসে থাকে। তুমি আসার আগে, মিতিয়া, ওরা সবাই ঠিক এমনি করে বড়মানুষি চাল দেখিয়ে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে ছিল..."

"দেরি আমার!" লোকটি চিৎকার করে এবারে তার নিজের ভাষাতেই বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ওপর তুমি প্রসন্ন নও, সেই কারণেই আমার মন খারাপ।" তারপর মিতিয়ার দিকে ফিরে কথা শেষ করে বলল, "আমি তৈরি, 'পান'।"

"তাহলে আর কি, শুরু হয়ে যাক!" এই বলে মিতিয়া ঝট করে পকেট থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে দুশ রুবলের দুখানা নোট নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। "আমি তোমার কাছে বড়ো রকমের বাজি হারতে চাই, 'পান'। তাস বের কর। কী পণ রাখবে রাখ।"

"সরাইওয়ালার কাছ থেকে নতুন তাস নিতে হবে কিন্তু মশাই", ছোটো পোলটি গম্ভীরভাবে জেদ ধরল।

"সেটাই সবচাইতে ভালো উপায়", ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি সায় দিল।

"সরাইওয়ালার কাছ থেকে? বেশ, বুঝলাম। হোক, তার কাছ থেকেই নেওয়া হোক। এটা আপনি ভালোই বলেছেন 'পান'। নিয়ে এসো, তাস নিয়ে এসো!" মিতিয়া সরাইওয়ালাকে হুকুম করল।

সরাইওয়ালা না খোলা অবস্থায় এক প্যাকেট আনকোরা তাস নিয়ে এলো। মিতিয়াকে সে জানাল যে ছুকরিগুলো তৈরি হচ্ছে, ঝাঁঝ করতাল নিয়ে ইহুদিগুলোও সম্ভবত শিগগিরই এসে পড়বে, কিন্তু খাবার দাবার নিয়ে যে গাড়িটা আসার কথা সেটা এখন অবধি এসে পৌঁছোয়নি। মিতিয়া টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাদি করার জন্য পাশের ঘরে ছুটে গেল। কিন্তু দেখা গেল এসেছে মাত্র তিনটি মেয়ে, মারিয়া এখনও আসেনি। তা ছাড়া মিতিয়া নিজেও জানে না কীসের কী বন্দোবস্ত করবে এবং কেনই বা সে ছুটে এলো। শুধু বলে দিল খাবারের পেটি থেকে যে সমস্ত মিষ্টি খাবার, লজেন্স, হাওয়া মিঠাই ইত্যাদি আছে সেগুলো যেন বের করে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। 'আর হ্যাঁ, আন্দ্রেইকে ভোদ্কা দেবে, অবশ্যই ভোদ্কা দেবে ওকে!' তাড়াতাড়ি এই হুকুম দিয়ে সে বলল, 'আন্দ্রেইর সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছিলাম।'

ঠিক এই সময় মাক্সিমভ্ তার কাঁধে হাত রাখল। মিতিয়ার পিছন পিছন সেও ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকেছিল।

"আমাকে পাঁচটা রুবল দিন", সে চাপা গলায় মিতিয়াকে বলল, "আমিও বাজি রাখতে চাই, দেখি একটা ঝুঁকি নিয়ে। হে-হে।"

"বাহবা, এই তো চাই! নিন, দশই নিন! এই যে!" সে আবার পকেট থেকে সবগুলো নোট বের করে তার ভেতর থেকে দশ রুবলের একটা নোট তুলে তাকে দিল। যদি হেরে যাও, আবার এসো, আবারও এসো।

"খুব ভালো কথা", খুশি হয়ে চাপা গলায় এই কথা বলে মাক্সিমভ্ ছুটে হলঘরে চলে গেল। মিতিয়াও তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো, সকলকে বসিয়ে রেখেছে বলে ক্ষমা চাইল। পোল দুজন ইতিমধ্যেই তাস খেলার জন্য তৈরি হয়ে বসে গেছে, তাসের প্যাকেটটা খুলেও ফেলেছে। এবারে কিন্তু তাদের অনেক বেশি অমায়িক এবং প্রায় দরদিই দেখাচ্ছে। পাইপমুখে পান নতুন করে পাইপ ধরিয়ে পণ রাখার জন্য প্রস্তুত হল। তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা বিজয়োভাসের ভাবও ফুটে উঠল।

"এবারে জায়গায় বাজির পণ রাখুন মশাই!" ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি ঘোষণা করল।

"না, আমি আর খেলব না", কালাগানভ্ প্রত্যুত্তরে সাড়া দিয়ে বলল, "এই কিছুক্ষণ আগে আমি ওদের কাছে পঞ্চাশ রুবল হেরেছি।"

"পান'-এর নসিব তখন খারাব ছিল, এখুন ফের ভালো হতে পারে", তাকে লক্ষ করে সোফায় বসে থাকা 'পান' মন্তব্য করল।

"তাহলে পণ কত থাকবে? জবাবে কত পণ রাখবেন?" মিতিয়া উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

"তা পান্-এর যেমন মর্জি—এক শ' দু'শ—যেমন বাজি রাখবেন।

"যদি বলি মিলিয়ন!" হো-হো করে হেসে উঠল মিতিয়া।

"পান্ ক্যাপ্টেন, আপনি হয়তো পান্ পদ্‌ভিসোৎস্কির কথা শুনে থাকবেন?"

"পদভিসোৎস্কি?—সে আবার কে?"

"ওয়ারশতে খেলার আসরে যে কেউ আসে সে-ই জবাবি পণ রাখতে পারে। তা এই রকম একটা আসরে পদ্‌ভিসোৎস্কি এসে দেখতে পেল হাজারটা সোনার মোহর পণ রাখা হয়েছে সেখানে, তা জবাবে সেও পণ রাখল। যে লোকটা সোনা পণ রেখেছিল সে বলল 'পান্ পদ্‌ভিসোৎস্কি, তুমি কী পণ রাখছ?—সোনা না তোমার ইজ্জত?' 'ইজ্জত পণ রাখছি পান্', পদ্‌ভিসোৎস্কি জবাব দিল। 'সেটা আরও ভালো'—এই বলে লোকটা দান দিল। পদ্‌ভিসোৎস্কি হাজার মোহর জিতে গেল। 'অপিক্ষা কর পান', এই বলে লোকটা ড্রয়ার খুলে এক মিলিয়ন বার করে তাকে দিয়ে বলল, 'এই নাও পান্, এটাই তোমার পাওনা!' আসলে পণ ছিল মিলিয়নের। 'এটা আমার জানা ছিল না', পদ্‌ভিসোৎস্কি বলল। তাতে যে বাজি রেখেছিল সে

বলল, 'তুমি তোমার ইজ্জত পণ রেখেছিলে, আমরাও আমাদের ইজ্জত পণ রেখেছিলাম।' পদ্‌ভিসোৎস্কি মিলিয়ন তুলে নিল।"

"এটা সত্যি নয়", কালাগানভ্ বলল।

"পান্ কালাগানভ্, ভোদ্দর সমাজে লোকে ওমন বোলে না।"

"হুঁঃ বললেই হল! পোল্ জুয়াড়ি অমনি অমনি তোমাকে মিলিয়ন দিয়ে দেবে!" মিতিয়া বলে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়তে সে নিজেকে সামলে নিল: "মাফ কর পান, অপরাধ হয়ে গেছে, আবার অপরাধ করে ফেলেছি। দেবে, দেবে, মিলিয়ন দেবে, ইজ্জতের খাতিরে, একজন পোল তার সম্মানের খাতিরে নির্ঘাত দেবে! দেখলে তো, পোল ভাষায় আমি কেমন কথা বলি! হাঃ-হাঃ! এই এবারে দশ রুবল বাজি রাখছি। এই রইল বাজির প্রথম তাস—গোলাম।"

আমি এক রুবল বাজি রাখছি বিবির ওপর, হরতনের বিবির ওপর, আমার লক্ষ্মীসোনা পানি খুকুরানির ওপর, হে-হে!" মাক্সিমভ্ তার তাসের বিবি টেনে বার করে হাসতে হাসতে বলল এবং যেন অন্যদের কাছ থেকে লুকোতে চাইছে এমন একটা ভাব করে একেবারে টেবিল ঘেঁষে সরে এসে টেবিলের তলায় হাত রেখে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। মিতিয়ার জিত হল। রুবলেরও জিত হল।

"তাসের কোণ মুড়ে সিকি ভাগ বাজি।" মিতিয়া চেঁচিয়ে বলল।

"আমি এক রুবল রাখছি, সিংগল-এই, ছোট্ট করে, ছোট্ট একটা সিংগল-এর", রুবল জিতে গিয়ে দারুণ আনন্দ হতে আহ্লাদে আটখান হয়ে বিড় বিড় করে বলল মাক্সিমভ্।

"মার গেল!" মিতিয়া চিৎকার করে উঠল। "সাতের ওপরে ডাবল!"

সাতও তুরুপের তাসে মার খেল।

"ডাবল! ডাবল!" মিতিয়া তার ডাক ডাবল করে দিল। যতবার সে ডাক ডাবল করে দেয়, ততবারই দেখা যাচ্ছে প্রতিপক্ষের হাতে মার খাচ্ছে। রুবলের বাজি দিব্যি জিতে চলেছে।

"ডাবল!" ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠল মিতিয়া।

"দুশ হেরে গেছ হে 'পান'। আরও দুশ রাখবে নাকি বাজি?" সোফায় বসে থাকা পান জানতে চাইল।

"সে কী! এর মধ্যে দুশ চলে গেল? তাহলে এই রাখছি আরও দুশ! দুশ'র সবটাই ডাব্‌লসে!" এই বলে পকেট থেকে টাকা বের করে মিতিয়া বিবির ওপর দুশ রুবল ছুড়ে দিতে যাবে এমন সময় কালাগানভ্ হাত দিয়ে তাকে বাধা দিল।

"অনেক হয়েছে!" সে তার ঝঙ্কৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

"কী ব্যাপার?" মিতিয়া স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"অনেক হয়েছে। আপনি খেলুন এটা আমার ইচ্ছে নয়! আর খেলবেন না।"

"কেন?"

"কেন তা তো বললাম। 'ধুত্তোর' বলে ছেড়ে দিয়ে উঠে আসুন দেখি। এরপর আর 'কেন' নেই। আর খেলতে দেব না!"

মিতিয়া অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

"ছাড় মিতিয়া। ও হয়তো ঠিকই বলছে। তাছাড়া অমনিতেই অনেক হেরেছ।" গ্রুশেন্কার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত সুর প্রকাশ পেল। দুজন 'পান'ই হঠাৎ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তাদের দেখে মনে হল তারা ভয়ঙ্কর রেগে গেছে।

"মশ্করা হচ্ছে নাকি 'পান'?" ছোটো 'পান'টি কঠিন দৃষ্টিতে কালাগানভ্কে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে উঠল।

"আপনার সাহস তো কম নয়!" 'পান' ভ্রব্লিয়োভ্স্কিও হুঙ্কার দিয়ে কালাগানভ্কে বলল।

"চেঁচাবেন না, অমন গলাবাজি করবেন না বলে দিচ্ছি! একি মোরগের লড়াই নাকি?" গ্রুশেন্কা চিৎকার করে বলল।

মিতিয়া একে একে সকলের মুখের দিকেই তাকাল। কিন্তু গ্রুশেন্কার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাকে হঠাৎ অবাক করে দিল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথার ভেতরে এক ঝলক কী যে একটা খেলে গেল যা একেবারে নতুন—অদ্ভুত এক নতুন চিন্তা।

"পানি আগ্রিপিনা!" উত্তেজনায় আগাগোড়া লাল হয়ে গিয়ে ছোট 'পান'টি সবে বলতে শুরু করেছিল, এমন সময় মিতিয়া আচমকা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে চাপড় মারল।

"এই যে বীরপুরুষ, দুটো কথা আছে।"

"কী চাই 'পান'?"

"ওই ঘরটাতে, পাশের ওই ঘরটাতে এসো, দুটো কথা তোমায় বলব, ভালো কথাই বলব, খুবই ভালো কথা বলব, শুনে তুমি খুশি হবে।"

ছোটো 'পান'টি অবাক হয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে মিতিয়ার দিকে তাকাল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রাজিও হয়ে গেল, তবে একটি শর্তে—ভ্রুব্লিয়োভ্স্কিকেও অবশ্যই তার সঙ্গে যেতে দিতে হবে।

"দেহরক্ষীটি তো? তা চলুক না, সেও চলুক, তাকেও দরকার আছে। এমনকি তাকে না হলেই নয়!" মিতিয়া সোল্লাসে বলে উঠল। "দুই 'পান'ই তাহলে কদম বাড়াও!"

"তোমরা আবার কোথায় চললে?" শঙ্কিত কণ্ঠে গ্রুশেন্কা জিগ্গেস করল।

"এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসছি", মিতিয়া জবাব দিল।

কেমন যেন একটা ভয়লেশহীন, এক ধরনের আকস্মিক ফুর্তির ভাব তার চোখেমুখে খেলে গেল। এক ঘণ্টা আগে যখন সে ঘরে ঢুকেছিল তার তখনকার সেই চেহারার সঙ্গে এ চেহারার একেবারেই কোনো মিল নেই।

পাশের বড়ো ঘরটাতে গানবাজনার দলের মেয়েরা জড় হচ্ছিল এবং খাবার টেবিল পাতা হচ্ছিল। দুই পোলকে মিতিয়া সেখানে না নিয়ে গিয়ে নিয়ে গেল ডান দিকে শোবার ঘরে। এই ঘরটাতে কয়েকটা তোরঙ্গ আর কিছু গাঁটরি রাখা ছিল, আর ছিল দুটো বড়ো বড়ো পালঙ্ক—দুটোর ওপরই পর পর স্তূপাকার করে রাখা একগাদা ছিটকাপড়ের বালিশ। ঘরের এক কোণে পাতলা তক্তা দেওয়া একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল। ছোটো পোলটি আর মিতিয়া এই টেবিলটার ধারে মুখোমুখি হয়ে বসল, দীর্ঘকায় পান ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি দু হাত পেছনে রেখে টেবিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই কটমট করে তাকাচ্ছিল, তবে দেখে মনে হচ্ছিল তারা বেশ কৌতূহল বোধ করছে।

"মোশাইয়ের কোন্ উপকারে লাগতে পারি?" ছোট 'পান' অস্ফুটস্বরে বলল।

"তাহলে বলি শোন পান, বেশি কথা আমি বলতে যাব না। এই যে এই টাকা দিচ্ছি তোমাকে", ব্যাঙ্কনোটগুলি বের করে সে বলল, "চাই কি তিন হাজারও নিতে পার, নিয়ে সরে পড়। কোথায় যাবে সে তুমি নিজেই জান।"

লোকটা দু চোখ বিস্ফারিত করে মিতিয়ার মুখের দিকে তাকাল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করল।

"তিন হাজার বলছ 'পান'?" ভ্রুব্লিয়োভ্স্কির সঙ্গে সে দৃষ্টিবিনিময় করল।

"তিন হাজার, বলছি তো মশাই তিন হাজার! শোন 'পান', দেখেশুনে যতদূর মনে হয়, তুমি একজন বিচক্ষণ লোক। তিন হাজার দিচ্ছি, ওই নিয়ে যে চুলোয় যেতে হয় চলে যাও, আর হ্যাঁ ভ্রুব্লিয়োভ্স্কিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলো না—শুনছ, কী বলছি? কিন্তু যেতে হবে এই এখুনি, এই মুহূর্তে আর, সে যাওয়া হবে চিরকালের জন্য, বুঝতে পারছ তো 'পান', চিরকালের জন্য—বেরিয়ে যাও সটান এই যে এই দরজাটা দিয়ে। ও হ্যাঁ, ও ঘরে তোমার কী রাখা আছে?—ওভারকোট? লোমের কোট?—আমি এনে দিচ্ছি। এক্ষুনি তিনঘোড়ার গাড়ি তোমার জন্য জোতা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে—'পান', বিদায়! কী বল? অ্যাঁ?"

মিতিয়া দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। লোকটা যে রাজি হয়ে যাবে এতে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। রীতিমতো দৃঢ় সংকল্পের একটা ভাব ফুটে উঠল পোলটির চোখেমুখে।

"তাহলে টাকা, 'পান'?"

'টাকার কথাটা তাহলে বলছি 'পান' গাড়ি বাবদ আর আগাম পাঁচশ রুবল এই মুহূর্তেই তোমাকে দিচ্ছি, বাকি আড়াই হাজার কাল শহরে গিয়ে দেব—আমার সম্মানের দিব্যি দিয়ে বলছি, পেয়ে যাবে। মাটির তলা থেকে হলেও ঠিক জোগাড় করে দেব!" মিতিয়া গলা চড়িয়ে বলল।

পোল দুজন আবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাউয়ি করল। খাটো 'পান'টির মুখের ভাব বিগড়ে যাবার মতো হল।

“পাঁচশ নয়, সাতশ’, সাতশ’ই দিচ্ছি—এক্ষুনি, এই মুহূর্তে, হাতে হাতে!” গতিক সুবিধার নয় উপলব্ধি করে মিতিয়া যোগ করল। “কী হল ‘পান’? বিশ্বাস করছ না? তিন হাজারের সবটাই তো আর তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দিয়ে দেওয়া যায় না। আমি এখন দিয়ে দিই, আর তুমিও কালই আবার ওর কাছে ফিরে আস। তাছাড়া তিন হাজারের সবটা এখন আমার কাছে নেইও, শহরে আমার বাড়িতে আছে”, প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে হতোদ্যম হয়ে, ভয়ে ভয়ে অস্ফুট স্বরে সে বলল। “ঈশ্বরের দিব্যি, আছে, লুকিয়ে রাখা আছে

মুহূর্তের মধ্যে খাটো ‘পান’টির মুখে দপ্ করে জ্বলে উঠল অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধের চিহ্ন।

“আরও কী চাই, শুনি?” বিদ্রূপের সুরে সে জিগ্গেস করল। “ছি! ছি!” এই বলে সে মেঝেতে থুতু ফেলল, ‘পান’ ভ্রুব্লিয়োভ্স্কিও থুতু ফেলল।

সব শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মিতিয়া এবারে মুষড়ে পড়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, “তুমি যে অমন ঘেন্না দেখাচ্ছ তার কারণ এই যে   এটাই কারণ যে তুমি ভাবছ গ্রুশেন্কাকে দিয়ে আরও বেশি ফায়দা ওঠাতে পারবে। তোমরা দুটোতেই একেকটা খাসি মোরগ—এছাড়া আর কী বলব।”

“এতো অপমানের চূড়ান্ত দেখছি!” খাটো ‘পান’টি হঠাৎ দেখতে দেখতে জলে সেদ্ধ হওয়া কাঁকড়ার মতো লাল হয়ে গেল এবং আর একটি কথাও শোনার এতটুকু প্রবৃত্তি নেই—এমন একটা ভাব করে চটপট ঘর ছেড়ে চলে গেল। ভ্রুব্লিয়োভ্স্কিও হেলেদুলে তাকে অনুসরণ করল। মিতিয়া হতবুদ্ধি ও মনমরা হয়ে পড়েছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেও স্থানত্যাগ করল। তার ভয় হচ্ছিল গ্রুশেন্কাকে। আগে থাকতেই সে উপলব্ধি করতে পারছিল ‘পান’ এখুনি দারুণ চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। ঠিক তা-ই হল। বড়ো ঘরে ঢুকেই পোল সন্তানটি নাটকীয় ভঙ্গিতে গ্রুশেন্কার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“পানি আগ্রিপিনা, আমি চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছি!” এই বলে পোল ভাষায় সে মুখ খুলেছে কি খোলেনি, অমনি গ্রুশেন্কার সমস্ত রকম ধৈর্যের বাঁধ এমন ভাবে ভেঙে পড়ল যে মনে হল যেন তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে।

“রুশিতে বল, রুশিতে বল, পোল ভাষার একটি শব্দও যেন না থাকে!” গ্রুশেন্কা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। “এর আগে তো দিব্যি রুশ ভাষায় কথা বলতে, পাঁচ বছরের মধ্যে ভুলে গেলে নাকি!” ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল তার চোখমুখ।

“পানি আগ্রিপিনা   ”

“আমি আগ্রাফেনা, আমি গ্রুশেন্কা। রুশিতে বল, নইলে শুনতে চাইনে তোমার কথা!”

পোল সন্তানটি তার অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ফুঁসতে লাগল, ভাঙা-ভাঙা রুশিতে সে চটপট বলে উঠল   ‘পানি আগ্রাফেনা, আমার ইচ্ছে ছিল পুরনো কুছু মনে

রাখব না, মাফ করে দিব বলে আমি এসেছি। আগে যা কুছু হয়েছিল ভুলে যাব...”

“মাফ করে দেব মানে? আমাকে মাফ করতে এসেছ তুমি?” তার কথায় বাধা দিয়ে এক লাফে সে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল।

“ঠিক তাই, পানি। আমার মন ছোটো নয়, আমার মন বড়ো আছে। কিন্তু তোমার পিয়ারাদের দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ‘পান’ মিতিয়া আমাকে ওই শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গিয়ে তিন হাজার দিচ্ছিল, মতলব যাতে আমি চলে যাই। আমি ‘পান’-এর মুখের ওপর থুক ফেলে চলে আসি।”

“মানে? আমার জন্য তোমাকে টাকা দিতে যাচ্ছিল?” হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চিৎকার করে উঠল গ্রুশেন্‌কা। “সত্যি? তাই নাকি, মিতিয়া? তোমার এতদূর আস্পর্ধা! আমাকে কেনাবেচার জিনিস পেয়েছ নাকি?”

“শুনুন মশাই, শুনুন! “মিতিয়া গর্জন করে উঠল। ও একটা নিখাদ ঝকঝকে মেয়ে। আমি কখনও ওর প্রেমিক ছিলাম না! তোমার ও কথা মিথ্যে

“তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! ওর কাছে আমার হয়ে সাফাই গাইতে তোমাকে কে বলেছে?” গ্রুশেন্‌কা ফেটে পড়ল। “আমি যদি নিখাদ হই সেটা আমার সৎ স্বভাবের দরুন নয়, এই কারণেও নয় যে কুজ্‌মাকে আমি ভয় পেতাম, কারণটা এই যাতে তার সামনে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি, যাতে তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে ছোটোলোক বলার অধিকার আমার থাকে। আচ্ছা, সত্যিই কি ও তোমার কাছ থেকে টাকা নেয়নি?”

“নিচ্ছিল! নিতেই তো যাচ্ছিল!” মিতিয়া বলে উঠল। “তবে হ্যাঁ, তিন হাজারের সবটা একসঙ্গে চেয়েছিল, কিন্তু আমি আগাম হিসেবে মোট সাতশ দিচ্ছিলাম।”

“এবারে বোঝা গেল। শুনেছে আমার টাকা আছে, তাই বিয়ে করতে এসেছে!”

“পানি আগ্রিপিনা!” ‘পান’ চিৎকার করে উঠল। “আমি একজন বীরপুরুষ, খানদানি লোক, আমাকে যা-তা ভেবো না! আমি তোমাকে আমার বন্ধু করব বলে এসেছিলাম, কিন্তু এখন যাকে দেখছি সে এক নতুন পানি, আগেকার সেই ‘পানি’ নয়—এক বেলাজ বেহায়া মেয়েমানুষ।”

“বটে! ভাগ এখান থেকে! যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে কেটে পড়! আমি ওদের বলছি তোমাকে খেদিয়ে দিতে, এখনই খেদিয়ে দেবে!” ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল গ্রুশেন্‌কা। “ওঃ আমি কী বোকা! এমন বোকা আমাক বানিয়ে রেখেছিল যার জন্য পাঁচ বছর কী যন্ত্রণাই না আমাকে সইতে হয়েছে! তবে হ্যাঁ, যন্ত্রণা যেটা ভোগ করেছি সেটা ওর জন্য মোটেই নয়, আমার রাগই আমাকে যন্ত্রণায় পুড়িয়ে মেরেছে! তা ছাড়া এ তো দেখছি সম্পূর্ণ অন্য এক লোক! ও কি এরকম ছিল? দেখে তো মনে হচ্ছে ওর বাপ-টাপ কেউ হবে! ওই পরচুলা তুমি কোথা থেকে ফরমায়েস দিয়ে নিয়ে এসেছ বল তো? সে ছিল বাজপাখি, কিন্তু এ তো একটা পাতিহাঁস। সে লোকটা হাসত, আমাকে গান গেয়ে শোনাত।...

এদিকে আমি কি না, আমি কি না পাঁচ বছর চোখের জল ঝরিয়েছি। আমি একটা হদ্দ বোকা, একেবারে খেলো, নির্লজ্জ!”

বলতে বলতে সে দু হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ততক্ষণে মোক্রয়ের দলটি বাঁ পাশের ঘরে এসে জড় হওয়াতে ঠিক এই সময় আচমকা সেখান থেকে উদ্দাম নাচগানের আওয়াজ আছড়ে পড়ল।

“এ যে রীতিমতো অনাচার!” পান ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি হঠাৎ গর্জন করে উঠল। “ওহে হোটেলওয়ালা, হটিয়ে দাও ওই বেহায়া ছুঁড়িগুলোকে!”

সরাইওয়ালা ইতিমধ্যে বেশ খানিকক্ষণ হল কৌতূহলভরে আড়াল থেকে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এবং অতিথিদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বেধে গেছে অনুমান করে সে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভেতরে এসে হাজির হল।

“অমন চেল্লাচেল্লি করে গলা ফাটানোর কী আছে?” ভ্রুব্লিয়োভ্স্কিকে সম্বোধন করে যে ভাবে সে কথাগুলি বলল তা কেমন যেন রূঢ়ই শোনা গেল, যদিও কেন অমন অভদ্রভাবে বলল সেটা ঠিক বোধগম্য হল না।

“জানোয়ার কোথাকার!” গলা চড়িয়ে হম্বিতম্বি করতে যাচ্ছিল পান ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি।

“জানোয়ার? বটে? কিন্তু তুমি এখন কী তাস খেলছিলে শুনি? আমি তোমাকে তাসের প্যাকেট দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমারটা লুকিয়ে রেখে দিলে! তুমি তোমার চিহ্ন দেওয়া জালি তাস দিয়ে তাস খেলেছ! জালি তাসে খেলার জন্য আমি তোমাকে সাইবেরিয়ায় ঘানি ঠেলতে পাঠাতে পারি জান? কেন না জালি তাস যা জালি নোটও তাই ” বলতে বলতে সোফার কাছে এগিয়ে এসে সোফার পিঠ আর বসার গদির মাঝখানের ফাঁকটায় আঙুল গলিয়ে দিয়ে তার ভেতর থেকে প্যাক-না-খোলা তাসের প্যাকেটটা টেনে বার করে আনল।

“এই যে আমার তাসের প্যাকেটটা। এটা খোলাই হয়নি; দেখছেন তো!” প্যাকেটটা তুলে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকে দেখাল। “আমি কিন্তু ওখান থেকে সব দেখতে পাচ্ছিলাম—দেখলাম আমার প্যাকেটটা ওই খোঁদলের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে নিজেরটা দিয়ে বদলি করে নিল। জোচ্চোর কোথাকার! আবার বলে কিনা ভদ্রসন্তান—‘পান’!”

“আমিও এই ‘পান’টাকে দুবার তাস নিয়ে কারসাজি করতে দেখেছি”, কালাগানভ্ চেঁচিয়ে বলল।

“ছি ছি, কী লজ্জার কথা! কী লজ্জার কথা!” দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়াল গ্রুশেন্কা। “হাঃ ভগবান, কোথায় নেমে গেছে লোকটা!” বলতে বলতে সে সত্যি সত্যি লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

“আমিও তা-ই ভেবেছিলাম”, মিতিয়া চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তার মুখের কথা পড়তে না পড়তে দস্তুরমতো অপ্রস্তুত ‘পান’ ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি ক্রোধে ক্ষিপ্ত

হয়ে গ্রুশেন্কার দিকে ফিরে ঘুষি পাকিয়ে তাকে শাসিয়ে চিৎকার করে বলল "বাজারের নষ্ট মেয়েমানুষ!"

এদিকে মিতিয়াও লোকটার মুখের কথা পড়তে না পড়তে তার দিকে ধেয়ে গেল, দু হাতে তাকে চেপে শূন্যে তুলে ধরে নিমেষের মধ্যে বড়ো ঘর থেকে বয়ে রেখে দিয়ে এলো ডান পাশের সেই ঘরটাতে, যেখানে এই কিছুক্ষণ আগে সে ওদের দুজনকেই নিয়ে গিয়েছিল!"

"ওটাকে আমি ওখানে মেঝেতে শুইয়ে রেখে এসেছি!" সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে ঘোষণা করল। "হতভাগাটা মারপিট করতে এসেছ। ওখান থেকে আর এমুখো হবে বলে মনে হয় না!

দরজার একটা পাল্লা বন্ধ করে আরেকটা পাল্লা হাঁ করে খুলে ধরে খাটো পোলটিকে হেঁকে সে বলল, "হে মহামান্য, ওই পথে যেতে আপনারও অভিরুচি হয় না কি? তাহলে আসুন!"

"আহা, দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ, করেন কী কর্তা।" উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠল সরাইওয়ালা ত্রিফন বরিসভিচ। "আরে ওদের কাছে যে পরিমাণ টাকা হেরেছ সেটা আদায় করে নেবে তো! ও টাকা তো তোমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিল বলেই ধরতে হয়।"

"আমি আমার পঞ্চাশ রুবল আর ফেরত চাইছি না", কালাগানভ্ হঠাৎ জানিয়ে দিল।

"আমিও আমার দুশ আর চাই নে!" মিতিয়া বলে উঠল। কোনো ভাবেই নেব না! ওই নিয়ে যদি ও সান্ত্বনা পায় তো পাক না।"

"বাহবা মিতিয়া! শাবাশ বলতে হয় তোমাকে, মিতিয়া!" গ্রুশেন্কা উল্লসিত হয়ে বলল। একটা ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের সুর বেজে উঠল তার উল্লসিত কণ্ঠস্বরে।

খাটো 'পান'টি প্রচণ্ড ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনও সে তার ভারিক্কি চাল এতটুকু ছাড়েনি। দরজার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে হঠাৎ গ্রুশেন্কার উদ্দেশে বলল

"'পানি' আমার সঙ্গে যাইতে হলে চল, না হইলে বিদায়।"

ক্রোধে বিতৃষ্ণায় ও আত্মম্ভরিতায় ফুঁসতে ফুঁসতে এই বলে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে দরজার কাছে চলে গেল। বিচিত্র চরিত্র বটে লোকটার। এত সব কাণ্ড ঘটে যাবার পরও সে আশা ছাড়েনি—নিজেকে সে এত বেশি মূল্যবান মনে করত যে এর পরও সে আশা করেছিল গ্রুশেন্কা তাকে অনুসরণ করবে। মিতিয়া ওর পেছন পেছন দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"ওদের তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখ", কালাগানভ্ বলল। কিন্তু ওদের দিক থেকে দরজায় খুট করে খিল পড়ার আওয়াজ উঠল। ওরা নিজেরাই নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

"বাহবা!" কোনো দয়ামায়া না দেখিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠল গ্রুশেন্‌কা। "বাহবা! ঠিক হয়েছে! ওদের অমনই হওয়া উচিত!"

## আট

## ঘোর

এর পর যা শুরু হল তা অনেকটাই উচ্ছৃঙ্খল পান-ভোজনের এক উৎসব, দুনিয়াসুদ্ধ সকলের জন্য যার দ্বার অবারিত। গ্রুশেন্‌কাই প্রথম হেঁকে বলল যে তার মদ চাই।

"মদ চাই। মদ খেয়ে একেবারে বেহেড মাতাল হতে চাই—সেই সেবারের মতো। তোমার মনে আছে মিতিয়া? মনে আছে তখন আমাদের দুজনার মধ্যে এখানে কেমন মিতালি হয়েছিল?"

এদিকে মিতিয়া যেন আছে একটা ঘোরের মধ্যে। সে তার 'ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায়' বিভোর। গ্রুশেন্‌কা অবশ্য মিতিয়াকে অনবরত তার নিজের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

"যাও আমোদফুর্তি কর। ওদের নাচতে বল। সব্বাইকে ফুর্তি করতে বল। কুঁড়েঘর নেচে উঠুক, ঘরের উনুন নেচে উঠুক'—আবার সেই সেবারের মতো!" সোল্লাসে সে বলে যেতে লাগল। রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে।

মিতিয়াও তার হুকুম তামিল করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। নাচগানের আসরটা বসেছিল পাশের ঘরে। এখন পর্যন্ত যে ঘরটাতে ওরা বসে ছিল সেটা অমনিতেই বেশ চাপাচাপি, তার ওপর আবার একটা ছিট কাপড়ের পর্দা দিয়ে দু ভাগ করা। পর্দার ওপাশে এখানেও আবার ছিল একটা বিশাল পালঙ্ক, পালঙ্কের ওপর পাখির পালকের নরম তুলতুলে গদি, তার ওপর একের পর এক স্তূপ করে রাখা ওই রকমই ছিট কাপড়ের বালিশ। সত্যি বলতে গেলে কি এই বাড়িতে যে চারটি 'পরিষ্কার' ঘর আছে সেগুলির সর্বত্রই খাট পালঙ্ক পাতা।

গ্রুশেন্‌কা একেবারে দোরগোড়ায় জায়গা করে নিল। মিতেন্‌কা তার জন্য সেখানে একটা হাতলওয়ালা চেয়ার এনে রেখে দিয়েছিল। 'সেদিনও', এখানে প্রথম যখন তাদের উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসবের আসর বসেছিল, সেই দিনটাতেও এই জায়গাটাতে, ঠিক এই ভাবেই সে বসে ছিল, এখান থেকেই নাচগান তামাশা দেখছিল। যে মেয়েগুলো এখন এসেছে তখনও এই ওরাই সব এসেছিল। ইহুদিগুলোও তাদের বেহালা এবং আরও সমস্ত তারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। অবশেষে এসে পৌঁছুল মদ এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়ে তিন ঘোড়ার গাড়িটা, যার জন্য সকলে এতক্ষণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল।

মিতিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল। বাইরের মেয়ে পুরুষেরা তামাশা দেখতে দলে

দলে ঘরে এসে ঢুকছে। এতক্ষণ তারা ঘুমিয়ে ছিল, কিন্তু এখন জেগে উঠেছে, এক মাস আগে যে ভাবে আপ্যায়িত হয়েছিল সেরকম একটা আপ্যায়নের গন্ধ পেয়েছে তারা। মিতিয়া একে একে তাদের মুখ মনে করে চেনাপরিচিতদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে, তাদের আলিঙ্গন করছে, বোতলের ছিপি খুলছে, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই গ্লাসে করে মদ ঢেলে দিচ্ছে। শ্যাম্পেনের জন্য শুধু ছুকরিগুলোরই বেশি আগ্রহ দেখা গেল। পুরুষগুলোর বেশি পছন্দ রম আর ব্র্যান্ডি, বিশেষ করে গরম গরম পাঞ্চ। মিতিয়ার হুকুম ছুকরিদের সকলকে চকোলেটের পানীয় বানিয়ে দিতে হবে, আর তিনটে সামোভারের সবগুলিতেই সারা রাত ধরে জল ফোটাতে হবে যাতে যে কেউ আসুক না কেন সে-ই গরম গরম চা আর পাঞ্চ পেতে পারে, যে যার খুশিমতো নিজে হাতে নিজের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

এক কথায়, একটা বিশৃঙ্খল ও উদ্ভট পরিস্থিতির সূচনা হল। কিন্তু মিতিয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন তার নিজের স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে এবং পরিস্থিতি যত বেশি হাস্যকর হয়ে উঠছিল এতই বেশি করে সে উজ্জীবিত হয়ে পড়ছিল। সেই মুহূর্তে চাষাভুসোরা কেউ যদি তার কাছে টাকাপয়সা চেয়ে বসত তাহলে সে তৎক্ষণাৎ গোটা বান্ডিলটা বার করে হিসাবের কোনো পরোয়া না করে ডাইনে বাঁয়ে এনতার বিলোতে থাকত। সম্ভবত এই কারণেই মিতিয়াকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সরাইওয়ালা ত্রিফন বরিসভিচ্ পারতপক্ষে তাকে কাছছাড়া করল না, তার চারধারে ঘুরঘুর করতে লাগল। মনে হয় সেদিন রাতের ঘুম তার মাথায় উঠেছিল, যদিও মদ্যপান সে অতি সামান্যই করেছিল—মাত্র এক গ্লাস পাঞ্চ চেখে দেখেছিল। সে তার নিজের মতো করে মিতিয়ার স্বার্থরক্ষার দিকে সতর্ক নজর রাখতে লাগল! মিষ্টি কথায়, তোয়াজ করে তাকে সংযত করল, অনেক করে বোঝাল। 'সেবারের' মতো এবারে আর তাকে চাষাগুলোর মধ্যে দেদার 'সিগার ও রাইন মদ্য' বিলোতে দিল না এবং ভগবান যাতে তাকে রক্ষা করেন তার জন্য ওদের মধ্যে টাকাপয়সাও বিলোতে দিল না। ছুঁড়িগুলো যে দিব্যি মিষ্টি মদ আর চকোলেট-টফি খাচ্ছে তা দেখেও রীতিমতো বিরক্ত হল। রাগে গজগজ করে সে বলতে লাগল 'এগুলো সব একেকটা উকুনের ঝাড় বৈ আর কিছু নয় দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আমি হলে ওদের ধরে ধরে লাথি কষিয়ে বুঝিয়ে দিতাম, ওটাই ওদের প্রাপ্য সম্মান আর তাতেই ওদের কৃতার্থ থাকা উচিত—এই হল ওদের ছিরি!"

মিতিয়ার আবার মনে পড়ে গেল তার গাড়ির গাড়োয়ান আন্দ্রেইয়ের কথা, তার জন্য সে বাইরে পাঞ্চ পাঠিয়ে দিতে বলল। "আমি আজ ওর মনে বড়ো দুঃখ দিয়েছি", আবারও আবেগে আপ্লুত হয়ে কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল। কালাগানভ্ পান করতে খুব একটা ইচ্ছুক ছিল না এবং প্রথম প্রথম ছুঁড়িগুলোর গানও তার তেমন একটা ভালো লাগছিল না, কিন্তু আরও দু

এক পাত্র শ্যাম্পেন পান করার পর সে বেজায় খুশি হয়ে উঠল, ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, গান বাজনা সবেরই এবং উপস্থিত সকলেরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। মাক্সিমভের আহ্লাদ আর ধরে না, তার নেশাটাও বেশ ধরেছে, মিতিয়ার সঙ্গ সে কিছুতেই ছাড়ছিল না। গ্রুশেন্‌কাও একটু একটু করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। কালাগানভ্‌কে দেখিয়ে সে মিতিয়াকে বলছে: "আহা কী মিষ্টি, কী চমৎকার ছেলেটা!" মিতিয়াও উল্লসিত হয়ে কালাগানভ্ আর মাক্সিমভের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের চুমু খাচ্ছে। আহা, ভবিষ্যতের কত ভাবনাই না তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল! গ্রুশেন্‌কা এখনও তাকে ওরকম কিছু বলে নি, এমনকি মনে হয় যেন ইচ্ছে করেই বলতে দেরিও করছিল। শুধু কদাচিৎ এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল যে সেখানে একটা স্নিগ্ধ অথচ উদগ্র আবেগের ভাব ফুটে উঠছিল। শেষকালে গ্রুশেন্‌কা আচমকা শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে সজোরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনল। নিজে সে তখন বসে ছিল দরজার সামনে সেই হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে।

"আচ্ছা, এই এখন তুমি এখানে এসে ঢুকলে কী করে বল তো? ওঃ যে ভাবে ঢুকলে না! কী ভয়ই না আমি পেয়ে গিয়েছিলাম! কী বলে তুমি আমাকে ওর হাতে ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলে? সত্যি সত্যি তাই চাইছিলে না কি, অ্যাঁ?"

"তোমার সুখ নষ্ট করার ইচ্ছে আমার ছিল না!" পরম সুখাবেশে মিতিয়া আমতা আমতা করে বলল। কিন্তু মিতিয়ার উত্তরের কোনো প্রয়োজন তার ছিল না।

"আচ্ছা, এবারে যাও, আনন্দ কর ..." আবার তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গ্রুশেন্‌কা বলল। "কেঁদো না কিন্তু, তোমাকে আবার ডেকে নেবো।"

মিতিয়া তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটে চলে গেল। গ্রুশেন্‌কা আবার গান শুনতে ও নাচ দেখতে শুরু করল, যদিও মিতিয়া যেখানেই থাকুক না কেন গ্রুশেন্‌কার চোখ দুটি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেই দেখা গেল আবার সে মিতিয়াকে ডাকছে, মিতিয়াও তার ডাক পেয়ে আবার তার কাছে ছুটে আসছে।

"আচ্ছা এবারে আমার পাশে বোসো। বল দেখি কাল কোথা থেকে তুমি আমার খবর পেলে? কী করে জানতে পারলে যে আমি এখানে এসেছি? কার মুখ থেকে প্রথম জানতে পারলে?"

মিতিয়াও তাকে সব কথা বলতে শুরু করল। এলোমেলো ও ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তেজিত হয়ে বলল বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও আশ্চর্য এই যে সে বলল। বলতে বলতে অনেক সময় হঠাৎ হঠাৎ ভুরু কোঁচকাতে লাগল, তার কথার মাঝখানে ছেদ পড়তে লাগল।

"অমন ভুরু কোঁচকাচ্ছ কেন বল তো?" গ্রুশেন্‌কা জিগ্‌গেস করল।

“ও কিছু নয়। একজন লোককে অসুস্থ অবস্থায় ওখানে অমন ভাবে ফেলে রেখে দিয়ে এলাম। আহা, যদি সুস্থ হয়ে ওঠে, যদি জানতে পারতাম যে সুস্থ হয়ে উঠবে তাহলে এখুনি আমার আয়ুর দশটা বছর তাকে দিয়ে দিতাম!”

“হোক গে অসুস্থ। বাদ দাও তো ওর কথা! তা হলে কি তুমি সত্যি সত্যি আগামীকাল গুলি করে নিজেকে খতম করতে যাচ্ছিলে? আচ্ছা বোকা তো! কীসের জন্য? আমি কিন্তু তোমার মতো এই বেপরোয়াদেরই ভালোবাসি”, বেশ খানিকটা স্খলিত কণ্ঠে ঠেকে-ঠেকে সে বলল। “তুমি তা হলে আমার জন্য কোনো কিছুতেই পিছপা হবে না? অ্যাঁ? সত্যি সত্যি তুমি বোকার মতো কাল নিজেকে গুলি করে মারতে যাচ্ছিলে! না, একটু সবুর কর, কাল হয়তো আমি তোমাকে একটা কথা বলব... আজ বলব না, কাল বলব। তুমি কি আজই শুনতে চাইছিলে? না, আজ বলতে চাই নে... আচ্ছা, যাও, এবারে গিয়ে মজা কর গে।”

একবার অবশ্য কতকটা যেন হতবুদ্ধি ও উদ্বিগ্ন হয়েই সে ওকে ডাকল।

“কী হল? অমন মন খারাপ করছ কেন? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মন খারাপ। না, না, আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি”, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিতিয়ার দিকে তাকিয়ে সে যোগ করল। “যদিও চাষাগুলোর সঙ্গে তুমি চুমোচুমি করছ, চিৎকার চেঁচামেচি করছ, কিন্তু আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি। না না, যাও, তুমি আনন্দ কর। আমি আনন্দ পাচ্ছি, তুমিও আনন্দ কর। এখানে এমন একজন আছে যাকে আমি ভালোবাসি। আন্দাজ করতে পার, তাকে? এই দেখ, আরে বাচ্চা ছেলেটা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি। বাছার আমার নেশাটা ভালোই ধরেছে।”

গ্রুশেন্কা বলছিল কালাগানভের কথা। কালাগানভ্ বাস্তবিকই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সোফায় বসে বসে মুহূর্তের জন্য সে ঘুমিয়েও পড়েছিল। তবে কেবল নেশার ঘোরেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা নয়। হঠাৎ কেন যেন তার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অথবা তার ‘একঘেয়ে’ লাগছিল—যে কথা সে নিজেও মুখে বলেছিল। পানের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মেয়েগুলোর গানও বড়ো বেশি করে অসংযত ও অশালীন হয়ে উঠতে শুরু করছে দেখে শেষকালে তার উৎসাহে একেবারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। নাচের ক্ষেত্রেও তাই। দুটো মেয়ে ভাল্লুকের সাজে সাজল। স্তেপানিদা নামে একটা ছটফটে মেয়ে একটা লাঠি হাতে নিয়ে পরিচালক হয়ে তাদের ‘খেল দেখাতে’ শুরু করে দিল। “আরও মজা কর মারিয়া, আরও মজা কর, নইলে দেখছ তো আমার হাতের লাঠিটা”, মেয়েটা চিৎকার করতে থাকে। ভাল্লুক দুটো শেষকালে মেঝেতে পড়ে এমন ভাবে গড়াগড়ি যেতে লাগল যেটাকে তেমন একটা শোভন আদৌ বলা যায় না। কিন্তু তিল ধারণের জায়গার কোনো অবকাশ না রেখে যে সমস্ত চাষাভুসো লোক আর চাষি বৌ সেখানে দর্শক হিসেবে জুটেছিল তাদের সকলের মধ্যে এতে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। ‘চলুক, চলুক, চালিয়ে যাক!” চোখেমুখে পরম পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে রায়দানের ভঙ্গিতে গ্রুশেন্কা

বলল। 'একদিন যখন আনন্দ করার সুযোগ পেয়েছে তখন লোকে আনন্দ করবে না কেন?" এদিকে কালাগানভ্ এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার গায়ে কীসের যেন নোংরা লেগে গেছে। "এসব নোংরা শুয়োরেপনা, চাষাড়ে কারবার", একটু দূরে সরে যেতে যেতে বিড়বিড় করে সে বলল। "ওদের সমাজে এ হল এক ধরনের বসন্তলীলা, যখন গরমকালের সারা রাতের জন্য তারা সূর্যকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু বিশেষ করে তার ভালো লাগেনি নাচের সুরে গাওয়া একটা 'নতুন' ধরনের গান, যেখানে মেয়েরা তাকে ভালোবাসে কিনা তা জানার জন্য একজন বাবু তাদের পরীক্ষা করে দেখছিল

মেয়েগুলোকে করছে পরখ বাবু,
শুধোয় তাদের বাসবে কিনা ভালো।

কিন্তু মেয়েগুলোর মনে হল বাবুকে ভালোবাসা যায় না

বাবুর হাতের চড়চাপাটি ভালোই আছে জানা,
তাই ত ভালো বাসতে তাকে মানা।

তারপর এলো এক জিপ্‌সি—ওদের উচ্চারণে জিইপ্‌সি—সেও পরখ করতে গেল।

জিইপ্‌সি সে করছে পরখ এসে,
শুধোয় তাকে বাসবে কিনা ভালো।

কিন্তু না, জিপ্‌সিকেও ভালোবাসা যায় না

কোথায় কখন করবে চুরি
দুখের জ্বালায় তখন মরি।

এরকম অনেক ধরনের মানুষ এলো, এসে মেয়েদের মন পরখ করতে লাগল। এমনকি এক ফৌজিও এলো

করল পরখ ফৌজিও এক এসে,
শুধোয় তাকে বাসবে কিনা ভালো।

কিন্তু ফৌজিকেও মেয়েরা তাচ্ছিল্যভরে ফিরিয়ে দিল

পিঠে বয় ফৌজির ঝুলি,
আমি কি না

এর পরই চটুল গীতের যে অংশটি এলো তা একেবারে অশ্রাব্য অশ্লীল, তবে সেটা গাইবার মধ্যে রীতিমতো আন্তরিকতা ছিল এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও তা প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ব্যাপারটার শেষকালে নিষ্পত্তি হল সদাগরকে দিয়ে:

করল পরখ এক সদাগর এসে,
শুধোয় তাকে বাসবে কিনা ভালো।

দেখা গেল মেয়েরা তাকে খুবই ভালোবাসে। তার কারণটা এই যে

সদাগর যাবে বাণিজ্যেতে,
তবেই না হব তার রানি!

শুনে কালাগানভ্ তো খেপেই গেল। "ছ্যাঃ ছ্যাঃ এ তো দেখছি বস্তা পচা সেকেলে একটা গান!" গলা চড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে সে বলল। "কে যে ওদের জন্য এমন সব ছাইভস্ম লেখে! মেয়েগুলোকে যারা যারা পরখ করতে এসেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র রেলের কর্মী আর ইহুদিগুলোই বাকি থাকল দেখছি! ওরা এলে তো ষোলকলা পূর্ণ হত! ওরাই সবাইকে টেক্কা দিত।"

এবং মনে মনে যে সে আঘাত পেয়েছে প্রায় এমন একটা ভাব করেই সে সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল যে তার বড্ড একঘেয়ে লাগছে। বলে সোফায় গিয়ে বসে পড়ল এবং হঠাৎ ঝিমোতে শুরু করে দিল। তার অত সুন্দর মুখখানা খানিকটা পাণ্ডুর হয়ে গেল, সোফায় গদির ওপর কাত হয়ে পড়ল।

মিতিয়াকে হাতে ধরে কালাগানভের সামনে নিয়ে গিয়ে গ্রুশেন্কা বলল, "দেখ একবার দেখ, কী সুন্দর ছেলেটা। এই কিছুক্ষণ আগে আমি ওর মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলাম। ঠিক যেন শণের মতো চুলগুলো, আর কী ঘন!

তারপর আবেগে আপ্লুত হয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার কপালে সে চুমু খেল। নিমেষের মধ্যে কালাগানভ্ চোখ খুলল, চোখ মেলে তার দিকে তাকাল এবং অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জিগ্‌গেস করল মাক্সিমভ্ কোথায় গেল।

"কাকে ওর চাই দেখলে তো!" হাসতে হাসতে বলল গ্রুশেন্কা। "আরে আমার সঙ্গে একটু না হয় বসলেই। মিতিয়া, এক ছুটে যাও তো, মাক্সিমভ্‌কে নিয়ে এসো।"

দেখা গেল ছুঁড়িগুলোর কাছ থেকে মাক্সিমভের সরার আর নাম নেই। শুধু মাঝে মধ্যে তাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল, এক ছুটে গিয়ে নিজের জন্য গ্লাসে করে মিষ্টি মদ ঢেলে নিয়ে আসছিল। দু কাপ চকোলেটের পানীয় সে ইতিমধ্যেই খেয়ে ফেলেছে। তার মুখটা লাল টকটকে উঠেছে, নাকে গোলাপি রং ধরেছে, চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে, সেখানে কামার্ত ভাব ফুটে উঠেছে! সে ছুটে এসে জানিয়ে গেল যে এখুনি 'একটা বিশেষ সুরে' 'সাবোতিয়ের' নাচ নেচে দেখাতে চায়।

"ছোটবেলায় অভিজাত মহলের এই সব মার্জিত রুচির নাচের তালিম নিয়েছিলাম কিনা

"যাও, যাও, ওর সঙ্গে যাও মিতিয়া। আমি এখান থেকে বসে বসে দেখব কেমন হয় ওর নাচটা।"

"না, আমিও যাব, আমিও দেখতে যাব", গ্রুশেন্কা যে ওকে তার সঙ্গে একটু বসে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল অত্যন্ত সরল মনে সেটাকে বাতিল করে দিয়ে কালাগানভ্ বলে উঠল। সকলেই দেখার জন্য এগিয়ে গেল। মাক্সিমভ্ সত্যি সত্যি তার নাচ নাচল বটে, কিন্তু মিতিয়া ছাড়া প্রায় কাউকে বিশেষ একটা মুগ্ধ করতে পারল না। নাচ বলতে আগাগোড়া যা ছিল তা হল খানিকটা তিড়িংবিড়িং লম্ফঝম্প,

পায়ের তলি ঊর্ধ্বে তুলে এদিক ওদিক পা ঘোরান আর প্রতি বার লম্ফের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলিতে চটাস চটাস চাঁটি মারা। কালাগানভের একদম ভালো লাগল না, কিন্তু মিতিয়া নর্তককে চুমু পর্যন্ত খেয়ে বসল।

"আচ্ছা, ধন্যবাদ। অনেক ধকল গেছে কী বল? এদিকে দেখছ কী? টফি চকোলেট—চাই নাকি, অ্যাঁ? সিগার চাই?"

"একটা সিগারেট পাওয়া গেলে হত।"

"মদ চাই?"

"তা এই একটু মিষ্টি মদ পেলে তা চকোলেট-টকোলেট তোমাদের নেই নাকি?"

"থাকবে না কেন? এই তো টেবিলের ওপর একগাদা পড়ে রয়েছে। যেমন খুশি বেছে নাও না গো প্রাণের বন্ধু আমার!"

"না, আমি চাইছিলাম ওই ভ্যানিলা দেওয়া মিষ্টি বুড়োদের জন্য যেমন হয় আর কি হে-হে!"

"না ভাই, ঠিক ওরকম কিছু নেই।"

"শোন, তোমাকে বলি!" বুড়ো হঠাৎ মিতিয়ার একেবারে কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ওই যে ওই বাচ্চা মেয়েটি মারিনা যার নাম হি-হি তোমাদের যদি কৃপা হয় তাহলে আমার সঙ্গে যদি একটু আলাপ করিয়ে দাও

"ও, এই মতলব! না ভাই ওটি হবার নয়।"

"আমি তো কারও কোনো অনিষ্ট করছি না", মন মরা হয়ে ফিসফিস করে বলল মাক্সিমভ্।

"বেশ তো, বেশ তো। এখানে ভাই ওরা আসে শুধু নাচগান করতে। আচ্ছা, সে সব এখন যাক, চুলোয় যাক গে! একটু অপেক্ষা কর। আপাতত খাও, কিছু মুখে দাও, গলায় ঢাল, ফুর্তি কর। টাকার দরকার আছে?"

"পরে দরকার হতে পারে।" মাক্সিমভ্ হাসল।

"বেশ, বেশ।"

মিতিয়ার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল। উঠোনের দিক থেকে গোটা দালানটার অংশবিশেষ ভেতর থেকে ঘিরে রেখেছে কাঠের একটা বারান্দা। মিতিয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সেই বারান্দার ওপরতলার চাতালে এসে দাঁড়াল। তাজা বাতাস তাকে চাঙ্গা করে তুলল। অন্ধকারের মধ্যে এক কোনায় সে একা দাঁড়িয়ে রইল, হঠাৎ দু হাতে মাথা চেপে ধরল। তার বিক্ষিপ্ত ভাবনাচিন্তাগুলি আচম্বিতে এক সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা সামগ্রিক উপলব্ধির আকার নিয়ে তার অন্তরকে আলোয় আলোময় করে তুলল, সব কিছু স্পষ্ট করে তুলল। কী ভীষণ, কী ভয়ঙ্কর সেই আলোর ছটা! তার মনের মধ্যে যে চিন্তাটা খেলে গেল তা এই যে 'গুলি করে নিজেকে যদি মারতেই হয় তাহলে এখন না হলে আর কখন? গিয়ে পিস্তলটা

নিয়ে এসে এখানে এই নোংরা ঘুপচির মধ্যে, ঠিক এই কোণটাতে পালা চুকিয়ে দিলেই তো হয়।' দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে প্রায় মিনিটখানেক সে দাঁড়িয়ে রইল। এই তো কিছু আগে উর্ধ্বশ্বাসে এখানে ছুটে আসার মুখে যে দুষ্কর্ম সে করে এসেছে, যে চুরির পথে সে নেমেছিল তার ফলে পেছনে একটা কলঙ্কের ছাপ সে ফেলে রেখে এসেছে। আর রক্ত! সেই রক্ত! কিন্তু তখন ওটা তার পক্ষে অনেকটা সহজ ছিল। আহা, কত সহজই না ছিল! তার কারণ তখন তো সবই ফুরিয়ে গিয়েছিল: ওকে সে হারিয়েছিল, হার মেনে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল, তার কাছ থেকে সে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তার কাছে ওর আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আহা, তখন এই দণ্ড মাথা পেতে নেওয়া তার পক্ষে কত সহজই না ছিল! অন্তত পক্ষে মনে হত এটা ছিল অনিবার্য, অপরিহার্য—কেন না, এর পর এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকা কেন? কিন্তু এখন! এখনকার এই পরিস্থিতি কি সেই তখনকার মতো? এখন অন্তত পক্ষে একটা অপচ্ছায়া, একটা বিভীষিকা দূর হয়েছে ওর সেই 'প্রাক্তন এবং অবিসংবাদিত' ভাগ্যতারকা সেই লোকটি তার চিহ্নমাত্র না রেখে উধাও হয়ে গেছে। সেই বিভীষিকাময় অপচ্ছায়াটি হঠাৎ কেমন যেন ছোটখাটো, হাস্যকর একটা জীবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, ওটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে রেখে আসা হয়েছিল, কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। ওই বিভীষিকা আর কখনও ফিরে আসবে না। গ্রুশেন্‌কা এখন লজ্জা পাচ্ছে। তার চোখ দেখে মিতিয়া এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে কাকে সে ভালোবাসে। তা হলে, বাঁচতে হলে এই এখনই তো বাঁচতে হয়! অথচ অথচ এখন আর বাঁচা সম্ভব নয়, কোনো মতে সম্ভব নয়! ওঃ কী অভিশাপ! 'হে ভগবান, যে লোকটাকে আমি বেড়ার গায়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলাম তার জীবন তুমি ফিরিয়ে দাও! আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও ওই ভয়ঙ্কর পানপাত্র! আমার মতো এই পাপী তাপীদের জন্য অনেক অলৌকিক কীর্তিই তো তুমি সাধন করেছ প্রভু! কিন্তু তাতেই বা কী? বুড়ো লোকটা যদি বেঁচেই যায় তাতে কী হবে? আহা, তাহলে কলঙ্কের বাকি লজ্জাটা অন্তত আমি ঘুচোতে পারতাম, চুরি করা টাকা আমি যেখান থেকে পারতাম—মাটির তলা থেকে হলেও—জোগাড় করে এনে ফিরিয়ে দিতাম, কলঙ্কের চিহ্নমাত্র থাকত না—আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য ক্ষত হয়ে লেগে থাকা ছাড়া আর কোথাও থাকত না। কিন্তু না, না, এ তো এক কাপুরুষের অসম্ভব, অবাস্তব স্বপ্ন! ওঃ, কী নরকযন্ত্রণা!'

কিন্তু তবু তার সেই মনের অন্ধকারের মধ্যেও কেমন যেন একটা উজ্জ্বল আশার আলো ঝলক দিয়ে উঠল। সে এক ঝটকায় বারান্দা ছেড়ে ছুটল ঘরের দিকে, ওর কাছে, আবার সেই ওরই কাছে, চিরকালের জন্য যে তার হৃদয়ের অধীশ্বরী তার কাছে! 'কলঙ্কের যাতনা যদি ভোগও করতে হয়, বাকি যে সারাটা জীবন পড়ে রইল তার মূল্য কি ওর ভালোবাসার একটি প্রহরের, একটি মুহূর্তের উপযুক্ত নয়?'

এই প্রশ্নটি তার মনের মধ্যে গেঁথে রইল। 'ওর কাছে যাওয়া, একমাত্র ওরই কাছে যাওয়া, ওকে দেখতে পাওয়া, ওর কথা শোনা, আর কোনো কথাই না ভাবা, সব কিছু ভুলে যাওয়া—তা হোক না কেন শুধু এই রাতটির জন্য, একটি প্রহরের জন্য, একটি মুহূর্তের জন্য!' অলিন্দ ছাড়িয়ে ঘরের সামনের গলিপথে সে তখনও ঢোকেনি, এমন সময়, ঢোকার ঠিক মুখটাতে সরাইওয়ালা ত্রিফন বরিসভিচের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। মিতিয়ার মনে হল তার মুখটা কেমন যেন থমথমে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দেখে মনে হচ্ছিল সম্ভবত তারই খোঁজে এদিকে আসছিল।

"কী ব্যাপার ত্রিফন বরিসভিচ? আমাকে খুঁজছিলে না তো?"

"না হুজুর, আপনাকে নয়", হঠাৎ যেন হকচকিয়ে গেল সরাইওয়ালা। "আপনাকে খুঁজতে যাব কেন? কিন্তু আপনি আপনি ছিলেন কোথায় হুজুর?"

"তোমাকে এমন বেজার দেখাচ্ছে কেন বল তো? রাগ করনি তো? একটু রোসো, শিগ্‌গিরই ঘুমোতে যেতে পারবে। ক'টা বাজে এখন?"

"তা তিনটে তো হবেই। বলা যায় না হয়তো তিনটে পার হয়ে গেছে।"

"শেষ করছি, এই শেষ হল বলে।"

"কী যে বলেন! ওটা কোনো কথা হল! যতক্ষণ খুশি চালান না

'কী হল লোকটার?' মিতিয়ার এক ঝলক মনে হল। পরক্ষণেই মেয়েরা যেখানে নাচছিল সে ছুটে এসে সেই ঘরে ঢুকল। কিন্তু গ্রুশেন্‌কা সেখানে ছিল না। নীল ঘরেও সে ছিল না। একমাত্র কালাগানভ্ সোফায় পড়ে ঘুমোচ্ছিল। পর্দার ওপাশে উঁকি মেরে দেখল—গ্রুশেন্‌কা সেখানে বসে ছিল। সে বসে ছিল ঘরের একটা কোনায়, একটা তোরঙ্গের ওপরে, পাশে রাখা পালঙ্কটার ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথা গুঁজে দু হাত ছড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। লোকে যাতে শুনতে না পায় তার জন্য কণ্ঠস্বর চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মিতিয়াকে দেখতে পেয়ে সে ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। মিতিয়া কাছে ছুটে আসতেই তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল।

"মিতিয়া, মিতিয়া, আমি কিন্তু ওকে ভালোবেসেছিলাম!" চাপা গলায় সে তাকে বলতে শুরু করল। 'কী ভালোই না ওকে বেসেছিলাম এই পাঁচটি বছর, সর্বক্ষণ, সব সময়! আমি কি ওকেই ভালোবেসেছিলাম, নাকি শুধুই আমার আক্রোশকে? না, ওকেই বেসেছিলাম! আমি যদি বলি ওকে ভালোবাসিনি, ভালোবেসেছিলাম শুধু আমার আক্রোশকে তাহলে মিথ্যে বলা হবে। মিতিয়া আমার বয়স তখন ছিল মাত্র সতেরো, ও তখন আমার সঙ্গে এমন মিষ্টি ব্যবহার করত, এত আমুদে ছিল! আমাকে কত গান শোনাত! না কি আমার মতন অমন একটা বোকা বাচ্চা মেয়ের তখন ওরকম মনে হয়েছিল কিন্তু এখন, হা ভগবান, এখন তো দেখছি এ সেই লোক নয়, একেবারেই সে নয়! তাছাড়া চেহারাতেও সে নয়, একদম নয়। আমি তো মুখ দেখে ওকে চিনতেই পারিনি। তিমফিয়েই গাড়ি হাঁকিয়ে আমাকে

সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলো, আসতে আসতে ভাবছিলাম, সারাটা পথ কেবলই ভাবছিলাম 'কী ভাবে আমরা একে অন্যের দিকে তাকাব?...' আমার বুকের ভেতরটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। কিন্তু ওঃ শেষকালে কিনা এক গামলা নোংরা জল আমার ওপর ঢেলে দিল! এমন ভাবে কথা বলল যেন পাঠশালার কোনো গুরুমশাই এসেছেনঃ এতই গুরুগম্ভীর, এমনই পণ্ডিত-পণ্ডিত ভাব। দেখা হতে এমন একটা গম্ভীর ভাব করল যে আমি মহাসঙ্কটে পড়ে গেলাম। মুখে রা সরে না। গোড়ায় ভেবেছিলাম সঙ্গের ওই ঢ্যাঙা পোলটার সামনে কিছু বলতে সে লজ্জা পাচ্ছে। বসেই আছি, বসে বসে ওদের দুজনকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ভাবছি এ কেমন হল? কেন এখন ওর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারছি না? জান, ওকে নষ্ট করেছে ওর বৌটা—আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই যাকে তখন ও বিয়ে করেছিল। সে-ই ওকে পালটে দিয়েছে। ওঃ মিতিয়া, কী বলব! কী লজ্জার কথা! ওঃ সে আমার সারা জীবনের লজ্জা! অভিশপ্ত, অভিশপ্ত! অভিশপ্তই বলব আমার জীবনের ওই পাঁচ-পাঁচটি বছর!" বলতে বলতে আবার সে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল। কিন্তু মিতিয়ার হাত সে ছাড়ল না, শক্ত করে চেপে ধরে রইল।

"মিতিয়া, লক্ষ্মীটি আমার, যেয়ো না, একটু দাঁড়াও। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই", ফিসফিস করে একথা বলতে বলতে হঠাৎ সে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল। "শোন, আমায় বল দেখি, কাকে আমি ভালোবাসি? আমি এখানে একজন মানুষকে ভালোবাসি। কে সেই মানুষ? এটাই তোমাকে বলতে হবে।"

কাঁদতে কাঁদতে তার মুখ ফুলে গিয়েছিল। এখন সে মুখে হাসি ফুটে উঠল, আবছা অন্ধকারে জ্বল জ্বল করতে লাগল তার দুচোখ।

"এই তো কিছুক্ষণ আগে, এক বাজপাখি এসে হানা দিল। যেই সে ঢুকল অমনি আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। 'বোকা কোথাকার! এই তো সে যাকে তুমি ভালোবাস!' আমার মন তৎক্ষণাৎ চুপি চুপি আমাকে বলে দিল। তুমি এলে, সঙ্গে সঙ্গে সব আলোয় আলোময় করে তুললে। ভাবলাম, তাই তো, কীসের ওর ভয়?' তুমি কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, কথাই বলতে পারছিলে না।' ভাবলাম, 'ওদের দেখে নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে না।' তুমি কাউকে ভয় পাবে এটা কি হতে পারে? 'তার মানে ওর ভয় আমাকে, একমাত্র আমাকেই ওর ভয়।' আমি যে জানলা থেকে চিৎকার করে আলিয়োশাকে বলেছিলাম যে আমার মিতিয়াকে আমি ঘণ্টাখানেক ভালোবেসেছিলাম আর এখন... যাচ্ছি আরেকজনকে ভালোবাসতে—সোনিয়াটা দেখছি তোমাকে বোকা পেয়ে এ সব বৃত্তান্ত তোমাকে দিয়েছে। মিতিয়া, মিতিয়া আমি একটা আচ্ছা বোকা! কেমন করে আমি ভাবতে পারলাম যে তোমার পরে আমি আরেক জন কাউকে ভালোবাসতে পারি! তুমি আমাকে ক্ষমা করছ তো মিতিয়া? ক্ষমা করছ, কি করছ না? ভালোবাস? নাকি ভালোবাস না?" বলতে বলতে সে লাফিয়ে উঠে দু হাতে মিতিয়ার কাঁধ

চেপে ধরল। মিতিয়া পরম পুলকে বাকরুদ্ধ হয়ে তার চোখের দিকে, মুখের দিকে এবং মুখের হাসির দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎই দৃঢ় আলিঙ্গনে তাকে আবদ্ধ করে চুমোয় চুমোয় তাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

"তোমাকে যে এত কষ্ট দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা করছ তো? তোমাদের সবাইকে যে আমি কষ্ট দিয়েছি তা কিন্তু আমার আক্রোশবশত। ওই বুড়োটার যে আমি মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছি তাও কিন্তু ইচ্ছে করে, আক্রোশবশতই করেছি। তোমার মনে আছে একবার আমার ওখানে তুমি মদ খেয়ে মদের গেলাস আছড়ে ভেঙে ফেলেছিলে? ওটা আমি মনে করে রেখেছিলাম, তাই আজ আমিও গেলাস আছড়ে ভাঙলাম, আমার এই 'নীচ মনটার জন্য' মদ খেলাম। মিতিয়া, সোনা আমার, আমাকে আরও চুমু খাচ্ছ না কেন? একবার চুমু খেয়েই সরে গিয়ে এখন কেবল দেখছ আর শুনছ। আমার কথা অমন শোনার কী আছে! আমাকে চুমু দাও, আরও ভালো করে দাও এই যে এই ভাবে। ভালো যদি বাসতেই হয় তো ভালো করে বাস! এখন আমি তোমার দাসী হব, চির জীবনের মতো তোমার দাসী হব। আহা, এমন দাসী হতে পারা কী মধুর! আমাকে চুমু দাও! আমাকে মার ধর, আমাকে যন্ত্রণা দাও, আমাকে নিয়ে যা তোমার খুশি কর ওঃ, ঠিকই তো, আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই তো উচিত। দাঁড়াও! সবুর কর, পরে হবে, ওভাবে চাই নে " বলতে বলতে আচমকা সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। "যাও, এখন যাও, মিতিয়া লক্ষ্মী সোনা আমার। যাই, এখন গিয়ে প্রাণ ভরে মদ খাব, খেয়ে মাতাল হব, মাতাল হতে চাই। এখন মাতাল হয়ে নাচব। আমার ইচ্ছে, আমার ইচ্ছে, আমার ইচ্ছে!"

মিতিয়ার হাত থেকে নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল। মাতালের মতো টলতে টলতে মিতিয়া তাকে অনুসরণ করল।

'তা হোক না, যা হবার হোক এখন—এই একটি ক্ষণের জন্য সারা দুনিয়ার দখল ছেড়ে দিতে হয় তাও সই', চকিতে তার মনে হল।

গ্রুশেন্‌কা সত্যি সত্যি এক নিঃশ্বাসে আরও এক গ্লাস শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলল। খুব চট করে নেশাগ্রস্তও হয়ে পড়ল। মুখে বিগলিত হাসি নিয়ে সে হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে তার আগেকার জায়গায় গিয়ে বসল। তার দুগালে রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে, ঠোঁট দুটি উত্তাপে জ্বলছে, দু চোখ ধকধক করে জ্বলতে জ্বলতে ছলছল হয়ে উঠেছে, কামনায় আকুল তার দৃষ্টি জাগিয়ে তুলছে প্রলোভন। এমনকি কালাগানভ যে কালাগানভ, সেও বুকের ভেতরে কীসের যেন একটা দংশন অনুভব করল।

"একটু আগে, তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখন তোমাকে যে আমি চুমু খেয়েছিলাম, তুমি কি তা টের পেয়েছিলে?" জড়িতস্বরে কালাগানভ্‌কে সে জিগ্‌গেস করল। "এখন এই ত দেখছ আমি মাতাল হয়ে গেছি। তুমি মাতাল হও নি? কিন্তু

মিতিয়া মদ খাচ্ছে না কেন? কী ব্যাপার মিতিয়া, তুমি খাচ্ছ না যে? আমি খেয়েছি, কিন্তু তুমি তো খাচ্ছ না ”

“আমি মাতাল হয়ে গেছি! অমনিতেই মাতাল হয়ে আছি ... তোমাতে মাতাল হয়ে আছি, এখন মদে মাতাল হতে চাই।”

মিতিয়া আরও এক গ্লাস জল খেল। আর তার নিজের কাছে যেটা অদ্ভুত মনে হল তা এই যে একমাত্র এই শেষ গ্লাসের পরই নেশাটা তাকে চেপে ধরল, হঠাৎই সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অথচ এর আগে পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল—এটা তার বেশ মনে আছে। এই মুহূর্ত থেকে তার চারধারে সমস্ত কিছু ঘুরপাক খেতে লাগল, যেন সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে হাঁটছিল চলছিল, হাসছিল সকলের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছিল, কিন্তু সবই করছিল আত্মবিস্মৃত হয়ে। একমাত্র একটিই জ্বালাধরা অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে তাকে দহন করছিল—পরে তার মনে হয়েছিল ‘ঠিক যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো’ বুকের ভেতরটা পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল। গ্রুশেন্‌কার কাছে এসে সে তার পাশে বসছিল, তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল, তার মুখের কথা শুনছিল। গ্রুশেন্‌কাকে ভীষণভাবে কথায় পেয়ে বসেছিল। সকলকেই সে কাছে ডাকছিল। নাচগানের দলের ভেতর থেকে হঠাৎ হঠাৎ করে কোনো একটা মেয়েকে ইশারায় কাছে ডেকে আনছিল, কাছে এলে তাকে হয় চুমু খেয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল নয়তো হাত দিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে তার মঙ্গল কামনা করছিল। তার অবস্থা তখন এমনই যেন আর এক মুহূর্ত পরেই কেঁদে ফেলবে। যাকে সে ‘বুড়ো মানুষটি’ বলছিল সেই মাক্সিমভ্‌ও তাকে খুব আনন্দ দিচ্ছিল। লোকটা যেতে যেতে ছুটে এসে অনবরত তার হাতে, হাতের ‘প্রতিটি আঙুলে চুমু খাচ্ছিল। শেষকালে একটা পুরনো গানের সুরে আরও এক দফা নাচল। গানটা সে নিজেই গাইল। বিশেষ উৎসাহভরে নাচল গানের একটা ধুয়া ধরে

ঘোঁত ঘোঁত শুয়োরের ছানা,
হাম্বা-হাম্বা ডাক বাছুরের,
পাতিহাঁস—প্যাঁক প্যাঁক,
রাজহাঁস—খ্যাঁক খ্যাঁক,
মুরগির ছানা বারান্দায়,
ঘোরে ফেরে কঁক্ কঁক গায়,
আহা তোফা, কঁক্ কঁক গায়!

“ওকে কিছু একটা দাও, মিতিয়া”, গ্রুশেন্‌কা বলল। “আরে কিছু একটা উপহার দাও। আহা, গরিব বেচারি! আহা গরিব দুখি মানুষটি! জান মিতিয়া, আমি সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে চলে যাব ঠিক করেছি। না, সত্যি বলছি, এক সময় না এক সময় যাবই। আমাকে আজ আলিয়োশা যা বলেছে তা সারা জীবন মনে থাকবে।... হ্যাঁ, তাই তবে আজ না হয় নাচলামই আমরা। মঠে যেতে হলে তো কাল

যাব, আজ একটু নাচা যাক। ওহে তোমরা ভালোমানুষেরা শোন, আমার দুষ্টুমি করার সাধ হয়েছে, কিন্তু তাতে দোষের কী আছে বল তো? ভগবান ক্ষমা করে দেবেন। আমি যদি ভগবান হতাম তা হলে সব মানুষকে ক্ষমা করে দিতাম। বলতাম, 'ওগো আমার পরম আদরের ধন, পাপী তাপী তোমরা যারা আছ আজ থেকে তাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি।' আর আমি যাব ক্ষমা চেয়ে নিতে, এই কথাই বলব 'ওগো ভালোমানুষেরা এই বোকাসোকা মেয়েমানুষটাকে তোমরা ক্ষমা ঘেন্না করে দিয়ো।' আমি একটা জানোয়ার—জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নই। আমি প্রার্থনা করতে চাই। আমি একটা ছোট্ট পিঁয়াজকলি দিয়েছি। আমার মতো একটা দুশ্চরিত্রেরও প্রার্থনা করতে সাধ হয়! মিতিয়া, ওদের বল, নাচুক ওরা নাচুক, ওদের বাধা দিয়ো না। এই দুনিয়ার সব মানুষ ভালো, মানুষমাত্রেই ভালো। পৃথিবীটা একটা ভালো জায়গা। আমরা যদিও মন্দ লোক, কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের ভালোই লাগে। আমরা মন্দ, আবার ভালোও, যেমন ভালো তেমনি মন্দ। না, তোমরাই বল, আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করব, সবাই এগিয়ে এসো, আমি তোমাদের প্রশ্ন করব: আমাকে একটা কথা বল দেখি আমি কেন এমন ভালো? আমি ভালো, ঠিক কিনা? খুবই ভালো আমি তাই তো? কিন্তু কথাটা হচ্ছে কেন আমি এত ভালো?"

এই ভাবে গ্রুশেন্কা আবোল তাবোল বকে চলল, নেশা তার উত্তরোত্তর চড়তে লাগল। শেষকালে সোজাসুজি বলে বসল এবারে সে নিজে নাচতে চায়। চেয়ার ছেড়ে উঠতে পা টলে গেল। "মিতিয়া, আমাকে আর মদ দিয়ো না, চাইলেও দিয়ো না। মদ কোনো শান্তি দেয় না। সব ঘুরছে, চুল্লির মতো গনগন করছে, ঘুরছে তো ঘুরছেই। আমি নাচতে চাই। সবাই দেখুক আমি কেমন নাচি আমি কত ভালো, কী চমৎকারই না নাচি!

রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পকেট থেকে সাদা কেম্ব্রিক কাপড়ের রুমালটা বের করে নাচের সময় সেটা নাড়ানোর উদ্দেশ্যে ডান হাতে তার একটা কোনা চেপে ধরল। মিতিয়া ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। মেয়েরা নিস্তব্ধ হয়ে প্রথম ইশারার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে নাচের উপযোগী গানের সুরঝঙ্কার তোলার জন্য তৈরি হতে লাগল। মাক্সিমভ্ যখন জানতে পারল গ্রুশেন্কা নিজে নাচতে চাইছে তখন উৎফুল্ল হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

আহা কেমন ছিপছিপে পা, ঝনক ঝনক দেহের দুধার,
ছোট্ট অমন লেজটা কেমন পাকিয়ে গুটিসুটি।

গুনগুন করে গাইতে গাইতে সে গ্রুশেন্কার আগে আগে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রুশেন্কা তাকে রুমালের ঝটকা মেরে ঠেলে সরিয়ে দিল।

"শ্-শ্-শ! কী হল মিতিয়া, ওরা সব আসছে না কেন? আসুক সবাই তুমিই বা কী বল তো? ওদের ওখানে আটকে রেখেছ কেন? ওদের গিয়ে বল যে আমি নাচছি, ওরা আসুক, এসে দেখুক আমি কেমন নাচি

"এই যে খাঞ্জাখাঁ'রা! বেরিয়ে এসো। ও এখন নাচতে চায়, তোমাদের ডাকছে।"

"ছোটোলোক!" দুই 'পান'-এর মধ্যে কে একজন উত্তরে চেঁচিয়ে বলল।

"তুমি একটা ছোটোলোকের অধম! একটা ছোটোখাটো ইতর—এ ছাড়া আর কীই বা বলব!"

"আহা, পোল্যান্ডকে নিয়ে অমন হাসিঠাট্টা বন্ধ করুন তো!" কালাগানভের সুচিন্তিত মন্তব্য। সেও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, নিজের বশে ছিল না!

"তুমি চুপ কর তো, বাচ্চা ছেলে! আমি যদি ওকে ইতর বলি তার মানে এই নয় যে গোটা পোল্যান্ডকেই আমি ইতর বললাম। পোল্যান্ড দেশটা তো একটা ইতরকে নিয়ে নয়। ওগো আমার লক্ষ্মী ছেলেটি, চুপটি করে বসে থাক দেখি, লেবেঞ্চুস খাও।"

"ওঃ কী সব লোক রে বাবা! মানুষ না আর কিছু? মিটমাট করে নিতে চায় না—এ কী রকম?" এই বলে গ্রুশেন্‌কা নাচার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। গমগম করে ফেটে পড়ল সমবেত কণ্ঠের গান 'দাওয়া আমার, আহা আমার বাড়ির নতুন দাওয়া!' গ্রুশেন্‌কা মাথাটা পেছনে হেলাতে গেল, ঠোঁটজোড়া অর্ধেক খুলল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, হাতের রুমালটা নাড়াতেও গেল, কিন্তু হঠাৎ জায়গায় দাঁড়িয়েই ভীষণভাবে টলে উঠল, হতভম্ব হয়ে ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"দুর্বল লাগছে কেমন যেন একটা যন্ত্রণাকাতর স্বরে সে বলে উঠল! "মাফ চাইছি, দুর্বল লাগছে, পারছি না। দোষ আমারই

গানের দলটার উদ্দেশে সে মাথা নুইয়ে ক্ষমা চাইল, তারপর উপস্থিত আর সকলের উদ্দেশে একে একে চারপাশে মাথা নোয়াতে লাগল।

"অপরাধ হয়ে গেছে মাফ চাইছি

"একটু বেশি খেয়ে ফেলেছেন দিদিমণি। আহা, আমাদের বড্ড ভালো দিদিমণিটার একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে গো", চার দিক থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"উনি বড্ড বেশি খেয়ে ফেলেছেন", হি-হি করে হাসতে হাসতে মেয়েদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলল মাক্সিমভ্।

"মিতিয়া, আমায় নিয়ে চল, ধর আমাকে মিতিয়া", অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে গ্রুশেন্‌কা বলল। মিতিয়া ছুটে এসে তাকে চট করে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, মহামূল্যবান শিকারটিকে নিয়ে ছুটে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

'না, এবারে আমাকে যেতে হয়' কালাগানভ্ ভাবল। নীল ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে ঘরের দরজার দুটো পাল্লাই বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল। কিন্তু বড়ো ঘরের ভেতরে পানভোজনের আসরের হৈ হুল্লোড় চলতে লাগল, আরও বেশি জোরদার হয়ে উঠল। গ্রুশেন্‌কাকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট বিঁধিয়ে মিতিয়া তাকে চুমু খেল।

"আমাকে ছুঁয়ো না " অনুনয়ের সুরে স্খলিতকণ্ঠে গ্রুশেন্‌কা তাকে বলল। "ছুঁয়ো না, যতক্ষণ তোমার না হচ্ছি বলেছি ত তোমার, কিন্তু ছুঁয়ো না,... দয়া কর... ওরা যখন এখানে আছে, এই কাছে পিঠেই আছে তখন ওটা ঠিক হবে না। লোকটা এখানেই আছে। ওঃ কী জঘন্য এই জায়গাটা

'মেনে নিচ্ছি! মনেও আনব না তোমাকে আমি পুজো করি!' বিড়বিড় করে বলল মিতিয়া। "হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, ভারি জঘন্য এই জায়গাটা। ঘেন্না হয়!"

গ্রুশেন্‌কাকে তখনও তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত না করে, দু বাহুর আলিঙ্গনে রেখেই, পালঙ্কের পাশে মেঝের ওপর সে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

"আমি জানি, তুমি একটা জানোয়ার কিন্তু তা হলে কী হবে, তুমি বড়ো মনের মানুষ", কষ্ট করে জিভ নেড়ে জড়িয়ে জড়িয়ে গ্রুশেন্‌কা বলল। "যা হবে তার মধ্যে সততা থাকতে হবে আমরাও যেন সৎ হই, আমরাও যেন ভালো হই, যেন পশু হয়ে না যাই, যেন ভালো হই। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, অনেক অনেক দূরে, অন্য কোথাও নিয়ে যাও শুনছ এখানে থাকতে আমি চাই নে অনেক অনেক দূরে কোথাও যেতে চাই

"বেশ তো, বেশ তো, তা অবশ্যই হবে!" দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে তাকে চেপে ধরল মিতিয়া। "তোমাকে নিয়ে যাব, আমরা উড়ে চলে যাব অন্য কোথাও। ওঃ, একটা বছরের মূল্যে আমি এখন আমার সমস্ত জীবনটা বিসর্জন দিতে পারতাম, শুধু যদি ওই রক্তের রহস্যটা জানতে পারতাম!"

"রক্ত! কীসের রক্ত!" হতচকিত হয়ে গ্রুশেন্‌কা জানতে চাইল।

"না, ও কিছু নয়!" দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল মিতিয়া। "আচ্ছা গ্রুশেন্‌কা, তুমি তো সৎ হতে চাও, কিন্তু আমি যে একটা চোর। আমি কাতিয়ার কাছ থেকে টাকা চুরি করেছি কী লজ্জা, কী লজ্জা!"

"কাতিয়া? সেই বড়মানুষ দিদিমণিটা? না, চুরি তুমি করনি। ফেরত দিয়ে দাও, আমার কাছ থেকে নিয়ে ফেরত দিয়ে দিলেই তো হল ওই নিয়ে চেঁচামেচি করার কী আছে? এখন থেকে যা আমার সে সবই তোমার। টাকা পয়সা দিয়ে আমাদের কী হবে? ও তো আমরা অমনিতেই উড়িয়ে দেব। টাকাপয়সা ওড়াব না সে জাতের লোক আমরা নই। তার চেয়ে বরং চল আমরা জমি চাষ করি গে। আমি আমার এই হাত দিয়ে মাটি আঁচড়াতে চাই। কাজ করতে হবে, শুনছ? আলিয়োশা বলে দিয়েছে। আমি তোমার নাগরী হয়ে থাকব না, আমি তোমার অনুগত হয়ে, তোমার কেনা বাঁদি হয়ে থাকব, তোমার হয়ে কাজ করব। আমরা ওই দিদিমণিটার কাছে যাব, দুজনেই মাথা নুইয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আসব, তারপর চলে যাব। ক্ষমা করুক আর না করুক অমনিতেই চলে যাব। তুমি টাকা নিয়ে গিয়ে ওকে দিয়ে এসো, কিন্তু আমায় ভালোবেসো। ওকে ভালোবেসো

না। আর ভালোবেসো না ওকে। যদি ভালোবাস, আমি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলব। আমি ছুঁচ দিয়ে ওর দু চোখ গেলে দেব।

"তোমাকে ভালোবাসি। শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। দূর সাইবেরিয়া গেলেও ভালোবাসব।

"সাইবেরিয়া কেন? তা যাক গে, সাইবেরিয়া—তা-ই সই—তুমি যদি চাও।... আমরা দুজনে কাজ করব। সাইবেরিয়ায় বরফ আর বরফ। বরফের মধ্যে গাড়ি চড়ে যেতে আমার ভালো লাগে গাড়ির গায়ে টুং টাং ঘণ্টি থাকা চাই কিন্তু। শুনতে পাচ্ছ, টুং ট্যাং বাজছে কোথায় বাজছে বল তো ঘণ্টা? কারা যেন গাড়ি চড়ে আসছে এই যে থেমে গেল ঘণ্টাটা।"

বলতে বলতে সে নিস্তেজ হয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করল, আর হঠাৎই মুহূর্তের জন্য যেন ঘুমিয়ে পড়ল। সত্যি সত্যি দূরে কোথায় যেন গাড়ির ঘণ্টা বাজছিল, বাজতে বাজতে আচমকা থেমেও গেল। মিতিয়া হুমড়ি খেয়ে ওর বুকে মাথা গুঁজে পড়ে ছিল। ঘণ্টা যে কখন কী করে থেমে গেল তা সে খেয়াল করেনি, হঠাৎ কখন যে গান থেমে গেল এবং গান আর মাতালের হৈ হট্টগোলের বদলে সারা বাড়িতে যে অতর্কিতে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো তাও সে খেয়াল করেনি। গ্রুশেন্‌কা চোখ মেলে তাকাল।

"কী হল? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? হ্যাঁ, একটা ঘণ্টা যেন আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম মনে হচ্ছিল যেন আমি চলেছি, বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চড়ে চলেছি ঘণ্টা বেজে চলেছে টুং টাং আমি ঝিমোচ্ছি। আমার আদরের মানুষটির সঙ্গে, তোমার সঙ্গে চলেছি। যাচ্ছি দূরে, অনেক দূরে। তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছি, চুমু খাচ্ছি, বুকে চেপে ধরে আছি, আমার যেন ঠান্ডা লাগছে, বরফ ঝলমল করছে। জান, রাতে বরফ যখন ঝলমল করে আর চাঁদ যখন উঁকি মারে তখন ঠিক যেন মনে হয় আমি পৃথিবীতে নেই, অন্য কোথাও আছি।... জেগে উঠে দেখি আমার আদরের ধন তো আমার পাশেই আছে। আহা, কী ভালোই যে লাগছে!

"তোমার পাশেই আছে", বিড়বিড় করে এই কথা বলতে বলতে মিতিয়া তার পোশাকে, বুকে, তার হাতে চুমু খেল। হঠাৎ মিতিয়ার কেমন যেন অদ্ভুত লাগল: তার মনে হল গ্রুশেন্‌কা যেন সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু মিতিয়ার দিকে নয়, তার মুখের দিকে নয়; তার মাথা ছাড়িয়ে এক দৃষ্টিতে, রীতিমতো অদ্ভুত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মুখের ওপরে ফুটে উঠেছে একটা আশ্চর্যের এবং প্রায় আতঙ্কের ভাব।

"মিতিয়া দেখ দেখ, ওখান থেকে কে উঁকি মেরে আমাদের দেখছে?" হঠাৎ সে ফিসফিস করে বলল।

মিতিয়া ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল সত্যি সত্যি কে যেন পর্দা ফাঁক করে

তাদের লক্ষ করছে। আর শুধু যে একজন তাও যেন নয়। মিতিয়া চট করে লাফিয়ে উঠে পড়ল, দ্রুত এগিয়ে গেল নজরদার লোকটার দিকে।

"এদিকে, আমাদের কাছে এদিকে চলে আসুন", চাপা অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল কে একজন।

মিতিয়া পর্দার আড়াল থেকে ওধারে বেরিয়ে এসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সারা ঘর লোকজনে ছেয়ে গেছে—তবে এরা সব আগেকার লোক নয়, একেবারে অন্য, নতুন লোকজন। মুহূর্তের একটা সিরসির ভাব তার শিরদাঁড়া বয়ে নেমে গেল, সে আঁতকে উঠল। এদের সকলকেই সে নিমেষের মধ্যে চিনতে পারল। এই যে নধরকান্তি লম্বা বুড়োটা, যার গায়ে ওভারকোট, মাথার টুপিতে তকমা আঁটা, এ লোকটা জেলা পুলিশের বড়কর্তা মিখাইল মাকারভিচ। আর 'যক্ষ্মারোগীর মতো চেহারার' এই ফুল বাবুটি, যে 'সব সময় এরকম পালিশ করা চকচকে বুট জুতো পরে থাকে'—এ লোকটা ডেপুটি প্রসিকিউটর, 'এর কাছে চারশ রুবল দামের একটা ক্রনমিটার আছে, আমাকে দেখিয়েছিল।' চশমাচোখে, ছোটখাটো চেহারার এই অল্পবয়সি যে ছোকরাটা এর নামটা আবার মিতিয়া ভুলে গেছে, তবে একে জানে, আগে দেখেছে—তদন্তকারী—বিচার বিভাগের তদন্তকারী, 'আইনবিদ্যালয় থেকে' পাশ করে বেরিয়েছে, হালে এসেছে। আর এটা লোকাল থানার ইনস্পেক্টর মাভ্রিকি মাভ্রিকভিচ্—একে তো সে জানেই, এর সঙ্গে পরিচয় আছে। কিন্তু এই সব চাপরাশধারী লোকজন—এগুলো আবার এখানে কী করতে এসেছে? তারপর ওই আরও দুজন চাষাভুসো ধরনের লোক। আর ওই যে ওখানে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালাগানভ্ আর ত্রিফন বরিসভিচ্।

"ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী বলুন তো? " মিতিয়া বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই যেন নিজেই নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে, অনেকটা যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে জোরে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল

"বু-ঝ্‌তে পা-রছি!"

চশমাধারী যুবকটি হঠাৎ সামনে এগিয়ে এলো, মিতিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে গুরুগম্ভীর ভাবে হলেও খানিকটা যেন তাড়াহুড়ো করেই বলতে শুরু করল:

"আপনার কাছে আমাদের এক কথায়, আপনার কাছে আমার অনুরোধ একবার এই এখানে, এই সোফাটার কাছে আসুন। আপনার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথাবার্তা বলে খোলসা হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।"

"বুড়োর ব্যাপার!" মিতিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'বুড়ো আর তার রক্ত!... বু-ঝতে পা-রছি!"

বলতে বলতে ঠিক একটা কাটা গাছের মতো সে ধপ করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

"বুঝতে পারছ? বুঝেছে তাহলে! পিতৃহন্তা! নরপিশাচ কোথাকার! বুড়ো বাপের

রক্ত তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে!" মিতিয়ার দিকে ধেয়ে গিয়ে আচম্বিতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল পুলিশের বুড়ো কর্তাটি। ক্রোধে সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

"কিন্তু এ অসম্ভব!" ছোটখাটো চেহারার যুবকটি চেঁচিয়ে বলল। "মিখাইল মাকারভিচ্, মিখাইল মাকারভিচ্! এভাবে করা ঠিক হবে না, একেবারেই ঠিক হবে না! আমি অনুরোধ করছি, একা আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিন ....আপনার কাছ থেকে কিন্তু এরকম ঘটনা আমি কোনো মতে আশা করতে পারিনি..."

"কিন্তু ভদ্রমহোদয়রা, এ যে একটা উন্মাদের ঘোর! উন্মাদের কাণ্ড!" জেলা পুলিশের বড়কর্তা বলে উঠল। "একবার দেখুন, তাকিয়ে দেখুন ওকে রাতদুপুরে মদে চুর হয়ে আছে, সঙ্গে রাজ্যের কতকগুলো বাজে মেয়ে, হাতে লেগে রয়েছে নিজের বাপের রক্ত ঘোর উন্মাদের কাণ্ড! ঘোর বিকার!"

"দোহাই আপনার মাকার মাকারভিচ্, আপনাকে কায়মনোবাক্যে আমার অনুরোধ, এবারের মতো আপনার ভাবাবেগ সংযত করুন", ডেপুটি প্রসিকিউটর হড়বড় করে চাপা গলায় তাকে বলল, "নইলে কিন্তু আমি বাধ্য হব

কিন্তু ছোটখাটো চেহারার তদন্তকারীটি তাকে তার কথা শেষ করতে দিল না। মিতিয়াকে উদ্দেশ করে দৃঢ়কণ্ঠে, জোরে এবং গুরুগম্ভীর ভাবে ঘোষণা করল "প্রাক্তন লেফ্‌টেনাণ্ট, কারামাজ়ভ্ মহাশয়, আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে আপনার পিতার ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ কারামাজ়ভ্‌কে খুন করার অভিযোগ আছে। ঘটনাটা আজ রাতেই ঘটেছে

লোকটা আরও কী সব বলল, ডেপুটি প্রসিকিউটর লোকটাও যেন কী সব কথার ঘোরপ্যাঁচ মারল। কথাগুলি মিতিয়ার কানে গেলেও সে তার মাথামুণ্ডু কিছুই আর বুঝতে পারছিল না, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের সকলকে দেখতে লাগল।

## নবম অধ্যায়

## প্রাথমিক তদন্ত

### এক

### সরকারি আমলা পের্‌খোতিনের উন্নতির সূচনা

পিয়োতর ইলিচ পের্‌খোতিনকে আমরা শেষবার যখন দেখেছিলাম যখন সে বণিক মরোজভের বিধবার বাড়ির মজবুত গেটের বন্ধ দরজায় প্রাণপণ করাঘাত করে

যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই তাকে আমরা সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলাম। মুহুর্মুহু প্রবল করাঘাতের ফল হল এই যে শেষ পর্যন্ত তার আওয়াজ ঠিকই বাড়ির ভেতরে পৌঁছুল। ঘণ্টা দুয়েক আগে ফেনিয়া এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে উত্তেজনায়, 'ভাবনাচিন্তায়' সে তখনও শুতেই যেতে পারছিল না। বাড়ির গেটে করাঘাতের এমন বিকট আওয়াজ শুনে নিদারুণ আতঙ্কে আবার নতুন করে তার মূর্ছা যাবার দাখিল হল। দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ যে গাড়ি হাঁকিয়ে ওখান থেকে চলে গিয়েছিল তা স্বচক্ষে দেখার পরও ফেনিয়ার মনে হল আবারও, সে-ই বুঝি দরজা ধাক্কাচ্ছে, কেন না সে ছাড়া আর কেউ অমন বেপরোয়ার মতো দরজা ধাক্কাতে পারে না। ইতিমধ্যে বাড়ির উঠোনের দারোয়ানও জেগে উঠেছিল, করাঘাতের আওয়াজ শুনে সে গেটের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। তাই দেখে ফেনিয়া ছুটে তার কাছে গিয়ে তাকে অনুনয় বিনয় করে বলতে যাচ্ছিল সে যেন লোকটাকে ভেতরে ঢুকতে না দেয়। কিন্তু যে লোকটা করাঘাত করছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দারোয়ান যখন জানতে পারল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে সে ফেদোসিয়া মার্কভ্না অর্থাৎ ফেনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চায় তখন শেষকালে গেটের দরজা খোলাই মনস্থ করল। এর আগে যে রান্নাঘর আমরা দেখেছিলাম সেই একই রান্নাঘরে পিয়োতর ইলিচ্ও এসে ঢুকল, তবে ফেনিয়ার কেমন 'ভয়-ভয় করছিল' বলে পিয়োতর ইলিচ্কে কাকুতি-মিনতি করে বলল দারোয়ানকে যেন সে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে না করতে পিয়োতর ইলিচ মুহূর্তের মধ্যে একেবারে মোক্ষম সূত্রটি পেয়ে গেল ঘটনা এই যে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ যখন গ্রুশেন্কার খোঁজে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় হামানদিস্তা থেকে খপ্ করে পেষাইয়ের নোড়াটা তুলে নিয়েছিল, যখন ফিরে এলো তখন দেখা গেল নোড়াটা আর তার কাছে নেই, কিন্তু তার দুই হাত রক্তে মাখামাখি।

"তখনও টপটপ করে রক্ত পড়ছিল, দু হাত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরেই যাচ্ছে!" বিস্ময় প্রকাশ করে ফেনিয়া বলে যাচ্ছিল। যে রকম রোমহর্ষক তথ্য সে জানাল সেটা অবশ্য তার বিক্ষিপ্ত মনের কল্পনাপ্রসূতই হওয়া সম্ভব। তবে রক্তচর্চিত হাত পিয়োতর ইলিচ নিজেও দেখেছিল, যদিও রক্ত সেখান থেকে টপটপ করে পড়ছিল না এবং সে নিজে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলতে তাকে সাহায্যও করেছিল। তাছাড়া প্রশ্নটা এও নয় যে হাতের ওই রক্ত শিগ্গিরই শুকিয়ে গিয়েছিল কি না। আসল প্রশ্নটা হল হামানদিস্তার ওই নোড়াটা নিয়ে দ্মিত্রি ফিয়োদর পাভ্লভিচ ঠিক কোথায় ছুটে গিয়েছিল? অর্থাৎ, সত্যি সত্যি ফিয়োদর পাভ্লভিচের কাছে কিনা এবং কী থেকে এতটা নিশ্চিত ভাবে সে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে? ঠিক এই প্রশ্নটাকেই খুঁচিয়ে দেখার ওপর পিয়োতর ইলিচ বিশেষ ভাবে জোর দিল, যদিও পরিণামে নিশ্চিত ভাবে কিচ্ছু জানতে পারল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় এরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস তার জন্মাল যে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের পক্ষে তার বাবার বাড়ি

ছাড়া আর কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না, অর্থাৎ কিনা সেখানে নির্ঘাত 'কিছু একটা' ঘটে থাকবে।

ফেনিয়া উত্তেজিত হয়ে যোগ করল, "যখন ফিরে এলো তখন আমি তার কাছে সব কথা স্বীকার করলাম, আর তখনই আমি তাকে জিগ্‌গেস করে জানতে চাইলাম: 'হ্যাঁ গো দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ মশাই, তোমার দু হাতে রক্ত কেন বল তো?' উত্তরে সে নাকি ফেনিয়াকে এই কথাই বলেছিল যে ও রক্ত মানুষের রক্ত এবং সে এই মাত্র মানুষ খুন করেছে। "এমনি করে আমার কাছে স্বীকার করল, সঙ্গে সঙ্গে সব দোষ স্বীকার করল, তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎই পাগলের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি বসে পড়লাম, বসে বসে ভাবতে লাগলাম : আচ্ছা এই যে পাগলের মতো ছুটে গেল, কোথায় যেতে পারে এখন? ভাবলাম, যাবে মোক্রয়েতে, সেখানে আমাদের দিদিমণিকে খুন করবে। যেই মনে হল অমনি আমি ছুটলাম তার ডেরায়, গিয়ে তাকে হাতে পায়ে ধরে বলতে আমাদের দিদিমণিকে যেন খুন না করে। কিন্তু প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানের কাছে যেতে তাকিয়ে দেখি ওর গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে, আর ওর হাতেও রক্ত নেই।" ফেনিয়া আবার সেটা লক্ষ করেছে এবং মনেও রেখেছে। ফেনিয়ার বুড়ি দিদিমা তার সাধ্যমতো নাতনির সমস্ত রকম সাক্ষ্যই সমর্থন করল। এটা ওটা আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে যেমন দেখাচ্ছিল তার চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন ও অস্থির দেখাল।

স্বভাবতই মনে হতে পারে যে তার কাছে যেটা সবচেয়ে সোজা ও সহজ রাস্তা ছিল তা হল এখন ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতে যাওয়া, জেনে আসা ওখানে কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না এবং যদি ঘটে থাকে সেটা ঠিক কী। এর পর প্রশ্নাতীত ভাবে নিঃসন্দিগ্ধ হলে একমাত্র তখনই জেলা পুলিশের বড়কর্তার কাছে যাবে। মনে মনে এরকমই স্থির সঙ্কল্প করে রেখেছিল পিয়োতর ইলিচ। কিন্তু রাতটা বড়ো অন্ধকার। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়ির গেটটাও ভারী মজবুত। আবার গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে হবে। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে আবার তার যতটুকু জানাশোনা তা ওই দূর থেকে। এই অবস্থায় ধাক্কাধাক্কি করার পর ধরা যাক ওরা তাকে গেট খুলেও দিল, কিন্তু তারপর হঠাৎ যদি দেখা যায় ওখানে কিছুই ঘটেনি তাহলে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ আবার যেমন রঙ্গপ্রিয়, তাতে পের্‌খোতিন নামে এক অপরিচিত সরকারি আমলা যে মাঝরাতে তার ওপর হামলা চালিয়ে তার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল কেউ তাকে খুন করেছে কি না, কালই শহরময় এই নিয়ে সে খোশগল্প করে বেড়াবে। কেলেঙ্কারির একশেষ! আর এই কেলেঙ্কারিকেই পিয়োতর ইলিচ দুনিয়ায় সব চাইতে বেশি ভয় করে।

তা সত্ত্বেও যে উপলব্ধিটা তাকে পেয়ে বসেছিল সেটা এত প্রবল ছিল যে সে ক্রোধে মাটিতে পা ঠুকল, আবারও মনে মনে নিজেকে গালগাল দিল, তার

পর কালবিলম্ব না করে আরেকটা নতুন পথ ধরে আরেক জায়গায় ছুটল। এবারে আর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে নয়, মাদাম খখ্‌লাকোভার কাছে। মনে মনে ভাবল, আজ অমুক সময়ে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে তিন হাজার রুবল ওই মহিলাই দিয়েছিল কি না—এ প্রশ্নের উত্তর যদি সে দেয় এবং সেই উত্তর যদি প্রতিকূল হয় সেক্ষেত্রে পিয়োতর ইলিচ সঙ্গে সঙ্গে জেলা পুলিশের বড়ো কর্তার কাছে যাবে, ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে আর যাবে না। অন্যথায় আগামীকাল পর্যন্ত সব কিছু মুলতবি রেখে দিয়ে সে বাড়ি ফিরে যাবে।

এখানে অবশ্য সহজেই মনে হতে পারে এত রাতে, রাত প্রায় এগারোটার সময় সমাজের উঁচু মহলের, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মহিলার বাড়ি গিয়ে পরিস্থিতির বিচারে উদ্ভট একটা প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে তোলা—হয়তো বা শয্যা থেকেই ডেকে তোলা—যুবকের এই যে সিদ্ধান্ত তাতে যে কেলেঙ্কারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে সেটা ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতে গেলে যা হত তার চাইতে আরও অনেক বেশি হলেও হতে পারে। কিন্তু উপস্থিত এই ব্যক্তিটির মতো যারা ধীরস্থির নির্বিকার প্রকৃতির এবং কোনো মীমাংসায় পৌঁছুনোর ব্যাপারে অত্যন্ত নিখুঁত বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ঠিক এমনটিই হয়ে থাকে। পিয়োতর ইলিচ ঠিক সেই মুহূর্তে যে একেবারে নির্বিকার ছিল তাও বলা যায় না। একটা অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার অস্থিরতা যে ভাবে ধীরে ধীরে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে শেষ পর্যন্ত তার ভেতরটা যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এমনকি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পরে সারা জীবন তা সে মনে করে রেখেছিল। বলাই বাহুল্য, তা সত্ত্বেও এই ভদ্রমহিলাটির কাছে যে তাকে যেতে হচ্ছে তার জন্য সারাটা রাস্তা সে নিজেকে শাপ শাপান্ত করতে করতে চলল। কিন্তু 'দেখে ছাড়ব, এর শেষ দেখে ছাড়ব!'—দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে কত বারই না সে এই কথাটা আউড়ে গেল! আর সে তার সঙ্কল্প পূরণও করল—শেষ দেখে ছাড়ল।

মাদাম খখ্‌লাকোভার বাড়িতে যখন তার পদার্পণ ঘটল তখন রাত ঠিক এগারোটা। বাড়ির আঙিনায় তাকে বেশ তাড়াতাড়িই ঢুকতে দেওয়া হল, কিন্তু ঠাকরুন ইতিমধ্যেই শুতে চলে গেছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে দারোয়ান সঠিক কিছু বলতে পারল না; শুধু একথাই বলল যে সচরাচর এই সময়ে তিনি শুয়ে পড়েন।

"আপনি বরং সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে জানান। ওনার মর্জি হলে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, নইলে করবেন না।"

পিয়োতর ইলিচ ওপরে উঠল। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াল। যে ভৃত্যটি ছিল সে ভেতরে খবর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল, শেষকালে একজন দাসীকে ডেকে আনল। পিয়োতর ইলিচ্ বেশ ভদ্রভাবে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল সে যেন তার ঠাকরুনকে এ কথাই জানায় যে পের্‌খোতিন নামে

স্থানীয় এক সরকারি আমলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ নিয়ে তার কাছে এসেছে, কাজটা যদি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হত তাহলে সে সাহস করে আসত না। 'ঠিক, ঠিক এই কথাগুলোই তাকে বোলো', মেয়েটিকে সে অনুরোধ করল।

মেয়েটি চলে গেল। পিয়োতর ইলিচ সামনের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে মাদাম খখ্‌লাকোভা তখনও শুয়ে পড়েনি ঠিকই, তবে ইতিমধ্যে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। মিতিয়ার সঙ্গে তার ওই একেবারে শেষ সাক্ষাতের পর থেকে সে মুহ্যমান হয়ে আছে এবং মনে মনে ধরেই নিয়েছিল যে এসব ক্ষেত্রে সচরাচর তার যে আধকপালি মাথার ব্যথা হয়ে থাকে আজ রাতেও তা থেকে সে রেহাই পাবে না। দাসীর মুখের বৃত্তান্ত শোনার পর সে অবাকই হয়ে গিয়েছিল। তবু বিরক্তির সঙ্গে দাসীকে বলল লোকটাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যদিও এমন অসময়ে তার অপরিচিত এখানকার এক 'স্থানীয় সরকারি আমলার' অপ্রত্যাশিত আগমন তার মধ্যে একটা অদম্য মেয়েলি কৌতূহলও জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু পিয়োতর ইলিচ এবারে নাছোড়বান্দার মতো গোঁ ধরে রইল। তাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে শোনার পর সে দাসীকে একান্ত ভাবে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ করল যে সে যেন আরও একবার তার কর্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে 'একেবারে আক্ষরিক ভাবে' ঠিক এই কথাই নিবেদন করে যে সে 'একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছে এবং উনি যদি এখন তার সঙ্গে দেখা না করেন তাহলে পরে তাকে নিজেকেই এর জন্য পস্তাতে হতে পারে।'

পরে পিয়োতর ইলিচ নিজে এই পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বলেছে, 'আমার অবস্থা তখন পাহাড়ের মাথা থেকে গোঁত্তা খেয়ে পড়ার মতো।'

দাসী অবাক হয়ে আপাদমস্তক তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে বার্তাটি জানাতে আরও একবার ভেতরে গেল। মাদাম খখ্‌লাকোভাকে এবারে কাবু করা গেল। একটু ভেবে নিয়ে দাসীকে জিগ্‌গেস করল লোকটা দেখতে কেমন। উত্তরে জানতে পারল, 'দিব্যি ভালো জামাকাপড় পরা, বয়স কম, আর বেশ ভদ্র।' এখানে কথায় কথায় জনান্তিকে বলে রাখি, পিয়োতর ইলিচ কিন্তু রীতিমতো সুদর্শন যুবক এবং সে নিজেও সেটা ভালো জানে। মাদাম খখ্‌লাকোভা দেখা করাই মনস্থ করল। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বাইরের পোশাক ছেড়ে ঘরোয়া ড্রেসিং গাউন আর চটি পরে ফেলেছে, কিন্তু ওই অবস্থাতেই ভব্যতার খাতিরে সে গায়ের ওপর একটা কালো রঙের শাল ফেলে নিল। 'সরকারি আমলা' ব্যক্তিটিকে বসার ঘরে আসার জন্য অনুরোধ জানানো হল। এটা সেই বসার ঘরটা যেখানে কিছুক্ষণ আগে মিতিয়ার সঙ্গে সে দেখা করেছিল। দেখা হওয়ার সঙ্গে কর্ত্রী তার অতিথিটির দিকে কঠোর, প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল। তাকে বসতে না বলে 'কী চাই আপনার?' সরাসরি এই প্রশ্ন দিয়ে আলাপ শুরু করল।

"মাদাম, আপনাকে যে আমি বিরক্ত করব বলে মনস্থ করেছি তার কারণ আমার

প্রশ্ন ছিল দমিত্রি ফিয়োদরভিচ কারামাজ্ভ্কে নিয়ে—যাকে আমরা দুজনেই সাধারণভাবে চিনি।"

পেরখোতিন সবে বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু দ্মিত্রির নামটি তার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে না হতে হঠাৎ একটা প্রবল বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠল গৃহকর্ত্রীর চোখেমুখে। ক্ষিপ্ত হয়ে পেরখোতিনকে তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সে প্রায় হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল।

"আর কত, আর কত ওই সাঙ্ঘাতিক লোকটাকে নিয়ে আপনারা আমাকে যাতনা দেবেন বলুন তো?" প্রচণ্ড ক্রোধে সে ফেটে পড়ল। "মাননীয় মহাশয়, কী বলে একজন অপরিচিত ভদ্রমহিলাকে এই অসময়ে তার বাড়িতে এসে বিরক্ত করার সাধ আপনার হল? কী বলে তার সামনে উপস্থিত হয়ে এমন একজন মানুষ সম্পর্কে কথা বলতে এলেন যে এই ঘণ্টা তিনেক আগেও আমাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার এই বসার ঘরটাতেই এসেছিল? এবং আমার বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মেঝেতে পা ঠুকে এমন হম্বিতম্বি করেছিল যা কোনো মানুষ কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে করতে পারে না? আমি আপনাকে বলে রাখছি, মাননীয় মহাশয়, আপনার নামে আমি অভিযোগ দায়ের করব, আমি আপনাকে অমনি অমনি ছেড়ে দেব না। আপনাকে অনুরোধ করছি, এই মুহূর্তে আপনি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আমি একজন মা আমি—আমি

খুন করার কথা বলছেন! আপনাকেও খুন করতে চেয়েছিল নাকি?"

"কেন, সে কি এর মধ্যে কাউকে খুন করেছে নাকি?" তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল মাদাম খখলাকোভা।

"মাদাম, আপনি যদি দয়া করে অন্তত আধ মিনিট সময় দিয়ে আমার কথাটা একটু ভালো করে শোনেন তাহলে আমি দু চার কথায় আপনাকে সব খুলে বলি", দৃঢ়স্বরে পেরখোতিন জবাব দিল। "আজ বিকেল পাঁচটার সময় কারামাজভ্ মশাই আমার কাছ থেকে বন্ধু ভাবে দশ রুবল ধার নিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি ওঁর কাছে কোনও টাকা ছিল না। অথচ আজই ন'টার সময় লোকের চোখে পড়ার মতো করে এক শ রুবলের এক তাড়া নোট হাতে করে আমার বাড়ি এসে হাজির। বান্ডিলটার মধ্যে আন্দাজ দু হাজার, এমনকি তিন হাজার রুবলও থাকতে পারে। তাঁকে পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। তাঁর দুই হাতে এবং সারা মুখেও রক্ত লেগে ছিল। কোথা থেকে এই টাকা পেয়েছেন আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঠিক এই কথাই বললেন যে এইমাত্র আপনার কাছ থেকে পেয়েছেন এবং আপনি নাকি তাঁকে স্বর্ণখনির সন্ধানে যাবার জন্য কর্জ হিসেবে তিন হাজার রুবল দিয়েছেন।..."

মাদাম খখ্লাকোভার চোখেমুখে তৎক্ষণাৎ একটা অস্বাভাবিক ও যন্ত্রণাকাতর উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল।

“হা ভগবান! এ যে দেখছি নিজের বুড়ো বাপকে খুন করেছে!” দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। “আমি ওকে কোনো টাকা দিইনি, কোনো টাকাই দিইনি! যান, যান, ওর বাপের কাছে যান!”

“মাফ করবেন, মাদাম, তাহলে বলছেন, আপনি ওঁকে টাকা দেননি? আপনার ঠিক মনে আছে, আপনি ওঁকে কোনো টাকাই দেননি?”

“দিইনি, দিইনি! আমি ওকে হাঁকিয়ে দিয়েছি, কারণ এর মর্ম বোঝার মতো ক্ষমতা তার নেই। সে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়, মাটিতে পা ঠোকে। আমার দিকে তেড়ে এসেছিল, কিন্তু আমি সরে যাই। আপনার কাছ থেকে আমার লুকানোর কিছুই নেই, তাই আমি আপনাকে এও বলব যে সে আমার মুখের ওপর থুতু ফেলেছিল—ভাবতে পারেন? কিন্তু আমরা অমন দাঁড়িয়ে আছি কেন? আহা, বসুন না। মাফ করবেন, আমি নাকি বরং যান, ছুটে চলে যান, আপনার উচিত হবে এক ছুটে গিয়ে বেচারি বুড়োকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করা!”

“কিন্তু ইতিমধ্যেই যদি খুন করে থাকে?”

“হা ভগবান, সত্যিই তো! তাহলে আমরা এখন কী করব? তাহলে আমরা এখন কী করব? আমাদের এখন কী করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?”

ভদ্রমহিলা ততক্ষণে পিয়োতর ইলিচকে বসতে দিয়ে নিজেও তার মুখোমুখি বসে পড়েছে। পিয়োতর ইলিচ সংক্ষেপে, তবে যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে তাকে ঘটনার বিবরণ দিল—অন্ততপক্ষে ঘটনার সেই অংশের, সে নিজে আজ যার সাক্ষী ছিল। ফেনিয়ার সঙ্গে সে যে এখন দেখা করেছিল তারও বিবরণ দিল এবং প্রসঙ্গক্রমে হামানদিস্তার নোড়াটার কথাও জানাল। ভদ্রমহিলা অমনিতেই উত্তেজিত হয়ে ছিল, তার ওপর এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাকে যার পর নাই অভিভূত করে ফেলল। সে চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল, দু হাতে মুখ ঢাকতে লাগল।

“ধারণা করতে পারেন, এসব যে ঘটবে আমি আগে থাকতে মনে মনে ঠিক টের পেয়েছিলাম! আমার কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এই গুণটি আছে—আমি যা ভাবি তা ঠিক ফলে যায়। বলব কি, যত বার, যতবারই না আমি এই ভয়ঙ্কর লোকটাকে তাকিয়ে দেখেছি সব সময় আমার কেন যেন মনে হয়েছে এই যে লোকটা, এর পরিণতি হবে এই যে আমাকে খুন করবে। ঠিক তাই ঘটল। অর্থাৎ কিনা এখন শুধু এটাই হল যে আমাকে খুন করল না, কিন্তু তার বাপকে খুন করল, আর সেটা সম্ভবত এই কারণে যে এক্ষেত্রে দেখাই যাচ্ছে ঈশ্বরের অঙুলি হেলনে আমি রক্ষা পেয়ে গেছি; তাছাড়া আরও বড়ো কথা এই যে আমাকে খুন করতে তার লজ্জা হচ্ছিল, কেন না আমি এই এখানে, ঠিক এই জায়গাতেই নিজে হাতে তার গলায় পবিত্র শহিদ পরমা প্রকৃতি ভার্‌ভারার্ মন্ত্রপূত মূর্তি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম।... একবার ভাবুন তো, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি মৃত্যুর কত কাছাকাছিই

না চলে এসেছিলাম! আমি কি না তার একেবারে কাছে গিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম আর সে তার গলাটা সম্পূর্ণ বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে! জানেন পিয়োতর ইলিচ্—মাফ করবেন, আপনি, মনে হয়, আপনার নাম পিয়োতর ইলিচই বলেছিলেন—তাই না? জানেন, আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু ওই যে মূর্তিটি আর সত্যিকারের এই যে পরমাশ্চর্য এখন আমার জীবনে ঘটল তাতে আমি স্তম্ভিত এবং এখন থেকে আমি আবার যা বলেন না কেন তাতেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। মহাস্থবির জোসিমার কথা আপনি শুনেছেন কি? কিন্তু আমি যে কী ছাই বলছি তা আমি নিজেও জানি না। একবার ভেবে দেখুন কী মানুষ! ওই পবিত্র মূর্তি গলায় ঝুলিয়েই কি না লোকটা আমার মুখের ওপর থুতু ফেলল! অবশ্যই ভালো বলতে হবে যে শুধু থুতুই দিয়েছে, খুন করেনি। তারপর তারপর ছুটল সেই কোথায়! কিন্তু আমরা তাহলে এখন কী করি? কী করি বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?"

পিয়োতর ইলিচ উঠে দাঁড়াল, জানাল যে এখন সে সোজা জেলা পুলিশের বড়কর্তার কাছে গিয়ে সব বলবে, তারপর তিনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন।

"আহা, চমৎকার, অতি চমৎকার মানুষটি! মিখাইল মাকারভিচের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যেতে হলে অতি অবশ্য তাঁর কাছেই যাওয়া উচিত। আপনার ঠিক মাথায় খেলেছে তো পিয়োতর ইলিচ্! আপনি সব কিছু খুব ভালো ভাবে ভেবেচিন্তে বের করেছেন কিন্তু। জানেন, আপনার জায়গায় আমি হলে আমার মাথায় কখনোই এটা আসত না!"

"তা ছাড়া জেলা পুলিশের এই বড়ো কর্তাটির সঙ্গে আমার নিজেরও ভালো আলাপ পরিচয় আছে", পিয়োতর ইলিচ মন্তব্য করল। তখনও সে দাঁড়িয়েই আছে এবং তাকে দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল কোনো মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উচ্ছ্বাসপ্রবণ মহিলাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারলে সে বাঁচে। এদিকে মহিলা তাকে কিছুতেই তার কাছ থেকে বিদায় নিতে দিচ্ছে না, তাকে যেতে দিচ্ছে না।

"আর হ্যাঁ, জানেন, ভুলবেন না", আবোল তাবোল বকে চলল সে, "ওখানে যা যা দেখলেন, জানলেন যা যা প্রকাশ পেল তার ব্যাপারে ওরা কী স্থির করল, বিচারে তার কী শাস্তি হতে পারে—ফিরে এসে এ সব কথা আমাকে বলা চাই কিন্তু। আচ্ছা বলুন তো, আমাদের দেশে তো মৃত্যুদণ্ড নেই, তাই না? কিন্তু যা-ই হোক, অতি অবশ্যই আসবেন, রাত তিনটে হলেও আসবেন, না হয় চারটেই হল, এমনকি সাড়ে চারটে হলেও! বলবেন, আমাকে যেন ওরা ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেয়, যদি না উঠি তাহলে যেন আমাকে ঠেলাঠেলি করে জাগিয়ে দেয়। হা ভগবান, ঘুম আমার আসবেই না! আচ্ছা, আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তো কেমন হয়?

"ন্-না, তবে হ্যাঁ, যা-ই হোক না কেন, আপনি যদি এক্ষুনি নিজে হাতে এই

মর্মে গোটা দুই তিন ছত্র লিখে দেন যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচকে আপনি কোনো টাকা দেননি তাহলে সেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাও হতে পারে কাজে লাগলেও লাগতে পারে

“অবশ্যই!” উল্লসিত হয়ে এক লাফে মাদাম খখ্‌লাকোভা তার লেখার টেবিলের কাছে ছুটে গেল। “জানেন আপনি আমাকে অবাক করে দিচ্ছেন, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিতে এবং এসব ব্যাপারে আপনার পারদর্শিতায় আমি রীতিমতো চমৎকৃত। আপনার কর্মস্থল কি এখানেই? আপনার কর্মস্থল যে এখানে শুনে কী ভালোই না লাগল!

কথাগুলি বলতে বলতেই চিঠি লেখার কাগজের আধখানা পৃষ্ঠায় সে খসখস করে বড়ো বড়ো অক্ষরে এই তিনটি ছত্র লিখে ফেলল

‘হতভাগ্য দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কারামাজ়ভ্‌কে (এখন তো তাকে হতভাগ্যই বলতে হয়) আমি জীবনে কখনও টাকা ধার দিইনি, আজও তিন হাজার রুবল দিইনি। এ ছাড়া অন্য কোনো টাকাও কখনও দিইনি, কখনই দিইনি! আমাদের এই পৃথিবীতে যা যা পবিত্র হতে পারে সব কিছুর নামে শপথ করে আমি একথা বলতে পারি! ‘খখ্‌লাকোভা’

“এই যে ধরুন চিরকুটটা!” পিয়োতর ইলিচের দিকে দ্রুত ফিরে তাকিয়ে সে বলল। “যান, গিয়ে লোকটাকে বাঁচান। আপনার তরফ থেকে এটা একটা মহৎ কীর্তি হবে।”

এর পর পিয়োতর ইলিচের শুভ কামনায় সে তার ওপর তিনবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, এমনকি এগিয়ে এসে তাকে বিদায় জানানোর জন্য সামনের ঘর পর্যন্ত ছুটে এলো।

“কী বলে যে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাব! আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, আপনি যে প্রথমেই আমার কাছে এসেছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ! কেন যে আগে আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি! ভবিষ্যতে আমার বাড়িতে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারলে সেটা আমি আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব। আপনার কর্মস্থল যে এখানেই তা শুনে কী ভালোই না লাগল! আপনি কাজে এত নিখুঁত আপনার এমন উপস্থিত বুদ্ধি! তবে ওরা নিশ্চয় আপনার মূল্য বুঝবে, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় আপনাকে বুঝতে পারবে। আর আপনার জন্য যদি আমি কিছু করতে পারি, তাহলে বিশ্বাস করুন আহা, যুবসমাজকে আমি আমি কী ভালোই না বাসি! আমি যুব সমাজের প্রেমে আকুল। আমাদের এই যত অল্পবয়সি ছেলেছোকরা তারাই তো আমাদের আজকের দিনের সমগ্র নিপীড়িত রাশিয়ার একমাত্র অবলম্বন, তার সমস্ত আশা ভরসাস্থল। আচ্ছা যান, যান!

কিন্তু পিয়োতর ইলিচ ততক্ষণে ছুটে বেরিয়ে গেছে, নইলে খখ্‌লাকোভা তাকে

অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিত না। তবু বলতে গেলে কি মাদাম খখ্লাকোভা তার মনের ওপর যে ছাপ ফেলল সেটা যথেষ্ট মধুর এবং তার ফলে এরকম একটা বিশ্রী কাজে জড়িয়ে পড়ার দরুন তার মনের মধ্যে যে উদ্বেগ ছিল তা কতকটা হালকাও হয়ে গেল। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ—একথা সবারই জানা আছে। 'তা ছাড়া ভদ্রমহিলাকে এমন একটা বয়স্থাও বলা যায় না। বরং আমি তো ওকে ওর মেয়ে বলেই ধরে নিতাম', মনে মনে এই ভেবে তার বেশ ভালো লাগল।

মাদাম খখ্লাকোভার দিক থেকে বলতে গেলে যুবক তাকে একেবারে মোহিত করে দিয়েছে। 'এত পারদর্শিতা! এমন নিখুঁত! এত অল্পবয়সি একজন যুবকের মধ্যে! আমাদের এই আজকের দিনে! তার ওপর কী আদব কায়দা! কী চেহারা! তাহলে এই যে লোকে বলে আধুনিক ছেলেছোকরারা নাকি কোনো কাজেরই নয়! এই তো আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত', ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা ওই 'ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার' কথা সে তখনকার মতো স্রেফ ভুলে গেল। শুধু বিছানায় শুতে যাবার সময় আচমকা নতুন করে তার মনে পড়ে গেল 'মৃত্যুর কত কাছাকাছিই' না সে এসে পড়েছিল! এ কথা মনে পড়ে যেতে সে শিউরে উঠল 'ওঃ কী ভয়ঙ্কর। কী ভয়ঙ্কর!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর গাঢ় নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

এই যে বিধবা মহিলাটি, যাকে তেমন একটা বয়স্থা আদপেই বলা চলে না, তার সঙ্গে সরকারি আমলা যুবকটির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আমি এইমাত্র দিলাম পরবর্তীকালে যদি তা এই সূক্ষ্মদর্শী ও নিখুঁত যুবকটির সমগ্র জীবনের গতিপথের উৎস হয়ে না দাঁড়াত তাহলে অবশ্য এরকম ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনার বিশদ বিবরণ এত ফলাও করে আমি দিতে যেতাম না। ঘটনাটি আজও আমাদের শহরের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে স্মরণ করে এবং আমরাও হয়তো এ সম্পর্কে বিশেষ করে আরও কিছু কথা বলব, যখন আমরা কারামাজভ্ ভাইদের এই সুদীর্ঘ কাহিনির ইতি টানব।

## দুই

## বিপদ সঙ্কেত

আমাদের পুলিশ সুপার মিখাইল মাকারভিচ্ মাকারভ্ একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফ্টেনান্ট কর্নেল। সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে তাঁর পদমর্যাদা হয়েছে কোর্ট কাউন্সিলার। লোকটি বিপত্নীক। চমৎকার মানুষ। আমাদের এখানে তার আগমন মাত্র তিন বছর আগে। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন মুখ্যত এই কারণে যে 'জন সমাজকে এক ছত্রছায়ায় সম্মিলিত করার ক্ষমতা' তাঁর ছিল। তাঁর বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতদের সীমাসংখ্যা ছিল না। দেখে মনে হত তিনি যেন নিজেও তাদের ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারতেন না। প্রতিদিনই অতি অবশ্য কেউ না

কেউ তাঁর সঙ্গে ডিনার করত—হোক না দুজন, নিদেন পক্ষে একজন—কিন্তু অতিথি ছাড়া খাবার টেবিলে তিনি কখনও বসতেন না। যে কোনো অছিলায়—এমনকি কোনো কোনো সময় অপ্রত্যাশিত কোনো ছল ছুতো করে বাড়িতে নিয়মিত ডিনার পার্টিও দিতেন। খাবার দাবার যা পরিবেশন করা হত তা তেমন একজন আহামরি না হলেও প্রাচুর্যের কোনো অভাব থাকত না। মাছের পুর দেওয়া কচুরি অতি উপাদেয় হত। আর মদ যা থাকত তার গুণগত মান জাঁক করার মতো না হলেও পরিমাণে সে অভাব পুষিয়ে যেত।

বাড়িতে ঢোকার মুখে প্রথম ঘরটাতে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা ছিল। অত্যন্ত রুচিসম্মত গৃহসজ্জা এই ঘরটার। এমনকি দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে কালো ফ্রেমেবাঁধানো ইংলিশ রেসের ঘোড়ার ছবি, যা কিনা, আমরা জানি, একজন অবিবাহিত পুরুষ মানুষের বিলিয়ার্ড রুমের সজ্জার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় তাসের আসর বসত—মাত্র একটি টেবিলে হলেও বসবে। কিন্তু খুবই ঘন ঘন আমাদের শহরের উঁচু মহলের সকলে তাদের মা আর অল্পবয়সি মেয়েদের নিয়ে তার বাড়িতে নাচের আসরে এসে জুটত। মিখাইল মাকারভিচ বিপত্নীক হলে কী হবে সাংসারিক পরিবেশের মধ্যেই বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে বাস করত তাঁর মেয়ে, যে আজ বহুকাল হল বিধবা হয়েছে, বিধবা মেয়ের সঙ্গেঁ তার দুই কন্যা—মিখাইল মাকারভিচের দুই নাতনি। মেয়ে দুটি ইতিমধ্যে সাবালিকা হয়ে উঠেছে, তাদের শিক্ষাদীক্ষার পালাও চুকে গেছে। দেখতে শুনতে একেবারে মন্দ নয়, বেশ হাসিখুশি স্বভাবের। যদিও সকলেই জানত যে তাদের বিয়ে করলে কোনও যৌতুক মিলবে না, তবু আমাদের সমাজের উঁচু মহলের যুবকরা তাদের আকর্ষণে তাদের দাদামশাইয়ের বাড়িতে আনাগোণা করত।

মিখাইল মাকারভিচ কাজে কর্মে খুব যে একটা চালাক চতুর ছিলেন এমন কথা বলা যায় না, তবে আরও অনেকের তুলনায় তিনি কোনও অংশে কম কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন না। সোজা কথায় বলতে গেলে লোকটির শিক্ষা তেমন একটা উন্নত মানের ছিল না, এমনকি নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল না, আর তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাও ছিল না।

হাল আমলে যে সমস্ত সংস্কার বিধিবদ্ধ হয়েছে তার কতকগুলি সম্যকরূপে অনুধাবন করার ক্ষমতা যে তাঁর ছিল না ঠিক তা নয়, তবে তাঁর বোঝার মধ্যে বেশ খানিকটা গলদ থাকত—এমনকি অনেক সময় চোখে পড়ার মতো গলদই থাকত, কিন্তু এর কারণ স্রেফ তাঁর নিশ্চিন্ত স্বভাব—তার বিশেষ কোনো ক্ষমতার অভাব নয়, যেহেতু কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার মতো সময় তাঁর কখনও হত না।

'ভদ্রমহোদয়রা, আমি কিন্তু অসামরিকের চাইতে মনেপ্রাণে বেশি সামরিক', নিজের সম্পর্কে তিনি নিজেই এই কথা বলতেন। এমনকি ভূমিদাস প্রথা

উচ্ছেদসংক্রান্ত সংস্কারের সঠিক ভিত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত ও দৃঢ় কোনো ধারণাও যেন আজ পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি, যেটুকু জেনেছেন তা অনিচ্ছাকৃত ভাবে, বলতে গেলে বছরের পর বছর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটিয়ে। অথচ তিনি নিজে ছিল একজন ভূস্বামী, সে হিসেবে সেটা তাঁর একান্তই জানা দরকার ছিল। পিয়োতর ইলিচ ঠিক জানত, সেই রাতেও মিখাইল মাকারভিচের বাড়িতে অবশ্যই কোনো না কোন অতিথির দেখা পাবে, তবে ঠিক কার বা কাদের সেটাই কেবল তাঁর জানা ছিল না। এদিকে ঘটনাচক্রে তখনই, সেই মুহূর্তে সেখানে তাস খেলতে বসেছিলেন আমাদের জেলার প্রসিকিউটর আর জেলা পরিষদের ডাক্তার ভার্‌ভিন্‌স্কি। ডাক্তার লোকটি যুবক, অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পেতের্বুর্গ চিকিৎসাবিদ্যা একাডেমির পাঠ শেষ করে সবে রাজধানী থেকে আমাদের এখানে এসেছেন। প্রসিকিউটর আমরা যাকে বলছি তিনি আসলে ডেপুটি প্রসিকিউটর—ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ, কিন্তু এখানকার লোকেরা সকলে তাঁকে প্রসিকিউটরই বলে থাকে। বিশেষ এক ধরনের মানুষ, বুড়ো তাকে বলা যায় না—মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, কিন্তু যক্ষ্মারোগের বড়ো বেশি প্রবণতা আছে, এদিকে যাঁকে বিয়ে করেছেন তিনি এক দস্তুরমতো স্থূলকায়া মহিলা, যাঁর কোনো সন্তানাদি নেই। আত্মতৃপ্ত ও বদরাগী মানুষ বটে, তবে তা সত্ত্বেও বুদ্ধিটা তাঁর বেশ পাকা, এমনকি মনটাও নরম। মনে হয় তাঁর চরিত্রের একটা মহৎ দোষ এই যে তাঁর প্রকৃত যোগ্যতা যতটা মঞ্জুর করে নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা সেই তুলনায় বেশ খানিকটা উঁচু। আর ঠিক এই কারণেই তাঁকে সব সময় উৎকণ্ঠিত বলে মনে হত। কিন্তু এছাড়াও মনোবিদ্যা, মানব মনের বিশেষ জ্ঞান এবং অপরাধ ও অপরাধীকে বোঝার একটা বিশেষ ক্ষমতা—এ ধরনের জ্ঞান অর্জনের বেশ খানিকটা উঁচু ধরনের, এমনকি একটা শিল্পসম্মত ক্ষীণ প্রয়াসও তাঁর মধ্যে ছিল। এই বিবেচনায় তাঁর মনে হত চাকুরির ক্ষেত্রে সে বেশ খানিকটা অবহেলিত, উপেক্ষিত। তাঁর বরাবরের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ওপর মহল তাঁর ঠিক কদর দিতে পারেনি এবং তাঁর শত্রু আছে। এমন একেকটা বিষণ্ণ মুহূর্ত আসত যখন তিনি এই বলেও হুমকি দিতেন যে এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ফৌজদারি মামলার আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করবেন। কারামাজভ্ পরিবারের পিতৃহত্যার এই আকস্মিক মামলাটি তাঁকে যেন ধরে নাড়িয়ে দিল। তাঁর মনে হল, 'মামলাটা এমনই যে সারা রাশিয়াতে সাড়া ফেলে দিতে পারে।' কিন্তু এটা আমার আগ বাড়িয়ে বলা হয়ে যাচ্ছে।

পাশের ঘরে আবার অল্পবয়সি মেয়েদের সঙ্গে বসে ছিল আমাদের বিচারবিভাগীয় তদন্তকারী নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ নেল্যুদভ্। বয়সে যুবক, মাত্র দু মাস হল রাজধানী পেতের্বুর্গ থেকে এখানে এসেছে। পরে অবশ্য লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে কথাও উঠেছিল, এমনকি সকলে বিস্ময় প্রকাশ করে একথাও বলাবলি করেছিল যে এই এতগুলি লোক সকলে মিলে যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 'অপরাধ সংঘটনের' সেই

সন্ধ্যাটিতেই একজন নির্বাহী আধিকারিকের বাড়িতে এসে জুটেছিল! অথচ ব্যাপারটা ছিল অতি সাধারণ এবং তা ঘটেছিল নিতান্তই স্বাভাবিক ভাবে।

ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের সহধর্মিণীটি গত দুদিন হল দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের স্রেফ যেটা দরকার ছিল তা হল তাঁর আর্তনাদ থেকে কোথাও পালিয়ে বাঁচা। ডাক্তারের আবার স্বভাবটাই এমন যে সন্ধ্যা হলে তাসের টেবিল ছাড়া অন্য কোথাও তিনি থাকতে পারতেন না। আর নিকলাই পার্ফেনভিচ্ নেল্যুদভ্ যে ওই দিন সন্ধ্যাবেলাতে মিখাইল মাকারভিচের বাড়িতে আসবে সে তো তিন দিন আগে থাকতে মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিল—তাঁর মতলব ছিল কতকটা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে আচমকা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে এরকম একটা ধূর্তামি খাটিয়ে এই বাড়ির বড়ো মেয়ে ওল্গা মিখাইলভ্নাকে এই বলে চমকে দেওয়া যে তার গোপন কথাটা আর গোপন নেই সে জানে যে আজ তার জন্মদিন, কিন্তু লোকজন ডেকে নাচের আসরের আয়োজন যাতে না করতে হয় সেজন্য সে ইচ্ছে করে সমাজের সকলের কাছ থেকে তা গোপন করে রেখেছে। এর পর যেটা হতে পারত তা হল মেয়েটির বয়স, তা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায় হয়তো তার এই ভয় এবং এখন যুবক যেহেতু তার গোপন কথাটি জেনে গেছে সেহেতু কালই যে সকলের কাছে সে তা ফাঁস করে দিতে পারে ইত্যাদি নিয়ে বেশ খানিকটা হাসাহাসি আর খুনসুটি। এই মনোমুগ্ধকর যুবকটি ছিল ভারি দুষ্টু। এখানকার মহিলামহলে তার এরকম একটা ডাক নাম চালুও হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় যুবকের এটা বেশ ভালোও লাগত। সে যাই হোক, যুবক দস্তুরমতো সদ্বংশজাত, ভালো পরিবারের, সুশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতিসম্পন্ন। যদিও আমোদ প্রমোদে গা ঢালা গোছের, কিন্তু তার সে সব আমোদ প্রমোদ হত নিতান্তই নির্দোষ এবং সব সময় সুরুচিসম্মত। দেখতে ছোটখাটো, দেহের গঠন দুর্বল, পেলব শরীর। তার পাণ্ডুর বর্ণের পাতলা আঙুলগুলিতে সব সময় ঝকঝক করত বড়ো বড়ো বেশ কয়েকটা আঙ্টি। কাজের জায়গায় সে অসাধারণ গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ত, তখন তাকে দেখে মনে হত সে যেন তার নিজের গুরুত্ব এবং পবিত্র কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। জেরা করার সময় সাধারণ লোকজনের মধ্যে যার খুনি এবং অন্য আরও যারা দুর্বৃত্ত আছে তাদের হতবুদ্ধি করে দেওয়ার মতো একটা বিশেষ ক্ষমতা তার ছিল, আর তাইতে তাদের মনে তার প্রতি সম্ভ্রমের ভাব যদি নাও হয় অন্তত কতকটা বিস্ময়ের ভাব সত্যি সত্যি জাগিয়ে তুলতে পারত।

পুলিশ সুপারের বাড়িতে ঢুকে পিয়োতর ইলিচ একেবারে হতবাক সে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল ওখানে ইতিমধ্যে সবাই সব জানে। বাস্তবিকই সবাই তাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, এই নিয়ে আলোচনা করছে। এমনকি নিকলাই পার্ফেনভিচ্ও অল্পবয়সি মহিলাদের সঙ্গ ছেড়ে ছুটে এসেছে। তাকে এত উৎসাহী দেখাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল পারলে এখনই কাজে নেমে পড়ে। পিয়োতর ইলিচ্ এখানে এসে যে

তাক-লাগানো সংবাদটি পেল তা এই যে বুড়ো ফিয়োদর পাভ্লভিচ বাস্তবিকই সেই দিন সন্ধ্যায় তার নিজের বাড়িতে খুন হয়েছে। খুনের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতিও হয়েছে। জানা গেছে এই মাত্র, মাত্র কিছুক্ষণ আগে—কী ভাবে, সেটা খুলে বলা যাক।

বাড়ির বেড়ার গায়ে গ্রিগোরি ধরাশায়ী। এদিকে গ্রিগোরির সহধর্মিণী যদিও তার শয্যায় গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল এবং সেই ভাবে একেবারে সকাল পর্যন্ত ঘুমোলেও ঘুমোতে পারত, কিন্তু যেটা ঘটল তা এই যে হঠাৎই তার চটকা ভেঙে গেল। সেটা সম্ভব হয়েছিল মৃগী রোগগ্রস্ত স্মের্দিকোভের ভয়ঙ্কর আর্ত চিৎকারে। রোগের আক্রমণে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে পাশের ঘরে পড়ে ছিল। বরাবরই এরকম আর্ত চিৎকার দিয়ে তার মূর্ছার প্রকোপ শুরু হয়ে যেত আর এটাকেই মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না সব সময়, সারা জীবন ভীষণ ভয় করে এসেছে, এই আর্তনাদ তার কাছে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক ছিল। এতে সে কখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। অর্ধজাগ্রত অবস্থায় বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বেহুঁশ হয়ে সে ছুটে গেল স্মের্দিকোভের কুঠুরিতে। কিন্তু সেখানে ঘোর অন্ধকার, শুধু কানে এলো রোগী ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড় আওয়াজ আর ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছে। মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না নিজেই তখন চিৎকার করে উঠে স্বামীকে ডাকতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার খেয়াল হল সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠেছিল তখন গ্রিগোরি যেন পাশে তার শয্যায় ছিল না বলেই মনে হচ্ছে। ছুটে বিছানার কাছে গিয়ে আরেকবার হাতড়ে দেখল, কিন্তু বিছানা বাস্তবিকই খালি। তার মানে বিছানা ছেড়ে কোথাও গেছে—কিন্তু কোথায় হতে পারে? বাইরের বারান্দায় ছুটে গিয়ে দেউড়ির ধাপ থেকে ভীতকণ্ঠে ডাকল। বলাই বাহুল্য, উত্তর পেল না, তবে তাহলেও রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে দূর থেকে, যেন বাগানের কোনো এক জায়গা থেকে গোঙানির মতো কী যেন শুনতে পেল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল আবারও শোনা গেল, স্পষ্টই বোঝা গেল সত্যি সত্যি বাগান থেকে আসছে।

'হা ভগবান! সেই তখন দুর্গন্ধী লিজাভিয়েতার বেলায় যেমন হয়েছিল এও দেখছি ঠিক সেই রকম!' তার বিশৃঙ্খল মাথার মধ্যে তখন মুহূর্তের জন্য এই রকম একটা চিন্তার উদয় হয়েছিল। ভয়ে ভয়ে দেউড়ির ধাপ থেকে নিচে নেমে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। বাগানের গেট খোলা।

'নির্ঘাত ওই ওখানেই আছে আমার মানুষটা,' এই ভেবে সে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেল গ্রিগোরির ক্ষীণ, কাতর ও ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর: 'মার্ফা, মার্ফা!' বলে তার নাম ধরে তাকে ডাকছে।

"হে ভগবান, বিপদ থেকে আমাদের রক্ষে কর!" বিড়বিড় করে এই কথা বলতে বলতে যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সে দিকে ছুটে গেল। এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত গ্রিগোরির সন্ধান পেল। কিন্তু তাকে পেল বেড়ার ধারের ঠিক সেই

জায়গাটাতে নয় যেখানে সে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল—সেখান থেকে বিশ পা মতন দূরে। পরে দেখা গিয়েছিল জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বুকে হেঁটে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায় এবং সম্ভবত আবারও মূর্ছা গিয়ে, বেশ কয়েকবার অচৈতন্য হয়ে তারপর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এই ভাবে অনেকটা সময় ধরে বুকে হেঁটে এগোতে থাকে। মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করল তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তৎক্ষণাৎ মুখে যা এলো তাই বলে সে পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল। গ্রিগোরি ক্ষীণকণ্ঠে অসংলগ্নভাবে বিড় বিড় করে বলল "খুন করেছে বাপকে খুন করেছে... অমন চেল্লাচেল্লি করছ কেন? হাঁদা কোথাকার! যাও, ছুটে গিয়ে লোকজন ডেকে আন

কিন্তু মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না তাতে শান্ত না হয়ে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যেতে লাগল। এই অবস্থায় এক সময় হঠাৎ যখন তার চোখে পড়ল কর্তার ঘরের জানলা খোলা আর জানলায় আলো জ্বলছে তখন সেখানে ছুটে গিয়ে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতে দেখতে পেল এক বীভৎস দৃশ্য। কর্তা নিথর হয়ে চিতপাত মেঝেতে পড়ে আছে। তার ফিকে রঙের ড্রেসিং গাউন আর সাদা শার্টের বুকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। টেবিলের ওপরকার মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল আলোকিত হয়ে উঠেছে চাপ চাপ রক্ত আর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের নিথর মৃত মুখখানা। আতঙ্কের এই সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না তৎক্ষণাৎ জানলার কাছ থেকে সরে এসে ছুটতে ছুটতে বাগান থেকে বেরিয়ে বাইরের বড়ো ফটকের দরজার খিলটা খুলে বাড়ির পিছনের পথ ধরে পড়ি মরি করে প্রতিবেশিনী মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নার কাছে ছুটল। মা ও মেয়ে—প্রতিবেশিনীরা দুজনেই তখন ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না যে রকম ক্ষিপ্ত হয়ে, সজোরে জানলার খড়খড়ির গায়ে দুমদাম ঘা মারার সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল তাতে তাদের ঘুম ভেঙে গেল, এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে তারা জানলার দিকে এগিয়ে গেল। হাউমাউ চিৎকার করে অসংলগ্নভাবে হলেও মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না অবশ্য আসল ঘটনাটা তাদের জানাতে সক্ষম হল এবং এই বিপদে তাদের সাহায্য চাইল। ঠিক সেই দিনই আবার ভবঘুরে ফোমাও তাদের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছিল। তাকেও তৎক্ষণাৎ জাগিয়ে তোলা হল। তিনজনেই অকুস্থলের উদ্দেশে ছুটল। পথে যেতে যেতে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নার মনে পড়ে গেল আজ আটটার পরে কোনো এক সময়ে তাদের বাগান থেকে সারা পাড়া মাথায় করে একটা বিকট মর্মভেদী তীক্ষ্ণ চিৎকার তার কানে এসেছিল বটে। সেটা নিঃসন্দেহে ছিল গ্রিগোরির সেই চিৎকার যখন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ ইতিমধ্যে বেড়ার মাথায় উঠে বসেছে দেখে সে দুহাতে তার পা চেপে ধরে 'পিতৃঘাতী' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

"কেউ একজন একবারই ওরকম চেঁচিয়ে উঠল, তারপর আচমকা থেমে গেল",

দৌড়ে চলতে চলতে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না সাক্ষ্য দিল। গ্রিগোরি যেখানে পড়ে ছিল ছুটতে ছুটতে সেখানে আসার পর ওরা দুই মেয়েমানুষ ফোমার সাহায্য নিয়ে ধরাধরি করে তাকে বাইরের বাড়িতে তার বাসস্থানে এনে তুলল। বাতি জ্বালানোর পর তারা দেখতে পেল স্মের্দিয়াকোভের শান্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই, সে তখনও তার ঘরের মধ্যে ছটফট করছে, তার চোখ টেরিয়ে গেছে আর কশ বেয়ে গাঁজলা গড়িয়ে পড়ছে। গ্রিগোরির মাথাটা ভিনিগার মেশানো জলে ধুইয়ে দেওয়া হল। মাথায় জল পড়ায় তার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো, তৎক্ষণাৎ সে জিগ্‌গেস করল

"কর্তা কি খুন হয়েছেন নাকি?"

এরপর ওরা দুই মেয়েমানুষ আর ফোমা কর্তার বাসভবনের দিকে চলল। বাগানে ঢোকার পর এবারে তারা দেখতে পেল কেবল জানলা নয়, বাড়ি থেকে বাগানে যাবার যে দরজা সেটাও হাঁ করে খোলা। অথচ গত এক সপ্তাহ হল রোজ রাতে, সন্ধ্যা হতে না হতে কর্তা নিজে আচ্ছা করে দরজা এঁটে ভেতরে বসে থাকত, এমন কি গ্রিগোরিকে পর্যন্ত কোনো অছিলায় তার দরজায় ধাক্কা দিতে বারণ করে দিয়েছিল। সেই দরজা খোলা থাকতে দেখে 'শেষে আবার কী হতে কী হয়' এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে কর্তার কাছে যেতে ভয় পেয়ে গেল। ওরা ফিরে এলে গ্রিগোরি আর দেরি না করে তৎক্ষণাৎ ওদের সোজা জেলা পুলিশের বড়কর্তার কাছে যেতে বলল। মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্নাই সেখানে ছুটে গিয়ে পুলিশ সুপারের বাড়িতে উপস্থিত অতিথিদের সকলের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য সঞ্চার করল। পিয়োতর ইলিচের থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে সে এসে পড়েছিল, ফলে পিয়োতর ইলিচের বিচরণ আর নিছক তার নিজস্ব অনুমান ও সিদ্ধান্তরূপে উপস্থিত হল না তার চেয়েও বড়ো কথা, অপরাধী যে কে সাধারণের সেই অনুমানের সমর্থনে তা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, যদিও পিয়োতর ইলিচ নিজে তার হৃদয়ের গভীরে এই শেষ মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত সেটা বিশ্বাস করতে একেবারেই নারাজ ছিল।

ঠিক হল উঠে পড়ে কাজে লাগতে হবে। শহরের ডেপুটি পুলিশ ইন্স্পেক্টরের ওপর সঙ্গে সঙ্গে কাজের ভার দিয়ে বলে দেওয়া হল সে যেন অন্তত চারজন লোক জোগাড় করে তাদের সাক্ষী মেনে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতে সমস্ত রকম নিয়ম কানুন অনুসারে তদন্ত চালায়। সে সব নিয়মকানুনের বিশদ বিবরণের মধ্যে অবশ্য আমি যাচ্ছি না। জেলা পরিষদের ডাক্তারটি নতুন লোক, সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বলতে গেলে প্রায় উপযাচক হয়ে, নিজে থেকেই জেলা পুলিশের বড়কর্তা, প্রসিকিউটর ও তদন্তকারীর সঙ্গী হয়ে যেতে চাইল।

এখানে শুধু সংক্ষেপে বলে রাখি ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌কে সম্পূর্ণ মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার মাথার খুলি ভাঙা। কিন্তু কী দিয়ে ভাঙা হয়েছিল? খুব সম্ভব সেই একই হাতিয়ার দিয়ে যার ঘায়ে গ্রিগোরিও পরে ধরাশায়ী হয়েছিল। তা সেই হাতিয়ারেরও সন্ধান মিলল। গ্রিগোরিকে ইতিমধ্যে সাধ্যমতো চিকিৎসাসংক্রান্ত

সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। কষ্ট করে থেমে থেমে ক্ষীণকণ্ঠে হলেও কেমন করে সে ধরাশায়ী হয়েছিল যথেষ্ট সুসংবদ্ধভাবেই তার বিবরণ দিল। গ্রিগোরির মুখের বিবরণ শোনার পর বেড়ার কাছাকাছি জায়গায় লণ্ঠন নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। সরাসরি বাগানের রাস্তার ওপর নজর কাড়ার মতো যে জায়গাটাতে তামার নোড়াটা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেখানেই সেটাকে পাওয়া গেল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ যে ঘরটাতে পড়ে ছিল সেখানে বিশেষ কোনো বিশৃঙ্খলার চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে পর্দার ওপাশে তার শয্যার পাশের মেঝেতে কুড়িয়ে পাওয়া গেল অফিস-কাছারিতে ব্যবহারের উপযোগী, বেশ মোটা কাগজের একটা বড়সড় খাম, তার ওপর লেখা ছিল 'আমার স্বর্গের দেবী গ্রুশেন্‌কাকে প্রীতি উপহার স্বরূপ তিন হাজার রুবল, যদি আসতে চায়' নীচে আরও লেখা—সেটাও ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের নিজেরই হাতে লেখা 'এবং আমার ছোট্ট কুঁকড়িসোনাকে', তবে এটা সম্ভবত পরে যোগ করা হয়েছিল। খামের ওপর লাল গালার তিনটি বড়ো বড়ো সিলমোহর, কিন্তু খামটা ছিন্নভিন্ন, ভেতরে কিছু নেই টাকা যা ছিল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গোলাপি রঙের যে পাতলা ফিতে দিয়ে খামটা বাঁধা ছিল সেটাও মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল।

প্রসঙ্গত, পিয়োতর ইলিচের সাক্ষ্যের মধ্যে একটা বিষয় ও তদন্তকারীর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। সেটা হল তার এই অনুমান যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ ভোর হতে না হতে নির্ঘাত গুলি করে আত্মহত্যা করবে, সে নিজে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, একথা সে নিজের মুখে পিয়োতর ইলিচ্‌কে বলেছে, তার সামনে পিস্তলে গুলি ভরেছে, একটা চিরকুট লিখে সেটা তার নিজের পকেটে রেখে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পিয়োতর ইলিচ্ তখনও তার সে কথা বিশ্বাস করতে চায়নি, কিন্তু মিতিয়াকে যখন সে এই বলে শাসাল যে আত্মহত্যা নিবারণ করার জন্য সে এখনই গিয়ে কাউকে না কাউকে এটা বলে দেবে, তার উত্তরে মিতিয়া দাঁত বার করে তাকে বলে 'সে সময় তুমি পাবে না।' দেখা যাচ্ছে, অপরাধীকে ধরতে হলে যাতে সে সত্যি সত্যি গুলি করে আত্মহত্যা করে না বসে তার আগেই তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে, মোক্রয়েতে গিয়ে পৌঁছুনো দরকার।

"এটা পরিষ্কার, এটা পরিষ্কার!" অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে প্রসিকিউটর আওড়ালেন। "এই হতচ্ছাড়াগুলোর হুবহু এরকমই গতি হয় কাল নিজেকে খুন করব, কিন্তু মারা যাবার আগে হুল্লোড়বাজি করবে।"

যে ভাবে সে দোকান থেকে মদ এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করেছিল তার বিবরণ প্রসিকিউটরকে কেবল আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলল।

"ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের মনে আছে সেই ছোকরার কথা যে ব্যবসাদার ওল্‌সুফিয়েভ্‌কে খুন করেছিল? দেড় হাজার রুবল লুট করে কিনা সঙ্গে সঙ্গে হেয়ার ড্রেসারের কাছে চলে গেল! সেখানে দিব্যি চুল কোঁকড়া করে কেশসজ্জা সারার

পর টাকাগুলো ভালো ভাবে লুকানোর কোন চেষ্টা পর্যন্ত না করে সে ছোকরাও প্রায় হাতে করেই টাকার গোছা নিয়ে ছুকরিদের কাছে গিয়েছিল।”

সে যাই হোক, ঘটনাস্থলে তদন্ত, খানাতল্লাশি এবং নিয়মমাফিক আরও যা যা করণীয় সে সব করতে গিয়ে সকলে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতে আটকে পড়ল। এতে বেশ সময় লেগে যাচ্ছিল, তাই তারা নিজেরা মোক্রয়েতে রওনা দেবার ঘণ্টা দুয়েক আগে মোক্রয়ের থানার ইনস্পেক্টর মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্ শ্মের্‌ৎসোভ্‌কে সেখানে পাঠিয়ে দিল। আগের দিন সকালেই সে মাইনে নিতে শহরে এসেছিল। তাকে এই নির্দেশ দেওয়া হল যে মোক্রয়েতে গিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ না আসা পর্যন্ত কোনো রকম বিপদসঙ্কেত না দিয়ে সে যেন ‘অপরাধীর’ ওপর কড়া নজর রাখে আর সেই সঙ্গে তল্লাশি চালানো বা গ্রেপ্তারের সময় স্থানীয় যে সমস্ত সাক্ষীসাবুদ এবং স্থানীয় চাষিদের থেকে বাছাই করে তৈরি যে পুলিশদল* ইত্যাদির উপস্থিতি দরকার সে যেন ইতিমধ্যে তারও ব্যবস্থা করে রাখে। মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ তাকে যেমন বলা হয়েছিল তা-ই করল নিজের পরিচয় সে প্রকাশ করল না, তবে ত্রিফন বরিসভিচ তার পুরনো পরিচিত বলে একমাত্র তাকেই—তাও আবার কেবল আংশিকভাবে—তার নিজের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করল। এটা ছিল ঠিক সেই সময়কার ঘটনা যখন মিতিয়ার খোঁজ করতে করতে অলিন্দের মুখে অন্ধকার গলিপথে সরাইওয়ালা তার দেখা পেয়ে যায় আর তখনই মিতিয়াও ত্রিফন বরিসভিচের চোখেমুখে এবং কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ করে। তাই না মিতিয়া না উপস্থিত আর কেউ জানতই না যে তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এদিকে পিস্তলের বাক্সটাও ত্রিফন বরিসভিচ অনেক আগে পাশের ঘর থেকে হাতিয়ে সকলের চোখের আড়ালে একটা নির্জন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। সকাল চারটের একটু পরে, যখন চারদিকে প্রায় ফরসা হতে শুরু করেছে, কেবল তখনই পুলিশ সুপার, প্রসিকিউটর আর তদন্তকারীকে নিয়ে তৈরি ওপরওয়ালাদের দলটি তিন ঘোড়ায় টানা দুটো গাড়িতে করে সেখানে এসে পৌঁছুল। ডাক্তারকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতেই থেকে যেতে হল, যেহেতু পরদিন সকালে তাকে নিহত ব্যক্তির দেহের ময়নাতদন্ত করতে হবে। তবে অসুস্থ ভৃত্য স্মের্দিকোভের অবস্থাটাই তার আগ্রহের প্রধান বিষয় ছিল।

তার সঙ্গীরা যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে উত্তেজিত হয়ে বলল, “আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে এরকম ঘন ঘন ও দীর্ঘ একটানা মূর্ছার প্রকোপ কদাচিৎ দেখা যায়। এটা বিজ্ঞানের একটা নতুন আবিষ্কার!” শুনে তারা এমন একটা জিনিসের সন্ধান

---

* খানাতল্লাশির সময় স্থানীয় সাক্ষীর প্রয়োজন হত। গ্রামে পুলিশবাহিনীর স্বল্পতার দরুন চাষি সম্প্রদায়ের কিছু লোককে তালিম দিয়ে ভাড়াটে রিজার্ভ পুলিশ হিসেবে মজুত রাখা হত। প্রয়োজনে তাদের ডেকে পাঠানো হত।

পাবার জন্য হাসতে হাসতে তাকে অভিনন্দন জানাল। এসব সত্ত্বেও প্রসিকিউটর ও তদন্তকারীর বেশ ভালোভাবে মনে আছে যে ডাক্তার চূড়ান্ত রায় দিয়ে সেই সঙ্গে এও যোগ করেছিল যে স্মের্দিকোভ্ সকাল পর্যন্ত বাঁচবে না।

আমার এই ব্যাখ্যাগুলি দীর্ঘ হলেও আমার মনে হয় এগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আমাদের কাহিনি যেখানে ছেড়ে এসেছিলাম এখন এও সব ব্যাখ্যার পর আমরা আবার ঠিক সেই জায়গাটাতে ফিরে এলাম।

## তিন

## আত্মার অগ্নিপরীক্ষা

### প্রথম পরীক্ষা

এইভাবে মিতিয়া বসে বসে বন্য দৃষ্টিতে উপস্থিত সকলকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তাকে কী বলা হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যে দু হাত ছুড়ে জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল

"আমার কোনো দোষ নেই। ওই রক্তের দরুন অপরাধ আমার নয়! আমার বাবার রক্তপাতের অপরাধে আমি অপরাধী নই! খুন করতে চেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি দোষী নই! আমি নই!"

কিন্তু সে চিৎকার করে এই কথা বলতে না বলতে পর্দার ওপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে সোজা পুলিশ সুপারের পায়ে লুটিয়ে পড়ল গ্রুশেন্‌কা।

"দোয আমার! আমার! এই হতভাগিনীর! আমিই দোষী!" উপস্থিত সকলের দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে অঝোরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুকফাটা আর্তনাদ করে সে বলে উঠল। "খুনের জন্য যদি কেউ দায়ী হয় সে আমি! আমি, আমিই ওকে কষ্ট দিয়ে ওর এই হাল করেছি। ওই যে বেচারি বুড়োটা মারা গেল, তাকেও আমি কষ্ট দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তার এই হাল করে ছেড়েছি, আক্রোশের বশে এই কাজ করেছি! দোষ আমার! প্রথম আর সব চাইতে বড়ো দোষ যদি কারও হয়ে থাকে সে আমার! আমিই দোষী!"

"হ্যাঁ দোষ তোমার! আসল অপরাধী যদি কেউ হয় সে তুমি! তুমি একটা উগ্রস্বভাবের একটা নষ্ট মেয়েমানুষ। তুমিই প্রধান অপরাধী!" মারমুখী হয়ে হাত তুলে গর্জন করে উঠলেন পুলিশ-সুপার। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্ত করা হল। প্রসিকিউটর তাকে চটপট দুহাতে চেপে ধরে সামলালেন।

"এটা কিন্তু একেবারে শৃঙ্খলার বাইরে হয়ে যাচ্ছে মিখাইল মাকারভিচ!" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। "আপনি তদন্তের কাজে দস্তুরমতো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন কাজ পণ্ড করছেন বলতে বলতে তিনি প্রায় হাঁপাতে লাগলেন।

"আইন মাফিক ব্যবস্থা নিতে হবে! আইন মাফিক ব্যবস্থা নিতে হবে! আইন

মাফিক হতে হবে, নিকলাই পার্ফেনভিচ্ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন। "নইলে কিন্তু কিছুই করা যাবে না! "

"বিচার করতে হয়, আমাদের দুজনকে একসঙ্গে বিচার করুন!" নতজানু অবস্থাতেই গ্রুশেন্কা ক্ষিপ্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলল। "আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে শাস্তি দিন। ওর সঙ্গে যদি আমারও চরম শাস্তি হয় তাও মাথা পেতে নিতে রাজি আছি!"

"গ্রুশা, প্রাণ আমার, আমার দেহের শোণিত, আমার সাধনার ধন!" বলতে বলতে গ্রুশেন্কার পাশে মিতিয়াও নতজানু হয়ে বসে পড়ল, দু হাতে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করল। "ওর কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না!" সে চেঁচিয়ে বলল। "ওর কোনও দোষ নেই, কোনো রক্তের জন্য বা কোনো কিছুর জন্যই ওর কোনও দোষ নেই!"

পরে মিতিয়া মনে করতে পেরেছিল যে তাকে তখন বেশ কয়েকজন মিলে জোর করে গ্রুশেন্কার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, হঠাৎ হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে তারা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার যখন হুঁশ ফিরল তখন দেখল সে টেবিলের ধারে বসে আছে। তার আশেপাশে আর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নম্বরটম্বর লেখা তকমাধারী লোকজন। টেবিলের ওপাশে তার মুখোমুখি বসে আছে বিচারবিভাগীয় তদন্তকারী নিকলাই পার্ফেনভিচ। টেবিলের ওপরে একটা গেলাসে জল রাখা আছে। নিকলাই পার্ফেনভিচ্ বারবার মিতিয়াকে গেলাস থেকে একটু জল খেয়ে নিতে বলছে।

"এতে আপনি চাঙা হয়ে উঠবেন, শান্ত বোধ করবেন। উদ্বেগের কোনও কারণ নেই", অত্যন্ত ভদ্রভাবে সে মিতিয়াকে বলছিল। মিতিয়ার মনে আছে হঠাৎ তাকে ভীষণভাবে কৌতূহলী করে তুলেছিল লোকটার আঙুলের দুটি বড়ো বড়ো আঙটি—একটাতে নীলা বসানো, অন্যটাতে উজ্জ্বল হলুদ রঙের কী যেন একটা পাথর—স্বচ্ছ, ভারি ঝলমলে। এমনকি, ওই ভয়ঙ্কর জেরার মুখেও সারাটা সময় ধরে ওই আঙটি দুটো যে তার দৃষ্টির এমন এক দুর্নিবার আকর্ষণস্থল হয়ে থাকল যে কেন কে জানে কিছুতেই সেখান থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছিল না এবং তার তখনকার পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী বস্তু হিসেবে সেগুলোকে কেন যে সে ভুলে থাকতে পারছিল না, এর পরও দীর্ঘকাল একথা মনে করে সে অবাক হয়ে যেত।

মিতিয়ার এক পাশে, বাঁ ধারে সন্ধ্যার প্রথম দিকে যেখানে মাক্সিমভ্ বসে ছিল, সেখানে এখন বসেছেন প্রসিকিউটর। আর মিতিয়ার ডান ধারে যেখানে তখন গ্রুশেন্কা বসে ছিল সে জায়গা দখল করে আছে এক যুবক। তার গাল দুটো গোলাপি, গায়ে শিকারিদের কোর্তা ধরনের বেশ পুরনো রংচটা একটা কোর্তা। তার সামনে আবার একটা কালির দোয়াত আর কাগজও রাখা আছে। দেখা গেল

এ লোকটা তদন্তকারীর সচিব। তদন্তকারী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। জেলা পুলিশের বড়ো কর্তা এখন ঘরের আরেক প্রান্তে জানলার ধারে, কালাগানভের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই জানলার ধারেই একটা চেয়ারে কালাগানভ্ও তার বসার জায়গা করে নিয়েছে।

"একটু জল খান", এই নিয়ে বেশ কয়েকবার হয়ে গেল তদন্তকারী মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করল।

"হয়েছে মশাই জল খাওয়া হয়ে গেছে। বেশ তো, এবারে আসুন মশাই আপনারা আমায় পিষে মারুন, যা শাস্তি দেবার দিন, আমার ভাগ্য স্থির করুন!" দু চোখ বিস্ফারিত করে ভয়াবহ রকমের স্থির দৃষ্টিতে তদন্তকারীর দিকে তাকিয়ে মিতিয়া বলে উঠল।

"তা হলে আপনি সুনিশ্চিতভাবে এটা সমর্থন করছেন যে আপনার বাবা ফিয়োদর পাভ্লভিচের মৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী?" তদন্তকারীর কণ্ঠস্বর কোমল হলেও সেখানে দৃঢ়তার কোনো অভাব ছিল না।

"আমি দোষী নই! দোষী যদি হয়ে থাকি সে আরেকজন বুড়ো মানুষের রক্তপাতের জন্য, আমার বাবার খুনের অপরাধে নই। সে জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি। খুন করেছি, সেই বুড়ো মানুষটাকে খুন করেছি আমি! ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলাম তাকে। কিন্তু আরেকটি খুন দিয়ে, যে ভয়ঙ্কর খুনের অপরাধ আমার নয়, তাই দিয়ে এই রক্তপাতের দায় স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। কী সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ মশাই! এ যে শিরে বজ্রাঘাত! কিন্তু তা হলে কে খুন করল বাবাকে? কে? আমি যদি না হই তা হলে আর কেই বা হতে পারে? আশ্চর্য, উদ্ভট, এ যে অসম্ভব!

"সেটাই তো কথা, কে খুন করতে পারে তাহলে " তদন্তকারী সবে বলতে শুরু করেছিল, এমন সময় ডেপুটি প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্—যাকে আমরা অবশ্য সংক্ষিপ্ততার খাতিরে প্রসিকিউটর বলেই উল্লেখ করব — তদন্তকারীর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করে মিতিয়াকে উদ্দেশ করে বললেন

"বুড়ো চাকর গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভের কথা ভেবে আপনি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছেন। জেনে রাখুন, সে বেঁচে আছে, তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওর সাক্ষ্য থেকে এবং এখন আপনার সাক্ষ্য থেকেও আপনি ওকে যে বেধড়ক প্রহার করেছিলেন বলে মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও কিন্তু সে নিঃসন্দেহে বেঁচে যাবে—অন্তত ডাক্তারের তো তাই অভিমত।"

"বেঁচে আছে? লোকটা তা হলে বেঁচে আছে!" বিস্ময়ে হাতে হাত চাপড়ে সে উল্লাসে ফেটে পড়ল। তার চোখে মুখে উচ্ছ্বাসের দীপ্তি খেলে গেল। "হে প্রভু, আমার মতো একজন পাপী ও দুর্বৃত্তের প্রার্থনা শুনে আমার জন্য এই যে পরমাশ্চর্যের ঘটনা তুমি ঘটালে এর জন্য আমি কী বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা

জানাব!   হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, আমার প্রার্থনার গুণেই তা হয়েছে। আমি সারারাত ধরে প্রার্থনা করেছিলাম!  " বলতে বলতে সে তিনবার নিজের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে প্রণাম করল। তার প্রায় শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম।

"তা এই গ্রিগোরির কাছ থেকেই কিন্তু আমরা আপনার ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে সাক্ষ্য পেয়েছি তা এই যে   প্রসিকিউটর তার কথা শেষ করতে পারলেন না, তার আগেই মিতিয়া হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

"এক মিনিট ভদ্রমহোদয়গণ, ঈশ্বরের দোহাই, এক মিনিট সময় দিন। আমি এক ছুটে গ্রুশেন্কার কাছে গিয়ে

"মাফ করবেন! এই মুহূর্তে সেটা কোনো মতে সম্ভব নয়!" নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ পর্যন্ত প্রায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, তিনিও এক লাফে জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুকে তকমা আঁটা লোকগুলি মিতিয়াকে চেপে ধরল। সে অবশ্য নিজে থেকেই আবার গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল।

"বড়ো আফশোশের কথা, ভদ্রমহোদয়রা! আমি শুধু এই একটি মুহূর্তের জন্য ওর কাছে যেতে চেয়েছিলাম   ওকে জানাতে চেয়েছিলাম যে সারা রাত ধরে যে রক্তের কথা ভেবে আমার বুকের ভেতরটা অমন তোলপাড় করছিল সে রক্ত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে, আমি এখন আর খুনি নই! একবার অনুমতি দিন আপনারা! হাজার হোক সে আমার বাগ্‌দত্তা!" একে একে উপস্থিত সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে সাড়ম্বরে, উচ্ছ্বসিত ভাবে সে বলে উঠল। "ওঃ ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই! ওঃ আপনারা নিমেষে আমার দেহে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন, আমার পুনরুজ্জীবন ঘটালেন!   ওই বুড়ো মানুষটি, আমাকে কোলে পিঠে করে নিয়ে বেড়াত। আমার তিন বছর বয়সে যখন সকলে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন আমাকে গামলায় স্নান করাত, আমার জন্মদাতা বাপের মতো ছিল!

"কথাটা হল এই যে আপনি   " তদন্তকারী সবে শুরু করেছিল। কিন্তু মিতিয়া টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, "মাফ করবেন ভদ্রমহোদয়রা, দয়া করে আরও একটি মিনিট সময় দিন। একটু ভাবতে দিন, একটু ভাবতে দিন, একটু নিশ্বাস ফেলতে দিন ভদ্রমহোদয়রা। সব দেখেশুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি, ভীষণ স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। মানুষ তো আর ঢাকের চামড়া নয়, মশাই!"

"আহা আরেকবার একটু জল খেলে পারতেন ..." নিকলাই পারফেনভিচ্ আমতা-আমতা করে বলল।

মিতিয়া মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে হেসে ফেলল। তার দৃষ্টি প্রফুল্ল। এক মুহূর্তে সে যেন আগাগোড়া পালটে গেছে। তার কথা বলার সুরও পুরোপুরি পালটে গেল। এখন বসে আছে এমন একটি মানুষ যে ইতিমধ্যে আবার হয়ে উঠেছে আগের

মতোই আর সকলের সমান, তার পূর্বপরিচিত সকলের সমান—ঠিক যেমনটি হতে পারত এই গতকালও, যখন এ সব কিছু ঘটেনি, তখন যদি ওরা সকলে সমাজের উঁচু মহলের কোথাও এসে মিলত। তবে প্রসঙ্গত এও বলে রাখি, আমাদের এলাকায় মিতিয়ার যখন প্রথম আগমন ঘটে তখন পুলিশের এই বড়কর্তাটি তাকে তাঁর বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনাই জানাতেন, কিন্তু পরে, বিশেষত গত এক মাস মিতিয়া তাঁর কাছে যাতায়াত করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল; আর মিতিয়া যেটা বেশ ভালোভাবে লক্ষ করেছে তা এই যে পুলিশ সুপারও এই যেমন রাস্তায় যদি তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত তাহলে ভীষণভাবে ভুরু কোঁচকাতেন। শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে যে নমস্কার জানাতেন সেটা নিছক ভদ্রতার খাতিরে। প্রসিকিউটরের সঙ্গে তার পরিচয়টা আরও দূরের। তবে তাঁর সহধর্মিণীর কাছে সে অনেক সময় যাতায়াত করত, তার সে সব সাক্ষাৎকারের মধ্যে মহিলার প্রতি তার পরম শ্রদ্ধার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকত। মহিলা ছিলেন স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত ও কল্পনাপ্রবণ। মিতিয়া কেন যে তাঁর কাছে যেত তা সে নিজেও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারত না। মহিলা সব সময় তাকে সাদরে গ্রহণ করতেন, একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত কেন যেন মিতিয়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। তদন্তকারীর সঙ্গে অবশ্য তেমন ভাবে আলাপ হয়ে ওঠেনি, যদিও তার সঙ্গে কথাও হয়েছিল—তা সে দু বারই স্ত্রী-জাতি প্রসঙ্গে।

“আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন অত্যন্ত কৌশলী তদন্তকারী, নিকলাই পার্‌ফেনভিচ”, উৎফুল্ল হয়ে হাসতে হাসতে মিতিয়া আচমকা বলে উঠল, “কিন্তু আমি এখন নিজেই আপনাকে সাহায্য করব। আর ভদ্রমহোদয়রা, আমি নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছি! ... আমি যে এমন সরাসরি, এত সহজ সরল ভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি তার জন্য কোনো অপরাধ নেবেন না। তা ছাড়া আমি সামান্য নেশাগ্রস্তও—এটা আমি আপনাদের অকপটে বলছি। আমার মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য   সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্—যত দূর মনে পড়ে, আমার আত্মীয় মিউসভের বাড়িতে।... না ভদ্রমহোদয়রা, না, আমি নিজেকে আপনাদের সমান বলে দাবি করছি না। আপনাদের সামনে এখন আমি কী পরিচয় নিয়ে বসে আছি, তা আমার বুঝতে বাকি নেই। আমার ওপরে এসে পড়েছে   যদি অবশ্য আমার বিরুদ্ধে গ্রিগোরি সাক্ষ্য দিয়ে থাকে   তা হলে বলব   এসে পড়েছে   ওঃ, অবশ্যই একটা ঘোর সন্দেহ ইতিমধ্যে এসে পড়েছে! কী সাঙ্ঘাতিক! এ যে কী সাঙ্ঘাতিক আমি বেশ বুঝি। কিন্তু কাজের কথায় আসা যাক, ভদ্রমহোদয়রা, আমি প্রস্তুত, কারণ শুনুন, ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা সবাই শুনুন। আমি যখন জানি আমি নির্দোষ, আমরা নিমেষের মধ্যে এর নিষ্পত্তি ঘটাব! ঠিক কি না? ঠিক বলছি আমি?”

মিতিয়া নার্ভাস হয়ে তড়বড় করে অনর্গল এমন ভাবে বলে যেতে লাগল যেন সে তার শ্রোতাদের চূড়ান্তভাবে তার প্রাণের বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে।

"তাহলে আমরা আপাতত লিখে নিচ্ছি যে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে আপনি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ অর্থপূর্ণভাবে এই কথা বলে তার সচিবের দিকে ফিরে অর্ধস্ফুট স্বরে তাকে বলে দিল কী লিখতে হবে।

"লিখে নিতে চান? আপনি এটা লিখে নিতে চান? তা বেশ তো, লিখে নিন। আমি রাজি, ভদ্রমহোদয়রা, এ বিষয়ে আমি আমার পূর্ণ সম্মতি দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, দেখুন দাঁড়ান দাঁড়ান, সবুর করুন। লিখতে হলে এই ভাবে লিখুন : 'উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য দোষী, বেচারি বুড়ো মানুষটিকে যে নিদীরুন প্রহার করেছিল তার জন্যও দোষী।' তবে হ্যাঁ তাছাড়াও মনে মনে, মনের গভীরে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করছি—কিন্তু এটা আর লেখার দরকার নেই", চট করে মুহুরির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, "এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা মশাই, ওই যে মনের গভীরের কথা বললাম না, সে নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। তবে বুড়ো বাপকে খুন করার অপরাধে আমি অপরাধী নই; এই চিন্তাটাই ভয়ঙ্কর! রীতিমতো ভয়ঙ্কর! আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেব এবং আপনিও সঙ্গে সঙ্গে না মেনে পারবেন না। ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা হাসবেন, আপনাদের এই সন্দেহের কথা চিন্তা করে আপনারা নিজেরাই তখন অট্টহাসি হাসবেন!..."

"শান্ত হোন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", মনে হল যেন উন্মত্তপ্রায় লোকটির উদ্বেগের উপশম ঘটানোর সদিচ্ছা নিয়েই তদন্তকারী তাকে মনে করিয়ে দিল। "আপনি যদি রাজি থাকেন একমাত্র তবেই, জেরা চালানোর আগে আপনার মুখ থেকে যে ঘটনার প্রমাণ শোনার ইচ্ছে আমার ছিল তা এই যে আপনি নাকি আপনার পরলোকগত পিতৃদেব ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে অপছন্দ করতেন এবং তার সঙ্গে কী নিয়ে যেন আপনার নাকি নিরন্তর ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকত। অন্তত এখানে, মনে হচ্ছে এই মিনিট পনেরো আগেও আপনি নিজমুখে উচ্চারণ করেছিলেন যে তাকে খুন পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। আপনি চিৎকার করে বলেছিলেন 'খুন করিনি, তবে খুন করতে চেয়েছিলাম!'"

"তাই বলেছিলাম বুঝি? ওঃ তা হতে পারে ভদ্রমহোদয়রা, হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যের কথা এই যে আমি তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম, বহু বার চেয়েছিলাম ... সেটা আমার দুর্ভাগ্য, আমার দুর্ভাগ্য!"

"চেয়েছিলেন বলছেন। আপনার জন্মদাতা ব্যক্তিটির প্রতি আপনার এই যে এত ঘৃণা তার পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ছিল খুলে বলতে রাজি আছেন কি আপনি?"

"খুলে বলাবলির আর কী আছে মশাই!" বিরস বদনে মাটির দিকে তাকিয়ে দু কাঁধ ঝাঁকাল মিতিয়া। "আমার মনের ভাব তো আমি লুকোইনি। শহরের সবাই একথা জানে—সরাইখানাতে কারও জানতে বাকি নেই। এই কিছুদিন আগে মঠে,

মহাস্থবির জোসিমার আশ্রম কুঠুরিতেও খোলাখুলি জানিয়েছি। সেই দিনই সন্ধ্যায় বাপকে ঠেঙিয়েছি, প্রায় মেরেই ফেলেছিলাম তাকে, দিব্যি গেলে বলেছিলাম আবারও আসব, সাক্ষী সাবুদ রেখে খুন করব। সাক্ষী, হাজার মানুষ সাক্ষী!—সারাটা মাস এই বলে চেঁচিয়েছি, সকলে সাক্ষী আছে! তথ্যের জন্য বেশিদূর যেতে হবে না। তথ্য কথা বলে, তথ্য চিৎকার চেঁচামেচি করে, কিন্তু মানুষের অনুভূতি, মানুষের অনুভূতি বলে একটা জিনিস আছে—সে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার মশাই। দেখুন মশাই বলতে বলতে মিতিয়া ভুরু কোঁচকাল " আমার মনে হয় অনুভূতি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। আপনারা যদিও দায়বদ্ধ এবং আমিও সেটা বুঝি, কিন্তু এটা আমার ব্যাপার, আমার ভেতরের, একান্তই আমার ব্যক্তিগত, তবু যেহেতু আমি এর আগেও আমার মনের ভাব গোপন করিনি... তা সরাইখানায় হোক আর যেখানেই হোক, সবাইকে বলেছি, প্রতিটি মানুষকে বলেছি, তাই তাই এখনও এটাকে গোপন রাখছি না। দেখুন, ভদ্রমহোদয়রা, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি সে ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে যে সব তথ্যপ্রমাণ যাচ্ছে তা ভয়ঙ্কর সকলকে বলে বেড়িয়েছিলাম তাকে খুন করব, তারপর হঠাৎই লোকটা খুন হয়ে গেল—সে ক্ষেত্রে আমি বৈ আর কে করতে পারে? হাঃ-হাঃ! ভদ্রমহোদয়রা, এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের আমি কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না, আপনাদের আমি সম্পূর্ণ মার্জনা করে দিচ্ছি। আমি নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছি, কেন না, সত্যিই তো আমি যদি না হই তো কে তাকে খুন করল? কে? ভদ্রমহোদয়রা!" হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি জানতে চাই, এমনকি, ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের কাছে আমার দাবি — বলুন আপনারা, কোথায় খুন হয়েছে? কী ভাবে খুন হয়েছে? কী দিয়ে কেমন করে তাকে খুন করা হয়েছে? আমায় বলুন।" প্রসিকিউটর ও তদন্তকারীর ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে সে দ্রুত প্রশ্ন করল।

"আমরা তাকে তার পড়ার ঘরে মাথা ভাঙা অবস্থায় মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি", প্রসিকিউটর বলল।

"কী ভয়ঙ্কর!" হঠাৎ শিউরে উঠে টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে ডান হাতে মুখ ঢাকল মিতিয়া।

"আমরা যেখানে থেমেছিলাম সেখান থেকে চালিয়ে যাব", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ বাধা দিয়ে বলল, "তাহলে বলুন, আপনার এই যে ঘৃণার অনুভূতি, এর পিছনে আপনার উদ্দেশ্য তা হলে কী ছিল? আমার যেন মনে হচ্ছে আপনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন সেটা ছিল আপনার ঈর্ষা?"

"তা হ্যাঁ, ঈর্ষা বটে, তবে শুধু ঈর্ষাই নয়।"

'টাকাকড়ির কারণে বিবাদ?"

"তা, টাকাকড়ির কারণেও বটে।"

"মনে হচ্ছে যেন বিবাদটা ছিল তিন হাজার রুবল নিয়ে, যা নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার বকেয়া পাওনা ছিল।"

"তিন কী! বেশি, অনেক বেশি!" মিতিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল। "ছয়েরও বেশি, এমনকি দশেরও বেশি হতে পারে। আমি সব্বাইকে বলেছি, রাখঢাক না করে গলা চড়িয়েই সবাইকে বলেছি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি মনস্থির করে ফেলি, ভাবলাম যাক গে, তিন হাজারেই মিটমাট করে ফেলি। ওই তিন হাজার আমার ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছিল তাই তিন হাজারের নোটের যে বান্ডিলটা গ্রুশেন্‌কার জন্য তৈরি করে তার বালিশের তলায় রাখা থাকে বলে আমি জানতাম সেটা আমি চূড়ান্তভাবে আমার কাছ থেকে চুরি করা টাকা বলেই আমি ধরে নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়রা, ওই টাকা, আমার বিবেচনায়, অমনিতেই আমার নিজের টাকা, আমার নিজের সম্পত্তি ছিল।

প্রসিকিউটর তদন্তকারীর সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন এবং এই ফাঁকে অলক্ষিতে চোখ টিপে তাকে ইশারাও করলেন।

"এই প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসছি", তদন্তকারী তৎক্ষণাৎ বলে উঠল। "ওই যে আপনি বললেন না খামের ভেতরকার ওই টাকাগুলোকে আপনি আপনার নিজের টাকা বলে, নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেছিলেন, আপনার অনুমতি হলে ঠিক এই ছোট্ট বিষয়টাকেই এখন একটু খেয়াল করে লিখে নিই—কী বলেন?"

"লিখুন মশাই, লিখুন। এটা যে আমার বিরুদ্ধে আরও একটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তবে ওসব তথ্যপ্রমাণে আমি ভয় পাই না, আমি নিজেই তো নিজের বিরুদ্ধে বলছি। শুনছেন, নিজে বলছি! দেখুন, ভদ্রমহোদয়রা, আমার মনে হয় আমি আসলে যা আপনারা আমাকে তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের লোক বলে মনে করছেন", হঠাৎ মনমরা হয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে সে যোগ করল। "খেয়াল রাখবেন, আপনাদের সঙ্গে যে লোকটা কথা বলছে সে একজন বড়ো মনের মানুষ, অত্যন্ত মহানুভব এক ব্যক্তি—সর্বোপরি এটাও অবশ্য খেয়াল রাখবেন—এমন একজন মানুষ যার অকাজ কুকাজের কোনও তল নেই; কিন্তু তারই মধ্যেও সে সব সময় ভেতরে ভেতরে, তার অন্তরের অন্তস্থলে সুমহান এক সত্তাকে পোষণ করে এসেছে এবং এখনও করছে। এক কথায়, জানি নে কী ভাবে প্রকাশ করব।... আর ঠিক এটাই আমাকে সারা জীবন কষ্ট দিয়ে আসছে যে মহৎ হওয়ার একটা তীব্র বাসনা আমার ছিল, বলতে গেলে মহত্ত্ববোধের দরুন আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, আমি লণ্ঠনের আলোয় তার সন্ধান করে বেড়িয়েছি, দিয়োজেনেসের লণ্ঠনের আলোয়* তাকে খুঁজে মরেছি, অথচ সারাটা জীবন করার মধ্যে কেবল

---

* গ্রিক দার্শনিক দিয়োজেনেস্ (খ্রি.পূ ৪১২-৩২৩)। কথিত আছে, এক সময় তাঁকে দিনে দুপুরে আথেনাইয়ের রাস্তায় রাস্তায় লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি কিসের সন্ধান করছেন, উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন. একজন সৎ, মানুষের সন্ধান করছি।'

নোংরামিই করেছি—ভদ্রমহোদয়রা, আমরা সবাই যেমন করে থাকি আর কি অর্থাৎ কিনা  না, না ভুল হয়ে গেছে আমার, আমরা সকলে নই, কেবল আমি, একা এই আমি!  ভদ্রমহোদয়রা, আমার মাথা ব্যথা করছে...'' যন্ত্রণায় সে চোখমুখ কোঁচকাল। ''দেখুন, ভদ্রমহোদয়রা, আমার ভালো লাগত না ওর চেহারাটা, ওর কেমন যেন ইতর ধরনধারণ, হামবড়া ভাব, যা কিছু পবিত্র তাকেই পায়ে মাড়ানোর ইচ্ছে, ঠাট্টা বিদ্রূপ, অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধার ভাব। কদর্য, অতি কদর্য! কিন্তু এখন যেহেতু সে মৃত তাই অন্য রকম ভাবছি।''

''অন্যরকম মানে?''

''অন্যরকম নয়, তবে আমার এই ভেবে আক্ষেপ হচ্ছে যে তাকে ঘৃণা করতাম।''

''অনুশোচনা হচ্ছে বলুন।''

''না, অনুশোচনা ঠিক বলব না, ওটা কিন্তু আপনাদের বয়ানে লিখবেন না। আমি নিজে তো আর ভালো কিছু নই, ভদ্রমহোদয়রা, দেখতে শুনতেও আহামরি সুন্দর কিছু নই, তাই তাকে ন্যক্কারজনক ভাবার কোনো অধিকার আমার ছিল না—এই হল কথা! এটা লিখলে লিখতে পারেন।''

একথা বলার পর মিতিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ হয়ে গেল তদন্তকারীর প্রশ্নের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তরোত্তর আরও বেশি করে মনমরা হয়ে পড়ছিল। ঠিক সেই সময়, সেই মুহূর্তে আবারও ঘটে গেল আরেকটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। ঘটনা এই যে গ্রুশেন্‌কাকে ইতিমধ্যে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু সরিয়ে নিয়ে তাকে খুব একটা দূরে রাখা হয় নি—রাখা হয়েছিল যেখানে এখন জেরা চলছিল সেই নীল ঘরটা থেকে মাত্র একটা ঘর পরে আরেকটি ঘরে। সেটা ছিল একটা ছোট্ট ঘর, যার একটাই জানলা। এ ঘরটা আবার সেই বড়ো ঘরটার পরে যেখানে রাতের বেলায় ভুরিভোজ আর নাচগানের আসর বসেছিল। ঘরে বসে ছিল গ্রুশেন্‌কা, তার সঙ্গে আপাতত মাত্র আরেকজন—একা মাক্সিমভ্। ভয়ানক হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল গ্রুশেন্‌কার কাছাকাছি থাকলে তার উদ্ধারের আশা আছে বলে সে মনে করেছে। ওদের ঘরের দরজার কাছে বুকে চাপরাশ আঁটা চাষাভুসো গোছের কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রুশেন্‌কা কাঁদছিল। শেষকালে দুঃখ যখন বড়ো বেশি পরিমাণে বুকে চেপে বসল তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না, ঝট করে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল, দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়ে গলা ছেড়ে 'হায় হায়' করে বিলাপ করতে করতে এক ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, সোজা গিয়ে উপস্থিত হল তার কাছে, তার মিতিয়ার কাছে। ঘটনাটা এতই আকস্মিক ছিল যে তাকে থামানোর সময় পর্যন্ত কেউ পেল না। এদিকে তার আর্ত চিৎকার কানে যেতে মিতিয়াও এমনই চমকে উঠল যে সেও তৎক্ষণাৎ এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে

দিশেহারা হয়ে তিরবেগে ছুটল মুখোমুখি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু এবারেও ওদের দুজনকে মিলতে দেওয়া হল না, যদিও ওরা দুজনে ততক্ষণে দুজনকে দেখতে পেয়েছিল। মিতিয়ার দুহাত ওরা শক্ত করে চেপে ধরল। সে ছটফট করতে লাগল, ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। তাকে সামলানোর জন্য তিন চারজন লোকের দরকার হয়ে পড়ল। গ্রুশেন্‌কাকেও ওরা ধরে ফেলল। মিতিয়া দেখতে পেল তাকে যখন ওরা টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও সে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে দু হাত তার দিকে প্রসারিত করে আছে। এ দৃশ্যের পরিসমাপ্তিতে যখন তার হুঁশ ফিরে এলো তখন সে দেখতে পেল সে আবার তার আগের জায়গায়, টেবিলের সেই ধারটিতে, তদন্তকারীর মুখোমুখি বসে আছে।

মিতিয়া এবারে আকুল কণ্ঠে ওদের সকলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওকে নিয়ে আপনারা পড়েছেন কেন? কেন ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন? ওর কোনও দোষ নেই, কোনও দোষ নেই!

প্রসিকিউটর ও তদন্তকারী তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। এই ভাবে কিছুক্ষণ সময়—তা প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল। শেষ কালে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন মিখাইল মাকারভিচ। এতক্ষণ তিনি এখানে ছিল না। ঘরে ঢুকে তিনি উত্তেজিত হয়ে চড়া গলায় প্রসিকিউটরকে বললেন

"ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নিচে আছে। ভদ্রমহোদয়রা, এই হতভাগ্য লোকটিকে আমি কেবল একটি মাত্র কথা বলতে চাই—আপনারা অনুমতি দেবেন কি? আপনাদের উপস্থিতিতে বলব ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের উপস্থিতিতেই বলব!"

"বিলক্ষণ, মিখাইল মাকারভিচ", তদন্তকারী জবাব দিল। "এক্ষেত্রে আমাদের অমত করার কিছু নেই।"

"শোন বাবা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", তাঁর উত্তেজিত চোখমুখের সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠল একজন হতভাগ্য মানুষের প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ এক ধরনের অপত্যস্নেহসুলভ্ উষ্ণ আবেগ যখন মিতিয়ার উদ্দেশে তিনি বলতে শুরু করলেন, "তোমার আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে আমি নিজে নিচে সরিয়ে নিয়ে গেছি, সেখানে মালিকের মেয়েদের হাতে ওর দেখভালের ভার তুলে দিয়েছি, এখন এখানে ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী ওই বুড়ো মাক্সিমভ্। আমি তোমার ওকে অনেক করে বুঝিয়েছি—শুনছ? বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করেছি। আমি ওকে এই বলে বুঝিয়েছি যে তোমাকে তোমার নিজের সততা প্রমাণ করতে হবে, তাই ও যেন সেখানে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, তোমার মনটা খারাপ করে না দেয়, তখন হয়তো তুমি থতমত খেয়ে গিয়ে এমন উলটো পালটা কথা বলে বসলে যা তোমার নিজের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। বুঝলে তো? তা মোদ্দা কথা হল এই যে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, ও আমার কথা বুঝেছে। মেয়েটি ভাই ভারি বুদ্ধিমতী। ওর মনটা ভালো। আমার এই বুড়ো হাতে চুমু খায় আর কি! তোমার জন্য বারবার অনুনয় বিনয়

করতে লাগল। নিজে থেকে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিল যাতে এসে তোমাকে বলি তুমি যেন ওর জন্য কোনও চিন্তা কোরো না, এছাড়াও বাপু হে, আমাকে আবার ওর কাছে ফিরে যেতে হবে, গিয়ে বলে আসতে হবে তুমি ঠিক আছ এবং ওর ব্যাপারে তুমি এখন নিশ্চিন্ত। তাই বলছিলাম কি শান্ত হও, তুমি নিজে এটা বোঝার চেষ্টা কর। আমি ওর কাছে অপরাধী। ওর মনটা একটা খ্রিষ্টবিশ্বাসী মানুষের মন, হ্যাঁ ভদ্রমহোদয়রা, তাই। আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি, ভারি বিনম্র মন এই মেয়েটির। ওর কোনও দোষ নেই। তাহলে, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, ওকে গিয়ে কী বলব বল? শান্ত হয়ে বসে থাকবে তো, না কি?''

ভালোমানুষ পুলিশ কর্তাটি অনেক বাড়তি কথা বললেন বটে, কিন্তু গ্রুশেন্‌কার দুঃখ, একজন মানুষের দুঃখ তার দরদি মনটাকে এমনই স্পর্শ করেছিল যে তাঁর চোখের কোনায় জল দেখা দিল। মিতিয়া লাফিয়ে উঠে তাঁর কাছে ছুটে গেল।

''আপনারা আমাকে মাফ করবেন মশাই। বলুন, বলুন, আজ্ঞা করুন!'' সে চেঁচিয়ে উঠল। ''আপনি দেবতুল্য লোক মিখাইল মাকারভিচ, দেবতার মতো মন আপনার! আপনি যে ওর কথা ভেবেছেন সেজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি সুস্থির হব, সুস্থির হয়ে থাকব। আমি মনমেজাজ প্রফুল্ল রাখব। অশেষ দয়াপরবশ আপনার মন, সেই দয়া থেকে আপনি ওকে জানিয়ে দিন আমার মন মেজাজ প্রফুল্ল আছে আমি ভালো মেজাজে আছি, এমনকি আমার মুখে এখনই হাসি ফুটতে শুরু করবে, যখন জানতে পেরেছি যে আপনার মতো একজন রক্ষাকর্তা দেবদূত ওর আছে। এখুনি সব কাজ সারব, যে-ই কাজ থেকে ছাড়া পাব অমনি ওর কাছে যাব, ও নিজের চোখেই দেখতে পাবে, সবুর করুক! ভদ্রমহোদয়রা...'' এই বলে হঠাৎ প্রসিকিউটর ও তদন্তকারী—দুজনের দিকে ফিরেই সে বলল, ''এবারে আপনাদের সামনে আমার মনের সব কথা খুলে বলব, আমার মন উজাড় করে ঢেলে দেব। আমরা আমাদের কাজটা এক নিমেষে চুকিয়ে দেব, খুশি মনে চুকিয়ে ফেলব। শেষকালে আমরা এই নিয়ে হাসবও—তাই না? কী বললেন? কিন্তু ভদ্রমহোদয়রা ওই স্ত্রীলোকটি আমার প্রাণেশ্বরী! আহা, এই কথাটা আমায় বলতে দিন। এটাই আমি এখন আপনাদের কাছে প্রকাশ করব। আমি দেখতে পাচ্ছি আমি যাদের সঙ্গে আছি তারা সব অতি সজ্জন ব্যক্তি, তাই বলছি, ও আমার জগতের আলো, আমার সাধনার ধন—শুধু যদি আপনারা জানতেন! আপনারা শুনেছিলেন ও কেমন চিৎকার করে বলেছিল 'তোমার সঙ্গে থাকলে যদি চরম দণ্ড পেতে হয় তাও সই!' কিন্তু আমি একটা ন্যাংটো ভিখিরি—কী আমি দিয়েছি ওকে? কেন আমার জন্য ওর এই ভালোবাসা? আমার মতো একটা কদর্য, ঘৃণ্য, নগণ্য কীট আর তার কদর্য মুখটার মধ্যে কী এমন আছে? আমি কি ওর এমন ভালোবাসার যোগ্য যার জন্য ওকে আমার সঙ্গে ঘানি টানতে যেতে হবে? ওর মতো একটা দেমাকি মেয়ে এই কিছুক্ষণ আগে কি না আমারই জন্য আপনার পায়ে

ধরেছিল! ওর কোনও দোষ নেই! বলুন তো, আমি তাকে মাথায় করে রাখব না, তার কথা ভেবে বিলাপ করব না, তার কাছে ছুটে যাব না—এটা কী করে হয়? এখন যদি না হয় তো কবে হবে? ভদ্রমহোদয়রা, আমায় ক্ষমা করবেন! কিন্তু এখন, এখন আমি শান্তি পাচ্ছি!"

বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারের ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু এটা ছিল আনন্দাশ্রু। মুহূর্তের মধ্যে সে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। বৃদ্ধ পুলিশ সুপার এই প্রতিক্রিয়া রীতিমতো সন্তুষ্ট, মনে হয় উপস্থিত দুই আইনজীবীও তারা অনুভব করল জেরা এখন একটা নতুন স্তরে উপনীত হবে। পুলিশ বিদায় হওয়ার পর মিতিয়াকে দস্তুরমতো হাসিখুশি দেখাল।

"তাহলে ভদ্রমহোদয়রা, এবারে আমি আপনাদের জিম্মায়, পুরোপুরি আপনাদের জিম্মায়। এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলো যদি না থাকত তাহলে এতক্ষণে আমরা একটা সমঝোতায় আসতে পারতাম। কিন্তু আমাকে আবারও ছোটখাটো বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। ভদ্রমহোদয়রা, আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন ঠিকই, কিন্তু আমি হলফ করে বলছি এখানে একটা পারস্পরিক আস্থা থাকা দরকার—আমার প্রতি আপনাদের এবং আপনাদের প্রতি আমার—তা নইলে কখনই আমরা সুরাহা করতে পারব না। এটা আপনাদের স্বার্থেই বলছি। কাজের কাজ করা চাই ভদ্রমহোদয়রা, কাজের কাজ আর বড়ো কথা, আমার মনের ভেতরটা অমন হাতড়াতে যাবেন না, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমায় মনোকষ্ট দেবেন না, শুধু তথ্য সম্পর্কে জিগ্‌গেস করুন, কাজের কথা যা জানতে চান বলুন—আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সন্তুষ্ট করব। চুলোয় যাক যত তুচ্ছ বিষয়!"

একথাই বলল মিতিয়া। নতুন করে জেরা শুরু হল।

## চার

## দ্বিতীয় পরীক্ষা

নিকলাই পার্‌ফেনভিচের চেহারার মধ্যে একটা সজীব ভাব ফুটে উঠেছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সন্তুষ্ট। চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও মিনিট খানেক হল সে চোখ থেকে চশমা খুলে রেখেছে, তার হাল্‌কা ধূসর রঙের বড়ো বড়ো, ঠিকরে পড়া দুচোখের দৃষ্টিতে আলোর ঝিলিক।

"আপনি আমাদের যে কী পরিমাণে উৎসাহিত করে তুললেন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, তা আপনি ভাবতে পারবেন না," এই বলে সে শুরু করল, "পারস্পরিক আস্থাস্থাপন সম্পর্কে আপনি এখন যে মন্তব্য করলেন তা যথাযথ। এমনকি এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অনেক সময় এটা না থাকলে এগোনই সম্ভব নয়—সেই ক্ষেত্রে এবং সেই অর্থে যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের

আশা রাখে, তা করার সদিচ্ছা তার থাকে, আর করার মতো অবস্থাও তার থাকে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে পারি আমাদের ওপর যা যা নির্ভর করছে সে সবই আমরা কাজে লাগাব। কেসটা আমরা কী ভাবে চালাচ্ছি সে আপনি এখন নিজেও দেখতে পারেন।'' এরপর হঠাৎ প্রসিকিউটরের দিকে ফিরে সে জিগ্‌গেস করল, ''আপনি অনুমোদন করছেন তো ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্?''

''অবশ্যই, তা আর বলতে!'' প্রসিকিউটর অনুমোদন করলেন, যদিও নিকলাই পার্‌ফেনভিচের উচ্ছ্বাসের তুলনায় তার সুর কতকটা রসকষহীন শোনাল।

এই অঞ্চলে নবাগত নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ আমাদের সংস্পর্শে আসার একেবারে শুরু থেকেই আমাদের প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্‌কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে এবং তাঁর সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে পড়ে। বলতে গেলে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি, 'চাকুরিক্ষেত্রে অবহেলিত' আমাদের ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের মনস্তত্ত্ব ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের অসাধারণ প্রতিভায় যার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি যে সত্যি সত্যি অবহেলিত তা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করত। তাঁর কথা সে পেতের্বুর্গে থাকতেও শুনেছিল। অন্য দিকে ছেলেমানুষ নিকলাই পার্‌ফেনভিচও আমাদের 'অবহেলিত' প্রসিকিউটরের কাছে হয়ে ওঠে পৃথিবীতে একমাত্র মানুষ যাকে তিনি সত্যি সত্যি ভালোবাসতেন। তাদের সামনে যে মামলাটি আসছে মোক্রয়েতে আসার পথে তাই নিয়ে তারা নিজেদের যুক্তি পরামর্শ করে মোটামুটি একটা সমঝোতায় আসার অবকাশ পেয়েছিল। এখন টেবিলে বসার পর তীক্ষ্ণধী নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ তার উর্ধ্বতন সহকর্মীটির মুখের কথা পড়তে না পড়তে, তার চাউনি আর চোখ টেপা থেকে তার প্রতিটি নির্দেশ ও প্রতিটি মুখভঙ্গির অন্তর্নিহিত অর্থ সে বুঝতে পারছিল।

'ভদ্রমহোদয়রা, শুধু একটা কথা : আমাকে আমার কথা বলতে দিন, ছোটখাটো প্রশ্ন তুলে মাঝখান থেকে বাধা দেবেন না, আমি সঙ্গে সঙ্গে সব খুলে বলব।'' উত্তেজনায় টগবগ করছিল মিতিয়া।

''চমৎকার! আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার বৃত্তান্ত আমরা শুনব, কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আপনি যদি শুধু একটা ছোটখাটো তথ্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন, যেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলজনক, তাহলে আমরা বাধিত হব। প্রশ্নটা ওই দশ রুবল প্রসঙ্গে, যে দশ রুবল আপনি গতকাল পাঁচটা নাগাদ আপনার বন্ধুস্থানীয় পিয়োতর ইলিচ পের্‌খোতিনের কাছে আপনার পিস্তলজোড়া বন্ধক রেখে তার বিনিময়ে ধার নিয়েছিলেন।''

''হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ, বন্ধক রেখেছিলাম, দশ রুবলের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলাম। এরপর আর কী জিজ্ঞাস্য আছে? এ বিষয়ে যা বলার আছে সবই তো বললাম। যাত্রা শেষে শহরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওগুলো বন্ধক রাখি।''

''ও, আপনি যাত্রা শেষে ফিরে এসেছিলেন বলছেন? মানে আপনি শহরের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?''

"গিয়েছিলাম মশাই, চোদ্দ ক্রোশ মতন দূরে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। আপনারা কি সেটা জানতেন না মশাই?"

প্রসিকিউটর ও নিকলাই পার্‌ফেনভিচ পরস্পর মুখ চাওয়া চাউয়ি করল।

"মোদ্দা কথাটা হল, গতকাল একেবারে সকাল থেকে শুরু করে আপনি যা যা করেছেন তার একটা সুসম্বদ্ধ বিবরণ দিয়ে আপনার উপাখ্যানটা শুরু করলে হত না? এই ধরুন, না কেন, যদি অনুমতি করেন, তাহলে জানতে চাই আপনি শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন? ঠিক কখন যান, কখনই বা ফিরে আসেন... এই সব তথ্য আর কি

"আরে, একেবারে গোড়া থেকে এ প্রশ্ন করলেই তো হত!" বলতে বলতে জোরে হেসে উঠল মিতিয়া। "তাছাড়া যদি চান তাহলে বলব শুরু করতে হয় গতকাল থেকে নয়, গত পরশু থেকে, পরশু দিনের সেই সকাল থেকে—তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কোথায়, কী ভাবে, কেন আমি গিয়েছিলাম—তা সে পায়ে হেঁটে বলুন আর গাড়িতে চেপেই বলুন। তা মশাই, পরশু দিন সকালে আমি স্থানীয় ব্যবসায়ী সাম্‌সোনভের কাছে গিয়েছিলাম অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এক জামিনের বিনিময়ে তিন হাজার রুবল ধার করতে। টাকাটার হঠাৎ বড়ো দরকার হয়ে পড়েছিল মশাই, বড়োই দরকার হয়ে পড়েছিল হঠাৎ

"আপনাকে কথার মাঝখানে বাধা দিচ্ছি বলে মাফ করবেন " ভদ্রভাবে তাকে বাধা দিয়ে বলল প্রসিকিউটর। "হঠাৎ কী এমন দরকার আপনার পড়ে গেল, আর ঠিক ওই পরিমাণ টাকা, অর্থাৎ কিনা তিন হাজার রুবলই বা কেন?"

"ওঃ ভদ্রমহোদয়রা, কী ভাবে, কখন, কেন, কী কারণে ঠিক এতটা কেন, অতটাই বা নয় কেন—এই সব হ্যানা ত্যানা তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে যাবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। আরে, এই করে সাত কাণ্ড লিখেও তো কূল পাওয়া যাবে না, এর পর আবার উপসংহারও চেয়ে বসবেন!"

মিতিয়া ভালো মনেই বলল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার কথাগুলির মধ্যে ফুটে উঠল অসহিষ্ণু অথচ অন্তরঙ্গ এমন একজন মানুষের সুর যে পরিপূর্ণ সত্য প্রকাশের জন্য ব্যাকুল এবং যার সঙ্কল্প অত্যন্ত সাধু।

হঠাৎ যেন তার টনক নড়ল, এইভাবে সে বলতে শুরু করল, "ভদ্রমহোদয়রা, আমার ছটফটানির জন্য আপনারা আমার ওপর বিরক্ত হবেন না। আবারও আপনাদের অনুরোধ করছি আবারও বলছি, বিশ্বাস করুন, আপনাদের ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে এবং প্রকৃত অবস্থাটা আমি ঠিকই অনুধাবন করতে পারছি। ভাববেন না যে আমি মাতাল। আমার নেশা এতক্ষণে কেটে গেছে। তা ছাড়া মাতাল হলেও আদৌ কোনও বাধা হত না। আমার ব্যাপারটা হল ওই যে কথায় বলে না

নেশা গেলে বোধোদয়, কিন্তু তাহা বোকা,
মদে চুর—তাহা বোকা, হল বোধোদয়।

হাঃ-হাঃ! সে যা-ই হোক, ভদ্রমহোদয়রা, আমি দেখতে পাচ্ছি আপাতত, অর্থাৎ কিনা যতক্ষণ না আমরা একটা বোঝাপড়ায় আসছি, ততক্ষণ আপনাদের সামনে রসিকতা করাটা আমার পক্ষে শিষ্টাচারসম্মত হবে না। আপনাদের অনুজ্ঞাক্রমে আমাকে আমার আত্মসম্মান বজায় রাখতে হয়। আমার এই এখনকার অবস্থার পার্থক্যটা আমি বুঝতে পারছি যে আমি এখন আপনাদের সামনে বসে আছি হাজার হোক সে একজন অপরাধী, অর্থাৎ আপনাদের সমকক্ষ হওয়া তার পক্ষে দূরস্থান। আপনারা আবার আমার ওপর নজরদারি করার ভারও নিয়ে এসেছেন। গ্রিগোরির অবস্থা বিবেচনা করে আপনারা তো আর 'বাবা-বাছা' বলে আমার মাথায় হাত বুলোবেন না! একজন বুড়ো মানুষের মাথা ফাটিয়ে দেবার পর বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যাব তা তো আর হয় না! ওর জন্য বিচারে আমাকে সাজা দিয়ে কোনও গোপন জায়গায় তো পাঠিয়ে দেবেনই, পাঠাবেন শোধরানোর জন্য কোনো হোম-এ—হয়তো ছয় মাসের, হয়তো বা এক বছরের মেয়াদে—জানি না, আপনাদের বিচারে কেমন সাজা হবে, তবে সেক্ষেত্রে আমার অধিকারগুলো অন্তত কেড়ে নেওয়া হবে না—তাই নয় কি? কী বলেন, উকিল মশাই? তাই বলছিলাম কি ভদ্রমহোদয়রা, এই তফাতটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাদের এটাও মানতে হবে যে কোথায়, কী ভাবে, কখন এবং কীসের ওপর পা ফেলেছিলাম এমন ধারা সমস্ত প্রশ্ন করে তো আপনারা স্বয়ং ভগবানেরও মাথা গুলিয়ে দিতে পারেন। এরকম করলে তো আমার মাথা গুলিয়ে যাবে আর আপনারাও সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিটি কথায় দোষ ধরবেন এবং তা-ই নোট করে নেবেন। তাহলে কী দাঁড়াবে? কিছুই দাঁড়াবে না! তাই অবশেষে বলি, আমি যদি এখন মিথ্যে কথাই বলতে শুরু করে থাকি তাহলে আমাকে আগে শেষ করতে দিন, আর ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা যত উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য লোক না হয় আমাকে এর জন্য ক্ষমাই করলেন! পরিশেষে, আপনাদের কাছে আমার মাত্র একটিই প্রার্থনা ভদ্রমহোদয়রা আমি বলি কি, জেরা করার এই গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক অভ্যাসটা ছাড়ুন। অর্থাৎ কিনা, প্রথমেই কথা হল কী ভাবে শয্যাত্যাগ করলাম, কী খেলাম, কী ভাবে থুতু ফেললাম, এমনি সব অতি সামান্য, তুচ্ছ জিনিস দিয়ে শুরু করা, তাই দিয়ে 'অপরাধীর মনোযোগকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে' দুম করে 'কাকে খুন করেছ? কার ওপর লুঠতরাজ করেছ'—এই পিলে চমকানো প্রশ্ন করে তাকে ধরে ফেলা। হাঃ-হাঃ! এটাই আপনাদের গত বাঁধা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি, এটাই আপনাদের নিয়ম। আপনাদের যত চালাকি সে তো এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছে! আরে ওরকম চালাকি খাটিয়ে আপনারা ওই চাষাভুসো লোকগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পারেন, আমাকে নয়। ও কায়দা আমার জানা আছে, আমি নিজেও চাকরি বাকরি করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনারা

রাগ করবেন না মশাই, কেমন? ধৃষ্টতা মাফ করছেন তো?" প্রায় তাক লাগিয়ে দেবার মতো এক ধরনের ভালোমানুষি দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল। "যেহেতু মিতিয়া কারামাজভ্ বলল সেই হেতু ক্ষমা করলেও করা যেতে পারে। একজন বুদ্ধিমান লোককে ক্ষমা করা যায় না, কিন্তু মিতিয়াকে করা যায়! হাঃ-হাঃ!"

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ শুনছিল, শুনে সেও হাসল। প্রসিকিউটর যদিও হাসলেন না, কিন্তু মিতিয়াকে কিছুতেই চোখের আড়াল হতে না দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এমন ভাবে নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার মুখের এতটুকু কথা, তার সামান্যতম ভাবভঙ্গি, মুখের সামান্যতম রেখার এতটুকু আন্দোলন—কোনোটাই ফসকানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর নেই।

"আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই এই ভাবে শুরু করেছি আপনার সঙ্গে", উত্তরে তখনও সেইরকমই হাসতে হাসতে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ বলল। "সকালে কী ভাবে বিছানা ছেড়ে উঠেছিলেন, কী খেয়েছিলেন—এই সব প্রশ্ন করে আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিনি। বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়েই শুরু করেছি।"

"বুঝতে পারছি, বুঝেছি এবং এর মর্মও উপলব্ধি করতে পেরেছি। আরও বেশি করে উপলব্ধি করছি আমার সঙ্গে আপনার এই সদয় ব্যবহার, যার কোনও তুলনা হয় না, যা আপনার মতো একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরই শোভা পায়। আমরা যে তিনজন মানুষ এখানে এসে মিলেছি তারা সকলেই সদ্বংশজাত, তাই আমাদের মধ্যে যা হওয়ার সে সবও হোক পারস্পরিক আস্থার সেই ভিত্তিতে যা বংশগৌরব ও সম্মানের এক সাধারণ সূত্রে গাঁথা মানুষদের মধ্যে হয়ে থাকে। সে যাই হোক, আমার জীবনের এই মুহূর্তে, যখন আমার মান সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে সেই মুহূর্তটিতে আপনারা অনুমতি দিলে আমি আপনাদের আমার সবচাইতে ভালো বন্ধু বলে গণ্য করতে পারি! ভদ্রমহোদয়রা, এতে আপনারা অপমানিত বোধ করবেন না তো? কী বলেন?"

"আদৌ নয়। ভারী চমৎকার ভাবে আপনি এসব প্রকাশ করলেন, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", গুরুগম্ভীর ভাবে, অনুমোদনের সুরে বলল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্।

"আর দূর হোক মশাই, যত সব তুচ্ছ খুঁটিনাটির ঘোরপ্যাচ", সোল্লাসে বলে উঠল মিতিয়া। "ওতে যে কী দাঁড়াবে ছাই কে জানে?' ঠিক বলিনি?"

"আপনার বিচক্ষণ পরামর্শ আমি পুরোপুরি মেনে চলব", মিতিয়াকে উদ্দেশ করে হঠাৎ মাঝখান থেকে প্রসিকিউটর বলে উঠলেন, "কিন্তু তাই বলে আমার যা প্রশ্ন তা করতেও ছাড়ব না। আমাদের কাছে যেটা জানা অবশ্যই বড়ো বেশি জরুরি তা এই যে ঠিক কী কারণে ওই পরিমাণ টাকা, অর্থাৎ কিনা ওই তিন হাজারই আপনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।"

"কী কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? তা সে এটা সেটা নানা কারণে... বলতে পারেন ধার শোধ করার জন্য।"

"ঠিক কাকে, সেটা বলবেন কি?"

"এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একেবারে দিতে রাজি নই, ভদ্রমহোদয়রা। দেখুন, কারণটা এই নয় যে বলতে পারতাম না, অথবা বলার মতো সাহস নেই বা তাতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে, কারণ এগুলো নেহাৎ আজেবাজে, অতি তুচ্ছ ব্যাপার; বলব না এই কারণেই যে এটা একটা নীতির প্রশ্ন : এখানে জড়িত আছে আমার ব্যক্তিগত জীবন, আর আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাইরের কারও অনুপ্রবেশ ঘটতে দিতে আমি রাজি নই। এই হল আমার নীতি। আপনার প্রশ্নের সঙ্গে মামলার কোনও সম্পর্ক নেই, আর মামলার সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই সেটা আমার ব্যক্তিগত জীবন! ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলাম, আমার সম্মানের খাতিরে ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কাকে—সেটা বলব না।"

"আপনার অনুমতি হয় তো এটা আমরা লিখে নিই", প্রসিকিউটর।

"অনুগ্রহ করে লিখুন। হ্যাঁ তা-ই লিখুন বলব না, বলব না। লিখুন মশাই, এমনকি এও লিখুন যে বলাটা অপমানজনক মনে করছি। আহা, লিখবেন বৈ কি, আপনাদের হাতে যে অঢেল সময়!"

"মাননীয় মহাশয়, আপনার অনুমতি হলে আপনাকে জানিয়ে রাখি এবং আরও একবার মনে করিয়ে দিই অবশ্য যদি এটা আপনার জানা না থাকে " বিশেষ ধরনের এবং অত্যন্ত কঠোর ও গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করে প্রসিকিউটর বলতে শুরু করল, "আপনাকে আমাদের এখন যে সব প্রশ্ন করার আছে সেগুলোর উত্তর না দেওয়ার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। আপনি নিজে থেকে যদি যে কোনো কারণেই হোক উত্তর এড়িয়ে যেতে চান সেক্ষেত্রে আমাদেরও উলটে আপনার কাছ থেকে জোর জবরদস্তি তা আদায় করার কোনো অধিকার থাকছে না। এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার বিষয়। কিন্তু তবু বলব, বর্তমান ঘটনার মতো ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হল আপনি যদি কোনো সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃত হন তাহলে আপনি আপনার নিজের যে কী পরিমাণ ক্ষতি সাধন করবেন সেটা আপনার সামনে তুলে ধরা এবং আপনাকে তা ব্যাখ্যা করে বলা। এবারে আমি আপনাকে আপনার কথা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করছি।"

"ভদ্রমহোদয়রা, আমি রাগ করিনি আমি আমি " বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে অস্ফুটস্বরে বোঝানোর চেষ্টা করতে গেল মিতিয়া। "দেখুন ভদ্রমহোদয়রা, ব্যাপারটা হল এই যে ওই সাম্‌সোনভ্ লোকটা, যার কাছে আমি তখন গিয়েছিলাম..."

ইতিমধ্যেই পাঠকের কাছে যা পরিচিত, বলাই বাহুল্য, মিতিয়ার সেই বিবরণের খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা আর যাচ্ছি না। বিবরণদাতা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল। ঘটনার সামান্যতম খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তা

থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যও সে ছটফট করছিল। কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণ করা মানে তার সঙ্গে সঙ্গে এজাহার লেখার কাজও চলছিল, তাই সময় সময় তাকে থামিয়েও দিতে হচ্ছিল। দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের সেটা মনঃপূত হচ্ছিল না, কিন্তু সে মেনে নিচ্ছিল। রাগ করছিল বটে, তবে আপাতত খোলা মনেরই পরিচয় দিচ্ছিল। এটা ঠিক যে মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠছিল 'ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা যা করছেন তা ভগবানেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট', অথবা 'ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা বুঝতে পারছেন কি যে আপনারা অযথা আমাকে জ্বালাতন করছেন?'

কিন্তু এ ধরনের চিৎকার চেঁচামেচি করা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত তার সৌহার্দপূর্ণ খোলামেলা মেজাজের কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। এই ভাবে গত পরশু দিন সামসোনভ্ কী ভাবে তাকে 'বোকা বানিয়েছিল' তার বর্ণনা দিল। এই এখনই সে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে যে লোকটা তাকে তখন বোকাই বানিয়েছিল বটে। রাহাখরচের টাকা জোগাড় করার জন্য সে যে ছয় রুবলে ঘড়ি বিক্রি করেছিল এর আগে পর্যন্ত তদন্তকারী ও প্রসিকিউটরের তা একেবারে অজানা ছিল। ঘটনাটা তৎক্ষণাৎ তাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এমনকি তা দেখে মিতিয়া ভীষণ চটে গেলে কী হবে তাদের মনে হল এই তথ্যটি বিশদে নথিবদ্ধ করা প্রয়োজন, যেহেতু এতে দ্বিতীয়বারের মতো এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ঘটনার প্রাক্কালে তার কাছে বলতে গেলে কানাকড়িও ছিল না। মিতিয়া একটু একটু করে মুষড়ে পড়তে লাগল। এর পর 'খোচরের' সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে তার যাত্রা, দূষিত কয়লার গ্যাসে শ্বাসরোধকারী কুটিরে তার রাত্রিযাপন ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে শহরে ফিরে আসার ঘটনা পর্যন্ত সে তার বিবরণ টেনে নিয়ে গেল। এই জায়গায় আসার পর প্রশ্নকর্তাদের দিক থেকে এবারে তেমন কোনো আগ্রহ বা অনুরোধ না থাকা সত্ত্বেও সে নিজে থেকে গ্রুশেন্‌কাকে কেন্দ্র করে তার ঈর্ষাপীড়িত মনের যন্ত্রণার বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল।

ওরা মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনতে লাগল। এর মধ্যে থেকে যেটা তাদের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় হল তা এই যে গ্রুশেন্‌কার ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়ির 'পশ্চাদ্ভাগে' মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভনার বাড়িতে অনেক দিন হল সে একটা নজরদারির ঘাঁটি পেতে রেখেছিল, আর যাবতীয় সংবাদ তাকে এনে দিত স্মের্দিকোভ্। বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হল, যথাস্থানে তা লিখেও রাখা হল। মিতিয়া আবেগে উদ্দীপিত হয়ে তার ঈর্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিল। নিজের একান্ত অন্তরঙ্গ উপলব্ধিকে এই ভাবে বাইরে প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকচক্ষে ছোটো হয়ে যাওয়া' বলতে যা বোঝায় তারও তখন সেই দশা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে লজ্জা হলেও মনে হয় সত্যের খাতিরে সে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। মিতিয়া যখন বিবরণ দিচ্ছিল সেই সময় বিচারবিভাগীয় তদন্তকারী এবং বিশেষ করে প্রসিকিউটর যে রকম কঠোর উদাসীন স্থিরদৃষ্টিতে একাগ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে

ছিল তাতে সে শেষ পর্যন্ত বড়ো বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

'এই বালখিল্যটি নিকলাই পার্‌ফেনভিচ, যাকে আমি মাত্র এই কিছুদিন আগেও কথাপ্রসঙ্গে মেয়েমানুষদের সম্পর্কে আবোল তাবোল কিছু বলেছিলাম, আর এই অসুস্থ প্রসিকিউটরটা—এরা আমার এসব কথার মর্ম বোঝার উপযুক্ত নয়। কী লজ্জার কথা!' ভাবতেই তার মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। 'ধৈর্য ধর, শান্ত হও, রহিও নীরবে', মনে মনে এই বলে কবিতার ভাষাতে সে তার ভাবনার উপসংহার টানল। কিন্তু পরক্ষণেই নতুন করে মনের জোর ফিরিয়ে এনে আবার যথারীতি তার বিবরণ টেনে নিয়ে চলল। এমন কি মাদাম খখ্‌লাকোভার প্রসঙ্গে আসতে সে আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল, শুধু তা-ই নয়, বর্তমান প্রসঙ্গের ঠিক উপযুক্ত না হলেও ভদ্রমহিলা সম্পর্কে কিছুদিন আগেকার একটা বিশেষ খোশগল্পও বলার ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু তদন্তকারী তাকে ভদ্রভাবে থামিয়ে দিয়ে 'আরও গুরুত্বপূর্ণ' কোনো বিষয়ে যাবার প্রস্তাব দিল। অবশেষে নিজের মরিয়া অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সে যখন খখ্‌লাকোভার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরের সেই মুহূর্তটির কথা বলল, যখন তার এমনও মনে হয়েছিল যে 'কাউকে খুন করতে হয় তাও সই, কিন্তু তিন হাজার জোগাড় করতেই হবে' তখন তারা আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে 'খুন করতে চেয়েছিল' কথাটা টুকে নিল। মিতিয়া কোনো উচ্চবাচ্য না করে লিখতে দিল। শেষকালে সে তার বিবরণের সেই জায়গায় এলো যখন সে জানতে পারল গ্রুশেন্‌কা তাকে ভাঁওতা দিয়েছে, সাম্‌সোনভের কাছে যখন মিতিয়া তাকে পৌঁছে দেয় তার পরক্ষণেই গ্রুশেন্‌কা সেখান থেকে চম্পট দিয়েছিল, অথচ আগে সে নিজে বলেছিল, যে মাঝরাত অবধি বুড়োর কাছে থাকবে।

"ভদ্রমহোদয়রা, আমি যে ফেনিয়াকে তখন খুন করিনি তার একমাত্র কারণ এই যে আমার তখন অত সময় ছিল না", বিবরণের এই অংশে এসে আচমকা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো। এটাও যত্ন সহকারে টুকে নেওয়া হল। মিতিয়া বিরসবদনে অপেক্ষা করে রইল। তারপর আবার যখন কীভাবে ছুটতে ছুটতে সে তার বাবার বাড়ির বাগানে গিয়ে ঢুকেছিল তার বিবরণ দেওয়ার উপক্রম করল এমন সময় তদন্তকারী তাকে থামিয়ে দিল। পাশেই সোফার ওপর পড়ে ছিল তার বিশাল ব্রিফকেসটা। সেটা খুলে তার ভেতর থেকে সে আমার নোড়াটা বের করল।

"এই বস্তুটির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি?" মিতিয়াকে নোড়াটা দেখিয়ে সে জিগ্‌গেস করল।

"হ্যাঁ, অবশ্যই!" বিরসবদনে সে কাষ্ঠহাসি হাসল। "জানা নয় আবার! দিন তো, একবার দেখি    ধুত্তোর, কাজ নেই!"

"এটার উল্লেখ করতে কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন", তদন্তকারী মন্তব্য করল।

"চুলোয় যাক! আপনাদের কাছ থেকে লুকানোর কোনো কারণ ছিল না, ভাবছেন কি ওটা ছাড়া আমার চলত না? নেহাৎই মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

"ওটাকে আপনি কীভাবে আপনার হাতিয়ার করে নিলেন অনুগ্রহ করে যদি বলেন

"তা আপনাদের কৃপায় অনুগ্রহ করব বৈ কি, ভদ্রমহোদয়রা।"

কীভাবে হামানদিস্তার নোড়াটা নিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল মিতিয়া এবারে তার বিবরণ দিল।

"কিন্তু ওই বস্তুটার মধ্যে আপনি কী এমন দেখতে পেয়েছিলেন? কী আপনার উদ্দেশ্য ছিল ওরকম একটা হাতিয়ারে আপনার সশস্ত্র হওয়ার পেছনে?"

"কীসের আবার উদ্দেশ্য? কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না! স্রেফ হাতালাম, নিয়ে পালিয়ে গেলাম।"

"কোনো উদ্দেশ্যই যদি না থাকবে তা হলে কেন?"

নিদারুণ বিরক্তিতে মিতিয়া ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠল। স্থিরদৃষ্টিতে 'বালখিল্যটির' মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্বেষের জ্বালাধরা বিষণ্ণ হাসি হাসল। ঘটনা এই যে 'এ ধরনের লোকগুলোকে' সে যে এতক্ষণ এমন আন্তরিক ভাবে, মন উজাড় করে দিয়ে নিজের ঈর্ষার কাহিনি শোনাচ্ছিল এই ভেবে ক্রমেই তার বেশি করে লজ্জা হতে লাগল।

"নোড়ার মুখে আগুন!" হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

"তা হলেও

"ওঃ, কুকুর তাড়াব বলে তুলে নিয়েছিলাম। যা অন্ধকার! তা, কখন কী কাজে লাগে বলা তো যায় না।"

"কিন্তু এতই যখন অন্ধকারের ভয় তাহলে কি এর আগেও রাতের বেলায় বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আপনি কোনো অস্ত্র সঙ্গে নিতেন?"

"উঃ! চুলোয় যাক! আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই দেখছি দায় মশাই!" মিতিয়া ফুঁসে উঠল। তার বিরক্তি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। সচিবের দিকে ফিরে তাকাতে রাগে তার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। কেমন যেন একটা ক্ষিপ্তকণ্ঠে তাকে উদ্দেশ করে সে বলে উঠল

"লেখ, এখনই লেখ এখনই ... লেখ যে 'হামানদিস্তার নোড়াটা আমি ওখান থেকে ছুটে গিয়ে বাবাকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে মাথায় বাড়ি মেরে খুন করব বলে তুলে নিয়েছিলাম!' তাহলে এখন আপনারা খুশি ত মশাই? আপনাদের মনের ভার হালকা হয়ে গেল তো?" তদন্তকারী ও প্রসিকিউটারের দিকে মারকুটে ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করে সে বললেন।

"আমরা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছি, আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে এবং আমরা আপনাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছি তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে এরকম সাক্ষ্য আপনি এখন দিলেন যা আপনার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু যা আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ", জবাবে প্রসিকিউটর শুষ্ককণ্ঠে তাকে বললেন।

"মাফ করবেন ভদ্রমহোদয়রা! হামানদিস্তার নোড়াটা না হয় নিয়েইছিলাম, কিন্তু তাতে কী? আচ্ছা, এই সব ক্ষেত্রে মানুষ কী কারণে কিছু একটা হাতে তুলে নেয় বলুন তো? আমি জানি না কী কারণে? তুলে নিয়েই ছুট দিলাম। এর বেশি কিছু নয়। লজ্জার কথা মশাই, আর নয়, এই হলফ করে বলছি আর মুখ খুলছি না!"

টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে সে করতলে মাথা রাখল। ওদের দিকে পাশ ফিরে সে বসে ছিল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে ভেতরে ভেতরে একটা বিশ্রী অনুভূতির বিরুদ্ধে জুঝতে লাগল। আসলে তার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে 'ফাঁসিতে ঝোলাও আর যাই কর' আর একটি কথাও বলবে না।

"দেখুন মশাই", অতি কষ্টে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সে বলে উঠল, "দেখুন, আপনাদের কথা শুনতে শুনতে একটা স্বপ্ন আমার মনের মধ্যে হানা দেয় দেখুন, আমি অনেক সময় ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখি ওই একটাই স্বপ্ন, প্রায়ই দেখি, বারবার ঘুরে ফিরে আসে। দেখি, কে যেন আমাকে তাড়া করছে, এমন একটা কেউ যাকে আমার দারুণ ভয়। অন্ধকারের মধ্যে, রাতের বেলায় তাড়া করছে, আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি তার কাছ থেকে দরজার আড়ালে অথবা আলমারির পিছনে কোথাও গা ঢাকা দিচ্ছি, মান সম্মানের মাথা খুইয়ে লুকোচ্ছি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, সে লোকটা বেশ ভালোভাবেই জানে আমি তার কাছ থেকে লুকিয়ে কোথায় গা ঢাকা দিচ্ছি। যেন ইচ্ছে করেই এমন ভাব দেখাচ্ছে যে জানে না আমি কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছি, যাতে আরও বেশি করে কষ্ট দেওয়া যায়, যাতে আমার আতঙ্কটা সে উপভোগ করতে পারে। ... ঠিক এটাই এখন আপনারা করছেন! ওটারই মতন!"

"এরকম স্বপ্ন আপনি দেখেন বুঝি?" প্রসিকিউটর কৌতূহল প্রকাশ করল।

"হ্যাঁ দেখি। কী হল? এর মধ্যেই লেখার সাধ মিটে গেল নাকি?" বাঁকা হাসি হাসল মিতিয়া।

"না, লেখার দরকার নেই। তবে যাই বলুন না, আপনার স্বপ্নগুলো কিন্তু কৌতূহল জাগানোর মতো।"

"এখন কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। বাস্তবতা, মশাই, সত্যিকারের জীবনের বাস্তবতা! আমি নেকড়ে, আপনারা শিকারী। তাহলে আর কি, কুকুর লেলিয়ে দিন আপনাদের শিকারের পেছনে।"

"আপনি মিথ্যে অমন তুলনা করছেন বেশ নরম সুরেই নিকলাই পারফেনভিচ্ বলতে শুরু করেছিল।

"মিথ্যে নয় মশাই, মিথ্যে নয়!" আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল মিতিয়া, যদিও ক্রোধের আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে সম্ভবত ইতিমধ্যে তার মনটা হালকা হয়ে গিয়েছিল; তাই এবারে প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ভালো মেজাজের

পরিচয় দিতে লাগল। আপনাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত একজন অপরাধী বা বিচারাধীন আসামিকে আপনারা বিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু ভদ্রমহোদয়রা, একজন অতি সজ্জন ব্যক্তির হৃদয়ের সুমহান আবেগের যে উচ্ছ্বাস—আমি বুক ঠুকে জোরগলায় একথা বলতে পারি—তাই বলে সেটা বিশ্বাস করবেন না! বিশ্বাস না করাটা কিন্তু আপনাদের উচিত হবে না সে অধিকার আপনাদের নেই তবে—

হে হৃদয়, রহিও নীরবে,
ধৈর্য ধর, শান্ত হও রহিও নীরবে!

তাহলে, চালিয়ে যেতে বলেন কি?" বিষণ্ণ ভাবে সে তার কথা বন্ধ করল।

"অবশ্যই, যদি আপনার অনুগ্রহ হয়", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ জবাব দিল।

## পাঁচ

## তৃতীয় পরীক্ষা

মিতিয়া রুক্ষস্বরে বলতে শুরু করল বটে, কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল তার কথনের মধ্যে একটি খুঁটিনাটিও যাতে ভুল না হয় বা বাদ না যায় সে জন্য সে আরও বেশি সচেষ্ট। সে বলল কীভাবে সে বেড়া টপকে বাবার বাড়ির বাগানে ঢুকেছিল, কীভাবে জানলার কাছাকাছি গিয়েছিল এবং অবশেষে জানলার ধারে যা যা ঘটেছিল সে সবও বলল। বাগানের ভেতরে যখন তার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল গ্রুশেন্‌কা বাবার ঘরে আছে কিনা, তখন তার মনের মধ্যে যে তোলপাড় চলছিল, সুস্পষ্ট ভাষায়, যেন প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে তার সেই সব মুহূর্তের আবেগ অনুভূতির যথাযথ, নিখুঁত বর্ণনা সে দিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রসিকিউটর এবং তদন্তকারী—ওরা দুজনেই এবারে যেন দারুণ সংযম বজায় রেখে তার কথা শুনতে লাগল। ওরা তার দিকে ভাবলেশহীন শুষ্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তাকে প্রশ্নও অনেক কম করছিল। ওদের মুখ দেখে মিতিয়া কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

'রাগ করেছে, বেজায় চটে আছে', সে মনে মনে ভাবল। 'তা মরুক গে!'

বাবা যাতে জানলা খোলে সেই উদ্দেশ্যে গ্রুশেন্‌কা এসেছে বলে তাকে সঙ্কেত দেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত যে ভাবে সে মনস্থির করেছিল, সেই ঘটনা যখন মিতিয়া বলল তখন কিন্তু প্রসিকিউটর বা তদন্তকারী কেউই 'সঙ্কেত' কথাটার দিকে এতটুকু মনোযোগ দিল না; মনে হচ্ছিল এখানে কথাটার যে কী তাৎপর্য থাকতে পারে তা যেন তারা একেবারে ধরতে পারেনি, যেটা মিতিয়া পর্যন্ত লক্ষ না করে পারল না। শেষকালে যখন বাপকে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাইরে উঁকি মারতে দেখে তার ঘৃণা দপ করে জ্বলে উঠল এবং সে পকেট থেকে কষ্ট করে নোড়াটা বের করে আনল, সেই মুহূর্তটির প্রসঙ্গে এসে সে আচমকা, ইচ্ছে করেই যেন থেমে

গেল। দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে বসে রইল, অবশ্য এটাও জানত যে সকলের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ।

"তারপর?" তদন্তকারী বলল, "আপনি অস্ত্রটা বের করে আনলেন, তারপর?... তারপর কী ঘটল?"

"তারপর? তারপর খুন করলাম দিলাম বসিয়ে মাথার চাঁদিতে, খুলি ফাটিয়ে দিলাম। তাই তো? এটাই তো আপনাদের কথা!"

হঠাৎ জ্বলে উঠল তার দুচোখ। যে ক্রোধ নিভে যাবার উপক্রম হচ্ছিল তার সবটা হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে তার মনের মধ্যে উথলে উঠল।

"আমাদের কথা", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ তার কথার খেই ধরে বলল, "তা আপনার কথাটা কী শুনি?"

মিতিয়া চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

"আমার কথা, ভদ্রমহোদয়রা? আমার কথাটা হল এই রকম " মৃদু স্বরে সে বলতে শুরু করল, "কারও চোখের জল কিনা জানি নে, আমার মাতৃদেবী ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলেন, না কি কোনো পবিত্র আত্মা সেই মুহূর্তে আমাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহচুম্বন করেছিলেন—জানি নে, কিন্তু এটা ঠিক যে শয়তান হার মানল। আমি চট করে জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে বাগানের বেড়া লক্ষ করে ছুটতে লাগলাম। বাবা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এই প্রথম আমি তার চোখে ধরা পড়ে গেলাম। অস্ফুট আর্তনাদ করে বাবা এক লাফে জানলা থেকে পিছু হটে গেল—এটা আমার বেশ মনে আছে। এদিকে বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে বেড়ার কাছে তো গেলাম কিন্তু যখন আমি বেড়ার মাথায় উঠে বসেছি ঠিক তখুনি গ্রিগোরি আমাকে ধরে ফেলল।

এই পর্যন্ত বলে শেষকালে সে তার শ্রোতাদের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তাদের দেখে মনে হল তারা যেন শান্ত নির্বিকার দৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছিল। কেমন যেন একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের প্রবল আঘাতে মিতিয়ার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

"কিন্তু ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা এই মুহূর্তে আমাকে দেখে মনে মনে খুব হাসছেন!" হঠাৎ সে তার বিবরণ থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল।

"আপনার এমন সিদ্ধান্তে আসার হেতু?" নিকলাই পার্‌ফেনভিচ বলল।

"একটা কথাও বিশ্বাস করছেন না—এটাই তো হেতু! আমি ঠিকই বুঝতে পারছি যে আমি সেই মূল জায়গাটায় এসে পড়েছি। বুড়ো মাথা ভেঙে ওখানে পড়ে থাকল, এদিকে আমি যে তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম এবং নোড়াটাও বের করে ফেলেছিলাম, সেই করুণ বিবরণ দেওয়ার পর বলছি হঠাৎ কি না আমি জানলার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম। এ যে গল্পকথা! দস্তুরমতো কোনো আখ্যান

কাব্য! কোথাকার কোন্ এক ছোকরা, তার মুখের কথায় বিশ্বাস কী! হাঃ-হাঃ! আপনারা ভারি মজা করতে পারেন তো মশাই!"

বলতে বলতে গোটা শরীরটা দুলিয়ে সে এমন ভাবে চেয়ারে ঘুরে বসল যে চেয়ারটা মড়মড় করে উঠল।

"আপনার কি নজরে পড়েনি " মিতিয়ার উত্তেজনার প্রতি যেন কোনো আমল না দিয়েই তদন্তকারী হঠাৎ শুরু করল, "জানলার কাছ থেকে পিছু হটে যখন ছুটে পালিয়ে গেলেন সেই সময় কি আপনার নজরে পড়েনি বাইরের বাড়ির আরেক প্রান্তে বাগানে ঢোকার যে দরজা আছে সেটা খোলা ছিল কি না?"

"না, খোলা ছিল না।"

"ছিল না?"

"না, বরং বন্ধই তো থাকার কথা। নিজেরা না খুললে ওটা কেই বা খুলতে যাবে? আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান!" হঠাৎ যেন হুঁশ হতে সে প্রায় শিউরে উঠল। "আপনারা কি দরজা খোলা দেখলে পেয়েছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ, দরজা খোলা ছিল।"

"আপনারা নিজেরা যদি না খুলে থাকেন তাহলে আর কেই বা খুলতে পারে?" মিতিয়া হঠাৎ দারুণ অবাক হয়ে গেল।

"দরজা খোলা ছিল এবং আপনার পিতার হত্যাকারী নিঃসন্দেহে ওই দরজা দিয়ে ঢুকে হত্যা করার পর ওই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যায়", প্রত্যেকটি শব্দ যেন কেটে কেটে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে তদন্তকারী বলল। "এটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। হত্যাকাণ্ডটি, দেখাই যাচ্ছে, ঘটেছিল ঘরের মধ্যেই, *জানলা দিয়ে নয়*। ওখানে যে তদন্ত চালানো হয়েছে তা থেকে, মৃতদেহের অবস্থান এবং সমস্ত কিছু থেকেই এটা দস্তুরমতো পরিষ্কার। এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।"

মিতিয়া দারুণ হকচকিয়ে গেল।

"কিন্তু এ যে অসম্ভব, মশাই!" একেবারে দিশেহারা হয়ে সে চিৎকার করে উঠল। "আমি আমি ও দরজা দিয়ে ঢুকিনি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সঠিক ভাবেই বলছি, আমি যতক্ষণ বাগানে ছিলাম এবং যখন আমি বাগান থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে সর্বক্ষণ দরজাটা বন্ধ ছিল। আমি শুধু বাইরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, জানলা থেকে .. শুধু জানলা থেকে তাকে দেখেছিলাম মাত্র। শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমার মনে আছে। তা ছাড়া যদি মনে নাও থাকত তো অমনিতেই জানাও আছে, কেন না সঙ্কেতগুলো জানার মধ্যে জানত কেবল আমি আর স্মের্দিকোভ্ আর ওই মৃত লোকটি। সে লোকটি সঙ্কেত ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে দরজা খুলতই না!"

"সঙ্কেত? কীসের সঙ্কেত আবার?" এতক্ষণ যে সংযত আচরণের পরিচয়

দিচ্ছিলেন পলকের মধ্যে তা একেবারে হারিয়ে ফেলে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো লোলুপ কৌতূহলে ফেটে পড়লেন প্রসিকিউটর। তাঁর প্রশ্নের মধ্যে কেমন যেন একটা কুণ্ঠামিশ্রিত তোষামোদের ভাব ফুটে উঠল। তিনি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের গন্ধ পেলেন যা এতক্ষণ তাঁর অজানা ছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে যেটা উপলব্ধি করে তাঁর নিদারুণ শঙ্কা হল তা এই যে মিতিয়া এই রহস্যটা পুরোপুরি উদ্‌ঘাটন করতে নাও চাইতে পারে।

"কেন, জানতেন না!" মিতিয়া মজা করে তাকে চোখ টিপে বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসল। "যদি না বলি? তাহলে কার কাছ থেকে জানতে পারতেন? সঙ্কেত সম্পর্কে জানার মধ্যে জানত তো মৃত ব্যক্তি, আমি আর স্মের্দিকোভ্—এ ছাড়া আর কেউ নয়। আর হ্যাঁ, আমাদের মাথার ওপর যে আকাশ সেও জানত বটে, তবে সে তো আর আপনাদের বলবে না। অথচ এই সামান্য তথ্যটি কিন্তু কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এর ওপর নির্ভর করে কত কিছুই না তৈরি করা যায়! হাঃ-হাঃ! শান্ত হোন, ভদ্রমহোদয়রা, আমি প্রকাশ করব। আপনাদের মাথার ভেতরে তো আছে রাজ্যের যত বাজে চিন্তা। আপনারা জানেন না কার সঙ্গে কী কারবার করছেন? আপনাদের কারবার এমন একজন আসামিকে নিয়ে যে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাক্ষ্য দিয়ে নিজেরই ক্ষতি করছে! হ্যাঁ মশাই, কেন না আমি আত্মসম্মান রক্ষা করে আমার বীরধর্ম পালন করি, কিন্তু আপনাদের সে ক্ষমতা নেই!"

প্রসিকিউটর বিনা বাক্যব্যয়ে এসব হজম করে গেলেন। কেবল নতুন তথ্যটি জানার জন্য ভেতরে ভেতরে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর বুক টিপটিপ করছিল। স্মের্দিকোভের জন্য ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ যে সমস্ত সঙ্কেত উদ্ভাবন করেছিল সেগুলির প্রসঙ্গে যা যা বলার সে সবই মিতিয়া বিশদে ও ঠিক-ঠিক বলল। জানলায় কোন্ কোন্ টোকার ঠিক কী কী অর্থ তা তো বললই, এমনকি সেই সঙ্কেতগুলি টেবিলের ওপর টোকা মেরে বাজিয়েও শোনাল। নিকলাই পার্‌ফেনভিচ যখন তাকে জিগ্‌গেস করল তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে এই যে সে, অর্থাৎ মিতিয়া যখন জানলায় টোকা মেরে বুড়োকে সঙ্কেত করেছিল তখন টোকা মেরে সেই সঙ্কেতটিই করেছিল যার অর্থ 'গ্রুশেন্‌কা এসেছে', তার উত্তরে সে নির্দ্বিধায় জানাল যে নির্ভুল ওই টোকাটা মেরেই সে জানিয়েছিল যে 'গ্রুশেন্‌কা এসেছে।'

"এই তো আপনাদের যা জানানোর জানালাম, এবারে, গাঁথুন আপনাদের মিনার!" প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে মিতিয়া আবার অবজ্ঞাভরে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"বলতে চান, এই সঙ্কেতগুলি জানত কেবল আপনার পরলোকগত পিতা, আপনি আর ভৃত্য স্মের্দিকোভ্? আর কেউ জানত না?" আবারও জানতে চাইল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্!

"হ্যাঁ। ভৃত্য স্মের্দিকোভ্, এ ছাড়া মাথার ওপরের আকাশ। আকাশের কথাটাও

লিখুন—সেটা লিখলে বাড়তি কিছু হবে না। তাছাড়া আকাশের দেবতাকে আপনাদের নিজেদেরও দরকার হবে।"

ইতিমধ্যে অবশ্য সেটা লেখাও শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন লেখা হচ্ছিল সেই সময় যেন একেবারে আচমকা নতুন একটা চিন্তার ধাক্কায় প্রসিকিউটর হোঁচট খেলেন।

তিনি বললেন, "আচ্ছা, এটাই যদি হয় যে স্মের্দিকোভ্‌ও ওই সঙ্কেতগুলো জানত আর আপনিও যখন আপনার পিতার মৃত্যুর জন্য আপনার বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ মূলত অস্বীকার করছেন, তাহলে কি এমনও হতে পারে যে স্মের্দিকোভ্ই ওই বেঁধে দেওয়া সঙ্কেত অনুযায়ী টোকা দিয়ে আপনার বাবাকে তার ঘরের দরজা খুলতে বাধ্য করেছিল, আর তারপর ঘরে ঢুকে সেই দুষ্কর্মটি সাধন করেছিল?"

মিতিয়া খুব মজা পেয়ে গিয়ে এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। নীরবে, এত দীর্ঘ সময় ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল যে প্রসিকিউটরের চোখের পলক না পড়ে পারল না।

"এবারেও শেয়ালটাকে পাকড়াও করলেন!" শেষ কালে মিতিয়া বলে উঠল। "হতভাগাটাকে লেজে ধরে খেলানোর মতলব, হে-হে! আপনার হাড়হদ্দ আমার চিনতে বাকি নেই প্রসিকিউটর মশাই! আপনি তো এটাই ভেবেছিলেন যে আমি সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠব এবং আপনি আমাকে যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেটাকে লুফে নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলব 'বটেই তো ওই স্মের্দিকোভ্— স্মের্দিকোভ্টাই তো খুনি!' স্বীকার করুন, স্বীকার করুন যে তা-ই ভেবেছিলেন, তাহলে কথা চালিয়ে যাব।"

কিন্তু প্রসিকিউটর স্বীকার করার পাত্র নন। চুপ করে রইলেন। নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"ভুল করেছেন। চেঁচিয়ে বলতে যাব না যে ওটা স্মের্দিকোভের কাজ!" মিতিয়া বলল।

"এমনকি তাকে আপনার সন্দেহ পর্যন্ত হয় না?"

"কিন্তু আপনি সন্দেহ করেন কি?"

"তাকেও সন্দেহ করা হচ্ছিল।"

মিতিয়া মাথা গোঁজ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। "শুনুন, বলি : একেবারে গোড়াতে, কিছু আগে যখন আমি এই পর্দার আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আপনাদের মুখোমুখি হলাম, প্রায় সেই মুহূর্তটি থেকে আমার মাথায় এই চিন্তাটাই এসেছিল 'স্মের্দিকোভ্ই হবে!' স্মের্দিকোভ্ আমার মন থেকে দূর হচ্ছিল না। শেষকালে এই এখনও আমারও হঠাৎ মনে হল 'স্মের্দিকোভ্!' কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে, পাশাপাশি এও ভেবে দেখলাম 'না, স্মের্দিকোভ্ নয়!' না, ভদ্রমহোদয়রা, এটা ওর কাজ নয়!"

“সেক্ষেত্রে আপনি অন্য আর কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহ করেন কি?” সন্তর্পণে তাকে জিগ্গেস করতে গেল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্।

“জানি না কে বা কোন্ ব্যক্তি, স্বর্গের হাত, না নরকে শয়তানের হাত। তবে... আর যে-ই হোক, স্মের্দিকোভ্ নয়!” চূড়ান্ত ভাবে নস্যাৎ করে দিল মিতিয়া।

“কিন্তু আপনি কেন এত জোর দিয়ে এবং এতটা জেদ ধরে বলছেন যে সে নয়, বলুন তো?”

“আমার দৃঢ় বিশ্বাসবশত। তার সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছে তা থেকে। কারণ এই যে স্মের্দিকোভ্ লোকটা অত্যন্ত কোমল ও ভীতু স্বভাবের। শুধু ভীতুই বলব না, পৃথিবীতে যত ভীরুতা আছে সে সব একত্রে জড় করলে যা হয় স্মের্দিকোভ্ তার এক জীবন্ত দু পেয়ে প্রতিমূর্তি। সে জন্মেছে একটা মুরগির কলজে নিয়ে। আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে সব সময় কাঁপত—ভাবটা এই যে আমি ওকে খুন করে ফেলব, অথচ আমি ওর গায়ে কখনও হাত তুলিনি। ও আমার পায়ে পড়ে কেঁদেছে, জুতোজোড়ায় চুমু খেয়েছে, আক্ষরিক অর্থে চুমু খেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে আমি যেন ওকে ‘ভয় না দেখাই’। শুনছেন?—‘ভয় না দেখাই’—এটা একটা কথা হল! অথচ আমি ওকে এটা-সেটা দিতেও গেছি। লোকটা একটা অসুস্থ ল্যাগবেগে মুরগির মতো, মৃগীরোগ গ্রস্ত, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, একটা আট বছরের বাচ্চা ছেলেও তাকে ধাতানি দিতে পারে। এটা কোনো বলার মতো চরিত্র হল? না মশাই, স্মের্দিকোভ্ নয়। তা ছাড়া, টাকাপয়সার দিকে ওর কোনো ঝোঁকও নেই। আমি কোনো কিছু দিতে চাইলে ও একেবারেই নিত না। আর বুড়ো মানুষটাকে সে খুন করতে যাবেই বা কেন? কী উদ্দেশ্যে? ও আবার সম্ভবত তার অবৈধ সন্তান—আপনারা জানেন কি?”

“সে কাহিনি আমরা শুনেছি বটে। কিন্তু আপনিও তো আপনার পিতার সন্তান, অথচ আপনি কিনা নিজমুখে সকলকে বলে বেড়িয়েছেন যে তাকে খুন করতে চান!”

“এটা আপনার ঠেস দিয়ে কথা বলা। আর এই ঠেসটা জঘন্য ও হীন ধরনের। তবে আমি তাতে ভয় পাই না। ভদ্রমহোদয়রা, আমার মুখের ওপর এমন কথা বলাটা কি আপনাদের দিক থেকে বড়ো বেশি নীচাশয়তা নয়! নীচাশয়তা এই কারণে যে কথাটা তো আমি নিজেই আপনাদের বলেছি। শুধু যে চেয়েছিলাম তা নয়, পারলে খুন করতামও। তায় আবার স্বেচ্ছায়, আগ বাড়িয়ে নিজের ওপর দায় চাপিয়ে বলে ফেলেছি যে আরেকটু হলেই খুন করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে তাকে খুন করিনি, আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে সেই দায় থেকে উদ্ধার করেছেন—অথচ সেটা আপনারা ধর্তব্যের মধ্যে বলে গণ্য করলেন না। এই কারণেই বলব, এ আপনাদের নীচতা, অত্যন্ত নীচতা! কেন না, আমি খুন করিনি, করিনি, করিনি! শুনছেন, প্রসিকিউটর মশাই, খুন করিনি।”

তার গলা প্রায় বুজে আসছিল। এই এতক্ষণ ধরে যে জেরা চলছিল তার মাঝখানে এতটা বিচলিত হতে তাকে আর কখনও দেখা যায়নি।

“তা সেই স্মের্দিকোভ্ আপনাদের কী বলল, ভদ্রমহোদয়রা?” একটু চুপ থাকার পর অবশেষে সে আচমকা প্রশ্ন করল। “আপনাদের জিগ্‌গেস করতে পারি কি?”

“আপনি আমাদের যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন”, তাপ উত্তাপহীন কঠোর ভঙ্গিতে প্রসিকিউটর উত্তর দিলেন। “আমাদের বর্তমান মামলায় তথ্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশ্ন আপনি করতে পারেন এবং আমরা—আবারও আপনাকে বলছি—এমন কি আপনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনার সন্তুষ্টি বিধানে বাধ্য থাকব। যার কথা আপনি জিগ্‌গেস করছেন সেই ভৃত্য স্মের্দিকোভ্‌কে আমরা অজ্ঞান অবস্থায় তার বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তার মূর্ছারোগের প্রকোপটা বড়ো বেশি প্রবল হয়েছিল, হয়তো বা বার দশেক ঘন ঘন সে মূর্ছার কবলে পড়েছিল। আমাদের সঙ্গে যে ডাক্তার ছিলেন রোগীকে পরীক্ষা করে দেখার পর তিনি আমাদের এমন কথাও বলেন যে হয়তো বা সকাল পর্যন্ত সে টিকবে না।

“তা-ই যদি হয় তা হলে তো বলতে হয় যে শয়তান বাবাকে খুন করেছে!” এমন আকস্মিক ভাবে মিতিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো যে মনে হল এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছিল ‘স্মের্দিকোভ্, না কি স্মের্দিকোভ্ নয়?’

“এই প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসব”, নিকলাই পার্‌ফেনভিচ তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল। “এখন যে কথা হচ্ছিল, আপনি আপনার সাক্ষ্যদান আরও চালিয়ে যেতে চান কি?”

মিতিয়া একটু বিশ্রামের অনুমতি চাইল। সৌজন্য সহকারে তাকে অনুমতি দেওয়া হল। বিশ্রামের পর সে আবার শুরু করল। কিন্তু দেখা গেল তার পক্ষে ব্যাপারটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। সে এখন বিধ্বস্ত, অপমানিত, মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। তার ওপর প্রসিকিউটর মশাই আবার এখনই ঠিক যেন ইচ্ছে করেই যত ‘তুচ্ছ বিষয়’ নিয়ে লেগে থেকে প্রতি মুহূর্তে তাকে জ্বালাতন করতে লাগলেন। বেড়ার মাথায় উঠে বসার পর গ্রিগোরি তার বাঁ পা'টা চেপে ধরতে মিতিয়া যে বুড়োর মাথায় নোড়ার বাড়ি বসিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে ধরাশায়ী হতে দেখে পরক্ষণেই তাকে দেখার জন্য সে যে লাফিয়ে নীচে নেমে এসেছিল, মিতিয়া সেই কাহিনি বলতে না বলতে প্রসিকিউটর তাকে থামিয়ে দিয়ে ঠিক কী ভাবে সে বেড়ার মাথায় চেপে বসেছিল তাকে বিশদে তা বলার অনুরোধ জানালেন। মিতিয়া অবাক হয়ে গেল।

“কেন, যেমন ভাবে বসে থাকার কথা, তেমনিভাবে সওয়ার হয়ে চেপে বসে ছিলাম—এক পা এদিকে, আরেক পা ওদিকে!

“আর নোড়াটা?”

“সেটা হাতে ছিল।”

"পকেটে ছিল না তো? আপনার ঠিক মনে আছে তো? তা খুব জোরে হাত ঝাপটা দিয়ে ছুড়েছিলেন নাকি?"

"জোরে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে আপনার কী দরকার বলুন তো?"

"বেড়ার ওপর তখন যে ভাবে বসেছিলেন আপনি যদি এখন ঠিক সেই ভাবে চেয়ারে বসে কী ভাবে এবং কোথায়, কোন্ দিকে হাত ঝাপটা দিয়েছিলেন সেটা যদি একবার চাক্ষুষ দেখাতেন তাহলে আমাদের বোঝার সুবিধা হত।"

"আপনারা আমাকে নিয়ে উপহাস করছেন নাকি?" উদ্ধত দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে মিতিয়া জিগ্‌গেস করল। কিন্তু লোকটা তাতে ভ্রূক্ষেপই করল না।

মিতিয়া খিঁচিয়ে উঠে ঘুরে চেয়ারের দু পাশে পা ছড়িয়ে বসে হাত ঝাপটা দিল।

"এই যে এই ভাবে ঘা মেরেছিলাম! এই ভাবে খুন করেছিলাম! আর কী চাই আপনাদের?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। এখন একটু কষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বলবেন কি ঠিক কী কারণে লাফিয়ে নীচে নেমে এলেন? কী উদ্দেশ্যে এবং ঠিক কী মনে করে?"

"ধুত্তোর! লোকটাকে ফেলে দেবার পর তার অবস্থাটা দেখার জন্য লাফিয়ে নীচে নেমে এসেছিলাম—এছাড়া আর কী হতে পারে! কী কারণে তা জানি না!"

"অমন একটা উত্তেজনার মধ্যে? এবং যখন আপনি পালাচ্ছিলেন সেই অবস্থাতেও?"

"হ্যাঁ উত্তেজনা সত্ত্বেও এবং যখন পালাচ্ছিলাম সেই অবস্থাতেও।"

"তাকে কি সাহায্য করতে চেয়েছিলেন?"

"সাহায্য! তা হ্যাঁ, হবেও হয়তো, হয়তো সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। মনে করতে পারছি না।"

"নিজের অবস্থার কথা মনে ছিল না? তার মানে কতকটা অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই ছিলেন—কী বলেন?"

"না, না আদৌ তা নয়, সব মনে আছে। কুটোটি পর্যন্ত সব মনে আছে। কী হল দেখার জন্য লাফিয়ে নিচে এসেছিলাম। রুমাল দিয়ে ওর রক্ত মুছেছিলাম।"

"আপনার রুমালটা আমরা দেখেছি। আপনি কি আশা করেছিলেন আপনার আঘাতে ধরাশায়ী লোকটার জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবেন?"

"আশা করেছিলাম কিনা জানি নে। স্রেফ নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম বেঁচে আছে কি না।"

"আচ্ছা, তাহলে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন? তা কী দেখলেন?"

"আমি ডাক্তার নই। ঠিক ধরতে পারলাম না। খুন করেছি, এই ভেবে পালিয়ে গেলাম। এখন শুনছি তার হুঁশ ফিরে এসেছে।"

"চমৎকার!" প্রসিকিউটর মন্তব্য করলেন। "আপনাকে ধন্যবাদ। ঠিক এটাই আমার দরকার ছিল। আচ্ছা, যে কথা বলছিলেন এবারে যদি একটু কষ্ট করে তার পর থেকে শুরু করতেন।"

কিন্তু হায়! মিতিয়ার যদিও মনে ছিল তবু একথা বলার চিন্তা তার মাথাতেই এলো না যে লোকটার প্রতি করুণাবশত সে লাফিয়ে আবার নিচে নেমে এসেছিল এবং 'বিপাকে পড়লে তাহলে বুড়ো। কিছু করার নেই। তা থাক, ওখানেই পড়ে থাক' — দুঃখ করে এরকম দু একটি কথাও বলেছিল।

প্রসিকিউটর কিন্তু কেবল একটি সিদ্ধান্তই করে বসলেন মানুষটা যে 'এরকম একটা মুহূর্তে, এমন একটা উত্তেজনার মধ্যে' লাফিয়ে নিচে নেমে এসেছিল নিঃসন্দেহে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যে তার অপরাধের একমাত্র সাক্ষীটি বেঁচে রইল কিনা। তার মানে, এরকম একটা মুহূর্তে পর্যন্ত কী অসাধারণ মনের জোর, কী দৃঢ়সঙ্কল্প, কী পরিমাণ ঠান্ডা মাথা, নিখুঁত হিসাব ইত্যাদি ইত্যাদি লোকটার ছিল। প্রসিকিউটর সন্তুষ্ট। তাঁর মনের ভাবটা এই যে 'তুচ্ছ বিষয়গুলি' তুলে খিটখিটে লোকটাকে জ্বালাতন করে ছেড়েছিলাম বলেই না সে মুখ খুলল!

মিতিয়া বহু কষ্টে এর পর থেকে বলতে শুরু করল। কিন্তু সে শুরু করতে না করতেই আবার তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। এবারে তাকে থামিয়ে দিল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্।

"আপনার দু হাতে যখন রক্ত লেগে ছিল এবং পরে দেখা গেল আপনার মুখেও লেগে ছিল, এই অবস্থায় কী করে আপনি ফেদোসিয়া মার্‌কভ্‌না নামে ওই দাসীর কাছে ছুটে যেতে পারলেন?"

"বলব কী, রক্ত যে লেগে আছে সেটা আমি তখন একেবারেই খেয়াল করি নি!" মিতিয়া জবাব দিল।

"ওঁর এই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য", নিকলাই পার্‌ফেনভিচের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করে প্রসিকিউটর বললেন।

"ঠিকই, লক্ষই করিনি। আপনি ঠিক কথা বলেছেন প্রসিকিউটর মশাই", হঠাৎ অনুমোদনের সুরে বলে উঠল মিতিয়া।

কিন্তু এর পরই এলো মিতিয়ার 'নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার' এবং 'ওদের সুখী জীবনের পথ থেকে তার সরে দাঁড়ানোর' আকস্মিক সিদ্ধান্ত। এই কিছুক্ষণ আগেও যে ভাবে সে তার হৃদয়কে সকলের সামনে খুলে ধরেছিল এখন কিন্তু আবার তা করতে এবং তার 'প্রাণেশ্বরীর' কাহিনি শোনাতে সে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না। এই যে লোকগুলো 'ছিনে জোঁকের মতো তাকে ছেঁকে ধরেছে, এদের সামনে তার ভারি অস্বস্তি হতে লাগল। এই কারণে এই বিষয়ে তাকে বারবার যত প্রশ্ন করা হচ্ছিল সেগুলির উত্তরও হচ্ছিল সংক্ষিপ্ত ও কটু ধরনের।

"তা ঠিক করলাম নিজেকে শেষ করে দেব। কী হবে বেঁচে থেকে? প্রশ্নটি

আপনা আপনি সামনে উঠে এলো। ওর সেই প্রাক্তন এবং অবিসংবাদিত প্রেমিকটির আবির্ভাব ঘটেছে; এক সময় ওর মনে দুঃখ দিয়েছিল, কিন্তু এখন পাঁচ বছর পরে ছুটে এসেছে তার পুরাতন প্রেম নিয়ে, আইনত তাকে বিয়ে করে তার অনাদর অবহেলার অবসান ঘটাবে বলে। আমি এটাই বুঝে নিলাম যে আমার সব গেছে। পেছনে রেখে এসেছি কলঙ্ক—খুন ঝরানোর কলঙ্ক, গ্রিগোরির রক্ত। আর বেঁচে থাকা কেন? তাই গেলাম বন্ধক দেওয়া পিস্তলজোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে, ভাবলাম ওতে গুলি ভরে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে মাথায় গুলি চালিয়ে দেব।

"আর তার আগে রাতের বেলায় বুঝি ভূরিভোজ?"

"তা বটে, রাতের বেলায় ভূরিভোজ। ধুত্তোর! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করুন দেখি মশাই! এই এখানে, সামান্য খানিকটা দূরে, গ্রামের ওপাশটায় আমি গুলি করে আত্মহত্যা করব বলে একেবারে স্থিরই করে ফেলেছিলাম। নিজের ওই ব্যবস্থাটা করার জন্য সকাল পাঁচটা সময় ঠিক করে রেখেছিলাম। পকেটে একটা কাগজও তৈরি করে রেখে দিয়েছিলাম। পের্‌খোতিনের বাড়িতে যখন পিস্তলে গুলি ভরেছিলাম তখনই লিখেছিলাম। এই যে কাগজটা, নিন, পড়ে দেখুন। এসব কথা অবশ্য আপনাদের জন্য বলছি না!" হঠাৎ সে অবজ্ঞাভরে শেষ কথাটা যোগ করল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে কাগজখানা বার করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তদন্তকারীরা কৌতূহলের সঙ্গে সেটা পড়ল, পড়ার পর যথারীতি মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের সঙ্গে রেখে দিল।

"কিন্তু হাত ধোওয়ার কথা তখনও একবারও ভেবে দেখেননি?—এমনকি পের্‌খোতিন মহাশয়ের বাড়িতে ঢোকার পরও নয়? তাহলে কি লোকের মনে যে সন্দেহ জাগতে পারে এমন আশঙ্কা আপনি করেননি?"

"সন্দেহ-টন্দেহ'র কী আছে? কারও সন্দেহ হোক আর না-ই হোক, কিছুই আসে যায় না। আমি যদি ঝটপট এখানে ছুটে আসতে পারতাম এবং পাঁচটার সময় গুলি করে আত্মহত্যা করতে পারতাম তাহলে আপনারা অমনিতেই কিছু করার ফুরসত পেতেন না। আমার বাবার ওই ঘটনাটা না ঘটলে আপনারা এ ব্যাপারের কিছুই জানতে পারতেন না, এখানে আসতেনও না। ওঃ, এটা শয়তানের কারসাজি, শয়তান বাবাকে খুন করেছে, শয়তানের মারফতই এত তাড়াতাড়ি, আপনারা সেটা জানতে পেরেছেন। কী করে এত তাড়াতাড়ি আপনারা সেটা জানতে পেরেছেন! কী করে এত তাড়াতাড়ি এখানে এসে হাজির হতে পারলেন বলুন তো? এ যে কল্পনারও অতীত!"

"পের্‌খোতিন মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁর বাড়িতে যখন গিয়েছিলেন তখন আপনার হাতে আপনার রক্তমাখা হাতে আপনি মুঠো করে ধরে রেখেছিলেন আপনার টাকা অনেক টাকা অনেকগুলো এক শ রুবলের

নোটের একটা বান্ডিল। ওঁর বাড়িতে যে বাচ্চা ছেলেটা কাজ করে সেও দেখেছে!”

“ঠিক বলেছেন মশাই। আমার মনে আছে, তা-ই বটে।”

“এবারে আসছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন। আপনি কি জানাতে পারেন      নিকলাই পার্‌ফেনভিচ এবারে অত্যন্ত নরম সুরে শুরু করল, “হঠাৎ অতগুলো টাকা আপনার হাতে এলো কী করে যখন ঘটনা থেকে, এমনকি সময়ের হিসেবেও দেখা যাচ্ছে যে মাঝখানে আপনি বাড়িতে ঢোকেননি?”

“না, বাড়িতে ঢুকিনি”, আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত শান্তভাবে হলেও মাটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মিতিয়া।

“সেক্ষেত্রে আমাকে ফের আমার প্রশ্নটা করতে দিন”, কেমন যেন টেনে-টেনে বিষয়টার দিকে এগোতে লাগল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্। “আপনার নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এই দিন পাঁচটার সময়ও আপনার কাছে কোনও টাকা ছিল না, তাহলে ওই পরিমাণ টাকা ঝট করে কোত্থেকে জোগাড় করলেন?...”

“আমার দশটা রুবল দরকার ছিল, তাই পিস্তলজোড়া পের্‌খাতিনের কাছে বন্ধক রেখেছিলাম, তারপর গেলাম খখ্‌লাকোভার কাছে, তিন হাজার জোগাড় করতে, কিন্তু সে দিল না, ইত্যাদি, হ্যানা ত্যানা নানা ব্যাপার   ” বলেই মিতিয়া চট করে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল। “তা হ্যাঁ মশাই, দরকার ছিল, তারপর দুম করে কোত্থেকে এসে গেল কয়েক হাজার, তাই তো? জানেন ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের দুজনেরই এখন ভয় হচ্ছে—আচ্ছা যদি না বলে কোথা থেকে পেল তা হলে কী হবে? ঠিক তাই, বলব না মশাই। আপনারা ঠিকই অনুমান করেছেন, জানতে পারবেন না”, অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিটি শব্দ কেটে কেটে উচ্চারণ করে হঠাৎ বলে উঠল মিতিয়া। তদন্তকারীরা সামান্য চুপ করে রইল।

“আপনি একবার বোঝার চেষ্টা করুন, কারামাজ়ভ্ মশাই, এটা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি”, বিনীত ভাবে মৃদুস্বরে বলল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্।

“বুঝতে পারছি, কিন্তু তা হলেও বলব না।”

প্রসিকিউটর লেগে পড়লেন। জেরার অধীন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো প্রশ্নের জবাব না দেওয়া তার স্বার্থের একান্ত উপযোগী মনে করেন তাহলে যে তিনি জবাব নাও দিতে পারেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। তবে কিনা সন্দেহভাজন ব্যক্তি যে নীরব থেকে নিজেই নিজের কী পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে পারে সেই কারণে এবং বিশেষত এই কারণে যখন প্রশ্নগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যা কিনা   ”

“ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক শুনেছি মশাই। অনেক হয়েছে। এই লম্বা চওড়া বুকনি আগেও শুনেছি”, আবারও মিতিয়া বাধা দিয়ে বলল। বিষয়টা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি, জানি এটাই এখানে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, কিন্তু তবু বলব না।”

"আমাদের আর কী? এটা আমাদের ব্যাপার নয়, আপনারই ব্যাপার। এতে আপনি নিজেই নিজের ক্ষতি করছেন", নার্ভাস হয়ে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ মন্তব্য করল।

"দেখুন মশাই, ঠাট্টা তামাশা বাদ দিন।" মিতিয়া চোখ তুলে কঠিন দৃষ্টিতে ওদের দুজনের দিকে তাকাল। "আমি একেবারে গোড়াতেই মনে মনে টের পেয়েছিলাম ঠিক এই জায়গাটাতেই আমাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধবে। কিন্তু কিছু আগে আমি যখন প্রথম সাক্ষ্য দিতে শুরু করলাম তখন এসবই ছিল অনেক দূরে একটা কুয়াশার আড়ালে, সবটাই ছিল ভাসা-ভাসা। এমনকি আমি তখন এতই সরলমতি ছিলাম যে 'আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার' প্রস্তাব দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম। এখন আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি ওরকম আস্থার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, কেন না যা-ই হোক না কেন আমরা পোড়ার এই বেড়াটার গায়ে বাধা পেয়ে ঠিকই হোঁচট খেতাম! তা হলও তাই! আর চলে না, এখানেই শেষ! আমি অবশ্য আপনাদের দোষ দিচ্ছি না। সত্যিই তো, আমার মুখের কথাতে তো আর আমাকে বিশ্বাস করা যায় না। এটা আমি ঠিকই বুঝতে পারি!"

বলতে বলতে সে মনমরা হয়ে চুপ করে গেল।

"আমাদের যেটা সব চাইতে বড়ো প্রশ্ন সে বিষয়ে মৌন থাকার যে অনড় প্রতিজ্ঞা আপনি গ্রহণ করেছেন তা যদি এতটুকু নাও ভাঙেন, এই সাক্ষ্য গ্রহণের সময় আপনার পক্ষে এত বিপজ্জনক এমন এক মুহূর্তে কী এমন জোরাল যুক্তি আপনার থাকতে পারে যা আপনাকে মৌন থাকতে প্রবৃত্ত করছে তার অন্তত সামান্যতম ইঙ্গিতও কি আপনি সেই সঙ্গে দিতে পারেন না?"

মিতিয়া বিষণ্ণ হয়ে, কেমন যেন চিন্তিত মুখে কাষ্ঠহাসি হাসল।

"আপনারা আমাকে যেমন ভাবছেন আমি তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো মানুষ মশাই। কেন, তা আমি আপনাদের বলব এবং সেই ইঙ্গিতও আমি দেব, যদিও আপনারা তার যোগ্য নন। চুপ এই কারণেই করে আছি মশাই, যে ওটা আমার পক্ষে লজ্জার কথা। কোথা থেকে ওই টাকা পেয়েছি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যে লজ্জার কথাটা বেরিয়ে পড়বে তার সঙ্গে বাবাকে খুন করা এবং তার ওপর লুটতরাজ করার পর্যন্ত কোনও তুলনা হয় না, যদি অবশ্য আমি তাকে খুন করতাম বা তার ওপর লুটতরাজ চালাতাম। কারণ এটাই, এই জন্যই বলতে পারছি না। লজ্জায় বলতে পারছি না। কী হল ভদ্রমহোদয়েরা, আপনারা এটা লিখে নিতে চান নাকি?"

"হ্যাঁ, আমরা লিখে নেব", তো-তো করে বলল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্।

"এটা, মানে 'লজ্জার' কথাটা কিন্তু না লিখলেই পারতেন। আমি শুধু ভালোমানুষি করে বললাম। এ সাক্ষ্য তো নাও দিতে পারতাম। কী আর বলব! আমি আপনাদের একটা উপঢৌকন দিলাম, আর আপনারাও অমনি হামলে পড়লেন! তা লিখুন, লিখুন,

আপনাদের যা প্রাণে চায় লিখুন", প্রবল অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণার সুরে সে তার কথা শেষ করে বলল, "আপনাদের আমি ভয় পাই না আপনাদের সামনে আমি গর্ব করতে পারি।"

"কিন্তু লজ্জাটা ঠিক কী ধরনের সেটা বলবেন কি?" নিকলাই পারফেনভিচ্ আমতা-আমতা করে বলতে গেল।

প্রসিকিউটর ভীষণ ভাবে ভুরু কোঁচকালেন।

"না, না, C'est fini — এখানেই ইতি। আর চেষ্টা করবেন না। ও নোংরা ঘেঁটে আর কোনো লাভ নেই। আপনাদের দৌলতে এর মধ্যেই অনেক নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি হয়েগেছে। আপনারা এর যোগ্য নন, আপনারা তো ননই এবং কেউই ...অনেক হয়েছে মশাই, বন্ধ করে দিচ্ছি।"

কথাগুলি বড়ো বেশি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা হল। নিকলাই পার্‌ফেনভিচ আর পীড়াপীড়ি করল না, কিন্তু প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের দৃষ্টি থেকে মিতিয়া এক লহমায় ঠিক ধরে ফেলল যে তিনি তখনও হাল ছাড়েননি।

"আপনি অন্তত এটা কি জানাতে পারেন না যে আপনি যখন পের্‌খোতিন মহাশয়ের বাড়িতে ঢুকেছিলেন তখন আপনার হাতের মুঠোয় কী পরিমাণ টাকা ছিল—অর্থাৎ ঠিক কত রুবল ছিল?"

"এটাও জানাতে পারছি না।"

"মনে হয় পের্‌খোতিন মহাশয়কে যেন আপনি তিন হাজারের কথা বলেছিলেন, যা নাকি আপনি মাদাম খখ্‌লাকোভার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?"

"তা বলেও থাকতে পারি। অনেকে হয়েছে মশাই। কত, তা বলছি না।"

"সে ক্ষেত্রে কী করে এখানে এলেন এবং এখানে আসার পর কী কী করলেন একটু কষ্ট করে সে সবের একটা বিবরণ আপনি আমাদের দেবেন কি?"

"আঃ! সে কথা এখানে যে সমস্ত লোক আছে তাদের জিগ্‌গেস করলেই তো হয়। তা সে যাই হোক, সেটা বললেও বলতে পারি।"

মিতিয়া বিবরণ দিল, কিন্তু আমরা আর সে বিবরণের পুনরাবৃত্তি করছি না। শুষ্ক কণ্ঠে ভাসা-ভাসা বিবরণ দিল। সেই বিবরণের মধ্যে তার উচ্ছ্বসিত প্রেমের প্রসঙ্গ আদৌ ছিল না। তবে 'নতুন কিছু ঘটনার কারণে গুলি করে আত্মহত্যার দৃঢ় সঙ্কল্প যে তার মন থেকে দূর হয়ে গেল একথা সে বলল। কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে, বিশদ বর্ণনার মধ্যে না গিয়ে সে ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেল। এবারে কিন্তু তদন্তকারীরাও তাকে তেমন একটা উত্ত্যক্ত করল না। স্পষ্টই বোঝা গেল তারাও এখন দেখতে পাচ্ছে যে মূল বিষয়টা ঠিক এর মধ্যে নেই।

"এ সবই আমরা যাচাই করে দেখব, এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব যখন সাক্ষীদের জেরা করা হবে, আর সেটা অবশ্যই আপনার উপস্থিতিতে হবে", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ তার জেরা শেষ করে বলল। "এবারে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে

আপনার কাছে যা যা জিনিস আছে—বিশেষত টাকাপয়সা যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে—সে সব দয়া করে একে একে বার করে এখানে, এই টেবিলের ওপর রাখুন।''

'টাকাপয়সার কথা বলছেন মশাই? অবশ্যই। আমি বুঝতে পারছি এটা দরকার। আমি তো এই ভেবে অবাকই হয়ে যাচ্ছি যে এর আগে কেন আপনারা এ ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। অবশ্য এটাও ঠিক যে এর মধ্যে আমার কোথাও যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সকলের চোখের সামনেই বসে আছি এতক্ষণ। এই যে এই আমার টাকা, রইল, গুনে দেখুন। নিন, মনে হচ্ছে এ-ই সব।''

পকেট থেকে সে সর্বস্ব ঝেড়ে বার করে দিল—মায় খুচরো পর্যন্ত। ওয়েস্টকোটের পাশের পকেট থেকে দুটো বিশ কোপেকের মুদ্রাও বার করে দিল টাকা গোনা হল, দেখা গেল সবসুদ্ধ আট শ ছত্রিশ রুবল চল্লিশ কোপেক আছে।

''এ-ই কি সব?'' তদন্তকারী জিগ্‌গেস করল।

''এ-ই সব।''

''মাফ করবেন, এই এখুনি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আপনি যে বললেন প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানে আপনি তিন শ রুবল খরচ করেছেন, পের্‌খোতিনকে দিয়েছেন দশ, গাড়ির গাড়োয়ানকে বিশ, এখানে হেরেছেন দুশ, তারপর

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ একে একে সব গুনে দেখল। মিতিয়া সোৎসাহে তাকে এই কাজে সাহায্য করল। মনে করে করে পাই পয়সা পর্যন্ত হিসাবের মধ্যে ধরা হল। নিকলাই পার্‌ফেনভিচ ঝটপট মোট টাকার হিসাব কষে ফেলল।

''এই আট শ নিয়ে আপনার তাহলে প্রাথমিকভাবে ছিল মোট দেড় হাজার মতন, তাই তো?''

''তাই হবে'', মিতিয়ার কাটা কাটা জবাব।

''তাহলে সকলে কেন এমন জোর দিয়ে বলছে যে আপনার আরও অনেক বেশি ছিল?''

''বলুক গে।''

''কিন্তু আপনি নিজেও তো বলেছিলেন।''

''হ্যাঁ, আমি নিজেও বলেছিলাম।''

''আরও যে সব ব্যক্তিকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি তাদের সাক্ষ্যের সাহায্যে আমরা অবশ্য এসবই যাচাই করে নেব। আপনার টাকা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যথাস্থানে সুরক্ষিত থাকবে এবং যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অধিকারে চলে গিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত হবে যদি অবশ্য দেখা যায় অথবা যাকে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ওতে আপনার অধিকার প্রশ্নাতীত। আচ্ছা, তাহলে এখন

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং দৃঢ় কণ্ঠে মিতিয়াকে জানিয়ে দিল যে মিতিয়ার 'জামাকাপড় এবং সেই সঙ্গে অন্য আর যা যা আছে সব কিছু'...

যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে দেখার জন্য সে 'দায়বদ্ধ ও বদ্ধপরিকর'।

"দোহাই আপনাদের, ভদ্রমহোদয়রা, যদি বলেন সবগুলো পকেট উলটে দেখাতে পারি।"

বলতে বলতে সে সত্যি সত্যি পকেট উলটে দেখাতে শুরু করল।

"এমনকি আপনার জামাকাপড় খোলাও আবশ্যক হবে।"

"মানে? জামাকাপড় খুলতে হবে? ধুত্তোর! চুলোয় যাক! আরে অমনিই তল্লাশি চালান না। না খুললেই নয়?"

"কোনো মতেই নয়, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্। জামাকাপড় খুলতে হবে।"

"আপনাদের যেমন অভিরুচি।" মুখ আঁধার করে মিতিয়া মেনে নিল। "তবে দয়া করে এখানে করবেন না, পর্দার আড়ালে করুন। কে তল্লাশি চালাবে?"

"অবশ্যই পর্দার আড়ালে।"

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ সম্মতির নিদর্শনস্বরূপ মাথা নোয়াল। তার ছোট্ট মুখটাতে একটা বিশেষ ধরনের গাম্ভীর্যও ফুটে উঠল।

## ছয়

## প্রসিকিউটরের কাছে মিতিয়া ধরা পড়ে গেল

এর পর যা শুরু হল তা মিতিয়ার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর ছিল। এর আগে, এমনকি এই এক মুহূর্ত আগেও সে কখনও ধারণাই করতে পারেনি যে তার সঙ্গে, মিতিয়া কারামাজভের মতো লোকের সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করতে পারে! বড়ো কথা, এ এক ধরনের অপমান, আর ওদের তরফ থেকে ঔদ্ধত্য এবং তার প্রতি অবজ্ঞাসূচক'। গায়ের লম্বা ঝুল কোটটা না হয় খোলা গেল, সে এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু তাকে তো তার পরেও আরও জামাকাপড় খুলতে অনুরোধ করা হল। অনুরোধই বা বলি কেন, বস্তুতপক্ষে হুকুমই দেওয়া হল। এটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। নিজের গর্ব এবং ওদের প্রতি অবজ্ঞাবশত সে বিনা বাক্যব্যয়ে পুরোপুরি তা-ই মেনে নিয়েছে। পর্দার আড়ালে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ ছাড়া প্রসিকিউটরও প্রবেশ করলেন, চাষাভুসো শ্রেণির কয়েকজন লোককেও সেখানে উপস্থিত হতে দেখা গেল। মিতিয়া মনে মনে ভাবল 'নির্ঘাত প্রয়োজনে জোর খাটানোর জন্য, আবার বলা যায় না, অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে।'

"তাহলে শার্টটাও খুলতে হবে নাকি?" রুক্ষস্বরে সে জিগ্‌গেস করতে গেল, কিন্তু নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ তার কথার কোনো উত্তর দিল না। প্রসিকিউটরের সঙ্গে মিলে সে তখন লম্বা ঝুলকোটটা, পেন্টালুন, ওয়েস্টকোট, টুপি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখার কাজে গভীর ভাবে ডুবে আছে। দেখা যাচ্ছে এরা দুজনেই জিনিসগুলি পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। 'শিষ্টাচারের কোনো বালাই নেই', মিতিয়ার মনে হল, এমনকি সামান্য যেটুকু ভদ্রতা একেবারে না দেখালেই নয়, তাও রক্ষা করছে না।'

"আমি আপনাদের জিগ্‌গেস করছি, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জিগ্‌গেস করছি শার্ট খোলার প্রয়োজন আছে কি নেই?" আরও বেশি বিরক্তির সঙ্গে, আরও রুক্ষস্বরে সে বলে উঠল।

"ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, আমরা আপনাকে যথা সময়ে জানিয়ে দেব।" নিকলাই পার্‌ফেনভিচের এই জবাবটার মধ্যে কেমন যেন একটা ওপরওয়ালাসুলভ সুরও শোনা গেল। মিতিয়ার অন্তত তা-ই মনে হল।

ইত্যবসরে তদন্তকারী ও প্রসিকিউটরের মধ্যে চাপাগলায় গভীর শলাপরামর্শ চলতে লাগল। দেখা গেল, কোটের গায়ে, বিশেষত কোটের পেছনে বাঁ দিকে একটা বিশাল রক্তের ছাপ লেগে আছে, শুকিয়ে চড়চড় করছে, কিন্তু তখনও তেমন একটা ধেবড়ে যায়নি। পেন্টালুনের গায়েও রক্তের দাগ। নিকলাই পার্‌ফেনভিচ এছাড়াও স্থানীয় ভাবে জোগাড় করা নিরপেক্ষ সাক্ষীসাবুদের উপস্থিতিতে, তাদের সাক্ষী মেনে স্বহস্তে আঙুল বুলিয়ে কোটের কলার, হাতার কাফ আর সবগুলি সেলাইয়ের জায়গা এবং পেন্টালুনটাও দেখল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা খুঁজছে—টাকা ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? বড়ো কথা, মিতিয়ার কাছ থেকে এ সন্দেহ গোপন করল না যে মিতিয়া পোশাকের ভেতরে টাকা সেলাই করে রাখতে পারে বা সে ক্ষমতা তার আছে। 'এরা যা করছে সেনাবাহিনীর একজন অফিসারকে নিয়ে লোকে তা করে না, যেন স্রেফ কোনো চোরকে নিয়ে পড়েছে', মিতিয়া আপন মনে গজগজ করে বলল। এই লোকগুলি মিতিয়ার সাক্ষাতেই যে রকম খোলাখুলি ভাবে নিজেদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা আদান প্রদান করতে লাগল সেটাও বেশ অস্বাভাবিক। এই যেমন মুনশি লোকটা, আল্‌টপকা পর্দার অন্তরালে এসে পড়েছিল, ছুটোছুটি করে ওদের ফুটফরমাশ খাটছিল—ওরা দুজনে যখন টুপিটা হাতড়ে দেখছিল তখন সেও নিকলাই পার্‌ফেনভিচের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল: 'সেই যে মুহুরি গ্রিদিয়েন্‌কো—তার কথা মনে আছে তো? গরম কালে কাছারির সকলের মাইনে বাবদ টাকা আনতে গিয়েছিল, ফিরে এসে জানাল মাতাল অবস্থায় কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। তা কোথায় পাওয়া গেল শেষকালে? কোথায় আবার?—টুপির কিনারার ঠিক এই রকম ভাঁজগুলোর ভেতরে—এক শ রুবলের নোট সব পাকিয়ে পাকিয়ে কিনারার ভাঁজের ভেতরে সেলাই করে রেখে দিয়েছিল।' গ্রিদিয়েন্‌কোর ঘটনাটা তদন্তকারী ও প্রসিকিউটর—দুজনেই খুব মনে করতে পারল। সেই কারণে মিতিয়ার টুপিটা সরিয়ে রাখা হল, ঠিক করা হল এসবই পরে আবার

গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে—শুধু টুপি কেন, সমস্ত জামাকাপড়ই দেখতে হবে।

"মাফ করবেন" মিতিয়ার শার্টের ডান হাতার কাফটা গুটিয়ে ভেতরে ঢোকানো এবং সেটা আগাগোড়া রক্তে মাখামাখি দেখে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "মাফ করবেন, এটা কী? রক্ত?"

"হ্যাঁ রক্ত", মিতিয়ার কাটা জবাব।

"বলি কীসের রক্ত, অ্যাঁ? আর কাফটা গুটিয়ে ভেতর দিকে ঢোকানোই বা কেন?"

মিতিয়া যখন গ্রিগোরিকে নিয়ে পড়েছিল তখন যে কী ভাবে তার জামার আস্তিনের কাফে রক্ত লেগে যায় এবং পের্‌খোতিনের বাড়িতে যখন সে হাত ধোয় তখনই যে কাফটা সে গুটিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল সেই ঘটনার বিবরণ সে দিল।

"আপনার শার্টটাও গা থেকে খুলে নিতে হচ্ছে। সাক্ষ্য প্রমাণের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।

মিতিয়া একথায় লজ্জায় লাল হয়ে গেল, তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

"কী বলতে চান? ন্যাংটো হয়ে থাকতে বলেন নাকি?" সে চেঁচিয়ে উঠল।

"চিন্তার কোনোও কারণ নেই। ও আমরা কোনো ভাবে ব্যবস্থা করে নেব। তবে আপাতত একটু কষ্ট করে পায়ের মোজাজোড়াও খুলুন।"

"ঠাট্টা করছেন না তো? এটা কি সত্যি সত্যি এতই দরকার?" মিতিয়ার দু চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"ঠাট্টা তামাশার মেজাজে আমরা নেই", কঠিন স্বরে পালটা জবাব দিল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ।

"কী আর করা? যখন বলছেন দরকার আমি তা হলে " বিড়বিড় করে বলতে বলতে খাটের ওপর বসে পড়ে মিতিয়া পা থেকে মোজা খুলতে শুরু করল। একটা অসহ্য ধরনের অপ্রস্তুত ভাব তাকে পেয়ে বসল। কেবলই মনে হতে লাগল, সকলে দিব্যি জামাকাপড় পরে আছে আর সে কিনা জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে জামাকাপড় খোলা অবস্থায় তার নিজেরই নিজেকে অন্যদের সামনে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে, আর বড়ো কথা, সে নিজে এই বিষয়ে প্রায় একমত যে সত্যি সত্যি হঠাৎ করে সকলের নীচে চলে গেছে এবং এখন তাকে অবজ্ঞা করার পূর্ণ অধিকার ওদের আছে।

'কেউই যদি জামাকাপড় পরে না থাকে তাহলে লজ্জার তেমন কোনো কারণ নেই, কিন্তু একজন জামাকাপড় খুলে রেখেছে আর সবাই তার দিকে চেয়ে আছে—সে বড়ো লজ্জার!' বারবার তার মাথার মধ্যে এই চিন্তাটা খেলতে লাগল। 'ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে আমাকে অনেক সময় এরকম লজ্জার মধ্যে পড়তে

হয়েছে।' কিন্তু পা থেকে মোজা খোলা তার পক্ষে মর্মান্তিকও ছিল। সেগুলি তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না, আর অন্তর্বাসের দশাও তথৈবচ। এখন তা সকলের চোখের সামনে পড়ে গেল। আর বড়ো কথা এই যে নিজের পা দুটো তার পছন্দ নয়, কেন যেন সারাটা জীবন নিজের দু পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো তার কাছে কদাকার বলে মনে হয়েছে—বিশেষত ডান পায়ের একটা নখ—এবড়ো খেবড়ো, চ্যাপ্‌টা ধরনের এবং নিচের দিকে কেমন যেন দোমড়ানো। এখন সকলেই তা দেখতে পারে। দুর্বিষহ্ লজ্জায় সে হঠাৎ আরও বেশি করে এবং ইচ্ছে করেই অভদ্র আচরণ করতে লাগল। নিজেই গা থেকে শার্টটা টেনে খুলে ফেলল।

"আপনারা যদি নেহাৎ লজ্জা না পান তাহলে আরও কোথাও খুঁজে দেখতে চান কি?"

"না, আপাতত দরকার নেই।"

"তাহলে কি আমাকে এই রকম উদোম হয়েই থাকতে হবে?" ক্ষিপ্ত হয়ে সে যোগ করল।

"তা হ্যাঁ, আপাতত এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। একটু কষ্ট স্বীকার করে এখনকার মতো এখানে বসুন, বিছানা থেকে লেপটা নিয়ে গায়ে জড়াতে পারেন।... আমাকে এসব দেখেশুনে ঠিকঠাক করে নিতে দিন।"

স্থানীয় যে সাক্ষীদের জড় করা হয়েছিল সবগুলি জিনিস তাদের দেখান হল, তল্লাশির রিপোর্ট তৈরি করা হল এবং অবশেষে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় জামাকাপড়গুলিও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। ইপ্পলিত কিরিল্লভিচও বেরিয়ে গেল। থাকার মধ্যে থেকে গেল কেবল চাষাভুসো শ্রেণির লোকগুলো, তারা ওর ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মিতিয়া লেপ মুড়ি দিল, তার ঠান্ডা লাগছিল। তার খালি পা জোড়া খাড়া হয়ে বাইরে বেরিয়ে ছিল, কিন্তু ভালোমতো লেপ জড়িয়ে সেগুলিকে কিছুতেই ঢাকতে পারছিল না। নিকলাই পার্‌ফেনভিচের কী হল কে জানে—অনেকক্ষণ হয়ে গেল ফেরার কোনো নাম নেই। 'অসহ্য রকমের দেরি করছে তো!' 'আমাকে একটা কুকুরছানা ভেবেছে নাকি!' দাঁতে দাঁত ঘষল মিতিয়া। 'ওই হতভাগা প্রসিকিউটরটাও চলে গেছে। নির্ঘাত উপেক্ষা করেই চলে গেছে—ন্যাংটো লোককে দেখতে বিশ্রী লাগছিল আর কি।'

মিতিয়া কিন্তু তখনও ধরে নিয়েছিল যে তার জামাকাপড়গুলো ওখানেই কোথাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, দেখা হয়ে যাবার পর আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কী ভীষণ রাগই তার না হল যখন হঠাৎ নিকলাই পার্‌ফেনভিচের আগমন ঘটল একেবারে অন্য আরেক প্রস্ত জামাকাপড় নিয়ে। একটা লোক তার পিছন পিছন সেগুলি নিয়ে আসছিল।

"এই যে রইল আপনার জামাকাপড়", অকুণ্ঠচিত্তে এমন গা ছাড়া ভাবে সে

বলে উঠল যে মনে হল পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে সে রীতিমতো সন্তুষ্ট। চাঞ্চল্যকর এরকম একটা জরুরি পরিস্থিতিতে কালাগানভ্ মশাই ত্যাগস্বীকার করে এটা দান করেছেন, সেই সঙ্গে একটা পরিষ্কার শার্টও আপনার জন্য আছে। সৌভাগ্যবশত ঠিক তার ট্রাঙ্কের ভেতরে পাওয়া গেল। আপনার অন্তর্বাস আর মোজা আপনি রেখে দিতে পারেন।

মিতিয়া ভয়ঙ্কর চটে গেল।

"চাইনে অন্যের জামাকাপড়!" হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে। "আমারগুলো দিন!"

"সেটা সম্ভব নয়।"

"বলছি, আমারগুলো দিন। গোল্লায় যাক কালাগানভ্! ওর জামাকাপড়ের সঙ্গে ও নিজেও গোল্লায় যাক!"

তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। যা হোক, কোনোমতে শান্ত করা গেল। তাকে বুঝিয়ে বলা হল যে তার জামাকাপড়গুলিতে রক্ত লেগে থাকায় সেগুলিকে 'আরও সব সাক্ষ্যপ্রমাণের বস্তুর শ্রেণিভুক্ত করা' ছাড়া গত্যন্তর নেই, 'মামলার সম্ভাব্য পরিণতির কথা বিবেচনা করে' সেগুলি এখন যেমনকার তেমন তার গায়ে রেখে দেওয়া যায় না, সে ভাবে রেখে দেওয়ার 'কোনও অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই'। যা হোক, শেষকালে মিতিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারল। মুখ গোমড়া করে গুম হয়ে রইল, চটপট হাত চালিয়ে জামাকাপড় পরতে লাগল। পরতে পরতে তখনই সে লক্ষ করল এগুলি তার পুরনোগুলোর চেয়ে বেশি দামি এবং এগুলি 'ব্যবহার করা' তার কাম্য ছিল না। তা ছাড়া তার 'মানমর্যাদা খোয়া যাওয়ার মতো চাপাও বটে। আপনাদের আনন্দবর্ধনের জন্য এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাকে আমাকে সং সাজতে বলেন নাকি?'

তাকে আবার বোঝান হল যে এটা সে বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলছে, কালাগানভ্ মশাই তার চাইতে মাথায় একটু লম্বা ঠিকই, কিন্তু সেটা অতি সামান্য, এই কারণে পেণ্টালুনটাই যা একটু লম্বা হতে পারে। তা বললে কী হবে, ঝুলকোটটা কিন্তু কাঁধের দিকে সত্যি সত্যি আঁটো হয়ে গেল।

"ধুত্তোর! বোতাম লাগানোই তো দেখছি দায়", মিতিয়া আবার বলে উঠল। "দয়া করে আমার হয়ে কালাগানভ্ মশাইকে এক্ষুনি জানিয়ে দিন যে তার কাছে জামাকাপড় আর যে-ই চেয়ে থাকুক আমি অন্তত চাইনি, আমাকে ধরে পেড়ে পোশাক পালটে সং সাজানো হয়েছে।"

"উনি সেটা ভালোই বুঝতে পারছেন এবং দুঃখিতও মানে জামাকাপড় দিয়েছেন বলে যে তার দুঃখ হচ্ছে তা নয়, আসলে যা যা ঘটেছে সে সবের জন্যই দুঃখিত", আমতা আমতা করে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ বলতে গেল।

"ওর দুঃখের নিকুচি করেছি! বেশ, এখন তাহলে কোথায় যেতে আজ্ঞা হয়? নাকি এখানেই বসে থাকব?"

তাকে আবার পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে 'সেই ঘরটাতে' যেতে অনুরোধ করা হল। রাগে গমগম করতে করতে কারও দিকে তাকানোর চেষ্টা না করে মিতিয়া বেরিয়ে এলো। অন্যের পোশাকে নিজেকে চরম অপদস্থ বলে তার মনে হতে লাগল—এমনকি এই চাষাভুসো শ্রেণির লোকজন আর ত্রিফন বরিসভিচের সামনে পর্যন্ত। ত্রিফন বরিসভিচের মুখটা আবার হঠাৎ কেন যেন দরজার ওপাশ থেকে এক ঝলক দেখা দিয়ে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল। 'সাজটা কেমন হয়েছে একবার উঁকি মেরে দেখতে এসেছিল আর কি', মিতিয়া মনে মনে ভাবল। মিতিয়া আগে যে চেয়ারটাতে বসে ছিল সেখানে গিয়ে বসল। দুঃস্বপ্নের মতো কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি তার মনের মধ্যে হানা দিতে লাগল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যেন তার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

"তারপর, এবারে আমাকে বেতের বাড়ি মারতে শুরু করবেন নাকি? এ ছাড়া তো আর কিছু করারও বাকি নেই আপনাদের", দাঁতে দাঁত চেপে প্রসিকিউটরকে উদ্দেশ করে সে বলল। নিকলাই পার্‌ফেনভিচের দিকে আর ফিরে তাকানোর প্রবৃত্তিই তার হল না, এমন ভাব দেখাল যেন তার সঙ্গে কথা বলাটাও মর্যাদাহানিকর।

'বড়ো বেশি নিবিষ্ট হয়ে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল আমার মোজাগুলো, আবার মোজার ভেতরটাও উলটে দেখাতে বলেছে হারামজাদাটা। আমার ভেতরের জামাকাপড়গুলো যে কত নোংরা তা সকলকে দেখানোর জন্য ইচ্ছে করেই এটা করেছে!'

"আচ্ছা এবারে সাক্ষীদের জেরায় চলে আসা যাক", দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের প্রশ্নের জবাবেই যেন নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ বলে উঠল।

"হ্যাঁ তা তো বটেই", প্রসিকিউটরও কী যেন ভাবতে ভাবতে চিন্তিতভাবে বললেন।

"আমরা আপনার স্বার্থে যতদূর যা করার করেছি, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ তার কথার সূত্র ধরে বলতে লাগল, "তবে আপনার কাছে যে পরিমাণ টাকা ছিল তার উৎসটা যে কী সে বিষয়ে আমাদের কিছু খুলে বলার ব্যাপারে আপনার দিক থেকে ঘোরতর আপত্তির সম্মুখীন হওয়ায় আমরা এই মুহূর্তে..."

"আপনার এই আঙটির পাথরটা কী পাথর?" নিকলাই পার্‌ফেনভিচের ডান হাতের তিনটি আঙুলে যে তিনটি বড়ো বড়ো দামি পাথর বসানো আঙটি শোভা পাচ্ছিল সেগুলির একটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে স্বপ্নোত্থিতের মতো মিতিয়া বলে উঠল।

"আঙটি?" মিতিয়ার কথারই প্রতিধ্বনি করে আশ্চর্য হয়ে পাল্‌টা প্রশ্ন করল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্।

"হ্যাঁ, এই যে এটা আপনার মাঝের আঙুলের আঙটির পাথরটা যার

ভেতরে সূক্ষ্ম শিরার মতো কী সব দেখা যাচ্ছে। কী পাথর এটা?" কেমন যেন একটা খিটখিটে মেজাজের নাছোড়বান্দা বাচ্চা ছেলের মতো জেদ ধরে রইল মিতিয়া।

"এটা ধোঁয়াটে পোখরাজ", মুচকি হেসে বলল নিকলাই পার্‌ফেনভিচ, "চান তো দেখতে পারেন, আমি খুলে দিচ্ছি

"না, না, খুলতে হবে না!" যেন আচমকা ঘোর কেটে যেতে নিজেই নিজের ওপর রেগে গিয়ে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল মিতিয়া। "খুলবেন না, খোলার দরকার নেই। চুলোয় যাক!... ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা আমার মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছেন! আপনারা কি মনে করেন আমি যদি সত্যি সত্যি বাবাকে খুন করতাম তা হলে আপনাদের কাছ থেকে সেটা গোপন করতাম, আপনাদের সঙ্গে ছল চাতুরি করতাম, মিথ্যে কথা বলতাম, গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম? না দ্‌মিত্রি কারামাজ়ভ্ সেই ধাতুতে গড়া নয়, এটা তার ধাতে সইত না। আমি যদি দোষী হতাম তাহলে হলফ করে বলছি, আপনাদের এখানে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম না, আগে যেমন পরিকল্পনা করেছিলাম সেই মতো সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম না, তার আগেই, ভোরের আলো দেখা দেওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা না করে নিজেকে শেষ করে দিতাম! এটা আমি এখন নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি। আমি আমার জীবনের বিশ বছরেও এতটা শিখতে পারিনি যতটা জানতে পেরেছি এই একটা অভিশপ্ত রাতে! এখন, এই রাতে এবং এই মুহূর্তে আমি কি এই রকম থাকতে পারতাম? থাকতে পারতাম কি? আপনাদের সঙ্গে এই ভাবে বসে এরকম কথাবার্তা বলতে পারতাম, এই ভাবে চলাফেরা করতে পারতাম, এই ভাবে আপনাদের দিকে এবং সারা জগতের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতাম কি যদি আমি সত্যি সত্যি পিতৃহন্তা হতাম, যখন এমনকি গ্রিগোরিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে খুন করেছি এই ভেবে সারা রাত আমার মনে কোনও শান্তি ছিল না? না, ভয়ে নয়, শুধুমাত্র আপনাদের শাস্তির ভয়ে নয়! মর্যাদাহানির ভয়ে! আর আপনারা চাইছেন কি না আপনাদের মতো ঠাট্টাবিদ্রূপকারীরা, যারা কিছুই দেখতে পায় না, কিছুতেই যাদের কোনো বিশ্বাস নেই, যারা ইঁদুরের মতো অন্ধ, সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের কাছে আমি আমার নতুন কুকীর্তি বা আমার আরও নতুন লজ্জার কথা খুলে বলব বা তার বিবরণ দেব?—যদিও অবশ্য তাতে আপনাদের অভিযোগ থেকে রেহাই পেতে পারতাম! কিন্তু না, বরং সাইবেরিয়ায় ঘানি টানব তাও ভালো! যে লোকটা বাবার কাছে যাবার দরজা খুলেছিল এবং সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল সে-ই বাবাকে খুন করে তার টাকা পয়সা লুটপাট করেছিল। সে যে কে আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না, ভেবে ভেবে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি। তবে এটা ঠিক যে সে দ্‌মিত্রি কারামাজ়ভ্ নয়—এটা জেনে রাখুন! এর বেশি আর কিছু আপনাদের বলতে পারছি না। অনেক হয়েছে, আর আমাকে জ্বালাবেন না। নির্বাসনদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড যা দেবার হয় দিন,

কিন্তু আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। এই আমি চুপ করলাম। এবারে ডাকুন আপনাদের সাক্ষীদের!"

মিতিয়ার আকস্মিক ভাবে এই স্বগতোক্তি উচ্চারণ থেকে মনে হল সে যেন ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ভাবে স্থির করে নিয়েছে যে ভবিষ্যতে সে একেবারেই চুপ করে থাকবে। প্রসিকিউটর এতক্ষণ তাকে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র যেন অতি সাধারণ কোনো কথা বলছেন এমন একটা ভাব দেখিয়ে অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠলেন:

ভালো কথা, ওই যে খুলে রাখা দরজাটার কথা আপনি এই মাত্র উল্লেখ করলেন না, ঠিক সেই প্রসঙ্গে এই এখনই যেমন আপনার কাছে, তেমনি আমাদের কাছেও অত্যন্ত কৌতূহলজনক এবং অতি মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ একটা সাক্ষ্যের কথা আপনাকে জানাতে পারি। সাক্ষ্যটা দিয়েছে বুড়ো গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, যে আপনার হাতে আহত হয়েছেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে সে সুস্পষ্টভাবে এবং জোর দিয়ে আমাদের জানায় যে দেউড়ির ধাপ বয়ে নিচে নেমে বাইরে আসার পর বাগানের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ আসছে শুনতে পেয়ে খুলে রাখা ছোটো গেটটা দিয়ে বাগানে ঢুকবে বলে সে স্থির করেছিল। সেই সময়, আপনি অবশ্য আমাদের ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, খোলা জানলার বাইরে যেখান থেকে আপনি আপনার বাবাকে দেখেছিলেন, সেখান থেকে আপনি পালাতে থাকেন। গ্রিগোরি যখন অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে পালিয়ে যেতে দেখে তারও আগে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসেই ডাইনে বাঁয়ে নজর বুলিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল যে জানলাটা বাস্তবিকই খোলা এবং সেই সঙ্গে এও লক্ষ করেছিল যে তার দৃষ্টির আরও কাছাকাছি যে দরজাটা সেটাও সম্পূর্ণ খোলা, অথচ আপনি বলছেন আপনি যতক্ষণ বাগানে ছিলেন ততক্ষণ নাকি ওটা বন্ধই ছিল। আপনার কাছ থেকে একথা গোপন করব না যে গ্রিগোরি নিজে এই দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করছে এবং এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আপনি নির্ঘাত ওই দরজা দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও কী ভাবে বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেটা সে স্বচক্ষে দেখেনি, যেহেতু প্রথম মুহূর্তে সে যখন আপনাকে বাগানের মধ্য দিয়ে বেড়ার দিকে ছুটে পালাতে দেখে সেটা ছিল তার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে।

এই ভাষণ যখন অর্ধপথে মিতিয়া তখনই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল।

"একদম বাজে কথা!" মিতিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠল। "নির্লজ্জ ধোঁকাবাজি! দরজা খোলা সে দেখতেই পারে না, কারণ দরজা তখন বন্ধ ছিল। মিথ্যে কথা বলছে!

"আমার কর্তব্য বিবেচনা করে আমি আবারও আপনাকে বলছি যে সে জোর দিয়ে এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। এ ব্যাপারে তার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সে তার সাক্ষ্যে অনড়। আমরা তাকে বেশ কয়েকবার পালটা জেরা করে দেখেছি।"

"আমিই তাকে কয়েক বার জিজ্ঞাসাবাদ করেছি!" নিকলাই পার্ফেনভিচ উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল।

"মিথ্যে, মিথ্যে! এর অর্থ হয় আমার নামে অপবাদ দেওয়া, নয়তো কোনো পাগলের চোখের ভুল", মিতিয়া তার চিৎকার চালিয়ে যেতে লাগল। "এটা স্রেফ ওর প্রলাপ, রক্তপাত আর আঘাতের ফলে ওর ঘোর লেগেছিল, যখন হুঁশ ফিরে আসে তখন তাই তার মনে হয়েছিল দেখাই যাচ্ছে, ভুল বকছে।"

"কিন্তু এটা তো ঠিক যে দরজাটা যে সে খোলা দেখতে পেয়েছিল সেটা আঘাতের পর যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন নয়, তারও আগে—যখন সে সবে বাইরের বাড়ি থেকে বাগানে ঢুকছিল।"

"কিন্তু কথাটা যে সত্যি নয়। সত্যি নয়! এ হতেই পারে না! এটা সে গায়ের ঝাল মেটানোর জন্য আমার নামে অপবাদ দিচ্ছে। দেখতেই পারে না। আমি দরজা দিয়ে বাইরে পালাইনি।" বলতে বলতে মিতিয়া হাঁপাতে লাগল।

প্রসিকিউটর নিকলাই পারফেনভিচের দিকে ঘুরে সাড়ম্বরে তাকে বললেন, "এবারে দেখান।"

"এই জিনিসটা আপনার পরিচিত?" এই বলে নিকলাই পার্ফেনভিচ্ হঠাৎ টেবিলের ওপর মেলে ধরল দপ্তরে ব্যবহারের উপযোগী আকারের, মোটা কাপড়ের একটা বড়সড় খাম, যার ওপর তখনও অক্ষত তিনটে সিলমোহর দেখা যাচ্ছিল। খামটা অবশ্য খালি, এক পাশ থেকে ছেঁড়া। মিতিয়া চোখ বিস্ফারিত করে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"এটা এটা তো দেখছি বাবার খাম", বিড়বিড় করে সে বলল, "সেই খামটা যার ভেতরে ওই তিন হাজার ছিল আর ওপরে যদি লেখা থাকে, দাঁড়ান, আমাকে বলতে দিন 'আমার ছোট্ট কুঁকড়ি সোনাকে' হ্যাঁ, এই তো তিন হাজার!" সে চেঁচিয়ে উঠল, "তিন হাজার, দেখতে পাচ্ছেন?"

লেখা দেখতে পাচ্ছি তো বটেই, কিন্তু ওটা যখন আমাদের হাতে আসে তখন আর ওর ভেতরে কোনো টাকাকড়ি ছিল না, পর্দার পেছনে খাটের কাছে, খালি অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।"

মিতিয়া কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"ভদ্রমহোদয়রা, আমি বলছি, এটা স্মের্দিকোভের কাজ!" হঠাৎ প্রাণপণ শক্তিতে সে চেঁচিয়ে উঠল। ও-ই খুন করেছে, ও-ই টাকা লুট করেছে। একমাত্র ওরই জানার কথা বুড়োর খামটা কোথায় লুকানো ছিল। এবারে পরিষ্কার বোঝা গেল এটা ওর কাজ!"

"কিন্তু খামের কথা এবং সেটা যে বালিশের তলায় থাকে সে কথা তো আপনিও জানতেন।"

"কখনোই জানতাম না। খামটা কখনোও আমি চোখেই দেখিনি, এই প্রথম দেখছি।

আগে স্মের্দিকোভের কাছ থেকে শুনেছিলাম।  বুড়ো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল একমাত্র সে-ই জানত, আমি জানতাম না ” মিতিয়ার শ্বাস একেবারে রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

“কিন্তু কিছু আগে আপনি নিজেই তো আমাদের কাছে এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে খামটা আপনার পরলোকগত পিতার বালিশের তলায় ছিল। আপনি তো ঠিক এই কথাই বলেছিলেন সে বালিশের তলায় ছিল। তার মানে জানতেন কোথায় ছিল।”

“আমরা তো সেটাই লিখে নিয়েছি!” নিকলাই পার্‌ফেনভিচ জোর দিয়ে বলল।

“বাজে কথা! উদ্ভট কথা! বালিশের তলায় যে ছিল তা আমি একেবারে জানতাম না। তা ছাড়া এমনও হতে পারে যে বালিশের তলায় আদৌ ছিল না।  আমি আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেছিলাম বালিশের তলায় ছিল।  স্মের্দিকোভ্ কী বলছে? আপনারা ওকে জিগ্‌গেস করে দেখেছেন কোথায় ছিল? এটা বড়ো কথা।  আমি ইচ্ছে করে মিথ্যে করে নিজের বিরুদ্ধে বলেছি।  আমি কোনো কথা না ভেবে মিথ্যে করে আপনাদের বলেছিলাম যে বালিশের তলায় ছিল, এখন আপনারা আপনারা তো জানেনই মুখ ফসকালে মিথ্যে কথাও বেরিয়ে আসে। যদি কেউ জানত সে এক স্মের্দিকোভ্ একমাত্র স্মের্দিকোভ্, ও ছাড়া আর কেউ নয়!  কোথায় আছে তা আমার কাছেও সে প্রকাশ করেনি! কিন্তু কাজটা ওর, ওরই কাজ এটা। নিঃসন্দেহে ও-ই খুন করেছে। এটা এখন আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার”, উত্তরোত্তর বেশি করে হতবিহ্বল হয়ে, আরও বেশি মাত্রায় উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অসংলগ্ন ভাবে মিতিয়া বারবার আওড়াতে লাগল। “আমার কথাটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন, এক্ষুনি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে গ্রেপ্তার করুন।  ঠিক ও-ই খুন করেছে সেই সময় যখন আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং যখন গ্রিগোরি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিল—এটা এখন পরিষ্কার।  সে সঙ্কেত করেছিল, তাইতে বাবা খুলে দিয়েছিল।  কারণ এক মাত্র ও-ই একা সঙ্কেত জানত, সঙ্কেত না পেলে বাবা কাউকে খুলত না।

“কিন্তু আবারও আপনি পরিস্থিতির কথা ভুলে যাচ্ছেন” তখনও সেই একই রকম সংযত কণ্ঠে হলেও তারই মধ্যে অনেকটা যেন বিজয়ের চাপা উল্লাসের সুরে প্রসিকিউটর মন্তব্য করলো, “ভুলে যাচ্ছেন যে সঙ্কেত দেবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না যখন দরজা ইতিমধ্যেই খোলা ছিল, আপনি থাকার সময় খোলা ছিল, আপনি যখন বাগানে ছিলেন তখনই খোলা ছিল

“দরজা, দরজা”, এই বলে সে বিড়বিড় করে পরক্ষণেই নির্বাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে প্রসিকিউটরের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর শক্তি হারিয়ে অসহায়ের মতো ধপ করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। সকলে চুপ।

“হ্যাঁ, দরজা!  সে এক অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে কাণ্ড! নাঃ দেখছি, ভগবান আমার

প্রতিকূল!" এবারে একেবারে অর্থহীন চাউনি মেলে ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে সে বলে উঠল।

"তাহলে দেখছেন তো," প্রসিকিউটর গম্ভীর ভাবে বলল, "এখন নিজেই বিচার করে দেখুন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ একদিকে আমাদের এবং আপনাকেও হতবিহ্বল করে দিচ্ছে এই সাক্ষ্য যে দরজাটা খোলা ছিল, আর সেখান দিয়ে আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। অন্য দিকে হঠাৎ কী করে অতগুলো টাকা আপনার হাতে এলো সে সম্পর্কে আপনার এক দুর্বোধ্য, একরোখা এবং কঠোরতার কাছাকাছি এক ধরনের নীরবতা; অথচ আপনার নিজেরই সাক্ষ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ওই টাকা আপনার হাতে আসার তিন ঘণ্টা আগেও মাত্র দশটা রুবল পাবার জন্য আপনি আপনার পিস্তলজোড়া বন্ধক দিয়েছিলেন! এই সব কারণে, আপনিই বলুন কোন্‌টা আমরা বিশ্বাস করব এবং কোন্‌টার ওপর আমরা ভরসা করব? আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনতে পারেন না যে আমরা সেই শ্রেণির লোক 'যারা মানুষকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ ও তাপ উত্তাপহীন', যারা আপনার মহৎ হৃদয়াবেগকে বিশ্বাস করতে অক্ষম। আপনি বরং আমাদের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন। "

মিতিয়া যে রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ল সেটা ছিল অকল্পনীয়। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

"বেশ!" সে হঠাৎ বলে উঠল। আমি আপনাদের কাছে আমার রহস্য উদ্‌ঘাটন করব। আপনাদের বলব কোথা থেকে আমি টাকা পেয়েছিলাম! আমি আমার লজ্জার কথাটা আপনাদের খুলে বলব যাতে এর পর যেমন আপনাদের তেমনি নিজেকেও আর দোষ দেওয়া না যায়।

"আর বিশ্বাস করুন, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", তার কথার খেই ধরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেমন যেন বিগলিত কণ্ঠে নিকলাই পারফেনোভিচ বলল, "বিশ্বাস করুন, ঠিক এই মুহূর্তে অকপটে এবং পরিপূর্ণ ভাবে আপনি যা যা স্বীকার করবেন সেগুলির প্রতিটিই পরে আপনার ভাগ্যের অনুকূলে অপরিসীম প্রভাব তো ফেলতেই পারে, এমনকি এ ছাড়াও

কিন্তু প্রসিকিউটর এই সময় টেবিলের তলা থেকে তাকে সামান্য ঠেলা দিল, ফলে সে যথাসময়ে থেমে গেল। মিতিয়া অবশ্য সত্যি বলতে গেলে কি তার কথায় কোনো কানও দেয়নি।

## সাত

## মিতিয়ার অতি বড়ো রহস্য। তুড়ি মেরে নস্যাৎ

"ভদ্রমহোদয়রা," ওই রকমই উত্তেজিতভাবে সে বলতে শুরু করল, "এই টাকাগুলো আমি পুরোপুরি স্বীকার করতে চাই এই টাকাগুলো *আমারই* ছিল।

প্রসিকিউটর ও তদন্তকারী—দুজনেরই মুখ একেবারে চুন হয়ে গেল। এটা তারা আদৌ আশা করেনি।

"আপনার হল কী করে!" আমতা-আমতা করে নিকলাই পার্ফেনভিচ বলল। আপনার নিজেরই সাক্ষ্য বেলা পাঁচটার সময়ও আপনার

"ধুত্তোর! ওই দিন পাঁচটা আর আমার স্বীকারোক্তির কথা ছাড়ুন তো। ওটা এখন কোনো ব্যাপার নয়! ওই টাকাগুলো আমার ছিল, আমারই ছিল, অর্থাৎ কিনা আমারই চুরি করা টাকা ছিল মানে, আমার নয় তবে আমার চুরি করা। ছিল দেড় হাজার, আর সে টাকা আমার সঙ্গেই ছিল, সব সময় আমার সঙ্গে থাকত..."

"কিন্তু পেলেন কোথা থেকে?"

"গলা থেকে খুলে নিয়েছি, মশাই, আমার এই গলা থেকে। একটা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে আমার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, অনেক কাল হল ঝুলছিল, তা এক মাস হয়ে গিয়েছিল। লজ্জায় অপমানে আমি এতদিন ওটা গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়িয়েছি!"

"কিন্তু কোথা থেকে বাগালেন বলুন তো?"

আপনি বলতে চান 'চুরি' করেছিলাম—তাই ত? আরে এখন সোজা কথাতেই বলুন না। হ্যাঁ আমি মনে করি, যাই বলি আর তাই বলি না কেন, আসলে আমি চুরিই করেছিলাম, তবে আপনি যদি চান বলব 'বাগিয়েছিলাম'। অবশ্য আমার মতে, চুরি করেছিলাম। আর গতকাল সন্ধ্যায় আমি একেবারে চুরি করেছিলাম।"

"গতকাল সন্ধ্যায়? কিন্তু আপনি এই যে বললেন, এক মাস হয়ে গেল ওই টাকা আপনার হাতে এসেছিল!"

"হ্যাঁ। কিন্তু বাবার কাছ থেকে নয়, বাবার কাছ থেকে নয়। চিন্তার কোনো কারণ নেই, বাবার কাছ থেকে চুরি করিনি, করেছিলাম ওর কাছ থেকে। আমাকে বলতে দিন, কথার মাঝখানে বাধা দেবেন না। বড়ো কঠিন ছিল কিন্তু সেটা করা। দেখুন, মাসখানেক আগে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল কাতেরিনা ইভানভ্না ভের্খভ্‌ৎসেভা— আমার এক কালের বাগ্‌দত্তা। আপনারা জানেন কি তাকে?"

"জানি বৈ কি, অবশ্যই জানি।"

“জানি যে আপনারা জানেন। মহাপ্রাণা, মহীয়সী, বড়ো উদার মনের মানুষ, কিন্তু আজ বহুকাল হল আমাকে ঘৃণা করে, হ্যাঁ, অনেক অনেক কাল হল আর ঘৃণা যে করে সেটা যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই করে!”

“কাতেরিনা ইভানভ্‌না?” অবাক হয়ে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ বলে উঠল। প্রসিকিউটর দারুণ অবাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকালেন।

“না, না তার নাম অযথা উচ্চারণ করবেন না! আমি একটা ইতর, তাই তাকে টেনে আনছি। হ্যাঁ, আমি দেখেছি সে আমাকে ঘৃণা করত, অনেক আগে থেকেই করত সেই প্রথম দিন থেকে এমনকি আমার ঘরে সেদিনের সেই সন্ধ্যার ঘটনার পর থেকে। তা সে যাক গে, অনেক হয়েছে, আর নয়। আপনারা ওকথা জানার উপযুক্তই নন। আদৌ কোনো দরকার নেই সে প্রসঙ্গের। একমাত্র যেটা দরকার তা এই যে মাসখানেক আগে সে আমায় ডেকে পাঠিয়ে তিন হাজার আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল টাকাটা আমি যেন মস্কোয় তার বোনকে এবং তার আরও একজন আত্মীয়াকে পাঠিয়ে দিই। কে জানে, নিজে পাঠাতে পারত না না কি! এদিকে আমি সেটা ছিল আমার জীবনের সেই অমোঘ মুহূর্তটি যখন আমি মানে, এক কথায় বলতে গেলে, যখন আমি সবে আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলেছি, সেই তাকে, আমার এখনকার এই ভালোবাসার জনকে, গ্রুশেন্‌কাকে, এখন ওই যে ওখানে, নিচে বসে আছে। আমি তখন ওকে পাকড়াও করে এখানে, মোক্রয়েতে নিয়ে এলাম এবং এখানেই দুদিনে তার পিছনে ওই পোড়ার তিন হাজারের অর্ধেক, অর্থাৎ দেড় হাজার উড়িয়ে দিলাম। বাকি অর্ধেক নিজের কাছে রেখে দিলাম। তা এই সেই দেড় হাজার যা আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম, তাবিজ করে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, গতকাল খুলে বের করে ওড়াই। বাকি যে আটশ রুবল ভাঙানি ছিল তা এখন আপনাদের হাতে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ, গতকালের দেড় হাজারের ভাঙানি।”

“মাফ করবেন। তা কী করে হয়? এক মাস আগে তখন এখানে তো আপনি তিন হাজার উড়িয়েছিলেন, দেড় হাজার নয়। সবাই এটা জানে।”

“কে এটা জানে? কে গুনে দেখেছিল? কাকে আমি গুনতে দিয়েছিলাম?”

“কেন, আপনি নিজেই তো সকলকে বলে বেড়িয়েছিলেন যে তখন ঠিক তিন হাজার উড়িয়েছিলেন?”

“ঠিক কথা, বলেছিলাম। শহরসুদ্ধ সবাইকে বলেছিলাম, আর শহরের সবাই সে কথা বলেওছিল, সবাই তা-ই ধরে নিয়েছিল, এখানে, মোক্রয়তেও সকলে ধরে নিয়েছিল যে তিন হাজার। তবু আসলে কিন্তু তিন নয়, দেড় হাজার উড়িয়েছিলাম। বাকি অর্ধেক একটা থলিমতন সেলাই করে তাবিজ বানিয়ে তার ভেতর রেখে দিয়েছিলাম। এই হল ব্যাপার, ভদ্রমহোদয়রা। গতকালের যে টাকা সেটা এই এখান থেকে।

“এ তো প্রায় অলৌকিক কাণ্ড বলতে হয় তো-তো করে বলল নিকলাই পার্ফেনভিচ্।

“একটা প্রশ্ন করতে দিন”, অবশেষে প্রসিকিউটর বলে উঠলেন, “এই যে পরিস্থিতির কথা আপনি বললেন, এর আগে সে সম্পর্কে অর্থাৎ কিনা, এই দেড় হাজার যে আপনি তখনই, এক মাস আগে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন সে কথা অন্তত যে কাউকে হোক আপনি জানিয়েছিলেন কি?”

“কাউকে বলিনি।”

“এটা কিন্তু অদ্ভুত। তা হলেও সত্যি-সত্যি কি কাউকে নয়? একেবারেই কাউকে নয়?”

“একেবারেই কাউকে নয়। কাউকে নয়, কাউকে নয়।”

“কিন্তু এই নীরবতার কারণ তাহলে কী? কীসের তাগিদে এই নিয়ে আপনার এই গোপনীয়তা? আরও সঠিক ভাবে, খোলসা করে বলতে গেলে আপনি শেষ পর্যন্ত আপনার রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আপনার নিজের কথায়, বড়োই ‘লজ্জাজনক’ এই ব্যাপারটা, যদিও মূলত—অর্থাৎ, অবশ্য নিছক তুলনামূলক বিচারে বলতে গেলে—এই আচরণ, অর্থাৎ অন্যের তিন হাজার রুবল আত্মসাৎ করাটাই লজ্জাজনক। যদি নেহাৎ সাময়িকভাবেও আত্মসাৎ করা হয় তবু নিঃসন্দেহে চরম কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ—অন্তত আমার দৃষ্টিতে একে এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে ততটা লজ্জাজনক নয় যদি তার ওপরে আপনার স্বভাব চরিত্রের কথাটাও মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করে দেখি। এমনকি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে চূড়ান্ত পর্যায়ের অপমানজনক, আমি তাও মেনে নিতে রাজি আছি। তবু বলব, অপমানজনক, তবে লজ্জাজনক নয়। অর্থাৎ আপনার স্বীকারোক্তির কথা বাদ দিলেও ব্যক্তিগত ভাবে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি তা এই যে শ্রীমতী ভের্খভ্‌ৎসেভার কাছ থেকে পাওয়া এই তিন হাজার যে আপনি খরচ করে ফেলেছিলেন ইতিমধ্যে, গত এক মাসে সেটা অনেকেই অনুমান করতে পেয়েছিল। আমি নিজে এই কিংবদন্তি শুনেছি। এই যেমন মিখাইল মাকারভিচ্—উনিও শুনেছেন। তাই শেষপর্যন্ত এটা ঠিক কিংবদন্তি নয়, সারা শহরের চলতি গালগল্প। তা ছাড়া, আমি যদি ভুল না করে থাকি, এমন প্রমাণও আছে যে আপনি কারও কাছে এটা স্বীকারও করেছিলেন, অর্থাৎ ঠিক এটাই স্বীকার করেছিলেন যে আপনার ওই টাকা শ্রীমতী ভের্খভ্‌ৎসেভার কাছ থেকে পাওয়া। তাই তো আমার কাছে এটা ভারি আশ্চর্যের যে আপনি যে দেড় হাজার রুবল আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন বলছেন, এ পর্যন্ত, অর্থাৎ এই একটু আগে আপনি সেটা গোপন রেখেছিলেন, এমন কি কোনো এক নিদারুণ আতঙ্কের বশবর্তী তাকে আপনি এক অসাধারণ রহস্যের রূপ দিয়েছিলেন। এমন একটা রহস্য স্বীকার করার মূল্যস্বরূপ আপনাকে যে এত কষ্ট স্বীকার করতে হতে পারে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ

আপনার কষ্টটা এতই ছিল যে আপনি এমনকি এখনও চিৎকার করে বলেছিলেন যে স্বীকার করার চেয়ে সাইবেরিয়াতে ঘানি টানতে যাওয়াও ভালো।

প্রসিকিউটর তার কথা বন্ধ করলেন। তিনি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর বিরক্তি গোপন করলেন না। সেটা তখন প্রায় ক্রোধের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এমনকি কথাগুলি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত হল কি হল না তার পরোয়া না করে অসংলগ্ন ভাবে প্রায় *ঠেকে-ঠেকে* তার পুঞ্জীভূত বিষজ্বালার সমস্তটা সে উজাড় করে ঢেলে দিলেন।

"লজ্জার কারণ ওই দেড় হাজার নয়, লজ্জার কথাটা এই যে ওই দেড় হাজার আমি তিন হাজার থেকে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম", মিতিয়া দৃঢ়স্বরে বলল।

"কিন্তু তাতে কী হল?" বিরক্তি ভরে কাষ্ঠহাসি হাসলেন প্রসিকিউটর। "অমনিতেই তিন হাজার রুবল আপনি যে উপায়ে নিয়েছিলেন সেটা সম্মানজনক নয়—অবশ্য আপনার যেমন অভিরুচি, বলতে পারেন 'লজ্জাজনক ভাবে' আত্মসাৎ করেছিলেন—এর পর তার অর্ধেকটা যে আপনি আপনার নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে আলাদা করে রেখেছিলেন ঠিক এটার মধ্যেই লজ্জার কী আছে? ওই টাকার কী ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন সেটা নয়, যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল আপনি তিন হাজার আত্মসাৎ করেছেন। ভালো কথা, ঠিক এই রকম বন্দোবস্তই বা করেছিলেন কেন? কী জন্য, কী উদ্দেশ্যে করেছিলেন তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনকি?"

"ওঃ, ভদ্রমহোদয়রা, যত জোর সে তো ওই উদ্দেশ্যের মধ্যেই!" মিতিয়া বলে উঠল। আলাদা করে রেখেছিলাম আমি একটা ছোটো লোক বলে, মানে ঠিক হিসেব করেই করেছিলাম। আর এক্ষেত্রে হিসেব করাটাই হল নীচতা। পুরো একটা মাস আমার এই নীচতা চলতে থাকে!"

"বোঝা গেল না।"

"অবাক করলেন। সে যাক গে, আমি আপনাদের আরও ব্যাখ্যা করে বলব। বলা যায় না, হয়তো সত্যি সত্যি বোধগম্য হবে না। দেখুন, আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনে যান। আমার মান সম্মানের ওপর আস্থা রেখে তিন হাজার রুবল আমার হাতে তুলে দেওয়া হল, আমি তা আত্মসাৎ করলাম। সেই টাকায় আমি উচ্ছৃঙ্খলতা করলাম, সব টাকা উড়িয়ে দিলাম। পর দিন সকালে তার কাছে এসে বললাম, 'কাতিয়া আমার অপরাধ হয়ে গেছে, তোমার তিন হাজার আমি উড়িয়ে দিয়েছি।' তা এখন কী বলেন? সেটা বললে কি ভালো হত? না, ভালো হত না—তার মানে আমি অসৎ, আমি কাপুরুষ, আমি একটা পশু, এতদূর পশু যে আমার কোনো আত্মসংযম নেই—ঠিক কি না, তাই কি না? কিন্তু তাহলেও আমি চোর নই—তাই না? সরাসরি অর্থে তো আর চোর নই, সরাসরি অর্থে নই—মানবেন ত? উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু চুরি করিনি! এবারে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসছি, যেটা কিন্তু অত্যন্ত

লাভজনক। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকুন, নইলে আবার হয়তো গুলিয়ে ফেলব—মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। তা যা বলছিলাম, দ্বিতীয় ঘটনাটা এখানে আমি ওড়ালাম তিন হাজারের মধ্যে মাত্র দেড় হাজার, অর্থাৎ অর্ধেক। পর দিন তার কাছে এলাম, নিয়ে এলাম সেই অর্ধেকটা। বললাম, কাতিয়া আমার কাছ থেকে, এই হতভাগা, কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোটোলোকটার কাছ থেকে এই অর্ধেকটা নাও, কেন না, অর্ধেক আমি উড়িয়ে দিয়েছি, এখন দেখা যাচ্ছে এই অর্ধেকটাও উড়িয়ে দিতে পারি, তাই পাপ বিদেয় হওয়াই ভালো!' আচ্ছা এক্ষেত্রে কী বলা যায়? ইতর জানোয়ার বল, ছোটোলোক বল আর যাই বল, চোর নয়, চোর আদৌ নয়। তার কারণ, আমি যদি চোর হতাম তা হলে ভাঙানো টাকার অর্ধেকটা আমি নিশ্চয়ই ফেরত নিয়ে আসতাম না, বরং সেটাও আত্মসাৎ করতাম। ও তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবে এত তাড়াতাড়ি যখন অর্ধেকটা নিয়ে এসেছে তখন বাকিটাও, অর্থাৎ যেটা উড়িয়ে দিয়েছে সেটাও নিয়ে আসবে, সারা জীবন ওই টাকার সন্ধান করতে থাকবে, কাজ করবে, পেলেই ফেরত দেবে। সে ক্ষেত্রে আমি ইতর হতে পারি, কিন্তু ছ্যাঁচড় নই, চোর আমি নই, যা-ই বলুন না কেন চোর নই!"

"ধরা যাক, কিছু তফাত আছে", তাপ উত্তাপহীন হাসি হেসে প্রসিকিউটর বললেন। "কিন্তু তাহলেও আশ্চর্য এই যে এর মধ্যে আপনি একটা সাঙ্ঘাতিক তফাত দেখতে পাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, সাঙ্ঘাতিক তফাতই দেখতে পাচ্ছি! কোনো মানুষ ইতর হতে পারে, আর সম্ভবত মানুষমাত্রেই তাই। কিন্তু চোর যে কেউ হতে পারে না, একমাত্র চরম ইতর লোকেই হতে পারে। এসব সূক্ষ্ম বিচার অবশ্য আমার আসে না। শুধু এটাই বলতে পারি যে চোর হল ইতরের চাইতেও ইতর—এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শুনুন, আমি যখন পুরো এক মাস ধরে টাকাটা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছি তার মানে কালই আমি মনস্থির করে ওটা ফেরত দিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমি আর ইতর থাকছি না। কিন্তু মনস্থিরই তো আমি করতে পারছি না। কথাটা তো এখানেই। যদিও রোজই মনে মনে স্থির করছি, যদিও রোজ রোজ এই বলে নিজেকে গুঁতো মারছি 'ওরে ইতর, মনস্থির কর, মনস্থির কর', কিন্তু তা হলে কী হবে, দেখছেন তো, পুরো একটা মাস গেল—স্থির করতে পারছি না! কী বলেন? আপনার কি মনে হয় এটা ভালো কথা? ভালো কথা কি?"

'মনে হয় তেমন একটা ভালো কথা নয়। এটা আমি বেশ ভালো বুঝতে পারি এবং এ নিয়ে আমি কোনো তর্ক করছি না", সংযত কণ্ঠে প্রসিকিউটর জবাব দিলেন। "বলছিলাম কি, আসুন, এই সব চুলচেরা বিচার আর ভেদাভেদ নিয়ে এত সব কচলাকচলি মোটের মূলতবি রাখা যাক, আপনার যদি অনুগ্রহ হয় তাহলে আরও একবার কাজের কথায় আসা যাক। ঠিক বলতে গেলে কাজের কথাটা এই যে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম কী উদ্দেশ্যে আপনি গোড়াতেই ওই তিন

হাজার অমন ভাবে ভাগ করেছিলেন, অর্থাৎ এক অর্ধেক উড়িয়ে দিলেন আর বাকি অর্ধেক লুকিয়ে রেখে দিলেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিয়ে আপনি আমাদের বাধিত করেননি। ঠিক বলুন তো, ঠিক কী উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন? ঠিক কোন্ কাজে এই আলাদা করে রাখা দেড় হাজার লাগাতে চেয়েছিলেন? আমি এই প্রশ্নটার ওপর জোর দিচ্ছি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো!" কপাল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠল মিতিয়া। "মাফ করবেন, আমি আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি, অথচ আসল কথাটা খুলে বলছি না, বললে আপনারা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারতেন, কেন না ওই উদ্দেশ্যের মধ্যে, উদ্দেশ্যের মধ্যেই তো আমার যত লজ্জা! দেখুন, এ সবের মূলে আছে ওই বুড়ো, আমার পরলোকগত পিতা। সব সময় আগ্রাফিয়েনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে উত্ত্যক্ত করেছে, আর আমি তাইতে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরেছি। তখন ভেবেছিলাম আমার আর বাবার মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে এই নিয়ে ওর দ্বিধা। তাই আমার প্রতি দিনের চিন্তা আচ্ছা, ওর দিক থেকে হঠাৎ যদি কোনো সমাধান আসে? আমাকে যন্ত্রণা দিতে দিতে যদি ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ কালে দুম করে আমাকে বলে বসে, 'ওকে ভালোবাসি না, তোমাকেই ভালোবাসি, আমাকে দুনিয়ার শেষ প্রান্তে কোথাও নিয়ে চল'? এদিকে আমার থাকার মধ্যে তো আছে দুটো বিশ কোপেক। কী দিয়ে কী করব? ওকে নিয়ে যাব কী করে? তা হলেই তো আমি গেছি! আমি কিন্তু তখন ওকে জানতাম না, ওকে বুঝতে পারি নি। আমি ভেবেছিলাম ওর টাকার দরকার, আমি যে নিঃস্ব তার জন্য ও আমাকে ক্ষমা করবে না। তাই আমি বদমায়েশি করে তিন হাজার থেকে আলাদা করে অর্ধেক টাকা গুনে উঠিয়ে রাখলাম, মাতলামিতে নামার আগেই বেশ হিসেব করে ঠান্ডা মাথায় ছুঁচ সুতো দিয়ে এক টুকরো কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে রাখলাম। সেলাই করা হয়ে যাবার পরই বাকি অর্ধেক দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল মাতলামি করতে চললাম! নাঃ এটা নীচতা ছাড়া আর কী হতে পারে! এখন বুঝলেন তো?"

প্রসিকিউটর উচ্চকণ্ঠে হো-হো করে হেসে উঠলেন, তদন্তকারীও।

"আমার তো মনে হয় সবটা না উড়িয়ে আপনি যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সেটা আপনার সুবুদ্ধি আর নীতিবোধেরই লক্ষণ", ফিক-ফিক করে হেসে বলল নিকলাই পারফেনভিচ, "কারণ এর মধ্যে দোষের আর কী আছে?"

"বাঃ, নেই! এটাই তো দাঁড়াচ্ছে যে চুরি করেছি! হা ভগবান! আপনাদের না বোঝার বহর দেখে আমি আঁতকে উঠছি! যত দিন আমি এই দেড় হাজার কাপড়ের থলের মধ্যে সেলাই করে বুকের ওপর ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিলাম সেই সময় প্রতিটি দিন, প্রতিটি প্রহর আমি মনে মনে নিজেকে বলেছি 'তুমি চোর, তুমি চোর!' হ্যাঁ, এই কারণে এই একটা মাস একটা হিংস্রতা আমাকে পেয়ে বসেছিল, এই সরাইখানায় মারপিট করেছি, এই কারণেই বাপকেও পিটিয়েছি, কেন না আমি মনে মনে উপলব্ধি করছিলাম আমি একটা চোর! এমনকি আমি আমার ভাই

আলিয়োশাকে পর্যন্ত এই দেড় হাজারের রহস্য মনস্থির করে খুলে বলতে পারিনি, আমার সাহসে কুলোয়নি। নিজেকে এত নীচ আর এতটাই জোচ্চোর বলে মনে হচ্ছিল আমার! কিন্তু জানেন, যত দিন আমি এটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি সেই সময় প্রতিটি দিন, প্রতিটি প্রহর আমি মনে মনে নিজেকে এও বলেছি 'না, দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্, তোমাকে হয়তো এখনও ঠিক চোর বলা যায় না।' কেন? 'ঠিক এই কারণেই যে তুমি কালই গিয়ে এই দেড় হাজার কাতিয়াকে দিয়ে আসতে পার।' শেষকালে মাত্র এই গতকালই পের্‌খোতিনের কাছ থেকে ফেনিয়ার কাছে যেতে যেতে আমি আমার গলার তাবিজটা খুলে ছিঁড়ে ফেলব বলে ঠিক করলাম। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু এ ব্যাপারে আমি মন স্থির করতে পারিনি। আর যেই টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম অমনি আমি নিঃসন্দেহে হয়ে গেলাম আমি একটা ডাহা চোর, সারা জীবনের জন্য একটা অসাধু লোক। কেন? তার কারণ, আমি যে কাতিয়ার কাছে গিয়ে বলব আমি ছোটলোক, তবে আমি চোর নই'—তাবিজটা ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সেই স্বপ্নও ছিন্নভিন্ন করে ফেললাম! এখন বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারছেন!"

"বেছে বেছে ঠিক গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই আপনি এই বিষয়ে মনস্থির করলেন?" নিকলাই পারফেনভিচ্ মিতিয়ার কথার প্রায় মাঝখানেই বলে ফেলল।

"কেন? প্রশ্ন করাটা হাস্যকর। তার কারণ, আমি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এখানে ভোরবেলায়, সকাল পাঁচটায় নিজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করব বলে ঠিক করেছিলাম। ভেবে দেখলাম, 'মরতেই যদি হয় তাহলে ছোটলোক আর সজ্জনের কী আছে? সবই তো সমান! কিন্তু না, দেখা গেল সব সমান নয়। বিশ্বাস করুন ভদ্রমহোদয়রা, এই রাতে আমার কাছে যেটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক ছিল তা এই নয়, এই চিন্তা নয় যে আমি বুড়ো চাকরকে খুন করেছি এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড ভোগের বিপদের মুখে পড়েছি, তাও আবার কখন? না, যখন আমার প্রেম জয়মাল্যে ভূষিত হতে চলেছে এবং স্বর্গের দ্বার আবার আমার সামনে খুলে যাচ্ছে! ওঃ এটা আমার পক্ষে মর্মান্তিক ছিল, কিন্তু তেমন নয়; তবু বলব, তেমন নয়, অভিশপ্ত সেই বোধটির মতো নয় যে আমি শেষকালে হতচ্ছাড়া ওই টাকার গোছা আমার বুকের ওপর থেকে টান মেরে খুলে ফেলেছি, সেই টাকা খরচ করে ফেলেছি এবং ফলে এখন একটা ডাহা চোরে পরিণত হয়েছি! ওঃ ভদ্রমহোদয়রা, আবারও আপনাদের বলছি এবং একথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে যে আজ রাতে আমি অনেক কিছু শিখেছি! আমি জেনেছি যে ছোটলোক হয়ে বেঁচে থাকাই শুধু অসম্ভব নয়, সেই অবস্থায় মরাটাও অসম্ভব। না, ভদ্রমহোদয়রা, সৎপথে থেকে মরা উচিত! "

মিতিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব, যদিও সে দারুণ উত্তেজিত।

“আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে শুরু করেছি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্”, নরম সুরে, এমনকি অনেকটা যেন সমবেদনার সুরে টেনে টেনে বললেন প্রসিকিউটর, “কিন্তু এ সবই, আপনি যা-ই বলেন না কেন, আমার মতে, আপনার স্নায়বিক দৌর্বল্য... আপনার স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেছে—এটাই হল কথা! আচ্ছা, এই ধরুন না কেন, প্রায় পুরো একটা মাস আপনি এমন একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করলেন, কিন্তু যে ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করে আপনার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে গিয়ে এই দেড় হাজার ফেরত দিয়ে সব কথা খুলে বললেই তো আপনি সে যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারতেন। সেটা করলেন না কেন? আপনার নিজের বর্ণনা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে আপনার তখনকার অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল, তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যে ছকটা মাথায় আসতে পারত তার আশ্রয় নিলেন না কেন? অর্থাৎ বড়ো মনের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে কেন আপনি তাঁর কাছে আপনার খরচের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ধার চাইলেন না? তাঁর মন যেমন উদার তাতে আপনার অমন দুর্দশা দেখে তিনি অবশ্যই আপনাকে বিমুখ করতেন না—বিশেষত কোনো দলিল জামিন রেখে ধার নেওয়ার যদি প্রশ্ন আসে, অথবা আর কিছু হোক অন্তত কোনো সিকিউরিটির বিনিময়ে, যেমন প্রস্তাব আপনি দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সাম্‌সোনভকে এবং মাদাম খখ্‌লাকোভাকে। আপনার ওই সিকিউরিটির এখনও তো মূল্য আছে বলেই তো আপনি মনে করেন, তাই না?

মিতিয়ার চোখমুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল।

“আপনারা আমাকে তাই বলে অত দূর ছোটলোক বলে মনে করেন নাকি? এমন হতে পারে না যে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে এই কথাগুলি বলছেন!” পরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে এই বলে সে প্রসিকিউটরের চোখের দিকে সরাসরি এমন ভাবে তাকাল যেন সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

“আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন গুরুত্ব দিয়েই বলছি। গুরুত্ব দিয়ে নয় তা ভাবছেন কেন?” এবারে প্রসিকিউটরের অবাক হওয়ার পালা।

“ওঃ সে রকম হলে কী নীচতাই না হত! ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা যে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন সেটা জানেন কি! আপনাদের যদি এতই ইচ্ছা আমি আপনাদের সব বলব, তাই হোক। আমি এখন আমার সমস্ত নারকীয় কাণ্ডকারখানা আপনাদের কাছে স্বীকার করব, কিন্তু তাতে আপনারাই লজ্জায় পড়ে যাবেন, মানুষের রাগ অনুরাগের ছক তাকে কতদূর নীচতার দিকে ঠেলে দিতে পারে তার পরিচয় পেয়ে আপনারা নিজেরাই তাজ্জব বনে যাবেন। জেনে রাখুন, এই যে ছকটা যার কথা আপনি এখুনি বললেন ঠিক সেটাই ইতিমধ্যে আমার নিজেরও ছিল, প্রসিকিউটর মশাই! হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়রা, অভিশপ্ত এই মাসটাতে আমারও মনের মধ্যে এই চিন্তা ছিল [illegible] যে আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে কাতিয়ার

কাছে যাব—এতটাই নীচ হয়ে গিয়েছিলাম আমি! কিন্তু তার কাছে যাব, গিয়ে তাকে আমার বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলব, আর সেই বিশ্বাসভঙ্গের খাতিরে, সেই বিশ্বাসভঙ্গ চরিতার্থ করার জন্যই, সেই বিশ্বাসভঙ্গের পেছনে সামনেই যে খরচ দরকার তার জোগান দেওয়ার জন্য তার কাছে, কাতিয়ার কাছেই কিনা গিয়ে অর্থ ভিক্ষা করব!—শুনছেন, কী বলছি? বলছি, অর্থ ভিক্ষা করব! আর টাকাটা পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাব আরেকজনের সঙ্গে, তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সঙ্গে, যাকে সে ঘৃণা করে, যে তাকে অপমান করেছে! মাফ করবেন প্রসিকিউটর মশাই, আপনি খেপেছেন নাকি!"

"খেপি আর না খেপি, তবে এটা অবশ্য ঠিক যে উত্তেজনার মাথায় আমি মেয়েলি ঈর্ষার কথাটা ঠিক তেমন ভাবে ভেবে দেখিনি যদি অবশ্য এখানে সত্যি সত্যি ঈর্ষা বলে কিছু থেকে থাকে, যেটা আপনি জোর দিয়ে বলছেন। তা হ্যাঁ, এক্ষেত্রে ও রকম কিছু থাকলেও থাকতে পারে।" প্রসিকিউটর কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

"কিন্তু সেটা হলে কী জঘন্য নীচ ব্যাপারই না হত!" ক্ষিপ্ত হয়ে টেবিলে ঘুষি মারল মিতিয়া। "রীতিমতো নোংরা গন্ধ ছাড়ত—সে যে কী রকম তা জানি না! হ্যাঁ, আপনারা জানেন কি, এই টাকা সে আমাকে দিতে পারত, দিতও, হয়তো দিতও, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে দিত, দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের পরম সুখ উপভোগ করত, আমার প্রতি তাচ্ছিল্য বশত দিত, কারণ তার স্বভাবটাও নারকীয়, সে এক দারুণ কোপনস্বভাবের মহিলা! আমি তো টাকাটা নিতেই পারতাম। ওঃ নিলেই নিতে পারতাম। নিলাম, কিন্তু তারপর? হা ভগবান! তারপর সারাটা জীবন আমাকে মাফ করবেন ভদ্রমহোদয়রা, আমি যে অমন চেঁচাচ্ছি তার কারণ এই যে এই চিন্তাটা আমার মনের মধ্যে ছিল, এই কিছুদিন আগেও মাত্র গত পরশুদিনও, ঠিক সেই দিন রাতেও, যখন 'খোচর'কে নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছিলাম, তার পর গতকাল, হ্যাঁ, গতকালও গতকাল সারাটা দিন—এটা আমার মনে আছে, এই ঘটনার আগে পর্যন্ত।

"কোন্ ঘটনার?" নিকলাই পারফেনভিচ কৌতূহল দেখিয়ে কথার মোড় ঘোরাতে গেল, কিন্তু মিতিয়া শুনতেই পেল না।

"আমি আপনাদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি করলাম", মিতিয়া পরিশেষে বিষণ্ণভাবে বলল। "ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা তার গুণাগুণ বিচার করুন। সেটাই যথেষ্ট নয়, গুণাগুণ বিচার করুন বললে কম বলা হল, এটাও যদি আপনাদের মনকে স্পর্শ না করে তা হলে সরাসরি একথাই বলব যে ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা আর আমাকে সম্মান করেন না। এটাই আমার বক্তব্য। সেক্ষেত্রে আমি এই লজ্জা নিয়ে মরব যে আপনাদের মতো লোকদের কাছে আমি স্বীকারোক্তি করেছি! ওঃ, আমি গুলি করে আত্মহত্যা করব! হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা আমার

কথায় বিশ্বাস করছেন না! কী হল? এটাও কি আপনারা লিখে নিতে চান?" এবারে কিন্তু ভয় পেয়েই সে আর্তনাদ করে উঠল।

"তা হ্যাঁ, এই যে কথা আপনি এই এখুনি বললেন", অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ বলল। "মানে, আপনার এই কথাগুলি যে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওই টাকা চাওয়ার জন্য শ্রীমতী ভের্খভ্‌ৎসেভার কাছে যাবার বাসনা আপনার ছিল। আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, অর্থাৎ পুরো এই ঘটনাটি প্রসঙ্গে এবং বিশেষত আপনার পক্ষে, বিশেষ করে আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমাকে এইটুকু দয়া করুন—ভদ্রমহোদয়রা!" দিশেহারা হয়ে হাতে হাত চাপড়াল মিতিয়া। "এটা অন্তত না-ই বা লিখলেন। এটুকু চক্ষুলজ্জা অন্তত আপনাদের থাকা উচিত! আমি কিন্তু আপনাদের সামনে বুকটা চিরে দুফালা করে খুলে দিয়েছি, এখন আপনারা সুযোগ বুঝে সেই কাটা দুটো ফালির ঘা আঙুল দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। হা ভগবান!"

হতাশ হয়ে সে দু হাতে মুখ ঢাকল।

"অত চিন্তার কোনো কারণ নেই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", প্রসিকিউটর তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন, "এখন যা যা লেখা হয়ে গেল সে সবই পরে আপনাকে পড়ে শোনানো হবে, তখন যেটা যেটা মানতে আপনার আপত্তি থাকবে আমরা আপনার কথা মতো সেগুলো বদল করে দেব। এবারে আমি আপনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আরও একবার, এই নিয়ে তৃতীয়বার করছি আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, সত্যি-সত্যিই কি, একেবারেই কি কেউ আপনার ওই সেলাই করে ভেতরে পুরে রাখা তাবিজের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখা টাকার কথা আপনার মুখ থেকে কখনও শোনেনি? এটা কিন্তু, আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ধারণায় আনা প্রায় অসম্ভব।"

"কেউ না, কেউ না, আমি তো আগেই বলেছি, নয়তো আপনারা কিছুই বুঝতে পারেননি! আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিন।"

"বেশ, এই ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পেতেই হচ্ছে, তার জন্য অবশ্য সামনে আরও অনেক সময় পড়ে আছে, তবে আপাতত বিবেচনা করে দেখুন আমাদের হয়তো ডজন ডজন এরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যে আপনি নিজেই চাওড় করে বেড়িয়েছেন এমনকি সর্বত্র চেঁচিয়ে বলে বেড়িয়েছেন যে আপনি এখানে দেড় হাজার নয় তিন হাজার খরচ করেছিলেন। আবার এখন গতকাল যখন আপনার হাতে টাকা এসে গেল তখনও, এরই মধ্যে অনেকের মনে এমন ধারণার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন যে এবারেও তিন হাজার রুবল সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

"ডজন-ডজন কেন, শয়ে শয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ আপনাদের হাতে আছে, শ দুয়েক

সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, শ দুয়েক মানুষ শুনেছে, হাজার খানেক শুনেছে!” মিতিয়া চেঁচিয়ে বলল।

“তাহলেই দেখুন, সবাই, সবাই এক বাক্যে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই *সবাই* কথাটার তো কোনো একটা তাৎপর্য আছে—না কি?”

“কোনও তাৎপর্য নেই। আমি মিথ্যে করে বলেছি, আর আমাকে অনুসরণ করে সবাই সেই মিথ্যেই বলতে লাগল।”

“কিন্তু আপনার ওই ‘মিথ্যে’ বলার কী প্রয়োজন ছিল? এটা আপনি কী বলে ব্যাখ্যা করবেন?”

“কে জানে ছাই! হয়তো বড়াই করে অমনি আর কি বাহবা দেখানোর জন্য যে কতগুলো টাকাই না উচ্ছৃঙ্খলতা করে উড়িয়ে দিয়েছি। এমনও হতে পারে যে সেলাই করে রাখা ওই টাকাগুলোর কথা ভুলে থাকার জন্য হ্যাঁ, ঠিক এই কারণেই বটে ধুত্তোর! কতবার যে আপনারা আমাকে এই প্রশ্নটাই করছেন! বেশ তো বলেছি, মিথ্যে করে বলেছি, একবার যখন বলেই ফেলেছি তখন শোধরানোর জন্য কোনো গা করিনি। মানুষ যে কখন কখন মিথ্যে কথা বলে, কীসের জন্য বলে?”

“মানুষ কীসের জন্য মিথ্যে কথা বলে সেটা স্থির করা খুবই মুশকিল, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ”, গম্ভীর ভাবে বললেন প্রসিকিউটর। “যা হোক, বলুন তো যেটাকে আপনি আপনার গলার তাবিজ বলছেন সেটা কি বেশ বড়ো ছিল?”

“না, বড়ো নয়।”

“তা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কতটা বড়ো ছিল বলবেন কি?”

“এক শ রুবলের নোট ভাঁজ করে অর্ধেক করলে যেমন হয় ততটাই বড়ো।”

“কাপড়ের টুকরোগুলো দেখাতে পারলে কিন্তু ভালো হত। সেগুলো নিশ্চয় আপনার কাছেই কোথাও আছে?”

“ধুৎ! কী সব বাজে কথা! জানি নে কোথায় আছে।”

“কিন্তু মাফ করবেন, তাহলেও বলবেন কি কোথায় এবং কখন গলা থেকে খুলে ফেলেছিলেন? আপনি নিজেই তো সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মাঝখানে আপনি বাড়িতে যাননি?”

“সেই তখন, যখন ফেনিয়ার কাছ থেকে বেরিয়ে পেরখোতিনের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। সেই সময় পথে আমি গলা থেকে টান মেরে খুলে ভেতরের টাকাগুলো খুলে বের করে নিয়েছিলাম।”

“অন্ধকারের মধ্যে?”

“এখানে মোমবাতির কী দরকার? হাতের আঙুল দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কাজটা সেরেছি।”

“কাঁচি ছাড়াই? রাস্তার ওপরে?”

"যতদূর মনে হচ্ছে বাজার চত্বরে। কাঁচির কী দরকার? একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া, সঙ্গে সঙ্গে পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল।"

"তা, পরে কোথায় রাখলেন?"

"ওখানেই ফেলে দিলাম।"

"ঠিক কোথায়?"

"কোথায় আবার? বাজার চত্বরে, মোট কথা ওই বাজার চত্বরেই! বাজার চত্বরের কোথায় তা কে জানে ছাই? তা ছাড়া তাতে আপনাদের কী দরকার?"

"এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ। এগুলো সব সাক্ষ্য প্রমাণের বস্তু, এতে আপনারই লাভ—এটা আপনি বুঝছেন না কেন? এক মাস আগে ওটা সেলাই করতে কে আপনাকে সাহায্য করেছিল?"

"কেউ সাহায্য করেনি। আমি নিজেই সেলাই করেছিলাম।"

"আপনি সেলাই করতে জানেন নাকি?"

"একজন সৈনিককে সেলাই ফোঁড়াই জানতে হয়। এর জন্য আলাদা ভাবে কোনও জ্ঞানের দরকার হয় না।"

"যার ভেতরে সেলাই করে রেখেছিলেন সেই কাপড়টা, মানে ন্যাকড়ার সেই ফালিটা আপনি কোত্থেকে পেলেন?"

"আপনি তামাশা করছেন না কি?"

"আদৌ নয়। তা ছাড়া ঠাট্টা তামাশার মেজাজে আমরা নেই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্।"

"কাপড়টা কোত্থেকে নিয়েছিলাম মনে নেই—কোনো জায়গা থেকে হবে আর কি।"

"মনে হচ্ছে এটাও যেন আপনি মনে করতে পারছেন না?"

"ঈশ্বরের দোহাই, সত্যি বলছি মনে নেই। হয়তো ভেতরে পরার কোনো জামাকাপড় থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলাম।"

"এতে বেশ আগ্রহ বোধ করছি। কাল আপনার খানাতল্লাশি চালালেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ওই জিনিসটা। বলা যায় না, যেখান থেকে আপনি টুকরোটা ছিঁড়ে নিয়েছিলেন সেটা হয়ত একটা শার্ট। কীসের ছিল সেই কাপড়টা? শণকাপড় না অন্য কোনো ধরনের মোটা কাপড়?"

"কে ছাই জানে কী কাপড়? দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার যেন মনে হচ্ছে কোনো জায়গা থেকে ছিঁড়ে নিতে হয়নি। ওটা ছিল ক্যালিকো কাপড়। মনে হচ্ছে আমার বাড়িউলির একটা পাতলা টুপির ভেতরে সেলাই করে রেখেছিলাম।"

"বাড়িউলির টুপির ভেতরে বলছেন?"

"হ্যাঁ ওটা আমি ওর কাছ থেকে সরিয়েছিলাম।"

"সরিয়েছিলেন কেমন?"

"দেখুন, আমি সত্যি-সত্যি, আমার মনে পড়ছে, একবার মেয়েদের মাথার পাতলা কাপড়ের একটা টুপিকে এক টুকরো বাজে কাপড় বলে তুলে নিয়েছিলাম, বোধহয় কলমের নিব মোছার জন্য। না বলে কয়েই নিয়েছিলাম, কেন না ওটা কারও কাজে লাগার মতো অবস্থায় ছিল না, এক টুকরো বাজে কাপড় হয়ে আমার ঘরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। এই সময় আমার হাতে এলো এই দেড় হাজার। আমি নোটগুলো নিয়ে ওর মধ্যে ভরে সেলাই করে ফেললাম। মনে হচ্ছে যেন এই ন্যাকড়াটার ভেতরেই সেলাই করে রেখেছিলাম। পুরনো এক টুকরো ক্যালিকো কাপড়। রদ্দি মেরে গেছে, হাজার বার ধোয়া কাচা হয়েছে।"

"আচ্ছা এটা কি আপনার পরিষ্কার মনে আছে?"

"জানি না, পরিষ্কার কি না জানি না। মনে হচ্ছে যেন মেয়েদের মাথার হালকা টুপি। মরুক গে, ওতে আমার বয়েই গেছে!"

"সেক্ষেত্রে আপনার বাড়িউলি অন্তত এটা তো মনে করলেও করতে পারে যে তার এই জিনিসটা খোয়া গিয়েছিল?"

"আদৌ নয়। ওটার অভাব চোখে পড়ার মতো ছিল না। একটা পুরনো কাপড়ের টুকরো। আপনাদের তো বলেইছি পুরনো কাপড়ের টুকরো। কানাকড়ি মূল্য নেই।"

"আর ছুঁচ কোত্থেকে জোগাড় করলেন? সুতো?"

"আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, আর চালানোর ইচ্ছে নেই। অনেক হয়েছে।" শেষ পর্যন্ত মিতিয়া রেগে গেল।

"যাই বলুন না কেন, বাজার চত্বরের ঠিক কোন্ জায়গাটাতে আপনি ওই আপনার ওই তাবিজটা ফেলে দিয়েছিলেন তা যে এমন বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন এটা কিন্তু আশ্চর্যের কথা।"

"আরে আগামীকাল চত্বরটা ভালো করে ঝাঁট দেবার হুকুম দিন না, হয়তো পেয়ে যাবেন।" মিতিয়া মুচকি হাসল। "হয়েছে, অনেক হয়েছে ভদ্রমহোদয়রা!" যন্ত্রণাকাতর স্বরে সে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করেননি! এতটুকুও নয়, কানাকড়িও নয়! দোষটা আপনাদের নয়, দোষটা আমার। এর মধ্যে যাওয়াই উচিত হয়নি আমার। কেন, কেন যে আমি আমার গোপন রহস্য আপনাদের কাছে স্বীকার করে নিজেকে আপনাদের কাছে ঘৃণার পাত্র করে ফেললাম! আপনাদের কাছে এটা হাসির কথা। সে আমি আপনাদের চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। আপনি, প্রসিকিউটর মশাই, আপনিই আমার এমন হাল করে ছেড়েছেন! যান, পারলে এবারে বিজয়ের গীত গান গিয়ে। উচ্ছন্নে যান আপনারা, যত সব অত্যাচারীর দল!"

মাথা হেঁট করে সে দু হাতে মুখ ঢাকল। প্রসিকিউটর ও তদন্তকারী চুপ করে রইল। মিনিট খানেক বাদে সে মুখ তুলে কেমন যেন অর্থহীন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল। যে হতাশার ভাব ইতিমধ্যে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং যা ছিল

প্রতিকারহীন এবারে তার চোখেমুখে তা প্রকট হয়ে উঠেছে। কেমন যেন ধীরে ধীরে সে চুপচাপ হয়ে গেল। বসে যে আছে তাও যেন কেমন আত্মবিস্মৃত হয়ে। এদিকে কাজ শেষ না করলে নয়। আর কালবিলম্ব না করে সাক্ষীদের জেরা করার কাজ শুরু করতে হয়। সকাল আটটা বেজে গেছে। অনেক আগেই মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ জেরা চলছিল সেই সময়ের মধ্যে মিখাইল মাকারভিচ আর কালাগানভ্ ক্রমাগত একবার ঘরের ভেতরে ঢুকছিল, আবার বাইরে যাচ্ছিল। এবারে ওরা দুজনেই আবার বাইরে চলে গেছে। প্রসিকিউটর আর তদন্তকারীকেও রীতিমতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বাদল দিনের সকাল শুরু হয়েছে। আকাশ আগাগোড়া মেঘে ছেয়ে আছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মিতিয়া অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে জানলার দিকে তাকাল।

"জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পারি কি?" হঠাৎ সে নিকলাই পারফেনভিচকে জিগ্‌গেস করল।

"হ্যাঁ অবশ্যই, যত খুশি তাকিয়ে দেখুন না", নিকলাই পার্‌ফেনভিচ জবাব দিল।

মিতিয়া উঠে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলার সবুজাভ ছোটো ছোটো কাচের গায়ে বৃষ্টির জোর ঝাপটা এসে লাগছে। বাইরে জানলার ঠিক নিচে চোখে পড়ছে কাদা মাখা রাস্তাটা, আর তারও পরে বেশ খানিকটা দূরে বৃষ্টির আবছায়াতে দীনহীন কালো কালো কুটিরের কদাকার কতকগুলি সারি—বৃষ্টির ফলে আরও বেশি কালো, আরও বেশি কদাকার দেখাচ্ছে। মিতিয়ার মনে পড়ে গেল 'স্বর্ণকেশী জ্যোতির্ময় আদিত্যদেবের' কথা, মনে পড়ে গেল তাঁর প্রথম আলোর কিরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে আত্মহত্যা করবে বলে সে ভেবেছিল। 'বরং এরকম এরকম একটা সকালে হলেই হয়তো ভালো হত' এই ভেবে সে মনে মনে হাসল। তারপর হঠাৎ হাতটা ওপর থেকে নিচে ঝাপটা দিয়ে সে তার 'নির্যাতনকারীদের' দিকে ফিরে তাকাল।

"ভদ্রমহোদয়রা!" সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি আমার আর উদ্ধারের আশা নেই। কিন্তু ওর দশা কী হবে? আপনাদের পায়ে পড়ি, আমাকে বলুন ওর কথা। আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও কি ডুবল তাহলে? কিন্তু ওর তো কোনো দোষ নেই। গতকাল ও যে চেঁচিয়ে বলেছিল 'সব দোষ আমার', সে তো ও সজ্ঞানে ছিল না বলে। ওর কোনো দোষ নেই, কোনোই দোষ নেই ওর! আপনাদের সঙ্গে এখানে বসে বসে আমি সারা রাত ওর কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছি। ... আপনাদের পক্ষে কি একথা বলা সম্ভব নয়, আপনারা কি বলতে পারেন না ওকে নিয়ে এখন আপনারা কী করবেন?"

"এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ", তৎক্ষণাৎ, স্পষ্টতই তাড়াতাড়ি করে জবাবে বলে উঠলেন প্রসিকিউটর। "যে মহিলাটি সম্পর্কে

আপনার এত আগ্রহ তাকে বিরক্ত করার মতো কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ অন্তত আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আশা করি ভবিষ্যতে ঘটনার যখন অগ্রগতি ঘটতে থাকবে তখনও অবস্থাটা এরকমই হবে। বরং আমরা এই বিষয়ে আমাদের দিক থেকে যতদূর যা সম্ভব করব। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, ভদ্রমহোদয়রা। আমি কিন্তু ঠিকই জানতাম, যা-ই হোক না কেন, আপনারা সৎ, আপনাদের বিচার বিবেচনাবোধ আছে। আপনারা আমার বুকের বোঝা হালকা করে দিলেন। তাহলে এবারে আমাদের কী কর্তব্য? আমি প্রস্তুত।"

"বলছিলাম কি, আর দেরি করা চলে না। আর ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষীদের জেরার কাজ শুরু করা দরকার। এ সবই হওয়া চাই আপনার উপস্থিতিতে, সেই কারণে

"তার আগে একটু চা খেয়ে নিলে হয় না?" নিকলাই পার্‌ফেনভিচ বাধা দিয়ে বলল। "আমার তো মনে হয় এটা আমাদের প্রাপ্যও বটে!"

মিখাইল মাকারভিচ্ ইতিমধ্যে নিচে চলে গেছে—নির্ঘাত 'চাপানের' উদ্দেশ্যেই গেছে। তাই ঠিক করা হল নিচে যদি চা তৈরি থাকে তাহলে তারা এক গেলাস করে চা খেয়ে নেবে, তারপর কাজ শুরু করে 'যতদূর চলে চালিয়ে যাওয়া যাবে'। আসল যে চা আর 'জলখাবার' তা আরেকটু বেশি অবসর না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে। বাস্তবিকই নিচে চায়ের সন্ধান মিলল। সেই চা শিগ্‌গিরই ওপরে জোগান দেওয়া হল। নিককলাই পার্‌ফেনভিচ্ সৌজন্যবশত মিতিয়াকে চা দিতে গেল, মিতিয়া প্রথমে চায়ের গেলাস নিতে রাজি হল না, কিন্তু পরে নিজেই চেয়ে নিয়ে ব্যগ্র হয়ে খেয়ে নিল। তাকে মোটের ওপর কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল, এমনকি আশ্চর্যরকম বিধ্বস্তই দেখাচ্ছিল। সে যেমন আসুরিক শক্তির অধিকারী তাতে মনে হতেই পারে এক রাতের এই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং তার সঙ্গে না হয় এসে জুটলই বা প্রবল আবেগ উচ্ছ্বাস—তাতেই বা তার কী এমন হতে পারে? কিন্তু সে নিজে উপলব্ধি করতে পারছিল যে সে কোনোমতে চেয়ারে বসে আছে এবং থেকে থেকে তার চোখের সামনে চারপাশের সব কিছু দুলতে আর ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। 'আরেকটু হলেই সম্ভবত ভুল বকতে শুরু করব'—সে নিজের মনে ভাবল।

## আট

## প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য। ছাওয়াল

সাক্ষীদের ধরে ধরে জেরা করা শুরু হয়ে গেল। তবে আগের মতো এবারে কিন্তু আমাদের কাহিনিতে আমরা আর অমন বিশদ বর্ণনার মধ্যে যাচ্ছি না। আর সেই

কারণে আহূত প্রতিটি সাক্ষীকে নিকলাই পারফেন্‌ভিচ্ কীভাবে জনে জনে বুঝিয়ে বলেছিল যে তার উচিত হবে সততা ও বিবেক অনুসারে সাক্ষ্য দেওয়া এবং পরে তাকে যে শপথ করে তার নিজের সেই সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি করতে হবে, শেষে প্রত্যেক সাক্ষীকে যে তার নিজের এজাহারে স্বাক্ষর করতে হবে ইত্যাদি প্রসঙ্গও আমরা বাদ দেব। আমরা শুধু এইটুকুই লক্ষ করব যে জেরার সময় যেটা প্রধানতম বিষয় ছিল, সমস্ত মনোযোগের যেটা মুখ্য লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল তা ছিল সেই একই প্রশ্ন, সেই তিন হাজার রুবলের প্রশ্ন, অর্থাৎ প্রথমবার এখানে মোক্রয়েতে, এক মাস আগে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের প্রথমবারের উচ্ছৃঙ্খল আমোদফুর্তির সময়ই বা কতটা ছিল—তিন, না দেড় হাজার? দুঃখের বিষয় সবগুলি সাক্ষ্য, একে একে সবগুলিই মিতিয়ার বিরুদ্ধে গেল! একটিও যদি তার পক্ষে থাকত! কোনো কোনো সাক্ষ্য তো আবার মিতিয়ার সাক্ষ্যকে খণ্ডন করে এমন সব নতুন নতুন তথ্য হাজির করল যা প্রায় পিলে চমকানোর মতো।

প্রথম যার সাক্ষ্য নেওয়া হল সে ছিল ত্রিফন বরিসভিচ্। জেরার মুখে সে এতটুকু ভয় তো পেলই না বরং অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর এমন কঠিন, এতটাই কঠোর বিতৃষ্ণার ভাব দেখাল যে তারই ফলে তার চেহারার মধ্যে নিঃসন্দেহে গভীর সত্যনিষ্ঠা ও আত্ম-মর্যাদাবোধের লক্ষণও ফুটে উঠেছিল। কথা সে কমই বলল, সংযত ভাবে বলল, প্রশ্নের জন্য প্রতীক্ষা করল, সঠিক ও সুচিন্তিত উত্তর দিল। কোনো রকম ভনিতা না করে দৃঢ়স্বরে সে সাক্ষ্য দিল যে এক মাস আগে এখানে যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছিল তা তিন হাজারের কম হতেই পারে না, এখানকার সাধারণ লোকজন যারা আছে তারা সকলেই এক বাক্যে এই সাক্ষ্য দেবে যে 'মিত্রি ফিয়োদরিচ'-এর নিজের মুখ থেকেই তারা তিন হাজারের কথা শুনেছে। "একমাত্র জিপ্‌সি মেয়েগুলোর পেছনেই তো কত টাকা উড়িয়েছেন। একমাত্র ওদের পেছনেই সম্ভবত হাজারের ওপর গেছে।"

"হুঃ! পাঁচশও হয়তো দিইনি", মিতিয়া তাতে বিষণ্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করল। "শুধু কথাটা এই যে তখন গুনে দেখিনি। মাতাল অবস্থায় ছিলাম। এখন আফশোস হচ্ছে..."

মিতিয়া এবারে পর্দার দিকে পিঠ করে এক পাশে বসে ছিল, মনমরা হয়ে কথাগুলি শুনছিল, তাকে বিষণ্ণ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন এখনই বলে উঠবে: 'বলুন, বলুন, যা প্রাণ চায় বলুন, আমার এখন কিছুতেই কিছু এসে যায় না!'

"হাজারের ওপর ওদের পেছনে গেছে মিত্রি ফিয়োদরভিচ", দৃঢ়স্বরে মিতিয়ার কথার প্রতিবাদ করে বলল ত্রিফন বরিসভিচ, "এলোপাতাড়ি টাকা ছড়িয়েছেন, ওরা সেগুলো কুড়িয়েছে। এই লোকগুলো সব চোর বাটপার, ঠক প্রকৃতির, এরা ঘোড়া চুরি করে। এখান থেকে ওদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারত আপনার ঘাড় ভেঙে কত টাকা লুটেছে। আমি নিজের চোখে তখন আপনার

হাতে ওই পরিমাণ টাকা দেখেছিলাম। যদি গোনার কথা বলেন, সে আমি গুনে দেখি নি। এটা অবশ্য ঠিক যে আপনি আমায় গুনতে দেননি। তবে আমার মনে আছে চোখের আন্দাজে যতদূর মনে হয়েছিল—দেড় হাজারের অনেক বেশিই ছিল।... কীসের দেড় হাজার! টাকা পয়সা আমরাও চোখে দেখেছি, বিচার করার খ্যামতা আমাদেরও আছে।

গতকালের টাকার পরিমাণ প্রসঙ্গে ত্রিফন বরিসভিচ এই সাক্ষ্য দিল যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ গাড়ি থেকে নামামাত্র নিজ মুখে তাকে জানিয়েছিল যে তিন হাজার এনেছে।

"হয়েছে, কী সব বলছেন ত্রিফন বরিসভিচ!" মিতিয়া আপত্তি জানাতে গেল। বলল, "তাই বলে বলতে চান আমি সুনিশ্চিত জানিয়েছিলাম যে তিন হাজার নিয়ে এসেছি?"

"বলেছিলেন মিত্রি ফিয়োদরভিচ। আন্দ্রেইয়ের সামনে বলেছিলেন। এই তো আন্দ্রেই, সশরীরে এখানেই আছে, এখনও চলে যায়নি। ওকে ডেকে আনুন না। তারপর হলঘরে আপনি যখন গানবাজনার দলটাকে আদর আপ্যায়ন করছিলেন সরাসরি জোর গলায় চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে ছয় হাজারের শেষ এক হাজার এখানে রেখে যাচ্ছেন—তার মানে, আগে যা খরচ করেছিলেন সেইগুলো নিয়ে—তাই তো। স্তেপান শুনেছে, সেমিওনও শুনেছে। তাছাড়া পিয়োতর ফোমিচ্ কালাগানভ্—তিনিও আপনার সঙ্গে, আপনার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরও হয়তো মনে আছে..."

ছয় হাজারের শেষ এক হাজার সম্পর্কে পাওয়া এই সাক্ষ্যটি সাক্ষ্যগ্রহণকারীদের মনে এমন অসাধারণ প্রভাব ফেলল যে তারা সেটা গ্রহণ করে নিল। নতুন ভাষ্যটি তাদের মনে ধরল তাই তো, তিন আর তিন—তার মানে ছয়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, তখন তিন হাজার আর এখন তিন হাজার—এই তো পাওয়া যাচ্ছে মোট ছয় হাজারের হিসাব, সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

সাধারণ চাষাভুসো শ্রেণির লোকজনের মধ্যে যারা ছিল—স্তেপান, সেমিওন, গাড়োয়ান আন্দ্রেই—যাদের উল্লেখ ত্রিফন বরিসভিচ্ করেছিল, তাদের এবং পিয়োতর ফোমিচ কালাগানভ্‌কেও জেরা করা হল। চাষাভুসো লোকগুলো আর গাড়োয়ানটি এতটুকু ইতস্তত না করে ত্রিফন বরিসভিচের সাক্ষ্যকে সমর্থন করল। তা ছাড়া রাস্তায় আসতে আসতে মিতিয়ার সঙ্গে আন্দ্রেইয়ের যে কথাগুলি হয়েছিল আন্দ্রেইয়ের মুখ থেকে শুনে সেগুলি তারা বিশেষ করে টুকে নিল। সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী, মিতিয়া তখন আন্দ্রেইকে বলেছিল 'এই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ শর্মার গতি কোথায় হতে পারে? নরকে, না স্বর্গে? তোমার কী মনে হয়?' কথাগুলি শুনে 'মনস্তাত্ত্বিক' ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের মুখে সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল। দ্‌মিত্রি যে বলেছিল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ শর্মার গতি কোথায় হতে পারে এই মর্মে যে সাক্ষ্য পাওয়া গেল শেষকালে সেটাও তিনি 'মামলার নথিভুক্ত' করার জন্য সুপারিশ করলেন।

কালাগানভ্‌কে জেরার জন্য ডেকে পাঠানো হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে হাজির হল, ভুরু কুচকে, তিরিক্ষি মেজাজে ঘরে ঢুকল। প্রসিকিউটর আর নিকলাই পার্‌ফেনভিচের সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করল যেন জীবনে এই প্রথম তাদের দেখছে, অথচ সে তাদের বহুকালের পুরনো পরিচিত এবং রোজই তাদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎও হয়। সে শুরুই করল এই বলে যে এর কিছুই সে 'জানে না এবং জানতে চায়ও না'। কিন্তু ওই ছয় হাজারের শেষ এক হাজারের কথাটা দেখা গেল সেও শুনেছে এবং স্বীকার করল সেই মুহূর্তে সে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার মতে, টাকা ছিল মিতিয়ার হাতে, তবে 'কত, তা জানি না'। পোল দুটি যে তাস নিয়ে কারচুপি করেছিল সেটা সে তার সাক্ষ্যে সঠিক বলেই স্বীকার করল। বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে এটাও স্পষ্ট বলেই জানা গেল যে পোলদুটোকে তাড়ানোর পর আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না নিজে বলল যে সে তাকে ভালোবাসে। কালাগানভ্ এমন সংযতভাবে ও সশ্রদ্ধচিত্তে তার সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করল যেন সে অতি উচ্চবর্গের সমাজের কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলা। এমনকি কথা প্রসঙ্গে একবারও তাকে পরিচিত 'গ্রুশেন্‌কা' ডাক নামে উল্লেখ করার মতো স্পর্ধা দেখাল না। সাক্ষ্যদানের প্রতি যুবকের স্পষ্টতই প্রবল বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ কিন্তু তাকে অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করল। মিতিয়ার 'রোমান্স' বলতে যা বোঝায় সেটা যে সেই রাতে ঠিক কী রূপ নিয়েছিল একমাত্র কালাগানভের কাছ থেকে তা বিশদে জানা গেল। মিতিয়া একবারও কালাগানভ্‌কে তার কথার মাঝখানে থামাল না। অবশেষে যুবককে ছেড়ে দেওয়া হল। ঘর যখন ছাড়ল তখনও যে সে প্রচণ্ড রেগে আছে তা সে গোপন রাখল না।

পোল দুটিকেও জেরা করা হল। তারা তাদের ওই ঘরে যদিও ঘুমোবে বলে শুয়ে পড়েছিল, তবু সারারাত তাদের চোখে ঘুম আসেনি। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এসে যাওয়ায় তারা তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরে তৈরিই হয়ে ছিল, নিজেরাই বুঝতে পেরেছিল অতি অবশ্য তাদেরও তলব করা হবে। মর্যাদাব্যঞ্জক ভাব নিয়ে তারা হাজির হল, যদিও মনে মনে খানিকটা ভয়ও তাদের ছিল। দেখা গেল দুই 'পান্'-এর মধ্যে যে লোকটা প্রধান, অর্থাৎ ছোটো জন দ্বাদশ শ্রেণিভুক্ত এক অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, সাইবেরিয়ায় পশু চিকিৎসক ছিল। পদবি ধরে তাকে অবশ্য বলতে হয় পান্ মুসিয়ালভিচ্। আর অন্য যে লোকটা, পান্ ভ্রুব্‌লিওভ্‌স্কি, দেখা গেল সে নামে 'ডেন্টিস্ট'—সোজা কথায়, ভুয়া পরিচয়ে দাঁতের চিকিৎসা করে। যদিও মিখাইল মাকারভিচ্ এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তবু ওরা দুজনে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতাবশত তাঁকেই এখানে মুখ্য পদাধিকারী ও প্রধান কর্তাব্যক্তি ধরে নিয়ে তাঁকে উদ্দেশ করে নিকলাই পার্‌ফেনভিচের প্রশ্নগুলির জবাব দিতে লাগল এবং কথায় কথায় মিখাইল মাকারভিচ্‌কে 'কর্নেল 'মোশাই' বলে সম্বোধন করতে লাগল। বার কয়েক এরকম হওয়ার পর মিখাইল মাকারভিচ্ নিজেই যখন তাদের

তিরস্কার করলেন একমাত্র তখনই তারা অনুমান করতে পারল যে প্রশ্নের জবাবগুলি একান্তভাবে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্‌কে উদ্দেশ করেই দেওয়া উচিত। দেখা গেল রুশভাষাটা তারা বেশ ভালোই বলতে পারে, এমনকি দস্তুরমতো নির্ভুলই বলতে পারে, শুধু কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণে কিছু কিছু টান আছে—এই যা। গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে তার আগেকার এবং এখনকার সম্পর্কের বিষয়টি পান্ মুসিয়ালভিচ্ সগর্বে ও আবেগে বলতে যাচ্ছিল, তাতে মিতিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, জানিয়ে দিল যে তার উপস্থিতিতে 'ছোটলোকটার' মুখে অমন কথা সে বরদাস্ত করবে না। পান্ মুসিয়ালভিচ্ তৎক্ষণাৎ 'ছোটলোক' কথাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা এজাহারের অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানাল।

"ছোটলোক! একশ বার ছোটলোক! এটা লিখুন এবং এটাও লিখুন যে হোক না কেন এজাহার তা সত্ত্বেও আমি চেঁচিয়ে বলছি ছোটলোক!" মিতিয়া গলা ফাটাল।

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ এজাহারের অন্তর্ভুক্ত করল ঠিকই, কিন্তু এই অপ্রীতিকর ঘটনা সামাল দিতে গিয়ে যে রকম তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল তা রীতিমতো প্রশংসনীয়। মিতিয়াকে কড়া ধমক দেওয়ার পর সে নিজেই তৎক্ষণাৎ মামলার রোমাণ্টিক অংশ সম্পর্কিত পরবর্তী সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদই বন্ধ করে দিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চলে এলো। পোল্‌দের একটা সাক্ষ্য কিন্তু তদন্তকারীদের মনে অসাধারণ কৌতূহল জাগিয়ে তুলল এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। সেটা হল ছোটো ঘরের সেই ঘটনাটি যেখানে পান্ মুসিয়ালভিচ্‌কে মিতিয়া উৎকোচে বশীভূত করার চেষ্টা করেছিল। মিতিয়া তাকে সরে দাঁড়ানোর জন্য তিন হাজার রুবল দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল, বলেছিল সাতশ' রুবল এখন হাতে পাবে, আর বাকি দু হাজার তিনশ 'কাল সকালেই শহরে গিয়ে' পেয়ে যাবে। সে তখন দিব্যি করে বলেছিল এখানে মোক্রয়েতে অত টাকা আপাতত তার কাছে নেই, সে সঙ্গে করে আনেনি, টাকা শহরে আছে। মিতিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল যে পরদিন অবশ্যই শহরে গিয়ে টাকা দিয়ে দেবে অমন কথা সে বলে নি। কিন্তু পান্ ভ্রুবলিয়োভ্‌স্কি তার সাক্ষ্য থেকে এক চুল নড়ল না। এদিকে মিতিয়া নিজেও মিনিটখানেক ভেবে নিয়ে ভুরু কুঁচকে মেনে নিল ওরা যা বলছে সম্ভবত তাই, সে তখন একটা উত্তেজনার ঘোরে ছিল, তাই ঝোঁকের মাথায় সত্যি সত্যি অমন কথা বলে থাকতে পারে।

প্রসিকিউটর অমনি সাক্ষ্যটির ওপর হামলে পড়ল। দেখা যাচ্ছিল তদন্তের পক্ষে এটা স্পষ্ট—এবং পরেও এর ওপর ভিত্তি করে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে মিতিয়ার হাতে যে তিন হাজার এসেছিল তার অর্ধেক বা তার একটি অংশ বাস্তবিকই শহরে কোথাও লুকানো থাকলেও থাকতে পারে, এমনকি এখানে, মোক্রয়েতেও থাকতে পারে। এর ফলে, মিতিয়ার হাতে যে সবসুদ্ধ মোটে আটশ রুবল দেখা গিয়েছিল তদন্তের পক্ষে বিভ্রান্তিকর এই পরিস্থিতিটার একটা ব্যাখ্যা মিলল। এই

পরিস্থিতিটাই এর আগে পর্যন্ত মিতিয়ার সমর্থনে একমাত্র সাক্ষ্য ছিল। যদিও সে সাক্ষ্য একেবারেই নগণ্য ছিল, তবু মিতিয়ার অনুকূলে এক ধরনের সাক্ষ্য তো বটেই। এখন তার অনুকূল সেই একমাত্র সাক্ষ্যটিও নস্যাৎ হয়ে গেল। প্রসিকিউটর মিতিয়াকে প্রশ্ন করল মিতিয়া নিজেই যখন সমর্থন করে বলছে যে তার কাছে সবসুদ্ধ মোটে দেড় হাজার ছিল, এদিকে 'পান' যখন দিব্যি করে সে কথাই জোর দিয়ে বলছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আগামীকালই 'পান'কে শোধ করার জন্য বাকি দু হাজার তিন শ সে কোথা থেকে নিত, উত্তরে মিতিয়া দৃঢ়স্বরে বলল 'এই পুঁচকে পোলটাকে' কাল যেটা দেবে বলে প্রস্তাব করেছিল সেটা টাকা নয়, সেটা ছিল চের্মাশনিয়ার জমিদারির ওপর তার স্বত্বাধিকারের একটা যথাবিধি দলিল; সেই স্বত্বাধিকার যা সে ইতিপূর্বে সাম্সোনভ্ ও খখ্লাকোভাকেও দিতে চেয়েছিল। কথা ঘুরানোর এই কৌশলটা এমনই 'নিপাট ভালোমানুষের মতো' হল যে প্রসিকিউটর তা উপভোগ করে বরং মুচকি হাসল।

"আপনি কি মনে করেন নগদ দু হাজার তিনশ রুবলের বদলে উনি এই স্বত্বাধিকারের কাগজ নিতে রাজি হতেন?"

"অবশ্যই রাজি হত" উত্তেজিত হয়ে কাটা-কাটা জবাব দিল মিতিয়া। 'মাফ করবেন, কেন হবে না? এক্ষেত্রে শুধু দুই কেন, চার, এমনকি ছয় হাজারও এর থেকে সে বাগাতে পারত। সে সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের উকিল-মোক্তার ও পোল জাতভাইদের আর ইহুদিগুলোকে জোগাড় করে কাজে লাগিয়ে দিত, এই করে তিন হাজার কেন, গোটা চেরমাশ্নিয়া মহালটাই বুড়োর কাছ থেকে খিঁচে নিতে পারত।"

বলাই বাহুল্য, পান মুসিয়ালভিচের সাক্ষ্যটি যতদূর সম্ভব সবিস্তারে এজাহারের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এর পরই 'পান' যুগলকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাসের খেলায় কারচুপির প্রসঙ্গটির কিন্তু প্রায় কোনও উল্লেখই থাকল না। নিকলাই পার্ফেনভিচ্ অমনিতেই তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তাই অকাজের বিষয় নিয়ে তাদের বিরক্ত করতে তার আর ইচ্ছে হল না। তাছাড়া এ সবই হল তাস খেলতে গিয়ে মাতাল অবস্থায় আজেবাজে ঝগড়াঝাঁটি—এর বেশি কিছু নয়। উচ্ছৃঙ্খল আমোদফূর্তি, হুল্লোড়বাজি সেই রাতে কি আর কম হয়েছে। ফলে ওই দুশো রুবল 'পান্'-দের পকেটেই থেকে গেল।

এর পর ডেকে পাঠানো হল বুড়ো মাক্সিমভ্কে। সে ভয়ে ভয়ে এসে হাজির হল, গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এলো। তাকে বিপর্যস্ত এবং খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সারাক্ষণ সে নিচে আশ্রয় নিয়ে গ্রুশেন্কার পাশে বসে ছিল, নীরবে বসে ছিল তার সঙ্গে। 'থেকে থেকে তার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছিল আর একটা চেককাটা নীল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিল', মিখাইল মাকারভিচই পরে একথা বলেছিলেন। ফলে দেখা গেল উলটে গ্রুশেন্কাই তাকে নানা প্রবোধবাক্য দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে। বুড়ো এসেই সঙ্গে সঙ্গে সাশ্রু নয়নে স্বীকার করল তার অপরাধ

হয়ে গেছে যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের কাছ থেকে সে তার 'অভাবের দরুন দশ রুবল' ধার নিয়েছিল এবং সেটা সে শোধ করতে প্রস্তুত। নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করল সে যখন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের হাত থেকে টাকা নিচ্ছিল তখন যেহেতু দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের হাতের টাকা আর সকলের চেয়ে বেশি কাছ থেকে তারই দেখতে পাবার কথা, তাই তার হাতে ঠিক কত টাকা ছিল তা সে লক্ষ করেছিল কি না। তার উত্তরে মাক্সিমভ্ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল যে টাকার অঙ্ক ছিল 'বিশ হাজার'।

"এর আগে কখনও কোথাও বিশ হাজার আপনি দেখেছেন কি?" মৃদু হেসে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ জানতে চাইল।

"দেখেছি বৈ কি। তবে হ্যাঁ, বিশ নয়, সাত, যখন আমার সহধর্মিণী গ্রামের ছোটখাটো তালুকখানা বন্ধক দিয়েছিল। কেবল দূর থেকে দেখতে দিয়েছিল। এই নিয়ে আমার সামনে জাঁক করেছিল। খুবই মোটা ছিল বান্ডিলটা, রামধনু রঙা সব নোট। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের নোটগুলোও সব ছিল রামধনুরঙা। "

তাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা হল না। শেষকালে গ্রুশেন্‌কারও পালা এলো। তার আবির্ভাব আবার দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের মনে কী ভাবের সঞ্চার করে মনে হয় এই ভেবে তদন্তকারীরা আশঙ্কা বোধ করছিল। এমনকি নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ বিড়বিড় করে তাকে এই ব্যাপারে দু একটি সদুপদেশও দিল। কিন্তু তার জবাবে মিতিয়া মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে থেকে বুঝিয়ে দিল। কিন্তু তার জবাবে মিতিয়া মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে থেকে বুঝিয়ে দিল যে 'কোনো রকম গণ্ডগোলের মধ্যে সে যাবে না'। মিখাইল মাকারভিচ্ নিজেই গ্রুশেন্‌কাকে নিয়ে এলেন। চোখেমুখে এক ধরনের বিষণ্ন ও কঠোর ভাব নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। তাকে প্রায় শান্ত দেখাচ্ছিল। নিকলাই পার্‌ফেনভিচের মুখোমুখি একটা চেয়ার তাকে দেখিয়ে দিতে সে নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে বসল। তাকে বেশ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তার ঠান্ডা লাগছে। সে তার চমৎকার কালো শালটা আষ্টেপৃষ্ঠে গায়ে জড়িয়ে আছে। বাস্তবিকই সে সময় সামান্য একটু জ্বর-জ্বর ভাব তার শুরু হয়েছিল আর সেই সঙ্গে একটু কাঁপুনিও ধরেছিল। সেই রাতের পর থেকে দীর্ঘদিন যে অসুস্থতার মধ্যে তাকে কাটাতে হয় এটা ছিল তার সূত্রপাত। তার চেহারার কঠোর ভাব, চোখের সরাসরি ও ঐকান্তিক দৃষ্টি, তার শান্ত সংযত ব্যবহার উপস্থিত সকলের ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলল। এমনকি নিকলাই পার্‌ফেনফিচ তো সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা 'মজেই গেল'। পরে কোনো এক জায়গায় এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সে নিজের মুখে স্বীকার করেছিল যে একমাত্র তখনই সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল 'আহা, খাসা কিন্তু।' এর আগে বেশ কয়েকবার তাকে দেখেছিল বটে, কিন্তু বরাবরই তাকে কেমন যেন 'পাড়াগেঁয়ে রক্ষিতা' গোছের একজন বলে মনে হয়েছে। একবার আবার উচ্ছ্বাসবশত মহিলাদের এক সমাজে বাচালতা করে বলেই ফেলেছিল 'ওর আচার আচরণ সমাজের খুবই

উঁচু মহলের মেয়েদের মতো।’ তার এই মন্তব্য শুনে উপস্থিত মহিলারা অত্যন্ত রুষ্ট হয়। এর জন্য তারা ওকে ‘দুষ্টু ছেলে’ নাম দেয়। তাই নিয়ে তাকেও দিব্যি খুশি থাকতে দেখা যায়।

ঘরে ঢুকে গ্রুশেন্‌কা মাত্র যেন এক ঝলক তাকিয়ে দেখল মিতিয়াকে। মিতিয়াও তাকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু তাকাল অস্বস্তিভরে। তবে তার চেহারা দেখে সে আশ্বস্ত হল। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কিছু প্রশ্ন ও পরামর্শদানের পর নিকলাই পার্‌ফেনভিচ খানিকটা আমতা আমতা করে হলেও যতদূর সম্ভব ভদ্রতার ভাব বজায় রেখেই তাকে জিজ্ঞাসা করল ‘অবসরপ্রাপ্ত লেফ্‌টেনাণ্ট দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কারামাজ়ভের সঙ্গে তার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল’। এর উত্তরে গ্রুশেন্‌কা মৃদু ও দৃঢ় কণ্ঠে জানাল:

“উনি আমার একজন পরিচিত লোক। পরিচিত লোক হিসেবেই গত এক মাস ধরে আমার কাছে ওঁর যাতায়াত ছিল।” আরও কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি এবং সম্পূর্ণ অকপটে জানাল যে যদিও ‘সময় সময়’ তাকে তার ভালোই লাগত তবু ভালো তাকে সে বাসত না। তবে তার নিজের মনের মধ্যে যে ‘বিশ্রী ধরনের হিংসার জ্বালা’ ছিল তারই তাগিদে সে তাকে প্রলুব্ধ করেছিল, ঠিক যেমন প্রলুব্ধ করেছিল তার বাপ ওই ‘বুড়োটাকেও’। সে দেখেছিল তাকে নিয়ে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ এবং তাবৎ লোকের সঙ্গে মিতিয়ার ভারি রেষারেষি। কিন্তু এটা তার কাছে নেহাৎ একটা মজার ব্যাপার ছিল। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে যাবার ইচ্ছে তার কস্মিনকালেও ছিল না, লোকটাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে মাত্র। ‘সেই সময়টায়, পুরো একটা মাস ওদের দুজনের কারও কথাই ভাবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি আরেক জনের অপেক্ষায় ছিলাম, এমন একজনের অপেক্ষায় ছিলাম যে আমার কাছে অপরাধ করেছে। কিন্তু ” পরিশেষে সে বলল, “এই বিষয়ে আপনাদের জানতে চাইবার কিছু নেই, আমারও আপনাদের কাছে বলার মতো কিছু নেই, কারণ ওটা আমার একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার।”

নিকলাই পার্‌ফেনভিচও আর কালবিলম্ব না করে এই কথা মেনেই কাজে নেমে পড়ল। ‘রোমাণ্টিক’ দিকগুলির ওপর এবারেও আর জোর দিল না। তার বদলে সরাসরি চলে এলো মামলার প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে, অর্থাৎ তিন হাজারের সেই মূল প্রশ্নে। গ্রুশেন্‌কার সাক্ষ্যেও এটা সমর্থিত হল যে মোক্রয়েতে এক মাস আগে বাস্তবিকই তিন হাজার রুবল খরচ হয়েছিল। টাকা অবশ্য সে নিজে গুনে দেখে নি, তবে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের নিজের মুখ থেকে তিন হাজার রুবল বলেই শুনেছে।

“আপনাকে নিরালায় বলেছিলেন, না কারও সাক্ষাতে বলেছিলেন, নাকি আপনার সাক্ষাতে অন্যদের বলেছিলেন এবং আপনি শুধু তা বলতে শুনেছিলেন?” প্রসিকিউটর তৎক্ষণাৎ ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন।

তার উত্তরে গ্রুশেন্‌কা জানাল যে লোকজনের সাক্ষাতে যেমন শুনেছে, যেমন

শুনেছে অন্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে বলতে, তেমনি যখন তারা নিরিবিলিতে ছিল তখনও শুনেছে তার নিজের মুখ থেকে।

“দুজনে নিরিবিলিতে থাকার সময় তার মুখ থেকে একবার শুনেছিলেন না একাধিকবার শুনেছিলেন?” প্রসিকিউটর আবার জানতে চাইল। জানা গেল গ্রুশেন্‌কা একাধিকবার শুনেছিল।

ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ এই জবানবন্দিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এর পর আরও প্রশ্ন করা হতে এটাও প্রকাশ পেল যে গ্রুশেন্‌কা জানত কোথা থেকে এই টাকা এসেছে। দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ টাকা পেয়েছিল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছ থেকে।

“আচ্ছা, অন্তত কোনো একবার হলেও আপনি কি শোনেননি যে এক মাস আগে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ যে পরিমাণ টাকা উড়িয়েছিলেন তা তিন হাজার নয়, তার কম এবং সে টাকার অর্ধেকটাই তিনি নিজের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিলেন?”

“না, এটা কখনও শুনিনি”, গ্রুশেন্‌কা তার এজাহারে বলল।

পরে এমনকি এও প্রকাশ পেল যে মিতিয়া বরং এই এক মাস ধরে তাকে প্রায়ই বলে এসেছে যে তার কাছে একটি কপর্দকও নেই। “সব সময় তাঁর এই আশা ছিল যে তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে টাকা পাবেন”, গ্রুশেন্‌কা তার সিদ্ধান্ত জানাল।

“আচ্ছা, কখনও কি আপনার সাক্ষাতে অথবা অমনি কথায় কথায়, অথবা খেপে গিয়ে নিজের বাবার প্রাণনাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি?”

“ওঃ, বলেছিল!” গ্রুশেন্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“একবার না বেশ কয়েক বার?”

“কয়েক বার কথাটা তুলেছিল—তবে সব সময়ই রাগের মাথায়।”

“আপনি কি বিশ্বাস করেছিলেন এ কাজ উনি করবেন?”

“না, কখনও বিশ্বাস করিনি!” দৃঢ়স্বরে সে জবাব দিল। “সব সময় ওর মহত্ত্বের ওপর আমার ভরসা ছিল।”

“ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা অনুমতি দিন”, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মিতিয়া, “আপনাদের অনুমতি হয় তো আপনাদের সাক্ষাতে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে একটি কথা বলি, মাত্র একটি কথাই বলব তাকে।”

“বলুন।” নিকলাই পার্‌ফেনভিচ অনুমতি দিল।

“আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না!” বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিতিয়া। “ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর এবং আমাকে বিশ্বাস কর, গতকাল আমার বাবা যে খুন হয়েছেন সে খুনের দায় কিন্তু আমার নয়!”

এই কথা উচ্চারণ করেই মিতিয়া আবার চেয়ারে বসে পড়ল। গ্রুশেন্‌কা উঠে দাঁড়িয়ে পরম ভক্তিভরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করল।

“হে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ!” আবেগরুদ্ধ মর্মস্পর্শী কণ্ঠে সে বলল। তখনও

সে তার জায়গায় না বসে নিকলাই পার্ফেনভিচের উদ্দেশে যোগ করল, “উনি এখন যে কথা বললেন সেটাই বিশ্বাস করুন! আমি ওঁকে জানি। বাচালতা যখন করার তখন করেন, সেটা করেন হয় মজা করে নয়তো গোঁয়ার্তুমি করে, কিন্তু নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে কখনও কাউকে ঠকাবেন না। সরাসরি সত্যি কথা বলবেন, বিশ্বাস করতে পারেন!”

“ধন্যবাদ আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্না, আমার মনে বল ভরসা জোগালে!” কাঁপা কাঁপা গলায় মিতিয়া প্রত্যুত্তরে বলল।

গতকালের টাকার প্রশ্নে সে জানাল কত ছিল তা সে জানে না, তবে লোকজনের কাছে গতকাল তাকে অনেকবার বলতে শুনেছে যে তিন হাজার নিয়ে এসেছে। আর টাকা কোথা থেকে পেয়েছে সে বিষয়ে একমাত্র তাকেই বলেছে যে কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছ থেকে ‘চুরি করেছে’ এবং জবাবে গ্রুশেন্কা তাকে বলেছিল যে চুরি সে করেনি, টাকাটা আগামীকালই ফেরত দেওয়া দরকার। কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছ থেকে চুরি করেছে বলে যে টাকার কথা বলেছিল সেটা কোনো টাকা?—গতকালের না সেই তিন হাজার যা এক মাস আগে এখানে খরচ করা হয়েছিল?—প্রসিকিউটর নাছোড়বান্দা হয়ে এই প্রশ্ন করলে তার উত্তরে গ্রুশেন্কা প্রকাশ করল যে সেটা এক মাস আগেকার, মিতিয়ার কথা থেকে এরকমই সে বুঝেছিল।

অবশেষে গ্রুশেন্কাকে ছেড়ে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, নিকলাই পার্ফেনভিচ আবার আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে চটপট তাকে জানিয়ে দিল চাইলে এক্ষুনি সে শহরে ফিরে যেতে পারে, জানতে চাইল সে তাকে কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারে কিনা... এই যেমন গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া অথবা তাকে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে যদি সে কোনো লোক চায়—সে রকম ক্ষেত্রে সে তার নিজের দিক থেকে...

“অনেক ধন্যবাদ”, গ্রুশেন্কা মাথা নুইয়ে তাকে জানাল। “আমি ওই বুড়ো মানুষ জমিদারটির সঙ্গেই যেতে পারব। ওঁকে ওঁর জায়গায় পৌঁছে দেব। তবে আপাতত, আপনারা যদি অনুমতি দেন, তাহলে নিচে গিয়ে একটু অপেক্ষা করব, জানতে চাই দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের কী ব্যবস্থা আপনারা করছেন।”

গ্রুশেন্কা বেরিয়ে গেল। মিতিয়া এখন শান্ত, এমনকি তাকে রীতিমতো প্রফুল্লই দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেটা শুধু মুহূর্তের জন্য। কেমন যেন অদ্ভুত একটা শারীরিক দুর্বলতা যত বেশি সময় যাচ্ছে ততই বেশি করে তাকে পেয়ে বসছিল। ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল। সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণের পর্ব অবশেষে শেষ হল। এবারে তারা লিখিত এজাহার চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজে হাত দিল। মিতিয়া উঠে দাঁড়াল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোনায় সরে গেল। সেখানে পর্দার সংলগ্ন গালিচা বিছানো যে বিশাল তোরঙ্গটি ছিল তারই ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এমন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখল যার সঙ্গে স্থান বা কালের

কোনটারই কোন সঙ্গতি নেই। সে যেন গাড়ি চড়ে চলেছে বিস্তীর্ণ স্তেপ তৃণভূমির কোথাও, যে অঞ্চলে আগে কোনও এক সময়, বহুকাল আগে সে চাকরি করত। একটা চাষি শ্রেণির লোক বরফগলা জল কাদার মধ্য দিয়ে জোড়া ঘোড়ায় টানা গাড়িটা চালাচ্ছে। মিতিয়ার শুধু যেন ঠান্ডা লাগছে। নভেম্বরের শুরু। বড় বড় পেঁজা তুলোর মতো ভিজে বরফ পড়ছে, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যাচ্ছে। বেশ জোর গাড়ি হাঁকাচ্ছে লোকটা। চমৎকার তার হাত নাড়ানোর ভঙ্গিটি। হালকা বাদামি রঙের ইয়া লম্বা দাড়ি তার। বুড়ো তাকে বলা যায় না, বয়স এই বছর পঞ্চাশেক হবে। গায়ে একটা ছাইরঙা চাষাড়ে কোর্তা। এই তো আরেকটু দূরেই একটা গ্রাম। চোখে পড়ছে মিশ কালো কতকগুলি কুঁড়েঘর। সেগুলির অর্ধেকই আগুনে পুড়ে গেছে। কেবল খাড়া হয়ে আছে কাঠের পোড়া গুঁড়ি। গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চাষি পরিবারের মেয়েরা। সংখ্যায় অনেক, দস্তুরমতো একটা সারি। সবাই রোগা, জীর্ণশীর্ণ, তাদের মুখে কেমন যেন খয়েরি রঙের প্রলেপ। এই যে বিশেষ করে সারির শেষপ্রান্তের এইটি—এমনই হাড্ডিসার, মাথায় এত লম্বা যে দেখে মনে হয় বছর চল্লিশেক বয়স, কিন্তু আসলে তার বয়স হয়তো মাত্র বিশ। মুখটা লম্বা, বিশীর্ণ। তার কোলে একটা কচি বাচ্চা, সমানে কেঁদে চলেছে। শুকিয়ে চিমসে গেছে মা'র স্তন, মনে হচ্ছে এত শুকিয়ে গেছে যে দুধের ছিটেফোঁটা নেই সেখানে। বাচ্চাটা কাঁদছে ত কাঁদছেই। ওই ঠান্ডাতেও তার খুদে খুদে হাতদুটো খোলা। দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছে, ঠান্ডায় কেমন যেন সিঁটিয়ে একেবারে নীল হয়ে গেছে তার ছোটো ছোটো হাতের মুঠি।

গাড়িটা যখন তাদের পাশ দিয়ে বেপরোয়া ভাবে উড়ে চলেছে সেই সময় মিতিয়া জিগ্‌গেস করল, "কাঁদে কেন? কেন কাঁদছে?"

"ছাওয়াল, ছাওয়াল কাঁদছে", গাড়োয়ান জবাব দিল।

মিতিয়া অবাক হয়ে গেল যখন লোকটা 'বাচ্চা' না বলে তার গ্রাম্য ভাষায় 'ছাওয়াল' বলল। এই চাষাড়ে লোকটার মুখে 'ছাওয়াল' কথাটা শুনে তার ভালো লাগল—এর মধ্যে দিয়ে যেন আরও বেশি মাত্রায় দরদ প্রকাশ পেল।

"কিন্তু কী কারণে কাঁদছে?" মিতিয়া বোকার মতো লেগে রইল। "ওর হাতদুটো ঢাকা নেই কেন? কেন ওকে কাপড়চোপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখছে না?"

"ছাওয়ালের শীত লাগছে, ওর ছোট্ট জামাকাপড়গুলো সব জমে হিম হয়ে গেছে, তাতে ওর শরীর গরম হচ্ছে না।"

"কিন্তু এরকম কেন হচ্ছে? কেন?" হাঁদা মিতিয়া কোনো মতে ছাড়ার পাত্র নয়।

"আরে ওরা সব গরিবগুরবো, ওদের বাড়িঘর পুড়ে গেছে। খাবার দাবার কিচ্ছু নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই পুড়ে গেছে, তাই ভিক্ষেয় নেমেছে।"

"না, না," এখনও যেন বুঝতে পারছে না মিতিয়া। "আমায় বল দেখি এই

ঘরপোড়া মায়েরা কেন দাঁড়িয়ে আছে? কেন এরা গরিব? 'ছাওয়ালটা' কেন গরিব? স্তেপ কেন এমন ফাঁকা? কেন এরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে না? কেন আনন্দের গান গাইছে না? কেন দঃখদুর্দশার কালো ছায়া ওদের এমন কালো করে দিয়ে গেছে? কেন ওরা 'ছাওয়ালটাকে' খাওয়াচ্ছে না?"

মনে মনে সে এটাও উপলব্ধি করতে পারছে যে যদিও সে পাগলের মতো অর্থহীন প্রশ্নগুলি করছে তবু অবধারিতভাবে এই রকম প্রশ্ন করতেই তার মন চাইছে। তার মন বলছে ঠিক এই ভাবেই প্রশ্ন করা দরকার। সে আরও উপলব্ধি করতে পারছে যে তার মনের মধ্যে এমন একটা দরদের ভাব উথলে উঠছে যেমনটা আর কখনও তার হয়নি। তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে হচ্ছে ওদের সকলের জন্য এমন একটা কিছু করে যাতে 'ছাওয়ালটা' আর না কাঁদে, ওর কালিঢালা শুকিয়ে যাওয়া মা'টাও না কাঁদে, যাতে এই মুহূর্তটি থেকে কারও চোখেই আর জল না থাকে। সেটা করা দরকার এই এখনই, এক্ষুনি। যত যা-ই হোক না কেন, এ কাজ আর ফেলে রাখা যায় না, কারামাজভীয় যত উদ্দামতা তাই দিয়েই করতে হবে।

"আমিও কিন্তু তোমার সঙ্গে আছি। আমি এখন তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না। সারাটা জীবন আমি তোমার চলার পথের সাথী", সে তার পাশেই শুনতে পেল আবেগে অভিভূত গ্রুশেন্‌কার দরদি কণ্ঠস্বর। দেখতে দেখতে তার সমগ্র হৃদয় উদ্দীপিত হয়ে সবেগে ধাবিত হল কোনো এক উজ্জ্বল আলোক শিখার দিকে। তার এখন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। তার ইচ্ছে চলে, চলে আর শুধুই চলে, চলে এমন এক পথে যে পথে আছে নতুন এক আলোর আহ্বান। তাড়াতাড়ি করতে হয়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এখনই, এক্ষুনি!

"অ্যাঁ? কোথায়?" চোখ খুলে তার তোরঙ্গের বিছানা থেকে এমন ভাবে উঠে বসল যেন মূর্ছা কেটে গিয়ে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখটা। তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্, জবানবন্দির পাঠটা শুনে তাতে সই করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মিতিয়া অনুমান করল এক ঘণ্টা কি তারও কিছু বেশি সময় সে ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু নিকলাই পার্‌ফেনভিচের কথা সে শুনতে পেল না। তাকে হঠাৎ যেটা বিস্মিত করল তা এই যে তার মাথার তলায় কোথা থেকে যেন একটা বালিশ এসে গেছে। যখন সে অবসন্ন হয়ে তোরঙ্গের ওপর এলিয়ে পড়েছিল তখন কিন্তু ওটা ছিল না।

ঈশ্বর জানেন কে তার এমন উপকার করল, এই ভেবে এক ধরনের কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কেমন যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, "কে আমার মাথার তলায় বালিশ এনে দিল? কার এত দয়া হল!"

কার এত দয়া হয়েছিল পরেও কিন্তু তার অজানাই রয়ে গেল। হতে পারে স্থানীয় যে সমস্ত লোককে সাক্ষী মেনে তদন্ত করা হয়েছিল তাদের কেউ, আবার

এমনও হতে পারে যে নিকলাই পার্‌ফেনভিচের সহকারী ছোটখাটো চেহারার সেই মুনশিটি দয়াপরবশ হয়ে তার মাথার তলায় বালিশের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু সে যে-ই হোক, সেই পরম উপকারী মানুষটির কথা ভেবে তার সমগ্র সত্তা অশ্রুতে পরিপুরিত হয়ে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে জানাল যে তারা যা চায় তাতেই সে সই করবে।

"ভদ্রমহোদয়রা, আমি একটা ভালো স্বপ্ন দেখেছি", কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে সে বলে উঠল। বলতে বলতে এক ধরনের আনন্দের এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

## নয়

## মিতিয়া চালান হয়ে গেল

এজাহার সই করা হয়ে গেলে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ সাড়ম্বরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে তাঁকে এই মর্মে 'নির্দেশনামা' পড়ে শোনাল যে অমুক মাসের অমুক দিনে, অমুক স্থানে, অমুক জেলা আদালতের বিচারবিভাগীয় তদন্তকারী এই এই অভিযোগে (সবগুলি অভিযোগই সযত্নে লিখিত) অভিযুক্ত অমুক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ মিতিয়াকে) জিজ্ঞাসাবাদের পর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে তার অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেও আত্মপক্ষসমর্থনে কিছুই উপস্থিত করতে পারেনি, অথচ অমুক অমুক সাক্ষী, অমুক অমুক পরিস্থিতি তাকে যে অপরাধী বলে পরিপূর্ণভাবে প্রতিপন্ন করছে, এই তথ্য বিবেচনাপূর্বক, 'দণ্ডনীতির' এই এই ধারা ইত্যাদি অনুসরণ পূর্বক এই নির্দেশ জারি করছে যে আইন আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের এই যে সমস্ত অপপ্রয়াস তা থেকে অমুক ব্যক্তিকে (মিতিয়াকে) নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে জেল হাজতে আটক রাখা হউক, সেই সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা জ্ঞাপন করা হউক, উক্ত নির্দেশের প্রতিলিপি ডেপুটি প্রসিকিউটরেরও গোচরীভূত করা হউক ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক কথায়, মিতিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হল যে এই মুহূর্ত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বলে সে একজন কয়েদি, এখনই তাকে শহরে চালান করে দেওয়া হবে এবং সেখানেই একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর স্থানে তাকে আটকে রাখা হবে। মিতিয়া মনোযোগ দিয়ে শোনার পর নাচারের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মাত্র।

"কী আর করা, ভদ্রমহোদয়রা, আমি আপনাদের দোষ দিচ্ছি না। আমি প্রস্তুত।... বুঝতে পারছি, আপনাদের এ ছাড়া আর কিছু করার নেই।"

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ নম্রভাবে জানাল যে লোকাল থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্ ঘটনাক্রমে এখানে উপস্থিত আছে, সে-ই তাকে এখনই যথাস্থানে নিয়ে যাবে।

"দাঁড়ান", মিতিয়া হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠল। এমন একটা দুর্দমনীয় অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল যার বশবর্তী হয়ে ঘরে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে সে বলল, "ভদ্রমহোদয়রা আমরা সবাই নিষ্ঠুর, সবাই নরপিশাচ, আমরা সবাই অন্যদের কাঁদাই, মা জননীদের কাঁদাই, তাদের বুকের শিশুদের কাঁদাই; কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে— এখন এখানে না হয় এটাই স্থির হয়ে যাক যে তাদের সকলের মধ্যে আমার চেয়ে নীচ প্রকৃতির দুরাত্মা আর কেউ নেই! না হয় হলই তাই! আমার জীবনের প্রতিটি দিন আমি আমার বুক চাপড়ে প্রতিজ্ঞা করেছি নিজেকে আমি শোধরাব, কিন্তু প্রতি দিনই আমি সেই একই নোংরা কাজ করেছি। এখন বুঝতে পারছি আমার মতো লোকের যেটা দরকার সেটা একটা আঘাত, নিয়তির আঘাত, বাইরের কোনো শক্তির এমন এক নাগপাশ যা আমাকে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। আর কখনোই, কখনোই যেন আমি নিজের শক্তিতে উঠতে না পারি! কিন্তু বজ্রাঘাত হল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আর সর্বসমক্ষে আমার অপমানের মর্মযন্ত্রণাকে আমি বরণ করে নিচ্ছি, আমি যন্ত্রণা ভোগ করতে চাই, যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই আমার চিত্তশুদ্ধি হবে! বলা যায় না, হয়তো সত্যি সত্যি আমার চিত্তশুদ্ধি হবে—আপনারা কী বলেন ভদ্রমহোদয়রা? তবে শেষবারের মতো আবারও বলছি, শুনে রাখুন : আমার বাবার রক্তপাতের অপরাধে আমি অপরাধী নই! দণ্ড আমি মাথা পেতে নিচ্ছি এই কারণে নয় যে তাকে খুন করেছি, নিচ্ছি এই কারণেই যে খুন করতে চেয়েছিলাম, আর হয়তো সত্যি সত্যি করতামও। কিন্তু তা হলেও আপনাদের সঙ্গে লড়াই করার সঙ্কল্প আমার আছে—এটা আমি আপনাদের কাছে ঘোষণা করতে চাই। শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে আমার লড়াই চালিয়ে যাব। আর তারপর যা স্থির করার ঈশ্বর করবেন! বিদায়, ভদ্রমহোদয়রা, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি যে আপনাদের ওপর চিৎকার চেঁচামেচি করেছি সেজন্য আমার ওপর রাগ করবেন না। ওঃ তখনও কী বোকাই না আমি ছিলাম! আর এক মুহূর্ত পরে আমি একজন কয়েদি হতে যাচ্ছি। এখন শেষ বারের মতো, এখনও একজন মানুষ হিসেবে দ্‌মিত্রি কারামাজ়ভ্ আপনাদের দিকে সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আপনাদের বিদায় জানিয়ে আমি লোকসমাজের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।"

তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। সে সত্যি সত্যি হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিকলাই পারফেনভিচ্, যে আর সকলের চাইতে তার বেশি কাছাকাছি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে, কেমন যেন আচমকাই প্রায় খিঁচিয়ে ওঠা ধরনের একটা ভঙ্গি করে দুহাত পিছনে লুকিয়ে ফেলল। মিতিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা লক্ষ করল, সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রসারিত হাতটা নামিয়ে ফেলল।

"প্রাথমিক তদন্ত এখনও শেষ হয়নি", কতকটা বিব্রত হয়ে নিকলাই পার্‌ফেনভিচ আমতা-আমতা করে বলল। "এরপরও আমরা চালিয়ে যাব শহরে গিয়ে। আর আমি, আমার তরফ থেকে অবশ্যই আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করতে প্রস্তুত। আপনাকে আমি বরাবরই যে দৃষ্টিতে

দেখার পক্ষপাতী, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ, তা এই যে ঠিক অপরাধী বলতে যা বোঝায় আপনি ততটা তা নন, যতটা আপনি একজন হতভাগ্য মানুষ। আমরা যারা এখানে আছি তাদের সকলের হয়ে আমি শুধু ভরসা করে এটাই বলতে পারি যে আমরা সকলেই একথা মানতে রাজি আছি যে আপনি মূলত একজন মহৎ প্রকৃতির যুবক; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি বেশ খানিকটা অতিরিক্ত মাত্রায় আবেগের বন্যায় ভেসে যান।

নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্‌ যখন তার বক্তব্য শেষ করল তখন তার ছোটখাটো চেহারার মধ্যে পুরোদস্তুর একটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠেছিল। মিতিয়ার মাথার মধ্যে এমন সময় যে চিন্তাটা ঝলক দিতে যাচ্ছিল তা এই যে এই 'বাচ্চা ছেলেটা' এই বুঝি এখনই তার হাতখানি চেপে ধরে তাকে ঘরের আরেক কোনায় নিয়ে যায় এবং এই কিছুদিন আগেও তাদের দুজনের মধ্যে 'মেয়েমানুষদের' নিয়ে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা নতুন করে শুরু করে দেয়। কিন্তু একজন অপরাধীকে যখন প্রাণদণ্ড দিতে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময়ও কখন-কখন তার মনের মধ্যে কত রকমের উটকো ও কত অকাজের চিন্তা যে ঝলক দিতে পারে তা কে বলতে পারে!

"ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা ভালোমানুষ, আপনাদের মানবতাবোধ আছে—আমি কি তাকে একবার দেখতে পারি? শেষবারের মতো বিদায় জানাতে পারি?" মিতিয়া জিগ্‌গেস করল।

"নিঃসন্দেহে, তবে কথাটা হল গিয়ে   এক কথায়, এখন অন্যের উপস্থিতিতে ছাড়া সম্ভব নয়

"তা থাকুন না কেন উপস্থিত। থাকতে হয় থাকুন।"

গ্রুশেন্‌কাকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু বিদায় পর্বটি হল সংক্ষিপ্ত, কথা বিশেষ হল না। নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্‌ তাতে সন্তুষ্ট হল না। মিতিয়াকে দেখে অনেকখানি নিচু হয়ে গ্রুশেন্‌কা তাকে নমস্কার জানাল।

"তোমাকে তো বলেইছি আমি তোমার, তোমারই থাকব। চিরকাল তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলব—সে ওরা তোমাকে যেখানে পাঠাতেই মনস্থ করুক না কেন। বিদায়। তুমি নির্দোষ, যদিও—তুমি নিজেই তোমার নিজের সর্বনাশ করেছ।"

তার ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

"আমাকে ক্ষমা কোরো গ্রুশা, আমার প্রেমের জন্য, আমার প্রেম দিয়ে তোমারও যে সর্বনাশ করেছি তার জন্য ক্ষমা কোরো!"

মিতিয়ার আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হঠাৎই নিজেই কথায় ছেদ টেনে বেরিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তার চারধারে লোকজন এসে জড় হল, তারা তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল। নিচে, দেউড়ির ধাপের গায়ে যেখানে গতকাল অত হাঁকডাক করে আন্দ্রেইয়ের তিন ঘোড়ার গাড়িটা সে ভিড়িয়েছিল সেখানে ইতিমধ্যে দুটো ছ্যাকড়া গাড়ি তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। থলথলে মুখ, বেঁটেখাটো ভরাট

চেহারার মানুষ মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচের মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে, কেন না কী একটা ব্যাপারে আকস্মিক ভাবে কোথায় কীসের একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। রেগে গিয়ে লোকটা চোটপাট শুরু করে দিয়েছে। এবারে সে যখন মিতিয়াকে গাড়িতে গিয়ে বসার আমন্ত্রণ জানাল তখন কণ্ঠস্বর বড়ো বেশি রুক্ষ শোনাল। 'আগে যখন সরাইখানায় ওকে পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করেছি তখন ওর মুখটা একেবারে অন্যরকম ছিল', গাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মিতিয়া ভাবল। দেউড়ির ধাপ বয়ে ত্রিফন বরিসভিচও নিচে নেমে এলো। ফটকের কাছে লোকজনের ভিড় জমে গেল। স্থানীয় চাষাভুসো লোকজন, তাদের বাড়ির বৌরা, গাড়ির গাড়োয়ানরা—সবাই মিতিয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

"চলি, আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো, ঈশ্বরের অনুগৃহীত মানবসন্তানেরা!" গাড়ি থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল মিতিয়া।

"আমাদেরও ক্ষমা কোরো", দু'তিনটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"তুমিও ক্ষমা কোরো ত্রিফন বরিসভিচ, চললাম!"

কিন্তু ত্রিফন বরিসভিচ ফিরেও তাকাল না। হয়তো সে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। সেও কেন যেন চেঁচাচ্ছিল এবং শশব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিল। দেখা গেল দ্বিতীয় যে গাড়িটাতে মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচের সঙ্গী হয়ে দুজন কনস্টেবলের যাবার কথা সেটার এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি। যে চাষা লোকটাকে দ্বিতীয় গাড়িটার জন্য গাড়োয়ানের উপযুক্ত পোশাক পরাতে যাওয়া হচ্ছিল সে তার গায়ের চাষাড়ে কোর্তাটা ধরে টানাটানি শুরু করেছে এবং এই বলে জোর তর্ক চলেছে যে এবারে গাড়ি নিয়ে যাবার পালা তার নয়, আকিমের। কিন্তু আকিমের পাত্তা নেই। লোকে আকিমের খোঁজে ছুটল। লোকটা জেদ ধরে রইল, একটু অপেক্ষা করার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

"এই তো আমাদের লোকজন, মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্। লজ্জা শরমের কোন বালাই নেই!" ত্রিফন বরিসভিচ বলে উঠল। "গত পরশু দিন আকিম তোকে একটা সিকি দিয়েছিল, তুই সেটা মদ খেয়ে ফুঁকে দিয়েছিস, এখন কিনা চিৎকার চেঁচামেচি করছিস! আমাদের এই ইতর চাষাভুসো জাতটার ওপর, আপনার এত দয়ামায়া দেখে আমি স্রেফ অবাক হয়ে যাচ্ছি, মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্! একথা না বলে পারছি না।"

"আরে, আরেকটা গাড়ির আমাদের কী দরকার?" মিতিয়া মাঝখান থেকে বলে উঠল, "একটাতেই যাওয়া যাক না কেন, মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ। আমি তো আর হাঙ্গামা বাধাতে যাচ্ছি না, তোমার কাছ থেকে পালাতে যাচ্ছি না। সঙ্গে পাহারাদারদের কী দরকার?"

"আমার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন, মহাশয়, যদি এখন আপনি তা শিখে না থাকেন। আমি আপনার 'তুমি' নই, দয়া করে তুই-তোকারি করবেন না। আর হ্যাঁ, ওসব উপদেশ টুপদেশ আর কোন সময়ের

জন্য তুলে রাখুন " ফুঁসে উঠে হঠাৎ মিতিয়ার মুখের ওপর এমন কড়া জবাব দিল মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্ যে মনে হল গায়ের ঝালটা মেটাতে পেরে সে উল্লসিত।

মিতিয়ার বাক্যস্ফূর্তি হল না। সে আগাগোড়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ তার ভীষণ ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু ঘোলাটে আকাশটা তখনও মেঘাচ্ছন্ন। দমকা হাওয়া সোজা চোখেমুখে ঝাপটা দিচ্ছে। 'আমাকে কি কম্পজ্বরে পেল নাকি?' কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে মনে মনে ভাবল মিতিয়া।

অবশেষে মাভ্রিকি মাভ্রিকিয়েভিচ্ও গাড়িতে উঠে বসল। ভারী শরীরটা নিয়ে ধপ করে ধেবড়ে বসে পড়ল, মিতিয়াকে যে জোর জাঁতা দিয়ে সরিয়ে দিল সেটা খেয়ালই করল না। সত্যি কথা বলতে গেলে কি তার মনমেজাজ ভালো ছিল না এবং তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেটা তার একেবারে পছন্দ হচ্ছিল না।

"চলি, ত্রিফন বরিসভিচ্!" আবার চিৎকার করে বলল মিতিয়া। তবে নিজেই উপলব্ধি করতে পারছিল এবারে যে চেঁচিয়ে ডাকল তা ভালো মনে নয়, নিজের অনিচ্ছায়, মনের ভেতরে একটা জ্বালা নিয়ে।

কিন্তু ত্রিফন বরিসভিচ গর্বের ভাব নিয়ে দুহাত পিছনে রেখে মিতিয়ার মুখের দিকে সরাসরি একদৃষ্টে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তাকে কঠোর ও ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। মিতিয়ার কথার কোনো জবাবই সে দিল না।

"বিদায় দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্, বিদায়!" এমন সময় শোনা গেল কালাগানভের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ কোথা থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে এসেছে। ছুটতে ছুটতে গাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সে মিতিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তার মাথায় টুপি নেই। মিতিয়া ইতিমধ্যে তার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে ফেলেছে। সে তার হাত ধরে চাপও দিল।

"আমার প্রিয় মানুষটি, তোমাকে বিদায়। তোমার উদারতার কথা আমি ভুলব না!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠল। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দিতে তাদের দু হাতের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। টুং টাং বাজতে লাগল গাড়ির ঘণ্টিগুলি। ওরা মিতিয়াকে নিয়ে চলে গেল।

এদিকে কালাগানভ্ ছুটে ফিরে এলো। বাইরের বারান্দার এক কোনায় বসে পড়ে মাথা হেঁট করে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ এই ভাবে বসে বসে কাঁদতে লাগল। একটা বাচ্চা ছেলের মতো হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। কে বলবে সে বিশ বছরের একটা জোয়ান ছেলে! মিতিয়ার যে কোনো দোষ আছে এ কথা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, বলতে গেলে একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। 'এরা সব কী লোক! এর পরও কি ওদের মানুষ বলা যায়!' তিক্ত হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়ে সে বলে উঠল। এমনকি সেই মুহূর্তটিতে পৃথিবীতে তার বাঁচার আর ইচ্ছেই রইল না।

"কোনো মানে হয়? এর কোনো মানে হয়?" ক্ষুব্ধ স্বরে বলল নবীন যুবক।

# চতুর্থ পর্ব

## দশম অধ্যায়

## ছেলের দল

### এক

### কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিন

নভেম্বরের শুরু। আমাদের এখানে তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের এগারো ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। সেই সঙ্গে বরফ জমাট বেঁধে মাটি পিছলে হয়ে আছে! বরফ জমাট মাটিতে রাতে খানিকটা শুকনো তুষার পড়েছিল। 'শুকনো আর তীব্র' হাওয়ার দাপটে সে তুষার মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বে উড়ছে, আমাদের মফস্‌সল শহরের নিরানন্দ রাস্তাঘাট, বিশেষ করে বাজার চত্বর ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। সকালটা ঘোলাটে, তবে তুষারপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বাজার চত্বরের সামান্য কিছু দূরে, প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানের কাছাকাছি একটা ছোটখাটো বাড়ি। যেমন বাইরে থেকে তেমনি ভেতরেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সরকারি আমলা ক্রাসোত্‌কিনের বিধবা স্ত্রী মাদাম ক্রাসোত্‌কিনার বাড়ি এটা। প্রাদেশিক প্রশাসন দপ্তরের সচিব ক্রাসোত্‌কিন লোকটি নিজে অবশ্য আজ বহুকাল হল গত হয়েছে। সে প্রায় চোদ্দো বছর আগেকার কথা। কিন্তু তার বিধবা পত্নীটি ত্রিশ বছর বয়সের এই ভদ্রমহিলাটি আজও যথেষ্ট সুশ্রী, প্রাণচঞ্চল, তার ঝকঝকে তকতকে বাড়িটাতে তার 'নিজস্ব পুঁজিতে' জীবন যাপন করছে। মহিলা সৎপথে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে, কোমল স্বভাবের, তবে বেশ আমুদে। স্বামী যখন মারা যায় তখন তার বয়স বছর আঠারো। স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটাতে পেরেছিল মাত্র বছরখানেক। স্বামী যখন মারা যায় তখন সে সবেমাত্র তার পুত্রটির জন্ম দিয়েছে। এর পর থেকে, ভদ্রলোকের মৃত্যুর ঠিক পর থেকেই তার নয়নের মণি ছেলে কোলিয়াকে মানুষ করে তোলা তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। এই চোদ্দো বছর ধরে যদিও সে তার ছেলেকে পাগলের মতো ভালোবেসে এসেছে, কিন্তু তাকে নিয়ে তার জীবনে যত সুখ সেই তুলনায় দুর্ভোগ অবশ্যই অনেক

বেশি। এই বুঝি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার ঠান্ডা লেগে যায়, সে দস্যিপনা করে, দুষ্টুমি করে চেয়ারে উঠে সেখান থেকে পড়ে যায়—এই সব ভেবে ভেবে প্রায় প্রতিদিন সে ভয়ে আধমরা হয়ে থাকত, তার বুক দুর দুর করত। কোলিয়া যখন প্রাথমিক স্কুলে এবং পরে স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলে যেতে শুরু করল তখন তার স্কুলের পড়া তৈরি করে দিয়ে তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মাও তার সঙ্গে স্কুলপাঠ্য যাবতীয় বিদ্যার চর্চায় যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল তেমনি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে এবং তাদের স্ত্রীদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। এমনকি কোলিয়ার বন্ধুবান্ধব ও তার স্কুলের ছেলেদেরও আদর যত্ন করতে লাগল, তাদের মন জোগানোর চেষ্টা করতে লাগল, যাতে তারা কোলিয়াকে উত্ত্যক্ত না করে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে, তার গায়ে হাত না দেয়। ভদ্রমহিলা নিজেই অবস্থাটা এমন করে ছাড়ল যে বস্তুতপক্ষে দেখা গেল তার এই আচরণের কারণেই ছেলেরা কোলিয়াকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে, মায়ের আদুরে ছেলে বলে তাকে উপহাস করছে। অথচ ছেলেটার নিজেরই কিন্তু নিজের সমর্থনে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল। কোলিয়া সাহসী ছেলে। তার সম্পর্কে ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে এমন কথাও রটে গিয়েছিল যে সে 'প্রচণ্ড শক্তি ধরে'। তার প্রমাণ মিলতেও দেরি হল না। কোলিয়া চটপটে, একরোখা স্বভাবের, ডাকাবুকো, উদ্যোগী। পড়াশুনায় সে ভালো। স্কুলে এমন কথাও রটে গিয়েছিল যে পাটীগণিতে আর বিশ্ব ইতিহাসে সে তাদের শিক্ষক দার্দানেলভ্‌কেও কাত করে দিতে পারে। তবে নাক উঁচু করে সকলকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও বন্ধু হিসেবে সে ভালোই ছিল, আত্মম্ভরিতা সে প্রকাশ করত না। বন্ধুবান্ধবের ভক্তিশ্রদ্ধাকে সে তার ন্যায্য পাওনা বলে গ্রহণ করত, তবে বন্ধুদের সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্ক সে রাখত। সবচেয়ে বড়ো কথা পরিমিতিবোধ তার ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে নিজেকে সংযত রাখতে পারত আর স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সেই শেষ সীমারেখাটি কখনও লঙ্ঘন করত না যা ছাড়িয়ে কোন অপকর্ম করলে তা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ ও হাঙ্গামা সৃষ্টির পর্যায়ে চলে যায় এবং অন্যদের কাছে অসহ্য ঠেকে। কিন্তু সুযোগ পেলে স্কুলের একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো দুষ্টুমি করতে তার মোটেই এতটুকু আপত্তি দেখা যেত না, আর সেটা সে করত নিছক দুষ্টুমি করার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা না কিছু একটা উদ্ভাবন করা, চমৎকারিত্ব বা রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা, কিছু একটা করে দেখানো বা লোকের নজর কাড়ার উদ্দেশ্যে। বড়ো কথা, আত্মাভিমান তার ভালোমতোই ছিল। এমনকি স্বৈরাচারী প্রভাব খাটিয়ে নিজের মাকেও বশে আনার ক্ষমতা তার ছিল। মা তার বশে এসেও ছিল, অনেক কাল আগেই এসেছিল। একমাত্র একটি চিন্তাই তার কাছে অসহ্য ঠেকত—সেটা এই যে ছেলে তাকে 'তেমন ভালোবাসে না'। তার কেবলই মনে হত কোলিয়া তার প্রতি আবেগ অনুভূতিহীন'। সময় সময় এমন হত যে মা ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ছেলের উদাসীনতার জন্য তাকে

নিন্দা করতে থাকত। ছেলের এটা ভালো লাগত না। তার কাছ থেকে যত বেশি করে ভাবাবেগের প্রকাশ দাবি করা হত ততই যেন ইচ্ছে করে আরও বেশি অনমনীয় হয়ে পড়ত। কিন্তু এটা তার হত ঠিক ইচ্ছে করে নয়, আপনা-আপনিই হত— এমনই ছিল তার স্বভাব। মা এক্ষেত্রে ভুল করেছিল: ছেলে তার মাকে খুবই ভালোবাসত, শুধু যেটা তার ভালো লাগত না তা হল—তার স্কুল-পড়ুয়ার ভাষায় যাকে বলে 'গদগদ সোহাগ'।

বাবা মারা যাবার পর বাড়িতে তার একটা আলমারি ছিল, সেখানে কয়েকটা বই রাখা ছিল। কোলিয়া বই পড়তে ভালোবাসত, ইতিমধ্যে সে নিজে নিজে সেগুলির বেশ কয়েক খানা পড়েও ফেলেছিল। মা এতে কিছু মনে করত না, শুধু অনেক সময় এই দেখে অবাক হয়ে যেত যে কোথায় খেলতে যাবে তা নয়, ছেলেটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো একটা বইয়ের ভেতরে মুখ গুঁজে আছে। এই ভাবে কোলিয়া এমন কিছু কিছু জিনিস পড়ে ফেলল যা তার ওই বয়সে তাকে পড়তে দেওয়া উচিত নয়।

সে যাই হোক, দুষ্টুমি করতে গিয়ে ছেলেটা যদিও নির্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন করত না, তবু সম্প্রতি এমন এক ধরনের দুষ্টুমি সে শুরু করেছিল যাতে তার মা দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে তার সেই সব দুষ্টুমির মধ্যে নীতিবিগর্হিত কিছু থাকত না, কিন্তু সেগুলি ছিল বেপরোয়া ও ডাকাবুকো ধরনের।

ঠিক এই গ্রীষ্মকালেই জুলাই মাসে গরমের ছুটির সময় ঘটনাক্রমে মা আর ছেলে বাইশ-তেইশ ক্রোশ মতন দূরের আরেকটি জেলায় সপ্তাহখানেকের জন্য তাদের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলার স্বামী সেখানকার এক রেলস্টেশনের একজন কর্মচারী। এটা আমাদের শহরের সবচেয়ে কাছাকাছি সেই রেল স্টেশন যেখান থেকে এক মাস পরে ইভান ফিয়োদরভিচ কারামাজ়ভ্ মস্কোয় রওনা দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কোলিয়া তার কার্যকলাপের শুরুতে রেলওয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি, নিয়মকানুন ইত্যাদি ভালোমতো জেনে নিল, কারণ সে জানত বাড়ি ফিরে গিয়ে সে তার সদ্য অর্জিত এই জ্ঞান দিয়ে স্কুলের বন্ধুমহলে চমক সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু ঠিক সেই সময় সেখানে আরও কিছু ছেলেপুলের দেখা মিলল, যাদের সঙ্গে কোলিয়ার ভাবও হয়ে গেল। ওদের কেউ কেউ স্টেশন এলাকাতেই বসবাস করত, কেউ বা আশেপাশের অঞ্চলে। বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলেদের ছয়-সাত জনের একটা দল জুটে গেল। তাদের মধ্যে দুজন আবার দেখা গেল আমাদেরই শহরের ছেলে। ছেলেরা এক সঙ্গে খেলাধুলো করত, দুষ্টুমি করত। যাই হোক, স্টেশন এলাকায় কোলিয়ার অতিথি হয়ে থাকার চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিন হবে, স্টেশনে ওদের জটলা চলার সময় নির্বোধ ছেলেগুলোর মধ্যে রীতিমতো অসাধ্য সাধন করার মতো একটা কাজ করার

বাজি ধরা হয়ে গেল। দু রুবলের বাজি। বাজিটা ধরা হয়েছিল এই ভাবে: দলের মধ্যে কোলিয়াই ছিল বলতে গেলে সবার ছোটো, তাই যেহেতু বড়ো ছেলেরা তাকে খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখত সেই কারণে আত্মাভিমান থেকে হোক বা বেপরোয়া বাহাদুরি দেখানোর জন্যই হোক, সে প্রস্তাব দিল রাত আটটায় ট্রেন যখন আমার কথা তখন সে রেল লাইনের মাঝখানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে এবং ট্রেন যতক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে তার ওপর দিয়ে ছুটে যাবে ততক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। এটা ঠিক যে ছেলেরা প্রাথমিক ভাবে একটা অনুসন্ধান চালাল, তা থেকে দেখা গেল যে বাস্তবিকই রেলের দটো লাইনের মাঝখানে এই ভাবে চেপ্‌টে শুয়ে থাকা যায়, তাতে অবশ্যই ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে গেলেও যে শুয়ে থাকবে তার গাত্রস্পর্শ করবে না। সে না হয় হল, কিন্তু ওই ভাবে শুয়ে থাকা কি একটা সোজা কথা! কোলিয়া জিদ ধরে বলল যে সে পারবে। গোড়ায় ওকে নিয়ে সকলে হাসাহাসি করল, তাকে গুলবাজ, হামবড়া আখ্যা দিল, কিন্তু তাতে সে আরও বেশি প্ররোচিত হল। বড়ো কথা এই যে পনেরো বছর বয়সের ছেলেগুলোর তার সম্পর্কে বড়ো বেশি নাক উঁচু মনোভাব, প্রথম প্রথম ত তাকে 'বাচ্চা ছেলে' বলে তাদের বন্ধু হিসেবে গণ্যই করতে চায়নি। কোলিয়ার কাছে এই অপমানের জ্বালা ছিল দুঃসহ।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সন্ধ্যা থাকতে থাকতেই তারা স্টেশন থেকে সিকি ক্রোশ মতন দূরে চলে যাবে, যাতে স্টেশন ছাড়ার পর ট্রেন একেবারে পুরোদমে ছোটার অবকাশ পায়। ছেলের দল জড় হল। অমাবস্যার রাত। অন্ধকারই নয়, প্রায় মিশকালো অন্ধকার। যথাসময়ে কোলিয়া রেলের দুই লাইনের মাঝখানে শুয়ে পড়ল। বাকি পাঁচজন, যারা বাজি রেখেছিল, রেললাইনের বাঁধের নিচে রাস্তার কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষকালে একটা আতঙ্ক আর সেই সঙ্গে অনুশোচনাও তাদের মন ভারাক্রান্ত করে তুলল। অবশেষে দূরে স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার গুমগুম আওয়াজ উঠল। অন্ধকারের মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল দুটো লাল আলো, বিকট গর্জন করতে করতে করাল মূর্তি ধারণ করে ধেয়ে এলো রেল ইঞ্জিন।

"পালা, পালা, মাথায় থাক তোর রেল লাইন!" ঝোপের ভেতর থেকে আতঙ্কে আধমরা হয়ে চেঁচাতে লাগল ছেলের দল। কিন্তু তত্ক্ষণে দেরি হয়ে গেছে ট্রেন হুড়মুড় করে এসে তাদের পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। ছেলেরা পড়িমড়ি করে ছুটে গেল কোলিয়ার কাছে। কোলিয়া নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। তারা ওকে ধরে টানাটানি করতে লাগল, ওঠাতে গেল। হঠাৎ সে উঠে পড়ল, উঠে কোনো কথা না বলে চুপচাপ রেললাইনের বাঁধের ওপর থেকে নিচে নেমে এলো। নিচে নেমে আসার পর সে জানাল যে ওদের ভয় দেখানোর জন্য ইচ্ছে করেই সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে ছিল। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে কি আসলে সে সংজ্ঞা হারিয়ে

ফেলেছিল। পরে সে এটা নিজেও স্বীকার করে—সে অনেক দিন পরে, তার মা'র কাছে। এই ভাবে 'বেপরোয়া' বলে তার খ্যাতি চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সে যখন স্টেশনে তাদের ঘরে ফিরে এলো তখন তাকে কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছিল। স্নায়বিক চাপের কারণে পরদিন জ্বর-জ্বর ভাব হওয়ায় সে সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তবে তার মনমেজাজ খুবই ভালো ছিল। তাকে বেজায় উৎফুল্ল ও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। ঘটনাটা যে তখন চাওড় হয়ে গিয়েছিল এমন নয়, কিন্তু যখন জানাজানি হল তখন আমাদের শহরেও হল, স্কুলেও সে সংবাদ ঢুকতে বাকি রইল না, দেখতে দেখতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কানেও পৌঁছে গেল। তখনই কোলিয়ার মামণি তার ছেলের হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে কর্তাব্যক্তিদের হাতে পায়ে ধরল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে স্কুলের পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী শিক্ষক দার্দানেনভ্‌কেও মহিলার ছেলের পাশে এসে, দাঁড়াতে হল, তার হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সে আর্জি করল, কোনো সমাধান না করে ব্যাপারটা এমন ভাবে ধামা চাপা দেওয়া হল যেন ওরকম কোনো ঘটনা আদৌ ঘটেনি।

এই দার্দানেলভ্ লোকটি ছিল অকৃতদার। বুড়ো তাকে বলা যায় না। আজ অনেক বছর হল মাদাম ক্রাসোত্‌কিনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ইতিমধ্যে একবার, বছর খানেক আগে শিষ্টাচার সম্মত হবে কিনা এই ভেবে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে সে ভদ্রমহিলার পাণিপ্রার্থনা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা তাকে সরাসরি হাঁকিয়ে দেয়। তার মনে হয়েছিল এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার অর্থ তার ছেলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যদিও কিছু কিছু রহস্যজনক লক্ষণ থেকে হয়তো এমন স্বপ্ন দেখার অধিকার দার্দানেলভের থাকলেও থাকতে পারত যে এই মনোহারিনী অথচ বড় বেশি শুদ্ধাচারিনি ও কোমল স্বভাবের বিধবাটির কাছে সে একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। কোলিয়ার পাগলামি ধরনের দুষ্টুমির ঘটনার পর বোধ হয় বরফ গলল এবং দার্দানেলভ্ যে এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছিল সেই জন্য তাকে আশার ইঙ্গিত দেওয়া হল—অবশ্য এটা ঠিক যে সে আশা অনেকটাই দূরবর্তী। কিন্তু দার্দানেলভ্ নিজেও ছিল শুদ্ধতা ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্তি, তাই আপাতত এটাই তাকে পরিপূর্ণ রূপে সুখী করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেটাকে সে ভালোবাসত, যদিও তাকে তোয়াজ করা তার কাছে অপমানজনক মনে হত। ক্লাসে তাকে কড়া শাসনে রাখত, তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করত। কিন্তু কোলিয়া নিজেও তার সঙ্গে একটা সম্ভ্রমজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলত। খুব ভালোভাবে সে পড়া তৈরি করত। ক্লাসে তার স্থান ছিল দ্বিতীয়। দার্দানেলভের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল শুষ্ক ধরনের। ক্লাসের সকলেরই এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে বিশ্ব ইতিহাসে কোলিয়া এত ভালো যে দার্দানেলভ্‌কে পর্যন্ত 'কাত করে' দিতে পারে। আর বাস্তবিকই কোলিয়া একবার তাকে প্রশ্ন করেছিল: ট্রয় কে প্রতিষ্ঠা করেছিল?'—তার উত্তরে দার্দানেলভ্ যা বলেছিল তা কেবল বিভিন্ন জাতির কথা, তাদের চলাচল আর বাসাবদলের কাহিনি,

সময়ের সুদূর ব্যবধান আর প্রচলিত কিংবদন্তি, কিন্তু ঠিক কে বা কারা ট্রয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, অর্থাৎ ঠিক কারা সেই ব্যক্তি তার উত্তর দিতে পারল না। এমনকি প্রশ্নটি তার কাছে কেন যেন অলসমস্তিষ্কের ও অহেতুক বলে মনে হল। ফলে ছেলেদের মনের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েই গেল যে ট্রয় কে বা কারা প্রতিষ্ঠা করেছিল দার্দানেলভের তা জানা নেই। কোলিয়া কিন্তু ট্রয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের কথা জানতে পেরেছিল তার বাবার রেখে যাওয়া আলমারি থেকে স্মারাগাদভের ইতিহাস বই পড়ে। হল এই যে ঠিক কারা ট্রয় প্রতিষ্ঠা করেছিল—এই প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত ছেলেদের সকলকেও কৌতূহলী করে তুলল। কিন্তু ক্রাসোত্কিন তার সেই গোপন রহস্যটি আর উদ্ঘাটন করল না এবং জ্ঞানের জন্য তার যে নামডাক ছিল তাও অবিচল রয়ে গেল।

রেললাইনের ঘটনার পর মায়ের সঙ্গে কোলিয়ার সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। আন্না ফিয়োদরভ্না, অর্থাৎ মাদাম ক্রাসোত্কিনা যখন তার আদরের ছেলের কীর্তির কথা জানতে পারল তখন আতঙ্কে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। সে এত ভয়ঙ্কর রকমের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে তার থেকে থেকে মূর্ছার প্রকোপ ঘটতে লাগল। বেশ কয়েক দিন ধরে এই অবস্থা চলার পর কোলিয়া রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। সে তখন তার নিজের সততার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিব্যি করে তার মাকে বলল যে ওরকম দুষ্টুমি সে আর কখনও করবে না। মাদাম ক্রাসোত্কিনার দাবি মেনে নিয়ে সে উপাস্য মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে শপথ করল, তার বাবার পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মানের দিব্যি দিয়ে শপথ করল, আর তা করতে গিয়ে অত যার 'পৌরুষ' সেই কোলিয়া নিজেও ছয় বছরের একটা বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ভাসিয়ে দিল। সারাটা দিন মা আর ছেলে দুজনেই বার বার ছুটে ছুটে গিয়ে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পর দিন কোলিয়া যখন জেগে উঠল তখন সে আবার সেই আগের মতোই 'আবেগ-অনুভূতিহীন'। তবে সে এখন হয়েছে আরও স্বল্পবাক, আরও বেশি বিনয়ী, আরও কঠোর, আরও বেশি চিন্তায় বিভোর।

এটা অবশ্য ঠিক যে এর মাস দেড়েক বাদে আবারও আরেকটা কাণ্ডের মধ্যে তার ফেঁসে যাবার উপক্রম হয়েছিল যার ফলে তার নামটা আমাদের শান্তিরক্ষা আদলতের বিচারপতির কানেও পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এবারের দুষ্টুমিটা ছিল একেবারে অন্য ধরনের—এমনকি হাস্যকর, বোকার মতো কাজ। তা ছাড়া দেখা গেল ও নিজে সেটা করেওনি, তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল মাত্র। তা সে প্রসঙ্গ পরে এক সময় হবে। কোলিয়ার মা যথারীতি ভয়ে কাঁপছে, কষ্ট পাচ্ছে। তার উৎকণ্ঠা যত বাড়ছে দার্দানেলভও তত বেশি আশান্বিত হয়ে উঠছে। এখানে বলা দরকার, কোলিয়া কিন্তু দার্দানেলভের এই দিকটি বুঝতে পারছিল, তার মনোভাব অনুমান করতে পারছিল এবং বলাই বাহুল্য লোকটার এই 'অনুভূতির' জন্য তাকে

মনে মনে দারুণ ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। এমনকি আগে শিষ্টাচারের বাইরে গিয়ে এই ঘৃণার ভাবটা সে তার মা'র সামনে প্রকাশও করে ফেলত, আভাসে ইঙ্গিতে মা'কে এটাও বুঝিয়ে দিত যে দার্দানেলভের মতলবটা যে কী তা সে জানে। কিন্তু রেল লাইনের ঘটনার পর এ ব্যাপারেও সে তার আচরণ পালটাল। কোন ইঙ্গিতের—এমন কি সামান্যতম কোনো ইঙ্গিতেরও প্রশ্রয় সে আর দিত না। আর দার্দানেলভ্ সম্পর্কে মা'র সাক্ষাতে বেশি করে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক মতামত প্রকাশ করতে লাগল। আন্না ফিয়োদরভ্‌নার মনটা যে রকম সংবেদনশীল তাতে ব্যাপারটা সে বুঝতে পারত এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যেত। কিন্তু বাইরের কোন আগন্তুক কিছু না ভেবেচিন্তে নেহাৎই কথায় কথায় যদি দার্দানেলভের প্রসঙ্গ উত্থাপন করত আর সেখানে যদি কোলিয়া উপস্থিত থাকত তাহলে লজ্জায় ভদ্রমহিলার চোখেমুখে হঠাৎ গোলাপি আভা ফুটে উঠত। আর কোলিয়া সেই সব মুহূর্তে হয় ভুরু কুঁচকে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত, নয়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত তার বুটজোড়ার হাল খারাপ হয়েছে কিনা, অথবা ক্রুদ্ধস্বরে ডাকত তার 'রিমঝিম' নামের কুকুরটাকে। সেটা একটা রীতিমতো উশ্‌কো খুশকো চেহারার ঘেয়ো লোমশ কুকুর। মাসখানেক আগে কোলিয়া কোথা থেকে যেন জোগাড় করে ঘরে এনে তোলে। কেন কে জানে, কোলিয়া সকলের চোখের আড়ালে, গোপনে ঘরের মধ্যেই সেটাকে রেখে দিত, বন্ধুবান্ধবদের কাউকে দেখাত না। তার ওপর নির্মম উৎপীড়ন চালিয়ে তাকে নানা বিদ্যা ও কসরত শেখাত। শেষকালে বেচারি কুকুরের অবস্থা এমন হল যে কোলিয়া যখন তাকে ছেড়ে স্কুলে চলে যেত তখন তাকে দেখতে না পেয়ে সারাক্ষণ গরগর করত, আর সে যখন আসত তখন আনন্দে উল্লসিত হয়ে পাগলের মতো তার সামনে লম্ফঝম্প শুরু করে দিত, পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, মাটিতে গড়াগড়ি দিত, মটকা মেরে মড়ার মতো পড়ে থাকত—এক কথায়, যত রকমের কসরত তাকে শেখানো হয়েছিল সে সবই জাহির করত, আর সেটা যে করত তা এখন আর প্রভুর দাবিতে নয়, স্রেফ তার মনের খুশিতে, হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা থেকে।

প্রসঙ্গত, একটা কথা আমি বলতে ভুলেই গেছি, সেই যে ক্যাপ্টেনের ছেলে, পাঠকের পূর্বপরিচিত সেই ইলিউশা, যার বাবাকে 'শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া' ডেকে ছেলের দল তাকে খেপাচ্ছিল, যার ফলে বাবার পক্ষ নিয়ে যে ছেলেটার উরুতে সে পেন্সিল কাটার ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছিল, সে-ই হল আমাদের কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিন।

## দুই

## কচিকাঁচারা

যা বলছিলাম। সেদিনকার নভেম্বরের সেই হিমেল সকালে যখন হু-হু উত্তুরে হাওয়া বইছে তখন কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিন তার বাড়িতে বসেছিল। রবিবার, স্কুল নেই।

ঘড়িতে এই এগারোটা বাজল। 'অত্যন্ত জরুরি একটা কাজে' তাকে বাড়ি থেকে না বেরুলেই নয়। এদিকে সারা বাড়িতে সে একা, সে-ই এখন বাড়ির রক্ষক; কারণ এই যে ঘটনাক্রমে একটা জরুরি ও অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় বাড়ির যারা বয়োজ্যেষ্ঠ বাসিন্দা তারা সকলেই অনুপস্থিত। বিধবা ক্রাসোত্‌কিন বাড়ির যে অংশটুকু নিয়ে নিজে থাকে তাছাড়া দরদালান পেরিয়ে দুটি ছোটো ছোটো কামরার বাকি আরও একটিমাত্র যে অংশ আছে সেটা সে আরেকজনকে ভাড়া দিয়েছে। দুটি ছোটো ছোটো বাচ্চা নিয়ে সেই অংশে থাকে একজন ডাক্তারের স্ত্রী। ডাক্তার-গিন্নিটি আন্না ফিয়োদরভ্‌নারই সমবয়সি, তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ডাক্তার ভদ্রলোক নিজে আজ বছরখানেক হল কোথায় কোন্ সুদূরে গিয়ে পড়ে আছে। প্রথমে গিয়েছিল অরেনবুর্গ, তারপর তাশখন্দ, কিন্তু গত ছ' মাস হল তার কোনো সাড়াশব্দই নেই। মাদাম ক্রাসোত্‌কিনার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব এই পরিত্যক্তা ডাক্তার-গিন্নির দুঃখের বেশ খানিকটা লাঘব ঘটিয়েছিল। তা না হলে দুঃখের অশ্রুবন্যায় ভদ্রমহিলার কোথায় ভেসে যাবার কথা! এত সব দুর্ভাগ্যের ওপরে আরও এমন একটা ঘটনা ঘটল যেন একমাত্র সেটাই ঘটা বাকি ছিল। সেই রাতেই, শনি-রবিবারের মাঝখানের রাতে ডাক্তার-গিন্নির একমাত্র পরিচারিকা হঠাৎ তার কর্ত্রীকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল সকাল নাগাদ সন্তান প্রসব করা তার অভিপ্রেত। ব্যাপারটা যে আগে থাকতে কারও নজরে পড়েনি তা কী করে হল সেটা সকলের কাছে প্রায় অলৌকিক বলেই মনে মনে হল। ডাক্তার-গিন্নি স্তম্ভিত। এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের শহরের একজন ধাত্রীর একটা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে। পরিচারিকাটিকে ডাক্তার-গিন্নি অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করত, তাই কালবিলম্ব না করে সে তার পরিকল্পনামাফিক কাজ করল, তাকে সেখানে নিয়ে গেল, শুধু তা-ই নয়, তাকে দেখাশোনা করার জন্য সেখানে থেকেও গেল। এরপর এক্ষেত্রে তেমন হলে মাদাম ক্রাসোত্‌কিনা কাউকে না কাউকে যে কোনো ধরনের অনুরোধ জানাতে পারে অথবা কারও না কারও কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে পারে বলে সকাল হতেই কেন যেন মাদাম ক্রাসোত্‌কিনার সশরীরে উপস্থিতি ভদ্রমহিলার ভারি আবশ্যক হয়ে পড়ল।

ফলে দুই মহিলাই বাড়িতে অনুপস্থিত। মাদাম ক্রাসোত্‌কিনার পরিচারিকা আগাফিয়া মাসি বাজারে গেছে। ডাক্তারগিন্নির বাচ্চা দুটো বাড়িতে একেবারে একা পড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় কোলিয়াকেই সাময়িকভাবে 'পুঁচকেদের' রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারি করতে হচ্ছে। 'রিমঝিমকে' বাইরের ঘরে নিশ্চল অবস্থায় উপুড় হয়ে যেভাবে বেঞ্চির নিচে শুয়ে থাকতে বলা হয়েছিল সে সেভাবেই শুয়ে ছিল। কোলিয়া যতবার এঘর-ওঘর পায়চারি করতে করতে বাইরের ঘরে চলে আসছিল তত বারই তাকে ঢুকতে দেখে সে মাথা ঝাঁকিয়ে, খোশামোদের ভঙ্গিতে বার দুয়েক মেঝেতে সজোরে লেজ আছড়ে কোলিয়ার করুণা ভিক্ষা করছিল, কিন্তু আক্ষেপের

বিষয় এই যে তাকে শিস দিয়ে ডেকে ওই অবস্থা থেকে তাকে যে মুক্ত করবে তেমন কোনো আগ্রহ কোলিয়ার দিক থেকে দেখা গেল না। কোলিয়া কঠিন দৃষ্টিতে বেচারি কুকুরটার দিকে তাকাতে সেটা প্রভুর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আবারও আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে পড়ছিল। কিন্তু কিছু যদি কোলিয়াকে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকে তা একমাত্র এই 'পুঁচকে' দুটো। কাতেরিনার এই অনভিপ্রেত দুঃসাহসিক কাজটা তার চোখে, বলাই বাহুল্য, রীতিমতো ধিক্কারজনক মনে হল। তবে অনাথ 'পুঁচকে' দুটোকে সে খুব ভালোবাসত। এরই মধ্যে সে ওদের দুজনকে বাচ্চাদের পড়ার মতো একটা বইও দিয়ে এসেছে। দুজনের মধ্যে নাস্তিয়া নামে মেয়েটিই বড়ো। তার বয়স ইতিমধ্যে আট হয়েছে। সে পড়তে শিখেছে। সাত বছর বয়সের ছেলে, তার ছোটো ভাই কোলিয়া, তাকে যখন তার দিদি বই পড়ে শোনায় তখন তার খুব ভালো লাগে। ক্রাসোত্‌কিন অবশ্য আরও বেশি আকর্ষণীয় ভাবে তাদের মাতিয়ে রাখতে পারত। এই যেমন, সে ওদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ওদের সঙ্গে সেপাই খেলতে পারত, নয়তো সারা বাড়ি জুড়ে ছুটোপাটি করে লুকোচুরি খেলতে পারত। এর আগে অনেকবার সে এ কাজ করেছে এবং এতে তার কোনো বিরাগ ছিল না। তার ফল হয়েছিল এই যে একবার ওদের ক্লাসে পর্যন্ত প্রায় রটে গিয়েছিল যে ক্রাসোত্‌কিন তাদের ভাড়াটের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেলে, গাড়িতে জোতা ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে তিড়িং বিড়িং লাফায়। কিন্তু ক্রাসোত্‌কিন বুক ফুলিয়ে এই অভিযোগের সমুচিত জবাব দিয়ে বলে নিজের সমবয়সি, তেরো বছর বয়সের ছেলেদের সঙ্গে 'আজকালকার দিনে' ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে গেলে সেটা বাস্তবিকই লজ্জার কথা হত, কিন্তু সে যা করেছে তা 'পুঁচকেদের' মুখ চেয়ে করেছে, কেন না ওদের সে ভালোবাসে, আর তার অনুভূতির ব্যাপারে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করার মতো স্পর্ধা যেন কারও না হয়। 'পুঁচকেরা' দুজনেই কিন্তু ক্রাসোত্‌কিন বলতে পাগল।

কিন্তু এবারের ঘটনাটা এমনই যে খেলাধুলো তার মাথায় উঠেছে। তার সামনে পড়ে রয়েছে তার নিজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি আপাত দৃষ্টিতে অনেকটা রহস্যজনক একটা কাজ। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা দুটোকে আগাফিয়ার জিম্মায় রেখে গেলেও যাওয়া যেত, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বাজার থেকে ফিরে আসার কোনো ইচ্ছা আছে বলে মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কোলিয়া বার কয়েক দরদালান পেরিয়ে ডাক্তার-গিন্নির ঘরের দরজা ফাঁক করে পুঁচকে দুটোকে দেখে এসেছে—ওরা তার আদেশ মতো বই নিয়ে বসেছে এবং কোলিয়া যতবার দরজা ফাঁক করে দেখেছে ততবারই তাকে দেখতে পেয়ে নীরবে এক গাল হেসেছে, অপেক্ষা করেছে কখন সে ভেতরে ঢুকবে আর চমৎকার ও মজাদার কিছু একটা করবে। কিন্তু কোলিয়া মানসিক উদ্বেগের মধ্যে ছিল, সে ভেতরে ঢুকল না।

শেষকালে এগারোটা বাজতে সে চূড়ান্ত ভাবে এই স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করল

যে হতচ্ছাড়ি আগাফিয়াটা যদি আর দশ মিনিটের মধ্যে না আসে তা হলে সে আর তার অপেক্ষায় না থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে, যাবার আগে, বলাই বাহুল্য 'পুঁচকেদের' কাছ থেকে কথা আদায় করে নেবে যে সে না থাকলে তারা ভয় পাবে না, দুষ্টুমি করবে না, ভয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে না। মনে মনে এই ভেবে ফারের কলার দেওয়া, তুলোয় ঠাসা শীতের ওভারকোটটা সে গায়ে চাপাল, ঝোলাটা কাঁধে ঝোলাল। যদিও মা তাকে অনেক করে বলে দিয়েছিল যে 'অমন ঠান্ডায়' বাড়ি থেকে বেরোতে হলে সে যেন অতি অবশ্য বুটজুতোর ওপর শীতের গামবুট পরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরের ঘর দিয়ে যাবার সময় সে তাচ্ছিল্যভরে সেগুলির দিকে একবার তাকাল, গামবুট না পরে শুধু বুট জুতো পায়ে দিয়েই বের হল। তাকে বাইরের পোশাক পরা অবস্থায় দেখতে পেয়ে 'রিমঝিম' ঘাবড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে খুব জোরে জোরে মেঝেতে লেজ আছড়াতে লাগল, এমন কি করুণস্বরে আর্তনাদ করারও উপক্রম করল। কিন্তু কোলিয়া তার কুকুরের আবেগের এমন প্রবল উচ্ছ্বাস দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এতে শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। তাই আরও অন্তত মিনিট খানেকের জন্য তাকে বেঞ্চির নিচে আগের অবস্থায় রেখে দিল। যখন দরদালানের দরজা খুলল একমাত্র তখনই হঠাৎ তাকে শিস দিয়ে ডাকল। কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে মহানন্দে লাফাতে লাফাতে কোলিয়ার আগে আগে চলতে লাগল।

দরদালান পার হয়ে কোলিয়া 'পুঁচকেদের' ঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখল। ওরা দুজনেই আগের মতো টেবিলের ধারে বসে আছে। তবে এখন আর বই পড়ছে না, কী নিয়ে যেন তর্কে মেতে আছে। এই বাচ্চা দুটো প্রায়ই জীবনের বেয়াড়া ধরনের নানা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করে, তবে নাস্তিয়া বড়ো বলে সব সময় তারই জিত হয়। এদিকে কোস্তিয়া যদি তার দিদির সঙ্গে একমত না হয় সেক্ষেত্রে প্রায় সব সময় কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিনের কাছে আর্জি করে। কোলিয়া যে মত দেবে সেটা ওদের দু পক্ষের কাছেই চরম রায়দান বলে গ্রাহ্য হবে। ওদের এবারের তর্কের বিষয়টা ক্রাসোত্‌কিনকে বেশ খানিকটা আগ্রহী করে তুলল। সে থমকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের আলোচনা শুনতে লাগল। ওরাও দেখতে পেল ক্রাসোত্‌কিন ওদের আলোচনা শুনছে, তাতে আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে বাদানুবাদ চালিয়ে যেতে লাগল।

নাস্তিয়া উত্তেজিত হয়ে আধো-আধো স্বরে বলছে, "কখনও নয়, আমি কখনওই বিশ্বাস করব না সে বুড়ি ধাইরা ছোটো বাচ্চাদের আনাজ খেতে বাঁধাকপির সারির মাঝখানে খুঁজে পায়। এখন তো বাঁধাকপির সময় নয়, এই সময় বুড়ি আনাজ খেত থেকে কাতেরিনাকে মেয়ে এনে দিতে পারে না।"

"বোঝ কাণ্ড!" কোলিয়া আপন মনে শিস দিয়ে উঠল।

"আবার এমন হলেও হতে পারে যে ওরা কোথা থেকে কে জানে বাচ্চা নিয়ে আসে, তবে একমাত্র তাদেরই এনে দেয় যাদের বিয়ে হয়েছে।"

কোস্তিয়া অপলক দৃষ্টিতে তার দিদির দিকে তাকাল, গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে কথাগুলি শুনল, মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। শেষকালে দৃঢ় ও উত্তেজিত স্বরে সে বলে উঠল, "তুই আচ্ছা বোকা তো! কাতেরিনার তো বিয়েই হয়নি, তাহলে আবার ওর বাচ্চা হয় কী করে?"

নাস্তিয়া দারুণ রেগে গেল।

"তুই কিছুই বুঝিস না", তাকে থামিয়ে দিয়ে বিরক্তির সুরে সে বলে উঠল। "হয়তো ওর বর ছিল, এখন জেলে, আর ঠিক এই সময় কাতেরিনার বাচ্চা হল।"

"ওর বর তাহলে জেলে আছে?" ভারিক্কি চালে জানতে চাইল ভালোমানুষ কোস্তিয়া।

"আবার এমনও হতে পারে " প্রথম অনুমানটা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে এবং সেটার কথা ভুলে গিয়ে তাকে বাধা দিয়ে নাস্তিয়া বলে উঠল, "হতে পারে যে তুই যা বলেছিস তা-ই ঠিক—ওর বর নেই, কিন্তু ও বিয়ে করতে চায়, ভাবতে থাকে কী করে বিয়ে করা যায়। ভাবতে ভাবতে শেষকালে অবস্থা হল এই যে, বর আর ওর হল না, সেটা হয়ে গেল একটা বাচ্চা।"

"ও, তাই নাকি?" কোস্তিয়া সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে দিদির কথায় সায় দিয়ে বলল। "এ কথা তুই আমায় আগে বলিসনি তো, জানব কী করে?"

"এই যে বাচ্চারা, তোমরা দেখছি সাঙ্ঘাতিক লোক!" এবারে ঘরের ভেতরে ঢুকে কোলিয়া বলে উঠল।

"আরে, 'রিমঝিমও' তোমার সঙ্গে?" দাঁত বের করে হেসে এই বলে টুসকি মেরে 'রিমঝিমকে' ডাকতে লাগল কোস্তিয়া।

"ওহে পুঁচকেরা আমি একটু অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেছি", গুরুগম্ভীর ভাবে ক্রাসোত্‌কিন শুরু করল। "আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমাদের। আগাফিয়াটার নির্ঘাত পা ভেঙেছে, কেন না এখন পর্যন্ত তার দেখা নেই। এতে আর কোনো সন্দেহ নেই, এ আমি লিখে দিতে পারি। এদিকে আমার বাড়ি থেকে না বেরোলেই নয়। তোমরা আমাকে ছাড়বে তো, না কি?"

বাচ্চারা উদ্বিগ্ন হয়ে মুখ চাওয়া চাউয়ি করল। তাদের দন্তবিকশিত মুখে উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পেতে শুরু করল। তারা অবশ্য তখনও বুঝতে পারছিল না তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছিল।

"আমি না থাকলে তোমরা দুষ্টুমি করবে না তো? আলমারির মাথায় চড়ে বসবে না তো? ভাঙবে না তো? একা-একা ভয়ে কান্নাকাটি করবে না?"

ওদের চেহারা দেখে বোঝা গেল ওরা একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

"আমার কথা শুনলে আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে পারি। পেতলের

তৈরি একটা ছোট্ট কামান। ভেতরে সত্যিকারের বারুদ ঠেসে দিলে ওটা থেকে তোপ দাগা যায়।"

দুই ভাইবোনের চোখমুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"দেখাও, দেখাও কামানটা", বলতে বলতে খুশির ঝলক খেলে গেল কোস্তিয়ার সর্বাঙ্গে।

ক্রাসোত্‌কিন তার থলের ভেতরে হাত পুরে সেখান থেকে পেতলের একটা ছোট্ট খেলনা কামান বের করে আনল। সেটা টেবিলের ওপর রাখল।

"দেখাও বলছ, তাই তো! দেখ দেখ, চাকার ওপর আছে কামানটা", বলতে বলতে সে খেলনাটা টেবিলের ওপর ঠেলে গড়িয়ে দিল। "গোলাও ছোঁড়া যায়। গোলা ভরলেই দাগা যাবে।"

"লোকজন মারা পড়বে?"

যে কাউকে মারা যাবে—ঠিকমতো তাক করতে পারলেই হল।" এই বলে ক্রাসোত্‌কিন বুঝিয়ে দিল কোথায় বারুদ ঠাসতে হবে, কোথায় গোলা গড়িয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে, বারুদ ভরার জায়গার মতো দেখতে একটা ছোটো গর্তও দেখিয়ে দিল। এও বলল যে গোলা ছোড়ার সময় কামানটা ধাক্কাও মারা।

বাচ্চারা দারুণ কৌতূহল নিয়ে ওর কথাগুলি শুনল। কামানটা ধাক্কাও মারে বিশেষ করে এই কথা শোনার পর তারা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

"তোমার কাছে কি বারুদ আছে?" নাস্তিয়া জানতে চাইল।

"আছে।"

"বারুদও দেখাও তা হলে", মৃদু হেসে অনুরোধের সুরে টেনে টেনে বলল নাস্তিয়া।

ক্রাসোত্‌কিন আবার থলির ভেতরে হাত দিল, সেখান থেকে একটা ছোট্ট শিশি টেনে বের করল। শিশির ভেতরে সত্যি সত্যি সত্যিকারের কিছু বারুদ ঢালা ছিল, আর একটা কাগজের মোড়কে দেখা গেল খুদে খুদে দানার মতো গুটি কয়েক ছর্‌রাও আছে। এমনকি ক্রাসোত্‌কিন শিশির ছিপি খুলে খানিকটা বারুদও তার হাতের তালুতে ঢালল।

"এখন শুধু এটাই দেখতে হবে যে কোথাও আগুন যেন না থাকে, তাহলে কিন্তু আর দেখতে হবে না—ফেটে গিয়ে আমাদের সবাইকে খতম করে দেবে", ফলটা কী হয় দেখার জন্য ক্রাসোত্‌কিন এই বলে সতর্ক করে দিল।

"ছর্‌রা অমনিতে পোড়ে নাকি?" কোস্তিয়া জানতে চাইল।

"না, তা পোড়ে না।"

"আমাকে একটুখানি দাও না।" কোস্তিয়ার কণ্ঠে মিনতির সুর।

"সে একটু তোমাকে উপহার দিচ্ছি। এই নাও। শুধু একটা কথা আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার মাকে কিছু দেখাবে না। নইলে উনি ভেবে বসবেন এটা

বারুদ, ভয়ে মারা যাবেন, তোমাদের চাবকে আস্ত রাখবেন না।”

“মা আমাদের কখনও চাবকায় না”, নাস্তিয়া তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করল।

“সে আমি জানি। ওটা ওই অমনি, কথাটা জমকাল শোনায় বলে বললাম। আর হ্যাঁ মাকে কখনও ফাঁকি দিতে যেয়ো না—শুধু এই একবার ছাড়া—তাও আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত। তাহলে ‘পুঁচকেরা’ আমি যেতে পারি তো? কী বল? আমি না থাকলে ভয়ে কান্না কাটি জুড়ে দেবে না তো?”

কোস্তিয়া ততক্ষণে কাঁদার জন্য প্রস্তুত। ইনিয়ে বিনিয়ে করুণ কণ্ঠে সে বলল, “কাঁ-দ্-ব।”

“কাঁদব, কাঁদবই তো!” ভাইয়ের কথার খেই ধরে ভীতচকিত কাতিয়া তড়বড়িয়ে বলে উঠল।

“ওঃ বাচ্চারা, তোমাদের এই বয়সটাই ভারি বিপদের দেখছি। এই পাখির ছানাগুলোকে নিয়ে কী যে করি! নাঃ, তোমাদের সঙ্গে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে? এদিয়ে সময়, ওঃ, সময় যে বয়ে যায়!”

“আচ্ছা, ‘রিমঝিম’কে মড়ার ভান করে পড়ে থাকতে বল তো”, কোস্তিয়া আবদার করল।

“তা ঠিকই, কিছুই তো করার নেই, এখন ‘রিমঝিমের’ শরণ নিতে হয়। চুঃ, রিমঝিম!” কোলিয়া একের পর এক হুকুম দিতে লাগল, আর কুকুরটাও যত রকমের কৌশল তার জানা আছে সে সব দেখাতে লাগল। কুকুরটার গায়ের লোম ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, সচরাচর রাস্তার পেতি কুকুর যেমন হয় সেই আকারের। গায়ের লোমগুলো কেমন যেন বেগনি আভা মেশানো ধূসর। ডান চোখটা তার কানা, আর বাঁ কানটা কেন যেন কাটা। কুকুরটা কিঁউ কিঁউ করে লম্ফ ঝম্প শুরু করে দিল, পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, হাঁটল, ঝট করে চার পা শূন্যে তুলে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে মড়ার মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকল। এই শেষ কসরতটা যখন সে দেখাচ্ছিল সেই সময় দরজা খুলে গেল, দোর গোড়ায় দেখা দিল মাদাম ক্রাসোত্কিনার পরিচারিকা আগাফিয়া। আগাফিয়া মোটাসোটা গড়নের মেয়েমানুষ, বছর চল্লিশেক তার বয়স, সারা মুখে বসন্তের দাগ। সে বাজার থেকে ফিরে এসেছে, তার হাতে কেনা খাদ্য সামগ্রীতে বোঝাই থলে। বাজারের থলেটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে রেখেই সে কুকুরের কাণ্ডকারখানা দেখতে শুরু করল। কোলিয়া ব্যাকুল ভাবে আগাফিয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছিল ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটা সে বন্ধ করল না। ‘রিমঝিমকে’ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মড়ার ভঙ্গিতে ধরে রাখার পর শেষকালে শিস দিয়ে তাকে ডাকল। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তার কর্তব্য পালন করতে পেরেছে বলে খুশিতে ডগমগ হয়ে লাফাতে শুরু করল।

“হুঃ, কুকুরের যত আদিখ্যেতা!” মোক্ষম রায় দানের ভঙ্গিতে আগাফিয়া বলল।

"তা বলি মেয়েমানুষ, দেরি হল যে বড়ো!" ক্রাসোত্কিন রুক্ষস্বরে জিগ্গেস করল।

"মেয়েমানুষ! হুঁঃ, ছোঁড়ার কথা শোন!"

"ছোঁড়া বলছ?"

"হ্যাঁ, বলবই তো। আমার দেরি হয়েছে তাতে তোমার কী? দেরি যদি করে থাকি তাহলে বুঝতে হবে দরকারেই করেছি", বিড়বিড় করে এই কথা বলে আগাফিয়া উনুনের ধারে তার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তবে তাকে দেখে মোটেই অসন্তুষ্ট বলে মনে হল না, তার কণ্ঠস্বরেও রাগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না, বরং তাকে খুবই সন্তুষ্ট মনে হল। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল এই হাসিখুশি খোকাবাবুটির সঙ্গে খুনসুটি করার সুযোগ পেয়ে তার আনন্দই হচ্ছে।

"শোন বুড়ি, তোমার তো মতির কোনো স্থির নেই", সোফা ছেড়ে ক্রাসোত্কিন বলতে শুরু করল, "তাই বলি কি, এই পৃথিবীতে যা কিছু পবিত্র, আর তা ছাড়া আরও যদি কিছু থাকে সে সবের দিব্যি দিয়ে তুমি আমায় বলতে পার কি যে আমার অনুপস্থিতিতে এই পুঁচকে দুটোর ওপর তুমি সদা সতর্ক নজর রাখবে? আমি আবার একটু বাইরে বেরোচ্ছি।"

"তোমার কাছে দিব্যি করতে যাব কোন্ দুঃখে শুনি?" আগাফিয়া হাসতে হাসতে বলল। "সে তো আমি অমনিতেই দেখব।"

"না, তোমার আত্মার চিরকালের মুক্তির দিব্যি দিয়ে কথা দিতে হবে, নইলে যাব না।"

"তা যেয়ো না। আমার তাতে বয়েই গেল। বাইরে কনকনে হিম, ঘরেই না হয় বসে থাক।"

"এই যে পুঁচকেরা, শোন" এবারে বাচ্চাদের উদ্দেশ করে কোলিয়া বলল, "আমি না আসা পর্যন্ত, নয়তো তোমাদের মা না আসা পর্যন্ত এই স্ত্রীলোকটি তোমাদের সঙ্গে থাকবে, কারণ অনেক আগেই তার ফিরে আসা উচিত ছিল। তা ছাড়া এ তোমাদের সকালের জলখাবারও খেতে দেবে। কী বল আগাফিয়া, ওদের কিছু খেতে দেবে তো?"

"সেটা সম্ভব।"

"চলি তা হলে পাখির ছানারা। হালকা মনেই আমি যাচ্ছি, আর তোমাকে বলি বাপু আইমা", আগাফিয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় গম্ভীরভাবে সে বলল, "কাতেরিনার ব্যাপারে তোমাদের বুড়িদের মধ্যে যে সব আবোলতাবোল মেয়েলি কথার চল থাকতে পারে আশা করি সেগুলো ওদের বলবে না, ওদের কচি বয়সের কথা মনে রেখে তা থেকে ওদের রেহাই দেবে। চুঃ রিমঝিম!"

"হুঁঃ, তোমার যত কথা!" এবারে কিন্তু সত্যি সত্যি রাগ করে সে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল "অদ্ভুত বটে! এসব কথাবার্তার জন্য তোমাকেই তো দেখছি ধরে চাবকাতে হয়।"

## তিন

## স্কুল-পড়ুয়া

কিন্তু কোলিয়া আর কান দিল না। শেষকালে ছাড়া পেল তা হলে। বাড়ির ফটক ছাড়িয়ে আসার পর সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, দু কাঁধ ঝাঁকাল তার পর কী কনকনে ঠাণ্ডা!' এই বলে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটা দিল, পরে ডান দিকের গলিতে মোড় নিয়ে বাজার চত্বরের পথ ধরল। বাজার চত্বর পর্যন্ত না গিয়ে তার একটা বাড়ি আগেই বাড়ির ফটকের সামনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল বার করে প্রাণপণে সেটাতে এমন ভাবে ফুঁ দিল যেন কাউকে আগে থাকতে স্থির করা কোনো সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। মিনিট খানেকের বেশি তাকে অপেক্ষা করতে হল না, এমন সময় গেট খুলে ছুটে তার দিকে এগিয়ে এলো বছর এগারো বয়সের একটা ছেলে। ছেলেটার গাল দুটো গোলাপি। তারও পরনে গরম ওভারকোট, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমনকি কেতাদুরস্তও বটে। ছেলেটি স্মুরভ্। এখনও প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র, কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিনের দু' ক্লাস নীচে পড়ে। জনৈক অবস্থাসম্পন্ন সরকারি আমলার ছেলে। বেপরোয়া ধরনের দুরন্ত বলে কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিনের যে বিরাট খ্যাতি রটে গিয়েছিল তাতে মনে হয় ছেলেটার বাবা-মা তাকে কোলিয়ার সঙ্গে মিশতে দিত না, তাই এটা স্পষ্ট যে স্মুরভ্ এখন গোপনে বাড়ি থেকে সটকান দিয়েছে। এই স্মুরভ্ ছেলেটি—পাঠক যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন—সেই ছেলের দলের একজন, যাদের দুমাস আগে নালার ওপার থেকে ইলিউশার দিকে আমরা ঢিল ছুড়তে দেখেছি। স্মুরভ্‌ই তখন আলিয়োশা কারামাজভ্‌কে ইলিউশা সম্পর্কে বলেছিল।

"আমি তোমার জন্য ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি ক্রাসোত্‌কিন", চোখেমুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে স্মুরভ্ বলল। ওরা দুজনে বাজার চত্বরের দিকে পা বাড়াল।

"দেরি হয়ে গেল", ক্রাসোত্‌কিন উত্তর দিল। "একটা ব্যাপারে আটকে পড়েছিলাম। তুই যে আমার সঙ্গে আসছিস এর জন্য বাড়িতে আবার মারধর খাবি না তো?"

"কী যে বল! আমি কখনও মারধর খাই না! আরে রিমঝিমও তোমার সঙ্গে আছে?"

"হ্যাঁ, রিমঝিমও আছে।"

"ওকেও ওখানে নিয়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি।"

"আহা, 'জুচ্‌কা' কুকুরটা যদি থাকত!"

"জুচ্কাকে নিয়ে যাওয়া তো আর সম্ভব নয়। জুচ্কা বেঁচে নেই। অজানার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, এরকম করলে হয় না " বলতে বলতে স্মুরভ্ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ইলিউশা তো বলেছিল ওর 'জুচ্কাও' ছিল এই 'রিমঝিমের' মতোই ঝাঁকড়া লোমশ, ছাই-ছাই রঙের। ওকে বলা যায় না যে এটাই সেই জুচ্কা? বলা যায় না, হয়তো বিশ্বাসও করবে।"

"ওরে অপোগণ্ড স্কুল পড়ুয়া, মিথ্যা সর্বৈব বর্জনীয়—এটা এক, আর দুই হল, এমন কি ভালো কাজের জন্য হলেও বর্জনীয়। বড় কথা, আমি যে আসছি, আশা করি এ সম্পর্কে ওখানে কিছু জানাসনি।"

"ভগবান রক্ষে করুন! এটা কি আর আমি বুঝি না? তবে রিমঝিমকে দিয়ে ওকে শান্ত করা যাবে না।" স্মুরভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "জান, ওর বাবা, ক্যাপ্টেন, আমাদের 'শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া' আমাদের কাছে বলেছিল ওর জন্য নাকি আজই কালো নাকওয়ালা ভালো জাতের শিকারি কুকুরের ছানা এনে দেবে। ভাবছে এই দিয়ে ইলিউশাকে শান্ত করতে পারবে। আমার তো মনে হয় না।"

"তা ইলিউশা নিজে কেমন আছে?"

"ওঃ খারাপ, খুব খারাপ! আমার মনে হয় ওর যক্ষ্মা হয়েছে। ওর জ্ঞান ঠিকই আছে, কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যা অবস্থা! ভালো নয়। সে দিন ও চেয়েছিল কেউ যেন ওকে ধরে ধরে হাঁটায়, তাই ওকে বুটজুতো পরানো হল। কিন্তু হাঁটবে কী? হাঁটতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল। ও বলল, 'আঃ বাপি, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমার জুতোগুলো একেবারে বাজে। আগেও ও জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে বেকায়দায় পড়তে হত।' এটা ওর ধারণা আর কি যে জুতোর জন্যই ও টলে পড়ে যাচ্ছে। আসলে স্রেফ শরীর দুর্বল বলেই ওটা হচ্ছে। হের্‌ৎসেন্‌শ্টুবে এসে এসে দেখে যাচ্ছেন। এখন ওরা আবার বড়লোক হয়ে গেছে, ওদের অনেক টাকা।"

"যত সব বজ্জাত।"

"কারা বজ্জাত?"

"ওই ডাক্তারগুলো আর মোটের ওপর—শুধু মোটের ওপর কেন, বিশেষ করেও অবশ্যই বলব—ওদের ওই ওঁছামার্কা ডাক্তারি বিদ্যে। ডাক্তারিতে আমার বিশ্বাস নেই। সে যাক গে, পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। কিন্তু কথাটা হল ওখানে তোমাদের আবেগের অত মাতামাতিটা কীসের বল তো? তোমরা ক্লাসশুদ্ধ সবাই ওখানে যাও নাকি?"

'সবাই নয়, আমাদের এই জনা দশেক যায়, সব সময় যায়, রোজই যায়। ও কিছু নয়।"

"এ সবের মধ্যে আলেক্সেই কারামাজভের ভূমিকাটা আমাকে অবাক করে দিচ্ছে।

এমন একটা অপরাধের জন্য ওর ভাইটার কাল-পরশু নাগাদ বিচার শুরু হচ্ছে, এই অবস্থায় ছেলেদের সঙ্গে মিলে আবেগে মাতামাতি করার এত সময় ‘ও পায় কোথা থেকে!”

“আবেগে মাতামাতি করার একেবারেই কিছু নেই এখানে। তুমি নিজেই তো এখন ইলিউশার সঙ্গে ভাব করতে যাচ্ছ।”

“ভাব করতে? হাসালি আমাকে। তবে হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি আমার কাজকর্ম কেউ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এটা আমি বরদাস্ত করব না।”

“আহা, ইলিউশা তোমাকে দেখে কী খুশিই না হবে! ও ভাবতেই পারে না যে তুমি আসছ। কেন, কেন বল তো এত দিন তুমি আসতে চাওনি?” হঠাৎ উত্তেজনার বশে স্মুরভ্ বলে ফেলল।

“ওরে আমার বাচ্চা ছেলে, সেটা আমার ব্যাপার, তোর ব্যাপার নয়। আমি নিজেই নিজে থেকে যাচ্ছি, কারণ ওটাই আমার মনের ইচ্ছে। কিন্তু তোমাদের সবাইকে ওখানে টেনে নিয়ে গেছে আলেক্সেই কারামাজ়ভ্—মানে, তফাত আছে। তা ছাড়া তুই কী করে জানলি? এমনও তো হতে পারে আমি ওর সঙ্গে ভাব করার জন্য আদৌ যাচ্ছি না? বোকার মতো কথা বললেই হল?”

“মোটেই কারামাজ়ভ্ নয়, মোটেই ওর কাজ নয় এটা। সোজা কথা হল আমরা ছেলেরা নিজেরাই ওখানে যেতে শুরু করি। তবে হ্যাঁ প্রথমে অবশ্য কারামাজভের সঙ্গে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে ওরকম কিছুই ছিল না—কোন রকম বোকামি ছিল না। প্রথমে একজন তার পর আরেকজন। ওর বাবা আমাদের দেখে দারুণ খুশি। জান, ইলিউশা মারা গেলে উনি স্রেফ পাগল হয়ে যাবেন। উনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইলিউশা মারা যাচ্ছে। আর আমরা যে ইলিউশার সঙ্গে ভাব করে ফেলেছি তাতে কী খুশি! ইলিউশা তোমার কথা জিগ্‌গেস করছিল, এর বেশি অবশ্য কিছু বলেনি। জিগ্‌গেস করার পর চুপ করে থাকে। এদিকে ওর বাবা হয় পাগল হয়ে যাবেন নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। আগেও উনি পাগলের মতো ব্যবহার করতেন। জান, মানুষটা বড্ড ভালো। আমরা তখন ভুল করেছিলাম। এ সবের জন্য দায়ী ওই লোকটা যে তার নিজের বাবাকে খুন করেছে। সে-ই তো তখন ওঁকে ধরে পিটিয়েছিল।”

“যাই বলিস না কেন, কারামাজ়ভ্ কিন্তু আমার কাছে একটা প্রহেলিকা। আমি অনেক আগেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারতাম, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি আমার দেমাক নিয়ে থাকাটা পছন্দ করি। তা ছাড়া ওর সম্পর্কে মনে মনে আমার একটা ধারণা গড়ে উঠেছে, সেটা এখনও যাচাই করে দেখতে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে।”

কোলিয়া গম্ভীর ভাব করে চুপ করে গেল। স্মুরভ্‌ও চুপ করে রইল। স্মুরভ্, বলাই বাহুল্য, কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিনকে দস্তুরতো ভক্তি করত, নিজেকে তার সমান

সমান বলে সে ভাবতে পারত না, সে কথা ভাবার মাথাই তার ছিল না। এখন আবার যখন কোলিয়া তাকে বুঝিয়ে বলল যে সে 'নিজেই নিজে থেকে' ইলিউশাকে দেখতে যাচ্ছে তখন সে দারুণ কৌতূহল বোধ করল। তার মনে হল কোলিয়া যে বেছে বেছে ঠিক আজই দুম করে ওখানে যাবার কথা ভেবে বসল এর পেছনে নির্ঘাত কোনো রহস্য আছে। ওরা বাজার চত্বরের ওপর দিয়ে চলল। সেখানে এই সময়টাতে বাইরে থেকে জিনিসপত্রে বোঝাই অনেক গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে ছিল। নানা জায়গা থেকে হাঁস মুরগি জাতীয় যে সমস্ত পাখি নিয়ে আসা হয়েছে সেগুলিও সংখ্যায় কম নয়। শহরের পসারিনিরা যার যার ছাউনির নিচে মিষ্টি গোল রুটি, সেলাইয়ের সুতো ইত্যাদি নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছে। রবিবারের এই সব লোক সমাগমকে আমাদের মফস্‌সল শহরের লোকেরা কেন যেন তাদের সরল বিশ্বাসে 'মেলা' বলে থাকে। এই ধরনের 'মেলা' বছরে অনেকগুলি বসে।

'রিমঝিম' মহা আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, কখনও ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে যখন যেখানে পারে পাশ ফিরে সরে গিয়ে কিছু না কিছুর গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। অন্য কোনো কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের সারমেয় সমাজের সমস্ত রীতিনীতি মেনে প্রবল উৎসাহে পরস্পরের গা শোঁকাশুঁকি করছে।

"বাস্তব ঘটনা লক্ষ করতে আমার ভালো লাগে, স্মুরভ্", নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ কোলিয়া বলল। "কুকুরগুলো ওদের নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলে কেমন গা শোঁকাশুঁকি করে তুই লক্ষ করে দেখেছিস কি? মনে হয় এখানে ওদের মধ্যে কোনো সাধারন প্রাকৃতিক নিয়ম আছে।"

"হ্যাঁ, কেমন যেন হাস্যকর।"

"না, হাস্যকর নয়, এটা তুই ঠিক বললি না।' প্রকৃতিতে মজার বলে কিছু নেই—তা সে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কাছে যা-ই মনে হোক না কেন। কুকুরদের যদি বিচার করার বা সমালোচনা করার ক্ষমতা থাকত তাহলে তাদের যারা প্রভু সেই মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে তারাও সম্ভবত এমন অনেক কিছু খুঁজে পেত যা তাদের কাছে হাস্যকর, আর সেগুলো সংখ্যায় কোনো অংশে কম তো হতই না, এমনকি আরও অনেক বেশিও হতে পারত। আবারও বলছি, আরও অনেক বেশি; বলছি এই কারণে যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিমাণ আরও অনেক বেশি। এটা রাকিতিনের আইডিয়া, চমৎকার আইডিয়া। আমি একজন সমাজতন্ত্রী, স্মুরভ্।"

"সমাজতন্ত্রীটা কী ব্যাপার?" স্মুরভ্ জিগ্যেস করল।

"সে হল যখন সবাই সমান, যখন সকলের সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি, বিয়ে-শাদির বালাই নেই। আর ধর্মকর্ম, আইনকানুন, আরও যা কিছু সে সমস্তই যার যেমন খুশি। তোর এখনও ওসব বোঝার বয়স হয়নি, এখনও সময় হয়নি। যা-ই বলিস না কেন, বেশ ঠান্ডা কিন্তু।"

“তা ঠিক। বারো ডিগ্রি নিচে। এই কিছু আগে বাবা ব্যারোমিটারে দেখলেন।”

“তুই লক্ষ করে দেখেছিস কি স্মুরভ্, শীতের মাঝামাঝি সময়ে তাপমাত্রা যদি পনেরো, এমনকি আঠারো ডিগ্রির নিচেও নেমে যায় তবু কিন্তু এতটা ঠান্ডা মনে হয় না—এই যেমন এখন, শীতের শুরুতে লাগছে। এখন যে সে রকম লাগছে তার কারণ এই যে হিমের মাত্রা ঝট করে, আচমকা বারো ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে, তায় আবার বরফও তেমন পড়ছে না। তার মানে, লোক এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। মানুষের সব কিছু নির্ভর করে তার অভ্যাসের ওপর—এমনকি তার সামাজিক আর রাজনৈতিক সম্পর্কও। অভ্যাস, অভ্যাসই হলো মূল চালিকা শক্তি।... আরে দ্যাখ, লোকটাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে!”

কোলিয়া একটা ঢ্যাঙা মতন চাষিকে দেখিয়ে দিল। লোকটার গায়ে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট, চেহারাটা বেশ প্রসন্ন। সে তার মাল বোঝাই গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠান্ডায় জমে গিয়ে দস্তানা পরা হাতে তালি মেরে হাত গরম করছে। তার হালকা বাদামি রঙের লম্বা দাড়ি জমাট শিশিরকণায় আগাগোড়া ছেয়ে গিয়ে চাপ বেঁধে আছে।”

“লোকটার দাড়ি জমে হিম হয়ে গেছে”, পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু পিছনে লাগার ভঙ্গিতেই বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল কোলিয়া।

“অনেকেই জমে হিম হয়ে গেছে”, উত্তরে শান্ত কণ্ঠে, রায় দানের ভঙ্গিতে চাষিটি বলল।

“ওর পেছনে লাগতে যেয়ো না”, স্মুরভ্ মন্তব্য করল।

“ও কিছু না, রাগ করবে না। লোকটা ভালো। চললাম মাত্‌ভেই ভাই।”

“আচ্ছা, এসো।”

“তোমার নাম কি তাহলে মাত্‌ভেই?”

“হ্যাঁ, মাত্‌ভেই-ই তো। তুমি জানতে না?”

“জানতাম না। আন্দাজে ঢিল ছুড়েছি।”

“বোঝ কাণ্ড! স্কুল-পড়ুয়া, তাই না?”

“হ্যাঁ, স্কুল পড়ুয়া।”

“আচ্ছা, বেত-টেত খেতে হয় তোমাদের?”

“তেমন একটা নয়—তবে মাঝে সাঝে হয় বৈ কি।”

“ব্যথা লাগে না?”

“তা আর বলতে!”

“ওঃ, কী জীবন!” চাষিটি প্রাণ খুলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

“চললাম, মাত্‌ভেই।”

“এসো বাবা। তুমি ছেলেটা বড্ড ভালো গা।”

ওরা দুজনে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল।

"এই লোকটা বেশ ভালো", স্মুরভ্‌কে কোলিয়া বলল। "আমি সাধারণ লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসি, ওদের প্রতি সুবিচার করতে পারলে আমি সব সময় খুশি হই।"

"আচ্ছা, তুমি মিথ্যে করে বললে কেন যেন আমরা বেত খাই?" স্মুরভ্ জিগ্‌গেস করল।

"বাঃ, ওকে একটু সান্ত্বনা দিতে হবে না?"

"সে আবার কী করে?"

"দ্যাখ স্মুরভ্, কেউ যদি প্রথম কথাতেই বুঝতে না পেরে আবার একই প্রশ্ন করে সেটা আমি পছন্দ করি না। এমন কিছু জিনিস আছে যার ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন হয় না। একজন চাষির ধারণা হল স্কুল-পড়ুয়ারা বেত খায়, তাদের বেত মারাই উচিত। যে স্কুল-পড়ুয়া বেত খায় না সে আবার কীসের স্কুল পড়ুয়া? তাই আমি যদি হঠাৎ করে ওকে বলে বসি যে আমাদের স্কুলে বেত-টেত মারে না তাহলে সে এতে দুঃখ পাবে। যাক গে, তুই এটা বুঝবি না। আরে বাবা, সাধারণ লোকজনের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তা জানতে হয়।"

"তবে আর যাই হোক, কারও পিছনে লাগতে যেয়ো না, তাহলে কিন্তু সেবার ওই রাজহাঁসটাকে নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছিল আবার সে রকম একটা কিছু হয়ে যাবে।"

"ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

"হেসো না কোলিয়া। সত্যি বলছি, আমি ভয় পাচ্ছি। ওরকম কিছু হলে বাবা ভয়ানক চটে যাবেন। তোমার সঙ্গে বাইরে যেতে আমাকে পই-পই করে বারণ করে দেওয়া হয়েছে।"

"নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। এবারে কিছু হবে না। এই যে নাতাশা!" একটা ছাউনির নিচে একজন পসারিনিকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে তাকে বলল কোলিয়া। এই মেয়েমানুষটিকে বুড়ি আদৌ বলা যায় না। কোলিয়ার কথার উত্তরে সে তিরিক্ষি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল "আমি আবার তোমার নাতাশা হলাম কবে থেকে? আমি মারিয়া।"

"ভালো যে তোমার নাম মারিয়া। আচ্ছা, চলি।"

"ওরে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া! ওই তো এক রত্তি, এদিকে কি না এত দূর!"

"সময় নেই, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই আমার। যা বলার এর পরের কোন এক রোববার বলবে।" কোলিয়া এমন ভাবে হাত নাড়া দিল যে মনে হল কোলিয়া তো নয়, পসারিনিটিই যেন তার পিছনে লাগতে এসেছিল।

"রোববার তোকে আবার কী বলতে যাব রে? লাগতে এসেছিল কে? তুই, না আমি? বিচ্ছু কোথাকার!" চেঁচিয়ে গলা ফাটাল মারিয়া। "তোকে ধরে চাবকাতে হয়, ওটাই তোর বাকি আছে। তোর মতো চ্যাংড়াগুলোকে আমার জানা আছে, হ্যাঁ তাই!"

মারিয়ার পাশাপাশি আরও যারা পসারিনি ছিল, যারা গলায় পসরার বাক্স ঝুলিয়ে ফিরি করছিল, তাদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ শহরের সাজানো দোকানের সারির ভেতর থেকে বলা নেই কওয়া নেই তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তিরিক্ষি মেজাজের একটা লোক। লোকটা কোনো ব্যবসায়ীর দোকান কর্মচারী গোছের কেউ হবে, স্থানীয় কেউ নয়, বাইরে থেকে এসেছে। তার গায়ে মাটি ছুঁই ছুঁই নীলরঙা চাষাড়ে কোর্তা, মাথায় কানাতওয়ালা চুড়ো টুপি। বয়স বেশ কম, মাথার চুল কোঁকড়া, গাঢ় বাদামি রঙের। মুখটা পাণ্ডুর, লম্বাটে, সারা মুখে বসন্তের দাগ। সে কেমন যেন অবুঝের মতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ ঘুষি পাকিয়ে কোলিয়াকে ভয় দেখাতে শুরু করল।

"আমি তোকে চিনি", ক্ষিপ্ত হয়ে সে গর্জন করে উঠল, "তোকে আমি চিনি!"

কোলিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকে তাকিয়ে দেখল। কিছুতেই মনে করতে পারল না এই লোকটার সঙ্গে তার কখনও কোন হাঙ্গামা বেধেছিল কিনা। তবে রাস্তায় ঘাটে কম হাঙ্গামায় তো আর তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়নি। সব কি আর মনে থাকার কথা?

"চেন বলছ?" বিদ্রুপের সুরে কোলিয়া জিগ্গেস করল।

"তোকে আমি চিনি! তোকে আমি চিনি!" কর্মচারী শ্রেণির লোকটার বোকার মতো সেই এক সুর।

"তা বেশ তো, তাতে তো তোমারই ভালো। তা যাক গে, আমার অত সময় নেই। চলি!"

"নষ্টামির জায়গা পাও না!" লোকটা চেঁচাতে লাগল। "ফের নষ্টামি? আমি তোকে চিনি! ফের নষ্টামি?"

"আমি যদি নষ্টামি করে থাকি সেটা তোমার দেখার কথা নয় ভাই", থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কোলিয়া বলল।

"আমার দেখার কথা নয় মানে?"

"মানে, তোমার দেখার কথা নয়।"

"তাহলে কার? কার? কার তা হলে, শুনি?"

"তা ভাই সেটা এখন ত্রিফন নিকিতিচের ব্যাপার, তোমার নয়।"

কোথাকার ত্রিফন নিকিতিচ? সে আবার কে?" যদিও কোলিয়ার ওপর ছোকরা তখনও রীতিমতো চটে ছিল, তবু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকাল। কোলিয়া গম্ভীরভাবে চোখ বুলিয়ে আপাদমস্তক তাকে দেখে নিল।

"বলি, স্বর্গারোহণ গির্জায় কখনও গিয়েছিলে?" কঠিন স্বরে, বেশ জোর দিয়ে কোলিয়া হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করল।

"কোন্ স্বর্গারোহণ গির্জায় আবার? কী করতে? না, যাইনি।" ছোকরা বেশ খানিকটা থতমত খেয়ে গেল।

"সাবানেইয়েভ্‌কে চেন?" এবারে আরও বেশি জোর দিয়ে এবং আরও বেশি কঠিন স্বরে কোলিয়া চালিয়ে গেল।

"কোন্ সাবানেইয়েভ্, বল তো? না, চিনি না।"

"নিকুচি করেছি তোমার! এরপর আর কী বলব?" এই বলে দুম করে বাক্যালাপ থামিয়ে দিয়ে ঝটিতি ডান দিকে ঘুরে গিয়ে কোলিয়া তার নিজের পথে পা বাড়াল। তার হাবভাব দেখে মনে হল সাবানেইয়েভ্‌কে পর্যন্ত যে চেনে না অমন একটা গবেট লোকের সঙ্গে কথা বলতেও যেন তার প্রবৃত্তি হয় না।

"এই, দাঁড়াও দাঁড়াও! কোন্ সাবানেইয়েভ্?" হতচকিত ভাব কেটে গিয়ে হুঁশ ফিরে আসতে ছোকরা আবার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। "এটা আবার ও কী বলল?" হঠাৎ ঘুরে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে পসারিনিদের দিকে তাকাল।

মেয়েরা সব হেসে উঠল।

"ছেলেটার মতলব বোঝা ভার," একজন বলল।

"কোন্ সাবানেইয়েভ্? কোন্ সাবানেইয়েভের কথা বলছে ছেলেটা?" ডান হাত নেড়ে ছোকরা আবার বলল। তখনও সে রীতিমতো ক্ষিপ্ত।

"হতে পারে সেই সাবানেইয়েভ্ যে কুজ়মিচোভ্‌দের কাছে চাকরি করত। সে-ই হবে", হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে একজন আন্দাজ করে বলল।

ছোকরার ক্ষিপ্ত চাউনি তার ওপর স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল।

"কুজ়মিচোভ্‌দের ওখানে যে ছিল?" আরেকটি মেয়েমানুষ বলে উঠল। "আরে তার নাম ত্রিফন হতে যাবে কেন? সে তো ত্রিফন নয়, সে হল গিয়ে কুজ়্মা। কিন্তু ছেলেটা তো নাম বলল ত্রিফন নিকিতিচ্। তা হলে সে নয়।"

"দ্যাখ, তার নাম ত্রিফন নয়, সে সাবানেইয়েভ্‌ও নয়, সে হল চিজভ্।" এবারে হঠাৎ কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ল তৃতীয় আরেকটি মেয়েমানুষ যে এতক্ষণ বেশ গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল। "তার নাম আলেক্সেই ইভানিচ্। পুরো নাম আলেক্সেই ইভানিচ্ চিজভ্", সে বলল।

"ঠিক কথা, চিজভ্‌ই বটে", চতুর্থজন বেশ জোর দিয়ে তাকে সমর্থন করে বলল।

ছোকরা হকচকিয়ে গিয়ে একবার এর দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকাতে লাগল।

"কিন্তু কেন ও জিগ্‌গেস করল, কেনই বা জিগ্‌গেস করল? তোমরাই বল না গো, ভালোমানুষেরা!" এবারে প্রায় মরিয়া হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। 'সাবানেইয়েভ্‌কে চেন?'—এ কথা কেন বলল? কে ছাই জানে কেমন সেই সাবানেইয়েভ্ লোকটা?"

"আচ্ছা হাঁদা তো তুমি। ওরা বলছে সাবানেইয়েভ্ নয়, চিজভ্—আলেক্সেই

চিজভ্—আলেক্সেই ইভানভিচ্ চিজভ্—তার কথাই তো হচ্ছে!" ভারিক্কি চালে তাকে চেঁচিয়ে বলল আরেক জন পসারিনি।

"কোথাকার চিজভ্? কে সে? অতই যদি জান তো বল না।"

"আরে, সেই শিকনি-ঝরা ঢ্যাঙা লোকটা, যে গরমকালে বাজারে বসে থাকত।"

"তোমার ওই চিজভ্‌কে দিয়ে আমার কী হবে শুনি? হ্যাঁ গো ভালোমানুষেরা, তোমরাই বল না, অ্যাঁ?"

"চিজভ্‌কে দিয়ে তোমার কী হবে তার আমি কী জানি বাপু?"

আরেক জন তার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, "তোমার কী হবে তা কে জানে? অমন যখন তুলকালাম জুড়ে দিয়েছ তখন তোমার নিজেরই তো জানা উচিত ওকে দিয়ে তোমার কী হবে। ছেলেটা তো তোমাকেই বলেছিল, আমাদের তো আর বলে নি। আচ্ছা বোকা লোক দেখছি! আচ্ছা, সত্যি বলছ চেন না?"

"কাকে?"

"ওই চিজভ্‌কে।"

"চুলোয় যাক চিজভ্, আর সেই সঙ্গে তুমিও চুলোয় যাও! ওটাকে একবার পেলে হয়—এমন ধোলাই দেব না! আমাকে নিয়ে তামাশা!"

"চিজভ্‌কে ধোলাই দেবে বলছ? হয়তো সে-ই তোমাকে দেবে এক চোট! তোমাকে একটা হাঁদারাম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না!"

"আরে চিজভ্‌কে নয়। চিজভ্‌কে কেন হতে যাবে? আচ্ছা কুচুটে, হাড় জ্বালানো মেয়েমানুষ দেখছি তুমি! ছেলেটাকে ধোলাই দেবার কথা বলছি আমি। একবার নিয়ে এসো, ওটাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো। আমাকে নিয়ে তামাশা! মজা দেখাচ্ছি!"

মেয়েমানুষের দল হেসে লুটিয়ে পড়ল। এদিকে কোলিয়া ততক্ষণে দমদমিয়ে পা ফেলে অনেক দূরে চলে গেছে। তার মুখে বিজয়ের হাসি। স্মুরভ্ তার পাশে পাশে চলতে চলতে পিছন ফিরে ফিরে দূর থেকে দেখছিল দলটা নিজেদের মধ্যে কেমন চিৎকার চেঁচামেচি করে চলেছে। তারও বেশ মজা লাগছিল, যদিও তখনও মনে মনে তার আশঙ্কা হচ্ছিল কোলিয়ার সঙ্গে পড়ে এখন আবার কোনো ঝামেলার মধ্যে না পড়লে হয়।

"কোন্ সাবানেইয়েভের কথা তুমি ওকে বললে?" উত্তর কী হবে আগে থাকতে বুঝতে পেরেই সে কোলিয়াকে জিগ্‌গেস করল।

"কোন্ সাবানেইয়েভ্ আমি তার কী জানি? এখন সন্ধে অবধি ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি চলবে। সমাজের সর্বস্তরের বোকা হাঁদাগুলোকে ঘাঁটাতে আমার ভালো লাগে। ওই যে আরও একটা গবেট, ওই যে ওই চাষাটা। জেনে রাখ, কথায় বলে, 'একজন বোকা ফরাসির চাইতে বোকা আর কেউ হয় না', কিন্তু একজন রুশি তার চেহারাতেই ধরা পড়ে যায়। দেখতে পাচ্ছিস না কি ওটার মুখে, ওই

চাষাটার মুখেই লেখা রয়েছে যে ওটা একটা আকাট মুখ্যু?"

"থাক, ওকে আপন মনে থাকতে দাও। চল, আমরা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাই।"

"থাকতে দাও বললেই হল। এই আমি শুরু করে দিলাম, দ্যাখ না। এই যে, কী খবর হে চাষির পো?"

এই চাষি লোকটা বেশ বলিষ্ঠ চেহারার। ধীরে ধীরে ওদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সম্ভবত ইতিমধ্যেই ঈষৎ পানোন্মত্ত। মুখটা গোল ছাঁদের, সাদাসিধে, দাড়িতে পাক ধরেছে। ছেলেটার কথা শুনে সে মাথা তুলে তার দিকে তাকাল।

"ঠাট্টা করে যদি না ডেকে থাক তাহলে বলি, পেন্নাম হই", জবাবে ধীরেসুস্থে সে বল্‌ল।

"তোমার কি মনে হয় আমি ঠাট্টা করছি?" কোলিয়া হেসে উঠল।

"আর ঠাট্টা যদি করই, তো কর না কেন? ঈশ্বর তোমায় দেখবেন। ও কিছু নয়, করা যেতে পারে। যে কোনো সময় ঠাট্টা করা যেতে পারে।"

"অপরাধ হয়ে গেছে ভাই। ঠাট্টা করছিলাম।"

"ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

"কিন্তু তুমি ক্ষমা করছ তো?"

"খুব করছি। এসো তা হলে।"

"বলছি কি, তুমি কিন্তু, হ্যাঁ, তুমি লোকটা মনে হয় বুঝদার।"

"তোমার চাইতে বুদ্ধিমান বটে", অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং আগের মতোই গাম্ভীর্য বজায় রেখে চাষি জবাব দিল।

"মনে হয় না।" কোলিয়া খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

"যা বলছি ঠিকই বলছি।"

"হতে পারে, হয়তো তা-ই।"

"তা-ই তো, ভাই।"

"চলি গো।"

"হ্যাঁ, এসো।"

"চাষিরা অনেক রকম হয়ে থাকে", কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর স্মুরভ্‌কে উদ্দেশ করে কোলিয়া মন্তব্য করল। কী করে জানব বল যে একজন বুদ্ধিমানের পাল্লায় পড়ব? সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে সেটা আমি সব সময় স্বীকার করতে প্রস্তুত।"

দূরে ক্যাথেড্রালের ঘড়িতে সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা পড়ল। ছেলেরা তাড়াতাড়ি পা চালাল। ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়েভের আস্তানা পর্যন্ত যেতে এখনও বেশ খানিকটা পথ বাকি। প্রায় কোনো কথা না বলে বাকি দীর্ঘ পথটা তারা দ্রুত পার হয়ে গেল। বাড়ি তখনও বিশ পা মতন দূরে, এমন সময় কোলিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল,

স্মুরভ্‌কে বলল সে যেন আগে ভেতরে গিয়ে কারামাজভ্‌কে এখানে তার কাছে ডেকে আনে।

"আগে প্রাথমিকভাবে চারপাশটা একটু শুঁকে দেখতে হয়", স্মুরভ্‌কে সে বলল।

"কেন? ডেকে আনার কী দরকার?" স্মুরভ্ আপত্তি জানাতে গেল। "ঘরে ঢুকলেই দেখতে পাবে তোমাকে দেখে ওরা কী দারুণ খুশি হবে। বাইরে ঠান্ডায় জমে গিয়ে আলাপ করার কী মানে হয়?"

"ওকে কেন এখানে এই ঠান্ডার মধ্যে ডেকে আনা সেটা আমার দেখার কথা।" স্মুরভ্‌কে দাবড়ে দিল কোলিয়া। 'বাচ্চাদের' সঙ্গে এরকম দাপটের সুরে কথা বলতে তার দারুণ ভালো লাগে। স্মুরভ্‌ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটল তার হুকুম তামিল করতে।

## চার

## হারানো কুকুর

মুখে একটা ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে কোলিয়া অপেক্ষা করতে লাগল কখন আলিয়োশা আসে। এটা ঠিক যে অনেক দিন হলই আলিয়োশার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে তার ছিল। ছেলেদের মুখে তার কথা সে অনেক শুনেছে বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত তার কথা যখনই উঠেছে তখনই কোলিয়া বাইরে তার প্রতি একটা তাচ্ছিল্য-পূর্ণ ঔদাসীন্যই দেখিয়ে এসেছে। এমনকি আলিয়োশা সম্পর্কে তাকে যখনই যা বলা হত সে সব শোনার পর সে তার 'সমালোচনাও' করেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আলাপের জন্য সে খুবই ছটফট করছিল। আলিয়োশা সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনি সে শুনেছে সে সবের মধ্যেই যেন সহানুভূতিপূর্ণ আকর্ষণীয় কিছু একটা থাকত। তাই এখনকার এই মুহূর্তটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তাকে এমন ভাব বজায় রাখতে হবে যাতে তার নিজের মুখে চুনকালি না পড়ে, তাকে দেখাতে হবে সে কারও অধীন নয়। 'নইলে ভেবে বসবে তেরো বছরের বাচ্চা ছেলে, আমাকেও আর পাঁচটা বাচ্চা ছেলের মতোই ধরে নেবে। আচ্ছা, এই বাচ্চা ছেলেগুলো ওর কী হয়? দেখা হলে সেটাও ওকে জিগ্‌গেস করব। বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার অবশ্য এই যে আমি মাথায় এত খাটো। তুজিকভ্ আমার চাইতে বয়সে ছোটো, অথচ আধ বিঘতখানেক বেশি লম্বা। তবে আমার মুখটা বুদ্ধিদীপ্ত। আমি দেখতে ভালো নই। আমি জানি আমার চেহারাটা বেয়াড়া, তবে বুদ্ধিদীপ্ত। যেচে খুব বেশি কথা বলতে যাবারও দরকার নেই। সেটা হলে তৎক্ষণাৎ কোলাকুলির ধুম পড়ে যাবে, আর তাতে ওর মনে হবে   ছিঃ, কী যাচ্ছেতাই হবে যদি ও ভাবে ...!'

এই সব ভাবতে ভাবতে কোলিয়া দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল, সে তার চেহারার মধ্যে যতদূর সম্ভব স্বাধীন ভাবটা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

সে যে মাথায় খাটো এই চিন্তাটাই তাকে বড়ো বেশি কষ্ট দিচ্ছিল। চেহারাটা 'বেয়াড়া' বলে ততটা নয়, যতটা মাথায় খাটো বলে। বাড়িতে ঘরের একটা দেয়ালের এক কোনায় গত বছরই সে পেন্সিলে দাগ কেটে তার উচ্চতা মেপে রেখেছিল। তখন থেকে প্রতি দু মাস অন্তর অন্তর সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওই দাগ ধরে মেপে দেখে ইতিমধ্যে লম্বায় কতটা বড়ো হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বেজায় কম বাড়ছে। এতে সে সময় সময় বড়ই মুষড়ে পড়ছে।

চেহারার কথা যদি বলতে হয়, সেটা 'বদখত' আদৌ নয়, বরং দেখতে শুনতে তাকে যথেষ্ট সুশ্রী বলা যায়। মুখখানি সাদা ধবধবে, সামান্য পাণ্ডুর, রোদে পোড়ার ফলে ফুটিফুটি দাগ ধরা। ধূসর রঙের দুটি চোখ, তেমন বড়ো নয়, তবে প্রাণোচ্ছল, চোখের দৃষ্টি নির্ভীক, অনেক সময় অনুভূতির আলোয় ঝলমলে। গালের হাড় সামান্য চওড়া, ছোট্ট ঠোঁট দুটো, তেমন পুরু নয়, তবে লাল টকটকে। নাকটা ছোটো, নাকের ডগা একেবারেই ওল্‌টানো। 'বড়ি বসানো নাক, একেবারেই বড়ি বসানো নাক!' আয়নায় নিজের মুখ দেখে কোলিয়া সব সময় আপন মনে বিড়বিড় করে বলত, আর প্রতিবারই প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে আয়নার কাছ থেকে সরে দাঁড়াত। 'ধুৎ! সত্যিই কি আমার মুখটা বুদ্ধিদীপ্ত?'—মাঝে মাঝে তার মনে হত, এমনকি এ ব্যাপারে তার সন্দেহও হত। সে যাই হোক, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই সেই যে নিজের মুখ আর উচ্চতার চিন্তাই ছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বরং দেখা যেত আয়নার সামনা সামনি হওয়ার মুহূর্তগুলি তার কাছে যত জ্বালাধরাই হোক না কেন, দ্রুত সে তা ভুলেও যেত, এমনকি দীর্ঘক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে হারিয়ে যেত তার নিজের কাজের মধ্যে, আর এটা ছিল তার নিজের ভাষায়, 'আদর্শ ও বাস্তব জীবনে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেওয়া।'

আলিয়োশার দেখা পেতে দেরি হল না। সে দ্রুত পায়ে কোলিয়ার দিকে এগিয়ে এলো। আরও কয়েক পা বাকি ছিল, কিন্তু তখনই ভালোমতে লক্ষ করে কোলিয়া দেখতে পেল আলিয়োশার চোখেমুখে যেন খুশি আর ধরে না। 'আমাকে দেখে কিনা এতই খুশি?' একথা ভেবে কোলিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হল। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, আলিয়োশাকে আমরা শেষে যে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম তার পর থেকে তার একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে সন্ন্যাসীর জোব্বা ছেড়েছে, এখন সে বাহারি কাটছাঁটের লম্বা ঝুলকোট আর গোলাকার নরম টুপি পরেছে। তার চুল এখন ছোটো করে ছাঁটা। এ সবই তাকে সুন্দর মানিয়েছে, তাকে দস্তুরমতো সুন্দর দেখাচ্ছে। তার সুকুমার মুখখানিতে সব সময় লেগে থাকত একটা খুশির ভাব, কিন্তু সেই খুশির ভাবটি ছিল ধীরস্থির ও শান্ত। কোলিয়া দেখে অবাক হয়ে গেল যে আলিয়োশা যেমন ঘরে বসে ছিল সেই অবস্থাতে, ওভারকোট গায়ে না দিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখাই যাচ্ছে যে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসেছে। সে সোজা কোলিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

"যা হোক, শেষকালে তুমিও এলে! কী অধীর হয়েই না আমরা সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম!"

"কিন্তু কারণ ছিল, সেগুলো এখনই জানতে পারবেন। সে যাই হোক না কেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে খুশি হলাম। অনেক দিন হল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, আপনার কথা অনেক শুনেছি," কোলিয়া বিড়বিড় করে বলল। কথা বলতে বলতে তার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

"তা এ ছাড়াও অমনিতেই আমাদের আলাপ হতে পারত। আমি নিজেও তোমার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু এখানে, এই বাড়িতে তুমি কিন্তু দেরিতে এলে।"

"এখানকার খবর কী, বলুন।"

"ইলিউশার অবস্থা খুব খারাপ। মারাই যাবে।"

"বলেন কী! আপনাকে কিন্তু মানতেই হবে কারামাজ়ভ্ যে চিকিৎসাশাস্ত্র একটা বাজে জিনিস", কোলিয়া উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল।

"ইলিউশাকে হামেশা, প্রায়ই তোমার কথা বলতে শুনেছি—এমনকি, জান, ঘুমের মধ্যে, বিকারের ঘোরেও। দেখা যাচ্ছে, আগে   মানে ওই ছুরি বসানোর ঘটনার আগে   তুমি ওর খুব প্রিয় ছিলে, খুবই প্রিয় ছিলে।   তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।   আচ্ছা, এই কুকুরটা কি তোমার?"

"আমার। ওর নাম রিমঝিম।"

"জুচ্কা নয় তো?" করুণ দৃষ্টিতে কোলিয়ার চোখের দিকে তাকাল আলিয়োশা। জুচ্কা কি তা হলে একেবারেই হারিয়ে গেল?"

"জানি, জুচ্কা হলে আপনাদের সকলেরই ভালো লাগত। আমি সব শুনেছি"। রহস্যজনকভাবে মুচকি হাসল কোলিয়া। "শুনুন, কারামাজ়ভ্, পুরো ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। আমি আসলে সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আমরা বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে পুরো বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে আপনাকে খুলে বলব বলেই আপনাকে এখানে ডেকেছি", উদ্দীপিত হয়ে সে বলতে শুরু করল। "দেখুন কারামাজ়ভ্, গত বসন্তকালে ইলিউশা মাধ্যমিক স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হল। তা আমাদের এই প্রাথমিক শ্রেণিটা যে কী সেটা সকলের জানা আছে—কচিকাঁচা ছেলেদের একটা দল। ওরা তৎক্ষণাৎ ইলিউশাকে নিয়ে পড়ল, ওকে খ্যাপাতে শুরু করে দিল। আমি ওদের দু ক্লাস ওপরে, বলাই বাহুল্য, আমি ওদের মধ্যে থাকি না, দূর থেকে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখি। দেখলাম ছেলেটা ছোটখাটো চেহারার, দুর্বল কিন্তু তা হলে কী হবে, ওদের বশ মানার পাত্র নয়। এমনকি ওদের সঙ্গে মারপিটও করে। ওর তেজ আছে, দু চোখে আগুন ঝরে পড়ছে। এ ধরনের বাচ্চাদের আমি পছন্দ করি। ওরা ওকে প্রায়ই জ্বালাতন করে। বড়ো কথা, ওর ওভারকোটটা ছিল বদখত, প্যান্ট খাপি হয়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে, বুটজোড়া এমনই টুটোফাটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। এর জন্যই ওরা ওর পিছনে লাগে,

ওকে হেনস্তা করে। না, এটা আমি আদৌ পছন্দ করি না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালাম, জোর হম্বিতম্বি করলাম ওদের ওপর। আমি ওদের মারধর করি, কিন্তু জানেন কারামাজ়ভ্, ওরা আমার ভারি ভক্ত।" আত্মপ্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কোলিয়া। "তাছাড়া মোটের ওপর আমি বাচ্চাদের ভালোবাসি। এই তো আমার বাড়িতেই এখন দুটো পাখির ছানা আমার ঘাড়ে বসে আছে—এমনকি আজও ওদের কাছে আটকে পড়েছিলাম, তাইতে দেরি হয়ে গেল। এই ভাবে ইলিউশার ওপর মারধর বন্ধ হল, আমি ওকে রক্ষা করার ভার নিলাম। দেখলাম ছেলেটার তেজ আছে। আমি আপনাকে বলছি, তেজ আছে, কিন্তু শেষকালে এমন হল যে সে আমার একেবারে গোলাম হয়ে পড়ল। আমার যে কোনো হুকুম—তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন—সঙ্গে সঙ্গে সে তামিল করে। এমন ভাবে আমার কথা মেনে চলে যেন আমি ভগবান, আমাকে নকল করতে লেগে যায়। পিরিয়ডের মাঝখানে ফাঁক পেলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ছুটে আসে, আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটি। রোববার—রোববারও। আমাদের স্কুলের ছেলেরা আবার যখন দেখে কোনো বড়ো ক্লাসের ছেলে একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে এরকম তাল দিয়ে চলছে তখন তারা হাসাহাসি করে। কিন্তু এটা ওদের একটা অন্ধ সংস্কার। এটা আমার একটা খেয়াল—ব্যস্ চুকে গেল! ঠিক কি না? আমি ওকে এটা-ওটা শেখাই, ওকে গড়েপিটে বড়ো করে তুলতে চাই। আচ্ছা বলুন তো, ওকে যদি আমার ভালো লাগে তাহলে কেন ওকে গড়ে পিটে বড়ো করে তুলতে পারি না? এই যে আপনি, কারামাজ়ভ্, আপনি যে এই সব কচিকাঁচাগুলোর সঙ্গে এসে জুটেছেন তার অর্থ কি এ-ই নয় যে আপনি নতুন প্রজন্মের ওপর আপনার নিজের প্রভাব ফেলে তাদের বড়ো করে তুলতে চান, তাদের উপকারে লাগতে চান? আমার স্বীকার করতে বাধা নেই আপনার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা লোক মুখে জানতে পেরে আমার কাছে সব চাইতে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। সে যাই হোক, এবারে কাজের কথায় আসা যাক। লক্ষ করে দেখলাম ছেলেটার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবপ্রবণতা, এক ধরনের ভাবাবেগ বিকাশ পেতে চলেছে। এদিকে, আপনি জানেন, আমি আমার একেবারে জন্ম থেকেই যে কোন রকম গদগদ ভাবের ঘোর শত্রু। তার ওপরে ওর এই পরস্পরবিরোধিতা: এক দিকে ওর নিজের একটা গর্ববোধ আছে আবার অন্যদিকে কেনা গোলামের মতো আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে—ঠিক একটা কেনা গোলামের মতো; কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার দু চোখে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, আমার কথা পর্যন্ত মানতে চায় না, আমার সঙ্গে তর্ক করে, রাগে অন্ধ হয়ে দেয়ালে মাথা কুটতে বাকি রাখে। আমার মনের মধ্যে অনেক সময় নানা রকম চিন্তা ভাবনা এসে ভিড় করত। ও যে আমার আইডিয়ার সঙ্গে একমত নয় এমন নয়, কিন্তু স্রেফ দেখতে পাচ্ছি ও ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, কোনো না ও যখন সোহাগে গদগদ ভাব প্রকাশ করছে তার জবাবে আমি

নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছি। তাই ওকে পাকাপোক্ত করে তোলার জন্য আমি যা করলাম তা এই যে ও যত গদগদ ভাব দেখায় আমিও ততই বেশি করে নিস্পৃহ হয়ে পড়ি—ইচ্ছে করে করি। আমার মনে মনে এরকম একটা বিশ্বাস ছিল, আমার উদ্দেশ্য ছিল ওকে তালিম দিয়ে ওর চরিত্র গড়ে তুলি, ওকে গড়ে পিটে মানুষ করে তুলি

আর তা ছাড়া আপনি নিশ্চয় আমার অর্ধেক কথা শুনেই আমার মনোভাবটা বুঝতে পারছেন। হঠাৎ লক্ষ করলাম, এক দিন নয়, দুদিন নয়, পর পর তিন দিন ধরে ও মনমরা হয়ে আছে, শোকে দুঃখে যেন মুষড়ে পড়েছে, কিন্তু সেটা ঠিক ওর ভাবালুতার কারণে নয়, এর পেছনে আরও জোরাল, অন্য কোনো একটা বড়ো কারণ আছে। ভাবলাম, কী এমন শোকের ঘটনা ঘটতে পারে? ওকে চেপে ধরতে ব্যাপারটা কী জানতে পারলাম। আপনার পরলোকগত বাবা তখনও জীবিত, সেই সময় তাঁর অনুচর, স্মের্দিকোভের সঙ্গে কী করে যেন ওর আলাপ হয়। সে লোকটা ওকে বোকা পেয়ে বাজে ধরনের, অর্থাৎ অতি জঘন্য আর নৃশংস ধরনের একটা খেলা শেখাল। খেলাটা হল এক টুকরো রুটির নরম অংশটা নিয়ে তার ভেতরে একটা পিন গুঁজে দিয়ে সেটা বারোয়ারি উঠোনের পাহারাদার কোন এক ক্ষুধার্ত কুকুরের দিকে ছুড়ে দেওয়া। কুকুরটা খিদের জ্বালায় না চিবিয়েই টুকরোটা গিলে ফেলবে, তখন দেখতে হবে এর ফল কী দাঁড়ায়। তা ওরকম একটা টুকরো তো ওরা কায়দা করে বানাল, সেটা ছুড়ে দিল জুচ্‌কা নামে উঠোনের সেই ঝাঁকড়া লোমশ কুকুরটা দিকে, যাকে নিয়ে এখন এত সব কাণ্ড। কুকুরটা এমনই এক বাড়ির উঠোনের কুকুর যে বাড়ির লোকেরা তাকে একদম খেতে দিত না, আর সেও সারা দিন মিছিমিছি ঘেউ ঘেউ করে ডাকত তো ডাকতই। এরকম অর্থহীন ঘেউ-ঘেউ ডাক আপনার ভালো লাগে কি কারামাজভ্? আমি তো বাপু একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না। যা হবার তাই হল। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে রুটির টুকরোটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেটা গিলে ফেলার পর কিঁউ কিঁউ করতে করতে ঘুরপাক খেতে লাগল, তারপর ছুট দিল, কিঁউ কিঁউ করে ছুটতে ছুটতে এক সময় চোখের আড়াল হয়ে গেল। ইলিউশা নিজে আমায় এই বর্ণনা দিয়েছে। আমার কাছে ঘটনাটা স্বীকার করে সে কী অঝোরে কান্না! আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। 'কিঁউ কিঁউ করতে করতে ছুটছে, ছুটছে আর কিঁউ কিঁউ করছে,' বারবার কেবল এই কথাই বলতে লাগল। দৃশ্যটা তাকে হতবাক করে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছি ও বিবেকের দংশনে ছটফট করছে। বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হল। বড়ো কথা হল ওর আগেকার যা সব কাজকর্ম তার জন্যও ওকে ভালোমতো শিক্ষা দেবার একটা ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসেছিল। তার ফলে, স্বীকার করতে হচ্ছে, আমাকে এখানে একটা চালাকি খাটাতে হল। আমি ওর ওপর এমন খেপে যাবার ভান করলাম যে ততটা খেপে হয়তো আদৌ আমি যাই নি। বললাম, 'তুই নোংরা কাজ করেছিস, তুই একটা অমানুষ। আমি অবশ্য লোকজন ডেকে বলে বেড়াব না, কিন্তু আপাতত তোর

সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যতে তোর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখব কি না, নাকি অমানুষ হয়ে গেছিস বলে তোকে আমি চিরকালের জন্য ত্যাগ করব সেটা ভালো করে ভেবেচিন্তে পরে স্মুরভের মারফত জানিয়ে দেব।' স্মুরভ্ মানে এই ছেলেটি, যে আমার সঙ্গে এখানে এসেছে, সব সময় আমাকে মান্য করে চলে। যা বলছিলাম, আমার কথায় ছেলেটা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। আমি স্বীকার করছি, তখনই আমার বোধ হল হয়তো বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। কিন্তু কী আর করা? আমার তখনকার ভাবনাটাই ছিল ওরকম। এর এক দিন পরে আমি স্মুরভ্‌কে ওর কাছে পাঠালাম, তাকে দিয়ে বলে পাঠালাম ওর সঙ্গে আমার আর 'কথা নেই'। মানে, দুজন বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক ঘুচে যাওয়া বোঝাতে আমাদের মধ্যে ওরকম একটা কথার চল আছে। গোপনে গোপনে আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিল মাত্র দিন কয়েকের জন্য ওকে দূরে সরিয়ে রেখে পরীক্ষা করে দেখা, তারপর যদি অনুশোচনার কোনো লক্ষণ দেখা যায় তখন না হয় আবার ওর সঙ্গে হাত মেলানো যাবে। এটাই ছিল আমার মনের একান্ত বাসনা। কিন্তু কী হল ভাবতে পারেন? স্মুরভের মুখে আমার এই বার্তা শোনার পর ওর দুচোখে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'ক্রাসোত্‌কিনকে আমার তরফ থেকে জানিয়ে দাও এখন থেকে সবগুলো কুকুরকে পিন দিয়ে গাঁথা রুটির টুকরো ছুড়ে ছুড়ে খাওয়াব! সবগুলোকে!' আমি ভাবলাম, 'ওর ওই উদ্ধত মেজাজটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ওটাকে ধোঁয়া দিয়ে তাড়ানো দরকার।' তাই ওকে পুরোদস্তুর তাচ্ছিল্য করতে শুরু করলাম। দেখা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নিই, নয়তো মুখ বেঁকিয়ে হাসি। ঠিক এই সময় ওর বাবাকে নিয়ে সেই ঘটনা। সেই 'শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়া'— মনে আছে তো? বুঝতেই পারছেন ইতিমধ্যে যা ঘটে গিয়েছিল তাতে অমনিতেই প্রচণ্ড বিরক্তি উদ্রেকের একটা জায়গা তার মনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। ছেলেরা যখন দেখল আমি ওর সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছি তখন তারা ওর ওপর চড়াও হল, 'শুকনো ধুঁধুলের ছোবড়া' বলে ওকে খ্যাপাতে শুরু করল। তখনই শুরু হয়ে গেল ওদের নিয়মিত মারপিট। এর জন্য আমার এখন ভারি দুঃখ হচ্ছে, কেন না আমার মনে হয় এই সময় তারা একবার ওকে বেদম মার মেরেছিল। এক দিন যখন ছেলেরা সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসছিল সেই সময় রাস্তায় ও তাদের সকলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি তখন দশ পা মতন দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখছিলাম। আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার তো মনে পড়ে না যে আমি মজা পেয়ে হাসছিলাম, বরং বলব আমার তখন ওর জন্য খুব দুঃখ হচ্ছিল, খুবই দুঃখ হচ্ছিল। আর এক মুহূর্ত হলেই আমি ওকে রক্ষা করার জন্য ছুটে যেতাম। কিন্তু এমন সময় আমার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। কী তার মনে হল আমি জানি না। তবে সে একটা পেন্সিল কাটা ছুরি বাগিয়ে ধরে আমার দিকে ধেয়ে এলো, সেটা আমার উরুতে, ডান পায়ের এই যে এ জায়গাটাতে বসিয়ে

দিল। আমি কিন্তু নড়লাম না। আপনাকে বলতে বাধা নেই কারামাজভ্, আমি অনেক সময় সাহসের পরিচয় দিয়ে থাকি। আমি শুধু তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম, যেন দৃষ্টি দিয়ে তাকে এটাই বলতে চাইলাম 'কী হল? আরও কিছু করতে চাও তো কর না। আমার এই এত বন্ধুত্বের প্রতিদানে না হয় করলেই। আচ্ছা হলেই হল, আমি তৈরি।' কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে ছুরি বসাল না। আর সহ্য করতে পারল না, নিজেই ভয় পেয়ে গেল। ছুরি ফেলে দিয়ে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল, ছুটে পালিয়ে গেল। আমি অবশ্য ঘটনাটা আর পাঁচকান করতে দিলাম না, যাতে ওপরওয়ালার কানে না যায় সেই জন্য সবাইকে চুপ করে থাকতে বললাম। এমনকি মাকেও বলিনি, বললাম একমাত্র তখনই যখন ঘা'টা শুকিয়ে গেল। তা ছাড়া জখম তেমন একটা ছিলও না, সামান্য আঁচড় মাত্র। পরে শুনতে পেলাম ওই দিনই নাকি ও ঢিল ছুড়ছিল, আর আপনার আঙুলও কামড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বুঝতেই পারছেন ওর তখন মনের কী অবস্থা ছিল! কিন্তু কী আর করা? বোকামিটা আমারই ও যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল আমি তখন ওর কাছে এসে ওকে ক্ষমা করতে, অর্থাৎ কিনা ওর সঙ্গে ভাব করতে গেলাম না, এখন অনুশোচনা হচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে বিশেষ কারণও ছিল, একটা উদ্দেশ্য আমার ছিল। এই হল গোটা ইতিহাস আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি বোকামি করে ফেলেছি।

"ইশ্ কী দুঃখের কথা!" উত্তেজিত হয়ে আলিয়োশা বলে উঠল। "দুঃখের কথা যে ওর সঙ্গে আগে তোমার এই যে সম্পর্ক ছিল সেটা আমার জানা ছিল না, নইলে আমি নিজে অনেক আগেই তোমার কাছে এসে আমার সঙ্গে ওর কাছে যেতে তোমাকে অনুরোধ করতাম। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, জ্বরের ঘোরে, অসুস্থতার মধ্যে ও তোমার নাম করে ভুল বকছিল। তুমি যে ওর কাছে কত প্রিয় তা তো আমি জানতামই না! সত্যিই কি, সত্যি-সত্যিই কি তুমি 'জুচ্‌কা' কুকুরটাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারলে না? ওর বাবা আর ছেলেরা সকলে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছে। বিশ্বাস কর, অসুস্থ হওয়ার পর তিন বার আমার সামনে আমি শুনেছি ছলছল চোখে ও বাবাকে বলছে 'বাপি, আমার যে অসুখ করেছে তার কারণ জুচ্‌কাকে আমি মেরে ফেলেছি। ভগবান আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন।' এই চিন্তা কিছুতেই তার মাথা থেকে যাচ্ছে না! এখন ওই জুচ্‌কাকে যদি এনে দেখাতে পারতে, যদি দেখাতে পারতে যে সে মরেনি, বেঁচেই আছে তাহলে মনে হয়, একমাত্র তখনই আনন্দে উল্লসিত হয়ে ও নতুন করে বেঁচে উঠতে পারত। তোমার ওপর আমাদের সকলের আশাভরসা ছিল।"

"আচ্ছা বলুন তো, কীসে আপনাদের এমন আশা হল যে আমি জুচ্‌কাকে খুঁজে বের করব? অর্থাৎ কি না ঠিক আমিই ওকে খুঁজে বের করতে পারব?" অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে কোলিয়া জিগ্‌গেস করল। "অন্য কারও ওপর না করে বেছে বেছে কেন আমারই ওপর ভরসা করলেন?"

"এই রকম একটা কথা শোনা গিয়েছিল যে তুমি কুকুরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ এবং যখন খুঁজে বের করতে পারবে তখন এখানে নিয়ে আসবে। এরকম একটা কথা যেন স্মুরভ্ বলেছিল। বড়ো কথা, আমরা সব সময় ইলিউশাকে এই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছি যে জুচ্‌কা বেঁচে আছে, তাকে কোথায় যেন দেখা গেছে। ছেলেরা কোথা থেকে যেন একটা জ্যান্ত খরগোশ ধরে এনে ওকে দিয়েছিল। শুধু তাকিয়ে দেখল, তার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, ওটাকে সে মাঠে ছেড়ে দিতে বলল। আমরা তা-ই করলাম। ওরা-বাবা ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বড়সড় শিকারি জাতের কুকুরের একটা ছানা। উনিও সেটা কোথা থেকে যেন জোগাড় করে এনেছেন। ভাবলেন এই দিয়ে ওকে শান্ত করা যাবে, কিন্তু মনে হয় তাতে যেন আরও খারাপই হল।

"আচ্ছা, আরও একটা কথা বলুন তো কারামাজ়ভ্, ওর বাবা লোকটা কেমন? আমি ওকে জানি, কিন্তু আপনার ধারণা অনুযায়ী লোকটা কী?—একটা ভাঁড়? সং? না কী?"

"আরে না, না। এমন অনেক লোক আছে যারা গভীর অনুভূতিপরায়ণ কিন্তু কেমন যেন জাঁতা খাওয়া। তাদের ভাঁড়ামি অনেকটা যেন সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের আকারে এক ধরনের ক্ষোভের প্রকাশ, দীর্ঘকাল ধরে লাজে ভয়ে অপমানে যাদের সামনে তারা মুখ তুলে তাকাতে পারে না, যাদের মুখের ওপর সত্যি কথা বলার সাহস তাদের নেই। বিশ্বাস কর ক্রাসোত্‌কিন, এ ধরনের ভাঁড়ামি অনেক সময় চরম শোকাবহ হয়ে থাকে। ওর কাছে এখন সব কিছু, পৃথিবীতে যা আছে সব এসে মিলেছে ইলিউশার মধ্যে। ইলিউশা যদি মারা যায় তাহলে লোকটা হয় শোকে দুঃখে উন্মাদ হয়ে যাবে নয়তো নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবে। এখন ওকে দেখে আমার প্রায় এরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি কারামাজ়ভ্। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি মানুষ চেনেন", অভিভূত হয়ে কোলিয়া যোগ করল।

"আমি কিন্তু কুকুরটাকে নিয়ে তোমাকে আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিয়েছিলাম তুমি বুঝি ওই জুচ্‌কাকেই নিয়ে এসেছ।"

"একটু সবুর করুন কারামাজ়ভ্, হয়তো আমরা ওকে খুঁজে বেরও করব, কিন্তু এটা—এটার নাম রিমঝিম। আমি এখন এটাকে ঘরের ভেতরে ছেড়ে দেব। বলা যায় না, হয়তো শিকারি জাতের কুকুরের ছানার চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে ইলিউশাকে। একটু সবুর করুন, কারামাজ়ভ্, আপনি এখনই কিছু একটা জানতে পারবেন। ঈশ্! দেখ কাণ্ড! এই ঠান্ডায় কিনা রাস্তায় আপনাকে এমন করে ধরে রেখেছি!" কোলিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "এই ঠান্ডার মধ্যে আপনার গায়ে সামান্য একটা কোট ছাড়া আর কিছুই নেই যে! অথচ আমি কি না আপনাকে আটকে

রেখেছি! দেখলেন, দেখলেন তো, আমি কতদূর স্বার্থপর! ওঃ, আমরা সবাই একেকটা স্বার্থপর, কারামাজ়ভ্!"

"ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। ঠান্ডা ঠিকই, তবে ঠান্ডা লাগার ধাত আমার নেই। যাই হোক, যাওয়া যাক। হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার নামটা যেন কী? জানি, ডাক নাম কোলিয়া, কিন্তু পুরো নামটা?"

"নিকলাই, নিকলাই ইভানভিচ্ ক্রাসোত্কিন—অথবা সরকারি দলিলে যেমন লেখা হয়, অর্থাৎ 'ইভানের ছেলে' নিকলাই।" কেন যেন হেসে উঠল কোলিয়া, কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ যোগ করল, "আমার এই নিকলাই নামটা অবশ্য ভারি বিচ্ছিরি লাগে।"

"কেন বল তো?"

"একটা খেলো নাম, ছাপ মারা গোছের।

"তোমার বয়স কি তেরো?" আলিয়োশা জিগ্গেস করল।

"না, মানে চোদ্দো—খুব শিগ্গির, এই দু সপ্তাহ বাদে চোদ্দো হবে আর কি। আপনার কাছে আগে থাকতে আমার একটা দুর্বলতার কথা স্বীকার করছি, কারামাজ়ভ্। আপনি বলেই আপনার সামনে, আমাদের প্রথম আলাপের খাতিরে কথাটা বলছি যাতে আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমার ধাতটা পুরোপুরি বুঝতে পারেন। আমার আসলে বিরক্ত লাগে যখন কেউ আমাকে আমার বয়স জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত লাগে বললে কমই বলা হবে আর সর্বোপরি আমার সম্পর্কে এটা-ওটা নানা প্রশ্ন। এই যেমন, আমার সম্পর্কে এমন কুৎসা আছে যে গত সপ্তাহে আমি প্রাইমারির ছেলেদের সঙ্গে ডাকাত-ডাকাত খেলা খেলেছি। খেলেছি, সেটা ঘটনা, কিন্তু কেউ যদি বলে নিজের স্বার্থে খেলেছি, নিজের ভালো লাগে বলে খেলেছি সেটা হবে একটা চরম অপবাদ। আমার এটা মনে করার যথেষ্ট ভিত্তি আছে যে এই ঘটনার কথা আপনারও কানে গেছে, কিন্তু আমি নিজের স্বার্থে খেলিনি, খেলেছি বাচ্চাদের মুখ চেয়ে, কেন না আমাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু করার কথা ওরা ভাবতেই পারছিল না। তাই বলছিলাম কি, আমাদের এখানে লোকে নানারকম আজেবাজে গালগল্প ছড়ায়। আপনাকে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমাদের এই শহরটা একটা গুজবের শহর।"

"কিন্তু যদি নিজের ভালো লাগার জন্য খেলেই থাক তাতে দোষের কী?"

"কিন্তু নিজের ভালো লাগার জন্য তাই বলে কি আপনি ঘোড়া-ঘোড়া খেলবেন?"

"তা তুমি একবার এই ভাবে ভেবে দেখ না " আলিয়োশা মুচকি হেসে বলল, "এই ধর না কেন থিয়েটারে তো বড়রাও যায়, অথচ থিয়েটারেও নানা ধরনের নায়ক-নায়িকার কত রকম এডভেঞ্চারই না তুলে ধরা হয়—অনেক সময় ডাকাত দলের সঙ্গে আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও তা হয়ে থাকে। তাই বলছিলাম কি, এটাও

কি ঠিক সেই একই ব্যাপার হল না? শুধু নিজস্ব এক ধরনে—এই যা। আর অবসর সময়ে অল্পবয়সি ছেলেদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা বা ওই ডাকাত-ডাকাত খেলা-তারও তো জন্ম ওই আর্ট থেকে, কচি মনের মধ্যে যে শিল্পের একটা তাগিদ আছে সেখান থেকে। এমনকি ছেলেদের এই খেলাগুলো অনেক সময় থিয়েটারের দৃশ্যের চাইতেও বেশি গুছিয়ে তৈরি করা হয়। তফাতটা কেবল এই যে থিয়েটারে লোকে যায় অভিনেতাদের দেখতে, কিন্তু এখানে ছোটোরা নিজেরাই অভিনেতা। কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক।"

"আপনি তাই মনে করেন বুঝি? এটাই আপনার মত?" কোলিয়া স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। "জানেন, আপনি কিন্তু রীতিমতো আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মতো একটা চিন্তা প্রকাশ করলেন। আমি এর পর বাড়ি ফিরে গিয়ে মগজ দিয়ে বিষয়টা নাড়াচাড়া করে দেখব। আমি স্বীকার করছি, আমি ঠিক এটাই আশা করছিলাম যে আপনার কাছ থেকে কিছু শেখার আছে। আমি আপনার কাছে শিখতে এসেছি কারামাজভ্", আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কোলিয়া জানাল।

"আর আমি এসেছি তোমার কাছে শিখতে।" মৃদু হেসে আলিয়োশা তার হাতটা চেপে ধরল।

আলিয়োশাকে পেয়ে কোলিয়া দারুণ খুশি। যেটা ওকে অবাক করল তা এই যে তার সঙ্গে আলিয়োশা পুরোদস্তুর সমানে-সমানে ব্যবহার করছে, তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছে যেন সে 'রীতিমতো একটা বয়স্ক লোক'।

"আমি এখন আপনাদের একটা চমক দেখাব, কারামাজভ্। এটাও একটা নাটকের অভিনয়", বিব্রত হাসি হেসে সে বলল। "এই কারণেই আমার এখানে আসা।"

"এসো, আগে একবার বাঁ দিকে বাড়ির মালিকদের কাছে যাওয়া যাক। ওদের ওখানেই তোমাদের সকলে বাইরের গরম জামাকাপড় ওভারকোট ছেড়ে রেখে আসে, কেননা ঘরের ভেতরটা ঘিঞ্জি আর বড্ড গরম।"

"দরকার নেই। যাচ্ছি তো এই এক লহমার জন্য। সে আমি ওভারকোট পরেই বসে থাকব 'খন। আমার কুকুর 'রিমঝিম' এখানে এই দর দালানে থাকবে, মরে পড়ে থাকবে। 'চুঃ, রিমঝিম, শুয়ে পড়, মরে পড়ে থাক!' দেখলেন তো বলামাত্র কেমন মরে গেল। আমি প্রথমে ঘরে ঢুকব, ঢুকে সেখানকার হালচাল ভালোমতো দেখে নেব। তারপর যখন দরকার হবে তখন শিস দিয়ে ডাকব 'চুঃ রিমঝিম!' দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কেমন পাগলের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। শুধু দেখতে হবে স্মুরভ্ যেন সেই মুহূর্তটিতে দরজাটা ঠেলে খুলে দিতে ভুল না করে। একবার ব্যবস্থাটা করে ফেলি না, চমকটা দেখতে পাবেন।..."

## পাঁচ

## ইলিউশার শিয়রে

অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়োভ্ আমাদের পরিচিত। যে ঘরটিতে তার পরিবার বসবাস করছে সেটিও আমাদের পূর্বপরিচিত। এই মুহূর্তে অসংখ্য জন সমাগমের ফলে সেটা ঘিঞ্জি আর গুমোট হয়ে উঠেছে। এবারে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি ছেলে ইলিউশার পাশে বসে আছে। স্মুরভের মতো এরাও সকলে মানতে রাজি নয় যে আলিয়োশাই ইলিউশার সঙ্গে ওদের মিটমাট করিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে ওদের ভাব করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঘটনাটা আসলে তা-ই। এক্ষেত্রে আলিয়োশা যে কৌশলটা খাটিয়েছিল তা ছিল কোনো রকম 'ছেলেমানুষি ভাবাবেগের' প্রশ্রয় না দিয়ে এমন ভাবে একজন একজন করে ওদের সকলকে ইলিউশার কাছে নিয়ে এসে তার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেওয়া যেন ব্যাপারটা অমনি অমনি ঘটে গেছে, যাতে এর পিছনে কোনো মতলব আছে বলে কারও মনে না হতে পারে। ইলিউশার ক্ষেত্রে এটা ছিল তার কষ্টের মধ্যে একটা বড়ো রকমের স্বস্তি। যারা আগে তার শত্রু ছিল সেই ছেলেদের সকলের মধ্যে তার প্রতি সহানুভূতি এবং অনেকটাই স্নেহ মমতাপূর্ণ বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়ে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। একমাত্র ক্রাসোত্‌কিনই নেই। তার অভাব ইলিউশার বুকে ভয়ঙ্কর শেল হয়ে বিঁধে রইল। ইলিউশার তিক্ত স্মৃতির মধ্যে তিক্ততম ঘটনা বলে যদি কিছু থাকে তার এক কালের একমাত্র বন্ধু, তার রক্ষক ক্রাসোত্‌কিনকে তার ছুরি দিয়ে আঘাত করার ঘটনাটাই ছিল সেই ঘটনা। বুদ্ধিমান বাচ্চা ছেলে স্মুরভেরও তাই ধারণা। সে-ই প্রথম ইলিউশার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল। কিন্তু স্মুরভ্ যখন ক্রাসোত্‌কিনকে আভাসে ইঙ্গিতে জানাতে গেল যে আলিয়োশা 'একটা ব্যাপারে' তার সঙ্গে এসে দেখা করতে চায় তখন ক্রাসোত্‌কিন নিজেই সঙ্গে সঙ্গে স্মুরভ্‌কে থামিয়ে দিল, তাকে আর এগোতে না দিয়ে তার ওপর ভার দিল সে যেন অবিলম্বে 'কারামাজভকে' জানিয়ে দেয় যে কী করা উচিত তা তার নিজের ভালো জানা আছে, কারও কোনো পরামর্শ সে চায় না এবং অসুস্থ ইলিউশাকে যদি সে দেখতে যেতে চায় তাহলে নিজেই জানে কখন যেতে হবে, কারণ তার 'নিজস্ব বিবেচনাবোধ' আছে।

এটা ছিল এই রবিবারের দু সপ্তাহ আগেকার ঘটনা। এই কারণেই ইচ্ছে থাকলেও আলিয়োশা নিজে থেকে তার কাছে গেল না। সে যাই হোক, যদিও সে অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু আরও একবার এবং তার পরেও একবার স্মুরভ্‌কে ক্রাসোত্‌কিনের কাছে পাঠাল। দুবারই অসহিষ্ণু ক্রাসোত্‌কিনের সেই এক কড়া জবাব। আলিয়োশাকে এই বার্তা পাঠিয়ে দিল সে যদি নিজে তার কাছে আসেও তবু এর জন্য সে কখনও ইলিউশার কাছে যাবে না এবং সে যেন তাকে আর বিরক্ত না করে।

এমনকি এই শেষ দিনটির আগে পর্যন্ত স্মুরভ্ নিজেও জানত না যে এই দিন সকালে ইলিউশার কাছে যাবে বলে কোলিয়া মনস্থ করেছে। সবে এই আগের দিন সন্ধ্যায় স্মুরভের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যখন সে তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন কোলিয়া দুম করে চাঁছাছোলা ভাষায় তাকে জানাল আগামীকাল সকালে সে যেন বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করে, কারণ তারা এক সঙ্গে স্নেগিরিয়োভ্দের বাড়ি যাবে--তবে হ্যাঁ সে যেন তার আগমনের বার্তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানানোর মতো স্পর্ধা না দেখায়, কেন না সে আচমকা সেখানে হাজির হতে চায়। স্মুরভ্ বাধ্য ছেলের মতো তার কথা শুনল। ভেতরে ভেতরে স্মুরভের মনের মধ্যে এরকম একটা স্বপ্নেরও উদয় হয়েছিল যে কোলিয়া হারানো কুকুর জুচ্কাকে আনতে পারে। এর একটা ভিত্তিও ছিল, কারণ ক্রাসোত্কিন একবার কথায় কথায় বলে ফেলেছিল: 'যত সব গর্দভের দল! একটা কুকুর, যদি বেঁচেই থাকে, তাহলে সেটাকে খুঁজে বের করতে পারছে না!' এদিকে স্মুরভ্ যখন সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে কুণ্ঠিত ভাবে ক্রাসোত্কিনকে কুকুর সম্পর্কে তার নিজের অনুমানের কথা আভাসে বলল তখন ক্রাসোত্কিন হঠাৎ ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে বলল "আমাকে কি গর্দভ পেয়েছিস নাকি তোরা যে আমার নিজের কুকুর 'রিমঝিম' থাকতে আমি পরের কুকুরের খোঁজে শহরময় ঘুরে বেড়াব? তা ছাড়া একথা কি স্বপ্নেও ভাবা যায় যে একটা কুকুর পিন গেলার পর এখনও বেঁচে আছে? এসব ছেলেমানুষি ভাবপ্রবণতা—এর বেশি কিছু নয়।"

বাড়ির উপাস্য মূর্তিগুলির কাছাকাছি, ঘরের এক কোনায় ইলিউশার শয্যা। দু সপ্তাহ মতন হয়ে গেল ইলিউশা সেই শয্যা ছেড়ে আর উঠছে না বললেই চলে। ক্লাসে সে যাচ্ছে না সেই সে দিন থেকে যখন আলিয়োশার সঙ্গে দেখা হতে সে তার আঙুল কামড়ে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, সে দিন থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, যদিও তার পড়েও আরও মাস খানেক সে কখনও-সখনও শয্যা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে এবং বাড়ির দর দালানে কদাচিৎ কোনো মতে হেঁটে বেড়াতে পারত। কিন্তু শেষকালে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল, এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে আবার সাহায্য ছাড়া নড়াচড়াই করতে পারে না। বাপ ওকে নিয়ে দিশেহারা। এমনকি মদ খাওয়াও একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তার ছেলেটা মারা যাবে এই ভয়ে তার পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। বিশেষ করে ছেলেকে হাত ধরে ধরে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়ে এনে যখন আবার বিছানায় শুইয়ে দিত তারপর অনেক সময়েই এমন হত যে হঠাৎ ছুটে দরদালানের অন্ধকার কোণটিতে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে কেমন যেন উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফুলে ফুলে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চাপা গলায় এমন ভাবে কাঁদত যাতে তার কান্নার আওয়াজ ছেলের কানে না যায়।

ঘরে ফিরে এসে সে আবার যথারীতি কোনো একটা কিছু দিয়ে তার আদরের ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার বা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। তাকে নানা রকম

ছেলে ভুলানো গল্প বা মজার মজার সমস্ত গল্প শোনাত, কখনও বা জীবনে যত রকম মজার লোক সে দেখেছে তাদের নকল করে দেখাত, এমনকি মজা করে জীবজন্তুর ডাক আর তাদের গর্জনও নকল করে শোনাত। কিন্তু বাবা যখন নানা রকম মুখভঙ্গি করত আর সঙের অভিনয় করে দেখাত সেটা ছেলের একেবারে ভালো লাগত না। ব্যাপারটা যে তার পছন্দ নয় তা যদিও সে দেখানোর চেষ্টা করত না, তবু গভীর বেদনা নিয়ে সে মনে মনে উপলব্ধি করত যে সমাজে তার বাবার কোনো সম্মান নেই। আর সব সময়ই অনিবার্যভাবে তার মনে পড়ে যেত সেই 'শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া' কথাটা আর সেই 'ভয়ঙ্কর দিনটির' কথা।

ইলিউশার নম্র ও শান্ত স্বভাবের পঙ্গু বোন যে নিনা সেও বাবার এসব মুখ ভেঙানো পছন্দ করত না। বড়ো দিদি ভার্‌ভারা নিকলায়েভ্‌নার কথা যদি বলতে হয় সে ইতিমধ্যে অনেক দিন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার জন্য রাজধানী পেতের্বুর্গে চলে গেছে। তবে আধা পাগল মা'টা এতে ভারি মজা পেত। তার স্বামী যখন বানিয়ে বানিয়ে অথবা অভিনয় করে কোনো হাস্যকর ভঙ্গি দেখাত তখন মহিলা মজা পেয়ে প্রাণ খুলে হাসত। তাকে শান্ত করে রাখার এটাই ছিল একমাত্র উপায়। বাদবাকি সমস্ত সময় সে অবিরাম এই বলে গজগজ করত আর কাঁদত যে সবাই এখন তাকে ভুলে গেছে, তাকে কেউ সম্মান করে না, কথায় কথায় মনে দুঃখ দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই শেষ কয়েক দিন হল দেখা যাচ্ছে তারও যেন হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে প্রায়ই ঘরের কোনায় তাকিয়ে তাকিয়ে ইলিউশাকে দেখতে শুরু করেছে, তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সে অনেক বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। আর যদি কাঁদেও তো কাঁদে নিঃশব্দে, যাতে কেউ শুনতে না পায়। ক্যাপ্টেন তার স্ত্রীর এই পরিবর্তন লক্ষ করে দস্তুরমতো থ হয়ে গেল। ছেলেদের এই দেখতে আসা প্রথম-প্রথম মহিলার ভালো লাগত না। এতে তার কেবল রাগই হত। কিন্তু পরে বাচ্চাদের উল্লসিত হৈ হল্লা আর গল্পগুজব তারও মন ভুলিয়ে দিতে লাগল। শেষকালে তার এত ভালো লেগে গেল যে ছেলেরা যদি আসা বন্ধ করে দিত তাহলে তার মন যে কী ভীষণ আকুলি বিকুলি করতে পারত সে কথা বলা যায় না। বাচ্চারা যখন কোন গল্প করত বা বা খেলতে শুরু করত তখন সে খুশি হয়ে হাসত, হাততালি দিত। কাউকে কাউকে কাছে ডেকে এনে চুমু খেত। বিশেষ করে তার ভালো লেগেছিল স্মুরভ্ ছেলেটিকে।

ক্যাপ্টেনের কথা বলতে গেলে, ইলিউশাকে আনন্দ দেবার জন্য ছেলেরা যখন আসতে শুরু করল তখন তার ঘরে তাদের উপস্থিতি প্রথম থেকে পরম আনন্দের আবেগে তার হৃদয়কে উচ্ছলিত করে তোলে, এমনকি তার মনের মধ্যে এমন আশাও জাগিয়ে তোলে যে ইলিউশা এখন থেকে আর মন খারাপ করবে না এবং এর ফলে হয়ত শিগ্‌গিরই সেরেও উঠবে। ইলিউশা সম্পর্কে তার যত আশঙ্কাই

থাকুক না কেন, মুহূর্তের জন্যও, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও এই বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে সে ভালো হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন তার খুদে অতিথিদের দেখে এক ধরনের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠত, তাদের চারপাশে ঘুরঘুর করত, তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। পারলে সে ওদের ঘাড়েপিঠে করে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি ওদের পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ানোর উপক্রমও সে করেছিল, কিন্তু এই খেলাগুলো ইলিউশার ভালো লাগত না, তাই ছেড়ে দিতে হল। ওদের জন্য সে টুকটাক উপহার, মিষ্টি রুটি, বাদাম এই সব কিনতে শুরু করল, চায়ের ব্যবস্থা করত, স্যান্ডউইচ বানিয়ে ওদের খাওয়াত। এখানে বলা দরকার যে এই সময়টাতে তার টাকার কোনো টানাটানি ছিল না। আলিয়োশার কথাটাই ঠিক ফলল সেই সময় কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছ থেকে সেই দুশ রুবল সে ঠিক নিয়েছিল। এর পর আরও বিস্তারিত ভাবে তাদের পরিস্থিতি এবং ইলিউশার অসুস্থতার কথা জানতে পেরে কাতেরিনা ইভানভ্না নিজে তাদের ঘরে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করে, পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ করে, এমনকি আধাপাগল ক্যাপ্টেন-গিন্নিকে পর্যন্ত মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়। এর পর থেকে দরাজ হস্তে সে তাদের সাহায্য করতে থাকে। এদিকে ক্যাপ্টেন নিজে, ছেলে মারা যাবে এই ভেবে ভেবে আতঙ্কে এমনই মুষড়ে পড়েছিল যে এতকাল তার মনে মনে যে অহঙ্কার ছিল তা ভুলে গিয়ে সে শান্ত ভাবে কাতেরিনা ইভানভ্নার অনুগ্রহ গ্রহণ করতে লাগল।

এত দিন হয়ে গেল কাতেরিনা ইভানভ্নার ব্যবস্থা অনুযায়ী ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্টুবে ঠিক এক দিন অন্তর অন্তর নিয়ম করে এসে রোগীকে দেখে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারের এই সব ভিজিটে লাভ তেমন একটা কিছু হচ্ছিল না, মাঝখান থেকে ছেলেটাকে একগাদা ওষুধ গিলতে হত। তবে, যে দিনের কথা হচ্ছে সেদিন, অর্থাৎ আজ রবিবার সকালে ক্যাপ্টেনের বাড়িতে একজন নতুন ডাক্তারের আসার কথা। তিনি মস্কো থেকে এসেছেন, সেখানে তাঁকে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়। কাতেরিনা ইভানভ্না একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখে মস্কো থেকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এর জন্য প্রচুর অর্থও খরচ করছেন। তবে সেটা ইলিউশার জন্য নয়, এর পেছনে তার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল, যার কথা একটু পরেই যথাস্থানে বলা হবে। কিন্তু তিনি যেহেতু এসেই গেছেন তাই ইলিউশাকে একবার দেখার অনুরোধও তাঁকে জানিয়েছেন। আর তিনি যে ইলিউশাকে দেখতে আসছেন সে খবরটা আগে থাকতে অবশ্য ক্যাপ্টেনকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিন যে আসছে তা অবশ্য সে একেবারেই টের পায়নি, যদিও বহু দিন হল তার মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে ছেলেটার জন্য তার ইলিউশা অমন হেদিয়ে মরছে সে যেন আসে।

কোলিয়া যখন দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে হাজির হল ঠিক সেই মুহূর্তে

ঘরে উপস্থিত সকলে—ক্যাপ্টেন এবং ছেলের দল—সবাই রোগীর শয্যার পাশে ভিড় করে শিকারি জাতের কুকুরের একরত্তি একটা বাচ্চাকে দেখছি। ওটাকে ক্যাপ্টেন এই সবে নিয়ে এসেছে। জন্মেছে সবে গতকাল, যদিও জুচ্‌কা যে হারিয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে অবশ্যই মারাও গিয়ে থাকবে সেই দুঃখে ছেলে ইলিউশা তখনও কাতর হয়ে আছে দেখে তার মন ভুলিয়ে তাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহ আগেই ক্যাপ্টেন ওটার জন্য বায়না করে রেখেছিল। ইলিউশা ইতিমধ্যে তিন দিন আগেই শুনেছিল এবং জানতে পেরেছিল যে সে একটা ছোট্ট কুকুর উপহার পাচ্ছে, আর যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে সেটা একটা সাধারণ কুকুর নয়, জাত শিকারি কুকুর। ইলিউশার স্বভাবটা কোমল ও সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ বলে যদিও সে বাইরে দেখাল যে উপহার পেয়ে সে খুশি, তবু তার বাবা আর ছেলেরাও সকলে স্পষ্ট দেখতে পেল এই নতুন কুকুরটা কেবল যেন আরও বেশি করে তার শিশু হৃদয়ে জাগিয়ে তুলল হতভাগ্য জুচ্‌কার স্মৃতি। সেই জুচ্‌কা যাকে সে অত কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছে। কুকুরছানাটা তার কাছে শুয়ে ছিল, হুটোপুটি খাচ্ছিল। ইলিউশা ম্লান হাসি হেসে তার শীর্ণ বিশীর্ণ পাতলা ফ্যাকাশে হাত বুলিয়ে সেটাকে আদরও করছিল। এমন কি দেখা যাচ্ছিল কুকুরছানাটা তার পছন্দও হয়েছে, কিন্তু তা হলেও জুচ্‌কা তো আর নেই, এটা আর যাই হোক জুচ্‌কা নয়। আহা, জুচ্‌কা আর কুকুরছানাটা—দুটোকেই যদি এক সঙ্গে পাওয়া যেত তাহলে সুখের পরাকাষ্ঠা হত!

"ক্রাসোত্‌কিন!" ছেলেদের মধ্যে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। কোলিয়াকে ঘরে ঢুকতে সে-ই প্রথম দেখেছিল।

দেখার মতো হুলুস্থুল পড়ে গেল। ছেলেরা শয্যার দুপাশে সরে গিয়ে সামনের আড়াল ঘুচিয়ে দিয়ে ইলিউশাকে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষগোচর করে তুলল। ক্যাপ্টেন দ্রুত ছুটে এসে কোলিয়ার সামনা সামনি হল।

"স্বাগতম, স্বাগতম, আসতে আজ্ঞা হোক!" তো-তো করে সে কোলিয়াকে বলল। 'ইলিউশা, ওরে ইলিউশা, ক্রাসোত্‌কিন মশাই তোকে দেখতে এসেছেন।"

কিন্তু ক্রাসোত্‌কিন দ্রুত তার হাতে হাত মিলিয়েই সমাজের উঁচু মহলে প্রচলিত শিষ্টাচার সম্পর্কেও যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল মুহূর্তের মধ্যে তারও পরিচয় দিল। ক্যাপ্টেনের সহধর্মিণী তার আরামের চেয়ারটিতে বসে ছিল। ঠিক এই মুহূর্তটিতে সে দারুণ বিরক্ত। ছেলেদের ভিড়ে ইলিউশার শয্যা আড়াল হয়ে পড়ায় নতুন কুকুরটাকে যে সে দেখতে পাচ্ছে না এই জন্য সে গজগজ করছিল। আর তখনই কোলিয়া সর্বপ্রথমে যে কাজটি করল তা হল ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে তার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে যথারীতি পায়ে পা ঠুকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাথা নুইয়ে তাকে সম্মান জানানো। তারপর নিনার দিকে ফিরে—মহিলাদের উদ্দেশে যেমন করতে হয়—

তেমনি ভাবে তাকেও ওই একই রীতিতে নমস্কার জানাল। এহেন ভদ্র ব্যবহার অসুস্থ ভদ্রমহিলার মনে আশাতীত ভালো প্রভাব ফেলল।

"এই তো, একেই বলে ভালো শিক্ষাদীক্ষা পাওয়া যুবক! দেখলেই বোঝা যায়", দু হাত নাড়িয়ে গলা চড়িয়ে সে বলল। "তা নয় তো, আমাদের যা সব অতিথি!- একটা আরেকটার ঘাড়ে চেপে আসছে।"

"একটা আরেকটার ঘাড়ে? সে আবার কী গো গিন্নি?" স্নেহমাখা সুরে হলেও 'গিন্নির' অবস্থার কথা ভেবে খানিকটা ভয়ে ভয়েই আমতা আমতা করে ক্যাপ্টেন বলল।

"ওই ভাবে একটা আরেকটার ঘাড়ে পিঠে চেপেই তো ঘরে ঢোকে। ঢোকার মুখে দরদালানে একজন আরেকজনের পিঠে চেপে বসে। পিঠে চেপে কি না একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ওপর চড়াও হয়! এরা আবার কীসের অতিথি?"

"কিন্তু কে? কে বল তো এই ভাবে ঘাড়ে চেপে ঘরে ঢুকেছিল গিন্নি?"

"এই তো এই ছোঁড়াটা, ওই যে ওটার ওপর চেপে আজ ঢুকেছিল, আর ওই যে ওটা, চেপেছিল এই এটার ওপর।

কিন্তু কোলিয়া ততক্ষণে ইলিউশার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রোগী সঙ্গে সঙ্গে যেরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল তা দেখার মতো। বিছানায় সামান্য একটু উঠে বসে সে অপলক দৃষ্টিতে কোলিয়ার দিকে তাকাল, তাকিয়ে রইল তো রইলই। আজ মাস দুয়েক হয়ে গেল তার এক কালের খুদে বন্ধুটির সঙ্গে কোলিয়ার কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই। তাকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে হঠাৎ সে তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখটা কী ভয়ানক জীর্ণশীর্ণ আর হলদে হয়ে গেছে! প্রবল জ্বরের তাড়নায় চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে, কী ভীষণ বড়ো বড়োই না দেখাচ্ছে! আর কী হাড় জিরজিরে ওই খুদে হাত দুটো!—এরকম অবস্থায় যে তাকে দেখবে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। ইলিউশা যে রকম গভীরভাবে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে, ওর ঠোঁট দুটো যে অমন শুকিয়ে গেছে তা লক্ষ করে দুঃখে বেদনায় বিস্ময়ে কোলিয়া অভিভূত হয়ে পড়ল। সে তার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল, কী বলবে একেবারে ঠিক করতে না পেরে প্রায় দিশেহারা হয়ে বলে উঠল:

"কী রে বুড়ো কেমন আছিস?" কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আটকে গেল, সে স্বচ্ছন্দ হতে পারল না। মুখটা হঠাৎ কেমন যেন বিকৃত হয়ে উঠল, ঠোঁটের কোনা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ইলিউশা তাকে দেখে করুণ হাসি হাসল। কথা বলার কোনো শক্তি তার তখনও ছিল না। কোলিয়া হঠাৎ তার হাতটা তুলল, কেন কে জানে ইলিউশার মাথার চুলে হাত বুলাল।

"ও কিছু না!" কতকটা যেন তাকে উৎসাহিত করে তোলার উদ্দেশ্যে, আবার কতকটা যেন কেন এই কথা বলল তা নিজেই না জেনে বিড়বিড় করে মৃদুস্বরে সে বলল। মুহূর্তের জন্য দুজনেই চুপ।

“এটা তোর নতুন কুকুরছানা বুঝি?” চরম ভাবলেশহীন কণ্ঠে আচমকা কোলিয়া জিগ্‌গেস করল।

“হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা!” হাঁপাতে হাঁপাতে টেনে টেনে ফিসফিস করে ইলিউশা উত্তর দিল।

“কালো নাক, মানে বাড়িতে বেঁধে রাখার মতো পাহারাদার জাতের বদরাগি কুকুর”, গুরুগম্ভীর চালে দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করল কোলিয়া। ভাবটা এমন যেন কুকুরছানাটি আর তার কালো নাকটাই বড়ো কথা। কিন্তু আসল ঘটনাটা এই যে যাতে ‘বাচ্চা ছেলের মতো’ কান্নায় ভেঙে না পড়তে হয় সেই জন্য সে তখনও প্রাণপণ শক্তিতে তার অনুভূতিকে সংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিল না। বলল, “বড়ো হয়ে উঠলে দেখবি, শেকলে বেঁধে রাখতে হবে। আমার জানা আছে।”

“বড়ো হয়ে ওটা বিশাল চেহারার হবে!” ভিড়ের মধ্য থেকে একটা ছেলে বলে উঠল।

“অবশ্যই, জাত শিকারি বলে কথা। বিশাল, ইয়া চওড়া বাছুরের সমান”, হঠাৎ চার দিক থেকে বেশ কয়েকট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

“বাছুর, সত্যিকারের বাছুর যাকে বলে”, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে ক্যাপ্টেন বলে উঠল। “আমি ইচ্ছে করে বেজায় বদরাগি, অতি ভয়ঙ্কর জাতের এ রকম একটাকে খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছি। এটার বাপ-মাও অতি ভয়ঙ্কর, আর মাটি থেকে এই অ্যাত্ত বড়। আরে বোসো না, এই এখানে, ইলিউশার খাটেই বোসো না, নয়তো এই যে এই বেঞ্চিটাতেও বসতে পার। তুমি আমাদের প্রিয় অতিথি, বহু প্রতীক্ষিত অতিথি, তোমাকে স্বাগত জানাই। আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের সঙ্গে এসেছ তো? কৃতার্থ হলাম।”

ক্রাসোত্‌কিন বিছানার এক প্রান্তে ইলিউশার পায়ের কাছে বসে পড়ল। ঠিক কোন্ বিষয় দিয়ে নি:সন্দেহে সে কথাবার্তা শুরু করবে পথে আসতে আসতে সে হয়ত মনে মনে তা তৈরিও করে রেখেছিল, কিন্তু এখন একেবারেই খেই হারিয়ে ফেলল।

“ন্-না আমি এসেছি রিমঝিমের সঙ্গে। আমার এখন একটা কুকুর আছে ওই নামে। দিশি নাম। বাইরে অপেক্ষা করছে শিস দিলেই ছুটে আসবে। আমিও কুকুর নিয়ে এসেছি”, হঠাৎ ইলিউশার দিকে ফিরে সে বলল। “জুচ্‌কার কথা মনে আছে রে বুড়ো?” তার এই আচমকা প্রশ্নে ধাক্কা খেল ইলিউশা।

ইলিউশার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে সে কোলিয়ার দিকে তাকাল। আলিয়োশা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ভুরু কোঁচকাল, আড়চোখে কোলিয়াকে ইশারা করতে গেল যাতে সে জুচ্‌কার প্রসঙ্গ না তোলে। কিন্তু কোলিয়া সেটা লক্ষ করল না বা লক্ষ করতে চাইল না।

"জুচ্‌কা? কোথায় জুচ্‌কা?" বলতে বলতে ভেঙে পড়ল ইলিউশার কণ্ঠস্বর।

"তোর জুচ্‌কা ফুস হয়ে গেছে রে ভাই! মরে গেছে তোর জুচ্‌কা!"

ইলিউশা কোনো কথা না বলে চুপচাপ এক দৃষ্টে, অপলকে আরও একবার তাকিয়ে দেখল কোলিয়াকে। কোলিয়ার চোখে চোখ পড়তে আলিয়োশা আবারও মাথা নেড়ে যতদূর পারা যায় তাকে ইঙ্গিত করল, কিন্তু এবারেও সে তার চোখ সরিয়ে নিল, ভাব করল যেন এবারেও লক্ষ করে নি।

"কোথাও পালিয়ে গেছে, তারপর মরেও গেছে। অমন খাবারের পর মরবে না তো কী!" কোনো দয়ামায়া না দেখিয়ে কেটে কেটে বলল কোলিয়া, "তবে হ্যাঁ, আমার রিমঝিম আছে। একেবারে দিশি নাম। আমি তোর কাছে নিয়ে এসেছি।

"দরকার ন্-নেই!" ইলিউশা হঠাৎ বলে উঠল।

"না, না, দরকার আছে। অবশ্যই দেখতে হবে তোকে। মজা পাবি। আমি ইচ্ছে করেই নিয়ে এসেছি। ঠিক ওটার মতোই লোমশ। " তারপর আচমকা স্নেগিরেয়োভ্-গিন্নিকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, "আপনার অনুমতি হয় তো আমার কুকুরটাকে এখানে ডেকে আনি। কী বলেন মাদাম?" তার কথার মধ্যে একেবারে দুর্বোধ্য ধরনের কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল।

"দরকার নেই, দরকার নেই!" করুণ আর্তনাদে ভেঙে পড়ল ইলিউশার কণ্ঠস্বর। তার দু চোখে তীব্র ভর্ৎসনার আগুন।

"না হয় বরং দেয়ালের ধারে রাখা তোরঙ্গটার ওপর বসতে গিয়েও ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন বলল। "না হয় বরং অন্য আরেক সময় হবে 'খন", আমতা আমতা করে সে বলল। কিন্তু কোলিয়ার জেদ ছিল অপ্রতিরোধ্য। সে চটপট স্মুরভ্‌কে হেঁকে বলল "স্মুরভ্, দরজাটা খুলে দে!" স্মুরভ্‌ও দরজা খুলল, কোলিয়াও অমনি তার হুইসল বাজাল। রিমঝিম উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল।

"লাফা রে রিমঝিম লাফা! পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়া! দাঁড়া!" কোলিয়া তার জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, কুকুরটাও পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল ইলিউশার শয্যার ঠিক পাশটিতে। এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যা কারও কাছেই প্রত্যাশিত ছিল না। ইলিউশা চমকে উঠল, হঠাৎ সে জোর করে সমস্ত শরীরটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে রিমঝিমের দিকে ঝুঁকে পড়ল, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

"আরে এটা তো জুচ্‌কা!" যুগপৎ দুঃখে ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ইলিউশা।

"তা নয় তো কী ভেবেছিলি?" আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে প্রাণপণ

শক্তিতে চেঁচিয়ে ক্রাসোত্‌কিন বলল। কুকুরটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে জাপটে ধরে তুলে দেখাল ইলিউশাকে।

"চেয়ে দ্যাখ বুড়ো। দেখছিস, একটা চোখ কানা, বাঁ কানটা কাটা—হুবহু সেই সেই লক্ষণ যা তুই আমায় বলেছিলি। এই লক্ষণগুলো দেখেই তো আমি ওকে খুঁজে খুঁজে বের করেছি! দেরি না করে, তখনই খোঁজে লেগে যাই। ও কিন্তু কারও কুকুর ছিল না, কারোরই ছিল না!" তাড়াতাড়ি করে একের পর এক ক্যাপ্টেন, তার সহধর্মিণী ও আলিয়োশার দিকে ফিরে, তারপর ফের ইলিউশার দিকে ফিরে সে ব্যাখ্যা করল। "ছিল ফেদোতভ্‌দের বাড়ির পিছনের উঠোনে, সেখানেই থিতু হয়ে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাড়ির লোকেরা ওকে খেতে দিত না। কোথাকার কোন্ এক ছন্নছাড়া কুকুর, পাড়া গাঁ থেকে পালিয়ে এসেছে। আমি খুঁজে খুঁজে ওকে ঠিক বের করলাম। দেখলি তো বুড়ো, তাহলে দেখা যাচ্ছে ও তখন তোর দেওয়া ওই রুটির টুকরো গেলেনি। গিলে ফেললে আর দেখতে হত না—নির্ঘাত মারা যেত, মারা যে যেতই তাতে কোনো সন্দেহ নেই! বেঁচে যখন আছে তখন বুঝতে হবে ওটাকে ঠিক সময় মতো থু থু করে ফেলে দিয়েছিল। মুখ থেকে ফেলে যে দিয়েছিল তুই সেটা লক্ষ করিসনি। অবশ্য ফেলে দিলে কী হবে পিনটা তখন ওর জিভে ফুটেছিল, তাই কুঁই-কুঁই করছিল। কুঁই কুঁই করতে করতে ছুটে পালাচ্ছিল, তাইতে তুই ভাবলি পিনটা একেবারে গিলে ফেলেছে। যদি তা-ই হত তাহলে কিন্তু ভীষণ কুঁই-কুঁই ডাক ছাড়ত, কারণ কুকুরদের মুখের ভেতরকার চামড়া বড্ড নরম মানুষের মুখের ভেতরকার চামড়ার চেয়েও নরম, অনেক বেশি নরম!" অস্বাভাবিক চিৎকার করে বলে উঠল কোলিয়া। আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখমুখ।

এদিকে ইলিউশা কথাই বলতে পারল না। কেমন যেন ভয়াবহ ধরনের ঠিকরে পড়া তার বড়ো বড়ো দু চোখ মেলে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কোলিয়ার দিকে। তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। এরকম একটা মুহূর্ত অসুস্থ ছেলেটার স্বাস্থ্যের ওপর যে কী মারাত্মক, কী মর্মান্তিক প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে কোনো ধারণা ক্রাসোত্‌কিনের ছিল না। সে যদি শুধু তা জানত তাহলে যে চালাকিটা সে তার ওপর খাটাল সেটা সে কোনো মতেই খাটাতে যেত না। কিন্তু ঘরে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র আলিয়োশাই বোধ হয় সেটা বুঝতে পারছিল। আর ক্যাপ্টেনের কথা যদি বলতে হয়, তখন সে পুরোপুরি একটা বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছে।

"জুচ্‌কা! এটা তা হলে জুচ্‌কা!" আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে বলল। "ওরে ইলিউশা, এটা যে জুচ্‌কা, তোর জুচ্‌কা! গিন্নি দেখ, দেখ, এ যে জুচ্‌কা!" বলতে বলতে সে প্রায় কেঁদেই ফেলল।

"কী আশ্চর্য, আমি কিনা ধরতেই পারিনি!" স্মুরভ্ আক্ষেপ করে বলল। "বাহবা ক্রাসোত্‌কিন! আমি বলেছিলাম না ও খুঁজে পাবে! পেল তাহলে!"

"পেল তা হলে!" উল্লসিত হয়ে আরও কে একজন সাড়া দিল।

"শাবাশ ক্রাসোত্‌কিন!" আরও একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

"শাবাশ, শাবাশ!" ছেলেরা সবাই মিলে চিৎকার জুড়ে দিল, হাততালি দিতে শুরু করল।

"আরে বোসো, বোসো", সকলের ওপর গলা চড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ক্রাসোত্‌কিন বলল। "কী ভাবে এটা ঘটেছিল আমি তোমাদের বলি। অন্য আর কিছুর মধ্যে নয়, কী ভাবে ঘটেছিল আসল খেলাটা ত সেখানেই! তা আমি তো ওকে খুঁজে পেতে নিজের কাছে নিয়ে এলাম, এনে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ঘরের ভেতরে তালাবন্ধ করে লুকিয়ে রেখে দিলাম। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, আজকের আগে পর্যন্ত কাউকে দেখাইনি। একমাত্র স্মুরভ্‌ই জানতে পেরেছিল দু সপ্তাহ আগে। কিন্তু আমি ওর মনের মধ্যে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে এটার নাম রিমঝিম। ও ধরতে পারেনি। আমি ফাঁক পেলেই জুচ্‌কাকে এটা ওটা নানা বিদ্যা শেখাতাম। তোমরা সবাই দেখ, একবার চেয়ে দেখ কত রঙ্গ ও জানে! শিখিয়েছিলাম তো এই কারণেই রে বুড়ো, যাতে ভালো তালিম পাওয়া, মোলায়েম চেহারার একটা কুকুর তোর হাতে তুলে দিয়ে বলতে পারি, দ্যাখ রে বুড়ো, তোর জুচ্‌কা এখন কেমন সুন্দর হয়েছে!' আপনাদের এখানে কোনো মাংসের টুকরো হবে কি? ও এখন আপনাদের এমন একটা জিনিস দেখাবে যে আপনারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বেন। কী হল? এক টুকরো মাংস কি হবে না?"

ক্যাপ্টেন দরদালান দিয়ে পড়িমরি ছুটল বাড়িউলির কুটিরের দিকে। সেখানে তাদের হেঁসেলে ক্যাপ্টেনের পরিবারের খাবারও রান্না হচ্ছিল। এদিকে কোলিয়ার ভীষণ তাড়া। সে তার মূল্যবান সময় নষ্ট না করে চেঁচিয়ে রিমঝিমকে বলল 'মরে পড়ে থাক!' কুকুরটাও তৎক্ষণাৎ ঘুরপাক খেয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, চার পা শূন্যে তুলে কাঠ হয়ে পড়ে থাকল। ছেলেরা সব হেসে উঠল। ইলিউশা আগের মতো তার সেই বিষণ্ণ হাসি হেসে তাকিয়ে রইল। কিন্তু রিমঝিম মারা যাওয়াতে সবার চাইতে বেশি খুশি হল 'মামণি'। কুকুরের কাণ্ড দেখে সে অট্টহাসি হেসে উঠল, আঙুলে টুসকি মেরে তাকে ডাকতে শুরু করে দিল: 'রিমঝিম, এই রিমঝিম!"

"উঠবে না, কোনো মতেই উঠবে না!" বিজয়ীর ভঙ্গিতে এবং ন্যায্য কারণেই সগর্বে চেঁচিয়ে বলল কোলিয়া। "দুনিয়াসুদ্ধ লোক যতই চেঁচাক না কেন উঠবে না। কিন্তু আমি চেঁচিয়ে ডাকলেই মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠে পড়বে। এই দেখুন: 'চুঃ রিমঝিম!'"

কুকুরটা এক লাফে উঠে পড়ে আনন্দে কুঁই কুঁই করতে করতে লম্ফঝম্প শুরু করে দিল। ক্যাপ্টেন এক টুকরো সিদ্ধ মাংস নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল।

"গরম নয় তো?" টুকরোটা হাতে নিতে নিতে একজন কর্মব্যস্ত লোকের মতো ব্যস্তসমস্ত হয়ে কোলিয়া জানতে চাইল। "না, গরম নয়, কুকুর আবার গরম ভালোবাসেনা কি না। এবারে সবাই দেখুন। ইলিউশা, দ্যাখ দ্যাখ। চেয়ে দ্যাখ না রে বুড়ো? দেখছিস না কেন বল তো? আমি নিয়ে এলাম, কিন্তু ও যে তাকিয়েই দেখছে না!"

নতুন মজাটা এই যে কুকুরটা তার নাক বাড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তার ঠিক নাকের ওপর মাংসের লোভনীয় টুকরোটা রেখে দেওয়া হবে। হতভাগ্য কুকুরকে এই অবস্থায়, টুকরোটা নাকের ওপর রেখে এতটুকু নড়াচড়া না করে, প্রভু যতক্ষণ অনুমতি না দেয় ততক্ষণ ধরে রাখতে হবে—আধ ঘণ্টা হলেও রাখতে হবে—নড়া চড়া বা এদিক ওদিক করা চলবে না। রিমঝিমকে অবশ্য অতি অল্প মুহূর্তের জন্য ধরে রাখা হল।

"চুঃ!" কোলিয়া হাঁক দিতেই পলকের মধ্যে টুকরোটা উড়ে গিয়ে রিমঝিমের মুখের ভেতরে চালান হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে, বলাই বাহুল্য, পরম পুলক ও বিস্ময় প্রকাশ করল।

তাহলে, তাহলে সত্যি সত্যি কি একমাত্র কুকুরটাকে তালিম দেবে বলেই তুমি এই এত দিন এখানে আসনি!" আলিয়োশার কণ্ঠে তার নিজের অজান্তে ভর্ৎসনার সুর বেরিয়ে এলো।

"ঠিক এই কারণেই!" কোলিয়া সরল মনে চেঁচিয়ে বলল। "আমি ওকে পুরোদস্তুর ওর জৌলুসে দেখাতে চেয়েছিলাম!"

"রিমঝিম! রিমঝিম!" হঠাৎ ইলিউশা তার সরু সরু আঙুলে টুসকি মেরে ইশারা করে কুকুরটাকে কাছে ডাকল।

"কীসের দরকার তোর? ও নিজেই লাফিয়ে চলে আসুক না তোর বিছানায়। এই, রিমঝিম, চুঃ!" বলতে বলতে চাপড় মেরে বিছানা দেখিয়ে দিল কোলিয়া। রিমঝিমও তৎক্ষণাৎ তিরবেগে ইলিউশার কাছে ছুটে এলো। ইলিউশা তাড়াতাড়ি দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, রিমঝিম মুহূর্তের মধ্যে এর জন্য ইলিউশার গাল চেটে দিল। ইলিউশা বিছানায় শুয়েই শরীরটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তার ঘন লোমের মধ্যে সকলের কাছ থেকে মুখ লুকাল।

"প্রভু, প্রভু হে!" ক্যাপ্টেন অভিভূত হয়ে বলে উঠল।

কোলিয়া আবার বিছানায় ইলিউশার কাছে গিয়ে বসল।

'ইলিউশা, আমি তোকে আরও একটা জিনিস দেখাতে পারি। আমি তোর জন্য একটা খেলনা কামান নিয়ে এসেছি। মনে আছে আমি তোকে আগেও এই কামানটার কথা বলেছিলাম? তুই তখন বলেছিলি 'আহা, ওটা দেখতে পেলে হত!' এই যে এবারে এনেছি।"

কোলিয়া তাড়াতাড়ি করে তার থলে থেকে পেতলের খেলনা কামানটা বের

করল। ওটা বের করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে তার নিজেরও বড়ো আনন্দ হচ্ছিল। অন্য সময় হলে রিমঝিম যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল সেই ভাবটা যতক্ষণ কেটে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন আর ধৈর্যের কোনো বালাই না রেখে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল  অমনিতেই তো দেখছি সকলে সুখী, না হয় আরও বেশি সুখী হল!' সে নিজেও বেশ একটা উন্মাদনার মধ্যে আছে।

"জিনিসটার ওপর অনেক দিন ধরেই আমার নজর ছিল। সরকারি কর্মচারী মরোজভের বাড়িতে দেখেছিলাম। এটা তোর জন্য এনেছি রে বুড়ো, তোর জন্য। জিনিসটা মরোজভের কাছে অমনি অমনি পড়ে ছিল। পেয়েছিল ওর ভাইয়ের কাছ থেকে। বাবার বইয়ের আলমারি থেকে 'মহম্মদের জনৈক আত্মীয় বা চরম আহাম্মকি' নামে একটা বই দিয়ে তার বদলে নিয়ে এসেছি। এক শ বছর আগেকার বই, কেচ্ছা কেলেঙ্কারিতে ভরা। মস্কোয় তখনও সেন্সর ব্যবস্থা ছিল না, সেই সময় বের হয়েছিল। এ ধরনের জিনিসে আবার মরোজভের ভারি উৎসাহ। এর জন্য আমাকে ধন্যবাদও জানায়।

কামানটা কোলিয়া সকলের সামনে এমন ভাবে ধরে রাখল যাতে তারা সেটা দেখতে পায় এবং দেখে নয়ন সার্থক করতে পারে। ইলিউশা বিছানায় খানিকটা উঠে বসে আগের মতোই ডান হাতে রিমঝিমের গলা জড়িয়ে ধরে থাকল আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে খেলনাটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। চাঞ্চল্যটা উচ্চমাত্রায় পৌঁছুল যখন কোলিয়া ঘোষণা করল যে তার কাছে বারুদ আছে এবং এখুনি গোলাও ছোড়া যেতো পারে 'যদি অবশ্য মহিলারা তাতে বিচলিত না হয়ে পড়েন'। 'মামণিটি' তৎক্ষণাৎ অনুরোধ জানাল তাকে যেন একবার কাছ থেকে খেলনাটা দেখতে দেওয়া হয়। তার সেই অনুরোধ রাখা হল। চাকা লাগানো পেতলের খেলনা কামানটা তার ভারি পছন্দ হল। সেটাকে সে কোলের ওপর রেখে গড়গড় করে এদিক ওদিক চালাতেও শুরু করে দিল। আর কামান থেকে গোলা ছোড়ার যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছিল তার জবাবে সে পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করল, যদিও অবশ্য তাকে যে ঠিক কী প্রশ্ন করা হচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারছিল না। কোলিয়া বারুদ আর ছর্‌রা দেখাল। ক্যাপ্টেন এক কালে মিলিটারিতে ছিল বলে খুব সামান্য পরিমাণ বারুদ নিয়ে নিজেই কামানে বারুদ ভরার ভার নিল, ছর্‌রা পরের বারের জন্য তুলে রাখতে বলল। কামান মাটিতে রাখার পর তার নলটা ঘরের একটা খালি জায়গার দিকে মুখ করে রাখা হল। কামানের গর্তের ভেতরে তিন গ্রেন মতন বারুদ ঠাসার পর দেশলাই জ্বেলে আগুন দেওয়া হল। শোনার মতো একটা আওয়াজ হল বটে। 'মামণি' তো প্রায় চমকেই উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে আনন্দে হেসে উঠল। ছেলেরা নির্বাক হয়ে গম্ভীর ভাবে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু

ইলিউশার দিকে তাকিয়ে সবচাইতে বেশি সুখ অনুভব করল ক্যাপ্টেন। কোলিয়া কামানটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইলিউশাকে উপহার দিল, সেই সঙ্গে বারুদ আর ছর্‌রাও।

"এটা তোর, তোর জন্যে এনেছি আমি! অনেক দিন হল তৈরি করে রেখেছি", আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে আরও একবার বলে উঠল।

"আহা ওটা আমাকে উপহার দাও! না, কামানটা বরং আমাকেই উপহার দাও!" হঠাৎ একটা ছোটো বাচ্চার মতো আবদার শুরু করে দিল 'মামণি'। পাছে তাকে না দেয় এই আশঙ্কায় তার চোখেমুখে শোকাচ্ছন্ন উদ্বেগের ছায়া নেমে এলো। কোলিয়া ঘাবড়ে গেল। ক্যাপ্টেন বিব্রত ও অস্থির হয়ে পড়ল।

"ওগো শুনছ? যা বলছি শোন!" এক লাফে তার কাছে ছুটে এসে সে বলল। "কামানটা তোমার, ওটা তোমারই, কিন্তু ওটা না হয় থাকলই আমাদের ইলিউশার কাছে, কেন না উপহারটা দেওয়া হয়েছে ওকে। তবে সে যা-ই হোক না কেন, ওটা তোমার। ইলিউশা যে কোনো সময়ে তোমাকে খেলতে দেবে। খেলনাটা তোমাদের দুজনের হোক, তোমাদের দুজনেরই হোক না কেন।

"না না, আমি চাই না দুজনের হোক। আমি চাই ওটা ইলিউশার না হয়ে আমার, একা আমার হোক।" 'মামণির' সেই এক কথা। একেবারে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা তার।

"নাও মামণি, এই নাও তুমিই রাখ!" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কোলিয়া। "এটা কি আমি মাকে উপহার দিতে পারি ক্রাসোত্‌কিন?" চট করে ক্রাসোত্‌কিনের দিকে ফিরে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিতে এমন মিনতির ভাব ফুটে উঠল যে মনে হল ইলিউশার আশঙ্কা হচ্ছিল সে যে ক্রাসোত্‌কিনের দেওয়া উপহার আরেকজনকে দিয়ে দিচ্ছে তাতে ক্রাসোত্‌কিন মনে দুঃখ পেতে পারে।

"খুব দিতে পারিস!" তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল ক্রাসোত্‌কিন। উপহারটা ইলিউশার হাত থেকে নিয়ে অত্যন্ত ভদ্র ভাবে মাথা নুইয়ে ইলিউশার মামণিকে সম্মান জানিয়ে নিজেই সেটা তার হাতে তুলে দিল। 'মামণি' এত অভিভূত হয়ে পড়ল যে কেঁদেই ফেলল।

'ইলিউশা, বাছা আমার, দেখাই যাচ্ছে কে তার মামণিকে ভালোবাসে!" ভাবে গদগদ হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার খেলনাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে গড়িয়ে এদিক ওদিক চালাতে শুরু করে দিল।

"ওগো তোমার হাতটা দাও, আমি চুমু খাই!" ক্যাপ্টেন তার সহধর্মিণীর কাছে ছুটে এসে সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা পুরণ করল।

"সব চাইতে মিষ্টি ছেলে যদি কেউ থাকে তাহলে সে এই ভালোমানুষ ছেলেটি!" ক্রাসোত্‌কিনকে দেখিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ভদ্রমহিলা বলে উঠল।

"আর বারুদ এখন থেকে যত চাস তত এনে দেব ইলিউশা। আমরা নিজেরাই

এখন বারুদ তৈরি করি। কতটা কী দিয়ে বানাতে হয় বরভিকভ্ জেনে নিয়েছে। চব্বিশ ভাগ শোরা, দশ ভাগ গন্ধক আর ছয় ভাগ বার্চ গাছের কাঠ পোড়ানো কয়লা। সব এক সঙ্গে গুঁড়ো করে তাতে জল ঢালতে হবে, তারপর মিশিয়ে কাদা কাদা করে একটা পাতলা চামড়ায় ঘষে ঘষে ছাঁকতে হবে—এই ভাবে তৈরি হয় বারুদ।”

“স্মুরভ্ আমাকে এর মধ্যে তোমাদের বারুদের কথা বলেছে, তবে বাবা বলছেন এটা আসল বারুদ নয়”, ইলিউশা মন্তব্য করল।

“আসল নয় কেমন?” কোলিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ‘আমাদের এটা তো জ্বলেও। “আমি অবশ্য ঠিক জানি না ”

“না না!” আমি ওরকম কিছু বলিনি”, কাচু মাচু হয়ে ক্যাপ্টেন মাঝখান থেকে বলে উঠল। “এটা ঠিক যে আমি বলেছিলাম, আসল বারুদ এ ভাবে তৈরি হয় না, কিন্তু ও কিছু নয়—এভাবেও হতে পারে।”

“জানি না, আপনিই ভালো জানেন। আমরা একটা কৌটোর মধ্যে খানিকটা নিয়ে জ্বালিয়ে দেখেছি, দিব্যি জ্বলছে, পুরোটাই পুড়ে গেল, অতি সামান্য পরিমাণ ঝুলকালি পড়ে রইল। তবে সে শুধু ওই কাদা-কাদা তাল, কিন্তু যদি চামড়ায় ঘষে ঘষে ছাঁকা যায় অবশ্য হ্যাঁ আপনারই ভালো জানার কথা, আমি আর কী জানি? এদিকে বুল্‌কিনের বাবা আমাদের এই বারুদের জন্য ওকে জোর ধাতানি দিয়েছেন, শুনেছিস?” ইলিউশাকে উদ্দেশ করে সে হঠাৎ বলল।

“শুনেছি”, ইলিউশা জবাব দিল। অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে সে কোলিয়ার কথা শুনছিল এবং উপভোগ করছিল।

আমরা পুরো এক বোতল তৈরি করেছিলাম। ও খাটের নীচে রাখত। ওর বাবা দেখে ফেলল। বলল, বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ধরে চাবকাল। স্কুলে আমার নামে নালিশও করতে যাচ্ছিল। এখন অবস্থাটা হয়েছে এই যে ছেলেকে আমার সঙ্গে কোথাও যেতে দেয় না, ইদানীং কাউকেই আমার সঙ্গে কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। স্মুরভ্‌কেও ওর বাড়ি থেকে ছাড়ে না। সবার কাছে আমি নাম কিনেছি। লোকে বলে আমি নাকি ‘বেপরোয়া ধরনের’ ছেলে।” কোলিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। “এ সবেরই শুরু সেই রেল লাইনের ঘটনা থেকে।”

“ওঃ তোমার সেই কাণ্ডও আমরা শুনেছি বটে!” ক্যাপ্টেন উল্লসিত হয়ে বলে উঠল। “কী ভাবে ওখানে পড়ে থাকতে পারলে বল তো? ট্রেনের নিচে শুয়ে থাকার সময়ও এতটুকুও ভয় পাওনি এটা কি হতে পারে? ভয় পেয়েছিলে বল?”

কোলিয়ার সামনে তার গুণগানে ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন।

“ন্-না, তেমন একটা নয়!” যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে ক্যাপ্টেনের কথায় সাড়া দিয়ে সে বলল। “এখানে আমার নামটা যদি কেউ বেশি করে ডুবিয়ে থাকে তো সেই হতচ্ছাড়া হাঁসটা” আবারও ইলিউশার দিকে ফিরে সে বলল।

যদিও সে বলতে বলতে মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল, কিন্তু তা হলেও নিজের আবেগকে সে কোনো মতে সামলাতে পারছিল না, যে সুরটাকে ধরে রাখতে যাচ্ছিল সেখানে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

“ওঃ সেই হাঁসের কথাও শুনেছি!” ইলিউশার সমস্ত চোখমুখ উচ্ছল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। “ওরা আমায় বলেছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি। “সত্যি সত্যি কি এর জন্য তোমার বিচার হয়েছিল?”

“অতি সামান্য ধরনের একটা মূর্খামি। সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, আমাদের লোকজন ওই থেকে তিলকে তাল বানিয়েছে।” কোলিয়া গা ছাড়া ভাবে তার কাহিনি শুরু করল। “ঘটনাটা এই যে এক দিন আমি বাজার চত্বর দিয়ে হেঁটে চলেছি, ঠিক এই সময় এক পাল হাঁসকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁসগুলোকে দেখলে লাগলাম। এমন সময় দেখি ভিশ্‌নিকভ্ নামে স্থানীয় একটা ছেলে—যে এখন প্লোত্‌নিকভ্‌দের দোকানে ফাইফরমাশ খাটে—আমার দিকে চেয়ে আছে। সে আমায় বললে ‘কী ব্যাপার, হাঁসগুলোর দিকে অমন তাকিয়ে আছ যে?’ আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম গোলগাল বোকা-বোকা মুখখানা। বছর বিশেক বয়স হবে ছোঁড়ার। তা তোমরা তো জানই, সাধারণ লোকজনকে আমি কখনও অগ্রাহ্য করি না। বরং আমি তাদের সঙ্গ পছন্দই করি। আজকাল আমরা তাদের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়েছি—এটা আর কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আপনি হয়তো আমার কথা শুনে হাসছেন কারামাজ়ভ্, তাই না?”

“না, না। কী যে বল! আমি খুব মন দিয়ে তোমার কথা শুনছি”, নিপাট ভালোমানুষের ভাব করে আলিয়োশা উত্তরে বলল। সন্দিগ্ধ কোলিয়াও সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

“আমি বলছিলাম কি কারামাজ়ভ্, আমার তত্ত্বটা পরিষ্কার এবং সহজ সরল”, আবারও উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ হড়বড়িয়ে বলতে শুরু করল, “সাধারণ লোকজনকে আমি বিশ্বাস করি, তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে পারলে আমি সব সময়ই খুশি হই, তবে তাই বলে তাদের মাথায় চড়িয়ে আদৌ নয়—এটা sine qua — একটা অত্যাবশ্যক শর্ত। ও হ্যাঁ, আমি বলছিলাম হাঁসের কথা। তা আমি ওই বুদ্ধুটার দিকে ফিরে জবাবে তাকে বললাম ‘এই ভাবছিলাম কি হাঁসের মাথার ভাবনাটা কী।’ ফ্যালফ্যাল করে আস্ত গবেটের মতো আমার দিকে চেয়ে বলল ‘হাঁসের মাথায় আবার কী ভাবনা থাকতে পারে?’ আমি বললাম, ‘ওই যে দেখছ তো জইয়ের বস্তা বোঝাই মালগাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বস্তা থেকে জই মাটিতে ঝরে পড়ছে, এদিকে হাঁসটার কাণ্ড দেখ—একেবারে গাড়ির চাকার নিচে গলা বাড়িয়ে দিয়ে দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে—দেখছ তো?’ ‘সেটা আমি খুবই দেখতে পাচ্ছি, সে বলল। আমি তখন বললাম, ‘আচ্ছা, এই গাড়িটাকে এবারে যদি সামান্য একটু সামনে ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে হাঁসটার গলা চাকার তলায় কাটা পড়বে কি?

কী মনে হয়?' 'পড়বে, নির্ঘাত কাটা পড়বে', এই বলে সে একেবারে বিগলিত হয়ে দাঁত বের করে হাসল। আমি বললাম, 'তাহলে এসো হে, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।' 'বেশ, দেখা যাক', সে বলল। ব্যবস্থাটা করতে আমাদের দেরি হল না। সে ছোকরা লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে লাগামের কাছটাতে গিয়ে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম গাড়ির এক পাশ ঘেঁষে, যাতে হাঁসটাকে চাকার দিকে চালান করতে সুবিধে হয়। গাড়ির মালিক চাষিটার তখন এদিকে কোনো হুঁশই নেই, কার সঙ্গে যেন কথায় মেতে রয়েছে, এমনই মেতে রয়েছে যে তার ফলে হাঁসটাকে চাকার তলায় চালিয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকারই হল না আমার, সেটা জইয়ের লোভে আপনা আপনি সোজা গাড়ির তলায়, চাকার ঠিক নিচে গলা বাড়িয়ে দিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছোকরাকে চোখ টিপে ইশারা করলাম। ছোকরা লাগাম ধরে টান মারল—সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাচাং—হাঁসের গলা কেটে দু আধলা হয়ে গেল। আর এমনই কাণ্ড যে ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা চাষিদের সকলের নজরে পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ সে যা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল! 'এটা তুই ইচ্ছে করে করেছিস।' 'না, ইচ্ছে করে করিনি।' 'আলবত্, ইচ্ছে করে করেছিস!' কিন্তু তাহলে কী হবে? হৈ হট্টগোল তুলে বলল, 'চল, শান্তিরক্ষা আদালতের বিচারপতির কাছে এর বিচার হবে!' আমাকেও পাকড়াও করল। তাদের কথা 'এই যে তুই, তুইও এর মধ্যে ছিলি, এ কাজে তুই ওকে মদত দিয়েছিস। বাজারের সব্বাই তোকে চেনে।' এটা অবশ্য ঠিকই, কেন যেন বাজারের লোকজন সবাই আমাকে চেনে', কোলিয়া সদর্পে যোগ করল। সবাই চললাম বিচারপতির কাছে, হাঁসটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল। আমার সেই ছোকরার দিকে চেয়ে দেখি সে ভয় পেয়ে গেছে, আর সত্যি সত্যি কেঁদেও ফেলল, মেয়েদের মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিল। যে চাষি হাঁসের পালটা বাজারে নিয়ে এসেছিল সে চেঁচিয়ে বলল, 'এই ভাবে তো কত হাঁসই চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে পারতিস!' বলাই বাহুল্য, ঘটনার সাক্ষী ত ছিলই। বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন হাঁসের জন্য এক রুবল জরিমানা দিতে হবে, আর সেটা পাবে হাঁসগুলো যার হেফাজতে ছিল সেই চাষিটা, তবে হাঁসটা ওই ছোকরাই নিক, আর হ্যাঁ, ভবিষ্যতে যেন এমন রসিকতা আর কক্ষনও না করে। এদিকে ছোকরা সেই মেয়েদের মতো গলা ছেড়ে কাঁদছে তো কাঁদছেই। বারবার বলে চলেছে 'আমি করিনি, এই ছেলেটা আমাকে দিয়ে করিয়েছে।' বলে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমি তার জবাবে সম্পূর্ণ মাথা ঠান্ডা রেখে বলি যে আমি মোটেই শেখাইনি, আমি শুধু একটা মৌলিক চিন্তা প্রকাশ করেছিলাম, যা বলেছিলাম সেটা নিছক একটা খসড়া। বিচারপতি আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ওরকম হাসার জন্য নিজেই নিজের ওপর চটে গেলেন, আমায় বললেন, 'আমি এখুনি তোমার স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করছি যাতে ভবিষ্যতে বইপুথি নিয়ে বসে পড়াশুনা শেখার বদলে অমন মৌলিক চিন্তা না করতে হয়।' আমার নামে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ অবশ্য তিনি করলেন না। ওটা ছিল তাঁর একটা ঠাট্টা,

তবে ঘটনাটা সত্যি সত্যি চাওড় হয়ে গেল এবং কর্তৃপক্ষের কানে গিয়েও পৌঁছুল। কর্তৃপক্ষের কান বলে কথা! অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা কি না! বিশেষত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন আমাদের ক্লাসিকের মাস্টার মশাই কল্‌বাসনিকভ্। দার্দানেলভ্ এবারেও আমাকে উদ্ধার করলেন। এদিকে কল্‌বাস্‌নিকভ্ তখন একেবারে কাঁচা বুদ্ধির বেয়াড়া একটা গাধার মতো আমাদের সকলের ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন। তুই শুনেছিস তো ইলিউশা, উনি বিয়ে করেছেন, মিখাইলভ্‌দের কাছ থেকে হাজার রুবল যৌতুকও নিয়েছেন। নতুন বৌটি সব সময় মুখ ঘুরিয়ে আছে, এমনই নাক সিঁটকানো ভাব যে কহতব্য নয়। ছেলের দল সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও বানিয়ে ফেলল কল্‌বাসনিকভের নামে।

কল্‌বাস্‌নিকভ্—লোক নোংরা অতিশয়,
করেছে সে বিয়ে শুনে চমকাতেই হয়।

এরপর আরও যা আছে তা বেজায় হাসির। আমি তোকে পরে এনে দেব। দার্দানেলভের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। জ্ঞানীগুণী লোক, সত্যিকারের জ্ঞানী—কোনো সন্দেহ নেই। এ ধরনের লোকজনকে আমি শ্রদ্ধা করি—অবশ্যই এই কারণে নয় যে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন

"সে যা-ই বল না কেন, ট্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে সেই প্রশ্ন করে তো তুমি তাঁকে কাবু করে দিয়েছিলে!" সেই মুহূর্তে ক্রাসোত্‌কিনের জন্য রীতিমতো গর্ব বোধ হওয়ায় হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে স্মুরভ্ বলে উঠল। হাঁসের গল্পটি তার খুবই ভালো লেগেছিল।

"সত্যি সত্যি তাকে কাবু করে দিয়েছিলে বুঝি?" স্মুরভের কথা লুফে নিয়ে খোশামোদের সুরে ক্যাপ্টেন জানতে চাইল। 'ট্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে সেই প্রশ্নটা তো? আমরা শুনেছি বটে যে কাবু করেছিলে। ইলিউশা আমাকে আগেই বলেছে।

"ও সব জানে বাপি। আমাদের যে কারও চাইতে ভালো জানে!" স্মুরভের তালে তাল দিয়ে ইলিউশা বলল। "ও শুধু ভান করে থাকে যেন কিছুই নয়, কিন্তু আসলে ও ক্লাসে সব বিষয়ে সেরা ছাত্র।

কোলিয়ার দিকে তাকিয়ে সীমাহীন সুখের অনুভূতিতে ইলিউশার মন ভরে উঠল।

"সেই ট্রয়ের ব্যাপার তো? ও কিছু নয়, এলেবেলে। আমি নিজে এই প্রশ্নটাকে একটা ফাঁকিবাজি বলেই মনে করি।" কোলিয়ার এই বিনয়ের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বের ভাবও ছিল। ইতিমধ্যে সে পুরোপুরি তার নিজস্ব ছন্দে ফিরে এসেছে, যদিও কিছুটা অস্বস্তি তার তখনও ছিল। সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে সে বড়ো উত্তেজনার মধ্যে আছে। এই যেমন হাঁসের ঘটনাটা যখন সে বলল তখন এত বেশি উচ্ছ্বাস দেখানো তার ঠিক হয়নি। এদিকে সে যতক্ষণ ঘটনার বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় আলিয়োশা আগাগোড়া চুপ করে ছিল, তাকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। একথা মনে হতে যে চিন্তাটা আত্মাভিমানী ছেলেটির বুকের মধ্যে কুরে কুরে খেতে শুরু করল তা এই যে 'আলিয়োশার চুপ করে থাকার কারণ এই নয় তো যে

সে আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে, ভাবছে আমি তার কাছ থেকে প্রশংসার প্রত্যাশায় আছি? তা-ই যদি হয়, যদি তার মনে মনে একথা ভাবার স্পর্ধা হয় যে আমি...'

"আমার মনে হয় প্রশ্নটা একদম বাজে", আরও একবার সে কাটা জবাব দিল।

"আমি কিন্তু জানি, কারা ট্রয় প্রতিষ্ঠা করেছিল", একেবারে আচমকা, দুম করে বলে উঠল একটা ছেলে। ছেলেটা চুপচাপ গোছের, দেখেশুনে মনে হয় লাজুক স্বভাবের। এর আগে পর্যন্ত তাকে প্রায় কোনো কথা বলতে শোনা যায়নি। দেখতে বেশ ভালো, বছর এগারোর এই ছেলেটার নাম কার্তাশভ্। বসে ছিল দরজার কাছ ঘেঁষে। কোলিয়া অবাক হয়ে ভারিক্কি চালে তার দিকে তাকাল।

ঘটনাটা এই যে ঠিক কে বা কারা ট্রয় প্রতিষ্ঠা করেছিল এই প্রশ্নটি সারা স্কুলের সবগুলি ক্লাসের মধ্যেই রীতিমতো একটা গোপন রহস্যের আকার ধারণ করেছিল। সে রহস্য ভেদ করতে গেলে যেটা দরকার ছিল তা হল স্মারাগাদভের ইতিহাস বইটা পড়ে দেখা। কিন্তু কোলিয়া ছাড়া আর কারও কাছে স্মারাগাদভের বইটা ছিল না। এক দিন হল কি, ক্লাসে কোলিয়া যখন একটু পাশ ফিরেছে সেই সময় তার অন্যান্য বইয়ের মাঝখানে স্মারাগাদভের ইতিহাস বইটা দেখতে পেয়ে কার্তাশভ্ নামে এই ছেলেটা চুপিচুপি সেটা তুলে নিয়ে চটপট পাতা ওল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে গেল সেই জায়গাটা যেখানে ট্রয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রসঙ্গ আছে। অবশ্য বহুকাল আগেকার ঘটনা এটা। কিন্তু ছেলেটা কেমন যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে ছিল। কে বা কারা ট্রয় প্রতিষ্ঠা করেছিল এটা যে সেও জানে তা সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করার ব্যাপারে সে মনস্থির করতে পারছিল না। তার আশঙ্কা ছিল পাছে কী বলতে কী হয়ে যায় এবং এই নিয়ে কোলিয়া তাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। কিন্তু এখন হঠাৎ কেন যেন আর চেপে রাখতে পারল না, বলে ফেলল। অবশ্য এটাও ঠিক যে অনেক দিন যাবত বলি-বলি করছিল।

"তা হলে বল। কারা প্রতিষ্ঠা করেছিল?" সদর্পে এবং অবজ্ঞাভরে তার দিকে ফিরে তাকাল কোলিয়া। কিন্তু তার মুখ দেখে কোলিয়া ততক্ষণে আন্দাজ করতে পেরেছে যে উত্তরটা সে সত্যি সত্যি জানে এবং সঙ্গে সঙ্গে কী ভাবে সেটা গ্রহণ করবে সেই বিষয়ে মনস্থিরও করে ফেলল। মিশ্র প্রতিক্রিয়া বলতে যা বোঝায় সাধারণ ভাবে উপস্থিত সকলের মনের মধ্যে তাই ঘটল।

'ট্রয় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা হলেন তেউকর, দার্দানুস্, ইলিউস্ আর ত্রোস্", এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলেই মুহূর্তের মধ্যে সে লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠল। এমনই লাল হয়ে উঠল যে তাকে দেখলে মায়া হয়। কিন্তু ছেলের দল তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল, পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইল। তারপর সেই এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা চোখগুলো হঠাৎ এক যোগে ঘুরে গেল কোলিয়ার দিকে। কোলিয়া তখনও আগের মতোই ঠান্ডা মাথায়, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এই বেআদব বালখিল্যটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

"প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানে? কী অর্থে?" শেষকালে এটা বলাই সে সমীচীন বোধ করল। "তাছাড়া মোটের ওপর একটা শহর বা একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বলতে কী বোঝায়? কী করেছিল তারা? এসে একটা করে ইট গাঁথল বলতে চাও?"

হাসির ধুম পড়ে গেল। ছেলেটার কাচুমাচু মুখখানা গোলাপি থেকে লাল টকটকে হয়ে উঠল। সে চুপ করে রইল, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল এই বুঝি কেঁদে ফেলবে। এই অবস্থায় কোলিয়া তাকে আরও মিনিটখানেক ধরে রাখল।

"কোনো জাতির প্রতিষ্ঠার মতো ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলে সবার আগে বোঝা দরকার এর অর্থ কী..." কঠিন স্বরে কেটে কেটে উপদেশের ভঙ্গিতে সে বলল। "আমি অবশ্য এই সব মেয়েমানুষি গালগল্পের কোনও গুরুত্ব দিই না। তা ছাড়া, মোট কথা, বিশ্ব ইতিহাসের ওপর আমার তেমন একটা ভক্তিশ্রদ্ধাও নেই", এবারে সাধারণ ভাবে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে অবহেলাভরে সে হঠাৎ যোগ করল।

"সে কী! বিশ্ব ইতিহাস?" হঠাৎ কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, বিশ্ব ইতিহাস। মানুষের যত নির্বুদ্ধিতা নিয়ে চর্চা করা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার একমাত্র ভক্তি গণিতে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানে।" কোলিয়া চাল মারল, সঙ্গে সঙ্গে আলিয়োশার দিকে এক ঝলক তাকাল। এখানে একমাত্র আলিয়োশার মতামতকেই তার ভয়। কিন্তু আলিয়োশা সেই রকমই চুপচাপ, আগের মতোই গম্ভীর। সে যদি এই মুহূর্তে কিছু বলত সেখানেই বিষয়টার নিষ্পত্তি ঘটত, কিন্তু সে চুপ করে আছে। বলা যায় না, তার 'এই নীরবতা' অবজ্ঞাসূচকও হতে পারে। এতে কোলিয়া রীতিমতো বিরক্তি বোধ করল।

"তারপর আবার আমাদের এই ক্ল্যাসিকাল ভাষা গুলো—স্রেফ পাগলামি—এ ছাড়া আর কী হতে পারে? এবারেও আপনি আমার সঙ্গে এক মত নন—তাই না কারামাজভ্?"

"একমত নই।" আলিয়োশা মৃদু হাসল।

"ক্ল্যাসিকাল ভাষার চর্চা, আমার মতামত যদি জানতে চান, এটা একটা পুলিশি ব্যবস্থা—একমাত্র এই কারণেই আমাদের স্কুলগুলোতে ওগুলো চালু করা হয়েছে।"[১৫] বলতে বলতে অল্প অল্প করে সুর চড়াতে চড়াতে কোলিয়ার এমন অবস্থা হল যে সে আবার হাঁপাতে শুরু করে দিল। "চালু করা হয়েছে এই কারণে যে ওগুলো নীরস, এই কারণে যে তাতে বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হয়ে যায়। অমনিতেই নীরস ছিল, কিন্তু কী করে আরও বেশি নীরস করে তোলা যায় সেটা দেখতে হবে না? ছিল অর্থহীন, কিন্তু আরও বেশি অর্থহীন করে তুলতে হবে না? সেই কারণেই না গ্রিক লাতিনের মতো ক্ল্যাসিকাল ভাষাগুলোর কথা ভাবা। এই হল আমার মত এবং আমি আশা রাখি এ মত আমার কখনও পালটাবে না।" রুক্ষস্বরে কোলিয়া তার

কথা শেষ করল। তার দুই গালে ফুটে উঠেছে লাল চাকা চাকা দাগ।

"এটা সত্যি" এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে শোনার পর কথাটা মেনে নিয়ে কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে হঠাৎ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল স্মুরভ্।

"এদিকে নিজে কিন্তু লাতিনে ফার্স্ট বয়!" দলের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

"হ্যাঁ বাপি, ও এই কথা বললে কী হবে, ক্লাসে কিন্তু লাতিনে ফার্স্ট হয়", ইলিউশাও সায় দিল।

"তাতে কী হয়েছে?" কোলিয়া দেখল এবারে তাকে নিজের সমর্থনে দাঁড়াতে হয়, যদিও প্রশংসাটা শুনতে তার বেশ ভালোই লাগছিল। "লাতিন নিয়ে আমাকে ঘষটাতে হয়, তার কারণ মা'কে আমি কথা দিয়েছি কোর্সটা আমি শেষ করব। আমার মতে, যে কাজটা একবার হাতে নেওয়া হয়েছে সেটা ভালোভাবেই করা উচিত। কিন্তু মনে মনে ক্ল্যাসিক জিনিসটা আর তার সব জঘন্য ব্যাপার-স্যাপারে আমার দারুণ বিতৃষ্ণা। আপনি মানেন না, তাই না কারামাজ়ভ্?"

"কিন্তু 'জঘন্য' হতে যাবে কেন?" আলিয়োশা আবার কাষ্ঠহাসি হাসল।

"মাফ করবেন, এই দেখুন না কেন, সব ক্ল্যাসিকেরই তো সব ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে ক্ল্যাসিক পড়ার জন্য লাতিন চালু করার দরকার তাদের ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুলিশি ব্যবস্থা কায়েম করা আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভোঁতা করে দেওয়া। এর পরও জঘন্য বলব না তো কী বলব?"

"কিন্তু এসব তোমাকে কে শিখিয়েছে বল তো?" আলিয়োশা শেষ কালে অবাক হয়ে বলে উঠল।

"প্রথমত, এর জন্য কোন শিক্ষার দরকার হয় না, আমার নিজেরই এটা বোঝার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ত, জেনে রাখুন, এই যে ক্ল্যাসিকের অনুবাদ সম্পর্কে এই মাত্র যে কথা আমি আপনাদের বললাম ঠিক সেই কথাটাই আমাদের শিক্ষক কল্‌বাস্‌নিকভ্ নিজের মুখে ক্লাসের সকলের সামনে বলেছেন।

"ডাক্তারবাবু এসে গেছেন!" এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর ক্যাপ্টেনের ছোটো মেয়ে নিনা বলে উঠল।

বাস্তবিকই তাই। বাড়ির গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়িটা অবশ্য মাদাম খখ্‌লাকোভার। ক্যাপ্টেন সারাটা সকাল ডাক্তারের মুখ চেয়ে ছিল। গাড়িটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য পড়িমরি করে গেটের দিকে ছুটল। 'মামণিটি' নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করল। আলিয়োশা ইলিউশার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার বালিশ ঠিকঠাক করে দিতে লাগল। নিনা তার চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে উদ্বেগের সঙ্গে আলিয়োশার বিছানা ঠিক করার ওপর নজর রাখতে লাগল। ছেলের দল তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিতে শুরু করল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কথা দিল যে সন্ধ্যাবেলা আরেক বার

এসে দেখা করে যাবে। কোলিয়া রিমঝিমকে ডাকল, সেও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

“আমি যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি না!” কোলিয়া তাড়াতাড়ি করে ইলিউশাকে বলল। “আমি দরদালানে অপেক্ষা করে থাকব, ডাক্তার চলে গেলে আবার আসব, রিমঝিমকে নিয়েই আসব।”

কিন্তু ডাক্তার ততক্ষণে ঘরে ঢোকার মুখে। বেশ রাশভারী চেহারা। গালের দু পাশে গাঢ় রঙের ইয়া লম্বা লম্বা জুলপি, নিখুঁত কামানো চকচকে চিবুক, গায়ে ভালুকের সলোম চামড়ার কোট। চৌকাট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, মনে হল যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। তাঁর সম্ভবত মনে হচ্ছিল তিনি ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। ‘এ কী করে হল? এ আমি কোথায় এলাম?’ তিনি বিড়বিড় করে বললেন। কাঁধ থেকে পশুলোমের কোটটা খুলে রাখতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। কানাত পর্যন্ত আগাগোড়া সীলের দামি চামড়ায় তৈরি টুপিটাও মাথা থেকে খুললেন না। লোকজনের ভিড়, ঘরের দারিদ্র্যদশা, কোনায় দড়িতে টাঙানো কাচা জামাকাপড়—দেখেশুনে তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ক্যাপ্টেন তাঁর সামনে কোলকুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

“আপনি এখানে, মহাশয়, এখানে ” বিগলিত হয়ে বিড়বিড় করে সে বলল, “মহাশয়, এখানে ঠিকই এসেছেন, আমার কাছেই আপনার আসার কথা, মহাশয়।...”

“স্নে-গি-রিয়োভ্?” গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে ডাক্তার বলে উঠলেন। “মিস্টার স্নেগিরোয়ভ্—আপনি?”

“আমিই, মহাশয়!”

“আচ্ছা!”

ডাক্তার আরও একবার খুঁতখুঁত ভাব নিয়ে ঘরের ভেতরে চোখ বুলালেন। লোমের কোটটা গা থেকে খুলে এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিলেন, তাঁর গলায় ঝোলান জমকাল পদকটা উপস্থিত সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন বিলম্ব না করে শূন্যেই কোটটা লুফে নিল। ডাক্তার মাথার টুপি খুললেন।

“পেশেন্ট কোথায়?” তিনি চড়া সুরে প্রশ্ন করলেন।

## ছয়

## অকাল পক্বতা

“আপনার কী মনে হয়? ডাক্তার ওকে কী বলবেন?” তড়বড় করে বলে উঠল কোলিয়া। যাই বলুন না কেন, কী বিচ্ছিরি লোকটার মুখখানা! ঠিক কি না? চিকিৎসাশাস্ত্র আমার দু চক্ষের বিষ!”

“ইলিউশা মারা যাবে। আমার তো এখন মনে হচ্ছে নির্ঘাত মারা যাবে”, বিষণ্ণভাবে আলিয়োশা জবাব দিল।

"বজ্জাতের দল! চিকিৎসা জিনিসটাই একটা ভাঁওতাবাজি! যাই হোক, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমি কিন্তু খুশি হয়েছি, কারামাজ়ভ্। অনেক দিন হল আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। দুঃখ একটাই যে এরকম একটা দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের দেখা হল। "

কোলিয়ার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল আরও বেশি আবেগ এবং আরও বেশি উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ কিছু বলে, কিন্তু কেন কে জানে তা থেকে সে নিবৃত্ত হল। আলিয়োশা সেটা লক্ষ করে মৃদু হেসে তার হাতটা চেপে ধরল।

"আপনার মধ্যে যে দুর্লভ একটা কিছু আছে এর জন্য আমি অনেক কাল আপনার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মেছে", তালগোল পাকিয়ে ফেলে থতমত খেতে খেতে আবারও বিড়বিড় করে বলল কোলিয়া। "আমি শুনেছি আপনি মরমিয়াবাদী, আপনি মঠে ছিলেন। আমি জানি আপনি মরমিয়াবাদী, কিন্তু সেটা আমার কাছে কোনো বাধা নয়। বাস্তবের সংস্পর্শে এসে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। ...আপনার যা চরিত্র তাতে এর অন্যথা হতে পারে না।"

"মরমিয়াবাদী বলতে তুমি কী বোঝ? কী থেকে আরোগ্য লাভের কথা বলছ?" আলিয়োশা খানিকটা অবাক হয়ে গেল।

"ওই যে ঈশ্বর-টিশ্বর ইত্যাদি।"

"কী বলছ কী? ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস নেই নাকি?"

"কথাটা ঠিক তা নয়। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। অবশ্য এটা ঠিক ঈশ্বর একটা অনুমান মাত্র তবে আমি স্বীকার করছি, তাঁর প্রয়োজন আছে, শৃঙ্খলার জন্য তাঁর প্রয়োজন আছে বিশ্বসংসারে শৃঙ্খলা ইত্যাদি রক্ষার জন্য প্রয়োজন আছে তিনি যদি নাও থাকতেন তাহলেও তাঁকে উদ্ভাবন করা দরকার ছিল",* কথাটা যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কোলিয়া লজ্জায় লাল হতে শুরু করল। হঠাৎ সে ভেবে দেখল আলিয়োশা এখন মনে করতে পারে সে তার জ্ঞান জাহির করতে চাইছে এবং দেখাতে চাইছে সে একজন 'বয়স্ক লোক'। 'কিন্তু আমার তো ওর সামনে নিজের বিদ্যে জাহির করার এতটুকু ইচ্ছে নেই!' এই ভেবে নিজের ওপর তার রাগই হল। হঠাৎ সে মনে মনে দারুণ বিরক্তি বোধ করতে লাগল।

"আমি স্বীকার করছি, এ সবের আলোচনার মধ্যে ঢোকা আমার সহ্যের বাইরে", সাফ কথা জানিয়ে দিয়ে সে বলল, 'ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেও তো মানুষকে ভালোবাসা যায়? আপনার কী মনে হয়? ভল্‌ত্যের তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না?" বলতে বলতে সে আবার মনে মনে ভাবল, 'আবার! আবারও?'

"ভল্‌ত্যের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, তবে মনে হয় কম বিশ্বাস করতেন এবং

---

কথাটা অবশ্য আসলে ভল্‌ত্যের-এর।

মানবজাতিকেও কম ভালোবাসতেন”, শান্ত সংযত কণ্ঠে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে আলিয়োশা বলল। তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল যে যেন তারই সমবয়স্ক, এমন কি তার চাইতেও বেশি বয়সের কারও সঙ্গে কথা বলছে। আলিয়োশা যে ভল্‌ত্যের সম্পর্কে তার অভিমত নিয়ে এক ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করল এবং এই প্রশ্নটির মীমাংসার ভার অনেকটা যেন কোলিয়ার মতো একটা বাচ্চা ছেলের হাতেই ছেড়ে দিল এতে কোলিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল।

“তুমি কি ভল্‌ত্যের পড়েছ নাকি?” আলিয়োশা শেষকালে প্রশ্ন করল।

“না, ঠিক যে পড়েছি তা নয়। আমি অবশ্য ‘কাঁদিদে’ পড়েছি, রুশ অনুবাদে পড়েছি। সে একটা পুরনো, উদ্ভট আর হাস্যকর ধরনের অনুবাদ। ‘আবার আবারও কিছু বেরিয়ে পড়ছে!’ সে মনে মনে বলল।

“বুঝতে পেরেছ?”

“তা হ্যাঁ পেরেছি বৈ কি, সবই পেরেছি মানে কিন্তু আপনার কেন মনে হচ্ছে আমি বুঝিনি? অবিশ্যি এটা ঠিক, ওর মধ্যে অনেক অশ্লীল জিনিস আছে।... এটা বোঝার মতো ক্ষমতা আমার নিশ্চয়ই আছে যে বইটা একটা দার্শনিক উপন্যাস এবং লেখা হয়েছে একটা আইডিয়া প্রচারের উদ্দেশ্যে ” বলতে বলতে কোলিয়া সব একেবারে গুলিয়ে ফেলল। “আমি একজন সমাজতন্ত্রী, কারামাজভ্, একজন কট্টর সমাজতন্ত্রী”, কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই আচমকা দুম্ করে বলে বসল কোলিয়া।

“সমাজতন্ত্রী?” আলিয়োশা হেসে উঠল। “সে হওয়ার মতো সময় কোথায় পেলে আবার? তোমার বয়স তো এখনও সবে তেরো, তাই না?”

কোলিয়া কুঁকড়ে গেল।

“প্রথমত, তেরো নয়—চোদ্দ—দু হপ্তা পড়ে চোদ্দ হবে”, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে সে বলল, “আর দ্বিতীয়ত, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এখানে আমার বয়সের কথা উঠছে কেন। আমার বয়স নয়, আমার বিশ্বাস কী?—এটাই তো প্রশ্ন। ঠিক কিনা?”

তোমার যখন বয়স আরেকটু বেশি হবে তখন তুমি নিজেই দেখতে পাবে বিশ্বাসের ওপর বয়সের গুরুত্ব কতখানি। আমার এটাও মনে হচ্ছে তুমি যে কথাগুলো বলছ সেগুলো তোমার নিজের কথা নয়’’ সবিনয়ে, শান্ত কণ্ঠে আলিয়োশা জবাব দিল। কিন্তু কোলিয়া উত্তেজিত হয়ে তাকে বাধা দিল।

“মাফ করবেন, আপনারা চান আজ্ঞানুবর্তিতা আর অলৌকিকতা। খ্রিস্টধর্মের কথা যদি ধরেন তাহলে আপনাকে মানতে হবে এই ধর্মবিশ্বাস শুধু ধনী আর হোমরাচোমরাদের স্বার্থে কাজ করে এসেছে যাতে তারা নীচু তলার মানুষদের কেনা গোলাম করে ধরে রাখতে পারে। ঠিক কি না?”

"ও, এই কথা! আমি জানি, কোথায় তুমি এটা পড়েছ। তোমাকে নির্ঘাত কেউ শিখিয়েছে!" আলিয়োশা বলে উঠল।

"মাফ করবেন, পড়তেই হবে এমন কী মানে আছে? আর আমাকে অবশ্যই কেউ শিখিয়েও দেয়নি। আমার নিজেরই ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা আছে। যদি জানতে চান তো বলি, আমি খ্রিস্টের বিরোধী নই। তিনি পূর্ণমাত্রায় মানবিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যদি আজকের দিনে জীবিত থাকতেন তাহলে সরাসরি বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতেন এবং হয়তো বিশিষ্ট ভূমিকাও গ্রহণ করতেন। এমনকি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"*

"আচ্ছা, কোত্থেকে, বল তো কোত্থেকে তুমি এটা পেলে? কোন্ আহাম্মকের সঙ্গে তুমি জুটেছিলে?" আলিয়োশা বিস্ময় প্রকাশ করল।

"মাফ করবেন, সত্য গোপন করব না। অবশ্য এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে রাকিতিন মহাশয়ের সঙ্গে আমার অনেক সময় এ বিষয়ে কথা হয়ে থাকে, কিন্তু ... লোকে ত বলে যে বুড়ো বেলিন্‌স্কিও[১৬] নাকি এমন কথা বলেছিলেন।"

"বেলিন্‌স্কি? কোথায়? মনে পড়ছে না তো। উনি এ কথা কোথাও লেখেননি।"

"লিখে যদি নাও থাকেন, শোনা যায় তিনি বলেছিলেন। এটা আমি শুনেছি এমন এক জনের কাছ থেকে তা সে যাক গে"

"তা, বেলিন্‌স্কি পড়েছ নাকি?"

"দেখুন, ব্যাপারটা এই যে না সব পড়েছি বলব না, তবে তাতিয়ানা প্রসঙ্গে সেই জায়গাটা পড়েছি যেখানে তিনি লিখেছেন কেন তাতিয়ানা[১৭] অনিয়েগিনের সঙ্গে গেল না।"

"অনিয়েগিনের সঙ্গে গেল না কেমন? সেটা এই বয়সেই তুমি বুঝে ফেললে নাকি?"

"মাফ্ করবেন, আমার মনে হয় আপনি আমাকে স্মুরভের মতো ছেলেমানুষ বলে ভাবছেন", বিরক্ত হয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কোলিয়া বলল। "সে যাই হোক, দয়া করে আবার ভেবে বসবেন না যে আমি ওরকম একজন বিপ্লবী। রাকিতিন মহাশয়ের সঙ্গে আমার অনেক সময়ই মতের মিল হয় না। আমি তাতিয়ানার কথা উল্লেখ করলাম বটে, কিন্তু আমি মোটেই নারী মুক্তির পক্ষে নই। আমি মনে করি স্ত্রীলোক মাত্রেই বশংবদ, তার উচিত আজ্ঞা মেনে চলা। ওই যে নেপোলিয়ন তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন না—Les femmes tricotent—মেয়েদের কাজ হল পোশাক বোনা!" কোলিয়া কেন যেন মুচকি হাসল। "অন্তত এই প্রশ্নে আমি মহত্ত্বের ছদ্মনামধারী এই ব্যক্তিটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এই ধরুন না কেন, আমিও মনে

---

* পরবর্তী কালে কবি আলেকজান্দ্র ব্লোক এবং ভ্লাদিমীর মায়াকোভ্‌স্কিও তাঁদের কাছে এমন ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

করি নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়া নীচতার পরিচয়—নীচতার চেয়েও খারাপ—মূর্খামি। আমাদের দেশে থেকেই যখন মানবজাতির অশেষ উপকার সাধন করা যায় তখন আমেরিকায় যাওয়া কেন? বিশেষ করে এই এখন। ফলপ্রসূ কাজের একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। আমি এই রকমই জবাব দিয়েছিলাম।”

“জবাব দিয়েছিলে মানে? কাকে? তোমাকে কি কেউ ইতিমধ্যে আমেরিকায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল?”

স্বীকার করতে বাধা নেই, আমাকে টোপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি ‘না’ করে দিয়েছি। এটা অবশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, কারামাজ়ভ্। শুনছেন? কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবেন না। শুধু আপনাকেই বললাম। তিন নম্বর ডিপার্টমেন্টের খপ্পরে পড়ে শিক্‌লি সেতুর ধারে ওদের দালানে পাঠ নেবার ইচ্ছে আমার একদম নেই।

পড়বে মনে বারে বারে
সেই যে দালান শিক্‌লি সেতুর ধারে!”

মনে আছে? দারুণ কিন্তু! কী হল, আপনি হাসছেন যে? আপনি আবার ভাবছেন না তো আমি আপনাকে গুচ্ছের মিথ্যে কথা বলে গেলাম?” ‘কিন্তু সত্যিই তো এ যদি ধরে ফেলে যে আমার বাবার বইয়ের আলমারিতে ‘ঘণ্টাধ্বনি’ পত্রিকার ওই একটি সংখ্যাই আছে এবং ওটা থেকে এর বেশি কিছু আমি পড়িওনি?’ কোলিয়ার মাথায় এই চিন্তাটা এক ঝলক খেলে যেতে সে শিউরে উঠল।

“আরে না, না, আমি হাসছি না। আদৌ এমন কথা ভাবছি না যে তুমি মিথ্যে বলছ। সেটাই তো কথা যে ওরকম ভাবতে পারছি না, কারণ আক্ষেপের বিষয় এই যে এ সবই নির্ভেজাল সত্য! আচ্ছা সত্যি বল ত’ পুশ্‌কিন পড়েছ কি? ‘অনিয়েগিন’? পড়েছ কি? এই মাত্র তাতিয়ানার কথা বললে না?”

“না, এখনও পড়িনি, তবে পড়ার ইচ্ছে আছে। আমার কোনও সংস্কার নেই, কারামাজ়ভ্। আমি দুই পক্ষেরই মতামত শুনতে চাই। আপনি জিগ্যেস করলেন কেন বলুন তো?”

“না, অমনি।”

“আচ্ছা বলুন তো কারামাজ়ভ্, আপনি আমাকে রীতিমতো তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন, তাই না?” দুম্ করে কাটা-কাটা সুরে এই কথা বলে কোলিয়া তার গোটা শরীরটাকে আলিয়োশার সামনে এমন ভাবে বাড়িয়ে দিল যেন সে একটা নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। “বলুন, কোনো রকম ভনিতা না করে দয়া করে বলে ফেলুন।”

“তোমাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখি?” আলিয়োশা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কী কারণে? আমার শুধু দুঃখ এই যে তোমার মতো চমৎকার স্বভাব

চরিত্রের একটা ছেলে যে তার জীবন এখনও শুরুই করেনি, সে কি না স্থূল ধরনের আজেবাজে এই সব চিন্তার প্রভাবে এরই মধ্যে বিকৃত হয়ে গেল।"

"আমার স্বভাব চরিত্র নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না", তাকে বাধা দিয়ে বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদের সুরেই কোলিয়া বলল। "আর আমি যে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত এটা ঠিক। বোকার মতো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, স্থূল ধরনের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। আপনি এখুনি হেসেছিলেন, আমার এটাও মনে হয়েছিল আপনি যেন..."

"আহা, আমি হেসেছিলাম একেবারে অন্য কারণে। জান আমি কেন হেসেছিলাম? কিছুদিন আগে আমাদের স্কুল কলেজের পড়ুয়া বর্তমান যুবসম্প্রদায় সম্পর্কে রাশিয়ায় বসবাসকারী এক প্রবাসী জার্মানের একটা সমালোচনা আমি পড়েছিলাম। তিনি লিখছেন কোনো রুশি স্কুল-পড়ুয়াকে আপনি নক্ষত্রলোকের একটা মানচিত্র দেখান, যার এর আগে পর্যন্ত তার কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু দেখবেন কালই সে মানচিত্রটা আপনাকে সংশোধন করে ফেরত দেবে। জ্ঞানের কোনও বালাই নেই, নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণার একশেষ—রুশি স্কুল পড়ুয়াদের সম্পর্কে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন জার্মান ভদ্রলোকটি।"

"তা হ্যাঁ ঠিক বৈ কি, একদম ঠিক!" কোলিয়া হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি! শাবাশ জার্মান! তবে এটাও ঠিক যে ভালো দিকটা কিন্তু খতিয়ে দেখলেন না। আপনার কী মনে হয়? নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা—না হয় হলই, সেটা যৌবনের ধর্ম, শুধরে যাবে, শোধরানোর প্রয়োজন হলে ঠিক শুধরে যাবে। বলতে গেলে একেবারে ছোটোবেলা থেকে স্বাধীন মনোভাব, স্বাধীন চিন্তা আর মতের এই যে দৃঢ়তা—এ সেই ওদের, ওই সসেজওয়ালাগুলো যেমন কর্তাব্যক্তিদের সামনে যেমন লুটিয়ে পড়ে সেই মনোবৃত্তি নয়। কিন্তু সে যা-ই হোক, জার্মানটা ভালোই বলেছে। শাবাশ জার্মান! যদিও, যা-ই বলেন না কেন, জার্মানগুলোকে গলা টিপে মারা উচিত।

"গলা টিপে মারা? সেটা আবার কেন?" আলিয়োশা মুচকি হাসল।

"নাঃ, মেনে নিচ্ছি, হয়তো অনেকগুলো আজেবাজে কথা বলে ফেললাম। মাঝে মাঝে আমি সাঙ্ঘাতিক ভাবে একটা বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে পড়ি। যখন কোনো কারণে মন খুশি থাকে তখন নিজেকে আর সামলাতে পারি না—আবোল তাবোল যা-তা বকার জন্য আমি মুখিয়ে থাকি। শুনুন, আমি বলছিলাম কি, আমরা তো এখানে বাজে বকবক করে যাচ্ছি, কিন্তু ডাক্তার এতক্ষণ ওখানে পড়ে আছে কী করতে? অনেকক্ষণ হয়ে গেল না? অবশ্য হতে পারে, 'মামণিকে' দেখবে, তারপর পঙ্গু নিনাকেও দেখবে। জানেন, এই নিনা মেয়েটাকে কিন্তু আমার বেশ লেগেছে। আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন হঠাৎ ফিসফিস করে আমাকে

বলল: 'আগে আসেননি কেন?' এমন গলায় বলল, এমন বকুনির সুরে বলল না! আমার মনে হয় মেয়েটা দারুণ ভালো। ওকে দেখে বড্ড মায়া হয়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছ। যাতায়াত করতে থাক, তাহলেই দেখতে পাবে কেমন। যাতে আরও অনেক কিছুর মূল্য দিতে পার সেই জন্য এই ধরনের মানুষজনকে জানতে পারলে তোমার খুবই উপকার হবে। এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়েই তোমার সেই বোধোদয় হবে", আলিয়োশা উত্তেজিত হয়ে মন্তব্য করল। "এতে সবচাইতে ভালোভাবে তোমার রূপ বদল হবে।"

'ইশ্, আমি যে আগে কেন এখানে আসিনি এই ভেবে কী আফশোশই না আমার হচ্ছে! নিজেকে কী বলে যে গালমন্দ করব বুঝতে পারছি না!" তিক্ত কণ্ঠে কোলিয়া বলল।

"হ্যাঁ, বড়ো আফশোশের কথা। তুমি নিজের চোখেই দেখলে ওই বেচারি বাচ্চাটার মনে কী আনন্দই না তুমি দিলে! তোমার জন্য কী হন্যে হয়ে যে অপেক্ষা করছিল!"

"অমন করে আর বলবেন না আমাকে! আপনি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না। এতে অবশ্য আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। আমি যে এত দিন আসি নি সেটা আমার অহঙ্কারের কারণে, আমার স্বার্থপর অহঙ্কার আর নীচ প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতার দরুন, যার হাত থেকে সারা জীবন আমি রেহাই পেতে পারছি না, যদিও সারা জীবন ধরে এরই যন্ত্রণায় আমি মাথা কুটে মরছি। আমি এখন এটা দেখতে পাচ্ছি। আমি অনেকাংশেই একটা অমানুষ, কারামাজভ্!"

"না, তোমার স্বভাবটা চমৎকার, যদিও তার বিকৃতি ঘটেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি কেন একটা ভদ্র পরিবারের অসুস্থ প্রকৃতির সংবেদনশীল এই ছেলেটার ওপর 'তুমি' এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারলে!" আবেগে অভিভূত হয়ে আলিয়োশা জবাব দিল।

"একথা আপনি বলছেন কিনা আমাকে!" কোলিয়া চিৎকার করে উঠল। "আমার তো ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার—এই এখন যতক্ষণ আমি এখানে আছি—মনে হয়েছে আপনি আমাকে অবজ্ঞা করছেন! আপনি যদি শুধু জানতেন আপনার মতামতের আমি কত মূল্য দিয়ে থাকি!"

"কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি এত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত? এই বয়সে। ধারণ করতে পারবে না তুমি যখন গল্প বলছিলে তখনই ঘরের ভেতরে তাকিয়ে তোমাকে দেখামাত্র আমি ঠিক এটাই ভাবলাম যে তুমি নির্ঘাত অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত।"

"তা-ই ভেবে বসলেন বুঝি? তাহলে দেখছেন, দেখছেন আপনার কী চোখ! বাজি রেখে বলতে পারি এটা নিশ্চয়ই সেই সময়কার ঘটনা যখন আমি হাঁসের গল্পটা বলছিলাম। ঠিক এই জায়গাটাতেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল আমি যে নিজেকে একজন ডাকাবুকো বলে জাহির করার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি

এর জন্য আমাকে আপনি গভীরভাবে অবজ্ঞা করছেন। এই ভেবে সেই মুহূর্তে আপনার প্রতি একটা দারুণ ঘৃণাও আমার মনে জেগে উঠল এবং আমি উলটো পালটা বকতে শুরু করলাম। তারপর আমি ভেবে দেখলাম—সেটা অবশ্য এই এখনই মনে হল—হয়তো সেই মুহূর্তটিতে, যখন আমি বলেছিলাম 'ঈশ্বর যদি নাও থাকতেন তাহলেও তাঁকে উদ্ভাবন করা দরকার ছিল', যেখানে আমি নিজের বিদ্যা জাহির করতে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, বিশেষ করে যেহেতু কথাটা আমি একটা বইতে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি আমি যে জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তার কারণ আমার অসার দম্ভ নয়, সেটা ওই অমনি, জানি না কী কারণে। মনের আনন্দে, ঈশ্বরের দোহাই, মনের আনন্দেই বুঝিবা হবে যদিও কোনো মানুষ যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সকলের মাথায় চড়ে বসে সেটা বড়ো লজ্জার কথা। এটা আমি জানি। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল আপনি আমাকে অবজ্ঞা করছেন না, সবটাই ছিল আমার মনগড়া। কী বলব কারামাজ়ভ্, আমি ভারী অসুখী। একেক সময়, ঈশ্বর জানেন, মনে মনে কত কী যে কল্পনা করি! মনে হয় যেন সবাই, যেন বিশ্বসুদ্ধ সকলেই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। সেই সব মুহূর্তে আমি স্বাভাবিক সব কিছু তছনছ করে দেবার জন্য প্রস্তুত।"

"আর সেই সঙ্গে আশেপাশের সকলকে কষ্ট দেওয়া।" আলিয়োশা মৃদু হাসল।

"হ্যাঁ, আশেপাশের সকলকে কষ্ট দিই, বিশেষ করে আমার মাকে। আচ্ছা বলুন ত কারামাজ়ভ্, আমি কি এখন খুবই হাস্যকর?"

"আরে, ও নিয়ে ভাববে না, ও কথা একেবারে ভাববে না!" আলিয়োশা বলে উঠল। "আর হাস্যকর বলতেই বা কী বোঝায়? মানুষ তো কতবার হাস্যকর হয়, অথবা কতবারই না তাকে হাস্যকর মনে হয়! তা ছাড়াও আজকাল অশেষ গুণসম্পন্ন মানুষদেরও প্রায় সকলেরই ভয় এই বুঝি তারা হাস্যকর হয়ে পড়ল, তাই তাদের মনে সুখ নেই। আমি শুধু অবাক হচ্ছি এই দেখে যে তুমি এত অল্প বয়সে সেটা টের পেতে শুরু করেছ, যদিও হ্যাঁ, একমাত্র তোমার ক্ষেত্রেই যে লক্ষ করে আসছি এমন নয় এবং অনেক দিন ধরেই করে আসছি। এমনকি যাদের প্রায় শিশু বললেও ভুল হবে না তারাও ইতিমধ্যে এই ব্যাধিতে কষ্ট পেতে শুরু করেছে। এটা এক ধরনের পাগলামি। শয়তান এই আত্মাভিমানের রূপ ধারণ করেছে এবং এই শয়তানই আমাদের গোটা প্রজন্মের ভেতরে ঢুকে বাসা বেঁধেছে।" কোলিয়া এক দৃষ্টে আলিয়োশার দিকে তাকিয়ে ছিল। আলিয়োশা যখন এই কথাগুলি যোগ করল তখন কোলিয়া আরেকটু হলেই ভাবতে যাচ্ছিল এর পর বোধহয় সে মৃদু হাসবে; কিন্তু আলিয়োশার মুখের হাসির এতটুকু চিহ্ন দেখা গেল না। "তুমিও দেখছি আর দশজনের মতো, অর্থাৎ খুবই বেশি সংখ্যায় আরও যারা আছে তাদেরই মতো। কিন্তু আমার কথা হল, আর দশজনের মতো ওরকম হওয়াটা তোমার উচিত নয়", এই বলে আলিয়োশা তার বক্তব্য শেষ করল।

"এমনকি সকলে যদি ওরকম হয় তাহলেও নয়?"

"এমনকি তাহলেও নয়। একা তুমিই না হলে ওরকম না-ই হলে। আসলেও তো তুমি ওরকম নও, আর সবার মতো নও। এই দেখ না, এই মাত্র একটা বাজে, এমনকি হাস্যকর ব্যাপার তুমি নিজে মুখে স্বীকার করলে—তাতে তুমি লজ্জা পেলে না। কিন্তু আজকাল কে তা কবুল করবে বল? কেউ করবে না। তাছাড়া আত্মধিক্কারের যে একটা আবশ্যকতা আছে সেটা পর্যন্ত মনে করে না। সকলের মতো হয়ো না। থাক না, একমাত্র তুমি, তুমি একাই না হয় ওরকম না হলে, তবু বলছি ওরকম হয়ো না।"

"চমৎকার! আপনার সম্পর্কে আমি ভুল করিনি দেখছি। আপনি জানেন কী করে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে হয়! ওঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমি যে কী পরিমাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম, কারামাজভ্! আপনিও কি তাহলে সত্যি সত্যি আমার কথা ভেবেছিলেন? এই মাত্র আপনি বললেন যে আপনি আমার কথাও ভেবেছিলেন?"

"হ্যাঁ, আমি তোমার কথা শুনেছিলাম, তোমার কথা ভেবেও ছিলাম। তবে হ্যাঁ, বিশেষ করে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তুমি যদি এখন একথা জিগ্যেস করে থাক, তাহলে বলব ওতে কিছু আসে যায় না।"

"জানেন কারামাজভ্, আমাদের কথাবার্তা অনেকটা যেন প্রেমালাপের মতো", কেমন যেন স্খলিত ও লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কোলিয়া বলে উঠল। "এটা হাসির নয়, তাই না।"

"একেবারেই হাসির নয়, আর হাসির যদি হয়ে থাকে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ জিনিসটা ভালো।" উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল আলিয়োশার মুখ।

"জানেন কারামাজভ্, আপনাকে কিন্তু মানতেই হবে যে আমার পাল্লায় পড়ে আপনার নিজেরও এখন একটু লজ্জা-লজ্জা করছে। আমি আপনার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি।" কেমন যেন একটা চালাক-চালাক ভাব এবং সেই সঙ্গে এক ধরনের প্রায় সুখের একটা উপলব্ধি ফুটে উঠল কোলিয়ার হাসির মধ্যে।

"এতে লজ্জার আবার কী আছে?"

"কিন্তু আপনি অমন রাঙা হয়ে উঠলেন যে?"

"তুমিই তো এমন কাণ্ড করলে যার জন্য আমি রাঙা হয়ে উঠলাম!" বলতে বলতে আলিয়োশা হেসে উঠল, আর সত্যি-সত্যি একেবারে রাঙা হয়ে উঠল। "তা হ্যাঁ, একটু লজ্জার বৈ কি! ভগবান জানেন কীসের জন্য! জানি নে কীসের জন্য " কতকটা অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড় করে সে বলল।

"ওঃ আমার সঙ্গে মিলে আপনারও যে কেমন লজ্জা করছে ঠিক এই জন্যই এই মুহূর্তটিতে আপনাকে আমার কী ভালো যে লাগছে! আপনার ওপর আমার কী শ্রদ্ধাই না হচ্ছে! কারণ এই যে আপনিও হুবহু আমারই মতো!" পরম উল্লসিত

হয়ে কোলিয়া বলে উঠল। আরক্তিম হয়ে উঠল তার দুই গাল, তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

"শোন কোলিয়া, তুমি কিন্তু জীবনে অত্যন্ত অসুখী হবে", আলিয়োশা কেন যেন হঠাৎ বলে উঠল।

"জানি, জানি। আপনি আগে থেকে এত সব জানেন কী করে!" কোলিয়া তৎক্ষণাৎ সমর্থন করে বলল।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনকে মোটের ওপর সাদরে বরণ করে নেবে।"

"ঠিক কথা! বাহবা! আপনি দিব্যদ্রষ্টা! ওঃ আমাদের দারুণ মিলমিশ হবে কারামাজ়ভ্। জানেন আমাকে সবচাইতে বেশি যেটা আনন্দ দেয় তা এই যে আপনি আমার সঙ্গেঁ একেবারে সমানে-সমানে ব্যবহার করেন। অথচ আমরা সমান নই। না, সমান নই, আপনি উচ্চস্তরের! কিন্তু আমাদের মিলমিশ হবে। জানেন, গত এক মাস ধরে আমি মনে মনে নিজেকে এই কথাই বলেছি 'হয় আমাদের দুজনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য মিতালি হবে, নয়তো প্রথম দর্শনেই আমাদের অমিল হবে, আমরা কবরে যাওয়া পর্যন্ত একে অপরের শত্রু হয়ে থাকব!'"

"আর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে অবশ্য আমাকে আরও ভালোও বেসেছিলে বল!" আলিয়োশা খুশি হয়ে হাসল।

"ভালোবেসেছিলাম, দারুণ ভালো বেসেছিলাম। ভালো বেসেছিলাম, আপনাকে নিয়ে স্বপ্নও দেখছিলাম! এত সব আপনি আগে থেকে জানলেন কী করে? বাঃ, এই তো, ডাক্তারকে দেখছি যে। হা ভগবান! কিছু একটা বলবে বলবে মনে হচ্ছে। দেখুন দেখুন, ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন!"

## সাত

## ইলিউশা

ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এবারেও তিনি পশুলোমের কোর্তায় গা মুড়ি দিয়েছেন, এবারেও তাঁর মাথায় সেই টুপি। তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অনেকটা রাগ-রাগ আর গা ঘিন ঘিন করা এমন একটা ভাব যেন তাঁর ভয় এই বুঝি কোথা থেকে তাঁর গায়ে নোংরা লেগে যায়। দরদালানে এক পলক চোখ ফেলে এরই ফাঁকে তিনি কঠোর দৃষ্টিতে আলিয়োশা ও কোলিয়াকে তাকিয়ে দেখলেন। আলিয়োশা চটপট দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে গাড়ির কোচম্যানের কাছে ছুটে গেল। ডাক্তার যে গাড়িতে এসেছিলেন সেটা এবারে বাড়ির গেটের কাছে এগিয়ে এলো। ক্যাপ্টেন পড়িমরি করে ডাক্তারের পিছন পিছন ছুটল, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে আনত হয়ে তাঁর মুখ থেকে শেষ কথা শোনার আশায় তাঁকে থামাল। বেচারির মুখ মরার মতো হয়ে গেছে, তার চোখের দৃষ্টি ভীতসন্ত্রস্ত।

"মহামহিম, মহামহিম,   তাহলে কী?  " বলতে গিয়েও সে তার কথা শেষ করতে পারল না, শুধু হতাশ ভঙ্গিতে হাতে হাত চাপড়াল, যদিও তখনও শেষবারের মতো অনুনয়ের ভঙ্গিতে এমন ভাবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল যেন বেচারি বালকের ওপর যে দণ্ডবিধান হয়ে গেছে তারপরও ডাক্তারবাবু এখন যদি কিছু একটা কথা বলেন তাতে সত্যি সত্যি তার কোনো হেরফের হতে পারে।

"কিছু করার নেই, আমি তো আর ভগবান নই!" গা-ছাড়া ভাবে হলেও ডাক্তার তাঁর অভ্যস্ত প্রভাবব্যঞ্জক কণ্ঠে জবাব দিলেন।

"ডাক্তারবাবু   মহামহিম   তাহলে কি আর বেশিদিন নেই   আর বেশিদিন নেই বলছেন?"

"যে কোনো অবস্থার জন্য প্র-স্তু-ত থাকুন", প্রতিটি শব্দাংশের ওপর ঝোঁক দিয়ে কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার, তারপর মাটিতে চোখ নামিয়ে গাড়ির কাছে যাবার উদ্দেশ্যে নিজেই দরজার চৌকাটের দিকে পা বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত হলেন।

"মহামহিম, খ্রিস্টের দোহাই!" আরও একবার ডাক্তারের গতিরোধ করে ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠল ক্যাপ্টেন। "মহামহিম!   তাহলে কি বাঁচানোর এখন কোন উপায়ই নেই, সত্যি-সত্যি নেই?  "

"এখন আর আমার ওপর নি-র্ভ-র করছে না", অসহিষ্ণু হয়ে ডাক্তার বললেন। "তবে হ্যাঁ, হুম্   বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। "যদি কালবিলম্ব না করে এই এখুনি   আপনার পেশেণ্টকে   এই ধরুন   সিরাকুজে পাঠাতে পারতেন   তাহলে নতুন জল বা-যু-র অনুকূল প্রভাবে হয়তো বা দেখা যেত   এখানে 'কালবিলম্ব না করে' এবং 'এই এখুনি' কথা দুটি ডাক্তার ঠিক কড়া গলায় না হলেও এমন ক্রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন যে ক্যাপ্টেনের পিলে চমকে উঠল।

"সিরাকুজ!" ক্যাপ্টেন এমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

"সিরাকুজ জায়গাটা সিসিলিতে", হঠাৎ গলা চড়িয়ে ঝট করে ব্যাখ্যা করে বলল কোলিয়া। ডাক্তার তার দিকে ফিরে তাকালেন।

"সিসিলি! বলেন কী মহামহিম!" ক্যাপ্টেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। "কিন্তু আপনি তো স্বচক্ষে দেখলেন!" দু হাত চারদিকে ঘুরিয়ে সে তার পরিবেশের দিকে ইঙ্গিত করল। "কিন্তু ওর মা'র কী হবে? পরিবারেরই বা কী হবে?"

"ন্-না, পরিবারকে সিসিলিতে যেতে বলছি না, আপনার পরিবারকে যেতে হবে ককেশাসে, বসন্তের শুরুতেই   আপনার মেয়েকে যেতে হবে ককেশাসে, আর আপনার স্ত্রীকেও   তাঁর বাতব্যাধির জন্য ওই ক-কে-শাসেই জলচিকিৎসার পালা শেষ করার পর অনতিবিলম্বে পাঠাতে হবে প্যারিসে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

লেপেল্-লে-ত্রিয়ের ক্লিনিকে। আমি আপনাকে একটা চিরকুট লিখে দিতে পারতাম তাঁর নামে তাহলে হয়তো হয়ত বা একটা পরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে।...”

“ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু! কিন্তু আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন।” আবারও হঠাৎ হঠাৎ দু হাত নাড়িয়ে দরদালানের কাঠের ন্যাড়া দেয়ালগুলি দেখিয়ে দিল ক্যাপ্টেন।

“সেটা আমার দেখার কথা নয়।” কাষ্ঠ হাসি হাসলেন ডাক্তার। “শেষ উপায় কী হতে পারে আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে বি-জ্ঞান কী বলতে পারে আমি শুধু সেটাই বললাম। বাকিটা দুঃখের কথা

রিমঝিমকে দরজার চৌকাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার যে খানিকটা অস্বস্তির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে তা লক্ষ করে কোলিয়া গলা চড়িয়ে ঝট করে বলে উঠল, “ঘাবড়াবেন না বদ্যিমশাই, আমার কুকুর আপনাকে কামড়াবে না।” কোলিয়ার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের সুর। ‘ডাক্তারের’ বদলে সে যে ‘বদ্যি’ কথাটা বলেছিল সে যে ‘অপমান করার উদ্দেশ্যে’ *ইচ্ছে করেই* বলেছিল তা সে পরে সকলের কাছে স্বীকার করেছিল।

“এর মা-নে?” ডাক্তার মাথা তুলে অবাক হয়ে কোলিয়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকালেন। “এ কে?” হঠাৎ আলিয়োশার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন তার কাছ থেকেই তিনি এর কৈফিয়ত চান।

“আমি রিমঝিমের প্রভু, বদ্যিমশাই। আমি লোকটি কে ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না”, কোলিয়া আবার কাটা-কাটা জবাব দিল।

“রিমঝিম?” রিমঝিমটা কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে ডাক্তার আওড়ালেন।

“আরে কোথায় আছে সে বোধই তো নেই। এবারে আসুন বদ্যি মশাই। সিরাকুজে দেখা হবে।”

“কে এটা? এটা কে?” হঠাৎ ভয়ঙ্কর খেপে উঠলেন ডাক্তার।

“এ স্থানীয় স্কুলের এক ছাত্র, ডাক্তারবাবু। দুষ্টুমি করে বেড়ায়। ওর কথায় কান দেবেন না”, ভুরু কুঁচকে তড়বড় করে বলে উঠল আলিয়োশা। “কোলিয়া, চুপ করলে?” ক্রাসোত্কিনের উদ্দেশে সে চেঁচিয়ে বলল। “কান দেবার দরকার নেই ডাক্তারবাবু”, এবারে বেশ খানিকটা অসহিষ্ণু হয়েই সে আবারও বলল।

“চা-ব্ কানো দরকার, চা-ব্ কানো দরকার, আচ্ছা করে চা-ব্ কানো দরকার!” ততক্ষণে ডাক্তার কেন যেন এত সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি মেঝেতে পা ঠুকতে যাচ্ছিলেন।

“জানেন কি বদ্যিমশাই, আমার রিমঝিম কিন্তু আপনাকে কামড়েও দিতে পারে!” কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে বলতে কোলিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, তার দু চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। “চুঃ, রিমঝিম, চুঃ!” সে বলল।

“কোলিয়া, এর পর যদি তুমি আর একটি কথাও বল তাহলে কিন্তু তোমার

সঙ্গে চিরকালের জন্য আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে!" কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে আলিয়োশা চিৎকার করে তাকে বলল।

"বদ্যিমশাই, সারা দুনিয়ায় একমাত্র একজন মানুষই আছে যে নিকলাই ক্রাসোত্কিনকে হুকুম করতে পারে—এই সেই মানুষটি", আলিয়োশাকে দেখিয়ে কোলিয়া বলল। "আমি তাকেই মানি। আচ্ছা, চলি!"

কোলিয়া ঝট করে জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেল, ভেজানো দরজাটা ঠেলে দ্রুত ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়ল। রিমঝিম তার পিছন পিছন ছুটল। ডাক্তার আরও পাঁচ সেকেন্ড মতো বিমূঢ় হয়ে আলিয়োশার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎই 'ধুত্তোর' বলে দ্রুত পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, যেতে যেতে বারবার জোরে জোরে আওড়াতে লাগলেন 'এটা, এটা এটা এটা যে কী আমি জানি নে!' ক্যাপ্টেন তাকে ঠিকমতো গাড়িতে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য ছুটে গেল। কোলিয়ার পিছন পিছন আলিয়োশাও ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। কোলিয়া ততক্ষণে ইলিউশার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইলিউশা তার হাত ধরে রেখেছিল। সে বাবাকে ডাকতে লাগল। মিনিটখানেক বাদে ক্যাপ্টেনও ফিরে এলো।

"বাপি, বাপি, এদিকে এসো আমরা " নিদারুণ উত্তেজনার বশে ইলিউশা তো-তো করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার বাকরোধ হয়ে আসছিল, দেখাই যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার সাধ্য তার নেই। হঠাৎ সে তার বিশীর্ণ হাতদুটি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কোলিয়া আর বাবা দুজনকেই যতদূর তার সাধ্যে কুলোয়, গাঢ় আলিঙ্গনে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল। এক আলিঙ্গনপাশে তাদের দুজনকে আবদ্ধ করে তাদেরকেও নিজের বুকে চেপে ধরল। একটা অস্ফুট চাপা কান্নায় ক্যাপ্টেনের সর্বাঙ্গ হঠাৎ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, কোলিয়ার ঠোঁট আর চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল।

"বাপি, বাপি! তোমার জন্য আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে বাপি!" তিক্তকণ্ঠে আর্তনাদ করে বলল ইলিউশা।

"ইলিউশা খোকা আমার মানিক আমার ডাক্তারবাবু বলেছেন তুই ভালো হয়ে যাবি আমরা সুখী হব ডাক্তার " আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন।

"আহা, বাপি! নতুন ডাক্তারবাবু আমার সম্পর্কে তোমাকে কী বলেছেন সে তো আম জানি বাপি। আমি যে দেখেছি!" চিৎকার করে এই কথা বলে ইলিউশা আবারও যতদূর তার সাধ্যে কুলোয়, ওদের দুজনকেই বুকে চেপে ধরল, বাবার কাঁধে মুখ লুকালো।

"কেঁদো না বাপি। আমি মারা গেলে তুমি ভালো দেখে আরেকটা ছেলেকে নিয়ো ওদের মাঝখান থেকে, সকলের মাঝখান থেকে নিজেই ভালো একজনকে বেছে নিয়ো, তার নাম দিয়ো ইলিউশা, আমার জায়গায় তাকে ভালোবেসো।

"চুপ করলি বুড়ো! তুই সেরে উঠবি!" ক্রাসোত্‌কিন হঠাৎ এমন ভাবে চিৎকার করে উঠল যে মনে হল সে বেজায় চটে গেছে।

"কিন্তু তাই বলে বাপি, আমায় ভুলো না, আমায় কখনও ভুলো না কিন্তু", ইলিউশা বলে চলল, "আমার কবরের জায়গায় আমাকে দেখতে আসবে আর হ্যাঁ বাপি, আমাকে কবর দেবে আমাদের সেই বড়ো পাথরটার কাছে, যেখানে আমি আর তুমি বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতাম। সেখানে আমার কাছে আসবে সন্ধ্যাবেলায় ক্রাসোত্‌কিনকে সঙ্গে নিয়ে। রিমঝিমও থাকবে সঙ্গে। আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। বাপি, বাপি!"

বলতে বলতে ইলিউশার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল। ওরা তিনজনে পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারও মুখে কোনো কথা নেই। নিনা তার চেয়ারটিতে বসে নিঃশব্দে কাঁদছিল। এমন সময় সকলকে কাঁদতে দেখে মামণিও চোখের জলে ভাসিয়ে দিল।

"ওরে ইলিউশা! খোকা আমার!" সে বলে উঠল।

ক্রাসোত্‌কিন হঠাৎ ইলিউশার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

"চলি রে বুড়ো, আমার মা আবার আমার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন", সে তড়বড়িয়ে বলে উঠল। বড় দুঃখের কথা যে আমি আগে থাকতে ওঁকে জানিয়ে আসতে পারিনি! খুব দুশ্চিন্তা করবেন। তবে খাওয়া দাওয়ার পর আমি সঙ্গে সঙ্গে তোর কাছে আসব। অনেক কথা বলব তোকে, অনেক কথা বলার আছে তোকে। রিমঝিমকেও সঙ্গে নিয়ে আসব। এখন অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, কেন না আমাকে দেখতে না পেলে গর্জন করতে শুরু করবে, তোকে উত্ত্যক্ত করবে। আসি, আবার দেখা হবে!"

সে একছুটে ঘর ছেড়ে দরদালানে বেরিয়ে এলো। কাঁদার ইচ্ছে তার ছিল না, কিন্তু দরদালানে এসে সে কেঁদেই ফেলল। আলিয়োশা তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেল।

"কোলিয়া, তোমাকে অবশ্যই তোমার কথা রাখতে হবে, এখানে আসতে হবে, নয়তো ও ভীষণ দুঃখ পাবে", আলিয়োশা তাকে মিনতি করে বলল।

"অবশ্যই! ঈশ্, এর আগে যে আসিনি সে জন্য নিজেকে কী শাপশাপান্তই না করতে হচ্ছে!" বিড়বিড় করে কোলিয়া বলল, তবে এখন আর কান্নার জন্য তাকে অপ্রতিভ হতে দেখা গেল না।

সেই মুহূর্তে ঘর থেকে যেন হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এলো ক্যাপ্টেন, বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তার চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। দুই নবীনের সামনে দাঁড়িয়ে সে শূন্যে দু হাত ছুড়ল।

“চাই নে আমি ভালো ছেলে। চাই নে অন্য কোনো ছেলে!” দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে হিংস্র চাপা গলায় ফিসফিস করে সে বলল। “হে যেরুসালেম, তোমাকে যদি বিস্মৃত হই তাহা হইলে যেন আড়ষ্টতাপ্রাপ্ত হয় আমার ”

বলতে বলতে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। সে তার কথা শেষ করতে পারল না, শক্তি হারিয়ে কাঠের বেঞ্চটার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। দু হাতের মুঠোয় মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরে কেমন যেন অর্থহীন ভাবে হাউমাউ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। তবে সেই অবস্থাতেও প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল যাতে তার কান্না ঘরের ভেতরে কেউ শুনতে না পায়। কোলিয়া এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

“চলি, কারামাজভ্। আপনি নিজে আসছেন তো?” তীক্ষ্ণ ও ক্রুদ্ধস্বরে সে চেঁচিয়ে আলিয়োশাকে বলল।

“সন্ধ্যাবেলায় অবশ্যই আসব।”

“আচ্ছা উনি যে যেরুসালেমের কথা বললেন সেটা কী ব্যাপার বলুন তো? এর মানেই বা কী?”

“ওটা বাইবেল থেকে।“* হে যেরুসালেম, আমি যদি তোমাকে বিস্মৃত হই”, অর্থাৎ কিনা আমার কাছে পরম মূল্যবান যা কিছু আছে সে সবই যদি আমি ভুলে যাই, যদি তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করি তা হলে আমার শিরে বজ্রাঘাত হোক।...”

“বুঝেছি, ওতেই হবে! আপনি নিজে আসছেন তো! চুঃ, রিমঝিম!” এবারে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরটাকে চিৎকার করে ডেকে দ্রুত বড় বড় পা ফেলে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

## একাদশ অধ্যায়

## দাদা ইভান ফিয়োদরভিচ্

### এক

### গ্রুশেন্‌কার বাড়িতে

গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে দেখা করার জন্য আলিয়োশা রওনা দিল ক্যাথেড্রাল স্কোয়ারের দিকে, বণিক মরোজভের বিধবা স্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে। অতি ভোরেই ফেনিয়াকে আলিয়োশার কাছে পাঠিয়ে একবার এসে তার সঙ্গে দেখা করে যাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল গ্রুশেন্‌কা। ফেনিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আলিয়োশা জানতে পেরেছিল যে তার দিদিমণিটি সেই গতকাল থেকেই কেমন যেন একটা বড়ো রকমের এবং বিশেষ ধরনের উদ্বেগের মধ্যে আছে। মিতিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার পর

দু মাস কেটে গেছে। এই দু মাসের মধ্যে আলিয়োশাকে প্রায়ই যেমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তেমনি আবার মিতিয়ার কাছ থেকে কোনো না কোনো কাজের ভার নিয়ে বিধবা মরোজভার বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়েছে। মিতিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার তিন দিন পরে গ্রুশেন্‌কা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ছিল। সেই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে এক সপ্তাহ তার কোনো জ্ঞানই ছিল না। তার মুখের চেহারা ভীষণরকম পালটে গেছে। সে রোগা আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে, যদিও আজ প্রায় দু সপ্তাহ হল বাড়ির আঙিনা ছেড়ে বাইরে যাবার মতো সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে আলিয়োশার দৃষ্টিতে গ্রুশেন্‌কার মুখটা যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আলিয়োশা যখন তার কাছে আসত তখন তার দৃষ্টির সামনা সামনি হতে আলিয়োশার ভালো লাগত। গ্রুশেন্‌কার দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা দৃঢ়তা আর বুদ্ধিদীপ্ত ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। তার অন্তরলোকে বেশ খানিকটা ওলট পালট ঘটে গেছে, সেখানে দেখা দিয়েছে দৃঢ় অথচ বিনম্র ও কল্যাণময় এমনই এক সঙ্কল্প যার কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। তার কপালে দুই ভুরুর মাঝখানে লম্বালম্বি ছোটখাটো এমন একটা ভাঁজ ফুটে উঠেছে যার ফলে তার সুমধুর মুখটিতে সঞ্চারিত হয়েছে এমন এক আত্মমগ্ন একাগ্র ভাব যা প্রথম দৃষ্টিতে এমনকি প্রায় কঠোর বলেও মনে হতে পারে। আগে যেমন তার মধ্যে একটা উড়ু উড়ু ভাব ছিল এখন তার চিহ্নমাত্র সেখানে নেই।

গ্রুশেন্‌কা যখন তার পাণিপ্রার্থীর বাগ্‌দত্তা, বলতে গেলে ঠিক সেই মুহূর্তটিতে এক ভয়ঙ্কর অপরাধে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তার বাগ্‌দত্ত প্রেমিক গ্রেপ্তার হওয়ায় অভাগা নারীর মাথার ওপর যে ঘোর বিপদ নেমে এসেছিল তা সত্ত্বেও, এর পর সে যে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল, ভবিষ্যতে আদালতের রায় যে বিভীষিকাময় হয়ে দেখা দেবে এবং তা যে প্রায় অবধারিত, তৎসত্ত্বেও গ্রুশেন্‌কা যে তার আগেকার যৌবনসুভ প্রফুল্লতা হারায়নি সেটাও আলিয়োশাকে বিস্মিত করেছিল। গ্রুশেন্‌কার চোখে আগে যে গরিমার ভাব প্রকাশ পেত এখন সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক ধরনের শান্ত আলোর দীপ্তি, যদিও যদিও সেই চোখ দুটি থেকেই আবার কদাচিৎ ঠিকরে পড়ছে কতকটা অলক্ষণসূচক, পুরানো সেই তীব্র আলোর শিখা, যখন অতীতের এমন একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে হানা দিচ্ছে যা প্রশমিত ত হয়ইনি, বরং এই সময়ের মধ্যে বেড়েই গেছে। তার চিন্তার বিষয়টি সেই একই কাতেরিনা ইভানভ্‌না। এমনকি গ্রুশেন্‌কা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল তখনও বিকারের ঘোরে কাতেরিনার নামে তাকে ভুল বকতে শোনা গেছে। আলিয়োশা বুঝতে পারছিল মিতিয়াকে নিয়ে, কয়েদি মিতিয়াকে নিয়ে কাতেরিনার প্রতি তার মনে মনে দারুণ ঈর্ষা। অথচ কাতেরিনা ইভানভ্‌না একবারও জেলখানায় মিতিয়াকে দেখতে যায়নি, যদিও সেটা সে তার খুশিমতো যখন তখন করতেই পারত। এ সবের ফলে আলিয়োশা বেশ খানিকটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়, যেহেতু

গ্রুশেন্কা আবার একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করে মনের কথা বলত এবং অনবরত তার পরামর্শ চাইত। এদিকে আলিয়োশা সময় সময় এমন ফাঁপড়ে পড়ে যেত যে তাকে কিছু বলার মতো অবস্থাই তার থাকত না।

চিন্তাভারাক্রান্ত মনে সে গ্রুশেন্কার বাড়িতে ঢুকল। গ্রুশেন্কা ইতিমধ্যে বাড়ি চলে এসেছে। আধ ঘণ্টাখানেক আগে সে মিতিয়ার কাছ থেকে ফিরে এসেছে। আলিয়োশাকে দেখতে পেয়ে গ্রুশেন্কা যে রকম চটপট টেবিলের ধার থেকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তা থেকে আলিয়োশার বুঝতে বাকি রইল না যে সে এতক্ষণ রীতিমতো অধীর হয়ে তারই প্রতীক্ষায় বসে ছিল। টেবিলের ওপরে কিছু তাস পড়ে ছিল, সেগুলি খেলার জন্যই বাঁটা হয়েছিল। টেবিলের আরেক পাশে চামড়ার গদি আঁটা সোফাটার ওপর একটা শয্যা পাতা হয়েছে, সেখানে ড্রেসিং গাউন পরে, রাতের বেলায় ঘরে পরার সাদা সুতির টুপি মাথায় দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে মাক্সিমভ্। তাকে দেখে অসুস্থ ও দুর্বল বলে মনে হচ্ছে, যদিও তার মুখে মিষ্টি হাসি লেগে ছিল। এই হাঘরে বুড়োটা দু মাস আগে মোক্রয়ে থেকে গ্রুশেন্কার সঙ্গে সেই যে ফিরে এসেছিল তখন থেকে তার কাছেই রয়ে গেছে, নড়াচড়ার কোনো নাম নেই। সেই সময় বৃষ্টিবাদল মাথায় করে জলকাদা ভেঙে গ্রুশেন্কার সঙ্গে আসার পর ভিজে একসা হয়ে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সোফাতে বসে পড়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে মিনতিভরা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে নীরবে গ্রুশেন্কার দিকে চেয়ে ছিল। গ্রুশেন্কা তখন নিদারুণ শোকে আকুল, ততক্ষণে তার জ্বরের প্রকোপও শুরু হয়ে গিয়েছিল, আসার পর প্রথম আধঘণ্টাখানেক নানা রকম ঝামেলার মধ্যে পড়ে লোকটার কথা সে প্রায় ভুলেও গিয়েছিল। হঠাৎই তার দিকে নজর পড়ে যেতে এক দৃষ্টে তাকে তাকিয়ে দেখল। মাক্সিমভ্ও করুণভাবে ফ্যালফ্যাল করে গ্রুশেন্কার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। গ্রুশেন্কা ফেনিয়াকে ডেকে মাক্সিমভ্কে কিছু খেতে দিতে বলল। সারাটা দিন সে প্রায় নিথর হয়ে এক ঠায় বসে রইল। অন্ধকার হতে যখন খড়খড়ি বন্ধ করা হল তখন ফেনিয়া তার দিদিমণিকে জিগ্গেস করল

"আচ্ছা দিদিমণি, ইনি কি রেতের বেলায় এখানে থাকবেন?"

"হ্যাঁ, ওঁর জন্য সোফায় বিছানা পেতে দে", গ্রুশেন্কা উত্তরে বলল।

ওকে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রুশেন্কা ওর কাছ থেকে জানতে পারল যে বাস্তবিকই ওর এখন যাবার একেবারেই কোনো জায়গা নেই এবং 'আমার পরম হিতৈষী কালাগানভ্ মহাশয় আমাকে সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন যে আমাকে তিনি আর গ্রহণ করছেন না। এই বলে তিনি আমাকে পাঁচটা রুবল উপহার দিয়েছেন।'

'যাক গে, ভগবান তোমার সহায় হোন। থাকার হয় তো থেকেই যাও', মৃদু হেসে সমবেদনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শোকে দুঃখে কাতর গ্রুশেন্কা মনে মনে স্থির করল। গ্রুশেন্কার ম্লান হাসিতে বুড়ো মানুষটির বুকের ভেতরটা মোচড়

দিয়ে উঠল, কৃতজ্ঞতাসূচক কান্নায় তার ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। এই ভাবে সেদিন থেকে পরাশ্রয়ী অভাবগ্রস্ত ভবঘুরে লোকটি তার আশ্রয়েই রয়ে গেল। এমনকি গ্রুশেন্‌কা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল তখনও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল না। ফেনিয়া আর তার মা—গ্রুশেন্‌কার রাঁধুনি—তাকে বাড়ি থেকে তো তাড়ালই না, বরং নিত্য তার আহারের ব্যবস্থা এবং সোফায় তার শয্যার ব্যবস্থাও করে চলল। পরে গ্রুশেন্‌কা তার সাহচর্যে অভ্যস্তও হয়ে উঠল। অসুস্থতা থেকে ভালোমতো সেরে ওঠার অবকাশ না পেলেও একটু সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই সে মিতিয়ার কাছে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য সে বসে বসে তার 'মাক্সিম ভাইটির' সঙ্গে ছোটখাটো নানা বিষয় নিয়ে গল্প গাছা শুরু করে দিত। নিজের দুঃখকে মনে ঠাঁই না দেওয়াই ছিল তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেখা গেল বুড়ো মানুষটি অনেক সময় নেহাৎ মন্দ গল্প বলতে পারে না, ফলে শেষকালে গ্রুশেন্‌কার কাছে তার সান্নিধ্য অপরিহার্যও হয়ে উঠল। আলিয়োশা অবশ্য রোজ আসত না এবং এলেও কখনও বেশিক্ষণ থাকত না। আলিয়োশা ছাড়া বাইরের আর প্রায় কাউকেউ সে তার সঙ্গে দেখা করতে দিত না। গ্রুশেন্‌কার সেই যে বুড়ো বণিকটি, সে এই সময় সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল, শহরে লোকে এমনও বলাবলি করছিল যে সে এখন 'যাবার পথে'। বাস্তবিক হলও তাই—মিতিয়ার বিচারের পর মাত্র এক সপ্তাহ যেতেই সে মারা গেল। মারা যাবার তিন সপ্তাহ আগে বুঝতে পেরেছিল অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে, তাই শেষ কালে সে তার ছেলেদের, তাদের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের ওপরে নিজের কাছে ডেকে পাঠাল, বলল তারা যেন আর তাকে ছেড়ে চলে না যায়। সেই মুহূর্ত থেকে সে তার ভৃত্যদের এই মর্মে কড়া নির্দেশ দিল যে গ্রুশেন্‌কাকে যেন কোনোমতেই ঢুকতে দেওয়া না হয়, যদি সে আসে তাহলে তাকে যেন বলে দেওয়া হয় 'উনি আপনার সুখী ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছেন এবং ওঁর কথা একেবারে ভুলে যেতে বলেছেন।' গ্রুশেন্‌কা অবশ্য প্রায় রোজই তার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিতে লোক পাঠাত।

"যাক, শেষকালে এলে!" তাস ফেলে দিয়ে আলিয়োশাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সোল্লাসে সে চেঁচিয়ে উঠল। "এদিকে মাক্সিম ভাইটি আমার আমাকে এই বলে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে তুমি আর আসবে না। ওঃ তোমাকে আমার যে কী ভীষণ দরকার! বোসো, বোসো, টেবিলের ধারটিতে এসে বোসো। কী দেবে তোমাকে? কফি?"

"হলে মন্দ হয় না", টেবিলের ধারে বসতে বসতে আলিয়োশা বলল। "বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"ঠিক ঠিক। ফেনিয়া, ওরে ফেনিয়া, কফি নিয়ে আয়!" গ্রুশেন্‌কা হাঁক দিল। "অনেকক্ষণ হল ফুটছে, তোমারই অপেক্ষায় আছে। আর হ্যাঁ, ওই বড়াগুলোও

নিয়ে আয়—দেখিস গরম হয় যেন। না, দাঁড়াও আলিয়োশা, তোমাকে বলি, এই বড়াগুলো নিয়ে আজ জেলখানায় আমাদের একটা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে গেছে। ওর জন্যে নিয়ে গেলাম, আর ও কিনা, বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ঝটকা মেরে ঠেলে সরিয়ে দিল, খেলই না। একটা তো একেবারে মেঝেতেই ছুড়ে ফেলে দিল, পায়ের তলায় পিষে ফেলল। আমি তখন ওকে বললাম 'ওয়ার্ডারের কাছে রেখে যাচ্ছি, সন্ধ্যার মধ্যে যদি না খাও তাহলে বুঝব তোমার ওই আক্রোশের জ্বালাই তোমার মুখের গ্রাস।' এই বলে আমি চলে এলাম। বিশ্বাস কর আবারও এক চোট ঝগড়া। গেলেই ঝগড়া।"

উত্তেজিত হয়ে এক নিশ্বাসে গ্রুশেন্‌কা গড়গড় করে বলে গেল। মাক্সিমভ্ তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে কাচু মাচু হয়ে হাসল।

"তা এবারে ঝগড়ার কারণটা কী?" আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

"এটা কিন্তু আমি একেবারেই আশা করিনি! একবার ভেবে দেখ, আমার সেই 'প্রাক্তন'কে নিয়ে এখনও ওর ঈর্ষা! বলে কি না 'তুমি ওই লোকটার খাওয়া পরা জোগাচ্ছ কেন? তুমি তাহলে ওর খাওয়া পরা জোগাতে শুরু করে দিয়েছ, অ্যাঁ?' খালি ঈর্ষা আর ঈর্ষা, আমার জন্যে ওর ঈর্ষার শেষ নেই! খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কেবলই ঈর্ষা! এমনকি গত সপ্তাহে কুজ্‌মাকে নিয়েও ঈর্ষার কথা বলেছে।

"কিন্তু আগে কি তোমার ওই 'প্রাক্তনের' কথা জানত?"

"হ্যাঁ, কথাটা তো সেখানেই। একেবারে শুরু থেকে এই আজ পর্যন্ত তো জানাই ছিল, অথচ আজকে কিনা হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল, ওই নিয়ে গালাগাল শুরু করে দিল। যা সব বলল তা মুখে আনতেও লজ্জা হয়। আহাম্মক কোথাকার! আমি বেরোবার সময় দেখলাম রাকিতিনটা এলো। আমার মনে হয় ওটাই ওকে উসকোচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?" কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে সে যোগ করল।

"ও তোমাকে ভালোবাসে, কথাটা হচ্ছে, খুবই ভালোবাসে। কিন্তু এখন তো আবার তিরিক্ষি হয়ে আছে।"

"তা আর হবে না! কাল যে বিচার হবে। আগামীকালের ব্যাপারে আমার কিছু কথা ওকে বলব বলেই আমি গিয়েছিলাম, কেন না আলিয়োশা, কাল যে কী হবে একথা ভাবতেই ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। এই যে তুমি বললে না, তিরিক্ষি হয়ে আছে, কিন্তু আমার মনমেজাজের অবস্থাটাই বা কী! আর এই সময় কিনা সেই পোল্‌টার কথা! আহাম্মক আর কাকে বলে! তবু হোক ভালো বলতে হবে মাক্সিমভ্ ভাইটিকে নিয়ে এখন পর্যন্ত ঈর্ষার কোনও লক্ষণ ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমার সহধর্মিণীটিরও আমার ব্যাপারে ভীষণ সন্দেহ বাতিক ছিল", মাঝখান থেকে মাক্সিমভ্ ফুট কাটল।

"বল কী! তোমার ব্যাপারে!" না চাইলেও গ্রুশেন্‌কা না হেসে পারল না। "কাকে নিয়ে তোমাকে সন্দেহ করত শুনি?"

"বাড়ির ওই ছুঁড়ি চাকরানিগুলোকে নিয়ে।"

"আঃ চুপ কর তো মাক্সিমভ্ ভাই। এখন আমি হাসির মেজাজে নেই। এমনকি আমার রাগ চড়ে যাচ্ছে। ওই বড়াগুলোর দিকে চোখ দেবে না বলছি। পাবে না, ওসব খাওয়া তোমার পক্ষে ভালো নয়। আর ওই আরক টারকও পাবে না। হুঃ, ওনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাক! কেন, আমার বাড়িতে আমি দানছত্র খুলে রেখেছি নাকি?" গ্রুশেন্কা হাসল।

"আমি আপনার অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নই। আমি এক অতি নগণ্য ব্যক্তি", বলতে বলতে কান্নায় বুজে এলো মাক্সিমভের কণ্ঠস্বর। "আমার চাইতে যারা বেশি প্রয়োজনীয় আপনি বরং তাদের দয়া দাক্ষিণ্য করুন গে।"

"আহা, সব লোককেই দরকার হয় মাক্সিমভ্ ভাইটি আমার। কে কার কাজে লাগবে কে বলতে পারে! ওই পোলটা যদি আদৌ না থাকত আলিয়োশা! মিতিয়াটার মাথায় ওই যে চিন্তা আজ ঢুকেছে তাতে বুঝিবা ও অসুস্থই হয়ে পড়ে। তা ওই লোকটার কাছেও গিয়েছিলাম। আমি আরও ইচ্ছে করে ওকে এই সমস্ত খাবার পাঠাব। এত দিন পাঠাইনি, অথচ মিতিয়া আমাকে এই বলে খোঁটা দিল যে আমি নাকি পাঠিয়ে থাকি। তা এই বারে ঠিক পাঠাব, ইচ্ছে করেই পাঠাব! এই যে ফেনিয়া এসে গেছে, একটা চিঠিও নিয়ে এসেছে দেখছি! হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই, আবার সেই পোল্‌দের কাছ থেকে—আবারও টাকা চাইছে!"

পান্ মুসিয়ালভিচ বাস্তবিকই বেশ বড়ো সড় একটা চিঠি পাঠিয়েছে। তার স্বভাবসিদ্ধ কথার ফুলঝুরিতে লেখা সে চিঠি। তাতে সে তিন রুবল ধার চেয়ে পাঠিয়েছে। চিঠির সংলগ্ন আলাদা একটা কাগজে উক্ত অর্থের প্রাপ্তিস্বীকার এবং সেই সঙ্গে তিন মাসের মধ্যে তা অবশ্যই ফেরত দেবার অঙ্গীকার করে একটা খতও ছিল। সেটার নিচে পান্ মুসিয়ালভিচের সঙ্গী পান ভ্রুব্‌লিয়োভ্‌স্কিও দস্তখত করেছে। এরকম চিঠি আর তার সঙ্গে এইরকমই সব খত গ্রুশেন্কা তার 'প্রাক্তনে'র থেকে ইতিমধ্যে অনেকগুলি পেয়েছে। শুরু হয়েছিল দুসপ্তাহ আগে, গ্রুশেন্কার সুস্থ হয়ে ওঠার ঠিক পর থেকে। গ্রুশেন্কা অবশ্য জানত যে সে যখন অসুস্থ ছিল তখন এই দুজন পোল তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে তার কাছে আসত। প্রথম যে চিঠিটা গ্রুশেন্কা পেয়েছিল সেটা ছিল দীর্ঘ, বেশ বড়ো আকারের কাগজে লেখা, পরিবারের প্রতীকচিহ্ন দেওয়া বিশাল সিলমোহর আঁটা। সেটা ছিল কথার ফুলঝুরি ভরা এমনই ভয়ঙ্কর রকমের দুর্বোধ্য যে গ্রুশেন্কা মাত্র অর্ধেকটা পড়ে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিল, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। তাছাড়া তখন চিঠি পড়ার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না। এই প্রথম চিঠিটার পর, পরদিনই পাওয়া গেল দ্বিতীয় আরেকটা, যাতে পান মুসিয়ালভিচ্ অতি স্বল্প সময়ের মেয়াদে তার কাছে দু হাজার রুবল ধার চেয়ে পাঠিয়েছিল। সে চিঠিরও কোনো জবাব গ্রুশেন্কা দেয়নি। এর পর প্রতি দিন একটা করে একের পর এক চিঠি আসতে লাগল।

সেই একই রকম গুরুত্বপূর্ণ এবং কথার ফুলঝুরি ভরা, তবে সেগুলিতে প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ ধীরে ধীরে নাম্‌তে নাম্‌তে একশতে পঁচিশে, দশে এসে ঠেকেছিল। অবশেষে মাত্র একটি রুবল, সেই সঙ্গে আলাদা একটা কাগজে প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি খতও পাঠিয়েছে, যাতে ওরা দুজনেই সই করেছে। গ্রুশেন্‌কার তখন হঠাৎ ওদের জন্য বড়ো দুঃখ হল, তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে সে নিজেই পোল্‌টার কাছে ছুটল। ওদের আস্তানায় গিয়ে দুজনকেই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, প্রায় ভিখিরি অবস্থায় দেখতে পেল। খাবার নেই, ঘরে জ্বালানি নেই, সিগারেট নেই, বাড়িউলির কাছে ঋণগ্রস্ত। মোক্রয়েতে মিতিয়ার কাছে যে দুশ রুবল বাজি জিতেছিল তা কোথায়, কী ভাবে যেন দ্রুত উড়ে হাওয়া হয়ে গেছে। তবু তার সঙ্গে দেখা হতে ওরা দুজনেই যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ গাম্ভীর্যের পরিচয় দিল, যে ভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাহির করল, আদবকায়দার পরাকাষ্ঠা দেখাল আর যে রকম লম্বাচওড়া কথা বলল তাতে কিন্তু গ্রুশেন্‌কা অবাকই হয়ে গেল। গ্রুশেন্‌কা কেবল হাসল, সে তার 'প্রাক্তন'কে দশ রুবল দিল। সেই সময়ই হাসতে হাসতে এই ঘটনার কথা সে মিতিয়াকে বলেছিল। মিতিয়া কিন্তু তখন আদৌ কোনো ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করেনি। কিন্তু তখন থেকে ওই দুই পোল গ্রুশেন্‌কাকে আঁকড়ে ধরে রইল, প্রতিদিন অর্থের জন্য অনুরোধ জানিয়ে তাকে পত্রাঘাত করে চলল। গ্রুশেন্‌কাও প্রতিবার একটু একটু করে টাকা পাঠাতে লাগল। শেষকালে হঠাৎ এই আজই মিতিয়ার মাথায় কী খেয়াল চাপল— তার ভীষণ ঈর্ষা জেগে উঠল।

"আমি একটা আচ্ছা বোকা মেয়ে মিতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে মাত্র মিনিটখানেকের জন্য আমি ওর কাছে, আমার সেই প্রাক্তনের কাছেও ছুটে গিয়েছিলাম, কেন না সেই মানুষটিও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল", উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আবারও তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করল গ্রুশেন্‌কা। "মিতিয়াকে আবার হাসতে হাসতে এটাও বললাম 'ভাবতে পার, আমার সেই পোল্‌টির তো এদিকে মাথায় কী বাই চেপেছে কে জানে, গিটার বাজিয়ে আমাকে পুরানো দিনের সব গান গেয়ে শোনাচ্ছে, হয়তো ভেবেছে আমি গলে যাব, ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধব।' শুনে মিতিয়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠে যা শাপশাপান্ত শুরু করে দিল! তাই বলছিলাম কি, না, ওই দুই 'পান'কে অবশ্যই খাবারগুলো পাঠাব! ফেনিয়া, ওরা কি ওদের ওই বাচ্চা মেয়েটাকে পাঠিয়েছে? তাহলে তিনটে রুবল আর একটা কাগজে মুড়ে গোটা দশেক ওই বড়া ওর হাতে দিয়ে ওদের জন্যে নিয়ে যেতে বল। আর তুমি আলিয়োশা মিতিয়াকে অবশ্যই বোলো যে আমি ওদের বড়া খেতে দিয়েছি।"

"কোনো মতেই বলব না", মুচকি হেসে আলিয়োশা বলল।

"হুঁঃ, তুমি ভাবছ ও কষ্ট পাচ্ছে! আরে ও ইচ্ছে করেই এই ঈর্ষার ভাবটা দেখাচ্ছে। এতে ওর কিছু যায় আসে না।" তিক্ততা ঝরে পড়ল গ্রুশেন্‌কার কণ্ঠে।

"ইচ্ছে করে কী রকম?" আলিয়োশা জানতে চাইল।

“আচ্ছা বোকা তো তুমি আলিয়োশা! তোমার যত বুদ্ধিই থাক না কেন, মোদ্দা কথাটা হল এই যে এ ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ কিছুই বোঝ না তুমি। আমি এই ভেবে মনে দুঃখ পাচ্ছি না যে আমার মতো একটা মেয়ের জন্য ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছে। ওর মনের মধ্যে যদি ঈর্ষা না জাগত তাতে বরং মনে মনে দুঃখই পেতাম। আমার স্বভাবটাই এরকম। আমার দুঃখটা ওর ঈর্ষার জন্য নয়। আমার নিজের মনটা কঠিন, কিন্তু আমিও ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়ি। আমার দুঃখ শুধু এখানে যে ও আমাকে মোটে ভালোবাসে না। আমার কথা হল এখন ও ইচ্ছে করে ঈর্ষার ভাব দেখাচ্ছে। আমার কি চোখ নেই? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না? ও আমাকে এখন হঠাৎ শোনাচ্ছে ওই কাতেরিনাটার কথা ও এই, ও সেই—এই রকম সব কথা বলছে, বলছে ‘ও আমাকে বাঁচাতে চায়, তাই মস্কো থেকে আদালতে আমার জন্য একজন ডাক্তারকে আনিয়েছে, একজন প্রথম সারির, মস্ত পণ্ডিত অ্যাডভোকেটকেও আনিয়েছে।” চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে আমার মুখের ওপর যখন ওর প্রশংসা শুরু করে দিয়েছে তার মানে ওকে ভালোবাসে! ও নিজেই আমার কাছে অপরাধী, ও যে আমার এমন নেওটা হয়ে পড়ল তার কারণ ওর মতলব ছিল আগে আমার দোষটা ধরা, একা আমার ঘাড়েই সবটা দোষ চাপিয়ে দেওয়া। বলতে চায়, ‘তুমি আগে ছিলে ওই পোলটার সঙ্গে, তাই কাতিয়ার সঙ্গে ‘আমার এই সম্পর্কটাকেও প্রশ্রয় না দেবার কী আছে?’ আমি তো এটাই বুঝি। একা আমার ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিতে চায়। ইচ্ছে করে, একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো এমন নেওটা হয়ে পড়েছে — এ আমি তোমাকে বলে দিলাম। তবে আমি...”

গ্রুশেন্‌কা তার কথা শেষ করল না, সে যে কী করবে তা বলল না। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

“কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে ও ভালোবাসে না”, আলিয়োশা দৃঢ়স্বরে বলল।

“বেশ, ভালোবাসে কি না বাসে সেটা আমি শিগ্‌গিরই জানতে পারব”, চোখের ওপর থেকে রুমাল সরিয়ে নিয়ে সে বলল। তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল হুমকির সুর। মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। তার যে চাউনির মধ্যে এতক্ষণ একটা বিনম্র শান্ত প্রফুল্ল ভাব ছিল তা হঠাৎ পালটে গিয়ে থমথমে ও হিংস্র হয়ে উঠেছে দেখে আলিয়োশার দুঃখ হল।

‘যাক গে, অনেক হয়েছে ওসব আজেবাজে কথা,” হঠাৎ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে রুক্ষস্বরে সে বলে উঠল। “তোমাকে যে ডেকে পাঠিয়েছি তা কিন্তু মোটেই এ কারণে নয়। আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি আমার, কাল—কী হবে কাল, বল তো? ঠিক এই কথা ভেবেই আমি কষ্ট পাচ্ছি! একমাত্র আমি, আমিই এই যন্ত্রণাটা ভোগ করছি! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি সবাইকে, কেউই এই নিয়ে ভাবছে না। কারও কোনও গরজ নেই। অন্তত তুমি কি এই নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা করছ? কালই যে বিচার হবে! আমায় বল তো ওরা ওকে কী ভাবে বিচার করবে? খুন তো

করেছে ওই চাকরটা, চাকরটা করেছে, চাকরটাই খুন করেছে! হা ভগবান! তাহলে কি ওই চাকরটার অপরাধে ও দোষী সাব্যস্ত হবে? ওর পক্ষ নিয়ে কি কেউ দাঁড়াবে না? ওটাকে, ওই চাকরটাকে ত কেউ এতটুকু ঘাঁটালও না—তাই না?"

"তাকে ভালোমতো জেরা করা হয়েছিল", আলিয়োশা চিন্তিত ভাবে বলল, "কিন্তু সকলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলো যে সে খুন করেনি। এখন সে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। সেই তখন থেকে অসুস্থ, সেই ফিটের ব্যামো। বাস্তবিকই অসুস্থ", আলিয়োশা যোগ করল।

"হা ভগবান! তা তুমি নিজে সেই অ্যাডভোকেটের কাছে একবার গেলেও ত পারতে, সামনা সামনি তাকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারতে। আরে বাবা, লোকে ত বলছে পেতের্বুর্গ থেকে তাকে তিন হাজার রুবল দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে — তাই নয় কি?"

"আমরা তিনজনে মিলে ওই তিন হাজার দিয়েছি—আমি, দাদা ইভান আর কাতেরিনা ইভানভ্না। আর যে ডাক্তারটিকে মস্কো থেকে আনা হয়েছে তার জন্য দু হাজার কাতেরিনা ইভানভ্না নিজেই দিয়েছেন। অ্যাডভোকেট ফেতিউকভিচ্ হয়তো আরও বেশিই নিতেন, কিন্তু এই মামলাটা সারা রাশিয়ায় সোরগোল ফেলে দিয়েছে, সমস্ত পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে কথা হচ্ছে, ফেতিউকভিচ্ বেশি করে আসতে রাজি হয়েছেন খ্যাতির কথা ভেবে, কেননা এরই মধ্যে মামলাটা বড়ো বেশি বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। গতকাল ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

"তারপর? তুমি তাঁকে বলেছিলে?" ঝট করে গা ঝাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল গ্রুশেন্কা।

"উনি মন দিয়ে সব কথা শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। বললেন ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তাঁর নির্দিষ্ট একটা মত গড়ে উঠেছে। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমার কথাগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।"

"বিবেচনা করে দেখবেন মানে! ওগুলো সব একেকটা ঠকবাজ! ওর সর্বনাশ করে ছাড়বে! বেশ, কিন্তু ডাক্তার? ডাক্তারকে ডেকে আনতে গেল, শুনি?"

"একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে। প্রমাণ করতে চাইছে দাদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং উন্মাদ অবস্থায় কী করছে না করছে বুঝতে না পেরে খুন করেছে", মৃদু হেসে আলিয়োশা বলল। কিন্তু দাদা এতে রাজি হচ্ছে না।"

"আহা, সেটা তো সত্যিই, যদি সে খুন করত!" গ্রুশেন্কা চিৎকার করে উঠল। "মাথাটা ওর গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তখন, একেবারে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল আর সে ব্যাপারে দোষী যদি কেউ হয়ে থাকে সে আমি, হতচ্ছাড়া আমিই দোষী! কিন্তু কথাটা এই যে খুন তো ও করেনি, ও খুন করেনি! অথচ সবাই, শহরসুদ্ধ সকলে ওর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এমনকি ফেনিয়া যে ফেনিয়া সেও যা এজাহার দিল তা থেকে এটাই বেরিয়ে আসছে যেন ও-ই খুন করেছে। তাছাড়া দোকানের

লোকজন, ওই সরকারি আমলাটি আর তারও আগে সরাইখানাতেও লোকে ওকে এই কথা বলতে শুনেছিল! সবাই ওর বিরুদ্ধে, সবাই। কেউই ওর বিরুদ্ধে বলতে ছাড়ছে না।"

"হ্যাঁ, সাক্ষ্যপ্রমাণের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মারাত্মক আকার নিয়েছে", বিষণ্ণভাবে আলিয়োশা মন্তব্য করল।

"আর গ্রিগোরি—গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ—সে ত নিজের গোঁ ধরে বসে আছে, বলছে দরজা নাকি খোলা ছিল, তার সেই এক কথা—নিজের চোখে দেখেছে। এক চুল নড়ানোর উপায় নেই। আমি তার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, নিজে তার সঙ্গে কথাও বলেছি। উপরন্তু গালিগালাজ করছে, মুখে যা আসছে তা-ই বলছে!"

"হ্যাঁ, এটা সম্ভবত দাদার বিরুদ্ধে সব চাইতে জোরাল এজাহার", আলিয়োশা বলল।

"আর যদি বল মিতিয়া পাগল হয়ে গেছে তাহলে বলব, এখন ও ঠিকই তাই", বিশেষ ধরনের কেমন যেন একটা উদ্বেগের সঙ্গে এবং একটা রহস্যজনক ভাব নিয়ে গ্রুশেন্‌কা হঠাৎ শুরু করল। "আলিয়োশা, ভাই আমার, জান, অনেক দিন হল তোমাকে এটা বলব-বলব করছিলাম। ওর কাছে রোজ যাচ্ছি, ওকে দেখে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাকে বল দেখি, তোমার কী মনে হয়? ও এখন এই যে সব কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে সেগুলো কী নিয়ে? বকেই চলেছে, বকেই চলেছে—মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। ভাবি, হতে পারে বুদ্ধিমানের মতো কিছু বলছে, আমি বোকা বলেই আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। এমনই ভাবি। কেবল কোথা থেকে দুম করে আমাকে বলতে শুরু করে দিল একটা বাচ্চার কথা, মানে কোথাকার কোন্ এক বাচ্চার কথা। ওর কথা 'বাচ্চাটা অমন গরিব কেন?' 'ওই বাচ্চাটার জন্যেই তো আমাকে এখন সাইবেরিয়াতে ঘানি টানতে যেতে হচ্ছে। আমি খুন করিনি, কিন্তু আমাকে সাইবেরিয়া যেতে হচ্ছে!' এটা কী ব্যাপার? কোথাকার বাচ্চা? কিস্যু বুঝতে পারলাম না। কেবল ও যে ভাবে কথাগুলো বলল তাতেই আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। কেন না এত সুন্দর ভাবে বলল যে আমার কান্না পেয়ে গেল। ও নিজে কাঁদল, আমিও কেঁদে আকুল। হঠাৎ ও আমাকে চুমু খেল, আমাকে লক্ষ করে হাতের ইঙ্গিতে ক্রুশচিহ্ন এঁকে আমার মঙ্গল কামনা করল। এটা কী ব্যাপার? আলিয়োশা, তুমি আমায় বল দেখি, কোথা থেকে এলো ওই 'বাচ্চা'?

"এটা রাকিতিনের কাজ হবে—আজকাল ওর কাছে যাওয়াটা রাকিতিনের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে", বলতে বলতে আলিয়োশা হাসল। "যদিও অবশ্য... নাঃ রাকিতিনের কাজ নয় এটা। গতকাল আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম, আজও যাব।"

"না, রাকিতিন ছোঁড়ার কাজ নয়। তোমাদের ভাই ইভান ফিয়োদরভিচই ওর মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছে। ও মিতিয়াকে দেখতে যাচ্ছে বলেই এরকম হচ্ছে—আমার

তো তা-ই মনে হয় " বলতে বলতে গ্রুশেন্‌কা আচমকা মুখ বন্ধ করে ফেলল। আলিয়োশা স্তম্ভিত হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"যাচ্ছে মানে? বলতে চাও ওর কাছে গিয়েছিল? মিতিয়া নিজে আমাকে বলেছে ইভান একবারও আসেনি।"

"দেখ কাণ্ড! দেখ দেখি কী মেয়ে আমি! কথায় কথায় বেরিয়ে গেল!" অপ্রতিভ হয়ে গ্রুশেন্‌কা বলে উঠল, তার চোখমুখ সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠল। "দাঁড়াও আলিয়োশা, চুপ করে থাক! একবার যখন কথায় কথায় বলেই ফেলেছি তখন আর কিছু করার নেই—পুরোপুরি সত্যি কথাটাই বলি। দু বার ওর কাছে গিয়েছিল, সেই তখন, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে। তখন মস্কো থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসেই ছুটেছিল ওর কাছে, আমি তখনও ঠিক অসুস্থ হয়ে পড়িনি। আরেক বার এসেছিল সপ্তাহ খানেক আগে। মিতিয়াকে বলে দিয়েছিল তোমাকে যেন না বলে, একদম না বলে যেন, কাউকেই যেন না বলে। গোপনে এসেছিল।"

আলিয়োশা বসে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল, মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগল। দেখে মনে হল এ সংবাদে সে স্তম্ভিত।

"মিতিয়ার মামলার বিষয়ে ভাই ইভান আমার সঙ্গে কোনও কথা বলে না", ধীরে ধীরে সে বলল। "তাছাড়া মোটের ওপর গত দু মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে কথা সে খুব কমই বলেছে। আমি তার কাছে এলে সব সময় দেখতাম আমি এসেছি বলে সে অসন্তুষ্ট, তাই তিন সপ্তাহ হল আমি তার কাছে আর যাই না। হুম্ যদি এক সপ্তাহ আগে সে গিয়ে থাকে, তাহলে এই এক সপ্তাহের মধ্যে মিতিয়ার বাস্তবিকই কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে

"পরিবর্তন, পরিবর্তনই বটে!" আলিয়োশার কথার খেই ধরে দ্রুত বলে উঠল গ্রুশেন্‌কা। "ওদের নিজেদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা আছে, কোনো একটা গোপনীয়তা ছিল! মিতিয়া আমাকে নিজের মুখে বলেছে, একটা গোপন রহস্য ছিল! আর জান আলিয়োশা, সেটা এমনই যে মিতিয়াকে কোনো মতে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। আগে ও কেমন হাসিখুশি ছিল, অবশ্য এখনও হাসিখুশি, তবে জানই তো যখন ওই মাথা নাড়াতে শুরু করে আর ঘরময় পায়চারি করতে থাকে, ডান হাতের এই যে এই আঙুলটা দিয়ে রগের চুল ধরে টানতে থাকে, তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি ওর মনটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে ঠিক টের পাই! ছিল তো হাসিখুশিই, আজও হাসিখুশিই ছিল!"

"তবে যে তুমি বললে ও তিরিক্ষি হয়ে আছে?"

"হ্যাঁ, তিরিক্ষি, আবার হাসিখুশিও। একেবারে তিরিক্ষি—তবে সেটা মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই আবার হাসিখুশি, তারপর হঠাৎ আবার তিরিক্ষি। জান আলিয়োশা, আমি ওকে যত দেখি ততই অবাক হয়ে যাই সামনে এরকম একটা বিভীষিকা,

অথচ তা সত্ত্বেও সময় সময় এমন সব তুচ্ছ ব্যাপারে হো হো করে হেসে উঠছে, যেন ও নিজেই ঠিক একটা বাচ্চা ছেলে।”

“এটা তাহলে সত্যি যে ইভান সম্পর্কে আমাকে বলতে মানা করে দিয়েছিল? ‘বোলো না’—এই কথাই বলেছিল?”

“‘বোলো না’—এই কথাই বলেছিল। ওর—আমাদের মিতিয়ার যত ভয় তোমাকে। কারণ ওটা গোপনীয়, নিজেই বলেছে গোপনীয় তাই বলছি কি আলিয়োশা, লক্ষ্মীটি আমার, একবার যাও, গিয়ে জেনে এসো, কী ওদের সেই গোপন বিষয়। তারপর আমার কাছে এসে বল”, হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে কাতর কণ্ঠে আলিয়োশাকে অনুনয় করল গ্রুশেন্‌কা। “হতভাগিনী আমার কথা ভেবে একটা কিছু কর ভাই, যাতে আমার এই পোড়া কপালে কী আছে আমি জানতে পারি! এই জন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।”

“তুমি ভাবছ এর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে? তা-ই যদি হত তাহলে গোপন একটা কিছু যে আছে সে কথা তো তোমার সাক্ষাতে বলতই না।”

“জানি নে। বলা যায় না, এমনও হতে পারে যে আমাকে ও বলতেই চায়, কিন্তু বলতে সাহস করছে না। সাবধান করে দিচ্ছে। বলতে চায় গোপন বিষয় একটা আছে, কিন্তু সেটা কী তা আর বলল না।”

“তা তোমার নিজের কী মনে হয়?”

“আমার কী মনে হয়? এটাই মনে হয় যে আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার এই শেষটা ওরা সকলে—ওরা তিনজনে মিলে তৈরি করেছে, কেন না এর মধ্যে তোমাদের ওই কাতেরিনা—কাতিয়াটাও আছে। এ সব ওই কাতিয়াটার কারবার, ওর দিক থেকে আসছে। ‘ওঃ এই রকম সেই রকম’—তার মানে আমি ওর মতো নই। আমাকে আগে থাকতে এ সব কথা বলছে মিতিয়া, আগে থাকতে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দেবার মতলব—গোপন বিষয় বলতে যদি কিছু থাকে সে তো এটাই! মিতিয়া, কাতিয়া আর ইভান ফিয়োদরভিচ্—তিনজনে মিলে এই মতলব ফেঁদেছে। আলিয়োশা, তোমাকে আমি অনেক দিন হল একটা কথা জিগ্‌গেস করব বলে ভাবছিলাম। সপ্তাহ খানেক আগে ও দুম্ করে আমার কাছে একটা রহস্য ফাঁস করল, বলল ইভান নাকি কাতিয়ার প্রেমে পড়েছে, কেন না ঘন ঘন তার কাছে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে। ও আমাকে যেটা বলল সেটা কি সত্যি? আমাকে মেরে ফেল আর কেটে ফেল, তোমার বিবেক বুদ্ধি যা বলে তাই বল।”

“আমি তোমাকে মিথ্যে বলব না। ইভান কাতেরিনা ইভানভ্‌নার প্রেমে পড়ে নি—আমার তা-ই মনে হয়।”

“তা আমারও কিন্তু তখন তা-ই মনে হয়েছিল! আমাকে মিথ্যে বলছে। নির্লজ্জ কোথাকার! এখন আবার আরেকজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ

করে হিংসের ভাব দেখাচ্ছে, যাতে পরে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। ও একটা আচ্ছা বোকা, কোনো জিনিস চেপে রাখতে পারে না, এমনই খোলামেলা, বুঝলে    তবে হ্যাঁ, আমি ওকে ...ওকে আমি ঠিক দেখে নেব! বলে কিনা, 'তুমি বিশ্বাস কর আমি খুন করেছি।' একথা বলে কিনা আমাকে! কাকে? না, আমাকে! এতে তো ও আমাকে নিন্দেই করল! তা সে যাক গে, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করুন! দাঁড়াও না, আদালতে ওই কাতিয়াটার হাল আমি কী করে ছাড়ি দেখে নিয়ো! আমি ওখানে ওকে এমন একটা কথা বলব    না    ওখানে আমি যা যা বলার সব বলব!"

বলতে বলতে আবার সে তিক্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"দেখ গ্রুশেন্‌কা, আমি তোমাকে জোর দিয়ে এটাই বলতে পারি", জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আলিয়োশা বলল, "প্রথম কথা, ও তোমাকে ভালোবাসে, পৃথিবীতে যে কারও চাইতে বেশি ভালোবাসে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই ভালোবাসে—বিশ্বাস কর আমাকে। আমি জানি, আমি ঠিক জানি। দ্বিতীয় যে কথাটা তোমাকে বলব তা এই যে ওর কাছ থেকে ওর গোপন খবর বার করার কোনও চেষ্টা আমি করতে চাই নে। অবশ্য ও যদি আজ নিজে থেকে আমায় বলে তাহলে ওকে সরাসরি এও বলব যে সেটা তোমাকে জানাব বলে আমি তোমায় কথা দিয়েছি। সেক্ষেত্রে আজই তোমার কাছে আসব, এসে জানিয়ে যাব। তবে    আমার কিন্তু মনে হচ্ছে    কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কোনো নামগন্ধ আমি এখানে পাচ্ছি না, অন্য আর কিছু নিয়ে এই গোপনীয়তা। নির্ঘাত তাই। দেখেশুনে একেবারেই মনে হয় না কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে নিয়ে—আমার মন তো তা-ই বলছে। আচ্ছা, আপাতত চলি!"

বিদায় নেবার জন্য গ্রুশেন্‌কার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল আলিয়োশা। গ্রুশেন্‌কা তখনও কেঁদে চলছিল। আলিয়োশা দেখল তার প্রবোধবাক্যে গ্রুশেন্‌কা খুব একটা বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে অন্তত মনের দুঃখ উজাড় করে দিয়েছে, মনের কথা খোলসা করে বলতে পেরেছে—এতে বরং ওর ভালোই হল বলতে হবে। ওকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে আলিয়োশার মায়া হচ্ছিল। কিন্তু তার তাড়া ছিল। সামনে আরও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

## দুই

### পায়ের ব্যথা

এই কাজগুলির প্রথমটি ছিল মাদাম খখ্‌লাকোভার বাড়িতে। আলিয়োশা তাড়াতাড়ি সে দিকে রওনা দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারা, যাতে মিতিয়ার কাছে যেতে দেরি না হয়ে যায়। মাদাম খখ্‌লাকোভা আজ তিন

সপ্তাহ যাবৎ একটু অসুস্থ। কী কারণে কে জানে, তার একটা পা ফুলেছে। বিছানায় শুয়ে থাকেন বটে, তবে দিনের বেলায় তার খাসকামরায় বাড়ির এলোমেলো জামাকাপড় পরেই আধশোয়া অবস্থায় একটা গদিতে পড়ে থাকে। তার সেই জামাকাপড় নজরে পড়ার মতো, তবে শোভনীয়। আলিয়োশা একবার লক্ষ করে দেখেছিল অসুস্থতা সত্ত্বেও মাদাম খখ্‌লাকোভা তার বেশভূষায় অনেকটাই শৌখিন হয়ে উঠেছে কেশসজ্জার ওপর পাট করে পাতা কোথাকার সব লেসের আবরণ, রাজ্যের ফিতে আর যত সব ঢোলা জামা সেগুলির মধ্যে জুটতে দেখে একটা নির্দোষ কৌতুকের হাসিও আলিয়োশার পেয়েছিল। এসব যে কীসের জন্য যদিও সেটা বুঝতে বাকি ছিল না, তবু সে তার এ ধরনের চিন্তাকে অলস মস্তিষ্কের চিন্তা বলেই উড়িয়ে দেয়। প্রসঙ্গত, গত দুমাস হল, পের্‌খোতিন নামে সরকারি আমলা যুবকটিকে মাদাম খখ্‌লাকোভার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

দিন চারেক হল আলিয়োশা ভদ্রমহিলার বাড়িতে যায়নি। বাড়িতে ঢুকেই সটান লিজার কাছে যাবার জন্য আলিয়োশা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যেহেতু তার কাছেই আলিয়োশার একটা কাজ ছিল, কারণ গতকালই লিজা আলিয়োশার কাছে একজন দাসী পাঠিয়ে তাকে একান্ত অনুরোধ জানিয়েছিল 'একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে' সে যেন অতি অবশ্য তার কাছে একবার আসে। লিজার এই অনুরোধ কোনো না কোনো কারণে আলিয়োশার মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু বাড়ির দাসীটি লিজাকে গিয়ে আলিয়োশার আগমন বার্তা জানাবে কি, তার আগেই মাদাম খখ্‌লাকোভা কার কাছ থেকে যেন সে বার্তাটি জেনে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনকে পাঠিয়ে 'মাত্র মিনিটখানেকের জন্য' আলিয়োশাকে তাঁর কাছে আসার অনুরোধ জানাল। আলিয়োশা বিবেচনা করে দেখল প্রথমে 'মামণি'টির অনুরোধ রক্ষা করাটাই বরং ভালো, তা না হলে যতক্ষণ না সে তার কাছে গিয়ে বসছে ততক্ষণ মিনিটে মিনিটে সে লিজার কাছে তলব পাঠাবে। মাদাম খখ্‌লাকোভা একটা গদির ওপর শুয়ে ছিল। কেমন যেন উৎসবের বিশেষ সাজগোজ পরে আছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল রীতিমতো স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে আছে।

"ওঃ কতকাল হয়ে গেল, এক যুগ হয়ে গেল দেখা নেই! পুরো একটা সপ্তাহ—ভেবে দেখুন একবার! ও হ্যাঁ, তাই তো, মাত্র চার দিন আগে, গত বুধবারই তো এসেছিলেন। আপনি লিজের কাছে এসেছিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি পা টিপে টিপে সরাসরি ওর কাছেই যেতে চেয়েছিলেন, যাতে আমি টের না পাই। প্রিয় বন্ধু, আমার পরম প্রিয় বন্ধু আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্, আপনি যদি জানতেন ওর কথা ভেবে আমি কী দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি! তা সে কথা পরে হবে। যদিও এটাই সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার, কিন্তু তাহলেও এ বিষয়ে পরে বলছি। প্রিয় আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমি আপনার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমার লিজেকে আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। মহাস্থবির জোসিমার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি

দিন! " ক্রুশ চিহ্ন এঁকে প্রণাম করতে করতে সে বলল—তাঁর মৃত্যুর পর আমি আপনাকে একজন সন্ন্যাসী হিসেবেই দেখি, যদিও আপনি যে নতুন পোশাক ধরেছেন তাতে আপনাকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। এখানে আপনি এরকম দর্জি পেলেন কোত্থেকে? না, না, এটা বড়ো কথা নয়, সে কথা পরে হবে। আমি যে আপনাকে অনেক সময় আপনার ডাকনাম ধরে আলিয়োশা বলে ডাকি এর জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আমি একজন বুড়ো মানুষ, আমাকে সবই মানায়", চটুল হাসি হেসে সে বলল, "সে যাক গে, ওকথাও পরে হবে খন। বড়ো কথা হল, আসল কথাটা আমার ভুললে চলবে না। দয়া করে আপনি নিজে থেকে আমায় মনে করিয়ে দেবেন। যেই আমি কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে চলে যাব অমনি আপনি আমাকে বলবেন: 'কিন্তু আসল কথাটা?' ওঃ, এখন আমি জানবই বা কী করে, কোন্‌টা সবচাইতে বড়ো কথা! আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, যখন থেকে লিজে ওর প্রতিশ্রুতি—আপনাকে বিয়ে করার ওর ছোটোবেলার সেই প্রতিশ্রুতি—আপনার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিল, তখনই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ওসব ছিল দীর্ঘ কাল চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে থাকা একটা অসুস্থ বাচ্চা মেয়ের নিছক খেলার ছলে এক ধরনের কল্পনাবিলাস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ও এখন হাঁটতে পারছে! এই যে নতুন ডাক্তারটি যাকে কাতিয়া আপনার ওই হতভাগ্য ভাইটির জন্য মস্কো থেকে আনিয়েছে, যাকে কিনা আগামীকাল... আগামীকালের কথা আর কী বলব! আগামীকাল যে কী হবে একমাত্র এই চিন্তাতেই তো আমি মরছি! বড়ো কারণ হল কৌতূহল এক কথায়, সেই ডাক্তার গতকাল আমাদের কাছে এসে লিজেকে দেখে গেছেন। আমি ওঁকে পঞ্চাশ রুবল ভিজিট দিয়েছি। কিন্তু না, কী বলতে কী ছাই বলছি, আবারও অন্য প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। দেখছেন তো, আমি সব কেমন গুলিয়ে ফেলছি। তাড়াহুড়ো করছি। কেন এত তাড়াহুড়ো? জানি নে। আমার এখন এমন অবস্থা যে জ্ঞানবুদ্ধিই লোপ পেয়ে গেছে। সব মিলেমিশে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে আপনি একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পারলে এই এখুনি আমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাবেন, আপনার টিকিটি আমি আর খুঁজে পাব না। হা ভগবান! আমরা এই ভাবে শুধু শুধু বসে আছি কেন? প্রথম কথা হল, কফি নেই কেন? ইউলিয়া, গ্লাফিরা, ওরে তোরা সব গেলি কোথায়? কফি নিয়ে আয়!"

আলিয়োশা ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, যে সে এই মাত্র কফি খেয়ে এসেছে।

"কোথায়?"

"আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নার বাড়িতে।"

"মানে মানে, ওই স্ত্রীলোকটার বাড়িতে! ওঃ সে-ই তো সকলের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। অবশ্য হ্যাঁ, জানি নে বাপু, লোকে বলছে এখন নাকি সাধ্বী হয়েছেন, যদিও বড়োই দেরিতে। আগে হতে পারলে ভালো হত, তখন দরকার ছিল। এখন

এতে আর কী লাভ? চুপ, চুপ, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, কেন না আপনাকে আমার এত কিছু বলার আছে যে আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই বলে উঠতে পারব না। এই ভয়ঙ্কর মামলাটা  আমি অবশ্যই যাব, আমি তৈরি হচ্ছি, আমাকে চেয়ারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। চেয়ারে বসে থাকার মতো অবস্থাও আমার আছে। আমার সঙ্গে লোকজনও থাকবে। আর জানেন, আমি একজন সাক্ষীও বটে। কী ভাবে যে সেখানে কথা বলব, কী ভাবে যে বলব! জানি নে কী বলব। শপথ নিতে হবে—তাই না? তাই তো?"

"হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমার মনে হয় না আপনার পক্ষে সেখানে হাজির হওয়া সম্ভব।

"বসে থাকার মতো অবস্থা আমার আছে। আঃ, আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছেন! ওঃ, এই মামলা, এরকম একটা নৃশংস কাণ্ড, তারপর ওরা সবাই যাচ্ছে সাইবেরিয়ায়, কেউ কেউ আবার বিয়ে শাদি করতে যাচ্ছে—কত তাড়াতাড়ি, কত তাড়াতাড়িই না ঘটতে চলেছে সমস্ত ঘটনা! সব পালটে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত—কিছুই থাকছে না। সকলে বুড়ো হচ্ছে, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সে যাক গে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই যে কাতিয়া—cette charmante personne—এই মনোহারিণীটি আমার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এখন সে আপনার এক ভাইয়ের পিছু পিছু সাইবেরিয়াতে যাবে, আবার আপনার অন্য ভাইটি এই কাতিয়ার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে, ওদের পাশাপাশি কোনো এক শহরে বসবাস করতে থাকবে, ওরা সকলে একে অন্যকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। আমি এই ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বড়ো কথা, এই প্রচারটা  কি পেতের্বুর্গে কি মস্কোয়, সবগুলো কাগজে লক্ষবার এই কাহিনি লেখা হয়েছে। ও হ্যাঁ, ভাবতে পারেন, আমার কথাও লেখা হয়েছে! আমি নাকি আপনার ভাইয়ের পরম বন্ধু ছিলাম। ওই বিশ্রী কথাটা আমি মুখে আনতে চাই নে। কিন্তু ভাবুন তো, ভাবুন দেখি একবার!"

"এ হতে পারে না! কোথায়? কী লিখেছে?"

"এই এখুনি দেখাচ্ছি। গতকাল পেয়েছি, গতকালই পড়েছি। এই যে এখানে, পেতের্বুর্গের কাগজে। এই 'গুজব' এ বছর থেকে বেরোতে শুরু করেছে। আমি 'গুজব' ভারি পছন্দ করি, তাই গ্রাহক হয়েছিলাম। এখন মাথায় বাড়ি। এই ত গুজবের নমুনা। এই যে এখানে, এই জায়গাটা পড়ে দেখুন।"

এই বলে সে বালিশের তলায় রাখা খবরের কাগজের পাতাটা আলিয়োশার দিকে বাড়িয়ে দিল।

এমন নয় যে সে মুষড়ে পড়েছিল সে একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, তার মাথার ভেতরে সব মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজের সংবাদটি ছিল রীতিমতো বৈশিষ্ট্যসূচক এবং বাহুল্য, তার প্রভাবে সে খুবই, অস্বস্তিকর

একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত, ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভবত কোনো একটা বিষয়ের ওপর মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা তার ছিল না। তাই পরক্ষণেই এই খবরের কাগজের প্রসঙ্গটিও বেমালুম ভুলে গিয়ে এক লাফে সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রসঙ্গে চলে যাওয়াটাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র ছিল না।

এই ভয়ঙ্কর মামলার খ্যাতি যে ইতিমধ্যে সারা রাশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আলিয়োশা এটা অনেক দিন হলই জানত। হা ভগবান! দু মাস হয়েছে, এরই মধ্যে আরও সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য খবরের মাঝখানে আলিয়োশা তার ভাইকে নিয়ে, সাধারণভাবে কারামাজ়ভ্দের সম্পর্কে, এমনকি তার নিজের সম্পর্কেও কাগজে কাগজে কত আজগুবি খবর আর লেখালেখিই না পড়েছে! একটা কাগজে এমন কি এও বলা হয়েছিল যে সে নাকি তার দাদার অপরাধের পর আতঙ্কিত হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে ঘরে আগল দিয়ে বসে আছে। আরেকটি কাগজ আবার তার প্রতিবাদ করে উলটে লিখেছে যে আলিয়োশা, তার মঠের মহাস্থবির জোসিমার সঙ্গে যোগসাজস করে সিন্দুক ভেঙে 'মঠ থেকে চম্পট দিয়েছে'। 'গুজব' কাগজের এখনকার এই খবরটার শিরোনাম 'কারামাজ়ভ্ মামলা প্রসঙ্গে, গোচারণ থেকে।' (কী আর করা যাবে! আমাদের এই ছোটো শহরটার এটাই নাম। এত দিন গোপন রেখেছিলাম।) খবরটা সংক্ষিপ্ত, আর মাদাম খখ্‌লাকোভা সম্পর্কে সরাসরি কোনো উল্লেখ এতে নেই। তা ছাড়া মোটের ওপর কারও কোনও নামই প্রকাশ করা হয়নি। কেবল এটাই জানানো হয়েছে যে এত ঘটা করে যে অপরাধীটির বিচারের আয়োজন চলছে, ঘৃণ্য ভূমিদাসপ্রথার একজন কট্টর সমর্থক, নিষ্কর্মা এবং নিলর্জ্জ ধরনের সেই লোকটি, আর্মির অবসরপ্রাপ্ত সেই ক্যাপ্টেনটি সময় সময় প্রণয়লীলাতেও ব্যাপৃত থাকত, বিশেষত 'নিঃসঙ্গতাতে মনমরা' কোনো কোনো ভদ্রমহিলাকেও সে প্রভাবিত করেছিল। এই ধরনের 'কোনো এক মনমরা বিধবা ভদ্রমহিলা', যিনি তাঁর এক বয়স্থা কন্যা থাকা সত্ত্বেও সব সময় খুকি সেজে থাকেন, এই লোকটির এমনই মোহে পড়ে যান যে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মাত্র দু ঘণ্টা আগেও তিনি তাকে এই শর্তে তিন হাজার রুবল দিতে চেয়েছিলেন যে সে তাঁকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ গোপনে স্বর্ণখনি অঞ্চলে পালিয়ে যাবে। কিন্তু দুর্বৃত্তটি বিবেচনা করে দেখল তার এই মনমরা মহিলাটির চল্লিশ বছর বয়সের মাধুর্যের আকর্ষণে পড়ে তাকে নিয়ে কষ্ট করে সাইবেরিয়াতে না গিয়ে যে কাজটা করলে বরং আরও ভালো হয় এবং শাস্তির হাত এড়িয়ে যেটা করা যায় বলে ভরসা করা যেতে পারে তা হল বাপকে খুন করে ওই তিন হাজার রুবলই লুটে নেওয়া। এই কৌতুকপূর্ণ লেখাটির উপসংহারে—যেমন হওয়া উচিত—পিতৃহন্তা আর এক কালের ভূমিদাসপ্রথার অনৈতিকতা সম্পর্কে উদার মনের প্রবল ক্ষোভ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। কৌতূহল সহকারে লেখাটি পড়ার পর আলিয়োশা কাগজের পাতাটা ভাঁজ করে সেটা ফের মাদাম খখ্‌লাকোভার হাতে তুলে দিল।

"তাহলে, কী মনে হয়? আমার কথা নয় কি?" বাধ-বাধ গলায় সে আবার বলল। "অবশ্যই আমার কথা হচ্ছে। ঘটনার এক ঘণ্টা আগে আমি ওকে সোনার খনির কথা বলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—'চল্লিশ বছর বয়সের মাধুর্য'! আরে আমি কি সেই উদ্দেশ্যে বলেছিলাম? এ তো ইচ্ছে করে সব যা তা লিখেছে! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিচারক—এই 'চল্লিশ বছর বয়সের মাধুর্য' কথাটার জন্য তিনি তাকে ক্ষমা করুন, যেমন আমিও ক্ষমা করে দিচ্ছি। কিন্তু এটা এটা কার কাণ্ড জানেন? এ আপনার বন্ধু রাকিতিনের কাণ্ড।"

"হতে পারে", আলিয়োশা বলল, "যদিও এ বিষয়ে আমি কিছু শুনিনি।"

"'হতে পারে' নয়, ওর কাণ্ড, ওরই কাণ্ড! আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম কিনা পুরো ঘটনাটা আপনি জানেন তো—তাই না?"

"আমি জানি আপনি ওকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে যেন আপনার সঙ্গে দেখা না করে। কিন্তু ঠিক কী কারণে—এটা আমি আপনার মুখ থেকে অন্তত শুনিনি।"

"তার মানে ওর মুখে শুনেছেন! তা কী শুনলেন? আমাকে গালমন্দ করছে, কষে গালমন্দ করছে — তাই ত?"

"হ্যাঁ, গালমন্দ করছে। তা ও সবাইকেই গালমন্দ করে। তবে কেন আপনি ওকে বর্জন করেছেন সেটা আমি ওর মুখেও শুনতে পাইনি। তা ছাড়া, মোটের ওপর বলতে গেলে ওর সঙ্গে আমার ইদানীং কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমরা আর বন্ধু নই।"

"বেশ, তাহলে আমি আপনাকে সবই খুলে বলব। আর কিছু করার নেই, আমাকে অনুতাপ করতে হচ্ছে, এই জন্যে যে এখানে এমন একটা বিষয় উঠে আসছে যে ক্ষেত্রে হয়তো দোষটা আমার নিজেরই। তবে সেটা একটা ছোটখাটো, খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, এত ছোটো যে হয়তো তার একেবারেই কোনো অস্তিত্ব নেই। দেখুন বাপু " বলতে বলতে মাদাম খখ্‌লাকোভা হঠাৎ কেমন যেন একটা চটুল ভঙ্গি করলেন, তাঁর ঠোঁটের কোনায় এক ধরনের মধুর অথচ প্রহেলিকাময় হাসি খেলে গেল। "দেখুন, আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন আলিয়োশা, আমি আপনার মা'র মতো না, না, ঠিক তার উল্‌টোটা—আমি এখন আপনাকে আমার বাবার মতো ভেবেই বলছি কেন না এক্ষেত্রে মা কথাটা একদম মানায় না। যাই হোক না কেন, মহাস্থবির জোসিমার কাছে স্বীকারোক্তি করার মতো আর কি—তাই এটাই সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্য, এটাই ঠিক মানায়। এই মাত্র আমি বললাম না, আপনি একজন সন্ন্যাসী। তা কথাটা এই যে এই বেচারি যুবকটি — আপনার বন্ধু রাকিতিন ওঃ ভগবান! আমি তার ওপর ঠিক রাগ করতে পারছি না! আমার রাগ হচ্ছে, রাগে গা জ্বালা করছে ঠিকই, কিন্তু ততটা নয় এক কথায়, এই চপলমতি যুবকটি ভাবতে পারেন! হঠাৎ তার কী বাই মাথায় চেপেছে...

আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রেমে পড়েছে। পরে, পরেই শুধু হঠাৎ আমি লক্ষ করে দেখলাম। কিন্তু গোড়ায়, মানে মাসখানেক আগে সে আমার কাছে ঘন ঘন—প্রায় রোজই যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিল, যদিও তার আগেও আমাদের জানাশোনা ছিল। আমি কিছুই জানি না   শেষকালে হঠাৎ আমার কাছে যেন পরিষ্কার হয়ে এলো এবং আমি অবাক হয়ে লক্ষ করতে লাগলাম। আপনি জানেন, মধুর স্বভাবের, বিনয়ী এবং সম্ভ্রম উদ্রেক করার মতো সেই যে যুবকটি—পিয়োতর ইলিচ পের্‌খোতিন,—যিনি এখানে সরকারি চাকুরিতে বহাল আছেন—গত দু মাস হল তাঁকে আমি আমার বাড়িতে নিয়মিত অভ্যর্থনা জানাতে শুরু করেছি। আপনি তো নিজেই তাঁকে কতবার আমার এখানে দেখেছেন। সম্ভ্রম উদ্রেক করার মতো, রাশভারি স্বভাবের লোক—সত্যি কিনা? রোজ আসেন না, তিন দিন বাদে বাদে একবার করে আসেন, যদিও না হয় রোজই এলেন। আর সব সময় কী পরিপাটি বেশভূষা! মোটকথা, যুবকদের আমি ভালোবাসি, আলিয়োশা। এই যেমন আপনি— এরকম প্রতিভাবান ও বিনয়ী যুবকদের আমি ভালোবাসি। বুদ্ধিতে উনি প্রায় একজন রাষ্ট্রনেতা। কী মধুর ওঁর কথা বলার ভঙ্গি! আমি অবশ্যই, অতি অবশ্য ওঁর পদোন্নতির জন্য দরবার করব। উনি ভবিষ্যতে একজন কূটনীতিবিদ হবেন। ওই বিভীষিকাময় দিনটিতে রাতের বেলায় আমার কাছে এসে উনি বলতে গেলে আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেন। এদিকে আপনার বন্ধু রাকিতিন সব সময় এমন বিতিকিচ্ছিরি বুট জুতো পরে আসে আর সটান গালিচার ওপর দিয়ে গটগটিয়ে চলে আসে   এমনকি আমাকে কীসের যেন ইঙ্গিতও দিতে লাগল। একবার তো যাবার সময় আমার হাতে হাত মেলাতে গিয়ে আচমকা ভীষণ জোরে আমার হাতে চাপ দিল। যেই আমার হাতে অমন চাপ দিল অমনি আমার পায়ের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। এর আগেও পিয়োতর ইলিচকে অবশ্য আমার বাড়িতে দেখেছে। বিশ্বাস করুন, কেন কে জানে তাঁকে দেখলেই খোঁচা মেরে কথা বলে, খালি খোঁচা মারে, গজগজ করে। ওরা দুটিতে যখন খেলে তখন আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর মনে মনে হাসি। তা একবার হল কি, আমি একা একা বসে আছি—না, মানে আমি তখন শুয়েই ছিলাম—তা আমি একা একা শুয়ে আছি, এমন সময় এসে হাজির আমাদের মিখাইল ইভানভিচ্—রাকিতিন ভাবতে পারেন! নিয়ে এসেছে তার নিজের লেখা পদ্য—খুবই ছোট্ট, আমার পায়ের ব্যথার ওপর, অর্থাৎ পদ্যে আমার পায়ের ব্যথার বর্ণনা দিয়েছে! দাঁড়ান, দাঁড়ান—কী যেন লিখেছিল?

পদ-পল্লব, পদপল্লব আহা!
ব্যথার বিষে একটু কাবু তাহা

ওই গোছের কিছু। কবিতার বাকিটা আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আমার এখানেই পড়ে আছে। সে আমি আপনাকে পরে দেখাব 'খন। তবে জিনিসটা চমৎকার! খাসা! আর জানেন, শুধু পায়ের কথাই নয়, বেশ নীতিশিক্ষামূলকও

বটে। চমৎকার আইডিয়া! তবে আমি ওটা ভুলে গেছি। এক কথায় এলবামে রেখে দেবার মতো জিনিস। তা বলাই বাহুল্য আমি ওকে ধন্যবাদ জানালাম। দেখেশুনে মনে হল কৃতার্থ হয়ে গেছে। আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছি কি জানাইনি, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন পিয়োতর ইলিচ। সঙ্গে সঙ্গে মিখাইল ইভানভিচ রাতের অন্ধকারের মতো মুখ কালো করে ভুরু কোঁচকালেন। আমি তো দেখতে পাচ্ছি পিয়োতর ইলিচ কীসে যেন তার বাদ সাধছেন, কারণ কবিতাটার পর তখনই মিখাইল ইভানভিচের অবশ্যই কিছু একটা বলার ইচ্ছে ছিল—এটা আমি মনে মনে ঠিক টের পেয়েছিলাম; কিন্তু পিয়োতর ইলিচ এসে গেলেন। আমিও ঝট করে পিয়োতর ইলিচকে কবিতাটা দেখালাম, কে লিখেছে তা আর বললাম না। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করতে পেয়েছিলেন, যদিও এখন পর্যন্ত স্বীকার করছেন না, বলছেন অনুমান করতে পারেননি, তবে সেটা ইচ্ছে করেই বলছেন। পিয়োতর ইলিচ সঙ্গে সঙ্গে হেসে কুটিপাটি। শুরু হয়ে গেল সমালোচনা। বললেন, 'যত সব ছাইভস্ম ছড়া! কোনো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রের লেখা হবে।' আর জানেন, কী উত্তেজিত হয়ে যে বললেন! এত উত্তেজিত হয়ে বললেন না! তখন আপনার বন্ধুটি কী করল জানেন? কোথায় হেসে উড়িয়ে দেবে তা নয়, দুম করে খেপে উঠল।   আমি ভাবলাম, এই মরেছে, এবারে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে না যায়! সে বলল, 'ওটা আমি লিখেছি। আমি ঠাট্টা করে লিখেছি, কেন না কবিতা লেখাকে আমি একটা নীচতা বলে মনে করি। তবে আমার কবিতাটা ভালো। আপনাদের পুশ্‌কিন মেয়েদের পদপল্লব নিয়ে লিখেছেন, সেজন্য লোকে তাঁর স্মৃতিমূর্তি তুলতে চায়;[১১] কিন্তু আমার কবিতাটার একটা নৈতিক দিক আছে আপনি নিজে ঘৃণ্য ভূমিদাস প্রথার একজন সমর্থক, আপনার মধ্যে মানবতাবোধের কোনো বালাই নেই, আজকের দিনের যে আলোকপ্রাপ্ত অনুভূতি তা উপলব্ধি করার এতটুকু ক্ষমতা আপনার নেই, প্রগতির কোনও ছোঁয়া আপনার লাগেনি। আপনি একজন আমলা, আপনি ঘুষ খান!' আমি তো চিৎকারে চেঁচামেচি করে ওদের কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম। এদিকে পিয়োতর ইলিচকে তো জানেনই—তেমন একটা ভীরুস্বভাবের লোক মোটেই নন, কিন্তু তিনিও এক্ষেত্রে রীতিমতো ভদ্রজনোচিত সুরের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কৌতুকভরে ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শুনলেন এবং ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'আমি জানতাম না। জানলে অমন কথা বলতাম না, বরং প্রশংসাই করতাম।   কবিরা সবাই এরকম বদরাগি হয়ে থাকেন   ' এক কথায়, অত ভদ্রজনোচিত সুরের ছলে কী বিদ্রূপটাই না করলেন। পরে উনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এ সবই ছিল ঠাট্টাবিদ্রূপ। কিন্তু আমি ত ভেবেছিলাম উনি মন থেকেই বলছেন। তা আমি তো শুয়ে আছি—এই যেমন এখন আপনার সামনে শুয়ে আছি—হঠাৎ মনে হল   'আচ্ছা, মিখাইল ইভানভিচ্ এই যে আমার বাড়িতে এসে আমারই অতিথির ওপর এমন অভদ্রের মতো চোটপাট

করছে এর জন্য তাকে যদি বের করে দিই সেটা সঙ্গত হবে, কি হবে না?' তারপর বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, শুয়ে শুয়ে চোখ বুজলাম, চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম কাজটা সঙ্গত হবে কিনা। সে যে কী মর্মান্তিক! কী মর্মান্তিক যে সেই জ্বালা! বুক ধড়ফড় করতে লাগল। মনস্থির করতে পারছি না। ভাবছি, চেঁচাব, কি চেঁচাব না? আমার ভেতরের একটা কণ্ঠস্বর বলছে 'চেঁচাও, আবার অন্যটি বলছে 'না, চেঁচিয়ো না!' যেইমাত্র দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি এই কথা বলল অমনি আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আর হঠাৎই মূর্ছা গেলাম। তা, বলাই বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে হুলস্থূল কাণ্ড। এমন সময় আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম, মিখাইল ইভানভিচ্‌কে বললাম 'আপনাকে বলতে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি না বলে পারছি না, আমার বাড়িতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর আর অভিলাষ আমার নেই।' দিলাম ভাগিয়ে! ওঃ, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আমি নিজে জানি যে একটা বাজে কাজ করে ফেলেছি। যা করেছি সব মিথ্যে। আমি ওর ওপর মোটে রাগ করিনি। আসল কথা, হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল এটা করলে বেশ ভালো হবে, দৃশ্যটা বেশ জমবে। তবু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, দৃশ্যটা কিন্তু বেশ স্বাভাবিক হয়েছিল, কেন না আমি পর্যন্ত কেঁদে আকুল হলাম, এর পর কয়েক দিন ধরে কাঁদলাম, তারপর হঠাৎ এক দিন ডিনারের পর সব বেমালুম ভুলে গেলাম। আজ এই দু সপ্তাহ হয়ে গেল আপনার বন্ধু রাকিতিন আর আসছে না। আমি খালি ভাবছিলাম তাহলে কি আর একেবারেই আসছে না? গতকাল অবধি এরকমই ভাবছিলাম। এমন সময় সন্ধ্যাবেলায় এলো এই 'গুজব' কাগজটা। পড়ে তো আমি হাঁ হয়ে গেলাম। কে এরকম লিখতে পারে? কে আর হবে? ও-ই লিখেছে। তখনই বাড়ি ফিরে গিয়ে বসে লিখে ফেলেছে। লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওরাও ছাপিয়ে দিয়েছে। দেখুন, এটা হয়েছিল দু সপ্তাহ আগে। কিন্তু আলিয়োশা, আমি ভয়ানক ভয়ানক সব কথা বলে যাচ্ছি! অথচ যা বলা দরকার তা আদৌ বলছি না—তাই না? ওঃ! কথাগুলো যে আপনা আপনিই বেরিয়ে আসছে!"

"সময়মতো ভাইয়ের কাছে যেতে পারা আজ আমার ভীষণ দরকার", আলিয়োশা আমতা-আমতা করে বলল।

"ঠিক! ঠিক কথা! আপনি আমাকে সব মনে করিয়ে দিলেন! আচ্ছা বলুন তো, মুহূর্তের মনোবিকার ব্যাপারটা কী?"

"কীসের মুহূর্তের মনোবিকার?" আলিয়োশা অবাক হয়ে গেল।

"আইনের পরিভাষায় যাকে বলে। যার বলে সব অপরাধের মার্জনা হয়ে যায়। আপনি যা-ই করুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেয়ে যাবেন।"

"কিন্তু আপনি কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলছেন?"

"প্রসঙ্গটা? বলছি তাহলে। এই কাতিয়া মেয়েটি আহা, ভারি মিষ্টি! ঈশ্বরের এক অপূর্ব সৃষ্টি! কিন্তু আমি কোনোমতেই জানতে পারলাম না ও কার প্রেমে

পড়েছে। এই কিছু দিন আগে আমার কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ বসেও ছিল কিন্তু কিছুই টেনে করতে পারলাম না। বিশেষত আজকাল নিজে থেকে আমার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা শুরু করে সেগুলো সবই ওই ওপর-ওপর। এক কথায়, খালি আমার স্বাস্থ্যের কথা—এর বেশি কিছু নয়, আর এমন সুরে কথা বলে না তা আমি মনে মনে নিজেকে বলি 'যাক গে, আমার আর কী! ও হ্যাঁ, সেই 'মুহূর্তের মনোবিকারের' কথা হচ্ছিল না! সেই ডাক্তার ত এসে গেছেন। আপনি জানেন যে ডাক্তার এসে গেছেন? ও তাই তো, আপনি জানবেন না তো কে জানবে? সেই যে যে-ডাক্তার পাগল চিনতে পারেন—আপনিই ত লিখে ডেকে এনেছেন—মানে, আপনি নন, কাতিয়া! এ সবই কাতিয়া করেছে! দেখুন দেখি, একটা লোক বসে আছে, পাগল না কিছু না—হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই মুহূর্তের মনোবিকার ঘটে গেল তার। লোকটা জ্ঞান হারায়নি, কী করছে তা সে জানে, অথচ সাময়িক মনোবিকারের ঘোরে আছে। তা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের ক্ষেত্রেও সম্ভবত এই রকমই মুহূর্তের মনোবিকার ঘটেছিল। বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের পর এখন যে নতুন বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন হল সেখানে এই মুহূর্তের মনোবিকার বস্তুটির সন্ধান মিলল। এটা নতুন বিচার ব্যবস্থার একটা মহৎ কাজ। এই যে ডাক্তারটি, তিনি এখানে এসেছিলেন, সে দিনের সেই সন্ধ্যার কথা এবং সোনার খনির ব্যাপারেও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, জানতে চাইলেন আমি তাকে তখন কী রকম দেখেছিলাম। মুহূর্তের মনোবিকার না ত কী বলব?—এসেই চিৎকার চেঁচামেচি টাকা, টাকা, তিন হাজার দাও, তিন হাজার! তারপর চলে গেল এবং তার পরক্ষণেই খুন করল। বলেছিল, খুন করতে চাইনে, চাইনে, কিন্তু দুম্ করে করে ফেলল। ঠিক এই কারণে, এই এটার জন্যেই তো ওকে অব্যাহতি দেবে যে প্রতিরোধ করেছিল, কিন্তু খুন করে ফেলল।"

"কিন্তু খুন তো ও করেনি", কতকটা রূঢ়ভাবে তাকে বাধা দিয়ে বলল আলিয়োশা। উদ্বেগ ও অসহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর তাকে বেশি করে পেয়ে বসতে লাগল।

"সে আমি জানি। খুন করেছে ওই বুড়ো গ্রিগোরি

"গ্রিগোরি? সে কী করে হয়?" অস্ফুট চিৎকার করে উঠল আলিয়োশা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই গ্রিগোরিই করেছে। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ ওকে ঘা মারতে ও পড়ে গিয়েছিল, পড়ে শুয়েই ছিল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যখন দেখতে পেল দরজাটা খোলা তখন ভেতরে ঢুকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে খুন করল।"

"কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্যে?"

"মুহূর্তের মনোবিকার ঘটে গিয়েছিল। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ যেই ওর মাথায় ঘা মারলেন তারপর ও হুঁশ ফিরে পেল বটে, কিন্তু ওই আঘাতে ওর সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল সটান গিয়ে খুন করল। আজ সে যে নিজে বলছে খুন করে নি, তার কারণ—সম্ভবত সে মনেই করতে পারছে না। শুধু দেখুন, একটা

কথা: ভালো হবে, অনেক বেশি ভালো হবে যদি দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ খুন করে থাকেন। হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক তাই-ই, যদিও আমি বলছি গ্রিগোরি করেছিল। কিন্তু নির্ঘাত দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ করেছিলেন, আর সেটা অনেক ভালো, অনেক বেশি ভালো! আরে না, ভালো এই কারণে নয় যে ছেলে তার জন্মদাতা বাপকে হত্যা করবে, আমি এ কাজের প্রশংসা করছি না। বরং সন্তানের উচিত তার মা বাবাকে শ্রদ্ধা করা। তা সত্ত্বেও যে বলছি যদি উনি হন তাহলে বরং আরও ভালো, সেটা শুধু এই কারণে যে তাহলে আপনার কাঁদার মতো কিছু থাকবে না, যেহেতু তিনি খুন করেছিলেন অচেতন অবস্থায়, অথবা আরও ভালো করে বলা যায় তার চেতনা ছিল কিন্তু জানতেন না কী করে এমনটা হল। না, বিচারে যদি উনি ছাড়া পেয়ে যান, সেটা হবে খুবই মানবিক, লোকে দেখুক নতুন বিচারব্যবস্থা কত বড়ো আশীর্বাদ। আমি কিন্তু এ বিষয়ে জানতামই না, অথচ শুনতে পাচ্ছি এটা বহুকাল আগে থেকে হয়েছে। গতকাল যেই জানতে পারলাম তখন আমি এমন বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম যে তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে আপনাকে ডেকে আনতে চেয়েছিলাম। তারপর, যা বলছিলাম, আদালত যদি ওঁকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে উনি যেন আদালত থেকে সটান আমার বাড়িতে ডিনার করতে চলে আসেন, আমি ইতিমধ্যে আমার চেনা পরিচিতদের ডেকে আনব, আমরা নতুন বিচারব্যবস্থার সম্মানে পান করব। আমার মনে হয় না এখানে উনি বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেবেন। তাছাড়া আমি অবশ্য অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাব, যাতে উনি যদি তেমন কিছু করেন তাহলে যে-কোনো সময়ে ওঁকে বের করে দেওয়া যেতে পারে। তারপর উনি অন্য কোনো শহরে কোথাও শান্তিরক্ষা আদালতের বিচারপতি বা ওই গোছের কিছু হতে পারেন, কারণ যাঁরা নিজেরা এক কালে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছেন তাঁরাই সকলের ভালো বিচার করতে পারেন। আর বড়ো কথা, আজকাল কেই বা মুহূর্তের মনোবিকারে না ভুগছে?—আপনি, আমি—সবাই ভুগছি। এর কত দৃষ্টান্ত চাই? এই ধরুন না কেন, একটা মানুষ দিব্যি বসে বসে গান গাইছে, এমন সময় হঠাৎই কিছু একটা তার পছন্দ হল না—অমনি পিস্তল তুলে নিয়ে যাকে সামনে পেল তাকে লক্ষ করেই গুলি চালিয়ে খুন করে বসল, পরে তার সাতখুন মাফ হয়ে গেল। আমি এটা এই কিছুদিন আগে পড়েছি, ডাক্তাররা সকলেই এটা সমর্থন করেছেন। ডাক্তাররা এখন সমর্থন করেন, যে কোনো জিনিস সমর্থন করেন। এই তো দেখুন না, আমার লিজে একটা মনোবিকারের মধ্যে আছে। গতকালও আমি ওর জন্য কেঁদেছি, আজ এই নিয়ে তিন দিন হল কেঁদেছি। কিন্তু আজই অনুমান করতে পারলাম এ সবেরই কারণ স্রেফ ওর মুহূর্তের মনোবিকার। ওঃ লিজের কথা ভেবে আমি কী কষ্টই যে পাচ্ছি! আমার মনে হয় ওর মাথাটা একেবারে গেছে। আপনাকে ডেকেছে কেন? ও কি আপনাকে ডেকেছে, না আপনি নিজেই ওর কাছে এসেছেন?"

"হ্যাঁ ও আমাকে ডেকেছে! আমি এখন ওর কাছে যাব।" এক রকম মনস্থির করেই আলিয়োশা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আহা, আমার প্রাণের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্ আমার! বড়ো কথাটা হয়তো এখানেই", চিৎকার করে বলে উঠে মাদাম খখ্‌লাকোভা হঠাৎ কেঁদে ফেলল। "ঈশ্বর সাক্ষী, লিজের ব্যাপারে আমি আন্তরিক ভাবে আপনার ওপর আস্থা পোষণ করছি। ও যে মা'র কাছ থেকে লুকিয়ে গোপনে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু আমাকে মাফ করবেন, আপনার ভাই ইভান ফিয়োদরভিচকে তাই বলে আমার মেয়ের ব্যাপারে আমি অত সহজে বিশ্বাস করতে পারি না, যদিও তাঁকে আমি এখনও মহিলাদের স্বার্থরক্ষাকারী সেবাব্রতী বীর যুবক বলে গণ্য করি। ভেবে দেখুন দেখি, একবার আচমকা লিজের কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন, অথচ আমি তার বিন্দুবিসর্গ জানতাম না!"

"কী? সে কী রকম? কবে?" ভীষণ অবাক হয়ে গেল আলিয়োশা। তবে আর বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে লাগল।

"সে কাহিনি আমি আপনাকে বলব, আর সম্ভবত এই কারণেই আমি আপনাকে ডেকেছি, কেন না আমি ঠিক জানিও না কীসের জন্য আপনাকে ডেকেছি। তাহলে শুনুন। মস্কো থেকে ফেরার পর ইভান ফিয়োদরভিচ্ মোট দু বার আমার কাছে এসেছিলেন। প্রথমবার এসেছিলেন একজন পরিচিত ব্যক্তি হিসেবে সাক্ষাৎ করতে, এর পর—সেটা অবশ্য এই কিছু দিন আগে—যখন কাতিয়া আমার বাড়িতে বসে ছিল। কাতিয়া আমার কাছে আছে জানতে পেরেই উনি এসেছিলেন। ঘন ঘন সাক্ষাৎ করতে আসবেন এমন দাবি আমার অবশ্যই ছিল না, কেন না আমি জানতাম অমনিতেই তাঁর এখন কত ঝামেলা। vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de votre papa.* কিন্তু হঠাৎ জানতে পারলাম উনি আবার এসেছিলেন, তাও আবার আমার কাছে নয় এসেছিলেন লিজের কাছে, এই দিন ছয়েক আগে। এসে মিনিট পাঁচেক বসে থেকে উঠে চলে গিয়েছিলেন। পুরো তিন দিন কেটে যাবার পর এ খবরটা আমি জানতে পারি—গ্লাফিরার কাছ থেকে, তাই এটা আমাকে হঠাৎ একটা আঘাত দিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ লিজেকে ডেকে পাঠালাম। সে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'উনি ভেবেছিলেন তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই আমার কাছে এসে তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। অবশ্যই, এমনটাই ঘটেছিল। কিন্তু লিজে, লিজে হা ভগবান! ও আমাকে কী ভোগানোই না ভোগাচ্ছে! একবার কল্পনা করুন, এক দিন রাতে হঠাৎ ওর কী যে হল—চার দিন আগেকার কথা, সেই শেষবার যখন আপনি এসে চলে গেলেন তার ঠিক পরেই—হঠাৎ রাতের বেলায় মূর্ছা গেল। আর্তনাদ, চিলচিৎকার, হিস্টিরিয়া! বলি, আমার কখনও হিস্টিরিয়া

---

আপনি বুঝতে পারছেন এই ব্যাপারটা আর আমার বাবার ভয়ঙ্কর মৃত্যু (ফরাসি)

হয় না কেন? তারপর পরের দিন আরও এক দফা মূর্ছা, তৃতীয় দিনে আরও একবার, গতকালও। শেষ কালে গত কাল এই সাময়িক মনোবিকার। হঠাৎ আমার ওপর চেঁচামেচি 'ইভান ফিয়োদরভিচ আমার দু চক্ষের বিষ। আমি বলে দিচ্ছি ওঁকে এখানে আসতে দেবে না, এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না!' ঘটনার আকস্মিকতায় আমি একেবারে স্তম্ভিত। 'অমন একজন গুণবান যুবক, যাঁর অত পাণ্ডিত্য, যাঁকে এত বড়ো একটা দুর্ভাগ্য বহন করতে হচ্ছে, তাঁকে আমি মানা করি কী করে বলুন তো? কারণ হাজার হোক, এই সমস্ত ঘটনা দুর্ভাগ্য বৈ সুখের তো আর নয় — সত্যি কি না?' আমার কথায় ও হঠাৎ এমন হেসে গড়িয়ে পড়ল না! বলব কি, অপমানিতই বোধ করলাম। আবার মনে মনে আনন্দও হল এই ভেবে ওকে হাসাতে পেরেছি এবং ওর এই ঘোরটা এখন কেটে যাবে। তা ছাড়া ইভান ফিয়োদরভিচ যে আমার সম্মতি ছাড়া এরকম অদ্ভুত ভাবে আমার বাড়িতে এসে সাক্ষাৎ দিচ্ছেন এর জন্য আমার নিজেরও অবশ্য তাঁকে মানা করে দেবার এবং তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ত দাবি করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই আজ সকালেই দেখুন, লিজার যখন ঘুম ভাঙল তখন ইউলিয়ার ওপর এমন খেপে গেল, ধারণা করতে পারেন, ওর গালে চটাস করে চড় কষিয়ে দিল! কী পৈশাচিক কাণ্ড বলুন তো! আমি আমার বাড়ির কাজের মেয়েদের সম্মান দিয়ে কথা বলে থাকি। হঠাৎ ঘণ্টা খানেক বাদে কী মতি হল ইউলিয়াকে জড়িয়ে ধরে তার পায়ে চুমু খেল। আমার ঘরে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে আমার কাছে আর আসছে না এবং ভবিষ্যতেও আসার ইচ্ছে ওর নেই। কিন্তু আমি নিজে যখন আমার এই শরীরটাকে নিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে ওর কাছে গেলাম তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুমু খেতে লাগল, কাঁদতে লাগল। আর চুমু খেতে খেতেই, একটি কথাও না বলে, এমন ভাবে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল! ফলে আমি কিছুই জানতে পারলাম না। এখন লক্ষ্মীটি, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, আপনার ওপরই আমার সমস্ত আশা ভরসা, আর বলাই বাহুল্য, আমার সমস্ত জীবন, আমার ভাগ্য আপনারই হাতে। আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি লিজের কাছে যান, ওর কাছ থেকে সব কিছু ভালো মতো জেনে নিন। একমাত্র আপনিই এটা করতে পারেন। জেনে এসে আমায় বলুন, বলুন আমাকে—"ওর এই মা'টাকে, কেন না, আপনি বুঝতে পারছেন, এসব যদি চলতে থাকে আমি মারা যাব, স্রেফ মারা যাব, নয়তো বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। আমি আর পারছি না। আমার ধৈর্য আছে, কিন্তু আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে

তাহলে কিন্তু সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে যাবে। আরে এই তো! পিয়োতর ইলিচ, শেষকালে এলেন তাহলে!" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মাদাম খখ্‌লানোভা ইলিচ পেত্র্‌খোতিনকে ঘরে ঢুকতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ। "দেরি করে ফেলেছেন, দেরি করে ফেলেছেন!" তিনি বললেন। "বেশ, বেশ, বলুন, বলুন,

কী আছে ভাগ্যে? অ্যাডভোকেট কী বলছেন? কী হল আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ? আপনি আবার কোথায় চললেন?”

“আমি লিজার কাছে যাচ্ছি।”

“ও হ্যাঁ, তাই তো! তাহলে ভুলবেন না, আমি আপনাকে যে অনুরোধ করলাম সেটা ভুলবেন না কিন্তু!” এটা জীবন মরণের প্রশ্ন। আমার ভাগ্য নির্ভর করছে এর ওপর!”

“অবশ্যই ভুলব না, তবে যদি সম্ভব হয় তাহলেই অমনিতেই আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে”, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সরে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলল আলিয়োশা।

“না না,’ যদি সম্ভব হয়’ নয়। নিশ্চয়ই আসবেন, অবশ্যই একবার আসবেন। নইলে আমি মারা যাব!” তার পিছন পিছন চিৎকার করে বলল মাদাম খখ্‌লাকোভা, কিন্তু আলিয়োশা ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

## তিন

## খুদে শয়তান

লিজার ঘরে ঢুকে আলিয়োশা তাকে তার আগেকার সেই হুইল চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় দেখতে পেল। লিজা যখন হাঁটতে পারত না তখন তাকে এই চেয়ারটাতেই বসিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হত। আলিয়োশাকে সামনাসামনি দেখেও কিন্তু লিজা নড়ল, তবে তার তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি আলিয়োশার মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল। চোখের দৃষ্টিতে কতকটা জ্বর জ্বর ভাব, মুখ বিবর্ণ, হলদেটে। তিন দিনের মধ্যে তার এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যে আলিয়োশা তা দেখে বিস্মিত। এমনকি রোগাও হয়ে গেছে। আলিয়োশার দিকে সে হাত বাড়াল না। ছিপছিপে লম্বা লম্বা আঙুলগুলি স্থির হয়ে পোশাকের ওপর পড়ে ছিল। আলিয়োশা নিজে হাত বাড়িয়ে তার করস্পর্শ করল, তারপর চুপচাপ তার মুখোমুখি বসল।

“আমি জানি আপনার জেলখানায় গিয়ে দেখা করার তাড়া আছে”, রুক্ষস্বরে লিজা বলল, “অথচ দুঘণ্টা আপনাকে আটকে রেখে দিল। এখন আপনাকে আমার আর ইউলিয়ার সম্পর্কে বলল।”

“কী করে জানলে?” আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

“আমি আড়ি পেতে শুনেছি। কী হল? অমন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? আমি আড়ি পেতে শুনতে চাই, শুনতে চাই। এতে খারাপের কী আছে শুনি? এর জন্য আমি ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি না।”

"কোন কারণে মন মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে?"

"উঁহু, বরং খুবই আনন্দ হচ্ছে। এই মাত্র, এখুনি এই নিয়ে তিরিশ বার আবারও মনে মনে ভেবে দেখলাম আমি যে আপনাকে 'না' করে দিয়েছি, আমি যে আপনার স্ত্রী হব না এটা কী ভালোই না হয়েছে! আপনি স্বামী হওয়ার যোগ্য নন। আমি আপনাকে বিয়ে করলাম, তারপর দেখা গেল আরেকজন কাউকে ভালোবেসে একটা চিরকুট লিখে আপনার হাতে দিয়ে সেই লোকটাকে দিয়ে আসতে বললাম, আপনি নির্ঘাত সেটা নিয়ে তাকে দিয়ে তো আসবেনই তার উত্তরও নিয়ে আসবেন। আপনার চল্লিশ বছর বয়স হবে, তখনও আপনি সেই আগের মতো আমার প্রেমপত্র বহন করার কাজ চালিয়ে যাবেন।"

সে হঠাৎ হেসে উঠল।

"তোমার মধ্যে কেমন যেন একটা বিদ্বেষের জ্বালা আর সেই সঙ্গে এক ধরনের খোলামেলা ভাবও দেখতে পাচ্ছি।" আলিয়োশা তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

"খোলামেলা ভাব যে দেখছেন সেটা এই কারণে যে আপনাকে আমি লজ্জা পাই না। লজ্জা তো পাই-ই না, পেতে চাইও না — ঠিক আপনাকেই পাই না, আপনি বলেই পাই না। আলিয়োশা, বলুন তো, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি না কেন? আমি আপনাকে খুবই ভালোবাসি, কিন্তু শ্রদ্ধা করি না। শ্রদ্ধা যদি করতাম তা হলে তো লাজলজ্জার বালাই না রেখে বলতাম না। তাই না?"

"তাই।"

"কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার সামনে আমি লজ্জা পাই না?"

"না, বিশ্বাস করি না।"

লিজা আবারও নার্ভাস হয়ে হাসল। সে কথা বলছিল দ্রুত, তাড়াহুড়ো করে।

"আমি জেলখানায় আপনার ভাই দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচকে কিছু মিষ্টি পাঠিয়েছি। আপনি কী চমৎকার আলিয়োশা, আপনি জানেন! আপনি যে এত তাড়াতাড়ি আপনাকে ভালো না বাসার অনুমতি আমাকে দিলেন সে জন্য আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসব।"

"আজ আমায় ডেকে পাঠালে কী কারণে লিজে?"

"আমার ইচ্ছে ছিল আমার একটা বাসনার কথা আপনাকে জানাই। আমার ইচ্ছে কেউ যেন আমাকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেয়, আমাকে বিয়ে করে, তারপর মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, আমাকে প্রতারণা করে, আমাকে ছেড়ে চলে যায়, একেবারে চলে যায়। আমি সুখী হতে চাই নে!"

"অরাজকতাকে ভালোবেসেছ তাহলে?"

"আহা, আমি অরাজকতা চাই! আমার বড়ো সাধ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই। আমি মনে মনে কল্পনা করি পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল হয়। অবশ্যই সেটা চুপিচুপি করতে হবে। লোকে নেভাতে

যাবে, কিন্তু বাড়ি পুড়তেই থাকবে। আমি তো জানি, কিন্তু চুপ করে থাকব। ওঃ কী যাচ্ছেতাই! কী একঘেয়ে!"

বিতৃষ্ণার সঙ্গে সে হাত নাড়ল।

"প্রাচুর্যের জীবন কাটাচ্ছ", আলিয়োশা মৃদুস্বরে বলল।

"তাহলে কি গরিব হওয়া ভালো?"

"তা তো ভালোই।"

"আপনার সেই পরলোকগত সন্ন্যাসীটি এ সব আপনার মাথায় ঢুকিয়েছেন। একথা সত্যি নয়। বরং আমি বড়লোক হব, আর সকলে গরিব হয়ে থাক। আমি মন্ডামিঠাই মাখন ননী খাব, ওদের কাউকে কিছু দেব না। আঃ, বলবেন না, বলবেন না, একটি কথাও বলবেন না", ঝট করে হাত নাড়া দিয়ে সে বলল, যদিও আলিয়োশা মুখই খোলেনি। "আপনি আগেও আমাকে এ সব কথা বলেছেন, এ সব আমার মুখস্থ। বেজার লাগে। আমাকে যদি গরিব হতে হয় তাহলে আমি কাউকে না কাউকে খুন করব—অবশ্য হ্যাঁ, যদি বড়লোকও হই হয়তো তাহলেও খুন করব—এতে লজ্জার কী আছে! জানেন, আমি ফসল কাটতে চাই, খেতে কাজ করতে চাই। আমি আপনাকে বিয়ে করব, আপনি একজন চাষি হবেন, খাঁটি চাষি হবেন। আমাদের একটা বাচ্চা ঘোড়া থাকবে। কী বলেন? আপনি কালাগানভ্‌কে জানেন?"

"জানি।"

"উনি কেবল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান আর স্বপ্ন দেখেন। উনি বলেন, বাস্তবে বেঁচে থাকার কী অর্থ? বরং স্বপ্ন দেখা ভালো। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার মতো সুখ আর কীসে আছে? বাস্তব জীবনটা ত একঘেয়ে। অথচ দেখুন নিজে শিগ্‌গিরই বিয়ে করতে চলেছেন। ইতিমধ্যে আমাকেও প্রেম নিবেদন করেছিলেন। আচ্ছা, আপনি লাট্টু ঘোরাতে জানেন?"

"জানি।"

"তা এই ইনি হলেন একটা লাট্টু। ওঁকে বনবন করে ঘোরাতে হয়, লেত্তি দিয়ে আচ্ছা করে পাকিয়ে পাকিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। ওঁকে বিয়ে করলে সারা জীবন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব। আমার সঙ্গে বসে থাকতে আপনার লজ্জা করছে না?"

"না।"

"আপনি ভয়ঙ্কর রেগে আছেন—কোনো পুণ্য কথা বলছি না। আমি পুণ্যবতী হতে চাই নে। আমি যদি অতি বড়ো পাপ কাজও করি পরলোকে আমার কী হতে পারে? আপনার নিশ্চয়ই এটা সঠিক জানা আছে।"

"ঈশ্বর দণ্ড দেবেন।" আলিয়োশা এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখছিল।

"ঠিক এটাই আমি চাই। আমি সেখানে উপস্থিত হলে আমার দণ্ডবিধান হত, আমিও হঠাৎ ওদের সকলের মুখের ওপর হো-হো করে হেসে উঠতাম। আলিয়োশা,

আমার কিন্তু ভীষণ ইচ্ছে করছে বাড়িতে—আমাদের এই বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দিই। আমার কথায় এখনও আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?”

“কিন্তু কেন? এমন ছেলেপুলে অবশ্য আছে—এই বছর বারো যাদের বয়স—যারা কিছু একটাতে আগুন লাগানোর জন্য উসখুস করে। সেটা তো এক ধরনের রোগ।”

“সত্যি নয়, আপনি ঠিক বলছেন না। না হয় থাকলই অমন ছেলেপুলে, কিন্তু আমার কথা সেটা নয়।”

“তুমি মন্দকে ভালো বলে গ্রহণ করছ। এটা তোমার মনের ক্ষণিকের একটা সঙ্কট। এর জন্য দায়ী সম্ভবত তোমার আগেকার রোগ।”

“যাই বলুন না কেন, আপনি কিন্তু আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছেন। আমার সাফ কথা হল আমি ভালো কিছু করতে চাইনে, আমি মন্দ করতে চাই। এ কোনো রোগের ব্যাপারই নয়।”

“কেন মন্দ করতে যাওয়া?”

“এই জন্যে যাতে কোথাও কিচ্ছুটি না থাকে। আহা, কী ভালোই না হয় যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। জানেন আলিয়োশা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি খুব বেশি করে অনেক মন্দ আর অতি যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই সব কাজ করে যাই। সে সব কাজ চুপিচুপি অনেক দিন ধরে করব, তারপর সকলে আচমকা একদিন জানতে পারবে। সবাই আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে, আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাতে থাকবে, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের সকলকে দেখব। খুব ভালো লাগবে। কেন এত ভালো লাগবে বলুন তো আলিয়োশা?”

“ওই তো। ভালো কোনো কিছুকে গুঁড়িয়ে দেবার তাগিদ, অথবা—তুমি যেমন বললে—আগুন ধরিয়ে দেওয়ার তাগিদ। এরকমও হয় বৈ কি।”

“আমি যে শুধু মুখে বললাম তা নয়, আমি কিন্তু করে ছাড়ব।”

“বিশ্বাস করছি।”

“আহা, আপনি যে বললেন বিশ্বাস করছেন, এর জন্য কী ভালোই না আপনাকে বাসি! আপনি তো আর মিথ্যে বলছেন না, এক বর্ণও মিথ্যে বলছেন না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আপনি হয়তো ভাবছেন আমি এসব আপনাকে ইচ্ছে করে বলছি, আপনাকে খেপানোর উদ্দেশ্যে বলছি?”

“না, তা ভাবছি না যদিও এরকম একটা তাগিদ কিছু পরিমাণে থাকলেও থাকতে পারে।”

“কিছুটা আছে বটে। আপনার সামনে কখনও মিথ্যে বলব না।” একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দু চোখে কেমন যেন আগুনের ফুলকি ঝলকে উঠল।

আলিয়োশাকে যা সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করল সেটা লিজার আন্তরিকতা। এখন তার মুখে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও কৌতুকের ছায়ামাত্র ছিল না, যদিও তার একান্ত আন্তরিক

মুহূর্তগুলিতেও প্রফুল্লতা ও ঠাট্টা বিদ্রুপের বোধ তার চলে গেছে এর আগে এমন হয়নি।

"এমন এমন মুহূর্ত আছে যখন লোকে অপরাধ ভালোবাসে", চিন্তিত ভাবে আলিয়োশা বলল।

"এই তো, এই তো! আপনি আমার মনের কথাটা বলে দিলেন। ভালোবাসে—সব্বাই ভালোবাসে, সব সময় ভালোবাসে, 'মুহূর্ত' বলে কোনো কথা নয়। জানেন, এই ব্যাপারে সবাই মিলে যেন কোনো এক সময় যুক্তি করে স্থিরই করে নিয়েছে যে মিথ্যে বলবে, আর তখন থেকে সবাই মিথ্যে বলে যাচ্ছে। সবাই বলে খারাপকে ঘৃণা করে, অথচ দেখবেন মনে মনে সবাই তা ভালোবাসে।"

"তুমি কি এখনও সেই আগের মতো বাজে বই-টই পড়ছ?"

"পড়িই তো। মামণি পড়ে, বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখে, আমি চুরি করে পড়ি।"

"তুমি যে নিজেকে উচ্ছন্নে দিচ্ছ এতে তোমার লজ্জা করে না?"

"আমি উচ্ছন্নে যেতে চাই। আমাদের এখানে একটা ছেলে আছে যে রেললাইনের মাঝখানে শুয়ে ছিল যখন তার ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যায়। ছেলেটার ভাগ্যি ভালো! শুনুন, আপনার ভাই তার বাবাকে খুন করেছেন এই অভিযোগে এখন তার বিচার হতে চলেছে। উনি যে ওঁর বাবাকে খুন করেছেন এটা সকলেরই ভালো লাগছে।"

"সকলের ভালো লাগছে যে বাবাকে খুন করেছে?"

"ভালো লাগছে, সকলেরই ভালো লাগছে! সবাই বলছে 'কী ভয়ঙ্কর', কিন্তু মনে মনে সকলেরই ভীষণ ভালো লাগছে। আমার তো কথাই নেই।"

"সকলের সম্পর্কে যে কথা তুমি বললে তার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে", মৃদুস্বরে আলিয়োশা বলল।

"আহা, আপনার ভাবনার তারিফ করতে হয়!" উল্লসিত হয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল লিজা। "একজন সন্ন্যাসীর মুখে এ কী শুনছি! আপনি বিশ্বাস করবেন না আপনাকে আমি কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করি, আলিয়োশা, করি এই কারণে যে আপনি কখনও মিথ্যে কথা বলেন না। ও হো, আমি আপনাকে আমার একটা মজার স্বপ্নের কথা বলব। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে শয়তানদের দেখি। মনে হয় যেন রাত, আমি মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার ঘরে আছি। এমন সময় কোথা থেকে বাড়ির আনাচে কানাচে, টেবিলের নিচে—সর্বত্র ছেয়ে গেল রাজ্যের ভূতপ্রেত শয়তানের দঙ্গলে। ওরা বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা খুলল, দরজার ওধারে ওদের রীতিমতো একটা দঙ্গল। ঘরের ভেতরে ঢুকে আমাকে ধরার মতলব। ওরা দেখতে দেখতে এগিয়ে এলো, এই আমায় ধরল বলে। কিন্তু হঠাৎ কী হল, আমি ক্রুশচিহ্ন আঁকলাম, ওরাও অমনি সবাই পিছিয়ে গেল। ভয় পাচ্ছে। তবে একেবারে গেল না, দরজার কাছে আর ঘরের কোনায় কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এমন

সময় আমার দারুণ ইচ্ছে হল জোর গলায় ভগবানকে গালমন্দ করি। শুরু করলাম গালমন্দ, ওরা তৎক্ষণাৎ দল বেঁধে আবার এগিয়ে এলো আমার দিকে। ওদের সে কী আনন্দ! এই বুঝি আমাকে আবারও খপ্ করে ধরে ফেলে! আমিও আবার হঠাৎ ক্রুশচিহ্ন আঁকি—ওরাও সবাই অমনি সরে যায়। দারুণ মজার কিন্তু, দমবন্ধ হওয়ার মতো।"

"আমিও কিন্তু ঠিক এই স্বপ্নটাই দেখেছিলাম", আলিয়োশা হঠাৎ বলে উঠল।

"বলেন কী!" লিজা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "শুনুন আলিয়োশা, হাসির কথা নয়। এটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দুজন ভিন্ন ভিন্ন লোক কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে? এটা কি সম্ভব?"

"সম্ভব। হতেই পারে।"

"আলিয়োশা, আমি আপনাকে বলছি, এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ", এবারে কেমন যেন মাত্রাছাড়া গোছের বিস্মিত হয়ে লিজা বলতে লাগল। "স্বপ্নটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথাটা হল আমি যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম সেই একই স্বপ্ন আপনিও কী করে দেখতে পারলেন? আপনি আমাকে মিথ্যে কখনও বলেন না। এখনও মিথ্যে বলবেন না। এটা কি সত্যি? আপনি হাসছেন না তো?"

"সত্যি বলছি।"

লিজাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ভীষণ রকম স্তম্ভিত হয়ে গেছে। আধ মিনিট খানেক চুপ করে রইল।

"আলিয়োশা, আপনি কিন্তু আমার কাছে আসবেন, ঘন ঘন এসে দেখা করে যাবেন", হঠাৎ অনুনয়ের সুরে সে বলে উঠল।

"আমি সব সময়, সারা জীবন তোমার কাছে আসা যাওয়া করব, এসে তোমাকে দেখে যাব", আলিয়োশা দৃঢ় স্বরে জবাব দিল।

"দেখুন, আমার যা কথা তা আমি একমাত্র আপনাকেই বলতে পারি", লিজা আবার শুরু করল। "একমাত্র নিজেকে বলি, আর আপনাকে বলি। এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনাকেই বলি। এমনকি নিজেকে যে ভাবে বলি তার চেয়েও বেশি উৎসাহ নিয়ে আপনাকে বলি। আপনাকে আমি একেবারে লজ্জা করি না। আলিয়োশা, বলুন তো কেন আমি আপনাকে একেবারে লজ্জা পাই না, একেবারেই পাই না? আলিয়োশা, এ কথা কি সত্যি যে ইহুদিগুলো ইস্টারের সময় কচি বাচ্চাদের চুরি করে তাদের মেরে ফেলে?"

"জানি নে।"

এই যে আমার কাছে একটা বই আছে। বইটাতে আমি কোনো এক জায়গায় কোনো এক বিচারের কথা পড়লাম। কোথাকার কোন্ এক ইহুদি নাকি চার বছরের এক বাচ্চাকে ধরে এনে প্রথমে তার দু হাতেরই আঙুলগুলো একে একে কেটে ফেলে, তারপর দেয়ালের গায়ে গেঁথে, হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকে তাকে ক্রুশ করে

ঝুলিয়ে দেয়। পরে যখন আদালতে মামলা ওঠে তখন বলে ছেলেটা চটপট মারা যায়—চার ঘণ্টা পরে মারা যায়। এই হল 'চটপট' মারা যাবার নমুনা! বলল, বাচ্চাটা কাতরাচ্ছিল, সমানে কাতরাচ্ছিল আর ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে সে দৃশ্য দেখছিল। বেশ কিন্তু!"

"এটা বেশ হল?"

"বেশই তো। আমি অনেক সময় ভাবি ওকে যে ক্রুশ করে ঝুলিয়েছিল সে তো আমিই। বাচ্চাটা ঝুলছে, কাতরাচ্ছে, আর আমি তার মুখোমুখি বসে দিব্যি চিনির জলে ভেজানো আনারস খাচ্ছি। চিনির জলে ভেজানো আনারস খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি। আপনি ভালোবাসেন?"

আলিয়োশা নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল। লিজার পাণ্ডুর হলদেটে মুখখানা হঠাৎ বিকৃত হয়ে গেল, চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

"জানেন, এই ইহুদিটার কথা আমি যখন পড়লাম সারাটা রাত আমি ফুলে ফুলে কেঁদেছি। মনে মনে কল্পনা করি ওই ছোট্ট বাচ্চাটা কী রকম চিৎকার করছিল, কাতরাচ্ছিল। চার বছরের একটা বাচ্চা তো সবই বোঝে! কিন্তু চিনির জলে ভেজানো ওই আনারসের চিন্তাটা আমার মাথা থেকে আর দূর হয় না। সকালবেলা আমি একজনকে চিঠি লিখে অতি অবশ্য এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম। সে আসতে আমি তাকে হঠাৎ সেই বাচ্চা ছেলেটা আর চিনির জলে ভেজানো আনারসের সমস্ত বৃত্তান্তটা বললাম, সবই বললাম, এও বললাম যে 'এটা বেশ'। সে হঠাৎ হেসে ফেলল বলল 'এটা বাস্তবিকই ভালো। তারপর উঠে দাঁড়াল, চলে গেল। মাত্র মিনিট পাঁচেক বসে ছিল। আমাকে হেলাফেলা করলে। হেলাফেলা করলে— তাই না? বলুন, বলুন না আলিয়োশা, হেলাফেলা করলে কিনা?" গদিতে বসে থাকতে থাকতে সে শরীরটা টানটান করল, তার চোখদুটো চকচক করে উঠল।

"আচ্ছা বল তো", আলিয়োশা উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্‌গেস করল, "তুমি কি নিজেই ওকে ডেকেছিলে—ওই লোকটাকে?"

"হ্যাঁ নিজেই ডেকেছিলাম।"

"ওকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ লিখেছিলাম।"

"শুধু এই কথা জানার জন্যে?" বাচ্চাটার কথা জিগ্‌গেস করবে বলে?"

"না না একেবারে নয়, ওটা জানার জন্যে একেবারেই নয়। কিন্তু সে ঘরে ঢুকতে কী যে হল, আমি তৎক্ষণাৎ তাকে ওই কথাই জিগ্‌গেস করে বসলাম। সে উত্তর দিল, হাসল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল।"

"লোকটা তোমার সঙ্গে সঠিক ব্যবহারিক করেছে", আলিয়োশা মৃদুস্বরে বলল।

"কিন্তু আমাকে যে হেলাফেলা কর? হাসল?"

"না, তা ঠিক নয়। কেননা সে নিজেও হয়তো তোমার ওই চিনির জলে ভেজানো

আনারসে বিশ্বাস করে। সে নিজেও এখন খুব অসুস্থ লিজে।"

"হ্যাঁ বিশ্বাস করে!" লিজার দু চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"কাউকে যে সে হেলাফেলা করছে এমন নয়", আলিয়োশা বলে চলল, তবে কথাটা এই যে সে কাউকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস যখন করে না তখন, বলাই বাহুল্য, হেলাফেলাও করে।

"তার মানে, আমাকেও? আমাকেও উপেক্ষা করে?"

"তোমাকেও।"

"এটা বেশ", কেমন যেন দাঁতে দাঁত চেপে লিজা বলল। "যখন সে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল তখন আমার উপলব্ধি হল অবহেলার পাত্রী হওয়াটা ভালো। ওই যে বাচ্চা ছেলেটা, যার সবগুলো আঙুল কাটা সে যেমন বেশ, কারও উপেক্ষার পাত্রী হওয়াটাও তেমনি বেশ।"

বলতে বলতে আলিয়োশার মুখের দিকে চেয়ে সে কেমন যেন জ্বরতপ্তের মতো আরক্ত হয়ে জ্বালাধরা হাসি হাসল।

"জানেন আলিয়োশা, জানেন, আমি চাইছিলাম কি  আমাকে বাঁচান, আলিয়োশা!" হঠাৎ বসার গদি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আলিয়োশার দিকে ছুটে গিয়ে সে দু হাতে সজোরে তাকে আঁকড়ে ধরল। "আমাকে বাঁচান!" প্রায় আর্তনাদ ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। "আপনাকে যা বললাম, পৃথিবীতে এমনকি কেউ আছে যাকে সে সব কথা বলতে পারি? কিন্তু আমি যা বললাম সব সত্যি, সত্যি, সত্যি! আমি নিজেকে মেরে ফেলব, কেননা আমার সবই বিশ্রী লাগছে! আমি বাঁচতে চাই নে, কেননা আমার সবই বিশ্রী লাগছে! সব বিশ্রী লাগছে, সব বিশ্রী লাগছে! আলিয়োশা, আপনি কেন আমাকে ভালোবাসেন না, একদম ভালোবাসেন না?" হতবিহ্বল হয়ে সে তার কথা শেষ করল।

"না, ভালোবাসি", জবাবে আলিয়োশা সাবেগে বলে উঠল।

"আমার কথা ভেবে কাঁদবেন তো? বলুন, কাঁদবেন?"

"কাঁদব।"

"এই কারণে নয় যে আমি আপনার স্ত্রী হতে চাইনি, অমনি কাঁদবেন, কেবল আমার জন্যেই কাঁদবেন?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"ধন্যবাদ! শুধু আপনার চোখের জল—এ ছাড়া আমার আর কিছু চাই না। বাকিরা সকলে আমাকে শাস্তি দেবার হয় দিক, পায়ের তলায় পিষে মারুক—সবাই সবাই, কাউকে বাদ দিচ্ছি না! কারণ, আমি কাউকে ভালোবাসি না। শুনছেন? কা-উ-কে না! ভালো তো বাসিই না, ঘেন্না করি! যান আলিয়োশা, আপনার সময় হয়ে গেছে—আপনাকে আপনার ভাইয়ের কাছে যেতে হবে।" বলতে বলতে ঝট করে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

"কিন্তু তুমি এইভাবে কী করে থাকবে?" প্রায় ভীতচকিত হয়ে আলিয়োশা বলল।

"যান, ভাইয়ের কাছে যান। জেলখানা বন্ধ হয়ে যাবে। যান, এই যে আপনার টুপি! মিতিয়াকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। যান, যান!"

একরকম জোর করেই সে আলিয়োশাকে *ঠেলে* দরজার বার করে দিল। আলিয়োশা হতবুদ্ধি হয়ে কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। এমন সময় সে উপলব্ধি করল তার ডান হাতে একটা চিঠি আছে। ছোট্ট একটা চিঠি, শক্ত ভাঁজ করে সাঁটা। নজর বুলাতেই দেখল 'ইভান ফিয়োদরভিচ কারামাজভ্'-এর নামে লেখা। চট করে এক নজর তাকিয়ে দেখল লিজাকে। লিজার মুখটা প্রায় ভয়াবহ উঠেছে।

লিজার সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছিল। হতবিহ্বল কণ্ঠে সে হুকুম দিল, "চিঠিটা দিয়ে আসবেন, অবশ্যই দেবেন। আজই, এখুনি! নইলে আমি বিষ খেয়ে মরব! এটার জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম!"

তাড়াতাড়ি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ভেতর থেকে খুট করে দরজায় ছিটকানি দেওয়ার আওয়াজ হল। আলিয়োশা চিঠিটা পকেটে রেখে মাদাম খকলাকোভার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আসলে তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। এদিকে আলিয়োশা যেই চলে গেল লিজাও অমনি ছিটকানি খুলে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সেই ফাঁকের ভেতরে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে সর্বশক্তিতে চেপে ধরে আঙুলটা চিপ্‌টে দিল। দশ সেকেন্ড মতো পরে সেখান থেকে আঙুল বের করে এনে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হেঁটে তার চেয়ারে গিয়ে বসল। শরীর টান টান করে সোজা হয়ে বসে তার কালশিটে পড়া আঙুলটা আর চেপ্‌টে যাওয়া নখের তলা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে লাগল। তার *ঠোঁট* থরথর করে কাঁপতে লাগল। দ্রুত, অতি দ্রুত আপন মনে ফিসফিস করে সে আওড়াল, "আমি একটা যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই, একেবারে যাচ্ছেতাই!"

## চার

## একটি স্তবগান ও একটি গূঢ় রহস্য

আলিয়োশা যখন দেওয়ালের গেটে ঘণ্টা বাজাল ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে। নভেম্বরের দিন আবার তেমন বড়োও নয়। এমনকি অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু আলিয়োশা জানত তাকে অবাধে মিতিয়ার কাছে যেতে দেওয়া হবে। আর সব জায়গায় যা হয় আমাদের এখানে, আমাদের এই ছোটো শহরটাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। গোড়ার দিকে অবশ্য, প্রাথমিক তদন্ত শেষ হওয়ার পর, আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য কোনো কোনো ব্যক্তি মিতিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে কিছু কিছু

প্রয়োজনীয় বিধিবদ্ধতা মেনেই তাদের তা করতে হত। কিন্তু পরে বিধিবদ্ধতা যে শিথিল করা হয়েছিল তা নয়, তবে, অন্তত পক্ষে মিতিয়ার কাছে যারা আসত সেরকম কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেমন যেন আপনা থেকেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটা এতদূরই হয়েছিল যে সাক্ষাৎকারের জন্য যে নির্দিষ্ট কক্ষ ছিল সেখানেও কয়েদির সঙ্গে সাক্ষাৎকার বস্তুতপক্ষে একান্তে, চার চক্ষুর মধ্যই হত।

অবশ্য হ্যাঁ, এ ধরনের ব্যতিক্রম অতি অল্প লোকের ক্ষেত্রে হত কেবল গ্রুশেন্‌কা, আলিয়োশা ও রাকিতিনের ক্ষেত্রেই তা করা হত। তবে গ্রুশেন্‌কার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন স্বয়ং জেলা পুলিশ সুপার মিখাইল মাকারভিচ্ মাকারভ্। মোক্রয়েতে তিনি ওর ওপর যে হম্বিতম্বি করেছিল সেটা বৃদ্ধের মনের ওপর একটা বোঝা হয়ে ছিল। পরে আসল ঘটনাটা পুরোপুরি জানার পর গ্রুশেন্‌কা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ পাল্‌টে যায়। আর অদ্ভুত ব্যাপার এই যে মিতিয়া যে অপরাধ করেছে এই বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যখন থেকে মিতিয়া কয়েদে আছে সেই সময় থেকে বৃদ্ধ তাকে ক্রমেই যেন বেশি করে কোমল দৃষ্টিতে দেখছেন। মনে মনে ভাবছিলেন: 'ওর অন্তরটা হয়তো ভালোই ছিল, কিন্তু তাহলে কী হবে? মাতলামি আর উচ্ছৃঙ্খলতা করে একজন স্যুইডের মতো ডুবে মরল!'* আগেকার সেই বিভীষিকার ভাবটা চলে গিয়ে তাঁর মনের মধ্যে কেমন যেন একটা করুণার উদ্রেক হল। আলিয়োশার কথা বলতে গেলে, জেলা পুলিশ সুপারের সে পরম স্নেহভাজন এবং বহুকালের পরিচিত। এদিকে সম্প্রতি কয়েদির কাছে অতি ঘন ঘন যাতায়াত করা রাকিতিনের দস্তুরমতো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যাদের সে 'পুলিশ সুপারের বাড়ির দিদিমণি' বলে উল্লেখ করত সে ছিল তাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিতিদের একজন। নিত্যই সে তাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করত। জেলের যিনি সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট সেই বৃদ্ধ লোকটিও সহৃদয়, যদিও কাজের জায়গায় শক্ত ধাঁচের। রাকিতিন আবার তাঁর বাড়িতে পড়াত। তাঁর সঙ্গেও আলিয়োশার বিশেষ খাতির, বহু পুরনো পরিচয়। আলিয়োশার সঙ্গে মোটের ওপর নানা রকম 'জ্ঞানের কথা' বলতে তিনি ভালোবাসতেন। ইভান ফিয়োদরভিচের প্রসঙ্গে যদি বলতে হয়, সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট তাকে শ্রদ্ধাই করতেন না, এমনকি তাকে ভয় পেতেন, বড়ো কথা ভয় পেতেন তার বিচার বিবেচনাকে, যদিও তিনি নিজে ছিলেন এক বড়ো রকমের দার্শনিক—বলাই বাহুল্য তাঁর 'নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে যতদূর পৌঁছুন যায়'। কিন্তু আলিয়োশার প্রতি তাঁর কেমন যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। গত এক বছর ধরে বৃদ্ধ আবার বাইবেলের সুসমাচারের অপ্রামাণিক অংশগুলির** চর্চায় মেতেছিলেন

---

জার মহামতি পিয়োতরের রাজত্বকালে ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে আক্রমণকারী স্যুইড্‌দের শোচনীয় পরাজয়ের পর রুশভাষায় এ ধরনের একটি বাগধারা চালু হয়েছিল।

**Apocryphal Gospel নামে পরিচিত।

এবং সেই সম্পর্কে তাঁর যা মনোভাব প্রতিনিয়ত তিনি তাঁর যুবক বন্ধুটিকে তা জানাতেন। আগে সে তার কাছে মঠে পর্যন্ত আসতেন, তার সঙ্গে এবং মঠের সাধু সন্তদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তত্ত্বালোচনা করতেন। তাই আলিয়োশা যদি দেরি করেও জেলখানায় এসে হাজির হত তাকে সুপারিন্‌টেন্ডেণ্টের কাছে চলে গেলেই হত, কাজ ঠিক হাসিল হয়ে যেত। তাছাড়া জেলের ওপরওয়ালা থেকে শুরু করে সামান্য পাহারাদার পর্যন্ত সকলেই আলিয়োশার যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলেই হল—শান্ত্রির আর বাধা দেবার কী আছে?

মিতিয়াকে কারাকক্ষ থেকে ডেকে পাঠানো হলে তাকে সব সময় নিচতলায় নেমে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হত। আলিয়োশা যখন সেই ঘরে ঢুকল ঠিক তখনই রাকিতিনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। রাকিতিন তখন মিতিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার মুখে। ওরা দুজনেই বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল। মিতিয়া তাকে এগিয়ে দিতে যাবার সময় কেন যেন খুব হাসছিল, রাকিতিনকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন গজগজ করছে। আলিয়োশার সঙ্গে দেখা হওয়া রাকিতিনের পছন্দ নয়—বিশেষ করে সম্প্রতি। তার সঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলত না, মুখোমুখি হয়ে গেলে কষ্টেসৃষ্টে মাথাটা সামান্য নোয়াত। এখন আলিয়োশাকে ঢুকতে দেখে সে বিশেষ করে ভুরু কোঁচকাল, চোখের দৃষ্টি এমন ভাবে এক পাশে সরিয়ে নিল যেন তার পশুলোমের কলারওয়ালা বিশাল ও গরম ওভারকোটটার বোতাম আঁটতে ব্যস্ত। পরক্ষণেই সে তার ছাতাটার খোঁজ করতে লাগল।

"আমার নিজের জিনিসপত্রগুলোর মধ্যে আবার কিছু ভুলে না যাই", স্রেফ কিছু বলতে হয় তাই বিড়বিড় করে সে বলল।

"দেখো, অন্য লোকেরও কিছু আবার ভুলে না যাও!" রসিকতা করে এই কথা বলে নিজেরই রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল মিতিয়া। রাকিতিনও মুহূর্তের মধ্যে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

"সে পরামর্শ রাকিতিনকে না দিয়ে তুমি বরং জঘন্য ভূমিদাস প্রথার তাঁবেদার তোমার কারামাজ়ভ্‌দের গুষ্টিকে দিয়ো!" রাগে রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলল।

"এ আবার তোমার কী হল? আমি তো ঠাট্টা করছিলাম!" তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল মিতিয়া। "ধুত্তোর! চুলোয় যা! ওগুলো সব এক ধাতের", রাকিতিনকে দ্রুত অপসৃত হতে দেখে মাথা নেড়ে তাকে দেখিয়ে আলিয়োশার দিকে ফিরে সে বলল। "দিব্যি এখানে বসে বসে হাসছিল, খোশমেজাজে ছিল, হঠাৎ কী হল—খেপে গেল। তোর দিকে ফিরে একবার মাথাটা পর্যন্ত নোয়াল না দেখছি। তোদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে নাকি? এত দেরি করে এলি যে? তোর জন্য শুধু অপেক্ষাই করছিলাম

না, সারাটা সকাল তৃষ্ণার্তের মতো তোর পথ চেয়ে বসে ছিলাম। সে যাক গে। এখন সেটা পুষিয়ে নেব।"

"তোমার কাছে ও যে এত ঘনঘন যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে কী ব্যাপার? ওর সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব পাতিয়েছ নাকি?" রাকিতিন যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল আলিয়োশাও মাথা নেড়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে জিগ্‌গেস করল।

"মিখাইলের সঙ্গে তো? বন্ধুত্ব পাতানোর কথা বলছিস? না, ঠিক তা নয়। অমন একটা শুয়োর—তার সঙ্গে কী করে হয়? মনে করে আমি আমি একটা বদ লোক। ওর মতো লোকের মধ্যে সবচাইতে বাজে যেটা সেটা এই যে ঠাট্টাতামাশাও ওরা বুঝতে পারে না। ঠাট্টাতামাশা কখনোই বুঝতে পারে না। ওদের মন রসকষহীন, লেপাপোঁছা—যখন আমাকে প্রথম জেলখানায় আনা হয়েছিল তখন জেলখানার চার দেয়াল দেখে আমার যেমন মনে হয়েছিল ঠিক তেমনি—শুকনো, রসকষহীন। তবে বুদ্ধিমান লোক, বুদ্ধিমান বলতে হয়। কিন্তু আলিয়োশা, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, এখন আমার মাথাটাই তো গেল দেখছি।"

সে বেঞ্চে গিয়ে বসল, আলিয়োশাকে তার পাশে বসাল।

"হ্যাঁ, কাল বিচার। একেবারেই কি কোন আশাভরসা করতে পারছ না', দাদা?" আলিয়োশার কণ্ঠে কুণ্ঠার উপলব্ধি।

"কীসের কথা বলছিস তুই?" যে দৃষ্টিতে সে আলিয়োশার দিকে তাকাল তাতে নির্দিষ্ট ভাবে তেমন কিছু বোঝার উপায় ছিল না। "ও, তুই ওই বিচারের কথা বলছিস! মরুক গে ওসব! আজ পর্যন্ত তোর সঙ্গে আমার যে সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো কোনো কাজের কথা নয়, সবই এই বিচার সম্পর্কে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো যে বিষয়টা তা নিয়ে তোর সঙ্গে একটি কথাও আমার হয়নি। হ্যাঁ, কাল বিচার ঠিকই, কিন্তু আমি যে বললাম আমার মাথাটা গেল সেটা বিচারের কথা ভেবে বলিনি। আমার যা গেল তা মাথা নয়, আমার মাথার ভেতরে যেটা বাসা বেঁধেছিল সেটা গেল। কী হল? তুই অমন সমালোচকের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী দেখছিস?"

"তুমি এ কীসের কথা বলছ মিতিয়া?"

"আইডিয়া, আইডিয়া! তাহলে আর কী বলছি? নীতিশাস্ত্র। নীতিশাস্ত্রটা কী — তাই তো?"

"নীতিশাস্ত্র!" আলিয়োশা অবাক হয়ে গেল।

"হ্যাঁ, এক ধরনের শাস্ত্র না কী যেন?"

"তা এরকম একটা শাস্ত্র আছে বটে তবে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে সেটা যে কী ধরনের শাস্ত্র তা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না।

"রাকিতিন জানে। রাকিতিন অনেক কিছু জানে। মরুক গে ওটা! সাধু সন্ন্যাসী সে হতে যাচ্ছে না। পেতের্বুর্গে যাবার মতলব করছে। বলছে সেখানে সে কোনো

সমালোচনা বিভাগে যোগ দেবে, তবে সেটা হবে বেশ উঁচু দরের। বলা যায় না হয়তো কাজের লোক হবে, কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠাও লাভ করবে। ওঃ, এই লোকগুলো তাদের নিজেদের কর্মজীবন গুছিয়ে নিতে ওস্তাদ! চুলোয় যাক নীতিশাস্ত্র! আমি তো গেলাম, ওরে আলেক্সেই, ঈশ্বরের বরপুত্র আমার, আমি কিন্তু খতম হয়ে গেলাম! তোকে আমি সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তোকে চোখের দেখা দেখার জন্যে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে। আচ্ছা কার্ল বের্নার কে ছিল যেন?"

"কার্ল বের্নার?" আলিয়োশা এবারেও অবাক হয়ে গেল।

"না, না, কার্ল নয়। দাঁড়া। ভুল বলছি। ক্রোদ বের্নার।[২২] বস্তুটা কী? কেমিস্ট্রি নাকি?"

"কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি হবেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি তাঁর সম্পর্কেও বিশেষ কিছু বলতে পারছি না। শুধু শুনেছি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কী ধরনের তা জানি নে।"

"তা মরুক গে। ও আমিও জানি নে", গালিগালাজ দিয়ে মিতিয়া বলল। "পাজি বদমাশ গোছের কেউ একটা হবে। ওগুলোর সব কটাই পাজির পা-ঝাড়া। তবে রাকিতিন বেরিয়ে যাবে। ফাঁক ফোকর দিয়ে ঠিক বেরিয়ে যাবে। ওটাও একটা বের্নার। ওঃ এই বের্নারগুলোকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা! ওদের বিরাট বংশবৃদ্ধি হয়েছে!"

"আরে তোমার কী হল বল তো?" আলিয়োশা নাছোড়বান্দা মতো চেপে ধরল।

"আমাকে নিয়ে, আমার মামলা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে চায়, তাই দিয়ে সাহিত্যজগতে তার ভূমিকা শুরু করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে আমার কাছে যাতায়াত। নিজেই আমাকে খুলে বলেছে। কীসের কী একটা তত্ত্ব ধরে এগোতে চায়। ওর কথাটা হল 'খুন না করে তার উপায় ছিল না, কারণ পরিবেশ তাকে কুরে কুরে খেয়েছে' ইত্যাদি, এই গোছের কিছু একটা। আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছে। বলছে সমাজতন্ত্রের খানিকটা ছোঁয়াও ওতে থাকবে। তা যাক গে, চুলোয় যাক ওটা! ছোঁয়া থাকলে থাকুক। আমার তাতে কী? ভাই ইভানকে ভালোবাসে না, দু চক্ষে দেখতে পারে না ওকে। তোকেও রেয়াত করে না। কিন্তু আমি ওকে দূর ছাই করে তাড়িয়ে দিই না, কারণ লোকটা বুদ্ধিমান। অবশ্য বড্ড বেশি হামবড়া। আমি এইমাত্র ওকে একথাই বললাম 'কারামাজভ্‌রা পাজি বদমাশ নয়, তারা দার্শনিক, কারণ খাঁটি রুশিরা সকলেই দার্শনিক, কিন্তু তুমি পড়াশুনা করলে কী হবে দার্শনিক নও, তুমি একটা ছোটলোক।' শুনে ও বিদ্বেষের জ্বালাধরা হাসি হাসল। আমি ওকে বললাম 'de ideabus non est disputandum'*—আইডিয়া নিয়ে

---

* লাতিন

কোনও তর্ক চলে না। রসিকতা কেমন হল? ভালো না? অন্ততপক্ষে আমিও কী রকম ক্লাসিকটা চালিয়ে দিলাম, বল?" মিতিয়া হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল।

"কীসে তুমি খতম হয়ে গেলে? এই যে তখন তুমি বলছিলে?" আলিয়োশা তাকে বাধা দিয়ে বলল।

"কীসে খতম হয়ে গেলাম? হুম্! মোদ্দা কথাটা হল গোটা বিষয়টা যদি ধরি তাহলে আমার দুঃখ হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য—সর্বনাশটা তো এখানেই!"

"ঈশ্বরের জন্য দুঃখ হচ্ছে মানে?"

"একবার মনে মনে ভেবে দ্যাখঃ আমাদের স্নায়ুগুলোর মধ্যে, আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের মগজের মধ্যে এই যে নার্ভগুলো আছে ধুত্তোর ছাই! নিকুচি করেছি নার্ভের! সেখানে এক ধরনের ছোটো ছোটো লেজ মতন আছে নার্ভেরই ছোটো ছোটো লেজ আর কি। তা সেই লেজগুলো যেই কাঁপতে শুরু করে, অর্থাৎ বুঝলে কিনা, যেই আমি আমার চোখদুটো মেলে এই যে এই ভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখি, অমনি সেই লেজগুলোও কাঁপতে শুরু করে আর কাঁপন শুরু হতেই চোখের সামনে দেখা দেয় একটা আকার—সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য নয়—এই মুহূর্তখানেক, এক সেকেন্ড মতন কেটে গেলে, তবেই। তখন এমন একটা মুহূর্ত চলে আসে; মানে, মুহূর্ত বলছি কি ছাই—মুহূর্ত ত নয়—একটা প্রতিমূর্তি, অর্থাৎ একটা বস্তু অথবা একটা ঘটনা। আর তখন যে কী হয় শয়তানই জানে! ঠিক সেই জন্যই আমি নিবিষ্ট হয়ে দেখি, তারপর ভাবনাচিন্তা করি। তার কারণ এই লেজগুলো। কারণটা আদৌ এই নয়, যে আমার একটা আত্মা আছে এবং আমি কোনো একটা কিছুর প্রতিমূর্তি বা ওই গোছের কিছু একটা। রাকিতিন গতকালই আমাকে এ সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে ভাই! চমৎকার এই শাস্ত্রটা! নতুন মানুষ আসছে—এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু তা হলেও ঈশ্বরের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে!"

"তা সেও এক পক্ষে ভালো", আলিয়োশা বলল।

"ভালো? কীসের ভালো? ঈশ্বরের জন্য দুঃখ হচ্ছে বলে ভালো? এটা ভাই রসায়ন। পরম শ্রদ্ধাভাজন মহাশয় আমার, কিছু করার নেই। একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিতে হচ্ছে। রসায়ন শাস্ত্রকে পথ করে দিতে হবে। রাকিতিনের আবার ঈশ্বরকে পছন্দ নয়। ওফ্! একেবারে নয়। এটাই ওদের—ওদের সকলের দুর্বলতার জায়গা। কিন্তু ওরা তা গোপন করে। মিছে কথা বলে। ভান করে। 'তাহলে কী বল? তোমার সমালোচনা বিভাগের লেখায় তুমি কি এটা চালাবে?' আমি জিগ্গেস করলাম। 'চালাতে যে দেবে না সে তো স্পষ্টই', হাসতে হাসতে সে বলল। আমি জিগ্গেস করলাম, 'কিন্তু এর পর মানুষ জাতিটার কী হবে? ঈশ্বর ছাড়া, পরকাল ছাড়া চলবে কী করে? তাহলে তো দাঁড়াচ্ছে এই যে সবই ন্যায়সঙ্গত, যা খুশি তাই করা যায়?' 'সেটা তুমি জানতে না নাকি?' হাসতে হাসতে সে বলল। 'একজন

বুদ্ধিমান মানুষের সব কিছুই করা সাজে। কী ভাবে কী করতে হয় তার জানা আছে। কিন্তু তুমি? খুন করলে, করে ফেঁসে গেলে, এখন জেলে পচে মর!' আমার মুখের ওপর কিনা বলে দিল! শুয়োর আর কাকে বলে! আগে আমি এ ধরনের লোককে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম, কিন্তু এখন ওদের কথা শুনি! অনেক কাজের কথাও বলে কি না। লেখেও বেশ বুদ্ধিমানের মতো। হপ্তাখানেক আগে আমাকে একটা প্রবন্ধ পড়ে শোনাতে শুরু করেছিল। আমি তখন ইচ্ছে হতে সেখান থেকে তিনটে লাইন টুকে রেখে দিয়েছিলাম। একটু দাঁড়া। এই যে এখানে।"

মিতিয়া তাড়াতাড়ি ওয়েস্টকোটের পকেটের ভেতরে হাত গলিয়ে সেখান থেকে একটা কাগজ টেনে বের করে পড়ে শোনাল

"'এই প্রশ্নটার সমাধান করতে গেলে যেটা সবার আগে দরকার তা হল নিজের ব্যক্তিসত্তাকে নিজের বাস্তবতার প্রতিকূলে দাঁড় করানো।' কিছু বুঝলি কি?"

"না, বুঝতে পারছি না", আলিয়োশা বলল।

সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিতিয়াকে দেখছিল, তার কথা শুনছিল।

"আমিও বুঝতে পারছি না। অন্ধকার, অস্পষ্ট, তবে বুদ্ধিমানের মতো কথা বটে! বলল, 'আজকাল সকলে এরকমই লেখে, কেন না পরিবেশটাই এরকম। ওদের ভয় পরিবেশকে। কবিতাও লেখে হতভাগাটা। খখ্‌লাকোভার পদপল্লবের গুণগান করে কবিতা লিখেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

"আমি শুনেছি", আলিয়োশা বলল।

"শুনেছিস? কিন্তু পদ্যটা শুনেছিস কি?"

"না, তা শুনিনি।"

"আমার কাছে ওটা আছে। এই যে এখানে। তোকে পড়ে শোনাব। তুই জানিস না—তোকে বলি নি—সে এক কাহিনি। ওটা একটা বজ্জাত। হপ্তা তিনেক আগেকার কথা, কী মতি হল কে জানে, আমাকে টিটকারি দিয়ে বলল, 'তুমি তিন হাজারের জন্য বোকার মতো ফেঁসে গেলে, কিন্তু আমি, এই দেখ না, কেমন দেড় লাখ ঝাড়ি। একজন, বিধবাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, পেতের্বুর্গে পাকা বাড়ি কিনছি।' আমাকে বলল, খখ্‌লাকোভাকে প্রেম নিবেদন করছে। আর সে মহিলার বয়সকালেও তেমন বুদ্ধি সুদ্ধি ছিল না, এখন চল্লিশ বছর বয়সে একেবারেই লোপ পেয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ ভাবপ্রবণ, বড্ড বেশি ভাবপ্রবণ, তার ওপরে ভরসা করেই তো ওকে আমি মাত্‌ করে দেব। বিয়ে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে পেতের্বুর্গে চলে যাব, সেখানে একটা খবরের কাগজ ছাপাতে শুরু করব।' বলতে বলতে বিশ্রী ধরনের একটা লালসায় তার জিভে যেন জল এসে গেল, তবে সেটা ওই দেড়লাখের জন্য, খখ্‌লাকোভার জন্য নয়। আমাকে অনেক করে বলে তার কথা বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল। আমার কাছে সমানে যাতায়াত করছে। রোজই আসে আর বলে 'একটু একটু করে বশে আসছে।' আনন্দে ডগমগ। এমন সময় হঠাৎ একদিন ভদ্রমহিলা দিলেন

ওকে ভাগিয়ে। পের্খোতিনের জিত হল। শাবাশ! এই তো চাই! ওকে যে ভাগিয়ে দিলেন তার জন্য চাই কি ওই হদ্দ বোকা মহিলাটিকে আমি ঘটা করে চুমুও খেতে পারতাম! আমার কাছে ওর যখন এই রকম আসা যাওয়া চলছে সেই সময়ই ও এই কবিতাটা লিখেছিল। আমাকে বলল, এই প্রথম হাত নোংরা করছি, কবিতা লিখছি, মন ভোলানোর জন্য, তার মানে কাজের কাজ করছি। ওই হদ্দ বোকা মহিলাটার কাছ থেকে পুঁজি হাতিয়ে তাই দিয়ে পরে সমাজের উপকার সাধন করতে পারব। ওদের আবার যে কোনো দুষ্কর্মের সমর্থনে একটা না একটা সামাজিক যুক্তি আছে! বলল, 'যা-ই বল না কেন তোমার পুশ্‌কিনের চেয়ে ভালো লিখেছি, কারণ রসিকতা করে কবিতাটা লেখা হলেও তার মধ্যে সমাজের দুঃখটাকেও ঠিক গুঁজে দিতে পেরেছি।' পুশ্‌কিন সম্পর্কে যা বলেছে তা না হয় বুঝলাম। লোকটা যদি সত্যি সত্যি প্রতিভাবান হত তাহলেও বুঝতাম, নয়তো কেবলই পদপল্লবের বর্ণনা! ওই ওঁছামারা পদ্য নিয়ে কত না বড়াই! দেখ, দেখ, ওদের আত্মম্ভরিতাটা কীরকম একবার দেখ! 'আমার কোন এক জনের পায়ের ব্যথার আরোগ্য কামনায়'—কেমন শিরোনামও একটা ভেবে বের করেছে! আমুদে লোক বটে!

পদপল্লব, পদপল্লব আহা!
হলই না হয় একটু স্ফীত তাহা।
রোগ সারাতে বদ্যিতে ডাক্তারে
বাড়ায় ব্যামো ব্যান্ডেজে প্লাস্টারে।

থোড়াই কাতর হচ্ছি পায়ের তরে—
ওসব গীতি পুশ্‌কিনেতে আছে।
দুঃখ আমার মাথার ব্যামোর তরে।
আইডিয়া সে কিচ্ছু বোঝে না যে!

বুদ্ধিসুদ্ধি যেটুক ছিল ঘটে
পায়ের ব্যথায় সেটাও উধাও হলে
এক্ষুনি পা সারাতে হয় বটে—
বুদ্ধি কিছু মাথায় যাতে খোলে।

"শুয়োর, আস্ত শুয়োর একটা! তবে খেল খেলেছে কিন্তু হতভাগাটা। বাস্তবিকই কেমন কায়দা করে 'সামাজিক বিষয়টাও' ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওকে যখন তাড়িয়ে দিল তখন ওর সে কী রাগ! দাঁতে দাঁত কড়মড় করছিল।"

"ও কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিশোধও নিয়েছে", আলিয়োশা বলল। "খখ্‌লাকোভার ওপর পত্রিকায় রিপোর্ট লিখেছে।"

"এটা ওর কাজ, ওর কাজ!" মিতিয়া ভুরু কুঁচকে সমর্থন করে বলল। "ওরই কাজ! এই সব লেখালেখি   আমি তো জানি   মানে, এই ধর না কেন গ্রুশেন্‌কা

সম্পর্কেই কত রকমের জঘন্য কথা যে লেখা হয়েছে! তার পর কাতিয়া তার সম্পর্কেও হুম্!"

সে উদ্বিগ্নচিত্তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াল।

"আমার পক্ষে আর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হচ্ছে না, ভাই", একটু চুপ করে থাকার পর আলিয়োশা বলল। "কাল তোমার পক্ষে একটা মস্ত বড়ো আর ভয়ঙ্কর দিন। তোমার ওপর ঈশ্বরের বিচার সম্পন্ন হবে। কিন্তু আমি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি. তুমি দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছ, মামলার কথা কিছুই বলছ না। তার বদলে, ভগবান জানেন, কী সব ছাই বলছ

"না, অবাক হওয়ার কিছু নেই", মিতিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল। "আমাকে কি তাই বলে ওই পূতিগন্ধময় কুত্তাটার কথা বলতে বলিস নাকি? ওই খুনিটার কথা বলতে বলছিস? এই নিয়ে তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। পূতিগন্ধীর ছেলে পূতিগন্ধময় স্মের্দিকোভ্ সম্পর্কে কোনো কথা বলার ইচ্ছে নেই! ঈশ্বর ওকে হত্যা করবেন। দেখে নিস। চুপ্!"

উত্তেজিত হয়ে আলিয়োশার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে তাকে হঠাৎ চুমু খেল। তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

"রাকিতিন এটা বুঝতে পারবে না", এক ধরনের উল্লাসে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলতে শুরু করল, "কিন্তু তুই, তুই সব বুঝবি। তাই না তোর জন্য তৃষ্ণার্তের মতো অপেক্ষা করছিলাম। দ্যাখ, এখানে, এই পলেস্তারা খসা চার দেয়ালের ভেতরে অনেক দিন হল তোকে অনেক কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল। অথচ সবচেয়ে বড় যেই কথাটা সেটা নিয়েই আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিনি। বলার সময় যেন কিছুতেই আর মনে আসছিল না। এখন আর অপেক্ষা করা যায় না, তোর কাছে মন উজাড় করে দেবার চূড়ান্ত সময়টা এসে গেছে। ভাই রে, গত দু মাসের মধ্যে আমি নিজের মধ্যে এক নতুন মানুষকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমার মধ্যে এক নতুন মানুষের জাগরণ ঘটেছে! আমার ভেতরে সেটা বন্দি হয়ে ছিল, কিন্তু বজ্রপাতটা না ঘটলে তার প্রকাশ হয়তো কখনও হত না। কী ভয়ঙ্কর! কিন্তু আমাকে যদি বিশ বছর খনির ভেতরে হাতুড়ি দিয়ে খনি ভাঙতে হয় তাতেই বা কী? এতে আমি আদৌ ভীত নই। এখন আমার যে ভয় সেটা অন্য পাছে এই জাগ্রত মানুষটি আমার কাছ থেকে সরে যায়! সেখানেও, মাটির নিচে, খনির গর্ভে নিজের পাশে এমনই আরেকজন সশ্রম কারাদণ্ড-ভোগী এবং খুনি আসামির মধ্যেও মনুষ্য হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে, কেন না সেখানেও লোকে বাস করতে পারে, মানুষ মানুষকে ভালো বাসতে পারে, দুঃখকষ্ট ভোগ করতে পারে! সেই সশ্রম কারাদণ্ডভোগী মানুষটির পাষাণ হৃদয়কে গলানো যেতে পারে, বছরের পর বছর তার পিছনে লেগে থেকে শেষ পর্যন্ত গুহার আঁধার থেকে উদ্ধার করে আলোর জগতে এনে তার মধ্যে এক মহৎ

প্রাণ আর বেদনাবোধ জাগিয়ে তোলা যায়, তার পুনর্জন্ম ঘটিয়ে তাকে দেবদূতে পরিণত করা যায়, তাকে একজন নায়কে পরিণত করা যায়। ওদের সংখ্যাও কিন্তু অনেক—শত শত। ওদের দুর্দশার জন্য দোষ আমাদের সকলের! তখন, অমন একটা মুহূর্তে আমি 'ছাওয়ালের' স্বপ্নটা দেখলাম কেন? 'ছাওয়ালটা গরিব কেন?' সেই মুহূর্তে কিনা আমার দিব্যজ্ঞান হল! 'ছাওয়ালের' জন্যই আমার যাওয়া। তার কারণ আমরা সকলেই সকলের জন্য দোষী। সব 'ছাওয়ালের' জন্য, কেননা ছোটো বাচ্চা আছে, আবার বড়ো বাচ্চাও আছে। সবাই 'ছাওয়াল'। সকলের জন্যই যাচ্ছি, কেন না কাউকে না কাউকে তো সকলের জন্য যেতেই হয়। আমি বাবাকে খুন করিনি, কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে। আমি গ্রহণ করছি! আমার এ সমস্ত চিন্তা এখানে, এই পলেস্তারাখসা চার দেওয়ালের মাঝখানে আসার পর হয়েছে। ওখানে মাটির গর্ভে, হাতুড়ি হাতে ওরা তো সংখ্যায় অনেক, শয়ে শয়ে। ও, তাই তো, আমরা তো আবার শেকলে বাঁধা থাকব, আমাদের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না! কিন্তু তা হোক, আমাদের পরম শোকের মধ্য দিয়ে আমরা আবার জেগে উঠব নব আনন্দে, যে আনন্দ ছাড়া মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বও সম্ভব নয়, যেহেতু ঈশ্বর আনন্দ দান করেন এটা তাঁরই অধিকার— বিশেষ অধিকার।

হে প্রভু, মানুষ তার প্রার্থনার মধ্যে গলে মিশে যাক! মাটির গর্ভে আমি ঈশ্বরকে ছাড়া থাকব কী করে? রাকিতিন মিথ্যে কথা বলছে। ওরা যদি ঈশ্বরকে এই ধরণীর বুক থেকে দূর করে দেয়, ধরণীর গর্ভে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পাব! একজন সশ্রম কারাদণ্ডভোগীর পক্ষে ঈশ্বর ছাড়া চলা অসম্ভব, এমনকি যে মানুষ সশ্রম কারাদণ্ডভোগী নয় তার তুলনায়ও বেশি অসম্ভব। আমরা, মাটির তলার মানুষগুলো তখন ধরণীর গর্ভ থেকে শোকাকুল স্তোত্র গাইব ঈশ্বরের উদ্দেশে, যাঁর কাছে আছে আনন্দ! জয় হোক ঈশ্বরের, জয় হোক তাঁর আনন্দের! আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি!"

এই উদগ্র ভাষণ দেওয়ার সময় মিতিয়ার শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, দু'চোখ বয়ে অশ্রুধারা গড়াতে লাগল।

"না, জীবনে পরিপূর্ণতা আছে। ধরণীর গর্ভেও জীবন আছে।" সে আবার শুরু করল। "তুই বিশ্বাস করবি না আলেক্সেই, আমার এখন বাঁচার কী দারুণ ইচ্ছে। বেঁচে থাকার, উপলব্ধি করার কী দারুণ একটা তৃষ্ণা এই পলেস্তারা খসা চার দেয়ালের মাঝখানেই আমার ভেতরে জেগে উঠেছে! রাকিতিন এটা বোঝে না। তার একমাত্র চিন্তা বাড়ি তৈরি করা আর সেখানে ভাড়াটে বসানো। আমি কিন্তু তোর অপেক্ষায় ছিলাম। দুঃখ কষ্ট ভোগ করা?—সে আর এমনকি? আমি তাতে ভয় করি না— হোক না তা সীমাসংখ্যাহীন। এখন আর ভয় নেই, আগে ভয় করতাম। জানিস, আমি হয়তো আদালতে কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেব না। আমার মনে হচ্ছে আমার মধ্যে এখন এত শক্তি আছে যে আমি সব কিছু জয় করতে পারব, সব

দুঃখকষ্ট জয় করতে পারব, প্রতিনিয়ত নিজেকে শুধু এই টুকুই বলার জন্য যে আমি আছি! সহস্র যন্ত্রণার মধ্যেও আমি আছি। পীড়নে নিস্পেষিত হয়ে যন্ত্রণায় মুচড়ে যেতে যেতেও আমি আছি! কোথায় কোন্ একটা স্তম্ভের ভেতরে বসে আছি, তাও কিন্তু আমি আছি, সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে যদি নাও পাই তো জানি যে সে আছে। আর সূর্য যে আছে সেটা জানার জন্য সারাটা জীবন আছে। আলিয়োশা, ভাই রে, তুই আমার স্বর্গের দূত, রাজ্যের নানা দর্শন আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। চুলোয় যাক ওগুলো! আমাদের ভাই ইভান

“ভাই ইভানের কথা কী বলছ?” আলিয়োশা ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল। কিন্তু মিতিয়া তার কথায় কান দিল না।

“দ্যাখ, এ সমস্ত সন্দেহের কোনোটাই এর আগে আমার মনে কখনও কখনও ছিল না, তবে সব সময় আমার মধ্যে গোপনে লুকিয়ে ছিল। হয়তো আমার ভেতরে অজ্ঞাত সমস্ত আইডিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠত বলেই আমি মাতলামি করতাম, মারদাঙ্গা বাধাতাম, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতাম। আমার ভেতরের সেই ভাবগুলোকে আমি দূর করে দিতে চাইতাম, সেগুলোকে দমন করার জন্য, চাপা দেবার জন্য আমি মারপিট করতাম। আমাদের ভাই ইভান আবার রাকিতিন নয়, সে তার আইডিয়া গোপন করে রাখে। ইভান একটা স্ফিংকসের মতো রহস্যময়, চুপচাপ, কেবলই চুপ করে থাকে। এদিকে আমি মরছি ঈশ্বরের কথা ভেবে। এটাই আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা। যদি না থাকেন তাহলে কী হবে? কী হবে যদি রাকিতিনের কথাই সত্যি হয় যে মানব জাতির মনোজগতে এটা একটা কৃত্রিম আইডিয়া? তাহলে, যদি তিনি না-ই থাকেন তাহলে তো মানুষই এই পৃথিবীর, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বেসর্বা। চমৎকার! কিন্তু কথাটা এই যে ঈশ্বরকে বাদ দিলে সে মঙ্গলময় হবে কী করে? এটা একটা প্রশ্ন বটে। আমি বারবার এই প্রশ্ন করি। বলি, তাহলে কাকে সে ভালোবাসবে? মানুষ কাকে ভালোবাসবে, শুনি? কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে? কার নামকীর্তন করবে? রাকিতিন আমার কথায় হাসে। সে বলে ঈশ্বরকে বাদ দিলেও মানবজাতিকে ভালোবাসা সম্ভব। আরে, একটা শিকনিঝরা বদখত কেউ না হলে অমন কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে? আমি তো বুঝতে পারি না। রাকিতিনের কাছে জীবনটা সহজ। আমাকে আজ বলল, ‘তুমি বরং মানুষের নাগরিক অধিকার সম্প্রসারণের কাজে লেগে পড়, নয়তো অন্তত মাংসের দাম যাতে না বাড়ে সেই চেষ্টা কর, তাতে তোমার দর্শনচর্চার তুলনায় সহজ পথে, মানবপ্রেমের অনেক কাছাকাছি যেতে পারবে।’ এর জবাবেও আমি ওর ওপর এক হাত নিলাম, বললাম, ‘আরে তুমি তো, ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহলে তুমি নিজেই তো, তোমার হাতে থাকলে, ঠিক মাংসের দাম চড়িয়ে দেবে, কোপেক পিছু একটি করে রুবল দাঁও মারবে।’ আমার কথায় চটে লাল। সৎগুণটা তা হলে কী? আমার কথার জবাব দে আলেক্সেই। আমার কাছে সৎগুণ এক, আবার একজন চিনে মানুষের কাছে

আরেক জিনিস, তার মানে, আপেক্ষিক। না কি তা নয়? আপেক্ষিক নয় কি? একটা মারাত্মক প্রশ্ন। তুই কিন্তু হাসবি না, যদি আমি বলি এই নিয়ে ভেবে ভেবে আমার দু রাত ঘুম হয়নি। আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই, লোকে কী ভাবে বেঁচে আছে অথচ এই নিয়ে এতটুকু ভাবে না! মানুষের অসারতা! ইভানের কাছে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ওর আছে আইডিয়া। আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ও চুপ করে থাকে। আমার মনে হয় ও স্বাধীন ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন সদস্য।¨ আমি জিগগেস করেছিলাম, ও চুপ করে রইল। ওর মনের প্রস্রবণে সামান্য একটু তৃষ্ণার জল পাব আশা করেছিলাম, কিন্তু ও চুপ করে রইল। একমাত্র একবারই একটা কথা বলেছিল।

"কী বলেছিল?" আলিয়োশা লুফে নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জানতে চাইল।

"আমি ওকে বললাম 'যদি তা-ই হয়, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে সবেরই অনুমতি আছে?' শুনে ও ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'আমাদের বাপ ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ ছিল একটা আস্ত শুয়োর, কিন্তু তার ভাবনাচিন্তাগুলো সঠিক ছিল।' একটা কথা ছাড়ল বটে! এর বেশি আর কিছু বলল না। এ তো দেখছি রাকিতিনেরও বাড়া!"

"তা বটে", তার কথায় সায় দিয়ে তিক্ত ভাবে আলিয়োশা বলল।

"সে প্রসঙ্গ পরে হবে, এখন অন্য কথা। আজ পর্যন্ত ইভান সম্পর্কে তোকে আমি প্রায় কিছুই বলিনি। শেষ পর্যন্ত তুলেই রেখে দিয়েছিলাম। আমার এখানকার এই ব্যাপারটা যখন চুকে যাবে, আদালত যখন রায় দেবে তখন তোকে একটা কথা বলব। সব বলব। এখানে একটা বিষয় আছে যেটা ভয়ঙ্কর। এই বিষয়ে তুই হবি আমার বিচারক। কিন্তু এখন এই নিয়ে কোনো কথা শুরু করিস নে, এখন চুপ করে থাক। এই যে তুই আগামীকালের বিচারের কথা বলছিস, বিশ্বাস করবি কি না জানি না, আমি তার কিছুই জানি না।"

"তুমি কি ওই অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলেছিলে?"

"কীসের অ্যাডভোকেট! আমি তাকে সব কথা বলেছি। একটা মিটমিটে শহুরে বজ্জাত। বের্নার-এর জাতভাই! আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না—এক বিন্দুও বিশ্বাস করে না। ওর বিশ্বাস, আমি খুন করেছি! একবার ভেবে দ্যাখ্! আমি তো দেখতেই পাচ্ছি। বলি 'তাহলে আর আমার কৌঁসুলি হতে এসেছেন কী করতে?' নিকুচি করেছি ওগুলোর! আবার একজন ডাক্তারকেও ডেকে আনা হয়েছে, আমাকে পাগল বলে দেখাতে চায়। ওসব চলবে না! কাতেরিনা ইভানভ্‌না শেষ পর্যন্ত তার কর্তব্য পালন করে যেতে চায়। তাতে তার যত কষ্টই হোক না কেন!" মিতিয়া তিক্ত হাসি হাসল। "একটা বিড়াল বিশেষ! কঠিন হৃদয়! কিন্তু সে তো জানে, তখন মোক্রয়েতে আমি তার সম্পর্কে বলেছিলাম যে সে একটা দারুণ কোপনস্বভাবের নারী! কথাটা তার কানে লাগনোও হয়েছিল। তা হ্যাঁ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ জমতে জমতে সমুদ্রের বালুকণার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে! গ্রিগোরি তার

নিজের গোঁ ধরে বসে আছে। গ্রিগোরি লোকটা সৎ, কিন্তু বোকা। অনেক মানুষই সৎ, তবে সেটা বোকা হাঁদা হওয়ার দৌলতে। এটা রাকিতিনের মাথার চিন্তা। গ্রিগোরি আমার শত্রু। কোনো কোনো মানুষ আছে যাদের বন্ধু হিসেবে পাবার চেয়ে শত্রু হিসেবে পেলেই বরং লাভ। কথাটা বলছি কাতেরিনা ইভানভ্‌না প্রসঙ্গে। ওঃ আমার ভয় হচ্ছে, দারুণ ভয় হচ্ছে, ওই সাড়ে চার হাজার পাবার পর সে যে আভূমি নত হয়ে আমাকে সম্মান জানিয়েছিল সে কথা আদালতে বলে না বসে! শেষ পর্যন্ত, শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ করবে। চাই নে ওর আত্মত্যাগ! এগুলো আদালতে আমাকে লজ্জাই দেবে! সে লজ্জা আমি রাখব কোথায়? তুই যা আলিয়োশা, ওর কাছে গিয়ে বল, আদালতে যেন একথা না বলে। না কি পারবি না? যাক গে, চুলোয় যাক! এখন সব সমান, যা হোক করে সামলে নেব। ওর জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। যা করার নিজের ইচ্ছেতে করছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল হবে তো। আমি আমার নিজের বক্তব্য বলব, আলেক্সেই।" আবারও তার মুখে সেই তিক্ত হাসি। "শুধু শুধু বলতে চাই, কিন্তু গ্রুশা গ্রুশেন্‌কা হা ভগবান! সে কী দোষ করেছে যে তাকে এখন এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?" হঠাৎ বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল এসে গেল। "গ্রুশা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে, গ্রুশার চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি! আজ ও আমার কাছে এসেছিল।

"সে কথা আমায় বলেছে। আজ তোমার ব্যবহারে বড়ো দুঃখ পেয়েছে।"

"জানি। আমার এই স্বভাবটা আমার একটা আপদ হয়েছে। ঈর্ষা, ঈর্ষা! ওকে বিদায় দেবার সময় আমার অনুশোচনা হয়েছিল। আমি ওকে চুমু খেলাম। ক্ষমা অবশ্য চাইনি।"

"কেন চাওনি?" আলিয়োশা বিস্ময় প্রকাশ করল।

মিতিয়া আচমকা কেমন যেন উল্লসিত হয়ে উঠল।

"ওরে আমার লক্ষ্মী সোনা ছেলেটা, ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন, নিজের দোষ কবুল করে প্রণয়িনীর কাছে কখনও ক্ষমা ভিক্ষা করতে নেই! বিশেষ করে, হ্যাঁ, বিশেষ করে প্রণয়িনীর কাছে—তা তার কাছে তুমি যত অপরাধীই হও না কেন। কারণ এই যে স্ত্রী জাতিটাই ভাই—কী জানি ছাই, কী পদার্থ! তবে সে যা-ই হোক না কেন, আমি অন্তত তাদের সম্পর্কে বেশ খানিকটা জানি! তা একবার তার সামনে তোমার নিজের দোষ স্বীকার করার চেষ্টা করে দেখই না, একবার বলে দেখ না, 'অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা কর, মাফ কর'—আর দেখতে হবে না!—সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে নেমে আসবে বকুনির বর্ষণ! কোনো মতেই সোজাসুজি, সরাসরি তোমাকে ক্ষমা তো করবেই না বরং তোমাকে লাঞ্ছনার একশেষ করে, তুলোধুনো করে ছাড়বে, এমন এমন সব জিনিস টেনে বার করবে যার কস্মিনকালে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কিছু করতে বাদ রাখবে না, কিছু ভোলার পাত্রী সে নয়,

সেই সঙ্গে নিজের মন থেকে আরও কিছু যোগ করবে, একমাত্র তারপরই তোমাকে ক্ষমা করবে। তাও আবার করবে তারাই যারা একটু ভালো, এদের মধ্যে যারা ভালো তারাই করবে। রাজ্যের যত জঞ্জাল সব চেঁছেপুঁছে তুলে তোমার মাথায় চাপিয়ে দেবে। জ্যান্ত ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেবার এমনই একটা প্রবৃত্তি আছে ওদের—এ আমি তোকে বলে দিচ্ছি। আর এরা হল গিয়ে আমাদের স্বর্গের দেবী, যাদের বাদ দিয়ে আমাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব, অথচ এরা সবাই এই একই রকম, একজনও এর ব্যতিক্রম নয়। দ্যাখ রে লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আমি খোলাখুলি সহজ ভাষায় তোকে বলে দিচ্ছি, যে-কোনো শিষ্ট-মানুষকে কোনো না কোনো মহিলার তাঁবে থাকতে হয়। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দৃঢ়বিশ্বাস বলব না, আমার মনের উপলব্ধি। এতে কোনো কলঙ্ক পুরুষমানুষকে স্পর্শ করে না। কোনো বীরপুরুষকে পর্যন্ত স্পর্শ করে না, কোনো রাজামহারাজাকেও নয়! তা সে যাই হোক না কেন, কোনো কিছুর জন্য ক্ষমা চাইতে যাবি না, কক্‌খনো না। মনে রাখবি এই নিয়মটা যা তোকে শিখিয়ে দিল তোর দাদা মিতিয়া, যে মেয়েদের পাল্লায় পড়ে মরতে বসেছে। না আমি গ্রুশার কাছে ক্ষমা না চেয়ে বরং অন্য কোনো ভাবে তার কাজে লাগতে চাই। আমি ওকে পুজো করি আলেক্সেই, পুজো করি! তবে সেটা ওর চোখে পড়ে না, ওর কেবলই মনে হয় আমার প্রেমে ঘাটতি আছে। ও আমাকে যন্ত্রণায় কাতর করে তোলে, ওর প্রেমে আমি কাতর হয়ে পড়ি। অতীতে যা ছিল সে তো কিছুই না! তখন শুধু ওর দেহের নারকীয় প্যাঁচগুলোতে আমি কাতর হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন? এখন ত পুরোপুরি ওর অন্তরটাকেই আমি আমার নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আর ওর মাধ্যমেই না আমি নিজে একজন মানুষ হয়ে উঠেছি! ওরা কি আমাদের বিয়ে দেবে? যদি না দেয় তা হলে আমি ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে শেষ পর্যন্ত মারাই যাব। এই রকমই কিছু একটা রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার সম্পর্কে ও কী বলেছে তোকে?”

সেদিন গ্রুশেন্‌কা আলিয়োশাকে যা যা বলেছিল সে সবেরই পুনরাবৃত্তি করল আলিয়োশা। মিতিয়া সেই বিশদ বিবরণ শুনল, অনেক কিছু কয়েকবার জিগ্‌গেস করে ভালোভাবে জেনে নিল। তাকে সন্তুষ্টই দেখাল।

“তা হলে, আমার ঈর্ষা হয়েছে বলে আমার ওপরে রাগ করছে না?” সে বলে উঠল। যে মেয়েমানুষ আর কাকে বলে! আমার নিজেরই হৃদয়টা কঠিন। আহা, এ রকম কঠিন হৃদয়ই আমার পছন্দ! যদিও বরদাস্ত করতে পারি না যদি কেউ আমাকে ঈর্ষা করে, একদম বরদাস্ত করতে পারি না! আমাদের মধ্যে চুলোচুলি হবে। কিন্তু ওকে আমি ভালোবাসব—চিরকাল ভালোবাসব। আমাদের বিয়ে হতে দেবে কি? সশ্রম কারাদণ্ডভোগীদের কি বিয়ে করতে দেয়? এটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু ওকে ছাড়া আমি বাঁচবও না যে।

মিতিয়া ভুরু কুঁচকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াল। ঘরের মধ্যে প্রায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। হঠাৎ তাকে দারুণ উদ্বিগ্ন দেখাল।

"তাহলে বলছে গোপন একটা কিছু আছে, কোনো গোপন রহস্য আছে—এই ত? বলতে চাইছে ওর বিরুদ্ধে আমার, আমাদের তিনজনের একটা চক্রান্ত চলছে, আর এর মধ্যে 'কাতিয়াটাও' জড়িত আছে? না ভাই গ্রুশেন্‌কা, ব্যাপারটা তা নয়। তোমার বোকাটে মেয়েলি কল্পনার যা বিস্তার তাতেই কিন্তু তুমি এখানে ভুলটা করে বসলে! আলিয়োশা, ভাই আমার, ওঃ কোথায় গড়িয়েছে, একবার দ্যাখ! তাহলে শোন, আমাদের রহস্যটা তোকে খুলে বলি!"

সে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। আলিয়োশা তার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে সে আলিয়োশার গা ঘেঁষে দাঁড়াল এবং রহস্যজনক ভাব করে আলিয়োশার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল, যদিও ধারে কাছে এমন কেউ ছিল না যে ওদের কথা শুনতে পায়। বুড়ো পাহারাদারটা ঘরের এক কোনায় বেঞ্চের ওপর বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, আর নজরদার সৈন্য যারা ছিল তাদের কানে ওদের একটি কথাও পৌঁছুনোর কথা নয়।

"আমি তোর কাছে আমাদের পুরো রহস্যটা খুলে বলছি!" মিতিয়া তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে বলল। "অমনিতেই ইচ্ছে ছিল পরে খুলে বলব, কারণ তোকে বাদ দিয়ে কি আর কোনও বিষয়ে মীমাংসায় আসতে পারি? তুইই আমার সব। আমি যদিও বলি যে ইভান আমাদের সবার ওপরে, কিন্তু তুই হলি আমার কাছে নিষ্পাপ দেবশিশু। একমাত্র তোর সিদ্ধান্তেই মীমাংসা হবে। হয়তো ইভান নয়, তুইই আমাদের সবার ওপরে। বুঝলি কিনা এটা হল একটা বিবেকের প্রশ্ন, উঁচু দরের বিবেকের প্রশ্ন—রহস্যটার গুরুত্ব এতটাই যে আমার নিজের পক্ষে তাকে কব্‌জা করা সম্ভব নয়, অনেক দিন হলই তোকে বলব-বলব করছিলাম। তবে সে যাই হোক না কেন, এখনও স্থির করার মতো সময় আসেনি, কেন না বিচারের রায়দান পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। রায় বেরোবে, তখনই তুই আমার ভাগ্য নির্ধারণ করিস। এখন স্থির করার দরকার নেই। আমি এখন তোকে সব কথা বলব, তুই শুনে যা, কিন্তু এখনই কোন সিদ্ধান্তে আসিস না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনে যা। পুরোটা অবশ্য খুলে বলব না। বিশদ বিবরণ না দিয়ে তোকে শুধু আইডিয়াটার কথাই বলব। তুই চুপচাপ থাকবি। কোনো প্রশ্ন নয়, নড়াচড়া নয়—রাজি? কিন্তু হা ভগবান। তোর চোখ যাবে কোথায়? আমার আশঙ্কা হচ্ছে তুই চুপ করে থাকলেও তোর চোখদুটো ঠিক বলে দেবে তুই কী ঠিক করেছিস। ওঃ, কী ভয়ই না হচ্ছে আমার! শোন্ তাহলে আলিয়োশা। ইভান আমাকে পালাতে বলছে। বিস্তারিত কিছু বলব না। সব রকম সাবধানতা নেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থা হয়েই যেতে পারে। তোকে চুপ করে থাকতে বলছি, কোনও সিদ্ধান্ত করে বসিস না। গ্রুশাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে আমেরিকায় চলে যেতে হবে। বুঝতেই পারছিস, গ্রুশাকে ছাড়া আমার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব!

আমাকে যদি ওরা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয় আর গ্রুশাকে যদি আমার সঙ্গে ওখানে যেতে না দেয় তাহলে আমার কী হবে বল তো? কয়েদিদের কি আর বিয়ে করতে দেয় যে সঙ্গে করে ওখানে নিয়ে যেতে পারব? ভাই ইভান বলল, দেয় না। কিন্তু গ্রুশা না থাকলে সেখানে খনির অন্ধকার গর্ভে হাতুড়ি নিয়ে আমি কাটাব কী করে? ওই হাতুড়ি দিয়ে নিজের মাথাটা চুরমার করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না আমার! কিন্তু অন্য দিকে বিবেক? আমার বিবেক? যন্ত্রণা ভোগ না করে কিনা পালিয়ে গেলাম! একটা নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা কিনা নাকচ করে দিলাম! আত্মশুদ্ধির পথ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলাম! ইভান বলছে, এখানে মাটির তলায় কাজ করে যা হবে আমেরিকায় 'সদিচ্ছা থাকলে' তার চেয়ে বেশি কাজের কাজ হবে। কিন্তু তাহলে আমাদের পাতাল রাজ্যের স্তবগানটা কোথায় তৈরি হবে শুনি? আমেরিকা কী? সেও তো আবার একটা ফাঁকিবাজি! আমার তো মনে হয় আমেরিকাতেও ঠক জোচ্চুরির রমরমা। ক্রুশে বিঁধে মরার হাত থেকে পালিয়ে যেতে হবে! তোকে এই কথা বলছি কেন আলেক্সেই, কারণ একমাত্র তুই-ই এটা বুঝতে পারবি, আর কেউ পারবে না। ওই যে পাতাল রাজ্যের স্তবগান সম্পর্কে তোকে যা যা বললাম অন্যদের চোখে সে সবই একটা বোকামি, প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নেই। লোকে বলবে হয় পাগল হয়ে গেছে নয়তো বোকা। কিন্তু আমি পাগল হইনি, বোকা হাঁদাও নই। স্তবগানের ব্যাপারটা ইভানও বোঝে, বেশ ভালোই বোঝে, শুধু কোনও উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে। স্তবগানে ওর অবশ্য বিশ্বাস নেই। কথা বলিস নে, কথা বলিস নে। আমি দেখতে পাচ্ছি তুই কেমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছিস! তুই এরই মধ্যে কিছু একটা স্থির করে ফেলেছিস! কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করিস নে, আমাকে ক্ষমা করিস! গ্রুশাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর!"

মিতিয়া হতবিহ্বলের মতো তার কথা শেষ করল। সে দু হাতে আলিয়োশার গলা জড়িয়ে ধরল, জ্বরতপ্তের মতো আরক্ত টসটসে তৃষিত চোখের দৃষ্টি তার ভাইয়ের চোখের ওপর স্থির নিবদ্ধ করে তাকিয়েই রইল তার দিকে।

"কয়েদিদের কি আর বিয়ে করতে দেয়?" এই নিয়ে তিন বার অনুনয়ের সুরে সে তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

আলিয়োশা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তার কথা শুনল। সে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

"একটা কথা আমায় বল দেখি", শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'ইভান কি এই নিয়ে খুব পীড়াপীড়ি করছে? প্রথমে কার মাথা থেকে এটা বেরিয়েছিল?"

"কার আবার? ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। ও-ই পীড়াপীড়ি করছে! এত কাল আমার কাছে আসেনি, হপ্তাখানেক আগে হঠাৎ এসে হাজির। সরাসরি এই দিয়েই কথা শুরু করল। ভীষণ পীড়াপীড়ি করছে। অনুরোধ তো নয়, হুকুম। আমি

যে ওর কথার বাধ্য হব এ বিষয়ে ওর কোনও সন্দেহ নেই, যদিও তোর কাছে যেমন তেমনি ওর কাছেও আমি আমার মনের কোনো কথাই খুলে বলতে বাকি রাখিনি। স্তবগানের কথাও বললাম। ব্যাপারটা কী ভাবে ঘটাবে ও আমাকে তার বিবরণ দিল, বলল খোঁজখবর নিয়ে সব ঠিক করে রেখেছে। তা ও কথা পরে হবে। এমন করে চাইছে যে মনে হয় খেপেই গেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা টাকা। পালানোর খরচ বাবদ দশ হাজার দেবে, আর আমেরিকার জন্য বিশ হাজার। বলল, দশ হাজারে আমরা পালানোর চমৎকার বন্দোবস্ত করে ফেলব।”

“তাহলে তোমাকে বলল, আমাকে যেন একেবারেই জানানো না হয়?” আলিয়োশা আবার জিগ্‌গেস করল।

“একেবারেই নয়, কাউকে নয়, বিশেষ করে তোকে—তোকে তো কোনো মতেই নয়! ওর নির্ঘাত ভয়, পাছে আমার সামনে তুই আমার বিবেকের মতো হয়ে উঠিস। তোকে যে বলে দিয়েছি একথা ওকে বলিস নে কিন্তু। একদম না!”

“তুমি ঠিকই বলেছ”, আলিয়োশা তার মত প্রকাশ করল, “বিচারে কী হয় তা শোনার আগে কোনো কিছু স্থির করা অসম্ভব। বিচারের রায় বেরোবার পর তুমি নিজেই ঠিক কোরো। তখন তুমি নিজেই নিজের মধ্যে নতুন মানুষের সন্ধান পাবে, সে-ই স্থির করে দেবে।”

“নতুন মানুষ, না বের্নার! আরে বের্নার হলে সে ত বের্নারী পন্থাতেই স্থির করবে! কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি নিজেই একটা জঘন্য বের্নার!” দাঁত বের করে তিক্ত হাসল মিতিয়া।

“তাহলে কি, তাহলে কি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো আশাই তুমি কর না, দাদা?”

মিতিয়ার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল, ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধদুটো ওপরে তুলে হতাশ ভাবে সে মাথা নাড়ল।

“আলিয়োশা, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোর এখন যাবার সময় হয়ে গেছে!” হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে বলে উঠল। “বাইরের উঠোনে সুপারিনটেন্ডেন্ট হাঁকডাক করছে, এখনই এখানে এসে যাবে। আমাদের দেরি হয়ে গেছে, শৃঙ্খলাভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। আয়, শিগ্‌গির আয়, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধর, চুমু খা, আমার ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর ভাই, আমার আগামীকালের ক্রুশের কথা ভেবে প্রার্থনা কর। ”

ওরা দুজনে একে অন্যকে আলিঙ্গন করল, চুমু খেল।

“এদিকে ইভানের কথা শোন”, হঠাৎ মিতিয়া বলে উঠল, “আমাকে পালানোর প্রস্তাব দিল বটে, কিন্তু ওর নিজের বিশ্বাস আমি খুন করেছি!”

বিষণ্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ওষ্ঠপ্রান্তে।

"তুমি কি ওকে জিগ্‌গেস করেছিলে ও বিশ্বাস করে কিনা?" আলিয়োশা জানতে চাইল।

"না, জিগ্‌গেস করিনি। জিগ্‌গেস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু করতে পারিনি। সাধ্যে কুলোল না। তা সে যা-ই হোক না কেন, ওর চোখ দেখে আমি বুঝে গেছি। আচ্ছা, এবারে বিদায়!"

আরও একবার ওরা তাড়াতাড়ি করে পরস্পরকে চুমু খেল। আলিয়োশা বেরিয়েই যাচ্ছিল, এমন সময় মিতিয়া আবার তাকে ডাকল।

"আমার সামনা সামনি একবার দাঁড়া, এই যে এইভাবে।"

এই বলে সে আবারও গভীর আবেগে দু হাতে আলিয়োশার গলা জড়িয়ে ধরল। তার মুখটা হঠাৎ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এতই ফ্যাকাশে হয়ে গেল যে অন্ধকারে ভীষণভাবে চোখে পড়ার মতো। ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল, চোখের দৃষ্টি আলিয়োশার ওপর স্থির নিবদ্ধ হল।

"পরমেশ্বরের সামনাসামনি হলে যেমন বলতিস আমাকেও তেমনি খাঁটি সত্যি কথাটা বল্ দেখি আলিয়োশা—তুই কি বিশ্বাস করিস আমি খুন করেছি, নাকি করিস না? তুই, তুই নিজে বিশ্বাস করিস কি করিস না? খাঁটি সত্যি কথাটা বল্, মিথ্যে বলিস নে!" উন্মত্তের মতো সে চিৎকার করে বলল তাকে।

আলিয়োশার সামনে সব কিছু কেমন যেন দুলে উঠল আর তার বুকের ভেতরে, সে যেন শুনতে পেল, খচ্ করে ধারাল কী একটা এসে বিঁধল।

"হয়েছে! কী যে বল তুমি। থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে সে বলল।

"খাঁটি সত্যি কথাটা বল, সত্যি করে বল, মিথ্যে বলিস নে!" মিতিয়া পুনরাবৃত্তি করল।

"এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করতে পারিনি যে তুমি খুনি!" হঠাৎ আলিয়োশার বুকের ভেতর থেকে কম্পিত কণ্ঠে বেরিয়ে এলো কথাগুলি। ডান হাতটা সে এমন ভাবে ওপরে তুলল যেন নিজের এই কথাগুলির জন্য ঈশ্বরকে ডেকে সাক্ষী মানছে।

মিতিয়ার সারা মুখ জুড়ে পরম পুলকের উল্লাস খেলে গেল।

"তোকে ধন্যবাদ!" এমন ভাবে টেনে টেনে সে উচ্চারণ করল যে মনে হল মূর্ছা যাবার পর এই যেন প্রথম নিশ্বাস ফেলছে। "এবারে তুই আমাকে পুনর্জন্ম দান করলি। বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, এর আগে পর্যন্ত তোকে জিগ্‌গেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। তোকে কিনা আমার ভয়! আমার ভয় কিনা তোকে! আয়, এবারে আয়! আগামীকালের মুখোমুখি হওয়ার মতো বল তুই আমাকে দিলি। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন! আচ্ছা, যা। ইভানকে ভালোবাসিস কিন্তু!" এই বলে মিতিয়া তার কথা শেষ করল।

আলিয়োশা অশ্রুসজল চোখে বেরিয়ে এলো। মিতিয়ার এই মাত্রায় সন্দেহপ্রবণতা,

এমনকি তার প্রতি—আলিয়োশার প্রতি পর্যন্ত এই যে এত বেশি মাত্রায় অবিশ্বাস—সব মিলে আলিয়োশার সামনে তার হতভাগ্য দাদাটির অন্তরের এমন এক অতলস্পর্শী প্রতিকারহীন দুঃখ ও নৈরাজ্যের ছবি মেলে ধরল যে সে সম্পর্কে এর আগে তার মনের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও কোনো সন্দেহ উঁকি মারেনি। মুহূর্তের মধ্যে একটা গভীর অপরিসীম সমবেদনা অকস্মাৎ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, যন্ত্রণায় আকুল করে তুলল। তার ভাঙা বুকের ভেতরটা ভয়ঙ্কর বেদনায় মুচড়ে উঠল। 'ইভানকে ভালোবাসিস'—হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মিতিয়ার এখনকার এই কথাগুলি। ইভানের কাছেই তো সে যাচ্ছিল! অবশ্য সকালেই ইভানের সঙ্গে দেখা করাটা তার ভীষণ দরকার ছিল। মিতিয়ার জন্য আলিয়োশার যে উদ্বেগ তার চাইতে ইভানের জন্য উদ্বেগও কোন অংশে কম নয়—আর এখন দাদা মিতিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তো বটেই।

## পাঁচ

## তুমি নও, তুমি নও!

ইভানের কাছে যাবার পথে কাতেরিনা ইভানভ্‌না যেই বাড়িতে থাকত তার পাশ দিয়ে তাকে যেতে হল। জানলায় আলো জ্বলছিল। আলিয়োশা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ঠিক করল ভেতরে যাবে। আজ এক সপ্তাহের ওপরে হয়ে গেল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ নেই। কিন্তু এখন তার মাথায় এই চিন্তা ঢুকল যে ইভান এই সময় কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়িতে থাকলেও থাকতে পারে—বিশেষত অমন একটা দিনের প্রাক্কালে। দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে সে সিঁড়ির মুখে ঢুকল। চিনে লণ্ঠনের আলোয় স্বল্প আলোকিত এই জায়গাটিতে আসার পর দেখতে পেল কে একজন ওপর থেকে নিচে নেমে আসছে। কাছাকাছি হতে চিনতে পারল লোকটি আর কেউ নয়—তার দাদা ইভান। দেখা গেল ইভান ইতিমধ্যেই কাতেরিনা ইভানভ্‌নার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।

"ও তুই, তা-ই বল্", শুষ্ককণ্ঠে ইভান ফিয়োদরভিচ বলল। "আচ্ছা চলি। ওর কাছে যাচ্ছিস বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার পরামর্শ যদি নিস তাহলে বলব যাস নে। 'বিগড়ে আছে'। তুই আরও বেশি মন খারাপ করে দিবি।"

মুহূর্তের মধ্যে ওপরের একটা দরজা খুলে গেল, ওপর থেকে শোনা গেল একটি কণ্ঠের চিৎকার:

"না, না! আপনি কি ওর কাছ থেকে আসছেন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্?"

"হ্যাঁ, আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম।"

"আমার জন্য কিছু বলে পাঠিয়েছেন কি? ভেতরে আসুন আলিয়োশা, আর ইভান ফিয়োদরভিচ, আপনিও আসুন, অবশ্যই, অবশ্যই ফিরে আসুন। শুন্-ছেন?"

কাতিয়ার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুর ছিল যে ইভান ফিয়োদরভিচ এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর শেষ পর্যন্ত আলিয়োশার সঙ্গে ওপরে ওঠাই মনস্থ করল।

"আড়ি পেতে শুনছিল!" বিরক্ত হয়ে আপন মনে ফিসফিস করে বলল। কিন্তু তার কথা আলিয়োশার কানে গেল না।

"অনুমতি হয় ত গায়ের ওভারকোটটা আর ছাড়ছি না", হলঘরে ঢুকতে ঢুকতে ইভান ফিয়োদরভিচ বলল। "আমি বসব না। মিনিট খানেকের বেশি থাকছি না।"

"বসুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ", কাতেরিনা ইভানভ্না বলল। নিজে অবশ্য দাঁড়িয়েই রইল। এই সময়ের মধ্যে তার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি, কিন্তু তার কালো চোখদুটিতে এমন একটা কিছু ঝলক দিচ্ছিল যা অনর্থসূচক। আলিয়োশার পরে মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"কী জানাতে বলেছে শুনি?"

"মাত্র একটি কথাই", সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আলিয়োশা বলল, "বলেছে, আপনি যেন নিজেকে রেহাই দেন এবং খানিকটা ইতস্তত করেই বলল, "ওই শহরে আপনাদের একেবারে প্রথম পরিচয়ের সময় আপনাদের দুজনের মধ্যে যা হয়েছিল সে ব্যাপারে যেন মুখ না খোলেন।

"ও, সেই টাকার জন্য তার সামনে আভূমি নত হওয়ার ঘটনাটা ত!" সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে তিক্ত হেসে সে বলল, "কেন, ও কি নিজের জন্য ভয় পাচ্ছে, না কি আমার জন্য? অ্যাঁ? ও বলেছে আমি যেন রেহাই দিই — কাকে বলুন ত? ওকে না নিজেকে? বলুন আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ, বলুন।"

আলিয়োশা নিবিষ্ট হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তাকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল

"যেমন নিজেকে, তেমনি ওকেও", মৃদুস্বরে সে বলল।

"সেটাই ত কথা! হঠাৎ লাল হয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে কেটে কেটে সে বলল, "আপনারা এখনও আমাকে চেনেন না, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ", হুমকির সুরে সে বলল, "তা ছাড়া আমি নিজেও এখনও নিজেকে জানি না। আগামীকালের জেরার পর হয়ত এমনও হতে পারে যে আপনারা আমাকে পায়ের তলায় পিষে মারতে চাইবেন।"

"আপনি সততার সঙ্গে এজাহার দেবেন", আলিয়োশা বলল, "শুধু এটাই দরকার।"

"মেয়েদের অনেক সময় সততা বোধ থাকে না", দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল। "এই এক ঘণ্টা আগেও আমি ভেবেছিলাম লোকটা একটা নরপিশাচ, তার সংসর্গ... আমার কাছে একটা বিষাক্ত সাপের মতোই ভয়াবহ কিন্তু না, তা ত নয় —

আমার কাছে এখনও সে মানুষ! কিন্তু ও কি খুন করেছিল? ও-ই কি খুন করেছিল?" দ্রুত ইভান ফিয়োদরভিচের দিকে ঘুরে হঠাৎ হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল সে। আলিয়োশা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল এ প্রশ্ন সে ইভান ফিয়োদরভিচকে এর আগেও করেছে — হয়ত তার আসার মাত্র মিনিটখানেক আগেও করেছে এবং সেটাই প্রথম বার নয়, হয়ত এই নিয়ে এক শ বার করা হয়ে গেছে, শেষকালে নিজেদের মধ্যে কলহ হয়েছে।

"আমি স্মের্দিকোভের কাছে গিয়েছিলাম। তুমি, তুমিই আমাকে বুঝিয়েছ যে দ্মিত্রি পিতৃহন্তা। শুধু তোমাকে বিশ্বাস করলেই হল!" ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে উদ্দেশ্য করেই সে বলে চলল। ইভান এক ধরনের চেষ্টাকৃত হাসি হাসল। কাতেরিনার মুখে এই 'তুমি' সম্বোধনটা শুনে আলিয়োশা চমকে উঠল। ওদের দুজনের মধ্যে যে এ ধরনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে সে রকম কোন সন্দেহই এর আগে তার মনে জাগে নি!

"সে যাই হোক, অনেক হয়েছে", প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে ইভান বলে উঠল। "আমি চললাম। কাল আসব।" বলেই তৎক্ষণাৎ ঘুরে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে চলল।

কাতেরিনা ইভানভ্‌না হঠাৎ কেমন যেন একটা কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে আলিয়োশার হাতদুটো চেপে ধরল।

"ওর পেছন পেছন যান! ছুটে গিয়ে ওকে ধরুন! এক মিনিটের জন্যও ওকে একা থাকতে দেবেন না", দ্রুত ফিসফিস করে সে বলল। "ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনি কি জানেন না ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? স্নায়ুবিকারের ফলে ওর জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে! ডাক্তার আমাকে বলেছে। যান, ছুটে গিয়ে ওকে ধরুন।

আলিয়োশা এক লাফে বেরিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচের পিছন পিছন ছুটল। সে অবশ্য তখনও পঞ্চাশ পা দূরেও যেতে পারে নি।

"তোর আবার কী চাই?" আলিয়োশা ওর পিছু ধাওয়া করেছে দেখে হঠাৎ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বলল। "ও, তোকে আমার পিছু ধাওয়া করতে বলেছে, কারণ আমি পাগল হয়ে গেছি? ওসব আমার মুখস্থ আছে", বিরক্তির সঙ্গে সে যোগ করল।

"ওটা তার অবশ্যই একটা ভুল। তবে তুমি যে অসুস্থ সেটা সে ঠিকই বলেছে", আলিয়োশা বলল। "আমি এই মাত্র ওর ওখানে তোমার মুখটা দেখলাম ত — তোমার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি খুব খুবই অসুস্থ, ইভান!"

ইভান থামল না, যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। আলিয়োশাও তার পিছন পিছন চলল।

"এই যে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ মহাশয়, মহাশয়ের জানা আছে কি লোকে

কী করে পাগল হয়?" হঠাৎ একেবারে শান্তকণ্ঠে ইভান জিগ্‌গেস করল। এখন আর তার কণ্ঠে একেবারেই কোন বিরক্তির ভাব নেই, সে জায়গায় আচম্বিতে যেটা কানে এসে বাজল তা ছিল নিছক সরল মনের একটা কৌতূহল।

"না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি পাগলামির অনেক রকম ধরন আছে।"

"আচ্ছা কেউ যদি পাগল হয়ে যায় নিজেকে নিরীক্ষণ করে সে কি তা বুঝতে পারে?"

"আমার মনে হয় এরকম ক্ষেত্রে নিজেকে নিরীক্ষণ করা অসম্ভব", অবাক হয়ে আলিয়োশা উত্তর দিল। ইভান আধ মিনিটমতন চুপ করে রইল।

"তোর যদি আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে থাকে তাহলে দয়া করে প্রসঙ্গটা পালটা", হঠাৎ সে বলে উঠল।

"ও এই যে, তোমার জন্য একটা চিঠি আছে—সেটা আবার ভুলে না যাই", সলজ্জ ভাবে এই কথা বলে ইভানকে লেখা লিজার চিঠিটা পকেট থেকে বের করে সে তার দিকে বাড়িয়ে দিল। ঠিক সেই সময় তারা রাস্তার একটা ল্যাম্প পোস্টের কাছে এসেও গিয়েছিল। ইভান তৎক্ষণাৎ হাতের লেখাটা চিনতে পারল।

"ও সেই খুদে শয়তানটার কাছ থেকে!" বিদ্বেষের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। খামটা না খুলেই হঠাৎ কুটি কুটি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় ছুড়ে দিল। কুটিগুলো উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"বয়স তো মনে হয় ষোলও হয়নি, এখনই কেমন নিজেকে নিবেদন করছে দেখ!" নাক সিঁটকে এই কথা বলে সে আবার সামনে পা বাড়াল।

"নিবেদন করছে মানে?" আলিয়োশা বলে উঠল।

"নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষেরা কী করে তাও বলে দিতে হবে নাকি?"

"কী বলছ!" বলছ কী তুমি দাদা!" উত্তেজিত হয়ে মেয়েটির পক্ষ নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে আলিয়োশা বলল। "সে একটা শিশু, একটা শিশুকে তুমি এই ভাবে আঘাত করছ! সে অসুস্থ, সে নিজেই খুব অসুস্থ, বলা যায় না হয়তো তারও মস্তিষ্ক বিকৃতি হতে চলেছে। ওর চিঠিটা তোমাকে না দিয়ে আমার কোনো উপায় ছিল না।... আমার বরং আশা ছিল তোমার মুখ থেকে এমন কিছু শুনতে পাব যাতে ওকে উদ্ধার করা যায়।"

"আমার মুখ থেকে তোর শোনার মতো কিছু নেই। ও যদি শিশুই হয় আমি তো আর তাই বলে ওর দেখভাল করার চাকরানি নই। চুপ কর আলেক্সেই। আর কথা বাড়াস নে। আমি এ নিয়ে আদৌ ভাবছি না।"

আবার দুজনে মিনিটখানেকের মতো চুপচাপ।

"ও এখন সারা রাত ধরে দেব জননীর কাছে প্রার্থনা করবে, আগামীকাল

আদালতে ওর কী করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ চাইবে", বিদ্বেষের জ্বালাধরা কটু কণ্ঠে হঠাৎ সে আবার বলতে শুরু করল।

"তুমি তুমি কি কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। মিতিয়াকে উদ্ধারকর্ত্রী হয়ে দেখা দেবে না কি তার অনিষ্ট করার জন্য দেখা দেবে? প্রার্থনা করবে অন্তরের আলোর সন্ধানে। নিজে নাকি এখনও জানে না, মনস্থির করে উঠতে পারেনি। ওর ইচ্ছে ওকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াই!"

"তা হতে পারে। তবে ওর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।

"উনি মনোকষ্টে আছেন। কেন তুমি মাঝে মাঝে ওঁকে এমন কথা বল যাতে ওঁর মনের মধ্যে আশা জেগে ওঠে?" মৃদু ভর্ৎসনার সুরে আলিয়োশা বলতে লাগল। "আমি তো জানি তুমি ওকে আশা দিয়েছ। মাফ করবে আমাকে এমন কথা বলার জন্য", সে যোগ করল।

"এক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার করা উচিত তা আমি করতে পারছি না, ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং সরাসরি সে কথা ওকে বলতে পারছি না!" বিরক্তির সঙ্গে ইভান বলল। "খুনির দণ্ডবিধান যতক্ষণ ঘোষণা করা না হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এখন যদি আমি ওর সংশ্রব ত্যাগ করি তাহলে আমার ওপর প্রতিহিংসার বশে কালই আদালতে সে ওই হতভাগার সর্বনাশ ঘটাবে, কেন না সে ওকে ঘৃণা করে, জানে যে ঘৃণা করে। এখানে সবই মিথ্যা, মিথ্যার ওপর মিথ্যা! এখন কথাটা হচ্ছে যতক্ষণ না আমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছি ততক্ষণ ও আশা করে থাকবে এবং ওই নৃশংস অত্যাচারীটার সর্বনাশ করতে যাবে না, যেহেতু জানে আমার খুবই ইচ্ছে ওটাকে বিপদ থেকে বের করে আনি। কখন যে এই পোড়ার রায়টা বেরোবে!"

'খুনি' আর 'নৃশংস অত্যাচারী'—এই কথাগুলি আলিয়োশার বুকে শেল হয়ে বাজল।

"কিন্তু এমন কী থাকতে পারে যা দিয়ে মিতিয়ার সর্বনাশ ঘটাতে পারে?" ইভানের কথায় চিন্তিত হয়ে সে প্রশ্ন করল। এমন কী এজাহার দিতে পারে যাতে মিতিয়ার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে?"

"সেটা তুই এখনও জানিস না। ওর হাতে মিতিয়ার নিজের হাতে লেখা এমন একটা প্রমাণপত্র আছে যাতে গণিতের নিয়মে প্রমাণ হয়ে যাবে সে-ই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচকে খুন করেছে।"

"হতেই পারে না!" আলিয়োশা চিৎকার করে উঠল।

"হতে পারে না মানে? আমি নিজে পড়েছি।"

"অমন প্রমাণপত্র থাকতেই পারে না!" উত্তেজিত হয়ে আলিয়োশা পুনরাবৃত্তি করল। "হতেই পারে না, কেন না খুনি ও নয়। বাবাকে খুন করেনি, ও করেনি!"

ইভান ফিয়োদরভিচ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তাহলে আপনার মতে খুনিটা কে, শুনি?" কেমন যেন নিস্পৃহ কণ্ঠে সে জিগ্‌গেস করল—তার ভাব দেখে অন্তত তাই মনে হল। এমনকি প্রশ্নটার মধ্যে কেমন যেন একটা দম্ভের সুরও ফুঠে উঠল।

"তুমি নিজেই জান, কে", মৃদু ও মর্মস্পর্শী কণ্ঠে আলিয়োশা বলল।

"কে? ওই খ্যাপা ইডিয়ট মৃগীরোগীটাকে নিয়ে সেই গল্পকথা? স্মের্দিকোভের কথা বলবি তো?"

আলিয়োশা হঠাৎ অনুভব করল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

"তুমি নিজেই জান, কে", অসহায়ভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। সে হাঁপাতে লাগল।

"কিন্তু কে? কে?" এবারে প্রায় হিংস্র গর্জন করে উঠল। তার এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ হঠাৎ ভেঙে গেল।

"আমি শুধু একটা কথাই জানি", সেই আগের মতোই প্রায় ফিসফিস করে আলিয়োশা বলল। "বাবাকে খুন তুমি করনি।"

"'তুমি করনি!' তুমি করনি মানে?" ইভান স্তম্ভিত।

"তুমি খুন করনি বাবাকে, তুমি করনি!" দৃঢ়কণ্ঠে আলিয়োশা পুনরাবৃত্তি করল।

আধ মিনিট মতন স্থায়ী হল নীরবতা।

"আরে আমি যে করিনি সে তো আমি নিজেই জানি! তুই কি প্রলাপ বকছিস নাকি?" পাণ্ডুর মুখটা বেঁকিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে ইভান বলল। তাকে দেখে মনে হল সে যেন চোখের দৃষ্টিতে আলিয়োশাকে বিদ্ধ করছে। দুজনেই আবারও দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা ল্যাম্পপোস্টের ধারে।

"না, দাদা, তুমি বেশ কয়েক বার নিজের মনে বলেছ যে তুমিই খুনি।"

"কখন বললাম আবার? আমি মস্কোয় ছিলাম। কখন বললাম, শুনি?" একেবারে হতচকিত হয়ে আমতা-আমতা করে ইভান বলল।

"তুমি নিজের মনে, এ কথা অনেক বার বলেছ, এই ভয়ঙ্কর দু মাস সময়ের মধ্যে, যখন তুমি একা ছিলে", আগের মতোই মৃদুস্বরে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে আলিয়োশা বলে চলল। কিন্তু এখন সে যে ভাবে বলছিল তাতে মনে হল সে যেন নিজে থেকে, নিজের ইচ্ছায় কথাগুলি বলছে না, বলছে কোনো এক অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞার বশবর্তী হয়ে। "তুমি নিজেই নিজেকে দোষ দিয়েছ, নিজের কাছে স্বীকার করেছ যে খুনি আর কেউ নয়—তুমিই। কিন্তু খুন তুমি করনি, তুমি ভুল বকছ, খুনি তুমি নও। শুনছ আমার কথা? তুমি নও! ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে এই কথাটা বলে দিতে।"

দুজনেই চুপ করে রইল। টানা এক মিনিট চলল এই দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা। দুজনেই পরস্পরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেরই মুখ ফ্যাকাশে।

হঠাৎ ইভানের সর্বাঙ্গ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। সে শক্ত করে আলিয়োশার কাঁধ চেপে ধরল।

"তুই আমার ঘরে এসেছিলি!" দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে সে বলল। "ও যখন এসেছিল তখন রাতের বেলায় তুই আমার ঘরে এসেছিলি। স্বীকার কর তুই ওকে দেখেছিলি। দেখেছিলি তাই তো?"

"কার কথা বলছ তুমি? মিতিয়ার কথা বলছ?" ভেবাচেকা খেয়ে জিগ্‌গেস করল আলিয়োশা।

"না না ওর কথা নয়। গোল্লায় যাক ওই হতভাগা শয়তানটা!" ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠল ইভান। তুই তাহলে জানিস যে সে আমার কাছে আসে? কী ভাবে জানতে পারলি বল!"

"'সে'টা কে? আমি জানি না কার কথা তুমি বলছ", আলিয়োশা আমতা আমতা করে বলল। ততক্ষণে সে ভয় পেয়ে গেছে।

"না, তুই জানিস তা নইলে কী করে তুই তুই জানতিস না এমন হতেই পারে না।

কিন্তু হঠাৎ সে নিজেকে কেমন যেন সামলে নিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগল। একটা অদ্ভুত বাঁকা হাসিতে তার ঠোঁট বেঁকে গেল।

"দাদা", কম্পিত কণ্ঠে আলিয়োশা আবার বলতে শুরু করল, "আমি তোমাকে যে এই কথাটা বললাম তার কারণ আমি জানি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে। এটা আমি জানি। আমি তোমাকে সারা জীবনের মতো বলছি *তুমি নও*! শুনছ আমার কথা? — সারা জীবনের মতো। ঈশ্বর আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তোমাকে এই কথাটি বলতে, যদিও এর জন্য এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পার।

কিন্তু ইভানকে দেখে মনে হল সে ইতিমধ্যে পুরোপুরি আত্মসংযম ফিরে পেয়েছে।

"আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ মহাশয়", বিদ্রুপের হাসি হেসে নিস্পৃহ কণ্ঠে সে বলল, "পির পয়গম্বর আর মৃগী রোগীদের আমি দু চক্ষে দেখতে পারি নে — বিশেষত ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের — আপনি এটা বেশ ভালোভাবেই জানেন। এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করছি, সম্ভবত চিরকালের জন্য। আমার অনুরোধ, এই মুহূর্তে, এই মোড়ের মাথায় আমাকে রেখে বিদেয় হোন। তা ছাড়া এই গলি দিয়ে আপনার বাসস্থানে যাবার রাস্তাও বটে। বিশেষ করে সতর্ক থাকবেন আজ যেন আমার কাছে না আসেন! শুনছেন?"

সে ঘুরে গিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সোজা এগিয়ে গেল। আর ফিরে তাকাল না।

"দাদা", পিছন থেকে তাকে চেঁচিয়ে ডেকে বলল আলিয়োশা, "আজ যদি তোমার কিছু ঘটে যায় তাহলে আগে আমাকে মনে কোরো! "

কিন্তু ইভান কোনো উত্তর দিল না। আলিয়োশা মোড়ের মাথায় ল্যাম্প পোস্টের

নিচে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না ইভান অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর সে মোড় নিয়ে ধীরে ধীরে গলিপথে নিজের বাসস্থানের দিকে রওনা দিল। সে এবং ইভান দুজনেই আলাদ আলাদা ভাবে ভিন্ন জায়গায় বাসা ভাড়া করে ছিল। দুজনের কারোরই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের খালি বাড়িতে বাস করার ইচ্ছে ছিল না। আলিয়োশা শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণির এক পরিবারের বাড়িতে আসবাবপত্রসমেত একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ইভান ফিয়োদরভিচ্ তার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকত। সে থাকত রীতিমতো অবস্থাসম্পন্ন এক সরকারি আমলার বিধবার এক চমৎকার বাসগৃহ সংলগ্ন বাইরের অংশে। তার এই বাসস্থানটা বেশ বড়সড় আর যথেষ্ট আরামপ্রদ। কিন্তু গোটা সদরবাটিতে কাজের লোক বলতে ছিল একমাত্র একজন আদ্যিকালের থুত্থুড়ে বুড়ি। সেও আবার বদ্ধ বোবাকালা, তার সর্বাঙ্গ বাত ব্যাধিগ্রস্ত। বুড়ি রোজ সন্ধ্যা ছটার সময় ঘুমোতে যেত, আবার সকাল ছ টার সময় উঠে পড়ত। এই দু মাসের মধ্যে ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে আশ্চর্যরকম ভাবে অল্পেতেই তুষ্ট থাকতে দেখা যাচ্ছিল। সম্পূর্ণ একা একা থাকতে সে ভালোবাসত। এমনকি যে ঘরটাতে সে থাকত সেটা সে নিজের হাতে পরিষ্কার করত, দালানের তার অংশের বাকি ঘরগুলিতে সে কদাচিৎ পদার্পণ করত।

বাড়ির গেটের কাছে এসে সে সবে ঘণ্টায় হাত দিয়েছে এমন সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনুভব করল রাগে তার সর্বাঙ্গ তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। হঠাৎ কী মনে হতে 'ধুত্তোর' বলে ঘণ্টার হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে পিছনে ফিরে গিয়ে আবার দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল—এবারে একেবারে অন্য দিকে, শহরের বিপরীত প্রান্ত লক্ষ করে। লক্ষ্যস্থল ছিল তার নিজের বাসস্থান থেকে পৌনে এক ক্রোশ মতন দূরে থাক থাক কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হেলে পড়া খুব ছোটো একটা বাড়ি যেখানে আস্তানা নিয়েছিল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের এক কালের প্রতিবেশিনী মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না। মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না তখন সুপ নিতে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের হেঁসেলে আসত! স্মের্দিকোভ্ সেই তাকে তার গান গেয়ে আর গিটার বাজিয়ে শোনাত। মেয়েটা তাদের আগেকার ছোট বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিল। এখন তার মাকে নিয়ে এই যে বাড়িটাতে বসবাস করছে সেটা প্রায় একটা কুঁড়েঘর। এদিকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মৃত্যুর ঠিক পর পর অসুস্থ, মুমূর্ষুপ্রায় স্মের্দিকোভ্ ওদের বাড়িতেই উঠে এসেছে এবং তখন থেকে সেখানেই বসবাস করছে। এক আকস্মিক ও অপ্রতিরোধ্য ভাবনার তাড়নায় ইভান ফিয়োদরভিচ এখন তার কাছেই চলেছে।

## ছয়

## স্মের্দিকোভের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার

মস্কো থেকে ফেরার পর ইভান ফিয়োদরভিচ্ এই নিয়ে তৃতীয়বার স্মের্দিকোভের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে। প্রথমবার, দুর্ঘটনার পর এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনই তার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, কথাও হয়েছিল। এর পর দু সপ্তাহ বাদে আরও একবার তাকে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয়বারের পর স্মের্দিকোভের সঙ্গে সে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দেয়। ফলে এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল স্মের্দিকোভের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি, তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই সে শোনেওনি।

ইভান ফিয়োদরভিচ্ তখন মস্কো থেকে ফিরে এসেছিল তার বাবার মৃত্যুর কেবল পাঁচদিন পরে, তাই বাবার শবাধারও সে চোখে দেখতে পায়নি। যেদিন সে এসে পৌঁছোয় তার ঠিক আগের দিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইভান ফিয়োদরভিচের বিলম্বের কারণ এই যে আলিয়োশা তার মস্কোর সঠিক ঠিকানা জানত না, তাই তাকে তারবার্তা পাঠানোর জন্য আলিয়োশাকে কাতেরিনা ইভানভ্নার শরণাপন্ন হতে হয়। এদিকে তার আসল ঠিকানা কাতেরিনা ইভানভ্নারও জানা না থাকায় সে তার বোনকে আর মাসিকে টেলিগ্রাম পাঠাল। এই বিবেচনা করে পাঠাল যে মস্কোয় পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে ইভান ফিয়োদরভিচ তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু পৌঁছুনোর পর মাত্র চতুর্থ দিনে সে তাদের কাছে এসেছিল। টেলিগ্রাম পড়ার পর অবশ্য পড়িমরি করে তৎক্ষণাৎ আমাদের শহরে চলে আসে। আমাদের এখানে আসার পর প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হয় সে আলিয়োশা। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার পর এই দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেল যে আমাদের শহরের আর সকলের মতের বিরোধিতা করে মিতিয়াকে আলিয়োশা এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত করতে নারাজ, সরাসরি স্মের্দিকোভ্কে দেখিয়ে বলছে যে সে-ই খুনি। পরে জেলা পুলিশ সুপার আর প্রসিকিউটরের সঙ্গে দেখা করার পর এবং মিতিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও গ্রেপ্তারের সমস্ত খুঁটিনাটি জানার পর আলিয়োশার কথায় সে আরও বেশি বিস্মিত হল। আলিয়োশার মতটাকে নিছকই তার চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মিতিয়ার প্রতি তার সমবেদনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ বলে সে ধরে নিল। ইভান ফিয়োদরভিচ এটাও জানত যে মিতিয়াকে আলিয়োশা খুবই ভালোবাসে। প্রসঙ্গত, ভাই দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের প্রতি ইভানের অনুভূতি সম্পর্কে পরে আর যাতে বলতে না হয় সেইজন্য এখানে মাত্র দুইটা কথা বলে রাখি। সে তাকে একদম পছন্দ করত না, বড়জোর সময় সময় তার প্রতি সমবেদনা অনুভব করত। সেটাও আবার ছিল

বড়ো রকমের উপেক্ষা মিশ্রিত, যা তার মনে ন্যাক্কারজনক ভাব পর্যন্ত জাগিয়ে তুলত। সামগ্রিকভাবে মিতিয়া ব্যক্তিটি, এমনকি তার চেহারাও ইভানের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। তার প্রতি কাতেরিনার ভালোবাসাকেও ইভান বিতৃষ্ণার চোখে দেখত। তা সত্ত্বেও বিচারাধীন আসামি মিতিয়ার সঙ্গেও আসার প্রথম দিনই সে দেখা করতে গিয়েছিল। মিতিয়া যে অপরাধী এই ব্যাপারে তার যে দৃঢ়বিশ্বাস এই সাক্ষাৎকারের ফলে তা শিথিল তো হলই না, এমনকি আরও জোরাল হল। সে তখন দেখেছিল তার ভাই উত্তেজনায় খিটখিটে ও অস্থির হয়ে উঠেছে। মিতিয়া অজস্র বকে যাচ্ছিল—কিন্তু অন্যমনস্কভাবে, এলোমেলো কথা সে বলছিল অত্যন্ত রূঢ়স্বরে। স্মের্দিকোভ্‌কে অভিযুক্ত করল। সব কিছু ভীষণভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলছিল। সবচেয়ে বেশি করে, বারবার করে বলতে লাগল সেই তিন হাজারের কথা, যা নাকি মৃত ব্যক্তি তার কাছ থেকে 'চুরি করেছিল'। 'টাকা আমার, ও টাকা আমার ছিল', মিতিয়া বারবার জোর দিয়ে বলতে লাগল, 'আমি যদি ও টাকা চুরিও করতাম সে অধিকার আমার ছিল।' যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তার বিরুদ্ধে ছিল সেগুলির কোনোটা নিয়ে সে প্রায় কোনো প্রশ্ন তুলত না। আর নিজের স্বার্থে কোনো তথ্যের ব্যাখ্যা যাও বা দিচ্ছিল সেও আবার সেই একেবারে গোলমেলে ও হাস্যকর—এমনকি মোটের ওপর ইভানের সামনে অথবা আদৌ কারও সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছে তার আছে বলে মনে হচ্ছিল না। বরং রেগে উঠছিল, অহঙ্কারের ভাব নিয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল, গালিগালাজ করছিল, মেজাজ গরম করছিল। দরজা খোলা ছিল বলে গ্রিগোরি যে সাক্ষ্য দিয়েছিল সে প্রসঙ্গে কেবল অবজ্ঞাভরে হাসল, নিশ্চিত করে বলল 'ও, শয়তানে খুলে রেখে দিয়েছিল।' কিন্তু এই তথ্যের কোনো সুসঙ্গত ব্যাখ্যা সে দিতে পারল না। এমন কি এই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ও সে ইভান ফিয়োদরভিচকে অপমান করতে ছাড়ল না, কড়া ভাষায় তাকে বলে দিল, যে যারা নিজেরাই জোর গলায় বলে যে 'সবেরই অনুমতি আছে', তাকে সন্দেহ করা বা জেরা করা তাদের অন্তত সাজে না। মোটের ওপর, সেবারে আর যাই হোক, ইভান ফিয়োদরভিচের প্রতি তাকে খুব একটা বন্ধুভাবাপন্ন দেখা যায়নি। এখন মিতিয়ার সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের পর ইভান ফিয়োদরভিচ এবারে এই প্রথম স্মের্দিকোভের সঙ্গে দেখা করতে চলল।

স্মের্দিকোভের বিষয়ে এবং এখান থেকে সেবারে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় স্মের্দিকোভের সঙ্গে তার শেষ যে কথাবার্তা হয়েছিল মস্কো থেকে আসার পথে ট্রেনে থাকতেই ইভান ফিয়োদরভিচ তাই নিয়ে মনে মনে আন্দোলন করে চলছিল। বেশ কিছু জিনিস তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল, বেশ কিছু জিনিস তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। কিন্তু বিচারবিভাগীয় তদন্তকারীর কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় ইভান ফিয়োদরভিচ ওই কথাবার্তার প্রসঙ্গ তখনকার মতো চেপে গিয়েছিল।

স্মের্দিকোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত সব সে মুলতবি রেখেছিল। সেই সময় স্মের্দিকোভ্ শহরের হাসপাতালে ভর্তি ছিল।

ডাক্তার হের্‌ৎসেন্‌শ্‌টুবে এবং হাসপাতালে যে ডাক্তারের সঙ্গে ইভান ফিয়োদরভিচের দেখা হল সেই ডাক্তার ভার্‌ভিন্‌স্কিও ইভান ফিয়োদরভিচের নাছোড়াবান্দা প্রশ্নের উত্তরে জোর দিয়ে বললেন যে স্মের্দিকোভের মূর্ছারোগের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। এমনকি 'দুর্ঘটনার দিন ও ভান করে নিতো?'—এই প্রশ্ন শুনে তাঁরা বিস্মিতই হলেন। তাঁরা তাকে এরকম একটা ধারণাও দিলেন যে রোগের এই আক্রমণটা সাধারণ ছিল না, প্রকোপ চলতেই থাকে, কয়েক দিন ধরে বারবার ঘটতে থাকে, ফলে পেশেণ্টের অবস্থা রীতিমতো সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং একমাত্র এখনই, উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার পর জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে রোগী প্রাণে বেঁচে যাবে, 'যদিও এটা খুবই সম্ভব'—ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে যোগ করলেন—'ওর বিচারবুদ্ধি অংশত বিকল হয়ে যাবে—সারা জীবনের জন্য যদি নাও হয় অন্তত বেশ কিছু কালের মতো তো বটেই।' ইভান ফিয়োদরভিচ্ যখন অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করল, 'তার মানে ওকে এখন পাগল বলা যেতে পারে?' এর উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'পরিপূর্ণ অর্থে এখনও নয়, তবে অস্বাভাবিকতার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বটে।' ইভান ফিয়োদরভিচ ঠিক করল জানতে হবে সেই অস্বাভাবিকতাগুলি কী ধরনের।

হাসপাতালে তৎক্ষণাৎ তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হল। স্মের্দিকোভ্‌কে একটা পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। সে শয্যায় শুয়ে ছিল। সেখানেই, তার পাশে আরও একটি শয্যা। সেটা দখল করে ছিল শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন লোক। লোকটা একেবারে অশক্ত, শোথ রোগে আগাগোড়া ফুলে গেছে। দেখে মনে হয় কাল-পরশুর মধ্যে মারা যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। তার উপস্থিতি ওদের কথাবার্তায় কোনো বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। ইভান ফিয়োদরভিচকে দেখে স্মের্দিকোভ দাঁত বের করে অবিশ্বাসের হাসি হাসল। এমনকি প্রথম মুহূর্তে দেখে মনে হল যেন ঘাবড়ে গেছে। ইভান ফিয়োদরভিচের অন্তত চকিতে তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল মাত্র ক্ষণিকের। বরং এর পর বাকি সময়টা স্মের্দিকোভ্ যে রকম স্থৈর্যের পরিচয় দিল তাতে ইভান ফিয়োদরভিচ্ প্রায় অবাক হয়ে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই তার মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে লোকটা পুরোমাত্রায় রোগগ্রস্ত, ঘোরতর অসুস্থ। খুবই দুর্বল, কথা বলছে ধীরে ধীরে, মনে হচ্ছে যেন জিভ নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। খুব রোগা হয়ে গেছে, তাকে হলদেটে দেখাচ্ছে। মিনিট কুড়ির এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে সে সর্বক্ষণ এই বলে অনুযোগ করতে লাগল যে তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার নপুংসক গোছের, বিশীর্ণ মুখখানা কুঁচকে যেন একেবারে ছোটো হয়ে গেছে, দু পাশের রগের চুল এলোমেলো হয়ে আছে, মাথার সামনে চুলের যে ঝুঁটিটা ছিল তার বদলে খাড়া

হয়ে আছে পাতলা এক গোছা চুল। কিন্তু ওই যে তার বাঁ চোখটা যেটা এমন ভাবে কুঁচকে আছে যেন কোনো কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাতেই কিন্তু ধরা পড়ে যাচ্ছে আগেকার সেই স্মের্দিকোভ্। 'বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ' — তৎক্ষণাৎ ইভান ফিয়োদরভিচের মনে পড়ে গেল। সে তার পায়ের কাছে একটা টুলের ওপর বসল। স্মের্দিকোভ্ অতি কষ্টে সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে বিছানার মধ্যে নড়েচড়ে উঠল, কিন্তু এমন ভাবে তাকাতে লাগল যে এবারে আর তেমন একটা সুখ উপভোগ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

"আমার সঙ্গে কথা বলার মতো ক্ষমতা আছে কি?" ইভান ফিয়োদরভিচ জিগ্‌গেস করল। "খুব একটা কষ্ট দেব না।"

"খুব আছে", ক্ষীণকণ্ঠে বিড়বিড় করে স্মের্দিকোভ্ বলল। "হুজুরের কি অনেক দিন হল আগমন হয়েছে?" প্রশ্রয়ের সুরে এমন ভাবে সে যোগ করল যেন কোনো অপ্রস্তুত আগন্তুককে উৎসাহ দিচ্ছে।

"এই তো আজই। তোমরা এখানে কী সব পাকিয়ে রেখেছ তারই জট ছাড়াতে এলাম।"

স্মের্দিকোভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন? তুমি তো জানতে?" ইভান ফিয়োদরভিচ্ সরাসরি দুম্ করে বলে বসল।

স্মের্দিকোভ্ গুরুগম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"না জানার কী ছিল? আগে থাকতেই তো পরিষ্কার ছিল। তবে কথাটা এই যে অমন যে দাঁড়াবে তা-ই বা জানব কী করে হুজুর?"

"কী দাঁড়াবে? দেখ বাপু ওসব ফক্কিকারি ছাড়! তুমিই না আগে থাকতে বলেছিলে যে তলকুঠুরির ভাঁড়ারে নামতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃগী রোগের প্রকোপ হবে? সোজা ওই তলকুঠুরির কথাই তো বলেছিলে।"

"এটা আপনি ইতিমধ্যে জেরার সময় আপনার এজাহারে বলেছেন বুঝি?" শান্ত কণ্ঠে স্মের্দিকোভ্ কৌতূহল প্রকাশ করল।

ইভান ফিয়োদরভিচ হঠাৎ খাপ্পা হয়ে উঠল।

"না, এখনও বলিনি, তবে অবশ্যই বলব। তোমার, ভাই, এখন উচিত আমাকে অনেক কিছু খুলে বলা। জেনে রেখো হে, আমাকে লেজে খেলাবে সে আমি হতে দেব না!"

"অমন খেলা আমি খেলতে যাব কেন কর্তা, যখন একমাত্র পরমেশ্বরের ওপর লোকের যেমন সমস্ত আশা ভরসা তেমনি আপনার ওপরও আমার সমস্ত আশা ভরসা?" শুধু মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে সেই একই রকম সম্পূর্ণ শান্ত ভাবে স্মের্দিকোভ্ বলল।

ইভান ফিয়োদরভিচ শুরু করল "প্রথমত আমি জানি মৃগী রোগের প্রকোপ

কখন হবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি। উঁহু, ওসব ফক্কিকারি ছাড়। দিনক্ষণ আগে ভাগে বলা যায় না। তাহলে তুমি তখন কী করে আগে থাকতে দিনক্ষণ বলতে পারলে—তাও আবার তলকুঠুরিতেই যে হবে তাই বা কী করে? তুমি যদি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মৃগীরোগের ভান না করে থাক তাহলে আগেই কী করে জানতে পারলে যে ঠিক ওই তলকুঠুরিতে নামতে গিয়েই তুমি পড়ে যাবে?"

"তলকুঠুরির ওই ভাঁড়ারে আমাকে অমনিতেই দিনের মধ্যে বেশ কয়েক বার নামতে হত কর্তা", ধীরেসুস্থে টেনে টেনে বলল স্মের্দিকোভ্। "ঠিক এই ভাবেই বছরখানেক আগে চিলেকোঠা থেকে নামতে গিয়ে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম। এটা অবশ্য ঠিক যে কোন্ দিন কোন্ সময়ে মৃগী রোগের প্রকোপ হবে তা আগে থাকতে বলা যায় না, তবে ওরকম একটা অনুভূতি সব সময়ই ভেতরে ভেতরে থাকতে পারে।"

"কিন্তু তুমি তো আগে থাকতে দিনক্ষণ বলেছিলে!"

"আমার মৃগী রোগ সম্পর্কে আপনার যদি কিছু জানার থাকে কর্তা, তা হলে সব চাইতে ভালো হয় যদি এখানকার ডাক্তারদের জিগ্‌গেস করেন—আমার যা হয়েছিল সেটা সত্যি না মিথ্যে। এই বিষয়ে আপনাকে আমার এর বেশি আর কিছু বলার নেই।"

"কিন্তু তলকুঠুরি? ওটা আগে থাকতে থাকতে জানতে পারলে কী করে?"

"নাঃ, ওই তলকুঠুরি আপনাকে পেয়ে বসেছে দেখছি! সেই সময়, যখন আমি ওই তলকুঠুরির ভেতরে নামছিলাম তখন আমি একটা দারুণ আতঙ্ক আর সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। আমার বেশি আতঙ্ক হয়েছিল এই কারণে যে আপনাকে হারাচ্ছি, পৃথিবীতে আর এমন কেউ রইল না যে আমাকে রক্ষা করতে পারে বলে আশা করা যেতে পারে। তখন ওই তলকুঠুরিতে ঢুকতে না ঢুকতেই আমি ভাবছিলাম: 'এই এলো বলে। এই আমার ওপর এসে পড়বে একটা কোপ। উলটে পড়ে যাব নাকি?' ঠিক এই সন্দেহ থেকেই হঠাৎ আমি গলার ভেতরে বোধ করলাম সেই হেঁচকি মতন ঝটকা টানটা যা আর এড়ানো গেল না আমিও অমনি ছিটকে পড়ে গেলাম।" এসবই, আর এর আগে, সে দিনের আগের দিন সন্ধ্যায় গেটের সামনে আপনার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল, যখন আমি আপনাকে আমার ভয়ের কথা আর তলকুঠুরির ব্যাপারটাও জানিয়েছিলাম—সে সমস্তই আমাদের ডাক্তার বাবু হের্‌ৎসেনশটুবেকে এবং তদন্তকারী নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্‌কেও সবিস্তারে খুলে বলেছি। এজাহার হিসেবে সেগুলো লিখে নেওয়া হয়েছে। আর এখানকার যিনি ডাক্তারবাবু, ডাক্তার ভার্‌ভিন্‌স্কি ওঁদের সকলের সামনে বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেছেন যে ঘটনাটা ঠিক বলতে গেলে ভাবনার ফলেই ঘটেছিল—মানে, 'কে জানে বাবা, পড়ে যাব না ত?'—এই যে একটা মনগড়া চিন্তা তা থেকে।

BengaliBook.org

তখনই রোগটাও চেপে ধরল। এজাহারে তাই লিখেও নিলেন ওঁরা যে এটা হওয়াই ছিল অবধারিত, অর্থাৎ কিনা স্রেফ আমার ভয় থেকেই এটা হয়েছে।"

কথা শেষ করে স্মের্দিকোভ্ যে ভাবে বুক ভরে দম নিল তাতে মনে হল সে যেন ক্লান্তিতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

"তাহলে তুমি এরই মধ্যে তোমার এজাহারে একথা বলেছ?" কতকটা হকচকিয়ে গিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ জিগ্গেস করল। ওদের তখনকার কথাবার্তা প্রকাশ করে দেবে—এই বলেই না সে স্মের্দিকোভ্কে ভয় দেখাতে চেয়েছিল! উলটে স্মের্দিকোভ্ নিজেই কিনা ইতিমধ্যে সব প্রকাশ করে দিয়েছে!

"আমার ভয়ের কী আছে? যেটা নির্জলা সত্য সেটাই লিখুক না", দৃঢ়স্বরে স্মের্দিকোভ্ বলল।

"আর গেটের সামনে তোমার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সব কিছু অক্ষরে অক্ষরে বলে দিয়েছ?"

"না, সবটা যে অক্ষরে অক্ষরে বলেছি তেমন নয়।"

"তখন তো তুমি আমাকে বড়াই করে বলেছিলে যে তুমি মৃগী রোগের ভান করতে পার—তাও বলে দিয়েছ?

"না, সে কথাও বলিনি এজ্ঞে।"

"আচ্ছা এবারে বল দেখি, কীসের জন্য তখন তুমি আমাকে চের্মাশনিয়াতে পাঠাচ্ছিলে?"

"আমার ভয় হচ্ছিল মস্কোয় চলে যাবেন, চের্মাশনিয়া হাজার হোক অনেক কাছে এজ্ঞে।"

"মিছে কথা! নিজেই আমাকে এখান থেকে চলে যাবার মন্ত্রণা দিয়েছিলে, বলেছিলে চলে যান, পাপ থেকে শত হস্তে দূরে থাকুন!"

"সে তো আমি আপনাকে স্রেফ বন্ধুভাবে, আপনার ওপর আমার অন্তরের টান থেকে বলেছিলাম। ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারছিলাম এ বাড়িতে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আপনার ওপর আমার মায়া হয়েছিল এজ্ঞে। তবে হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশি মায়া হয়েছিল নিজের ওপর এজ্ঞে। তাইতেই তো বলেছিলাম যাতে এই পাপ থেকে দূরে চলে যান, যাতে আপনি বুঝতে পারেন বাড়িতে খারাপ কিছু একটা ঘটবে, আর আপনি আপনার বাবামশাইকে রক্ষা করার জন্য থেকে যান।"

"তা সে কথা আরও সোজাসুজি বললেই তো হত! বুদ্ধু কোথাকার!" ইভান হঠাৎ রাগে জ্বলে উঠল।

"তখন আর কত সোজা করে বলতে পারতাম এজ্ঞে? একমাত্র আমার ভেতরের ভয় থেকেই না এই কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল এজ্ঞে! তাছাড়া আপনি হয়তো রেগেও যেতেন। আমার মনের মধ্যে অবশ্য এরকম একটা আশঙ্কা থাকলেও থাকতে পারত যে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ আবার একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে

না বসেন, ওই টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে না যান, কেন না অমনিতেই ওগুলো তিনি নিজের বলে মনে করতেন। কিন্তু তার পরিণতি যে অমন হবে, অমন একটা খুনের ঘটনা যে ঘটবে তা কে জানত বলুন? ওই তিন হাজার তো ছিল বড় কর্তার তোষকের তলায়, একটা প্যাকেটের মধ্যে। ভেবেছিলাম স্রেফ চুরি করে নিয়ে চলে যাবেন, অথচ দেখুন, খুন করলেন। কী ভাবেই বা অনুমান করতে পারতেন কর্তা?"

"তা তুমি নিজেই যখন বলছ যে অনুমান করার উপায় ছিল না তাহলে আমিই বা কী করে অনুমান করতে পারতাম এবং সেটা আঁচ করে থেকে যেতাম? এসব কী তালগোল পাকাচ্ছ তুমি?" ভাবতে ভাবতে ইভান ফিয়োদরভিচ্ বলল।

"আমি যে আপনাকে মস্কোর বদলে চের্‌মাশনিয়াতে পাঠাচ্ছি এ থেকে আঁচ করতে পারতেন এজ্ঞে।"

কিন্তু তা থেকে কী করে আঁচ করব!"

স্মের্দিকোভ্‌কে দেখে মনে হল সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আবার মিনিটখানেক চুপ করে রইল।

"এ থেকেই আঁচ করতে পারতেন এজ্ঞে, যে আমি যখন মস্কো থেকে আপনাকে চের্‌মাশনিয়াতে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার মানে আমার ইচ্ছে আপনি এখানেই ধারে কাছে থাকুন, কারণ মস্কো বেশ দূরে, কিন্তু দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ যখন জানবেন যে আপনি বেশি দূরে নেই তখন আর অতটা উৎসাহ বোধ করবেন না। তাছাড়া তেমন কিছু হলে আপনি তুরন্ত চলে এসে আমাকেও রক্ষা করতে পারতেন, যেহেতু তার ওপরে আমি নিজে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের অসুস্থতার উল্লেখ আপনার কাছে করেছি আর এও বলেছি মৃগী রোগের আক্রমণের ভয়ে মরছি। আর দরজার ওই টোকাগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে যখন আপনাকে বলেছিলাম যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ আমার মারফত সেগুলো জেনে গেছেন তখন তো আমি ভেবেছিলাম যে আপনি নিজেই অনুমান করতে পেরেছেন যে উনি নির্ঘাত কিছু না কিছু একটা ঘটাবেন, সুতরাং আপনি চের্‌মাশনিয়াতেও যাবেন না, এখানেই থেকে যাবেন।"

'কথাগুলো বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলছে বটে', ইভান ফিয়োদরভিচ মনে মনে ভাবল, 'যদিও অবশ্য মিনমিন করে বলছে। তাহলে বোধশক্তি গোলমাল হয়ে যাবার যে কথা হের্‌ৎসেনশ্টুবে বললেন সেটা কী রকম?'

"আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে, না? চুলোয়া যা!" তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে চিৎকার করে সে বলল।

"আমি কিন্তু, সত্যি বলতে গেলে কি, তখন ভেবেছিলাম আপনি ঠিক অনুমান করতে পেরেছেন", নিপাট ভালোমানুষের ভাব করে স্মের্দিকোভ্ তার মুখের ওপর বলল।

"আরে, অনুমান করতে পারলে তো থেকেই যেতাম!" আবারও জ্বলে উঠে চিৎকার করে বলল ইভান ফিয়োদরভিচ্।

"কিন্তু কর্তা, আমি তো ভেবেছিলাম সব কিছু অনুমান করে কেবল একটা পাপ থেকে দূরে সরে থাকার উদ্দেশ্যে আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাচ্ছেন, যাতে—যেখানেই হোক না কেন—একমাত্র পালিয়ে গিয়েই বিভীষিকার কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন, এজ্ঞে।"

"তুমি কি ভেবেছিলে সকলে তোমার মতো ভীতু?"

"মাফ করবেন, এজ্ঞে, ভাবলাম আপনিও আমারই মতন।"

"অবশ্যই অনুমান করা উচিত ছিল", ইভান ফিয়োদরভিচ্ উত্তেজিত হয়ে বলল। তা অনুমান করেও ছিলাম—তোমার দিক থেকে কোনো কুকর্মের সম্ভাবনা আছে বলে ভেবেছিলাম। তবে তুমি মিথ্যে কথা বলছ, আবারও মিথ্যে বলছ কিন্তু", হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে সে চেঁচিয়ে বলল, "তোমার মনে আছে, তখন তুমি গাড়ির সামনে এগিয়ে এসে আমাকে বলেছিলে 'বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ'? তুমি যে প্রশংসা করলে তার মানে কি তাহলে এই যে আমি চলে যাচ্ছি বলে তুমি খুশি?"

স্মের্দিকোভ্ একবার, আরও একবার উচ্চারণ করল, "খুশি যদি হতাম সেটা একমাত্র এই কারণে যে মস্কোয় না গিয়ে চের্মাশ্নিয়াতে যেতে রাজি হয়েছেন। কারণ, হাজার হোক, জায়গাটা অনেক কাছে। তবে হ্যাঁ ওই যে কথাগুলো আমি তখন আপনাকে লক্ষ করে উচ্চারণ করেছিলাম তার মধ্যে প্রশংসা ছিল না, নিন্দাই ছিল, এজ্ঞে। আপনি সেটা বুঝে উঠতে পারেননি কর্তা।"

"কী রকম নিন্দা?"

"নিন্দার কারণটা এই যে বিপদের আভাস মনে মনে টের পাওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্মদাতা বাপকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন এজ্ঞে, আর আমাদেরও রক্ষা করতে চাইছেন না, কেন না ওই তিন হাজারের জন্য যে কোনো সময় আমাকে নিয়ে এই বলে টানাটানি চলতে পারত যে আমি ও টাকা চুরি করেছি এজ্ঞে।"

"চুলোয় যাও তুমি!" আবার গাল দিল ইভান। দাঁড়াও দাঁড়াও, আচ্ছা ওই সঙ্কেত, মানে দরজার টোকার ব্যাপারে তুমি তদন্তকারী আর প্রসিকিউটরকে কিছু জানিয়েছ কি?"

"ঠিক যা যা হয়েছিল সবই জানিয়েছি এজ্ঞে।"

ইভান ফিয়োদরভিচ এবারেও মনে মনে বিস্মিত হল।

সে আবার শুরু করল, তখন যদি আমি কোনো কিছুর কথা ভেবে থাকতাম সেটা একমাত্র তোমার দিক থেকেই কোনো কুকীর্তি। দ্‌মিত্রি খুন করতে পারত, কিন্তু সে টাকা চুরি করবে—এটা আমি তখন বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু তোমার দিক থেকে যে কোনো কু কাজ প্রত্যাশিত ছিল। তুমি নিজেই তো আমাকে বলেছ যে তুমি মৃগী রোগের ভান করতে পার। কেন বলেছিলে, বল তো?"

"একমাত্র কারণ আমার মনটা সরল। তাছাড়া জীবনে কখনও কোনো উদ্দেশ্য

নিয়ে আমি মৃগীরোগীর ভান করিনি। আপনাকে যে বলেছিলাম সে কেবল আপনার সামনে বড়াই করে। স্রেফ আমার বোকামি। আমি তখন আপনাকে খুবই ভালো বেসে ফেলেছিলাম, তখন আপনার সঙ্গে আমার একেবারে সহজ দিলখোলা সম্পর্ক ছিল।”

“ভাই তো সরাসরি এই বলে তোমার ওপর দোষারোপ করছে যে তুমি খুন করেছ এবং চুরিও তুমিই করেছ।”

“তা ওনার আর এর বেশি কী থাকছে?” দাঁত বের করে তিক্ত হাসল স্মের্দিকোভ্। “এত সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের পর কেই বা ওনাকে বিশ্বাস করবে? দরজা তো গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্ খোলাই দেখেছিল এজ্ঞে, এরপর আর কী? যাক গে, ভগবান ওর বিচার করবেন! কী করে নিজেকে বাঁচানো যায় এই ভেবে ভয়ে কাঁপছেন।

ধীরে ধীরে সে চুপ করে গেল, তারপর আচমকা মনে মনে কী যেন কী ভেবে যোগ করল

“তাহলে দেখুন, আবারও সেই একই ব্যাপার উনি আমার ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দিতে চান, বলতে চান এটা আমার কাজ—ও আমি ইতিমধ্যেই শুনেছি কর্তা। কিন্তু আমি মৃগী রোগীর অভিনয় করে দেখাতে ওস্তাদ—এই এটাই অন্তত ধরুন না কেন—বলুন তো, আপনার বাবার বিরুদ্ধে যদি সত্যি সত্যিই আমার কোনো মতলব থাকত তা হলে কি আমি আগ বাড়িয়ে বলতাম যে ওরকম করে দেখাতে পারি? এমন একটা খুনের মতলব যদি আমি আঁটতাম তা হলে এতটা বোকা হওয়া কী সম্ভব যে আগে থাকতে নিজের বিরুদ্ধে এরকম একটা প্রমাণ দিতে যাব? তাও আবার কার কাছে?—না, তাঁর ছেলের কাছে! মাফ করবেন, এজ্ঞে! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যেন এটা হতে পারে! হতে পারে না, কখনোই হতে পারে না, এজ্ঞে। আমরা এই যে এখন কথাবার্তা বলছি তা ওই বিধাতাপুরুষ ছাড়া আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না, এজ্ঞে। এখন যদি আপনি প্রসিকিউটরকে আর নিকলাই পার্ফেনভিচকে জানিয়ে দেন তাহলে তারই ফলে শেষ পর্যন্ত আমাকেই কিন্তু আপনার পুরোমাত্রায় সমর্থন করা হয়ে যাবে, কেন না এমন দুষ্কৃতী আবার কে হতে পারে বলুন যে কিনা আগে থাকতেই এতটা খোলামেলা? যে কেউ মনে মনে চিন্তা করলে খুবই দেখতে পাবে।”

স্মের্দিকোভের এই শেষ যুক্তিতে বিস্মিত হয়ে কথাবার্তায় ছেদ টেনে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ্ বলল, “শোন, আমি তোমাকে আদৌ সন্দেহ করছি না। এমনকি আমার মনে হয় তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটাও হাস্যকর হবে। বরং উলটে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এই কারণে যে তুমি আমাকে স্বস্তি দিলে। এখনকার মতো যাচ্ছি, তবে আবার আসব। আপাতত চলি, সেরে ওঠো। কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি?”

"সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ, এজ্ঞে। মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না আমাকে মনে রেখেছেন, আমার যা যা দরকার সব ব্যাপারে সাহায্য করেন তাঁর আগের সেই দয়ার বশবর্তী হয়ে। ভালো ভালো মানুষেরা রোজ আমাকে দেখতে আসেন।"

"আবার দেখা হবে। তুমি যে ভান করতে জান সে কথা আমি অবশ্য বলতে যাচ্ছি না আর তোমাকেও পরামর্শ দিচ্ছি এজাহারে তা বলতে যেয়ো না", কেন যেন ইভান হঠাৎ বলল।

"খুবই বুঝতে পারছি এজ্ঞে। আপনি যদি আপনার এজাহারে এটা না বলেন তা হলে আমিও গেটের সামনে আপনার সঙ্গে আমার তখন যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানাব না, কর্তা।

এর পর যা হল তা এই যে ইভান হঠাৎ করে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার পর করিডর ধরে মাত্র দশ পা মতন এগিয়ে গেছে, এমন সময় চকিতে তার উপলব্ধি হল যে স্মের্দিকোভের শেষ কথাটার মধ্যে অপমানসূচক কী যেন একটা অর্থ নিহিত আছে। সে তক্ষুনি আবার ফিরে যাব-যাব করছিল, কিন্তু সেটা ছিল নিছক ক্ষণিকের একটা ঝোঁক। 'যত বাজে চিন্তা!' বিড়বিড় করে এই বলে সে চটপট হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বড়ো কথা এই যে সে বাস্তবিকই মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে—ঠিক এই কারণেই করছে যে দোষী স্মের্দিকোভ্ নয়, আসলে তার ভাই মিতিয়া, যদিও মনে হতে পারে এর বিপরীতটাই হওয়া উচিত ছিল। কেন এমন হল সেই সময় এ নিয়ে বিচার বিবেচনা করার ইচ্ছে তার ছিল না, এমনকি নিজের মনের উপলব্ধি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা তার কাছে ন্যক্কারজনক বলেও মনে হল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু একটা ভুলে থাকতে চায়।

এর পরের কয়েক দিনের মধ্যে যখন মিতিয়ার বিরুদ্ধে তাকে হতাশ করার মতো সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে সে আরও ঘনিষ্ঠভাবে, আদ্যোপান্ত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেল তখন মিতিয়ার অপরাধ সম্পর্কে সে একেবারে সুনিশ্চিত হল। অতি নগণ্য কিছু লোকের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছিল—যেমন ফেনিয়া আর তার মা'র সাক্ষ্য। কিন্তু সে সব সাক্ষ্য প্রায় চাঞ্চল্যকর ছিল। পের্খোতিন, সরাইখানার মালিক, প্লোত্নিকভ্দের দোকান বা মোক্রয়ের সাক্ষীসাবুদ—এদের কথা যদি ধরতে হয় তাহলে তো আর বলার কিছুই থাকে না। সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক ছিল বিশদ বিবরণ। খোলা দরজা সম্পর্কে গ্রিগোরির সাক্ষ্যের মতো দরজায় টোকা মারার রহস্যের সংবাদটাও প্রায় একই মাত্রায় তদন্তকারী ও প্রসিকিউটরকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। ইভান ফিয়োদরভিচের প্রশ্নের উত্তরে গ্রিগোরির স্ত্রী মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না তাকে সরাসরি এই কথাই জানায় যে স্মের্দিকোভ্ সারা রাত ওদের কুঠুরিতে পার্টিশনের ওপাশে শুয়ে ছিল। তার কথায়, 'আমাদের বিছানা থেকে তিন পাও হবে না।' মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্নার নিজের ঘুমটা গাঢ় হলে কী হবে বেশ কয়েক বার ঘুম

ভেঙে যেতে সে তার কাতরানি শুনতে পায়। 'সব সময় কাতরাচ্ছিল, অনবরত কাতরাচ্ছিল।'

হের্‌ৎসেন্‌শ্‌টুবের সঙ্গে কথাবার্তার পর ইভান ফিয়োদরভিচ্‌ তাঁকে তার নিজের সন্দেহের কথা জানিয়ে যখন বলল যে স্মের্দিকোভ্‌কে আদৌ বিকৃতমস্তিষ্ক মনে হচ্ছে না, বরং তাকে নেহাৎই দুর্বল বলে মনে হচ্ছে, তখন তার এই মন্তব্য বৃদ্ধের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির উদ্রেক করল মাত্র।

"কিন্তু আপনি জানেন কি এখন সে বিশেষ করে কী নিয়ে পড়ে আছে?" ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে সে জিগ্‌গেস করল। "ফরাসি ভাষার শব্দ তালিকা ধরে মুখস্থ করতে লেগেছে। ওর বালিশের তলায় একটা এক্সারসাইজ বুক আছে, সেখানে ওর জন্য কে যেন রুশ অক্ষরে ফরাসি শব্দ লিখে দিয়েছে। হে-হে-হে!"

ইভান ফিয়োদরভিচ্‌ শেষ পর্যন্ত যাবতীয় সন্দেহ্‌ বাতিল করে দিল। ভাই দ্‌মিত্রির কথা ভাবলে তার মনের মধ্যে এখন শুধু বিতৃষ্ণাই জাগে। তবে যা-ই হোক না কেন, একটা জিনিস কিন্তু ভারি অদ্ভুত। আলিয়োশা জেদ ধরে বলে চলেছে যে দ্‌মিত্রি খুন করেনি এবং 'খুব সম্ভবত' স্মের্দিকোভ্‌ই খুন করেছে। ইভানের সব সময় এরকম একটা উপলব্ধি ছিল যে আলিয়োশার মতামত তার কাছে পরম মূল্যবান, আর এই কারণেই সে এখন এতে রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে আলিয়োশা তার সঙ্গে মিতিয়া সম্পর্কে কোনো কথা বলার আগ্রহও দেখায়নি, নিজে থেকে এই বিষয়ে কখনও কথা শুরু করেনি, কেবল ইভান প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিয়েছে। এটাও খুব ভালো করে লক্ষ করেছে ইভান ফিয়োদরভিচ।

সে যা-ই হোক, সেই সময় এসবের একেবারে বাইরে ভিন্ন প্রকৃতির একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মনকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মস্কো থেকে আসার পর প্রথম থেকেই কাতেরিনা ইভানভ্‌নার প্রতি তার উন্মত্ত আবেগের বহ্নিশিখায় সে যেভাবে নিজেকে একেবারে সপে দিল তা থেকে তার উদ্ধারের কোনো আশা ছিল না। ইভান ফিয়োদরভিচের এই যে নতুন হৃদয়াবেগ যার প্রভাব পরবর্তীকালে তার সমগ্র বাকি জীবনের ওপর পড়েছিল সেই প্রসঙ্গ শুরু করার জায়গা এটা নয়। সে সব অন্য আরও এমন একটা কাহিনির, এমন আরেকটি উপন্যাসের ক্যানভাস হিসেবে কাজে লাগতে পারে যাতে হাত দেওয়ার উদ্যোগ আমি কখনও নিতে পারব কিনা তাও জানি না। কিন্তু তাহলেও এখন এটাও না বলে পারছি না যে রাত্রে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ যখন আলিয়োশার সঙ্গে পথ চলছিল—যার বিবরণ আমি ইতিপূর্বেই দিয়েছি—তখন যে সে আলিয়োশাকে বলেছিল, 'ওর প্রতি আমার কিন্তু কোন আগ্রহ নেই'—তার সেই মুহূর্তের কথাটা ছিল ডাহা মিথ্যে কথা। কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে সে পাগলের মতো ভালোবাসত, যদিও এটাও সত্য যে সময় সময় সে তাকে

ঘৃণাও করত—এতদূর ঘৃণা করত যে তাকে খুন পর্যন্ত করে বসতে পারত। এখানে অনেকগুলি কারণ এসে জুটেছিল। মিতিয়ার ঘটনায় দারুণ ভাবে ধাক্কা খেয়েছিল কাতেরিনা ইভানভ্না, তাই ইভান ফিয়োদরভিচ তার কাছে আবার ফিরে আসতে তাকে নিজের একজন উদ্ধারকর্তা মনে করে সে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে এসেছিল। তার মনের মধ্যে তখন দুঃখ অপমান ও লাঞ্ছনার জ্বালা। ঠিক এই সময় আবারও দেখা দিল সেই মানুষটি যে আগে এক সময় তাকে কী ভালোই না বাসত! আঃ, কী ভালোই যে বাসত তা কাতেরিনা ইভানভ্না বেশ ভালো জানত। তার হৃদয় আর বুদ্ধিমত্তাকে কাতেরিনা ইভানভ্না তার নিজের হৃদয় আর বুদ্ধিমত্তার অনেক ওপরে স্থান দিত। কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্না দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। যে মানুষটিকে সে ভালোবাসে তার বাসনার মধ্যে কারামাজ়ভ্ প্রকৃতির যাবতীয় অসংযম থাকলেও এবং তার প্রতি মানুষটির যে অত মুগ্ধতা তা সত্ত্বেও কাতেরিনা ইভানভ্না পুরোপুরি তার কাছে আত্মোৎসর্গ করেনি। সেই সঙ্গে সর্বক্ষণ মনে মনে এই ভেবে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হত যে মিতিয়ার সঙ্গে সে বেইমানি করেছে। ইভানের সঙ্গে তার তুমুল কলহের মুহূর্তে—আর সে রকম কলহ তাদের মধ্যে অনেকই হত—কাতেরিনা সোজা তার মুখের ওপর তা বলেও ফেলত। আলিয়োশার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এটাকেই ইভান 'মিথ্যার ওপরে মিথ্যা' আখ্যা দিয়েছিল। অবশ্য আসলে এর মধ্যে অনেকটা মিথ্যাও ছিল, আর সেটাই আরও বেশি করে ইভান ফিয়োদরভিচের মনে বিরক্তির উদ্রেক করত। কিন্তু সে সব পরের কথা।

এক কথায়, কিছু সময়ের জন্য সে স্মের্দিকোভের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু তাহলে কী হবে, তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের দু সপ্তাহ পরে আগের মতো সেই একই সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা আবারও তাকে পীড়া দিতে শুরু করল। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে সে অনবরত নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল কীসের জন্য ও তখন ফিয়োদর পাভ্লভিচের বাড়িতে তার অবস্থানের শেষের দিন সেই রাতে, তার এখান থেকে বিদায়ের আগে চোরের মতো চুপিসারে সিঁড়ির কাছে গিয়ে ঘাপটি মেরে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিল নিচে তার বাবা কী করছে? কেন পরে একথা মনে হতে তার মনের মধ্যে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছিল? কেন পরের দিন সকালে পথে তার মন হঠাৎ অমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মস্কোয় যেতে যেতে সে আপন মনে নিজেকে বলেছিল 'আমি একটা ইতর'? এবং অবশেষে এখন এই সমস্ত পীড়াদায়ক চিন্তা হঠাৎ এত প্রবলাকার ধারণ করে তার মনকে অধিকার করে বসেছিল যে ফলে এক সময় তার মনে হয়েছিল এর দরুন সে সম্ভবত কাতেরিনাকেও ভুলে যেতে প্রস্তুত! ঠিক এই কথা ভাবার পরই আলিয়োশার সঙ্গে রাস্তায় তার দেখা। তৎক্ষণাৎ তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আচমকা সে তাকে একটি প্রশ্ন করেছিল:

"তোর মনে আছে, ডিনারের পর দ্মিত্রি যখন হুড়মুড় করে বাড়িতে ঢুকে

পড়ে বাবাকে ধরে মারল আর তারপর বাইরে বেরিয়ে আমি তোকে বলেছিলাম যে 'কামনা করার অধিকার' আমি নিজের জন্য রেখে দিচ্ছি, বল দেখি, তখন কি তুই ভেবেছিলি যে আমি বাবার মৃত্যু কামনা করি? না কি অন্য কিছু?"

"তা, ভেবেছিলাম", মৃদুস্বরে আলিয়োশা উত্তর দিয়েছিল।

"আসলেও তাই। এখানে অনুমান করার কিছু নেই। কিন্তু তোর কি তখন মনে হয়েছিল যে 'একটা কালসাপ আরেকটা কালসাপকে খাক'—ঠিক এটাই আমার মনোগত ইচ্ছে ছিল, অর্থাৎ কিনা দ্‌মিত্রিই বাবাকে খুন করে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে, এমনকি আমি নিজেও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পিছপা নই?"

আলিয়োশার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে নীরবে তার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"কী হল? বল!" ইভান চিৎকার করে উঠল। "আমার আপ্রাণ জানার ইচ্ছে তুই তখন কী ভেবেছিলি। আমার জানা দরকার, সত্যি কথাটা আমার জানা দরকার!" এই বলে সে জোরে নিশ্বাস টানল, আলিয়োশা উত্তরে কিছু বলার আগেই কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব করে তার দিকে তাকাল।

"আমায় ক্ষমা কোরো, এটাও আমি তখন ভেবেছিলাম", ফিসফিস করে এই কথা বলে আলিয়োশা চুপ করে গেল, 'পরিস্থিতি হালকা করার জন্য' একটি কথাও সে যোগ করল না।

"ধন্যবাদ!" উত্তরে কাটা জবাব দিয়ে আলিয়োশাকে ছেড়ে দিয়ে ইভান দ্রুত তার পথ ধরল। তখন থেকেই আলিয়োশা লক্ষ করেছে, দাদা ইভান কেমন যেন একটা কড়া মনোভাব নিয়ে তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছে, এমনকি আলিয়োশার প্রতি তার ভালোবাসাও যেন ঘুচে গেছে। ফলে হল এই যে পরে আলিয়োশা নিজেও তার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে, তার সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের পর ইভান ফিয়োদরভিচ্ আর বাড়ি না গিয়ে তৎক্ষণাৎ হঠাৎ কী মনে হতে আবার স্মের্দিকোভের উদ্দেশে রওনা দিল।

## সাত

## স্মের্দিকোভের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার

স্মের্দিকোভ্ তত দিনে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে গেছে। ইভান ফিয়োদরভিচ্ তার নতুন বাসস্থান জানত থরে থরে গুঁড়ি কাঠের দেয়াল দিয়ে গাঁথা সেই হেলে পড়া ছোট্ট বাড়িটা, দুটো কুটিরে ভাগ করা, মাঝখানে একটা গলি বারান্দা। একটাতে বাস করত মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না আর তার মা, অন্যটাতে বিশেষ ভাবে থাকত স্মের্দিকোভ্। বিনা পয়সায় না টাকাপয়সার বিনিময়ে সে বাস করত, কীসের ভিত্তিতে সে ওদের কাছে এসে উঠেছিল তা ভগবানই জানেন। পরে অনুমান করা

হত মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নার বাগ্‌দত্তা প্রেমিক হিসেবে সে ওখানে উঠে এসেছিল এবং আপাতত বিনা পয়সাতেই থাকত। মা এবং মেয়ে দুজনেই তাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করত এবং তাকে অতি উচ্চস্তরের মানুষ হিসেবে দেখত।

ইভান ফিয়োদরভিচ্ দরজায় করাঘাত করল। শেষ পর্যন্ত দরজা খোলা হলে সে গলি বারান্দায় ঢুকল এবং মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নার নির্দেশমতো সোজা বাঁ দিকের 'ছিমছাম গোছের কুটিরটার' দিকে এগিয়ে গেল। স্মের্দিকোভ্ এটাতেই থাকত। ঘরের ভেতরে দিব্যি টালি লাগানো একটা চুল্লি, ঘরটা চুল্লির আগুনে দস্তুরমতো গরম করে রাখা হয়েছে। দেয়ালের শোভাবর্ধন করছে নীলরঙের ওয়াল পেপার—অবশ্য বেশ ছেঁড়াখোঁড়া, আর তার তলায় ফাঁকফোকরের মধ্যে গিজগিজ করছে রাজ্যের কটাশে আরশুলা—সংখ্যায় এত মারাত্মক রকমের বেশি যে ঘরের মধ্যে তাদের ফড়ফড় আওয়াজের আর কামাই নেই। আসবাব বলতে যা আছে তা একেবারেই নগণ্য দুই দেয়াল ঘেঁষে দুটো বেঞ্চি আর টেবিলের পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলটা যদিও সাধারণ কাঠের তবু একটা টেবিল-ক্লথ দিয়ে ঢাকা, সেটার ওপরে আবার গোলাপি রঙের কী সব ডিজাইন আঁকা। ঘরে ছোটো ছোটো দুটো জানলা। দুটো জানলারই ধারে জিরেনিয়াম ফুলের একটি করে টব। এক কোনায় কুলঙ্গির মধ্যে কয়েকটা বিগ্রহ। টেবিলে বেশ ভালোমতো তোবড়ানো, ছোটো খাটো একটা তামার সামোভার, একটা ট্রে আর দুটো কাপ। কিন্তু স্মের্দিকোভের চা পান ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, সামোভারটার আঁচও নিভে গেছে। নিজে সে বসে আছে টেবিলের ধারে একটা বেঞ্চের ওপর, একটা এক্সারসাইজ বুকের দিকে তাকিয়ে কলম দিয়ে কী সব লেখাজোখা করছে। পাশেই একটা কালির দোয়াত, একটা নিচু বাতিদান, সেটা ঢালাই লোহার, বাতিদানের মোমবাতিটা আবার চর্বি মেশানো। স্মের্দিকোভের চেহারা দেখে ইভান ফিয়োদরভিচ সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে এলো যে অসুস্থতা থেকে সে পুরোপুরি সেরে উঠেছে। তার মুখ অনেকটা তাজা, অনেকটা ভরাট। মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি ফাঁপিয়ে তোলা, রগের দু পাশের চুল লোশন দিয়ে পাট করা। বসে আছে তুলোয় ঠাসা বিচিত্রবর্ণের একটা ড্রেসিং গাউন পরে। সেটা অবশ্য খুবই নোংরা আর রীতিমতো জীর্ণদশাগ্রস্ত। নাকের ওপর চশমা। ইভান ফিয়োদরভিচ আগে কখনও তাকে চশমা পরতে দেখেনি। এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটাতে ইভান ফিয়োদরভিচের রাগ যেন হঠাৎ দ্বিগুণ চড়ে গেল 'এমন একটা ইতর জীব আবার চশমা পরে আছে!'

স্মের্দিকোভ্ ধীরে ধীরে মাথা তুলে চশমার ভেতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল প্রবেশকারী ব্যক্তিটিকে, তারপর ধীরে সুস্থে চশমাজোড়া খুলে বেঞ্চি থেকে সামান্য উঠে দাঁড়াল, তবে ততটা শ্রদ্ধাভরে যেন একেবারেই নয়, এমনকি খানিকটা যেন আলস্যভরে—শুধু যতটা সৌজন্য রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক, যতটা না হলে প্রায় চলেই না, মাত্র সেইটুকু বজায় রেখে। এ সবই মুহূর্তের মধ্যে ইভানের

মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে গেল, সবই সঙ্গে সঙ্গে সে ধরে ফেলল, লক্ষ করল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা স্মের্দিকোভের চোখের দৃষ্টি—চরম বিদ্বেষপরায়ণ; বন্ধুভাবাপন্ন আদৌ নয়, এমনকি ঔদ্ধত্যপূর্ণ। ভাবটা এই যে 'অত ঘুরঘুর করার কী আছে? তখন তো আমাদের মধ্যে সব ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েই গেছে। এখন আবার এলে কী বলে?' ইভান ফিয়োদরভিচ কোনো মতে নিজেকে সংযত রাখল।

"তোমার ঘরে বড্ড গরম দেখছি", দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওভারকোটটার বোতাম খুলতে খুলতে সে বলল।

"খুলে ফেলুন, এজ্ঞে", স্মের্দিকোভ্ অনুমতি দিল।

ইভান ফিয়োদরভিচ ওভারকোট খুলে বেঞ্চির ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে একটা চেয়ার ধরে তাড়াতাড়ি সেটা টেবিলের কাছে টেনে এনে বসে পড়ল। স্মের্দিকোভ্ তার আগেই বেঞ্চিতে তার নিজের জায়গাটাতে বসে পড়েছিল।

"প্রথমত, আমরা এখানে একা তো?" কঠোর স্বরে দ্রুত প্রশ্ন করল ইভান ফিয়োদরভিচ। "ওখান থেকে কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না তো?"

"কেউ কিচ্ছু শুনতে পাবে না, এজ্ঞে। আপনি নিজেই তো দেখলেন মাঝখানে গলি বারান্দা আছে।"

"শোন হে বৎস, তোমার সঙ্গে দেখা করার পর আমি যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন যে তুমি একটা বাজে কথা বলেছিলে, বলেছিলে তুমি যে মৃগী রোগের অভিনয় করতে ওস্তাদ এই কথা যদি আমি প্রকাশ না করি তাহলে তুমিও গেটের সামনে তোমার সঙ্গে আমার যে সমস্ত কথা হয়েছিল তা তদন্তকারীকে জানাবে না—এর অর্থ কী? 'সমস্ত কথা' মানে? কী ভেবে তুমি তখন বলেছিলে? তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলে না কি? তুমি ভেবেছ কী? আমি তোমার সঙ্গে কোন ব্যাপারে গাঁটছড়া বেঁধেছিলাম নাকি? তোমাকে আমি ভয় পাই নাকি?"

ইভান ফিয়োদরভিচ রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে কথাগুলি বলল। মনে হল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই সে তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে-কোনো রকম রাখঢাক ভাব বা এড়িয়ে যাবার কৌশল তার দু চক্ষের বিষয়, সে সোজা কথায় আসতে চায়। স্মের্দিকোভের দু চোখে বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠল, তার বাঁ চোখটা পিটপিট করতে লাগল, যদিও সে তার অভ্যাসবশত যথারীতি সংযম ও পরিমিতি বোধ বজায় রেখে তৎক্ষণাৎ তার জবাবটাও দিল। সে যেন বলতে চাইল 'খোলাখুলি চাও? বেশ তো, খোলাখুলিই হবে।'

"আমি তখন ঠিক এটাই বোঝাতে চাইছিলাম এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই তখন আমি কথাটা উচ্চারণ করেছিলাম যে আপনার জন্মদাতা পিতার এই খুনের ব্যাপারটা আগেভাগে জানা সত্ত্বেও আপনি তখন তাঁকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাই এর পর লোকে যাতে আপনার মনের ভাব নিয়ে মন্দ কিছু বা আরও অন্য

রকম কিছু ভেবে না বসে—ঠিক এই কারণেই তখন আমি কথা দিয়েছিলাম যে ওপরওয়ালাদের কানে এটা আর তুলব না।”

যদিও স্মের্দিকোভ্ তাড়াহুড়ো না করে কথা বলছিল এবং দেখেশুনে মনে হচ্ছিল আত্মসংযম বজায় রেখেই বলছিল তবুও এরই মধ্যে এক ধরনের দৃঢ়তা, একটা জেদের ভাব, বিদ্বেষের জ্বালা আর মারমুখী ঔদ্ধত্যের সুরও তার কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ছিল। উদ্ধত ভঙ্গিতে অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ইভান ফিয়োদরভিচের দিকে। তাই দেখে ইভান ফিয়োদরভিচের চোখে পর্যন্ত ধাঁধা লেগে গেল।

“সে আবার কী? কী ব্যাপার? তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল নাকি?”

“বুদ্ধিসুদ্ধি আমার পুরোপুরি ঠিক আছে, এজ্ঞে।”

“আরে তখন কি আমি খুনের কথা *জানতাম?*” ইভান ফিয়োদরভিচ শেষ কালে চিৎকার করে উঠে সজোরে টেবিলে ঘুষি মারল। ‘আরও অন্য কিছু’র মানেটা কী? বল্ হারামজাদা!”

স্মের্দিকোভ্ চুপ করে রইল। সেই একই রকম উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে।

“আরও অন্য কিছু’টা কী—বল্ পূতিগন্ধের বাসা বজ্জাত।” গর্জন করে উঠল সে।

“এই মুহূর্তে ‘আরও কিছু’ বলতে আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা এই যে আপনি নিজেও তখন খুব বেশি করে সম্ভবত আপনার জন্মদাতা পিতার মৃত্যু কামনা করেছিলেন।”

ইভান ফিয়োদরভিচ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণ শক্তিতে স্মের্দিকোভের কাঁধে এমন ঘুষি বসিয়ে দিল যে সে টাল খেয়ে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তার সারাটা মুখ চোখের জলে ভেসে গেল। “একজন দুর্বল লোককে মারা লজ্জার কথা, কর্তা!” এই বলে নাক ঝেড়ে হদ্দ নোংরা, নীল চেক কাটা একটা সুতির রুমাল দিয়ে সে হঠাৎ চোখ ঢাকল, নিঃশব্দ কান্নায় ডুবে গিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল। মিনিট খানেক কেটে গেল।

“হয়েছে! থাম তো!” ফের চেয়ারে বসতে বসতে শেষ পর্যন্ত হুকুমের সুরে ইভান ফিয়োদরভিচ্ বলল। “আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে না বলে দিচ্ছি!”

স্মের্দিকোভ্ চোখের ওপর থেকে তার ন্যাকড়াটা সরাল। এই মাত্র যে অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছে তার কুঞ্চিত মুখের প্রতিটি রেখায় তা প্রকট হয়ে উঠল।

“তাহলে তুই হারামজাদা তখন ভেবেছিলি আমি দ্মিত্রির সঙ্গে মিলে বাবাকে খুন করতে চাই?”

“আপনার তখনকার মনের কথা জানতাম না এজ্ঞে”, ক্ষুব্ধস্বরে স্মের্দিকোভ্ বলল, “আর সেই কারণেই তখন গেটের সামনে আপনাকে থামিয়েছিলাম, ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই আপনাকে বাজিয়ে দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এজ্ঞে।”

"কী বাজিয়ে দেখা? কী?"

"কেন? ঠিক এই ব্যাপারটি যে আপনার পিতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুন হয়ে যান এটা আপনি চান কি চান না?"

ইভান ফিয়োদরভিচের সব চাইতে বেশি রোষোদ্রেক করল স্মের্দিকোভের এই নাছোড়বান্দা উদ্ধত সুরটি, জেদের বশে সেটা সে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না।

"যদি কেউ খুন করে থাকে সে তুই!" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

স্মের্দিকোভ্ অবজ্ঞার হাসি হাসল।

"আমি যে খুন করিনি সে আপনি নিজেই বেশ ভালোভাবে জানেন। আমি তো ভেবেছিলাম একজন বুদ্ধিমান লোকের এই নিয়ে বলার আর কিছু থাকতে পারে না।"

"কিন্তু কেন, কেন সেই সময় আমার ওপর তোমার অমন সন্দেহ হয়েছিল?"

"আপনি তো জানেন, স্রেফ ভয় থেকেই এটা হয়েছিল, এজ্ঞে, কেন না আমার অবস্থাটা তখন এমন হয়েছিল যে আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম, সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখছিলাম। ঠিক করলাম আপনাকেও বাজিয়ে দেখা যাক এজ্ঞে, কেন না, ভাবলাম আপনার ভাইয়ের মতো আপনারও যদি ওই একই ইচ্ছা থাকে তাহলে তো আর দেখতে হচ্ছে না, আমি নিজেও সেই সঙ্গে মাছির মতো নিকেশ হয়ে যাব।"

"শোন হে, দু সপ্তাহ আগে কিন্তু তুমি এমন কথা বলনি।"

"হাসপাতালে আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি ঠিক এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম, কেবল ভেবেছিলাম আপনি এত বড়ো বুদ্ধিমান মানুষ, বাড়তি কথা ছাড়াই বুঝতে পারবেন, আপনি নিজেই এ বিষয়ে সরাসরি কথাবার্তা বলতে চাইবেন না, এজ্ঞে।"

"আহা কী কথা! কিন্তু বল, জবাব দাও, আমি কিন্তু ছাড়ছি না  ঠিক কীসে... আমি কী এমন তখন ভেবেছিলাম যে তোমার এই নোংরা মনটার মধ্যে আমার সম্পর্কে এমন হীন সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারল?"

"খুন করার কথা যদি বলেন, সেটা আপনি নিজে কোনো মতেই করতে পারবেন না, এজ্ঞে। করতে চানওনি। কিন্তু অন্য কেউ যাতে খুন করে এই চাওয়ার কথা যদি বলেন, সেটা আপনি চেয়েছিলেন!"

"কেমন অম্লান বদনে, কেমন অম্লান বদনে বলছে এসব কথা! কিন্তু আমি তা চাইতে যাব কেন? কী ছাই কারণ থাকতে পারে এই চাওয়ার পিছনে?"

"বলেন কী! কী ছাই কারণ? উত্তরাধিকারের কী হবে, এজ্ঞে?" বিষঢালা কণ্ঠে, এমনকি অনেকটা যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই তার কথার খেই ধরে বলে উঠল স্মের্দিকোভ। "সেক্ষেত্রে তো আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনাদের তিন ভাইয়ের প্রত্যেকের ভাগে অন্তত পক্ষে চল্লিশ হাজার করে আসার কথা এজ্ঞে,

হয়তো বা তারও বেশি। কিন্তু ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ যদি ওই মহিলাকে—আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকেই বিয়ে করে বসতেন তাহলে মহিলা বিয়ের অনুষ্ঠানের পরই, সঙ্গে সঙ্গে কর্তার যা কিছু পুঁজি সবটা নিজের নামে করে নিতেন, কেন না তিনি খুব একটা বোকাহাঁদা নন। ফলে পিতার মৃত্যুর পর আপনাদের তিন ভাইয়ের সকলের কপালে দু রুবলও জুটত না এজ্ঞে। আর তখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে বিয়ের অনুষ্ঠানের বেশি বাকি ছিল কি? এক চুলের মামলা এজ্ঞে কর্তার সামনে দিদিমণি একবার তার কড়ে আঙুলটি তুললেই আর দেখতে হত না—অমনি তিনি ল্যা ল্যা করে জিভ্ বের করে বিয়ের জন্যে ওনার পিছু পিছু গির্জায় ছুটতেন।"

ইভান ফিয়োদরভিচ অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল।

"ভালো", শেষ পর্যন্ত সে বলল। "তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমি লাফিয়ে উঠে তোমাকে মারতে যাইনি, তোমাকে খুন করিনি। বলে যাও। তোমার মতে তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে ভাই দ্‌মিত্রিকে আমি এই উদ্দেশ্যে ঠিক করে রেখেছিলাম, ওর ওপরই আমি ভরসা করেছিলাম?"

"ওঁর ওপর আপনার ভরসা না করার কী ছিল, এজ্ঞে? উনি যদি খুন করেন তাহলে ওঁর আভিজাত্যের অধিকার পদমর্যাদা বিষয়সম্পত্তি সবই খোয়া যাবে, ওঁকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তখন আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার ভাই দ্‌মিত্রির পাওনা ভাগটা আপনার ভাই আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ আর আপনার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। তার মানে, আপনাদের দুজনের ভাগে আর চল্লিশ করে নয়, প্রত্যেকের ভাগে ষাট হাজার করে পড়বে এজ্ঞে। তাই এ ব্যাপারে আপনি অবশ্যই তখন দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের ওপর ভরসা করেছিলেন!"

"ওঃ তোমার কাছ থেকে এতও আমাকে সইতে হচ্ছে! শোন রে হতভাগা: আমি যদি তখন কারও ওপর ভরসা করতাম সেটা করতাম অবশ্যই তোর ওপর, দ্‌মিত্রির ওপর নয়। আমি হলফ করে বলছি তুমি যে কিছু একটা নষ্টামি করবে আমার মনও কিন্তু তাই বলছিল তখনই বলছিল। আমার তখনকার মনোভাবটা আমার মনে আছে!"

"আমিও তখন ভেবেছিলাম, আমার ওপর যে ভরসা করছেন সেটাও আমি ভেবেছিলাম এক লহমার জন্য।" দাঁত বের করে বিদ্রূপের হাসি হাসল স্মের্দিকোভ্। "তাই বলছিলাম কি, এতেই কিন্তু আপনি নিজেকে আমার কাছে আরও বেশি করে প্রকাশ করে দিলেন। কারণ এই যে আমার সম্পর্কে আগে থাকতে আপনার এরকম একটা ধারণা থাকা সত্ত্বেও আপনি যে চলে গেলেন তার মানে এতেই আপনি যেন বলে দিলেন : তুমি ইচ্ছে করলে আমার জন্মদাতা বাপকে খুন করতে পার, আমি তাতে বাধা দেব না।"

"হারামজাদা! এটাই তুমি বুঝলে!"

"এ সবই সেই চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাওয়া নিয়ে, এজ্ঞে। মাফ করবেন! আপনি

মস্কো যাবার আয়োজন করছেন, আপনার পিতা আপনাকে চের্মাশ্নিয়াতে যাবার জন্য কত অনুনয় করলেন, আপনি রাজি হলেন না! অথচ আমার একটিমাত্র বাজে কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন, এজ্ঞে! বলি, তখন চের্মাশ্নিয়াতে যেতে আপনার রাজি হওয়ার কী কারণ ছিল? মস্কোয় না গিয়ে আমার একটি মাত্র কথায় যখন চের্মাশ্নিয়াতে গেলেন তার মানে আমার কাছ থেকে আপনার কোনো প্রত্যাশা ছিল?”

“না, হলফ করে বলছি, না!” দাঁত কড়মড় করতে করতে ইভান চেঁচিয়ে বলল।

“না, কী করে হয়, এজ্ঞে? তাহলে, আপনি যদি বাপের ব্যাটা হতেন সেক্ষেত্রে উলটোটাই হওয়া উচিত ছিল, আমার তখনকার ওরকম কথার জন্য আপনার প্রথমেই উচিত ছিল আমাকে হাজতে পুরে দিয়ে আচ্ছা করে ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা নিদেনপক্ষে ওখানেই তৎক্ষণাৎ কষে আমার বদনে একটা ঘুষি ঝেড়ে দেওয়া। কিন্তু আপনি, মাফ করবেন এজ্ঞে, করলেন তার উল্‌টোটা—এতটুকুও রাগ না করে তক্ষুনি আমার ওই স্রেফ একটা বাজে কথামতো বন্ধুভাবে অক্ষরে অক্ষরে কাজ করলেন, গেলেন এজ্ঞে, অথচ এই কাজটা ছিল একেবারে অর্থহীন, কেন না আপনার উচিত ছিল জন্মদাতা পিতার প্রাণ রক্ষা করার জন্য এখানে থেকে যাওয়া। তা হলে আমার এই সিদ্ধান্ত না করার কী ছিল?”

ইভানের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, সেই অবস্থায় সে দু হাতের মুঠোয় দু হাঁটু চেপে ধরে গোমড়ামুখে বসে রইল।

“হ্যাঁ আফশোসের কথা যে তখন তোমার বদনে কষে একটা ঘুষি ঝেড়ে দিই নি”, তিক্ত হেসে সে বলল। তখন তোমাকে যে আর হাজতে পুরি, সে উপায় ছিল না। কে আমাকে বিশ্বাস করত আর কীই বা প্রমাণ দেখাতে পারতাম? তবে হ্যাঁ, কষে একটা ঘুষি ঝেড়ে বদন বিগড়ে দেওয়া ইশ্, বড়ো আফশোসের কথা। তখন মাথায় খেলেনি। যদিও ঘুষি মেরে বদন বিগড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা নিষিদ্ধ, তবু তোমার ওই বিশ্রী বদনটাকে আমি হালুয়া বানিয়ে ছাড়তাম।

স্মের্দিকোভ্ প্রায় উপভোগ করার মতো ভাব করে তার দিকে তাকাল।

“জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে ” এক সময় ফিয়োদর পাভ্লভিচের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে যে রকম আত্মতৃপ্ত তত্ত্ববাগীশের সুরে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে সে তর্ক করেছিল, তাকে উপহাস করেছিল সেই একই রকম ভাবে সে বলল, “সাধারণ ক্ষেত্রে আজকাল সত্যি সত্যি বদনে ঘুষি ঝাড়াটা আইনে নিষিদ্ধ বটে, সবাই সেটা বন্ধও করে দিয়েছে এজ্ঞে, কিন্তু তা হলে কী হবে, জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা দুনিয়াতেই—তা হোক না কেন অমন পুরোদস্তুর প্রজাতন্ত্রের দেশ ফরাসি দেশ—সেখানে পর্যন্ত আদম আর হবার সেই সময়ের মতোই আজও লোকে মারধর চালিয়ে যাচ্ছে এজ্ঞে। তা

এটা কখনও বন্ধ হবারও নয়। অথচ আপনার কিনা তখন, বিশেষ ক্ষেত্রে সে সাহস হল না এজ্ঞে।”

“তুমি ফরাসি শব্দ শিখতে লেগেছ যে, কী ব্যাপার?” মাথা নেড়ে ইশারায় টেবিলের ওপর পড়ে থাকা এক্সারসাইজ বুকটা দেখিয়ে ইভান বলল।

“আমার শিক্ষার যদি তাতে কোনো সাহায্য হয় তাহলে শিখব না কেন এজ্ঞে? ভাবলাম কোনো না কোনো সময় আমার নিজেরই হয়তো ইউরোপের ওই সুখের জায়গাগুলোতে যাবার সুযোগ হতে পারে।”

“শোন্ রে জানোয়ার!” ইভানের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, তার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল। “তোর ওই অভিযোগে আমি ভয় পাই না। আমার বিরুদ্ধে যা খুশি এজাহার দিতে পারিস। তোকে যে মারতে মারতে মেরে ফেলিনি তার একমাত্র কারণ এই যে এই অপরাধে তোকে সন্দেহ করছি এবং আমি আদালতে তোকে টেনে নিয়ে যাব। তোর মুখোশ আমি খুলে দেব!”

“আমার মতে আপনার চুপ করে থাকাই ভালো, এজ্ঞে। কারণ, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমার বিরুদ্ধে আপনি কী বলতে পারেন, আর কে-ই বা আপনার কথা বিশ্বাস করবে? কিন্তু যেই বলতে শুরু করবেন অমনি আমিও সব বলে দেব, এজ্ঞে, কেন না নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব না তা কী করে হয়?”

“তুমি কি ভাবছ আমি এখন তোমাকে ভয় পাই?”

“আমার এই যে সমস্ত কথা, যা এখন আমি আপনাকে বললাম, আদালত না হয় না-ই বিশ্বাস করল, কিন্তু পাব্‌লিক বিশ্বাস করবে এজ্ঞে। তাতে কিন্তু আপনিই লজ্জায় পড়ে যাবেন।”

“এর মানে কী? আবার সেই ‘বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ’?—অ্যাঁ?” দাঁত কড়মড় করে ইভান বলল।

“আপনি একদম ঠিক ধরেছেন কর্তা। বুদ্ধিমানের কাজই করুন, এজ্ঞে।”

ইভান ফিয়োদরভিচ উঠে দাঁড়াল। রাগে বিতৃষ্ণায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। ওভারকোটটা গায়ে চড়াল। স্মের্দিকোভের কথার আর কোনো উত্তর না দিয়ে, এমন কি তার দিকে না তাকিয়েই দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার তাজা বাতাস তাকে সতেজ করে তুলল। আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো নানা চিন্তা আর উপলব্ধি তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। ‘এখুনি গিয়ে স্মের্দিকোভের সব কথা জানিয়ে দেব কি? কিন্তু কী জানাব? হাজার হোক ও নিরপরাধ। বরং উলটে ও আমার নামেই বলতে পারে। সত্যিই তো, আমি তখন চের্‌মাশ্‌নিয়াতে রওনা দিতে গেলাম কী করতে? কেন? কী করতে?’ ইভান ফিয়োদরভিচ নিজেকে প্রশ্ন করল। ‘হ্যাঁ অবশ্যই আমি কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলাম। এ ঠিকই বলেছে’ আবার তার এই নিয়ে এক শ বার মনে পড়ে গেল বাবার বাড়িতে থাকার সময় শেষের রাতে সিঁড়ির কাছে তার আড়ি পাতার ঘটনাটা।

কিন্তু এবারে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত কষ্ট হল যে সে যেখানে ছিল সেখানেই ছুরিকাবিদ্ধের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তাই তো আমি তখন এটা আশা করছিলাম। কথাটা সত্যি! আমার কাম্য ছিল, ঠিক এই খুনই আমার কাম্য ছিল! খুন আমার কাম্য ছিল কি? ছিল কি? স্মের্দিকোভ্টাকে খুন করা উচিত! আমার যদি এখন স্মের্দিকোভ্কে খুন করার সাহস না থাকে তাহলে বাঁচারও কোনো অর্থ থাকছে না!...'

ইভান ফিয়োদরভিচ বাড়িতে না গিয়ে তখন সোজা কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে গেল। তার আবির্ভাব কাতেরিনা ইভানভ্নাকে ভীতচকিত করে তুলল। ইভান ফিয়োদরভিচকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল। স্মের্দিকোভের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল সব সে তাকে জানাল, ছিটেফোঁটা কিছুই বাদ দিল না। কাতেরিনা ইভানভ্না তাকে কত ভাবেই না বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সে কিছুতেই শান্ত হতে পারছিল না। শুধু ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে লাগল আর অদ্ভুত ভাবে ছাড়া ছাড়া কথা বলে যেতে লাগল। শেষকালে বসে পড়ল, টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে দু হাতে মাথা চেপে ধরে সে অদ্ভুত একটা উক্তি করল

"দ্মিত্রি খুন না করে যদি স্মের্দিকোভ্ খুন করে থাকে তবে বলাই বাহুল্য, আমি তার সঙ্গে এককাট্টা, কেননা আমি তাকে উস্কানি দিয়েছিলাম। উস্কানি দিয়েছিলাম কিনা এখনও জানি না। কিন্তু এটাই যদি হয় যে দ্মিত্রি খুন করে নি, খুন করেছিল স্মের্দিকোভ্ তাহলে অবশ্যই আমিও খুনি।"

এই কথা শুনে কোনো কথা না বলে কাতেরিনা ইভানভ্না জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে তার লেখার টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখা একটা হাতবাক্স খুলল। সেখান থেকে কী যেন একটা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর ইভানের সামনে রাখল। ভাই দ্মিত্রিই যে বাবাকে খুন করেছিল 'গণিতের নিয়মে তার প্রমাণ' স্বরূপ যার কথা পরে আলিয়োশাকে ইভান ফিয়োদরভিচ জানিয়েছিল এই কাগজটা ছিল সেই প্রমাণপত্র। প্রমাণপত্র বলতে একটা চিঠি। চিঠিটা মাতাল অবস্থায় মিতিয়া লিখেছিল কাতেরিনাকে। লিখেছিল ঠিক সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা কাতেরিনা ইভানভ্নার বাড়িতে সেই দৃশ্যের পর, যখন কাতেরিনা ইভানভ্নাকে গ্রুশেন্কা অপমান করেছিল, যেদিন আলিয়োশার মঠে চলে যাবার পথে তার সঙ্গে দ্মিত্রির দেখা হয়েছিল। সেই সময় আলিয়োশার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর গ্রুশেন্কার কাছে ছুটে গিয়েছিল মিতিয়া। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। তবে রাত নাগাদ সে গিয়ে পড়েছিল 'মহানগর' সরাইখানায়। সেখানে সে আকণ্ঠ পান করে। মাতাল অবস্থায় একটা কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে তার নিজের পরিণতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণপত্র লিখে ফেলে। 'মাতালের' চিঠি' বলতে যা বোঝায় তাই— আচ্ছন্নের মতো লেখা, বাগবহুল, অসংলগ্ন। অনেকটা সেই মাতালের মতো, যে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত

হয়ে তার স্ত্রীকে অথবা বাড়ির কাউকে বলতে শুরু করে এইমাত্র কী রকম অপদস্থ তাকে হতে হয়েছে, যার কাছে সে অপদস্থ হয়েছে সে লোকটা কত পাজি, অন্যদিকে সে নিজে কত ভালো লোক এবং সেই পাজিটাকে সে দেখে নেবে। আর সে সবই হয় দীর্ঘক্ষণের, দীর্ঘ একটানা ছাড়া-ছাড়া ও উত্তেজনাপূর্ণ, সেই সঙ্গে টেবিলের ওপর পড়তে থাকে চড়চাপড়, হু হু করে ঝরতে থাকে মাতালের চোখের জল। সরাইখানায় যে কাগজটা তাকে চিঠি লেখার জন্য দেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল অতি শস্তাদরের সাধারণ এক টুকরো নোংরা লেখার কাগজ, যার উলটো পিঠে কী সব হিসাবপত্তর লেখা ছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল মাতালের অত কথার সেখানে স্থান সঙ্কুলান হয়নি, তাই মিতিয়া লিখে মার্জিন তো ভরিয়েই ফেলেছিল, এমনকি শেষ লাইনগুলো আগের লেখার ওপরই আড়াআড়ি ভাবে তাকে লিখতে হয়েছিল। চিঠির বিষয়বস্তুটা ছিল এই রকম:

'আমার সর্বনাশিনী কাতিয়া,

'কালই তোমাকে তোমার তিন হাজার ফেরত দিয়ে দেব। হে উগ্রচণ্ডা। হে উগ্রচণ্ডা নারী, বিদায়, কিন্তু হে আমার ভালোবাসা, তোমাকেও বিদায়! চুকিয়ে দিচ্ছি! কাল সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে জোগাড় করার চেষ্টা করব, যদি লোকের কাছ থেকে জোগাড় করতে না পারি তাহলে তোমাকে আমি আমার সম্মানের দিব্যি দিয়ে বলছি বাবার কাছে যাব, গিয়ে ওর মাথার খুলি ভাঙব, ওর বালিশের তলা থেকে টাকা নেব—শুধু ইভান্‌টা চলে গেলেই হয়। জেলের ঘানি টানতে হয় তাও সই, তিন হাজার ফেরত দেবই দেব। তুমি নিজে আমায় বিদায় দাও। তোমার সামনে আভূমি নত হচ্ছি, কেন না তোমার কাছে আমি একটা ইতর। আমাকে ক্ষমা কোরো। না, ক্ষমা বরং না-ই করলে—সেটা তোমার এবং আমার—আমাদের দুজনার পক্ষেই স্বস্তিকর হবে! তোমার ভালোবাসার চাইতে জেলের ঘানি টানা ভালো, কেননা আমি অন্য এক নারীকে ভালোবাসি, আর তাকে তুমি আজ বেশ ভালো ভাবেই জেনেছ—তাই আমাকে ক্ষমা করবে সেটা কেমন করে হয়? আমার সম্পদ যে চুরি করেছে তাকে খুন করব। চলে যাব তোমাদের চোখের আড়ালে, দূর পূর্বাঞ্চলে যাতে তোমাদের কাউকে আর দেখতে না হয়। ওকেও না। কেন না তুমি একাই যে আমাকে যাতনা দিয়েছ তা নয়, সেও দিয়েছে। বিদায়!

'পুনঃ তোমাকে শাপশাপান্ত করে লিখছি, কিন্তু আমি তোমাকে ভক্তি করি! সেটা আমি আমার বুকের ভেতরে শুনতে পাচ্ছি। সব ছিঁড়ে গিয়েও একটা তার রয়ে গেছে, সেটাই বাজছে। এর চাইতে বুকটা ফেটে দু আধলা হয়ে গেলেও ভালো ছিল! আমি নিজেই নিজেকে খুন করব, কিন্তু তা হলেও, তার আগে ওই কুত্তাটাকে। ওর কাছ থেকে তিন ছিনিয়ে নিয়ে তোমার কাছে ছুড়ে দেব। তোমার চোখে ইতর হতে পারি কিন্তু আমি চোর নই! তিন হাজারের অপেক্ষায় থাক। কুত্তাটা ওর তোশকের তলায় রেখেছে, গোলাপি ফিতে দিয়ে বাঁধা। আমি চোর নই, কিন্তু আমার

জিনিস যে চুরি করেছে তাকে আমি খুন করব। অমন অবজ্ঞার চোখে আমার দিকে তাকিয়ো না, কাতিয়া। দ্‌মিত্রি চোর নয়, তবে খুনি! বাপকে খুন করেছে, নিজেও ধ্বংস হল—নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে, তোমার অহঙ্কার যাতে সইতে না হয় সেই জন্য। যাতে তোমাকে আর ভালোবাসতে না হয়।

'পুনঃ পুঃ পুঃ কাতিয়া, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর যাতে লোকের কাছ থেকে টাকাটা পাওয়া যায়। তাহলে আর রক্তারক্তির মধ্যে যেতে হয় না, কিন্তু যদি পাওয়া না যায় তাহলে রক্তারক্তি হবে! সে তুমি আমাকে মার আর কাট!

তোমার দাস এবং তোমার শত্রু
দ্‌ কারামাজ়ভ্'

ইভান যখন এই 'প্রমাণপত্রটা' পড়ল তখন তার দৃঢ়প্রত্যয় হল—তার মানে খুন স্মের্দিকোভ্ করেনি, ভাই-ই করেছে। স্মের্দিকোভ্ যখন নয় তখন দাঁড়াচ্ছে এই যে সে, অর্থাৎ ইভানও নয়। চিঠিটা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে গণিতের নিয়মে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। তার কাছে মিতিয়ার দোষ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার আর কোনও কারণই রইল না। প্রসঙ্গত, মিতিয়া যে স্মের্দিকোভের সঙ্গে যোগসাজশ করে খুন করতে পারে এরকম কোনো সন্দেহ ইভানের কখনও ছিল না, তাছাড়া সেটা তথ্যের সঙ্গে মেলেও না। ইভান সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হল। পরদিন সকলে কেবল যা হল তা এই যে স্মের্দিকোভ্ আর তার উপহাসের কথা মনে হতে ইভানের মনে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব জাগল। এর কয়েক দিন বাদে এই ভেবে সে রীতিমতো আশ্চর্যই হয়ে গেল যে এই সন্দেহবশত কিনা সে এমন মর্মান্তিক দুঃখ পাচ্ছিল! সে ঠিক করল ওকে উপেক্ষা করে ওর কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। এই ভাবে এক মাস কেটে গেল। স্মের্দিকোভ্ সম্পর্কে সে কাউকে আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করল না। তবে কথায় কথায় বার দুয়েক শুনতে পেয়েছিল যে সে ভয়ানক অসুস্থ এবং তার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

'পরিণামে পাগল হয়ে যাবে', ভার্‌ভিন্‌স্কি নামে যুবক ডাক্তারটি একবার তার প্রসঙ্গে বলেছিল। ইভানের সেটা মনে আছে। সেই মাসের শেষ সপ্তাহে ইভান নিজে খুবই অসুস্থ বোধ করতে লাগল। আদালতের বিচারের ঠিক আগে আগে কাতেরিনা ইভানভ্‌না মস্কো থেকে ডাক্তারটিকে ডেকে আনিয়েছিল, ইতিমধ্যে পরামর্শের জন্য সে তার কাছে গিয়েছিল। ঠিক এই সময়ই কাতেরিনা ইভানভ্‌নার সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি মাত্রায় জটিল হয়ে পড়ে। ওরা দুজনে যেন পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত দুই শত্রু। মিতিয়ার কাছে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার 'ফিরে ফিরে আসা', যা ছিল ক্ষণিকের অথচ তীব্র একটা আকর্ষণ, ইভানকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে মিতিয়ার কাছ থেকে আলিয়োশা যখন কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে এলো তখন কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বাড়িতে শেষ যে কাণ্ডটি ঘটেছিল, যার বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি, তার ঠিক আগে পর্যন্ত, মিতিয়ার কাছে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার

অমন যে 'ফিরে ফিরে আসা', যা ইভানের কাছে অত বিতৃষ্ণাজনক ছিল, তা সত্ত্বেও মিতিয়া যে অপরাধী এমন সন্দেহ পুরো এক মাসের মধ্যে ইভান তাকে একবারও প্রকাশ করতে শোনেনি। আরও লক্ষণীয় এই যে যত দিন যাচ্ছে মিতিয়ার প্রতি তার ঘৃণা যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে এটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সেও এও বুঝতে পারছিল যে ঘৃণাটা ঠিক মিতিয়ার কাছে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার 'ফিরে ফিরে আসার' জন্য নয়, এর আসল কারণ হল *সে বাবাকে খুন করেছে!* এটা সে উপলব্ধি করতে পারছিল এবং এ বিষয়ে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল।

সে যা-ই হোক, আদালতের বিচারের দিন দশেক আগে সে মিতিয়ার কাছে গিয়েছিল, তাকে পালানোর একটা পরিকল্পনাও বাতলেছিল। পরিকল্পনাটা স্পষ্টতই সে অনেক আগে ভেবে রেখেছিল। এরকম একটা পদক্ষেপ গ্রহণে ইভানের উদ্বুদ্ধ হওয়ার মূল কারণ ছাড়াও এর জন্য আংশিক ভাবে দায়ী ছিল স্মের্দিকোভের ছোটো একটা কথা যা তার মনে বেশ খানিকটা আঁচড় ফেলেছিল, যার ঘা তখনও তার শুকোয়নি। স্মের্দিকোভ্ বলেছিল ভাই দ্‌মিত্রি যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তা থেকে সে, অর্থাৎ ইভানই লাভবান হবে, যেহেতু সেক্ষেত্রে তার ও আলিয়োশার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ চল্লিশ থেকে বেড়ে ষাট হাজার করে দাঁড়াবে। সে তাই ঠিক করল মিতিয়ার পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে তার পিছনে একা নিজের তরফ থেকে ত্রিশ হাজার জলাঞ্জলি দেবে। সেই সময় মিতিয়ার কাছ থেকে ফিরে সে দারুণ বিষণ্ণ ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করতে শুরু করল, মিতিয়ার পলায়ন যে তার কাম্য সেটা শুধু এই কারণে নয় যে এর পিছনে ত্রিশ হাজার জলাঞ্জলি দিয়ে সে তার ঘা শুকোতে চায়। আরও কী যেন একটা কারণ আছে। 'এই কারণে নয় কি যে মনে মনে আমি ওরকমই একজন খুনি?' সে নিজেকে প্রশ্ন করল। মনের কোন্ গহন থেকে জ্বলন্ত কী যেন একটা তার বুকের ভেতরে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বড়ো কথা এই যে এই পুরো এক মাস ধরে তার অহঙ্কারে ঘা লাগার দরুন সে দারুণ কষ্ট পাচ্ছিল। তবে সে প্রসঙ্গ পরে।

আলিয়োশার সঙ্গে কথাবার্তার পর ফিরে এসে ইভান ফিয়োদরভিচ্ যখন তার বাসস্থানের দরজার ঘণ্টায় হাত দিয়েছে এমন সময় হঠাৎই যে সে স্থির করে বসল যে স্মের্দিকোভের কাছে যাবে সেটা আকস্মিক ভাবে তার বুকের ভেতরে ফুঁসতে থাকা বিশেষ এক ধরনের একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের বশবর্তী হয়েই সে করেছিল। তার আচমকা মনে পড়ে গেল এই মাত্র আলিয়োশার সামনেই কাতেরিনা ইভানভ্‌না চিৎকার করে তাকে বলেছিল 'তুমি, একমাত্র তুমিই আমাকে বুঝিয়েছ যে ও-ই (অর্থাৎ দ্‌মিত্রি) খুনি!' একথা মনে হতে ইভান একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল: কোথায়, জীবনে কখনও তো তাকে এমন কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেনি যে মিতিয়া খুনি! বরং তখন স্মের্দিকোভের কাছ থেকে ফিরে আসার পর কাতেরিনা

ইভানভ্নার সামনে সে এই বিষয়ে তার নিজের মনের সন্দেহই তো প্রকাশ করেছিল। বরং উল্‌টোটাই ঘটেছে — 'ও' ও-ই ত তখন তার সামনে 'প্রমাণপত্রটা' হাজির করে ভাইয়ের অপরাধ প্রমাণ করতে গেল! আবার ও-ই কিনা এখন দুম্ করে চেঁচিয়ে বলল 'আমি স্মের্দিকোভের কাছে গিয়েছিলাম!' কখন গিয়েছিল? ইভান এ বিষয়ে কিছুই জানত না। তার মানে মিতিয়ার অপরাধ সম্পর্কে ও মোটেই ততটা নিশ্চিত নয়! স্মের্দিকোভ্ই বা ওকে কী বলতে পারত? ঠিক কী, কী কথা স্মের্দিকোভ্ ওকে বলেছিল? ইভানের মনের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা ভয়ঙ্কর ক্রোধের আগুন। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কী করে আধ ঘণ্টা আগে এরকম কথা বলে কাতেরিনা ইভানভ্না তার কাছ থেকে পার পেয়ে গেল এবং সেই মুহূর্তে সে চেঁচিয়ে তার ওপর কিছু বলতে পারল না। দরজার ঘণ্টাটা ছেড়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি স্মের্দিকোভের উদ্দেশে ছুটল। 'হয়তো এবারে আমি ওটাকে খুনই করে ফেলব', পথে যেতে যেতে সে ভাবল।

## আট

## স্মের্দিকোভের সঙ্গে তৃতীয় ও শেষ সাক্ষাৎকার

সেদিন খুব ভোরে যেমন হয়েছিল, অর্ধেক পথ যেতে না যেতে আবারও সে রকম একটা শুষ্ক খরবায়ু বইতে শুরু করল, ঘন হয়ে ঝরছে মিহি শুকনো বরফ। তুষারকণা মাটিতে পড়ে মাটির পায়ে না লেগে ঘূর্ণিবায়ুতে ঘুরপাক খেতে লাগল, দেখতে দেখতে রীতিমতো তুষার ঝড় উঠল। শহরের যে অংশে স্মের্দিকোভ্ বাস করত সেখানে রাস্তায় আলোর প্রায় কোনো বালাই ছিল না। তুষারঝড়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে অন্ধকারের মধ্যেই সহজাত প্রবৃত্তিতে পথ খুঁজে খুঁজে ইভান ফিয়োদরভিচ পা ফেলতে লাগল। তার মাথা ব্যথা করছিল। মাথার দুপাশের রগ অসহ্য রকমের দপ্‌দপ্ করছে। হাতের কব্‌জিতে সে তা টের পাচ্ছিল। শরীর খিঁচোচ্ছে। মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্নার কুটিরে পৌঁছুতে আরও খানিকটা পথ বাকি, এমন সময় ছোটখাটো চেহারার এক মাতাল চাষির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। লোকটা একাই ছিল। তার গায়ে একটা তালিমারা ঘরে তৈরি চাষাড়ে কোর্তা। এলোপাতাড়ি পা ফেলে ফেলে হাঁটতে হাঁটতে সে আপন মনে বিড়বিড় করছিল আর খিস্তি খেউড় করে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎই খিস্তি খেউড় ছেড়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা মাতাল কণ্ঠে গান শুরু করে দিল

আহা, ভানিয়া গেছে পেতের্বুর্গে,
থাকব নাকো তার আশাতে!

কিন্তু বারবারই এই দ্বিতীয় ছত্রে এসে থেমে যাচ্ছিল, ফের কার উদ্দেশে কে জানে গালিগালাজ শুরু করে দিচ্ছিল, তারপর ফের ওই একই গান। লোকটা সম্পর্কে

আদৌ কোন কিছু ভাবার আগেই ইভান ফিয়োদরভিচ অনেকক্ষণ হল তার প্রতি প্রচণ্ড রকমের একটা ঘৃণা মনে মনে উপলব্ধি করছিল, হঠাৎই সে সেটা হৃদয়ঙ্গম করল। তৎক্ষণাৎ দুম করে একটা ঘুষি মেরে লোকটাকে ফেলে দেবার একটা অদম্য বাসনা তাকে পেয়ে বসল। ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা দুজনে পাশাপাশি চলে এসেছে, আর লোকটাও ভীষণভাবে টাল খেয়ে হঠাৎ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ইভানের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ইভান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। লোকটা সেখান থেকে উড়ে গিয়ে একখণ্ড গুঁড়িকাঠের মতো ধপ করে জমাট বরফে ঢাকা কঠিন মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। কেবল একবারই করুণস্বরে 'ওঃ' বলে আর্তনাদ করেই চুপ করে গেল। ইভান তার কাছে এগিয়ে গেল। সে চিৎপাত হয়ে পড়ে ছিল। একেবারে নিথর, কোনো সাড় নেই। 'ঠান্ডায় জমে যাবে!' ইভান মনে মনে ভাবল। এর পর সে আবার সামনে, স্মের্দিকোভের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

দরজা খোলার জন্য মোমবাতি হাতে করে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না ছুটে এসেছিল। গলি বারান্দাতে ঢুকতেই সে ফিসফিস করে ইভান ফিয়োদরভিচকে বলল যে পাভেল ফিয়োদরভিচ্, অর্থাৎ স্মের্দিকোভ্ খুবই অসুস্থ। 'শুয়ে আছেন বললে ভুল বলা হবে, আজ্ঞে। এমনকি চা দিলে তাও নিয়ে যেতে বললেন, খেতে চাইলেন না।'

"কী ব্যাপার? হৈ হল্লা করছে নাকি?" ইভান ফিয়োদরভিচ রুক্ষস্বরে জিগ্গেস করল।

"না না, বরং একেবারেই শান্ত, আজ্ঞে। কেবল আপনি কিন্তু দয়া করে ওঁর সঙ্গে খুব বেশিক্ষণ কথা বলবেন না " মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না অনুরোধ করল।

ইভান ফিয়োদরভিচ ভেজানো দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল।

আগের বারের মতোই ঘরটা চুল্লির আঁচের গরমে তেতে আছে। কিন্তু ঘরের ভেতরে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করার মতো। দুপাশে যে দুটো বেঞ্চি ছিল তার মধ্যে একটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে মেহগনি কাঠের চামড়ার গদি দেওয়া বড়সড় পুরনো একটা সোফা রাখা হয়েছে। তার ওপর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা বালিশ সমেত একটা শয্যা পাতা হয়েছে। শয্যায় বসে আছে স্মের্দিকোভ্—পরনে তার সেই একই ড্রেসিং গাউন। টেবিলটাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে সোফার সামনে, ফলে ঘরটা বড়ো ঠেসাঠেসি হয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে হলুদ রঙের মলাট দেওয়া, ইয়া মোটা কী একটা বই, কিন্তু স্মের্দিকোভ্ সেটা পড়ছে না। মনে হচ্ছিল সে স্রেফ বসে আছে, কিছুই করছে না। দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে নীরবে সে তাকিয়ে তাকিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচকে দেখল। দেখে মনে হল তার আগমনে সে এতটুকু বিস্মিত হয়নি। তার মুখের চেহারা খুব পালটে গেছে, সে বড্ড রোগা আর হলদেটে হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে।

"এ কী! তুমি সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়লে নাকি?" ইভান ফিয়োদরভিচ্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমি তোমাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না। ওভারকোটটা পর্যন্ত গা থেকে খুলছি না। তোমার এখানে বসার জায়গাটা কোথায়?"

বলতে বলতে সে টেবিলের আরেক প্রান্তে চলে গিয়ে সেখান থেকে একটা চেয়ার টেবিলের কাছে টেনে এনে সেটাতে বসল।

"অমন চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কী? আমি তোমার কাছে মাত্র একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। দিব্যি করে বলছি, যতক্ষণ উত্তর না পাচ্ছি ততক্ষণ এখান থেকে নড়ছি না। বড়ো ঘরের সেই মেয়েটি, কাতেরিনা ইভানভ্না তোমার কাছে এসেছিল কি?"

স্মের্দিকোভ্ দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল। আগের মতোই শান্ত ভাবে ইভানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হাত ঝটকা দিয়ে তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"কী হল তোমার?" ইভান চেঁচিয়ে উঠল।

"কিচ্ছু না।"

"কিছু না মানে?"

"তা এসেছিলেন। কিন্তু তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আমায় রেহাই দিন কর্তা।"

"না রেহাই আমি তোমাকে দিচ্ছি না। বল, কবে এসেছিল?"

"সে ওঁর কথা মনে করে রাখতে আমার বয়েই গেছে।" তাচ্ছিল্যভরে বাঁকা হাসি হাসল স্মের্দিকোভ্। তারপর হঠাৎই আবার ইভানের দিকে মুখ ফিরিয়ে কেমন যেন ঘৃণামিশ্রিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করল। এ সেই দৃষ্টি যা দিয়ে এক মাস আগের সেই সাক্ষাৎকারের সময় সে ইভানকে বিদ্ধ করেছিল।

"আপনাকে দেখেই তো অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। আহা, চোখমুখ একেবারে বসে গেছে! আপনার মুখ দেখে যে চেনারই জো নেই!" ইভানকে সে বলল।

"আমার স্বাস্থ্যের কথা ছেড়ে দাও। তোমাকে যা জিগ্গেস করা হচ্ছে তার উত্তর দাও।"

"কিন্তু আপনার চোখ অমন হলদেটে হয়ে গেল কী করে? চোখের সাদা অংশটা একেবারে হলুদ। খুব কষ্টে আছেন নাকি?"

তাচ্ছিল্যভরে বাঁকা হেসে পরক্ষণেই আচমকা উন্মত্তের মত হেসে উঠল।

"শোন হে, আমি তো তোমাকে বলেইছি যে উত্তর না নিয়ে আমি তোমার এখান থেকে নড়ছি না!" ভীষণ বিরক্ত হয়ে ইভান চিৎকার করে বলল।

"আমার পেছনে অমন লেগে আছেন কেন বলুন তো? আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন এজ্ঞে?" ব্যথিত কণ্ঠে স্মের্দিকোভ্ বলল।

"মর গে যা! তোমার কী হল না হল তাতে আমার ভারি বয়ে গেল। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব।"

“আপনাকে বলার মতো আমার কিছু নেই!” আবারও চোখ নামিয়ে নিল স্মের্দিকোভ্।

“তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি, তোমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করে আমি ছাড়ব!”

“আপনি অমন উতলা হচ্ছেন কেন বলুন তো?” হঠাৎ স্মের্দিকোভ্ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, কিন্তু ঠিক অবজ্ঞাভরে নয়—এবারে প্রায় এক ধরনের বিতৃষ্ণার সঙ্গেঁ। “বিচার কালকে শুরু হচ্ছে—এই জন্যে তো? আরে আপনার কিছু হবে না, শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন! যান, বাড়ি যান, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।”

“আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আগামীকাল আমার ভয় পাবার কী আছে?” অবাক হয়ে ইভান বলল। কিন্তু পরমুহূর্তে হঠাৎ সত্যি সত্যি আতঙ্কের কেমন যেন একটা হিমশীতল ঘ্রাণ সে ভেতরে ভেতরে টের পেল। স্মের্দিকোভ্ তাকে চোখ দিয়ে মেপে দেখল।

“বু-ঝ-তে পার-ছেন না?” তিরস্কারের সুরে সে টেনে টেনে বলল। “নিজেকে হাসির খোরাক করা—একজন বুদ্ধিমান মানুষের এ আবার কেমনধারা শখ!”

ইভান হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এক কালে যে লোকটা ছিল তার হুকুমের চাকর এখন সে যে রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে, রীতিমতো অভূতপূর্ব এক ধরনের দাম্ভিকতার সুরে তার সঙ্গে কথা বলছে—স্রেফ এই ঘটনাটাই ছিল অস্বাভাবিক। সত্যি বলতে গেলে কি, গতবারও কিন্তু তার কণ্ঠে এরকম সুর ছিল না।

“বললাম না আপনাকে, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আপনার বিরুদ্ধে কোনও এজাহার দেব না, কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। ইশ্, দেখ দেখি, হাত কাঁপছে! আপনার আঙুলগুলো অমন নড়বড় করছে কেন? যান বাড়ি যান। *আপনি খুন করেননি।*”

ইভান আঁতকে উঠল। তার মনে পড়ে গেল আলিয়োশার কথা।

“আমি জানি যে আমি নই আমতা আমতা করে সে বলতে গেল।

“জা-নে-ন?” আবারও তার মুখের কথা পড়তে না পড়তে চট করে বলে উঠল স্মের্দিকোভ্।

ইভান লাফিয়ে উঠে খপ্ করে তার কাঁধ চেপে ধরল।

“বল্ রে হারামজাদা, সব বল! বল্ সব কথা!”

স্মের্দিকোভ্ এতটুকু ভয় পেল না। শুধু একটা উন্মত্ত ঘৃণার ভাব নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল।

“তা অমনই যদি হয় তাহলে তো আপনিই খুন করেছিলেন”, ক্ষিপ্ত হয়ে ফিসফিসিয়ে সে তাকে বলল।

ইভান কী যেন বিবেচনা করে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তার মুখে বিদ্বেষের কুটিল হাসি ফুটে উঠল।

"সেই তখনকার কথাটা বলছ আবার? গত বার যা বলেছিলে এখনও তাই।"

"বটেই তো। গতবারও আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনও সব বুঝেছিলেন, এখনও বুঝতে পারছেন।"

"শুধু এটাই বুঝতে পারছি তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ।"

"আপনি কেমন মানুষ বলুন তো? বিরক্তিও ধরে না! আমরা দুজনে এখানে নিরিবিলিতে বসে আছি, বলি আমাদের মধ্যে ফাঁকিজুকির কী আছে? অমন নাটক করারই বা কী আছে? নাকি এখনও সবই আমারই মুখের ওপর আমারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান? আপনি খুন করেছেন, আসল খুনি যদি কেউ হয় সে আপনি, আমি আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য, আমি শুধু আপনার নিমিত্তের ভাগী ছিলাম। আপনার কথাতেই আমি এই কাজটা করেছিলাম।"

"করেছিলে? তাহলে কি তুমি খুন করেছিলে?" ইভান আতঙ্কে হিম হয়ে গেল।

তার মস্তিষ্কের মধ্যে কী যেন একটা কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল, একটা ঠান্ডা স্রোত শিরশির করে তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে সে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এই সময় স্মের্দিকোভ্ নিজেও অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। ইভানের এই ভীতি যে কতটা আন্তরিক সম্ভবত তা দেখে শেষ পর্যন্ত সে বিস্মিত হয়েছিল।

"আহা, আপনি যেন সত্যি সত্যিই কিছু জানতেন না!" বাঁকা হাসি হেসে সন্দেহের দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমতা-আমতা করে সে বলল।

ইভান বাকশক্তিরহিত। কেবলই চেয়ে চেয়ে তাকে দেখতে লাগল।

আহা, ভানিয়া গেছে পেতের্বুর্গে,
থাকব না কো তার আশাতে!

হঠাৎ ঝনঝন করে তার মাথার ভেতরে বেজে উঠল।

"জান, এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি একটা স্বপ্ন, একটা ছায়ামূর্তি", সে বিড়বিড় করে বলল।

"এখানে কোনো ছায়ামূর্তি-টুর্তি নেই এজ্ঞে। আমরা এই দুজন আর তৃতীয় আরেকজন ছাড়া আর কেউ নেই। সন্দেহ নেই তিনি, ওই তৃতীয়জন এখন এখানেই আমাদের দুজনার মাঝখানে আছেন।"

"কে সে? কে আছে? কে সেই তৃতীয় জন?"

চারদিকে দৃষ্টিপাত করে, ঘরের আনাচে কানাচে চোখ ফেলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেই কেউ একজনের সন্ধান করতে করতে ভীতকণ্ঠে বলে উঠল ইভান ফিয়োদরভিচ।

"তৃতীয় যাঁর কথা বলছি তিনি ঈশ্বর, তিনি বিধাতা, এজ্ঞে। তিনি এখন আমাদের পাশেই আছেন। তবে তাঁকে খুঁজতে যাবেন না, এজ্ঞে। পাবেন না।"

"তুমি যে বললে তুমি খুন করেছ, একথা মিথ্যে!" ইভান পাগলের মতো

চিৎকার করে উঠল। "হয় তুমি পাগল, নয়তো সেই আগের বারের মতোই আমাকে খ্যাপাচ্ছ!"

স্মের্দিকোভ্ এই কিছুক্ষণ আগের মতোই এবারেও এতটুকু ভয় না পেয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করে যেতে লাগল। এখনও সে কোনো মতে তার অবিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, এখনও তার মনে হতে লাগল ইভান 'সব জানে' তারই 'মুখের ওপর একমাত্র তারই ঘাড়ে সব চাপিয়ে দেবার' উদ্দেশ্যে শুধু এরকম নাটক করছে।

"একটু সবুর করুন, এজ্ঞে", শেষকালে সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। তারপর হঠাৎ টেবিলের নিচ থেকে বাঁ পা'টা বের করে পাতলুনটা ওপরে গুটাতে শুরু করল। সে একটা লম্বা সাদা মোজা আর চটি পরে ছিল। কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে স্মের্দিকোভ্ মোজার গার্টারটা খুলে মোজার অনেকখানি ভেতরে আঙুল গলিয়ে দিল। তার দিকে দৃষ্টিপাত করে আতঙ্কে ইভান ফিয়োদরভিচের শরীরে খিঁচুনি ধরল, হঠাৎ সে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

"পাগল!" সে আর্ত চিৎকার করে উঠল। তড়াক করে জায়গা ছেড়ে উঠে এক লাফে পিছিয়ে গেল। পিছু হটতে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠুকে গেল। সেখানেই একটা টানা সুতোর মতো টানটান হয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যে মনে হল যেন দেয়ালের গায়ে লেপটে গেছে। একটা উন্মত্ত আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে সে স্মের্দিকোভের দিকে তাকাল। স্মের্দিকোভ্ তার আতঙ্কে এতটুকু বিচলিত না হয়ে তখনও মোজার ভেতরটা হাতড়ে দেখছে। দেখে মনে হল সে মোজার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে কিছু একটা ধরে সেখান থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করছে। অবশেষে সেটার নাগাল পেয়ে টেনে বের করতে শুরু করল। ইভান ফিয়োদরভিচ দেখল সেটা কী সব কতকগুলো কাগজ অথবা সম্ভবত কাগজের একটা মোড়ক। স্মের্দিকোভ্ সেটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

"এই যে!" মৃদুস্বরে সে বলল।

"এটা কী?" তার কথায় সাড়া দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইভান বলল।

"দয়া করে একবার দেখুনই না, এজ্ঞে", সেই রকমই মৃদুস্বরে স্মের্দিকোভ্ বলল।

ইভান টেবিলের দিকে পা বাড়াল। কাগজের মোড়কটা নিয়ে খুলতে শুরু করল। কিন্তু হঠাৎই ঝট করে হাতের আঙুল এমন ভাবে সরিয়ে নিল যে মনে হল যেন গা ঘিনঘিন করার মতো, ভয়ঙ্কর কোনো সরীসৃপের গায়ে তার হাত লেগে গেছে।

"আপনার হাতের আঙুলগুলোতে খিঁচ ধরেছে, হাত কাঁপছে আপনার", স্মের্দিকোভ্ মন্তব্য করল। এর পর নিজেই সে ধীরেসুস্থে মোড়ক খুলতে লাগল। মোড়কের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো রামধনুরঙা একশ রুবল ব্যাঙ্ক নোটের তিনটে বান্ডিল।

"এখানে সবটাই আছে, এজ্ঞে, তিন হাজারের সবটাই আছে। না গুনলেও পারেন।

নিন, ধরুন," মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে টাকাগুলো দেখিয়ে সে ইভানকে আমন্ত্রণ জানাল।

ইভান ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তাকে কাগজের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

"তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তোমার ওই মোজার ব্যাপারটা দিয়ে", কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হেসে সে বলল।

"আপনি বলতে চান, সত্যি সত্যি এর আগে পর্যন্ত আপনি জানতেন না?" স্মের্দিকোভ্ আরও একবার জিগ্‌গেস করল।

"না, জানতাম না। আমি তো বরাবরই ভাবছিলাম দ্‌মিত্রি। ভাই! ভাই! ওঃ!" বলতে বলতে সে হঠাৎ দু হাতে মাথা চেপে ধরল। "শোন, খুনটা কি তুমি একাই করেছিলে? ভাইকে ছাড়াই, নাকি ভাইয়ের সঙ্গে মিলে?"

"শুধুমাত্র আপনারই সঙ্গে, আপনার সঙ্গে মিলেই খুন করেছি, এজ্ঞে। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, এজ্ঞে।'

"বেশ বেশ। আমার কথা পরে হবে। আরে এ আবার কী হল? আমি এমন কাঁপছি কেন? কথা উচ্চারণ করতে পারছি না।"

"তখন তো খুব সাহস দেখিয়েছিলেন, এজ্ঞে। বলেছিলেন 'সবেরই অনুমতি আছে', এখন কিনা এমন ভয় পেয়ে গেলেন!" বিস্মিত হয়ে বিড়বিড় করে বলল স্মের্দিকোভ্। "লেমোনেড চান কি? বলেন তো এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি, এজ্ঞে। তাতে বেশ চাঙ্গা বোধ করতে পারেন। তবে তার আগে এটা ঢেকে রাখা দরকার।"

এই বলে সে আবার মাথা নেড়ে নোটের বাণ্ডিলের দিকে ইঙ্গিত করল। সে নড়ে চড়ে উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌নাকে চেঁচিয়ে ডাকতে গেল, যাতে সে খানিকটা লেমোনেড তৈরি করে তাদের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না যাতে দেখতে না পায় সেই জন্য টাকাগুলো কী দিয়ে ঢাকা যায় তার খোঁজ করতে লাগল। প্রথমে সে তার রুমালটাই বের করেছিল, কিন্তু দেখা গেল ঘন ঘন নাক ঝাড়ার ফলে সেটা যাচ্ছেতাই রকম নোংরা হয়ে আছে। তাই টেবিলের ওপর হলুদ রঙের একমাত্র যে মোটা বইটা ছিল, যেটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইভান লক্ষ করেছিল, সেটাই, তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টাকাগুলো চাপা দিল। বইটার নাম ছিল 'অস্মদীয় প্রভু, পুণ্যাত্মা আসিরীয় ইসাকের বাণী'। ইভান ফিয়োদরভিচ ইতিমধ্যে যন্ত্রচালিতের মতো নামটা পড়ে ফেলেছিল।

"লেমোনেডের প্রয়োজন নেই। আমার সম্পর্কে পরে কথা হবে। বোসো দেখি, বল কী ভাবে তুমি এটা করলে? সব কথা খুলে বল। "

"ওভারকোটটা অন্তত গা থেকে খুললে পারতেন এজ্ঞে, নইলে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে যাবেন যে।"

ইভান ফিয়োদরভিচ যেন একমাত্র এই এখনই সেটা অনুমান করতে পারল। ওভারকোটটা এক টানে খুলে ফেলে চেয়ার ছেড়ে না উঠেই সেটাকে বেঞ্চির ওপর ছুড়ে ফেলে দিল।

"বল, বল, দয়া করে বল!"

সে যেন এখন শান্ত হয়ে এসেছে। সে অপেক্ষা করতে লাগল, তার দৃঢ় বিশ্বাস স্মের্দিকোভ্ এবারে সব কথা বলবে।

"কী ভাবে এটা করা হয়েছিল সেই কথা?" স্মের্দিকোভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "খুবই সাধারণ উপায়ে করা হয়েছিল, এজ্ঞে, আপনার সেই কথাগুলো অনুসরণ করেই করা হয়েছিল।..."

"আমার কথা সম্পর্কে যা বলার পরে হবে।" ইভান ফিয়োদরভিচ্ তার কথার মাঝখানে বাধা দিল। তবে এবারে আর আগের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করল না। কথাগুলি সে দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করল; দেখে মনে হল যেন নিজেকে পুরো মাত্রায় সংযত করতে পেরেছে। "কী ভাবে তুমি এটা করেছিলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাটা শুধু আমাকে দাও। একে একে সব বল। কোনও কিছু ভুলে যেয়ো না। পুঙ্খানুপুঙ্খ, বড় কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ হতে হবে। আমার অনুরোধ, বল।"

"আপনি তো চলে গেলেন, আমি তখন ভিরমি খেয়ে তলকুঠুরির ভেতরে গিয়ে পড়লাম, এজ্ঞে

"মূর্ছারোগে না কি ভান করে?"

"বোঝাই যাচ্ছে, এজ্ঞে, ভান করে। দস্তুরমতো ভান করেছিলাম। সিঁড়ি থেকে ধীরে সুস্থেই নীচে নেমেছিলাম একেবারে সেই নিচের ধাপ পর্যন্ত এজ্ঞে, তারপর ধীরেসুস্থে শুয়ে পড়লাম, আর শোয়ামাত্রই চিৎকার। শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলাম, যতক্ষণ না লোকজন এসে ধরাধরি করে আমাকে বয়ে নিয়ে গেল।"

"দাঁড়াও, দাড়াও! তাহলে সারাটা সময় এবং পরে হাসপাতালেও আগাগোড়া ভান করে গেছ?"

"মোটেই তা নয়, এজ্ঞে। পরের দিন সকালে, ওরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে সত্যিকারের আক্রমণটা হল, আর সেটা এমন জোর হল যে বহু বছরের মধ্যে সে রকম কখনও হয়নি। দু দিন একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম!"

"বেশ, বেশ। তারপর, বলে -যাও।"

"ওরা আমাকে এই খাটটাতে শুইয়ে দিল, এজ্ঞে। আমি ঠিকই জানতাম আমাকে পার্টিশানটার ওপাশে রাখবে, 'কারণ যতবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ততবারই মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্না রাতের বেলায় তার বাড়িতে ঠিক ওই পার্টিশানটার ওপাশে আমাকে শুইয়ে রাখতেন, এজ্ঞে। উনি বরাবরই আমাকে স্নেহ করতেন—আমার একেবারে জন্ম থেকে। রাতের বেলায় কাতরাতাম, তবে আস্তে আস্তে। অপেক্ষা করছিলাম কখন দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ আসেন।"

"অপেক্ষা করছিলে মানে? তোমার কাছে?"

"আমার কাছে আসতে যাবেন কেন? বাড়িতে আসবেন বলে অপেক্ষা করছিলাম।

উনি যে সেই রাতেই আসবেন তাতে আমার মনে এতটুকু সন্দ ছিল না, কেননা আমাকে হারিয়ে এবং আমার কাছ থেকে কোনও সমাচার না পাবার ফলে উনি আসতেনই—পাঁচিল টপকেই ভেতরে ঢুকতেন। বরাবর সেটাই তিনি করতেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতাও ছিল, আর ঢুকলে তিনি একটা কিছু ঘটিয়েও ছাড়তেন।"

"কিন্তু যদি না আসত?"

"তাহলে কিছুই হত না। উনি না থাকলে আমি এ বিষয়ে মনস্থির করতে পারতাম না।"

"বেশ বেশ আরেকটু বোঝার মতো করে বল। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। বড়ো কথা, কিছু বাদসাদ দিয়ো না!"

"আমি এটাই প্রত্যাশা করেছিলাম যে উনি ফিয়োদর পাভ্লভিচকে খুন করবেন, এজ্ঞে, নির্ঘাত করবেন। কারণ আমি ইতিমধ্যে এর জন্য ওঁকে তৈরি করে ফেলেছিলাম গত কয়েক দিন ধরে, এজ্ঞে। আর বড়ো কথা এই যে ওই সঙ্কেতগুলো ওঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। ওই কয়েক দিনে ওঁর মনের মধ্যে যে পরিমাণ সন্দেহ আর যে রকম প্রচণ্ড রাগ জমা হয়েছিল তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ওই সঙ্কেতগুলোর সাহায্য নিয়ে উনি ঠিক ভেতরে ঢুকবেন। এটা না হয়ে যায় না। আমি তাই ওঁর অপেক্ষা করছিলাম।"

"দাঁড়াও", ইভান তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, "ও যদি খুন করে তাহলে তো টাকাগুলো নিয়ে ওর সরিয়ে ফেলার কথা। এটাও তো তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল, তাই না? সেক্ষেত্রে এর পর তোমার কী জুটত? আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"কিন্তু টাকার সন্ধান উনি কখনওই পেতে পারতেন না, এজ্ঞে। আমি তো শুধু ওঁকে এটাই শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে টাকা তোশকের তলায় আছে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়, এজ্ঞে। ব্যাপারটা এই যে প্রথমে ছিল একটা হাতবাক্সের ভেতরে। ফিয়োদর পাভ্লভিচ যেহেতু সব মানুষের মধ্যে একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করতেন, আমি তাই ওঁকে শিখিয়ে দিলাম টাকার এই যে খামটা, এটা যেন জায়গা বদল করে তিনি ঘরের কোনায় বিগ্রহের পিছনে লুকিয়ে রেখে দেন, কারণ কেউ অনুমান করতে পারবে না যে ওটা ওখানে থাকতে পারে—বিশেষ করে যদি তাড়াহুড়ো করে আসে। তাই ওটা, মানে এই খামটা ওর ঘরের কোনায় বিগ্রহের পিছনে ছিল এজ্ঞে। তোশকের তলায় রাখতে যাওয়াটা তো একেবারে হাস্যকর, অন্ততপক্ষে তালা চাবি দিয়ে আটকে হাতবাক্সের ভেতরে রাখা তো বটেই। কিন্তু এখানে সকলে বিশ্বাস করল তোশকের তলায় আছে। বোকার মতো যুক্তি, এজ্ঞে। তাই দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ যদি এই খুনটা করেনও তাহলে খুঁজে পেতে কিছুই না পেয়ে হয় যে কোনো খস্‌খস্ শব্দে ভয় পেয়ে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যাবেন—যেমন খুনিদের ক্ষেত্রে সর্বদাই

হয়ে থাকে—নয়ত গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি তখন যে কোনো সময়—পরের দিন, কিংবা এমনকি সেই দিন রাতেই বিগ্রহের পিছনে হাত চালিয়ে ওই টাকাগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। সব দোষ দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের ঘাড়েই চাপত। এ আমি সব সময়ই আশা করতে পারতাম।"

"কিন্তু সে যদি খুন না করত? যদি শুধুই মারধর করত?"

"খুন যদি না করত তাহলে অবশ্যই টাকা নেবার সাহস আমার হত না, ফল কিছু হত না। কিন্তু আমার এরকমও একটা হিসাব ছিল যে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলবেন, আর আমিও সেই ফাঁকে টাকাগুলো সরিয়ে নিতে পারব, তারপর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌কে রিপোর্ট করতে পারব যে এটা দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ ছাড়া আর কারও কাজ নয়, তিনিই ওকে মারধর করার পর টাকাগুলো চুরি করেছেন।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও  আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে যা-ই হোক না কেন, দ্মিত্রিই খুন করেছে, তুমি কেবল টাকাটা নিয়েছ?"

"না, খুনটা উনি করেননি, এজ্ঞে। দেখুন, এখনও আমি আপনাকে বলতে পারতাম যে উনিই হত্যাকারী  কিন্তু না, আমি আপনার কাছে এখন মিথ্যে বলতে চাই নে, কারণ  কারণ আপনি বাস্তবিকই যদি এখন পর্যন্ত কিছু বুঝে না থাকেন—যা আমি নিজে দেখতেও পাচ্ছি—এবং যেটা স্পষ্টই আপনার অপরাধ, সেটা যে আপনি আমার মুখের ওপর আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন তা যদি আপনার ভণ্ডামি না হয় তা হলেও সব দোষ কিন্তু আপনার, এজ্ঞে, কেন না খুনের ব্যাপারটা আপনি জানতেন, আমার ওপর খুন করার ভার দিয়েছিলেন এজ্ঞে, আর নিজে সব কিছু জেনেশুনে চলে গিয়েছিলেন। এই কারণেই তো আজ এই সন্ধেবেলায় আপনার চোখের সামনে প্রমাণ করে দিতে চাই যে এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একমাত্র আপনি, আপনিই হলেন গিয়ে আসল হত্যেকারী, এজ্ঞে। আমি মোটে ঠিক আসল নই, যদিও খুনটা আমিই করেছি। কিন্তু ঠিক আইনসঙ্গত হত্যেকারী আপনিই!"

"কেন? কেন আমি হত্যাকারী? হা ভগবান!" শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না ইভান। ভুলে গেল যে তার নিজের সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা তা এই প্রসঙ্গ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে মুলতবি রেখেছিল। সে বলে উঠল, "আবার সেই চের্‌মাশ্‌নিয়ার কথা? আচ্ছা, হ্যাঁ, আমায় বল তো, চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যেতে যে আমি রাজি এটা যদি তুমি ধরেই নিয়েছিলে তাহলে আমার মুখের স্বীকৃতি আদায়ের কী এমন দরকার পড়েছিল তোমার—এবং এখন কী ব্যাখ্যা তুমি দেবে?"

আপনি মেনে নিলেন আমি নিশ্চিত জানতে পারতাম যে ফিরে এসে ওই হারানো তিন হাজারের শোকে আপনি কোনো শোরগোল তুলবেন না—এমন কি দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের বদলে কোনো কারণে কর্তাব্যক্তিরা যদি আমাকে সন্দেহ করেন বা দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের সহযোগী বলেও সন্দেহ করেন তাহলেও না। বরং আপনি অন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে সমর্থনই করবেন।  আর উত্তরাধিকারসূত্রে

আপনার প্রাপ্য অংশ লাভ করার পর আপনি, আপনার যখন সামর্থ্য হবে, তখন কোনো এক সময় আপনি বাকি জীবনটা সারা জীবনের মতো আমাকে পুরস্কৃত করবেন; কারণ, যাই বলুন না কেন, আমি ছিলাম বলেই না এই উত্তরাধিকার আপনার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হল! নইলে উনি যদি আগ্রাফেনা আন্দ্রেইয়েভ্‌নাকে বিয়ে করে বসতেন তা হলে তো আপনার ভাগ্যে কচুপোড়া ছাড়া আর কিছুই জুটত না।"

"বটে! পরে সারা জীবন ধরে আমাকে যন্ত্রণা দেওয়া—এই ছিল তোমার অভিপ্রায়!" ইভান দাঁতে দাঁত ঘষল্। "আচ্ছা আমি যদি তখন চলে না যেতাম এবং তোমার নামে জানিয়ে দিতাম তাহলে কী হত?"

"কিন্তু তখন আপনি কী জানাতে পারতেন? আমি আপনাকে চের্‌মাশ্‌নিয়াতে যাবার জন্যে উস্‌কানি দিয়েছিলাম—এই ত? তাহলে সেটা তো হত একটা ডাহা মূর্খামি, এজ্ঞে। তা ছাড়া আমাদের কথাবার্তার পর আপনি হয় যেতেন, নয়তো থেকে যেতেন। যদি থেকে যেতেন তা হলে কিছুই ঘটত না। আমি তখন এটাই বুঝে নিতাম যে এ ব্যাপারটা আপনি চান না। সে ক্ষেত্রে আমি কোনও উদ্যোগই নিতাম না। কিন্তু যখন সেই গেলেনই তার মানে আপনি আমাকে আশ্বস্ত করে গেলেন যে আদালতে আমার নামে কিছু জানানোর সাহস আপনার হবে না আর ওই তিন হাজারের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে দেবেন। পরেও কিন্তু আর এই নিয়ে আমার ওপর একেবারেই নির্যাতন করতে পারতেন না, কারণ তাহলে আমি আদালতে সব কথা বলে দিতাম, এজ্ঞে; অর্থাৎ কিনা, এই নয় যে আমি চুরি করেছি অথবা খুন করেছি—একথা আমি বলতাম না, এজ্ঞে—বলতাম আপনি আমাকে বরাবর চুরি করা আর খুন করার উস্‌কানি দিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। এই কারণেই না তখন আপনার সম্মতি আদায় করার প্রয়োজন আমার ছিল যাতে পরে আপনি কোনো ভাবেই আমাকে কোণঠাসা করতে না পারেন, কেন না আপনার হাতে কীই বা প্রমাণ আছে? কিন্তু আপনার পিতার যাতে মৃত্যু হয় এই বাসনা যে আপনার কী ভীষণ পরিমাণে ছিল তা প্রকাশ করে দিতে পারি। আমি আপনাকে বলে রাখছি পাব্লিক কিন্তু সে সবই বিশ্বাস করত, আপনাকে সারা জীবনের জন্য লজ্জা পেতে হত।"

"ছিল বলছ? ছিল? এই বাসনা আমার ছিল?" ইভান আবার দাঁত খিঁচোল।

"ছিল যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, এজ্ঞে। আপনি যে রাজি হয়েছিলেন তাইতেই তখন মৌনভাবে আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, এজ্ঞে।" দৃঢ়প্রত্যয়ের দৃষ্টিতে ইভানের দিকে তাকাল স্মের্দিকোভ্। সে খুবই দুর্বল, কথা বলছিল মৃদুকণ্ঠে, ক্লান্তভাবে। কিন্তু অন্তর্লীন, প্রচ্ছন্ন কী যেন একটা ভেতরে ভেতরে তাকে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল তার কোনো একটা অভিপ্রায় আছে। ইভান সেটা টের পাচ্ছিল।

"বলে যাও", তাকে সে বলল। "সেই রাতে কী হয়েছিল বল।"

"পরে আর কী আছে, এজ্ঞে! আমি তো পড়ে আছি, শুনছি কর্তামশাই যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। এদিকে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ তার আগে হঠাৎই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ শুনলাম তার আর্ত চিৎকার, তারপর সব নিস্তব্ধ, অন্ধকার। আমি শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকি, বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে, আর সহ্য করতে পারছি না। শেষ কালে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিলাম, এজ্ঞে। দেখি বাঁ পাশে বাগানের দিককার জানলা, সেটা খোলা। বাঁ দিকেই আরও পা বাড়ালাম, ভাবলাম কান পেতে শোনার চেষ্টা করে দেখি জীবিত অবস্থায় বসে আছেন না নেই। শুনতে পেলাম কর্তামশাই অস্থির হয়ে ঘরময় ছুটোছুটি করছেন আর 'ওঃ আঃ' করছেন। তার মানে, বেঁচেই আছেন, এজ্ঞে। গেল যা!— আমি ভাবলাম। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে গলা উঁচিয়ে কর্তামশাইকে ডাকলাম। বললাম, 'আমি, আমি এসেছি।' উনি আমাকে বললেন : 'এসেছিল, এসেছিল, পালিয়ে গেছে!' তার মানে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ এসেছিলেন, এজ্ঞে। 'গ্রিগোরিকে খুন করেছে!' 'কোথায়?' আমি ফিসফিসিয়ে জিগ্‌গেস করলাম। 'ওই যে ওই কোনায়।'—বলে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তিনি নিজেও ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। 'সবুর করুন' দেখছি', এই বলে আমি বাগানের কোনায় খুঁজতে চললাম। সেখানেই বেড়ার গায়ে আচমকা চোখে পড়ে গেল গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচকে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, জ্ঞান নেই। তাহলে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ সত্যি সত্যি এসেছিলেন— তৎক্ষণাৎ এই চিন্তাটা আমার মাথায় খেলে গেল। তক্ষুনি, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম যা করার চটপট হাসিল করতে হবে, এজ্ঞে, কেন না গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ যদি এখনও বেঁচেও থাকে তো অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে আপাতত কিছুই দেখতে পাবে না। শুধু একটাই ঝুঁকি ছিল, এজ্ঞে মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না যদি হঠাৎ জেগে ওঠে। সেই মুহূর্তে আমি এটা অনুভব করেছিলাম, কিন্তু কাজটা করে ফেলার একটা ভীষণ ইচ্ছে আমাকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে আমার তখন শ্বাসরোধ হওয়ার মতো অবস্থা। আবার গেলাম কর্তামশাইয়ের জানলার কাছে, বললাম 'উনি এখানে। এসেছেন। আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না এসেছেন, ভেতরে যেতে চাইছেন।' শোনামাত্র একটা ছোট বাচ্চার মতো চমকে উঠলেন। কোথায় সে? কোথায়?' সেই রকমই আঃ- উঃ করতে লাগলেন, কিন্তু নিজে তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'ওই ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। খুলুন।' জানলা দিয়ে উঁকি মেরে আমাকে দেখলেন। মনে মনে ভাবলাম এ তো দেখছি আমাকেই ভয় পাচ্ছেন। মজার কথা কী আর বলব? তখন হঠাৎ আমার মাথায় এলো, আমাদের সেই ইঙ্গিতগুলো ওর জানলার ফ্রেমে টোকা মেরে ইশারায় জানিয়েই দেখা যাক না যে গ্রুশেন্‌কা এসেছে, ওঁর চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত আছে আমার মুখের কথায় ত বিশ্বাস হল না বলেই মনে হচ্ছে। বলব কী, যেই টোকা মেরে ইঙ্গিতগুলো করলাম অমনি দরজা খোলার জন্য ছুটে এলেন। দরজা খুলে দিলেন।

আমি ঢুকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু উনি শরীর দিয়ে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন আমাকে ঢুকতে দেবেন না। 'কোথায় ও? কোথায়?' আমার দিকে তাকালেন। ওঁর শরীর কাঁপছে। আমি দেখলাম, এই রে! আমাকে যখন অত ভয় পাচ্ছেন তখন গতিক খারাপ! আমাকে তো ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেবেনই না, হাঁকডাক শুরু করে দিতে পারেন, চাই কি মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না ছুটে আসতে পারে, নয়তো আরও কিছু কাণ্ড হয়ে যেতে পারে—এই ভেবে আমার নিজেরই তখন আতঙ্কে পা দুটো পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। আমার তখন আর মনে নেই, আমি নিজেও সম্ভবত ফ্যাকাশে মুখে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফিসফিস করে ওঁকে বললাম 'আরে ওই তো, ওই তো জানলার ধারে। দেখতে পাননি নাকি?' 'তাহলে নিয়ে আয়, তুই ওকে নিয়ে আয়!' বললাম, 'উনি ভয় পাচ্ছেন। চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেছেন, ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছেন। যান না, পড়ার ঘর থেকে আপনি নিজেই একবার হাঁক দিন না।' ছুটে গেলেন জানলার কাছে মোমবাতিটা জানলার ধারে রাখলেন। চিৎকার করে ডাকলেন 'গ্রুশেন্‌কা, তুমি কি এখানে গ্রুশেন্‌কা?' চিৎকার তো করছেন, কিন্তু জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখার ইচ্ছে নেই, আমার কাছ থেকে এতটুকু সরার ইচ্ছে নেই—কারণ সেই আতঙ্ক; আমাকে তাঁর দারুণ ভয়, তাই আমার কাছ থেকে এতটুকু সরে আসার সাহস তাঁর নেই। 'আরে, এই তো এখানে', এই বলে আমি জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজেই জানলা দিয়ে গলাটা পুরোপুরি বার করে দিলাম। 'এই যে ঝোপের মধ্যে আছেন, আপনাকে দেখে হাসছেন। দেখতে পাচ্ছেন?' হঠাৎ আমার কথায় বিশ্বাস করে ফেললেন। তার সর্বাঙ্গ তখনও তেমনি কাঁপছে। ওঁর কী প্রেমেই যে উনি পড়ে গিয়েছিলেন, এজ্ঞে! তা উনিও জানলা দিয়ে পুরো গলাটা বার করে দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়লেন। ওঁর টেবিলের সেই পেপার ওয়েটটার কথা মনে আছে কর্তা?—সেই যে ঢালাই লোহার, যেটার ওজন—তা সের দেড়েক হবে—আমিও অমনি খপ্ করে সেটা তুলে নিয়ে তার কোনা দিয়ে দড়াম করে বসিয়ে দিলাম ওঁর মাথার একেবারে চাঁদিতে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না কেবল হঠাৎ ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল। আমি তখন আরেকবার, আরও একবার বসিয়ে দিলাম। তৃতীয়বারের সময় অবশ্য টের পেলাম খুলিটা ভেঙেছে। উনি হঠাৎ মুখটা উঁচিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে গেলেন। সারা শরীর তখন রক্তাক্ত। আমি ভালোমতো চোখ বুলিয়ে দেখলাম না, আমার গায়ে রক্ত লাগেনি, ছেটেনি। পেপার ওয়েটটা ভালো করে মুছে রেখে দিলাম। এবারে বিগ্রহের কাছটাতে গেলাম। খাম থেকে টাকাগুলো বের করে নিয়ে খামটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিলাম, সেই সঙ্গে তার পাশে সেই গোলাপি ফিতেটাও। বেরিয়ে বাগানে চলে এলাম, সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে। সোজা চলে গেলাম সেই আপেল গাছটার কাছে যেটার গায়ে একটা কোটর আছে—সেই কোটরটা তো আপনি জানেনই। আমি কিন্তু অনেক আগেই ওটাকে ভালোমতো দেখে রেখেছিলাম। অনেক আগে থেকে এক টুকরো

কাগজ আর এক খণ্ড ন্যাতা মজুত করে ওটার ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। সবগুলো নোট কাগজে মুড়ে তারপর ন্যাতা দিয়ে পেঁচিয়ে কোটরের অনেকখানি ভেতরে গুঁজে রেখে দিলাম। এই যে টাকাগুলো, এইগুলোই এক সপ্তাহেরও ওপরে ওই ভাবেই সেখানে পড়ে ছিল, এজ্ঞে। পরে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তারপর বের করেছিলাম। তা আমি তো আমার ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবছি আর আতঙ্কে সারা হয়ে যাচ্ছি 'গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ যদি একেবারেই খুন হয়ে গিয়ে থাকে তাতে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হতে পারে। কিন্তু খুন যদি না হয়ে গিয়ে থাকে, যদি ওর জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে খুবই ভালো হবে, কেন না সেক্ষেত্রে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ যে এসেছিলেন এই ঘটনার সে সাক্ষী হবে, তাহলে দাঁড়াবে এই যে খুন উনিই করেছেন এবং উনিই টাকা নিয়ে পালিয়েছেন।' আমি তখন সংশয় আর অধীরতা থেকে কাতরাতে লাগলাম যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌নার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া যায়। শেষ কালে উঠে দাঁড়াল, আমার কাছে ছুটেও আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় দেখতে পেল গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ্ বিছানায় নেই। তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল। বাগানে তার আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। তা এই রকম সারা রাত চলল। এবারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলাম।"

বক্তা তার কথার ছেদ দিল। নিস্পন্দ নিথর হয়ে বক্তার চোখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মৃত্যুর ভূষ্ণীম্ভাবের মধ্যে ততক্ষণ তার কথা শুনে যাচ্ছিল ইভান। স্মের্দিকোভ্ বর্ণনা দেওয়ার সময় কদাচিৎ ইভানের দিকে তাকাচ্ছিল, তবে বেশির ভাগ সময়ই চোখ এক পাশে ফিরিয়ে ছিল। বিবরণ শেষ করার পর মনে হল সে নিজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তার মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে। তবে সে অনুশোচনা বোধ করছে কি না তা অনুমান করা অসম্ভব ছিল।

"দাঁড়াও!" একটু ভেবে দেখে ইভান বলে উঠল। "তা হলে দরজার ব্যাপারটা? দরজা যখন উনি কেবল তোমাকেই খুলে দিলেন সেক্ষেত্রে গ্রিগোরি তার আগে কী করে দেখতে পেল যে দরজা খোলা ছিল? গ্রিগোরি তো তোমার আগেই দেখেছিল—তাই না?"

লক্ষ করার বিষয় এই যে ইভান অত্যন্ত শান্ত সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, এমন কি একেবারে যেন অন্য সুরে, তার মধ্যে রাগের চিহ্ন মাত্র নেই—এমনই যে সেই মুহূর্তে কেউ যদি দরজা ঠেলে চৌকাট থেকে উঁকি মেরে তাদের দেখত তাহলে নির্ঘাত সিদ্ধান্ত করে বসত যে ওরা দুজনে দিব্যি বসে বসে আকর্ষণীয় হলেও সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কথাবার্তা বলছে।

"সেই দরজা আর গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচের ওই যে কথা, যেন দরজাটা সে খোলা দেখেছিল সেটা ওর কল্পনামাত্র।" স্মের্দিকোভ্ মুখ বাঁকিয়ে হাসল। "তাহলে

আপনাকে বলি লোকটা মানুষ নয়, একটা একগুঁয়ে গাধা ছাড়া আর কিছু নয়। কিছুই দেখে টেখেনি, মনে হয়েছিল যেন দেখেছিল—ব্যস্, আর তাকে নড়ায় সাধ্য কার! লোকটা যে এরকম একটা জিনিস কল্পনা করেছে সেটা আপনার এবং আমার—আমাদের দুজনেরই সৌভাগ্য বলতে হবে কেন না এর পর দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ নিঃসন্দেহে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন।"

"শোন!" ইভান ফিয়োদরভিচ যেন আবারও দিশেহারা হয়ে পড়ছে এবং কিছু একটা বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। "শোন! আরও অনেক কিছু তোমাকে জিগ্গেস করার ইচ্ছে আমার ছিল, "কিন্তু ভুলে গেছি। আমি সব ভুলে যাচ্ছি আর গুলিয়ে ফেলছি। হ্যাঁ, তা-ই বটে! আমাকে অন্তত একটা কথা বল দেখি: খামটা খুলে ওখানেই মেঝেতে ফেলে রাখলে কেন? স্রেফ খামটা সুদ্ধ টাকাগুলো নিয়ে গেলেই তো পারতে। তুমি যখন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলে আমার মনে হল তুমি যেন ওই খামটার প্রসঙ্গে একথাই বলেছিলে যে ওরকম করাই দরকার ছিল। কিন্তু কেন দরকার ছিল আমি বুঝতে পারছি না।

"তা এটা আমি করেছিলাম কোনো একটা কারণে বটে। কারণটা এই যে যে-মানুষের এটা জানাই আছে এবং যে-মানুষ এতে অভ্যস্ত—এই যেমন ধরুন আমি—যে এই টাকাগুলো আগে থাকতেই দেখেছে, হয়তো নিজে হাতেই সেগুলো খামের ভেতরে পুরেছে, কী ভাবে খামটা সিল করা হয়েছে, খামের ওপর নামধাম লেখা হয়েছে তাও নিজের চোখে দেখেছে, ধরুন যদি সে রকম একজন কেউ খুন করত তাহলে এটা কী করে হয় যে খুন করার পর সে ওই খামটা খুলবে—তাও আবার অমন তাড়াহুড়োর মধ্যে—যখন সে অমনিতেই জানে, একেবারে নিশ্চিত জানে যে টাকাগুলো অবশ্যই ওটার মধ্যে আছে? না, বরং সেই চোর এই ধরুন, আমার মতো কেউ যদি হয় তাহলে খোলাখুলির মধ্যে আদৌ না গিয়ে খামটা সোজা পকেটে পুরে ফেলবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা নিয়ে সটকান দেবে, এজ্ঞে। কিন্তু দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের বেলায় হত একেবারে অন্যরকম। ওই খামের কথা উনি শুধু লোক মুখে শুনে জানতে পেরেছিলেন। জিনিসটা উনি চোখেও দেখেননি। তাই, যেই পেলেন—ধরা যাক, তোশকের তলাতেই পেলেন, অমনি, ওটার ভেতরে সত্যি সত্যি সেই টাকাগুলো আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে দেখবেন। তারপর খামটা ওখানেই ফেলে দেবেন, একবার চিন্তা করে দেখার অবসরও পাবেন না যে উনি চলে যাবার পর ওঁর বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ হয়ে থেকে যাবে। তার কারণ, উনি তো আর কোনও অভ্যস্ত চোর নন, এজ্ঞে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আগে কখনও চুরি-টুরি করেননি। বড়ো ঘরের ছেলে বলে কথা, এজ্ঞে। আর এখন যদি চুরি করবেন বলে মনস্থ করেও থাকেন সে তো আর ঠিক চুরি করা নয়। এসেছেন যেটা তার নিজের, শুধু সেটাই ফেরত নিতে। সে কথা আবার উনি আগে থাকতে শহরময় বলেও বেড়িয়েছেন, আগেই সকলের সামনে

জোর গলায় বড়াই করে বলেছেন যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছ থেকে তিনি তার পাওনা সম্পত্তি আদায় করে ছাড়বেন।-ঠিক এই চিন্তাটা প্রসিকিউটরের কাছে আমার এজাহারে আমি যে স্পষ্ট করে বলেছিলাম তা নয়, বরং তার উলটোটাই করেছি। কিছুটা ইঙ্গিতমতো দিয়েছিলাম, এজ্ঞে—এমন ভাবে দিয়েছিলাম যেন আমি নিজে কিছু বুঝতে পারছি না, যেন ওটা ওর নিজের বানানো, আমি কিছু বলে দিইনি, এজ্ঞে। তা সেই ইঙ্গিতের ফল হল এমনই যে প্রসিকিউটর মশাই পর্যন্ত লালায়িত হয়ে উঠলেন, এজ্ঞে।

"তা তুমি কি সত্যি-সত্যি, সত্যি সত্যিই কি এত সব চট করে ওই জায়গাতেই ভাবতে পেরেছিলে?" বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ্ চেঁচিয়ে উঠল। আবার সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে স্মের্দিকোভের দিকে তাকাল।

"মাফ্ করবেন এজ্ঞে, ওই রকম তাড়াহুড়োর মধ্যে কারও পক্ষে কি অত সব মাথা খাটিয়ে বের করা সম্ভব? সব আগে থাকতে ভেবে রাখা হয়েছিল, এজ্ঞে।"

"বটে, বটে    তার মানে খোদ শয়তান তোকে মদত দিয়েছিল!" ইভান ফিয়োদরভিচ আবারও চিৎকার করে উঠল। "উঁহু, বোকা তুমি নও, আমি যেমন ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধি ধর।

সে উঠে দাঁড়াল। দেখাই যাচ্ছিল ঘরের মধ্যে পায়চারি করা তার উদ্দেশ্য। ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু টেবিলটা তার হাঁটাচলার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল, টেবিল আর দেয়ালের মাঝখান দিয়ে যেতে গেলে কোনো মতে গলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না—তাই অগত্যা ঘুরে যথাস্থানে ফিরে এসে ফের বসে পড়ল। চলাফেরা করার অবকাশ না পাওয়ায় হয়তো হঠাৎই মেজাজটা খিচড়ে গেল—এতই খিচড়ে গেল যে আবার সেই আগের মতো হঠাৎ ক্ষিপ্ত চিৎকার করে উঠল।

"শোন রে হতভাগা, তুই একটা ঘেন্না করার মতো মানুষ! বুঝতে পারছিস না, আমি যে এখনও তোকে খুন করিনি তার একমাত্র কারণ এই যে আগামীকাল আদালতে তোর জবাব শোনার জন্য আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখছি। ঈশ্বর সাক্ষী   " ঊর্ধ্বে হাত তুলে ইভান বলল, "আমারও হয়তো দোষ ছিল, হয়তো বাবা মারা যাক এমন গোপন বাসনা সত্যি সত্যি আমার ছিল। কিন্তু আমি হলফ করে বলছি, তুমি আমাকে যতটা দোষী ভাবছ ততটা দোষী আমি নই। হয়ত আমি তোমাকে মোটেই কোনো ইন্ধন জোগাই নি। না, না, সেটা আমি করি নি! কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, কালই আদালতে আমি নিজে আমার নিজের বিরুদ্ধে এজাহার দেব—এটা আমি ঠিক করে ফেলেছি! আমি সব বলব, সব কথা বলব। কিন্তু আমি আর তুমি—আমরা দুজনে এক সঙ্গেঁ মিলে হাজিরা দেব। তুমি আদালতে আমার বিরুদ্ধে যা-ই বল না কেন, যে এজাহারই দাও না কেন—আমি তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তোমাকে আমি ডরাই না। আমি নিজে সব

কিছু প্রমাণ করব! কিন্তু তোমাকে বলছি, তোমাকেও আদালতের সামনে সব স্বীকার করতে হবে! যেতে হবে, তোমাকেও যেতে হবে, এসো, একসঙ্গেই যাওয়া যাক। তা-ই হবে!"

ইভান উৎসাহের সঙ্গে, সাড়ম্বরে কথাগুলি বলল। তার চোখের দৃষ্টি যে রকম জ্বলজ্বল করছিল একমাত্র তা থেকেই দেখা যাচ্ছিল তা-ই হবে।

"আপনি অসুস্থ, দেখতেই পাচ্ছি এজ্ঞে, একেবারে অসুস্থ। আপনার চোখ দুটো একেবারে হলদে", স্মের্দিকোভ বলল। কিন্তু তার কথার মধ্যে এতটুকু কৌতুকের আভাস ছিল না। এমন কি মনে হচ্ছিল যেন সমবেদনাই প্রকাশ করছে।

"চল, একসঙ্গে যাই!" ইভান পুনরাবৃত্তি করল। "তবে যদি নাও যাও তাতেও কিছু আসে যায় না—আমি একাই স্বীকারোক্তি করব।"

স্মের্দিকোভ্ একটু চুপ করে রইল, যেন মনে মনে কিছু একটা ভাবছে।

"ওরকম কিছুই হবে না, এজ্ঞে। আপনিও যাবেন না, এজ্ঞে।" কোনো রকম আবেদন নিবেদন না করে শেষকালে সে রায় দিল।

"তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না!" ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠল ইভান।

"আপনি যদি নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে সব কিছু স্বীকার করেন সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে বড়ো লজ্জার কথা হবে, এজ্ঞে। তাছাড়া তাতে কোনও ফল হবে না, একেবারেই হবে না, এজ্ঞে, কারণ আমি তো সরাসরি বলে দেব যে ওরকম কোনও কথা আমি আপনাকে কখনও বলিনি, আর আপনি হয় কোনো অসুখে ভুগছেন—যা আপনাকে দেখে মনেও হচ্ছে এজ্ঞে—নয়ত ভাইয়ের ওপর আপনার মায়া হওয়াতে তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপনি আত্মত্যাগ করছেন, আমার বিরুদ্ধে যা নয় তাই বানিয়ে বানিয়ে বলছেন, কেননা আপনারা আমাকে মানুষ বলে গণ্য না করে, সারাটা জীবন একটা সামান্য মাছি ছাড়া আর কিছু বলে মনে করেননি। কিন্তু কেই বা আপনার কথা বিশ্বাস করবে? আর আপনার অন্তত একটা প্রমাণও যদি থাকে সেটাই বা কী?"

"শোন, এই যে টাকাগুলো তুমি এখন আমাকে দেখালে তার উদ্দেশ্য অবশ্যই আমার মনে বিশ্বাস জাগানো।"

স্মের্দিকোভ্ বান্ডিলটার ওপর থেকে 'আসিরীয় ইসাক' বইটা তুলে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল।

"এই টাকাগুলো আপনি নিয়ে যান।" স্মের্দিকোভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"অবশ্যই নিয়ে যাব! কিন্তু ওগুলোর জন্যই যদি খুন করে থাক তাহলে আমাকে দিচ্ছ কেন বল তো?" ভীষণ আশ্চর্য হয়ে ইভান তার দিকে তাকাল।

"ওতে আমার মোটে কোনও দরকার নেই, এজ্ঞে", হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান জানিয়ে কম্পিত কণ্ঠে স্মের্দিকোভ্ বলল। "আগে এরকম একটা চিন্তা মাথায় ছিল বটে যে এই টাকা দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করব—মস্কোয়, নয়তো আরও

ভালো হয় বিদেশে হলে। এরকম একটা স্বপ্ন ছিল, এজ্ঞে। বিশেষ করে এই কারণে যে 'সবেরই অনুমতি আছে'। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আপনিই আমাকে এটা শিখিয়েছিলেন, এজ্ঞে; কেন না আপনি তখন এ বিষয়ে আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন বলেছিলেন শাশ্বত ঈশ্বর বলে যদি কারও অস্তিত্ব না থাকে তাহলে ন্যায়নীতি বলেও কিছু থাকছে না, আর তার আদৌ কোনও দরকারও নেই। এসব তো আসলে আপনারই কথা। আমিও সেই ভাবে বিবেচনা করে দেখলাম।"

"তুমি কি নিজের বুদ্ধি দিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছ?" বাঁকা হাসল ইভান।

"আপনার পরিচালনায়, এজ্ঞে।"

"এখন যেহেতু টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছ তাহলে এটাই বুঝে নিতে হবে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করছ?"

"না, বিশ্বাস করি না, এজ্ঞে" ফিসফিস করে স্মের্দিকোভ্ বলল

"বাঃ, তাহলে ফেরত দিচ্ছ কেন?"

"ছাড়ুন তো! অনেক হয়েছে!" স্মের্দিকোভ্ আবারও বিরক্ত হয়ে হাত নাড়া দিল। "এই তো, আপনি নিজে তখন অত করে বলতেন যে সবেরই অনুমতি আছে, তাহলে এখন আপনার নিজেরই বা কেন এত উৎকণ্ঠা? এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও এজাহার দিতে চাইছেন! তবে হ্যাঁ, ওসব কিছুই হবে না! এজাহার দিতে আপনি যাবেন না! " দৃঢ়স্বরে স্মের্দিকোভ্ তার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল।

"দেখতে পাবে!" ইভান বলল।

"এ হতেই পারে না। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এজ্ঞে। টাকাকড়ি ভালোবাসেন—সে আমি জানি, এজ্ঞে। মান সম্মানও পছন্দ করেন, কেন না আপনি খুব অহঙ্কারী। রমণীর মাধুর্য আপনার খুবই ভালো লাগে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে কারও কাছে মাথা নত না করে নির্ঝঞ্ঝাটে, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে—এটাই আপনার সবচেয়ে বেশি কাম্য, এজ্ঞে। আদালতে অমন লজ্জা মাথা পেতে নিয়ে আপনি তো আর চিরকালের জন্য আপনার জীবনটা নষ্ট করতে চাইবেন না! আপনি ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মতো, অনেকটাই এজ্ঞে। তাঁর আর সব সন্তানের মধ্যে মধ্যে আপনিই বেশি করে তার মতো হয়েছেন। আপনারা দুজনে অভিন্নহৃদয়, এজ্ঞে।"

"তুমি তো বোকা নও!" ইভান তিরবিদ্ধের মতো চমকে উঠল। তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। "আমি আগে ভাবতাম তুমি বোকা। এখন দেখছি তুমি সিরিয়াস!" হঠাৎ যেন নতুন দৃষ্টিতে স্মের্দিকোভের দিকে চেয়ে ইভান মন্তব্য করল।

"আপনার ওই অহংকার থেকেই আপনি ভেবেছিলেন আমি বোকা। টাকাগুলো নিন, এজ্ঞে।"

ব্যাঙ্কনোটের তিনটি বাণ্ডিলই ইভান তুলে নিল, কোনো কিছু দিয়ে না মুড়ে অমনিই [illegible]

"আগামীকাল আদালতে এগুলো দেখাব" সে বলল।

"সেখানে আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, এজ্ঞে। যেহেতু এখন আপনার নিজেরই অঢেল টাকা আছে, আপনি এগুলো আপনার ক্যাশবাক্স থেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছেন, এজ্ঞে।"

ইভান জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"আবারও তোমাকে বলছি, তোমাকে যে খুন করিনি তার একমাত্র কারণ এই যে কাল তোমাকে আমার দরকার হবে। এটা মনে রেখো, ভুলে যেয়ো না!"

"বেশ তো, খুন করুন না। এখনই খুন করুন", অদ্ভুত ভাবে ইভানের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে স্মের্দিকোভ্ বলে উঠল। "সে সাহস আপনার হবে না, এজ্ঞে", তিক্ত হেসে সে যোগ করল। "আগেকার সেই সাহসী মানুষটির এখন আর কিছু করারই সাহস হবে না, এজ্ঞে!"

"কাল দেখা হবে!" চেঁচিয়ে এই কথা বলে ইভান যেতে উদ্যত হল।

"একটু দাঁড়ান ওগুলো আরেকবার আমাকে দেখান।"

ইভান নোটগুলি পকেট থেকে বের করে তাকে দেখাল। স্মের্দিকোভ দশ সেকেন্ড মতো তাকিয়ে সেগুলি দেখল।

"আচ্ছা, এবারে আপনি যেতে পারেন", হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সে বলল। 'ইভান ফিয়োদরভিচ্!" হঠাৎ আবার সে চেঁচিয়ে তাকে পিছু ডাকল।

"আবার কী চাই?" ইভান এবারে চলতে চলতেই পিছনে ফিরে তাকাল।

"বিদায়, এজ্ঞে!"

"কাল দেখা হবে!" আবারও চেঁচিয়ে এই বলে কুটির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ইভান।

তখনও পুরোমাত্রায় বরফঝড়ের তাণ্ডব চলছে। প্রথম কয়েক পা সে বেশ প্রফুল্ল মেজাজে চলল, কিন্তু তারপরই হঠাৎ যেন টলতে শুরু করল। 'কোনো শারীরিক কারণে হবে', এই ভেবে মুচকি হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল। আনন্দের মতো একটা অনুভূতিতে এখন তার মন ভরে উঠল। ভেতরে ভেতরে সে অনুভব করল এমন এক ধরনের দৃঢ়তা, যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সম্প্রতি সর্বক্ষণ তাকে এত ভীষণভাবে পীড়া দিচ্ছিল তার অবসান ঘটতে চলেছে! যে সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার আর 'কোনো হেরফের হবে না', এই ভেবে সে স্বস্তি পেল। সেই মুহূর্তে আচমকা সে কীসের গায়ে যেন হোঁচট খেল। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখতে পেল, পায়ের কাছে পড়ে আছে ছোটখাটো চেহারার সেই চাষিটা যাকে সে তখন ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এখনও সেই ভাবে, সেই জায়গাতেই অজ্ঞান ও অসাড় হয়ে পড়ে আছে। বরফ ঝড়ের তুষার ইতিমধ্যে ঝেঁটিয়ে স্তূপাকার হয়ে পড়ে তার মুখ প্রায় ঢেকে দিয়েছে। ইভান হঠাৎ খপ্ করে তাকে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। ডান দিকে একটা ছোট্ট

বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে এগিয়ে সেখানে গিয়ে জানলার খড়খড়িতে করাঘাত করল। বাড়ির মালিক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন লোক—সাড়া দিতে চাষিটাকে পুলিশ স্টেশনে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য সে তাকে অনুরোধ করল, এর বিনিময়ে তক্ষুনি তাকে তিন রুবল দেবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিল। লোকটা তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো। কী ভাবে তখন ইভান ফিয়োদরভিচের পক্ষে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব হল, চাষিটাকে পুলিশ স্টেশনে তুলে এনে তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার লাগিয়ে সে যে তাকে দেখানোর ব্যবস্থা করল এবং প্রসঙ্গত এসবের 'খরচ বাবদ' সে যে আবারও মুক্ত হস্তে টাকা ঢালল—সে সবের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে আর যাচ্ছি না। শুধু এইটুকুই বলব যে একাজে তার প্রায় এক ঘণ্টা সময় চলে গেল। কিন্তু দেখা গেল ইভান ফিয়োদরভিচ এতে বেশ সন্তুষ্ট। তার ভাবনাচিন্তা প্রসারিত ও সক্রিয় হয়ে পড়ল।

হঠাৎ এই ভেবে সে তৃপ্তিলাভ করল যে 'আগামীকালের ব্যাপারে অমন দৃঢ়সঙ্কল্প যদি আমি গ্রহণ না করতাম তাহলে এই চাষিটার একটা বন্দোবস্ত করার জন্য আমি ঝাড়া এক ঘণ্টা এখানে থাকতাম না, আমি তখন লোকটা ঠান্ডায় জমে গেল, না তার কী হল তা নিয়ে থোড়াই ভাবতাম, ওর পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম। যা হোক, নিজের ওপর নজর রাখার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার আছে, অথচ ওরা ধরেই নিয়েছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি', এই ভেবে সে মনে মনে আরও বেশি তৃপ্তি পেল।

বাড়ি পর্যন্ত আসার পর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অতর্কিতে তার মনে প্রশ্ন জাগল: 'আচ্ছা, এখন, এই এখুনি গিয়ে প্রসিকিউটরকে সব জানালে হয় না?' মনে মনে প্রশ্নটার মীমাংসা করে সে আবার বাড়ির দিকে চলল। 'যা করার আগামীকাল সব এক সঙ্গে করা যাবে!' সে ফিসফিসিয়ে আপন মনে বলল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে সঙ্গে সঙ্গে তার যত আনন্দ, যত আত্মতৃপ্তি সব এক পলকে উধাও হয়ে গেল।

যখন সে ঘরে ঢুকল তখন সে তার বুকের ভেতরে আচমকা কীসের যেন একটা হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করল। সেটা বেদনাদায়ক, ন্যক্কারজনক কীসের যেন একটা স্মৃতি, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তার তাড়না, যা ঠিক এই ঘরটাতেই এখন, এই মুহূর্তে আছে এবং এর আগেও ছিল সে ক্লান্তিবশত সোফায় অঙ্গ ছেড়ে দিল। বুড়ি তাকে চায়ের জন্য সামোভার এনে দিল। চা সে বানাল ঠিকই, কিন্তু স্পর্শ করল না। বুড়িকে সে দিনের মতো বিদায় দিল। সোফায় বসে থাকতে থাকতে সে অনুভব করল তার মাথা ঘুরছে। অনুভব করল অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। আরেকটু হলেই ঘুমিয়ে পড়ছিল, কিন্তু অস্থিরতার ফলে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুম তাড়ানোর জন্য ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করল। কোনো কোনো মুহূর্তে তার মনে হতে লাগল যেন সে ভুল বকতে শুরু করেছে। কিন্তু যে চিন্তাটা

তাকে বেশি করে পেয়ে বসেছিল সেটা তার অসুস্থতা নয়। আবার বসে পড়ে সে থেকে থেকে এমন ভাবে চারপাশে তাকাতে লাগল যেন কিছু একটার সন্ধান করছে। এরকম বেশ কয়েক বার হল। শেষকালে তার দৃষ্টি একটা বিন্দুতে এসে স্থির নিবদ্ধ হল। ইভান মৃদু হাসল, কিন্তু একটা প্রচণ্ড ক্রোধের জ্বালা তার চোখেমুখে রং ছড়িয়ে দিল। দুহাতের ওপর জোরে মাথা ভর দিয়ে অনেকক্ষণ সে তার জায়গায় বসে রইল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আগের সেই বিন্দুটাই, উলটো দিকের দেয়ালের ধারে রাখা সোফাটা আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সম্ভবত ওখানে কিছু একটা, কোনো একটা বস্তু তার বিরক্তি উদ্রেক করছিল, তাকে অস্থির করে তুলছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

## নয়

## শয়তান। ইভান ফিয়োদরভিচের দুঃস্বপ্ন

আমি ডাক্তার নই, কিন্তু তাহলেও আমি উপলব্ধি করছি, আমরা সেই মুহূর্তে উপনীত হয়েছি যখন ইভান ফিয়োদরভিচের রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে যা-ই হোক না কেন, অন্তত কিছু একটা পাঠকের কাছে খুলে বলা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেবল একটি কথাই আগে থেকে বলে রাখি মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে যেমন দেখা যায় এখন, এই সন্ধ্যায় তারও অবস্থা ঠিক তা-ই ছিল। তার শরীর যদিও অনেক কাল হলই খারাপ যাচ্ছিল তবু দৃঢ় ভাবে সে ওই রোগ প্রতিহতও করে যাচ্ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগ শরীরকে পুরোপুরি কবজা করে ফেলল। চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুই না জানা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়েই আমি এই অনুমান ব্যক্ত করছি যে হয়তো সত্যি সত্যি প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে সে তার রোগকে সাময়িক ভাবে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল—বলাই বাহুল্য, এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে যে তা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারবে। সে জানত যে তার স্বাস্থ্য ভালো নয়, কিন্তু এই সময়ে, যখন তার জীবনের সর্বনাশা মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে, এমনই এক সময়ে, যখন তাকে সশরীরে উপস্থিত থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে, সাহসের সঙ্গে তার নিজের কথা বলা এবং ‘নিজের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা’ একান্ত প্রয়োজন তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এই চিন্তাটাই তার কাছে ন্যক্কারজনক মনে হচ্ছিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে কাতেরিনা ইভানভ্‌না তার অদ্ভুত খেয়ালের বশে মস্কো থেকে এক ডাক্তারকে আনিয়েছিল। তা সে যাই হোক, ইভান ফিয়োদরভিচ্ একবার সেই নবাগত ডাক্তারকেও দেখাতে গিয়েছিল। ডাক্তার তাকে ভালোমতো দেখেশুনে এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে ওর যা হয়েছে সেটাকে মস্তিষ্কের এক ধরনের গোলমালই বলা যেতে পারে। ডাক্তারের অভিমতের এক রকম স্বীকৃতি

দিয়েই ইভান ফিয়োদরভিচ্ তাঁকে যে কথা বলল—অবশ্য বিতৃষ্ণার সঙ্গেই বলল—তাতে তিনি এতটুকু বিস্মিত হলেন না। 'আপনার যা অবস্থা তাতে আপনার যখন তখন মনের বিভ্রম হওয়া খুবই সম্ভব', ডাক্তার মন্তব্য করলেন, 'যদিও ওগুলো একটু যাচাই করে দেখলে ভালো হত তবে মোটের ওপর কথা হল এই যে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্তে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা একান্ত দরকার, নইলে খারাপ হবে।' কিন্তু ইভান ফিয়োদরভিচ্ ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর বিচক্ষণ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল না। চিকিৎসার জন্য শয্যা গ্রহণে তার অবহেলা। তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিয়ে সে মনে মনে স্থির করল 'যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে ততক্ষণ তো চলাফেরা করি, পড়ে যখন যাব তখন অন্য ব্যাপার; তখন যার খুশি আমার চিকিৎসা করুক গে।'

যা হোক, ইভান ফিয়োদরভিচ প্রায় উপলব্ধি করতে পারছে যে সে একটা বিকারের ঘোরে আছে। এই অবস্থায় সে এখন বসে আছে এবং আমি আগেই বলেছি, একাগ্র দৃষ্টিতে উলটো দিকের দেয়ালের ধারে সোফার গায়ে কোনো এক বস্তু নিরীক্ষণ করছে। সেখানে হঠাৎ দেখা গেল কে একজন বসে আছে। ঈশ্বর জানেন কী করে এসে ঢুকল, কেন না স্মের্দিকোভের কাছ থেকে ফিরে ইভান ফিয়োদরভিচ যখন তার ঘরে ঢুকল তখনও সে ঘরের ভেতরে ছিল না। ভদ্রশ্রেণির কোনো লোক হবে অথবা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, বিশেষ এক ধরনের রুশ ভদ্রলোক! যুবক তাকে আর বলা যায় না। বছর পঞ্চাশেক বয়স—যাকে ফরাসিরা 'quit frisait la cinquantaine' বলে থাকে। চুলে খুব একটা বেশি পাক ধরেনি—চুল এখনও বেশ কালো, লম্বা লম্বা আর ঘন। মুখে ছোট্ট একটুখানি ছাঁটা ছুঁচালো দাড়ি। গায়ে কেমন যেন খয়েরি রঙের একটা কোট—দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো ভালো দর্জির হাতের কাজ, তবে ইতিমধ্যে বহু ব্যবহারে জীর্ণদশাগ্রস্ত, সেলাই করা হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে, আজকাল এই ফ্যাশন একেবারে উঠে গেছে, যারা একটু শৌখিন ও অবস্থাপন্ন লোক গত দুবছর হল তাঁদের কেউ আর এ ধরনের পোশাক পরে না। ভেতরের জামা, স্কার্ফের মতো লম্বা নেকটাই—সবই ছিল আর দশটা ফিটফাট ভদ্রলোকের মতো, কিন্তু ভেতরের জামাকাপড়—যদি একটু কাছ থেকে নিরীক্ষণ করা যায়—নোংরামতন। চওড়া স্কার্ফটাও বেশ রংচটা। আগন্তুকের চেক কাটা পাতলুন চমৎকার তার গায়ে খাপ খেয়েছে বটে, কিন্তু বড়ো বেশি হালকা রঙের, কেমন যেন বাড়াবাড়ি রকমের আঁটসাট, ওরকম আজকাল আর কেউ পরে না। ঠিক তেমনি তার সাদা নরম পশমিনের টুপিটা, যেটা আগন্তুক সাথে করে নিয়ে এসেছে—মরশুমের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

এক কথায়, চেহারায় রীতিমতো ভদ্রস্থ, তবে পকেটের সঙ্গতি অত্যন্ত দুর্বল। দেখেশুনে মনে হয় ভদ্রলোক এক কালের সেই সব অকর্মণ্য জমিদার গোষ্ঠীর কেউ,

ভূমিদাস প্রথার আমলে যাদের খুব রমরমা ছিল। নিঃসন্দেহে কোনো এক কালে শৌখিন ও ভদ্রসমাজের সান্নিধ্যে ছিল, এক সময় তার ভালো যোগাযোগ ছিল, সেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলত এবং সম্ভবত এখনও রক্ষা করে চলছে; কিন্তু যৌবনে আমোদ ফুর্তি করে জীবন কাটানোর পর, সম্প্রতি ভূমিদাসপ্রথা উঠে যাওয়ায় একটু একটু করে দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়ার ফলে তার সমাজের অন্যদের কাছে অনেকটা যেন ভালো স্বভাবের এক পরান্নজীবীতে পরিণত হয়েছে। পুরনো আলাপ পরিচয়ের সূত্রে সদাশয় ব্যক্তিদের এর ওর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। তারাও লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো, ভালো স্বভাব চরিত্রের জন্য তাকে গ্রহণ করে, পরন্তু আরও এই হেতু গ্রহণ করে যে হাজার হোক সে একজন ভদ্রলোক, যাকে যে কারও সামনে টেবিলে এক আসনে বসানো যায়—যদিও, বলাই বাহুল্য, সাড়ম্বরে নয়। ভালো স্বভাব চরিত্রের এ ধরনের ভদ্রলোকেরা যারা গল্প করতে পারে, তাসের আসরে যোগ দিতে পারে, কোনো রকম কাজের ভার নেওয়া যাদের একদম পছন্দ নয়—এমন কি তাদের ওপর চাপিয়ে দিলেও নয়—এরা সচরাচর নিঃসঙ্গ অথবা অকৃতদার, নয়তো বিপত্নীক হয়ে থাকে; সন্তানাদি তাদের থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা সব সময়ই দূরে কোথাও কোনো মাসিপিসির কাছে মানুষ হয়, তাদের সম্পর্কে এই ভদ্রলোকেরা ভদ্রসমাজে প্রায় কখনওই কোনো উচ্চবাচ্য করে না—সম্ভবত এ ধরনের সম্পর্কের দরুন তারা কতকটা লজ্জিত। একটু একটু করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে তারা একেবারে অনভ্যস্ত হয়ে পড়ে, কদাচিৎ জন্মতিথি বা বড়দিন উপলক্ষে তাদের কাছ থেকে চিঠিতে বার্তা পায়, এমনকি মাঝে মধ্যে সেগুলির উত্তরও দেয়।

অপ্রত্যাশিত আগন্তুকটির চেহারার মধ্যে যে খুব একটা দিলখোলা ভাব ছিল এমন নয়, কিন্তু আবারও বলতে হয়, তার মুখের ভাবটা বেশ ভালো, দেখে মনে হয় পরিস্থিতি তেমন বুঝলে যে-কোনো রকমের অমায়িক ভাব প্রকাশের জন্য প্রস্তুত। ঘড়ি তার ছিল না, তবে কচ্ছপের খোলের ফ্রেমে বাঁধানো, কালো ফিতে দেওয়া একটা হাত চশমা ছিল। ডান হাতের মাঝের আঙুলে শোভাবর্ধন করছে শস্তাদরের ওপাল পাথর লাগানো বিশাল এক সোনার আঙটি।

ইভান ফিয়োদরভিচ ক্রুদ্ধ হয়ে চুপ করে ছিল। কথা শুরু করার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। আগন্তুক অপেক্ষা করে রইল, বসে রইল ঠিক অপরের অন্নে প্রতিফলিত একজন মানুষের মতো—যেন ওপরতলায় তার জন্য যে ঘরখানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, চায়ের টেবিলে গৃহকর্তার সঙ্গদানের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে নিচে নেমে এসেছিল, কিন্তু এসে দেখছে গৃহকর্তা যেন কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন এবং ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছেন। তাই সে-ও চুপচাপ মুখ বুঁজে আছে। তবে গৃহকর্তা একবার মুখ খুললেই হল—যে কোনো রকম অমায়িক কথাবার্তার জন্য সে প্রস্তুত। এমন সময় আগন্তুকের চোখে মুখে যেন আকস্মিক কোনো উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল।

"শোন হে", ইভান ফিয়োদরভিচের উদ্দেশে সে বলতে শুরু করল, "তুমি আমাকে মাফ কোরো, আমি শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই  তুমি  তো স্মের্দিকোভের কাছে গিয়েছিলে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কথাই জানতে, অথচ বেরিয়ে এলে তার সম্পর্কে কিছুই না জেনে। সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলে

"ও হ্যাঁ!" হঠাৎ ইভানের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে এলো। "হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।  অবশ্য এখন সবই সমান। যা হবার কাল হবে," আপন মনে বিড়বিড় করে সে বলল। "কিন্তু তুমি  " বিরক্ত হয়ে আগন্তুককে উদ্দেশ করে সে যোগ করল, "সে তো এখন আমার নিজেরই, এই এখনই মনে করার কথা, কেন না এই ভেবেই তো আমি এত কাতর হয়ে পড়ছি! তুমি কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসলে—তুমি বললে, আর আমিও বিশ্বাস করে নিলাম যে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ, আমি নিজে মনে করতে পারিনি?"

"বিশ্বাস করতে হবে না।" ভদ্রলোকের মুখে প্রীতিমধুর হাসি ফুটে উঠল। "জোরজবরদস্তি করে কি বিশ্বাস করানো যায়? তা ছাড়া বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ কাজে আসে না—বিশেষত সাক্ষ্যপ্রমাণের বস্তু। থমাস্* যে বিশ্বাস করেছিলেন তার কারণ এই নয় যে তিনি খ্রিস্টকে পুনরুত্থিত হতে দেখেছিলেন, কারণ এই যে দেখার আগেই তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন। এই ধর না কেন, অধ্যাত্মবাদীদের কথা  ওদের আমার খুব ভালো লাগে।  একবার ভেবে দেখ, ওরা মনে করে ওরা ধর্মের উপকার সাধন করছে, কারণ শয়তানের দল পরলোক থেকে ওদের শিং দেখায়। ওরা বলে 'পরলোক যে আছে তার বস্তুগত প্রমাণ বলতে যা বোঝায় এটা তাই। পরলোক আর বস্তুগত সাক্ষ্যপ্রমাণ! আহা, কী কথা! শেষ কথাটা হল, যদি শয়তানের প্রমাণ দেওয়াও যায় তাতেও কিন্তু জানা যাচ্ছে না ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল কি না। আমি ভাববাদী সমাজে নাম লেখাতে চাই। ওদের বিরোধিতা করে বলব  'আমি বাস্তববাদী, বস্তুবাদী নই।' হে-হে!"

"শোন!" ইভান ফিয়োদরভিচ্ চট করে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "আমি এখন একটা বিকারের ঘোরে আছি  অবশ্যই বিকারের ঘোরে  যত খুশি মিথ্যে বলে যাও, আমার কিছু আসে যায় না! এবারে আর আমাকে গতবারের মতো খেপিয়ে তুলতে পারবে না। শুধু আমার কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে।  আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে চাই।  আমি অনেক সময় তোমাকে দেখতে পাই না, এমনকি তোমার গলার স্বর গতবারের মতো শুনতেও পাই না, কিন্তু তুমি

---

* সন্ত থমাস্  খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যমন্ডলীর অন্যতম। 'সন্দেহপ্রবণ থমাস্' নামেও পরিচিত, যেহেতু কথিত আছে খ্রিস্টের পুণরুত্থানে তিনি গোড়ায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

যা-ই বক না কেন আমি সব সময় আন্দাজে বুঝতে পারি, কেন না সে তো, তুমি না, আমি—আমি নিজেই কথা বলছি! কেবল জানি না গতবার কী হয়েছিল—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না কি জাগ্রত অবস্থায় তোমাকে দেখেছিলাম? যাই দেখি ঠান্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায় জলপটি লাগাই। বলা যায় না হয়তো তুমি উঠে যাবে।"

ইভান ফিয়োদরভিচ ঘরের এক কোনায় চলে গিয়ে একটা তোয়ালে নিয়ে যেমন বলা তেমনি কাজ করল। ভিজে তোয়ালেটা মাথায় দিয়ে ঘরের ভেতরে আগে পিছে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

"আমার ভালো লাগছে যে আমরা সরাসরি 'তুমি' সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছি", আগন্তুক বলতে শুরু করেছিল।

"আহাম্মক!" ইভান হেসে উঠল। "আমি তোমাকে 'আপনি' বলতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি এখন খোশমেজাজে আছি। কেবল মাথার এক পাশের রগটাতে ব্যথা করছে এই যা    মাথার চাঁদিতেও।    শুধু একটাই অনুরোধ : দয়া করে গতবারের মতো দর্শন আওড়াবে না। যদি বিদেয় হতে না পার তো মিথ্যে করে মজার কিছু একটা বল। গালগল্প ছাড় না, তুমি যখন অন্যের আশ্রিত তখন গালগল্প করতে পার না তা তো আর হয় না! বল, তাতে দুঃস্বপ্ন দেখার হয় দেখব! কিন্তু আমি তোমাকে ভয় পাই না। আমি তোমার ওপর টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাব। আমাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাবে বললেই হল!"

"অন্যের আশ্রিত! C'est charmant—সে তো আনন্দের কথা! হ্যাঁ, তাই, আমি ঠিক আমার নিজের রকমেই আছি। এই দুনিয়ায় আমি অন্যের আশ্রিত ছাড়া আর কী? ভালো কথা, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমি কিন্তু কতকটা অবাকই হয়ে যাচ্ছি   ঈশ্বরের দিব্যি, দেখতে পাচ্ছি গত বার তুমি যেমন জিদ ধরে আমাকে নিছক তোমার কল্পনাবিলাস বলেছিলে এখন কিন্তু তার বদলে এরই মধ্যে একটু একটু করে আমাকে সত্যিকারের কিছু একটা বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছ।   "

"কখনোই না!, এক মুহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে বাস্তব সত্য বলে গ্রহণ করি নি!" এক রকম ক্ষিপ্ত হয়েই ইভান চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি মিথ্যে, তুমি আমার ব্যাধি, তুমি প্রেতাত্মা। শুধু আমার জানা নেই কী ভাবে তোমাকে উচ্ছেদ করতে হয়, তাই দেখেত পাচ্ছি কিছুটা সময় আমাকে ভুগতে হবে। তুমি আমার মনের বিভ্রম। তুমি আমারই মূর্ত প্রকাশ, তবে যা-ই হোক না কেন, আমার—আমার চিন্তা আর অনুভূতির মাত্র একটা দিকের ..যা অতি কদর্য, অতি নির্বোধ   একমাত্র সেগুলোর। এ দিক থেকে দেখতে গেলে তুমি আমার কাছে কৌতূহলের বিষয় হলেও হতে পারতে—শুধু তোমাকে নিয়ে ঝামেলা পোহানোর মতো সময় যদি আমার থাকত

এই যে আজ ল্যাম্পপোস্টের কাছে আলিয়োশার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুমি চিৎকার করে বলেছিলে 'তুই ওর কাছ থেকে জানতে পেরেছিস? কী করে তুই জানতে পারলি যে ও আমার কাছে আসে?'—সে তো তুমি আমার কথা মনে করেই বলেছিলে—তাই না? তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে অন্তত সামান্য এক পল সময়ের জন্যও তুমি বিশ্বাস করেছিলে, অবশ্যই বিশ্বাস করেছিলে যে আমি সত্যি সত্যি আছি।" ভদ্রলোক মুচকি হাসল।

"তা হ্যাঁ, সেটা ছিল প্রকৃতির একটা দুর্বলতা কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারিনি। সেবারে আমি ঘুমিয়েছিলাম না হাঁটাচলা করছিলাম, আমি জানি না। আমি হয়তো তখন তোমাকে স্বপ্নেই দেখেছিলাম, জাগ্রত অবস্থায় মোটেই নয়..."

"তাহলে এই মাত্র আলিয়োশার সঙ্গে তুমি যে অমন দুর্ব্যবহার করলে তার কী দরকার ছিল? বড়ো মিষ্টি ছেলেটা। মহাস্থবির জোসিমাকে নিয়ে আমি যা করেছি তার জন্য আমি ওর কাছে অপরাধী।"

"আলিয়োশাকে নিয়ে কোনো কথা নয়! হুকুমের চাকর হয়ে তোমার স্পর্ধা তো কম নয়!" আবারও হেসে উঠল ইভান।

"গালাগাল করছ, আবার হাসছও—এটা ভালো লক্ষণ। তুমি, যাই বল না কেন, গতবারের তুলনায় আজ কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক বেশি অমায়িক ব্যবহার করছ। বুঝতে পারছি এর কারণটা কী কারণ তোমার মহৎ সঙ্কল্প "

"চুপ করে থাক! আমার সঙ্কল্পের কথা তোমাকে বলতে হবে না!" ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল ইভান।

"বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি, c'est noble, c'est charmant—এটা মহৎ, এটা চমৎকার! তুমি কাল তোমার ভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করতে যাচ্ছ, আত্মোৎসর্গ করতে যাচ্ছ c'est chevaleresque—এটা শিভাল্‌রি।"

"কথা বোলো না, লাথি কষিয়ে দেব কিন্তু!"

"তাতে আমি বরং খুশিই হব, কেন না তাহলে আমি বুঝে নেব আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। লাথির কথা যদি উঠল তার মানে আমার বাস্তবতাকে তুমি বিশ্বাস করছ, কারণ প্রেতাত্মাকে কেউ লাথি মারে না। ঠাট্টাতামাশা রাখ। আমাকে যত খুশি গাল দিতে পার, আমার কাছে সব সমান, কিন্তু তা হলেও আরেকটু—অন্তত সামান্য এক ফোঁটা ভদ্র হতে পারলে ভালো করতে—এমন কি আমার সঙ্গে ব্যবহারেরও। তা নয় তো কথায় কথায় আহাম্মক, হুকুমের চাকর! এসব কী কথা, অ্যাঁ!"

"তোমাকে গালমন্দ করে আমি নিজেকেই গালমন্দ করছি!" আবারও হাসতে লাগল ইভান। "তুমি হলে আমি, স্বয়ং আমি—শুধু চেহারাটাই যা অন্য। তুমি ঠিক সেই সেই কথা বলছ যা আমি মনে মনে ভাবছি আমাকে নতুন কিছু বলার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই!"

"তোমার সঙ্গে আমার ভাবনাচিন্তার যদি মিল হয় সেটা তো আমার পক্ষে পরম সম্মানের", ভদ্রভাবে, মর্যাদার সঙ্গে ভদ্রলোক বলল।

"বেছে বেছে শুধু আমার খারাপ চিন্তাগুলোই নিচ্ছ—সবচেয়ে বড়ো কথা নির্বোধ চিন্তাগুলো। তুমি নির্বোধ আর নীচ প্রকৃতির। তুমি আকাট মূর্খ। নাঃ, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না! কী যে করি, কী যে করি!" ইভান দাঁতে দাঁত ঘষল।

"বন্ধু আমার, যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু একজন ভদ্রলোক হয়েই থাকতে চাই, আমি চাই আমাকে যেন সেই ভাবেই গ্রহণ করা হয়", নির্ভেজাল পরান্নজীবী মোসাহেব শ্রেণির লোকের আঁতে ঘা লাগলে ক্ষোভের যেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পর মুহূর্তেই আবার যেমন সেটা হজমও করে নিতে হয়, কতকটা সেই ভাবেই নতি স্বীকার করে প্রসন্নচিত্তে আগন্তুক আবার শুরু করল। "আমি গরিব, কিন্তু

আমি বলব না যে আমি খুব একটা সৎ, কিন্তু যেটা স্বতঃসিদ্ধ তা এই যে সমাজে লোকে আমাকে সচরাচর একজন অধঃপতিত দেবদূত বলে গ্রহণ করে। ঈশ্বরের দিব্যি, আমার তো ধারণায়ই আসে না এ কী করে সম্ভব যে আমি কোনো এক কালে দেবদূত ছিলাম! যদিএমনও হয় যে কোন কালে ছিলাম, তা হলে সেটা এত আগেকার কথা যে ভুলে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। এখন আমি একমাত্র যার মূল্য দিয়ে থাকি সেটা হল একজন ভদ্র সন্তান হিসেবে আমার সুনাম, আর জীবন যাপন করি যখন যে রকম, তবে চেষ্টা করি লোকের প্রীতিভাজন হতে। আমি লোকজনকে মনে প্রাণে ভালোবাসি। ওঃ, আমাকে কত অপবাদই যে দেওয়া হয়! এখানে, সময় সময় যখন আমি তোমার কাছে এসে উঠি তখন আমার জীবনটা এমন ভাবে কাটে যে মনে হয় সেটা যেন এক ধরনের বাস্তবতা, আর এটাই আমার সব চাইতে বেশি ভালো লাগে। কথাটা এই যে আমি নিজেও তোমারই মতো কল্পনাবিলাসে ভুগছি, এই কারণে তোমাদের পার্থিব বাস্তবতা ভালোবাসি। এখানে তোমাদের সব কেমন গণ্ডি বাঁধা, এখানে ফর্মুলা আছে, জ্যামিতি আছে, কিন্তু আমাদের ওখানে যা আছে তা কেমন যেন সব অনির্ধারিত সমীকরণ! আমি এখানে হাঁটাচলা করি আর স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। তা ছাড়া পৃথিবীতে আমি হয়ে পড়ি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। না, না, হেসো না, দয়া করে হেসো না আমি যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি ঠিক এটাই কিন্তু আমার পছন্দ নয়। আমি এখানে এসে তোমাদের সব রকমের অভ্যাস রপ্ত করছি। ধারণা করতে পার, পাব্লিক বাথে যেতে আমার বেশ লাগে। ব্যবসায়ী আর ধর্মগুরুদের সঙ্গে সেখানে বাষ্প স্নান করতে আমি ভালোবাসি। আমার স্বপ্ন শরীরী রূপ ধারণ করা—এমন ভাবে, যাতে সেটা হয় চূড়ান্ত, আর ফেরত চলে যেতে না হয়। আমি হতে চাই আড়াই মন ওজনের কোনো বেনে বৌ, সে যা যা বিশ্বাস করে সব বিশ্বাস করতে। আমার আদর্শ—গির্জায় ঢুকে শুদ্ধ মনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর উদ্দেশে দেওয়া —সত্যি বলছি তাই। তখন আমার দুঃখকষ্টের অবসান ঘটবে। তোমাদের এখানে

নিজের চিকিৎসা করানোর ব্যাপারটাও আমার ভালো লেগেছে। বসন্তকালে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হল, আমিও একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বসন্তের টিকে নিলাম—সেদিন কী খুশিই যে হয়েছিলাম তা যদি তুমি জানতে! আমাদের স্লাভ্ ভাইদের দশ রুবল দান করেছি! নাঃ, তুমি শুনছ না। জান, আজ তোমাকে যেন বড্ড কেমন কেমন দেখাচ্ছে।" ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি জানি, গতকাল তুমি ওই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে। তা, তোমার শরীরের অবস্থা কেমন? ডাক্তার তোমাকে কী বললেন?"

"আহাম্মক!" ইভান মুখের ওপর জবাব দিল।

"তা তুমি এতো খুব বুদ্ধিমান! ফের গালমন্দ করছ? আমি কিন্তু তোমাকে সমবেদনা জানানোর জন্য বলিনি, অমনিই বলেছিলাম। জবাব দিতে না চাইলে দিতে হবে না। এ যে দেখছি বাতটা আবার চাগিয়ে উঠল।

"আহাম্মক!" ইভান আবার বলল।

"তুমি কেবল তোমার সেই একই কথা বলে যাচ্ছ, এদিকে গত বছর আমাকে এমন বাতে ধরেছিল যে এখন পর্যন্ত মনে পড়ছে।"

"শয়তানের আবার বাত!"

"হতে নেই বা কেন, যখন আমি মাঝে মাঝেই রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করছি? মূর্তি ধারণ করে তার ফলও ভোগ করছি। আমি শয়তান, sum et nihil humanum a me alienum puto*—কিন্তু মানুষের কিছুই আমার পর নয়।"

"কী বললে? কী বললে? শয়তান, অথচ sum et nihil humanum তা শয়তানের পক্ষে এটা মন্দ নয় বটে!"

"শুনে আনন্দ হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুশি করতে পেরেছি।"

"কিন্তু এটা তো তুমি আমার কাছ থেকে নাওনি।" ইভান যেন স্তম্ভিত হয়ে হঠাৎ থমকে গেল। এটা আমার মাথায় কখনও আসেনি। অবাক কাণ্ড

"C'est du nouveau n'est ce pas?** এইবারে আমি সৎ আচরণ করব, তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলব। শোন, স্বপ্নের মধ্যে, এবং বিশেষ করে দুঃস্বপ্নের মধ্যে—তা সে বদহজমের দরুন বা যে-কোনো কারণেই হোক—সময় সময় মানুষ এমন অনেক কিছু দেখে যা এমন শিল্প রুচিসম্মত, এমন জটিল আর যথার্থই বাস্তব, যেখানে থাকে এমন সমস্ত ঘটনা, এমনকি ঘটনাবহুল পুরোদস্তুর এমন এক জগৎ যা তোমাদের অতি উচ্চস্তরের বিষয় থেকে শুরু করে একটা মেশিনের শেষ বোতামটা পর্যন্ত সব কিছুর এমন সব অপ্রত্যাশিত খুঁটিনাটি সমেত এমনই এক পরম্পরাসূত্রে সুকৌশলে গাঁথা, যে হলফ করে বলতে পারি সেরকম কিছু রচনা

---

লাতিন

** এটা নতুন, সত্যি কিনা? (ফরাসি)

করা ল্যেভ্ তল্স্তোয়েরও সাধ্য হবে না। প্রসঙ্গত, এরকম স্বপ্ন অনেক সময় এমন সব লোকে দেখে যারা আদৌ কোনও লেখক নয়—সরকারি অফিসের কোন আমলা, খবরের কাগজের কলমবাজ বা পুরুতঠাকুরের মতো অতি সাধারণ সব লোকজন।

এখানে আবার দস্তুরমতো একটা সমস্যাও আছে : একজন মন্ত্রীমশাই তো নিজমুখে স্বীকারই করলেন যে তাঁর সমস্ত ভালো ভালো আইডিয়া আসে যখন তিনি ঘুমোন। তা এখনও ঠিক সেই রকম হয়েছে। আমি তোমার বিভ্রম হলে কী হবে, দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেমন হয় তেমনি আমি তোমাকে এমন সমস্ত বিষয়ে কথা বলি যা মৌলিক, যা এ পর্যন্ত তোমার মাথায় কখনও আসেনি, তাই এমন মোটেই নয় যে আমি তোমার ভাবনাচিন্তার পুনরাবৃত্তি করি। অথচ দেখ, আমি তোমার দুঃস্বপ্ন মাত্র, এর বেশি কিছু নই।''

''মিথ্যে কথা। তোমার উদ্দেশ্যই হল আমাকে বিশ্বাস করানো যে তুমি তোমার নিজের মতো, তুমি আমার দুঃস্বপ্ন, অথচ এখন কি না নিজেই জোর দিয়ে বলছ যে তুমি একটা স্বপ্ন।''

"ওহে বন্ধু আজ আমি একটা বিশেষ পন্থা ধরেছি, পরে তোমাকে তার ব্যাখ্যা দেব। দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোথায় যেন আমি থেমেছিলাম? ও হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমার তখন সর্দি লেগেছিল, তবে তোমাদের এখানে নয়, ওই ওখানে থাকতেই..."

"ওখানে আবার কোথায়? আচ্ছা বল তো, তুমি আর কতক্ষণ আমার এখানে থাকবে? বিদেয় হতে পার না?" অনেকটা হতাশ হয়েই ইভান বলে উঠল। পায়চারি করা বন্ধ করে সে সোফায় গিয়ে বসল, আবারও টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে দু হাতে মাথা চেপে ধরল। মাথা থেকে ভিজে তোয়ালেটা টেনে খুলে ফেলল, বিরক্ত হয়ে এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিল। বোঝাই যাচ্ছে ওতে কোনো কাজ হয়নি।

''তোমার আসলে নার্ভের গোলমাল হয়েছে", গা ছাড়া ভাবে হালকা সুরে মন্তব্য করল ভদ্রলোক—অবশ্য বাইরে সম্পূর্ণ অমায়িক বন্ধুভাব বজায় রেখেই। ''আমার যে সর্দি লাগতে পারে এমনকি এর জন্যও তুমি আমার ওপর রাগ করছ। অথচ দেখ, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল। পেতের্বুর্গের উঁচু মহলের এমনই এক ভদ্রমহিলা, যাঁর লক্ষ্য ছিল সরকারি মন্ত্রণালয়, তাঁর বাড়িতে একটা কুটনৈতিক সান্ধ্য আসরে আমার তখন যাবার তাড়া ছিল। তা, টেইল কোটা, সাদা নেকটাই, দস্তানা— এসব তো হল, কিন্তু ভগবান জানেন, আমি তখন কোথায়, এদিকে তোমাদের পৃথিবীতে গিয়ে পড়তে গেলে আমাকে আবার শূন্যদেশও পাড়ি দিতে হয়। অবশ্য সেটা ছিল মাত্র এক পলকের ব্যাপার। কিন্তু তোমরা তো জানই, সূর্যের কিরণের সময় লাগে পুরো আট মিনিট, তাহলে ধারণা কর, আমার গায়ে তখন একটা টেইল কোট, আর খোলা ওয়েস্টকোট! আত্মা ঠান্ডায় জমে যায় না ঠিকই, কিন্তু যখন শরীরী আকার নেয় তখন   এক কথায়, আমি দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে যাত্রা করলাম। কিন্তু এই শূন্যদেশে, মেঘলোক ছাড়িয়ে ওই ইথারের মধ্যে,

নভোমণ্ডলের মাথার ওপর জল থাকলে যা হয়—মানে, এমন হিম    হিমই বা কী বলছি—সেটাকে হিম বললেও ভুল বলা হবে। ধারণা করতে পার?—শূন্যের একশ পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে! সকলের জানা আছে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের সেই মজা: ঠান্ডা যখন শূন্যের তিরিশ ডিগ্রি নিচে তখন আনাড়ি কারও সামনে একটা কুড়ুল বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সেটা চাটতে বলে, মুহূর্তের মধ্যে জিভ ঠান্ডায় জমে কুড়ুলের গায়ে এঁটে যায়, আর গবেটটা জিভ ছাড়াতে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করে জিভের ছালই ছাড়িয়ে ফেলে। মাত্র তিরিশ ডিগ্রিতেই এই, কিন্তু একশ পঞ্চাশ ডিগ্রিতে? সেক্ষেত্রে আমার তো মনে হয় কুড়ুলে আঙুল ঠেকানোমাত্র আর দেখতে হবে না    অবশ্য যদি    যদি ঘটনাচক্রে সেখানে কোনো কুড়ুল থাকত।

"কিন্তু সেখানে কি কোনো কুড়ুল থাকতে পারে?" অন্যমনস্ক ভাবে এবং একটু বদমাইশি করেই তাকে হঠাৎ বাধা দিল ইভান ফিয়োদরভিচ। সে যে বিকারগ্রস্ত সেটা যাতে বিশ্বাস করতে না হয় এবং চূড়ান্ত রকমের পাগলামির কবলে যাতে তাকে না পড়তে হয় সেই জন্য সে প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল।

"কুড়ুল?" আগন্তুক অবাক হয়ে তার কথাটাই তুলে পাল্টা তাকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, বলছিলাম কি, ওখানে কুড়ুলের দশাটা কী হবে?" কেমন যেন হিংস্র ভাবে, নাছোড়াবান্দার মতো জেদ ধরে হঠাৎ এ চেঁচিয়ে উঠল ইভান ফিয়োদরভিচ্

"মহাশূন্যে কুড়ুলের কী দশা হবে? Quelle idée!—আইডিয়া বটে!* যদি সে রকম কোনো দূরত্বে গিয়ে পড়ে, তাহলে আমার মনে হয়ে কেন ঘুরছে তা সে নিজেই না জেনে পৃথিবীর চারধারে উপগ্রহের মতো ঘুরতে থাকবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কুড়ুলের উদয় আর তার পাক খাওয়া নিয়ে আঁকজোখ করবেন, গাত্‌ৎসুক্[14] তাঁর ক্যালেন্ডারভুক্ত করবেন—আর কী?"

"তুমি একটা মূর্খ, আকাট মূর্খ!" ইভান তিরিক্ষি হয়ে বলল, "মিথ্যে কথা বলতে হয় তো একটু বুদ্ধিমানের মতো বল, নইলে কেউ শুনতে যাবে না। তুমি বাস্তবতা দিয়ে আমাকে কাবু করতে চাও, আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও যে তুমি আছ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে তুমি আছ! বিশ্বাস করব না!"

"আমি কিন্তু মিথ্যে বলছি না, যা বলছি সব সত্যি। দুঃখের বিষয় এই যে সত্য প্রায় কখনোই মনোরঞ্জন করার মতো হয় না। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার কাছ থেকে খুব করে বড়ো রকমের কিছু একটার, হয়তো বা চমৎকার কোনো কিছুর প্রত্যাশা করছ। বড়ই দুঃখের কথা, কারণ আমি, যা দেবার আমার সাধ্য আছে শুধু তা-ই দিচ্ছি।    "

"আর দর্শন কপ্‌চিয়ো না, গর্দভ কোথাকার!"

"কীসের আবার দর্শন, যখন আমার ডান দিকটা একেবারে পড়ে গেছে, আমি

---

* ফরাসি

গোঙাচ্ছি, কাতরাচ্ছি! চিকিৎসা জগতের সকলের কাছেই ঘুরে দেখেছি। চমৎকার রোগ ধরতে পারে। তোমার রোগের আগাগোড়া বর্ণনা তোমাকে এমন ভাবে দেবে যে বিষয়টা তার একেবারে নখদর্পণে, অথচ রোগ সারাতে পারে না। একবার ছোটখাটো চেহারার এক উৎসাহী মেডিক্যাল ছাত্রের দেখা পেয়েছিলাম। সে বলল, 'আপনি যদি মারাও যান তাহলেও কী রোগে আপনি মারা গেলেন তা পুরোপুরি জানতে পারবেন!' এটা অবশ্য আবার বিশেষজ্ঞদের কাছে তোমাকে পাঠিয়ে দেবার একটা বিশেষ ধরন। তাদের কথায়, 'আমরা শুধু রোগ নির্ণয় করে থাকি। তাই বলছিলাম কি অমুক বিশেষজ্ঞের কাছে যান, উনি আপনাকে সারিয়ে তুলবেন।' আমি তোমাকে বলছি, আগেকার সেই ডাক্তার, যিনি সব রকম রোগের চিকিৎসা করতেন, তাঁর আর দেখা নেই, একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি। এখন যারা আছে তারা শুধুই বিশেষজ্ঞ, সমানে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। তোমার নাকের কোনো গোলমাল দেখা দিয়েছে, তোমাকে তারা প্যারিসে পাঠিয়ে দেবে। তারা বলবে, ওখানে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা নাকের চিকিৎসা করে। এলে প্যারিসে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তোমার নাক পরীক্ষা করে দেখল। দেখার পর বলবে, আমি শুধু আপনার ডান নাসারন্ধ্রেরই চিকিৎসা করতে পারি, কারণ বাঁয়েরটার চিকিৎসা আমি করি না, এটা আমার কাজ নয়। আপনি বরং ভিয়েনায় চলে যান, সেখানে বিশেষ ধরনের বিশেষজ্ঞ আছেন যিনি আপনার বাম নাসারন্ধ্রকে নিরাময় করে তুলবেন। কী করবে তখন? আমি তখন লোকপ্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির শরণাপন্ন হলাম। একজন জার্মান ডাক্তার আমাকে সাধারণ স্নানঘরে গিয়ে নুন দিয়ে মধু গায় মেখে বাষ্পস্নান করার পরামর্শ দিলেন। একমাত্র এর জন্যই আমাকে বাড়তি আরেক বার স্নানঘরে যেতে হল। তা গেলাম, সর্বাঙ্গ চর্চিত করলাম, কোনো ফলই হল, না। মরিয়া হয়ে মিলানে কাউন্ট মাগুেইকে লিখলাম। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন, উনি আমাকে একটা বই পাঠালেন আর সেই সঙ্গে একটা ড্রপের সন্ধান দিলেন। ভেবে দেখ, হফ্-এর মল্ট এক্সট্রাক্ট কিনা আমার কাজে এলো! ঝট্ করে কিনে ফেললাম, দেড় খানা শিশি খেয়ে ফেললাম, এর পর আমার শুধু নাচতে বাকি। সব ভোজবাজির মতো উধাও! ঠিক করলাম খবরের কাগজের পাতায় ওর জন্য একটা 'ধন্যবাদ' অবশ্যই ছাপাতে হয়। কৃতজ্ঞতাবোধ বলে কথা! ভেবে দেখ, এখানে সে আরেক ইতিহাস একটা কাগজও আমার চিঠি নিতে রাজি নয়। তারা বলল, 'বড়ো বেশি পশ্চাদ্‌গামিতা হবে, কেউ বিশ্বাস করবে না। **Le diable n'existe point**— শয়তানের কোনো অস্তিত্বই নেই।' পরামর্শ দিল, 'আপনি বরং বেনামে ছাপান।' বেনামেই যদি হয় তাহলে আর কীসের 'ধন্যবাদ' জানানো হল? দপ্তরের লোকদের সঙ্গে এক চোট হাসাহাসি হল। আমি বললাম, 'আমাদের এই কালে তো ভগবানে বিশ্বাস করাটাই পশ্চাদগামিতা। কিন্তু আমি তো শয়তান, তাই আমাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তারা বলল, 'বুঝতে পারছি। শয়তানে কে না বিশ্বাস করে?

কিন্তু তা হলেও, চলবে না, ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। রসিকতার আকারে হলে কেমন হয়?' কিন্তু আমি ভাবলাম রসিকতা হিসেবে হলে সেটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই শেষকালে আর ছাপানো হল না। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এটা আমার বুকের ভেতরে শেল হয়ে বিঁধে আছে। আমার সবচাইতে ভালো যে অনুভূতি—এই যেমন কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ—বিধিবদ্ধ ভাবে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল, স্রেফ আমার সামাজিক অবস্থানের কারণে।"

"আবার সেই দর্শনের মধ্যে ঢুকে পড়লে!" বিরক্তির সঙ্গে দাঁতে দাঁত ঘষল ইভান।

'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, কিন্তু কোনো কোনে সময় যে অনুযোগ না করেও পারা যায় না। আমি একটা ধিকৃত লোক। এই তো তুমি উঠতে বসতে বলে যাচ্ছ যে আমি একটা মূর্খ। দেখাই যাচ্ছে তুমি একজন অপরিণত যুবক। ওহে বন্ধু, বুদ্ধিই সব নয়! আমার মনটা স্বাভাবিক ভাবেই ভালো, হাসিখুশি। আমিও কিন্তু নানা রকম রঙ্গব্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে থাকি। আমার মনে হয় তুমি ধরেই নিয়েছ যে আমি একজন কেশে পাক ধরা খ্লেস্তাকোভ্[২৭], কিন্তু আমার ভাগ্য অনেক বেশি সিরিয়াস। সেই কোন্ আদ্যিকালে কোন এক নির্দেশবলে—যার কোনো অর্থই আমি কখনও বুঝতে পারিনি—আমাকে নিয়োগই করা হয়েছিল 'অস্বীকৃতি' জানানোর জন্য; অথচ আমি একজন নিপাট ভালোমানুষ, কোনো কিছুতে 'না' করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। উঁহু, তা বললে কী হবে? যাও, অস্বীকৃতি জানাও, অস্বীকৃতি ছাড়া সমালোচনা চলবে না। যে কাগজে সমালোচনার কোনো বিভাগ নেই সে আবার কাগজ নাকি? সমালোচনা না থাকলে সে তো ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক 'হৌজ্যান্যা[২৮]' মাত্র হবে। কিন্তু জীবনের পক্ষে শুধুমাত্র 'হৌজ্যান্যাই' যথেষ্ট নয়। যেটা দরকার তা হল এই 'হৌজ্যান্যাকেও' সন্দেহের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেকটা এই রকম সব কথা আর কি। আমি অবশ্য নিজে এসবের মধ্যে জড়িত নই। আমি সৃষ্টি করিনি, জবাবদিহি করার দায় আমার নয়। তা বেছে বেছে বের করল এই একজনকে, যার ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দেওয়া যায়, সমালোচনা বিভাগে লিখতে বাধ্য করল, ফলে জীবন সম্ভব হল। এই কমেডিটা আমরা বুঝি। আমার কথা যদি বল, সোজা কথা, আমি সহজ ভাষায় আমার নিজের বিনাশ দাবি করছি। কিন্তু, না, তা হবে না। আমাকে বলা হচ্ছে, তুমি বেঁচে বর্তে থাক, কারণ তোমাকে ছাড়া কিছুই চলবে না। পৃথিবীতে সব কাজই যদি বিচক্ষণ হতো তাহলে কিছুই ঘটত না। তোমাকে ছাড়া কোনো ঘটনা ঘটবে না, অথচ ঘটনার প্রয়োজন আছে। তাই কী আর করা? ঘটনা তৈরি করার জন্য মন শক্ত করে কাজ করে যাচ্ছি, ফরমায়েস মাফিক কাণ্ডজ্ঞানহীন সৃষ্টি করে চলেছি। লোকেও তাদের তর্কাতিত বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও এই যে পুরোদস্তুর একটা প্রহসন, এটাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলে গ্রহণ করে আসছে। এখানেই তো তাদের ট্র্যাজিডি। অবশ্য হ্যাঁ, যন্ত্রণাও

ভোগ করে, কিন্তু তাই নিয়েই বেঁচেবর্তে থাকে, যে জীবন কাটায় তা কাল্পনিক নয়, বাস্তব জীবন, কেন না যন্ত্রণাই তো জীবন! যন্ত্রণা না থাকলে জীবনে আনন্দ বলতেই বা কী থাকত? সব হয়ে যেত এক অন্তহীন প্রার্থনা সঙ্গীত—সেটা হত পবিত্র, কিন্তু বিরস। সে ত বুঝলাম, কিন্তু আমি? আমি যন্ত্রণা ভোগ করে মরছি, কিন্তু আমার জীবন বলে কিছু নেই, আমি এক অনির্ণীত সমীকরণের মধ্যে একটা অজ্ঞাত রাশি। আমি যেন জীবনের এক ধরনের অপচ্ছায়া, যে তার আদি অন্ত হারিয়ে ফেলেছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজেও ভুলে গেছে তার নাম কী। কী হল? তুমি কি হাসছ? না, হাসছ না, তুমি ফের রেগে যাচ্ছ। তুমি সব সময় রাগ কর। তোমার চাই কেবল বুদ্ধি আর বুদ্ধি। কিন্তু আমি আবারও তোমাকে বলছি, আমি যদি শুধু আড়াই মন ওজনের কোনো বেনে বৌয়ের আত্মার রূপ নিতে পারতাম, ঈশ্বরের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতে পারতাম তাহলে আমি আমার এই উর্ধ্বলোকের জীবন, সমস্ত মান সম্মান ও পদমর্যাদা দিয়ে দিতাম।"

"তুমিও কি তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না?" ঘৃণামিশ্রিত কাষ্ঠহাসি হাসল ইভান।

"মানে, কী করে বলি তোমাকে, অবশ্য তুমি যদি সিরিয়াস হও একমাত্র তবেই...

"ঈশ্বর আছেন কি নেই?" আবারও জেদের বশে হিংস্র গর্জন করে উঠল ইভান।

"ও, তুমি তাহলে সিরিয়াস? শোনো ভাই, দিব্যি করে চলছি, আমি জানি নে। তবে হ্যাঁ একটা কথার মতো কথা বলেছ বটে!"

"জান না, অথচ ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছ? নাঃ, তুমি তোমার নও, তুমি—আমি, আমি ছাড়া আর কিছু নও! তুমি যাচ্ছেতাই, তুমি আমার মিছে কল্পনা!"

"অর্থাৎ কিনা, তুমি যদি চাও তো বলি, তোমার আর আমার দর্শন একই—এটাই বলা সঙ্গত হবে। Je pense donc je suis"—আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি—এটা নিশ্চয় করে জানি, আর বাদবাকি যা আছে, যা আমার চারপাশে আছে, এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বর, এমনকি স্বয়ং শয়তান—এর কোনোটারই কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই, এদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, নাকি স্রেফ আমা থেকেই এদের উদ্ভব, এরা আমার সেই আমিরই ধারাবাহিক বিকাশ যা অনাদি অনন্তকাল থেকে একক ভাবে আছে ... এক কথায়, আমি চটপট শেষ করছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর শুরু করে দেবে।"

"বরং কোনো চুটকি বলতে পারলে ভালো করতে!" তিতিবিরক্ত হয়ে ইভান বলল।

"চুটকি আছে, আমাদের বিষয়ের ওপরই আছে। মানে, চুটকি ঠিক নয়, কিংবদন্তি বলাই ভালো। তুমি এই বলে আমার নিন্দা কর যে আমার বিশ্বাস নেই। বলবে, 'চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ অথচ বিশ্বাস করছ না।' কিন্তু বন্ধু হে, আমি একাই

তো আর ওরকম নই। আমরা সবাই এখন ওখানে একটা গাড্ডার মধ্যে পড়ে আছি, আর এ সবেরই মূল তোমাদের যত বিজ্ঞান। এক সময় যা হোক ছিল পরমাণু, পঞ্চেন্দ্রিয়, চারটি প্রাকৃতিক উপাদান—তখন পর্যন্ত তাও কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে চলত। পরমাণু তো প্রাচীন জগতেও ছিল। কিন্তু দেখ যেই আমরা জানতে পারলাম যে তোমরা 'রাসায়নিক অণু' আর প্রোটোপ্লাজম আবিষ্কার করেছ, আরও কী সব ছাই কে জানে—তখুনি আমাদের লেজ গুটোতে হল। রীতিমতো একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল বড়ো কথা—কুসংস্কার, রাজ্যের গালগল্প। বুঝলে কিনা, গালগল্প তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণে আছে আমাদের মধ্যেও সেই পরিমাণে আছে—এমনকি সামান্য একটু বেশিও হতে পারে। সর্বোপরি আছে চুকলি, আমাদেরও কিন্তু এমন একটা দপ্তর আছে যেখানে 'প্রয়োজনীয় গোপন খবর' সংগ্রহ করা হয়। তা এই উৎকট কিংবদন্তিটা অবশ্য আমাদের সেই মধ্যযুগের—তোমাদের নয়, আমাদের যুগের—কেউই কিন্তু এটা বিশ্বাস করে না, এমনকি আমাদের লোকেরা নয়, কেবল আড়াই মন ওজনের বেনে বৌরা ছাড়া, অর্থাৎ কিনা আবারও সেই তোমাদের নয়, আমাদের বেনে বৌরা ছাড়া। তোমাদের এখানে যা যা আছে সে সবই আমাদের ওখানেও আছে। আমি কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে এই একটা রহস্য তোমার কাছে উদ্‌ঘাটন করছি, যদিও নিষেধ আছে। এই কিংবদন্তিটা হল স্বর্গরাজ্য নিয়ে। লোকে বলে তোমাদের এই পৃথিবীতে নাকি এমন এক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন যিনি 'সব কিছু অগ্রাহ্য করতেন, আইনকানুন, বিবেক, বিশ্বাস', আরো বড় কথা—পরকাল। মারা গেলেন, ভাবলেন, সোজা অন্ধকার আর মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে পড়বেন। কিন্তু না—তাঁর সামনে পরলোক। বিস্মিত হয়ে গেলেন, ভীষণ বিরক্তও হয়ে গেলেন। বললেন, 'এটা আমার নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে!' ঠিক এই কারণেই তাঁর সাজা হয়ে গেল। অর্থাৎ, বুঝলে কিনা, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, আমি যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই তোমাকে জানাচ্ছি। এ একটা কিংবদন্তি মাত্র।

সাজা বলতে বুঝলে কিনা, যা হয়েছিল তা এই যে তাঁকে অন্ধকারের মধ্য দশ লক্ষের চতুর্ঘাত কিলোমিটার (আমাদের আবার আজকাল কিলোমিটার চালু হয়েছে কিনা) হাঁটতে হবে। যখন এই দশলক্ষের চতুর্ঘাত শেষ করবে তখন স্বর্গের দ্বার তাঁর সামনে খুলে দেওয়া হবে এবং তাঁর সব দোষ ক্ষমা করা হবে।

"আচ্ছা, তোমাদের পরলোকে ওই দশ লক্ষের চতুর্ঘাত ছাড়া আর কী কী যন্ত্রণা আছে?" কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে উৎসুক হয়ে তাকে বাধা দিয়ে ইভান জিগ্‌গেস করল।

'কী কী যন্ত্রণা? ওঃ তা আর জিগ্‌গেস কোরো না। আগে তো এটা সেটা অনেকই ছিল, কিন্তু আজকাল হয়েছে বেশির ভাগই নৈতিক, 'বিবেকের দংশন' আর ওই রকম যত সব হাবিজাবি। এটাও এসেছে তোমাদের কাছ থেকে, তোমাদের ওই 'স্বভাবচরিত্র কোমল করা' থেকে। কিন্তু এতে সুবিধে হল কাদের? হল একমাত্র

বেহায়া নির্লজ্জদের, কারণ যার বিবেক বলেই কিছু নেই তার আবার বিবেকের দংশন কীসের? অথচ দুর্ভোগ হল শিষ্ট লোকদের, যাদের এখনও বিবেক এবং মানসম্মান বোধ আছে। আরে বাবা, জমি প্রস্তুত না করে তার ওপর সংস্কার, তাও আবার বাইরের সব প্রতিষ্ঠান থেকে কপি করা—এতে অনিষ্ট বৈ আর কীই বা হতে পারে! প্রাচীন কালের সেই আগুনই ছিল বরং ভালো। তা এই দশলক্ষের চতুর্ঘাত সাজা পাওয়া আমাদের এই মানুষটি দেখেশুনে সটান রাস্তার ওপর আড়াআড়ি শুয়ে পড়লেন। তাঁর কথা, 'যাবার ইচ্ছে নেই, নীতিগতভাবে যাব না!' সেই যে মহাপুরুষ যোনাহ্[২৮], যিনি তিন দিন তিন রাত তিমির গর্ভে চুপচাপ পড়ে ছিলেন, একজন আলোকপ্রাপ্ত রুশ নিরীশ্বরবাদীর অন্তরাত্মাটা নিয়ে তাঁর অন্তরাত্মার সঙ্গে যদি মেশাও তাহলেই পথের ওপর শুয়ে পড়া এই চিন্তাবিদটির চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে।"

"ওখানে তিনি কীসের ওপর শুয়ে ছিলেন?"

"তা, যার ওপর শোয়া যায় সে রকম কিছু সম্ভবত সেখানে ছিল। তুমি হাসছ না তো?"

"শাবাশ!" সেই রকমই অদ্ভুত উৎসাহের সঙ্গে ইভান চেঁচিয়ে উঠল। এখন কিন্তু সে অপ্রত্যাশিত ভাবে কেমন যেন একটা কৌতূহল নিয়েই শুনছে। "তারপর? এখনও কি সেই ভাবেই শুয়ে আছেন?"

"কথাটা তো এখানেই যে নেই। প্রায় হাজার বছর শুয়ে ছিলেন, পরে উঠে হাঁটা দিলেন।"

"গর্দভ আর কাকে বলে!" উত্তেজনায় অধীর হয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল ইভান, মনে হল তখনও যেন গভীর ভাবে কিছু একটা ভাবছে। চিরকাল পড়ে থাকা বা দশ লক্ষের চতুর্ঘাত ক্রোশ হাঁটা—একই কথা নয় কি? হাঁটতে হলে সে তো লক্ষ কোটি বছর হাঁটতে হবে?"

"আরও অনেক বেশি। আমার কাছে এখন আবার কাগজ পেন্সিলও নেই, নইলে হিসেব কষে বলা যেত। কিন্তু উনি পৌঁছে গেলেন অনেক আগে—এখানেই তো গল্পের শুরু।"

"পৌঁছে গেলেন বললেই হল! লক্ষ কোটি উনি পেলেন কোথায়?"

"আহা, তুমি তো কেবল আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীর কথা ভাবছ! কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এই বর্তমান পৃথিবী নিজেই লক্ষ কোটি বার তার নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। এই ধর প্রাচীন হয়ে গেছে, বরফে জমে গেছে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে, ভেঙে যৌগিক উপাদানে আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, আবার সেই জল, নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে সেই জলরাশি, তারপর আবার ধূমকেতু, আবার সূর্য, আবার সূর্য থেকে পৃথিবী—বিকাশের এই

পরম্পরার হয়তো বা নিরবধি পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবং সব অক্ষরে অক্ষরে সেই একই রূপে। অতি যাচ্ছেতাই ধরনের একটা একঘেয়ে ব্যাপার ”

“বেশ, বেশ, শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছুলেন তখন কী হল?”

“যেই স্বর্গের দ্বার তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হল এবং উনি ভেতরে ঢুকলেন, অমনি দু সেকেন্ডও সেখানে থাকতে না থাকতে—এটা ঘড়ি ধরে, হ্যাঁ ঘড়ি ধরেই বলছি, যদিও ঘড়ি তাঁর, আমার মতে, অনেক আগে পথে, তাঁর পকেটের মধ্যেই যৌগিক উপাদানে ভেঙে আলাদা আলাদা হয়ে যাবার কথা—সে যাই হোক, দু সেকেন্ডও সেখানে থাকতে না থাকতে তিনি বলে উঠলেন যে ওই দুই সেকেন্ডে শুধু দশ লক্ষের চতুর্ঘাত কেন, তার ওপরে আরও দশ লক্ষের চতুর্ঘাত চড়িয়ে দশলক্ষের চতুর্ঘাতের চতুর্ঘাতও পার হওয়া যায়! এক কথায়, ‘হৌজ্যান্যা’ গেয়ে ঈশ্বরের প্রশস্তি করলেন কিন্তু এত বেশি নুনকাটা করে ফেললেন যে সেখানে আরও বেশি উদার চিন্তাধারার যাঁরা বাহক ছিলেন তাঁরা প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর কোনো ইচ্ছে পর্যন্ত প্রকাশ করলেন না। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন যে লোকটা বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি রক্ষণশীল হয়ে গেছে। রুশ স্বভাব আরকি। আবারও বলছি কিংবদন্তি। যে দামে কেনা সেই দামেই বেচলাম। এই সব বিষয় সম্পর্কে এই রকমই সব ধারণা এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে চালু আছে।”

“আমি তোমাকে ধরতে পেরেছি!” শেষ পর্যন্ত যেন কিছু একটা মনে করতে পেরেছে এই ভাবে প্রায় ছেলেমানুষের মতো উল্লাসে ফেটে পড়ল ইভান। “দশ লক্ষের চতুর্ঘাত বছর নিয়ে এই যে চুটকিটা এটা তো আমার নিজেরই তৈরি! তখন এটা আমি বানিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধুকে গল্পটা বলেওছিলাম, করোভ্‌কিন তার নাম, মস্কোর ঘটনা। চুটকিটার এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে ওটা আমি কোথাও থেকে নিয়েছিলাম তা হতেই পারে না। এত দিনে ওটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু এখন অজ্ঞাতসারেই আমার মনে পড়ে গেল—আমার নিজেরই মনে পড়ে গেল, তুমি বলনি! এমনকি কোনো মানুষকে যখন মৃত্যুদণ্ড দিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারও অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে এরকম হাজার হাজার জিনিস মনে পড়ে যায়। স্বপ্নের মধ্যে মনে পড়ে গেল। তুমিই হলে আমার সেই স্বপ্ন! তুমি স্বপ্ন, তোমার অস্তিত্ব নেই!”

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলল, “যে রকম উত্তেজিত হয়ে আমাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছ তাতে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস হচ্ছে যে আর যা-ই হোক, আমার অস্তিত্বে তুমি বিশ্বাস কর।”

“এক কণাও না! এক শ ভাগের এক ভাগ বিশ্বাসও নেই!”

“কিন্তু হাজারের এক ভাগ তো আছে। হোমিওপ্যাথিতে আবার এই মাত্রা সম্ভবত সবচাইতে বেশি জোরাল। স্বীকার কর, তোমার বিশ্বাস আছে—এমনকি দশ হাজারের এক ভাগ আছে।

“এক মিনিটেরও নয়!” ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল ইভান। “তবে হ্যাঁ, বিশ্বাস রাখার ইচ্ছে ছিল!” হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে সে যোগ করল।

“হুঁ হুঁ! যা-ই বল না কেন, এটাও স্বীকৃতি! তবে আমি ভালো মানুষ, এবারেও আমি তোমাকে সাহায্য করব। শোন কেউ যদি কাউকে ধরতে পেরে থাকে সে আমি তোমাকে ধরতে পেরেছি, তুমি আমাকে পারনি! আমি তোমাকে ইচ্ছে করে তোমারই বানানো গল্প শুনিয়েছি, যা তুমি এর মধ্যে ভুলেও গিয়েছিলে, কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার অস্তিত্বে তোমার বিশ্বাস যেন সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।”

“মিথ্যে কথা! তোমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই তো ছিল আমাকে বিশ্বাস করানো যে তুমি আছ।”

“ঠিক তাই। কিন্তু এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অস্থিরতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই সংঘাত—এ তো অনেক সময় একজন বিবেকবান মানুষের কাছে—এই যেমন তুমি—এমনই এক যন্ত্রণা যে তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও ভালো। আমি ঠিক জানতাম যে আমার অস্তিত্বে ছিটেফোঁটা বিশ্বাস তোমার আছে, তাই ওই চুটকিটা বলে তোমার মনে চূড়ান্ত অবিশ্বাস জাগিয়ে তুললাম। আমি তোমাকে পর্যায়ক্রমে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেছি—এখানে আমার নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য আছে। এ হল গিয়ে এক নতুন পদ্ধতি যেই আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস একেবারে চলে গেল, তক্ষুনি আবার আমার সামনা সামনি আমাকেই এই বলে আশ্বস্ত করতে শুরু করে দেবে যে আমি স্বপ্ন নই, আমি সত্যি সত্যি আছি। তোমাকে জানতে আমার বাকি নেই। তখনই সিদ্ধ হবে আমার উদ্দেশ্য। আর আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি তোমার মধ্যে শুধু বিশ্বাসের ছোট্ট এইটুকুন একটা বীজ পুঁতে দেব, আর তা থেকে বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠবে এক মহীরুহ—আর সেই মহীরুহ এমনই যে তার ওপর বসে ‘নির্জনবাসী সাধু, সাধ্বী কুলবধূ’[২]-দের দলে নাম লেখানোর বাসনা তোমার হবে, যেহেতু তলে তলে তুমি এটাই চাইছ, খু-উ-ব করে চাইছ! পোকামাকড় ধরে ধরে খাবে, উদ্ধার লাভের জন্য নির্জন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে!”

“পাজির পা-ঝাড়া! আমার আত্মার মুক্তির জন্য খুব দেখছি উঠে পড়ে লেগেছ।”

“কোনো না কোনো সময় কিছু একটা ভালো কাজ তো করতেই হয়। তুমি খাপ্পা হয়ে আছ, আমি দেখতে পাচ্ছি খাপ্পা হয়ে আছ।”

“ভাঁড় কোথাকার! তুমি কি কখনও ওই ওদের প্রলোভন দেখিয়েছ?—ওই যারা পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে, নির্জন ধু ধু প্রান্তরে তপস্যা করতে করতে শ্যাওলায় যাদের সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়?”

“বন্ধু আমার, এটাই তো আমি করে বেড়িয়েছি। একজন এরকম সাধুর সঙ্গে লেগে থাক, সমস্ত জগৎসংসার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ভুলে যেতে হবে তোমাকে, কেন না তারা তো এককেটি মহামূল্যবান রত্নবিশেষ। এরকম একটি আত্মার দাম কখনো কখনো পুরোপুরি একটা তারামণ্ডলের সমান। আমাদের আবার একটা নিজস্ব

অঙ্ক আছে কিনা। জয়লাভ করাটাই তো একটা মহার্ঘ বস্তুর সামিল! আর হ্যাঁ এনাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, বলব কি, মনের বিকাশের দিক থেকে তোমার চেয়ে কোনো অংশে কম যান না, যদিও এটাও তুমি বিশ্বাস করবে না। একই মুহূর্তে এমনই অতলস্পর্শী বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধ্যান করতে পারেন যে সত্যি কথা বলতে গেলে কি অনেক সময় মনে হয় আর মাত্র এক চুল—মানুষটা, 'আমাদের অভিনেতা গর্বুনোভের ভাষায়, 'ডিগবাজি খেয়ে উলটে' পড়ে যাবে।

"তা ফল কী হল? নাকাল হয়ে শেষকালে পৈতৃক নাকটা অক্ষত থাকতে থাকতে কেটে পড়লে তো?"

"ওহে বন্ধু", রায়দানের ভঙ্গিতে আগন্তুক মন্তব্য করল, "নাকাল হয়ে নাক একেবারে কাটা যাবার চেয়ে অনেক সময় নাক নিয়ে কেটে পড়াই ভালো। এই কিছুদিন আগে এমনই একটা উক্তি করেছিলেন একজন ব্যাধিগ্রস্ত। তিনি বলেছিলেন তাঁর পিতৃস্থানীয় গুরুঠাকুর জেজুইট[৬০] সম্প্রদায়ভুক্ত এক যাজকের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তিতে। আমি উপস্থিত ছিলাম। ভারি চমৎকার। 'আমাকে আমার নাক ফিরিয়ে দিন!' এই বলে তিনি বুক চাপড়াতে লাগলেন। 'ওহে বৎস', তাঁকে কায়দা করে এড়ানোর চেষ্টায় প্রভু বললেন, 'যা কিছু সম্পন্ন হয় সবই দৈবের নির্বন্ধ, যা আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। পরন্তু যে বিপদ দৃষ্টিগোচর তাও অনেক সময় পরিণামে বড়ো রকমের উপকার সাধন করতে পারে, যা আবার আপাত দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। অকরুণ নিয়তি যদি তোমার নাক থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাতে লাভ তো তোমারাই—এই কারণে যে সারা জীবন এই বলে তোমাকে খোঁটা দেবার সাহস আর কারও হবে না যে তুমি নাকাল হয়ে তোমার নাক নিয়ে কেটে পড়েছ।' 'হে পুণ্যাত্মা প্রভু, এটা কোন সান্ত্বনা নয়!' হতাশ হয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন মার্কিজ। 'আমার নাক যদি তার যথাস্থানে থাকে তাহলেই আমি পরমানন্দে থাকব—তাতে যদি রোজ রোজ নাকাল হয়ে নাক নিয়ে সরে পড়তে হয় তাও সই!'[৬১] 'বৎস আমার!' গুরু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সব কল্যাণ এক সঙ্গে চাওয়াটা ঠিক নয়। এটা হবে সেই বিধির বিরুদ্ধে তোমার অসন্তোষ প্রকাশের সামিল, যিনি এই মুহূর্তেও তোমাকে বিস্মৃত হননি, যেহেতু তুমি এই যে এত চেঁচামেচি করছ, খিটখিট করে এই যে এখন বলছ যে সারা জীবন নাকাল হয়েও সানন্দে নাক নিয়ে থাকতে প্রস্তুত, তাহলে এক্ষেত্রে পরোক্ষে তোমার বাসনাই ত পূর্ণ হল, কারণ নাক হারিয়েও সেই তো ফাঁকিতে পরেই নাকাল হচ্ছ তুমি ...'"

"ধুত্তোর! এ কী মূর্খামি!" ইভান চেঁচিয়ে উঠল।

"ওহে বন্ধু, আমি শুধু তোমাকে হাসাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হলফ করে বলছি এটা সত্যিকারের জেজুইটদের খাঁটি ক্যাজুইস্ট কূটতর্ক। হলফ করে বলছি, আমি তোমাকে যে ভাবে বললাম অক্ষরে অক্ষরে সেই রকমই ঘটেছিল। বেশি দিন আগেকার ঘটনা নয়, এর জন্য আমাকে ঝামেলাও কম পোহাতে হয়নি। হতভাগ্য

যুবকটি বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই রাতেই গুলি করে আত্মহত্যা করে বসল। শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি সারাক্ষণ তার সঙ্গে ছিলাম।... জেজুইটদের স্বীকারোক্তি ধরনের ব্যাপারস্যাপারের কথা যদি বল, ওগুলো আমার জীবনের বিষাদ ভারাক্রান্ত মুহূর্তে বাস্তবিকই মন ভুলিয়ে রাখার সবচেয়ে ভালো উপায়। তাহলে তোমাকে আরও একটা ঘটনার কথা বলি। এই মাত্র কয়েক দিন আগেকার ঘটনা এটা। এক বৃদ্ধ পুরোহিত মশাইয়ের কাছে এসে উপস্থিত এক নর্মান মেয়ে। বছর বিশেক বয়স হবে, মাথার চুল সোনালি। আহা কী মধুর! কী তার রূপ! প্রকৃতির দান!'জিভে জল এসে যায়। পুরোহিতের ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে তাকে নিজের পাপের কথা শোনায়। 'কী হল গো মেয়ে, আবারও তোমার অধঃপতন হয়েছে?' পুরোহিত চেঁচিয়ে বলল। 'হে সাংক্তা মারিয়া*, এ আমি কী শুনছি! এবারেও অন্য কোনো পুরুষ! কিন্তু কত দিন আর এই ভাবে চলতে পারে বল ত? তোমার লজ্জা করে না?' অনুশোচনায় চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে পাপী মেয়েটি বলল, Ah mon père, ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peinel!** ধারণা কর—কী উত্তর! এখানে এসেই আমাকে হোঁচট খেতে হল। এ যে একেবারে প্রকৃতির আর্তকণ্ঠ! চাও ত বলব, নিষ্পাপ কী!—এ যে তারও বাড়া! আমি সঙ্গে সঙ্গে তার পাপ মোচন করে দিলাম, কিন্তু যাবার জন্য মুখ ফিরিয়েছি কি ফেরাইনি, অমনি আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। শুনতে পেলাম ওই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে পুরোহিত মেয়েটির সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার একটা সাক্ষাৎ স্থির করে নিল। বোঝ কাণ্ড! একজন বুড়ো মানুষ, শক্ত ধাঁচের মানুষ—মুহূর্তের মধ্যে কিনা এই অধঃপতন! প্রকৃতির মহিমা আর কাকে বলে! প্রকৃতির সত্যই তো তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করল! কী হল? আবারও নাক সিঁটকোচ্ছ যে! আবারও রাগ করছ? জানি নে বাপু, কী করে তোমার মন জোগাব।

"আমায় রেহাই দাও। তুমি একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের মতো আমার মস্তিষ্কের ভেতরে ক্রমাগত ঘা মেরে চলেছ", নিজেরই ছায়ার সামনে অসহায় হয়ে পড়ে তিক্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল ইভান। "তোমার সঙ্গ আমার কাছে বিরক্তিকর, অসহ্য, যন্ত্রণাদায়ক! তোমাকে খেদাতে পারলে আমি অনেক কিছুই দিতে পারতাম!"

"আবারও বলছি, তোমার চাহিদা পরিমিত কর। আমার কাছে 'বিপুল ও চমৎকার কিছু' দাবি করে বোসো না, তাহলেই দেখবে আমরা দুজনে কেমন বন্ধুভাবে মিলেমিশে থাকতে পারি", প্রভুত্বব্যঞ্জক সুরে ভদ্রলোক বলল। "তুমি, বাস্তবিকই আমার ওপর খেপে আছ, এই কারণে যে বজ্রবিদ্যুৎ নিয়ে, ঝলসানো ডানা মেলে, কোনো লোহিতবর্ণের দীপ্তি ছড়িয়ে তোমার কাছে দেখা না দিয়ে এরকম অনাড়ম্বর

---

সাধ্বী মেরি (লাতিন)

** আঃ বাবাঠাকুর আমার, এতেও এত তৃপ্তি পায়, অথচ আমার পরিশ্রম এতই কম লাগে! (ফরাসি)

মূর্তিতে এসে হাজির হয়েছি। তুমি অপমানিত বোধ করছ, এই কারণে যে প্রথমত তোমার সৌন্দর্যবোধে, দ্বিতীয়ত তোমার অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে। তুমি বলবে এমন একটা মানী লোকের কাছে অমন একটা নীচ শয়তানের আগমন কী করে হতে পারে? না, যা-ই বল না কেন, তোমার মধ্যে বাপু সেই রোমাণ্টিক ফল্গুধারাটি আছে যা বেলিন্‌স্কি অত করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার কিছু করার ছিল না হে ইয়ং ম্যান, এই তো আজ তোমার কাছে আসার জন্য আমি যখন তৈরি হচ্ছিলাম তখন একবার ভেবেছিলাম মজা করে টেইলকোটের ওপর সিংহ আর সূর্যের চিহ্ন এঁটে এক কালে ককেশাসে কর্মরত সত্যিকারের কোনো অবসরপ্রাপ্ত স্টেট কাউন্সিলারের মূর্তি ধরে হাজির হব কিনা। কিন্তু দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ সেক্ষেত্রে আমি যে টেইল কোটের ওপর অন্তত পক্ষে ধ্রুবতারা বা লুব্ধক নক্ষত্রের চিহ্ন না এঁটে তার বদলে সিংহ আর সূর্যের চিহ্ন আঁটার মতো স্পর্ধা দেখিয়েছি একমাত্র এই জন্যই তুমি আমাকে ধরে পেটাতে। অথচ তুমি খালি বল আমি নাকি বোকা। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ হওয়ার এতটুকু দাবি পর্যন্ত আমি করছি না। মেফিস্টোফেলেস ফাউস্টের[১১] কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করে যে সে অনিষ্ট করতে চায়, অথচ যে শুধু মঙ্গলই সাধন করছে। তা সে ওর যা খুশি, কিন্তু আমি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আমিই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি যে সত্যকে ভালোবাসে এবং আন্তরিক ভাবে মঙ্গল কামনা করে। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম যখন সেই বাণীমূর্তি, যিনি ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর দাক্ষিণ্যপ্রাপ্ত ক্রুশবিদ্ধ দস্যুর আত্মাকে নিজের বক্ষে ধারণ করে তাকে নিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। আমি শুনেছি দেবশিশুদের উল্লাসধ্বনি, তাদের কণ্ঠের গীত, ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক 'হৌজ়গন্যা', শুনেছি দ্যুলোক ভূলোক কাঁপিয়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে দেবদূত সেরাফ্‌দের বজ্রকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত উচ্চরোল। আমি তাই যা কিছু পবিত্র তার নামে তোমাদের সকলের সামনে শপথ করে বলছি, আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল দেবালয়ের বৃন্দগীত দলের সঙ্গে সামিল হয়ে, সবার সঙ্গে মিলে আমিও 'হৌজ়ন্যা' বলে চেঁচিয়ে উঠি। সেই ধ্বনি ততক্ষণে আমার মুখ থেকে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, বুক ঠেলে উঠে আসছিল তুমি তো জানই আমি বড্ড আবেগপ্রবণ আর শিল্পবোধও প্রখর। কিন্তু হায় আমার চরিত্রের একটা পরম দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য আমার কাণ্ডজ্ঞান তাতে বাদ সাধল!—সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে আমাকে আটকে দিল, সেই মুহূর্তটি আমার ফসকে গেল! কারণটা তাহলে কী?—সেই মুহূর্তে আমি মনে মনে ভাবলাম—কী হতে পারত আমার 'হৌজ়্যান্যা' উচ্চারণের পর? তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সব কিছু নিভে যেত, কোনো রকম ঘটনাই ঘটতে পারত না। তাই একমাত্র কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যের খাতিরে এবং সমাজে আমার যা স্থান তা বিবেচনা করে অত ভালো একটা মুহূর্তকে দাবিয়ে দিয়ে আমি আমার নষ্টামি নিয়েই থেকে যেতে বাধ্য হলাম। সুকৃতির সমস্ত

কৃতিত্বটাই কেউ একজন নিজের জন্য তুলে রাখে, আমার ভাগ্যে থেকে যায় শুধুই যত নোংরামি। কিন্তু উঞ্ছবৃত্তিধারী ঠক জোচ্চরের জীবনে যে সম্মান জোটে আমি তাতে ঈর্ষা বোধ করি না। আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই। জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র আমারই কপালে কেন এমন দুর্ভাগ্য যে শিষ্টজনেরা সকলে আমাকে শাপশাপান্ত করবে, এমনকি আমাকে বুটজুতোর লাথি মারবে? কেন না আমি দেখেছি শরীরী মূর্তি ধারণ করার পর কোনো কোনো সময় আমার এমন দশা ঘটেছে। আমি অবশ্যই জানি যে এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে, কিন্তু সেই রহস্য আমাকে কেউ কোনোমতেই খুলে বলতে চায় না, এই কারণেই যে তাহলে ব্যাপারটা কী ধরে ফেলার পর আমি হয়তো 'হোজ়ান্যা' বলে হেঁকে উঠব, আর তখন, তৎক্ষণাৎ যে অপরিহার্য বিয়োগ জিনিসটা ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বিশ্বচরাচরব্যাপী শুরু হয়ে যাবে শুভ বুদ্ধির রাজত্ব, সেই সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, সব কিছুর অবসান—এমনকি সমস্ত পত্রপত্রিকারও, কেন না কেই বা তখন সেগুলোর গ্রাহক হতে যাবে? আমি ঠিক জানি, আমি শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাট করে ফেলব, আমিও আমার সেই দশ লক্ষের চতুর্ঘাত পর্যন্ত যাব, গোপন রহস্যটা জানব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না ঘটছে ততক্ষণ আমি ম্রিয়মাণ হয়ে থাকছি, মন শক্ত করে পালন করে যাচ্ছি আমার নির্ধারিত কর্ম—একজনকে বাঁচানোর জন্য হাজার হাজার জীবন ধ্বংস করছি। এই ধর না কেন, জোব্ -এর কথা, যাকে নিয়ে সেই কোনো কালে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে জ্বালাতন করা হয়েছিল। মাত্র একজন সাধুপুরুষ জোব্‌কে পেতে গিয়ে কত আত্মাকে নষ্ট করতে হয়েছে, কত সততার খ্যাতিকেই না কালিমালিপ্ত করতে হয়েছে! না, রহস্য যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত না হচ্ছে ততদিন আমার কাছে থাকছে দুটো সত্য একটা ওখানকার, ওদের সত্য যা এখনও আমার কাছে একেবারে অজানা, অন্যটা আমার। আর এটাও জানা নেই যে কোন্‌টা বেশি খাঁটি হবে। কী হল, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

"ঘুমোতে পারলে তো হতই!" ক্রুদ্ধকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল ইভান। "আমার চরিত্রের মধ্যে যত নির্বুদ্ধিতা আছে, যা আজ বহুকাল হল আমি ফেলে এসেছি, মনে মনে রোমন্থন করে ছিবড়ের মতোই ফেলে দিয়েছি সেগুলো তুমি তুলে এনে আমাকেই আবার এনে দিচ্ছ—যেন এটা কোনো সংবাদ!"

"এতেও সন্তুষ্ট করা গেল না! আমি তো এমনও ভেবেছিলাম যে আমি সাহিত্য ধরনের বিবরণ দিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করে দেব। ওই যে ঊর্ধ্বাকাশে যে 'হোজ়্যান্যা' ধ্বনি সেটা কিন্তু যাই বল মন্দ হয় নি—তাই না? তাহলে এখন কেন a la Heine—হাইনের কায়দায় এই বিদ্রূপের সুর, অ্যাঁ? সত্যি কিনা?"

'নাঃ আমি কস্মিনকালে অমন পা-চাটা ছিলাম না! তাহলে কী করে আমার আত্মা তোমার মতো একটা পা-চাটা পয়দা করতে পারল?

"ওহে বন্ধু, আমি পরম মনোমুগ্ধকর, অতি আকর্ষণীয় অভিজাত রুশ সন্তানকে

জানতাম। চিন্তাশীল যুবক, শিল্প ও সাহিত্যের বড়ো ভক্ত, 'মহাবিচারক' নামে প্রতিশ্রুত এক আখ্যানকাব্যের কবি। আমি শুধু তার কথাই ভাবছি।"

"আমি তোমাকে নিষেধ করছি 'মহাবিচারকের' কথা বলতে", লজ্জায় লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ইভান।

"কিন্তু একটা 'ভূতাত্ত্বিক ওলটপালট' তো বটে? মনে আছে? সে এক কাব্য!"

"চুপ কর, নইলে খুন করব তোমাকে!"

"আমাকে খুন করবে বলছ? না, মাফ কর, আমি শেষ পর্যন্ত বলবই। আমি যে এখানে এসেছি সে তো এই তৃপ্তিটুকু দিয়ে নিজেকে আপ্যায়িত করতেই। আহা, জীবন তৃষ্ণায় কাতর, শিহরিত, উদগ্র স্বভাবের, আমার যুবক বন্ধুদের স্বপ্ন আমার কী ভালোই যে লাগে! গত বসন্তকালে যখন তুমি এখানে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলে তখন মনে মনে ভেবেছিলে ওখানে নতুন মানুষেরা আছে, তারা ঠিক করেছে সব কিছু ধ্বংস করে নরমাংস দিয়ে শুরু করবে। যত মূর্খের দল! আমার পরামর্শ নিতে এলো না! আমার মতে, কিছুই ধ্বংস করার দরকার নেই, শুধু যেটা দরকার তা হল মানুষের মাথার মধ্যে ঈশ্বরের যে ধারণাটি আছে তা ধ্বংস করা—শুরু করতে হলে এটা দিয়েই শুরু করা দরকার! ওহে অন্ধের দল, তোমরা কিছুই বোঝ না—এখান থেকে, ঠিক এখান থেকেই শুরু করা উচিত। মানবজাতির ভেতরে থেকে একে একে প্রতি জনে যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করবে—এবং আমার বিশ্বাস, এই পর্বটা ভূতাত্ত্বিক যুগের সমান্তরালে সংঘটিত হবে—ঠিক তখনই আপনা আপনি, নরমাংস ভক্ষণ ছাড়াই জগৎ সম্পর্কে আগেকার সমস্ত ধ্যানধারণা, আর বড়ো কথা, আগেকার সমস্ত নীতিবোধ ধসে পড়বে, সব নতুন করে শুরু হবে। জীবন যা যা দিতে পারে সব গ্রহণ করার জন্য মানুষ সম্মিলিত হবে, কিন্তু সে সব অবশ্যই হবে একমাত্র এই ইহজগতের সুখ আর আনন্দের জন্য। এক ঐশ্বরিক, দানবীয় গর্বের বোধ মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলবে, মানুষ সাক্ষাৎ নররূপী ঈশ্বর হয়ে উঠবে। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রকৃতির ওপর জয়লাভ করবে, তার সে জয়ের আর কোন সীমাপরিসীমা থাকবে না, আর তারই পরিণামে মানুষ প্রতি নিয়ত এত বিপুল আনন্দ উপভোগ করবে যা তার স্বর্গসুখ উপভোগের আগেকার সমস্ত ধ্যান ধারণাকে বদলে দেবে। প্রত্যেকেই জানবে যে সে মরণশীল, তার পুনরুত্থান ঘটবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মতো মাথা উঁচু করে, শান্ত ভাবে মৃত্যুকে বরণ করবে। তার অহংকার তাকে শেখাবে যে জীবন ক্ষণিকের বলে অসন্তোষ প্রকাশ করার কিছু নেই, সে তখন অমনিতেই, কোনো রকম পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই তার ভাইকে ভালোবাসবে। প্রেম শুধু জীবনের ক্ষণটিকেই ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু জীবনের ক্ষণিকতার এই যে চেতনা এটাই আবার তার বহ্নিশিখাকে ততটাই তীব্র করে তুলবে যেমন তীব্র হয়ে উঠে জীবন এর

আগে মরণোত্তর ও শাশ্বত আকুতিতে ছড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। ইত্যাদি ইত্যাদি, এই রকম সব আর কি। চমৎকার!"

ইভান দু হাতে কান চেপে ধরে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। কণ্ঠস্বর বলে চলল

"এখন প্রশ্নটা এই যে আমার খুদে চিন্তাশীল মানুষটি ভেবে দেখেছে কি এমন একটা কালের সূচনা কখনও সম্ভব কিনা? যদি সম্ভব হয় তাহলে সবের নিষ্পত্তি হয়ে গেল, মানবজাতির চিরকালের জন্য স্থিতি হল। কিন্তু মানুষের বদ্ধমূল নির্বুদ্ধিতার কারণে যেহেতু অন্তত আরও হাজার বছরেও এটা হবার নয় তাই এই সত্য সম্পর্কে আজও যারা সচেতন এমন যে-কোনো মানুষেরই নতুন মূলনীতিতে তার যেমন খুশি সেই ভাবে জীবন গড়ে তোলার সম্পূর্ণ বৈধ অধিকার আছে। এই অর্থে তার কাছে 'সবই বৈধ'। শুধু তা-ই নয়, এমনকি সেই সময় যদি কখনও না-ও আসে, তো যা-ই হোক না কেন, যেহেতু ঈশ্বর ও অমরত্ব নেই তাই নতুন মানুষের পক্ষে নররূপী ঈশ্বর হয়ে ওঠা বৈধ—এমনকি সমগ্র বিশ্বচরাচরে সে যদি একমাত্র একজনও হয়। আর বলাই বাহুল্য তেমন প্রয়োজন হলে নতুন পদমর্যাদার জেরে, হাল্কা মনে দাসমনোভাবাপন্ন পূর্বতন মানুষের আগেকার যে কোনও রকম নৈতিক সীমানা লঙ্ঘন করার বৈধ অধিকারও তার আছে। ঈশ্বরের জন্য কোনও আইন নেই! ঈশ্বর যেখানে পা রাখবেন সেই স্থানটাই পুণ্যস্থান! আমি যেখানে পা রাখব সেটা তৎক্ষণাৎ হয়ে দাঁড়াবে অগ্রবর্তী স্থান 'সব বৈধ'—ব্যস্, চুকে গেল! এ সবই ভারি চমৎকার। শুধু একটাই কথা—যদি ঠক জোচ্চোরিই করতে চাও তার জন্য আবার নৈতিক অনুমোদন কেন? তা-ই তো মনে হয়। কিন্তু আমাদের আধুনিক রুশ মানুষই এই রকম—অনুমোদন ছাড়া ঠক জোচ্চোরি করার জন্য পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারে না। সত্যকে তারা এতই ভালোবাসে!

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল আগন্তুক তার বাকচাতুর্যের আবেগে ভেসে গিয়ে কথা বলে যাচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর চড়ামাত্রায় উঠে যাচ্ছিল, কৌতুকের দৃষ্টিতে সে গৃহকর্তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু সে তার কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। ইভান আচমকা খপ করে টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে সজোরে বক্তার দিকে ছুড়ে দিল।

"Ah, mais c'est bête enfin!"* সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে আঙুল দিয়ে গা থেকে চায়ের ছিটে ঝাড়তে ঝাড়তে বক্তা বলে উঠল। "ও, লুটারের কালির দোয়াতের কথা মনে পড়ল বুঝি!" নিজে আমাকে স্বপ্ন বলে মনে করে, আবার স্বপ্নের ওপরই কিনা গ্লাস ছোড়া হচ্ছে! এটা কিন্তু মেয়েলি ব্যাপার হয়ে

---

* আঃ হা, কিন্তু এটা যে শেষ পর্যন্ত একটা বোকামি! (ফরাসি)

গেল। হুঁ হুঁ আমি ঠিক এই সন্দেহই করছিলাম : তুমি কান বন্ধ করার ভান করেছিলে মাত্র, আসলে সব শুনছিলে

এমন সময় বাইরে থেকে জানলার ফ্রেমের ওপর জোরে জোরে বারবার টোকা মারার আওয়াজ শোনা গেল। ইভান ফিয়োদরভিচ চট করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"শুনছ? বরং খুলেই দাও", আগন্তুক চেঁচিয়ে বলল, "তোমার ভাই আলিয়োশা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং রীতিমতো কৌতূহল উদ্রেক করার মতো একটা বার্তা নিয়ে এসেছে। আমি বলছি তোমাকে!"

"চুপ কর, ফন্দিবাজ। তুমি বলার আগেই আমি জানতাম ওটা আলিয়োশা। আমি মনে মনে টের পেয়েছিলাম যে ও আসবে, আর বলাই বাহুল্য অমনি অমনি নয়, অবশ্যই কোনো 'বার্তা' নিয়ে! " উদ্‌ভ্রান্তের মতো ইভান বলে উঠল।

"খোল, আরে খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে এসো। বাইরে বরফঝড় বইছে। হাজার হোক, তোমার ভাই। Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est a ne pas mettre un chien dehors..."*

জানলায় টোকা পড়া চলতেই লাগল। ইভান জানলার দিকে ছুটে যেতে যাচ্ছিল, কিন্তু কীসে যেন হঠাৎ তার হাত পা বাঁধা পড়ে গেল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে যেন তার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা। জানলায় ঠকঠক আওয়াজটা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে আরও বেশি জোরাল হয়ে উঠল। অবশেষে হঠাৎই বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল। ইভান ফিয়োদরভিচ সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে চারধারে তাকাল। দুটো মোমবাতিই নিভু নিভু প্রায়। যে গ্লাসটা সে এইমাত্র তার অতিথির দিকে ছুড়ে দিয়েছিল সেটা দিব্যি তার সামনে টেবিলের ওপর আছে উলটো দিকের সোফাটাতে কেউ নেই। জানলার ওপর যদিও নাছোড়বান্দার মতো করাঘাত চলছিল তবু এখন আর তেমন জোরে নয়, যেমনটি এই মাত্র স্বপ্নে তার মনে হয়েছিল। বরং আওয়াজটা বেশ সংযত।

"এটা স্বপ্ন নয়! না, হলফ করে বলতে পারি স্বপ্ন ছিল না, এ সবই এইমাত্র ঘটেছিল!" চিৎকার করে এই কথা বলে গিয়ে ইভান ফিয়োদরভিচ্ ছুটে গিয়ে জানলার সামান্য একটু অংশ ফাঁক করল।

"আলিয়োশা, আমি না তোকে আসতে বারণ করেছিলাম!" ভাইয়ের ওপর সে খেঁকিয়ে উঠল। "যা বলার দুটো কথায় বল—কী চাই তোর? দুটো কথায়, শুনছিস?"

---

* আবহাওয়াটা কেমন জানা আছে কি মঁসিঅ্য? অমন আবহাওয়ায় একটা কুকুরকে পর্যন্ত রাস্তায় বের করা হয় না — (ফরাসি)

“এক ঘণ্টা আগে স্মের্দিকোভ্ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে”, আলিয়োশা বাইরে থেকে জবাব দিল।

“দেউড়ির কাছে চলে আয়, এখুনি তোকে দরজা খুলে দিচ্ছি”, এই বলে আলিয়োশাকে দরজা খুলে দিতে গেল ইভান।

## দশ

## ‘সে-ই একথা বলেছিল’

আলিয়োশা ঘরে ঢুকে ইভান ফিয়োদরভিচকে জানাল ঘণ্টাখানেকের কিছু আগে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না ছুটতে ছুটতে তার বাসায় এসে জানিয়ে গেছে যে স্মের্দিকোভ্ আত্মহত্যা করেছে। ‘ওর ঘরে ঢুকে সামোভারটা তুলে আনব বলে গেছি, দেখি দেয়ালের একটা গজালে ঝুলছে।’ আলিয়োশা যখন জিগ্‌গেস করল যথাস্থানে জানিয়েছে কি না, তার উত্তরে সে বলল কাউকে জানানো হয়নি, ‘সোজা ছুটতে ছুটতে আপনার কাছেই এলাম, সারা রাস্তা ছুটতে ছুটতে এসেছি।’ আলিয়োশা জানাল তার তখন পাগল-পাগল অবস্থা, সর্বাঙ্গ বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। তার সঙ্গে ছুটে তাদের কুটিরে এসে আলিয়োশা দেখতে পেল স্মের্দিকোভ্ তখনও ঝুলছে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা চিরকুট, তাতে লেখা আছে ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় ও আগ্রহে নিজের প্রাণনাশ করছি।’ চিরকুটটা যেমনকার তেমন টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে আলিয়োশা সোজা পুলিশের বড়কর্তার কাছে চলে গেল। তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। ‘সেখান থেকে সোজা তোমার কাছে আসছি’, ইভানের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আলিয়োশা শেষ পর্যন্ত জানাল। যতক্ষণ সে বিবরণ দিচ্ছিল সেই সময়ের মধ্যে সে তার মুখের ওপর থেকে একবারও দৃষ্টি সরিয়ে নেয়নি—মনে হচ্ছিল তার মুখের ভাবে সে যেন রীতিমতো স্তম্ভিত।

“দাদা”, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, “তুমি নিশ্চয় খুবই অসুস্থ। তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ, কিন্তু আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছ না।”

“ভালো যে তুই এসেছিস”, কেমন যেন চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে ইভান বলল এবং এমন ভাব করল যেন আলিয়োশার চিৎকার আদৌ তার কানে যায়নি। আমি কিন্তু জানতাম যে ও গলায় দড়ি দিয়েছে।’

“কার কাছ থেকে আবার?”

“জানি না, কার কাছ থেকে। কিন্তু আমি জানতাম। জানতাম কী? হ্যাঁ ও আমায় বলেছে। এই এখনও আমায় বলছিল ”

ইভান ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, কথা বলছিল সেই আগের মতোই চিন্তিত ভাবে এবং মাটির দিকে চোখ রেখে।

“কে সে?” প্রশ্ন করে আলিয়োশা নিজের অজান্তেই চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

"সে সরে পড়েছে।"

ইভান মাথা তুলে মৃদু হাসল।

"তোকে ভয় পেয়েছে, তোর মতন একটা শান্ত কপোতকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে! তুই হলি গিয়ে একটা খাঁটি 'দেবশিশু'। দাদা দ্‌মিত্রি তোকে 'দেবশিশুই' বলে। দেবশিশু  দেবদূততুল্য সেরাফদের বজ্রকণ্ঠের উল্লাস! সেরাফ কী? হয়তো একটা সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জ। কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জও হয়তো বা এক ধরনের রাসায়নিক অণু ছাড়া আর কিছুই নয়।  সিংহ আর সূর্যেরও একটা নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। জানিস না?"

"দাদা, বোসো!" আলিয়োশা ঘাবড়ে গিয়ে বলল। 'বোসো, ঈশ্বরের দোহাই, সোফায় গিয়ে বোসো। তুমি ভুল বকছ। বালিশে হেলান দিয়ে একটু শোও—হ্যাঁ, এই এরকম। তোয়ালে জলে ভিজিয়ে কপালে জলপটি লাগাব কী? কী বল? হয়তো তাতে একটু ভালো বোধ করবে?"

"দে, তোয়ালেই দে। এই যে এখানে চেয়ারের ওপর আছে। আমি এইমাত্র এখানে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।"

"এখানে নেই। ব্যস্ত হয়ো না। আমি জানি কোথায় আছে। এই তো এখানে", ঘরের অন্য একটা কোনায় ইভানের ড্রেসিং টেবিলের ধারে ব্যবহার না করা, দিব্যি ভাঁজ করা একটা পরিষ্কার তোয়ালে খুঁজে পেয়ে আলিয়োশা বলল।

ইভান অদ্ভুত ভাবে তোয়ালেটার দিকে তাকাল। মুহূর্তের মধ্যে যেন তার স্মৃতি ফিরে এলো।

"দাঁড়া, দাঁড়া!" সোফা ছেড়ে সামান্য উঠে দাঁড়াল ইভান। "ঘণ্টাখানেক আগে আমি ওই নতুন তোয়ালেটা ওখান থেকে নিয়েই জলে ভিজিয়েছিলাম। মাথায় পটি করে লাগিয়েছিলাম, তারপর এই ত এখানেই ছুড়ে ফেলেছিলাম।  কী করে শুকনো থাকল? আর কোনো তোয়ালে তো ছিল না!"

"বলছ কী? তুমি এই তোয়ালেটা মাথায় লাগিয়েছিলে?" আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

"শুধু তা-ই নয়, মাথায় জড়িয়ে এক ঘণ্টা আগে ঘরময় পায়চারি করে বেড়িয়েছি।  মোমবাতিগুলো অমন পুড়ে গেল কী করে? কটা বাজে?"

"বারোটা বাজতে চলল।"

"না, না, না!" ইভান হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "ওটা স্বপ্ন ছিল না! লোকটা এখানে ছিল, এই এখানে বসে ছিল, ওই যে ওই সোফাটায়। তুই যখন জানলায় ধাক্কা মারছিলি তখন আমি ওর দিকে একটা গ্লাস ছুড়ে মেরেছিলাম।  এই যে এটা। দাঁড়া, এর আগেও আমি ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু এই স্বপ্নটা স্বপ্ন নয়। এরকম আগেও ঘটেছে। ওরে আলিয়োশা, আমার আজকাল স্বপ্নদর্শন হয়, কিন্তু ও সব স্বপ্ন তো স্বপ্ন নয়, জাগর স্বপ্ন। আমি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, চোখে দেখছি, অথচ ঘুমোচ্ছি।

কিন্তু ও এখানে বসে ছিল, ও ছিল, ওই যে ওই সোফাটাতে বসে ছিল। ওটা ভীষণ বোকা রে আলিয়োশা, ভীষণ বোকা।” ইভান হঠাৎ হেসে উঠল, তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিল।

“কে বোকা? কার কথা তুমি বলছ দাদা?” আবার কাতরকণ্ঠে জিগ্‌গেস করল আলিয়োশা।

“শয়তান আমার কাছে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছে। দুবার এসেছিল, এমন কি প্রায় তিনবারই বলতে পারিস। সে আমাকে এই বলে ঠাট্টা করল যেন বজ্রবিদ্যুতে ঝলসানো ডানাওয়ালা সাক্ষাৎ শয়তান মনে না করে তাকে নেহাৎই একটা ছোটখাটো শয়তান ধরে নিয়ে আমি তার ওপর রেগে আছি। কিন্তু ও মিছে বলছে, ও আসল শয়তান নয়। একটা ভুঁইফোঁড়। স্রেফ একটা ওঁছা মার্কা ছোটখাটো শয়তান। স্নানঘরে যাতায়াত করে। ওকে ন্যাংটো করে দ্যাখ, নির্ঘাত খুঁজে পাবি সিনেমার কুকুরের লেজের মতো একটা লম্বা মোলায়েম লেজ—হাত দেড়েক লম্বা, ছাই-ছাই রঙের। আলিয়োশা, তোর শীত-শীত করছে। তুই ঠান্ডায় বরফের মধ্যে ছিলি। চা খাবি? কী বললি? জুড়িয়ে গেছে? বল তো বসাতে বলি। C'est à ne pas mettre un chien dehors'—অমন আবহাওয়ায় একটা কুকুরকে পর্যন্ত রাস্তায় বের করা হয় না

আলিয়োশা তাড়াতাড়ি হাত ধোয়ার স্ট্যান্ডের কাছে ছুটে গেল। তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিয়ে আরও একবার ইভানকে অনুনয় বিনয় করে বসাল। তার মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে দিল। নিজে তার পাশে গিয়ে বসল।

“এই তখন লিজা সম্পর্কে আমাকে কী যেন বলছিলি?” ইভান আবার কথা বলতে শুরু করে দিল। তাকে বড়ো বেশি কথায় পেয়ে বসেছিল। “লিজাকে আমার ভালো লাগে। আমি তোকে ওর সম্পর্কে কদর্য ধরনের কী যেন একটা বলেছিলাম। ওটা মিথ্যে কথা। আসলে ওকে আমার ভালোই লাগে। আমার ভয় হচ্ছে আগামীকাল কাতিয়ার কী হবে। ওটাই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় হচ্ছে। কাল ও আমাকে ঝেড়ে ফেলে দেবে, পায়ের তলায় পিষে মারবে। ওর ধারণা, আমি ওর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ঈর্ষা করে মিতিয়ার সর্বনাশ করতে যাচ্ছি! হ্যাঁ, ও এটাই ভাবছে! কিন্তু না, আদৌ তা নয়! কাল যা হবে সেটা ক্রুশ কাঠে বেঁধা, ফাঁসিকাঠ নয়। না, আমি গলায় দড়ি দেব না। জানিস কি তুই, আলিয়োশা, আমি কখনও নিজের প্রাণের মায়া ছাড়তে পারি না? সেটা কি আমার নীচতা থেকে? আমি কাপুরুষ নই, জীবনতৃষ্ণা থেকে! কী করে আমি জানলাম যে স্মের্দিকোভ্ গলায় দড়ি দিয়েছে? হ্যাঁ, সে তো ও-ই আমাকে বলেছে।...”

“তোমার কি তাহলে দৃঢ়বিশ্বাস যে এখানে কেউ একজন বসে ছিল?” আলিয়োশা জিগ্‌গেস করল।

“এই তো ওই সোফাটাতে, ওই কোনায়। তুই হলে ওকে তাড়িয়ে দিতিস।

তা তুই ওকে তাড়িয়ে দিয়েওছিস তুই আসার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। তোর মুখটাকে আমি ভালোবাসি রে আলিয়োশা। তুই কি জানতিস যে তোর মুখটা আমি ভালোবাসি? আর ওই যে ও—সে কিন্তু আমিই, আলিয়োশা। আমার যা কিছু হীনতা, নীচতা, যা কিছু ঘৃণা করার মতো—সব! হ্যাঁ, আমি একজন 'রোমান্টিক'। ও সেটা খেয়াল করেছে, যদিও এটাও একটা কুৎসা। ডাহা মূর্খ, কিন্তু ওখানেই তো ওর সুবিধে। ধূর্ত, মহা ধূর্ত, জানত কী করে আমাকে খেপিয়ে তোলা যায়। আমি ওর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি এই বলে আমাকে সমানে জ্বালাতন করে চলল, আর এই ভাবে ওর কথাগুলো শুনতে আমাকে বাধ্য করল। এমন ভাবে আমাকে ধোঁকা দিল যেন আমি একটা বাচ্চা ছেলে। ও অবশ্য আমাকে আমার সম্পর্কে অনেক সত্যি কথাও বলেছে। আমি কখনও নিজেকে এটা বলতে পারতাম না। জানিস আলিয়োশা " ভীষণ রকম সিরিয়াস হয়ে এবং বিষয়টা যেন একান্তই গোপনীয় অনেকটা এই সুরে ইভান যোগ করল, আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ও যেন আমি না হয়ে সত্যি সত্যি ও-ই হয়!"

"ও ত দেখছি তোমার জেরবার করে দিয়েছে", সমবেদনার দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়ে আলিয়োশা বলল।

"আমাকে উত্যক্ত করে ছেড়েছে! জানিস, কী কৌশলে করেছে, কী কৌশলেই না করেছে! 'বিবেক! বিবেক কী? আমি নিজেই তা তৈরি করি। কেন আমি তার তাড়নায় কষ্ট পাচ্ছি? অভ্যাসবশত। সাত হাজার বছর ধরে বিশ্বব্যাপী মানবজাতির যে অভ্যাস সেই অভ্যাসবশত। তাই বলি কি, অভ্যাসটা ছাড়া যাক—তা হলে আমরাই ঈশ্বর হব।' একথা ও বলেছিল, ও বলেছিল!"

"তুমি বল নি তো? তুমি বলনি?" স্পষ্ট দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়ে অসংযত ভাবে চেঁচিয়ে বলল আলিয়োশা। "তা মরুক গে ওটা, ছেড়ে দাও ওর কথা, ওকে ভুলে যাও! এখন তুমি যার জন্য এত শাপশাপান্ত করছ সে সব আপদ বালাই নিয়ে বিদেয় হোক গে ওটা! আর যেন কখনও না আসে!"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওটা একটা বজ্জাত। আমাকে নিয়ে হেসেছে। ওর স্পর্ধাটা দ্যাখ, আলিয়োশা!" অপমানের জ্বালায় গা ঝাঁকুনি দিয়ে ইভান বলল। কিন্তু ও আমাকে বদনাম দিয়েছে, অনেক বিষয়ে আমার বদনাম করেছে। আমার মুখের ওপর আমার নামে মিথ্যে করে আমাকেই বলেছে। বলেছে, 'আহা তুমি একটা মহৎ কাজ করে বিরাট কীর্তি স্থাপন করতে চলেছ! তুমি ঘোষণা করবে তুমি তোমার বাবাকে খুন করেছ, তোমার প্ররোচনাতেই ভৃত্য তোমার বাবাকে খুন করেছে

"দাদা," আলিয়োশা তাকে বাধা দিয়ে বলল, "নিজেকে সংযত কর এটা সত্যি নয়! বাবাকে খুন তুমি করনি!"

"সেটা ও বলছে, ও, আর ও সেটা জানে। 'তুমি একটা সৎকাজ করে মহৎ কীর্তি স্থাপন করতে চলেছ। অথচ সৎকাজে তো তোমার বিশ্বাসই নেই। এই জন্যই

তো তোমার এত রাগ, তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ। ঠিক এই কারণেই তুমি এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ।’ একথা সে আমার সম্পর্কে আমাকে বলেছিল। ও জানে কী বলছে

“এটা তুমি বলছ, ও নয়!” ক্ষুব্ধ স্বরে আলিয়োশা বলল। “আর বলছ তুমি অসুস্থতার ঘোরে, বিকারের ঘোরে, নিজেকে কষ্ট দিয়ে!”

“না, ও জানে কী বলছে। বলছে, তুমি যাচ্ছ তোমার সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। তুমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলবে ‘আমিই খুন করেছি। তোমরা অমন আতঙ্কে কুঁকড়ে যাচ্ছ কেন? তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। তোমাদের মতামতকে আমি তাচ্ছিল্য করি, তোমাদের আতঙ্ককে তাচ্ছিল্য করি।’ একথা ও বলছে আমার সম্পর্কে। হঠাৎ বলল কি, ‘জান, তোমার কী ইচ্ছে করছে? ইচ্ছে করছে যেন লোকে তোমাকে প্রশংসা করে, প্রশংসা করে বলে দেখ, দেখ, খুনি, অথচ কী উদার ওর মন! ভাইকে বাঁচানোর ইচ্ছে, তাই স্বীকারোক্তি করল!’ তাই বলছিলাম কি, এটা কিন্তু মিথ্যে আলিয়োশা!” হঠাৎ চিৎকার করে বলল ইভান। দপ্ করে জ্বলে উঠল তার দু চোখ। “আমি চাই না যে ওই ছোটলোকগুলো আমার প্রশংসা করে! ও মিথ্যে কথা বলেছে আলিয়োশা, মিথ্যে কথা বলেছে—এটা আমি তোকে হলফ করে বলতে পারি! এই কারণে আমি এই গ্লাসটা ওকে ছুড়ে মেরেছিলাম। ওর ওই কুৎসিত মুখটার ওপর ওটা আছড়ে পড়েছিল।”

“শান্ত হও দাদা, আর নয়!” আলিয়োশা অনুনয় করে বলল।

“না, মানতেই হবে মানুষকে যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা ওর আছে, ও নিষ্ঠুর”, আলিয়োশার কথায় কান না দিয়ে ইভান বলে চলল। কেন যে সে আসে সেটা আমি সব সময় আগে থাকতে উপলব্ধি করতে পারতাম। আমাকে বলল, ‘সে তুমি তোমার অহংকারবশত যাও আর যাই কর, তোমার মনে মনে কিন্তু এই আশা ছিল যে স্মের্দিকোভ্ ঠিক ধরা পড়ে যাবে, তাকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, মিতিয়া ছাড়া পেয়ে যাবে, আর তোমাকে শুধুমাত্র *নৈতিক কারণে* নিন্দা করা হবে ’ শুনছিস? ও তখন হাসল! বলল, ‘কেউ কেউ আবার তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। কিন্তু স্মের্দিকোভ্ তো এখন মারা গেল, গলায় দড়ি দিয়ে মরল, এখন আদালতে কে-ই বা একমাত্র তোমাকে বিশ্বাস করবে? কিন্তু তুমি যাচ্ছ, তাও তুমি যাচ্ছ, যাই হোক না কেন তুমি যাবে, তুমি ঠিক করেছ যে তুমি যাবে। এরপরও তুমি কেন যাচ্ছ বল তো?’ কী ভয়ঙ্কর আলিয়োশা! এমন ধরনের প্রশ্ন আমি বরদাস্ত করতে পারি না। কার সাহস আছে আমাকে এমন প্রশ্ন করে!”

ভয়ে আতঙ্কে আলিয়োশার মনটা দমে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইভানের বোধশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে এই আশায়, তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, “কিন্তু দাদা, আমি আসার আগে সে কী করে তোমাকে স্মের্দিকোভের মারা যাবার কথা বলতে

পারল? তখনও তো কেউ সেটা জানতই না, তাছাড়া কেউ যে জানতে পারবে সে সময়ও তো ছিল না।"

"ও বলেছিল", কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে ইভান দৃঢ়স্বরে বলল। "যদি জানতে চাস তো বলি, ঠিক এটাই সে বলেছিল। বলেছিল, 'তুমি যদি সততায় বিশ্বাস কর সে তো ভালোই—লোকে আমাকে বিশ্বাস না হয় না-ই করল, কিন্তু আমি তো নীতির খাতিরে চলছি। কিন্তু তুমি হলে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মতো একটা ছোটখাটো শুয়োরের বাচ্চা, সততা দিয়ে তোমার কী হবে? কেন বাপু তুমি অত টানা হিঁচড়ে করে ও দিকে যাচ্ছ, যখন তোমার আত্মবলিদানে কারোরই কোনো কাজ হল না? আর তার কারণ এই যে তুমি নিজেই জান না কীসের জন্য যাচ্ছ! ওঃ, কীসের জন্য যে তুমি যাচ্ছ তোমার নিজেকে তা জানতে গেলে অনেক কিছু তোমাকে দিতে হত! ভেবেছ কি মনস্থির করে ফেলেছ? তুমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারনি। সারা রাত তুমি বসে থাকবে, বসে বসে ভাববে যাব কি যাব না। কিন্তু তুমি, যাই হোক না কেন, যাবে। জান যে যাবে, তুমি নিজেই জান যে তুমি যা-ই স্থির কর না কেন, সমাধানটা কিন্তু আর তোমার ওপর নির্ভর করছে না। যাবে, কেন না না যাবার সাহস তোমার নেই। কেন সাহস নেই?—তা সেটা তুমি নিজেই অনুমান কর। এই রইল তোমার কাছে ধাঁধা!' এরপরই উঠে দাঁড়াল, চলে গেল। তুই এলি ও-ও চলে গেল। ও আমাকে কাপুরুষ বলেছে রে আলিয়োশা! Le mot de l'enigme* এই যে আমি একটা কাপুরুষ! 'মাটির ঊর্ধ্বে ওঠা এরকম ইগল পাখিদের কাজ নয়।' এ কথা ও যোগ করেছিল, ও যোগ করেছিল। আর স্মের্দিকোভ্‌ও এটাই বলেছিল। ওকে খুন করা দরকার। কাতিয়া আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, আমি আজ এক মাস হল দেখে আসছি। আর লিজা—সেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছে! 'তুমি যাচ্ছ এই কারণে যে লোকে তোমাকে প্রশংসা করবে'—এটা ডাহা মিথ্যে কথা! তুইও আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিস, আলিয়োশা। এখন আমি আবার ঘৃণা করতে শুরু করেছি তোকে। আমি ঘৃণা করি ওই পাষণ্ডটাকে, ওই পাষণ্ডটাকে আমি ঘৃণা করি। পাষণ্ডটাকে উদ্ধার করতে আমি চাই নে। ওটা ওই নির্বাসনে ঘানি ঠেলে পচে মরুক! হুঁঃ, আবার স্তোত্র গাওয়া হচ্ছে! না, কাল আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব, ওদের সকলের মুখের ওপর থুতু ফেলে চলে আসব!"

সে উন্মত্তপ্রায় হয়ে জড়ানো তোয়ালেটা মাথা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিল, আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিল। আলিয়োশার মনে পড়ে গেল তার কিছুকাল আগেকার কথাগুলি 'আমি যেন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছি। হাঁটাচলা করছি, কথাবার্তা বলছি, দেখতে পাচ্ছি, অথচ ঘুমোচ্ছি।' এখনও যেন ঠিক সেটাই

---

* প্রহেলিকার সমাধান — (ফরাসি)

ঘটতে চলেছে। আলিয়োশা তার কাছ থেকে নড়ল না। একবার তার মনের মধ্যে এক ঝলক এমন একটা চিন্তার উদয় হয়েছিল যে এক ছুটে গিয়ে একজন ডাক্তারকে ডেকে আনে, কিন্তু দাদাকে একা ফেলে রেখে যেতে তার ভয় হল, এমন কেউই ছিল না যার ওপর তার ভার দিয়ে যাওয়া যায়। এদিকে ইভান শেষ কালে অল্প অল্প করে একেবারেই সংজ্ঞা হারাতে শুরু করেছে। সে এখনও কথা চালিয়ে যাচ্ছে বটে, অনর্গল বকেও চলেছে, কিন্তু এখন তার কথা রীতিমতো অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি কথাগুলি ভালোমতো উচ্চারণও করতে পারছে না। এক সময় হঠাৎ সে ভীষণভাবে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আলিয়োশা সময় মতো তাকে ধরে ফেলল। আলিয়োশা তাকে ধরে ধরে শয্যার কাছে নিয়ে গেলে ইভান তাকে বাধা দিল না। আলিয়োশা কোনো মতে তার জামাকাপড় খুলে তাকে শুইয়ে দিল। নিজে সে আরও ঘণ্টা দুয়েক তার শিয়রে বসে কাটাল। রোগী নিথর হয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল, শান্ত ভাবে সমান তালে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আলিয়েশা নিজেও একটা বালিশ নিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই সোফাতে শুয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ার মুখে সে মিতিয়ার জন্য এবং ইভানের জন্য প্রার্থনা করল। ইভানের অসুস্থতা তার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠতে লাগল। 'একটা অহমিকাপূর্ণ সঙ্কল্পের যাতনা, গভীর বিবেকবুদ্ধি!' যাঁর ওপর তার কোনও আস্থা ছিল না সেই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সত্যের উপলব্ধি তার মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চলেছে, কিন্তু এখনও সে হার মানতে চাইছে না। আলিয়োশা ততক্ষণে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে, এমন সময় তার মাথার ভেতরে একটা চিন্তা উঁকি মারল। 'হ্যাঁ', সে মনে মনে ভাবল, 'হ্যাঁ, এটা ঠিক যে স্মের্দিকোভ্ যখন মারা গেছে তখন ইভানের এজাহারে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ইভান এজাহার দিতে যাবে!' আলিয়োশা মৃদু হাসল। 'ঈশ্বরের জয় হবে!' সে ভাবল। 'হয় সত্যের আলোকে ওর অভ্যুত্থান ঘটবে, নয়তো  নয়তো যাতে ওর বিশ্বাস ছিল না সেই কাজই করেছে বলে নিজের ওপর এবং অন্যদের ওপরও প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে, ঘৃণা ও বিদ্বেষের জ্বালায় ও ধ্বংস হয়ে যাবে', তিক্ত উপলব্ধি নিয়ে মনে মনে এই কথা যোগ করে আবারও ইভানের জন্য প্রার্থনা করল আলিয়োশা।

The Online Library of Bangla Books

# একাদশ অধ্যায়
# ভুল বিচার

## এক
## সর্বনাশা দিন

আমার বর্ণিত এই সমস্ত ঘটনার পর, পর দিন সকাল দশটার সময় আমাদের জেলা আদালতে অধিবেশন বসতে সেখানে দ্‌মিত্রি কারামাজভের মামলার শুনানি শুরু হল।

আগে থাকতে বলে রাখি এবং জোর দিয়েই বলছি, আমি আদৌ এমন মনে করি না যে আদালতে যা যা ঘটেছিল তার সব কিছু বলার মতো ক্ষমতা আমার আছে—শুধু যথাযথ পূর্ণাঙ্গ রূপে কেন, এমনকি যথাযথ পরম্পরাক্রমেও নয়। আমার কেবলই মনে হয় সব কিছু মনে করে সেগুলির যথারীতি ব্যাখ্যা দিতে গেলে গোটা একটা বই লিখতে হয়, আর তার কলেবরও বিরাট হয়ে পড়বে। তাই বলছিলাম কি, ব্যক্তিগত ভাবে যা যা আমাকে চমৎকৃত করেছিল এবং বিশেষ করে যে-সমস্ত ঘটনা আমি মনে রাখতে পেরেছি আমার বিবরণে আমি যদি কেবল সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে কেউ যেন আমার অপরাধ না নেন। এমনও হতে পারে যে আমি কোনো গৌণ বিষয়কে বড়ো বেশি গুরুত্ব দিয়ে মুখ্য বিষয় বলে ধরে নিয়েছি, এমনকি বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো ঘটনার অবশ্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে একেবারে বাদ দিয়ে চলে গেছি। সে যাই হোক না কেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমা প্রার্থনা করতে না যাওয়াই বরং ভালো। আমি যেমন পারি তেমনি বর্ণনা করব, পাঠক নিজেও বুঝতে পারবেন আমি আমার সাধ্যমতো যা করার তাই করেছি।

আদালত কক্ষে ঢোকার আগে সেদিন বিশেষ করে যা আমাকে বিস্মিত করেছিল প্রথমেই আমি তার উল্লেখ করব। প্রসঙ্গত, পরে দেখা গিয়েছিল শুধু আমাকে নয়, সকলকেই তা বিস্মিত করেছিল। বিষয়টা এই যে আমরা সকলে জানতাম যে এই মামলাটি বড়ো বেশি সংখ্যক মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। মামলা কবে যে শুরু হবে এই ভেবে সকলে অধীর আগ্রহে ছটফট করছিল। আমাদের স্থানীয় মহলে পুরো দু মাস ধরে এই নিয়ে অনেক কথা, অনেক জল্পনা কল্পনা, উৎসাহ উদ্দীপনা চলতে থাকে। সকলে এটাও জানত যে এই মামলার কথা রাশিয়ার সর্বত্র চাওড় হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও তা যে এত বেশি মাত্রায় আগ্রহোদ্দীপক ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং শুধু আমাদের কেন, দেশের সর্বত্র, সকলকে, প্রতিটি মানুষকে

নাড়া দিয়েছিল এ সম্পর্কে কারও যে কোনো ধারণা ছিল না সে দিন আদালতে বিচারের সময়ই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেদিন এখানে শুধু আমাদের জেলাশহর থেকেই নয়, রাশিয়ার অন্যান্য শহর থেকে—সর্বোপরি মস্কো ও পেতের্বুর্গ থেকেও আগন্তুকদের সমাগম ঘটে। এদের মধ্যে আইনজ্ঞরা ছিলেন, এমনকি বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মহিলারাও ছিলেন। প্রবেশপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। পুরুষ দর্শকদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিশেষ সম্মানের অধিকারী বিচারকমন্ডলীর টেবিলের ঠিক পিছনে তাদের জন্য একটি স্থানও সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অলঙ্কৃত পুরো এক সারি হাতলওয়ালা চেয়ারের যে সমাবেশ ঘটেছিল ইতিপূর্বে কখনও এখানে তার অনুমোদন মেলেনি। স্থানীয় এবং বহিরাগত মিলে বিশেষভাবে মহিলাদের সংখ্যাও কম ছিল না, আমার ধারণা, সমবেত জনমণ্ডলীর অর্ধেকের কম হবে না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত আইনজীবী এসেছিলেন একমাত্র তাঁদেরই সংখ্যা এত বেশি ছিল যে আদালতের কর্মচারীরা বুঝে উঠতে পারছিল না কোথায় তাদের জায়গা দেওয়া যেতে পারে, যেহেতু সব প্রবেশপত্রই অনেক অনুরোধ উপরোধ করে লোকে ইতিমধ্যে আদায় করে নিয়েছে, সেগুলি অনেক আগে নিঃশেষে বিলি করা হয়ে গেছে। আমি নিজেও দেখলাম হলঘরের শেষ প্রান্তে প্ল্যাটফর্মের পেছনে তাড়াহুড়ো করে সাময়িক ভাবে একটা বিশেষ পার্টিশনের আড়াল দিয়ে তার ভেতরে সমাগত আইনজীবীদের সকলের স্থান করে দেওয়া হয়েছে। স্থান সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে পার্টিশনের আড়ালের ভেতর থেকে চেয়ারগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এর ফলে আইনজীবীরা সেখানে যে অন্তত দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে সেজন্য তারা নিজেদের পরম সৌভাগ্যবানই জ্ঞান করছিল। এখানে যারা ভিড় করে জড় হয়েছিল তারা সবাই চাপাচাপি করে জড়সড়ো হয়ে কাঁধে কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে আগাগোড়া মামলার শুনানি শুনে গেল।

মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ—বিশেষত যারা বাইরে থেকে এসেছে তারা জমকালো সাজগোজ করে হলঘরের গ্যালারিতে উপস্থিত হয়েছিল, তবে অধিকাংশ মহিলাই তাদের বেশভূষার কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল। তাদের চোখেমুখে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, ব্যাকুল এবং প্রায় অসুস্থ ধরনের একটা কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠেছিল। হলঘরে সমবেত জনসমাজের মধ্যে লক্ষ করার মতো একটা বৈশিষ্ট্য, যার অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় এবং যেটা পরে বহু পর্যবেক্ষকের দ্বারা সমর্থিতও বটে, তা এই যে মহিলারা প্রায় সকলেই—অন্ততপক্ষে তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা অংশ তো বটেই—মিতিয়ার পক্ষে এবং তাকে বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত করার অনুকূলে ছিল। হয়তো প্রধানত এই কারণে যে তার সম্পর্কে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে সে নারীহৃদয় জয়ে পারঙ্গম। এটাও জানা ছিল

প্রতিদ্বন্দ্বিনী দুজন স্ত্রীলোক এই মামলা উপলক্ষ্যে আদালতে হাজির হবে। তাদের একজন, অর্থাৎ কাতেরিনা ইভানভ্না, বিশেষ ভাবে সকলের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সম্পর্কে লোকে অতি বিচিত্র ধরনের বহু কথা বলাবলি করত, মিতিয়া যে অপরাধী তা সত্ত্বেও তার প্রতি কাতেরিনার যে এত আবেগ তাই নিয়েও অনেক মুখরোচক গল্প চলত। আমাদের শহরে প্রায় কারও বাড়িতেই সে দেখাসাক্ষাৎ করতে যেত না। তার অহংকার এবং 'অভিজাত মহলে তার যোগাযোগের' কথা বিশেষ ভাবে লোকের আলোচনার বিষয় ছিল। তারা বলাবলি করতে লাগল কাতেরিনা নাকি ঠিক করেছে যে সরকারের কাছে সে আবেদন জানাবে যেন অপরাধী মিতিয়ার সঙ্গিনী হয়ে তাকে মিতিয়ার সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের স্থান সাইবেরিয়াতে যাবার এবং সেখানে খনির গর্ভে কোথাও মিতিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কাতেরিনা ইভানভ্নার প্রতিদ্বন্দ্বিনী গ্রুশেন্কার আগমনের জন্য যে প্রতীক্ষা সেটাও কোনও অংশে কম উদ্বেগজনক ছিল না। বড়ো ঘরের একটি দেমাকি মেয়ে আর একজন 'রক্ষিতা'—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মধ্যে আদালতকক্ষে সাক্ষাৎকারটা কেমন হবে অধীর আগ্রহে সকলে তার প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রসঙ্গত, আমাদের মহিলাদের মহলে কাতেরিনা ইভানভ্নার চেয়ে গ্রুশেন্কার পরিচিতিটা বেশি ছিল। 'ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ আর তার হতভাগ্য পুত্রের ধ্বংসের কারণ' এই স্ত্রীলোকটিকে আমাদের মহিলারা আগেও দেখেছে। 'অতি সাধারণ, এমনকি দেখতে শুনতেও একেবারেই ভালো নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির এমন একটা রুশি স্ত্রীলোকের' অত বেশি মাত্রায় প্রেমে বাপ আর ছেলে দুজনে যে কী করে পড়তে পারে এই বলে তারা সকলে প্রায় এক বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করল।

এক কথায়, গালগল্পের কোনো কমতি ছিল না। আমার বেশ ভালো করে জানা আছে যে বিশেষ করে আমাদের শহরে মিতিয়াকে নিয়ে বেশ কয়েকটি মারাত্মক ধরনের পারিবারিক কলহ পর্যন্ত বেধে গিয়েছিল। এই ভয়াবহ মামলা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন বহু মহিলা তাদের স্বামীদের সঙ্গে তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এর পর সেই সব মহিলার স্বামীরা যখন আদালতকক্ষে উপস্থিত হল তখন তারা যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে যাবেই না, এমনকি ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরোধিতাই করবে তাতে আর বিচিত্র কী। মোটের ওপর যেটা ভালো মতো বলা যেতে পারে তা এই যে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের অংশের মনোভাবটা পুরোমাত্রায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিকূলে ছিল। কঠোর, ভ্রূকুটিল মুখগুলি চোখে পড়ার মতো ছিল। এমনকি কাউকে কাউকে রীতিমতো ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল, তাদের সংখ্যাধিক্যও চোখে পড়ার মতো ছিল বটে। অবশ্য এটাও সত্যি যে আমাদের এই শহরে থাকার সময় মিতিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনেককেই অপমান করতে ছাড়েনি। বলাই বাহুল্য, আগন্তুকদের মধ্যে কারও কারও মনমেজাজ বলতে গেলে বেশ প্রফুল্লই ছিল এবং মিতিয়ার কপালে কী হবে না হবে এ সম্পর্কে

ব্যক্তিগত ভাবে তারা সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল—কিন্তু তা সত্ত্বেও আবারও বলতে হয়, মামলার বিচারের ব্যাপারে অবশ্যই নয়। মামলার ফল কী হয় সকলে তা দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং অধিকাংশ পুরুষমানুষই অপরাধীর চরম দণ্ড কামনা করছিল। তবে সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ছিল আইনজীবীরা। মামলার নৈতিক দিক নয়, সাম্প্রতিক আইনের সংশ্লিষ্ট বিষয় বলতে যা বোঝায় সেটাই তাদের কাছে মূল্যবান ছিল।

খ্যাতনামা আইনজীবী ফেতিউকোভিচের আগমনে সকলে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতিভা সর্বজনবিদিত। চাঞ্চল্যকর ফৌজদারি মামলার সমর্থনে মফস্‌সলে তাঁর আগমন এই প্রথম নয়। তিনি এই ধরনের মামলার সমর্থনে দাঁড়ালে সেগুলির খ্যাতি সব সময়ই রাশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বহুকাল লোকের মনে থাকে। আমাদের প্রসিকিউটর এবং বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি সম্পর্কেও বেশ কয়েকটি গল্প শোনা যায়। শোনা যায় আমাদের প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ নাকি ফেতিউকোভিচ্‌কে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। পেতের্বুর্গে তাঁদের দুজনের কর্মজীবনের একেবারে শুরু থেকেই নাকি তাঁদের মধ্যে বহুকালের পুরনো শত্রুতা। আমাদের আত্মাভিমানী প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের সব সময়ই মনে হত সেই পেতের্বুর্গের সময় থেকে শুরু করে কেউ না কেউ তাঁর ওপর ক্রমাগত অন্যায় করে আসছে, যেহেতু তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি; তাই কারামাজভ্ মামলার ওপর ভরসা করে তিনি তাঁর মনোবলের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে যাচ্ছিলেন, এমন কি এই মামলার সাহায্যে তিনি কর্মক্ষেত্রে তাঁর নিষ্প্রভ ভাবমূর্তির পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নও দেখছিলেন। কিন্তু এখন ফেতিউকোভিচের আবির্ভাব তাঁর কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তবে ফেতিউকোভিচের সামনে পড়ে তাঁর আতঙ্কে শিউরে ওঠার অপবাদটা একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল। বিপদের মুখে পড়ে ভগ্নোৎসাহ হওয়ার পাত্র আমাদের প্রসিকিউটর নন। বরং তাঁর চরিত্রটাই এমন ছিল যে বিপদ যত বাড়তে থাকত ঠিক তখনই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মবিশ্বাসের মাত্রাও বেড়ে চলত, পক্ষ বিস্তার করতে থাকত। মোটের ওপর, উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোকটা বড়ো বেশি আবেগপ্রবণ এবং অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর। যে কোনো কাজেই হাত দিন না কেন সেটা তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে করতেন, আর মামলা এমন ভাবে পরিচালনা করতেন যেন সেটা সমাধানের ওপরে তাঁর সমস্ত ভাগ্য এবং সমস্ত মানসম্মান নির্ভর করছে। আইনজীবীদের মহলে এই নিয়ে বেশ হাসাহাসিও চলত। এমনকি চরিত্রের ঠিক এই বৈশিষ্ট্যের দরুনই আমাদের প্রসিকিউটর খানিকটা খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। সে খ্যাতি যদি সর্বব্যাপী নাও হয়, আমাদের স্থানীয় আদালতে তার সামান্য পদমর্যাদার কারণে যতটা প্রত্যাশিত ছিল অন্তত সেই তুলনায় অনেক বেশি তো বটেই। বিশেষত মনস্তত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ নিয়ে লোকে হাসাহাসি করত। আমার মতে, সকলেই ভুল করেছিল। আমার মনে হয়, আমাদের

প্রসিকিউটর সম্পর্কে অনেকে যেমন ভাবত মানুষ হিসেবে এবং চরিত্র হিসেবে তার গভীরতা সেই তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা হলে কী হবে, অসুস্থ প্রকৃতির এই মানুষটি তাঁর কর্মক্ষেত্রে, কর্মজীবনের একেবারে শুরুতে, তাঁর সেই প্রথম পদক্ষেপ থেকেই নিজেকে তুলে ধরতে পারেনি এবং পরে সারা জীবন ধরেও তা আর পারেনি।

আমাদের বিচারকমণ্ডলীর সভাপতির প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে মানুষটি ছিলেন সুশিক্ষিত এবং মনুষ্যত্ববোধ ও মার্জিত রুচির অধিকারী। কাজের জায়গায় অতি আধুনিক সমস্ত মতাদর্শ প্রয়োগের ব্যাপারে ব্যবহারিক জ্ঞানও তাঁর ছিল। আত্মাভিমান তাঁর কম ছিল না বটে, কিন্তু নিজের কর্মজীবন নিয়ে খুব একটা ভাবনাচিন্তা তাঁর ছিল না। তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অগ্রগণ্য ব্যক্তি হওয়া। এছাড়াও তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল, যথেষ্ট বিষয় আশয়ও ছিল। কারামাজ়ভ্‌দের মামলাতে, পরে দেখা গিয়েছিল, তাঁর বেশ উৎসাহ ছিল, তবে সেটা নেহাৎই ব্যাপক অর্থে। ঘটনার প্রকৃতি ও শ্রেণিবিভাগ এবং আমাদের সামাজিক ভিত্তির ফল হিসেবে, রুশ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল। মামলার ব্যক্তিগত প্রকৃতি বা তার শোকাবহ পরিণাম সম্পর্কে প্রসিকিউটরের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পরিমাণে এবং ঠিক ততটাই নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক ছিল যতটা ছিল অভিযুক্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে। অবশ্য সেরকম হওয়া বোধহয় উচিতও ছিল।

বিচারকমণ্ডলীর আবির্ভাবের অনেক আগে থাকতেই আদালত-কক্ষে তিল ধারণে ঠাঁই ছিল না। আমাদের আদালতকক্ষটি শহরের মধ্যে সেরা—প্রশস্ত ঘর উঁচু ছাদ; এখানকার আওয়াজের ব্যবস্থাও বেশ ভালো। খানিকটা উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর যেখানে বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদের স্থান হয়েছিল, তার ডান দিকে একটা টেবিল আর দু সারি হাতলওয়ালা চেয়ার জুরিবর্গের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। বাঁ দিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি আর তার পক্ষসমর্থনকারীর স্থান! আদালত কক্ষের মাঝখানে বিচারকমণ্ডলীর আসনের কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা টেবিলের ওপর ছিল' 'সাক্ষ্য প্রমাণের বস্তু'। সেগুলির মধ্যে ছিল ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের রক্তমাখা সাদা রেশমি কাপড়ের ড্রেসিং গাউন; যেটার সাহায্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছিল সর্বনাশা সেই তামার নোড়াটা, মিতিয়ার শার্ট, যেটার আস্তিনে রক্তের দাগ লেগে ছিল; আগাগোড়া রক্তে ভেজা রুমালটা তখন পকেটে গুঁজতে গিয়ে পকেটের জায়গার কাছে যার পিছন দিকটার সর্বত্র ছোপ ছোপ রক্ত লেগে ছিল সেই লম্বা ঝুলকোটটা; সেই সঙ্গে রক্ত শুকিয়ে একেবারে চড়চড়ে হয়ে যাওয়া রুমালটাও, যেটা এর মধ্যে একেবারে হলদেও হয়ে এসেছিল; সেই পিস্তলটা, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে পের্‌খোতিনের সামনেই যেটাতে সে গুলি ভরেছিল এবং মোক্রয়েতে ত্রিফন বরিসভিচ্‌ যেটা চুপি চুপি তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল;

ওপরে নাম লেখা সেই খামটা যার ভেতরে গ্রুশেন্‌কার জন্য তিন হাজার তৈরি করে রাখা ছিল; গোলাপি রঙের সরু ফিতেটা যা দিয়ে খামটা বাঁধা ছিল, ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস যেগুলি আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। আরও দূরে, বেশ খানিকটা দূরত্বে, হলঘরের অনেকটা ভেতরে জনসাধারণের জন্য আসনের শুরু। কিন্তু তারও আগে, হলঘরের স্তম্ভশ্রেণির সামনে আরও কয়েকটা হাতলওয়ালা চেয়ার রাখা হয়েছিল সেই সমস্ত সাক্ষীর জন্য যারা ইতিমধ্যে তাদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং যাদের আদালতকক্ষে বসিয়ে রাখা হবে।

দশটার সময় বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি, একজন সদস্য আর শান্তিরক্ষা আদালতের একজন অবৈতনিক বিচারপতিকে নিয়ে তিনজনের একটি দল আদালত কক্ষে উপস্থিত হল। বলাই বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রসিকিউটরেরও আবির্ভাব ঘটল। সভাপতিটি উচ্চতায় মাঝারিরও নীচে, বেশ ভরাট ও গাঁট্টাগোট্টা চেহারার লোক। মুখের ভাব দেখে মনে হয় অর্শরোগে ভুগছেন। বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে। মাথার কালো চুলে সামান্য পাক ধরেছে। চুল ছোটো করে ছাঁটা। বুকে একটা লাল ফিতের ওপর একটা পদক আঁটা—সেটা কীসের তা মনে করতে পারছি না। প্রসিকিউটরকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—শুধু আমার কেন, উপস্থিত সকলরেই মনে হয়েছিল কেমন যেন ফ্যাকাশে, বড্ড বেশি ফ্যাকাশে, মুখটা প্রায় সবুজ হয়ে গেছে, কেন কে জানে যেন আচমকা, হয়তো বা রাতারাতিই রোগা হয়ে গেছে—কথাটা বলছি এই কারণে যে মাত্র দুদিন আগেও আমি তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক চেহারায় দেখেছি। সভাপতি মশাই আদালতের প্রধান কর্মচারীকে এই প্রশ্ন করে কাজ শুরু করলেন যে জুরিবর্গের সকলে উপস্থিত আছেন কিনা।

কিন্তু না, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই ভাবে আমার পক্ষে আর বেশি দূর চালানো সম্ভব হবে না। এমনকি এই কারণেও একেবারে সম্ভব নয় যে অনেক কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, অনবধানবশত কিছু জিনিসের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করিনি, কিছু আবার মনে করতেই ভুলে গেছি। কিন্তু বড়ো কথা, যা আমি এর আগেও উল্লেখ করেছি, কারণটা এই যে যা যা বলা হয়েছিল এবং যা যা ঘটেছিল সে সব কিছু মনে করতে গেলে আক্ষরিক অর্থে আমার সময়ের অভাব ঘটবে স্থান সঙ্কুলানও হবে না। শুধু এটাই জানিয়ে প্রতিবাদী কৌঁসুলি অথবা প্রসিকিউটর—কোনো পক্ষই খুব একটা বেশি সংখ্যক জুরিমণ্ডলীর সদস্য রাখে নি। বারোজন সদস্যের জুরিমণ্ডলীতে কারা কারা ছিল সেটা মনে আছে। তাদের মধ্যে চারজন ছিল স্থানীয় ছোটখাটো সরকারি আমলা, দুজন বণিক, বাকি ছয় জন কৃষক আর আমাদের শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। আমার মনে আছে, বিচার শুরু হওয়ার অনেক আগে থাকতে আমাদের সমাজে লোকে—বিশেষত মহিলারা—বেশ খানিকটা অবাক হয়েই প্রশ্ন তুলেছিল 'এরকম একটা সূক্ষ্ম, জটিল ও মনস্তাত্ত্বিক মামলা মীমাংসার ভার কোথাকার কতকগুলো সরকারি কর্মচারী এবং সর্বোপরি

চাষাভুসো শ্রেণির লোকের হাতে তুলে দিয়ে একটা সর্বনাশা কাণ্ড ঘটানো হবে এটা কী করে হতে পারে? কোথাকার কোন্ সরকারি কর্মচারী—তার চেয়েও বড়ো কথা একটা চাষা এর কী ছাই মর্ম বুঝবে?' যে চারজন সরকারি কর্মচারী জুরিমন্ডলীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তারা আসলেও কিন্তু ছোটখাটো, নিম্নপদমর্যাদার, পলিতকেশ লোক ছিল। তাদের মধ্যে কেবল একজনেরই বয়স একটু কম ছিল। আমাদের সমাজে তাদের তেমন একটা পরিচিতি ছিল না। যৎসামান্য বেতনে তারা কোনোমতে দিনগত পাপক্ষয় করত। তাদের ঘরের বৌরাও সম্ভবত বেশ বুড়ি, কোথাও দেখানোর মতো নয়, আর ঘরে তাদের একগাদা আন্ডাবাচ্চা, এমনকি হয়তো খালি পায়েই ঘোরাঘুরি করে—সংখ্যায় এত বেশি যে বাইরে কোথাও তাস খেলে অবসর সময় কাটানো ছাড়া বাড়ির কর্তাদের আর কোনও উপায় থাকে না এবং কস্মিনকালেও কোনো বইপুথি তারা পড়েনি। যে দুজন বণিক ছিল তারা দেখতে ভারিক্কি গোছের হলে কী হবে, অদ্ভুত রকম চুপচাপ আর জবুথবু ধরনের। তাদের মধ্যে একজনের আবার দাড়ি চাঁছা, তার পোশাক পরিচ্ছদ জার্মান ছাঁদের। অন্য জনের দাড়িটা ছোটখাটো, সামান্য পাক ধরা, তার গলায় একটা লাল ফিতে, তাতে কীসের যেন একটা পদক ঝুলছিল। শহরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর চাষি সম্প্রদায়ের লোকগুলোর কথা না হয় না-ই বললাম। আমাদের 'গোচারণ' এলাকায় শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত বলে যারা পরিচিত তারাও প্রায় ওই চাষিদেরই সমগোত্রীয়, এমনকি হালচাষও করে। তাদের মধ্যেও দুজনের বেশভূষা ছিল জার্মান ছাঁদের এবং হয়ত বা সেই কারণেই বাকি চারজনের তুলনায় দেখতে বেশি নোংরা আর কদাকার। তাই ওদের দেখামাত্র এই যেমন আমার মনে হয়েছিল 'এই ধরনের লোকদের এরকম একটা মামলার কীই বা বোঝার ক্ষমতা থাকতে পারে?'—তেমনি আর সকলের মাথায়ও যে বাস্তবিকই এই চিন্তাটা আসতে পারে তাতে আর বিচিত্র কী! কিন্তু তা সত্ত্বেও সদস্যদের মুখগুলি যে রকম কঠোর ও থমথমে দেখাচ্ছিল তা লোকের মনে কেমন যেন অদ্ভুত এক ধরনেব প্রভুত্ব ব্যঞ্জক এবং কতকটা ভীতিজনক ভাব সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট।

অবশেষে সভাপতি মশাই অবসরপ্রাপ্ত নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ কারামাজভ্ হত্যা মামলার শুনানির সূচনা ঘোষণা করলেন। অবশ্য তখন তিনি কীভাবে কথাগুলি বলেছিলেন ঠিক মনে করতে পারছি না। আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করতে বলা হল। মিতিয়া উপস্থিত হল। আদালতকক্ষ জুড়ে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। একটা মাছির গুঞ্জন পর্যন্ত শোনা যায়। জানি না অন্যদের কী মনে হয়েছিল কিন্তু মিতিয়াকে দেখে আমার মনে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ভাবের উদ্রেক হয়েছিল। যেটা বড়ো কথা সেটা এই যে সদ্য সেলাই করা লম্বা ঝুলকোট পরে দারুণ ফুলবাবু সেজে সে হাজির হয়েছে। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম মস্কোয় মিতিয়ার আগেকার যে দর্জির কাছে তার পোশাকের

মাপ থেকে গিয়েছিল, ইচ্ছে করে এই দিনটিকে উপলক্ষ করেই সে এটা তাকে অর্ডার দিয়েছিল। তার হাতে ছিল কালো রঙের ছাগ শিশু চর্মের দস্তানা, অঙ্গে শোভা বর্ধন করছিল কেতাদুরস্ত জামাকাপড়। সে তার অভ্যাসমতো গজখানেক মাপের লম্বা লম্বা পা ফেলে নিশ্চল স্থির দৃষ্টিতে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এসে এতটুকু শঙ্কার ভাব না দেখিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার পক্ষ সমর্থনকারী বিখ্যাত আইনজীবী ফেতিউকভিচেরও আবির্ভাব ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে আদালতকক্ষে কেমন যেন একটা চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। লোকটা লম্বা, শুকনো চেহারার। তাঁর পাগুলো লম্বা লম্বা, পাতলা গড়নের, হাতের আঙুলগুলো বড়ো বেশি লম্বা, পাতলা ফ্যাকাশে। মুখ পরিষ্কার কামানো। মাথার চুল বেশ ছোটো, ভদ্র ভাবে আঁচড়ানো। ঠোঁটজোড়া পাতলা, কখনও কখনও এমন ভাবে বেঁকে যায় যে ঠাট্টা করছেন না অমনি হাসছেন বোঝা ভার। দেখে মনে হয় বয়স বছর চল্লিশেক হবে। তাঁর মুখের গড়নটা প্রীতিকর হলেও হতে পারত, কিন্তু তাতে বাদ সেধেছে তার ভাবলেশহীন চোখদুটো, যা অমনিতেই তেমন একটা বড়ো নয় এবং এত বেশি কাছাকাছি যে সে রকম কদাচিৎ চোখে পড়ে—দুটোর মাঝখানের একমাত্র ব্যবধান বলতে তার লম্বাটে পাতলা নাকের পাতলা হাড়টা। এক কথায়, তাঁর চেহারার দারুণ ভাবে পাখি পাখি ভাবটা ছিল অবাক করার মতো। তাঁর পরনে ছিল টেইল কোট আর গলায় সাদা টাই।

আমার মনে আছে মিতিয়ার কাছে সভাপতির প্রথম প্রশ্ন ছিল তার নাম কী, পেশা কী ইত্যাদি। মিতিয়ার উত্তরটা কর্কশ শোনাল, তার কণ্ঠস্বরও আকস্মিকভাবে এত জোরাল হয়ে উঠল যে সভাপতি পর্যন্ত ঝট করে মাথা ঝাঁকালেন, কতকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। এর পর আদালতে তদন্তের জন্য যাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের অর্থাৎ সাক্ষী ও বিশেষজ্ঞদের তালিকা পড়ে শোনানো হল। তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। সাক্ষীদের মধ্যে গর হাজির চারজন মিউসভ্—সে এখন প্যারিসে আছে, কিন্তু প্রাথমিক তদন্তের সময়ই তার এজাহার পাওয়া গিয়েছিল; মাদাম খখ্‌লাকোভা আর জমিদার মাক্সিমভ্ অসুস্থতার কারণে আসতে পারেনি। স্মের্দিকোভ্‌কে পাওয়া সম্ভব হয়নি তার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে—সে সম্পর্কে অবশ্য পুলিসের তরফ থেকে আদালতে একটা প্রমানপত্রও দাখিল করা হয়েছিল। স্মের্দিকোভের মৃত্যু সংবাদ আদালতকক্ষে বিপুল চাঞ্চল্য ও কানাকানির সূচনা করল। সেটাই স্বাভাবিক, কেন না জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনাটি তখন পর্যন্ত একেবারে জানা ছিল না। কিন্তু যেটা বিশেষ করে আশ্চর্য হওয়ার বিষয় তা ছিল মিতিয়ার আকস্মিক বিস্ফোরণ। স্মের্দিকোভের মৃত্যু সংবাদ যে-ই জানানো হল অমনি সে তার জায়গা থেকে আদালত কক্ষের সকলকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল

"কুকুরের মরণ কুকুরের উপযুক্তই হয়েছে!"

আমার মনে আছে তার কৌঁসুলি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ধেয়ে গিয়েছিলেন, আর সভাপতি মশাই তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে এরকম প্রগল্‌ভতার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু মিতিয়ার মধ্যে যেন অনুশোচনার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। সে শুধু একথায় সামান্য ঘাড় কাত করে ছাড়া ছাড়া ভাবে চাপা গলায় বার কয়েক তার কৌঁসুলিকে বলল

"বলব না, আর বলব না! মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে! আর হবে না!"

ওই সংক্ষিপ্ত ঘটনাটির ফলে কিন্তু বলাই বাহুল্য, তার সম্পর্কে উপস্থিত জনসাধারণ ও জুরিবর্গের ধারণাটা ভালো হল না। তার চরিত্র প্রকট হয়ে পড়ল, সে নিজেই নিজেকে জাহির করল। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই আদালতের সচিব অভিযোগের বিবরণ পড়ে শোনালেন। বিবরণটি খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান ছিল। অমুক ব্যক্তিকে কেন আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে, কেন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা উচিত কেবল তার প্রধান প্রধান কারণ ইত্যাদি এতে বলা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেটা আমার মনে বেশ ভালো ছাপ ফেলেছিল। সচিব উচ্চকণ্ঠে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় তার বিবরণ পেশ করলেন। এই শোকাবহ ঘটনাটি আগাগোড়া এক সর্বনাশা ও নিষ্করুণ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট আকারে আমাদের সকলের সামনে যেন নতুন করে প্রকাশ পেল। আমার মনে আছে অভিযোগনামার পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি প্রভাবব্যঞ্জক উচ্চকণ্ঠে মিতিয়াকে প্রশ্ন করেছিলেন

"আসামি, আপনি কি আপনার অপরাধ স্বীকার করছেন?"

মিতিয়া হঠাৎ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"মাতলামি, ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি", আবারও কেমন যেন অপ্রত্যাশিত ভাবেই, উন্মত্তপ্রায় কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল। "আমি চিরকালের জন্য একজন সৎ মানুষ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভাগ্য আমার বাদ সাধল! কিন্তু আমার শত্রু, আমার বাবা ওই বুড়ো লোকটার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই! না, না, তার টাকাপয়সা লুটপাট করার অপরাধেও অপরাধী নই, কোনোমতেই হতে পারি না! দ্মিত্রি কারামাজভ্ ইতর হতে পারে, কিন্তু চোর নয়!"

চিৎকার করে কথাগুলি বলে সে বসে পড়ল। দেখাই যাচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। সভাপতি আবার তাকে উদ্দেশ করে সংক্ষেপে অথচ উপদেশাত্মক ভঙ্গিতে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে কোনো রকম অবান্তর বিষয়ের মধ্যে গিয়ে উন্মত্ততা প্রকাশ না করে তাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে যেন কেবল তারই উত্তর দেয়। এরপর তিনি মামলার বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু করার আজ্ঞা দিলেন। সাক্ষীদের সকলকে হলফনামা পড়ানোর জন্য নিয়ে আসা হল। তখনই আমি সাক্ষীদের

সকলকে একসঙ্গে দেখতে পেলাম। অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাইদের অবশ্য হলফনামা ছাড়াই সাক্ষ্য দিতে দেওয়া হল। ধর্মযাজক ও বিচারকমণ্ডলীর সভাপতির উপদেশদানের পর্ব শেষ হলে সাক্ষীদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে যতদূর সম্ভব পরস্পরের থেকে পৃথক পৃথক করে বসিয়ে দেওয়া হল। এর পর এক এক করে তাদের ডাক পড়তে লাগল।

## দুই

## বিপজ্জনক সাক্ষী

প্রসিকিউটরের সাক্ষী আর আসামি পক্ষের সাক্ষীদের সভাপতি মশাই কোনো ভাবে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করেছিলেন কিনা এবং ঠিক কোনও পর্যায়ক্রমে তাদের ডাকার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা তা জানি না। তবে সে রকম একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হয়ে থাকবে। শুধু এটাই জানি যে প্রসিকিউটরের সাক্ষীদের প্রথমে ডাকা হয়েছিল। আবারও বলছি, সবগুলি জেরার প্রতিটি পদক্ষেপের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার অভিপ্রায় আমার নেই। তাছাড়া আমার বর্ণনা কিছু পরিমাণে বাড়তিও হতে পারত, কারণ প্রসিকিউটর ও পক্ষ সমর্থনকারীর বক্তৃতায়, যখন দুই পক্ষ সওয়াল-জবাবে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যাবতীয় তথ্য ও শুনানির সমস্ত গতিপ্রকৃতি ও নিহিতার্থ যেন এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে এক উজ্জ্বল ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যসূচক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাদের সেই চমৎকার দুটি বক্তৃতার বয়ান, অন্ততপক্ষে তার কোনো কোনো অংশ আমি সম্পূর্ণ রূপে টুকে রেখে দিয়েছি, যথাসময়ে তার উল্লেখও করব, ঠিক যেমন সেই সঙ্গে উল্লেখ করব এই মামলার বিশেষ ও একেবারে অপ্রত্যাশিত এমন একটি ঘটনারও যা দুই পক্ষের সওয়াল জবাবেরও আগে আকস্মিক ভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং মামলার ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক পরিণতিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।

আমি কেবল এটাই উল্লেখ করব যে বিচারের একেবারে শুরুর মুহূর্তগুলি থেকেই এই মামলার একটা বিশেষ যে চরিত্র রীতিমতো প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং সকলের লক্ষ করার মতোও ছিল সেটা হল প্রতিবাদীকে সমর্থনের যে যে উপায় ছিল সেগুলির তুলনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অসাধারণ বিপুল শক্তি। সকলে প্রথম মুহূর্ত থেকেই এটা বুঝতে পেরেছিল, যখন এই ভয়ঙ্কর আদালতকক্ষের মধ্যে তথ্যগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা বিশেষ শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে শুরু করে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে অপরাধের সামগ্রিক ভয়াবহ রূপ, প্রকটিত হয়ে ওঠে তার সমস্ত নৃশংসতা। সেই প্রথম পদক্ষেপ থেকেই সকলে সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে এই মামলা নিয়ে কোনো বিতর্ক চলতে পারে না, এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, আসলে কোনও রকম বাদ প্রতিবাদ না হলেও চলত, বাদ প্রতিবাদ

যা হবে সেটা স্রেফ নিয়ম রক্ষার খাতিরে এবং আসামি দোষী, তার অপরাধ প্রত্যক্ষ, সে চূড়ান্ত ভাবে অপরাধী। আমার এমনও মনে হয়, এই কৌতূহলজনক অভিযুক্ত ব্যক্তিটির বেকসুর খালাসের জন্য যারা সকলে একজোটে এত অধীর ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল এমনকি সেই মহিলারা পর্যন্ত সেই একই সঙ্গে অপরাধটা যে পুরোপুরি তারই সে বিষয়েও সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। এ কথা বললেও কম বলা হয়। আমার তো মনে হয়, তার অপরাধ যদি তেমন একটা প্রমাণিত না হত তাহলে তারা মর্মাহতই হত, যেহেতু সেক্ষেত্রে, অপরাধীর দোষ যখন ক্ষালনই হয়ে গেল তখন আর ঘটনার গ্রন্থিমোচন মনে তেমন একটা ছাপ ফেলে না। কিন্তু সে যে বেকসুর খালাস পাবে, অদ্ভুত ঘটনা এই যে এব্যাপারে মহিলাদের সকলের প্রায় একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চূড়ান্ত আস্থা ছিল। 'দোষী ঠিকই, কিন্তু মানবিকতার খাতিরে এবং এখন যে সমস্ত নতুন নতুন ধ্যানধারণা আর নতুন নতুন অনুভূতির চল হয়েছে সেগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে খালাস করে দেওয়া হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি ভেবে তাদের এটা মনে হয়েছিল। এই কারণেই না তারা সকলে এত অধৈর্য হয়ে ছুটে এসে এখানে জুটেছে! অন্যদিকে পুরুষদের বেশি আগ্রহের বিষয় ছিল প্রসিকিউটর আর বিখ্যাত আইনজীবী ফেতিউকভিচের মধ্যে লড়াই। সকলে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, মনে মনে প্রশ্ন করছিল এরকম একটা অনর্থক ও গজভুক্ত কপিত্থবৎ মামলা থেকে এমনকি ফেতিউকভিচের মতো এমন একজন প্রতিভাবান লোকও কীই বা উদ্ধার করতে পারেন? এই কারণে তারা গভীর মনোযোগ সহকারে তার অভীষ্ট সাধনের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছিল।

কিন্তু ফেতিউকভিচ্ একেবারে শেষ পর্যন্ত, তাঁর ভাষণদান পর্যন্ত সকলের কাছে প্রহেলিকাই হয়ে থাকলেন। যারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের মনে মনে এমন একটা উপলব্ধি হয়েছিল যে ভেতরে ভেতরে তাঁর একটা কোনো পদ্ধতি আছে, ইতিমধ্যেই কিছু একটা তিনি ভেবে বার করেছেন, তাঁর একটা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আছে—কিন্তু সেটা যে কী তা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁর আত্মবিশ্বাস, নিজের ওপর তাঁর আশাভরসা কিন্তু চোখে পড়ার মতো ছিল। তা ছাড়া সকলে সঙ্গে সঙ্গে যেটা লক্ষ করে সন্তুষ্ট হয়েছিল তা এই যে মাত্র তিনদিন হয়েছে কি হয়নি তিনি আমাদের এখানে এসেছেন, কিন্তু এই এত অল্প সময়ে থাকার মধ্যেই তিনি সম্ভবত বিস্ময়কর ভাবে মামলার সমস্ত সুলুক সন্ধান করে উঠতে পেরেছেন, 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন'। যেমন লোকে পরে উল্লসিত হয়ে বলাবলি করছিল যে তিনি যথাসময়ে প্রসিকিউটরের তরফের সাক্ষীদের সকলকে 'নাকাল করে দিতে' এবং যত দূর সম্ভব তাদের ধরাশায়ী করতে পেরেছিলেন। আর বড়ো কথা এই যে তাদের নীতিবোধের সুখ্যাতিকে কালিমালিপ্ত করতে পেরেছিলেন, যার অর্থ তাদের সাক্ষ্যও আপনা আপনিই কলঙ্কজনক হয়ে পড়া। অবশ্য এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে তিনি যা করছেন সেটা অনেকটাই খেলার ছলে, আইন ব্যবসায়ের জৌলুস

বলতে যা বোঝায় তার খাতিরে, ওকালতিতে প্রচলিত মারপ্যাঁচের কোনোটাই যে বাদ যাচ্ছে না তা দেখানোর উদ্দেশ্যে। তাই সকলের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সাক্ষীদের এই ভাবে কালিমালিপ্ত করে দিয়ে কোনো বড়ো রকমের এবং চূড়ান্ত কোনো লাভের সম্ভাবনা তাঁর নেই, সম্ভবত তিনি নিজেও এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে কম সচেতন নন; কিন্তু হয়তো তাঁর ভাণ্ডারে এমন কোনো মৌলিক আইডিয়া আছে, তাঁর কাছে এখনও আত্মরক্ষার এমন কোনো গোপন অস্ত্র আছে যা সময় এলেই তিনি প্রকাশ করবেন। কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে অনেকটা যেন খেলায় মেতেছেন, লেজে খেলাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ফিয়োদর পাভ্লভিচের খাসভৃত্য গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচকে জেরা করার সময় যেমন হয়েছিল তার উল্লেখ করতে হয়। লোকটা ইতিপূর্বে 'বাগানের দিককার খোলা দরজা' সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিয়েছিল। প্রতিবাদী কৌঁসুলিটির তাঁর প্রশ্ন করার পালা এলে তাকে আচ্ছা করে চেপে ধরেছিলেন। লক্ষ করার বিষয় এই যে আদালতের এত জমক বা তার কথা শোনার জন্য এত বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের উপস্থিতি—কোনোটাতেই এতটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে বেশ শান্ত ভাব বজায় রেখে, এমনকি কতকটা যেন ভারিক্কি চালেই গ্রিগোরি আদালত-কক্ষে এসে দাঁড়াল। এমন দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে সে তার সাক্ষ্য দিল যে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন তার ধর্মপত্নী মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্নার সঙ্গে একান্তে বাক্যালাপ করছে—তবে একটু বেশি সম্ভ্রমের সঙ্গে, এই যা। তাকে গুলিয়ে দেওয়া অসম্ভব ছিল। প্রসিকিউটর তাকে প্রথমে কারামাজভ্ পরিবার সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এতে পারিবারিক চিত্রটা উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হয়ে উঠল। দেখেশুনে বোঝা যাচ্ছিল সাক্ষী সরল প্রকৃতির ও পক্ষপাতহীন। যেমন, পরলোকগত মনিবের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সে জানালো, যাই হোক না কেন, মিতিয়ার প্রতি তার আচরণ ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং তার মনিব ছেলেদের 'ঠিক ভাবে মানুষ করেননি'। মিতিয়ার ছোটবেলাকার কথাপ্রসঙ্গে গ্রিগোরি যোগ করল, 'ও যখন একেবারে ছোটো ছিল তখন আমি না থাকলে উকুনেই ওকে খেয়ে শেষ করে ফেলত, আর মার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া যে জমিদারিতে ওর ন্যায্য অধিকার ছিল সেই ব্যাপারে বাপ তার ছেলের ওপর যে অন্যায় করেছে সেটা তার উপযুক্ত হয়নি।'

প্রসিকিউটর যখন প্রশ্ন করল ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ যে সম্পত্তির হিসাব নিয়ে তার ছেলের প্রতি অন্যায় করেছে একথা জোর দিয়ে বলার মতো কী ভিত্তি তার আছে, তখন সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল যে এই ব্যাপারে কোনো জোরাল তথ্য সে একেবারেই দিতে পারল না; কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রিগোরি তার নিজের মত আঁকড়ে ধরে থেকে এই কথাই বলল যে ছেলের সঙ্গে তাঁর হিসাবটা 'সঠিক ছিল না', ''কয়েক হাজার রুবল পাওনা অবশ্যই শোধ করা উচিত ছিল'। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়,

ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ কি সত্যি সত্যি মিতিয়ার প্রাপ্য একটি অংশ পরিশোধ করে নি—প্রসিকিউটর তাঁর এই প্রশ্নটি পরে অন্য আরও যে সমস্ত সাক্ষীর কাছে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল তাঁদের সকলের কাছেই নাছোড়বান্দার মতো বিশেষ ভাবে রেখেছিল,—না আলিয়োশা না ইভান ফিয়োদরভিচ—কেউই তা থেকে বাদ পড়েনি, কিন্তু সাক্ষীদের কারও কাছ থেকেই কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনাটা যে ঠিক সেটা সকলেই সমর্থন করল, কিন্তু কেউই অন্তত সামান্য পরিমাণে হলেও সুস্পষ্ট কোনও প্রমাণ দিতে পারল না। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ যখন হুড়মুড় করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে তার বাপকে প্রহার করল এবং এই বলে তাকে শাসাল যে পরের বার ফিরে এসে তাকে খুন করবে, ডিনার টেবিলের সেই দৃশ্যের বর্ণনা গ্রিগোরির মুখ থেকে শোনার পর আদালত কক্ষে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল—বিশেষত এই কারণে যে পুরাতন ভৃত্যটির কথা বলার ভঙ্গি ছিল ধীরস্থির, তার বিবরণের মধ্যে কোনো বাড়তি কথা ছিল না, তার ভাষার নিজস্ব একটা ধরনও ছিল। সব মিলিয়ে তার বর্ণনায় দারুণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সঞ্চার হয়েছিল। মিতিয়া যে তখন তার মুখের ওপর ঘুষি মেরে তাকে উলটে ফেলে দিয়েছিল সেই অপমানজনক ঘটনা প্রসঙ্গে সে মন্তব্য করল যে এর জন্য তার কোনও রাগ নেই, অনেক আগেই সে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। মৃত স্মের্দিকোভ্ প্রসঙ্গে ক্রুশ প্রণাম ঠুকতে ঠুকতে সে তার মত প্রকাশ করে বলল, ছোকরার ক্ষমতা ছিল, তবে বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন একটা ছিল না, তাছাড়া রোগে জর্জরিত, অধিকন্তু নাস্তিক, আর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ এবং তার বড়ো ছেলেই তাকে এই নাস্তিকতার শিক্ষা দিয়েছিল। তবে স্মের্দিকোভের সততার কথা সে জোর দিয়ে প্রায় উৎসাহের সঙ্গেই সমর্থন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানাল যে অনেক কালে আগে একবার কর্তামশাইয়ের বেশ কিছু টাকা কোথাও পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু স্মের্দিকোভ্ সেই টাকা কুড়িয়ে পেয়ে গোপন করে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে কর্তামশাইকে এনে দিয়েছিল, আর উনিও ওকে এর জন্য একটা 'মোহর' উপহার দিয়েছিলেন এবং এর পর থেকে সব ব্যাপারে ওকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু বাগানের দিককার খোলা দরজার কথা উঠতে সে তার নিজের মতের সমর্থনে একরোখা জেদ ধরে বসে রইল। সে যাই হোক, তাকে এত বেশি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সব আমি মনে করতে পারছি না।

অবশেষে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলির জেরার পালা এলো। যে খামটার মধ্যে 'নাকি' 'বিশেষ একজনের' জন্য ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ তিন হাজার রুবল লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল প্রথমেই সেটা সম্পর্কে জানতে চেয়ে তিনি তাঁর প্রশ্ন শুরু করলেন। 'আপনি তো আপনার কর্তার এত বছরের এত ঘনিষ্ঠ অনুচর, আপনি কি নিজের চোখে ওটা দেখেছেন?' উত্তরে গ্রিগোরি বলল সে দেখেনি, তাছাড়া 'এখন যখন সকলে এ নিয়ে বলাবলি শুরু করে দিয়েছে তার আগে পর্যন্ত' অমন টাকার কোনো কথা সে কানেও শোনেনি। ফেত্তিউকভিচের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের মধ্যে আরও যাকে

যাকে প্রশ্ন করা সমীচীন বলে মনে হয়েছিল তাদের সবাইকেও খাম সম্পর্কে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। প্রসিকিউটরের মতো তিনিও সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন; কিন্তু তিনিও সকলের কাছ থেকে একই উত্তর পেলেন: সাক্ষীরা সকলেই জানাল যে খামটা কেউ চোখে দেখেনি, যদিও অনেকে সেটার কথা শুনেছে। এই প্রশ্নে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি ফেতিউকভিচের এমন নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরাটা একেবারে গোড়া থেকেই লক্ষ করা গিয়েছিল।

"এবারে, যদি অনুমতি করেন, একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি কি?" দুম্ করে, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ফেতিউকভিচ্ প্রশ্ন করে বসলেন। "প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ওই দিন সন্ধ্যায় আপনি আপনার কোমরের ব্যথা উপশমের আশায় ঘুমোতে যাবার আগে ব্যথার জায়গাটাতে কীসের একটা নির্যাস, বা যাকে আরক বলে, ওই রকম কিছু একটা মালিশ করেছিলেন—তা সেই বস্তুটি কী দিয়ে তৈরি জানতে পারি কি?"

গ্রিগোরি বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বিড়বিড় করে বলল, "শুল্‌ফা দেওয়া ছিল।"

"শুধুই শুল্‌ফা? মনে করে দেখুন দেখি আরও কিছু ছিল কিনা?"

"সোমরাজলতাও ছিল।"

"হয়ত লঙ্কাও ছিল—কী বলেন?" কৌতূহল প্রকাশ করল ফেতিউকভিচ্।

"হ্যাঁ, লঙ্কাও ছিল।"

"ইত্যাদি আরও সমস্ত বস্তু, আর এ সবই ভোদকায় ভিজানো ছিল—তাই তো?"

"স্পিরিটে।"

আদালত কক্ষে মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে গেল।

"দেখছেন তো, এমনকি স্পিরিটেও ভেজানো ছিল। তা ওই দিয়ে পিঠ রগড়ানোর পর বোতলে যে বাকি অংশটুকু পড়ে ছিল সেটা তো আপনি ঈশ্বরের নামে ভক্তিগদগদ এমন কোন প্রার্থনা আউড়ে খেয়ে ফেলেছিলেন যা কিনা কেবল আপনার ধর্মপত্নীই জানেন—তাই ত?"

"হ্যাঁ, তা খেয়েছিলাম।"

"মোটামুটি হিসেবে অনেকটা খেয়েছিলেন কি? আন্দাজ? ছোটো গ্লাসের এক গ্লাস? দু গ্লাস?"

"তা গেলাস খানেক হবে।"

"বলছেন, এমনকি গ্লাসখানেক হতে পারে? দেড় গ্লাসও তো হতে পারে? কী বলেন?"

গ্রিগোরি চুপ করে রইল। মনে হল সে যেন কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে।

"দেড় গ্লাসখানেক খাঁটি স্পিরিট—তা নেহাৎ মন্দ নয়—কী মনে হয় আপনার?

বাগানের দিককার দরজা কেন, 'স্বর্গের দ্বারও উন্মুক্ত হতে' দেখতে পারেন—ঠিক কি না।

গ্রিগোরি তখনও চুপ। আবারও মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে গেল আদালতকক্ষে। সভাপতিমশাই নড়েচেড়ে বসলেন।

"আপনি কি ঠিক জানেন," উত্তরোত্তর বেশি করে দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করতে করতে ফেতিউকভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন, "যখন বাগানের দিকে জানলাটা খোলা দেখেছিলেন সেই মুহূর্তে আপনি নিদ্রিত ছিলেন কিনা?'

"আমি নিজের পায়ে খাড়া ছিলাম।"

"আপনি যে নিদ্রিত ছিলেন না এতে কিন্তু তা প্রমাণিত হয় না।" আদালতকক্ষে আরও একবার নতুন করে হাসির ধুম পড়ে গেল। "আপনাকে সেই মুহূর্তে, এই ধরুন না কেন কেউ যদি প্রশ্ন করত এখন কোন্ সাল চলছে তাহলে কি আপনি তার উত্তর দিতে পারতেন?"

"সেটা জানি নে।"

"আচ্ছা এখন আমাদের এই শতাব্দীর, খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে কোন্ সাল চলছে জানেন কি?"

গ্রিগোরির ভাব দেখে মনে হল সে একেবারে বিধ্বস্ত। সে একদৃষ্টে তার নির্যাতনকারীর দিকে তাকিয়ে রইল। দেখেশুনে অদ্ভুত মনে হল যে এখন কত সাল চলছে তা সে সত্যি সত্যি জানে না।

"হয়তো এটা অন্তত জানেন যে আপনার হাতে ক'টা আঙুল আছে?"

"আমি এমন একজন লোক যার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই", হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে এবং সুস্পষ্টভাবে গ্রিগোরি জানাল। "কর্তাব্যক্তিদের কারও যদি আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার মর্জি হয় সেটা আমাকে সইতেই হয়।"

গ্রিগোরির কথাটা ফেতিউকভিচ্কে যেন কতকটা বসিয়ে দিল। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি মশাইও আবার এর মাঝখানে হস্তক্ষেপ করলেন, উপদেশের ভঙ্গিতে কৌঁসুলিকে মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁর উচিত আরও বেশি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা। এ কথা শোনার পর ফেতিউকভিচ্ সসম্মানে মাথা নুইয়ে জানিয়ে দিলেন যে সে তার জেরা শেষ করেছে। বলাই বাহুল্য, চিকিৎসার এমন একটা সুবিদিত অবস্থার মধ্যে যে লোকটার পক্ষে 'স্বর্গের দ্বার দেখা' সম্ভব হলেও হতে পারত, পরন্তু যে লোকটা এখন কোন্ খ্রিস্টাব্দ চলছে তা পর্যন্ত জানে না, উপস্থিত জনসাধারণের মনে এবং জুরিবর্গের মনেও তার সাক্ষ্য সম্পর্কে সামান্য একটু সন্দেহের বীজ থেকেই যেতে পারে। তাই প্রতিবাদী কৌঁসুলির উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধই হয়েছিল। কিন্তু গ্রিগোরি সাক্ষীর কাঠগড়া ছেড়ে চলে যাবার আগে আরও একটি ঘটনা ঘটল। সভাপতি মশাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন এই সাক্ষ্য সম্পর্কে তার কিছু মন্তব্য করার আছে কিনা।

"দরজার প্রসঙ্গটা ছাড়া আর যা যা বলেছে সবই সত্যি", জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল মিতিয়া। আমার উকুন যে আঁচড়ে পরিষ্কার করে দিত তার জন্য ধন্যবাদ, আমার ঘুষি মারার অপরাধ যে ক্ষমা করেছে তার জন্যও ধন্যবাদ। বুড়ো লোকটি সারা জীবনই সৎ ছিল, আমার বাবার কাছে সাতশটা পুড্‌ল কুকুরের সমান বিশ্বস্ত ছিল।"

"আসামি, আপনি আপনার ভাষা নির্বাচন সম্পর্কে সচেতন হবেন", কঠোর সুরে সভাপতি বললেন!

"আমি পুড্‌ল কুকুর নই", গ্রিগোরিও বলে উঠল।

"ঠিক আছে, তাহলে আমিই পুড্‌ল কুকুর। আমিই না হয় পুড্‌ল কুকুর হলাম!" মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। "এত যদি মান যায় তাহলে অপমানটা না হয় নিজের ওপরই নিয়ে নিচ্ছি, আর ওর কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি। আমি ছিলাম একটা জানোয়ার, ওর সঙ্গে নৃশংস আচরণ করেছি। ইশপের সঙ্গেও নৃশংস আচরণ করেছি।"

"ইশপ! কোন্ ইশপ্?" আবার কঠোর সুরে প্রশ্ন করলেন সভাপতি।

"এই এই আমাদের পিয়েরো মহাশয় আমার পিতাঠাকুর ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ।"

সভাপতি মশাই আবারও, আরও একবার প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে এবং এবারে অত্যন্ত কড়া ভাষায় মিতিয়াকে জানিয়ে দিলেন সে যেন তার ভাষা নির্বাচনের ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক হয়।

"আপনি কিন্তু এই করে আপনার বিচারকদের চোখে নিজেই নিজেকে হেয় করে ফেলছেন।"

সাক্ষী রাকিতিনকে জেরা করার ক্ষেত্রেও প্রতিবাদী কৌঁসুলি ঠিক সেই একই ভাবে বড়ো রকমের চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাকিতিন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই সব সাক্ষীদের একজন, প্রসিকিউটরের কাছে যাদের নিঃসন্দেহে মূল্য ছিল। দেখা গিয়েছিল সে সব জানে, এত বেশি জানে যে সেটা বিস্ময়কর ছিল। কার কাছে না তার যাতায়াত ছিল, কীই বা সে না দেখেছে, কার সঙ্গেই না তার কথাবার্তা হয়েছে! ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ আর কারামাজ়ভ্‌দের সকলের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি তার জানা ছিল। অবশ্য এটা সত্যি যে তিন হাজার রুবল ভর্তি খামটার কথা সেও কেবলই শুনেছে, শুনেছে মিতিয়ারই মুখে। কিন্তু তা হলে কী হবে, 'মহানগর' সরাইখানায় মিতিয়ার সমস্ত কীর্তিকাণ্ড, তার অশিষ্ট সমস্ত শব্দপ্রয়োগ ও নিন্দনীয়, ভাবভঙ্গির বিশদ বিবরণ সে দিয়েছিল এবং ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়োভের 'শুকনো ধুঁদুলের ছোবড়া' আখ্যা পেয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাও তাদের বলেছিল। কিন্তু মিতিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির হিসাবমতো মিতিয়ার কাছে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কোনো ঋণ ছিল কি না এই

বিশেষ জায়গাটাতে এসে স্বয়ং রাকিতিন পর্যন্ত কিছু বলতে পারেনি, কেবল মামুলি ধরনের অবজ্ঞাসূচক কতকগুলি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কাজ সেরেছিল।

রাকিতিনের কথাটা ছিল 'ওদের মধ্যে দোষটা যে কার এবং কে যে কার কাছে অপরাধী সেটা বোঝার বা হিসাব করে দেখার সাধ্য কারই বা থাকতে পারে, যেখানে নির্বোধ কারামাজভ্দের গুষ্টিসুদ্ধ সকলেই এমন যে তাদের মধ্যে কেউই না পারে নিজেকে বুঝতে, না পারে কিছু স্থির করতে?' অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের যে ট্র্যাজিডি তাকে সে সামগ্রিক রূপে বহুকালের বদ্ধমূল ভূমিদাস প্রথার অভ্যাস এবং যথোপযুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত থাকার কারণে রাশিয়ার চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার পরিণাম হিসেবে তুলে ধরেছিল। এক কথায়, তাকে কিছু পরিমাণে তার মনের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই মোকদ্দমার সময় থেকে, এই প্রথম আমাদের রাকিতিন মহাশয় নিজেকে জাহির করতে পেরেছিল এবং চোখে পড়ার মতো ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। প্রসিকিউটর জানতেন যে সাক্ষী এই অপরাধ সম্পর্কে কোনো এক পত্রিকার জন্য একটি লেখা তৈরি করছিল। আমরা পরে দেখতে পাব এক সময় তিনি তাঁর ভাষণে সেই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর নিজস্ব কিছু ভাবনাচিন্তাও তুলে ধরেছিল; অর্থাৎ সেটার সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছিলেন। সাক্ষীর বর্ণিত চিত্রটি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিভীষিকাময় মাত্রা পেয়েছিল, আর তাতে 'অভিযোগের' প্রমাণও অত্যন্ত জোরাল হয়ে উঠেছিল। মোটের ওপর এটাই বলতে হয় যে রাকিতিনের বিবরণ তার স্বাধীন চিন্তা আর সুদূরপ্রসারী ভাবনার অসাধারণ মহত্ত্বের ফলে জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিল। এমন কি আদালত-কক্ষ দু' তিনবার আকস্মিক করতালিধ্বনিতে ফেটে পড়তেও শোনা গিয়েছিল—বিশেষত সেই সমস্ত জায়গায় যেখানে সে বিশৃঙ্খলার ফলে রাশিয়ার দুর্দশা আর ভূমিদাস প্রথার উল্লেখ করছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাকিতিন তার যৌবনসুলভ উৎসাহের দরুন একটা ছোটখাটো ভুল করে বসল। প্রতিবাদী কৌঁসুলিও তৎক্ষণাৎ চমৎকার ভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। গ্রুশেন্‌কা প্রসঙ্গে সুবিদিত কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, তার নিজের যে সাফল্য, যা সে ইতিমধ্যে নিজেও অবশ্যই মনে মনে উপলব্ধি করতে পারছিল এবং মহৎ উপলব্ধির যে উচ্চস্তরে সে পৌঁছে গিয়েছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে এতদূর আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল যে আগ্রাফেনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে সে বেশ খানিকটা ঘৃণাভরে 'ব্যবসায়ী সাম্‌সোনভের রক্ষিতা' বলে উল্লেখ করতেও দ্বিধা করল না। কথাটা ফিরিয়ে নেবার জন্য পরে হয়তো তাকে অনেক মূল্য দিতে হত, কারণ এই কথার সূত্র ধরেই ফেতিউকভিচ তৎক্ষণাৎ তাকে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিলেন। এ সবই হতে পেরেছিল এই কারণে যে ফেতিউকভিচ যে এত কম সময়ের মধ্যে মামলার এত খুঁটিনাটির সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হতে পারবেন সেটা রাকিতিনের একেবারেই গণনার মধ্যে ছিল না।

"আপনার অনুমতি হলে জানতে চাই", প্রতিবাদী কৌঁসুলির পালা আসতে অত্যন্ত বিনীত ভাবে, এমনকি সম্ভ্রমসূচক মৃদু হেসে তিনি বলতে শুরু করলেন, "আপনি নিশ্চয়ই সেই রাকিতিন মহোদয়, পরম পূজ্যপাদ প্রভুর উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধাবনত, অমন সুন্দর একটা উৎসর্গপত্র সমেত, গভীর ভাবব্যঞ্জনাময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত যাঁর 'কৈবল্যধামপ্রাপ্ত মহাপুরুষ মহাস্থবির জোসিমার জীবনকাহিনি' নামে পুস্তিকাটি গির্জার আঞ্চলিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছেন এবং যেটা আমি এই কিছুদিন আগে পাঠ করে এত তৃপ্তি পেয়েছি?"

"আমি প্রকাশের জন্য লিখিনি   পরে ওঁরা প্রকাশ করেছিলেন", বিড়বিড় করে এমন ভাবে রাকিতিন বলল যেন হঠাৎ কেন যেন সে হতভম্ভ হয়ে গেছে এবং কতকটা যেন লজ্জাও পেয়ে গেছে।

"আহা, সে তো চমৎকার! আপনার মতো একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি কোনো সামাজিক প্রশ্নে যে অত্যন্ত ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে সে তো বলাই বাহুল্য। আপনার পরম পূজ্যপাদ প্রভুর আনুকূল্যে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ আপনার এই পুস্তিকাটির বেশ কাটতি হয়েছে এবং লোকের অনেকটাই উপকারে লেগেছে।   কিন্তু আপনার কাছে মূলত যে বিষয়ে আমি আমার কৌতূহল প্রকাশে ইচ্ছুক সেটা বলি। আপনি এই মাত্র জানালেন যে মাদাম স্‌ভেতলোভার সঙ্গে আপনার খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাই তো?"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রুশেন্‌কার পদবি ছিল স্‌ভেতলোভা। সেটা আমি মামলা চলাকালে, মাত্র ওই দিনই প্রথম জানতে পারি।

"আমার জানাশোনা সকলের হয়ে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি একজন যুবক   তাছাড়া যাদের যাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আছে তাদের সকলের হয়ে জবাবদিহি করতে পারে এমন কে আছে?" রাকিতিনের সর্বাঙ্গ দপ্ করে জ্বলে উঠল।

"বুঝতে পারছি খুবই বুঝতে পারছি!" ফেতিউকভিচ্ এমন ভাবে বলে উঠলেন যেন তিনি নিজেও বিব্রত বোধ করছেন এবং যথাশীঘ্র ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন, "এটা ঠিক, স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের সেরাভাগকে নিজের কাছে টানায় যার এত উৎসাহ এরকম একজন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে  আর দশজন যুবকের মতো আপনারও আগ্রহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল   আমাদের গোচরে এসেছে যে মাস দুয়েক আগে কারামাজ়ভ্‌দের ছোটো ছেলে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচের সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল স্‌ভেতলোভার, তবে একমাত্র এই শর্তে যে আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ তখন যে মঠের বেশ পরতেন সেই বেশেই তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। আপনি তাঁকে ওঁর কাছে আনলেই উনি আপনাকে পঁচিশ রুবল দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এও জানা গেছে যে এটা ঘটেছিল ঠিক সেই দিন যে দিন সন্ধ্যাটা

শেষ হয়েছিল এই শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে যা আমাদের বর্তমান মামলার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি আলেক্সেই কারামাজভ্‌কে মাদাম স্‌ভেত্‌লোভার কাছে নিয়ে এসেছিলেন—এখন আমার প্রশ্ন হল আপনি কি তখন মাদাম স্‌ভেত্‌লোভার কাছ থেকে পারিতোষিক হিসেবে সেই পঁচিশ রুবল পেয়েছিলেন? এই প্রশ্নেরই উত্তর আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছুক।"

"ওটা ছিল একটা ঠাট্টা। আমি বুঝতে পারছি না এতে আপনার কেন এত আগ্রহ হতে পারে। আমি নিয়েছিলাম ঠাট্টার ছলেই পরে ফেরত দিয়ে দেব বলে নিয়ে ছিলাম।..."

"তার মানে নিয়েছিলেন—তাই তো? কিন্তু এখন পর্যন্ত ফেরত দেন নি... নাকি দিয়ে দিয়েছেন?"

"যত বাজে কথা " রাকিতিন গজগজ করতে লাগল। "এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজি নই। ফেরত আমি অবশ্যই দেব।"

সভাপতি মশাই মাঝখানে হস্তক্ষেপ করলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি জানিয়ে দিলেন যে মিস্টার রাকিতিনকে তাঁর যা প্রশ্ন করার ছিল হয়ে গেছে। মিস্টার রাকিতিন যখন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এলো ততক্ষণে সে কতকটা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে মহৎ ও উদার অনুভূতির প্রকাশ উপস্থিত সকলের মনে যে ছাপ ফেলেছিল সেটা কিন্তু যতটা নষ্ট হওয়ার হয়ে গেল। ফেতিউকভিচ্‌ও তাকে দৃষ্টি দিয়ে এমনভাবে অনুসরণ করলেন যেন অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে জনসাধারণকে বলতে চাইছেন 'যে লোকটি অভিযোগ করছে তার মহানুভবতার এই তো নমুনা!' মনে আছে, এখানেও মিতিয়া একটি কাণ্ড না ঘটিয়ে ছাড়েনি। রাকিতিন যে সুরে গ্রুশেন্‌কা সম্পর্কে তার মনোভাব প্রকাশ করল তাতে সে তার নিজের জায়গা থেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে 'বের্নার'[৫৪] বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল। রাকিতিনকে সমস্ত রকম জেরা করা শেষ হয়ে যাবার পর বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি আসামির দিকে ফিরে যখন জিগ্‌গেস করলেন তার দিক থেকে তার নিজের কিছু বলার আছে কিনা তখন মিতিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছিল:

"আমি যখন বিচারাধীন আসামি তখনও আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গেছে! ও একটা জঘন্য বের্নার, সুযোগসন্ধানী, ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস নেই, পরম পূজ্যপাদ প্রভুর নাম করে ধোঁকা দিচ্ছে!"

মিতিয়াকে, বলাই বাহুল্য, তার ক্রোধোন্মত্ত উক্তির জন্য আবারও সচেতন করে দেওয়া হল, কিন্তু মিস্টার রাকিতিনের যেটুকু বাকি ছিল তাও গেল। ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়োভের সাক্ষ্যও সুবিধাজনক হল না, কিন্তু সেটা একেবারেই অন্য কারণে। লোকটা উপস্থিত হয়েছিল শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক আর নোংরা বুটজুতো পরে এবং পুলিশের এত সতর্কতা ও প্রাথমিক 'পরীক্ষা' সত্ত্বেও হঠাৎ দেখা গেল লোকটা

একেবারে মাতাল অবস্থায় এসেছে। মিতিয়া তাকে যে অপমান করেছিল সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে জবাব দিতে অস্বীকার করল।

"ঈশ্বর দেখবেন ওকে! আমার ইলিউশা আমাকে বারণ করে দিয়েছে। ঈশ্বর আমাকে ওখানে ওর প্রতিদান দেবেন, হুজুর।"

"কে আপনাকে বলতে বারণ করেছে? আপনি কার কথা মনে করে বললেন?"

"কে আবার? ইলিউশা—আমার ছেলে। 'বাপি, বাপি, তোমাকে কী অপমানটাই না করল!' রাস্তার পাথরের ওই জায়গাটায় আমায় বলেছিল। এখন মারা যেতে বসেছে, হুজুর

ক্যাপ্টেন হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ধপ্ করে সভাপতির পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জনসাধারণের উচ্চকিত হাসির মধ্যে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। প্রসিকিউটর সকলের মনে যে ছাপটা ফেলার আয়োজন করেছিলেন সেটা ধোপে টিকল না।

এদিকে প্রতিবাদী কৌঁসুলি সমস্ত রকম উপায়ের সদ্ব্যবহার চালিয়ে যেতে লাগলেন, মামলার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিশদ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লোকে উত্তরোত্তর বেশি করে অবাক হয়ে যেতে লাগল। এই ভাবে, যেমন ত্রিফন বরিসভিচের সাক্ষ্য আদালতে বেশ ভালো রকমের ছাপ ফেলতে যাচ্ছিল—বলাই বাহুল্য—মিতিয়ার বড়ো বেশি প্রতিকূলেই চলে যাচ্ছিল। সে বলতে গেলে প্রায় আঙুলে গুনে গুনে বলেছিল দুর্ঘটনার প্রায় এক মাসে আগে মিতিয়া প্রথম যখন মোক্রয়েতে এসেছিল তখন যে পরিমাণ টাকা সে খরচ করেছিল তা তিন হাজারের কম না হয়ে যায় না অথবা 'খুব কম করে হলেও তা তো হবেই।' একমাত্র জিপসি মেয়েগুলোর পিছনেই কত টাকা না উড়িয়েছিল! আর আমাদের এই উকুনে চাবাভুসোগুলোর পিছনে! সে আপনার 'রাস্তায় আধুলি ছুড়ে দেওয়া নয়!' 'খুব কম করে হলেও পঁচিশ রুবলের একেকটি নোট ওদের উপহার দিয়েছিলেন, এর কম কোনোমতেই দেননি। আর কত টাকা যে তখন তাঁর স্রেফ চুরি গিয়েছিল তার কোনও লেখাজোখা নেই! কেউ যদি চুরি করে থাকে সে তো আর ধরার মতো কিছু রেখে যায়নি। সেই চোরকে ধরবে কে যখন উনি নিজেই খামোকা টাকা নয়ছয় করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন! আরে, আমাদের লোকজন হল সব ডাকাত! ওদের মন বলে কিছু আছে না কি! আর মেয়েগুলোর বেলায়? আমাদের পাড়াগাঁয়ের এই মেয়েগুলোর বেলায় সে যা হল! তখন থেকে আমাদের ওগুলো ত সব ফুলে ফেঁপে বড়লোক হয়ে গেল। তবে আর কী বলছি। এর আগে সব গরিবগুর্বো ছিল।' এক কথায়, খরচের প্রতিটি বস্তু মনে করে ধরে ধরে সে সেগুলির সঠিক হিসাব কষে দেখাল। এই ভাবে দেখা গেল আগে যে অনুমান করা হয়েছিল যে খরচ হয়েছিল মাত্র দেড় হাজার আর বাকিটা গলার তাবিজের থলির ভেতরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিল সেটা হতে পারে না।

‘নিজে দেখেছি একটা পয়সার মতো পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি ওর হাতে তিন হাজার রুবল। চোখে দেখেই ধরে ফেলেছি। টাকাপয়সার হিসাব কি আর আমরা বুঝি নে!’ ‘কর্তাব্যক্তিদের’ যতদূর পারা যায় মন জোগানোর চেষ্টায় ত্রিফন বরিসভিচ্ চিৎকার করে বলল।

কিন্তু জেরা করার সুযোগ যখন প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি ফেতিউকভিচের ওপর বর্তাল তখন তিনি সাক্ষ্য খণ্ডন করার কোনো চেষ্টাই প্রায় করলেন না, তার বদলে দুম্ করে যে প্রসঙ্গটা দিয়ে ভাষণ শুরু করলেন সেটা এই যে মিতিয়ার গ্রেপ্তার হওয়ার আরও এক মাস আগে মোক্রয়েতে প্রথম বারের হুল্লোড়বাজির সময় মিতিয়া যখন নেশার ঘোরে ছিল তখন যাতায়াতের বারান্দায় তার হাত থেকে এক শ রুবল পড়ে যেতে কোচোয়ান তিমফিয়েই এবং আকিম নামে আরেকজন চাষি মেঝেতে সেই টাকা কুড়িয়ে পেয়ে তা ত্রিফন বরিসভিচের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং ত্রিফন বরিসভিচ্ সেজন্য তাদের দুজনকে এক রুবল করে বখশিস দিয়েছিল। ‘এখন আমার প্রশ্ন হল সেই একশ রুবল আপনি তখন মিস্টার কারামাজভ্‌কে ফেরত দিয়েছিলেন কি?’ ত্রিফন বরিসভিচ্ প্রশ্নটাকে যতই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করুক না কেন, এর পর চাষি দুজনকে যখন জেরা কর হল তখন আর পড়ে পাওয়া এক শ রুবলের কথা স্বীকার না করে তার কোনও উপায় রইল না; তবে শুধু এটাই যোগ করল যে ধর্মত সে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্‌কে তখন সব ফেরত দিয়ে দিয়েছিল, ‘অত্যন্ত সততার সঙ্গে’ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল, ‘তবে কিনা উনি নিজে তখন একেবারে মাতাল অবস্থায় ছিলেন, এজ্ঞে, তাই মনে করতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।’ কিন্তু তা হলে কী হবে, সাক্ষী দুই চাষিকে ডাকার আগে পর্যন্ত যেহেতু পড়ে পাওয়া এক শ রুবলের কথা অস্বীকার করেছিল তাই নেশাগ্রস্ত মিতিয়াকে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে যে সাক্ষ্য সে দিল স্বাভাবিক ভাবেই তাতে বড়ো রকমের সন্দেহ দেখা দিল। এই ভাবে এবারেও প্রসিকিউটরের হাজির করা আরও একজন অতি বিপজ্জনক সাক্ষীকে শেষ পর্যন্ত সন্দেহভাজন হয়ে এবং চূড়ান্ত বদনামের বোঝা নিয়ে অপদস্থ হয়ে বিদায় নিতে হল।

দুই পোল সন্তানের বেলায়ও এই একই রকম ঘটনা ঘটল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় তাদের আবির্ভাবের মধ্যে বেশ একটা দাম্ভিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের ভাব ফুটে উঠেছিল। তারা তাদের সাক্ষ্যে জোর গলায় ঘোষণা করল যে প্রথমত, তারা দুজনেই ‘রাজকীয় চাকুরিতে বহাল’ ছিল এবং ‘পান মিতিয়া’ তিন হাজার রুবল উৎকোচ দিয়ে তাদের সম্মান কিনে নিতে চেয়েছিলেন, আর তাঁর হাতের মুঠোয় যে অনেক টাকা ছিল সেটা তারা স্বচক্ষে দেখেছে। পান মুসিয়ালভিচ্ তার কথার মধ্যে সাঙ্ঘাতিক বেশি বেশি পোল ভাষার শব্দ ব্যবহার করছিল, এবং তাতে যে সভাপতি মশাই আর প্রসিকিউটরের চোখে তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিই পাচ্ছে এটা লক্ষ করে তার উৎসাহ বাড়তে বাড়তে এমন মাত্রাছাড়া হয়ে উঠল যে শেষকালে সে পুরোপুরি পোল ভাষাতেই

কথা বলতে শুরু করে দিল। কিন্তু ফেতিউকভিচ তাদেরও জালে আটকে ফেললেন। আবারও ত্রিফন বরিসভিচের ডাক পড়ল। এবারেও ত্রিফন বরিসভিচ্ যতই এড়ানোর চেষ্টা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হল যে পান্ ভ্রুব্লিয়োভ্স্কি তার দেওয়া তাসের প্যাকেট হাত সাফাই করে নিজের প্যাকেট দিয়ে বদলি করে ফেলেছিল এবং পান্ মুসিয়ালভিচ্ তাসের বাজি রাখার সময় কারচুপি করেছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে কালাগানভ্ যখন সাক্ষ্য দিয়েছিল তখন তার সাক্ষ্যেও এর সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। ওই দুই পোল ভদ্রলোককে তাই বেশ খানিকটা লজ্জায় পড়ে উপস্থিত সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে কাঠগড়া ছাড়তে হয়েছিল।

এর পর আরও যে সমস্ত অতি বিপজ্জনক সাক্ষী বাদ ছিল তাদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ফেতিউকভিচ এক এক করে ধরে তাদের প্রত্যেকের নৈতিক চরিত্রে কালিমা লেপন করতে পেরেছিলেন এবং তাদের নাকাল করে ছেড়েছিলেন। কৌতূহলী লোকজন ও আইনজ্ঞরা এতে মুগ্ধ হয়েছিল—কিন্তু ওই পর্যন্তই। তা সত্ত্বেও, এত সব আয়োজন কী এমন বড়ো ধরনের ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এই ভেবে তারা হতবুদ্ধিও হয়ে পড়েছিল; কারণ, আবারও বলছি, অভিযোগ যে অকাট্য এবং মামলা যে ক্রমেই বেশি করে এক দুর্নিবার শোকাবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিল এটা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছিল। কিন্তু আমাদের এই 'গ্রেট ম্যাজিশিয়ানটি' তাঁর বিশ্বাসে এমনই অনড়, তিনি এমনই ধীরস্থির যে তা দেখে তারা এই আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল যে ওঁর মতন 'এমন একটা মানুষ' পেতের্বুর্গ থেকে তো আর অমনি-অমনি আসেননি। কিছু না নিয়ে ফিরে যাবেন এমন পাত্রও তিনি নন।

## তিন

## চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদল ও এক পাউন্ড বাদাম

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টও আসামিকে খুব একটা সাহায্য করতে পারল না। তাছাড়া ফেতিউকভিচের ভাবগতিক দেখেও মনে হয়েছিল—এবং পরে দেখা গেল সেটা ঠিকও বটে—সে নিজেও তার ওপর বড়ো একটা ভরসা করেনি। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণের মূলে ছিল কাতেরিনা ইভানভ্না। একমাত্র তারই পীড়াপীড়িতে এটা করা হয়েছিল। সে-ই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মস্কো থেকে একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। প্রতিপক্ষের অবশ্য এতে হারানোর কিছু ছিল না, বরং কপাল ভালো থাকলে এ থেকে কিছুটা লাভবান হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। সে যাই হোক, এখানেও হাস্যকর গোছের একটা বিষয় প্রকাশ পেল। ডাক্তারদের মধ্যে কিছু কিছু মতবিরোধের কারণেই এটা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ বলতে

ছিলেন মস্কো থেকে আগত বিখ্যাত ডাক্তার, তারপর আমাদের ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে এবং অল্পবয়সি ডাক্তার ভার্‌ভিন্‌স্কি। শেষোক্ত দুজন আবার প্রসিকিউটরের তলব করা সাধারণ সাক্ষীদের মধ্যেও ছিল।

প্রথম যাকে জেরা করার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাকা হয়েছিল তিনি ছিলেন ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে। সত্তর বছরের বৃদ্ধ, পাকা চুল, মাথায় টাকও পড়েছে, উচ্চতা মাঝারি, দেহের গড়ন বেশ মজবুত। আমাদের শহরের সকলের তাঁর সম্পর্কে উঁচু ধারণা ছিল, সকলে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন একজন বিবেকবান ডাক্তার, ভারি চমৎকার সাধু প্রকৃতির মানুষ, অনেকটা 'হার্‌নহুট' বা 'মোরাভীয় ভ্রাতৃসঙেঘর'[৫২] সদস্যদের মতো, মিশনারি গোছের—ঠিক কোন্ সম্প্রদায়ের আমি বলতে পারছি না। আমাদের অঞ্চলে অনেককাল হল বসবাস করে আসছিলেন, তাঁর আচার ব্যবহার সকলের গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। সজ্জন, মানবদরদী। বিনা পারিশ্রমিকে অসুস্থ গরিব লোকজন আর চাষিদের চিকিৎসা করতেন। নিজেই তাদের ঝুপড়িতে, কুঁড়েঘরে যেতেন, তাদের চিকিৎসার জন্য টাকাপয়সা রেখে যেতেন। কিন্তু একগুঁয়েমিতে তিনি ছিলেন একটা গাধার মতো। কোনো একটা আইডিয়া তাঁর মাথায় একবার চেপে বসলে সে ভূত তাঁর মাথা থেকে ঝেড়ে বার করে সাধ্যি কার! প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে আমাদের শহরের প্রায় সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছিল যে বহিরাগত বিখ্যাত ডাক্তারটি আমাদের এখানে আসার প্রথম দু তিন দিনের মধ্যেই ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবের যোগ্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কিছু মন্তব্য করেছিলেন। ঘটনা এই যে মস্কোর এই ডাক্তারটি যদিও পঁচিশ রুবলের কম ভিজিট নিতেন না, তবু আমাদের শহরের কেউ কেউ তাঁর আগমনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, টাকার পরোয়া না করে পরামর্শের জন্য তাঁর পিছনে ছুটেছিল। এর আগে, বলাই বাহুল্য এই রোগীদের সকলের চিকিৎসা করতেন ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে। এখন বিখ্যাত ডাক্তারটি এসে সর্বত্র তাঁর চিকিৎসার রীতিমতো কড়া সমালোচনা শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল যে রোগীর কাছে উপস্থিত হলেই তিনি সরাসরি তাকে জিগ্‌গেস করতেন 'তা কে আপনার এমন বেহাল অবস্থা করে ছেড়েছে—হেরৎসেনশ্‌টুবে? হে-হে!' ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে অবশ্যই এ সব জানতে পেরেছিলেন। সে যাই হোক, তিন জন ডাক্তারই একের পর এক এজাহার দেবার জন্য হাজির হলেন।

ডাক্তার হের্‌ৎসেনশ্‌টুবে সরাসরি জানিয়ে দিলেন, আসামির 'মানসিক অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় তা অমনিতেই নজর কাড়ার মতো।' এর পর এ বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনারও পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে আমি আর সে সবের মধ্যে যাচ্ছি না। শেষ কালে তিনি যোগ করেছিলেন যে 'অভিযুক্ত ব্যক্তির অতীতের অনেক আচরণের মধ্যে তো বটেই, এখনও—এমন কি ঠিক এই মুহূর্তেও—তার এই অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ার মতো। তাঁকে যখন ব্যাখ্যা করতে বলা হল এখন,

ঠিক এই মুহূর্তে চোখে পড়ার মতো তিনি কী দেখলেন তখন সরল মনের এই বৃদ্ধ ডাক্তারটি কোনো রকম ভনিতা না করে সরাসরি যে ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তা এই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন আদালতকক্ষে প্রবেশ করল তখন তার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত ভাব লক্ষ করা গিয়েছিল যা পরিস্থিতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায়না। 'সে স্থির দৃষ্টিতে নাক বরাবর তাকিয়ে ফৌজি কায়দায় মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছিল, অথচ তাঁর পক্ষে বেশি সমীচীন ছিল বাঁ দিকে নজর দেওয়া, যেখানে জনসাধারণের মধ্যে মহিলারা বসে ছিলেন, যেহেতু সে ছিল রমণীকুলের পরম ভক্ত এবং মহিলারা এখন তার সম্পর্কে কী বলেন সেটাও তার খুব বেশি করে ভাবা উচিত ছিল।' বৃদ্ধ তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষায় উপসংহার টানলেন।

এখানে যোগ করা দরকার যে রুশ ভাষা তিনি খুবই বলতেন এবং উৎসাহের সঙ্গেই বলতেন, কিন্তু তাঁর প্রতিটি বাক্য অনিবার্যভাবে কেমন যেন জার্মান ভঙ্গিতে প্রকাশ পেত। অবশ্য তাতে তিনি কখনও অপ্রতিভ হতেন না, কারণ সারা জীবন ধরে তিনি মনে মনে এই দুর্বলতা পোষণ করে আসছিলেন যে তাঁর রুশ বাচন ভঙ্গিটা আদর্শ ধরনের, 'এমনকি রুশিদের চাইতেও ভালো'। শুধু তা-ই নয়, কথায় কথায় রুশ প্রবাদ প্রবচনের আশ্রয় নিতেও তিনি খুব ভালোবাসতেন, বারবার জোর দিয়ে এই কথাই বলতেন যে পৃথিবীর যে কোনো ভাষার প্রবাদ প্রবচনের তুলনায় রুশ প্রবাদ প্রবচন অনেক ভালো এবং অনেক বেশি ভাবগর্ভ। আরও একটি জিনিস লক্ষ করার মতো কথাবার্তা বলার সময়, অন্যমনস্কতার দরুন কি না কে জানে অনেক সময় অতি সাধারণ এমন সমস্ত শব্দ তিনি ভুলে যেতেন যেগুলি যদিও তাঁর উত্তম রূপে জানা ছিল, কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ কেন যেন তাঁর মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেত। অবশ্য তিনি যখন জার্মান বলতেন তখনও ঠিক এই কাণ্ডটাই হত, আর সে ক্ষেত্রে তিনি সব সময় তাঁর নিজের মুখের সামনে এমন ভাবে হাত নাড়াতেন যেন হারানো শব্দটি ধরার চেষ্টা করছেন। তখন কিন্তু যতক্ষণ তাঁর হারানো কথাটি তিনি খুঁজে না পাচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর প্রারব্ধ বক্তৃতা চালিয়ে যেতে কেউ তাঁকে বাধ্য করতে পারত না। আদালত কক্ষে প্রবেশ করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে মহিলাদের দিকে তাকানো উচিত ছিল, তাঁর এই মন্তব্যটি জনসাধারণের মধ্যে কৌতুকের মৃদু গুঞ্জন তুলেছিল। আমাদের এই ছোটখাটো বৃদ্ধ মহিলাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁরা এটাও জানতেন যে তিনি অকৃতদার, বিয়েশাদি না করেই সারাটা জীবন কাটিয়েছেন, ধর্মপ্রাণ ও সাত্ত্বিক ব্যক্তি, নারী জাতিকে অতি উন্নত ও আদর্শ সৃষ্টি রূপে গণ্য করেন। এই কারণে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্য সকলের কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল।

মস্কোর ডাক্তারটিকে তাঁর পালা আসতে প্রশ্ন করা হলে তিনিও তীব্র ভাষায় দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে বললেন যে তাঁরও ধারণা যে অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা

স্বাভাবিক নয়, এমন কি 'পূর্ণমাত্রায় অস্বাভাবিক'। 'স্নায়বিক বিকারের ঘোর' ও 'বাতিক' সম্পর্কে তিনি অনেক বিচক্ষণ কথা বলেছিলেন, সংগৃহীত যে সমস্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি এই সিদ্ধান্তে উপণিত হয়েছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বেশ কয়েকদিন যাবৎ নিঃসন্দেহে অসুস্থ বিকারের ঘোরের মধ্যে ছিল এবং সে যদি অপরাধ করে থাকে, সে সম্পর্কে যদি সে সচেতনও থাকে, তবু সেটা প্রায় অনিচ্ছাকৃতই ছিল, যেহেতু যে অসুস্থ মানসিকতা তাকে পেয়ে বসেছিল তার সঙ্গে এঁটে ওঠার শক্তি তার একেবারে ছিল না।

কিন্তু সাময়িক বিকারের ঘোর বাদে আরও যে জিনিসটা ডাক্তার বিবেচনা করে দেখেছিলেন সেটা ছিল এক ধরনের বাতিক, যা ইতিমধ্যে, তাঁর কথায়, ভবিষ্যতে অসুস্থ ব্যক্তির পুরোদস্তুর বাতুল হয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। (বি দ্র. এসব কথা আমি আমার নিজের ভাষায় বলছি, ডাক্তার কিন্তু অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণও বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।) 'ওর সমস্ত কাজকর্ম সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তির বিপরীত', তিনি বলে চললেন, 'আর যা আমি নিজের চোখে দেখিনি সেই প্রসঙ্গে, অর্থাৎ অপরাধের সেই ঘটনাটি এবং এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে তো বলাই বাহুল্য। তাই বা কেন? এই দু দিন আগে, যখন সে আমার সঙ্গেঁ কথা বলছিল এমনকি সেই সময়ও তার চোখে দুর্বোধ্য ধরনের একটা স্থির দৃষ্টি আমি দেখতে পেয়েছিলাম। যখন তখন আচমকা হেসে উঠছিল, যখন হাসার আদৌ কোনও কথা নয়। সবেতেই একটা বিরক্তির ভাব, যার কোনো কারণ বোধগম্য হচ্ছিল না: 'বের্নার, এথিক্‌স এই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত আরও এমন সব শব্দ সে ব্যবহার করছিল যা ছিল একেবারে অবান্তর।' কিন্তু ডাক্তার এই বাতিকটা বিশেষ করে দেখতে পেয়েছিলেন একটি ঘটনার মধ্যে: 'যে-তিন হাজার রুবল নিয়ে তার সঙ্গে প্রতারণা করে হয়েছিল বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ধারণা সে-সম্পর্কে কথা বলার সময়ও সে নিদারুণ বিরক্তি প্রকাশ না করে পারছিল না, অথচ নিজের আর সমস্ত অকৃতকার্যতা ও দুঃখের কথা সেই তুলনায় বেশ হালকা মনে স্মরণ করতে এবং বলতে পারছিল। সর্বোপরি খোঁজখবর নিয়ে এও জানা গেছে যে এর আগেও যতবার ওই তিন হাজারের কথা উঠেছে ততবারই সে কেমন যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠত, অথচ সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যাচ্ছে যে সে নিঃস্বার্থপর এবং অর্থলোলুপ সে আদৌ নয়। আমার বিদগ্ধ সহকর্মী ভ্রাতার যে অভিমত সে প্রসঙ্গে আমি শুধু এটাই বলতে পারি...' মস্কোর ডাক্তার পরিশেষে তাঁর ভাষণে কটাক্ষ করে যোগ করলেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আদালতকক্ষে প্রবেশ করে সোজা নাক বরাবর না তাকিয়ে মহিলাদের দিকে তাকানোই যে সমীচীন ছিল এই মর্মে যে সিদ্ধান্ত তিনি করেছেন তার মধ্যে একটা কৌতুকের ভাব তো আছেই, পরন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত রীতিমতো ভ্রান্তও বটে। কারণ, যদিও আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন তার ভাগ্য নির্ধারস্থল আদালতকক্ষে প্রবেশ

করছে তখন অমন স্থির দৃষ্টিতে সোজা নাক বরাবর তাকিয়ে থাকাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না এবং সেই মুহূর্তে বাস্তবিকই এটা তার অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে আমি জোর দিয়ে একথাও বলতে চাই যে বাঁ পাশে মহিলাদের দিকে নয়, বরং ঠিক ডান দিকটাতে দৃষ্টিপাত করা এবং দৃষ্টি দিয়ে কৌঁসুলিকে খোঁজাটাই তার পক্ষে সঙ্গত ছিল, যেহেতু তাঁর সাহায্যই অভিযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত আশাভরসা, তিনি কী ভাবে তাকে সমর্থন করবেন এখন তার ওপরই নির্ভর করছে তার ভাগ্য।' ডাক্তার দৃঢ় ভাবে তাঁর চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করলেন।

কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ দুই পণ্ডিতের মতভেদে বিশেষ করে কৌতুকের মাত্রা সঞ্চার করেছিল ডাক্তার ভার্‌ভিন্‌স্কির অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। তাঁর ডাক পড়েছিল সবার শেষে। তাঁর মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা আগে যেমন ছিল, তেমনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং যদিও গ্রেপ্তার হওয়ার আগে নিঃসন্দেহে তার পক্ষে নার্ভাস অবস্থাতে থাকাই সঙ্গত ছিল, এর পেছনে ঈর্ষা, ক্রোধ, একটানা দিনের পর দিন মদে চুর হয়ে থাকা ইত্যাদি রীতিমতো অনেক কারণও থাকতে পারত; কিন্তু এখানে যে বিশেষ এক ধরনের স্নায়বিক বিকারের কথা বলা হচ্ছে এই নার্ভাস অবস্থাকে কোনোমতেই তা বলা যায় না, আর অভিযুক্ত ব্যক্তির আদালতকক্ষে প্রবেশের সময় ডাইনে না বাঁয়ে কোন্ দিকে তাকানো উচিত ছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে তাঁর 'বিনীত নিবেদন' এই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে ভাবে সোজা নাক বরাবর তাকিয়ে ছিল, তাঁর মতে আসলে সেটাই সঙ্গত ছিল, যেহেতু সোজা তার সামনাসামনি বসে ছিলেন মাননীয় সভাপতি আর বিচারকমণ্ডলীর সদস্যরা, যাঁদের ওপর এখন পুরোপুরি তার ভাগ্য নির্ভর করছে। 'অতএব সে যে সোজা নাক বরাবর তাকিয়ে ছিল ঠিক এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক', বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে এই বলে যুবক ডাক্তারটি তাঁর সাক্ষ্যের 'বিনীত নিবেদনে' সমাপ্তি টানলেন।

"শাবাশ বদ্যিমশাই!" মিতিয়া তার জায়গা থেকে চিৎকার করে বলে উঠল। "যা বলেছ!"

মিতিয়াকে, বলাই বাহুল্য, থামিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যুবক ডাক্তারটির অভিমত যেমন বিচারকমণ্ডলীর ওপর তেমনি উপস্থিত জনসাধারণের ওপরও চূড়ান্ত রকমের প্রভাব ফেলেছিল, কেন না পরে দেখা গিয়েছিল সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত। তবে যাই হোক না কেন ডাক্তার হের্‌ৎসেনশটুবেকে যখন ইতিমধ্যে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়েছিল তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, হঠাৎ করে মিতিয়ার উপকারে লেগে গিয়েছিলেন। এই শহরের একজন পুরনো বাসিন্দা হিসেবে, তিনি অনেক দিন থেকে কারামাজভ্ পরিবারকে জানতেন। তিনি 'অভিযোগ দায়ের করার পক্ষে' অত্যন্ত

আগ্রহোদ্দীপক বেশ কিছু সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎই যেন কিছু একটা মনে হতে তিনি যোগ করেছিলেন

"তবে হ্যাঁ হতভাগ্য যুবকটি আরও অনেক ভালো, অতুলনীয় ভাগ্যের অধিকারী হতে পারত, যেহেতু ওর মনটা বড়ো ভালো ছিল—যেমন ছোটোবেলায়, তেমনি তার পরেও, কারণ এটা আমি জানি। কিন্তু রুশ প্রবাদে বলে 'কারও যদি একটা মাথার বুদ্ধি থাকে সেটা ভালো, কিন্তু আরও একজন বুদ্ধিমান মানুষ যদি তার অতিথি হয় সেটা হবে আরও ভালো, যেহেতু তখন আর একটা মাথা থাকছে না, দুটো মাথা এক হচ্ছে

"একটা মাথার বুদ্ধি ভালো, দুটো মাথার আরও ভালো" অধৈর্য হয়ে প্রসিকিউটর তাঁকে আসল প্রবাদটা মনে করিয়ে দিলেন। প্রসিকিউটর বৃদ্ধের ধীরে ধীরে টেনে টেনে কথা বলার অভ্যাসের সঙ্গে বহুকাল হলই পরিচিত। কিন্তু এর ফলে তাঁর কথার প্রভাব যে কী হতে পারে এবং তিনি যে তাঁর শ্রোতাদের অপেক্ষা করে থাকতে বাধ্য করছেন এ নিয়ে বৃদ্ধের মাথাব্যথা ছিল না। শুধু তা-ই নয় তিনি তাঁর শক্ত-শক্ত বোদা-বোদা স্বাদের এবং আত্মপ্রসাদে সদা উচ্ছ্বসিত জার্মান রসিকতাকে বরং বেশ ভালোই মূল্য দিতেন। রসিকতা করতে তিনি ভালোও বাসতেন।

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম", কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়ে একরোখা ভঙ্গিতে বৃদ্ধ বলে উঠলেন। "একটা বুদ্ধি ভালো, দুটো বুদ্ধি আরও বেশি ভালো। কিন্তু বুদ্ধি নিয়ে কেউ আর ওর কাছে এলো না। এদিকে ওর নিজের যা বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল তাও গেছে। কী ভাবে, কোথায় তা ছেড়ে দিল? কোথায় সে ছেড়ে দিল তার নিজের বুদ্ধি? কথাটা আমি ভুলে গেছি", নিজের চোখের সামনে হাত ঘুরিয়ে কথাটা হাতড়াতে হাতড়াতে বৃদ্ধ বলে চলল। "ও হ্যাঁ, 'শ্‌পাৎসিরেনে'।"

"ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিল বলছেন?"

"তা-ই বটে। ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিল। আমিও ঠিক এটাই বলতে যাচ্ছিলাম। ওর বুদ্ধি ওকে ছেড়ে দিয়ে খেয়াল খুশি মতো ঘুরে বেড়াতে শুরু করল, ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়ল যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। অথচ এটা ঠিক ছেলেটার কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল, ভাবপ্রবণতা ছিল। আহা, আমার বেশ মনে আছে যখন ও এইটুকুন বাচ্চাটি ছিল ওর বাপের অবহেলায় ওর ঠাঁই হয়েছিল বাড়ির পেছনের আঙিনায়, যখন ও বুটছাড়া খালি পায়ে মাটিতে ছুটোছুটি করে বেড়াত আর ওর পরনের প্যান্টের সম্বল ছিল একটি মাত্র বোতাম। "

এই সৎচরিত্রের বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে হঠাৎই কেমন যেন একটা কোমল অনুভূতি ও দরদের ভাব ফুটে উঠেছিল। ফেতিউকভিচ্ সঙ্গে সঙ্গে কীসের যেন একটা আঁচ পেয়ে চমকে উঠলেন, ব্যাপারটা চট করে তাঁর মনে ধরে গেল।

"আর হ্যাঁ, আমার নিজেরও তখন বয়স কম ছিল। আমার তখন ...হ্যাঁ...

আমার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর, আমি তখন সবে এখানে এসেছি। ছেলেটাকে দেখে তখন আমার মায়া হয়েছিল। আমি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম: ওকে কিনে দিলে কেমন হয় পাউণ্ডখানেক আহা, ওই যে কী যেন বলে? এই দেখ, ভুলে গেছি কী বলে ওটাকে ... পাউন্ডখানেক ওই ওটা, যেটা বাচ্চারা খুব ভালোবাসে কী যেন কী যেন " ডাক্তার আবারও হাত নাড়াতে শুরু করলেন। "আরে ওই যে গাছে ফলে, যেগুলো জড়ো করে এনে একে ওকে দেওয়া হয়

"আপেল নাকি?"

"আরে না না! পাউন্ড, পাউন্ড। আপেল তো আর পাউন্ড দরে বিক্রি হয় না, ডজন দরে বিক্রি হয়। ওগুলো অনেক অনেক করে ফলে, সব ছোটো ছোটো, মুখে পুরে কট্-কট্ কটাশ!

"বাদাম?"

"আরে হ্যাঁ, বাদাম। আমিও তো তাই বলছি।" এমনই শান্ত কণ্ঠে ডাক্তার কথাটা সমর্থন করলেন যেন আদৌ সেটা তাঁকে খুঁজতে হয়নি। "তা আমি ছেলেটার জন্য এক পাউন্ড বাদাম নিয়ে এলাম, কেন না এর আগে কেউ কখনও ওকে এক পাউন্ড বাদাম এনে দেয়নি। আমি ওকে কাছে ডেকে একটা আঙুল তুলে বললাম, 'এই যে খোকা! Gott der Vater",* হাসতে হাসতে তিনি বললেন। "Gott der Vater—Gott der Sohn**..." আরও একবার হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে তিনি বললেন, Gott der Sohn–Gott der heilige Geist।"*** তখন সেও হাসতে হাসতে যতটা পারে উচ্চারণ করে বলল, Gott der heilige Geist'।" আমিও চলে গেলাম। এই ঘটনার দুদিন পরে আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম ও নিজেই চিৎকার করে আমাকে বলছে, 'কাকু কাকু, Gott der Vater, Gott der Sohn.।' কেবল Gott der heilige Geist কথাটাই ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম। আবারও ওর জন্য আমার খুব মায়া হতে লাগল। কিন্তু ওকে ওখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এর পর আমি আর ওকে দেখতে পাইনি। এর পর তেইশ বছর কেটে গেছে। এক দিন সকালে আমি আমার কাজের ঘরে বসে আছি, আমার মাথার চুল ততদিনে সাদা হয়ে গেছে, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল এক প্রাণবন্ত যুবক, যাকে আমি কোনো মতেই চিনতে পারলাম না। কিন্তু যুবক একটা আঙুল তুলে হাসতে হাসতে বলল 'Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist! আমি এই মাত্র এসেছি, এসেই সেই এক পাউন্ড বাদামের জন্য

---

* ঈশ্বর পিতা (জার্মান)

** ঈশ্বর পিতা—পুত্রও ঈশ্বর (জার্মান)

*** পুত্র ঈশ্বর—ঈশ্বরই পবিত্র আত্মা (জার্মান)

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলাম, কেন না তখন আমাকে কেউ কখনও এক পাউন্ড বাদাম কিনে দেয়নি, একমাত্র আপনিই কিনে দিয়েছিলেন।' তখনই আমার মনে পড়ে গেল আমার সেই সুখের যৌবনের কথা আর আঙিনায় দেখা বুট জুতো ছাড়া খালি পায়ে সেই দুঃখী ছেলেটাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমি বললাম, 'তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ আছে দেখছি ইয়ং ম্যান, নইলে সেই ছোটবেলায় কবে তোমাকে এক পাউন্ড বাদাম এনে দিয়েছিলাম সেটা কিনা সারা জীবন মনে করে রেখেছ!' আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলাম। আমার চোখে জল এসে গেল। ও হাসছিল, কিন্তু হাসতে হাসতে ও-ও কেঁদে ফেলল

কেন না রুশিদের স্বভাবটাই হল যেখানে কাঁদা দরকার বেশির ভাগ সময় সেখানে হাসে। কিন্তু ও কেঁদেও ছিল, আমি তা দেখেছি। আর এখন হায়, এ আমি কী দেখছি!

"এখনও কাঁদি, জার্মান, এখনও কাঁদি, ওগো আমার দেবতুল্য মানুষটি!" মিতিয়া হঠাৎ তার জায়গা থেকে চিৎকার করে বলে উঠল।

সে যা-ই হোক না কেন, এই ছোটো ঘটনাটির উল্লেখ কিন্তু জনসাধারণের মনের মধ্যে কতকটা অনুকূল ভাবের সঞ্চার করেছিল। তবে মিতিয়ার অনুকূলে সবচেয়ে বড়ো চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার এজাহার, যার কথা আমি এখন বলব। তাছাড়া মোটের ওপর যখন à décharge সাক্ষীদের, অর্থাৎ প্রতিবাদী কৌঁসুলির ডাকা সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান শুরু হল তখন মিতিয়ার ভাগ্য যেন হঠাৎই—এমনকি এতটাই প্রসন্ন হয়ে উঠল যে তা লক্ষ করার মতো ছিল। আর সব চাইতে চমকপ্রদ এই যে আত্মপক্ষ সমর্থনকারীর কৌঁসুলির নিজের কাছে পর্যন্ত সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্‌নারও আগে জেরা করা হয়েছিল আলিয়োশাকে। আলিয়োশা আকস্মিক ভাবে এমন একটি ঘটনার কথা স্মরণ করল যা মিতিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের বিরোধিতা করেছিল, এমনকি ইতিমধ্যেই তার পক্ষে এক ধরনের সদর্থক সাক্ষ্যের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

## চার

## মিতিয়ার ভাগ্য মুখ তুলে চাইল

ঘটনাটা যে ভাবে ঘটেছিল তা আলিয়োশার নিজের কাছে পর্যন্ত একেবারে আকস্মিক ছিল। তাকে কোনো হলফনামা পড়তে হয়নি। আমার মনে আছে জেরার একেবারে গোড়া থেকে দুই পক্ষই তার সঙ্গে বাক্য ব্যবহারে অত্যন্ত নম্রতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিল। দেখাই যাচ্ছিল এর পিছনে কারণ ছিল তার সুনাম। আলিয়োশার সাক্ষ্যে বিনয় ও সংযমের পরিচয় ছিল, কিন্তু তার সাক্ষ্যে তার হতভাগ্য দাদার

প্রতি প্রবল সহানুভূতিও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল। একটি প্রশ্নের উত্তরে দ্মিত্রির চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলল মানুষটি সম্ভবত যেমন উগ্রস্বভাবের তেমনি বড় বেশি আবেগতাড়িত ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎ, উদার এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্নও ছিল, এমনকি প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করার মতো ক্ষমতাও তার ছিল। অবশ্য এটাও স্বীকার করল যে গ্রুশেন্‌কার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ এবং সেই ব্যাপারে বাবার সঙ্গে তার রেষারেষির ফলে শেষ দিকে সে একটা দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ছিল। কিন্তু দ্মিত্রি যে বাটপারির উদ্দেশ্যে খুন করতে পারে এই অনুমান আলিয়োশার কাছে এমনই অকল্পনীয় মনে হয়েছিল যে প্রবল বিতৃষ্ণা ও ক্রোধের সঙ্গে সে তা উড়িয়ে দিল, যদিও স্বীকার করল যে ওই তিন হাজারের ব্যাপারটা দ্মিত্রির মাথার ভেতরে প্রায় এক ধরনের বাতিকের মতো গেঁথে বসে গিয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তার ন্যায্য পাওনার এই ওই বাকি অংশটা তাকে পরিশোধ না করে বাবা তাকে ঠকিয়েছিল বলে সে মনে করত। অমনিতে সে ছিল নির্লোভ, কিন্তু তার মতো নির্লোভ মানুষও ওই তিন হাজার রুবলের কথা বলতে গিয়ে হতবিহ্বল ও উন্মত্ত ভাব প্রকাশ না করে পারত না। প্রসিকিউটর যাদের দুই 'বিশিষ্ট মহিলা' বলে উল্লেখ করেছিলেন তাদের, অর্থাৎ গ্রুশেন্‌কা ও কাতিয়ার রেষারেষির প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর আলিয়োশা কতকটা এড়িয়ে গেল, এমনকি সংশ্লিষ্ট দু একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে একেবারেই অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

"আপনার ভাই কি অন্তত এরকম কোন্ কথা আপনাকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বাবাকে খুন করতে চান?" প্রসিকিউটর জিগ্‌গেস করল। "অবশ্য সে রকম মনে হলে উত্তর নাও দিতে পারেন", সে যোগ করল।

"সরাসরি বলেনি", আলিয়োশা উত্তর দিল।

"তাহলে কী ভাবে? পরোক্ষে?"

"একবার আমাকে বলেছিল যে বাবাকে ঘেন্না করে, এও বলেছিল যে ওর ভয় হয় কোনো এক চরম মুহূর্তে প্রচণ্ড ঘৃণার বশে হয়তো তাকে খুন করেও বসতে পারে।"

"শুনে আপনি কি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলেন?"

"আমার বলতে বুক কাঁপছে, আমার বিশ্বাস হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে কখনও এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগেনি যে উন্নত ধরনের কোনো এক উপলব্ধি সমূহ সঙ্কটের মুহূর্তে ওকে সব সময়ই রক্ষা করবে। আসলে রক্ষা করেওছে, কেন না ও আমার বাবাকে *খুন করেনি*", আদালতকক্ষে উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে আলিয়োশা তার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করল।

শৃঙ্গধ্বনির সঙ্কেত কানে গেলে যুদ্ধের ঘোড়ার যে রকম অবস্থা হয় এই কথা শোনামাত্র প্রসিকিউটরও তেমনি চমকে উঠলেন।

"আপনার হতভাগ্য ভাইয়ের প্রতি আপনার যে ভালোবাসা তার ওপর কোনো

রকম ভিত্তি না করে বা তার সঙ্গে কোনো মতে না জড়িয়েই আমি বলছি, আপনার এই দৃঢ় প্রত্যয় যে সম্পূর্ণ আন্তরিক সে বিশ্বাস আমার পূর্ণমাত্রায় আছে। আপনাদের পরিবারে এই যে এত বড়ো একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল সে সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্ত থেকে পেয়েছি। আপনার কাছ থেকে আমার গোপন করার কিছু নেই যে আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গি অতিমাত্রায় আপনার নিজস্ব, প্রসিকিউটরের দপ্তরে অন্য আরও যে সমস্ত সাক্ষ্য জমা পড়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তাই আমার মনে হয় আপনাকে একান্ত ভাবে প্রশ্ন করা প্রয়োজন ঠিক কী এমন তথ্য আপনার কাছে আছে যার দ্বারা আপনার চিন্তা পরিচালিত হয়েছিল এবং সেই চিন্তা আপনার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারল যে আপনার ভাইয়ের কোনো অপরাধ নেই, বরং অপরাধী অপর এক ব্যক্তি, যার সরাসরি উল্লেখ আপনি ইতিমধ্যে প্রাথমিক তদন্তের সময়ই করেছিলেন?"

"প্রাথমিক তদন্তের সময় আমি কেবল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম", মৃদু ও শান্ত কণ্ঠে আলিয়োশা বলল। "আমি নিজে থেকে স্মের্দিকোভের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে যাইনি।"

"কিন্তু তাহলেও তার উল্লেখই তো করলেন?"

"আমি আমার ভাই দ্‌মিত্রির মুখের কথা শুনে তা করেছিলাম! দ্‌মিত্রির গ্রেপ্তার হওয়ার সময় কী ঘটেছিল এবং সে নিজে তখন যে স্মের্দিকোভ্‌কেই দেখিয়ে দিয়েছিল জেরার আগেই আমি এসব কথা শুনেছি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ভাই দোষী নয়। আর খুন যদি সে না করে থাকে   তাহলে

"তাহলে কী? তাহলে স্মের্দিকোভ্? এত লোক থাকতে স্মের্দিকোভ্ কেন? আর আপনারই বা কী বলে চূড়ান্ত ভাবে এই বিশ্বাস জন্মাল যে আপনার ভাই নিরপরাধ?"

"আমার ভাইকে বিশ্বাস না করে আমি পারিনি আমি জানি সে আমার কাছে মিথ্যে বলবে না।"

"শুধুই মুখ দেখে? আপনার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বলতে এই?"

"এর বাইরে আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার কাছে নেই।"

"আর স্মের্দিকোভের অপরাধের প্রমাণ? সেক্ষেত্রেও কি কেবল আপনার ভাইয়ের মুখের কথা আর তার মুখের অভিব্যক্তি ছাড়া, যৎসামান্য হলেও, অন্য আর কোনও প্রমাণ আপনি দেখাতে পারছেন না?"

"না, আর কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই।"

এখানেই প্রসিকিউটর তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ ছেদ টানলেন। আলিয়োশা জনসাধারণের মনে যা ছাপ ফেলেছিল তা রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জক। মামলা আদালতে ওঠার আগেই এখানে লোকে স্মের্দিকোভের কথা বলাবলি করছিল। কেউ কেউ কী না কী যেন শুনেছিল, কেউ কেউ আরও কিছুর উল্লেখ করছিল। আলিয়োশার প্রসঙ্গে তারা বলছিল

সে নাকি তার ভাই যে নিরপরাধ এবং ভৃত্য স্মের্দিকোভ্ই যে অপরাধী এই ব্যাপারে মোক্ষম সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে রেখেছে। শেষ কালে কি না এই! কিছুই না! কোথাকার কতকগুলি নৈতিক বিশ্বাস ছাড়া সাক্ষ্যপ্রমাণ বলতে কিছুই নেই। এ ধরনের বিশ্বাস আসামির ভাই হিসেবে তার যে থাকবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু ফেতিউকভিচ্ও জেরা শুরু করে দিলেন। আলিয়োশাকে যখন প্রশ্ন করা হল ঠিক কখন তাকে, আলিয়োশাকে আসামি বলেছিল যে সে তার বাবাকে ঘৃণা করে, পারলে তাকে খুন করে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুর্ঘটনার আগে তাদের যে শেষ সাক্ষাৎকার হয়েছিল সেই সময় তার মুখ থেকে সেটা সে শুনেছিল কি না সে কথার উত্তর দিতে গিয়ে আলিয়োশা হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠল, মনে হল এই মাত্র এখনই কিছু একটা মনে পড়ে যেতে সে মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিল।

"আমার এখন মনে পড়ে যাচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতির কথা যা আমি নিজেও একদম ভুলে যেতে বসেছিলাম। তবে সেই সময় আমার কাছে ওটা তেমন পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু এখন "

বলতে বলতে আলিয়োশা এমন ভাবে তন্ময় হয়ে পড়ল যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সে নিজে সবে এই এখন আচম্বিতে একটা আইডিয়ার সন্ধান পেয়েছে। সে মনে করে বলল যে সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, মঠে যাবার পথে গাছতলায় মিতিয়ার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের সময় মিতিয়া বুকে করাঘাত করে, 'বুকের ওপরের অংশে' করাঘাত করে বেশ কয়েকবার তার কাছে এই কথাই আউড়েছিল যে নিজের সম্মান পুনরুদ্ধারের একটা উপায় ওর আছে, আর সেটা আছে এই এখানে, ওর বুকে। আমি তখন ভেবেছিলাম ও বুঝি নিজের বুক চাপড়ে বোঝাতে চাইছিল যে ওর 'অন্তরের অন্তস্তলে' কোথাও কোনো একটা শক্তির সন্ধান সে করছিল যার সাহায্যে ভয়ঙ্কর রকমের এমন এক অসম্মান থেকে সে রেহাই পেতে পারে যা তার কাছে আসন্ন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যার কথা আমার কাছে পর্যন্ত মুখ ফুটে বলার সাহস তার ছিল না। আমি স্বীকার করছি, সেই সময় আমি এটাই ভেবেছিলাম যে ও বাবার কথা বলছে এবং যে কলঙ্কের কথা ভেবে ও শিউরে উঠছে সেটা এই চিন্তা করে যে পাছে বাবার কাছে গিয়ে তার ওপর কোন রকম বলপ্রয়োগ করতে হয়। অথচ ও কিন্তু তখন ওর বুকের ওপরের কিছু একটা দেখাচ্ছিল। ফলে আমার মনে আছে, ঠিক তখনই আমার মনের মধ্যে এক ঝলক কেমন যেন একটা চিন্তার উদয় হয়েছিল যে হৃদয় বা অন্তর বলতে যে জায়গাটা বোঝায় সেটা একেবারেই বুকের ওই পাশটাতে নয় এবং আরেকটু নিচেও হওয়ার কথা, অথচ ও যেখানে করাঘাত করছে সেটা অনেকটা ওপরে, এই এখানে, ঘাড়ের ঠিক নিচটাতে, বারবার সেই জায়গাটাই দেখাচ্ছে। আমার চিন্তাটা তখন আমার কাছে বোকা-বোকা মনে হয়েছিল, আসলে কিন্তু ও হয়তো তখন দেখাতে চাইছিল ওর গলায় ঝোলানো

তাবিজের সেই থলেটা যার মধ্যে ওই দেড় হাজার সেলাই করে রাখা হয়েছিল!..."

"ঠিক তাই!" মিতিয়া ওর জায়গা থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।" আসলে তাই, আলিয়োশা, তাই। আমি তখন ঘুষি পাকিয়ে ওটার ওপরই ঠুকছিলাম!"

ফেতিউকভিচ্ হাঁ-হাঁ করে তার দিকে ধেয়ে গেলেন, তাকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ, নিমেষের মধ্যে আবার আলিয়োশাকে নিয়ে পড়লেন। আলিয়োশা নিজেই তার স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে তার নিজের এই অনুমান ব্যক্ত করল যে কলঙ্ক লাগার আশঙ্কার কারণ খুব সম্ভব এটাই ছিল যে ওই দেড় হাজার রুবল তার হাতে থাকায় কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে তার ঋণের অর্ধেকটা সে শোধ করতে পারত বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মনস্থ করেছিল সেই অর্ধেক তাকে ফেরত না দিয়ে বরং অন্য কাজে লাগাবে, অর্থাৎ গ্রুশেন্‌কাকে নিয়ে পালানোর সময় কাজে লাগাবে—অবশ্য যদি সে ওর সঙ্গে যেতে রাজি থাকে।...

"তাই, ঠিকই তাই", সহসা উত্তেজিত হয়ে আলিয়োশা বলে উঠল। "আমার দাদা তখন চিৎকার করে আমাকে এই কথাই বলেছিল যে অসম্মানের অর্ধেক বোঝা—অর্ধেক কথাটা সে বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেছিল!—সে ইচ্ছে করলে এখনই নিজের ঘাড় থেকে নামাতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার চরিত্র এত দুর্বল যে সেটা সে করতে যাচ্ছে না   আগে থাকতেই জানে যে একাজ সে করতে পারবে না, করার মতো মনের জোর তার নেই!"

"আপনি কি স্পষ্ট মনে করে জোর দিয়ে এমন কথা বলতে পারেন যে উনি ওঁর বুকের ঠিক ওই জায়গাটাতেই ঘুষি মেরেছিলেন?" সাগ্রহে জেরা করলেন ফেতিউকভিচ।

"স্পষ্ট মনে আছে এবং জোর দিয়েই বলছি, কারণ তখন আমার নিজেরই মনে হয়েছিল কেন ও এতটা উঁচুতে ঘা মারছে? হৃদয়ের প্রসঙ্গই যদি হবে তাহলে তো আরও নিচে ঘা মেরে দেখানোর কথা! কিন্তু তখন এই চিন্তাটা আবার আমার কাছে বোকা-বোকা মনে হয়েছিল   বোকা-বোকা যে মনে হয়েছিল এটা আমার মনে আছে।   সে ছিল আমার এক ঝলকের চিন্তা। ঠিক এই কারণে এখন আমার মনেও পড়ে গেল। কেন যে এর আগে পর্যন্ত বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম! ওর যে সঙ্গতি আছে, কিন্তু ওই দেড় হাজার যে ও ফেরত দেবে না গলায় ঝোলানো তাবিজের থলেটা দেখিয়ে এই কথাই তো ও বলতে চেয়েছিল। আর যখন ও মোক্রয়েতে গ্রেপ্তার হয়েছিল তখনকার সেই ঘটনাটা? আমি সেটা জানি, আমার কানে এসেছে। তখনও সে চিৎকার করে ঠিক এই অর্ধেকের উল্লেখ করেই বলেছিল যে কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে যাতে চোর অপবাদ পেতে না হয় সেই জন্য তার অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করার মতো সঙ্গতি তার আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে টাকা তাকে ফেরত দেবে না বলে যে সে মনস্থ করেছে এবং টাকা হাতছাড়া

করার চেয়ে বরং কাতেরিনা ইভানভ্নার চোখে যে চোর হয়ে থেকে যাওয়ার সাধ তার হয়েছে এটাকে সে তার জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায় বলে মনে করে!'' আলিয়োশা সোচ্ছ্বাসে তার সিদ্ধান্ত জানাল।

বলাই বাহুল্য প্রসিকিউটরও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি আলিয়োশাকে অনুরোধ করলেন ঠিক যা যা ঘটেছিল আরও একবার যেন তার বর্ণনা দেয় এবং বেশ কয়েকবার নাছোড়বান্দার মতো প্রশ্ন করলেন আসামি যে বুকে করাঘাত করেছিল তার দ্বারা কি ঠিকই কিছু একটা দেখাতে চাইছিল? এমনও তো হতে পারে যে অমনি অমনি নিজের বুকে কিল মেরেছিল?

''না না কিল মেরেও নয়!'' আলিয়োশা চেঁচিয়ে উঠল। দেখিয়েছিল কিন্তু আঙুল দিয়েই, দেখিয়েছিল এই এখানটায়, অনেকটা উঁচুতে। কিন্তু এটা কেমন করে হল এতদিন, একেবারে আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি এরকম বেমালুম ভুলে থাকতে পারলাম!''

সভাপতি মশাই মিতিয়াকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন এই সাক্ষ্য সম্পর্কে তার বলার কী আছে। মিতিয়া সমর্থন করে বলল যে ঠিক তা-ই ঘটেছিল, বুকের ওপর, গলার খানিকটা নিচে যে দেড় হাজার ঝুলছিল ও তখন সেটার দিকেই ইঙ্গিত করছিল। ব্যাপারটা অবশ্যই লজ্জার ছিল, 'এমনই একটা লজ্জার যা আমি অস্বীকার করতে পারছি না, আমার সারা জীবনের একটা বড়ো রকমের কলঙ্ক!' মিতিয়া আর্তনাদ করে বলে উঠল। 'আমি ফেরত দিলে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেরত আমি দিইনি। চেয়েছিলাম ফেরত না দিয়ে ওর চোখে বরং চোর হয়ে থাকব সেও ভালো। আর সব চেয়ে বড়ো লজ্জার কথা এই যে ফেরত যে দেব না সেটা আগে থাকতেই জানতাম!'

আলিয়োশাকে জেরা করার পর্ব এখানেই শেষ হল। ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসূচক করে তুলেছিল এই ঘটনাটি যে অন্তত পক্ষে এমন একটি তথ্যের সন্ধান মিলল যা না হয় ধরলামই অত্যন্ত ছোটখাটো ধরনের একটা প্রমাণ, বলতে গেলে প্রমাণের একটা ইঙ্গিতমাত্র; কিন্তু তা হলেও, সামান্য ছিটেফোঁটা হলেও এতে অন্তত এটা প্রমাণিত হল যে তাবিজের ওই থলিটার বাস্তবিকই অস্তিত্ব ছিল, সেটার মধ্যে সেলাই করে দেড় হাজার রাখা ছিল এবং মোক্রয়েতে প্রাথমিক তদন্তের সময় আসামি যখন জানিয়েছিল ওই দেড় হাজার 'আমার ছিল' তখন সে মিথ্যে বলেনি। এর পরও আলিয়োশা অনেকক্ষণ ধরে আপন মনে বার কয়েক আউড়েছিল 'কী করে এমন হল যে ওটার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম! কী করে ভুলে যেতে পারলাম! কী করে এমন হল যে সবে এই এখনই ওটার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল!'

শুরু হল কাতেরিনা ইভানভ্নাকে জেরা করা। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আদালতকক্ষে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। মহিলারা সব লর্নেট চশমা আর

বাইনোকুলার হাতে তুলে নিল, পুরুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কেউ কেউ একটু ভালো করে দেখার জন্য জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পরে সকলেই এই কথা বলেছিল যে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মিতিয়া 'একেবারে ফ্যাকাশে' হয়ে গিয়েছিল। আগাগোড়া কালো পোশাকে বিনীত ভাবে এবং প্রায় সলজ্জ ভঙ্গিতে সে তার নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে গেল। সে যে উদ্বেগের মধ্যে ছিল তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না। তবে তার বিষাদ ভারাক্রান্ত ধূসর দৃষ্টির মধ্যে একটা স্থির সঙ্কল্প ঝলক দিচ্ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরে বেশ কিছু লোক এমন কথাও বলেছিল যে সেই মুহূর্তে তাকে আশ্চর্য রকম সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে কথা বলছিল মৃদুস্বরে, কিন্তু আদালতকক্ষের সর্বত্র তার কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তার কথনভঙ্গি ছিল অত্যন্ত শান্ত সংযত, অথবা সে নিজে অন্তত শান্ত থাকার চেষ্টা করছিল। পাছে বেকায়দায় 'অন্য কোনো তন্ত্রীতে' ছোঁয়া লেগে যায় অনেকটা যেন এই রকম একটা আশঙ্কার ভাব নিয়ে, কাতেরিনা ইভানভ্‌নার অতবড় একটা দুর্ভাগ্যের কথা বিবেচনা করে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে এবং সন্তর্পণে তাঁর প্রশ্ন শুরু করে দিলেন। কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্‌না তার কথার একেবারে শুরুতেই উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় কণ্ঠে জানাল যে সে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাগ্‌দত্তা ছিল—ততক্ষণ পর্যন্ত ছিল' যতক্ষণ না সে নিজে আমাকে ছেড়ে চলে যায় ' মৃদুস্বরে সে যোগ করল। আত্মীয়দের কাছে ডাকে পাঠানোর জন্য কাতেরিনা ইভানভ্‌না যে বিশ্বাস করে মিতিয়াকে তিন হাজার রুবল দিয়েছিল সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল 'আমি ওকে সরাসরি ডাকে পাঠানোর জন্য টাকাটা দিইনি। আমার মন তখন বলছিল ওর টাকার খুব দরকার ওই মুহূর্তে দরকার। আমি ওকে ওই তিন হাজার এই কড়ারে দিয়েছিলাম যে সে চাইলে এক মাসের মধ্যে যে কোনো সময় ওটা ডাকে পাঠাতে পারে। ও যে পরে ওই কাজের দরুন অত মনোকষ্ট পেয়েছে তার কোনো মানে হয় না।

আমি এখানে অত সব প্রশ্ন আর কাতেরিনা ইভানভ্‌নার প্রত্যুত্তরও হুবহু তুলে ধরতে যাচ্ছি না। আমি কেবল তার এজাহারের সারমর্মটুকু তুলে ধরছি।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওর বাবার কাছে থেকে টাকা পাওয়ামাত্র যে কোনো সময়ে ওই তিন হাজার ও ঠিক পাঠিয়ে দিতে পারবে', প্রশ্নের উত্তরে সে বলে চলল। "ওর নিঃস্বার্থপরতায়, ওর সততায় টাকাকড়ির ব্যাপারে ওর অতিমাত্রায় সততায় আমার চিরকালই স্থির বিশ্বাস ছিল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ওর বাবার কাছ থেকে ও তিন হাজার রুবল পাবেই। এ কথা ও আমাকে একাধিকবার বলেছে। জানতাম, বাপের সঙ্গে ওর মন কষাকষি চলছে। চিরকালই, এমনকি আজও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওর বাবা ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি। ও যে ওর বাবাকে কোন ভাবে ভয় দেখিয়েছিল এমন কথা আমি মনে করতে পারছি না।

অন্তত আমার সাক্ষাতে ওরকম কোনো কথা বা কোনো হুম্‌কি সে উচ্চারণ করেনি। তখন যদি ও আমার কাছে আসত তাহলে আমার কাছে ওই অনাসৃষ্টিকারী ঋণের দরুন ওর যে দুশ্চিন্তা আমি তৎক্ষণাৎ তার উপশম ঘটাতে পারতাম। কিন্তু আর আমার কাছে এলোই না  এদিকে আমি নিজে  আমি নিজেও এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম  ওকে যে আমার কাছে ডাকব সে উপায়ও আমার ছিল না।  তা ছাড়া এটাও ঠিক যে ওই ঋণশোধের জন্য যে ওর কাছে দাবি করব সে অধিকারই তো আমার থাকার কথা নয়", হঠাৎ এই কথাটা যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর বেজে উঠল। আমি নিজে এক সময় ওর কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ টাকা, তিন হাজারেরও বেশি রুবল ধার পেয়েছিলাম, ওর সেই ঋণ আমি গ্রহণ করেছিলাম, যদিও তখনও আমি ভাবতেই পারিনি যে কোনও কালে ওকে তা শোধ করার মতো সঙ্গতি আমার হবে।

তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা যুদ্ধংদেহি ভাব ফুটে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে জেরা করার পালা ফেতিউকভিচের ওপর এসে পড়ল।

"এটা তাহলে এখানে ঘটেনি, ঘটেছিল আপনাদের আলাপ পরিচয়ের শুরুতে, তাই ত?" মুহূর্তের মধ্যে অনুকূল কিছু একটার আঁচ করে লুফে নিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হলেন ফেতিউকভিচ্। (এখানে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে বলে রাখি, ফেতিউকভিচ্‌কে যদিও কতকটা কাতেরিনা ইভানভ্‌না নিজেই পেতের্বুর্গ থেকে ডেকে এনেছিল তবু মিতিয়া যে ওই শহরে থাকার সময়ই তাকে পাঁচ হাজার রুবল দিয়েছিল এবং কাতেরিনা ইভানভ্‌না যে 'আভূমি নত হয়ে' মিতিয়াকে সম্মান জানিয়েছিল এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ তাঁর জানা ছিল না। একথা কাতেরিনা ইভানভ্‌না তাঁকে আগে বলেনি, গোপন করে রেখেছিল! এতে অবাক হওয়ার কথা। নিশ্চিত ভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে সে নিজেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না যে ঘটনাটা আদালতে বলবে কি বলবে না। মনে হচ্ছিল যেন কোনো প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল।)

না, ওই মুহূর্তগুলির কথা আমার পক্ষে কখনও ভোলা সম্ভব নয়। আলিয়োশাকে মিতিয়া যা যা জানিয়েছিল—সেই 'আভূমি নত হওয়ার' ঘটনা, তার কারণ নিজের বাবার কথা, মিতিয়ার কাছে তার আগমন—সব *কিছুর* সমস্ত ঘটনাটারই বিবরণ সে দিতে শুরু করল; অথচ মিতিয়া নিজেই যে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার বোনের মাধ্যমে টাকাটা নেওয়ার জন্য তাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল সে কথা একবারও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করল না, তার কোনো ইঙ্গিতই দিল না। সে তার ঔদার্যবশত সেটা গোপন করে গেল, প্রকাশ্যে এমন একটা ভাব দেখাতে লজ্জা পেল না যে সে নিজে, নিজে থেকেই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আবেগের বশবর্তী হয়ে, কোনো একটা আশায় বুক বেঁধে তখন তরুণ অফিসারটির কাছে ছুটে গিয়েছিল  এই ভরসাতেই গিয়েছিল যে কাকুতি মিনতি করলে তার কাছ থেকে টাকা

পাওয়া যাবে। এটা এক ধরনের চমকপ্রদ ঘটনা ছিল। শুনতে শুনতে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল, শরীরে কাঁপুনি এসে যাচ্ছিল। আদালত কক্ষে উপস্থিত সকলে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে তার মুখের প্রতিটি কথা গিলতে লাগল। এর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা অভূতপূর্ব। শুধু তা-ই নয়, তার মতো অমন একটা মেয়ে, যার এত দাপট, আত্মগরিমায় লোকজনকে হুট হাট করাই যার স্বভাব, তার কাছ থেকে এরকম আত্মত্যাগ, এরকম আত্মাহূতির প্রত্যাশা করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। তাও আবার কীসের জন্য? কার জন্য? এমন একজন মানুষকে উদ্ধার করার জন্য যে তার সঙ্গে বেইমানি করেছে, তাকে অপমান করেছে; অন্তত কোনো না কোনো ভাবে তারই উপকারে লাগার জন্য, অন্তত সামান্য কিছু পরিমাণে হলেও তার অনুকূলে ভালো একটা ধারণার সৃষ্টি করে তাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। আর সত্যিই তো, একজন অফিসার যে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত—তার জীবনের শেষ সম্বল পাঁচ হাজার রুবল এক নিষ্পাপ কুমারীর হাতে সমর্পণ করে মাথা নত করে তাকে সম্মান জানাল, এতে তার ভাবমূর্তিটি যে সকলের গভীর সহানুভূতি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। আমার কেমন যেন উপলব্ধি হয়েছিল যে এর পরিণামে পরে কুৎসাজনক কিছু একটা ঘটবে, যা পরে সত্যি সত্যি ঘটেও ছিল! বিদ্বেষের জ্বালাধরা হাসি নিয়ে পরে শহরসুদ্ধ সকলে বলাবলি করতে লাগল যে বিবরণটা হয়তো পুরোপুরি সঠিক নয়, বিশেষত সেই জায়গাটাতে যেখানে সে বলেছে যে অফিসারটি নাকি কিছু না করে শুধু 'আভূমি নত হয়ে সম্মান জানিয়ে' মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছে। তারা আভাসে ইঙ্গিতে এমন কথাও বলল যে এখানে কিছু একটা 'বাদ গেছে'। আর কিছু যদি বাদ না গিয়েও থাকে, সবই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলেও'—এমনকি আমাদের পরম সম্মানীয়া মহিলারাও বলাবলি করতে লাগলেন—'এটা কিন্তু বোঝা গেল না যে নিজের বাপকে বাঁচানোর খাতিরে হলেও এ ধরনের কাজ কোনো কুমারী মেয়ের পক্ষে খুব একটা কৃতিত্বের কিনা।'

এটাই বা কী করে সম্ভব যে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার মতো একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে যার সূক্ষ্মদর্শিতা অমন ব্যাধিগ্রস্ত গোছের সেও কিনা আগে থাকতে উপলব্ধি করতে পারল না যে লোকে এই নিয়ে তার সম্পর্কে কথা বলাবলি করবে? উপলব্ধি অবশ্যই করতে পেরেছিল, কিন্তু তাহলেও সব কথা বলবে বলেই সে মনস্থির করে ফেলেছিল। বলাই বাহুল্য, তার বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে এই যে সমস্ত নোংরা সন্দেহ, সেগুলির সূত্রপাত কেবলমাত্র পরে ঘটেছিল, কিন্তু প্রথম মুহূর্তে সকলে এতে রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদের কথা যদি বলতে হয়, তারা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে, এমনকি বলা যেতে পারে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে তার কথাগুলি শুনে গেল। প্রসিকিউটর এই বিষয়ে আর একটিও প্রশ্ন করতে ভরসা পেলেন না। ফেতিউকোভিচ্ মাথা নুইয়ে তাকে গভীর শ্রদ্ধা আনালেন। ওঃ, তিনি

তখন বিজয়ের আনন্দে উল্লসিতপ্রায়! মামলার অনেকটাই উদ্ধার করা গেছে যে লোকটা মহৎ আবেগের বশবর্তী হয়ে তার শেষ সম্বল পাঁচ হাজার দিয়ে দিতে পারে সে-ই কিনা তিন হাজার লুট করার উদ্দেশ্যে রাতের বেলায় তার বাপকে খুন করল!—অংশত হলেও এটা তার পক্ষে কেমন যেন বেমানান। আর যা-ই হোক, অন্ততপক্ষে লুট করার অভিযোগটা তো ফেতিউকোভিচ্ এখনই খণ্ডন করতে পারেন। 'মামলাটা'র ওপর হঠাৎ কেমন যেন একটা নতুন আলোকপাত ঘটল। মিতিয়ার প্রতি এক ধরনের সহানুভূতিতে লোকে উথলে উঠল। এদিকে মিতিয়া

লোকের মুখে শোনা গেছে, কাতেরিনা ইভানভ্না যখন সাক্ষ্য দিচ্ছিল তখন সে নাকি বার দুয়েক জায়গা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পরক্ষণেই দু হাতে মুখ ঢেকে আবার বেঞ্চির ওপর বসে পড়েছিল। কিন্তু কাতেরিনা ইভানভ্না যখন তার বক্তব্য শেষ করল তখন তার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে আচমকা কাঁদ কাঁদ গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল

"কাতিয়া, এ তুমি কী করলে! কেন আমার এমন সর্বনাশ করলে?" আদালত কক্ষ দূরে তার সেই আর্ত চিৎকার শোনা গিয়েছিল। অবশ্য মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার চেঁচিয়ে বলেছিল

"এখন আমার যা দণ্ড হওয়ার হয়ে গেল!"

এরপর সে দাঁতে দাঁত চেপে, দুহাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে তার নিজের জায়গায় বসে রইল। কাতেরিনা ইভানভ্না আদালতকক্ষে থেকে গেল, সে তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসে পড়ল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, সে মাথা হেঁট করে বসে রইল। যারা তার কাছাকাছি ছিল তাদের মুখে শুনেছি তার সর্বাঙ্গ নাকি অনেকক্ষণ ধরে জ্বরবিকারগ্রস্তের মতো থরথর করে কাঁপছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব পড়তে এবারে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গ্রুশেন্কার আবির্ভাব ঘটল।

আমি সেই বিপর্যয়ের কাছাকাছি চলে আসছি যা, আকস্মিক ভাবে ঘটে গিয়ে সম্ভবত মিতিয়ার চূড়ান্ত সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস—এবং অন্য সকলেরও দৃঢ়বিশ্বাস—তা ছাড়া আইনজ্ঞেরাও সকলে পরে এই অভিমতই প্রকাশ করেছিলেন যে ওই ঘটনাটি যদি না ঘটত তাহলে আসামিকে অন্ততপক্ষে ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য সুপারিশ করা গেলেও যেতে পারত। কিন্তু ে কথায় আমি পরে আসছি। তার আগে গ্রুশেন্কা সম্পর্কে অন্তত দুটো কথা বল হয়।

সেও আদালত কক্ষে হাজির হয়েছিল শোকের কালো পোশাক পরে, ও চমৎকার কালো শালটা কাঁধের ওপর ফেলে। ভরাট চেহারার মেয়েমানুষরা অনেক সময় যে ভাবে হাঁটে সেই ভাবে দেহবল্লরীতে ঈষৎ হিল্লোল তুলে মরালগতিতে গ্রুশেন্কা তার স্বাভাবিক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে এক দৃষ্টে বিচারক মন্ডলীর সভাপতির দিকে তাকাল, না ডাইনে, না বাঁয়ে'— কোথাও একবারও দৃকপাত করল না। আমার তো মনে হয় তাকে সেই মুহূর্তে রীতিমতো ভালো দেখাচ্ছিল। উপস্থিত ভদ্রমহিলারা পরে জোর দিয়ে যা-ই বলুন না কেন, পাণ্ডুর তাকে আদৌ দেখাচ্ছিল না। তাঁরা জোর দিয়ে এমন কথাও বলছিলেন যে তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা নিবিষ্টতা ও বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। আমার শুধু এটাই মনে হয় যে তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে ছিল এবং কেলেঙ্কারির জন্য লোলুপ আমাদের এই জনসাধারণের তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও উৎসুক দৃষ্টি যে তার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে এই উপলব্ধিটা তার কাছে দুঃসহ মনে হচ্ছিল। সে ছিল অহংকারী, কারও উপেক্ষা সহ্য করা তার ধাতে ছিল না। সেই ধরনের চরিত্রের একজন যারা কেউ তাদের উপেক্ষার চোখে দেখছে সন্দেহ করার সঙ্গে সঙ্গে দপ করে ক্রোধে জ্বলে ওঠে এবং তার ওপর প্রত্যাঘাত হানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, এক ধরনের ভীরুতা যেমন ছিল তেমনি আবার সেই ভীরুতার জন্য ভেতরে ভেতরে একটা লজ্জার ভাবও তার ছিল, যার ফলে তার কথাবার্তার সুর যে সর্বত্র সমান হবে না তাতে আর বিচিত্র কি! কখনো ক্রোধপরায়ণ, কখনো অবজ্ঞাপূর্ণ এবং বড়ো বেশি মাত্রায় রুক্ষ। আবার হঠাৎ হঠাৎ কণ্ঠস্বরে বেজে উঠছে আত্মধিক্কার আর নিজের ওপর অকপট দোষারোপের আন্তরিক সুর। কখনো কখনো আবার এমন ভাবে কথা বলছিল যেন মরিয়া হয়ে কোনো এক অতলস্পর্শী গহ্বরের ভেতরে উড়ে পড়তে যাচ্ছে। সেই সব মুহূর্তে তার মনের ভাবটা ছিল 'পরিণাম যা-ই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাকে বলতেই হবে ...' ফিয়োদর পাভ্লভিচের সঙ্গে তার পরিচয়ের প্রসঙ্গে কটু মন্তব্য করে সে বলল 'ওসব বাজে কথা। লোকটা যে আমার পেছনে অমন লেগে ছিল সেটা কি আমার দোষ?' তারপর এক মিনিট বাদেই যোগ করল: 'সব দোষ আমার। বুড়োকে নিয়ে বলুন, আর এই একে নিয়ে বলুন—দুজনকে নিয়েই আমি তামাশা করেছি—দুজনেরই আমি এই হাল করে ছেড়েছি। আমার দোষেই এ সমস্ত ঘটেছে।'

একবার কী ভাবে যেন সাম্সোনভের প্রসঙ্গও উঠেছিল। তাতে সে তৎক্ষণাৎ প্রগল্ভ ধরনের মারমুখো মূর্তি ধারণ করে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল 'তাতে কার কী? সে লোকটি আমার উপকারী ছিল। আমার আপন জনেরা যখন আমাকে বাড়ি থেকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিয়েছিল, যখন আমার পায়ে জুতো পর্যন্ত ছিল না, সেই সময় সে আমাকে তুলে নিয়েছিল।' সভাপতিমশাই অবশ্য বেশ ভদ্রভাবে তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে অবান্তর কোনো খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে তার উচিত হবে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। গ্রুশেন্কা লাল হয়ে উঠল, তার দুচোখ ঝলকে উঠল।

নোটের সেই প্যাকেটটা সে চোখে দেখেনি বটে, তবে ওই 'পাজি লোকটার'

মুখে সে শুনেছে যে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের কাছে নাকি তিন হাজারের একটা প্যাকেট না কী একটা আছে। 'তবে এসব স্রেফ বাজে কথা। শুনে আমার হাসিই পেয়েছিল। মরে গেলেও আমি ওখানে যেতাম না...'

"আচ্ছা আপনি এই মাত্র 'পাজি লোকটা' বলে যার উল্লেখ করলেন সেটা কে?" প্রসিকিউটর জানতে চাইল।

"কে আবার? বাড়ির চাকর স্মের্দিকোভ্, যে তার কর্তাকে খুন করেছে, আর গতকাল গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে!"

বলাই বাহুল্য, মুহূর্তের মধ্যে তাকে প্রশ্ন করা হল লোকটার বিরুদ্ধে এরকম চরম অভিযোগের কী এমন ভিত্তি তার আছে। কিন্তু দেখা গেল সেরকম কোনো ভিত্তি তারও নেই।

'দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ নিজে আমায় একথা বলেছেন। ওঁকে বিশ্বাস করতে পারেন। ওঁর সর্বনাশ ঘটিয়েছে সেই মেয়েমানুষটি, যে আমাদের দুজনার মাঝখানে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা বলছি তা-ই, এ সবেরই একমাত্র কারণ সে। হ্যাঁ, তাই", গ্রুশেন্‌কা যোগ করল। তার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় রি-রি করে জ্বলে উঠল, কণ্ঠে বেজে উঠল বিদ্বেষের সুর।

জানতে চাওয়া হল এবারে আবার সে কাকে ইঙ্গিত করছে।

"ওই তো ওই দিদিমণিটাকে—কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে গো। হুঃ, আমাকে আবার ওর কাছে ডেকেও পাঠিয়েছিল, চ্যাকোলেট দিয়ে খাতির জমিয়ে আমাকে খুশি করতে গিয়েছিল। সত্যিকারের লজ্জাশরম বলতে যা বোঝায় তার ছিটেফোঁটাও যদি ওর মধ্যে থাকত

এই জায়গায় সভাপতিমশাই কড়া সুরে ভাষা ব্যবহারে তাকে সংযত হতে বলে থামিয়ে দিলেন। কিন্তু তার নারী হৃদয় হিংসায় এমনই জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল যে সে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোনো অতলস্পর্শী গহ্বরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

প্রসিকিউটরের মনে পড়ে যেতে এবারে সে জিগ্‌গেস করল, "মোক্রয়ে গ্রামে গ্রেপ্তারের সময় সবাই দেখেছিল এবং শুনেও ছিল যে আপনি পাশের আরেকটা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'সব দোষ আমার! ঘানি ঠেলতে যেতে হয় আমরা এক সঙ্গে যাব!' তাহলে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে ও যে পিতৃহন্তা এই বিষয়ে সেই তখনই আপনারও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল?"

"তখন আমার কী বোধ হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারছি না", গ্রুশেন্‌কা জবাব দিল। "তখন সবাই চেঁচিয়ে এই কথাই বলছিল যে ও নাকি ওর বাবাকে খুন করেছে। আমার তখন মনে মনে এটাই বোধ হল যে দোষটা আমার, আমার জন্যেই ও খুন করেছে। কিন্তু যখন ও নিজের মুখে বলল যে ও নির্দোষ আমি

সঙ্গে সঙ্গে ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম, এখনও করি আর চিরকাল করবও। মিথ্যে কথা বলার লোক ও নয়।"

এবারে জেরা করার পালা ফেতিউকোভিচের। আমার মনে আছে, আরও সব প্রশ্নের মধ্যে রাকিতিনের প্রসঙ্গ তুলে 'আলেক্সেই কারামাজভ্‌কে যাতে আপনার কাছে নিয়ে আসে তার জন্য' রাকিতিনকে যে পঁচিশ রুবল দেওয়ার কথা হয়েছিল সে সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন করলেন।

"টাকা যে নিয়েছিল তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু ছিল না", তাচ্ছিল্যভরে বিদ্রুপের হাসি হেসে ক্রুদ্ধস্বরে গ্রুশেন্‌কা বলল। "অমনিতেই আমার কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করে টাকা আদায় করত, মাসে নয় নয় করে তা রুবল তিরিশেক তো নিতই আমার কাছ থেকে। সবটাই লাটসাহেবি করার জন্যে। আমার টাকা ছাড়া যে ওর খাওয়া-পরা চলত না এমন নয়।"

"তা মিস্টার রাকিতিনের ব্যাপারে আপনার অমন উদার হওয়ার-কারণটা বলবেন কি?" সভাপতি রীতিমতো উসখুস করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফেতিউকোভিচ্ প্রশ্ন করতে ছাড়লেন না।

"আরে ও তো আমার মাসতুতো ভাই হয়। আমার মা ওর মার আপন বোন। আমার জন্যে ওর এত লজ্জা যে সব সময় কাকুতি মিনতি করে আমাকে কেবলই বলত একথা যেন এখানে কারও কাছে প্রকাশ না করি।"

দেখা গেল এই নতুন তথ্যটি সকলের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। সারা শহরে কেউই এটা জানত না, এমনকি মঠেও কেউ জানত না, দ্‌মিত্রি পর্যন্ত না। শুনেছি দ্‌মিত্রি নাকি এই কথা শুনে চেয়ারে তার নিজের জায়গাটাতে বসা অবস্থায় লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। গ্রুশেন্‌কা আদালত কক্ষে ঢোকার আগেই কী করে যেন জানতে পেরেছিল যে রাকিতিন মিতিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাই তার ওপর সে খাপ্পা হয়ে ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে রাকিতিনের যত বক্তৃতা, তার যত মহৎ চিন্তার প্রকাশ, ভূমিদাস প্রথার কুফল আর রাশিয়ার সামাজিক অব্যবস্থা সম্পর্কে তার এত বড়ো বড়ো কথা, সর্বসাধারণের মতামতের ওপর তার চিন্তার এত প্রভাব—এই এক ধাক্কায় চূড়ান্তভাবে তা বাতিল হয়ে গেল, নস্যাৎ হয়ে গেল। ফেতিউকোভিচ সন্তুষ্ট : ঈশ্বরের কৃপায় ভিক্ষার ঝুলিতে আবারও কিছু পড়ল। মোটের ওপর, গ্রুশেন্‌কাকে খুব একটা বেশিক্ষণ জেরা করা হল না। তাছাড়া সে অবশ্য নতুন বিশেষ কিছু জানাতেও পারল না। জনসাধারণের মনে সে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছাপ রেখে গেল। সে যখন তার জবানবন্দি শেষ করে আদালতকক্ষে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার থেকে অনেকখানি দূরত্বে তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল তখন শত শত তাচ্ছিল্যপূর্ণ চোখের দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়েছিল। গ্রুশেন্‌কাকে যখন জেরা করা হচ্ছিল সেই সময় মিতিয়া সর্বক্ষণ মাটিতে চোখ নামিয়ে এমন ভাবে চুপ

করে ছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে।

সাক্ষী হিসেবে হাজির হল ইভান ফিয়োদরভিচ্।

## পাঁচ

## আকস্মিক বিপর্যয়

উল্লেখ করা যেতে পারে যে আলিয়োশার আগেই তাকে ডাকার কথা ছিল। কিন্তু আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তখন সভাপতি মশাইকে জানিয়েছিল যে আকস্মিক অসুস্থতা অথবা মূর্ছাধরনের কোনো এক প্রকোপের কারণে সাক্ষী আপাতত উপস্থিত হতে পারছে না, তবে সুস্থ হওয়ামাত্র যে কোনো সময়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এটা অবশ্য কেউ শুনেছিল বলে মনে হয় না, শুধু আরও পরে জানতে পেরেছিল।

প্রথম মুহূর্তে তার আবির্ভাবের মধ্যে লক্ষ করার মতো প্রায় কিছু ছিল না: প্রধান প্রধান সাক্ষীদের, বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বিনী দুই মহিলাকে ইতিমধ্যেই জেরা করা হয়ে গেছে। কৌতূহল আপাতত চরিতার্থ হয়েছে। এমনকি জনসাধারণও ক্লান্তি বোধ করছে। আরও কয়েক জন সাক্ষীর বক্তব্য শোনা বাকি আছে। কিন্তু এরই মধ্যে এত সব কিছু আদালতের গোচরে আনা হয়ে গিয়েছিল যে সেই হেতু তাদের পক্ষে আর বিশেষ কোনো তথ্য জানানো বোধহয় সম্ভবও ছিল না। ইতিমধ্যে সময়ও চলে যাচ্ছিল। কারও দিকে না তাকিয়ে, এমন কি মাথা হেঁট করে বেজার মুখে কী যেন ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আশ্চর্য রকমের ধীর গতিতে এগিয়ে এলো ইভান ফিয়োদরভিচ্। পোশাক পরিচ্ছদ নিখুঁত পরিপাটি। কিন্তু তার মুখটা অন্তত আমার ওপরে একটা পীড়াদায়ক ছাপ ফেলেছিল: সে মুখে কেমন যেন একটা মাটি-মাটি স্পর্শ, অনেকটা যেন মুমূর্ষু মানুষের মতো। চোখ দুটো ঘোলাটে। ধীরে ধীরে চোখ তুলে সে আদালতকক্ষের ওপর নজর বুলিয়ে নিল। আলিয়োশা তার জায়গা ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে 'আঃ!' বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। এটা আমার মনে আছে। কিন্তু খুব কম লোকেই ধরতে পেরেছিল।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি এই বলে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন যে ইভান ফিয়োদরভিচ্ হলফনামা ছাড়া সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে ইচ্ছে করলে জেরার উত্তর দিতে পারে আবার কিছু না বলে চুপ করেও থাকতে পারে, তবে তার সাক্ষ্যের সবটাই তার বিবেক বুদ্ধি অনুসারে হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। ইভান ফিয়োদরভিচ্ ঘোলাটে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তার মুখটা ধীরে ধীরে স্মিত হাসিতে প্রসারিত হয়ে উঠতে লাগল। সভাপতি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে যেই তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন ইভান ফিয়োদরভিচও তৎক্ষণাৎ আচমকা হেসে উঠল।

"তারপর, আরও কী আছে?" চড়া গলায় সে জিগ্‌গেস করল।

আদালতকক্ষ জুড়ে স্তব্ধতা নেমে এলো। সকলেরই মনে কেমন যেন একটা উপলব্ধি। সভাপতিমশাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

"আপনি হয়তো এখনও তেমন সুস্থ হয়ে ওঠেননি?" দৃষ্টি দিয়ে আদালতেরভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটির সন্ধান করতে করতে তিনি বললেন।

"আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই ধর্মাবতার, আমি যথেষ্ট সুস্থ এবং কৌতূহল জাগানোর মতো কিছু আপনাকে বলতেও পারি", সম্পূর্ণ শান্ত সংযত ভাবে এবং শ্রদ্ধাভরে ইভান ফিয়োদরভিচ্ হঠাৎ জবাব দিল।

"আপনার কি জানানোর মতো বিশেষ কোনো সমাচার আছে?" আগের মতোই সন্দেহের সুর সভাপতির কণ্ঠে।

ইভান ফিয়োদরভিচ্ চোখ নামাল, কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব করল, তারপর মাথা তুলে কতকটা যেন থতমত খেয়ে উত্তর দিল

"নাঃ তা নেই। বিশেষ কিছু নেই।"

তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হতে লাগল। প্রশ্নের উত্তর সে এমন ভাবে দিতে লাগল যে দেখে মনে হচ্ছিল নিতান্তই অনিচ্ছায় দিচ্ছে। অত্যন্ত সংক্ষেপে, এমন কি কতকটা বিতৃষ্ণার সঙ্গেই সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল, আর তার সেই বিতৃষ্ণার মাত্রাও যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল, যদিও, তা সত্ত্বেও, তার উত্তরগুলি বেশ বোধগম্যই ছিল। অজ্ঞতার অজুহাত দেখিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দানে সে বিরত থাকল। দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচের সঙ্গে বাবার টাকাপয়সার হিসাবের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। 'ও নিয়ে মাথাও ঘামাই নি'—তার সাফ জবাব। বাবাকে খুন করার হুমকি সে বিচারাধীন ব্যক্তিটির মুখে শুনেছে, খামের মধ্যে রাখা টাকার কথা শুনেছে স্মের্দিকোভের কাছ থেকে।

"বারবার সেই একই কথা", হঠাৎ কথা বন্ধ করে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে বলে উঠল। "আদালতে আমি বিশেষ করে কিছু জানাতে পারছি না।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি সুস্থ নন। আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি সভাপতি বলতে শুরু করলেন।

কথাগুলি বলে তিনি প্রসিকিউটর ও প্রতিবাদী পক্ষের কৌঁসুলি—দুই পক্ষের দিকেই তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাদের জানালেন যে সাক্ষীকে জেরা করার প্রয়োজন বোধ করলে তাঁরা জেরা করতে পারেন। কিন্তু ঠিক তখনই ইভান ফিয়োদরভিচ আচমকা অবসন্ন কণ্ঠে অনুরোধ জানাল

"আমাকে ছেড়ে দিন ধর্মাবতার। আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছি।"

কথাগুলি বলতে না বলতেই অনুমতির জন্য আর অপেক্ষা না করে হঠাৎ পিছন ফিরে সে আদালতকক্ষ ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করল। কিন্তু দু চার পা এগিয়ে যাবার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখে মনে হল হঠাৎ যেন কী একটা ভাবনা

তার মাথায় এসেছে। নিঃশব্দে মৃদু হেসে সে আবার তার আগের জায়গায় ফিরে গেল।

"ধর্মাবতার, আমার অবস্থা হল সেই চাষি মেয়েটার মতো সেটা কী রকম জানেন?—'মন চায় করব, মন চায় করব না।' তাকে বিয়ের কনের সাজপোশাক না কি লম্বা ঝুলের ঢিলে হাতকাটা জামাগোছের কী সব পরিয়ে বিয়ে দিতে নিয়ে যাবে বলে লোকে তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে মেয়ে কেবলই বলে চলেছে 'মন চায় করব, না চায় করব না! ' এটা আমাদের এক ধরনের জাতীয় চরিত্র।"

"এর দ্বারা আপনি কী বলতে চান?" কড়া সুরে সভাপতি জিগ্‌গেস করলেন।

"যা বলতে চাই সেটা এই " বলতে বলতে ইভান ফিয়োদরভিচ্ ফস্ করে এক তাড়া নোট বের করে দেখাল। "এই যে টাকা এ সেই টাকা যা ওই যে ওই খামটার মধ্যে ছিল", সাক্ষ্যপ্রমাণের বস্তু যে টেবিলটার ওপর রাখা ছিল মাথা নেড়ে ইশারায় সেটা দেখিয়ে সে বলল। "এগুলোর জন্যই বাবা খুন হয়েছিল। কোথায় রাখতে আজ্ঞা হয়? এই যে নাজির মশাই, কোথায় দিতে হবে দিয়ে দিন।"

আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নোটের পুরো বান্ডিলটা নিয়ে সভাপতির হাতে তুলে দিল।

"এ যদি সেই টাকাই হয় তাহলে এগুলো আপনার কাছে এলো কী করে?" অবাক হয়ে সভাপতি মশাই জানতে চাইলেন।

"পেয়েছি গতকাল, খুনি স্মের্দিকোভের কাছ থেকে। ও যখন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে তার আগে আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম। বাবাকে ভাই খুন করে নি, করেছে ওই স্মের্দিকোভ্। খুন করেছিল ও, কিন্তু ওকে খুন করতে শিখিয়েছিলাম আমি। বাবার মৃত্যু কার না কাম্য ছিল?"

"আপনার কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে?" অনিচ্ছাকৃতভাবেই সভাপতির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"সেটাই তো কথা যে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়নি। বদবুদ্ধি ঠিকই আছে যেমন আপনাদের সকলের এই পোড়মুখগুলোর সবারই আছে!" হঠাৎ সে উপস্থিত জনসাধারণের দিকে ফিরে তাকাল। "বাবা খুন হয়েছে, আর এরা ভান করছে যেন ভয় পেয়ে গেছে।" অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধে সে দাঁতে দাঁত ঘষল। "এরা সব একে অন্যের সামনে ঢং করছে। যত সব মিথ্যেবাদীর দল। বাবার মৃত্যু এদের সকলের কাম্য। একটা কালসাপ আরেকটা কালসাপকে খাচ্ছে। ... পিতৃহত্যার ঘটনাটা যদি ন ঘটত এরা সবাই রেগে যেত, রেগেমেগে যার যার ঘরে চলে যেত। তামাশা দেখতে এসেছে! 'রুটি আর তামাশা'[৮৫]—আর কী চাই! অবশ্য হ্যাঁ, আমিই বা কম যাই কীসে! বলি আপনাদের এখানে জল পাওয়া যাবে কি? খ্রিস্টের

দোহাই, একটু জল খেতে দিন!" বলতে বলতে সে হঠাৎ দু হাতে মাথা চেপে ধরল।

আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তৎক্ষণাৎ তার দিকে এগিয়ে গেল। আলিয়োশা ঝট করে তার জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল "ও অসুস্থ। ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না। ও মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে ভুগছে!" কাতেরিনা ইভানভ্না চটপট তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে সে ইভান ফিয়োদরভিচের দিকে তাকাল। মিতিয়াও উঠে দাঁড়িয়েছিল, কেমন যেন একটা হিংস্র বাঁকা হাসি হেসে লোভাতুর আগ্রহ নিয়ে সে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

"শান্ত হোন, আমি পাগল হইনি। আমি একজন খুনি মাত্র!" ইভান আবার বলতে শুরু করল। "একজন খুনির কাছ থেকে তো আর বাগবৈদগ্ধ্য আশা করা যায় না!" কী কারণে কে জানে এই কথা যোগ করে সে হঠাৎ মুখ বাঁকিয়ে হেসে উঠল।

প্রসিকিউটর সম্ভবত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সভাপতি মশাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বিচারকমণ্ডলীর সদস্যরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগলেন। ফেতিউকোভিচ একাগ্রভাবে কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন। আদালতকক্ষে উপস্থিত আর সকলে একটা কিছুর প্রত্যাশায় আড়ষ্ট হয়ে রইল। এক সময় সভাপতি মশাইয়ের যেন আচমকা চটক ভাঙল।

"সাক্ষী, আপনার কথাগুলি বোধগম্য নয়, এক্ষেত্রে অসম্ভব ঠেকছে। যদি পারেন তো শান্ত হোন এবং বলুন যদি আপনার সত্যি সত্যি কিছু বলার থাকে। আপনার কথাগুলো যদি নেহাৎ প্রলাপ না হয়ে থাকে তা হলে বলুন, আপনার এই স্বীকারোক্তির সমর্থন আপনি কী দিয়ে করতে পারেন?"

"কথাটা তো এখানেই যে আমার কোনও সাক্ষী নেই। হারামজাদা কুকুর স্মের্দিকোভ্টা পরলোক থেকে আপনাদের কাছে খামে ভরে এজাহার পাঠাবে না। আপনাদের সকলের আবার খামটাম না হলে চলে না দেখছি। আরে বাপু, একটাই যথেষ্ট! নাঃ, সেরকম কোনও সাক্ষীসাবুদ আমার নেই। কেবল একটা ছাড়া আর কোনও সাক্ষী নেই।" চিন্তিত ভাবে সে মুচকি হাসল।

"কে আপনার সাক্ষী?"

"তার একটা লেজ আছে ধর্মাবতার। নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই! Le diable n'existe point!—শয়তানের তো কোনো অস্তিত্বই নেই! আমল দেবেন না—হেঁজিপেজি ধরনের, একেবারেই পেতি শয়তান", চটপট সে যোগ করল, তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করে দিয়ে যেন একান্তই গোপন কোনো কথা বলছে এমন ভাবে "সেটা হয়তো এখানেই কোথাও আছে, এই যে সাক্ষ্যপ্রমাণের জিনিসগুলো যে টেবিলের ওপর রাখা আছে হয়তো তার তলায়। ওখানে না হলে আর কোথায়ই বা বসে থাকবে? দেখুন, আমার কথাগুলো একবার শুনুন। আমি ওকে বললাম,

আর চুপ করে থাকতে চাই নে, তাইতে সে আমাকে ভূতাত্ত্বিক ওলট পালটের কথা শোনাল... যত্ত সব! আরে ওই জানোয়ারটাকে খালাস করে দিন না! ওটা আবার স্তোত্র গাইতে শুরু করে দিয়েছে, কারণ এ কাজটা ওর পক্ষে করা সহজ! যা-ই বলুন না কেন, ভানিয়া আমার গেছে পেতের্বুর্গে, বলে রাস্তার একটা হতভাগা মাতালের গলা ফাটানোর মতো! আমি কিন্তু দুদণ্ডের আনন্দের জন্য লক্ষ কোটির লক্ষ কোটিগুণ দিয়ে দিতে রাজি। আপনারা আমাকে চেনেন না! ওঃ কী যে সব বোকা-বোকা কাজ আপনাদের! ওর বদলে না হয় আমাকেই নিন না! কিছু একটার জন্যেই না আমি এসেছি! কেন, কেন বলুন তো চারপাশে যা যা আছে সব এত বাজে?

এই বলে সে আবার যেন চিন্তায় ডুবে গিয়ে ধীরে-ধীরে আদালতকক্ষের চারধারে চোখ বুলাতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। আলিয়োশা জায়গা থেকে উঠে তার দিকে ছুটে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এর মধ্যেই ইভান ফিয়োদরভিচের হাত আঁকড়ে তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে।

"এটা আবার কী ধরনের ব্যবহার?" আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে সে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর আচম্বিতে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার কাঁধদুটো আঁকড়ে ধরে সজোরে ধাক্কা মেরে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। কিন্তু পাহারাদার যথাসময়ে ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল। এই সময় সে অস্বাভাবিক রকমের হাউমাউ চিৎকার জুড়ে দিল। তাকে যতক্ষণ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় সারাক্ষণ সে হাউমাউ চিৎকার চেঁচামেচি করে অসংলগ্নভাবে কী সব বলে যেতে লাগল।

হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ঠিক কী কী ঘটেছিল সব মনে করতে পারছি না। আমি নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, তাই ঠিক অনুধাবন করতে পারি নি। শুধু এটাই জানি যে পরে যখন সব শান্ত হয়ে এলো, সকলে যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে খুব একচোট বকুনি খেতে হয়েছিল, যদিও সে কিন্তু বেশ যুক্তি দিয়ে ওপরওয়ালাকে ব্যাখ্যা করে বলল যে সাক্ষী এর আগে পর্যন্ত সর্বক্ষণ পুরোপুরি সুস্থ ছিল, এর এক ঘণ্টা আগে তার যখন সামান্য ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা দেখা দিয়েছিল তখন ডাক্তার তাকে দেখেছিলেন, কিন্তু আদালতকক্ষে প্রবেশের আগে পর্যন্ত তার কথাবার্তার মধ্যে এতটুকু অসংলগ্নতা ছিল না, তাই আগে থাকতে কিছু বোঝা অসম্ভব ছিল; বরং এটাই দেখা গেছে যে সাক্ষী নিজেই পীড়াপীড়ি করছিল, সাক্ষ্য দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সকলে অন্তত কিছুটা হলেও শান্ত হওয়ার আগেই এবং ধাতস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই এই দৃশ্যের পর পর আরও একটি দৃশ্য ঘটে গেল : কাতেরিনা ইভানভ্না হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল। গলা ছেড়ে হাউমাউ করে চিৎকার

আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল, অথচ আদালতকক্ষ ছেড়ে যেতে চাইল না, ছটফট করতে করতে কাকুতি মিনতি করে সকলকে বলতে লাগল তাকে যেন সরিয়ে না দেওয়া হয়। তারপর হঠাৎই সভাপতি মশাইয়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল

"আমার আরও একটা এজাহার দেবার আছে। এক্ষুনি এই মুহূর্তেই দিতে চাই। এই যে এক টুকরো কাগজ, এটা একটা চিঠি এই নিন, পড়ে দেখুন। শিগ্‌গির পড়ুন, তাড়াতাড়ি! ওই হতভাগা জুলুমবাজটার চিঠি ওই যে, ওই ওটার!" সে মিতিয়াকে দেখিয়ে দিল। "ও-ই ওর বাপকে খুন করেছে, আপনারা এখন দেখতে পাবেন। আমাকে লিখেছিল কী ভাবে ও ওর বাবাকে খুন করবে! কিন্তু আরেকজন যে সে অসুস্থ। লোকটা অসুস্থ, মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে ভুগছে। আমি আজ তিন দিন হল দেখছি বিকারের ঘোরে আছে।" সে আত্মবিস্মৃত হয়ে চেঁচাতে লাগল।

সভাপতি মশাইয়ের দিকে যে কাগজটা সে বাড়িয়ে দিয়েছিল আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সেটা গ্রহণ করল। কাতেরিনা ইভানভ্‌না তার চেয়ারে এলিয়ে পড়ে দু হাতে মুখ ঢেকে দমকে দমকে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করে দিল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, পাছে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় এই ভয়ে সে কষ্ট করে মুখ বুজে রইল, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না। যে কাগজটা সে দিয়েছিল সেটা ছিল 'মহানগর' সরাইখানা থেকে লেখা মিতিয়ার সেই চিঠিটা যাকে ইভান ফিয়োদরভিচ 'গণিতের নিয়মে' গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপত্র আখ্যা দিয়েছিল। আক্ষেপের কথা, এর মধ্যে যে গাণিতিক চরিত্রটা ছিল সেটাই স্বীকৃতি পেল, অথচ এই চিঠিটা না থাকলে মিতিয়ার সর্বনাশ নাও হতে পারত, আর হলেও অন্তত পক্ষে এতটা ভয়ঙ্কর হয়তো হত না! আমি আবারও বলছি, বিশদ অনুধাবন করা কঠিন ছিল। যা যা ঘটেছিল তা ভাবতে গেলে এখনও ওই রকম গণ্ডগোলের মধ্যে আমাকে পড়তে হয়। সভাপতিমশাই সম্ভবত তখনই বিচারপতি, প্রসিকিউটর, জুরি, প্রতিবাদী কৌঁসুলিকে নতুন প্রমাণপত্রটির সংবাদ জানালেন। সাক্ষীকে তাঁরা কী ভাবে জেরা করতে শুরু করলেন আমার কেবল এটুকুই মনে আছে। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি যখন কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে কোমল কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন এখন সে শান্ত হয়েছে কিনা তার উত্তরে সে চটপট বলে উঠল

"আমি প্রস্তুত! আমি প্রস্তুত!" হয়তো তখনও তার ভীষণ ভয় ছিল যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে তার সাক্ষ্য শোনাই হবে না, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, "আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো অবস্থা আমার পুরোমাত্রায় আছে।"

চিঠিটা কী ধরনের এবং কোন্ পরিস্থিতিতে সে ওটা পেয়েছিল বিশদ ব্যাখ্যা করে বলার জন্য তাকে অনুরোধ করা হল।

"আমি পেয়েছিলাম অপরাধটা ঘটার ঠিক আগের দিন, তবে ওটা ও লিখেছিল তারও আগের দিন, হোটেল থেকে, তার মানে, যেদিন ও অপরাধটা করে তার

দুদিন আগে। একবার তাকিয়ে দেখুন লেখা হয়েছে কোন্ একটা হিসাবের কাগজের ওপর!" হাঁপাতে হাঁপাতে সে চেঁচিয়ে বলল। "আমার ওপর একটা প্রবল ঘৃণা ওকে তখন পেয়ে বসেছিল, কেন না সে নিজে একটা জঘন্য কাজ করেছিল, এই বাজে মেয়েমানুষটার পিছন পিছন ঘুরছিল এবং আরও কারণ আমার কাছে ওর এই তিন হাজারের ঋণ। কী আর বলব! ওর নিজের মনটা ছোটো বলেই এই তিন হাজারের জন্য ওর মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল! এই তিন হাজার কী ভাবে এলো বলি—আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, মিনতি করছি, আমার কথাগুলো একবার শুনুন। ও যখন ওর বাবাকে খুন করে তারও তিন সপ্তাহ আগে একদিন সকালে ও আমার কাছে এলো। আমি জানতাম ওর টাকার দরকার আছে, কী জন্য দরকার তাও জানতাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলছি - এই পদে মেয়ে মানুষটাকে ফুসলে নিয়ে যাবার জন্যেই দরকার ছিল! আমি তখন জানতাম ও আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে, আমাকে ছেড়ে দিতে চায়, অথচ আমি, এই আমি নিজেই এই টাকাগুলো ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, এই বলেই দিয়েছিলাম যেন মস্কোয় আমার বোনের কাছে পাঠানোর জন্য দিচ্ছি। দেওয়ার সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম যখন খুশি পাঠাতে পারে—'এমন কি এক মাস পরে হলেও চলবে'। কিন্তু এটা কেমন করে হয়, কেমন করে এটা হয় যে ও বুঝতে পারল না আমি সরাসরি ওর মুখের ওপর এই কথাই বলে দিলাম 'ওই বাজে মেয়েমানুষটাকে নিয়ে আমার সঙ্গে বেইমানি করার জন্য তোমার টাকার দরকার? বেশ তো, এই তোমার টাকা, আমি নিজে হাতে তোমাকে দিচ্ছি। যদি তোমার আত্মসম্মানে এতটুকু না বাধে তাহলে নাও! ' ও যে আসলে কী এটাই আমি প্রমাণ করতে চাইছিলাম। তা কী হল? টাকা ও নিল, ঠিকই নিল, নিয়ে চলে গেল, এই বজ্জাত মেয়েমানুষটার সঙ্গে জুটে এক রাতে সেগুলো ওখানে উড়িয়ে দিল। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল, ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে আমি সব জানি। আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, ও তখন এটাও বুঝেছিল, আমি যে ওকে টাকা দিয়েছিলাম সেটা কেবল এটাই যাচাই করে দেখার জন্য যে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে ওর আত্মসম্মানে এতটুকুও বাধবে কিনা। ওর চোখে চোখ রাখলাম, ও-ও আমার চোখে চোখ রাখল—সব বুঝতে পারছিল, সবই বুঝতে পারছিল, কিন্তু তাও নিল, আমার টাকা নিয়ে চলে গেল!"

"ঠিক কথা কাতিয়া!" মিতিয়া হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল। "চোখে চোখ রাখতেই বুঝে নিলাম আমাকে অসম্মান করছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার টাকা নিয়েছিলাম!"

"আসামি", সভাপতি মশাই চেঁচিয়ে বললেন, "আর একটিও কথা যদি শুনি, আমি আপনাকে বের করে দেবার হুকুম দেব।"

"এই টাকাই ওর যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল" থেকে থেকে কাঁপতে কাঁপতে

তাড়াহুড়ো করে কাতিয়া বলে চলল, ‘টাকাটা ও আমাকে ফেরত দিতে চেয়েছিল, দিতে চেয়েছিল এটা সত্যি, কিন্তু এই বজ্জাত মেয়েমানুষটার জন্যও ওর টাকার দরকার ছিল। তাই ও ওর বাবাকে খুন করল, কিন্তু তাই বলে টাকা আমাকে ফেরত দিল না, তা না করে মেয়েমানুষটাকে নিয়ে চলে গেল ওই গ্রামে, যেখানে ও ধরা পড়ল। সেখানে ও আবারও টাকা ওড়ালো—সেই টাকা, যা ওর বাবাকে খুন করে তার কাছ থেকে চুরি করেছিল। আর বাবাকে যে দিন খুন করল তার আগের দিনই এই চিঠিটা লিখেছিল আমাকে, লিখেছিল মাতাল অবস্থায়, সেই সময় আমি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করে দেখেছি। লিখেছিল রেগে গায়ের ঝাল মিটিয়ে। জানত, ঠিকই জানত যে এ চিঠি আমি কাউকে দেখাতে যাব না—এমনকি ও যদি খুন করে তবুও না। নইলে লিখত না। ও জানত যে আমি ওর ওপর প্রতিহিংসা নিতে যাব না, ওর অনিষ্ট চাইব না! কিন্তু পড়ুন, মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, দয়া করে আরও মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখুন—তাহলেই দেখতে পাবেন কী ভাবে বাপকে খুন করবে, কোথায় তার টাকা আছে — সবেরই বর্ণনা ও দিয়েছে চিঠিতে, আগে থাকতেই সব বলেছে। দেখুন, দয়া করে দেখবেন, ওই জায়গাটা আবার ছেড়ে যাবেন না—ওখানে একটা জায়গায় ও লিখেছে ‘খুন করব, শুধু ইভানটা চলে গেলেই হয়।’ তার মানে, কী ভাবে খুন করবে সেটা সে আগে থাকতে ভেবে রেখেছিল”, হিংস্র উল্লাসে টিপ্পনী কেটে ইঙ্গিতে বিচারকদের মনে করিয়ে দিল কাতেরিনা ইভানভ্না। বলব কী, দেখাই যাচ্ছিল, এই সর্বনাশা চিঠিটা সে রীতিমতো খুঁটিয়ে পড়ে দেখেছে, তার অন্তর্নিহিত সমস্ত তাৎপর্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। “মাতাল না হলে ও আমায় লিখত না। কিন্তু দেখুন, ওখানে আগে থাকতে সব কিছু বলে দেওয়া আছে, পরে কী ভাবে খুন করল, ওর গোটা পরিকল্পনাটা কী—সবেরই হুবহু বর্ণনা আছে!”

বলতে বলতে যেভাবে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হয়ে সে আবেগে ভেসে গেল তাতে অবশ্যই বোঝা গেল এর পরিণামে তার নিজের যে কী হতে পারে এ নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, যদিও এটা ঠিক যে এসব হয়তো সে আরও মাসখানেক আগেই টের পেয়েছিল, কেন না তখনও হয়তো সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে মনে মনে ভেবেছিল: ‘আদালতে এটা পড়ে শোনালে কেমন হয়?’

এখন সে যা করল তাকে মরণঝাঁপ বলতে হয়। আমার মনে আছে ঠিক যেন তখনই আদালতের সচিব চিঠিটা সরবে পড়ে শোনালেন, আর তাতে সকলের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হল। মিতিয়াকে প্রশ্ন করা হল চিঠিটা তার নিজের লেখা বলে সে স্বীকার করছে কি না।

“আমার! আমার!” মিতিয়া চেঁচিয়ে বলে উঠল। “মাতাল না হলে লিখতে যেতাম না! আমরা অনেক ব্যাপারে একে অন্যকে ঘেন্না করতাম—ঠিকই কাতিয়া, কিন্তু আমি শপথ করে বলছি, একথা আমি শপথ করে বলছি যে আমি তোমাকে

ঘেন্না করলেও ভালোবাসতাম, কিন্তু তুমি?—তুমি আমাকে ভালোবাস নি!" বলতে বলতে সে তার জায়গায় এলিয়ে পড়ে অসহায়ের মতো হাতে হাত মোচড়াতে লাগল।

প্রসিকিউটর ও প্রতিবাদী কৌঁসুলি কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে জেরা-পালটা জেরা শুরু করে দিলেন, যার মূল কথাটি ছিল 'এরকম একটা প্রমাণপত্র এই কিছু আগেও আপনি যে চেপে রেখেছিলেন এবং আগে যে আপনি একেবারে অন্য মেজাজে, অন্য সুরে এজাহার দিয়েছিলেন তার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে?'

"হ্যাঁ তা ঠিক, ঠিকই বলেছেন! এই কিছু আগেও আমি মিথ্যে কথা বলেছি, যা বলেছি সব মিথ্যে. আমার সম্মান আর বিবেকের বিরুদ্ধে বলেছি, কিন্তু আমি ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কারণ ও আমাকে কী ঘেন্নাই যে করত, কী উপেক্ষাই না করত!" পাগলের মতো চিৎকার করে বলল কাতিয়া। "ওঃ কী ভীষণ উপেক্ষার চোখেই না দেখত! বরাবরই উপেক্ষার চোখে দেখত। আর জানেন, আপনারা জানেন কি, ও ঠিক সেই মুহূর্তটা থেকে আমাকে উপেক্ষার চোখে দেখতে শুরু করেছিল যখন আমি এই টাকার জন্য সেই সময় ওর পায়ে পড়েছিলাম? সেটা আমার চোখে পড়েছিল। আমি সেই মুহূর্তে, তখনই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, কিন্তু অনেক কাল পর্যন্ত আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কতবারই না ওর চোখের ভাষায় পড়েছিলাম 'যা-ই বল না কেন, তুমি তখন নিজে থেকে আমার কাছে এসেছিলে!' ওঃ কী বলব! ও বুঝতে পারেনি, আমি যে কেন তখন ওর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ওর ছিল না! মানুষের মধ্যে নীচতা ছাড়া আর কিছু দেখার ক্ষমতা ওর নেই! নিজেকে দিয়ে ও আমার বিচার করেছিল, ভেবেছিল সবাই বুঝি ওরই মতন!" প্রচণ্ড ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে দাঁতে দাঁত ঘষল কাতিয়া। "আর আমাকে যে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার একমাত্র কারণ এই যে আমি সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। এটাই কারণ, এটাই কারণ! আমার সব সময়ই মনের মধ্যে সন্দেহ ছিল যে এই কারণে। ওঃ, ও একটা জানোয়ার! সারা জীবন ধরে ওর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তখন আমি যে ওর কাছে এসেছিলাম এর জন্য আমি ওর কাছে সারা জীবনের মতো মরমে মরে থাকব, আর ও-ও চিরটা কাল আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারবে, এইভাবে আমার ওপরে থাকতে পারবে—এই কারণেই না আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। যা বলছি তাই, সব তাই! আমি ওকে আমার ভালোবাসা দিয়ে জয় করার চেষ্টা করেছিলাম। আমার সে ভালোবাসার কোনো সীমাপরিসীমা ছিল না। এমনকি ওর বেইমানিও সহ্য করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ও সে সবের কিছু বুঝল না, কিছুই বুঝল না! বুঝবেই বা কী করে? ও যে একটা পাষণ্ড! এই চিঠিটা আমি অবশ্য কেবল পর দিন সন্ধ্যাবেলায় পেয়েছিলাম। হোটেল থেকে আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। সেই দিনই, সে

দিন সকালেও কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল ওর সব দোষ আমি ক্ষমা করে দেব—সব ক্ষমা করে দেব—এমনকি ওর বেইমানিও!”

বলাই বাহুল্য, সভাপতি ও প্রসিকিউটর দুজনেই তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইভাবে প্রবল উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় তার এই অবস্থার সুযোগ যে তাঁদের নিতে হচ্ছে এবং এমন ধরনের স্বীকারোক্তি যে তাঁদের শুনতে হচ্ছে এর জন্য ওঁরা সকলে নিজেরাও হয়তো লজ্জা পাচ্ছিলেন। আমার মনে আছে, আমি শুনেছিলাম, ওঁরা তাঁকে বলছিলেন 'আপনার পক্ষে যে কী কষ্টকর সেটা আমরা বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করুন, উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের আছে', ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তাহলে কী হবে? হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে তাঁরা কিন্তু ঠিক টেনে সাক্ষ্য বের করেছিলেন। গত দু মাস ধরে ইভান ফিয়োদরভিচ্ তার ভাই ওই 'নৃশংস খুনেটাকে' বাঁচানোর জন্য প্রায় পাগল হয়ে কী রকম উঠে পড়ে লেগেছিল, এই ধরনের তীব্র সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যেও কোনো কোনো মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য ঝলক দিয়ে গেলেও অনেক সময় যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, কাতিয়াও তেমনি এরই মধ্যে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তার বর্ণনা দিতে পেরেছিল।

“উনি নিজেকে কষ্ট দিয়েছেন”, কাতিয়া বলে উঠল, “ভাইয়ের অপরাধকে ছোটো করে দেখানোর চেষ্টায় বারবার আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে উনি নিজেও তাঁর বাবাকে ভালোবাসেন না এবং হয়তো নিজেও মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করেন। আহা, কতটা গভীর, কী গভীর ওর বিবেক বলুন তো! বিবেকের যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছেন! সব কিছু খুলে বলেছেন আমাকে, সব বলেছেন। আমার কাছে রোজ আসতেন, আমাকে তার একমাত্র বন্ধু জ্ঞান করে আমার সঙ্গে কথা বলতেন। আমি তাঁর একমাত্র বন্ধু বলে নিজেকে সম্মানিত মনে করি!” ঠিক যেন এক ধরনের চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে চিৎকার করে কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে তার দুইচোখে আগুন জ্বলে উঠল। “দু বার স্মের্দিকোভের কাছে গিয়েছিলেন। এখানে সকলে এমন গল্প চাওড় করে দিয়েছিল যে স্মের্দিকোভ খুন করেছে, তাই একবার আমার কাছে এসে স্মের্দিকোভের প্রসঙ্গ তুলে উনি বলেছিলেন, 'ভাই খুন না করে যদি স্মের্দিকোভ্ খুন করে থাকে তাহলে হয়তো আমিও দোষী, কেন না স্মের্দিকোভ্ জানত যে আমি বাবাকে দু চক্ষে দেখতে পারি না, তাই হয়তো ভেবেছিল আমি বাবার মৃত্যু কামনা করি।' তখন আমি এই চিঠিটা বার করে ওঁকে দেখালাম: এবারে ওঁর পুরোপুরি বিশ্বাস হল যে ভাই-ই খুন করেছে, আর এতে উনি একেবারে মুষড়ে পড়ল। ওঁর নিজের ভাই—সে কিনা পিতৃহন্তা! এটা উনি সহ্য করতে পারলেন না। এক সপ্তাহ আগেই আমি লক্ষ করে দেখেছি এতে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শেষ যে কয়েক দিন আমার কাছে এসেছিলেন তখন বসে বসে ভুল বকতেন। আমি দেখলাম ওঁর বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ভুলভাল বকতেন — এই অবস্থায়

লোকে ওঁকে রাস্তায় দেখেছে। মস্কো থেকে যে ডাক্তার এখানে এসেছেন তিনি আমার অনুরোধে গত পরশুদিন ওঁকে দেখেছেন, পরীক্ষা করে বললেন ওঁর রোগটা মস্তিষ্কের প্রদাহের কাছাকাছি। এ সবই এই এটার জন্য, এই পশুটার জন্য। তারপর গতকাল উনি জানতে পারলেন স্মের্দিকোভ্‌ মারা গেছে—এই ঘটনায় উনি এমনই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন যে উনি পাগল হয়ে গেলেন।... যত নষ্টের গোড়া এই জানোয়ারটা। সব হয়েছে এই জানোয়ারটাকে বাঁচাতে গিয়ে!"

হাঁ, এটা ঠিকই যে এ ধরনের কথা বলা এবং এরকম স্বীকারোক্তি করা একমাত্র জীবনে কোনো একবারই সম্ভব—আর সেটা সম্ভব মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে—এই যেমন বধ্যভূমিতে প্রাণদণ্ডের মঞ্চে ওঠার সময়। কিন্তু এটাই ছিল কাতিয়ার নিজস্ব চরিত্র, এই মুহূর্তটি তার জীবনের এই রকমই একটা মুহূর্ত। এ ছিল সেই উদগ্র স্বভাবের কাতিয়া যে তার বাবাকে বাঁচানোর জন্য সেই সময় একটা দুশ্চরিত্র যুবকের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল; সেই একই কাতিয়া, সেই তেজস্বিনী ও অপাপবিদ্ধ কাতিয়া যে এই কিছু আগেও মিতিয়ার ভাগ্যে যা অপেক্ষা করে আছে অন্তত কিছু পরিমাণে হলেও তার ভার লাঘব করার আশায় মিতিয়ার 'মহত্ত্বের' বিবরণ দিয়ে সমগ্র জনমণ্ডলীর সামনে নিজেকে বলি দিয়েছিল, তার কুমারীসুলভ লজ্জা বিসর্জন দিয়েছিল। আবার এই এখন ঠিক সেই একই রকম ভাবে সে নিজেকে বলি দিল—কিন্তু এবারে আরেক জনের জন্য; আর এই আরেক জন যে তার কত প্রিয় এটা উপলব্ধি করে, পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, বলা যায় না, হয়তো শুধু এই এখনই, একমাত্র এই মুহূর্তে, এই প্রথম সে তা করল! ইভান যে তার সাক্ষ্যে বলেছিল যে তার ভাই নয়, সে-ই খুন করেছে, এর ফলে সে তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে—হঠাৎ এরকম একটা ধারণা হতে তারই বশবর্তী হয়ে ইভানের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে সে নিজেকে বলি দিল। ইভানকে বাঁচানোর জন্য, তার সুনাম, তার খ্যাতিকে রক্ষা করার জন্যই কাতিয়ার এই আত্মত্যাগ।

তা সত্ত্বেও এমন একটা সম্ভাবনা এক ঝলক উঁকি দিয়েছিল যা ভাবলেও ভয় হয়। মিতিয়ার সঙ্গে তার আগেকার সম্পর্কের বিবরণ দিতে গিয়ে মিথ্যে করে কিছু বলেনি ত কাতিয়া?—এটাই ছিল প্রশ্ন। না, তা নয়। কাতিয়া যখন চিৎকার করে বলেছিল যে মিতিয়ার সামনে সে আভূমি নত হয়েছিল বলে মিতিয়া তাকে ঘৃণার চোখে দেখে তখন কিন্তু মিতিয়ার কুৎসা করার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। তার নিজেরই মনে মনে এই বিশ্বাস ছিল, তার গভীর বিশ্বাস জন্মেছিল—হয়তো আভূমি নত হওয়ার সময় থেকেই তার এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে সরলমতি মিতিয়া—যে সেই তখনই কাতিয়া বলতে পাগল হয়ে গিয়েছিল—আসলে তাকে নিয়ে মনে মনে হাসছে, তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে একমাত্র অহংকারবশত, তার অহংকারে আঘাত লাগায় কাতিয়া নিজে তখন তাকে প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছিল, কিন্তু সে প্রেম ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, ভাঙা মনের উচ্ছ্বাস—ভালোবাসার মতো নয়,

বরং প্রতিহিংসার মতো। আহা, এই ভগ্ন হৃদয়ের প্রেমও হয়তো সত্যিকারের প্রেমের জন্ম দিতে পারত, হয়তো এছাড়া আর কোনো বাসনা কাতিয়ারও ছিল না, কিন্তু মিতিয়া তার সঙ্গে বেইমানি করে তার অন্তরের অন্তস্তলে আঘাত হেনেছিল, তাই কাতিয়া অন্তর থেকে তাকে ক্ষমা করতে পারেনি। প্রতিহিংসা গ্রহণের মুহূর্তটি আকস্মিক ভাবে এসে গিয়েছিল, আর আহত নারীর বুকের ভেতরে এতদিন ধরে যা জমছিল, ক্রমে জমে তাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছিল সে সব যেন একই সঙ্গে এবং আবারও আকস্মিক ভাবেই বাইরে ফেটে পড়ল। সে মিতিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, কিন্তু নিজের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করল! আর বলাই বাহুল্য, যে-ই মনের সব কথা খুলে বলল অমনি মনের উত্তেজনাও কেটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে জুড়ে বসল। তার পর আবারও শুরু হল তার হিস্টিরিয়া। উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে কখনও ফুঁপিয়ে, কখনও চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই মুহূর্তে গ্রুশেন্‌কা তার জায়গা ছেড়ে উঠে বিলাপ করতে করতে এমন ভাবে মিতিয়ার দিকে ছুটে গেল যে তাকে আটকানোর মতো সময়ই পাওয়া গেল না।

"মিতিয়া!" গ্রুশেন্‌কা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠল। "তোমার কালনাগিনীটা তোমার সর্বনাশ করে গেল! ও যে কী চিজ সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিয়ে গেল!" রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিচারকদের উদ্দেশে সে চেঁচিয়ে বলল।

সভাপতি ইশারা করতে তাকে ধরে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু গ্রুশেন্‌কাকে রোখা যাচ্ছিল না। সে ছটফট করতে করতে ফের মিতিয়ার কাছে ছুটে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। মিতিয়াও আর্ত চিৎকার করে তার দিকে ছুটে গেল। শেষকালে দুজনকেই কাবু করা হল।

হ্যাঁ, আমার ধারণা, আমাদের মহিলা দর্শকরা, যাঁরা তামাশা দেখতে এসেছিলেন, খুশিই হয়েছিলেন। দৃশ্যটা দেখার মতো হয়েছিল বটে! এরপর, মনে আছে, উপস্থিত হলেন মস্কো থেকে আগত ডাক্তারটি। আমার মনে হয়, সভাপতি মশাই এর আগেই ইভান ফিয়োদরভিচের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আদালতের কর্মচারী দিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনতে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার আদালতকে জানালেন যে রোগী মস্তিষ্কের প্রদাহরোগের আক্রমণের একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আছে, তাকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। প্রসিকিউটর ও প্রতিবাদী কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে তিনি সমর্থন করে বললেন যে রোগী নিজে থেকে গত পরশুদিন তাঁর কাছে এসেছিল এবং তা যে শিগ্‌গিরই এরকম একটা বিকারের ঘোরে পড়তে পারে এই বলে তিনি তাকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন, কিন্তু রোগী চিকিৎসা করাতে রাজি হল না। সুস্থ মস্তিষ্কে অবশ্যই ছিলেন না। নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে জাগ্রত অবস্থাতেও অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন, রাস্তায় নানা ধরনের এমন সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ পান যারা ইতিমধ্যে মারা গেছে এবং রোজ সন্ধ্যায়

তাঁর কাছে নাকি শয়তানের আগমন ঘটে', সর্বশেষে ডাক্তার বললেন। খ্যাতনামা চিকিৎসকটি তাঁর এজাহার দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন। কাতেরিনা ইভানভ্‌নার পেশ করা চিঠিটা সাক্ষ্যপ্রমাণের বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হল। বিচারকমন্ডলী নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শের পর স্থির করলেন আদালতের তদন্তের কাজ চলতে থাকবে এবং কাতেরিনা ইভানভ্‌না ও ইভান ফিয়োদরভিচ্—দুজনের দেওয়া অপ্রত্যাশিত এজাহার দুটিও আদালতের নথিভুক্ত করা হবে।

এর পরের আর কোনও এজাহারের বিবরণ আমি দিতে যাচ্ছি না। বাদবাকি সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলি এর আগে যারা সাক্ষ্য দিয়ে গেল তাদেরই সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র, যদিও সবগুলিরই নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু আবারও বলছি সব মিলিত হবে একটি বিন্দুতে এসে—সভাপতির ভাষণে। এখন আমি সেটাতেই আসছি। শেষ যে বিপর্যয়টি ঘটে গেল তাতে সকলে উত্তেজিত, সকলের অবস্থা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো। যত তাড়াতাড়ি হয় অন্তত ঘটনার গ্রন্থিমোচন, বাদী-বিবাদীপক্ষের বক্তৃতা এবং আদালতের রায়দান শোনার জন্য সকলে জ্বলন্ত আগ্রহ নিয়ে, অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। ফেদিউকোভিচকে দেখে মনে হচ্ছিল কাতেরিনা ইভানভ্‌নার এজাহারে তিনি স্তম্ভিত। এদিকে প্রসিকিউটর বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত। আদালতের অনুসন্ধান পর্ব শেষ হতে অধিবেশনের বিরতি ঘোষণা করা হল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিরতির পর বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি তাঁর জায়গায় ফিরে এসে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করলেন। আমাদের প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ যখন অভিযোগের বিবরণ দিতে উঠলেন আমার মনে হয় তখন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা আটটা।

## ছয়

## প্রসিকিউটরের বক্তৃতা

## চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ

স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ অভিযোগের বিবরণ দিতে শুরু করলেন। তাঁর আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছিল, কপালে আর দু পাশের রগে অসুস্থ ধরনের ঠান্ডা ঘাম দেখা দিয়েছিল। সর্বাঙ্গ জুড়ে পালা করে একবার শীত শীত করতে লাগল, আরেকবার জ্বরজ্বর বোধ হতে লাগল। একথা তিনি নিজে পরে বলেছিলেন। এই ভাষণটিকে তিনি তাঁর chef d'oeuvre বা masterpiece বলে মনে করতেন, তাঁর সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি-ও শেষ সংগীত বলে গণ্য করতেন। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এই ঘটনার নয় মাস পরে দুরারোগ্য ক্ষয় রোগে তিনি মারাও যান। তাই তিনি যদি তাঁর শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে বলে আগে থাকতে টের পেয়ে তাঁর এই ভাষণটিকে তাঁর জীবনের

শেষ সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন তাহলে দেখা যাচ্ছে সত্যি সত্যি সে অধিকার তাঁর ছিল। এই ভাষণের মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ এবং তাঁর মস্তিষ্কের যতটুকু যা ছিল সব ঢেলে দিয়েছিলেন। আমাদের হতভাগ্য ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ এর মধ্য দিয়ে শেষ কালে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রমাণ করতে পারলেন যে যেমন নাগরিকতাবোধ, তেমনি মানুষের 'অভিশপ্ত' সমস্যা সম্পর্কে ধারণাও তাঁর মনের গহনে কোথাও লুকিয়ে ছিল—অন্ততপক্ষে ততটা, যতটা নিজের মধ্যে ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। বড়ো কথা, তার ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল তাঁর আন্তরিকতার গুণে। তিনি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী। আসামির বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ এনেছিলেন তা কেবল তাঁর নিজের পদাধিকারবলে নয়, কোনো ফরমায়েশমাফিক নয়। 'প্রতিশোধ গ্রহণের' আবেদন জানানোর সময় তিনি যে সত্যি সত্যি কাঁপছিল তার মূলে ছিল 'সমাজকে রক্ষা করার' প্রবল বাসনা। এমনকি আমাদের যে মহিলা জনসাধারণ, যাঁরা শেষ পর্যন্ত ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের প্রতি শত্রুভাবাপন্নই থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও কিন্তু স্বীকার করতে হয়েছিল যে তাঁদের মনের ওপর তিনি অসাধারণ ছাপ ফেলেছেন। আরম্ভ করেছিলেন ভাঙা ভাঙা খনখনে গলায়, কিন্তু পরে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কণ্ঠস্বর জোরাল হয়ে উঠল, আদালতকক্ষের সর্বত্র ঝঙ্কৃত হতে লাগল এবং সেই ভাবেই তিনি তাঁর ভাষণ শেষও করলেন। কিন্তু শেষ করা মাত্র তাঁর সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল।

"উপস্থিত জুরি মহোদয়বৃন্দ", অভিযোক্তা তাঁর ভাষণ শুরু করলেন, "বর্তমান মামলাটি সারা রাশিয়ায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু মনে হতে পারে এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার এমন কী আছে, বিশেষ করে রোমহর্ষক এমন কী আছে? বিশেষ করে আমাদের কাছে, আমাদের মতো লোকদের কাছে? আমাদের মতো লোকদের কাছে এসব ত খুবই অভ্যস্ত ব্যাপার! আমাদের আতঙ্কের কথাটা এখানেই যে এই ধরনের তামসিক কার্যকলাপ আমাদের কাছে আর বিভীষিকাময় বলে মনে হয় না! কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিচ্ছিন্ন কোনো দুষ্কর্ম নয়, আমরা যে তাতে এরকম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি সেটাই তো আতঙ্কের কারণ হওয়া উচিত। এই ধরনের যে কার্যকলাপ, সময়ের এই যে সমস্ত লক্ষণ, যা আমাদের কোনো ঈর্ষণীয় ভবিষ্যতের পূর্বলক্ষণ সূচনা করছে না, সে সবের প্রতি আমাদের যে ঔদাসীন্য, আমাদের সবেতেই এই যে অনেকটাই নরম মনোভাব, এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? আমাদের নাক সিঁটকানো? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর কল্পনাশক্তির অকাল ক্ষয়িষ্ণুতা? আমাদের এই যে সমাজ যা এখনও এত নবীন অকালেই কি তা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ল? তাহলে কি বলতে হবে আমাদের নীতবোধের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গেছে, ভূমিসাৎ হয়ে গেছে? না কি শেষ পর্যন্ত এটাই ধরে নিতে হবে যে ওসব নীতিবোধের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত আমাদের নেই? এসব প্রশ্নের কোনো সমাধান আমি দিতে পারছি না। কিন্তু

সে যাই হোক না কেন, এগুলি পীড়াদায়ক, আর প্রতিটি নাগরিকের উচিত—শুধু উচিত বলব না, অবশ্যকর্তব্য—এর জন্য মর্মযন্ত্রণা ভোগ করা। আমাদের নবজাত সংবাদমাধ্যম এখনও ভীরুপ্রকৃতির হলেও ইতিমধ্যেই অবশ্য আমাদের সমাজকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে, কেন না সংবাদ মাধ্যমের অস্তিত্ব না থাকলে মানুষের লাগামছাড়া ইচ্ছা ও তার নৈতিক অধঃপতনের বিভীষিকার সামগ্রিক রূপ আমাদের পক্ষে এতটুকু জানা সম্ভব হত না। পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় তা অনবরত প্রকাশিত হচ্ছে বলেই বর্তমান আমলের প্রচলিত প্রকাশ্য বিচারব্যবস্থার ফলে যাঁরা আদালতকক্ষে উপস্থিত থাকতে পারছেন শুধু তারাই নন, সকলেই তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন। আর প্রায় প্রতিদিন আমরা পত্রপত্রিকায় কী পড়ছি বলুন তো? হায়, প্রায় প্রতি মুহূর্তে এমন সব জিনিস পড়ছি যার পাশে আমাদের বর্তমান মামলা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায়, অনেকটা নিত্যকার সাধারণ ঘটনা বলেই মনে হয়! কিন্তু যেটা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে আমাদের রুশিদের, আমাদের জাতির অধিকাংশ হিংসাত্মক ঘটনা ঠিক এমনই একটা কিছুর সাক্ষ্য বহন করছে যা বলতে গেলে সর্বব্যাপী, কতকটা যেন আমাদের মজ্জাগত, সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়া এক সমূহ বিপদ। এ যেন এক সর্বগ্রাসী অশুভ শক্তি, এর সঙ্গেও এখন জুঝে ওঠা ভার। এই দেখুন না কেন, সমাজের উঁচু মহলের একজন কৃতী যুবক, মিলিটারি অফিসার, সবে তার কর্মজীবন শুরু করেছে। কী করল সে? একজন ছোটখাটো সরকারি আমলার কাছে তার নিজের যে ঋণপত্রটি জমা রাখা ছিল সেটা গায়েব করা এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু টাকা হাতানোর উদ্দেশ্যে বিশেষত যে লোকটা এককালে তার উপকার করেছিল, তাকে সেই সঙ্গে চাকরানিকেও একজন নীচাশয়ের মতো চুপচাপ দিব্যি খুন করে বসল—এর জন্য বিবেকের এতটুকু দংশন অনুভব করল না! মনে মনে ভাবল, 'আমার ইহজীবনের পরম সুখ মেটাতে এবং আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে কাজে লাগবে।' দুজনকে খুন করল, তারপর মৃত দুজনেরই মাথার তলায় কেমন সুন্দর দুটো বালিশ দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল! আবার দেখুন, এক যুবক বীরপুরুষ—সাহসিকতার জন্য নানারকম সম্মান পদক ঝুলছে তার বুকে—সে কী করছে? যে ব্যক্তি তার শুভানুধ্যায়ী, তার অধিনায়ক তারই মার ওপর রাহাজানি করছে, ছিনতাই করে সেই মহিলাকে ডাকাতের মতো খুনও করছে, তার সঙ্গীসাথীদের প্ররোচনা দিয়ে, এই বলে আশ্বাস দিয়ে নিজের দলে টানছে যে মহিলা তাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন, তাই সে যা যা পরামর্শ দেবে সবই অনুসরণ করবেন, কোনো রকম সাবধানতা অবলম্বন করবেন না। ধরলাম লোকটা নৃশংস প্রকৃতির, কিন্তু আমি এখন, আমাদের এই কালে বুক ঠুকে বলতে পারছি না এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। আরেক জন দেখা গেল খুন করছে না, কিন্তু ঠিক তারই মতো ভাবছে, উপলব্ধি করছে। সেও কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই লোকটারই সমান বিবেকহীন। নিরিবিলিতে, একান্তে যখন তার বিবেকের সংস্পর্শে

আসছে তখন হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করছে 'কিন্তু মানুষের সম্মান,—সেটা কী? রক্তপাতকে ধিক্কার দেওয়া—এটা মানুষের মনের একটা সংস্কার নয় কি?' লোকে হয়তো চিৎকার করে আমার বিরুদ্ধে এই কথাই বলবে যে আমি একটা অসুস্থ মনোভাবাপন্ন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোক, উৎকট ধরনের সব কুৎসা করছি, আবোল তাবোল বকছি, বাড়িয়ে বলছি। বেশ তো, হে ঈশ্বর, তা-ই যেন হয়। সেটা হলে তো আমিই প্রথম খুশি হব! বলছি তো, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। ধরে নিন আমি অসুস্থ লোক। কিন্তু তাহলেও মনে রাখবেন আমার কথাগুলো আমার কথার মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ, এমনকি অন্তত বিশ ভাগের এক ভাগও যদি সত্যি হয় সেটাও কিন্তু ভয়ঙ্কর! ভদ্রমহোদয়রা, দেখুন, একবার চেয়ে দেখুন আমাদের যুবকেরা কেমন গুলি করে আত্মহত্যা করছে! ও ধারে কী আছে—ওসব হ্যামলেটীয় প্রশ্ন বিন্দুমাত্র তাদের মনে জাগে না, তার কোনো নামগন্ধ নেই। যেন আমাদের মনোবলের বিষয়টি এবং পরলোকে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে এই ধরনের যাবতীয় প্রসঙ্গ ওদের প্রকৃতির মধ্যে অনেক কাল হল নষ্ট হয়ে গেছে, কবরে চলে গেছে, বালির স্তূপে চাপা পড়ে গেছে। শেষকালে, দেখুন আমাদের ভ্রষ্টাচারের নমুনা, চেয়ে দেখুন আমাদের লালসাপরায়ণ লোকগুলোকে। বর্তমান মামলায় যিনি অপরাধের শিকার সেই হতভাগ্য ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ ব্যক্তিটি তাদের অনেকের তুলনায় প্রায় একটা নিষ্পাপ বাচ্চা ছেলে। আর আমরা সকলে তো ওকে জানতামও, 'উনি আমাদের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছিলেন হ্যাঁ, আমাদের দেশে এবং ইউরোপেও যাঁরা অগ্রগণ্য মেধার অধিকারী তাঁরা হয়তো কোনো একদিন রুশ অপরাধ জগতের মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করবেন, কেন না বিষয়টি তার উপযুক্ত বটে। কিন্তু সেই চর্চার সূচনা হবে পরে কোনো এক সময়ে, কোন এক অবকাশে, যখন আমাদের বর্তমান মুহূর্তের বিশৃঙ্খল অবস্থার সবটাই বেশ খানিকটা দূরে সরে যাবে, যার ফলে, এই আমার মতো লোকেরা যেমন করতে পারে তার চেয়েও বেশি বিচক্ষণতার সঙ্গে, আরও নিরপেক্ষভাবে তা খতিয়ে দেখা সম্ভব হবে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে আমরা হয় আতঙ্কে শিউরে উঠতে পারি, নয়তো আতঙ্কে শিউরে ওঠার ভান করতে পারি, যদিও আমরা নিজেরা তার উল্‌টোটাই করছি: তারিয়ে তারিয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করছি। আমরা তাদের মতো, যাদের পছন্দ প্রবল মাত্রার, উৎকেন্দ্রিক এমন সমস্ত অনুভূতি যা আমাদের আলস্যজড়িত সিনিক মনোবৃত্তিতে, আমাদের কুঁড়েমিতে সুড়সুড়ি দেয়। অথবা বলা যেতে পারে ছোটো বাচ্চাদের মতো, হাতের ঝাপ্‌টা দিয়ে ভয়ঙ্কর ভূত তাড়ানোর চেষ্টা করছি, বালিশে মাথা গুঁজে মুখ লুকিয়ে ভাবছি কতক্ষণে সেই বিভীষিকাময় অপচ্ছায়া দূর হয়ে যায়, আর সেটা দূর হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা ভুলে গিয়ে আনন্দফূর্তি ও খেলাধুলোতে মেতে ওঠা যায়। কিন্তু একটা না একটা সময়ে তো সমাজের ওপর যেমন আমরা দৃষ্টিপাত করি তেমনি আমাদের যার যার নিজের ওপরও

দৃষ্টিপাত করতে হয়! আমাদের সামাজিক অবস্থান অন্তত কিছুটা হলেও বোঝার চেষ্টা করতে হয়, অথবা নিদেন পক্ষে বুঝতে শুরু করতে হয়। বিগত শতাব্দীর মহান লেখক তাঁর মহত্তম রচনার[৩৭] উপসংহারে সমগ্র রাশিয়াকে কোনো এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান তিন ঘোড়ার গাড়ি ত্রোইকা রূপে কল্পনা করে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠেছিলেন  'আহা, ত্রোইকা, পক্ষীরাজ ত্রোইকা! কে তোমায় আবিষ্কার করেছিল?' সেই সঙ্গে গর্বমিশ্রিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যোগ করেছিলেন যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত সেই ত্রোইকার সামনে পড়ে সসম্মানে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিচ্ছে আর সব দেশ, অন্য সব জাতি। তা মহাশয়রা, তা-ই না হয় হল, না হলে সরেই দাঁড়াল—সসম্মানে হোক আর না-ই হোক; কিন্তু আমার এই পাপ চোখে, মহাপ্রতিভাধর কথাশিল্পী যে উপসংহার টেনেছিলেন তা হয় সুকুমারমতি শিশুসুলভ সরল সুন্দর ভাবনাচিন্তার ঘোরে, নয়তো তখনকার দিনে প্রচলিত সেন্সর ব্যবস্থার ভয়ে।[৩৮] কারণ তাঁর ওই ত্রোইকাতে যদি কেবলমাত্র তাঁরই কাহিনির নায়ক সবাকিয়েভিচ্, নজ্‌দ্রিয়োভ্ ও চিচিকোভ্‌রা[৩৯] জোতা থাকত তাহলে চালকের আসনে যাকেই বসানো হোক না কেন ওসব ঘোড়ার ওপর ভরসা করে খুব একটা বেশি দুর যাওয়া সম্ভব নয়। তাও আবার আগেকার দিনের ঘোড়া হলে তবু এক কথা, সেগুলো তবু একরকম, কিন্তু আজকালকারগুলো তো আরও সরেস!...''

এই জায়গায় এসে করতালিধ্বনিতে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের বক্তৃতায় বিঘ্ন ঘটল। রুশ ত্রোইকার এই উদারনৈতিক রূপকল্পনাটি লোকের মনে ধরেছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে এরকম অত্যুৎসাহী মাত্র দু তিনটেই বেরিয়েছিল, তাই সভাপতি মশাই জনসাধারণকে আদালত কক্ষ সাফ করার হুমকি পর্যন্ত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না, তিনি শুধু কটমট করে আদালতের আইন লঙ্ঘনকারীদের দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ উৎসাহিত হয়ে পড়লেন  আজ পর্যন্ত কখনও তিনি করতালিধ্বনিতে অভিনন্দিত হননি! এত কাল হয়ে গেল, যে লোকটার কথা কেউ শুনতে চায়নি, আজ হঠাৎ তার সামনে সমগ্র রাশিয়ার উদ্দেশে নিজের মনের কথা বলার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে!

তিনি বলে চললেন, ''আসলে সত্যিই তো, কী এই কারামাজভ্ পরিবার? কোন্ গুণে তার খ্যাতি?—এমন কি সারা রাশিয়া জুড়ে তার এমন মর্মান্তিক খ্যাতি? হয়তো আমি বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু আমার মনে হয় এই পরিবারের চিত্রটির মধ্যে আমাদের সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু কিছু মূল উপাদান যেন ঝলক দিচ্ছে। না, না, সব উপাদান অবশ্যই নয়, তা ছাড়া যা ঝলক দিল তা অতি সূক্ষ্ম আকারে—'সামান্য এক ফোঁটা জলের মধ্যে সূর্যের আলো দেখার মতো'। কিন্তু তা হলেও কিছু একটা অন্তত প্রতিফলিত হল, কিছু একটা প্রতিক্রিয়া তো অন্তত ঘটলই। আসুন, দেখা যাক, 'পরিবারের পিতা' হতভাগ্য,

অসংযত ও দুশ্চরিত্র এই বৃদ্ধটিকে, যাকে এমন শোচনীয় ভাবে তার জীবনের পরিসমাপ্তি টানতে হল। বংশানুক্রমে অভিজাত ভূস্বামী, প্রথম জীবনে অন্যের আশ্রিত ও অভাবগ্রস্ত, না জেনেশুনে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুবাদে যৌতুক হিসেবে যৎসামান্য পুঁজি তার হস্তগত হয়েছিল। গোড়ায় ছিঁচকে ঠগবাজ ও চাটুকারী ভাঁড়। মস্তিষ্ক খাটানোর ক্ষমতা ছিল তার মজ্জাগত—যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, সেখানে এতটুকু দৌর্বল্য ছিল না, যার ফলে সর্বোপরি সে হয়ে উঠেছিল একজন কুসীদজীবী মহাজন। কালে কালে, অর্থাৎ পুঁজিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহও বেড়ে চলল। লোকের কাছে মাথা হেঁট করা আর লোককে তোয়াজ করার প্রবৃত্তি তার চলে গেল। থাকার মধ্যে থেকে গেল তার ঠাট্টাবিদ্রূপ, খল সিনিক চরিত্র আর কামুক স্বভাব। অধ্যাত্ম চেতনাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, এদিকে জীবনতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে দাঁড়াল এই যে কামনাবাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া জীবনের আর কোনও দিকই সে দেখতে পায় না, নিজের ছেলেদেরও সে এই শিক্ষাই দিল। বাপ হিসেবে তার যে কোনো নৈতিক কর্তব্য থাকতে পারে সে রকম কোনো বোধ তার ছিল না। ওসব তার কাছে হাস্যকর। তার ছোটো বাচ্চারা বাড়ির পিছনের উঠোনে চাকরদের মহলে মানুষ হয়, তার কাছ থেকে ওদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে সে বরং খুশি। এমনকি তাদের কথা একেবারে ভুলেও যায়। বৃদ্ধের সমস্ত নীতির মূল মন্ত্র হল apres moi le deluge[১০]— আমার পরে মহাপ্রলয় হলে হোক! একজন নাগরিকের বোধ বলতে যা বোঝায় তার বিপরীত সব কিছুর, এমনকি লোক সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বৈরভাবের এক মূর্তিমান বিগ্রহ! 'বিশ্বচরাচর আগুনে পুড়লে পুড়ুক, আমার একার ভালো হলেই হল!' ভালোই হল তার, সে খুশিতে ডগমগ, পারলে এই ভাবে আরও বিশ-ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেয়। সে তার নিজের ছেলেকে হিসাবে কারচুপি করে ঠকায়, ছেলে যে টাকা উত্তরাধিকারসূত্রে তার মার কাছ থেকে পেয়েছিল, যা ছেলেকে ফেরত দিতে সে নারাজ সেই টাকা খরচ করে তার কাছ থেকে, নিজের ছেলের কাছ থেকে তার প্রণয়িনীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। না, আসামির পক্ষ সমর্থনের জন্য অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আমাদের সহকর্মী, যিনি পেতের্বুর্গ থেকে এসেছেন, তাঁর হাতে আসামির পক্ষ সমর্থনের ভার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে আমি রাজি নই। যা সত্যি আমি নিজেই তা বলব, লোকটা তার ছেলের মনের মধ্যে যে কী পরিমাণ ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল তা আমি নিজেও বুঝি। কিন্তু হয়েছে, অনেক হয়েছে ওই হতভাগ্য বৃদ্ধের প্রসঙ্গ, সে তার যোগ্য প্রতিদান পেয়েছে। তা সে যাই হোক, মনে রাখতে হবে যে লোকটা সন্তানের পিতা, আজকালকার একজন টিপিক্যাল বাবা। যদি বলি আজকালকার অনেক বাবারই মতো একজন তাহলে কি অন্যায় বলা হবে? হায়, কী বলব। আজকালকার বাবাদের মধ্যে এমন অনেক বাবা আছেন যাঁরা এই লোকটার মতো খোলাখুলি এতটা সিনিক ভাব প্রকাশ করেন

না—এই যা, তার কারণ তাঁরা অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক বেশি মার্জিত, কিন্তু তাদের জীবনদর্শন আসলে প্রায় এরই মতো। তা হলামই না হয় আমি নৈরাশ্যবাদী, না হয় তা-ই হলাম। আমরা তো ইতিমধ্যে স্থিরই করে নিয়েছি যে আপনারা আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে দেবেন। আসুন, আগে থাকতে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে নিই: আপনারা আমাকে বিশ্বাস না করতে হয় করবেন না, আমি কিন্তু বলে যাব, বিশ্বাস করতে হবে না আপনাদের। কিন্তু তাহলেও আমায় বলতে দিন, যা-ই হোক না কেন, আমার কথা কিছু কিছু ভুলবেন না।

"এবারে আসছি এই বৃদ্ধের, পরিবারের এই পিতাটির সন্তানদের প্রসঙ্গে। এদের মধ্যে একজন আমাদের সামনে আসামির কাঠগড়ায় উপস্থিত। তাকে নিয়ে আমার যত কথা সামনে পড়ে আছে। অন্য দুজনের কথা আমি শুধু প্রসঙ্গক্রমে বলছি। এই অন্য দুজনের মধ্যে যে বড়ো সে উচ্চশিক্ষিত, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক যুবকদের একজন, যার আবার কোনোটাতেই আর কোনো বিশ্বাস নেই; হুবহু তার জন্মদাতা পিতার মতো সেও ইতিমধ্যে জীবনের অনেক কিছু অগ্রাহ্য করেছে, বড়ো বেশি নষ্ট করেছে। আমরা সবাই ওর বক্তব্য শুনেছি। আমাদের সমাজ ওকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিল। সে তার মতামত কখনও গোপন রাখেনি। এমন কি তার উলটোটাই করেছে, যেটা করেছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত, যার ফলে আমার পক্ষে এখন সাহস করে, কতকটা খোলাখুলি ভাবেই তার কথা বলা সম্ভব হচ্ছে—বলাই বাহুল্য, ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে তার সম্পর্কে নয়, কারামাজভ্ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে। এখানে, শহরের এক প্রান্তে গতকাল আত্মহত্যা করে প্রাণত্যাগ করেছে এক ব্যাধিগ্রস্ত জড়বুদ্ধি, বর্তমান মামলার সঙ্গে সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। লোকটা স্মের্দিকোভ্। এক সময় ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের ভৃত্য ছিল, হয়তো বা তার অবৈধ সন্তান। যুবক কারামাজভ্, ইভান ফিয়োদরভিচের আত্মার অসংযম স্মের্দিকোভের মনে যে কী রকম বিভীষিকার সঞ্চার করেছিল প্রাথমিক তদন্তের সময় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কেঁদে কেটে চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্মের্দিকোভ্ আমাকে তার বিবরণ দিয়েছিল। তার কথায়, 'তেনার মতে, পৃথিবীতে সবেরই অনুমতি আছে, ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ বলে কিছু থাকা উচিত নয়—এই রকমই সব জিনিস তিনি আমায় শেখাতেন।' আমার মনে হয় ইডিয়টটাকে যে তত্ত্বকথার তালিম দেওয়া হয়েছিল তারই পাল্লায় পড়ে সে পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিল, যদিও এটা ঠিক যে তার মৃগীরোগের প্রকোপ এবং তাদের বাড়ির এত ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনাও তার মানসিক বিকারের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই ইডিয়টটার মাথার মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহলজনক, এমনই কৌতূহলজনক একটা চিন্তা ঝলক দিয়ে উঠেছিল যা তার চাইতে বুদ্ধিমান যে কোনো পর্যবেক্ষকের পক্ষে শ্লাঘার হতে পারত। এমনকি এই কারণেই আমি প্রসঙ্গটা এখানে তুললাম। আমাকে সে বলেছিল, 'ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি চরিত্রের দিক থেকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বেশি কাছাকাছি হয়ে থাকে

সে ওই ইভান ফিয়োদরভিচ!' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনার যে সূত্রপাত আমি করেছিলাম এই মন্তব্য দিয়েই তা থেকে ক্ষান্ত হচ্ছি, আমার মনে হয় আর বেশি দূর টানা শিষ্টাচারসম্মত হবে না। না, এর পরেও আর কোনো সিদ্ধান্ত করার বাসনা আমার নেই, একজন যুবকের ভাগ্য নিয়ে কাকের মতো কা-কা করে কেবল তার সর্বনাশ ঘোষণা করতে আমি চাই নে। আজও আমরা এখানে এই আদালতকক্ষেই দেখেছি তার তরুণ অন্তঃকরণে এখনও সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি অধিষ্ঠান করছে, যে অবিশ্বাস ও সিনিক মনোভাব তার চিন্তাকে পীড়া দিচ্ছে তার ভারে তার পারিবারিক বোধ এখনও চাপা পড়ে যায়নি; সে সমস্ত মনোভাব যতটা না তার স্বভাবসিদ্ধ তার চেয়ে বেশি বংশানুক্রমে অর্জিত।

"এর পর আসছি আরেক ছেলের প্রসঙ্গে। সেটি এখনও নবীন যুবক। ধর্মপ্রাণ, নিরীহ প্রকৃতির, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দাদার যে বিষাদগ্রস্ত ও ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তার বিপরীত। 'জনমানসের উৎসভূমি' বলতে যা বোঝায়, আমাদের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের কোনো কোনো তাত্ত্বিক মহলে এই জ্ঞানগর্ভ কথাটির দ্বারা যা বোঝায় কী করে সে রকম একটা কিছু আঁকড়ে ধরা যায় তারই সন্ধানে আছে। এক সময় মঠ আঁকড়ে ধরেছিল, আরেকটু হলে কেশকর্তন করে সন্ন্যাসীও হয়ে যেত। আমার মনে হয় তার মধ্যে অনেকটা যেন তার নিজের অজ্ঞাতসারে বড়ো বেশি সকাল সকাল কুণ্ঠাজড়িত এমন একটা হতাশার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল য'কে আশ্রয় করে আমাদের হতভাগ্য সমাজের অনেকেই তার সিনিসিজ্‌ম ও ব্যভিচার দেখে আঁতকে ওঠে এবং ভুলক্রমে যত দোষ ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যাকে তার 'জন্মের মাটি' বলে তার কাছে ছুটে যায়, অর্থাৎ জন্মভূমি মা'র আলিঙ্গনে নিজেদের সঁপে দেয়। তাদের দশা সেই শিশুদের মতো যারা ভূতের ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে তাদের রুগ্‌ণ অশক্ত মা'র বিশীর্ণ বুকের কাছে নিদেন পক্ষে একটু শান্তিতে যাতে ঘুমিয়ে থাকা যায় তার জন্য, এমনকি পারলে সারা জীবনের মতো ঘুমিয়ে থাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে—যার ভয়ে তারা এমন জড়সড় তাকে চোখে দেখতে না পারলেই হল! আমার তরফ থেকে আমি এই সদাশয় ও গুণী যুবকটির শুভ কামনা করি, আমি কামনা করি তার তরুণ হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তি, জনমানসের উৎসভূমির প্রতি তার প্রবল আবেগ কালে যেন এমন রূপ ধারণ না করে যা নৈতিক দিক থেকে তামসিক মিস্টিসিজ্‌ম আর নাগরিক চেতনার দিক থেকে অন্ধ জাতীয়তাবাদের নামান্তর—যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ওর দাদা অযথা যে ইউরোপীয় ভাবধারা অর্জন করেছে এবং সে সম্পর্কে তার যে ভ্রান্ত ধারণা, যার ফল এখন তাকে ভুগতে হচ্ছে, এমন কি সেরকম অকাল পচনের চাইতেও ওই দুটি প্রবৃত্তি থেকে জাতির সম্ভবত বেশি ক্ষতির আশঙ্কা আছে।"

উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মিস্টিসিজ্‌মের উল্লেখমাত্র আবারও দুটো-তিনটে করতালিধ্বনি পড়ল। কিন্তু ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ বলাই বাহুল্য আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন। অবশ্য

এর কোনটাই বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে তেমন একটা প্রাসঙ্গিক নয়। আর এ থেকে যে স্পষ্ট কিছুই বেরিয়ে এলো না সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জীবনে অন্তত একটি বার প্রাণ খুলে নিজের মত প্রকাশ করার বড়ই সাধ হয়েছিল ক্ষয়রোগগ্রস্ত তিরিক্ষি মেজাজের এই মানুষটির। আমাদের এখানকার লোকে পরে বলাবলি করতে লাগল যে-উপলব্ধির বশবর্তী হয়ে ইভান ফিয়োদরভিচের চরিত্রের সমালোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাকে আদৌ শিষ্টাচারসম্মত বলা যায় না। তার কারণ ইভান ফিয়োদরভিচ একবার কি দুবার সর্বসমক্ষে তর্কে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচকে বসিয়ে দিয়েছিল, আর সেটা মনে রেখেই ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ও এখন তার ওপর এক হাত নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু জানি না, এরকম কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে কিনা। মোটের ওপর এসবই ছিল উপক্রমণিকামাত্র, এর পর তার বক্তৃতা মামলার অনেকটাই সরাসরি ও কাছাকাছি প্রসঙ্গে চলে এলো।

ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ বলে চললেন, "এবারে ফিরে আসছি আধুনিক পরিবারের পিতার আরেক পুত্র, আমাদের তৃতীয় জনের প্রসঙ্গে। সে এখন আসামির কাঠগড়ায়, আমাদের সামনেই আছে। তার কীর্তিকলাপ, তার জীবন ও কর্মকাণ্ডও আমাদের সামনে আছে। যথা সময়ে সব প্রকাশ পেল, সব বেরিয়ে পড়ল। তার অন্য দুই ভাইয়ের মতো 'ইউরোপিয়ানা' ও 'জনমানসের উৎসভূমি' সন্ধানের নীতির অনুসারী নয়—তার বিপরীত  সে যেন নিজেই রাশিয়ার এক মূর্তিমান বিগ্রহ। না, না, তাই বলে সমগ্র রাশিয়ার নয়, পুরো রাশিয়ার নয়। তাই যদি হত তাহলে বলতাম ঈশ্বর, রক্ষা কর! কিন্তু তাহলেও বলব, তার মধ্যে আমরা আমাদের আদরের রাশিয়াটিকে পাচ্ছি, তার গন্ধ পাচ্ছি, অস্তিত্ব টের পাচ্ছি আমাদের মা জননীর। আরে, সে ত আমরাই, প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা, একাধারে ভালো ও মন্দের পরমাশ্চর্য এক সংমিশ্রণ আমরা। আমরা জ্ঞানের পূজারী, আমরা শিলারের ভক্ত, আমরাই আবার শুঁড়িখানায় গিয়ে হল্লাবাজি করি, আমাদেরই বোতলের সঙ্গী মদোমাতালগুলোর দাড়ি ওপড়াই। হুঁ-হুঁ, আমরা ভালো মানুষ, আমরা চমৎকার, কিন্তু একমাত্র তখনই যখন আমরা নিজেরা ভালো থাকি, চমৎকার থাকি। বরং এও বলা যায় যে আমরা অতি মহৎ সমস্ত আদর্শে অভিভূত হয়ে পড়তে পারি — সত্যি সত্যি অভিভূত হয়ে পড়তে পারি — তবে একমাত্র এই শর্তে যদি আপনা আপনি সেগুলি জুটে যায়, আকাশ থেকে না কোথা থেকে আমাদের টেবিলে এসে পড়ল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে মুফতে জুটে গেছে, মুফতে, এর জন্য কোন মূল্য দিতে হচ্ছে না। মূল্য দেওয়াটা আমাদের ভীষণ অপছন্দ, কিন্তু পেতে আমরা খুব ভালোবাসি, আর এটা আমাদের সব ব্যাপারেই আছে। দাও-দাও, জীবনের যত ঐশ্বর্য আছে সব আমাদের দাও! যত ঐশ্বর্যই বটে — এর কমে আমাদের পোষাবে না। আর বিশেষ করে আমাদের চরিত্রের পরিপন্থী কিছু করতে এসো না, তাহলে আমরাও প্রমাণ করব আমরা কত ভালো হতে পারি, কী চমৎকারই না হতে পারি!

আমরা লোভী নই, না, লোভ আমাদের নেই। কিন্তু তা হলেও টাকা চাই, দাও টাকা। দাও আরও দাও, যত বেশি করে পার দাও, তাহলেই দেখতে পাবে আমরা কেমন দিল দরাজ, এই তুচ্ছ ধাতুর প্রতি আমাদের কী পরিমাণ অবজ্ঞা, উচ্ছৃঙ্খল হুল্লোড়বাজি করে কী রকম হেলাফেলা করে এক রাতে আমরা তা উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু টাকা যদি আমাদের না দাও তাহলে যখন আমাদের টাকা পেতে ভারি ইচ্ছে হবে তখন আমরা ঠিক দেখিয়ে দেব কী করে আমরা তা পেতে পারি। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন ঘটনাগুলি পর পর অনুসরণ করা যাক।

“সর্বাগ্রে, আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এক হতভাগ্য পরিত্যক্ত বালককে যাকে ‘বাড়ির পিছনের আঙিনায় খালি পায়ে’ ছুটোছুটি করতে দেখেছেন বলে এই মাত্র উল্লেখ করলেন আমাদের পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র জনৈক প্রতিবেশী নাগরিক। হায়! তিনি একজন বিদেশি বংশোদ্ভুত! আরও একবার বলছি বিচারাধীন ব্যক্তিটির পক্ষ সমর্থনে আমিও কারও চেয়ে কম যাই না! আমি অভিযোক্তা, আমিই আবার তার পক্ষ সমর্থনকারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরাও মানুষ, আমাদেরও মানবিকতা আছে, মানুষের নিজের বাড়ির পরিবেশ এবং তার শৈশবের অভিজ্ঞতা তার চরিত্রের ওপর যে কী প্রভাব ফেলতে পারে আমরাও তা ওজন করে দেখতে জানি। তা সেই বালক এখন তরুণ, একজন যুবক, মিলিটারি অফিসারও হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য, ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করার অপরাধে তাকে আমাদের সমৃদ্ধিশালিনী রাশিয়ার সুদূর এক সীমান্ত শহরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে সে চাকরি করে, উচ্ছৃঙ্খল আমোদফুর্তি করে দিন কাটায়। আর বলাই বাহুল্য, যত বড় জাহাজ তার পাল্লাটাও তো ত দূরের হবে বড় হবে। আমাদের টাকার দরকার, সর্বাগ্রে চাই টাকা। তাই অনেক বাদানুবাদের পর বাপের সঙ্গে শেষ ছয় হাজার রুবলের একটা রফা হল, বাপ তাকে সে টাকা পাঠায়। খেয়াল রাখবেন, সে একটা দলিল লিখে দিয়েছিল এবং এই মর্মে তার লেখা একটা চিঠিও আছে যে দাবি দাওয়া সে বলতে গেলে ছেড়েই দিচ্ছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বাপের সঙ্গে তার যে ঝগড়াবিবাদ ছিল এই ছয় হাজার রুবলে তার নিষ্পত্তি ঘটল।

“এই সময় উন্নত চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত একটি মেয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উঁহু, বিশদে পুনরাবৃত্তি করার স্পর্ধা আমার নেই। আপনারা এই মাত্র সে সব শুনেছেন। সেখানে মানসম্মানের কথা আছে, আত্মত্যাগের কথা আছে। আমি না হয় চুপ করেই রইলাম। কাণ্ডজ্ঞানহীন ও ব্যভিচারী, কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্বের সামনে, সুমহান ভাবনার সামনে অবনতশির যুবকটির যে ছবি আমরা এক ঝলক দেখতে পেয়েছি তা আমাদের গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে। কিন্তু তার পরই অকস্মাৎ এই আদালতকক্ষের মধ্যেই একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে বেরিয়ে পড়ল পদকের উলটো পিঠটা। এবারেও কিন্তু কেন এমন হল এই নিয়ে কোন রকম অনুমানের ভেতরে ঢোকার স্পর্ধা আমার নেই, বিচারবিশ্লেষণ থেকেও আমি ক্ষান্ত থাকছি। কিন্তু সে যা-ই হোক.

কেন এমন হল তার কারণ অবশ্যই ছিল। এই বিশিষ্ট মহিলাটিই আবার দীর্ঘকাল গোপনে রাখা ঘৃণার অশ্রু বিসর্জন করতে করতে আমাদের কাছে ঘোষণা করেছে যে ওই যুবক, প্রথমে ওই যুবকই তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছিল তার ভাবাবেগের জন্য, যে ভাবাবেগ অসতর্ক ও অসংযত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহৎ ও উদার ছিল। সবার আগে নিজের বাগ্‌দত্ত প্রেমিকের মুখেই কিনা খেলে গিয়েছিল এরকম বিদ্রূপের হাসি! আর যার কাছ থেকেই কিনা খেলে গিয়েছিল এরকম বিদ্রূপের হাসি! আর যার কাছ থেকেই হোক, অন্তত তার কাছ থেকে এটা সহ্য করা মেয়েটির পক্ষে অসম্ভব ছিল। যুবক ইতিমধ্যে তার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই করেছে যেন এরপরে মেয়েটি তার কাছ থেকে যে কোনো রকমের আঘাত— এমনকি তার বিশ্বাসঘাতকতাও সহ্য করতে বাধ্য হয়। একথা জানা সত্ত্বেও, জেনেশুনে ইচ্ছে করে সে যুবককে তিন হাজার রুবল দিতে চায়, এর দ্বারা পরিষ্কার, স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে তার বিশ্বাসভঙ্গ করার জন্যই সে তাকে টাকাটা দিতে চাইছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে তার নীরব চোখের ভাষায় তাকে প্রশ্ন করে 'কী হল নেবে কি নেবে না? তুমি কি সত্যি সত্যি এত দূর বেহায়া হতে পারবে?' যুবক তার মুখের দিকে তাকাল, তার মনের ভাব পরিষ্কার বুঝতে পারল। প্রসঙ্গত, সে নিজেই এখানে, আপনাদের সকলের সামনে একথা স্বীকারও করেছে যে সব সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু বুঝেশুনেও বিনা বাক্যব্যয়ে ওই তিন হাজার হস্তগত করল, তার নতুন প্রণয়িনীটির সঙ্গে আমোদ ফূর্তি করে দু দিনে তা উড়িয়ে দিল।

"কোন্‌টা বিশ্বাস করতে বলেন? যে মহৎ ও উদার ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে একজন তার জীবনের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে দিয়েছিল এবং আভূমি নত হয়ে আরেক জনের সদ্‌গুণকে সম্মান জানিয়েছিল সেই কিংবদন্তিটি, না পদকের উল্‌টো পিঠটা, যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক? জীবনে সচরাচর যা হয়ে থাকে তা এই যে দুই বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে সত্য খুঁজতে হয় মধ্যবর্তী কোথাও। বর্তমান ক্ষেত্রে এটা আক্ষরিক অর্থে খাটে না। খুব সম্ভব প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে তার কৃতজ্ঞতা যেমন আন্তরিক ছিল, দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রেও তার নীচতাও তেমনি আন্তরিক ছিল। কেন? ঠিক এই কারণেই যে আমরা যারা কারামাজভ্‌, তাদের স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের ব্যাপকতা আছে—আমি তো সেই কথাতেই আসছি—আমরা, কারামাজভ্‌রা যত রকমের বৈপরীত্য সম্ভব, সব ধারণ করার ক্ষমতা রাখি, একই সঙ্গে এমন জিনিসের ধ্যান করতে পারি যার দুদিকের কোনোটারই কোনো তল নেই, আমাদের মাথার ওপরের আকাশের মতো অতল, গগনচুম্বী আদর্শের অতলে যেমন ডুব দিতে পারি, তেমনি আমাদের পদতলের, আমাদের চরম নীচতা আর পতনের পূতিগন্ধময় অতল গহ্বরেও নামতে পারি। কারামাজভ্‌ পরিবারের সকলকে যিনি খুব কাছ থেকে গভীর ভাবে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছিলেন এমন একজন তরুণ পর্যবেক্ষক মিস্টার

রাকিতিন কিছু আগে যে মোক্ষম কথাটি বলে গেলেন সেটা একবার মনে করে দেখুন। তাঁর কথায়, 'এই লাগামছাড়া অসংযত প্রকৃতির মানুষগুলোর কাছে মহত্ত্বের সুমহান উপলব্ধির মতো অধঃপতনের হীন উপলব্ধিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।' সত্যিই তো তাই। ওদেরই তো দরকার—নিরন্তর, প্রতিনিয়ত দরকার এই অস্বাভাবিক মিশ্রণ। দুটোই অগাধ, ভদ্রমহোদয়রা, দুটোই অগাধ, একই মুহূর্তে দুই—এ ছাড়া আমাদের সুখ নেই, তৃপ্তি নেই, এ না হলে আমাদের অস্তিত্ব অপরিপূর্ণ থেকে যায়। আমরা ব্যাপক, আমাদের জননী রাশিয়ার মতো আমরাও ব্যাপক, আমরা সব কিছু ধারণ করতে পারি, সব নিয়ে মিলেমিশে থাকি!

"ভালো কথা, জুরিমণ্ডলীর সদস্য মহোদয়বৃন্দ, আমরা এখানে কেবল তিন হাজারের প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছি, ভরসা পেলে আরও খানিকটা এগিয়ে যাই। একবার শুধু ভেবে দেখুন, এই লোকটা, এই যার চরিত্র, তখন ওই টাকাগুলো পেয়ে—তাও আবার ওই ভাবে নিগৃহীত হয়ে, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে, মান সম্মান একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে পাওয়ার পর—একবার শুধু ভেবে দেখুন, ওই দিনই কী করে, ঠিক ওই দিনই সে কী করে সেই টাকার অর্ধেকটা আলাদা করে গলায় বাঁধা তাবিজের থলের ভেতরে সেলাই করে রেখে দিতে পারল, পরেই বা কোথা থেকে তার চরিত্রের এমন দৃঢ়তা এলো যে এত প্রলোভন এবং অত্যন্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও পুরো এক মাস গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারল! যখন সে হোটেলে হোটেলে উচ্ছৃঙ্খল মাতলামি করে বেড়াচ্ছে সেই অবস্থায় নয়, তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার নিজের বাবার প্রলোভন থেকে তার প্রণয়িনীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য টাকার জরুরি প্রয়োজন হতে যখন টাকার সন্ধানে, শহরের বাইরে, ভগবান জানেন কেন, কার কার কাছেই না সে ছুটে গেছে, তখনও কিন্তু কেন কে জানে, তাবিজের থলেতে হাত দেওয়ার সাহস তার হল না! আরে বাবা, প্রণয়িনীকে নিয়ে যার সঙ্গে তার অমন রেষারেষি সেই বুড়োর প্রলোভনের মধ্যে আকে যাতে ফেলে রাখতে না হয়, কিছু না হোক, নিদেন পক্ষে সেই জন্যই তো ওই থলেটা তার খোলা উচিত ছিল, উচিত ছিল তার প্রণয়িনীর অতন্দ্র প্রহরী হয়ে বাড়িতে থাকা, সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকা যখন তার প্রণয়িনী শেষকালে তাকে বলবে, 'আমি তোমার', আর সেও অমনি তাকে নিয়ে এখানকার এই অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে! কিন্তু না, তা ত নয়! সে তার তাবিজটা ছুঁলই না! অজুহাতটা কী? প্রাথমিক অজুহাতটা ছিল, যেটা আমরা বললাম, ঠিক এটাই যে যখন তার প্রণয়িনী তাকে বলবে 'আমি তোমার, আমায় তোমার যেখানে খুশি নিয়ে যাও', তখন যাতে তাকে নিয়ে যাবার জন্য কিছু সঙ্গতি তার থাকে। কিন্তু এই প্রথম অজুহাতটা, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের কথাতেই দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয়টার সামনে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সে বলেছিল যতক্ষণ আমি এই টাকাটা বয়ে বেড়াচ্ছি ততক্ষণ আমি 'একটা ইতর হতে পারি, কিন্তু আমি চোর নই', যেহেতু আমি যাকে অপমান করেছি আমার

সেই বাগ্‌দত্তার কাছে আমি যখন খুশি তখন যেতে পারি এবং তাকে প্রতারণা করে যে পরিমাণ টাকা হস্তগত করেছিলাম সেই টাকার এই অর্ধেকটা তার সামনে ফেলে দিয়ে যে কোনো সময়ে তাকে বলতে পারি: ‘দেখ, আমি তোমার টাকার অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়েছি, এর দ্বারা আমি প্রমাণও করেছি যে আমি একটা দুর্বল প্রকৃতির লোক, যদি চাও তো বলতে পার একটা ইতর লোক’—আসামির নিজের মুখের ভাষা ব্যবহার করেই আমি বলছি—‘কিন্তু যদিও আমি ছোটলোক, আমি চোর নই। চোরই যদি হতাম তাহলে এই অবশিষ্ট অর্ধেকটা তোমার কাছে নিয়ে আসতাম না, অন্য অর্ধেকটার মতো এটাও হস্তগত করতাম।’ আহা, ঘটনার কি আশ্চর্য ব্যাখ্যা! উন্মত্ত অথচ দুর্বল চরিত্রের এই লোকটা, যে তিন হাজারের লোভ সংবরণ করতে না পেরে লজ্জার মাথা খেয়ে তা গ্রহণ করতে পারল, সেই লোকই কিনা আবার হঠাৎ ভেতরে ভেতরে এমন একটা অটল নিস্পৃহ ভাব অনুভব করল, তিন হাজার রুবল গলায় ঝুলিয়ে বেড়াতে লাগল, তা ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখার সাহস তার হল না! যে চরিত্রের পর্যালোচনা আমরা করলাম তার সঙ্গে কি এটা অন্তত সামান্য পরিমাণে হলেও মেলে? না, আমি ভরসা করে বলতে পারি এক্ষেত্রে সত্যিকারের দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ কী করত—এমন কি সত্যি সত্যি যদি তার টাকাগুলো তাবিজের থলের ভেতরে সেলাই করে রাখবে বলেই মনস্থ করত।

“প্রথমেই যে প্রলোভনে সে পড়ত তা এই যে যার সঙ্গে মিলে সে ইতিমধ্যে ওই টাকারই প্রথম অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়েছে তার সেই নতুন প্রণয়িনীটিকেই আবার অন্তত কিছু একটা দিয়ে একটু খুশি করার জন্য সে তার তাবিজের থলের সেলাই খুলত, সেখান থেকে কিছুটা টাকা—তা ধরা যাক, অন্তত তখনকার মতো মাত্র একশ রুবলই হল— বের করে নিত; যুক্তিটা এই যে ঠিক অর্ধেকটাই, অর্থাৎ কিনা দেড় হাজারই ফেরত দিতে হবে এমন কী কথা আছে? এক হাজার চারশ রুবলও তো যথেষ্ট—দাঁড়াবে তো সেই একই মানে, ‘আমি ইতর লোক হতে পারি, তবে চোর নই, কেন না যা-ই বল না কেন, অন্তত এক হাজার চারশ তো ফেরত এনে দিয়েছি। চোর হলে তো সবটাই আত্মসাৎ করতে পারতাম, কিছুই ফেরত দিতাম না।’ এর পর আরও কিছুকাল বাদে সে আবার তাবিজের থলের সেলাই খুলত, আবারও বের করে নিত আরও একশ, তারপর আরও এবং আরও একশ ফেরত নিয়ে গেলেও সেই একই দাঁড়াবে ‘ইতর লোক, তবে চোর নই। উনত্রিশ শ উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাহলেও এক শ ফেরত এনে দিয়েছি, চোর হলে তাও ফেরত দিতাম না।’ শেষকালে শেষ দুশ’র এক শ ফুঁকে দেওয়ার পর শেষটার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলত ‘ধুৎ, এই একশ আবার ফেরত দেওয়ার মতো হল না কি! এটাও উড়িয়ে দেওয়া যাক!’ ঠিক এই রকমই আচরণ করত আমাদের আসল দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্‌, আমরা তাকে যে রকম জানি! তাবিজের থলে সম্পর্কে এই গল্পকথা—এটা বাস্তবতার এতই বিরোধী যে তা ধারণায়ই আনা

যায় না। যত যা-ই কল্পনা করা যাক না কেন, এটা কিন্তু করা যায় না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসব।”

সম্পত্তি নিয়ে বাপ-ছেলের বিবাদ এবং তাদের পারিবারিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে মামলার তদন্তে যা যা জানা গিয়েছিল ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিলেন এবং যতদূর যা তথ্য জানা গেছে তাতে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা প্রশ্নে কে কাকে হিসাবে ঠকিয়েছে বা কে কী হিসাব দাখিল করেছিল তা নির্ধারণ করা যে একেবারেই অসম্ভব বারবার তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিন হাজার রুবলের এই যে ব্যাপারটা বদ্ধমূল আইডিয়ার মতো মিতিয়ার মাথার মধ্যে গেঁথে বসেছিল সে প্রসঙ্গে মেডিক্যাল কমিশনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করলেন।

## সাত

## একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

“চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা আমাদের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির মাথার ঠিক নেই, সে বাতিকগ্রস্ত। আমি জোর দিয়ে বলছি যে তার মাথা একদম্ ঠিক আছে, কিন্তু যত গণ্ডগোল তো এখানেই মাথা যদি ঠিক না থাকত তা হলে তার আচরণ হয়তো অনেক বেশি বুদ্ধিমানের মতো হত। আর তাকে যদি বাতিকগ্রস্ত বলেন সে বিষয়ে আমি একমত হলেও হতে পারতাম, কিন্তু কেবল একটি জায়গায় সেই জায়গাটাতে, যেখানে বিশেষজ্ঞরাও দেখাচ্ছেন অভিযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই তিন হাজার রুবল যেন তার বাবার কাছ থেকে তার বকেয়া পাওনা। তা সত্ত্বেও, এই টাকাকে উপলক্ষ করে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বক্ষণের এই যে উন্মত্ততা সেটার ব্যাখ্যাস্বরূপ তার পাগলামির ঝোঁকের উল্লেখ না করে হয়তো এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া সম্ভব যা অনেকটাই কাছাকাছি হতে পারে। আমার তরফ থেকে আমি বলতে পারি, আসামি যে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতার অধিকারী, আর সেই ক্ষমতা যে তার বরাবর ছিলও এবং তাকে যে কেবল খিটখিটে ও রাগি-রাগি দেখাচ্ছিল এর বেশি কিছু নয়, আমাদের যুবক চিকিৎসক মশাইয়ের, এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কথাটা তো এখানেই। আসামির সর্বক্ষণের এই উন্মত্ত ক্রোধের বিষয়টা আসলে তিন হাজারের মধ্যে বা টাকাকড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এক্ষেত্রে তার ক্রোধোদ্রেকের বিশেষ একটা কারণ ছিল। সেটা তার ঈর্ষা।”

এখানে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ গ্রুশেন্কার প্রতি আসামির সর্বনাশা আবেগের সম্পূর্ণ চিত্রটি বিশদে তুলে ধরলেন। তিনি শুরু করলেন একেবারে সেই মুহূর্তটি থেকে যখন আসামি সেই ‘বিশেষ যুবতীটিকে’ ‘প্রহার করার’ উদ্দেশ্যে তার কাছে গিয়েছিল। “আমি তার নিজের মুখের কথাতেই বলছি”, স্পষ্ট করে বললেন ইপ্পলিত

কিরিল্লভিচ্। "কিন্তু তাকে প্রহার না করে সে তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে পড়ল। এখানেই এই প্রেমের সূত্রপাত। সেই একই সময়ে আবার আসামির বুড়ো বাপেরও দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এই বিশেষ পাত্রীটিরই ওপর। এক অদ্ভুত সর্বনাশা যোগাযোগ। কারণ দুটি হৃদয় একই কালে আচমকা জ্বলে উঠল, যদিও তারা দুজনেই কিন্তু এর আগেও এই বিশেষ পাত্রীটিকে জানত, তার সঙ্গে তাদের দেখাসাক্ষাত হয়েছিল। দুটি হৃদয়েরই সে আগুন ছিল এত বেশি উদ্দাম ও অসংযত যে তা কারামাজভ্ বংশেরই আবেগের চরিত্র বহন করে। এখানে আমরা সেই বিশেষ যুবতীটির নিজের স্বীকারোক্তিও পাচ্ছি। সে বলেছিল, 'ওদের দুজনকে নিয়েই আমি হেসেছি।' ঠিকই, ওদের দুজনকে নিয়ে মজা করার একটা প্রবণতা হঠাৎ তাকে পেয়ে বসেছিল। আগে যে তেমন একটা ইচ্ছে তার হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এখন হঠাৎ করে তার মাথার মধ্যে এই ইচ্ছেটা ঢুকল—আর তার পরিণতি হল এই যে ওরা দুজনেই তার কাছে কাবু হয়ে গেল। বুড়ো ঈশ্বরজ্ঞানে অর্থকে পুজো করে, তৎক্ষণাৎ তিন হাজার রুবল প্রস্তুত করে রেখে দিল—সেই বিশেষজন মাত্র যদি একটিবারও তার বাসগৃহে এসে দর্শন দেয় তাহলে সে টাকাটা তাকে দেবে। কিন্তু এর পরই দেখতে দেখতে অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে সে তার বৈধ স্ত্রী হতে রাজি হলে আর কোনো কথা নেই—তার যাবতীয় সম্পত্তি, তার নাম, সমস্ত কিছু সে তার পদতলে বিসর্জন দেবে এবং সেটাকে সে পরম সৌভাগ্য বলে গণ্য করবে। এই ব্যাপারে বেশ ভালো সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আসামির কথা যদি বলতে হয় তো তার ট্র্যাজিডি প্রত্যক্ষ, আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বিশিষ্ট যুবতীটির খেলাটাই ছিল এরকম। মায়াবিনীটি হতভাগ্য যুবকটিকে কোনো রকম আশা ভরসা পর্যন্ত দিল না, যাও বা দিল, সে কেবল একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন যুবক তার উৎপীড়নকারিণীর সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ততক্ষণে অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার নিজের বাবার রক্তে তার সে হাত রক্তাক্ত। ঠিক এই অবস্থাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'আমাকে, আমাকেও ওর সঙ্গে ঘানি টানতে পাঠিয়ে দিন। আমিই ওর এই অবস্থা করে ছেড়েছি। সবার চাইতে বেশি দোষ আমারই!' ওর গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তটিতে, ততক্ষণে তার মধ্যে আন্তরিক অনুশোচনার ভাব দেখা দিতে এই স্ত্রীলোকটি নিজেই চিৎকার করে বলে উঠেছিল।

"যে প্রতিভাবান যুবকটি বর্তমান মামলার একটি চিত্র তুলে ধরার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন—আমি বলছি মিস্টার রাকিতিনের কথা, যাঁর উল্লেখ আমি ইতিপূর্বেও করেছি—তিনি কিন্তু বেশ সংক্ষিপ্ত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষায় আমাদের এই নায়িকার চরিত্র নির্ধারণ করতে পেরেছেন 'অল্প বয়সে মোহভঙ্গ, অল্পবয়সে প্রতারণার শিকার ও অধঃপতন, একজন ফুসলানিদাতা বাগ্‌দত্ত প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতায় পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনা, অতঃপর দরিদ্রদশা, বংশের সুনাম নষ্ট করার অপরাধে

পরিবারের অভিসম্পাত কুড়ানো, শেষকালে একজন বিত্তবান বৃদ্ধের অনুগ্রহ লাভ, যাকে, প্রসঙ্গত সে নিজে এখন তার একজন শুভানুধ্যায়ী বলে গণ্য করে। অল্পবয়সের মনটার মধ্যে হয়তো ভালো অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু সে মন একেবারেই অকালে বিষিয়ে গেল। হিসাব করে চলা ও পুঁজি সঞ্চয় করা তার স্বভাবে পরিণত হল। সমাজের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখা দিল তার মধ্যে।' এই চরিত্র চিত্রণের পর বোঝাই যাচ্ছে যে এক ধরনের নিষ্ঠুর মজার খেলায় মেতে ওঠা, স্রেফ খেলার ছলে ওদের দুজনকে নিয়েই হাসাহাসি করা তার পক্ষে সম্ভব।

"তারপর এই এক মাস ধরে হতাশ প্রেম, নৈতিক অধঃপতন, বাগ্‌দত্তার সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতা, তার সততার ওপর ভরসা করে যে টাকা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল অন্যের সেই টাকা আত্মসাৎ করা—এ ছাড়াও নিরন্তর এক ধরনের রেষারেষি—তাও আবার তার নিজের বাবার সঙ্গে—এর ফলে আসামি অমনিতেই প্রায় উন্মত্ততার পর্যায়ে, খ্যাপামির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল! বড়ো কথা যে তিন হাজার রুবল ছেলে বংশানুক্রমে, তার মা'র দিক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য বলে মনে করে, যা নিয়ে ছেলে তার বাপকে নিন্দা করছে বিকৃতমস্তিষ্ক বুড়োটা সেই টাকা দিয়ে কিনা তারই কামনার বস্তুটিকে লোভ দেখিয়ে বশে আনার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, আমি এই বিষয়ে একমত যে এটা সহ্য করা কঠিন। এক্ষেত্রে কেউ যদি বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে তা হলে কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা টাকাকড়ি নিয়ে নয়, ঘটনা এই যে ওই টাকাই তার সুখস্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য অমন জঘন্য ভাবে নির্লজ্জের মতো কাজে লাগানো হচ্ছিল!"

আসামির মাথার মধ্যে কী করে ধীরে ধীরে পিতৃহত্যার চিন্তাটার জন্ম নিল ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ এর পর সে প্রসঙ্গে চলে এলেন এবং তার সমর্থনে তথ্য দিলেন।

"প্রথমে কেবল হোটেলে সরাইখানায় এই নিয়ে গলাবাজি করলাম—সারাটা মাস ধরে চেঁচিয়ে বেড়ালাম। আহা, আমরা লোক সমাজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসি! নিজেদের সব কিছু—এমনকি অতি বিপজ্জনক সমস্ত চিন্তা, মারাত্মক সব দুরভিসন্ধি সঙ্গে সঙ্গে এই লোকগুলোকে জানাতে আমাদের ভালো লাগে। লোকজনের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে আমাদের ভালো লাগে। জানি নে কী কারণে সঙ্গে সঙ্গে এমন দাবিও করে বসি যে এই লোকগুলো যেন প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, আমাদের যাবতীয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ভিতরে প্রবেশ করে, আমাদের কথায় সায় দেয়, আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে না যায়। তা নইলে কিন্তু আমরা দারুণ খেপে গিয়ে সরাইখানার সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে ফেলব।

এরপর ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়োভ্‌সংক্রান্ত মুখরোচক প্রসঙ্গটি এসে যেতে সেটা শেষ করে তিনি বললেন, "যাঁরা এই এক মাস ধরে আসামিকে দেখেছেন, তাঁর মুখের কথা শুনেছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ব্যাপারটা

কেবল বাপকে শাসানো আর চোটপাট করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। এহেন উন্মত্ত অবস্থায় হুমকি সম্ভবত কাজেও পরিণত হতে পারে।”

এখানে প্রসিকিউটর মঠে পারিবারিক সমাবেশের অনুষ্ঠান, আলিয়োশার সঙ্গে কথাবার্তা এবং সেই বীভৎস দৃশ্যটির বিবরণ দিলেন যখন ডিনারের পর জোর করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে আসামি তার বাপের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল।

প্রসিকিউটর বলে চললেন, “আমি খুব একটা জোর দিয়ে বলতে পারছি না ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত বাপকে খুন করে তার সঙ্গে ফয়সালা করার পূর্বপরিকল্পিত কোনো চিন্তা আসামির ছিল। তা সত্ত্বেও এই আইডিয়াটা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার তার সামনে উপস্থিত হয়েছিল এবং এটা নিয়ে সে একান্তে ভাবনাচিন্তাও করেছে—আমাদের কাছে এর তথ্যপ্রমাণ আছে, সাক্ষী আছে এবং এ বিষয়ে তার নিজের স্বীকারোক্তিও আছে। জুরিমণ্ডলীর সদস্য মহোদয়বৃন্দ, আমি স্বীকার করছি”, ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ, আরও বলল, “সম্পূর্ণ সচেতন ও পূর্ব নিধারিত কোনো পরিকল্পনা যে আসামিকে অপরাধে প্রবৃত্ত করেছিল এমন দায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে কিনা সে ব্যাপারে এমনকি আজ পর্যন্তও আমার মনে দ্বিধা ছিল। আমার অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইতিমধ্যে সে মনে মনে অনেক বার এই সর্বনাশা মুহূর্তটি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই—কেবল একটা সম্ভাবনা রূপেই মনে মনে কল্পনা করেছিল, কিন্তু তখনও তা কাজে পরিণত করার স্থান কাল বা পরিবেশ কোনোটাই সে নির্ধারণ করতে পারেনি।”

“কিন্তু আমার মনে দ্বিধা ছিল কেবল এই আজ পর্যন্ত, যে সর্বনাশা প্রমাণপত্রটা মাদাম ভের্খভ্‌ৎসেভা আদালতে পেশ করলেন তার আগে পর্যন্ত। ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা স্বকর্ণে শুনেছেন তাঁর আর্তচিৎকার  ‘এটা একটা পরিকল্পনা, খুনের কর্মপরিকল্পনা!’—ঠিক এই চরিত্রই তিনি নির্ধারণ করেছিলেন হতভাগ্য আসামির লেখা ওই মারাত্মক ‘মাতাল’ চিঠিটার। বাস্তবিকই তাই, ওই চিঠিটার ভেতর থেকেই কর্মসূচি ও পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার সমস্ত তাৎপর্য বেরিয়ে আসছে। ওটা লেখা হয়েছিল অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দু দিন আগে। তাই এখন আমরা বেশ ভালো করে জানি যে আসামি তার ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করার দু দিন আগেই শপথ করে ঘোষণা করেছিল যে কালকের মধ্যে যদি টাকা জোগাড় করতে পারা না যায় তা হলে বাবার বালিশের তলায় ‘লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা বড় খামটাতে’ যে টাকা আছে বাবাকে খুন করে সেখান থেকে ওগুলো সে নেবে, ‘এখন শুধু ইভানটা চলে গেলেই হয়’। শুনলেন তো  ‘এখন শুধু ইভানটা চলে গেলেই হয়’—এখানেই তো দেখা যাচ্ছে সব ইতিমধ্যে ভেবেচিন্তে ঠিক করা আছে, পরিস্থিতি কখন কী দাঁড়াতে পারে ওজন করে দেখা হয়েছে। তারপর কী হল? কী আর হবে? — যেমন যেমন লিখেছিল পরে ঠিক সেই ভাবেই কাজে পরিণত হল!

ঘটনা যে পূর্বপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অপরাধটা অবশ্যই সংঘটিত হয়েছিল লুট করার উদ্দেশ্যে, সেটা সরাসরি ঘোষণা করা হয়েছে, লিখিত আকারে আছে, লিখে সই করাও আছে। আসামি অস্বীকার করছে না যে ওটা তার স্বাক্ষর।

"লোকে বলবে এটা মাতালের লেখা। কিন্তু তাতে এর মূল্য এতটুকু তো কমেই না বরং আরও বৃদ্ধিই পায় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যার পরিকল্পনা করেছিল সেটাই মাতাল অবস্থায় লিখেছিল। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যদি কোনো পরিকল্পনা করা না হত তাহলে মাতাল অবস্থায় লিখতে যেত না। লোকে সম্ভবত এমন প্রশ্নও করবে হোটেল আর সরাইখানাগুলোতে সে যে তার অভিসন্ধির কথা চেঁচিয়ে বলে বেড়িয়েছে তারই বা উদ্দেশ্য কী? যে লোক পূর্বপরিকল্পিত ভাবে এমন কাজের সঙ্কল্প গ্রহণ করে সে তো চুপচাপ থাকবে, ব্যাপারটা গোপন রাখবে। ঠিক কথা, কিন্তু যখন চেঁচিয়ে বলেছিল তখন পর্যন্ত তার পূর্বপরিকল্পনা বা সে রকম কোনো অভিসন্ধি ছিল না। যা ছিল সেটা নেহাৎই একটা ইচ্ছা, যা দানা বেঁধে উঠছিল সেটা তার আবেগমাত্র। পরে কিন্তু এ বিষয়ে অনেকটা কমই চেঁচামেচি করেছে। সে দিন সন্ধ্যাবেলা যখন এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল, 'মহানগর' হোটেলে আকণ্ঠ মদ্যপান করলেও সে কিন্তু স্বভাবের বিপরীত আচরণ করেছিল বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না, বিলিয়ার্ড খেলতে যায়নি, একটা কোনায় বসে ছিল, কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল না। কেবল একবার এক স্থানীয় দোকান কর্মচারীকে তার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা সে করেছিল প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারে, যেহেতু ঝগড়া বাধানো তার বরাবরের অভ্যাস, একবার হোটেলে ঢুকলে ও কাজ সে করবেই। অবশ্য এটা ঠিক যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটা আশঙ্কার চিন্তাও তো আসামির মাথায় আসা উচিত ছিল যে শহরে আগেভাগে বড় বেশি চেঁচামেচি করে ফেলেছে এবং যখন সে তার সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজে পরিণত করবে তখন এটাই তাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করার, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার যথেষ্ট কারণ হতে পারে। কিন্তু তখন আর কী করার থাকতে পারে? যা প্রচার তা ত হয়েই গেছে, তা আর ফেরানোর উপায় নেই। তবে শেষ ভরসা এই যে এর আগেও এদিক ওদিক করে সে পার পেয়ে গেছে, এবারেও ঠিক পার পেয়ে যাবে। ভদ্রমহোদয়রা, আমরা ভরসা করেছিলাম যে আমাদের ভাগ্য তারকার ওপর! পরন্তু আমাকে এটাও স্বীকার করতে হচ্ছে যে সেই সর্বনাশা মুহূর্তটি এড়ানোর জন্য সে কম চেষ্টা করেনি। পরিণামে যাতে রক্তপাত না ঘটে সেদিকে সে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। সে তার স্বকীয় বৈশিষ্টপূর্ণ ভাষায় লিখেছিল 'কাল সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিন হাজারের আর্জি করব, লোকে যদি না দেয় তা হলে রক্তপাত ঘটবে।' আবারও দেখুন, মাতাল অবস্থায় লেখা, কিন্তু আবারও দেখুন, যেমন লেখা হয়েছিল, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তেমনি কাজে পরিণত হয়েছিল!"

অপরাধের পথে না গিয়ে অন্যভাবে টাকা জোগাড় করার কত রকম চেষ্টা যে মিতিয়া করেছিল ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ এখানে তার বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করলেন। সাম্সোনভের বাড়িতে হানা দেওয়া, 'খোচর'-এর কাছে যাত্রা—সে সবের বর্ণনা দিলেন—যাবতীয় প্রমাণ সমেতই দিলেন। "সে তখন বিধ্বস্ত, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ, ক্ষুধার্ত। এই যাত্রার পেছনে সে তার ঘড়িটাও বিক্রি করে দিয়েছিল। অথচ দেখুন, তার কাছে তখন কিন্তু দেড় হাজার রুবল ছিল—তাই কি? তাই ছিল কি! ভালোবাসার পাত্রীটিকে শহরে ফেলে এসেছিল বলে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছিল, তার সন্দেহ হচ্ছিল তার অনুপস্থিতিতে সে ফিয়োদর পাভ্লভিচের কাছে চলে যেতে পারে, তাই শেষকালে শহরে ফিরে এলো। যাক, ভালো বলতে হবে যে ফিয়োদর পাভ্লভিচের কাছে যায়নি! এদিকে সে নিজে সঙ্গে করে তাকে তার রক্ষাকর্তা সাম্সোনভের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছে। অদ্ভুত কথা এই যে সাম্সোনভের কাছে গেলে আমাদের ঈর্ষা হয় না। এটা কিন্তু এক্ষেত্রে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে রীতিমতো চরিত্র বৈশিষ্ট্য সূচক! এরপর তাড়াতাড়ি চলে যায় 'পিছনের উঠোনে', পর্যবেক্ষণের ঘাঁটিতে। আর সেখানে—সেখানে গিয়েই জানতে পারে স্মের্দিকোভ্ মৃগীরোগে মূর্ছা গেছে, বাকি আরেক জন ভৃত্য অসুস্থ। আর পায় কে!—রাস্তা পরিষ্কার, 'সঙ্কেতগুলি' তো তার হাতের মুঠোয়—প্রলোভন আর কাকে বলে! তা সত্ত্বেও কিন্তু সে নিজেকে দমন করল। এবারে সে গেল মাদাম খখ্লাকোভার কাছে। ভদ্রমহিলা আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, এখানে সাময়িক ভাবে বসবাস করছেন। দ্‌মিত্রির ভাগ্যের জন্য অনেক দিন হলই তাকে সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখেন। এই ভদ্রমহিলা তাকে এক অতি বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়েছিলেন  এই সব উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-ফূর্তি, এই অশোভন প্রণয়লীলা, হোটেলে-শুঁড়িখানায় এরকম অলসভাবে ঘুরে ঘুরে যা-তা করে বেড়ানো, যৌবনের শক্তির অপচয়—সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে তার উচিত হবে সাইবেরিয়ায় সোনার খনি এলাকায় চলে যাওয়া। 'আপনার যে উদ্দাম শক্তি, এডভেঞ্চারের জন্য ব্যাকুল আপনার যে রোমাণ্টিক চরিত্র ওখানেই তার পরিণতি।'

ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ এই কথোপকথনের পরিণাম এবং সেই মুহূর্তটিও বর্ণনা দিল যখন আসামি আকস্মিক ভাবে জানতে পারল যে গ্রুশেঙ্কা আদৌ সাম্সোনভের কাছে যায়নি; এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রুশেঙ্কা কি না তাকে প্রতারণা করল এবং এখন তাহলে ফিয়োদর পাভ্লভিচের কাছে আছে ঠিক একথা মনে হতেই স্নায়বিক উত্তেজনায় বিধ্বস্ত, ঈর্ষাকাতর হতভাগ্য লোকটি মুহূর্তের মধ্যে কী রকম ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে ঘটনার তাৎপর্য কতদূর মারাত্মক হতে পারে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে বললেন  'চাকরানিটি যদি একবারও মুখ ফুটে বলতে পারত যে তার প্রেয়সীটি এখন মোক্রয়েতে তার 'প্রাক্তন ও অবিসংবাদিত' প্রেমাস্পদের সঙ্গে আছে তাহলে

হয়তো কিছুই ঘটত না। কিন্তু মেয়েটি ভয়ে আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, দিব্যি গেলে, ভগবানের নামে শপথ করে তার অজ্ঞতার কথা জানাল। আসাবি যে তাকে তৎক্ষণাৎ ওখানেই খুন করে বসেনি তার কারণ এই যে তাকে পড়িমরি করে বিশ্বাসঘাতিনীর সন্ধানে ছুটতে হয়েছিল।

“কিন্তু লক্ষ করে দেখুন, যতই দিশেহারা হয়ে পড়ুক না কেন যাবার সময় হামনদিস্তার নোড়াটা কিন্তু ঠিক তুলে নিল। এত জিনিস থাকতে নোড়াটা কেন? অন্য কোনো অস্ত্র নয় কেন? কিন্তু আমরা যদি পুরো এক মাস ধরে এই ছবিটাকে ধ্যান করে থাকি এবং ওরই জন্য প্রস্তুত হতে থাকি তাহলে অস্ত্রের মতো যা হোক একটা কিছু হাতের সামনে এক ঝলক দেখা দিলেই হল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে অস্ত্র হিসেবে তুলে নেব। আর এই ধরনের যে কোনো একটা বস্তু যে অস্ত্রের কাজ করতে পারে সে তো আমরা পুরো এক মাস ধরে ভেবেই দেখেছি। সেই কারণেই না ওরকম নিমেষের মধ্যে, সন্দেহাতীত ভাবে জিনিসটা অস্ত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। তাই সর্বনাশা নোড়াটা যে সে তুলে নিয়েছিল তা কোনো মতেই অজ্ঞাতসারে নয়, মোটেই তার নিজের অজান্তে নয়। শেষ কালে বাবার বাড়ির বাগানে—ফাঁকা ময়দান, সাক্ষীর বালাই নেই, নিশুতি রাত, ঘন অন্ধকার, মনের মধ্যে ঈর্ষার জ্বালা। তার প্রেয়সীটি যে এখানে, তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বাবার কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে এবং এই মুহূর্তে হয়তো তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে—এই সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিতেই তার নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। অবশ্য কেবল সন্দেহই বা বলব কেন? এখন আর সন্দেহের কী আছে? প্রতারণা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ: সে এখানে, এই ঘরেই আছে। ওই তো ওখান থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে তার কাছে, পর্দার আড়ালে আছে। হতভাগ্য লোকটি গুড়ি মেরে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। এখন সে আমাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করতে চায় যে সে সম্মানহানি না ঘটিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত শিষ্টাচার সম্মতভাবে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল এবং পাছে বিপজ্জনক ও নীতিবিগর্হিত কিছু একটা ঘটে যায় সেই আশঙ্কায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফাঁড়া কাটানোর উদ্দেশ্যে বুদ্ধিমানের মতো সে স্থান ত্যাগ করেছিল! কিন্তু আমরা যারা আসামির চরিত্র জানি, বুঝতে পারি তখন তার মনের অবস্থাটা কী রকম ছিল, তথ্যপ্রমাণের দ্বারা যা আমাদের কাছে সুবিদিতও বটে, আর বড়ো কথা, যে-সঙ্কেতের সাহায্য নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ির দরজা খোলা পেতে পারে এবং বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারে তা যখন তার দখলে আছে—এত কিছুর পরেও কিনা আমাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে!” এখানে, ‘সঙ্কেতের’ প্রসঙ্গে এসে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ সাময়িক ভাবে তার অভিযোগের বিবরণ মুলতবি রেখে স্মের্দিকোভ্ সম্পর্কে সবিস্তারে বলা আবশ্যক বোধ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খুনের ব্যাপারে স্মের্দিকোভের ওপর সন্দেহের এই প্রক্ষিপ্ত ঘটনাটির উপসংহার টানা এবং চিরকালের

জন্য সেই চিন্তার অবসান ঘটানো। কাজটা সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করল। সবাই বুঝতে পারল এই অনুমানকে সে যত অবজ্ঞার চোখে দেখার ভাব করুক না কেন, তা সত্ত্বেও বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

## আট

## স্মের্দিকোভ্ সংক্রান্ত একটি ভাষ্য

"প্রথমত, কোথা থেকে এ ধরনের সন্দেহের সম্ভাবনা দেখা দিল?" এই প্রশ্ন দিয়ে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ শুরু করলেন। "স্মের্দিকোভ্ খুন করেছে বলে প্রথম যে ব্যক্তিটি চেঁচিয়ে উঠেছিল সে এই আসামি নিজে, তার গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তটিতে। অথচ তার সেই প্রথম চেঁচিয়ে বলার সময় থেকে শুরু করে আদালত চলাকালীন এই মুহূর্তটা পর্যন্ত তার এই অভিযোগের সমর্থনে সে একটা তথ্যও উপস্থিত করতে পারেনি। শুধু তথ্য কেন, এমনকি মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করার উপযোগী কোনো তথ্যের সামান্যতম ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এর পর এই অভিযোগ সমর্থন করছেন মাত্র তিন জন ব্যক্তি আসামির ভাইদের দুজনেই এবং মাদাম স্‌ভেতলভা। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে যে বড়ো সে তার সন্দেহ প্রকাশ করল মাত্র এই আজকে, যখন সে অসুস্থ, মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে ভুগছে এবং নিঃসন্দেহে প্রলাপের ঘোরে আছে। অথচ আগে, গত দু মাস ধরে, আমরা এটা ভালো করেই জানি, তার ভাই যে অপরাধী আমাদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ একমত ছিল। এমনকি আমাদের এই চিন্তার বিরোধিতা করার কোনও চেষ্টাও সে করেনি। তবে বিশেষ করে সে প্রসঙ্গে আমরা আরও পরে আসছি। অতঃপর আসামির ছোটো ভাই নিজেই সম্প্রতি আমাদের জানিয়েছে, স্মের্দিকোভ্‌কে যে সে দোষী বলে মনে করে তার এই চিন্তার সমর্থনে কোনো তথ্য—সামান্যতম কোন তথ্যপ্রমাণও তার কাছে নেই। সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সেটা একমাত্র আসামির মুখের কথা থেকে এবং তার 'মুখের ভাব' দেখে—হ্যাঁ, এই ওজনদার সাক্ষ্যটি আজ তার ভাইয়ের মুখ থেকে দু দুবার উচ্চারিত হয়েছে। মাদাম স্‌ভেতলোভা আবার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এমন মতও প্রকাশ করলেন যা সম্ভবত আরও বেশি ওজনদার!—'আসামি আপনাদের যা বলবে তা-ই বিশ্বাস করুন। মিথ্যে কথা বলার লোক সে নয়।' আসামির ভাগ্য সম্পর্কে যারা বড়ো বেশি আগ্রহী সেই তিন ব্যক্তির কাছ থেকে স্মের্দিকোভের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে যা পাওয়া গেছে এই তো তার নমুনা! অথচ তা সত্ত্বেও স্মের্দিকোভের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিব্যি চালু হয়ে গিয়েছিল, চলছিল, এখনও চলছে—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ধারণা করা যায়?"

এখানে 'মস্তিষ্কের বিকারজনিত অসুস্থতা ও উন্মত্ততার বশে আত্মঘাতী' পরলোকগত স্মের্দিকোভের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা সমীচীন বোধ

করলেন ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্। তাঁর উপস্থাপনায়, লোকটা ছিল জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, খানিকটা ভাসা-ভাসা এক ধরনের শিক্ষার একটা আদি রূপ তার মধ্যে ছিল, তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল এমনই সমস্ত দার্শনিক আইডিয়া যেগুলি ধারণ করার উপযুক্ত ক্ষমতা তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ছিল না। যেমন ব্যবহারিক জীবনে তার ভয় ছিল মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের আধুনিক এমন সমস্ত শিক্ষা যার বাস্তব প্রয়োগ তার পরলোকগত কর্তা—সম্ভবত তার বাবাই হবে—ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ তার নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে ব্যাপক ভাবে শিখিয়েছিল; তেমনি আবার তত্ত্বগত ভাবে ছিল কর্তার বড়ো ছেলে ইভান ফিয়োদরভিচের সঙ্গে নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব দার্শনিক কথাবার্তা। ইভান ফিয়োদরভিচ্ যে সোৎসাহে এই কৌতুকের প্রশ্রয় দিত তা সম্ভবত তার নিজের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য অথবা হাস্যপরিহাসের যে তাগিদ সে অনুভব করত তা প্রয়োগের উপযুক্ত আর কোন জায়গা না পেয়ে। "কর্তার বাড়িতে শেষ কয়েকদিন অবস্থানের সময় তার মানসিক অবস্থা যে কী রকম ছিল স্মের্দিকোভ্ নিজে আমাকে তার বিবরণ দিয়েছে", ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ ব্যাখ্যা করে বললেন। "অবশ্য ভৃত্য গ্রিগোরিও, অর্থাৎ যাদের যাদের ওকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানার কথা, তারা সকলেই। এছাড়া, মৃগীরোগের কারণে মন মরা স্মের্দিকোভ্ ছিল 'একটা মুরগির মতো ভীরু'। 'মুরগির মতো ভীতু এই মৃগীরোগীটা', আসামি, তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক ভাষায় আমাদের জানিয়েছিল, 'সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল, আমার পায়ে চুমু খেয়েছিল।' কথাটা আসামি নিজের মুখে আমাদের জানিয়েছিল। কিন্তু এই সংবাদটা জানালে যে তার কতকটা ক্ষতি হতে পারে সেই বোধ তার তখনও, সেই মুহূর্তে হয়নি। সেই ওকেই কিন্তু আবার আসামি বেছে বেছে তার আস্থাভাজন বলে গ্রহণ করল—যা তার নিজের সাক্ষ্য থেকেও জানা যাচ্ছে—এবং তাকে এমন ভয় দেখাল যে শেষকালে সে তার হয়ে গুপ্তচর ও বার্তাবহের কাজ করতে রাজি হল। বাড়ির ভেতরে গুপ্তচর হয়ে বসে সে তার মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, আসামিকে সে টাকার খামের অস্তিত্বের কথা জানাল এবং যে সঙ্কেতের সাহায্যে কর্তার কাছে পৌঁছুনো যায় তাও জানিয়ে দিল। না জানিয়ে অবশ্য কোনো উপায়ও ছিল না। 'মেরেই ফেলতেন এজ্ঞে, দেখতেই পাচ্ছিলাম আমাকে মেরে ফেলবেন', তদন্তের সময় একথা বলতে বলতে সে কেঁপে উঠেছিল, ভয়ে সিঁটিয়ে উঠেছিল, যদিও তার নির্যাতনকারী যে ব্যক্তিটি তাকে ভয় দেখিয়ে আসছিল সে নিজেই ততক্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে গেছে, এখন আর ওকে সাজা দিতে আসার কোনো ক্ষমতা তার নেই। 'প্রতি মুহূর্তে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, এজ্ঞে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি নিজে থেকে তড়বড় করে সমস্ত গোপন রহস্য ওঁর কাছে ফাঁস করে দিই, যাতে ওঁর চোখে নিজেকে নির্দোষ বলে দেখাতে পারি, এই পাপী তাপী লোকটাকে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য উনি জ্যান্ত ছেড়ে দেন।' এই যে তার নিজের মুখের কথা—আমি

লিখে রেখে দিয়েছি, আমার মনে আছে 'যেই আমার ওপর চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন অমনি আমি হাঁটু গেড়ে তার সামনে পড়ে যাই।'

খুবই সৎ চরিত্রের যুবক এই স্মের্দিকোভ্। মনিবের হারানো টাকা কুড়িয়ে পেয়ে তাকে তা ফেরত দেওয়ার পর বিশেষ ভাবে তার এই সততার পরিচয় প্রকাশ পেতে সে তার মনিবের আস্থাভাজনও হয়েছিল। নিজের শুভানুধ্যায়ী জ্ঞানে যে মনিবের প্রতি তার এত অনুরাগ তার বিশ্বাসভঙ্গ করে বেচারি স্মের্দিকোভ্ যে কী দারুণ অনুশোচনায় ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছিল তা সহজেই অনুমেয়। পরম বিচক্ষণ মনোরোগবিদদের সাক্ষ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যারা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় মৃগী রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে তাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং বলাই বাহুল্য অসুস্থ ধরনের একটা আত্মধিক্কারের প্রবণতা সব সময় কাজ করে। কোনো কারণে এবং কারও কাছে তারা 'অপরাধী' এই ভেবে তারা মর্মযন্ত্রণা ভোগ করে, বিবেকের দংশনে কষ্ট পায়। অনেক সময় তাদের সেই সব ভাবনার কোনো ভিত্তি পর্যন্ত থাকে না। নিজেদের নানা রকম দোষ ও অপরাধ তারা বাড়িয়ে দেখে, এমনকি সেগুলি তারা নিজেরাই ভেবে বের করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই রকমই একজন মানুষকে যে ভীতিপ্রদর্শনের ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সত্যি সত্যি দোষী ও অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও সে আগে থাকতে খুব ভালো করে অনুভব করতে পারছিল যে তার চোখের সামনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে চলেছে তার পরিণাম ভালো কিছু হতে পারে না। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মেজো ছেলে ইভান ফিয়োদরভিচ যখন দুর্ঘটনার ঠিক প্রাক্কালে মস্কোয় চলে যাচ্ছিল তখন স্মের্দিকোভ্ তাকে থেকে যাবার জন্য অনেক করে বলেছিল, কিন্তু নিজের ভীরু স্বভাবের দরুন সাহস করে তাকে তার নিজের মনের সমস্ত আশঙ্কা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। সে কেবল আভাস ইঙ্গিত দিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তার সেই আভাস ইঙ্গিত ইভান ফিয়োদরভিচ ধরতে পারেনি। উল্লেখ করা যেতে পারে ইভান ফিয়োদরভিচকে সে তার রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখেছিল, তার ভরসা ছিল ইভান ফিয়োদরভিচ্ যতক্ষণ বাড়িতে আছে ততক্ষণ কোনো বিপদ আপদ ঘটবে না। আপনাদের মনে আছে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচের লেখা সেই 'মাতাল' চিঠিটা, যেখানে সে লিখেছিল 'বুড়োকে খুন করব, এখন শুধু ইভান চলে গেলেই হয়।' তার মানে ইভান ফিয়োদরভিচের উপস্থিতি বাড়ির সকলের কাছে শান্তি শৃঙ্খলার গ্যারান্টি-স্বরূপ ছিল।

"সে চলে গেল, এদিকে স্মের্দিকোভ্‌ও তৎক্ষণাৎ, ছোটকর্তা চলে যাবার প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে মৃগী রোগের আক্রমণে মূর্ছা গেল। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বোধগম্য। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এক ধরনের হতাশায় জর্জরিত ও আতঙ্কগ্রস্ত স্মের্দিকোভ্ বিশেষ করে শেষ কয়েক দিন ধরে মূর্ছার প্রকোপ ঘনিয়ে আসার একটা নিকট সম্ভাবনা ভেতরে ভেতরে উপলব্ধি করতে পারছিল। এর আগেও মনের

ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় চাপ পড়লে বা কোনো মানসিক আঘাত পেলে সেই মুহূর্তে তার এমনটা ঘটতে দেখা গেছে। এই সব প্রকোপের দিনক্ষণ অবশ্যই আগে থাকতে অনুমান করা যায় না, কিন্তু সেটা যে ঘটতে চলেছে যে কোনো মৃগী রোগী তা ভেতরে ভেতরে আগেই টের পেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই কথাই বলে। তাই ঘটল এই যে ইভান ফিয়োদরভিচ্‌ও বাড়ির আঙিনা পরিত্যাগ করল, অমনি স্মের্দিকোভেরও মনের মধ্যে এমন একটা ভাবের উদয় হল যেন বলতে গেলে সে অনাথ হয়ে পড়েছে, তার নিরাপত্তা বলতে আর কিছু রইল না। এই যখন তার মনের অবস্থা তখন সে গৃহস্থালির কাজে তলকুঠুরির ভাণ্ডারে ঢুকতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ভাবতে লাগল 'মূর্ছার আক্রমণে পড়ব না কি? যদি এখনই পড়ে যাই তাহলে কী হবে?' মনের ঠিক এই অবস্থা থেকেই, এই অলীক ভাবনা এবং এই সমস্ত প্রশ্ন থেকেই তার কণ্ঠনালির ভেতরটা খিঁচ ধরে ঘড়ঘড় করে উঠল, যেটা সর্বদাই মৃগীরোগের আক্রমণের পূর্ব-লক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারিয়ে তিরবেগে তলকুঠুরির ভেতরে আছড়ে পড়ে গেল। অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ আকস্মিক একটা ঘটনা। কিন্তু বুঝি বা সে *উদ্দেশ্যমূলকভাবে* অসুস্থতার ভান করেছিল এমন একটা সন্দেহ, এমন একটা কিছুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ বা তার ইঙ্গিত লোকে কী কৌশলে যেন এর মধ্যে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকই যদি হবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে কী উদ্দেশ্যে? কীসের ভরসায়? লক্ষ্যটা কী? চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা না হয় না-ই বললাম। লোকে বলতে পারে বিজ্ঞান মিথ্যে বলছে, বিজ্ঞান ভুল করতে পারে, ডাক্তাররা বাস্তব ঘটনা আর কপটতার মধ্যে তফাত ধরতে পারেননি—বেশ তো, না হয় তা-ই হল, কিন্তু আমাকে অন্তত এই প্রশ্নের উত্তর দিন ভান করার কী কারণ তার ছিল? খুনের মতলব আঁটার পর মূর্ছার আক্রমণের ঘটনা দিয়ে আগে থেকে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ির সকলের দৃষ্টি যাতে তার ওপর এসে পড়ে সেই কারণে কি?

"দেখুন জুরিমণ্ডলীর সদস্যমহোদয়রা, অপরাধ যে দিন সংঘটিত হয় সে দিন রাতে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের বাড়িতে অবস্থান করছিল অথবা এসেছিল মোট পাঁচজন লোক প্রথমত ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্‌ নিজে, কিন্তু তিনি যে নিজেকে খুন করেননি এটা পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত, তাঁর ভৃত্য গ্রিগোরি, কিন্তু সে নিজেই তো প্রায় খুন হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, গ্রিগোরির স্ত্রী, বাড়ির চাকরানি মার্ফা ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না, কিন্তু সে তার নিজের মনিবকে খুন করেছে একথা কল্পনা করতেও লজ্জা হয়। থাকার মধ্যে তাহলে আমাদের চোখের সামনে থাকছে দুজন ব্যক্তি: আসামি আর স্মের্দিকোভ্‌। কিন্তু আসামি যেহেতু নিশ্চিত করে বলছে যে সে খুন করেনি, সেক্ষেত্রে খুন নিশ্চয়ই স্মের্দিকোভ্‌ করেছে—এ ছাড়া তো আর কোনো রাস্তা নেই; যেহেতু এ ছাড়া আর কারও সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, খুনি বলে আর কাউকে তুলে আনা যাবে না। এই তো, দেখা যাচ্ছে, এই সূত্র ধরেই এসেছে গতকালের আত্মঘাতী হতভাগ্য

জড়বুদ্ধিটির বিরুদ্ধে এমন ‘সুচতুর’ ও পর্বতপ্রমাণ অভিযোগ! একমাত্র এই কারণে যে অন্য আর কাউকে তুলে আনা যাচ্ছে না! অন্য আরও কাউকে যদি সন্দেহ করার জায়গা থাকত, যদি সেই সম্ভাবনার ছায়ামাত্র থাকত, যদি এরকম কোন ষষ্ঠ ব্যক্তি থাকত যাকে সন্দেহ করা গেলেও যেতে পারে তাহলে কিন্তু স্মের্দিকোভের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে আসামির নিজের পর্যন্ত লজ্জা হত, সেক্ষেত্রে সে ওই ষষ্ঠ ব্যক্তির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করত, যেহেতু স্মের্দিকোভ্‌কে এই খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

‘‘ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, মনস্তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, তর্কশাস্ত্রের কথাও ছেড়ে দিচ্ছি, আসুন, স্রেফ তথ্যগুলির দিকে, একমাত্র তথ্যগুলির দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক, দেখা যাক তথ্য আমাদের কী বলে। স্মের্দিকোভ্ খুন করেছিল, কিন্তু কী ভাবে করেছিল? একা, না কি আসামির সঙ্গে যোগসাজশ করে? প্রথমে খতিয়ে দেখা যাক প্রথম সম্ভাবনাটি, অর্থাৎ স্মের্দিকোভ্ একাই কাজটা করেছিল। খুন যদি করে থাকে তাহলে অবশ্যই কিছু একটার জন্য, কোনো একটা লাভের কথা চিন্তা করে। কিন্তু খুনের পেছনে যে ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যেমন আসামির ছিল—অর্থাৎ ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি—সেগুলির একটিরও ছায়ামাত্র স্মের্দিকোভের না থাকাতে সে যদি খুন করত তাহলে নিঃসন্দেহে করতে পারত একমাত্র টাকাপয়সার জন্য, ওই যে তিন হাজার রুবল সে স্বচক্ষে তার মনিবকে খামে করে বালিশের তলায় রাখতে দেখেছিল তা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। তা, খুন করার মতলব এঁটে সে আগেভাগে জানিয়ে দিল আরেক ব্যক্তিকে—এমন একজন, ব্যক্তিকে যে কি না এ ব্যাপারে অতি মাত্রায় আগ্রহী, মানে আসামিকে। টাকা আর সঙ্কেত সম্পর্কে যা যা জানানোর—কোথায় খামটা আছে, খামের ওপর ঠিক কী লেখা আছে, কী দিয়ে সেটা বাঁধা আছে সব জানিয়ে দিল, আর বড়ো কথা, সব চাইতে বড়ো কথা এই যে যে-সঙ্কেতের সাহায্যে কর্তার কাছে যাওয়া যায় তাও বলে দিল। তাহলে কী দাঁড়াল? সে কি স্রেফ নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা করল? নাকি তার উদ্দেশ্য ছিল সাধ করে নিজের এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডেকে আনা যে নিজেই সম্ভবত ভেতরে ঢুকে খামটা হস্তগত করতে চায়? জানি, লোকে আমাকে বলবে সে তো ভয়ে বলে দিয়েছিল। কিন্তু তা কী করে হয়? অমন একটা দুঃসাহসিক ও নৃশংস কাজের মতলব আঁটতে এবং পরে তা সম্পন্ন করতে যে লোকটার চোখের পাতা পড়ল না, সে এমন সমস্ত সংবাদ আমাদের জানাল যা সারা দুনিয়ায় একমাত্র সে-ই জানত, যেগুলো সম্পর্কে কোনো কথা না বলে সে যদি কেবল চুপচাপ থাকত তাহলে দুনিয়ার কেউই কখনও তা অনুমান করতে পারত না!

‘‘নাঃ, যা-ই বলুন না কেন, যত ভীতু মানুষই সে হোক না কেন এরকম একটা মতলব যদি এঁটে থাকত তাহলে কোনো মতেই অন্তত পক্ষে ওই টাকার

খাম আর ঢোকার সঙ্কেতের কথা সে কাউকেই জানাত না, কারণ সেটা হত আগাম নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার শামিল। সে ইচ্ছে করে কিছু একটা ভেবে বের করতে পারত, তার কাছ থেকে খবর আদায়ের জন্য যখন অত জোরজুলুম করছে তখন মিথ্যে করে অন্য কিছু একটা বলে দিতে পারত, এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকলেই হত! অন্য দিকে, আবারও আমি এটা বলছি, সে যদি অন্তত কেবল টাকার কথাটা চেপে যেত এবং পরে খুন করে টাকাটা হস্তগত করত তাহলে দুনিয়ায় কেউ কখনও তাকে অন্তুতপক্ষে লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারত না, কেন না এই টাকা সে ছাড়া আর কেউ দেখেনি, বাড়িতে তার অস্তিত্বের কথা আর কেউ জানত না। তাকে যদি অভিযুক্ত করাও হত তাহলে অবধারিত ভাবে এটাই মনে করা হত যে সে অন্য কোনো একটা উদ্দেশ্যে খুন করেছে। কিন্তু যেহেতু প্রাথমিক ভাবে তাকে লক্ষ করে কেউই তার এধরনের কোনো উদ্দেশ্য দেখতে পায়নি, বরং সবাই এটাই দেখেছে যে সে কর্তার প্রিয়পাত্র ছিল, কর্তার আস্থাভাজনের সম্মান অর্জন করেছিল, তাই বলাই বাহুল্য, সন্দেহভাজনের তালিকায় সে হত শেষ ব্যক্তি, সর্বাগ্রে সন্দেহ করা হত সেই ধরনের লোককে যার এই উদ্দেশ্যগুলি আছে, যে নিজে চেঁচিয়ে বলেছে যে এই উদ্দেশ্যগুলি তার আছে, যে তা গোপন না করে সকলের সামনে তা প্রকাশ করেছিল—এক কথায়, সন্দেহ করত নিহত ব্যক্তির ছেলে দ্মিত্রি ফিয়োদরভিচ্‌কে। স্মের্দিকোভ্ যদি খুন করে টাকাকড়ি লুট করত আর ছেলেকে তার দায়ে অভিযুক্ত করা হত তাতে অবশ্য খুনি স্মের্দিকোভের লাভই হত, তাই না? তাহলেই দেখুন, খুন করার মতলব করার পর স্মের্দিকোভ্ সেই ছেলে দ্মিত্রিকেই কি না আগে থাকতে জানিয়ে দিচ্ছে টাকার কথা, টাকার খাম আর সঙ্কেতের কথা!—এটা কি যুক্তিগ্রাহ্য? এটা কি স্পষ্ট?

"স্মের্দিকোভের পরিকল্পিত খুনের দিনটি যখন এলো তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সে মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার *ভান করে* পা ফসকে নিচে পড়ে গেল—উদ্দেশ্যটা কী? অবশ্যই এই, যাতে প্রথমত, ভৃত্য গ্রিগোরি তার নিজের চিকিৎসার যে কথা ভেবেছিল, এখন বাড়ি পাহারা দেওয়ার একেবারে কেউ নেই দেখে তা স্থগিত রেখে পাহারা দিতে বসে। দ্বিতীয়ত, অবশ্যই এই যে, বাড়ির কর্তা নিজে যখন দেখতে পেলেন যে তাঁকে কেউ পাহারা দিচ্ছে না তখন তাঁর সন্দেহ ও সতর্কতার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। অমনিতেই ছেলের আগমনের সম্ভাবনায় তিনি ভীষণ তটস্থ হয়ে থাকতেন, আর সেটা তিনি গোপনও করতেন না। শেষ কথা—এটাও অবশ্য বড়ো কথা—যাতে মূর্ছার আক্রমণে বিধ্বস্ত তাকে, স্মের্দিকোভ্‌কে তৎক্ষণাৎ তার রান্নাঘরের আশ্রয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বরাবরই সে সকলের থেকে পৃথক হয়ে রান্নাঘরেই রাত্রি যাপন করত, সেখানে থাকলে সে তার নিজের ইচ্ছে মতো বাড়ির ভেতরে বাইরে যেতে পারত। কিন্তু তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বাইরের বাড়ির আরেক প্রান্তে—গ্রিগোরির ঘরে, তাদের স্বামী স্ত্রীর দুজনের

থাকার জায়গায়, পার্টিশনের ওপাশে, তাদের নিজেদের শয্যার তিন পা মতন দূরে। বাড়ির কর্তা আর মমতাময়ী মার্ফা ইগ্নাতিয়েভ্নার নির্দেশে স্মরণাতীতকাল থেকে এই ব্যবস্থাই চলে আসছিল—যেই তার মৃগীরোগের আক্রমণের একটু বাড়াবাড়ি দেখা যেত অমনি তাকে এখানে স্থানান্তরিত করা হত। এখানে পার্টিশনের ওপাশে শুয়ে শুয়ে সে যে সত্যি সত্যি অসুস্থ তা দেখাতে গেলে তাকে সম্ভবত কাতরাতে শুরু করতে হয়, অর্থাৎ সারা ধরে অবশ্যই ওদের ঘুম ভাঙাতে হয়। গ্রিগোরি ও তার স্ত্রীর সাক্ষ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ঠিক সেটাই হয়েছিল। এ সব, এ সবই কি তাহলে এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল যাতে চট্ করে এক সময়ে উঠে পড়ে মনিবকে খুন করতে যাওয়া তার পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হয়!

"কিন্তু লোকে আমাকে বলবে, হয়তো সে এই উদ্দেশ্যেই অসুস্থতার ভান করেছিল যাতে যেহেতু সে অসুস্থ তাই তাকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। আর আসামিকে টাকার সন্ধান ও সঙ্কেতের কথা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই বলে দিয়েছিল যাতে সে প্রলুব্ধ হয়ে নিজেই এসে খুন করে যায়। অবস্থাটা বুঝুন, আসামি এসে খুন করে টাকা নিয়ে চলে যাবে, কাজটা করতে গিয়ে সে সম্ভবত একটা হুলস্থূল বা সাড়া ফেলে দেবে, যার ফলে সাক্ষী দেবার মতো লোকজন জেগে উঠবে এবং তখন নাকি স্মের্দিকোভ্ও শয্যা ছেড়ে উঠে ঘরের ভেতরে যাবে—কিন্তু কী করতে যাবে বলুন দেখি? কী করতে আবার? যে কর্তা ইতিমধ্যে খুন হয়েছে তাকে দ্বিতীয়বার খুন করতে এবং যে টাকা ইতিমধ্যেই একজন নিয়ে চম্পট দিয়েছে সেই টাকাই আরও একবার নিয়ে যেতে? ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা হাসছেন? এ ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। অথচ ভেবে দেখুন, যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, আসামি কিন্তু জোর দিয়ে এই সম্ভাবনার কথাই বলছে! তার বক্তব্য: আমি চলে যাবার পর, গ্রিগোরিকে ধরাশায়ী করার পর বাড়িতে সাড়া পড়ে যেতে আমি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি তারও পরে স্মের্দিকোভ্ উঠে পড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তার মনিবকে খুন করে তার টাকা লুট করেছিল। আচ্ছা, স্মের্দিকোভের পক্ষে আগে থাকতে এত সব কী করে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল, অর্থাৎ, কর্তার বদরাগি খ্যাপা ছেলেটা যে নিছক শিষ্টাচারসম্মত ভাবে জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখার উদ্দেশ্যে আসবে এবং সঙ্কেত জানা সত্ত্বেও কিছুই না করে শিকারটা পুরোপুরি তার জন্য, স্মের্দিকোভের জন্য রেখে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়বে—এত সমস্ত কিছু এত ভালো ভাবে আগেই কী করে তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ভদ্রমহোদয়রা, আমি গুরুত্ব দিয়ে যে প্রশ্নটা রাখছি সেটা এই যে স্মের্দিকোভ্ যে অপরাধটা করেছিল সেই অপরাধের মুহূর্তটি তা হলে কোথায় গেল? সেই মুহূর্তটি আপনারা দেখান, তা না হলে তাকে অভিযুক্ত করা সমীচীন হবে না।

"আবার এমনও হতে পারে যে মূর্ছার আক্রমণটা সত্যিকারের ছিল। অসুস্থ

ব্যক্তির হঠাৎ হুঁশ ফিরে এলো, চিৎকার শুনতে পেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বেশ তো, তারপর? একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর মনে মনে বলল, 'যাই, দেখি, কর্তাকে খুন করে আসি।' কিন্তু কী করে সে জানত পারল ওখানকার অবস্থাটা কী? কী ঘটেছে ওখানে? তার আগে পর্যন্ত সে তো অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল। যা-ই বলুন না কেন, ভদ্রমহোদয়রা, কল্পনার একটা সীমা আছে।

"'তা যা বলেছেন', যাঁরা সূক্ষ্মবুদ্ধির লোক তাঁরা বলবেন। 'আচ্ছা এমন যদি হয় যে দুজনের মধ্যে একটা সাঁট ছিল? দুজনে এক সঙ্গে মিলে খুনটা করেছিল, তারপর টাকাটা নিজেদের মধ্য ভাগাভাগি করে নিয়েছিল? তাহলে কী বলবেন?' হ্যাঁ, বাস্তবিকই সন্দেহটা গুরুতর। প্রথমত তৎক্ষণাৎ তার সমর্থনে পর্বতপ্রমাণ নজিরও এসে যাচ্ছে : একজন খুন করেছে, খুন করার সমস্ত ঝামেলাটা নিজের ওপর নিয়েছে। অন্যজন, তার সহযোগীটি অসুস্থতার ভান করে কাত হয়ে পড়ে ছিল। প্রাথমিক ভাবে তার উদ্দেশ্যই ছিল সকলের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলা, তার মনিবকে এবং গ্রিগোরিকেও বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন করে তোলা। কৌতূহলের বিষয়, কী ধরনের উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে দুজনে যোগসাজশ করে পাগলের মতো ঠিক এরকম একটা পরিকল্পনা উদ্ভাবনা করতে পারল?

"কিন্তু এমনও হতে পারে যে স্মের্দিকোভের দিক থেকে যোগসাজশটা আদপেই সক্রিয় ধরনের ছিল না, নিষ্ক্রিয় ও বেদনাদায়ক বলতে যা বোঝায় হয়তো তাই ছিল? এমন হতে পারে স্মের্দিকোভ্‌কে ভয় দেখানো হয়েছিল, তাইতে যে শুধু এই শর্তে রাজি হয়েছিল যে খুন করার সময় সে কোনো বাধা দেবে না এবং চিৎকার চেঁচামেচি না করে, কোন বাধা না দিয়ে সে যে খুনের সুযোগ করে দিয়েছিল এর জন্য সে তাকেই দোষারোপ করা হতে পারে সেটা আগে থেকে টের পেয়ে আগেই দ্‌মিত্রি কারামাজভের সঙ্গে কথা বলে তার কাছ থেকে এই সম্মতি আদায় করে নিয়েছিল যে ওই সময় সে মৃগীরোগে আক্রান্ত হওয়ার ভান করে পড়ে থাকবে। ভাবটা এই 'তারপর যা খুশি কর গে। আমি ওর মধ্যে নেই।' কিন্তু তাও যদি হয়, এই মৃগীরোগের আক্রমণের ঘটনাতেও যে আবার বাড়িতে নির্ঘাত তোলপাড় পড়ে যাবে সে কথা জেনেশুনে দ্‌মিত্রি কারামাজভের পক্ষে এরকম একটা আবদারে সায় দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। আচ্ছা, ওকথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ঠিক আছে, মেনে নিলাম সে রাজি হয়েছিল, কিন্তু তাতেও, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটাই দাঁড়াত যে দ্‌মিত্রি কারামাজভ্ খুনি, প্রত্যক্ষভাবে খুনি এবং সে-ই এই হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা, আর স্মের্দিকোভ্ একজন নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকারী মাত্র, এমন কি অংশগ্রহণকারীও বলা যায় না—শুধুমাত্র ভয়ে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন নীরব সমর্থক। আর যা-ই হোক, আদালতের বিচারে তো অবশ্যই এই পার্থক্যটা ধরা পড়তে পারত! কিন্তু আমরা কী দেখছি? অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেই গ্রেপ্তার করা হল অমনি নিমেষের মধ্যে যত দোষ সব সে চাপিয়ে দিল *একমাত্র* স্মের্দিকোভের

ঘাড়ে, একমাত্র তাকেই সে অভিযুক্ত করল। বলল, 'একা সে একাজটা করেছে, সে খুন করেছে, লুটও সে-ই করেছে। এটা ওর হাতের কাজ।' নিজের দুষ্কর্মের সহযোগী বলে যে অভিযোগ করছে তা নয়, একমাত্র তাকেই অভিযোগ করছে। দুষ্কর্মের ভালো সহযোগী দেখছি! সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করে দিল! নাঃ, এ কখনও হয় না। তা ছাড়া লক্ষ করে দেখুন, কারামাজ়ভের পক্ষে এটা কত বড়ো একটা ঝুঁকি। আসল হত্যাকারী তো সে-ই, স্মের্দিকোভ্‌ তো আর নয়। স্মের্দিকোভ্‌ কেবল একজন নীরব সমর্থক, পার্টিশনের ওধারে বিছানায় পড়ে ছিল। এই শয্যাশায়ী লোকটার ঘাড়ে কিনা সে যত দোষ চাপাচ্ছে! এরকম হলে সেই লোকটা, সেই শয্যাশায়ী ব্যক্তিটি তো চটেই যেতে পারে, চটে গিয়ে একমাত্র আত্মরক্ষার খাতিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্ভেজাল সত্যটা প্রকাশ করে দিতে পারে। বলতে পারত 'আমাদের দুজনেরই এতে অংশ ছিল, তবে খুন আমি করিনি, আমি শুধু সায় দিয়েছিলাম, ভয়ে নীরব সমর্থন জাড়িয়েছিলাম।' কেন না স্মের্দিকোভের অন্তত এটা বোঝার ক্ষমতা ছিল যে আদালত তৎক্ষণাৎ তার দোষের মাত্রা কতটা তা নির্ধারণ করবে, অর্থাৎ সে এমন ভরসাও করতে পারত যে তাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়ও যে-লোকটা সব দোষ একা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে সেই আসল হত্যাকারীর শাস্তির তুলনায় সেটা হবে নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কথাটা এই যে চাই-না-চাই সে স্বীকারোক্তি করত। অথচ সেটা আমরা দেখলাম না। যোগসাজশ সম্পর্কে স্মের্দিকোভ্‌ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও একটি কথা বলেনি, যদিও আসল হত্যাকারীটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাকেই একমাত্র হত্যাকারী বলে ঘোষণা করছে, সর্বক্ষণ তার দিকে অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। শুধু তা-ই বা কেন তদন্তের সময় স্মের্দিকোভ্‌ই তো প্রকাশ করেছিল যে টাকার খাম আর সঙ্কেতের কথা *সে নিজে* আসামিকে জানিয়েছিল, সে না বলে দিলে আসামি কিছুই জানতে পারত না। সত্যি সত্যি যদি কোনো যোগসাজশ থাকত এবং সে যদি সত্যি সত্যি দোষী হত তাহলে কি আর একথা, অর্থাৎ এসব যে সে নিজেই আসামিকে জানিয়েছিল তা এত সহজে তদন্তের সময় জানাত? বরং সে মুখে কুলুপ এঁটে থাকত, অবশ্যই তথ্যের বিকৃতি ঘটাত এবং কমসম করে তথ্য দিত। কিন্তু সে তথ্যের বিকৃতি ঘটায়নি, কমসম করেও কিছু বলেনি। এরকম করতে পারে শুধু একজন নির্দোষ ব্যক্তি, যার মনে এমন কোনো ভয় নেই যে তাকে যোগসাজশের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হতে পারে। এখন দেখুন, লোকটা তার মৃগীরোগের দরুন এবং এত বড়ো একটা দুর্ঘটনার প্রাদুর্ভাবের ফলে মর্মান্তিক বিষাদে আক্রান্ত হয়ে গতকাল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। আত্মহত্যা করার সময় সে তার নিজস্ব ধরনের শৈলীতে একটি চিরকুট লিখে রেখে গেল 'স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি নিজের বিনাশ সাধন করছি যাতে কাউকে দোষী করা না হয়।' কী এমন হত যদি এই লেখাটাতে

সে যোগ করত 'খুনি আমিই, কারামাজ়ভ্ নয়'? কিন্তু তা সে করেনি। একটার পেছনে বিবেক তাকে সায় দিল, কি অন্যটার পেছনে দিল না?

"তারপর কী হল? এই কিছুক্ষণ আগে এখানে, আদালতে টাকা দিয়ে যাওয়া হল, তিন হাজার রুবল—সাক্ষ্য প্রমাণের বস্তুর টেবিলে রাখা এই যে টাকা এগুলি নাকি সেই টাকা যা ওই খামটার মধ্যে রাখা ছিল এবং গতকাল নাকি তা স্মের্দিকোভের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। কিন্তু আপনারা, জুরিমন্ডলীর সদস্য ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা নিজেরাই মনে করে দেখুন কিছু আগের বেদনাদায়ক দৃশ্যটি। নতুন করে সেই দৃশ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে যাচ্ছি না। তবে ভরসা করে বেছে বেছে চিন্তা করার মতো মাত্র গুটি দুই তিন এমন বস্তু তুলে ধরতে চাই যা নেহাৎই নগণ্য। যেহেতু নগণ্য ঠিক সেই কারণেই যে-কারও মাথায় নাও আসতে পারে, লোকে ভুলেও যেতে পারে। প্রথমত এবং আবারও কথা হল, স্মের্দিকোভ্ বিবেকের দংশনের ফলে গতকাল টাকা ফেরত দিয়েছিল এবং গলায় দড়ি দিয়েছিল। কারণ, বিবেকের দংশন না হলে সে টাকা ফেরত দিতে যেত না। এবং অবশ্যই সবে এই গতকাল সন্ধ্যাবেলা এই প্রথম ইভান ফিয়োদরভিচের কাছে তার অপরাধের কথা স্বীকার করল—সে রকমটাই ইভান ফিয়োদরভিচ নিজে জানিয়েছে—তা যদি না-ই হবে তাহলে কেনই বা এর আগে পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে? বেশ, না হয় স্বীকার করল, কিন্তু তাহলে কেন বলুন তো—আমাকে আবারও বলতে হচ্ছে—মৃত্যুর আগের মুহূর্তের লেখাতে পুরোপুরি সত্য কথাটা আমাদের কাছে প্রকাশ করল না, অথচ সে জানত কালই নিরপরাধ আসামির শেষ বিচার হতে চলেছে। শুধু টাকাই কোন প্রমাণ হতে পারে না। যেমন আমি এবং এই আদালতকক্ষে উপস্থিত আরও দুই ব্যক্তি এক সপ্তাহ আগে নেহাৎই দৈবাৎ একটা তথ্য জানতে পেরেছি। সেটা এই যে ইভান কারামাজ়ভ্ পাঁচ হাজার করে পাঁচ শতাংশের দুটো ঋণপত্র, অর্থাৎ কিনা মোট দশ হাজারের ঋণপত্র ভাঙানোর জন্য মহকুমা শহরে লোক পাঠিয়েছিল। আমার বক্তব্য শুধু এটাই যে এই সময়ের মধ্যে যে কোনও লোকের কাছে টাকা থাকাটা বিচিত্র কিছু নয় এবং তিন হাজার এনে দেওয়া মানে অবশ্যই এই প্রমাণ করা নয় যে এই টাকাটা ঠিক অমুক বাক্সের বা অমুক খামেরই সেই টাকা।

"পরিশেষে আরেকটি কথা: ইভান কারামাজ়ভ্ গতকাল সন্ধ্যায় আসল হত্যাকারীর কাছ থেকে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়ার পর কিনা নির্বিকার রয়ে গেল! একথা তৎক্ষণাৎ জানাতে তার কী হয়েছিল? সকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে গেল কেন? আমার মনে হয় কেন, তা অনুমান করার অধিকার আমার আছে। গত এক সপ্তাহ হল তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, জনৈক চিকিৎসকের কাছে এবং ঘনিষ্ঠ লোকজনের কাছে নিজেই স্বীকার করেছিল যে সে অলীক সমস্ত দৃশ্য দেখতে শুরু করেছে, যে সব লোক আর জীবিত নেই তাদের ভূত দেখছে। যে মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে আজই সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তার ঠিক আগের মুহূর্তে আকস্মিক

ভাবে স্মের্দিকোভের মারা যাবার খবর পেয়ে হঠাৎ সে মনে মনে ঠিক করে নিল: ‘লোকটা মৃত, তার নাম করে এখন কিছু বলাই যেতে পারে, তাতে ভাই তো বাঁচবে। টাকা তো আমার আছেই। টাকার বাণ্ডিল নিয়ে গিয়ে বলব স্মের্দিকোভ্‌ মারা যাবার আগে আমাকে দিয়ে গেছে।’ আপনারা বলবেন, মৃতের নাম করে হোক আর যা-ই হোক, এটা সততার পরিচায়ক নয়। না, না, এমনকি ভাইকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে হলেও এরকম মিথ্যে বলাটা আদৌ সততার পরিচায়ক নয়—তাই তো? ঠিক কথা, কিন্তু এমন যদি হয় যে সে অচেতন ভাবে মিথ্যে বলেছিল? যদি এমন হয় যে তার বুদ্ধি বিবেচনা চূড়ান্ত ভাবে লোপ পেয়ে গিয়েছিল বলেই ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যুর এই সংবাদ পেয়ে সে মনে মনে কল্পনা করেছিল যে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল? আপনারা তো দেখেইছেন কিছু আগের সেই দৃশ্যটি, দেখেছেন লোকটা কী অবস্থায় ছিল। দু পায়ে খাড়া ছিল, কথাও বলছিল, কিন্তু তার মাথার ঠিক ছিল কি?

“সাম্প্রতিক এই সাক্ষ্যের পর পরই পাওয়া গেল একটি প্রমাণপত্র—মাদাম ভের্খভ্‌ৎসেভার কাছে আসামির লেখা চিঠিটা যেটা সে অপরাধ করার দু দিন আগে ক্ষিপ্ত হয়ে লিখেছিল। এই চিঠিতে অপরাধের পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি সবিস্তারে লেখা আছে। তাহলে আমরা আবার কী বলে অন্য কোনো কর্মসূচি বা তার প্রণেতাদের খোঁজ করে মরছি? হুবহু এই কর্মসূচি অনুসারেই ঘটনাটি ঘটেছিল। আর কারও দ্বারা নয়, এই কর্মসূচির প্রণেতার দ্বারাই ঘটেছিল। হ্যাঁ, যা বলছি, জুরিমণ্ডলীর সদস্য মহোদয়বৃন্দ, ‘যেমন লেখা তেমনি ঘটেছিল!’ আর আমরা শিষ্টাচারসম্মত ভাবে এবং ভয়ে ভয়ে বাবার ঘরের জানলার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েও যাই নি—আদৌ যাইনি, সে পাত্রই আমরা নই—তাও কিনা আবার সেই সময় যখন মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের প্রেয়সীটি এখন তারই ঘরে আছে। না, এটা উদ্ভট, অবিশ্বাস্য। সে ভেতরে ঢুকেছিল—ঢুকে কাজ হাসিল করেছিল। এটা খুবই সম্ভব যে তার ঘৃণার পাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীটির দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র তার মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল, ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সে খুন করেছিল তার হাতে অস্ত্র বলতে তখন সেই তামার নোড়াটা। সেটা দিয়ে সম্ভবত এক ঘায়ে, এক ঝটকায় সে কাজটা সেরেছিল। কিন্তু খুন করার পর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার পর যখন সে নিশ্চিত হল যে তার প্রেয়সীটি সেখানে নেই তখন কিন্তু বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে টাকার খামটা বের করে আনতে সে ভুলল না। ওই খামেরই ওপরের ছিন্নভিন্ন মলাটটা এখানে সাক্ষ্যপ্রমাণের বস্তুর টেবিলে রাখা আছে।

“আমি এই ঘটনার উল্লেখ করছি যাতে আপনারা একটা পরিস্থিতি লক্ষ করে দেখেন, যেটা আমার মতে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক। সে যদি একজন পাকা খুনি হত, অর্থাৎ শুধুমাত্র টাকাকড়ি লুট করার উদ্দেশ্যে যারা খুন করে সে রকম কোনো খুনি হত, তাহলে খামের ওপরের ছিন্নভিন্ন মলাটটা যে অবস্থায় আমরা মৃতদেহের

পাশে দেখতে পেয়েছিলাম সেই ভাবে কি সে মেঝেতে ফেলে রেখে চলে যেত? ধরলামই না হয় লোকটা স্মের্দিকোভ্, লুট করার উদ্দেশ্য নিয়েই খুন করেছিল—কিন্তু সে হলে তো স্রেফ গোটা খামটাই তুলে নিয়ে যেত, অত কষ্ট করে তার শিকারের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওটা খোলার আদৌ তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু সে নিশ্চিত জানত যে খামে টাকা আছে—টাকা তো তার উপস্থিতিতেই খামে পুরে সিল করে রাখা হয়েছিল—আর সে যদি খামটা একেবারে নিয়ে চলে যেত তাহলে ডাকাতি হয়েছিল কিনা জানাই যেত না। জুরিমণ্ডলীর সদস্য মহোদয়বৃন্দ, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন: স্মের্দিকোভ্ হলে কি এরকম ব্যবহার করত? খামটা মেঝেতে ফেলে রেখে চলে যেত কি?

"উঁহু, এমন আচরণ করতে পারে একমাত্র কোনো উন্মত্ত খুনি, ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা যার প্রায় লোপ পেয়েছে। খুনি চোর নয়, এর আগে পর্যন্ত কখনও কিছু চুরি করেনি, কিন্তু এখন যে শয্যার তলা থেকে টাকা টেনে বের করে নিল সেটা এই কারণে নয় যে সে একজন চোর, টাকা চুরি করতে এসেছে—এসেছে তার নিজেরই যে জিনিস চোরে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সেটাই চোরের কাছ থেকে কেড়ে নিতে—যেহেতু এই তিন হাজার সম্পর্কে ঠিক এমনই ছিল দ্‌মিত্রি কারামাজভের ধারণা, যা শেষ পর্যন্ত তার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খামটা সে আগে কখনও চোখে দেখেনি, তাই সেটার ওপর হামলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই ভেতরে টাকা আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে খামের ওপরকার মলাটটা ছিঁড়ে ফেলল, তারপরই টাকাগুলো পকেটস্থ করে সেখান থেকে দে ছুট। এদিকে মেঝের ওপরে খামের ছিন্নভিন্ন মলাট ফেলে রেখে নিজের বিরুদ্ধে সে যে কত বড়ো একটা নজির রেখে গেল তা পর্যন্ত ভাবতে ভুলে গেল। এ সবেরই কারণ এই যে লোকটা স্মের্দিকোভ্ নয়, কারামাজভ্। কোনো ভাবনা নেই, চিন্তার কোনো বালাই নেই—আর তা সে করবেই বা কী করে? পালাতে লাগল, শুনতে পাচ্ছিল তার পিছন পিছন ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে তাকে ধরার জন্য ধেয়ে আসছে বাড়ির পরিচারক। লোকটা শেষ পর্যন্ত তাকে ধরেও ফেলল, তার গতিরোধ করল, কিন্তু তামার নোড়ার আঘাতে ধরাশায়ী হল।

"আসামির মনে করুণার উদ্রেক হতে তাকে দেখার জন্য সে আবার লাফিয়ে নিচে নেমে এলো। ধারণা করুন দেখি, হঠাৎ সে এই বলে আমাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে চাইছে যে তখন সে করুণা ও সমবেদনার বশবর্তী হয়ে লাফিয়ে তার কাছে নিচে নেমে এসেছিল, দেখতে চেয়েছিল লোকটাকে কোন ভাবে সাহায্য করা যায় কি না। আচ্ছা বলুন তো, এই ধরনের সমবেদনা প্রকাশের এটা কি একটা সময় হল? উঁহু, সে যে নিচে নেমে এসেছিল তার কারণ ছিল ঠিক এটাই যে সে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল তার দুষ্কর্মের একমাত্র সাক্ষীটি বেঁচে আছে কি না। অন্য আর কোনো উপলব্ধি বা আর কোনো উদ্দেশ্যের কথা ভাবাটাই অস্বাভাবিক!

খেয়াল করে দেখুন, গ্রিগোরির জন্য সে অনেক চেষ্টাচরিত্র করেছিল, রুমাল দিয়ে তার কপাল মুছেছিল, কিন্তু যখন নিশ্চিত বুঝতে পারল যে সে মারা গেছে তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো, রক্তমাখা অবস্থায় আবার ছুটে গেল তার সেই প্রেয়সীর বাড়িতে—একবারও ভেবে দেখল না যে তার সর্বাঙ্গে রক্ত লেগে রয়েছে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে? কিন্তু আসামি নিজে এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করছে যে তার সর্বাঙ্গে যে রক্ত লেগে রয়েছে সে দিকে তার কোনো নজর পর্যন্ত ছিল না। এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে, এটা খুবই সম্ভব। অপরাধীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সব মুহূর্তে সব সময়ই এমন ঘটে থাকে। একটার পেছনে নারকীয় হিসাব, অন্যটার পেছনে চিন্তাশক্তি কুলোয় না। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার একমাত্র চিন্তা ছিল সে কোথায় থাকতে পারে। তার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানা দরকার ছিল সে কোথায় আছে। তাই সে ছুটে এসেছিল তার বাসস্থানে। সেখানে এসে যে সংবাদ জানতে পারল তা তার কাছে ছিল নিদারুণ ও অপ্রত্যাশিত সে তার 'প্রাক্তন' ও 'অবিসংবাদিত' প্রেমিকটির কাছে চলে গেছে!

## নয়

## মনস্তত্ত্বের চূড়ান্ত। ধাবমান তিন ঘোড়ার গাড়ি 'ত্রোইকা'। প্রসিকিউটরের ভাষণের পরিসমাপ্তি

যে-কোনো নার্ভাস বক্তা তাঁর উদগ্র আবেগকে কঠোর সীমারেখার মধ্যে বেঁধে সংযত রাখাব চেষ্টায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপনা করা অত্যন্ত পছন্দ করে। ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্‌ও তাঁর ভাষণের এই জায়গায়, এসে স্পষ্টতই সেই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলেন। বিশেষ করে 'প্রাক্তন' ও 'অবিসংবাদিত' প্রেমিকপ্রবরটি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করলেন এবং এই বিষয়ে বেশ খানিকটা চিত্তাকর্ষক ধ্যানধারণাও প্রকাশ করলেন।

"কারামাজ়ভ্ সকলকে ঈর্ষা করত, তার সেই ঈর্ষা খ্যাপামির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এ হেন ব্যক্তিটি কিনা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই 'প্রাক্তন' ও 'অবিসংবাদিত'টির সামনে যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এটা আরও বেশি অদ্ভুত এই কারণে যে তার পক্ষে নতুন এই যে বিপদ, তার কাছে অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বীটির মধ্যে যার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ইতিপূর্বে সে দিকে সে প্রায় কোনো আমল দেয়নি। তার কেবলই মনে হত ওসব অনেক দূরের ব্যাপার, কিন্তু কারামাজ়ভের জীবন ধারণ শুধু এই মুহূর্তটিকে নিয়ে। খুব সম্ভব ওটাকে সে নেহাৎ একটা গল্পকথা বলে মনে করত। কিন্তু তার আহত হৃদয় মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল সে হয়তো এই কারণেই এই নারী এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীটির কথা গোপন করেছিল, হয়তো বা এই কারণেই এখন তাকে ফাঁকি দিয়েছিল যে

নতুন করে উড়ে এসে জুড়ে বসা এই প্রতিদ্বন্দ্বীটি তার কাছে কোনো অলীক কল্পনা বা গল্পকথা নয়—সে তার কাছে সব, তার জীবনের একমাত্র আশা ভরসা। মুহূর্তের মধ্যে এটা বুঝতে পেরে সে নতি স্বীকার করল।

"এখানে আসামির চরিত্রের মধ্যে আকস্মিক ভাবে যে বৈশিষ্ট্যটি দেখা দিয়েছিল, যা প্রকাশের ক্ষমতা তার কোনো মতেই ছিল না বলে মনে হতে পারত সেটার উল্লেখ না করে নীরবে তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসামির মনের মধ্যে এই সময় হঠাৎই জেগে উঠেছিল নিষ্করুণ সত্যের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারী হৃদয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দানের এক অপ্রতিরোধ্য তাগিদ—তাও আবার কখন? ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যখন সেই নারীর জন্যই নিজের বাবার রক্তে সে তার হাত রক্তাক্ত করেছে! অবশ্য এটাও সত্য যে রক্তপাত সে ঘটিয়েছিল তাও ততক্ষণে সরব হয়ে উঠেছে, সেই মুহূর্তে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কারণ নিজের আত্মাকে, নিজের পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করার পর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক এই ক্ষণটিতে তাকে উপলব্ধি করতেই হবে, নিজেকে প্রশ্ন করতেই হবে  যাকে সে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসে তার কাছে, সেই নারীর কাছে এখন কী অর্থ তার আছে, কীই বা অর্থ তার থাকতে পারে 'প্রাক্তন' ও 'অবিসংবাদিত' এই ব্যক্তিটির তুলনায়, যে একদিন এই নারীর জীবন নষ্ট করেছিল, কিন্তু *এখন* অনুতপ্ত হয়ে নতুন ভালোবাসা নিয়ে, সম্মানজনক প্রস্তাব এবং নবজাগ্রত সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে? সে নিজে তো একটা হতভাগ্য লোক, সে এখন তাকে কী দেবে? কী প্রতিশ্রুতিই বা দিতে পারে?

"কারামাজভ্ এ সবই বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল তার অপরাধের ফলে তার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই, এখন সে আর বেঁচে থাকার মতো মানুষ নয়, সে একজন দণ্ডিত আসামি মাত্র! এই ভাবনা তাকে পিষে মারছিল, তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তাই মুহূর্তের মধ্যে একটি উন্মত্ত পরিকল্পনা সে করে বসল। কারামাজভের যা চরিত্র তাতে তার পক্ষে এটাকে তার ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় এবং তার ভবিতব্য বলে ভাবা ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব ছিল না। সেই উপায়টা ছিল আত্মহত্যা। সরকারি আমলা পের্খোতিনের কাছে সে তার দুটি পিস্তল বন্ধক রেখেছিল। সেগুলি ছাড়িয়ে আনার জন্য সে তার কাছে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সেই অবস্থাতেই পথের মধ্যে পকেট থেকে টেনে বার করল সেই টাকাগুলি যার জন্য এই কিছুক্ষণ আগে সে তার বাবার রক্তে নিজের হাত কলুষিত করেছে। আহা, টাকাই তো এখন তার সবচেয়ে বেশি দরকার! কারামাজভ্ মরতে চলেছে, কারামাজভ্ গুলি করে আত্মহত্যা করতে চলেছে, আর এটা সকলের মনে থাকবে। সাধে কি আমরা কবি? সাধে কি আর আমরা দুদিক থেকে মোমবাতি জ্বালানোর মতো করে জীবনটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি!

'যাচ্ছি, তার কাছে যাচ্ছি—ওখানে গিয়ে, আহা, ওখানে গিয়ে দুনিয়াসুদ্ধু সবাইকে দেখিয়ে যা ভোজের আসরটা দেব না, তেমনটি আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি। লোকে মনে রাখবে, অনেক কাল এই নিয়ে বলাবলি করবে। বন্য চিৎকার আর জিপ্‌সিদের উদ্দাম নাচগানের মধ্যে তুলে ধরব স্বাস্থ্য কামনার উদ্দেশ্যে পান পাত্র, যে নারীকে সমাদর করি তার নবলব্ধ সুখের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাব, তারপর—সেখানেই ঢলে পড়ব তার পদতলে, তার সামনে উড়িয়ে দেব নিজের মাথার খুলিটা, নিজেই নিজের শাস্তি বিধান করব! কোনো এক সময় দেখতে পাবে মিতিয়া তাকে কত ভালোবাসত, মিতিয়ার জন্য তার করুণা হবে!'

"কত না চিত্রিত ছবি, কত রোমাণ্টিক উন্মত্ততা, কারামাজভীয় বন্য অসংযম, ভাবাবেগ—এবং আরও আরও অন্য কিছু, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আরও কিছু একটা যা মানুষের মনের ভেতরে কোথাও গুমরোতে থাকে, মস্তিষ্কের ভেতরে অবিরাম ঘা মেরে চলে, তার হৃদয়ে তিক্ততার সঞ্চার করে তাকে মৃত্যুর দিকে *ঠেলে দেয়*। এই *কিছু একটা*—এটা বিবেক, মাননীয় ভদ্রমহোদয়রা, এটা ন্যায় বিচার, এটা বিবেকের নিদারুণ দংশন! কিন্তু পিস্তল সব বোঝাপড়ার অবসান ঘটাবে, পিস্তল একমাত্র পরিত্রাণের উপায়, এছাড়া আর কোন পথ নেই! কিন্তু তারও পরে!—আমি জানি না সেই মুহূর্তে কারামাজ়ভ্ ভেবেছিল কিনা তারও পরে কী আছে,' অথবা হ্যামলেটের মতো কারামাজ়ভ্‌ও ভাবতে পারে কিনা কী আছে তারও পরে। না, জুরিমণ্ডলীর সদস্য মহোদয়রা, ওদের হ্যামলেট আছে, কিন্তু আমাদের আপাতত, এখন পর্যন্ত আছে কারামাজ়ভ্‌রা!"

এখানে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ তুলে ধরলেন পের্‌খোতিনের বাড়িতে, দোকানে, গাড়ির কোচোয়ানদের সঙ্গে ঘটনার দৃশ্য—মিতিয়ার প্রস্তুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র। তিনি বিপুল পরিমাণে এমন সমস্ত কথা, উক্তি, ভাবভঙ্গি টেনে আনলেন যেগুলির সবই ছিল সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিত—ফলে ছবিটা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মতকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। অস্থিরমতি উদভ্রান্ত প্রকৃতির এই যে লোকটি, যে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারেনি, তার অপরাধ যে ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা আর খণ্ডানোর উপায় ছিল না।

"নিজেকে বাঁচিয়ে চলার আর কিছু ছিলও না আর', ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ বললেন। "দু তিনবার তো সে প্রায় পুরোপুরি স্বীকারই করে ফেলেছিল, একেবারে ভেঙে না বললেও কতকটা ইঙ্গিত তো দিয়েইছিল। এখানে তিনি সাক্ষীদের এজাহারের উল্লেখ করলেন। বললেন, এমনকি পথে যেতে যেতে গাড়ির কোচোয়ানকে পর্যন্ত চেঁচিয়ে বলেছিল 'তুমি যে একজন খুনিকে নিয়ে যাচ্ছ সেটা জান কি?' কিন্তু তাহলেও ভেঙে বলা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল তাকে আগে মোক্রয়েতে পৌঁছুতে হবে, সেখানেই শেষ করতে হবে তার আখ্যান। কিন্তু কী অপেক্ষা করছিল এই হতভাগ্য লোকটির জন্য? ঘটনা এই যে মোক্রয়েতে আসার পর প্রায় প্রথম

মুহূর্ত থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি বুঝতেও পেরেছিল যে তার 'অবিসংবাদিত' প্রতিদ্বন্দ্বীটি হয়তো আদৌ তেমন একটা অবিসংবাদিত নয় এবং নবলব্ধ সুখের জন্য অভিনন্দন বা স্বাস্থ্যকামনার উদ্দেশ্যে পানপাত্র তার কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত নয়, কেউ তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে না। কিন্তু জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্য মহোদয়রা, আদালতের প্রাথমিক তদন্ত থেকে সে সব তথ্য আপনাদের ইতিমধ্যেই জানা আছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কারামাজভের জয় প্রশ্নাতীত হয়ে দেখা দিল। আর এখানে, ঠিক এখানে এসেই কিন্তু কারামাজভের মনের মধ্যে একেবারে নতুন এক পর্যায়ের সূচনা হল—এমনকি এর আগে কখনও সে-সমস্ত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তার মনকে যেতে হয়েছে বা এর পরেও কোনো না কোনো সময় যেতে হবে সেগুলির যে-কোনোটির চেয়ে তা বেশি ভয়াবহ ছিল!

"ভদ্রমহোদয়রা, স্বীকার করতেই হবে", উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ, "কলুষিত প্রকৃতি ও অপরাধী মন—যে-কোন পার্থিব ন্যায়বিচারের তুলনায় অনেক বেশি ভালোভাবে নিজেরাই নিজেদের ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, ন্যায়বিচার ও পার্থিব আদালতের দণ্ড বরং প্রকৃতির দণ্ডবিধানের উপশমই ঘটায়। অথচ এই সমস্ত মুহূর্তে প্রকৃতির দণ্ডই অপরাধীর আত্মাকে হতাশা থেকে উদ্ধারের জন্য একান্ত আবশ্যক। কারণ, কারামাজভ্ যখন জানতে পারল সে তাকে ভালোবাসে, তার জন্য সে তার 'প্রাক্তন' ও 'অবিসংবাদিত' প্রেমিক প্রবরটিকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাকে—তার 'মিতিয়াকেই' সে নবজীবনের পথে তার সঙ্গে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে, তাকে সুখের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তখন কারামাজভের মনের মধ্যে যে বিভীষিকার সঞ্চার হয়েছিল, যে মানসিক কষ্ট তাকে ভোগ করতে হয়েছিল আমি তো তা ধারণাই করতে পারি না! সবই হল, কিন্তু হল কখন? যখন তার কাছে সব শেষ হয়ে গেছে, যখন আর কিছু করা সম্ভব নয়!

"প্রসঙ্গত, আসামির এখনকার মনের অবস্থাটা আসলে ঠিক কেমন ছিল সেটা বোঝানোর জন্য সামান্য একটা বিষয়ের উল্লেখ করব, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নারী, একেবারে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত, এমনকি গ্রেপ্তার হওয়ার সেই মুহূর্তটি পর্যন্ত এই নারীর প্রতি তার প্রেম তার কাছে এমন এক দুর্লভ বস্তু হয়ে থেকে গেল যা ছিল তার পরম আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু তার নাগালের বাইরে। কিন্তু কেন, কেন তাহলে তখনই সে গুলি করে আত্মহত্যা করল না, এমনকি পিস্তল কোথায় আছে তা পর্যন্ত ভুলে গেল? প্রেমের জন্য প্রবল তৃষ্ণা এবং তখনই সেই তৃষ্ণা মেটাতে পারবে বলে তার আশাই তাকে তখন ঠেকিয়ে রেখেছিল। উন্মত্ত পান ভোজনের সেই উৎসবে তার প্রণয়িণীটিও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাকে এত অপরূপ, এত মনোহারিণী এর আগে আর কখনও তার মনে হয়নি। সে তখন

তার সঙ্গে শিকলে বাঁধা হয়ে পড়েছে। তাকে কখনও কাছ ছাড়া করছিল না। তাকে দেখে সে এমনই মুগ্ধ যে তার সামনে তার নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

“আসামির এই প্রবল তৃষ্ণা শুধু তার নিজের গ্রেপ্তার হওয়ার বিভীষিকা কেন, এমনকি তার বিবেকের দংশনকেও দাবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল! কিন্তু ক্ষণিকের জন্য, সে কেবল মুহূর্তের জন্য! আসামির তখনকার মানসিক অবস্থাটা আমি মনে মনে বেশ ধারণা করতে পারছি। তার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে দাবিয়ে দিয়েছিল, নিঃসন্দেহে ক্রীতদাসের মতো বশীভূত করে ফেলেছিল তিনটি বস্তু  প্রথমত, মাতাল অবস্থা, মত্ততা, হুল্লোড়বাজি, নাচের দাপাদাপি, গানের তীক্ষ্ণ চিৎকার, আর অবশ্যই, অবশ্যই সেই নারী—নেশার ঘোরে নাচছে, গাইছে, তার দিকে তাকিয়ে হাসছে! দ্বিতীয়ত, দূরবর্তী একটি স্বপ্ন যা তাকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। সেটা এই যে সর্বনাশা পরিণতিটি আসতে এখনও দেরি আছে—অন্তত কাছে নয়—সে হলে কাল হবে, কাল সকালের আগে নয়, তখন ধরে নিয়ে গেলে নিয়ে যাক। দাঁড়াচ্ছে এই যে এখনও আরও বেশ কয়েক ঘণ্টা আছে। সে তো অনেক, খুবই বেশি! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছু ভেবে বার করা যেতে পারে। আমি মনে মনে কল্পনা করতে পারি তার অবস্থাটা তখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সেই আসামির মতো যাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে অনেক লম্বা এই রাস্তাটা ধরে এখনও আরও অনেকটা যেতে হবে, তাও আবার পায়ে হাঁটা গতিতে, হাজার হাজার লোকের সামনে দিয়ে, তারপর পড়বে আরও একটা রাস্তায় পড়ার একটা মোড়, কেবল সেই রাস্তাটার শেষেই আছে ওই ভয়ঙ্কর চত্বরটা যেখানে তাকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হবে! আমার এটাই মনে হয় যে শোভাযাত্রার শুরুতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামিটি তার ওই কলঙ্কিত চক্রযানটিতে বসে বসে নির্ঘাত ভেতরে ভেতরে অনুভব করছিল যে তার সামনে এখনও অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা হলেও, আশেপাশের বাড়িঘর যে একের পর এক দূরে সরে যাচ্ছে, চক্রযানটি এগিয়েই চলেছে সামনের দিকে। তা বললে কী হবে—ও কিছু নয়, দ্বিতীয় রাস্তার দিকে মোড় নিতে এখনও অনেক দেরি আছে। সে তখনও বসে বসে দিব্যি প্রফুল্লচিত্তে ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার ভাগ্য সম্পর্কে উদাসীন হাজার হাজার কৌতূহলী লোকজনকে, যাদের দৃষ্টি তারই দিকে স্থিরনিবদ্ধ। তার তখনও কেবলই মনে হচ্ছে সেও ওই ওদেরই মতো মানুষ। কিন্তু দেখতে দেখতে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়ার সেই মোড়টাও এসে গেল। আহা, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়, এখনও পুরো একটা রাস্তা পড়ে আছে। এর পরও যত বাড়িঘরই একের পর এক চোখের আড়াল হতে থাকুক না কেন, সে তখনও মনে মনে ভাবতে থাকবে ‘এখনও আরও অনেক বাড়িঘর বাকি আছে।’ এই ভাবেই চলবে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না চত্বরে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

"আমার ধারণা, কারামাজভের মনেও তখন ঠিক এই ধরনের ভাবনারই উদয় হয়েছিল। সে ভেবেছিল, 'এখনও তো ধরার অবকাশ পায়নি। 'এখনও খুঁজে পেতে কিছু একটা বার করা যেতে পারে। আরে, এখনও আত্মরক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করার বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ভাবনাচিন্তা করার সময় পাওয়া যাবে! কিন্তু এখন—আহা, ওকে যত দেখছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি!"

"তার মনের ভেতরে ভয়ঙ্কর তোলপাড় চলছে, কিন্তু এরই মধ্যে এক ফাঁকে সে তার টাকার অর্ধেকটা আলাদা করে রাখল, কোথায় আবার লুকিয়েও ফেলল। বাপের বালিশের তলা থেকে সবেমাত্র যে তিন হাজার সরিয়েছিল এরই মধ্যে পুরোপুরি তার অর্ধেকটা যে কোথায় হাওয়া হয়ে যেতে পারে এছাড়া তো আমি তার আর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। মোক্রয়েতে সে এই প্রথম নয়, এর আগেও পুরো দুদিন ধরে সে ওখানে হুল্লোড়বাজি করেছে। হোটেলের পুরনো বড়ো কাঠের বাড়িটা, বাড়ির ভেতরকার যত অলিগলি, অলিন্দ, বাইরের অংশের যত চালাঘর সবই তার ভালো জানা ছিল। আমার অনুমান, তখনই কোনো এক সময়, গ্রেপ্তার হওয়ার সামান্য কিছু আগে ওই বাড়িটার মধ্যেও কোথায় টাকার একটা অংশ লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল—হতে পারে কোন ফাঁকফোকর বা খোঁড়লের মধ্যে, ওখানকারই কোনো মেঝের তলায়, কোনো একটা কোনায় বা বাইরের কোনো চালাঘরের চালের বাতার নিচে। বলবেন, কেন? কেন আবার? বিপর্যয় এই এখুনি ঘটে যেতে পারে। বলাই বাহুল্য, কী ভাবে তার মোকাবিলা কর যাবে সেটা এখনও ভালোমতো ভেবে দেখা হয়নি, তাছাড়া সে ফুরসৎও আমাদের নেই, এদিকে মাথার ভেতরটা দপ্দপ্ করছে, আবার মনটাও সেই *তার* দিকেই টানছে, তবে হ্যাঁ টাকা—টাকা যে কোনো পরিস্থিতিতেই আবশ্যক! টাকাপয়সাওয়ালা মানুষ সর্বত্রই মানুষ বলে গণ্য। ওরকম একটা সময়ে এ ধরনের হিসেবি বুদ্ধি আপনাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে—ঠিক কিনা? কিন্তু দেখুন না, সে নিজেই তো আমাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করছে যে এই ঘটনার আরও এক মাস আগে তার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও মারাত্মক এই রকম একটা মুহূর্তে সে তিন হাজার থেকে অর্ধেকটা ভাগ করে সেই টাকাটা তার তাবিজের থলের ভেতরে সেলাই করে রেখে দিয়েছিল। আর এটা যদি সত্য না হয়—অবশ্যই যে সত্য নয় তা আমরা এখন প্রমাণও করব—তাহলেও এই আইডিয়াটা কারামাজভের পরিচিত এবং এই নিয়ে সে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তাও করেছিল। শুধু তাই নয়, পরে যখন সে তদন্তকারীর মনে এই বলে বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করেছিল যে দেড় হাজার আলাদা করে তাবিজের থলের মধ্যে রেখেছিল তখন দেখা গেল ওরকম কোনো থলের কোনো অস্তিত্বই কখনও ছিল না; সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে ওই থলের কথাটা তার মাথা থেকে তক্ষুনি মুহূর্তের প্রেরণা বশে বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল ঠিক এই কারণেই যে এর ঘণ্টা দুয়েক আগে সে অর্ধেক

টাকা আলাদা করে মোক্রয়েতেই কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল—সাবধানতার খাতিরে, যাতে অন্তত সকাল পর্যন্ত তার নিজের কাছে না রাখতে হয়। এ কাজটা সে করেছিল অকস্মাৎ একটা চিন্তার উদয় হতে, তারই প্রেরণাবশত। দুদিকের কোনোটারই কোনো তল নেই, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্য মহোদয়বৃন্দ, আপনাদের মনে আছে তো কারামাজ়ভ্ এমন জিনিসের ধ্যান করতে পারে যার দুদিকের কোনোটারই কোনো তল নেই, আর দুটোর ধ্যান সে একই সঙ্গে করতে পারে!

"আমরা ওই বাড়িতে খুঁজে দেখেছি, খুঁজে কিছু পাইনি। হতে পারে ওই টাকাগুলো এখনও ওখানে আছে, আবার এমনও হতে পারে যে পরদিনই অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এখন আসামির কাছে আছে। সে যাই হোক, তাকে যখন গ্রেপ্তার করা হল তখন সে তার প্রণয়িনীর পাশেই ছিল, তার সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রণয়িনীটি শয্যায় শুয়ে ছিল, আর সে তার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মুহূর্তে সব কিছু ভুলে এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য যে লোকজন এগিয়ে আসছে তা সে টেরই পায়নি। সে তখনও উত্তরের জন্য মনে মনে কিছু ঠিক করে উঠতে পারেনি। যেমন সে, তেমনি তার বুদ্ধিও অতর্কিতে ধরা পড়ে গেল। এখন এই যে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি তার ভাগ্যনিয়ন্তা বিচারকদের সামনে।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এমন এমন মুহূর্ত আসে যখন আমাদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এমন লোকেরও মুখোমুখি হতে হয় যার সামনে আমরা নিজেরাই প্রায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, আবার তার দশা ভাবলেও আমাদের ভয় হয়! এই মুহূর্তগুলি জৈব বিভীষিকা অনুধাবনের সেই সব মুহূর্ত যখন অপরাধী ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছে সব গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জুঝে চলে—তখনও আপনার সঙ্গে জোঝার অভিলাষ তার যায় না। এই মুহূর্তগুলি সেই সব মুহূর্ত যখন তার আত্মরক্ষার সমস্ত রকম সহজাত প্রবৃত্তি একযোগে তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী, প্রশ্নসূচক ও ব্যথাতুর দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে, আপনার মনের ভাব ধরার চেষ্টা করে, আপনাকে, আপনার চোখমুখের অভিব্যক্তি, আপনার ভাবনা চিন্তা অনুসন্ধান করে দেখতে থাকে, অপেক্ষা করে থাকে কোন্ পাশ থেকে আপনি আঘাতটা হানবেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তার বিক্ষিপ্ত মনের ভেতরে গড়ে ওঠে হাজার হাজার পরিকল্পনা। কিন্তু তাহলেও মুখে কিছু বলতে সে ভয় পায়, তার ভয় হয় পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে! মানবাত্মার এই সমস্ত অবমাননাকর মুহূর্ত, তার এই অগ্নিপরীক্ষা, আত্মরক্ষার এই জৈব তাগিদ—এ বড়ো ভয়ঙ্কর! এমনকি অনেক সময় তদন্তকারীকেও শিহরিত করে তোলে, অপরাধীর প্রতি তার সমবেদনার উদ্রেক করে! তখন আমরা ঠিক এই জিনিসটারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।

প্রথমে সে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, আতঙ্কে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'রক্ত! আমার প্রাপ্য ছিল!'—এরকম কয়েকটি শব্দ, যা তাকে বেশ ভালোভাবেই ডুবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পড়ে বেশ তাড়াতাড়ি সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। কী বলবে, কী জবাব দেবে—এসব তখনও তার তৈরি ছিল না, কিন্তু তৈরি ছিল মাত্র অস্বীকৃতির একটা ফাঁকা বুলি 'বাবার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই!' তার তখনকার মনোভাবটা যেন এই যে আপাতত এই হল আমাদের প্রাচীর। পরে দেখা যাবে, প্রাচীরের ওধারে আমরা হয়তো ব্যারিকেড বা ওই গোছের কিছু একটা গড়ে তুললেও তুলতে পারি। প্রথমেই চেঁচিয়ে যে কথাটি বলে ফেলে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন তোলার আগেই তাড়াতাড়ি করে সে তার এই ব্যাখ্যা দিল যে শুধু ভৃত্য গ্রিগোরির মৃত্যুর জন্যই সে নিজেকে দায়ী মনে করে। 'হ্যাঁ এই রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী। কিন্তু ভদ্রমহোদয়রা, তাহলে বাবাকে কে খুন করল? কে? *আমি যদি না হই* তাহলে আর কেই বা হতে পারে?' আপনারা শুনলেন তো, প্রশ্ন সে করছে কি না আমাদেরই, আমরা যারা কি না ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়েই ওর কাছে এসেছি! আপনারা শুনলেন তো আগ বাড়িয়ে কী কথাটা সে বলল?—'আমি যদি না হই!'—শুনলেন এই জৈব প্রকৃতির ধূর্ততা, এই সরল বিশ্বাস, এই কারামাজভীয় অসহিষ্ণুতা? আমি খুন করিনি, ভুলেও কখনও ভেবো না যে আমি 'খুন করতে চেয়েছিলাম ভদ্রমহোদয়রা, খুন করতে চেয়েছিলাম।' তাড়াতাড়ি এটা স্বীকার করে নিল কী তাড়া, কী ভীষণ তাড়া, দেখছেন! 'কিন্তু যা-ই বলুন না কেন, আমি দোষী নই, আমি খুন করিনি!' সে আমাদের কাছে যেটা মেনে নিয়েছে তা এই যে খুন করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ 'নিজেরাই দেখছেন তো আমি কত অকপট, তাই চটপট বিশ্বাস করে নিন যে আমি খুন করিনি।' কী বলব আপনাদের! এ সব ক্ষেত্রে অপরাধী অনেক সময় অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্পবুদ্ধি এবং অনায়াসে বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠে।

"এই জায়গায় এসে তদন্তকারী আইনজীবীদের একজন যেন কিছু না ভেবেচিন্তেই আচমকা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন 'তাহলে স্মের্দিকোভ্ খুন করেনি তো?' আমাদের যা প্রত্যাশিত ছিল ঠিক তা-ই ঘটল আমরা যে তার মনের কথাটা আগেই ধরে ফেলেছি, স্মের্দিকোভের প্রসঙ্গটা ওঠা যখন খুবই স্বাভাবিক হতে পারত সেই মুহূর্তটি বেছে নিয়ে সেটা ধরে মানসিক ভাবে তাকে প্রস্তুত হওয়ার অবকাশ না দিয়ে আমরা যে অতর্কিতে তাকে ধরে ফেলেছি তাতে সে ভয়ঙ্কর খেপে গেল। যেমন তার স্বভাব—সঙ্গে সঙ্গে সে চরমে পৌঁছে গেল—নিজেই সর্বতোভাবে আমাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল যে স্মের্দিকোভ্ খুন করতে পারে না, সে ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করবেন না, এটা তার একটা চালাকি মাত্র। আসলে কিন্তু স্মের্দিকোভের ব্যাপারটা সে মোটেই অস্বীকার করছে না, বরং পরে দেখা যাবে সেই প্রসঙ্গটার সে উত্থাপন করছে, কারণ তাকে ছাড়া

আর কাকেই বা সে টেনে আনবে? তবে তা সে করবে অন্য আরেকটি মুহূর্তে, কারণ আপাতত, এখনকার মতো ব্যাপারটা বানচাল হয়ে গেল। প্রসঙ্গটা সে টেনে আনবে সম্ভবত মাত্র পরের দিন, অথবা এমনকি হয়তো কয়েক দিন বাদে, এমন একটা সুযোগ খুঁজে নিয়ে যখন সে নিজেই চেঁচিয়ে আমাদের বলতে পারবে 'কেমন, দেখলেন তো ? আপনাদের থেকে বেশি করে আমি নিজেই স্মের্দিকোভের ব্যাপারটা অস্বীকার করেছিলাম—আপনাদের নিজেদেরই সেটা মনে থাকার কথা। কিন্তু এখন সেই আমিই এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছি যে সে-ই খুন করেছে, সে ছাড়া আর কেউ না!' তবে আপাতত যখন সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষণ্ণ ধরনের ও বিরক্তিকর অস্বীকৃতির মধ্যে পড়ে গেছে তখন সে যে কী রকম জানলা দিয়ে উঁকি মেরে তার বাবাকে দেখতে গিয়েছিল এবং শিষ্টাচার বজায় রেখে জানলা থেকে সরে গিয়েছিল অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ কিন্তু তাকে চুপিচুপি তার একটা অতি আনাড়ি ও অবিশ্বাস্য ধরনের ব্যাখ্যা দিতে তাকে প্রবৃত্ত করল। যেটা বড়ো কথা সেটা এই যে সে তখনও পরিস্থিতির কথা কিছুই জানে না এবং জ্ঞান ফিরে আসার পর গ্রিগোরি যে কত দূর কী সাক্ষ্য দিয়েছিল তার বিন্দুবিসর্গ তার জানা ছিল না।

"আমরা অনুসন্ধান ও তল্লাশির কাজে নামলাম। আমাদের অনুসন্ধান তার রোষোদ্রেক করে, তবে সেই সঙ্গে তাকে উৎফুল্লও করে তোলে তিন হাজারের সবটা তল্লাশি করে খুঁজে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে মাত্র দেড় হাজার। বলাই বাহুল্য, মাত্র ক্রুদ্ধ নীরবতা ও অস্বীকৃতির ঠিক এই মুহূর্তটিতে জীবনে এই প্রথম তাবিজের থলে সম্পর্কে আইডিয়াটা তার মনের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল! নিঃসন্দেহে এই উদ্ভাবনাটি যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হবে না তা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিল, তাই কী করে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়, এমন ভাবে বানানো যায় যাতে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য একটা রোমান্সের মতো হয়ে ওঠে কষ্ট করে, খুবই কষ্ট করে তাকে এসব ভাবতে হয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে একজন তদন্তকারী আইনজীবীর সর্বপ্রথম কাজ এবং প্রধানতম কর্তব্য হল আসামিকে প্রস্তুত হওয়ার অবকাশ না দেওয়া, তার ওপর অতর্কিতে এমন ভাবে হামলে পড়া যাতে সে তার সযত্নে লালিত সমস্ত আইডিয়া এমন ভাবে প্রকাশ করে ফেলে যে সেগুলির অন্তর্নিহিত যত সরল ভাব, অসম্ভাব্যতা ও পরস্পরবিরোধিতা সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে। অপরাধীকে দিয়ে কথা বলাতে হলে একমাত্র যেটা করা দরকার তা হল আচমকা, যেন কিছু না ভেবেচিন্তেই এমন কোনো নতুন তথ্য বা পরিস্থিতির কথা তার গোচরীভূত করা যা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ, অথচ যার সম্পর্কে কোনো ধারণা এর আগে পর্যন্ত তার ছিল না এবং যা কস্মিনকালে তার বিচারবিবেচনার মধ্যে ছিল না। এরকম একটা তথ্য আমাদের তৈরি ছিল, অনেক দিন হলই তৈরি ছিল। সেটা ছিল আসামি যে দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেই খোলা দরজার

প্রসঙ্গ যার উল্লেখ ভৃত্য গ্রিগোরি সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর তার এজাহারে করেছিল। এই দরজাটার কথা সে একদম ভুলেই গিয়েছিল, আর গ্রিগোরি যে দেখতে পারে সেটা সে অনুমান করতে পারেনি।

"এর ফল কিন্তু দারুণ হল। আসামি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে উঠল : 'এটা স্মের্দিকোভের কাজ! স্মের্দিকোভ্ই খুন করেছে!—এখানেই সে নিজেকে ধরিয়ে দিল। বেরিয়ে পড়ল তার সযত্নে লালিত আসল চিন্তাটি যার ধাঁচের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো বালাই ছিল না, কেন না স্মের্দিকোভ্ যদি খুন করত তাহলে আসামি যখন গ্রিগোরিকে ধাক্কা মেরে দেয়াল থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল একমাত্র তার পরই তাকে সেটা করতে হয়। আমরা যখন তাকে জানালাম যে গ্রিগোরি পড়ে যাবারও আগে দরজাটা খোলা থাকতে দেখেছিল এবং সে তার শোবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় পার্টিশনের ওপাশে স্মের্দিকোভ্‌কে কাতরাতে শুনেছিল, তখন কারামাজভ্ একেবারে মুষড়ে পড়ল। ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী, আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী নিকলাই পার্‌ফেনভিচ্ পরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে সেই মুহূর্তটিতে আসামির অবস্থা দেখে করুণায় তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ঠিক তখনই ব্যাপারটা শোধরানোর জন্য আসামিও চটপট ওই সর্বজনবিদিত তাবিজের কথাটি আমাদের জানাল ভাবটা এই যে তা তো হল, এই উপাখ্যানটা তো শুনুন!

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি কেন যে মনে করি ঘটনার এক মাস আগে তাবিজের মধ্যে সেলাই করে রাখা টাকার এই বানানো গল্পটা শুধু উদ্ভটই নয়, এমনকি বর্তমান পরিস্থিতিতে যা যা টেনে আনা সম্ভব ছিল সেগুলির মধ্যেও যতদূর হতে পারে অবিশ্বাস্য মিথ্যা কল্পনা—আমার সে চিন্তা আমি ইতিপূর্বেই আপনাদের কাছে ব্যক্ত করেছি। এমনকি চূড়ান্ত রকমের অসম্ভাব্য কোনো কিছু ভাবার ও বলার ওপরে যদি বাজি ধরা যায় তাতেও এর চেয়ে মন্দ আর কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বড়ো কথা এই যে সাফল্যে উল্লসিত এই রম্য কাহিনি রচয়িতাকেও বসিয়ে দেবার, তাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেবার একটা উপায় আছে—সেটা হল তথ্যের খুঁটিনাটি। এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলির কারণেই বাস্তব জীবন সব সময় এত সমৃদ্ধ। কিন্তু যারা বাধ্য হয়ে এই সমস্ত রম্য কাহিনি রচনা করে সেই হতভাগ্য মানুষগুলির আবার সব সময় ওই খুঁটিনাটির প্রতিই দারুণ অবজ্ঞা—যেন ওগুলি নেহাৎই নগণ্য ও অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ বিষয়—এমনকি তাদের মাথাতেও সেগুলি কখনও আসে না। সেই মুহূর্তে এর পেছনে সময় নষ্ট করতে তাদের বয়েই গেছে! তাদের যা বুদ্ধি তা কেবল সামগ্রিকভাবে অভিনব বস্তুই নির্মাণ করে থাকে—কার এমন স্পর্ধা যে এ হেন তুচ্ছ বিষয়ের ওপর মন দিতে বলে! কিন্তু ঠিক এখানেই তারা ধরা পড়ে যায়! আসামিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'তা আপনার ওই তাবিজের থলে বানানোর কাপড় আপনি কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন বলবেন

কি? কে-ই বা আপনাকে সেলাই করে দিল?' নিজেই সেলাই করে নিয়েছিলাম।'—কিন্তু কাপড় কোথায় পেলেন বলবেন কি?' এবারে আসামি অপমানিত বোধ করল, তার মনে এটা এমনই একটা তুচ্ছ বস্তু যে এর উত্তর দেওয়াটা তার পক্ষে প্রায় অপমানজনক। বিশ্বাস করবেন কি, এটা তার আন্তরিক বিশ্বাস! কিন্তু এরা সবাই এরকমই হয়ে থাকে। 'আমি আমার জামা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলাম!'—'খুব ভালো কথা, তাহলে তো কালই আপনার জামাকাপড়ের ভেতর থেকে আমরা খুঁজে বের করতে পারব সেই জামাটা যেখান থেকে আপনি টুকরো ছিঁড়ে বের করেছিলেন।' একবার ভেবে দেখুন জুরিমণ্ডলীর মহোদয়বৃন্দ—আর সে রকম কোনো জামার যদি সত্যি সত্যি কোনো অস্তিত্ব থাকত তাহলে তার বাক্সে বা দেরাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও খুঁজে না পাবারই বা কী আছে?—তাহলে তো সেটাই একটা প্রামাণিক তথ্য হতে পারত, তার বক্তব্যের সমর্থনে একটা শক্ত প্রমাণ হতে পারত! কিন্তু এটা তার পক্ষে আর কল্পনা করা সম্ভব হল না। 'আমার ঠিক মনে নেই, হয়ত জামা না, হতে পারে বাড়িউলির মাথার কোনো কাপড় ছিঁড়ে তার টুপির মধ্যে সেলাই করে রেখেছিলাম।'—'কী ধরনের টুপি সেটা।' আমি ওর ঘর থেকে তুলে নিয়েছিলাম। ক্যালিকো কাপড়ের কোথাকার কোন্ এক রদ্দি মাল।'—'এটা কি আপনার স্পষ্ট মনে আছে?'—'না স্পষ্ট মনে করতে পারছি না। রাগ তার ক্রমাগত চড়তেই থাকে। অথচ এদিকে একবার ভেবে দেখুন মনে না করার কী আছে বলুন তো? মানুষের জীবনের এক চরম ভয়াবহ মুহূর্তে, যখন তার দণ্ডবিধান হতে চলেছে এরকম সব ছোটোখাটো জিনিস তখন মনে হবে না তো কবে হবে? সে সব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা দিয়ে যেতে একবার কোনো এক বাড়ির একটা সবুজ চালা এক ঝলক তার চোখে পড়েছিল অথবা একটা ক্রুসের ওপর বসে থাকা একটা দাঁড়কাক—এগুলো কিন্তু সে ঠিক মনে করতে পারবে। সে যদি বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে গোপনে তার ওই তাবিজের থলেটা সেলাই করে থাকে তাহলে তো তার মনে থাকারই কথা যে ছুঁচ সুতো হাতে পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে সেই ভেবে কী দারুণ লজ্জায় ও ভয়ে সে মরে যাচ্ছিল, সামান্য শব্দে চমকে উঠে পার্টিশনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল!... প্রসঙ্গত তার ঘরের মাঝখানে একটা পার্টিশন আছে।

"কিন্তু জুরিমণ্ডলীর মহোদয়বৃন্দ, এত সব খুঁটিনাটি, সামান্য ছোটোখাটো এত সব ব্যাপার আমি কেন আপনাদের জানাচ্ছি!'' ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ হঠাৎ বলে উঠল। "বলছি ঠিক এই কারণেই যে আসামি একেবারে এই মুহূর্তটি পর্যন্ত তার যত উদ্ভট চিন্তা জেদ ধরে আঁকড়ে পড়ে আছে। এই পুরো দু মাসের মধ্যে, তার পক্ষে সর্বনাশা সেই রাতটি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো কিছুর ব্যাখ্যা সে দেয়নি, ইতিপূর্বে সে তার সাক্ষ্যে স্বকপোলকল্পিত যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করেছিল সেগুলি একটারও পেছনে বাস্তব অবস্থার সমর্থনসূচক কিছুই সে যোগ

করতে পারেনি। ভাবটা এই যে ওসব নিতান্তই মামুলি ব্যাপার, আমার মান সম্ভ্রমের খাতিরে আমাকে বিশ্বাস করুন! আরে বিশ্বাস করতে পারলে তো আমরা খুশিই হব! বিশ্বাস করার জন্য আমরা লালায়িত হয়ে আছি—এমন কি পারলে মান সম্ভ্রমের খাতিরেই করি! আমাদের ভেবেছে কী? আমরা মানুষের রক্তের জন্য লোলুপ শেয়াল কুকুর নাকি? দিন না, আসামির অনুকূলে অন্তত একটি তথ্যও আমাদের দেখান না—আমরা তাতে আনন্দিতই হব। কিন্তু আসামির মুখের ভাব দেখে তার আপন ভাইটির যে সিদ্ধান্ত, অথবা আসামি যে নিজের বুকে করাঘাত করেছিল—তাও আবার কিনা অন্ধকারের মধ্যে—সেদিকে আঙুল দেখিয়ে এমন কথা বলা যে নির্ঘাত বুকের ওপর ঝোলানো তাবিজের থলেটা দেখিয়েই সে তা করেছিল—এই ধরনের তথ্য না হয়ে সেই তথ্যকে অবশ্যই বোধগম্য ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। নতুন কোনো তথ্য পেলে আমরাই আনন্দিত হব, আমরাই প্রথম আমাদের অভিযোগ তুলে নেব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে নেব। কিন্তু এখন আর্তচিৎকার করছে ন্যায়বিচার, তাই আমরা এত জোর করছি, আমরা কোনো কিছুকেই অগ্রাহ্য করতে পারছি না।"

এবারে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ উপসংহারের, অংশে চলে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন জ্বরের ঘোরে আছেন। 'ডাকাতি করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে' ছেলে বাপের রক্তপাত ঘটিয়েছিল, বাপকে খুন করেছিল এর জন্য তাঁর কণ্ঠে আর্তচিৎকার ঝরে পড়ল। তথ্যের বিপুল সমাবেশ যে কী পরিমাণ ট্র্যাজিক ও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হয়ে উঠছে দৃঢ়তার সঙ্গে সে দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

"তাই প্রতিভার জন্য যাঁর এত খ্যাতি, আসামির পক্ষ সমর্থনকারী আমাদের সেই স্বনামধন্য আইনজীবীর মুখ থেকে আপনারা যা-ই শুনুন না কেন", আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ বলে উঠল, 'মর্মস্পর্শী ও ওজস্বী ভাষায় আপনাদের দরদি মনের কাছে যত আবেদনই করা হোক না কেন, সে রকম যত আবেদনই এখানে ধ্বনিত হোক না কেন, একটা কথা কিন্তু আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না—এই মুহূর্তে আপনারা ন্যায়বিচারের পুণ্য মন্দিরে অবস্থান করছেন। মনে রাখবেন, আপনারা আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের পুণ্যভূমি রাশিয়া ও তার ভিত্তিভূমির, তার পরিবারের এবং তার যা কিছু পবিত্র আপনারাই সে সবের রক্ষাকর্তা! হ্যাঁ আপনারা এখানে উপস্থিত মুহূর্তে রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আপনারা যে রায় দেবেন তার প্রতিধ্বনি শুধু এই কক্ষে নয়, রাশিয়ার দিক দিগন্তে ধ্বনিত হবে, সারা রাশিয়া আপনাদের তার রক্ষাকর্তা ও বিচারক রূপে গণ্য করে আপনাদের কথা শুনবে, আপনাদের রায় তাদের হতাশ করতে পারে আবার উৎসাহিতও করতে পারে। তাই বলছি রাশিয়াকে কষ্ট দেবেন না, তাকে নিরাশ করবেন না। আমাদের সর্বনাশা ত্রোইকা গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ধেয়ে চলেছে—কে বলতে পারে, হয়তো ধ্বংসের দিকে। আজ অনেক কাল হল সারা রাশিয়ায়

সর্বত্র লোকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে দু হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এই উন্মত্ত ও অসংযত গতিকে থামাতে বলছে। আর উর্ধ্বশ্বাস গতিতে ধাবমান এই গাড়ির সামনে পড়ে অন্য জাতির লোকেরা যদি আপাতত সরেও দাঁড়ায়ও[৭ঃ] সেটা সম্ভবত তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত আদৌ নয়—যা আমাদের কবির[৭ঃ] আকাঙ্ক্ষিত ছিল—হয়ত বা স্রেফ আতঙ্কিত হয়ে—খেয়াল রাখবেন কিন্তু। আতঙ্কিত হয়ে আবার এমনও হতে পারে যে ঘৃণায় শিহরিত হয়ে—তাও ত ভালো যে সরে দাঁড়াচ্ছে, বলা যায় না, তেমন মতি হলে সরে না দাঁড়িয়ে ওই ধাবমান অপচ্ছায়ার সামনে সুদৃঢ় প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে পড়বে, নিজেদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে, শিক্ষার আলোক ও সভ্যতাকে বাঁচানোর উদেদশ্যে তারা নিজেরাই আমাদের লাগামছাড়া উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত গতিবেগকে রোধ করবে। এরকম উদ্বেগ আমরা ইতিমধ্যে ইউরোপের কণ্ঠে শুনতে পেয়েছি। তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও শুরু হয়ে গেছে। তাদের আর প্রলোভন দেখাবেন না, নিজের ছেলের হাতে বাপের খুন হওয়ার পক্ষে রায় দিয়ে তাদের ক্রমবর্ধমান ঘৃণা সঞ্চয় করবেন না!

এক কথায়, ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ যদিও অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন তবু তিনি তাঁর ভাষণের যে উপসংহার টানল তা উদ্দীপনাময় হয়েছিল। যে প্রভাব তিনি সঞ্চার করলেন তা বাস্তবিকই অসাধারণ ছিল। তিনি নিজে তাঁর ভাষণ শেষ করার পর তাড়াতাড়ি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং—আমি আগেও উল্লেখ করেছি—পাশের ঘরে যাবার সঙ্গে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। আদালত কক্ষে কোনো করতালিধ্বনি পড়েনি, তবে যারা সিরিয়াস ধরনের লোকজন তারা সকলে সন্তুষ্ট, একমাত্র মহিলারাই তেমন একটা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কিন্তু তাহলেও তাঁর বাগ্মিতা তাঁদের পছন্দ হয়েছিল, বিশেষত এই কারণে যে পরিণামে কী হবে এই নিয়ে তাঁদের মনে কোনও শঙ্কা ছিল না এবং ফেতিউকভিচের ওপর তাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল। 'যাক, শেষ কালে উনি মুখ খুলবেন! আর দেখতে হবে না, উনি সবার ওপর টেক্কা মারবেনই!'

সকলে থেকে থেকে মিতিয়াকে দেখতে লাগল। প্রসিকিউটর যতক্ষণ তার ভাষণ দিচ্ছিলেন সেই সময় মিতিয়া চোখ মাটিতে নামিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে দু হাত মুঠো করে চেপে সারাক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। কেবল কদাচিৎ মাথা তুলে কান পাতছিল। বিশেষত যখন গ্রুশেন্‌কার কথা হচ্ছিল। প্রসিকিউটর যখন গ্রুশেন্‌কা সম্পর্কে রাকিতিনের অভিমতের কথা বলছিল তখন মিতিয়ার মুখে প্রবল ক্রোধ ও অবজ্ঞামিশ্রিত একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল, অস্ফুটস্বরে বলে উঠেছিল 'বের্নারের জাত!'—যে ভাবে বলেছিল তা লোকের শোনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মোক্রয়েতে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ নিজে যেভাবে মিতিয়াকে জেরা করেছিল এবং তার জেরবার করে দিয়েছিলেন ভাষণের মধ্যে তিনি যখন তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন

তখন মিতিয়া মাথা তুলল, ভীষণ কৌতূহল নিয়ে কান পেতে শুনতে লাগল। ভাষণের এক জায়গায় মনে হল এই বুঝি সে লাফিয়ে উঠবে, চেঁচিয়ে কিছু একটা যেন বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল, কেবল অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকাল। ভাষণের এই উপসংহার সম্পর্কে, বিশেষত মোক্রয়েতে আসামিকে জেরা করার সময় প্রসিকিউটরের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে পরে আমাদের স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, লোকে এই প্রসঙ্গে ইপ্পলিত কিরিল্লভিচকে নিয়ে এই বলে হাসাহাসিও করেছিল যে 'লোকটা তার ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করার লোভ সামলাতে পারল না।'

বিচারসভার অধিবেশন আপাতত মুলতুবি রাখা হল—তবে খুব অল্প সময়ের জন্য—মিনিট পনেরো, বড়ো জোর কুড়ি মিনিটমতন সময়ের জন্য। উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে নানা রকম কথাবার্তা ও উচ্ছ্বাসের গুঞ্জন উঠল! সেগুলির কিছু কিছু আমার মনে আছে।

"বেশ সিরিয়াস বক্তৃতা কিন্তু!" একটা দলের মধ্যে এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন।

"খুব ঠেসে মনস্তত্ত্বের কথা ঢুকিয়েছেন বটে", আরেকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তা যা-ই বলুন না কেন, সব সত্য, অকাট্য সত্য!"

"হ্যাঁ, ওস্তাদ লোক বলতে হয়!"

"সব মিলিয়ে মোদ্দা কথাটা বললেন কিন্তু।"

"আমাদের সম্পর্কে, আমাদের সম্পর্কেও কিন্তু মোদ্দা কথাটা বলে দিয়েছেন", তৃতীয় আরেকজন গলা মিলিয়ে বলল, "মনে আছে, বক্তৃতার শুরুতে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন না, আমরাও সবাই ওই ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের মতো?"

"সে তো শেষেও বলেছিলেন। তবে ওসব একদম বাজে কথা।"

"তা হ্যাঁ, অস্পষ্টতাও ছিল।"

"বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন।"

"ন্যায্য কথা বলেননি। কথাটা ন্যায্য বলেননি।"

"কিন্তু না, মানতেই হবে বেশ চালাকি খাটিয়েছেন। এর জন্য মানুষটিকে অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এখন সুযোগ পেয়ে বলে ফেললেন। হে-হে!"

"প্রতিবাদী কৌঁসুলি এখন কী বলবেন?"

আরেকটি জটলার মধ্যে

"কিন্তু 'আপনাদের দরদি মনের কাছে যত আবেদনই করা হোক' বলে পেতের্বুর্গের ভদ্রলোকটিকে যে তিনি এইমাত্র ঠুকলেন এটা যা-ই বলুন ঠিক হল না। মনে আছে?"

"তা ঠিক, ওটা বেয়াড়া ধরনের হয়ে গেছে।"

"বড্ড তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন।"

"নার্ভাস লোক।"

"আচ্ছা আমরা তো এখানে খুব হাসাহাসি করছি, কিন্তু আসামির অবস্থাটা কী?"

"যা বলেছেন মশাই। ওই মিতিয়া না কে, তার কথা বলছেন তো?"

"কে জানে এখন প্রতিবাদী কৌঁসুলি কী বলেন?"

তৃতীয় জটলাটিতে

"লর্নেট গ্লাস চোখের সামনে ধরে এ আবার কোনো ভদ্রমহিলা?—ওই যে মুটকি, ওখানে ধারে বসে রয়েছে?"

"ও এক জেনারেলের বৌ। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমি ওকে জানি।"

"তাই বল, ওই জন্যই লর্নেট নিয়ে এসেছে!"

"না, কাজের কিছু নয়।"

"আরে না, বেশ টক-ঝাল-মিষ্টি।"

"ওর কাছে, দুটো আসন পরে বসে আছে হালকা বাদামি চুলের একজন, ওটা বরং ভালো।"

"মোক্রয়েতে কিন্তু তখন ওকে বেশ কায়দা করে ধরে ফেলেছিল—তাই না?"

"কায়দা করে তো কায়দা করে—ও আমরা আগেও শুনেছি। আবারও বলতে যাওয়া কেন বাপু? এখানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এর মধ্যে তো কতবার বলা হয়ে গেছে!"

"এবারেও লোভ সামলাতে পারল না। এক ধরনের আত্মগরিমা।"

"ঘা খাওয়া লোক কিনা, হে-হে!"

"স্পর্শকাতর বটে। কথার জৌলুসও কম নয়। কী বিশাল বিশাল একেকটা বাক্য!"

"আবার ভয়ও দেখাচ্ছে কেমন! খেয়াল করেছেন? খালি ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। ত্রোইকার কথাটা—মনে আছে ত? 'ওদের হ্যামলেট আছে, আমাদের আপাতত আছে কারামাজভ্‌রা!' এটা কিন্তু বেশ বলেছে।"

"ওটা বলে একটু উদারনীতির ধোঁয়া টেনে দেখানো আর কি। ভয় পায়।"

"হ্যাঁ, এডভোকেটকেও ভয় পাচ্ছে।"

"তা বটে, মিস্টার ফেতিউকভিচ্ আবার কী বলেন?"

"সে যা-ই বলুন না কেন, আমাদের চাষাভুসোদের ও দিয়ে ঘায়েল করা যাবে না।"

"আপনি তা-ই মনে করেন বুঝি?"

চতুর্থ জটলাটিতে

"ত্রোইকা সম্পর্কে কথাটা কিন্তু বেশ বলেছেন! ওই যে যেখানে অন্য সব জাতির কথা বলেছেন।"

"এটাও কিন্তু সত্যি—ওই যে, মনে আছে তো—যেখানে উনি বললেন যে অন্য জাতিরা দাঁড়িয়ে দেখবে না?"

"মানে? কী বলতে চাও?"

"আরে ইংলিশ পার্লামেণ্টে এই গত সপ্তাহে একজন মেম্বার উঠে দাঁড়িয়ে নিহিলিস্টদের প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রিসভাকে প্রশ্ন করেছিল বর্বর জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে নামার এখনও কি সময় হয়নি আমাদের? ইপ্পলিত তার কথা মনে করেই বলেছিলেন, নির্ঘাত তার কথা মনে করে। গত সপ্তাহে একথা বলছিলেন বটে।"

"অনেক দূরের পথ।"

"কীসের দূরের পথ? দূরের পথ হতে যাবে কেন?"

"কেন? আমরা তাহলে ক্রন্‌শটাট[৭৫] বন্ধ করে দেবে। কোনও খাদ্যশস্য ওদের দেব না। পাবে কোথায়, শুনি?"

"কেন? আমেরিকায় পাবে। আজকাল তো আমেরিকাতেই পাওয়া যায়।"

"বাজে বোকো না।"

দেখতে দেখতে ঘণ্টা বেজে উঠল, সবাই যার যার জায়গার দিকে ছুটল। বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে উঠলেন ফেতিউকভিচ্‌।

## দশ

## প্রতিবাদী কৌঁসুলির সওয়াল

### শাঁখের করাত

প্রখ্যাত বক্তার মুখ থেকে প্রথম শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র নিস্তব্ধতা নেমে এলো। আদালতকক্ষে উপস্থিত সকলের স্থিরদৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। একেবারে সোজাসুজি ও সহজ সরল ভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করলেন, কিন্তু ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র সেখানে ছিল না। না বাকচাতুর্য, না কোন ভাবাবেগ, না কথায় কথায় অনুভূতির কাছে আবেদন—কোনোটারই কোনো নামগন্ধ নেই। লোকটি তার সহকর্মী লোকজনের অন্তরঙ্গ মহলে মুখ খোলার মতো মানুষ। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর, উদাত্ত, প্রীতিকর, এমনকি সময় সময় সেই কণ্ঠস্বরের মধ্যেই যেন আন্তরিক, খোলামেলা কিছু একটা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে বক্তা হঠাৎ করে সত্যিকারের আবেগের মাত্রায় উঠে যেতে পারেন এবং 'কোনো এক অজ্ঞাত শক্তির সাহায্যে মানুষের হৃদয়ে ঘা মারতে পারেন।' তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটা হয়তো ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের তুলনায়ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল,

কিন্তু কোনো দীর্ঘ বাক্য তাঁর কথার মধ্যে ছিল না, এমনকি অনেক বেশি যথাযথ। একটা জিনিস মহিলাদের পছন্দ হচ্ছিল না, বারবার, বিশেষত বক্তৃতার সূচনায় তিনি কেমন যেন পিঠ বাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ছিলেন—নুইয়ে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে ঠিক নয়, দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর শ্রোতাদের ওপর উড়ে পড়তে যাচ্ছেন। তায় আবার তাঁর লম্বাটে পিঠের অর্ধেকটাই এমন ভাবে বাঁকিয়ে নুইয়ে পড়ছিল যেন তাঁর ওই ছিপছিপে লম্বা পিঠটার মাঝামাঝি জায়গায় কব্জা জাতীয় কিছু একটা বসানো আছে, যার ফলে ওটা প্রায় সমকোণে বাঁকানো সম্ভব।

গোড়ায় তিনি কথা বলছিলেন কেমন যেন এলোমেলো, মনে হচ্ছিল যেন নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি না মেনে একের পর এক বিচ্ছিন্ন ভাবে টুকরো টুকরো তথ্য তুলে ধরছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে তারই মধ্য থেকে ফুটে উঠল একটি সামগ্রিক রূপ। তাঁর বক্তৃতা দুটি অংশে ভাগ করা গেলেও যেতে পারে প্রথম অংশে ছিল সমালোচনা, অভিযোগ খণ্ডন—অনেক সময় কটু ও তীব্র শ্লেষাত্মক। কিন্তু বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে এসে তিনি হঠাৎই তাঁর সুর, এমনকি তাঁর নিজস্ব কৌশল পর্যন্ত বদলে ফেললেন—এক ধাক্কায় ভাবাবেগের উচ্চগ্রামে উঠে গেলেন। আদালত কক্ষে উপস্থিত সকলে এটারই অপেক্ষায় ছিল, তারা পুলকে শিহরিত হয়ে উঠল।

বক্তা সোজা কাজের কথায় চলে এলেন। এই বলে শুরু করলেন যে যদিও তাঁর কর্মক্ষেত্র পেতের্বুর্গ, তবু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থনের জন্য রাশিয়ার অন্য কোনো শহরে তিনি এই প্রথম আসছেন এমন নয়, তবে সে সেই ধরনের অভিযুক্তদেরই পক্ষ সমর্থন করে থাকেন যাদের সততা সম্পর্কে তিনি হয় নিঃসন্দিগ্ধ অথবা যারা নির্দোষ বলে তিনি আগে থেকে অনুভব করেন। "বর্তমান ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই ঘটেছে", তিনি ব্যাখ্যা করলেন। 'এমনকি শুধুমাত্র পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রাথমিক বিবরণ থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে এমন কিছুর এক ঝলক আভাস আমি পেয়েছিলাম যাতে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যাই। এক কথায় বলতে গেলে, সর্বোপরি আইনঘটিত এমন একটি তথ্য আমাকে আগ্রহান্বিত করে তুলেছিল যার পুনরাবৃত্তি আইনব্যবসার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের বর্তমান মামলার মতো এতটা পরিপূর্ণরূপে এবং এমন চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে কখনও নয়। এই অদ্ভুত তথ্যটি আমার সূত্রবদ্ধ করা উচিত ছিল একমাত্র তখনই যখন আমি আমার কথা শেষ করব—আমার ভাষণের উপসংহারে। কিন্তু তা না করে আমি একেবারে গোড়াতেই আমার চিন্তা প্রকাশ করব, কারণ কোনো বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া জমিয়ে না রেখে, সে বিষয়ে আমার মনোভাব প্রকাশ্যে কার্পণ্য না করে সরাসরি কাজের কথায় আসা—এটা আমার একটা দুর্বলতা। আমার দিক থেকে এটা বিচক্ষণতার অভাব হতে পারে, কিন্তু তাহলেও আন্তরিক। আমার ভাবনাটা, আমার এই প্রতিটি তথ্যকে পৃথক পৃথক ভাবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে খতিয়ে দেখতে গেলে এমন একটি তথ্যও নেই যা সমালোচনার মুখে টিকতে পারে! তারপর

শোনা কথা আর পত্রপত্রিকা অনুসরণ করে আমার ধারণা ক্রমেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এমন সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছ থেকে তার পক্ষ সমর্থনের জন্য আমি আমন্ত্রণ পেলাম। আমিও কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ চলে এলাম, এখানে আসার পর আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না। যে সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলির প্রতিটি পৃথক পৃথকভাবে কতটা কল্পনাভিত্তিক ও ভিত্তিহীন এই ভয়ঙ্কর তথ্যসমাবেশটাকে ভেঙে ফেলে তা দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমি এই মামলা হাতে নিয়েছি।"

এই বলে শুরু করে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যমহোদয়বৃন্দ, আমি এখানে আনকোরা নতুন লোক। যে সমস্ত ছাপ আমার মনের ওপর পড়েছে তার পেছনে আমার কোনও পূর্বসংস্কার নেই। আসামি উদ্দাম ও লাগামছেঁড়া প্রকৃতির, আমাকে অবশ্য প্রাথমিকভাবে অপমান করেনি, যেমন সে করেছে এই শহরের অনেককে, হয়তো শত শত মানুষকে, যে কারণে অনেকেরই মনেই তার সম্পর্কে আগে থেকে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এটা ঠিক, এবং আমিও স্বীকার করছি যে স্থানীয় লোকসমাজ বিক্ষুব্ধ এবং সঙ্গত কারণেই তাদের মনোভাব এই যে লোকটা উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। তা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকসমাজে সে কিন্তু গৃহীত হয়েছিল—এমনকি আমাদের অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন অভিযোক্তা মহাশয়ের পরিবারেও সে সমাদৃত হয়েছিল।" (বিশেষ দ্রষ্টব্য এই কথায় উপস্থিত জনসাধারণের মধ্য থেকে দু একটি চাপা হাসির ধ্বনি শোনা গেল, যদিও তা দ্রুত চাপাও পড়ে গেল। তবে সকলেই সেটা লক্ষ করল। আমাদের সকলের জানা ছিল মিতিয়াকে প্রসিকিউটর যে তাঁর বাড়িতে আসতে দিতেন সেটা তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আসতে দেওয়ার একমাত্র কারণ এই যে প্রসিকিউটরের স্ত্রীর কাছে মিতিয়াকে কেন যেন আগ্রহোদ্দীপক মনে হয়েছিল। ভদ্রমহিলা অমনিতে অশেষ গুণসম্পন্না ও সম্ভ্রম উদ্রেককারিণী, কিন্তু অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ও খামখেয়ালি প্রকৃতির এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষত ছোটোখাটো ব্যাপারে তাঁর স্বামীর বিরোধিতা করতে ভালোবাসতেন। মিতিয়া অবশ্য কদাচিৎ তাদের বাড়িতে পদার্পণ করত।)

"তা সত্ত্বেও আমি ভরসা করে বলতে পারি", কৌঁসুলি ফেতিউকভিচ্ বলে চললেন, "আমার প্রতিপক্ষের মতো স্বাধীনচেতা ও ন্যায়বোধসম্পন্ন একজন মানুষের বুদ্ধিতেও আমার হতভাগ্য মক্কেল সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত প্রতিকূল ধারণা গড়ে উঠতে পারে। এটা স্বাভাবিক। তার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত প্রতিকূল কোনো ধারণা যদি কাজ করে এমনকি তাহলেও বলতে হবে হতভাগ্য মানুষটি তার খুবই যোগ্য। মানুষের নীতিবোধে, অধিকন্তু তার রুচিবোধে যখন আঘাত লাগে তখন তার সেই আহত উপলব্ধি অনেক সময় নির্দয় হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্রের কঠোর বিশ্লেষণ এবং মামলার প্রতি কঠোর সমালোচনামূলক মনোভাব—আমাদের

অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন অভিযোক্তা মহাশয়ের ভাষণে আমরা সকলে অবশ্য শুনেছি। আর বড়ো কথা, মামলার মূল বিষয়টি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি যে সমস্ত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন সেই গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিদ্বেষমূলক পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণা বিন্দুমাত্র তাঁর মনের মধ্যে থাকত। কিন্তু এমন কিছু কিছু জিনিসও আছে যা মামলার প্রতি বিদ্বেষমূলক ও পূর্বকল্পিত মনোভাবের চাইতেও মন্দ—এমনকি এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে আরও বেশি—দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশেষ করে আমরা যদি এক ধরনের শিল্পসৃষ্টির খেলায় মেতে উঠি এবং শিল্পসৃষ্টি বা রোমান্স রচনার তাগিদ বলতে যা বোঝায় তাতে গা ভাসিয়ে দিই, বিশেযত ঈশ্বর যদি আমাদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে দক্ষতার ঐশ্বর্য প্রদান করে থাকেন। পেতের্বুর্গে থাকতেই, আমি যখন এখানে আসার সবে উদ্যোগ নিয়েছি তখনই আমি এই মর্মে সতর্কবাতা পেয়েছিলাম—অবশ্য কোনো রকম সতর্কবার্তা ছাড়া আমি নিজেও জানতাম যে এখানে অতি সূক্ষ্ম ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এমন একজন মনস্তত্ত্ববিদের সাক্ষাৎ পাব যিনি তাঁর এই গুণে বহুকাল আগেই আমাদের তখনকার তরুণ আইনজীবীদের মহলে বিশেষ এক ধরনের খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহোদয়রা, মনস্তত্ত্ব একটা গভীর বিষয় হলে কী হবে—অনেকটা শাঁখের করাতের মতো—দুদিকেই কাটে।" এই সময় জনসাধারণের মধ্যে চাপা হাসির আওয়াজ উঠল। আমি যে এরকম একটা তুচ্ছ তুলনা দিলাম তার জন্য অবশ্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। "আমি খুব একটা বাকপটু নই। সে যা-ই হোক আমাদের অভিযোক্তার ভাষণের যে কোনো জায়গাতে প্রথম দর্শনেই যা ধরা পড়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেগুলির একটা তুলে ধরছি।

"আসামি রাতের অন্ধকারে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে বেড়া বয়ে ওপরে উঠে পড়ে—এই সময় বাড়ির ভৃত্য গ্রিগোরি তার একটা পা চেপে ধরতে সে তার হাতের নোড়াটা দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে নিচে ফেলে দেয়। পরক্ষণেই সে আবার লাফিয়ে বাগানে নেমে আসে, তারপর পুরো পাঁচ মিনিট ধরে আহত লোকটাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, অনুমান করতে চেষ্টা করে লোকটাকে খুন করল কিনা। কিন্তু দেখুন, আসামি যে করুণাবশত বুড়ো গ্রিগোরির কাছে ছুটে এসেছিল তার এই সাক্ষ্যের সত্যতা অভিযোক্তা কোনো মতেই স্বীকার করতে চাইছেন না। তিনি বলছেন না। ওরকম একটা মুহূর্তে এই ধরনের অনুভূতি কি সম্ভব? সেটা অস্বাভাবিক। আসলে তার দুষ্কর্মের একমাত্র সাক্ষীটি বেঁচে আছে না মরে গেছে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই সে নেমে এসেছিল।" তার মানে, এর দ্বারাই তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে সে এই দুষ্কর্মটি করেছে, কেন না এছাড়া আর অন্য কোনো কারণে, অন্য কোনো আকর্ষণে বা অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার পক্ষে বাগানে নেমে আসা সম্ভব ছিল না।"

"এই হল মনস্তত্ত্ব। কিন্তু ঠিক এই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিটিকেই গ্রহণ করে মামলার কাজে লাগিয়ে দেখা যাক—তবে এবারে বিপরীত দিক থেকে। তাতে কিন্তু যে ফল পাওয়া যাবে সেটাও এতটুকু কম বিশ্বাসযোগ্য হবে না। খুনি সাবধানতার খাতিরে নিচে নেমে এলো, সে নিশ্চিত হতে চাইছিল সাক্ষী বেঁচে আছে কিনা, অথচ দেখুন, অভিযোক্তার নিজেরই সাক্ষ্য থেকে দেখতে পাচ্ছি, এই মাত্র তার হাতে নিহত তার বাবার পড়ার ঘরে নিজের অপরাধের মস্ত বড়ো একটা প্রমাণ সে ফেলে রেখে এসেছে—একটা ছেঁড়া খাম যার ওপর লেখা ছিল যে ওটার ভেতরে তিন হাজার রুবল রাখা আছে। 'সে যদি ওই খামটা সঙ্গে করে নিয়ে যেত তাহলে কিন্তু দুনিয়ার কাকপক্ষীতেও জানতে পারত না যে ওরকম একটা খামের কোনো অস্তিত্ব আছে এবং তার ভেতরে টাকা আছে, যা থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে টাকাটা আসামিই চুরি করেছে।' এটা আমি অভিযোক্তার নিজের মুখের উক্তি উদ্ধার করেই বলছি। তাহলে দেখুন, একটার বেলায় সাবধানতায় কুলোল না—লোকটা দিশেহারা হয়ে পড়ল, মেঝেতে অপরাধের প্রমাণ ফেলে রেখে দিয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল, অথচ তার মিনিট দুয়েক বাদেই আরেকটা লোককে আঘাত করে মেরে ফেলল তখনই কিনা আমাদের সুবিধামতো প্রকাশ পেল সাবধানতার এমন এক উপলব্ধি যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং খুবই হিসাবি। কিন্তু যদি ধরেও নিই যে এমনটাই হয়েছিল তা হলে বলব এর মধ্যে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারটা কিন্তু এখানেই এসে পড়েছে যে এই এই পরিস্থিতিতে আমি রক্তপিপাসু আর বাজপাখির তীক্ষ্ন দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে জড়সড়ো একটা ইঁদুরের মতো অন্ধ। আমি যদি এমনই রক্তপিপাসু আর এত নৃশংস ধরনের হিসাবি হয়ে থাকি যে খুন করার পর আমার দুষ্কর্মের সাক্ষী লোকটা বেঁচে আছে কিনা একমাত্র সেটা দেখার জন্যই আমি লাফিয়ে নিচে নেমে এলাম তাহলে এটাই তো মনে হতে পারে যে আরও নতুন সব সাক্ষীসাবুদ সম্ভবত যাতে জুটে যায় সেই ঝুঁকি নিয়ে কেন আমি পুরো পাঁচটা মিনিট আমার এই নতুন শিকারটার জন্য ঝামেলা পোহাতে যাব? কী করতে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটার মাথার রক্ত আমারই রুমাল দিয়ে মুছতে যাব? যাতে ওই রক্তমাখা রুমালটা পরে আমারই বিরুদ্ধে, আমার অপরাধের প্রমাণস্বরূপ কাজে লাগতে পারে সেই জন্য কি? উঁহু, যদি এতই হিসেবি, এত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হতাম তাহলে তো বরং লাফিয়ে নিচে নেমে এসে ধরাশায়ী ভৃত্যটির ওপর স্রেফ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে হাতের ওই নোড়াটা দিয়েই তার মাথায় আরও এবং আরও কয়েকবার ঘা মারতাম তাকে একেবারে খতম করে দেবার উদ্দেশ্যে! তাতে সাক্ষীটিকে উৎখাত করা যেত, বুকের ওপর থেকে সমস্ত রকম দুশ্চিন্তার বোঝা ঝেড়ে ফেলা যেত—তাই নয় কি?

"শেষ কালে আরও একটা কথা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোকটি বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্য আমি নিচে নেমে এলাম, কিন্তু ওখানেই রাস্তার ওপর

ফেলে রেখে এলাম আরেকটি সাক্ষী—আমার হাতের সেই নোড়াটাই, যেটা আমি দুজন মহিলার কাছ থেকে তুলে নিয়েছিলাম, আর তারা দুজনে পরে যে কোনো সময় সেটা তাদের বলে শনাক্ত করতে পারে এবং আমি যে তাদের কাছ থেকেই ওটা তুলে নিয়েছিলাম এই মর্মে সাক্ষ্যও দিতে পারে। এই নয় যে ভুলে রাস্তার ওপর ফেলে রেখে এসেছিলাম, খেয়ালে বা দিশেহারা হয়ে যাওয়ার ফলে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। না, তা নয়, অস্ত্রটা ছুঁড়েই ফেলে দিয়েছিলাম, কেন না গ্রিগোরি যেখানে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে ছিল তার পনেরো পা মতন দূরেই সেটা পরে পাওয়া গিয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে : কী কারণে এরকম করেছিলাম? করেছিলাম ঠিক এই কারণেই যে একজন মানুষকে, বাড়ির পুরাতন ভৃত্যটিকে খুন করেছি বলে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই ক্ষোভে দুঃখে নিজেকে শাপশাপান্ত করতে করতে খুন করার অস্ত্র বলে নোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। এ ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? এছাড়া কোন্ দুঃখে অতটা দূরে ছুড়ে ফেলতে যাব? মানুষ খুন করেছি ভেবে যদি মনে মনে দুঃখ ও অনুকম্পা বোধ করার ক্ষমতা থাকে তো তাতে অবশ্যই প্রমাণিত হচ্ছে যে বাবাকে খুন করিনি। বাবাকে খুন করলে আর করুণাপরবশ হয়ে ধরাশায়ী আরেকজনের কাছে ছুটে যেতাম না, তখন আমার অনুভূতিটা হত একেবারে অন্য রকম, করুণা উদ্রেকের কোনো প্রশ্নই উঠত না, তখন একমাত্র প্রশ্ন হত কী করে নিজেকে বাঁচানো যায়—একথা মানতেই হবে। বরং, আবারও বলছি, মিনিট পাঁচেক তাকে নিয়ে অমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে না পড়ে তার মাথার খুলি একদম ভেঙে চুরমার করে দিতাম। মনের মধ্যে করুণা আর ভালো অনুভূতির যে জায়গা ছিল তা এই কারণেই যে এর আগে বিবেক পরিষ্কার ছিল। তাহলেই দেখছেন, মনস্তত্ত্বটা কেমন অন্য খাতে চলে গেল। জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবেই নিজেই এখন মনস্তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এর দ্বারা যে যা খুশি তাই সিদ্ধান্ত করা যায় সেটাই স্পষ্ট করে দেখান আমার উদ্দেশ্য ছিল। শুধু দেখতে হবে কার হাতে আছে। মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোকজনকে পর্যন্ত রোমাঞ্চে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, আর সেটা সম্পূর্ণ অজান্তে। ভদ্রমহোদয়গণ, মনস্তত্ত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি আর তার কিছু কিছু অপব্যবহারের প্রসঙ্গে আমার এই কথা।"

এখানে আবারও উপস্থিত জনসাধারণের মধ্য থেকে অনুমোদনসূচক মৃদু হাসি শোনা গেল, যার সবটাই আবার ছিল প্রসিকিউটরের উদ্দেশে। প্রতিবাদী কৌঁসুলির সম্পূর্ণ ভাষণ এখানে আর বিস্তারিত ভাবে উদ্ধার করতে যাচ্ছি না। সেখান থেকে কেবল কয়েকটি জায়গা, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কতকগুলি মূল বিষয় তুলে ধরব।

## এগার

## টাকার কোনও অস্তিত্ব ছিলনা। চুরি ডাকাতি হয় নি

ফেতিউকভিচের ভাষণের মধ্যে এমন একটা প্রসঙ্গ ছিল যা উপস্থিত সকলকে রীতিমতো চমকে দেয়। সেটা ছিল ওই সর্বনাশা তিন হাজার রুবলের অস্তিত্বই পুরোপুরি অস্বীকার করা, যার অর্থ দাঁড়ায় ডাকাতির সম্ভাবনাও অস্বীকার করা।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ", এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, "যার মনের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত বদ্ধমূল কোনো ধারণা নেই, বর্তমান মামলার খুবই অদ্ভুত একটা চরিত্রবৈশিষ্ট্য সেই সব আনকোরা মানুষকে বিস্মিত করবে। সেটা এই : চুরি ডাকাতির অভিযোগ, অথচ ঠিক কী যে চুরি গিয়েছিল বস্তুত তা একেবারেই দেখাতে না পারা। বলা হচ্ছে টাকা চুরি গেছে—ঠিক তিন হাজার রুবলই নাকি চুরি হয়েছে—কিন্তু কথাটা হল ওই টাকার সত্যি সত্যি কোনো অস্তিত্ব ছিল কিনা তা কারও জানা নেই। একবার চিন্তা করে দেখুন তিন হাজার ছিল তা আমরা কী করে জানতে পারলাম এবং কে তা দেখেছে? দেখেছিল শুধুমাত্র একজন—ভৃত্য স্মের্দিকোভ্। সে-ই দেখেছিল এবং বলেছিল একটা খামের ওপর কিছু লিখে সেটার ভেতরে টাকাটা রাখা হয়েছিল। এই সমাচারটি সে দুর্ঘটনারও আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তার ভাই ইভান ফিয়োদরভিচকে জানিয়েছিল। মাদাম স্ভেতলোভাকেও তা জানানো হয়েছিল। কিন্তু এই তিনজনের একজনও সে টাকা স্বচক্ষে দেখেনি, দেখেছিল আবারও সেই একজনই—একমাত্র স্মের্দিকোভ্।

"এখানে অমনিতেই যে প্রশ্নটা ওঠা স্বাভাবিক সেটা এই যে সেই টাকার যদি সত্যি সত্যি কোনো অস্তিত্ব থাকত এবং স্মের্দিকোভ্ যদি তা দেখে থাকত তাহলে শেষ বার কখন সে তা দেখেছিল? এমনও তো হতে পারে যে সেই টাকা বিছানার তলা থেকে তুলে তাকে না বলেই কর্তা ফের হাতবাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন? খেয়াল করবেন, স্মের্দিকোভ কী বলেছিল। তার কথায় টাকা বিছানার তলায়, তোশকের তলায় রাখা ছিল। আসামিকে টাকা নিতে হলে তোশকের তলা থেকে টেনে বার করতে হয়, অথচ এজাহারে সযত্নে লেখা হয়েছে যে দোমড়ানোর চিহ্নমাত্র ছিল না। বিছানা একেবারে না ঘেঁটে, এতটুকু না কুঁচকে কী করে আসামির পক্ষে, এ কাজটা করা সম্ভব হল? তাও আবার সেই সময়, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিছানায় যখন সদ্য পাটভাঙা ফিনফিনে পাতলা চাদর পাতা হয়েছিল, আর আসামির হাতও রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিল। তখন যে চাদরে এতটুকু দাগ লাগল না তাই বা কী করে সম্ভব হল?

“কিন্তু প্রশ্ন উঠবে এটা তো ঠিক যে মেঝেতে খাম পড়ে ছিল? ঠিক, বলতে হলে এই খাম নিয়েই বলতে হয়। এই কিছুক্ষণ আগে—জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা শুনছেন তো?—আমাদের মহাপ্রতিভাধর অভিযোক্তা মহাশয় তাঁর ভাষণের মাঝখানে স্মের্দিকোভ্ যে খুন করেছে এই অনুমানের অসারতা দেখিয়ে একটা জায়গায়, খেয়াল রাখবেন, নিজের মুখে হঠাৎ এমন একটা কথা বলেছিলেন, যাতে আমি বেশ খানিকটা অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ‘ওই খামটা যদি না থাকত, ওটা যদি অপরাধের একটা প্রমাণ হয়ে মেঝেতে পড়ে না থাকত, দুষ্কৃতকারী যদি ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেত তাহলে দুনিয়ার কেউই জানতে পারত না যে খামের অস্তিত্ব ছিল এবং তার ভেতরে টাকা ছিল, অর্থাৎ আসামি টাকাটা চুরি করেছে।’ তাহলে আমাদের প্রসিকিউটর নিজের মুখে যে কথা স্বীকার করেছেন এমনকি তা থেকেও দেখা যাচ্ছে নাম লেখা খামের ডেলা পাকানো ছেঁড়া কাগজটাই একমাত্র প্রমাণ যার ভিত্তিতে আসামির বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আনা যায়, ‘অন্যথায় টাকা যে চুরি হয়েছে একথা কেউ জানতে পারত না, এমন কি আদৌ যে কোনো টাকা ছিল তাও হয়তো কেউ জানত না।’ কিন্তু একটা কাগজের টুকরো মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল একমাত্র তাতেই কিনা প্রমাণ হয়ে গেল যে তার ভেতরে টাকা ছিল এবং সেই টাকা চুরি গেছে! এর উত্তরে বলা হচ্ছে ‘কিন্তু স্মের্দিকোভ্ যে খামের ভেতরে টাকা দেখেছিল!’ কিন্তু কবে, কখন? শেষ বারের মতো সে কখন দেখেছিল?—এটাই আমার প্রশ্ন। আমি স্মের্দিকোভের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। সে আমায় বলেছিল, দুর্ঘটনার দু দিন আগে দেখেছিল। তাহলে কেন আমি অনুমান করতে পারি না—এই ধরুন না কেন—অন্তত পরিস্থিতি যখন এমনই যে বুড়ো ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ ঘরের দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতরে হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মতো ছটফট করতে করতে অধীর আগ্রহে তার প্রেয়সীর আগমনের প্রতীক্ষা করছে, সেই সময় এমনও তো হতে পারে যে কিছু করার না থাকায় হঠাৎ কী খেয়াল হতে খামটা বের করে তার সিল খুলে ফেলেছিল। মনে মনে হয়তো ভেবেছিল ‘শুধু খাম দেখে ওর বিশ্বাস নাও হতে পারে, কিন্তু আমি যদি একটা বাণ্ডিলে রামধনু রঙা ত্রিশটা একশ রুবলের নোট ওকে দেখাতে পারি তাহলে নির্ঘাত হাতে হাতে ফলটা পাওয়া যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে লালা ঝরবে।’ যা ভাবা তাই কাজ সঙ্গে সঙ্গে খামটা সে ছিঁড়ে ফেলল, ভেতর থেকে টাকা বার করে নিয়ে ছেঁড়া খামটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। কর্তা তিনি, হাতও তাঁর, সুতরাং কার কী বলার আছে? বলাই বাহুল্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ ফেলে রাখার আশঙ্কার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

“শুনুন, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যমহোদয়রা, এরকম অনুমান বা এ ধরনের তথ্যের চেয়ে বেশি সম্ভাব্য আর কী হতে পারে? এটা সম্ভব নয় কেন বলবেন কি? কিন্তু দেখুন, এই জাতীয় অন্তত কিছু একটা যদি ঘটত তাহলে কিছু ডাকাতির

অভিযোগ আপনা আপনিই নস্যাৎ হয়ে যেত। দাঁড়াত এই যে টাকার কোনও অস্তিত্ব ছিল না, তার মানে চুরি ডাকাতি হয়নি। খাম মেঝের ওপর পড়ে থাকলে তা যদি এ-ই প্রমাণ করে যে তার ভেতরে টাকা ছিল তাহলে আমিই বা কেন জোর দিয়ে তার উলটোটা বলতে পারি না? কেন এই কথাটা বলতে পারি না যে খামটা যে মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল তার কারণ ঠিক এটাই যে এর ভেতরে ইতিমধ্যেই কোনো টাকা ছিল না, টাকার মালিক নিজেই আগে থেকে তা সরিয়ে নিয়েছিল?

"এবারে প্রশ্ন উঠবে 'বেশ তো, কিন্তু ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ নিজেই যদি খাম থেকে টাকা সরিয়ে নেয় তাহলে তাই বা গেল কোথায়, যখন খানাতল্লাশি করে বাড়িতে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি?' এর উত্তরে বলব প্রথমত, তার হাতবাক্সে টাকার একটা অংশ পাওয়া গেছে, দ্বিতীয়ত টাকাটা সে সেই দিনই সকালে, এমন কি আরও আগে কোনো এক সময়ে বার করতে পারত, তার অন্য কোনো বন্দোবস্ত করতে পারত, কাউকে দিতে পারত, কোথাও পাঠাতে পারত; শেষ কালে এমনও হতে পারে যে তার ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছিল, সে তার কর্মপন্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে স্মের্দিকোভ্‌কে পূর্বাহ্নে অবহিত করার কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি? তাই এ ধরনের অনুমানের সামান্যতম সুযোগও অন্তত যেখানে থাকতে পারে সেখানে এতটা সুনিশ্চিত হয়ে, এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কী করে আসামির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা যায় যে খুন সে-ই করেছে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে করেছে এবং ডাকাতির ঘটনা বাস্তবিকই ঘটেছিল? এই ভাবে তো আমরা গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে চলে যাচ্ছি। অমুক জিনিসটা চুরি হয়ে গেছে এটা যদি জোর দিয়ে বলতে হয় তাহলে তো সেই জিনিসটা দেখানো উচিত, নয়তো অন্তত পক্ষে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা উচিত যে তার অস্তিত্ব ছিল। অথচ সেই টাকা কেউ কখনও চোখেও দেখেনি।

"এই কিছুদিন আগে পেতের্বুর্গে এক ছোকরা, প্রায় বাচ্চা ছেলে বললেই হয়, বছর আঠারো বয়স, গলায় ট্রে ঝুলিয়ে খুচরো জিনিস ফিরি করে বেড়ায়—প্রকাশ্য দিবালোকে কুড়ুল হাতে করে টাকা লেনদেনের কারবারের এক দোকানে ঢুকে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত রকম দুঃসাহস দেখিয়ে দোকানের মালিককে খুন করে দেড় হাজার রুবল লুট করে নিয়ে গেল। ঘণ্টা পাঁচেক বাদে তাকে গ্রেপ্তার করা হল, দেড় হাজারের মধ্যে যে পনেরো রুবল সে ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছিল সেটা বাদে পুরো টাকাটাই তার কাছ থেকে উদ্ধার করা গেল। এ ছাড়া দোকানের যে কর্মচারীটি হত্যাকাণ্ডের পর দোকানে ফিরেছিল পুলিশকে সে শুধু চুরি যাওয়া টাকার অঙ্কটাই জানায় নি, ওই দেড় হাজারের মধ্যে কোন্ কোন্ অঙ্কের কত টাকা ছিল—অর্থাৎ ক'টা একশ, ক'টা পঞ্চাশ, ক'টা দশ রুবলের নোট, ক'টাই বা মোহর এবং ঠিক কী ধরনের—সব জানিয়েছিল। ঠিক সেই সেই নোট আর মোহরই ধরা পড়ার সময় অপরাধীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল। তার ওপর খুনি নিজেই এর পর অকপটে,

পুরোমাত্রায় স্বীকারও করেছিল যে সে-ই খুন করেছিল এবং ওই টাকাগুলোই লুট করেছিল। জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্য মহোদয়বৃন্দ, এটাকেই আমি বলব অপরাধের প্রমাণ! এখানে আমি জানি, চোখে দেখতে পাচ্ছি, টাকাটা স্পর্শ করতে পারছি, বলতে পারছি না তা নেই অথবা ছিল না। কিন্তু বর্তমান মামলার বেলায় কি তাই হয়েছে? অথচ দেখুন, এই মামলার সঙ্গে জড়িত আছে একজন মানুষের জীবন মরণ সমস্যা, তার ভাগ্যের প্রশ্ন।

"তা লোকে বলবে, 'কিন্তু ওই দিন রাতেই তো সে হুল্লোড়বাজি করে টাকা উড়িয়েছে, দেখা গেছে তার কাছে দেড় হাজার রুবল ছিল। কোথা থেকে এলো সেই টাকা?' কিন্তু যেহেতু সবসমেত মাত্র দেড় হাজার পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বাকি অর্ধেকটা খুঁজে পেতেও কোনো মতে পাওয়া যায়নি, ঠিক এই কারণে, এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় কোনো খামের মধ্যে ছিলই না। সময়ের হিসাবে—এবং খুব কড়াকড়ি হিসাবেই জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিতও হয়েছে যে চাকরানিদের কাছ থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে সরকারি আমলা পের্‌খোতিনের বাড়ি পর্যন্ত যাবার পথে মাঝখানে সে বাড়ি ঘুরে যায়নি, অন্য কোথাও যায়ও নি, তারপর থেকে সর্বক্ষণ লোকজনের মধ্যেই ছিল; তার মানে, দেখা যাচ্ছে তিন হাজার থেকে অর্ধেকটা আলাদা করে রাখার বা শহরে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার উপায় তার ছিল না। ঠিক এই বিবেচনাই না অভিযোগকারীর এমন অনুমান করার কারণ যে টাকা মোক্রয়ে পল্লির কোথাও কোনো ফোকরের মধ্যে লুকানো আছে! বলা যায় না, ভদ্রমহোদয়রা, উডোল্‌ফো প্রাসাদ দুর্গের ভূগর্ভ কুঠুরিতে নয় তো? এই অনুমান কি বড়ো বেশি কাল্পনিক, বড়ো বেশি রোমাণ্টিক নয়? এবং খেয়াল করে দেখুন, একমাত্র এই একটা অনুমান—অর্থাৎ টাকা যে মোক্রয়েতে লুকানো আছে—এই অনুমানটা যদি বিধ্বস্ত হয়ে যায় তাহলেই কিন্তু লুট করার অভিযোগটাই পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কারণ প্রশ্ন উঠবে তাহলে কোথায় সেই দেড় হাজার রুবল? কোথায় উধাও হয়ে গেল? আসামি পথের মাঝখানে যে আর কোথাও যায়নি এটা যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে কোন্ অলৌকিক উপায়ে তা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে? যত সব গল্পকথার সাহায্য নিয়ে কিনা আমরা একজন মানুষের জীবন নষ্ট করতে চলেছি!

"বলবেন, 'যা-ই বলুন না কেন, তার কাছ থেকে যে দেড় হাজার পাওয়া গিয়েছিল সেই টাকা কোথা থেকে এলো তার কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা সে দিতে পারে নি। তা ছাড়া সবাই জানতও যে ওই রাতের আগে পর্যন্ত তার কাছে কোনো টাকা ছিল না।' কিন্তু টাকা কোথা থেকে নিয়েছিল আসামি তার সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আপনারা যদি চান, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, এই এজাহারের থেকে বেশি সম্ভবপর এবং তাছাড়াও আসামির চরিত্র ও মনের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ আর কিছু হয় না, কখনও হতে

পারে না। অভিযোগকারীর পছন্দ তাঁর স্বরচিত রোমান্স। সেটা কী? না, যে লোকটার মনের জোর খুবই কম, যাকে তার বাগ্‌দত্তা এতটা অপমানজনক ভাবে তিন হাজার রুবল দেওয়ার প্রস্তাব করে এবং সেই অপমান হজম করে যে তা গ্রহণও করতে পারে সে রকম একজন লোকের পক্ষে অর্ধেক টাকা আলাদা করে তাবিজের থলের ভেতরে সেলাই করে রেখে দেওয়া সম্ভব নয়। রাখলেও প্রতি দু দিন অন্তর অন্তর সেলাই খুলে সেখান থেকে এক শ করে বার করে নেবে এবং এই ভাবে এক মাসের মধ্যে সবটাই ফুঁকে দেবে। মনে করে দেখুন, এ সবই এমন একটা সুরে বেঁধে পরিবেশন করা হয়েছিল যেখানে কোনো রকম আপত্তিই বরদাস্ত করা হয় নি। আচ্ছা, ঘটনা যদি আদৌ এই ভাবে ঘটে না থাকে? যদি এমন হয় যে আপনারা একটা রোমান্স রচনা করেছেন, আর সেটা করেছেন একেবারে অন্য এক ব্যক্তিকে নিয়ে? কথাটা তো এখানেই যে আপনারা অন্য এক ব্যক্তিকে উদ্ভাবন করেছেন!

''আপনারা সম্ভবত আপত্তি তুলে বলবেন 'দুর্ঘটনার এক মাস আগে সে তার বাগ্‌দত্তা ভের্খভ্‌ৎসেভার কাছ থেকে যে তিন হাজার রুবল নিয়েছিল তার সবটাই যে মোক্রয়েতে এক ফুঁয়ে সামান্য একটা কোপেকের মতো সে উড়িয়ে দিয়েছিল সেই ঘটনার সাক্ষী আছে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, ওই টাকা থেকে অর্ধেকটা আলাদা করে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।' কিন্তু কারা সেই সাক্ষী? সেই সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা যে কতখানি তা ইতিমধ্যেই আদালতে প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া অন্যের হাতের টুকরোটা সব সময়ই বড়ো বলে মনে হয়। সর্বোপরি, ওই সাক্ষীদের কেউই ওই টাকা নিজে গুনে দেখেনি, কেবল চোখের আন্দাজে বিচার করে বলেছে। সাক্ষী মাক্সিমভ্ তো তার এজাহারে এমন কথাও বলেছে যে আসামির হাতে বিশ হাজার ছিল। তাহলেই দেখছেন, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্য মহোদয়বৃন্দ, মনস্তত্ত্ব বস্তুটি একটি শাঁখের করাত। তাই যদি হয় তাহলে আপনাদের আজ্ঞা হোক, এবারে ঘুরিয়ে অন্য ধারটা দেখি। দেখা যাক কী দাঁড়ায়!

''দুর্ঘটনার প্রায় এক মাস আগে ভের্খভ্‌ৎসেভা আসামিকে বিশ্বাস করে ডাকে তিন হাজার রুবল পাঠানোর ভার দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল : লাঞ্ছনা ও অপমানের যে কাহিনি এই মাত্র আমাদের শোনান হল তা যদি সত্যি হয় তাহলে তার ওপর এমন একটা কাজের ভার অর্পণ করা—এটা কি সম্ভব? এই একই বিষয়ের ওপর ভের্খভ্‌ৎসেভার প্রথম যে এজাহার সেটা ছিল অন্য রকম, সম্পূর্ণ অন্যরকম। তার দ্বিতীয় এজাহারে আমরা শুনতে পেলাম কেবল প্রতিহিংসার, ক্রোধের চিৎকার, দীর্ঘকাল গোপনে সঞ্চিত ঘৃণার চিৎকার। কিন্তু সাক্ষী তার প্রথম এজাহারে যা বলেছিল তা যে সঠিক নয় একমাত্র তা থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অধিকার রাখি যে তার দ্বিতীয় সাক্ষ্যটিও সঠিক নাও হতে পারে। প্রসিকিউটরের নিজের কথাতেই, রোমান্সের এই অংশটি স্পর্শ করার তাঁর 'ইচ্ছে নেই, স্পর্ধাও নেই'। তা না হল, আমিও স্পর্শ করব না। কিন্তু তা হলেও ভরসা

করে মাত্র একটি মন্তব্যই করতে পারি  আমার কথা হল ভের্খভ্ৎসেভার মতো নিষ্কলঙ্ক ও উচ্চ নৈতিক গুণের আধার, যিনি নিঃসন্দেহে আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী, সে রকম একজন ব্যক্তি যদি বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তাঁর নিজের প্রথম এজাহার বদল করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে যদি তাঁর সরাসরি উদ্দেশ্যই হয় আসামির সর্বনাশ করা তাহলে এটাও পরিষ্কার যে তাঁর এই সাক্ষ্যও তিনি ঠান্ডা মাথায়, নিরপেক্ষ ভাবে দেননি। একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ নারী তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে অনেক কিছুই বাড়িয়ে বলতে পারে আমাদের এই সিদ্ধান্ত করার অধিকার কি তাই বলে কেউ কেড়ে নিতে পারে? হ্যাঁ, বাড়িয়ে বলতেই পারেন—বিশেষত কীভাবে অপমান ও লাঞ্ছনা করে টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে কথা তো বটেই। না, ঘটনা তা নয়, বরং টাকার প্রস্তাবটা ঠিক এমন ভাবেই দেওয়া হয়েছিল যাতে তখনও তা গ্রহণ করা যেতে পারে, বিশেষত আমাদের আসামির মতো একজন হালকা মেজাজের লোকের পক্ষে। বড়ো কথা, তখনও তার মনে মনে এই আশা ছিল যে তার হিসাব মতো তার বাবার কাছে যে তিন হাজার রুবল তার প্রাপ্য আছে শিগগিরই সে তা পেয়ে যাবে। এটা তার হালকা মনের পরিচায়ক, কিন্তু সে তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হালকা মনের বশবর্তী হয়েই মনে মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে আসছিল যে তার বাপ, তাকে টাকাটা দেবে, ওই টাকা সে পেয়ে যাবে, তার মানে ভের্খভ্ৎসেভা বিশ্বাস করে যে টাকা ডাকে পাঠানোর ভার তাকে দিয়েছিল সেটা সুবিধামতো যে-কোনো সময় পাঠিয়ে সে ঋণমুক্ত হতে পারে।

“অথচ অভিযোক্তা কোনো মতেই একথা মানতে রাজি নন যে যে-টাকাটা সে পেয়েছিল ওই দিনই, যে-দিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেই দিনই সে তা থেকে অর্ধেক আলাদা করে তাবিজের থলের ভেতরে সেলাই করে রাখতে পারে। তাঁর কথা  ‘ওটা তার চরিত্রে নেই, ওরকম উপলব্ধি তার থাকতে পারে না।’ কিন্তু আপনি নিজেই তা জোর গলায় বলেছিলেন  কারামাজভ্ প্রশস্ত প্রকৃতির, কারামাজভ্ একই কালে দুটি চরম ভাবে ভাবিত হতে পারে, যার কোনোটারই কোন তল নেই। কারামাজভের প্রকৃতিটা ঠিকই এই রকম দ্বিমুখী, সেই দু দিকের কোনোটারই কোন তল নেই। এমনই যে চরম অসংযত উচ্ছ্বাসের বশে যখন সে উচ্ছৃঙ্খল হৈ হুল্লোড়ে মত্ত, সেই মুহূর্তেও সে সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে যদি অন্য দিক থেকে কিছু একটা তাকে অভিভূত করে। আর সেই অন্য দিকটা—সে তার প্রেম, তার সেই নবলব্ধ প্রেম যা বারুদের মতো জ্বলে উঠে তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সে প্রেমের জন্য চাই অর্থ। সেখানে অর্থের খুবই দরকার, এমনকি তার প্রণয়িনীকে নিয়েই যে উচ্ছৃঙ্খল হৈ হুল্লোড়ে মেতেছে তার পেছনে যেমন দরকার! তার চেয়েও কত বেশি করেই না দরকার সে নারী একবার তাকে মুখ ফুটে বললেই হল  ‘আমি তোমার। ফিয়োদর

পাভ্লভিচ্‌কে আমি চাই নে!'—তা হলেই আর কথা নেই—সে তাকে তুলে নিয়ে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু সেই নিয়ে যাবার জন্য তো টাকা চাই। উচ্ছৃঙ্খল হৈ হুল্লোড় করার চেয়ে এর গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি। একজন কারামাজভ্ হয়ে তার পক্ষে কি এটা বোঝা অসম্ভব ছিল? এই দুশ্চিন্তাতেই তো সে মরছিল। তাই দরকারের সময় কাজে লাগতে পারে এই ভেবে সে যদি ওই টাকা আলাদা করে সরিয়ে রাখে তাতে অবিশ্বাস করার কী আছে?

"কিন্তু দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছে, এদিকে আসামিকে তার প্রত্যাশিত তিন হাজার রুবল দেবার কোনো নামই করছে না ফিয়োদর পাভ্লভিচ্। উলটে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে ওই টাকাটা নাকি তারই প্রণয়িনীকে প্রলুব্ধ করার জন্য ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ আলাদা করে রেখে দিয়েছে। আসামি তখন মনে মনে ভাবল, 'ফিয়োদর পাভ্লভিচ্ যদি টাকা না দেয় তাহলে কাতেরিনা ইভানভ্নার কাছে আমি চোর প্রতিপন্ন হব।' তখনই যে আইডিয়াটা তার মাথায় এলো তা এই যে সে তার তাবিজের থলের ভেতরে যে দেড় হাজার রুবল গলায় ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই টাকাটাই নিয়ে গিয়ে ভের্খভ্‌ৎসেভার সামনে ফেলে দিয়ে তাকে বলবে: 'আমি ইতর হতে পারি, কিন্তু আমি চোর নই।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই দেড় হাজার রুবল চোখের মণির মতো রক্ষা করার পেছনে দ্বিবিধ কারণ ছিল এবং সে কারণ বারবার তাবিজের থলের সেলাই খুলে এক শ রুবল করে বের করা কদাচ নয়। আসামির আত্মসম্মানবোধ অস্বীকার করছেন কেন? না, আত্মসম্মান বোধ তার আছে—না হয় ধরলাম সঠিক নয়, ভ্রমাত্মক, কিন্তু সেটা তার আছে এবং সেটা যে আবেগের মাত্রায় চলে যেতে পারে তার প্রমাণও সে দিয়েছে।

"কিন্তু সে যাই হোক, এখন ব্যাপার ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঈর্ষার মর্মবেদনা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে, সেই দুটি প্রশ্ন, আগের সেই দুটি প্রশ্নই আসামির উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ভেতরে দেখতে দেখতে একটা নির্দিষ্ট আকার লাভ করতে করতে তাকে ক্রমেই বেশি করে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলছে। 'কাতেরিনা ইভানভ্নাকে না হয় টাকাটা দিলামই, কিন্তু তাহলে গ্রুশেন্‌কাকে যে নিয়ে যাব তার জন্য সঙ্গতি কোথায় থাকছে?' তার মাথা যদি অমন বিগড়ে যায়, যদি সে আকণ্ঠ মদ্যপান করে এবং এই পুরো একটা মাস সরাইখানাগুলোতে তোলপাড় করে বেড়ায় সেটা হয়তো ঠিক এই কারণেই যে সে নিজে তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই দুটি প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত এতদূর তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে পরিণামে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। শেষ বারের মতো বাপের কাছ থেকে ওই তিন হাজারের জন্য আর্জি করে সে তার ছোটো ভাইকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু জবাবের জন্য আর অপেক্ষা না করে নিজেই সেখানে গিয়ে হানা দেয়, পরিণতি হল এই যে সাক্ষীসাবুদের উপস্থিতিতেই সে তার বাবাকে প্রহার করল। এরপর এমন অবস্থা হল যে কারও কাছ থেকেই টাকা পাওয়ার আর

কোনো উপায় রইল না। মার খাওয়ার পর বাপ তো আরও দেবে না।

"সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় সে বুক ঠুকে, বুকের ওপরের দিকের যেখানে তাবিজটা ছিল ঠিক সেই জায়গাটাতে করাঘাত করে সে হলফ করে তার ভাইকে বলে যে তাকে যাতে ইতর বলে প্রতিপন্ন হতে না হয় সে উপায় তার আছে, কিন্তু তাহলেও সে ইতরই থেকে যাবে, কেন না সে দেখতে পাচ্ছে ওই উপায়ের সদ্ব্যবহার সে করতে পারবে না, তার যা স্বভাব তাতে কুলোবে না, তার মনোবলে কুলোবে না। আলেক্সেই কারামাজভ্ কোনো রকম কারচুপি না করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অমন অকপট ও বিশ্বাসযোগ্য যে এজাহারটা দিয়েছিল অভিযোক্তা কেন সেটা বিশ্বাস করছেন না? কেন? উলটে আমাকে দিয়ে জোর করে বিশ্বাস করিয়ে নিতে চাইছেন সে টাকাটা কোথাকার কোনো এক ফাটলের মধ্যে, উডোল্ফো প্রাসাদ দুর্গের ভূগর্ভ কুঠুরিতে কোথাও লুকানো আছে? কেন?

"সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আসামি তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর ওই সর্বনাশা চিঠিটা লেখে। সেই চিঠিটাই কিনা আসামি যে ডাকাতি করেছে তার সবচেয়ে বড়ো, অমন বিরাট একটা প্রমাণ হয়ে গেল! 'সকলের কাছে চেয়ে বেড়াব, লোকে যদি না দেয় তাহলে বাবাকে খুন করে তার তোশকের তলা থেকে গোলাপি রঙের ফিতে দিয়ে বাঁধা খামটা বের করে নেব। এখন শুধু ইভানটা চলে গেলেই হয়।'—এ যে দস্তুরমতো একটা কর্মসূচি! অতএব সে নয় তো আর কে? যেমন লেখা তেমনি ঘটেছিল!'—অভিযোক্তার উচ্ছ্বসিত উক্তি।

"কিন্তু প্রথম কথা, ওটা ছিল একটা 'মাতাল' চিঠি। ভয়ানক বিরক্ত হয়ে লেখা। দ্বিতীয়ত, আবারও ঘুরে ফিরে যে কথাটি আসছে তা এই যে খামের কথা সে লিখেছে স্মের্দিকোভের মুখ থেকে শুনে, কারণ খামটা সে নিজের চোখে দেখে নি। তৃতীয়ত, লেখা না হয় হয়েছিল, কিন্তু যেমন লেখা হয়েছিল তেমনি ঘটেছিল কি? তার প্রমাণ কী? আসামি বালিশের তলায় খামটা পেয়েছিল কি? টাকার সন্ধান পেয়েছিল কি? এমনকি আদৌ কোনো টাকা ছিল কি? তা ছাড়া আসামি যে ছুটে গিয়েছিল তা কি টাকার জন্য? মনে করে দেখুন, ভালো করে মনে করে দেখুন! সে যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়েছিল তা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে নয়, সে কেবল জানতে চেয়েছিল কোথায় সে আছে—সেই নারী যে তার নিদারুণ মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে সে যে ছুটে গিয়েছিল সেটা তার লেখা অনুযায়ী, কর্মসূচি অনুযায়ী কার্যসিদ্ধি করার জন্য নয়, অর্থাৎ কিনা পরিকল্পিত উপায়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নয়—গিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আচমকা, ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হয়ে! হ্যাঁ, আপনারা বলবেন, 'কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, সেখানে ছুটে যখন গিয়েছিল তখন খুনও করেছিল এবং টাকাও নিয়েছিল।' কিন্তু আদৌ কি সে খুন করেছিল? তার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আমি বিতৃষ্ণার সঙ্গে অগ্রাহ্য করছি, যখন সঠিক ভাবে নির্দেশই

করা যাচ্ছে না ঠিক কী চুরি গেছে। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ! কিন্তু খুন কি সে-ই করেছে? ডাকাতি ছাড়াই কি খুন করেছে তাহলে? এটা কি প্রমাণিত হয়েছে নাকি? এও কি একটা গল্পকথা নয়?"

## বারো

## এবং হত্যাকাণ্ডও ঘটেনি

"আমাকে বলতে দিন, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্য মহোদয়বৃন্দ, এখানে প্রশ্নটা একজন মানুষের জীবন নিয়ে, তাই খুব সাবধানতার প্রয়োজন। আমরা শুনেছি, অভিযোক্তা নিজে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত, আজকে, আদালত চলার আগে পর্যন্ত আসামির বিরুদ্ধে পুরোপুরি, সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত খুনের অভিযোগ আনার ব্যাপারে তাঁর মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, যে সর্বনাশা 'মাতাল' চিঠিটা আজ আদালতে পেশ করা হয়েছে তার আগে পর্যন্ত তিনি এরকম একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। 'যেমন লেখা তেমনি ঘটেছিল!' কিন্তু আমি আবারও বলছি আসামি ছুটে গিয়েছিল তার কাছে, তার খোঁজে, একমাত্র এটাই জানতে যে সে কোথায় আছে। এই ঘটনাটা নিয়ে কিন্তু তর্কের কোনো অবকাশ নেই। সে যদি বাড়িতে থাকত তাহলে আসামি কোথাও ছুটে যেত না, তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত এবং চিঠিতে যা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা থেকে বিরত থাকত। সে ছুটে গিয়েছিল আচমকা, ঝোঁকের মাথায়, নিজের লেখা 'মাতাল' চিঠিটার কথা তখন হয়তো তার একেবারেই মনে ছিল না। মনে করে দেখুন, এই একটা নোড়া থেকেই পুরোদস্তুর কেমন একটা মনস্তত্ত্ব খাড়া করা হয়ে গেল কেন নোড়াটাকে অস্ত্র হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, কেন সেটা সে তুলে নিয়েছিল? ইত্যাদি ইত্যাদি! এখানে অতি সাধারণ একটা চিন্তা আমার মাথায় আসছে আচ্ছা এই নোড়াটা যদি চোখের সামনে পড়ে না থাকত? আসামি যেখান থেকে তুলে নিয়েছিল সেখানে, অর্থাৎ তাকের ওপর না থেকে যদি কোনো আলমারির ভেতরে থাকত—তাহলে তো আর আসামির চোখের সামনে ঝলক দিত না এবং তখন তাকে অস্ত্র ছাড়াই খালি হাতে ছুটতে হত, আর সেক্ষেত্রে, হয়তো সে কাউকে খুনও করত না। তা হলে নোড়াটাকে আমি কী ভাবে সশস্ত্র হওয়ার এবং পূর্বপরিকল্পনার প্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করতে পারি?

"ঠিক কথা, সরাইখানাগুলোতে ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে বলেছিল যে সে তার বাবাকে খুন করবে, তবে দুদিন আগে, সে দিন সন্ধ্যায় যখন সে তার ওই 'মাতাল' চিঠিটা লিখেছিল, তখন সে শান্তই ছিল—সরাইখানায় তার ঝগড়া হয়েছিল শুধুমাত্র একজন দোকান কর্মচারীর সঙ্গে, কারণ সত্যি বলতে গেলে কি, 'একজন কারামাজভের পক্ষে ঝগড়া না করে থাকা সম্ভব নয়।' কিন্তু এর জবাবে আমি বলব এমন একটা

খুনের মতলব যদি তার থাকত—তাও আবার পরিকল্পনা মাফিক, চিঠিতে যেমন যেমন লেখা ছিল সেই ভাবে—তাহলে অবশ্যই সে একজন দোকান কর্মচারীর সঙ্গেও ঝগড়া করতে যেত না। শুধু তা-ই নয়, হয়তো সরাইখানাতেও আদৌ ঢুকত না, কারণ যে লোক অমন কাজ করার মতলব ভাঁজে তার মন সব সময় নিস্তব্ধতা ও নিরিবিলির সন্ধান করে, সে অদৃশ্য হয়ে থাকতে চায়, সে চায় যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়, তার কথা শুনতে না পায়। তার মনোভাবটা হয় 'যদি পার আমার কথা ভুলে যাও।' এটা কিন্তু হিসাব করে হয় না, সহজাত বোধ থেকেই হয়ে থাকে। জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি একটা দুমুখো অস্ত্র এবং মনস্তত্ত্ব বোঝার মতো ক্ষমতা আমাদেরও আছে। এই পুরো এক মাস ধরে সরাইখানাগুলোতে ঘুরে ঘুরে এই যে এত সব চিৎকার চেঁচামেচি সে প্রসঙ্গে বলতে পারি শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় হুল্লোড়ে মাতালের দল অথবা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে বাচ্চা ছেলেরা 'তোকে খুন করব' অমুক তমুক কত কিছুই না বলে—এরকম কত বারই না আমরা শুনেছি—কিন্তু তাই বলে তো আর খুন করে না। আর ওই সর্বনাশা চিঠিটা—সেটাও কি স্রেফ একটা মাতালের বিরক্তির প্রকাশ নয়? 'খুন করব! তোদের সব কটাকে খুন করব!'—শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসা মাতালের সেই চিৎকার নয়! কেনই বা নয়? কেন তা হতে পারে না? কেন এই চিঠিটাকে সর্বনাশা চিঠি বলব? উলটে কেন বলব না যে হাস্যকর? বলব না ঠিক এই কারণেই যে নিহত বাবার লাশ পাওয়া গেছে, এই কারণে যে একজন সাক্ষী আসামিকে সশস্ত্র অবস্থায় বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছে, লোকটার হাতে সে নিজেও ধরাশায়ী হয়েছিল—সুতরাং যেমন লেখা হয়েছিল সেই ভাবেই কাজটা হয়েছে, আর সেই কারণে চিঠিটাকেও হাস্যকর না বলে সর্বনাশাই বলতে হয়।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা আসল জায়গাটাতে এসে পৌঁছেছি 'বাগানে ছিল যখন তার মানে, খুন সে-ই করেছে।' 'ছিল যখন' অবশ্যই 'তার মানে'—এই দুটো কথায় সব চুকে গেল। 'ছিল' এবং 'তার মানে'—এরই ভিত্তিতে গোটা অভিযোগটা। কিন্তু সে যদি ওখানে থাকেও 'তার মানে' যদি তা না হয়? আহা, আমি মানছি, ঘটনা সমাহারের সামগ্রিক রূপ, নানা ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ—বাস্তবিকই যথেষ্ট অর্থব্যঞ্জক। কিন্তু ঘটনাবলির সামগ্রিক রূপকে অগ্রাহ্য না করেও একবার পৃথক পৃথক ভাবে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখুন ধরুন যেমন, আসামি যে তার বাবার ঘরের জানলার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল তার সেই এজাহারের সত্যতা অভিযোক্তা কোনো মতে স্বীকার করতে চাইছেন না কেন? মনে করে দেখুন, হত্যাকারী যে হঠাৎ শ্রদ্ধাবোধ ও 'ভক্তির ধর্মীয় উপস্থিতিতে' অভিভূত হয়ে পড়েছিল সেই প্রসঙ্গটি পর্যন্ত এখানে অভিযোগে কেমন নির্দ্বিধায় ঠেস দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কী বলার আছে যদি এক্ষেত্রে সত্যি সত্যিই ওই গোছের কিছু হয়ে

থাকে?—অর্থাৎ ঠিক শ্রদ্ধা বোধ না হলেও অন্তত ভক্তির ধর্মীয় উপলব্ধি থাকে? 'সম্ভবত সেই মুহূর্তে আমার মা আমার জন্য প্রার্থনা করছিলেন', তদন্তের সময় আসামি তার এজাহারে এই কথা বলেছিল। তাই আসামি যখন নিশ্চিত হল যে সভেত্‌লোভা তার বাবার ঘরে নেই ঠিক তখনই সে পালিয়ে গেল। 'কিন্তু জানলা দিয়ে দেখে স্থির নিশ্চিত হওয়ার উপায় তার ছিল না', অভিযোক্তা আমাদের কথায় আপত্তি তুলে বলবেন। কিন্তু স্থিরনিশ্চিত না হওয়ারই বা কী ছিল? জানলা তো আসামির দেওয়া সঙ্কেতেই খোলা হয়েছিল। সেই সময় ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ কোনো একটা কথা, উল্লাসধ্বনি জাতীয় কিছু একটা উচ্চারণ করে থাকবে যাতে আসামির কাছে তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হয়ে যাবে স্‌ভেত্‌লোভা সেখানে নেই। আমরা মনে মনে যেমন কল্পনা করেছি, যে ভাবে কল্পনা করার জন্য আমরা আমাদের মনকে নির্দেশ দিয়েছি কেন অবশ্যই সেই ভাবে আমাদের অনুমান করতে হবে? বাস্তবে হাজারো এমন অনেক বস্তু একেক ঝলক দেখা দিতে পারে যা অতি সূক্ষ্মদর্শী ঔপন্যাসিকেরও নজর এড়িয়ে যেতে পারে।

"বলবেন, 'কিন্তু গ্রিগোরি যে দরজা খোলা থাকতে দেখেছিল। তার মানে, আসামি নির্ঘাত বাড়ির ভেতরে ছিল, সুতরাং খুনও করেছে।' এই দরজার কথা যদি বলেন, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ  দেখতে পাচ্ছেন তো, দরজা যে খোলা ছিল তার সাক্ষী মাত্র একজন ব্যক্তি—প্রসঙ্গত সে নিজেও আবার সেই সময় এমন অবস্থায় ছিল যে  বেশ, বেশ, ঠিক আছে, দরজা না হয় খোলাই থাকল, না হয় ধরে নিলাম আসামি মিথ্যে বলছে, আত্মরক্ষার খাতিরে অস্বীকার করছে—তার এই অবস্থায় যেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, হলই না হয় যে কোনো এক ফাঁকে বাড়ির সে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, সেখানেই ছিল—বেশ তো, তাতেই বা কী? তা থেকে কেন অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে ছিল যখন তার মানে খুন সেই করেছে? সেক্ষেত্রে সে জোর করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারত, এ ঘর ওঘর ছুটোছুটি করে খুঁজে বেড়াতে পারত, বাপকে ধাক্কা মারতে পারত, এমনকি তাকে আঘাতও করতে পারত, কিন্তু যখন প্রমাণ পেল যে স্‌ভেত্‌লোভা ওখানে নেই তখন ত সে যে ওখানে নেই সেই আনন্দেই সে পালিয়ে যাবে, বাপকে খুন না করেই পালিয়ে যাবে। বাপকে হত্যার প্রলোভন থেকে রেহাই পেয়ে সে যে পালিয়ে আসতে পেরেছিল সেই কারণে নিজের বিবেকের কাছে তার পরিষ্কার লাগছিল, ভেতরে ভেতরে সে আনন্দও উপলব্ধি করতে পারছিল। আর নির্মল হৃদয়ের উপলব্ধির এবং করুণা ও সমবেদনা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার ছিল বলেই হয়তো উত্তেজনার মাথায় গ্রিগোরিকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেওয়ার মিনিট খানেক পরেই সে বেড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে নিচে তার কাছে এসেছিল। মোক্রয়েতে আসামির কাছে যখন নবজীবনের বার্তা নিয়ে নতুন করে প্রেমের উন্মেষ ঘটল, যখন তার পক্ষে আর ভালোবাসা সম্ভব ছিল না, যেহেতু

তার পেছনে তখন পড়ে রয়েছে তার বাপের রক্তাক্ত মৃতদেহ, সামনে অপেক্ষা করে আছে এর জন্য তার সমুচিত শাস্তি, তখন তার মনের সে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল তার বিভীষিকাময় বিবরণ অভিযোক্তা সালঙ্কারে আমাদের দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও অভিযোক্তা কিন্তু আসামির প্রেমের কথাটা অস্বীকার করতে পারেনি, এ বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আসামির মাতাল অবস্থা, একজন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য বধভূমিতে নিয়ে যাবার সময় তার যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথারই উল্লেখ তিনি করেছেন। কিন্তু আবারও আমার প্রশ্ন: আপনি অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের উদ্ভাবন করেননি কি, মাননীয় অভিযোক্তা মহাশয়? আসামি কি এতটাই স্থূল প্রকৃতির, এতটাই হৃদয়হীন যে তার হাতে যদি সত্যি সত্যি তার বাবার রক্ত লেগে থাকত তাহলে সেই মুহূর্তেও সে তার প্রেমের কথা, বিচারকে ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবতে পারত? না, না, আবারও বলছি, না! সবেমাত্র প্রকাশ পেয়েছে যে সে তাকে ভালোবাসে, তাকে কাছে ডাকছে, নতুন সুখের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তাকে—উঁহু, আমি শপথ করে বলছি, সেক্ষেত্রে সে আত্মহত্যার দ্বিগুণ, তিনগুণ তাগিদ অনুভব না করে পারত না—যদি তার পিছনে তার বাবার লাশ পড়ে থাকত! না, না, কোনোমতেই ভুলে যেত না তার পিস্তল কোথায় আছে! আমি আসামিকে জানি। হিংস্র, পাষাণ নির্দয় বলে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। সে আত্মহত্যা করতে পারত—এটা নিশ্চিত। সে আত্মহত্যা করেনি ঠিক এই কারণেই যে 'মা তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন্ এবং তার বাবার খুনের অপরাধে সে অপরাধী নয়। সেই রাতে মোক্রয়েতে সে মনে মনে কষ্ট পেয়েছিল দুঃখ পেয়েছিল একমাত্র তার আঘাতে ধরাশায়ী বুড়ো গ্রিগোরির কথা ভেবে, মনে মনে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল বুড়ো যেন উঠে দাঁড়ায়, জ্ঞান ফিরে পায়, ওই আঘাতে যেন তার মৃত্যু না হয়, তার দরুন শাস্তি যেন সে এড়িয়ে যেতে পারে। ঘটনার এরকম ব্যাখ্যা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? আসামি যে আমাদের মিথ্যে বলছে তার কী এমন জোর প্রমাণ আছে? তৎক্ষণাৎ আবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাদের বলা হবে 'কিন্তু তার বাবার লাশটা! বুড়োকে খুন না করেই যদি সে পালায় তাহলে খুন কে করেছিল?' আবারও বলছি 'সে না করলে কে করেছিল খুনটা?'—অভিযোগের পুরো যুক্তিটা এরই মধ্যে নিহিত। দেখা যাচ্ছে, আর কাউকে তার জায়গায় বসানো যাচ্ছে না।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমার প্রশ্ন, সত্যিই কি তাই? সত্যি-সত্যিই কি, বাস্তবিকই কি বসানোর মতো একেবারে কেউ নেই? আমরা শুনেছি, ওই রাতে বাড়িতে যারা যারা ছিল, যারা আনাগোনা করেছিল অভিযোক্তা আঙুলে গুনে গুনে তাদের সকলেরই উল্লেখ করেছেন। মোট পাঁচজন লোককে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে তিন জন, আমি মানছি, কিছু বলার বা করার মতো অবস্থায় ছিল না। তারা হল স্বয়ং নিহত ব্যক্তি, বুড়ো গ্রিগোরি আর তার স্ত্রী। তাহলে থাকার মধ্যে থাকছে

BengaliBook.org

দুজন—আসামি আর স্মের্দিকোভ্। ব্যস্ হয়ে গেল! অভিযোক্তা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, আসামি এই কারণেই স্মের্দিকোভের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে যে তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখানোর নেই এবং এখানে যদি ষষ্ঠ কোন কেউ থাকত, সেই ষষ্ঠজন যদি কোন ভূতও হত তাহলে সে তৎক্ষণাৎ লজ্জা পেয়ে গিয়ে স্মের্দিকোভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ছেড়ে দিয়ে তার বদলে ওই অন্যজনকেই দেখিয়ে দিত। কিন্তু মাননীয় মহাশয়রা, কেন আমি এর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে আসতে পারি না? আছে দুজন আসামি আর স্মের্দিকোভ্—কেন আমি বলতে পারি না যে আপনি আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন স্রেফ এই কারণে যে আর কেউ নেই যার বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ আনতে পারেন? এবং আর কেউ যে নেই তার একমাত্র কারণ এই যে আপনি আগে থাকতেই, পূর্ব নির্ধারিত একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে স্মের্দিকোভ্কে সমস্ত রকম সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছেন।

"এটা অবশ্য ঠিক যে স্মের্দিকোভের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে কেবল আসামি নিজে, তার দুই ভাই, স্ভেত্লোভা—আর কেউই নয়। কিন্তু সাক্ষ্য দেবার মতো আর কেউই যে নেই তা-ই বা বলব কেন? লোকসমাজে এক ধরনের যে প্রশ্ন, যে সন্দেহ কতকটা অস্পষ্টভাবে হলেও দানা বেঁধে উঠছে, এক ধরনের অস্পষ্ট যে গুজব শোনা যাচ্ছে, কোনো একটা কিছুর যে প্রত্যাশা উপলব্ধি করা যাচ্ছে—সেগুলিই তো সেই সাক্ষ্য বহন করছে। সর্বোপরি আমাদের কাছে তুলনামূলক এমন কিছু তথ্যের সাক্ষ্যও আছে যা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক—যদিও স্বীকার করছি, কতকটা অনির্দিষ্ট ধরনেরও বটে। প্রথমত ঠিক দুর্ঘটনার দিনটিতে মৃগীরোগের যে আক্রমণ, যার পক্ষ নিয়ে, যার সমর্থনে আমাদের অভিযোক্তা মহাশয় কেন যেন অত করে উঠে পড়ে জোরজবরদস্তি সওয়াল করছেন। তারপর বিচারের ঠিক আগেই স্মের্দিকোভের আকস্মিক আত্মহত্যা। তারপর এর চাইতেও যেটা কম আকস্মিক নয় তা হল আদালতে আজ আসামির বড়ো ভাইয়ের সাক্ষ্য। এর আগে পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল যে তার ভাই অপরাধী, কিন্তু এখন হঠাৎ আদালতে এক তাড়া নোট নিয়ে এসে স্মের্দিকোভ্কেই কিন্তু খুনি বলে ঘোষণা করে গেল! না, না, আদালত এবং প্রসিকিউটরের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে ইভান কারামাজ়ভ্ মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে ভুগছে, এবং তার সাক্ষ্য বাস্তবিকই মৃত ব্যক্তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তার ভাইকে বাঁচানোর একটা মরিয়া প্রয়াস—তাও আবার বিকারের ঘোরে পরিকল্পিত প্রয়াসও—হতে পারে। কিন্তু যা-ই বলুন না কেন, আবারও কিন্তু স্মের্দিকোভের নামটাই উচ্চারিত হল, আবারও সেই নামের মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া গেল। মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোথাও কিছু যেন একটা ফাঁক আছে, এখানেই সব শেষ হতে পারে না, জুরিমণ্ডলীর মাননীয়

মহোদয়বৃন্দ! হয়তো এক সময় এর ব্যাখ্যা মিলবে। কিন্তু সে আরও পরের কথা। ওকথা আপাতত থাক।

"এই মাত্র আদালত যখন তার বিচারসভা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু আপাতত এখনও যখন আমাদের প্রতীক্ষা করে থাকতে হচ্ছে সেই সুযোগে আমি আমার দু একটি মন্তব্য প্রকাশ করতে পারি। যেমন, অভিযোক্তা মহাশয় এত নিপুণভাবে মৃত স্মের্দিকোভের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের এত সূক্ষ্ম যে রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন সেই প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার আছে। অভিযোক্তা মহাশয়ের প্রতিভায় আমি বিস্মিত, আমার কিছু বলার আছে। অভিযোক্তা মহাশয়ের প্রতিভায় আমি বিস্মিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য তিনি নিরূপণ করেছেন তার সারবত্তা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। স্মের্দিকোভের কাছে আমি গিয়েছিলাম, তাকে আমি দেখেছি, তার সঙ্গে আমি কথাও বলেছি, কিন্তু আমার মনের ওপর যে ছাপ সে ফেলেছিল সেটা একেবারে অন্য রকম। এটা সত্যি যে তার স্বাস্থ্য দুর্বল ছিল, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে বলুন, মনের দিক থেকে বলুন, অভিযোক্তা তার সম্পর্কে যেমন মন্তব্য করেছেন সে রকম দুর্বল সে ছিল না, না, আদৌ ছিল না। বিশেষত তার মধ্যে ভীরুতার চিহ্নমাত্র আমি খুঁজে পাই নি, অথচ অভিযোক্তা তার সেই ভীরুতাকেই তার চরিত্রের অত বড়ো বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার মনের মধ্যে সরলতা বলতেও কিছু ছিল না। বরং আমি তার মধ্যে উলটোটাই দেখতে পেয়েছি—ভীষণ সন্দেহপ্রবণ, সরলতার ভান করে নিজের আসল চেহারাটা গোপন করে রাখত, অনেক কিছু অনুধাবন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাও তার ছিল। অভিযোক্তা এত বেশি সরল যে তিনি তাকে জড়বুদ্ধি বলে গণ্য করেছিলেন। আমার মনের ওপর কিন্তু সে রীতিমতো সুনির্দিষ্ট ছাপ ফেলেছিল। আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তার কাছ থেকে চলে এলাম যে লোকটা নিঃসন্দেহে খল প্রকৃতির, বড়ো বেশি আত্মম্ভরী, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং ভয়ানক ঈর্ষাকাতর। আমি কিছু কিছু তথ্য জোগাড় করতে পেরেছি। নিজের জন্মকে সে ঘৃণার চোখে দেখত, সে জন্য তার লজ্জা ছিল এবং যখনই তার মনে হত যে সে পূতগন্ধির' ছেলে তখন রাগে দাঁতে দাঁত ঘষত। ভৃত্য গ্রিগোরি ও তার স্ত্রী তার ছেলেবেলায় তার অত উপকার করলেও সে তাদের এতটুকু সম্মান করত না। রাশিয়া দেশটাকে সে শাপশাপান্ত করত, তাকে নিয়ে হাসি মশ্‌করা করত। তার স্বপ্ন ছিল ফরাসি দেশে চলে যাবে সেখানে গিয়ে ফরাসি বনেযাবে। এই নিয়ে সে আগেও অনেকবার বলে বেড়িয়েছে যে এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সঙ্গতি তার নেই। আমার মনে হয় সে কাউকে ভালোবাসত না, নিজের সম্পর্কে তার অদ্ভুত রকম উঁচু ধারণা ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল ভালো পোশাক পরিচ্ছদ, কোটের তলায় পিঠ ছাড়া শার্টের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বুক আর পালিশ করা ঝকঝকে জুতোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিজেই সে নিজেকে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের অবৈধ সন্তান বলে গণ্য করত। এ

সম্পর্কে তথ্য প্রমাণও আছে। সে তার প্রভুর বৈধ সন্তানদের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে মনে মনে এই ভেবে বিদ্বেষও পোষণ করতে পারত যে যা কিছু সব ওদের, আর তার বেলায় কিছুই নয়। সব অধিকার ওদের, উত্তরাধিকার ওদের, আর সে একটা রাঁধুনে মাত্র। সে আমাকে জানিয়েছিল যে সে নিজে ফিয়োদর পাভ্‌লভিচের সঙ্গে মিলে খামে টাকা ভরেছিল। ওই টাকার উদ্দেশ্য এবং যে পরিমাণ টাকা ওই খামের মধ্যে ছিল তা যে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত এই ভেবে তার মনের মধ্যে অবশ্যই একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠেছিল। পরন্তু তিন হাজারের ঝকঝকে রামধনুরঙা নোটগুলি সে নিজের চোখে দেখেছে। এ সম্পর্কে আমি ইচ্ছে করেই তাকে প্রশ্নও করেছিলাম। না, কোনো ঈর্ষাকাতর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে এক সঙ্গে তার বেশি টাকা কখনই দেখানো উচিত নয়। এই প্রথম সে এক জনের হাতে এত টাকা দেখতে পেল। রামধনু রঙা নোটের তাড়া এক ধরনের অসুস্থ কল্পনায় তার মনকে নাড়া দিতে পারত, তবে তখনকার মতো, সঙ্গে সঙ্গে তার কোনো পরিণাম দেখা নাও যেতে পারত। স্মের্দিকোভ্‌কে হত্যাকারী অনুমান করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার যে সমস্ত সম্ভাবনা থাকতে পারে অগাধ প্রতিভাসম্পন্ন অভিযোক্তা মহাশয় সূক্ষ্ম ভাবে সেগুলির সব কয়টির পক্ষে বিপক্ষে সব রকমের যুক্তি আমাদের সামনে রেখেছেন। বিশেষ করে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন: মিছিমিছি মৃগী রোগের আক্রমণের ভান সে কেন করতে যাবে? কিন্তু আমার কথা, এমনও হতে পারে যে ভান সে আদৌ করেনি, মূর্ছার আক্রমণ তার অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারত; কিন্তু ঠিক সে রকম স্বাভাবিক ভাবেই আবার কেটেও তো যেতে পারত, রোগীর জ্ঞানও ফিরে আসতে পারত। ধরা যাক পুরোপুরি সেরে উঠল না, কিন্তু তা হলেও কোনো না কোনো সময় তো তার ঘোর কাটতে পারত, জ্ঞান ফিরে আসতে পারত?—যেমন সচরাচর দেখা যায় মৃগী রোগীদের বেলায়?

‘‘অভিযোক্তার প্রশ্ন স্মের্দিকোভ্ যে খুন করেছিল সেই মুহূর্তটি কোথায়? সেই মুহূর্তটি দেখানো কিন্তু অত্যন্ত সহজ। মৃগীরোগের আক্রমণের পর সব সময় গভীর নিদ্রার আক্রমণ দেখা যায়। স্মের্দিকোভ্‌ও সেই রকম ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল মাত্র। তাই এক সময় সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার সম্ভাবনা তার ছিল—সেটা ঠিক সেই মুহূর্তে হতে পারত যখন বুড়ো গ্রিগোরি আসামিকে পালাতে দেখে তার পিছু ধাওয়া করেছিল এবং আসামি যখন বেড়ার মাথায় উঠে গেছে সেই সময় ছুটতে ছুটতে এসে তার একটা ঠ্যাং চেপে ধরে সারা পাড়া মাথায় করে ‘পিত্তিঘাতি!’ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। রাত্রির অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই অস্বাভাবিক চিৎকারে স্মের্দিকোভের ঘুম ভেঙে গেলেও যেতে পারত, হয়তো ততক্ষণে তার ঘুম আর তেমন গাঢ়ও ছিল না। স্বাভাবিক ভাবে এমনও হতে পারে যে এক ঘণ্টা আগে তার ঘুম ভাঙতে শুরু করেছিল।

"বিছানা ছেড়ে উঠে সে প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায়, কোনো রকম অভিসন্ধি ছাড়াই শব্দ অনুসরণ করে ব্যাপারটা কী দেখার জন্য এগিয়ে গেল। তার অসুস্থ মাথার ভেতরে সব কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, তার চিন্তাশক্তি তখনও ঝিমন্ত। দেখতে দেখতে সে বাগানে এসে গেল, জানলায় আলো দেখতে পেয়ে সে দিকে এগিয়ে গেল। কর্তা অবশ্যই তাকে দেখে আনন্দিত। কর্তার মুখে সে ভয়ঙ্কর সমাচার শুনতে পেল। তৎক্ষণাৎ তার মাথা খুলে গেল। আতঙ্কিত কর্তার কাছ থেকে সমস্ত রকম খুঁটিনাটি জানতে পারল। এই সময় ধীরে ধীরে তার বিশৃঙ্খল ও অসুস্থ মস্তিষ্কের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করল একটি চিন্তা—চিন্তাটা ভয়ঙ্কর কিন্তু প্রলোভনজনক এবং তার যুক্তিও অকাট্য  কর্তাকে খুন করে ওই তিন হাজার রুবল হস্তগত করলে হয়। পরে সমস্ত দোষ তার বড়ো ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কোনো বাধা নেই। এক্ষেত্রে সে ছাড়া আর কেই বা হতে পারে বলে লোকে ভাবতে পারে? তাকে ছাড়া আর কাকেই বা দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে, যখন সে যে এখানে ছিল তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে? যখন বুঝতে পারল যে শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে শিকার ধরার এবং টাকা হস্তগত করার একটা দারুণ লোভ তাকে পেয়ে বসল। এই ধরনের আকস্মিক ঝোঁক অনেক সময় সুযোগ পেলে কী দুর্নিবারই না হয়ে ওঠে! বিশেষ করে তা চেপে ধরে সেই ধরনের খুনিদের, যারা খুন করার প্রবৃত্তি হবে বলে আগের মুহূর্তেও জানে না! তাই স্মের্দিকোভ্ তার কর্তার ঘরে ঢুকে তার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে পারত। কী দিয়ে? কোন্ অস্ত্র দিয়ে? কেন? বাগান থেকে যে কোনো একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে তাই দিয়ে। কিন্তু কী কারণে? কোন্ উদ্দেশ্যে? বাঃ। তিন হাজার! জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার একটা কত বড়ো সঙ্গতি! না, না, এমন নয় যে আমি নিজেই নিজের বিরোধিতা করছি। টাকা থাকতেও পারত। এমনকি এও হতে পারে যে একমাত্র স্মের্দিকোভ্ই জানত কোথায় পাওয়া যাবে, ঠিক কোথায় কর্তা রেখেছে। এখন প্রশ্ন করবেন  'তাহলে মেঝেতে যে ছেঁড়া খামটা পড়ে ছিল সেটা কী?'

"কিছু আগে এই খামটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিযোক্তা মহাশয় তাঁর নিজের অতি সূক্ষ্ম যে ভাবনাটি ব্যক্ত করেছিলেন তা এই যে কাজটা স্মের্দিকোভের মোটেই নয়—সে হলে কোনোমতেই নিজের বিরুদ্ধে অমন একটা প্রমাণ ফেলে রেখে যেত না। একমাত্র কারামাজ়ভের মতো একজন অনভিজ্ঞ চোরের পক্ষেই খামটা মেঝেতে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব। জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, তখন তাঁর এই কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল যেন খুবই চেনা-চেনা কিছু একটা শুনছি। ধারণা করতে পারেন, কারামাজ়ভ্ হলে খামটা নিয়ে যে কী করত সেই প্রসঙ্গে ঠিক এই একই ভাবনা, একই অনুমান এর ঠিক দু দিন আগে আমি স্মের্দিকোভের নিজের মুখেও শুনেছি! শুধু তা-ই নয়, আমি তখনও ভারি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমার তখন এটাই মনে হয়েছিল যে তার সারল্যটা একটা ভন্ডামি ছাড়া আর

কিছু নয়। আগ বাড়িয়ে এই ভাবনাটা বলে আমার ওপর এমন একটা চাপ সৃষ্টি করছে যাতে আমার মনে হতে পারে যে এটা আমার নিজেরই ধারণা। সে কেবল ধরিয়ে দিচ্ছে। তদন্তের সময়ও সে তার এই ধারণাটাই ধরিয়ে দেয়নি তো? আমাদের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন অভিযোক্তা মহাশয়ের ওপরও এই ধারণা চাপিয়ে দেয় নি ত?

"লোকে বলবে, 'তাহলে গ্রিগোরির বৌ সেই বুড়ি? সে তো শুনেছিল তার পাশেই সারা রাত ধরে অসুস্থ লোকটার কাতরানি।' হ্যাঁ শুনেছিল বটে, কিন্তু যা তার বোধ হয়েছিল সেটা খুবই নড়বড়ে। আমি একজন ভদ্রমহিলাকে জানতাম যিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অনুযোগ করেছিলেন যে উঠোনে একটা রাস্তার কুকুর সারারাত তাকে জাগিয়ে রেখেছিল, একেবারে ঘুমোতে দেয়নি। অথচ পরে জানা গেল বেচারি কুকুরটা সারা রাতের মধ্যে মাত্র দুবার কি তিনবার ডেকেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক। কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে হঠাৎ কাতরানি শুনে তার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ঘুম ভেঙে গেলে সে বিরক্তিই বোধ করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘুমিয়েও পরে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে আবার কাতরানি, আবার তার ঘুম ভেঙে যায়, আবারও সে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর আরও একবার কাতরানি, আবারও ঘণ্টা দুয়েক বাদে। এই ভাবে দেখা গেল সারা রাতের মধ্যে মোট তিন বার। পরদিন সকালে ঘুমন্ত লোকটির যখন ঘুম ভাঙল তখন সে অনুযোগ করছে সারা রাত ধরে কে একজন এমনই কাতরাচ্ছিল যে সে একদম ঘুমোতে পারেনি। অবধারিত ভাবে এরকমই তার মনে হবে। মাঝখানে মাঝখানে দুঘণ্টা পরে ঘুমের যে বিরতি, সেই সময় যে সে ঘুমিয়েছিল সেটা তার মনে নেই। মনে থাকল শুধু জাগার সেই মুহূর্তগুলো। সেই কারণেই মনে হচ্ছে যেন সারা রাতই সে ঘুমোতে পারে নি।

"কিন্তু অভিযোক্তা প্রশ্ন তুলবেন, 'তাহলে কেন, কেনই বা স্মের্দিকোভ্ মারা যাবার আগে যে চিরকুটটা লিখে গিয়েছিল সেখানে একথা স্বীকার করল না? বলতে চান বিবেকের তাড়নায় একটা কাজ করল, অথচ আরেকটা করতে পারল না?' কিন্তু মাফ করবেন, বিবেকের তাড়না মানে তো অনুতাপ, কিন্তু যে লোকটা আত্মহত্যা করেছে তার অনুশোচনার কোনো বালাই নাও থাকতে পারত, যা ছিল তা কেবল হতাশা। হতাশা আর অনুশোচনা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। হতাশার মধ্যে এমনই একটা আপসহীন আক্রোশের ভাব থাকতে পারে যে আত্মহননকারী যখন নিজের গায়ে হাত তুলছে সেই মুহূর্তে যাদের সে সারা জীবন ধরে হিংসা করে এসেছে তাদের প্রতি তার মনে দ্বিগুণ ঘৃণার উদ্রেক হওয়া সম্ভব।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, বিচারের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক হোন। আপনাদের সামনে আমি এখন যা যা পেশ করলাম, তুলে ধরলাম সেগুলির মধ্যে বিশ্বাস না করার মতো কী আছে বলুন না। আমার বক্তব্যের মধ্যে যদি কোনো গলদ খুঁজে বের করতে পারেন বলুন। বের করে দেখান না কোথায় কোথায়

সেটা অযৌক্তিক বা অসম্ভব বলে আপনাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু সম্ভাবনার ছায়ামাত্র যদি থাকে, আমার বিবৃতির কোথাও বিশ্বাস করার মতো লেশমাত্র যদি কিছু থাকে তাহলে আসামিকে অপরাধী বলে রায় দান করা থেকে সংযত থাকুন। কিন্তু ছায়ামাত্রই বা বলব কেন? যা কিছু পবিত্র তার নামে শপথ করে বলতে পারি, আমি এখন আপনাদের সামনে যা যা পেশ করলাম, হত্যার ঘটনার যে ব্যাখ্যা আমি এখানে দিলাম আমি নিজে তা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করি। বড়ো কথা, বড়ে কথা হল সেই একটাই চিন্তা, যা আমাকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছে, অস্বস্তি দিচ্ছে—তা এই যে অত যে তথ্য হাজির করে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর পর্বতপ্রমাণ অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলির মধ্যে এমন একটি তথ্যও নেই যাকে অকাট্য বা কতকটা সঠিক বলা গেলেও যেতে পারে। অথচ ওই সমস্ত তথ্যপ্রমাণের যা মোট পরিমাণ একমাত্র তার ঠেলাতেই হতভাগ্য মানুষটি ধ্বংস হতে চলেছে। তথ্যপ্রমাণের মোট পরিমাণ যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা ভয়ঙ্করই বটে। আসামির আঙুল থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে, তার জামাকাপড়ে লেগে রয়েছে রক্তের দাগ, তার ওপর নিশুতি রাত, রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে 'পিতৃঘাতী!' বলে একজনের গলা ফাটিয়ে আর্ত চিৎকার, চিৎকার করতে করতে ধাক্কা খেয়ে মাথায় চোট লেগে লোকটার মাটিতে গড়িয়ে পড়া, তারপর আবার এত লোকের এত কথা, এত সাক্ষ্য, এত রকমের ভাবভঙ্গি, চিৎকার চেঁচামেচি!—ওঃ, এসবের প্রভাব কী বিপুল পরিমাণই না হতে পারে। লোকের মত যে কী পরিমাণে এর বশীভূত হতে পারে সেকি আর আমি বুঝি না। কিন্তু জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্য মহোদয়রা, তাই বলে তা কি আপনাদের মতও কিনে নিতে পারে? মনে রাখবেন, অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী করে আপনাদের অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই ক্ষমতা বলে আপনারা স্থির করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, ক্ষমতা যত প্রবল, প্রয়োগ করার দায়িত্বও তত ভয়ঙ্কর।

"আমি এই মাত্র যা যা বললাম সেখান থেকে আমি এক চুলও নড়ছি না। বেশ তো, না হয় তা-ই হল, না হয় অনুমান করা গেল, ক্ষণিকের জন্য আমিও না হয় আমার হতভাগ্য মক্কেলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সঙ্গে একমত হয়ে অনুমান করলাম যে সে তার বাবার খুনে হাত রাঙিয়েছিল। কিন্তু আমি আবারও বলছি—এটা তো একটা অনুমান মাত্র! আমার মনে মুহূর্তের জন্যও এতটুকু সন্দেহ নেই যে সে নির্দোষ। বললাম ত, না হয় অনুমানই করলাম যে অভিযুক্ত ব্যক্তি, আমার মক্কেল পিতৃহত্যার অপরাধে অপরাধী, কিন্তু তাহলেও—এমনকি আমিও যদি মনে মনে এমন অনুমানের প্রশ্রয় দিয়ে থাকি—তাহলেও একবার মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমার মনের কথাটা। আপনাদের কাছে আরও কিছু একটা বলার জন্য আমার মন উশখুশ করছে। আমার মন বলছে, আমি ভেতরে ভেতরে অনুভব করতে পারছি আপনাদেরও মনের মধ্যে এবং মস্তিষ্কের ভেতরে একটা বড়ো রকমের সংঘাত চলছে। আপনাদের মন আর মস্তিষ্কের উল্লেখ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন

মহাশয়রা। কিন্তু আমি চাই শেষ পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও অকপট থাকতে। আসুন, আমরা সকলেই তাই হই—অকপট হই!

এই জায়গায় এসে করতালিধ্বনির মুখে পড়ে প্রতিবাদী কৌঁসুলির বক্তৃতায় বাধা পড়ল। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, শেষ যে কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করলেন সেগুলির মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠেছিল যে সকলেই মনে মনে অনুভব করতে পারছিল হয়তো বা সত্যি সত্যি বলার মতো কিছু তাঁর আছে এবং এখন তিনি তা বলবেন, আর যা বলবেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সভাপতিমশাই করতালিধ্বনি শুনে উপস্থিত জনসাধারণকে জোর গলায় এই বলে শাসালেন যে 'এ ধরনের ঘটনা ফের ঘটলে' তিনি আদালতকক্ষ 'সাফ করার' নির্দেশ দিতে বাধ্য হবেন। সকলে চুপ করে গেল। এর পর ফেতিউকভিচ্ যখন আবার বলা শুরু করলেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন এক ধরনের নতুন আবেগের সুর বেজে উঠল তিনি সুরে সে এর আগে পর্যন্ত একেবারেই কথা বলেনি।

## তেরো

## চিন্তাভ্রষ্ট

তিনি উচ্চকণ্ঠে শুরু করলেন, "জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মোট যে পরিমাণ তথ্য জমেছে কেবল তার জেরেই যে আমার মক্কেলের সর্বনাশ হতে চলেছে তা নয়। বস্তুতপক্ষে, তার সর্বনাশের কারণ মাত্র একটি তথ্য—সেটা তার বৃদ্ধ পিতার মৃতদেহ! সাধারণ কোনো খুনের ঘটনা হলে এবং সামগ্রিক ভাবে না দেখে প্রতিটি ঘটনাকে পৃথক পৃথক ভাব খুঁটিয়ে দেখলে তথ্যগুলি যে পরিমাণ অসার, কাল্পনিক ও অপ্রমাণিত তাতে আপনারাও অভিযোগ নাকচ করে দিতেন, অথবা অন্ততপক্ষে পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে একজন মানুষের জীবন নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হতেন—যদিও তার দুর্ভাগ্যবশত তার বিরুদ্ধে সে রকম বদ্ধমূল ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে তার নিজেরও যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে! কিন্তু এক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডটা সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়। পিতৃহত্যা বলে কথা! এটা মানুষের মনকে প্রভাবিত করে—এত বেশি মাত্রায় করে যে এমনকি যে ব্যক্তি তার মনের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণার প্রশ্রয় দেয় না তার কাছেও অভিযোগের অতি অসার ও একেবারেই অপ্রমাণিত বিষয়গুলি আর তেমন অসার বা ততটা অপ্রমাণিত বলে মনে হতে থাকে না। তাহলে, এরকম একজন আসামিকে কী করে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়? যদি এমন হয় যে খুন করেছে, তাহলে শাস্তি না পেয়ে পার পেয়ে যাবে—তা কেমন করে হয়? প্রতিটি মানুষ প্রায় তার নিজের অজান্তেই, সহজপ্রবৃত্তি বশে মনে মনে ঠিক এটাই অনুভব করছে।

"ঠিকই তো, পিতৃরক্তপাত—সে বড়ো ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এমন একজন মানুষের

রক্তপাত যিনি আমার জন্মদাতা, যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আমি মানুষ হয়েছি, যিনি আমার জন্য তাঁর নিজের জীবনের কোনো মায়া করেননি, আমার সেই শৈশব থেকেই যিনি আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, যিনি নিজে সারা জীবন কষ্ট ভোগ করেও আমাকে সুখে রেখেছেন, শুধুই আমার আনন্দ, আমার সাফল্য যাঁর সারা জীবনের ধ্যানজ্ঞান। না, এমন একজন পিতাকে হত্যা করা—সে তো ধারণায়ই আনা যায় না! জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, যথার্থ পিতা কাকে বলে? কী অর্থ বহন করে এই মহৎ শব্দটি? কী দারুণ বিপুল ভাবই না নিহিত আছে এই অভিধার অন্তরে! প্রকৃত পিতা কাকে বলে এবং তাঁর কেমন হওয়া উচিত আমরা এখানে অন্তত খানিকটা হলেও তা দেখানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু যে মামলাটি নিয়ে আমরা সকলে এখন এত ব্যস্ত, যার কথা ভেবে আমাদের হৃদয় এত কাতর, আমাদের এই বর্তমান মামলাটির বেলায় আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? পিতা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, যা আমাদের এখনকার মনের কথা, মৃত ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ কারামাজ়ভ্ লোকটা কিন্তু তার একেবারে ধারে কাছে আসে না। এটা একটা দুর্ভাগ্য। বাস্তবিকই কোনো কোনো পিতা সন্তানের পক্ষে দুর্ভাগ্যই বটে। এই দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা একটু কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখা যাক। জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা আগামীতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন তার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কোনো কিছুতেই সঙ্কুচিত হলে চলবে না। বিশেষ ভাবে, কোনো ধারণাকেই ভয় পাওয়া বা উপেক্ষা করে *ঠেলে সরিয়ে দেওয়া* বলতে যা বোঝায় তা করা ঠিক হবে না। সৌভাগ্যবশত, অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী আমাদের অভিযোক্তা মহাশয়ের ভাষায়, এক্ষেত্রে বাচ্চাদের মতো বা মেয়েদের মতো ভীতু হওয়া আমাদের শোভা পায় না। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ—এবং আমি আমার প্রথম কথাটি উচ্চারণ করার আগেই যিনি আমার প্রতিপক্ষ—তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণের মাঝখানে বেশ কয়েকবার এমন কথাও বলেছিলেন 'না, আসামির পক্ষ সমর্থন আমি কাউকে করতে দিচ্ছি না, তাকে সমর্থন করার জন্য পেতের্বুর্গ থেকে যে আইনজীবী এসেছেন তাঁর হাতেও তাকে সমর্থন করার ভার ছেড়ে দিচ্ছি না। আমি অভিযোক্তা, আমিই তার পক্ষসমর্থনকারী কৌঁসুলি।' ঠিক এই কথাই তিনি বলেছিলেন বেশ কয়েকবার। তাহলে কী হবে, একটা কথা উল্লেখ করতে কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন। এই ভয়ঙ্কর আসামিটি ছোটোবেলায় যখন তার পিতৃগৃহে ছিল সেই সময় একমাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকে যে আদর পেয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকে যে আধ পাউন্ড বাদাম পেয়েছিল একমাত্র সেই জন্য যদি এই দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে এতটা কৃতজ্ঞ থাকতে পারে, তাহলে কেনই বা সেই একই মানুষ এই তেইশ বছর ধরে অন্য দিক থেকে মনে করে রাখতে পারবে না পিতৃগৃহে তার জীবনের আরও একটি ঘটনার কথা, যখন সে—আমাদের মানবদরদি ডাক্তার হের্‌ৎসেন্‌শ্টুব্-এর ভাষাতেই বলছি—'একটিমাত্র

বোতামের ওপর সম্বল একটি প্যাণ্ট পরে খালি পায়ে বাড়ির পেছনের উঠোনে ছুটোছুটি করে বেড়াত'?

"হায়, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, কেন এই 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে' আরও কাছ থেকে আমাদের এত করে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা? কী দরকার আবার নতুন করে সেই প্রসঙ্গ তোলার যা ইতিমধ্যে সবারই জানা আছে? এখানে বাবার কাছে আসার পর কী দেখতে পেল আমার মক্কেল? আমার মক্কেলকে যে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর একটা অমানুষ দানব বলে দেখানো হচ্ছে সেটা কেন? কী কারণ বলুন তো? সে অসংযত, বন্য, উদ্দাম প্রকৃতির—তাই আমরা এখন তার বিচার করতে বসেছি, কিন্তু কে তার এই দুর্দশার জন্য দায়ী? তার এত সব সুকুমার প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও, তার অন্তঃকরণ এত উদার, এত স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও সে যে ঠিকমতো শিক্ষা পেল না, মানুষ হয়ে উঠতে পারল না তার জন্য কে দায়ী? তার ছোটোবেলায় কেউ কি তার প্রতি এতটুকু স্নেহ মায়া মমতা দেখিয়েছে? আমার মক্কেলকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সে সেই ভাবেই একটা বন্য পশুর মতো বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনও তো হতে পারে যে বহু বছরের বিচ্ছেদের পর সে তার বাবাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল? হতেও পারে যে স্বপ্নের ঘোরে আবছা দেখার মতো তার সেই শৈশবস্মৃতি তার মনের মধ্যে হানা দিতে না দিতে বারবার শৈশবের সেই বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী অপচ্ছায়াকে সে মন থেকে দূর করার চেষ্টা করত এবং সর্বান্তঃকরণে বাপকে ক্ষমা করে দিয়ে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখানে এসে সে কী দেখল? বিতর্কিত কিছু টাকার কারণে তাকে স্রেফ সিনিক ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রুপ, সন্দেহের বিষদৃষ্টি আর তুচ্ছ আইনি দরকষাকষির মুখে পড়তে হল। রোজ রোজ ব্র্যান্ডি নিয়ে টেবিলে বসে বাপ ছেলেকে অনবরত এমন সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়ে যেতে লাগল এবং এমন সমস্ত সাংসারিক উপদেশ দিয়ে যেতে লাগল যা শুনতে শুনতে তার মনটাই বিগড়ে গেল। শেষকালে সে দেখতে পেলযে টাকা তার প্রাপ্য তাই দিয়ে তার নিজের বাপ তার কাছে থেকে—ছেলের কাছ থেকে তার প্রণয়িনীকে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে। হায়, ভদ্রমহোদয়রা, এ যে অতি ন্যক্কারজনক, চরম নিষ্ঠুরতা! অথচ এই বুড়োই কিনা আবার লোকের কাছে তার প্রতি ছেলের অশ্রদ্ধা আর নিষ্ঠুরতার অনুযোগ করছে! সর্বসমক্ষে সে তার ছেলেকে হেয় করছে, তার অনিষ্ট সাধন করছে, তার বদনাম করে বেড়াচ্ছে, তাকে জেলে পোরার উদ্দেশ্যে তার সই করা ঋণপত্রগুলি কিনে নিচ্ছে!

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমার মক্কেলের মতো যারা বাইরে দেখতে গেলে নিষ্ঠুর, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির তারা কিন্তু অনেক সময়ই ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত কোমল। শুধু সেটা তারা বাইরে প্রকাশ করে না। হাসবেন না, আমার এই ধারণার কথা শুনে হাসবেন না আপনারা। আমাদের প্রতিভাবান অভিযোক্তা মহাশয় এই কিছু আগে নিষ্ঠুর পরিহাসের সুরে আমার মক্কেলের উদ্দেশে

মন্তব্য করেছিলেন যে সে একজন শিলার ভক্ত, 'মহৎ ও সুন্দরের' ভক্ত। তাঁর জায়গায়—অভিযোক্তা মহাশয়ের জায়গায় আমি হলে কিন্তু এই নিয়ে হাস্যপরিহাস করতাম না। হ্যাঁ, এই গোত্রের মানুষগুলোর পক্ষে, এদের সমর্থনে আমার কিছু বলার আছে। লোকে এদের খুব কম বোঝে, বড় বেশি ভুল বোঝে! এই ধরনের মানুষগুলোর হৃদয়ই কিন্তু বড় বেশি ঘন ঘন কোমল ও সুকুমার অনুভূতি আর ন্যায়বিচারের কাঙাল হয়ে পড়ে—অনেকটা যেন তাদের নিজেদের চরিত্রের, তাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি আর নিষ্ঠুরতার বিপরীতে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, কাঙাল হয়ে পড়েই বলব! বাইরে প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ আর রূঢ় স্বভাবের এরাই কিন্তু আবার, দৃষ্টান্তস্বরূপ, দেখতে পাবেন যাবতীয় দুঃখকষ্ট বরণ করে একজন নারীকে ভালোবাসতে পারে এবং অবশ্যই অতি উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক প্রেমের ক্ষমতা রাখে। আবারও বলছি, হাসবেন না আমার কথায়। যা বলছি ঠিকই বলছি। এই সব স্বভাবের বেলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়ে থাকে। এদের অসুবিধাটা এই যে এরা নিজেদের ভাবাবেগ লুকিয়ে রাখতে পারে না, সময় সময় তাই তার প্রকাশটা অত্যন্ত স্থূল ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু সেটাই লোকের চোখে পড়ে, অথচ মানুষের ভেতরটা কেউ দেখে না। বরং আমি বলব, ওদের সমস্ত ভাবাবেগের আবার অতি দ্রুত উপশমও ঘটে। কিন্তু মহৎ ও উন্নত কোনো হৃদয়ের সান্নিধ্য পেলে তার সংস্পর্শে আপাত দৃষ্টিতে অমার্জিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই মানুষটিই নবজীবনের সন্ধান করে নিজেকে সংশোধনের সুযোগ খোঁজে, ভালো হতে চায়, মহৎ ও সৎ হতে চায়—'মহৎ ও সুন্দর' হতে চায়—তা কথাটা নিয়ে যত হাসাহাসিই করা হোক না কেন!

"কিন্তু আগে আমি বলেছিলাম শ্রীমতী ভের্খোভ্‌ৎসেভার সঙ্গে আমার মক্কেলের রোমান্সের বিষয়টি স্পর্শ করা স্পর্ধা আমার নেই। তবে কিছু না হলেও অন্তত অর্ধেকটা কথা তো বলাই যেতে পারে। আমরা এই মাত্র তাঁর মুখ থেকে যা শুনতে পেলাম সেটা আর যা-ই হোক, কোনও এজাহার নয়—একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ মহিলার উন্মত্ত চিৎকার মাত্র। আমার কথা হল, বিশ্বাসভঙ্গের জন্য নিন্দা করা তাঁর মুখে শোভা পায় না, আদৌ শোভা পায় না, কারণ তিনি নিজেই বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। ভেবেচিন্তে দেখার মতো অন্তত সামান্য একটু সময়ও যদি তাঁর থাকত তাহলে এরকম এজাহার তিনি দিতে যেতেন না! না, না, ওঁকে বিশ্বাস করবেন না! আমার মক্কেলকে উনি 'নৃশংস' অত্যাচারী বলুন আর যা-ই বলুন, আসলে সে মোটেই তা নয়!

"আমাদের ক্রুশবিদ্ধ মানবপ্রেমী প্রভু ক্রুশে আরোহণের প্রাক্কালে বলেছিলেন: 'আমিই সদাশয় মেষপালক। সদাশয় মেষপালক তাহার মেষপালের নিমিত্ত জীবনপাত করে যাহাতে তাহাদিগের একটিও বিনষ্ট না হয় ' আমরাও যেন একটি মানব প্রাণকে বিনষ্ট না করি!

“এই মাত্র আমি প্রশ্ন করেছিলাম 'পিতা' বলতে কী বোঝায় এবং বলেছিলাম যে এটি একটি মহৎ শব্দ, এক মহামূল্যবান আখ্যা। কিন্তু হে জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এই শব্দটিকে ব্যবহার করতে হলে সততার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমি কোনো বিষয়কে তার নিজস্ব অভিধায়, নিজস্ব নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। আমি ভরসা করে বলতে পারি নিহত বৃদ্ধ কারামাজভের মতো একজন পিতা 'পিতা' নামে আখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি পিতা নামের অযোগ্য এমন একজন পিতাকে ভালোবাসা—সে তো অসম্ভব, অর্থহীন! ভালোবাসা শূন্য থেকে গড়ে তোলা যায় না, শূন্য থেকে সৃষ্টি কেবলই ঈশ্বরই করতে পারেন।

“'হে পিতৃগণ, তোমরা স্বীয় সন্তানদিগকে মনস্তাপ দিয়ো না'—প্রেমের আলোকশিখায় উদ্দীপিত হৃদয়ে ভগবদ্বাক্যপ্রচারক তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমি এখন এই যে পবিত্র বাণীর উল্লেখ করছি তা শুধু আমার মক্কেলের খাতিরে নয়, তাবৎ জন্মদাতা পিতার কথা মনে করেই বলছি। প্রশ্ন করবেন, পিতাদের শেখানোর এই অধিকার আমাকে কে দিয়েছে? না, কেউ দেয়নি। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে, জাগতিক চেতনাসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে এটা আমার একটা আবেদন — vivos & voco*—জীবিতদের প্রতি আমার আহ্বান! আমরা ধরাধামে দীর্ঘদিনের জন্য আসিনি। আমরা অনেক দুষ্কর্ম করে থাকি, অনেক অ-কথা কু কথা বলে থাকি। এই কারণেই আসুন, আমরা সকলে মিলে আমাদের এক সঙ্গে মেলামেশার এমন একটা উপযুক্ত মুহূর্ত বের করি যখন আমরা একে অন্যকে ভালো কথা বলতে পারি। আমি সেটাই করছি আপাতত যখন আমি এরকম একটা জায়গায় আছি, আমি আমার সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করছি। যিনি আমাদের সর্বনিয়ন্তা তাঁর কৃপায় আমরা এই যে মঞ্চে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার পেয়েছি সেটা অমনি অমনি নয়—সারা রাশিয়া এখান থেকে আমরা কী বলি তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। শুধু এখানে উপস্থিত পিতাদের উদ্দেশেই বলছি না, পিতা মাত্রের প্রতিই আমার সোচ্চার আহ্বান 'হে পিতৃগণ, তোমরা স্বীয় সন্তানদিগকে মনস্তাপ দিয়ো না!' ঠিক কথা, আসুন, আগে আমরা নিজেরা খ্রিস্টের বিধান পালন করি, কেবল তার পরই না আমরা আমাদের সন্তানদের প্রশ্ন করতে পারি! অন্যথায় আমরা পিতা নই, আমরা আমাদের সন্তানদের শত্রু, আর আমাদের সন্তানেরাও আমাদের সন্তান নয়, তারা আমাদের শত্রু এবং আমরা নিজেরাই তাদের শত্রু বানিয়েছি! 'যে পরিমাপ তুমি গ্রহণ করিবে তদ্দ্বারা তুমিও পরিমাপিত হইবে'—এটা আমার মুখের কথা নয়, সুসমাচারেই এই বিধান লিখিত আছে। যে পরিমাপে তোমাকে পরিমাপ করা হচ্ছে তাই দিয়ে অন্যদেরও পরিমাপ কর। তাই সন্তানরা যদি আমাদের মাপকাঠিতে আমাদের পরিমাপ করে সেক্ষেত্রে তাদের দোষটা কোথায়?

---

লাতিন

"সম্প্রতি ফিনল্যান্ডে একটি ঘটনা ঘটেছে। একটা মেয়েকে, কোনো এক দাসীকে সন্দেহ করা হচ্ছিল যে সে গোপনে একটি সন্তান প্রসব করেছে। তার ওপর নজর রাখা হতে বাড়ির চিলেকোঠার এক কোনায় ইটের পাঁজার পেছনে তার একটা তোরঙ্গ পাওয়া গেল, যেটার অস্তিত্ব এর আগে পর্যন্ত কারও জানা ছিল না। তোরঙ্গটা খুলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো তারই হাতে নিহত তার সদ্যোজাত শিশু সন্তানের মৃতদেহ। ওই একই তোরঙ্গের মধ্যে পাওয়া গেল আরও দুটি নবজাত শিশুর কঙ্কাল। ওই দুই শিশুকে সে এর আগে প্রসব করেছিল এবং পরে তার স্বীকারোক্তি থেকে এও জানা গেল যে তাদেরও সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেছিল।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমার প্রশ্ন হল একে কি সন্তানের জননী বলব? হ্যাঁ সে জন্ম দিয়েছিল বটে, কিন্তু তাই বলে কি সে সন্তানের মা? আমাদের মধ্যে কার এমন স্পর্ধা আছে যে তার প্রসঙ্গে এই পবিত্র শব্দটি উচ্চারণ করবে? জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের সাহসী হতে হবে, এমনকি দুঃসাহসী হতে হবে, আর এই মুহূর্তে এরকম হওয়াটা আমাদের কর্তব্যও বটে। কারও কোনো কথায় কোনো ধারণায় আমাদের ভীত হলে চলবে না। আমরা মস্কোর সেই বেনে বৌদের মতো হব নাকি ধাতুর সামান্য আওয়াজে বা জুজুবুড়ির নাম শোনামাত্র ভয়ে যাদের হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়?[৬২] না, বরং এটাই প্রমাণ করব যে গত কয়েক বছরে সমাজের যে উন্নতি হয়েছে তা আমাদেরও স্পর্শ করেছে। তাই আসুন আমরা সোজাসুজি বলি, জন্ম দিলেই পিতা হওয়া যায় না। পিতা তাকেই বলব যে জন্ম দিয়েছে এবং সেই নামের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

"তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে 'পিতা' শব্দটির অন্য আরেকটি অর্থ, আরেকটি ব্যাখ্যাও আছে, যাতে দাবি করা হয়ে থাকে যে আমার বাবা সে যতই অমানুষ হোক না কেন, তার সন্তানের যত অনিষ্টই সাধন করুক না কেন সে আমার বাবাই থেকে যাচ্ছে, *স্রেফ* এই কারণেই যে যে সে আমার জন্মদাতা। কিন্তু এই অর্থটা, বলা যেতে পারে, রহস্যময়, আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। এটা গ্রহণ করতে পারি কেবল বিশ্বাসের দ্বারা, অথবা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, *বিশ্বাসের ভিত্তিতে*— যেমন আরও এমন সব জিনিস আমরা গ্রহণ করে থাকি যা আমরা বুঝতে পারি না, অথচ ধর্মবিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত করে। তা-ই যদি হয়, তাহলে তা না হয় আমাদের বাস্তবজীবনক্ষেত্রের বাইরেই থাকল। কিন্তু বাস্তব জীবনের যেমন নিজস্ব কতকগুলি অধিকার আছে তেমনি তা নিজেও আমাদের ওপর কিছু কর্তব্য এবং দায়িত্বও ন্যস্ত করে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি মানবিক হতে চাই এবং সর্বোপরি একজন সৎ খ্রিস্টান হতে চাই তাহলে আমাদের উচিত হবে, অবশ্য কর্তব্য হবে বুদ্ধিভ্রংশের মতো কোনো স্বপ্ন বা বিকারের ঘোরে কাজ করে মানুষের ক্ষতি

সাধন না করে, তাকে যাতনা না দিয়ে, তার সর্বনাশ না ঘটিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত এবং একমাত্র আমাদের যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত দৃঢ় প্রত্যয় অনুসারে—এক কথায়, বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করা। তখন, ঠিক তখনই তা আর শুধু রহস্যময় থাকবে না হয়ে উঠবে যথার্থ খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর কাজ, বিচক্ষণ ও প্রকৃত মানবপ্রেমের কাজ।

এই জায়গায় হলঘরের বহু প্রান্ত থেকে তুমুল করতালিধ্বনি ওঠায় ভাষণে বাধা পড়ার উপক্রম হল, কিন্তু ফেতিউকভিচ হাত নেড়ে ইশারায় তাঁকে বাধা না দিয়ে শেষ করার সুযোগ দেবার জন্য শ্রোতাদের কাছে অনুনয় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা নেমে এলো। বক্তা আবার তাঁর ভাষণ শুরু করলেন।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এসব প্রশ্ন কি আমাদের সন্তানরা এড়িয়ে যেতে পারে—বিশেষত যাদের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটেছে, বিশেষত যারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে শুরু করেছে? না, তা পারে না। তা এরকম একটা অসম্ভব ধরনের সংযম তাদের কাছ থেকে আমরা দাবি করতে যাব না। একজন অযোগ্য পিতার যা প্রকৃতি তা তার অল্পবয়সি সন্তানের মনে আপনা থেকেই বেদনাভারাক্রান্ত প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে—বিশেষত যখন সে তারই সমবয়সি অন্যান্যদের যোগ্য পিতাদের সঙ্গে তার নিজের পিতার তুলনা করে। সে তার প্রশ্নের প্রথাগত যে উত্তরটি পায় তা এই যে 'তিনি তোমার জন্মদাতা, তুমি তাঁর শোণিত, তাই তোমার উচিত তাঁকে ভালোবাসা।' তরুণ বালক আপনা থেকেই ভাবিত হয়ে পড়ে। উত্তরোত্তর বেশি করে আশ্চর্য হয়ে সে নিজের মনে প্রশ্ন করে 'আচ্ছা সে যখন আমার জন্ম দিচ্ছিল সেই মুহূর্তে সে কি আমাকে ভালোবেসেছিল? আমার জন্যই কি আমাকে জন্ম দিয়েছিল? সে তো আমাকে জানতই না, আমি স্ত্রী না পুরুষ তাও তো জানত না তার কামনার সেই মুহূর্তটিতে, অথবা হয়তো বা সুরার প্রভাবে উত্তেজিত সেই মুহূর্তটিতে? আমাকে দেবার মধ্যে দিয়েছে তো শুধুই মাতলামির প্রবণতা—তার উপকারের তো এই নমুনা! তাহলে কেন আমি তাকে ভালোবাসতে যাব শুনি? স্রেফ এই কারণে যে সে আমার জন্ম দিয়েছে, আর তারপর সারা জীবন অবহেলা করে ফেলে রেখেছে?'

"বুঝতে পারছি, এই প্রশ্নগুলি হয়তো আপনাদের কাছে স্থূল ও নির্মম প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে একটি তরুণ বালকের কাছ থেকে যা সম্ভব নয় সে রকম সংযম প্রত্যাশা করতে যাবেন না। 'প্রকৃতিকে যতই ঠেল দুয়ার থেকে দূরে, জানলা দিয়ে আসবে আবার উড়ে।'[৬৫] বড়ো কথা, বড়ো কথা এই যে 'ধাতুর আওয়াজে' বা 'জুজুবুড়ির' নাম শুনে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। কোনো রহস্যময় ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়, আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা, আমাদের মানবপ্রেম যেমন নির্দেশ দিচ্ছে সেই অনুযায়ী প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। কী ভাবে সমাধিত হবে? কেন? হবে এই ভাবে ছেলে তার বাবার সামনে দাঁড়াক,

দাঁড়িয়ে সাহস করে তার বাবাকেই প্রশ্ন করুক, 'বল দেখি বাবা, তোমাকে আমার ভালোবাসা উচিত?' এরপর যদি সেই বাবার উত্তর দেবার মতো ক্ষমতা থাকে এবং যদি সে তাকে সঠিক প্রমাণ দিতে পারে তাহলে বলব হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সত্যিকারের স্বাভাবিক পারিবারিক বন্ধন অটুট আছে। নিছক কোনো রহস্যময় সংস্কারের জোরে নয়, মানুষের বুদ্ধিবিবেচনা, তার নিজেকে যাচাই করার ক্ষমতা আর সুদৃঢ় মানবতাবোধের ওপর এর প্রতিষ্ঠা। অন্যথায় বাপ যদি প্রমাণ না দিতে পারে তাহলে সেখানেই পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সে ব্যক্তি তার পুত্রের কাছে আর পিতা নয়; পুত্র অতঃপর, ভবিষ্যতে তার পিতাকে পর বলে, এমনকি তার শত্রু বলে গন্য করার অধিকার ও স্বাধীনতা পায়। জুড়িমন্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি তা সততা ও সুস্থবুদ্ধির পাঠশালা হওয়া উচিত।"

এখানে করতালিধ্বনি এমনই অদম্য ও উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল যে বক্তার ভাষণে ছেদ পড়ল। অবশ্য এমন নয় যে পুরো হলঘরটাই করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়েছিল, তবে নয় নয় করে আদালতকক্ষের অর্ধেকটা তো বটেই। উপস্থিত বাবা-মা'রা করতালিধ্বনি দিলেন। ওপরে, যেখানে মহিলারা বসে ছিলেন সেখান থেকে আর্তনাদ ও চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এলো, মহিলারা হাতের রুমাল নাড়াতে লাগলেন। সভাপতি মশাই লোকজনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে হাতের ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, আদালতকক্ষে উপস্থিত লোকজনের আচরণে তিনি রীতিমতো বিরক্ত। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যেরকম আদালতকক্ষ 'সাফ করার' হুমকি দিয়েছিলেন এখন আর সে কথা বলার মতো সাহস তাঁর হল না। এমনকি পেছনে বিশেষ চেয়ারে উচ্চপদস্থ যে সমস্ত ব্যক্তি বসে ছিলেন, যাদের টেইল কোটের বুকের ওপর তারকাচিহ্নিত পদক আঁটা সেই বৃদ্ধরা পর্যন্ত হাততালি দিলেন, রুমাল নেড়ে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। ফলে অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে কোলাহল যখন স্তিমিত হয়ে এলো একমাত্র তখনই আগেকার মতো কড়া ভাষায় আদালতকক্ষ 'সাফ করার' প্রতিশ্রুতি দিয়ে সভাপতি মশাইকে ক্ষান্ত থাকতে হল। এর পর উত্তেজিত ও উল্লসিত ফেতিউকভিচ্ আবার তার ভাষণ শুরু করল।

"জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সেই ভয়ঙ্কর রাতটার কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, যার কথা আমরা আজও অনেক বলেছি, যখন ছেলে বেড়া ডিঙিয়ে তার বাপের বাড়ির ভেতরে ঢুকে শেষকালে তারই জন্মদাতা, তার শত্রু ও অনিষ্টকারীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। আমি খুব জোর দিয়েই বলছি সেই মুহূর্তে সে যে ছুটে এসেছিল তা টাকার জন্য নয়। তার বিরুদ্ধে লুটপাট করার অভিযোগ অর্থহীন—একথা আমি আগেই বলেছি। সে যে জোর করে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল তা খুন করার উদ্দেশ্যে নয়—মোটেই নয়। যদি পূর্বপরিকল্পিত কোনো অভিসন্ধি থাকত তাহলে আগে থাকতে অন্তত পক্ষে একটা অস্ত্র জোগাড় করার কথা চিন্তা করত। তামার নোড়াটা যে তুলে নিয়েছিল সেটা নেহাৎ সহজাত প্রবৃত্তির বশে—সে নিজেই

জানত না, কেন। ধরলাম সে জানলায় সঙ্কেত করে বাবার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম, ধরলাম সে জোর করে তার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল—আমি আগেই বলেছি মুহূর্তের জন্যও ওই গল্পে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই, কিন্তু আপনারা যখন বলছেন না হয় তা-ই হল, না হয় মুহূর্তের জন্য সেটাও ধরে নিলাম। জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা যার নামে বলেন তার নামে, অর্থাৎ যা কিছু পবিত্র তার নামে আমি হলফ করে বলতে পারি অনিষ্টকারী লোকটা যদি তার বাবা না হয়ে বাইরের কেউ হত সেক্ষেত্রে এঘর ও ঘর ছুটোছুটি করে খুঁজে যখন সে নিঃসন্দেহ হত যে স্ত্রীলোকটি সে বাড়িতে নেই তখন সে তিরবেগে ছুটে পালিয়ে যেত, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কোনো ক্ষতি সাধন করত না, হয়ত দু এক ঘা মারত, ধাক্কা দিত—এর বেশি কিছু নয়, কেন না তার সে ফুরসৎ ছিল না, নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে ছিল না। তার তখন জানা দরকার ছিল সেই স্ত্রীলোকটি তাহলে কোথায়। কিন্তু তার বাবা! তার শিশুকাল থেকে এই বাবা তাকে ঘৃণা করে এসেছে, তখন থেকে সে তার শত্রু, তার অনিষ্টকারী—এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার দানবীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। এহেন বাপের চেহারাটাই তো যা ঘটার তা ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল! তার নিজের অজান্তেই একটা ঘৃণার অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, যা ছিল দুর্নিবার, যার বিচার করা তার অসাধ্য ছিল। এক পলকে সব উঠে এলো। এটা ছিল স্নায়বিক উত্তেজনার একটা ঘোর, এক ধরনের উন্মত্ততা, কিন্তু প্রকৃতির এমনই এক ঘোর উন্মাদনা যা তার অন্তর্গত সমস্ত কিছুর মতোই অপ্রতিহত গতিতে, অজ্ঞাতসারে তার চিরন্তন নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

"কিন্তু এক্ষেত্রেও বলব, যাকে খুনি বলছেন, সে খুন করেনি। আমি এটা জোর দিয়ে বলছি, জোর গলায় বলছি। না, তা সে করেনি। প্রবল বিতৃষ্ণা ও ক্রোধের বশে সে হাতের নোড়াটা ঘুরিয়েছিল মাত্র, খুন করার কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না, সে জানত না যে খুন করবে। ওই সর্বনাশা নোড়াটা যদি তার হাতে না থাকত তাহলে সে হয়তো তার বাবাকে একটু আধটু মারধর করে ছেড়ে দিত, কিন্তু খুন করতে যেত না। যখন সে ছুটে পালিয়ে গেল তখনও সে জানত না যে তার আঘাতে ধরাশায়ী বুড়ো লোকটা নিহত হয়েছে কিনা। এ ধরনের খুনকে খুন বলে না। এ ধরনের হত্যাকে পিতৃহত্যা বলে না। একমাত্র সংস্কারের বশবর্তী হয়েই এ ধরনের হত্যাকে পিতৃহত্যা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে!

"কিন্তু কথাটা হচ্ছে, তাই কি হয়েছিল? সত্যি সত্যিই কি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল? আমি আবারও, বারবার করে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলছি, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনাদের কাছে এই আবেদন রাখছি দেখুন, আমরা আসামিকে অপরাধী করছি বটে, কিন্তু সে মনে মনে বলবে, 'আমার ভবিষ্যতের জন্য, আমার শিক্ষাদীক্ষার জন্য, আমি যাতে ভালো হই, যাতে মানুষ হয়ে উঠি তার জন্য এই লোকগুলো কিছুই করেনি। এরা আমাকে খেতে দেয় নি,

পান করার জন্য জলটুকু পর্যন্ত দেয়নি, আমি যখন নগ্ন অবস্থায় অন্ধ কারায় আবদ্ধ ছিলাম তখন আমাকে একবার দেখতেও আসেনি, এরাই কিনা আমাকে ঘানি টানতে পাঠিয়ে দিচ্ছে! সব শোধবোধ হয়ে গেছে, চিরকালের জন্য হয়ে গেছে। এখন ওদের কাছে আমার কোনও ঋণ নেই, কারও কাছে আমার কোনও ঋণ নেই। ওরা কুটিল, আমিও কুটিল হব। ওরা নির্দয়, আমিও নির্দয় হব।' এই কথাই না সে বলবে মাননীয় মহাশয়রা! আমি হলফ করে বলছি  আপনারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে কেবল তার মনের ভার লাঘব করে দিচ্ছেন, তার বিবেকের বোঝা হালকা করে দিচ্ছেন মাত্র। যে রক্তপাত সে করেছে তার জন্য সে শাপশাপান্ত করবে, কিন্তু আক্ষেপ করবে না। সেই সঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠার যাও বা সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল সেটুকুও আপনারা নষ্ট করে দিচ্ছেন, কারণ কুটিলতা আর অন্ধত্ব সারা জীবনের মতো তার মধ্যে রয়ে যাবে।

"কিন্তু আপনারা কি তাকে শাস্তি দিতে চান? যতদূর কল্পনায় আনা যায় ভয়ঙ্কর, ভয়াল ও চরম বিভীষিকাময় এমন কোনো শাস্তি দিতে চান, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই দিতে চান যাতে তাকে উদ্ধার করা যায়, চিরকালের মতো তার আত্মার পুনর্জন্ম ঘটানো যায়। যদি তা-ই হয় তাহলে আপনাদের করুণা দিয়ে আপনারা তাকে দমন করুন! দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন তারা অন্তরাত্মা কী রকম কম্পিত হয়, আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সে আত্মহারা হয়ে বলে উঠবে, 'এত দয়া, এত ভালোবাসা—এ আমি সইব কী করে? আমি কি এর যোগ্য?'

"না, না, আমি জানি, এ হৃদয় আমি জানি—বন্য, কিন্তু কৃতজ্ঞ, মনে রাখবেন জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ। আপনাদের এই মহানুবতার সামনে সে হৃদয় আনত হবে। মহৎ প্রেমের জন্য কাঙাল সে হৃদয় উদ্দীপিত হয়ে উঠবে, চিরতরে তার পুনরুজ্জীবন ঘটবে। এমন সমস্ত মানুষ আছে যারা তাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তের দরুন পৃথিবীসুদ্ধ সকলের ওপর দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু সেরকম অন্তঃকরণকে করুণা দিয়ে অবদমন করার চেষ্টা করুন, তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করুন, দেখবেন সেই মানুষ তার নিজের অপকর্মকে ধিক্কার দেবে, যেহেতু তার মধ্যে কত শুভ সম্ভাবনাই না আছে! সে ব্যক্তির হৃদয় সম্প্রসারিত হবে, সে দেখতে পাবে যে ঈশ্বর করুণাময়, মানুষ কত সুন্দর, কত ন্যায়পরায়ণ। সে আঁতকে উঠবে, সে অনুশোচনায় দগ্ধ হবে, এর পর থেকে ভবিষ্যতের যে বিরাট দায়িত্ব তার ওপর এসে বর্তাল তার ভারে সে অবদমিত হবে। তখন সে আর বলবে না  'আমি আমার দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়েছি', তার বদলে সে বলবে: 'আমি সবার কাছে অপরাধী, আমি নরাধম, সবার চেয়ে অযোগ্য।' অনুশোচনায় অশ্রু বিসর্জন করতে, করতে বেদনায় দগ্ধ হয়ে বিগলিত চিত্তে সে বলে উঠবে: 'অন্যেরা আমার চাইতে ভালো, কেন না তারা আমাকে ধ্বংস না করে আমার উদ্ধার সাধন করতে চাইছে!' এটা করা, এই করুণা প্রদর্শন করা আপনাদের পক্ষে কতই না সহজসাধ্য! কেন

না সত্যিকারের সাক্ষ্যপ্রমাণের মতো প্রায় কিছুরই অস্তিত্ব না থাকায় আপনাদের পক্ষে এমন কথা উচ্চারণ করা বড়োই কঠিন হবে যে 'হ্যাঁ সে অপরাধী।'

"একজন নিরপরাধকে শাস্তি না দিয়ে যদি দশজন অপরাধীকে ছেড়ে দিতে হয় বরং তাও ভালো। আমাদের বিগত শতাব্দীর গৌরবময় ইতিহাসের উদাত্ত কণ্ঠের এই আহ্বান আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি? আপনাদের শ্রুতিগোচর হচ্ছে কি? আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে কি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া শোভা পায় যে রুশদেশের বিচারব্যবস্থার অর্থ কেবল অপরাধীর শাস্তিবিধান করাই নয়, পতিত মানুষের উদ্ধারসাধনও বটে! আইনের অক্ষর ও সাজা দেওয়ার বিধান অন্য সব জাতি মানতে হয় মানুক, কিন্তু আমরা ভাবি আইনের মূল নীতি ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথা, পতিত মানুষের উদ্ধারসাধন ও তার পুনরুজ্জীবনের কথা। যদি তা-ই হয়, রাশিয়া এবং তার বিচারব্যবস্থা যদি বাস্তবিকই তা-ই হয় তাহলে বলব উন্মত্তবেগে ধাবমান আপনাদের ওই যে তিন ঘোড়ার গাড়ি, যা দেখে আর সব জাতি বিতৃষ্ণায় পাশে সরে দাঁড়ায় তাই দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবেন না, ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না। উন্মত্তগতি কোনো তিন ঘোড়ার গাড়ি নয়, মহিমামণ্ডিত রাশিয়ার মহারথই সগৌরবে, ধীরস্থির গতিতে, রাজকীয় মহিমায় তার লক্ষ্যে পৌঁছুবে। আমার মক্কেলের ভাগ্য আপনাদের হাতে, আপনাদের হাতেই রয়েছে রাশিয়ার ন্যায়বিচারের ভার। আপনারাই তা বাঁচিয়ে রাখবেন, তার সমর্থনে দাঁড়াবেন, আপনারাই প্রমাণ করবেন যে তা পালন করার মতো লোক আছে, যোগ্য লোকের হাতেই তার ভার ন্যস্ত হয়েছে!"

## চোদ্দ

## গেঁয়ো ভূতগুলো তাদের গোঁ ধরে রইল

এই ভাবে ফেতিউকভিচ্ তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ এবারে দুর্বারগতি ঝটিকার মতো প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। তাদের সামাল দেবার চেষ্টার তখন আর কোনো অর্থ হয় না মহিলারা কেঁদে ভাসাল, পুরুষদের মধ্যে অনেকে, এমনকি দুজন আধিকারিকও অশ্রু বিসর্জন করল। সভাপতিমশাইকে নতি স্বীকার করতে হল, এমন কি তিনি ঘণ্টা বাজাতে গড়িমসি করতে লাগলেন। মহিলারা এ প্রসঙ্গে পরে চেঁচিয়ে এও বলেছিল যে 'এরকম উৎসাহ উদ্দীপনার ওপর আঘাত হানা পুণ্যস্থানের ওপর হামলা করার শামিল।' বক্তা নিজেও রীতিমতো উচ্ছ্বসিত।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্ তাঁর কিছু আপত্তি নিয়ে 'মতবিনিময়ের জন্য আরও একবার উঠে দাঁড়াল। লোকে তাঁর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল। 'সে কী কথা? এর অর্থ কী? এত কিছুর পরও আপত্তি উনি তোলেন কোন্ সাহসে?' মহিলারা কলধ্বনি করে উঠল। কিন্তু অবস্থাটা তখন এমনই যে

বিশ্বসুদ্ধ সকল মহিলা যদি কলধ্বনি তুলত, এবং তাদের পুরোভাগে আমাদের প্রসিকিউটর ইপ্পলিত কিরিল্লভিচের অর্ধাঙ্গিনী নিজেও থাকতো তাহলেও সেই মুহূর্তে তাঁকে থামানো যেত না। তিনি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন। এমনকি প্রথম যে কথাগুলি, যে বাক্যগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেগুলি কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল। তিনি ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলেন, কথা ভালোমতো উচ্চারণ করতে পারছিলেন না, পদে পদে তাঁর কথা আটকে যাচ্ছিল। সে যাই হোক অচিরেই সামলে উঠলেন। কিন্তু তাঁর এই দ্বিতীয় বক্তৃতা থেকে আমি শুধু অংশবিশেষ তুলে ধরব।

আমাদের এই বলে নিন্দা করা হচ্ছে যে আমরা নাকি একটা গল্পকথা ফেঁদেছি। কিন্তু প্রতিবাদী কৌঁসুলির বেলায় কী দাঁড়াল? তিনি যা বললেন তা গল্পের ওপরে গল্প নয়তো কী? অভাব কেবল কিছু কবিতার। ফিয়োদর পাভ্‌লভিচ্ তার প্রেয়সীর অপেক্ষায় থেকে থেকে খামটা ছিঁড়ে খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। লোকটা যখন এই অদ্ভুত কাজ করছিল তখন সে কী বলেছিল এমনকি সে কথাও আমাদের বলা হয়েছে। এটা কাব্যি নয়তো কী? টাকা যে বের করে নিয়েছিল তার প্রমাণ কোথায়? সে কী বলেছিল তা কে শুনেছে? জড়বুদ্ধি ইডিয়ট স্মের্দিকোভ্ এক ধরনের বায়রনীয় রোমান্টিক নায়কে পরিণত হয়ে কিনা তার অবৈধ জন্মের জন্য সমাজের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল!—এটা কি বায়রনীয় রুচির একটা কাব্যি হল না? আর যে ছেলে জোর করে তার বাবার বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাকে খুন করল, আবার সেই একই নিশ্বাসে বলা হচ্ছে যে খুন করে নি—এটাকে কী বলব? এটা কোনো রোমান্স নয়, কোনো কাব্যিও নয়—এ হল গিয়ে একটা স্ফিংকস যে এমন সমস্ত হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করছে যেগুলির সমাধান অবশ্যই তার নিজেরও জানা নেই। খুন যদি করে থাকে তাহলে বললেই হয় যে খুন করেছে? তা নয়তো খুন করেছে অথচ করেনি—এ আবার কেমন ধারা কথা? এর মাথামুণ্ড বোঝে সাধ্যি কার?

"তারপর আমাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আমাদের এই মঞ্চ সততা ও 'সুস্থ বোধ শক্তির' প্রতীক, অথচ দেখুন এই 'সুস্থ বোধশক্তির' মঞ্চ থেকেই কিনা হলফ করে স্বতঃসিদ্ধ বলে এমন একটা কথা ঘোষণা করা হল যে পিতাকে হত্যা করাকে যে পিতৃহত্যা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে সেটা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু পিতৃহত্যা যদি কুসংস্কার হয়, যদি প্রতিটি সন্তান তার বাবাকে ধরে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, 'বাবা, আমি তোমাকে কেন ভালোবাসব?'—তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে বলুন তো? সমাজের ভিতটা তাহলে কোথায় থাকছে? পরিবারের কী দশা হবে? পিতৃহত্যাটা, বুঝলেন কি না, মস্কোর সেই বেনে বৌয়ের 'জুজুবুড়ি' মাত্র। রাশিয়ার বিচার ব্যবস্থার জন্য, তার ভবিষ্যতের জন্যও পরম মূল্যবান ও পরম পবিত্র যে সমস্ত নীতি নির্ধারিত হয়েছে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির

খাতিরে, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বিকৃত করে দেখানো হচ্ছে! কী? না, তাকে করুণার দ্বারা অবদমন করুন—প্রতিবাদী কৌঁসুলি জোর গলায় এই কথাই বলছেন। আরে, অপরাধীর তো এটাই চাই! কালই হাতেনাতে প্রমাণ পাবেন কতটা সে অবদমিত হয়েছে! আর হ্যাঁ, অপরাধীকে শুধুমাত্র বেকসুর খালাস করার দাবি জানিয়ে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি কি বড়ো বেশি বিনয় প্রকাশ করছেন না? ভবিষ্যৎ বংশধর আর নবীন প্রজন্মের মধ্যে তাঁর কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য পিতৃহন্তার নামে কোনো বৃত্তি প্রচলনের দাবি করতেই বা বাধাটা কোথায়? ধর্ম আর সুসমাচারও সংশোধন করা হোক। বলাই যেতে পারে ওগুলো সব রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার, কিন্তু দেখুন, আমাদেরটা, আমাদেরটাই প্রকৃত খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধি ও সুস্থ বোধশক্তির দ্বারা বিশ্লেষিত পরীক্ষিত সত্য। এই ভাবেই কিন্তু আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে খ্রিস্টের এক মিথ্যা প্রতিরূপ! *'যে পরিমাপ তুমি গ্রহণ করিবে তদ্দ্বারা তুমিও পরিমাপিত হইবে'*, কৌঁসুলি মহাশয় সরবে ঘোষণা করছেন, আবার সেই মুহূর্তেই এই সিদ্ধান্ত করছেন যে খ্রিস্ট নাকি তাঁর অনুশাসনে যে পরিমাপ তোমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তাই দিয়ে অন্যদেরও পরিমাপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।—আর এটা কিনা ঘোষণা করছেন সত্যনিষ্ঠা ও সুস্থ চিন্তার এই পাদপীঠ থেকে! আমরা কেবল ভাষণদানের পূর্বমুহূর্তে সুসমাচারের মধ্যে উঁকি মারি। সুসমাচার হাজার হোক যথেষ্ট মৌলিক একটি রচনা, তাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে তার সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় আছে সেটা জাহির করে শ্রোতাদের মনের মধ্যে এমন চমক লাগিয়ে দেওয়া যা এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উপযোগী হতে পারে বা কাজে লাগতে পারে। সবই যতটা প্রয়োজন তার স্বার্থে, প্রয়োজনের মাত্রা অনুযায়ী! অথচ খ্রিস্ট ঠিক এটাই আমাদের করতে নিষেধ করেছেন, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন, কারণ হিংসার জগৎ এমন কাজ করে থাকে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে ক্ষমা করা, অপর গণ্ডদেশ পেতে দেওয়া, আমাদের যারা অনিষ্ট সাধন করে তারা যা দিয়ে আমাদের পরিমাপ করে তাই দিয়ে তাদেরও পরিমাপ করা নয়। এই শিক্ষাই না আমাদের ঈশ্বর আমাদের দিয়েছিলেন! সন্তানদের পিতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করা যে একটা কুসংস্কার এমন কথা তিনি আমাদের শেখাননি। আমাদের রাশিয়ার তাবৎ সনাতন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী যাঁকে 'তুমিই অস্মদীয় ঈশ্বর' বলে বন্দনা করে থাকে তাদের সকলের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি যাঁকে স্রেফ 'ক্রুশবিদ্ধ মানবপ্রেমী' আখ্যায় ভূষিত হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেছেন, আমাদের 'সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ চিন্তার' পাদপীঠ থেকে আমরা আমাদের সেই ঈশ্বরের সুসমাচারকে সংশোধন করতে যাব না।"

এই জায়গায় সভাপতি মশাই বাধা দিলেন, কোনো রকম অত্যুক্তি না করে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকার অনুরোধ জানিয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি যে সব কথা বিচারসভার সভাপতিরা এক্ষেত্রে বলে থাকেন তাই বলে অত্যুৎসাহী বক্তাকে তিনি

বসিয়ে দিলেন। তা ছাড়া সভাকক্ষে উপস্থিত, শ্রোতারাও অস্বস্তি বোধ করছিল, তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছিল, এমনকি বিতৃষ্ণার ভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল। ফেতিউকভিচ্ কোনো রকম আপত্তি পর্যন্ত তুললেন না। কেবল উঠে এসে বুকে হাত রেখে যথাবিহিত মর্যাদার সঙ্গে, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গুটি কয়েক কথা উচ্চারণ করলেন। শুধুমাত্র হালকা ভাবে, ঈষৎ ব্যঙ্গভরে আবারও 'রোমান্স' ও 'মনস্তত্ত্ব' তৈরির প্রসঙ্গ তুললেন এবং এক জায়গায় এসে সুযোগ বুঝে 'য়ুপ্পিতের, তুমি যখন রাগ করছ তখন বুঝে নিতে হবে তুমি ভুল করছ'[১১] লাগসই এই উক্তিটির প্রয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালতকক্ষে তাঁর এই উক্তির সমর্থনসূচক ধ্বনি এবং অগণিত মানুষের হাস্যরোল উঠল, যেহেতু ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্‌কে তখন আর আদৌ য়ুপ্পিতের মতো দেখাচ্ছিল না। এরপর নবীন প্রজন্মকে তিনি পিতৃহত্যার শিক্ষা দিচ্ছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেই প্রসঙ্গে অপরিসীম গাম্ভীর্যসহকারে ফেতিউকভিচ্ মন্তব্য করলেন যে এর কোনো প্রত্যুত্তরই তিনি দিতে যাচ্ছেন না। 'খ্রিস্টের মিথ্যা প্রতিরূপ' সৃষ্টি আর খ্রিস্টকে 'ঈশ্বর' নামে আখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত গণ্য না করে স্রেফ 'ক্রুশবিদ্ধ মানবপ্রেমী' বলে উল্লেখ করা এবং সনাতন খ্রিস্টধর্মবিরোধী এই কথা যে সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থচিন্তার পাদপীঠ থেকে উচ্চারিত হওয়া উচিত হয় নি—সেই প্রসঙ্গে ফেতিউকভিচ্ এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে এসবই তাঁর বিরুদ্ধে 'বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার'। তিনি এও বললেন যে এখানে আসার সময় তিনি অন্তত এটা আশা করেছিলেন এবং 'একজন সৎ নাগরিক ও অনুগত প্রজারূপে' এই বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর কোনো অভিযোগ এই আদালতের মঞ্চ থেকে উঠতে পারে না। কিন্তু এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি মশাই তাঁকেও বসিয়ে দিলেন। ফেতিউকভিচ্ মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে আদালতকক্ষের সকলের অনুমোদন সূচক গুঞ্জনের মধ্যে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এদিকে আমাদের মহিলাদের মতে, ইপ্পলিত কিরিল্লভিচ্‌কে 'আর মাথা তুলতে হচ্ছে না'।

এর পর আসামিকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হল। মিতিয়া উঠে দাঁড়াল, কিন্তু বিশেষ কিছু বলল না। শারীরিক ও মানসিক ভাবে সে অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সকালে যখন আদালতকক্ষে তার আবির্ভাব ঘটেছিল তখন যে মনের জোর আর স্বাধীন মনোভাব তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল এখন তার প্রায় কোনো চিহ্ন নেই। এই দিনটিতে তাকে যেন এমন একটা কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যা তাকে সারা জীবনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা কিছুর শিক্ষা দিয়ে তার চৈতন্যোদ্রেক করেছে যেটা এর আগে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। তার কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে আর আগের মতো চেঁচাচ্ছিল না। তার কথার মধ্যে কেমন যেন একটা নতুন সুর বেজে উঠছিল, পরাভব ও নতিস্বীকারের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

"আমার আর কী বলার আছে, জুরিমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ! আমার

ভাগ্যবিচারের সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমার ওপরে ভগবানের হাত আমি দেখতে পাচ্ছি। একজন ব্যভিচারী মানুষের এটাই তো পরিণতি! কিন্তু ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি স্বরূপ আমি আবারও আপনাদের বলছি 'না, আমার বাবার রক্ত পাতের জন্য আমি অপরাধী নই!' শেষবারের মতো আবারও বলছি, 'আমি খুন করিনি!' আমি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলাম ঠিকই, কিন্তু যা ভালো তাকে আমি ভালোবাসতাম। প্রতিনিয়ত আমি নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু জীবন যাপন করেছি একটা বন্য জন্তুর মতো। প্রসিকিউটর মহাশয়কে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে আমার সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলেছেন যা আমার জানাই ছিল না, কিন্তু একথা সত্যি নয় যে আমি আমার বাবাকে খুন করেছি। আমার পক্ষ সমর্থনকারী কৌঁসুলি মহাশয়কেও ধন্যবাদ, তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি অশ্রু বিসর্জন করেছি, কিন্তু একথা সত্যি নয় যে আমি আমার বাবাকে খুন করেছি, এটা অনুমান করারও কোনো দরকার ছিল না! আরেকটা কথা, ডাক্তারদের বিশ্বাস করবেন না, আমার জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে, কেবল মনটাই ভার হয়ে আছে। আপনারা যদি আমাকে ক্ষমা করেন, যদি আমাকে ছেড়ে দেন আমি আপনাদের জন্য প্রার্থনা করব। আমি ভালো হব, কথা দিচ্ছি, ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে কথা দিচ্ছি। আর যদি আমার শাস্তি বিধান করেন তা হলে আমি নিজে হাতে আমার তরবারি আমার মাথার ওপর ভাঙব, আর সেই ভাঙা টুকরোগুলোকে চুমু খাব! কিন্তু আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ঈশ্বর থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না! আমি নিজেকে জানি, আমি বিক্ষোভে ফেটে পড়ব! ভদ্রমহোদয়রা, আমার মন ভারাক্রান্ত, আমায় ক্ষমা করুন!"

সে কোনো রকমে তার নিজের জায়গায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল, সে কোনোমতে শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করল। এর পর বিচারসভা প্রশ্ন সমাধানের দিকে অগ্রসর হল, উভয় পক্ষকেই তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য প্রশ্ন শুরু করে দিল। তবে সে সবের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। শেষকালে জুরিমণ্ডলী উঠে দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শের জন্য স্থান ত্যাগ করল। সভাপতি মশাই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই জুরিমণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যে কথাগুলি তিনি বললেন তা বেশ খানিকটা দুর্বল ধরনের হল। 'পক্ষপাতহীন হবেন, কোন পক্ষের বাগজালে মুগ্ধ হয়ে কোনো কাজ করবেন না। মোট কথা, সব কিছু ওজন করে দেখবেন, মনে রাখবেন, আপনাদের ওপর একটা বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

জুরিমণ্ডলী চলে যেতে বিচারসভা আপাতত মুলতবি রইল। এখন সভাকক্ষ ছেড়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করা যেতে পারে, লোকজনের মনের মধ্যে এতক্ষন যে সমস্ত ভাব জমা হয়েছে এখন তারা তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে, আদালতের খাবার ঘরে গিয়ে টুকটাক খেয়েও নিতে পারে। বেশ রাত হয়ে গেছে, রাত প্রায় একটা। কিন্তু লোকজন কেউ চলে যায়নি। সকলে এত উত্তেজিত

এবং এমনই একটা অবস্থার মধ্যে আছে যে শান্ত থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশ্য হ্যাঁ, সকলেই যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল এমন কথাও বলা যায় না। কেবল মহিলাদের মধ্যেই এক ধরনের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু তারাও মনে মনে এই ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিল যে 'যা-ই হোক না কেন, বেকসুর খালাস পাওয়া অবধারিত।' সকলে সার্বিক উচ্ছ্বাস প্রকাশের নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বীকার করতে বাধা নেই যে পুরুষদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিল, এবং খুব বেশি সংখ্যকই ছিল, যারা মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছিল যে আসামি অবধারিতভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। কেউ কেউ আনন্দিত, কেউ বা ভুরু কোঁচকাল, কেউ কেউ স্রেফ নাক সিঁটকাল  বেকসুর খালাস পাওয়াটা তাদের পছন্দসই নয়! ফেতিউকভিচ নিজে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। লোকে তাকে ঘিরে ধরেছিল, তিনি তাঁদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে লাগলেন, সকলে তাঁকে তোয়াজ করতে লাগল।

এক দল লোকের কাছে তিনি বলল—একথা আমি পরে শুনেছি  "হ্যাঁ, এক রকমের অদৃশ্য একটা সূত্র আছে যা জুরিমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলির বন্ধন রচনা করে। এই গাঁটছড়া আগে থাকতে, ভাষণ দেওয়ার সময়ই উপলব্ধি করা গেছে। আমি টের পেয়েছি। সেটা আছে। মামলা আমাদের পক্ষে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"তা তো হল, কিন্তু আমাদের গেঁয়ো ভূতগুলো তখন কী বলবে?" আরেক দল ভদ্রলোকের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছিল সেই সময় তাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল মুখে বসন্তের দাগওয়ালা মোটাসোটা গোমড়ামুখো এক ভদ্রলোক। শহরের সংলগ্ন কোনো এলাকার জমিদার গোছের কেউ হবে।

"কিন্তু এরা সবাই গেঁয়ো ভূত মনে করবেন না। চার জন সরকারি কর্মচারী আছে।"

"হ্যাঁ সরকারি কর্মচারীও আছে", জেলাপরিষদের একজন সদস্য দলটার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল।

"আরে, নাজারিয়েভ্‌কে আপনারা জানেন তো? প্রোখর ইভানোভিচ নাজারিয়েভ্। ওই যে ব্যবসায়ী লোকটা, যার বুকে মেডেল ঝুলছে—জুরিমণ্ডলীর একজন সদস্য।"

"তা, কী বলতে চান?"

"লোকটা বুদ্ধির জাহাজ।"

"কিন্তু আগাগোড়াই তো চুপ করে আছে দেখছি।"

"চুপ করে তো আছে—সেটা ভালো বলতে হবে। আরে পেতের্বুর্গের লোক ওকে শেখাবে কী? ও নিজেই বেবাক পেতের্বুর্গকে শিখিয়ে দেবে। বারোটি ছেলে পুলে—ভাবুন একবার!"

"মাফ করবেন, কী মনে হয়—বেকসুর ছাড়া পাবে না?" আরেকটি দলে

আমাদের একজন কমবয়সি সরকারি কর্মচারী চেঁচিয়ে জিগ্‌গেস করল।

"অবশ্যই ছাড়া পাবে", দৃঢ় কণ্ঠে আরেকজন বলল।

"ছাড়া না পেলে সে কিন্তু বড়ো লজ্জার আর কলঙ্কের কথা হবে!" সরকারি কর্মচারীটি বলে উঠল। "ধরলাম না হয় খুনই করেছে। কিন্তু সে লোকটা ত তার বাপ—অন্য কেউ তো নয়! তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা সে এমনই একটা ঘোরের মধ্যে ছিল বাস্তবিকই, এমনও হতে পারে যে নোড়াটা কেবল হাতে নিয়ে শূন্যে দুলিয়েছিল, আর তাইতে ধাক্কা লেগে যেতে লোকটা পড়ে গিয়েছিল। কেবল খারাপ বলতে যা হয়েছে তা ওই চাকরটাকে এর মধ্যে টেনে আনা। স্রেফ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো একটা ঘটনা। আমি যদি কৌঁসুলি হতাম তাহলে সরাসরি এই কথাই বলতাম বেশ তো খুন করেছে, কিন্তু তাই বলে দোষী নয়! চুলোয় যাও সব।"

"তা উনিও তো তা-ই করেছেন। কেবল 'চুলোয় যাও সব' বলেননি—এই যা।"

"না, মিখাইল সেমিয়োনভিচ্, বলতে খুব একটা বাকিও রাখেননি", তৃতীয় আরেক জন তাদের কথার খেই ধরে বলল।

"এই তো দেখুন মশাই, ইস্টারের আগে চল্লিশ দিনের সংযম ব্রত পালনের সময় কেমন ছেড়ে দেওয়া হল আমাদের সেই অভিনেত্রীটিকে, যে তার প্রেমিকের বৈধ স্ত্রীর গলা কেটেছিল!"

"আহা, সে তো আর কেটে খতম করতে পারেনি।"

"ওই হল, কাটতে শুরু করেছিল তো!"

"বাচ্চাদের সম্পর্কে উনি কেমন বললেন, বলুন তো? চমৎকার! তাই না?"

"যা বলেছেন, চমৎকার!"

"আর ওই রহস্য নিয়ে? রহস্য সৃষ্টি করা নিয়ে? কী বলেন?"

"আঃ অনেক হয়েছে ওই রহস্যের কথা!" আরও কে একজন চেঁচিয়ে বলল। "আমাদের ইপ্পলিতের কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো! এর পর ওর দশাটা কী হবে, অ্যাঁ? ওর বৌ, আমাদের প্রসিকিউটর—গিন্নিটি তো মিতিয়াকে আজীবনের জন্য পারলে কাল ওর চোখ দুটো খুবলে নেবেন।"

"উনি এখানে আছেন না কি?"

"এখানে থাকতে যাবেন কেন? এখানে থাকলে তো এখানেই খুবলে নিতেন। বাড়িতে বসে আছেন। দাঁতের ব্যথা। হে-হে-হে!'

"হে-হে-হে!"

তৃতীয় দলটিতে

"যা-ই বলুন না কেন, আমাদের মিতিয়াকে সম্ভবত বেকসুর খালাস দেওয়া হবে।"

"বলা যায় না হয়তো আগামীকালই পুরো 'মহানগর' সরাইখানা জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। দশ দিন ধরে মাতলামি চলবে।"

“যত্ত শয়তানের কাণ্ড!”

“শয়তান তো শয়তান, শয়তানের হাত ছাড়া তো আর এটা হওয়ার উপায় ছিল না। এখানে না হলে আর কোথায়ই বা তার ঠাঁই?”

“আরে মশাই না হয় ধরাই গেল বক্তৃতার বোলচাল। কিন্তু তাই বলে বাটখারা দিয়ে বাবাদের মাথা ভাঙতে হবে না কি? এই করে করে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছুব বলুন তো?”

“মহারথ! মনে আছে তো মহারথের কথাটা কেমন বলল?”

“হ্যাঁ একটা ঠেলাগাড়িকে মহারথ বানাতে আর কতক্ষণ।”

“আগামীকাল আবার মহারথকে ঠেলাগাড়ি বানাতেই বা বাধাটা কোথায়? বললেই হল ‘প্রয়োজনের খাতিরে, সবই প্রয়োজনের খাতিরে’।”

“হুঃ। মানুষজন বড়ই ধূর্ত হয়ে গেছে আজকাল। বলি রাশিয়াতে সত্যি বলে কিছু আছে না কি মশাই? আদৌ আছে কি?”

কিন্তু দেখতে দেখতে ঘণ্টা বেজে উঠল। জুরিমণ্ডলী ঠিক এক ঘণ্টা ধরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে—তার একটু কমও নয় বেশিও নয়। জনসাধারণ আবার তাদের আসন গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষে নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা। জুরিমণ্ডলী যে ভাবে আদালতকক্ষে প্রবেশ করল সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অবশেষে! কী কী প্রশ্ন উঠেছিল এক এক করে আর উল্লেখ করতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া সেগুলি আমি ভুলেও গেছি। আমার শুধু মনে আছে সভাপতির প্রথম ও প্রধান প্রশ্নটি, অর্থাৎ ‘আসামি পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন করেছিল কিনা’—এবং তার উত্তর। সঠিক কথাগুলি অবশ্য মনে নেই। সবাই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। জুরিমণ্ডলীর প্রধান, সেই কর্মচারীটি, যার বয়স আর সকলের চেয়ে কম, কবরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করল

“হ্যাঁ, অপরাধী!”

তারপর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই বারবার উচ্চারিত হতে লাগল সেই একই কথা: ‘অপরাধী, হ্যাঁ অপরাধী!’ অপরাধের গুরুত্বলাঘব করে আসামিকে ক্ষমা করার এতটুকু গরজ পর্যন্ত দেখা গেল না! এটা কিন্তু কেউ আশা করেনি। প্রায় সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিল যে আর যাই হোক না কেন, অন্তত ক্ষমা করে দেবার সুপারিশ তো করা হবে। যে কবরের নিস্তব্ধতা আদালতকক্ষে নেমে এসেছিল তা ভঙ্গ হল না। অপরাধী যাতে সমুচিত দণ্ড পায় তার জন্য যাদের এত আগ্রহ ছিল, অন্য দিকে যারা তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল—দুই পক্ষের সকলেরই তখন আক্ষরিক অর্থে প্রস্তর মূর্তিবৎ অবস্থা। কিন্তু সে কেবল প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত। এর পরই শুরু হয়ে গেল দারুণ বিশৃঙ্খলা। পুরুষ শ্রোতাদের মধ্যে দেখা গেল অনেকেই খুব খুশি। কেউ কেউ আবার তাদের আনন্দ গোপন

না রাখতে পেরে হাতে হাত ঘষছিল। যারা এই রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি তারা কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছিল, ঘন ঘন কাঁধ ঝাঁকাচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিল, কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছিল তখন পর্যন্ত সব কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু হা ভগবান, কী দশাই না হল আমাদের মহিলাদের! আমার তো মনে হচ্ছিল তারা একটা হাঙ্গামাই বাধিয়ে বসবে। প্রথমে তারা যেন নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর আচমকা সারা হলঘর জুড়ে শোনা গেল বিস্ময়োক্তি 'কিন্তু এটা কী হল? এটা আবার কী হল?' তারা লাফিয়ে ছুটে এলো তাদের জায়গা ছেড়ে। তাদের নির্ঘাত মনে হচ্ছিল এসবই এখনই আবার বদলে দেওয়া যেতে পারে, উলটে দেওয়া যেতে পারে। ঠিক এই মুহূর্তে মিতিয়া হঠাৎ তার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কেমন যেন একটা বুকফাটা আর্ত চিৎকার করে উঠল।

"ঈশ্বরের দিব্যি, তাঁর 'শেষ বিচারের' দিব্যি, আমার বাবার রক্তপাতের অপরাধে আমি অপরাধী নই! কাতিয়া, তোমাকে ক্ষমা করছি! ভাইয়েরা, বন্ধুরা আমার, আরেকজন নারীকে দয়া কোরো তোমরা!"

কথা সে শেষ করতে পারল না, ভীষণভাবে ডুকরে কেঁদে উঠল, সারা হলঘরে ছড়িয়ে পড়ল তার কান্না। ঈশ্বর জানেন, কোথা থেকে এলো তার এই কণ্ঠস্বর। কিন্তু এটা এমনই নতুন ধরনের, এতই আকস্মিক যেন তার নিজের নয়—অন্য কারও। ওপরের গ্যালারির একেবারে শেষ সারির একটা কোনা থেকে ভেসে উঠল নারী কণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—গ্রুশেন্‌কার কণ্ঠস্বর। দুই পক্ষের কৌঁসুলিদের সওয়াল জবাব শুরু হওয়ার আগেই সে অনেক করে বলে কয়ে আবার আদালতকক্ষে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়েছিল। মিতিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। দণ্ড ঘোষণা আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবি রইল। সারা হলঘর জুড়ে হুলস্থূল পড়ে গেল। কিন্তু আমি আর শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম না। কেবল মনে আছে, বেরিয়ে যাবার মুখে, একেবারে দোরগোড়ায় আমার কানে এসেছিল কয়েকটি ভাবোচ্ছ্বাস।

"বারোটা বছর খনির তলায় ধুঁকতে হবে।"[৪১]

"তার কম তো নয়ই।"

"আমাদের গেঁয়ো ভূতগুলো কিন্তু তাদের গোঁ ধরেই রইল।"

"আমাদের মিতিয়াকেও শেষ করে দিল!"

# উপসংহার

## এক

## মিতিয়াকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা

মিতিয়ার বিচারপর্ব শেষ হওয়ার পাঁচদিন পরে খুব ভোরবেলায়, ন'টা তখনও বাজেনি, আলিয়োশা কাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল তাদের দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে চূড়ান্তভাবে একটা বোঝাপড়ায় আসা, তা ছাড়াও তাকে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এক সময় যে ঘরে গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল ঠিক সেই ঘরে বসেই আলিয়োশার সঙ্গে তার কথা হচ্ছিল। পাশের আরেকটি ঘরে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে শুয়ে ছিল ইভান ফিয়োদরভিচ্। আদালতকক্ষের সেই দৃশ্যের পর অসুস্থ ও সংজ্ঞাহীন ইভান ফিয়োদরভিচ্‌কে কাতেরিনা ইভানভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল। এর ফলে ভবিষ্যতে অবধারিত ভাবে সমাজে যে নানা রকম গুঞ্জন আর লোকনিন্দা শুরু হয়ে যাবে কাতেরিনা ইভানভ্‌না তার কোনো পরোয়া করল না। তার সঙ্গে তার যে দুই আত্মীয়া থাকত তাদের মধ্যে একজন আদালতের এই দৃশ্যের পর তৎক্ষণাৎ তার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে মস্কোয় চলে গেল। অন্যজন থেকে গেল। কিন্তু দুজনেই যদি চলে যেত তাহলেও কাতেরিনা ইভানভ্‌নার সিদ্ধান্তে কোনো হেরফের হত না, দিন রাত অসুস্থ ব্যক্তির শিয়রে বসে ঠিকই তার সেবাশুশ্রূষা করে যেত। ইভান ফিয়োদরভিচের চিকিৎসা করছিলেন ভার্‌ভিন্‌স্কি ও হের্‌ৎসেন্‌শ্‌টুবে। মস্কো থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন তিনি মস্কোয় ফেরত চলে গেছেন। রোগের সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়ে পূর্বাহ্নে তাঁর অভিমত প্রকাশে তিনি রাজি হননি। বাকি দুজন ডাক্তার কাতেরিনা ইভানভ্‌না ও আলিয়োশাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলেন বটে, তবে দেখাই যাচ্ছিল তারাও তেমন জোর দিয়ে কোনো আশাভরসা দিতে পারছেন না।

আলিয়োশা রোজ দুবার করে তার অসুস্থ দাদাকে দেখতে আসছিল। কিন্তু এবারে যে সে এসেছে তা বড়ো গোলমেলে ধরনের বিশেষ একটা কাজ নিয়ে। প্রসঙ্গটা তোলাই যে তার পক্ষে কত কঠিন হয়ে পড়বে সেটা সে আগে থাকতেই মনে মনে টের পাচ্ছিল। এদিকে তার অন্যত্র ভীষণ তাড়াও আছে। ওই দিন সকালবেলায় আরেক জায়গায় তার আরও এমন একটা কাজ আছে যা ফেলে রাখা সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি না করলে নয়।

ইতিমধ্যে মিনিট পনেরো হয়ে গেল দুজনে কথা বলছে। কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে ফ্যাকাশে ও বড়ো বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সেই সঙ্গে উত্তেজনাবশত সে অত্যন্ত

খিটখিটেও হয়ে আছে। প্রসঙ্গত, আলিয়োশা যে এখন কেন তার কাছে এসেছে সেটা সে মনে মনে ঠিকই টের পেয়েছিল।

"ওঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন", অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সে আলিয়োশাকে বলল। "যা-ই হোক না কেন, উনি এই সিদ্ধান্তেই আসবেন যে ওকে পালাতে হবে! এই হতভাগ্য মানুষটি, মান মর্যাদা ও বিবেকের ধারক এই মানুষটি—সেই মানুষটি নয়, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ নয়— ইনি সেই মানুষটি যিনি এই দরজার ওপাশের ঘরটিতে শুয়ে আছেন, তাঁর ভাইয়ের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন", বলতে বলতে কাতিয়ার চোখে ঝলক দিয়ে উঠল। সে যোগ করল, "মানুষটি অনেক দিন আগেই পালানোর এই পরিকল্পনাটি পুরোপুরি আমায় জানিয়েছিলেন। জানেন, ইতিমধ্যে তিনি একটা ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলেন। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু আধটু বলেওছি। দেখুন, সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দণ্ড পাওয়া বন্দিদের দলটিকে নিয়ে যাবার পথে তৃতীয় যে বিরতির জায়গাটা পড়বে এই ঘটনাটি খুব সম্ভব সেখানেই ঘটবে। ওঃ, সে এখনও অনেক দূরে। ইভান ফিয়োদরভিচ্ ইতিমধ্যে তৃতীয় বিরতির জায়গার যিনি কর্তাব্যক্তি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। তবে কনভয়ের দায়িত্ব নিয়ে কে যাচ্ছে কেবল সেটাই এখনও জানা যায়নি, এত আগে থাকতে তা জানা সম্ভবও নয়। কোনো কারণে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে বিচারের আগের দিন ইভান ফিয়োদরভিচ্ তাঁর গোটা পরিকল্পনার খুঁটিনাটি আমার কাছে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। আগামী কাল হয়তো সেটা আমি আপনাকে দেখাতে পারব। উনি সেটা দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়—সেই যে সেই সন্ধ্যায়—আপনার মনে আছে?—যখন আপনি আমাদের ঝগড়া করতে দেখেছিলেন, সেই যখন উনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন, আর আমি আপনাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বললাম—মনে পড়ে? আপনি জানেন কি, কী নিয়ে আমরা সেদিন ঝগড়া করেছিলাম?"

"না, জানি না", আলিয়োশা বলল।

"অবশ্যই তখন উনি আপনার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। ঘটনাটা সেই পালানোর পরিকল্পনা নিয়ে। তারও তিন দিন আগে উনি মূল ব্যাপারটার সব কিছু আমায় খুলে বলেছিলেন—আর তখনই আমাদের ঝগড়ার সূত্রপাত। সেই থেকে তিন দিন ধরে আমাদের ঝগড়া চলতে থাকে। ঝগড়ার কারণ এই যে যখন উনি আমাকে জানালেন যে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরভিচ্ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় সেক্ষেত্রে সে ওই চিজটিকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাবে, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে দারুণ খেপে গিয়েছিলাম—কেন, তা আমি আপনাকে বলতে পারব না, আমি নিজেই জানি না, কেন। হ্যাঁ, অবশ্যই ওই চিজটির কথা ভেবে তখন আমি খেপে লাল হয়ে গিয়েছিলাম, বিশেষত এই কারণে যে দ্‌মিত্রির সঙ্গে ওটাও কিনা বিদেশে পালাবে!" হঠাৎ চিৎকার করে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাতেরিনা ইভানভ্‌নার ঠোঁটদুটো

রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ‘ইভান ফিয়োদরভিচ্ তখন যেই দেখতে পেলেন ওই ইতর স্ত্রীলোকটার কথা ভেবে আমি অমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছি, অমনি মুহূর্তের মধ্যে উনি ধরে নিলেন যে দ্‌মিত্রির জন্য তাকে আমি ঈর্ষা করছি, অর্থাৎ কিনা আমি এখনও দ্‌মিত্রিকে ভালোবাসি, ঠিক এই নিয়েই আমাদের প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত। কোনও ব্যাখ্যার মধ্যে যাবার কোনো প্রবৃত্তি আমার হল না। এর জন্য তাঁর কাছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থনা করতেও পারলাম না। ওই লোকটার প্রতি আমার আগেকার ভালোবাসার প্রসঙ্গ তুলে এমন একজন মানুষ যে আমাকে সন্দেহ করতে পারে তাই ভেবে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। আর এই সন্দেহ কিনা তখন যখন আমি এর অনেক আগে নিজের মুখে সরাসরি তাঁকে বলেছি যে আমি দ্‌মিত্রিকে ভালোবাসি না, তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসি না! শুধুমাত্র ওই নচ্ছার স্ত্রীলোকটার ওপর আমার গায়ের ঝাল মেটানোর জন্যই না ওঁর ওপর আমি খেপে গিয়েছিলাম! তিন দিন পরে, সেই যেদিন সন্ধ্যায় আপনি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি একটা সিল করা খাম আমায় এনে দিয়ে বললেন তাঁর যদি কিছু ঘটে তাহলে আমি যেন তৎক্ষণাৎ সেটা খুলে দেখি। দেখুন কাণ্ড, তিনি যে এরকম একটা অসুখে পড়বেন তা আগে থাকতে বুঝতে পেরেছিলেন! উনি আমায় খুলে বললেন যে খামের মধ্যে পালানোর পরিকল্পনা বিশদে লেখা আছে এবং উনি যদি মারা যান অথবা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে একা আমাকেই মিতিয়াকে উদ্ধার করার ভার নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে টাকাও রেখে গেছেন—দশ হাজার। এ সেই দশ হাজার যা তোলার জন্য একজনকে উনি পাঠিয়েছিলেন, আর সেই কথাটাই কার কাছ থেকে যেন জানার পর প্রসিকিউটর তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। মিতিয়াকে এখনও ভালোবাসি বলে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস এবং এই ব্যাপারে আমাকে নিয়ে মনে মনে তাঁর ঈর্ষা থাকা সত্ত্বেও ভাইকে উদ্ধার করার চিন্তা যে তাঁর মাথা থেকে যায়নি, শুধু তা-ই নয়, তিনি যে বিশ্বাস করে সেই আমার ওপরই উদ্ধারকার্যের এই ভার অর্পণ করছেন আমি তখন এই ভেবে হঠাৎ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একে আত্মোৎসর্গ ছাড়া আর কী বলব! না, এ ধরনের আত্মত্যাগের মহত্ত্ব আপনি পূর্ণমাত্রায় অনুধাবন করতে পারবেন না, আলেক্সেই ফিয়োদরভিচ্! আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেই মনে হল মিতিয়াকে উদ্ধার করা হচ্ছে ভেবে এটা আমার আনন্দের উচ্ছ্বাস বলে তিনি ধরে নিতে পারেন—নির্ঘাত তা-ই মনে করবেন—আর এরকম একটা অন্যায় চিন্তা যে তাঁর দিক থেকে হতে পারে নিছক এই সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে আবারও মেজাজ হারিয়ে ফেললাম। তখন তার পদচুম্বন করব কি, তাঁর বদলে এবারেও খেপে গিয়ে যা-তা কাণ্ড করে বসলাম! ওঃ, আমি অভাগী! এমনই আমার স্বভাব। কী বিশ্রী, অভিশপ্ত আমার এই স্বভাবটা! দেখবেন, আপনাদের আরও দেখার আছে—

আমি এমন কাজ করব, যা-ই বলুন না কেন, আমার পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরও এমন এমন দশা হবে যে দ্মিত্রির মতোই আমাকে ছেড়ে দিয়ে এমন আরেক জনের কাছে চলে যাবেন যার সঙ্গে থাকাটা তাঁর পক্ষে অনেক সহজ হবে। কিন্তু তাহলে না, তাহলে সেটা কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারব না, আমি নিজে হাতে নিজের জীবন শেষ করব! তখন আপনি যখন আমার বাড়িতে ঢুকলেন এবং যখন আমি আপনাকে ডেকে ওঁকে ফিরিয়ে আনতে বললাম, তারপর তাঁকে সঙ্গে করে আপনি যখন ঘরে ঢুকলেন তখন যেরকম তাচ্ছিল্যের ভাব করে বিষ দৃষ্টিতে হঠাৎ উনি আমার দিকে তাকালেন, আর তাতে আমার মাথায় এমনই রাগ চড়ে গিয়েছিল—মনে আছে আপনার?—আমি আচম্বিতে চেঁচিয়ে আপনাকে বলেছিলাম যে এই ইনি, একমাত্র এই মানুষটিই আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর ভাই দ্মিত্রি খুনি! আমি ইচ্ছে করে তাঁর নামে এই অপবাদটা দিয়েছিলাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল আরও একবার তাঁকে খোঁচা দেওয়া। উনি কিন্তু কখনই আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপাদনের কোনো চেষ্টা করেননি যে তাঁর ভাই খুনি। বরং তার বিপরীত-আমিই তাঁর মনের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেছি! ওঃ, এ সবের জন্যই দায়ী আমার উগ্র স্বভাব! আদালতে ওই বিশ্রী দৃশ্যটা আমার তৈরি, আমারই তৈরি! উনি আমাকে প্রমাণ করে দেখাতে চাইছিলেন যে উনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি, আমি ওঁর ভাইকে যদি ভালোও বাসি তাই বলে প্রতিহিংসা বা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে উনি তার সর্বনাশ করবেন না। তাইতেই না উনি আদালতে গিয়েছিলেন। সব কিছুর কারণ আমি, দোষ যদি কারও থাকে সে একমাত্র আমার!"

আলিয়োশার কাছে এ ধরনের কোনো স্বীকারোক্তি কাতিয়া এর আগে কখনও করেনি। আলিয়োশা মনে মনে উপলব্ধি করল কাতিয়া এখন এত বেশি মাত্রায়, এমনই এক দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করছে যার আঘাতে অতি বড়ো অহংকারীর দর্প পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, শোকে পরাভূত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, তার এখনকার এই মানসিক যন্ত্রণার আরও একটি ভয়ঙ্কর কারণও আলিয়োশার জানা ছিল, তা সে বিচারে মিতিয়ার অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর থেকে এত দিন ধরে তার কাছ থেকে যত গোপন করার চেষ্টাই যে করুক না কেন। কিন্তু সে যদি এতটা নীচে নেমে আসবে বলে মনস্থির করে থাকে যে সে নিজে এখন, এই মুহূর্তে সেই কারণটাই আলিয়োশাকে বলবে সেটা আলিয়োশার পক্ষে কেন যেন বড়ো বেশি বেদনাদায়ক হত। কাতিয়া বিচারের সময় তার নিজের 'বিশ্বাসঘাতকতার' জন্য মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। আলিয়োশা আগে থাকতে এতো উপলব্ধি করতে পারছিল যে কাতিয়া তার বিবেকের তাড়নায় ঠিক তারই সামনে, আলিয়োশার সামনে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো আর্তচিৎকার করতে করতে মেঝেতে মাথা খুঁড়ে নিজের দোষ কবুল করার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু এই

মুহূর্তটিকে আলিয়োশা ভয় পাচ্ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এই যন্ত্রণা থেকে কাতিয়াকে সে রেহাই দেয়। যে কাজের ভার নিয়ে সে এসেছে এর ফলে সেটা করা তার পক্ষে আরও দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। সে আবার মিতিয়ার প্রসঙ্গ তুলল।

"কিছু না, কিছু না, ওকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই!" জেদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্বরে কাতিয়া আবার বলতে শুরু করল। "ওর সবটাই একটা মুহূর্তের ব্যাপার। ওর মনটা আমার খুবই ভালো জানা আছে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—পালাতে ঠিক রাজি হয়ে যাবে। বড়ো কথা হল এটা তো আর ঠিক এখনই ঘটতে যাচ্ছে না। মনস্থির করার এখনও অনেক সময় আছে ওর। ইতিমধ্যে ইভান ফিয়োদরভিচ্ও সুস্থ হয়ে উঠবেন, যা যা বন্দোবস্ত করার উনি নিজে সব করবেন। ফলে আমার কিছুই করতে হবে না। চিন্তা করবেন না, পালাতে রাজি হয়ে যাবে। তা-ই বা বলি কেন, দেখুন গিয়ে রাজি হয়েই আছে। ওর সঙ্গিনী ওই জীবটাকে ও ফেলে যাবে কী করে? এদিকে যেখানে ওকে ঘানি টানতে পাঠানো হচ্ছে সেখানেও ওটাকে ছাড়বে না। তাহলে পালাবে না তো কী করবে? যাকে ওর বেশি ভয় সে আপনি। ওর ভয়, নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে আপনি ওর পালানোতে সায় দেবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার অনুমোদন যদি এতই আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার উচিত উদারতা দেখিয়ে ওকে *অনুমতি দেওয়া*", কণ্ঠে বিষ ঢেলে কাতিয়া যোগ করল। একটু থেমে সে কাষ্ঠ হাসি হাসল।

"কোথাকার কী সব স্তোত্রের কথা সে বলে", কাতেরিনা আবার শুরু করল, কোথাকার কোন্ ক্রস নাকি তাকে বহন করতে হবে, কীসের কোন্ কর্তব্য — এই রকম সব কথা সে বলে। আমার মনে আছে, এই বিষয়ে অনেক কিছুই ইভান ফিয়োদরভিচ্ তখন আমাকে জানিয়েছিলেন। কী ভাবে বলেছিলেন, ওঃ তা যদি আপনি জানতেন!" বলতে বলতে আবেগ সংযত করত না পেরে কাতিয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "যখন উনি আমাকে এই কথাগুলি বলছিলেন সেই মুহূর্তে সেই হতভাগ্য লোকটিকে যে উনি কী পরিমাণে ভালোবাসতেন এবং সেই একই সঙ্গে সম্ভবত কতটা ঘৃণাও করতেন তা যদি আপনি জানতেন! কিন্তু হায়, তখন তার সেই কথা শুনে, তার চোখের জল দেখে আমার মুখে একটা অহমিকাপূর্ণ বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠেছিল! ওঃ কী ইতরতা! হ্যাঁ, আমি একটা ইতর জীব বিশেষ! ওঁর এই জ্বরবিকারের জন্য আমিই দায়ী! কিন্তু যে লোকটি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সে কি কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত?" তিক্তকণ্ঠে কাতিয়া উপসংহারে বলল। "তা এ ধরনের মানুষগুলোর আবার কীসের কষ্ট? ওর মতো মানুষগুলো কখনও কোন কষ্ট পায় না!"

ঘৃণা ও অবজ্ঞামিশ্রিত কেমন যেন একটা আক্রোশের সুর তার এই কথাগুলির মধ্যে বাজছিল। অথচ মিতিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ত সে-ই করেছিল। আলিয়োশা মনে মনে ভাবল হয়ত মিতিয়ার কাছে নিজেকে বড় বেশি অপরাধী মনে করছে

বলেই কোন কোন মুহূর্ত সে ওকে ঘৃণাও করছে। আলিয়োশার মন চাইছিল এ যেন কেবল 'কোন কোন মুহূর্তেরই' হয়ে থাকে। কাতিয়ার শেষ কথাগুলির মধ্যে সে একটা চ্যালেঞ্জের সুর শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তাতে সে কোন আমল দিল না।

“আমি এই কারণেই আজ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম যাতে আপনি আমায় কথা দেন যে আপনি নিজেই তাকে বলে কয়ে রাজি করাবেন। না কি আপনিও মনে করেন যে পালিয়ে যাওয়াটা সততার কাজ হবে না, কাপুরুষতা বা যাকে আপনারা ওই যে খ্রিস্টধর্মবিরোধী না কী বলেন সেই গোছের কিছু হবে — তাই কি?” আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কাতিয়া যোগ করল।

“না, সে রকম কিছু নয়। আমি ওকে সব বলব ” মিনমিন করে আলিয়োশা বলল। “ও আজ আপনাকে একবার ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকেছে”, দুম করে মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে যেতেই আলিয়োশা স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল। কাতিয়া চমকে উঠল, সোফায় চট করে আলিয়োশার কাছ থেকে অল্প একটু সরে বসল।

“আমাকে? সেটা কি সম্ভব নাকি?” ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে সে বলল।

“সেটা সম্ভব এবং উচিতও!” রীতিমতো উদ্দীপিত হয়ে উঠে দৃঢ়স্বরে বলতে শুরু করল আলিয়োশা। “ওর খুব দরকার — বিশেষত এই মুহূর্তে। প্রয়োজন না থাকলে আমি এই প্রসঙ্গ শুরু করতাম না, অসময়ে আপনাকে কষ্ট দিতে যেতাম না। সে অসুস্থ, তার এখন পাগল-পাগল অবস্থা। বারবার করে আপনাকে চাইছে। এই নয় যে ভাব করার জন্য আপনাকে ডাকছে। আপনি শুধু একবারটি দোরগোড়ায় এসে দেখা দিলেই হবে। সেদিনের পর থেকে ওর মনের মধ্যে অনেক ওলট পালট হয়ে গেছে। ও বুঝতে পারছে আপনার কাছে ওর অপরাধের কোন সীমাপরিসীমা নেই। আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে ও যাচ্ছে না। নিজেই বলছে, 'আমি ক্ষমার অযোগ্য।' তবু শুধু একবার যদি দোরগোড়ায় দেখা দিতেন

“আপনি আচমকা আমাকে এই ভাবে ” কাতিয়া আমতা-আমতা করে বলল। “এই এতদিন ধরে আমার মন বলছিল আপনি এই বার্তা নিয়ে আমার কাছে আসবেন। আমি ঠিকই জানতাম সে আমাকে ডাকবে। এটা অসম্ভব!”

“হলই না হয় অসম্ভব, কিন্তু করুন। একবার মনে করে দেখুন, সে যে আপনাকে লাঞ্ছনা করেছিল সে-কথা ভেবে এই প্রথম সে বিচলিত। জীবনে এই প্রথম। এর আগে আর কখনও এমন পরিপূর্ণভাবে এই উপলব্ধি তার হয় নি। বলছে যদি আসতে না চায় তাহলে 'এখন সারা জীবনের মতো আমি অসুখী হয়ে থাকব।' আপনি শুনছেন? বিশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড তাকে ভোগ করতে হবে, তা সত্ত্বেও সুখী হবার সাধ — কী করুণ, বলুন-ত! ভেবে দেখুন, আপনি এমন একজন মানুষকে

দেখতে যাচ্ছেন যে বিনা অপরাধে ধ্বংস হতে চলেছে", আক্রমণাত্মক সুরে আলিয়োশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। "ওর হাত কলুষিত নয়, সেখানে রক্তের দাগ নেই! ভবিষ্যতে যে অশেষ কষ্ট তাকে ভোগ করতে হবে অন্তত তার খাতিরে এখন তার সঙ্গে দেখা করে আসুন! এসে তার অন্ধকারে যাত্রার পথে তাকে শেষ বিদায় জানিয়ে যান। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেই হবে — এর বেশি কিছু নয়। এটা আপনার করা উচিত হবে, অবশ্যই উচিত হবে!" বিশেষ করে 'উচিত' কথাটার ওপর অসম্ভব রকম জোর দিয়ে আলিয়োশা তার বক্তব্য শেষ করল।

"উচিত, কিন্তু পারছি না।" কেমন যেন একটা কাতরতা ফুটে উঠল কাতিয়ার কণ্ঠস্বরে। "ও আমার দিকে তাকাবে সে দৃষ্টি আমি সইতে পারব না।"

"আপনাদের চোখাচোখি হওয়া উচিত। এখন যদি মনস্থির না করেন তাহলে সারাটা জীবন আপনি কাটাবেন কী করে?"

"বরং সারা জীবন কষ্ট পাব তাও সই।"

"আপনার আসা উচিত, *অবশ্যই উচিত*," অবারও নির্দয় ভাবে জোর দিয়ে আলোয়োশা বলল।

"কিন্তু আজ কেন? এখনই কেন? রোগীকে ফেলে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"এক মুহূর্তের জন্য পারেন বৈ কি। সামান্য এক মিনিটের ব্যাপার। আপনি যদি না আসেন তাহলে আজ রাতের মধ্যেই ও জ্বরবিকারে পড়ে ভুলভাল বকতে থাকবে। আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলব না। ওকে দয়া করুন!"

"আমাকে তো দয়া করবেন!" তিক্ত কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুরে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাতিয়া ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

"তাহলে আসছেন, তাই তো?" কাতিয়ার চোখে জল দেখে দৃঢ় কণ্ঠে আলিয়োশা বলল। "যাই, ওকে গিয়ে বলে আসি আপনি এখনই আসছেন।"

"না, কোনোমতেই বলবেন না!" ভীতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া। "আমি আসব, কিন্তু আপনি আগে থাকতে একথা তাকে বলবেন না, কেন না আমি আসব, কিন্তু এমনও হতে পারে যে আমি ভেতরে ঢুকব না। আমি এখনও জানি না, বলতে পারছি না।

বলতে বলতে তার গলা ধরে এলো। সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আলিয়োশা ওঠার জন্য তৈরি হল।

"কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়?" হঠাৎ মৃদুস্বরে সে বলে উঠল। তার মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"যাতে কারও সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে না যায় সেই জন্যই তো বলছি এখনই যাওয়া দরকার। ওখানে এখন কেউ থাকবে না। বিশ্বাস করুন আমার কথা। আমরা অপেক্ষা করে থাকব কিন্তু", নাছোড়বান্দার মতো এই বলে কথা শেষ করে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

## দুই

## ক্ষণিকের জন্য মিথ্যা সত্য হয়ে দাঁড়াল

মিতিয়াকে এখন যে হাসপাতালে রাখা হয়েছে আলিয়োশা তাড়াতাড়ি সেদিকে পা বাড়াল। আদালতের রায়দানের পরের দিন মিতিয়া স্নায়বিক জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে আমাদের টাউন হাসপাতালের বন্দিদের বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আলিয়োশা এবং খখ্‌লাকোভা, লিজা ইত্যাদি আরও অনেকের অনুরোধে ডাক্তার ভার্‌ভিন্‌স্কি বন্দিদের সঙ্গে না রেখে আলাদা একটা ছোটো কামরায় জায়গা করে তাকে রেখে দিয়েছিলেন। এটা সেই কামরা যেখানে এক সময় স্মের্দিকোভ্‌কে রাখা হয়েছিল। এটা ঠিক যে করিডরের অপর প্রান্তে একজন সান্ত্রি মোতায়েন ছিল, আর জানলায় জালও দেওয়া ছিল, যার ফলে ভার্‌ভিন্‌স্কি খাতিরে কাজটা করলেও এবং তাঁর কাজটাকে ঠিক আইনসঙ্গত বলা না গেলেও তাঁর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। আসলে এই যুবক ডাক্তারটির মনটি ছিল উদার আর সমবেদনায় পরিপূর্ণ। মিতিয়ার মতো একজন মানুষের পক্ষে এমন আচমকা সরাসরি খুনি আর চোর ডাকাতদের দলের মধ্যে গিয়ে পড়া যে কতটা দুঃসহ এবং এরকম একজন মানুষকে যে গোড়ার দিকে একটু একটু করে অভ্যস্ত হতে দেওয়া দরকার এটা তিনি বুঝতেন। আত্মীয়স্বজন ও চেনাপরিচিতদের দেখা করতে আসার ব্যাপারে ডাক্তার ও জেলখানার ওয়ার্ডারের তো বটেই, এমনকি জেলা পুলিশ সুপারেরও সায় ছিল—সকলেই হাতের কাছের মানুষ। কিন্তু এই কয়েক দিনে মিতিয়াকে দেখতে এসেছিল শুধু আলিয়োশা আর গ্রুশেন্‌কা। দুবার অবশ্য রাকিতিন জোর করে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভার্‌ভিন্‌স্কির কাছে মিতিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল তাকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়।

আলিয়োশা এসে দেখতে পেল মিতিয়া হাসপাতালের ড্রেসিং গাউন পরে বিছানায় বসে আছে। খানিকটা জ্বর জ্বর ভাব আছে, ভিনিগার মেশানো জলে ভেজানো একটা তোয়ালে দিয়ে মাথা জড়ানো। আলিয়োশাকে ঢুকতে দেখে কেমন যেন অনির্দিষ্টভাবে তার দিকে তাকাল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দৃষ্টিতে এক ধরনের আশঙ্কার ভাবও ঝলক দিল।

মোটের ওপর বিচারের পর থেকে সে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কখনও কখন কথাবার্তা বলতে বলতে থেমে গিয়ে আধঘণ্টা মতো চুপচাপ হয়ে যায়, মনে হয় লোকের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে কোনো দুরূহ বিষয় নিয়ে কষ্ট করে, গভীর ভাবে ভাবনাচিন্তা করছে। গভীর চিন্তা থেকে উঠে এসে যদি কথা বলতে শুরু করত তাহলে সব সময়ই সেটা হত কেমন যেন আচমকা, আর করুণ দৃষ্টিতে সে তার ভাইয়ের দিকে তাকাত। আলিয়োশার তুলনায় গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে সে যেন

বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করত। অবশ্য এটা ঠিক যে গ্রুশেন্‌কার সঙ্গে সে প্রায় কোনো কথা বলতও না, কিন্তু গ্রুশেন্‌কা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

আলিয়োশা এসে চুপচাপ তার খাটের পাশে বসল। এবারে কিন্তু সে ব্যাকুল হয়ে আলিয়োশার প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু তাকে কোনো প্রশ্ন করার মতো ভরসা পাচ্ছিল না। সে ধরেই রেখেছিল কাতিয়া যে আসতে রাজি হবে সেটা অভাবনীয়। সেই সঙ্গে মনে মনে এও উপলব্ধি করছিল যে যদি না আসে তাহলে রীতিমতো অসম্ভব কিছু একটা ঘটে যাবে। আলিয়োশা তার মনের এই ভাবটা বুঝতে পারছিল।

মিতিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলতে শুরু করল, "শুনতে পাচ্ছি ত্রিফন্,—আমাদের ত্রিফন বরিসভিচ নাকি তার সরাইখানাটা ভেঙেচুরে একেবারে ছারখার করে দিয়েছে। মেঝে-টেঝে সব খুঁড়ে একাকার, তক্তাগুলো, টেনে খুলে ফেলেছে, গ্যালারি ভেঙে তছনছ—এমন কথাই তো শুনছি। গুপ্তধনের খোঁজ করে চলেছে—সেই যে সেই টাকা, সেই দেড় হাজার, যা নাকি, ওই যে প্রসিকিউটর বলল না, আমি নাকি ওখানে লুকিয়ে রেখেছি। শুনলাম, বাড়ি ফিরে এসেই নাকি ওই সব রঙ্গতামাশা শুরু করে দিয়েছে। বেশ হয়েছে! ঠগবাজ কোথাকার! এখানকার পাহারাদার লোকটা কাল আমায় বলেছে। সে ওখান থেকে এসেছে কিনা।"

আলিয়োশা বলল, "শোন, তোমাকে বলছি, সে আসবে। তবে কখন, কবে আসবে জানি নে। হয়তো আজই, হয়তো দু এক দিনের মধ্যে—সেটা জানি নে। তবে আসবে, আসবে যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

মিতিয়া চমকে উঠল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়েও চুপ করে রইল। সংবাদটা তার ওপর একটা ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে কথাবার্তার বিশদ বিবরণ জানার জন্য সে ভীষণ ভাবে ছটফট করছে, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন করতেও সে আবার ভয় পাচ্ছে। কাতিয়ার কাছ থেকে নিষ্ঠুর ও অবজ্ঞাপূর্ণ কিছু একটা এই মুহূর্তে তার বুকে শেল হয়ে বিঁধবে।

"ভালো কথা, আমাকে এই কথাই বলেছে যে পালানোর ব্যাপারে আমি অবশ্যই যেন তোমার মনের দ্বিধা দূর করে তোমার বিবেককে শান্ত করি। ইতিমধ্যে দাদা ইভান যদি সেরে না ওঠে তাহলে কাতেরিনা ইভানভ্না নিজে এ কাজের ভার তুলে নেবে।"

"তুই কিন্তু এ বিষয়ে আগে কিছু বলিসনি", মিতিয়া অন্যমনস্ক ভাবে মন্তব্য করল।

"তুমি কিন্তু এর মধ্যে গ্রুশাকে বলে দিয়েছ", আলিয়োশা মন্তব্য করল।

"তা বলে দিয়েছি", মিতিয়া স্বীকার করল। "আজ সকালে ও আসবে না।" সলজ্জ দৃষ্টিতে সে ভাইয়ের দিকে তাকাল। আসবে সেই সন্ধ্যাবেলা। গতকাল যেই আমি ওকে বললাম যে কাতিয়া একটা ব্যবস্থা করছে, চুপ করে রইল, ঠোঁট বাঁকাল।

শুধু ফিসফিস করে বলল করুক গে,!' বুঝল ঠিকই যে ব্যাপারটা গুরুতর। কিন্তু আমি আর বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলাম না। মনে হয় এখন ঠিকই বুঝতে পারছে যে ওই ও আমাকে ভালোবাসে না, ইভানকেই ভালোবাসে—তাই না?"

"তাই কি?" আলিয়োশার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

"হয়তো ঠিক তাও নয়। তবে আজ সকালে ও আসবে না।" আবারও খুলে বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিতিয়া। "আমি ওকে একটা কাজের ভার দিয়েছি।... জানিস, আমাদের ভাই ইভান আমাদের সবার ওপর টেক্কা মারবে। বাঁচতে হয় ওকেই বাঁচতে হবে, আমাদের নয়। ও সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"একবার ভেবে দেখ, কাতিয়া যদিও ওর কথা ভেবে ভেবে কেঁপে সারা, তবু ও যে ভালো হয়ে উঠবে এ ব্যাপারে তার মনে প্রায় কোনো সন্দেহ নেই", আলিয়োশা বলল।

"তার মানে কাতিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ও মারা যাবে। ও সেরে উঠবে বলে সে যে এতটা নিশ্চিত সেটা ওর মনের ভয় থেকে।"

"দাদা ইভান বেশ বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। আমারও খুব আশা যে ও সেরে উঠবে", উদ্বিগ্ন স্বরে আলিয়োশা মন্তব্য করল।

"হ্যাঁ তা সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু ওই জনের বিশ্বাস, মারা যাবে। তার কপালে অনেক দুঃখ আছে কিনা

নীরবতা নেমে এলো। খুবই গুরুতর কিছু একটা মিতিয়াকে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

"আলিয়োশা, আমি গ্রুশাকে ভীষণ ভালোবাসি", অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে মিতিয়া হঠাৎ বলে উঠল।

"*ওখানে* তোমার কাছে ওকে ওরা যেতে দেবে না"*, আলিয়োশা তৎক্ষণাৎ তার কথা লুফে নিয়ে বলল।

"আর হ্যাঁ, আরও একটা কথা বলতে চাই তোকে", বলতে বলতে আচমকা কেমন যেন ঝনঝন করে বেজে উঠল তার কণ্ঠস্বর। "পথে বা ওখানে যাবার পর ওরা যদি আমাকে মারধর করতে শুরু করে তাহলে আমি কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করতে পারব না। আমি ওদের কোনো একটাকে খুন করব, তাতে ওরা আমাকে গুলি করে মারে তো মারুক। বিশ বছর ধরে কিনা ওরকম চলবে! ওরা এখানেই এখন আমাকে 'তুই-তোকারি' করতে শুরু করেছে। পাহারাদারগুলো আমাকে 'তুমি' বলছে। আজ সারাটা রাত আমি শুয়ে শুয়ে মনে মনে বিচার করে দেখছিলাম। না, আমি প্রস্তুত নই! বহন করার মতো শক্তি আমার নেই! একটা স্তোত্র গাইবার

---

* এখানে একটা ইঙ্গিত আছে: বৈধ স্ত্রী হলে গ্রুশেন্কা মিতিয়ার নির্বাসন দন্ড ভোগের সঙ্গিনী হতে পারত। তাই এক্ষেত্রে গ্রুশেন্কাকে নিয় পালানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।—টীকা অনুবাদকের

ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু একটা পাহারাদার সেপাই যখন 'তুই-তোকারি' করে তখন সব কিছু সহ্যের বাইরে চলে যায়! গ্রুশা থাকলে সব সইতে পারতাম, সব—অবশ্য ওই মারধরটা ছাড়া। কিন্তু ওকে তো আর ওখানে যেতে দেবে না।

আলিয়োশা মৃদু হাসল।

"শোন ভাই, শেষ বারের মতো আমি বলছি", আলিয়োশা বলল। "এই ব্যাপারে আমি কী ভাবছি তোমায় বলি। তুমি তো জানই তোমার কাছে মিথ্যে আমি বলব না। তা হলে শোন তুমি প্রস্তুত নও, এরকম গুরুভার ক্রস তোমার জন্য নয়। তার চেয়েও বড়ো কথা, পরম গৌরবোজ্জ্বল শহিদত্বের ওই ক্রস বহন করার জন্য তুমি যখন প্রস্তুত নও তখন তার দরকারও নেই। তুমি যদি বাবাকে খুন করতে তাহলে আমি আক্ষেপ করে বলতে পারতাম তুমি তোমার ক্রস বহন করতে, শাস্তি মাথা পেতে নিতে অস্বীকার করছ। কিন্তু তুমি তো আর অপরাধী নও, তাই এরকম একটা ক্রস তোমার পক্ষে বড়ো বেশি গুরুভার হয়ে পড়বে। তুমি দুঃখ বরণ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে অন্য মানুষে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলে। আমার মতে, তুমি পালিয়ে যেখানেই যাও না কেন, সারা জীবন, চিরকাল সেই অন্য মানুষটিকে তোমার মনে রাখলেই হবে—সেটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। বড়ো রকমের ক্রস বহন করতে যে তুমি গেলে না তাতে বরং একটা কাজের কাজই হবে: তাতে তুমি মনে মনে আরও বেশি দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারবে, আর ভবিষ্যতে, সারা জীবন ধরে তোমার অনুক্ষণের এই উপলব্ধির সাহায্যে তুমি নিজের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবে—এমন কি হয়তো বা ওখানে গেলে যেমন হত তার চেয়েও বেশি পারবে। কথাটা আমি বলছি এই কারণেই যে ওখানে তুমি সইতে পারবে না, তুমি সর্বক্ষণ গজগজ করতে থাকবে, হয়তো বা শেষকালে সরাসরি বলেই বসবে 'আমি আমার দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়েছি।' অ্যাডভোকেট এক্ষেত্রে ঠিকই বলেছেন। ভারী বোঝা সবার জন্য নয়, কারও কারও পক্ষে একেবারে অসম্ভব।... এই আমার মনের কথা—যদি তোমার এতই দরকার হয়। যদি এমন হত যে তুমি পালালে অন্য সব লোককে—সৈন্যদের বা অফিসারদের দায়ী করা হবে তাহলে আমি তোমার পালানোকে 'প্রশ্রয়' দিতাম না।" আলিয়োশা মুচকি হাসল। কিন্তু ওরা বলছে—এই মর্মে আশ্বাসও দিচ্ছে—কনভয়ের দায়িত্বে যে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছেন তিনি নিজে ইভানকে এমন কথাও বলেছেন যে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে পারলে বড়ো রকমের কোনো তদন্ত না হওয়াই স্বাভাবিক—ছোটখাটোর ওপর দিয়ে পার পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এটা ঠিক যে এমনকি এ ক্ষেত্রেও ঘুষ দেওয়াটা কোনো সততার কাজ নয়, কিন্তু এখানে আমি কোনোমতে এর বিচার করতে যাব না, কেন না সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এই ধর ইভান আর কাতিয়া যদি তোমার ব্যবস্থা করার ভারটা আমার ওপর দিত তাহলে আমিও যে ঘুষ দিতে যেতাম সে আমি ঠিকই জানি। তোমাকে পুরোপুরি সত্যি কথাটাই আমার বলা উচিত। আর সেই

কারণেই তুমি নিজে কী করবে তার বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু জেনে রাখ, আমি কখনও তোমাকে নিন্দা করতে যাব না। তা ছাড়া এ ব্যাপারে আমি কী করেই তোমার বিচারক হতে পারি?—সেটাও তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে। যাক, এখন মনে হচ্ছে যা যা খতিয়ে দেখার ছিল সব দেখা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু তা হলেও আমি নিজেই নিজের শাস্তিবিধান করব!" মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। "আমি পালাব, তোকে ছাড়াই ওটা আমি স্থির করে ফেলেছিলাম। মিতিয়া কারামাজ়ভ্ পালাতে পারে না তাও কি হয়? কিন্তু তা হলেও আমি নিজের শাস্তিবিধান করব, সেখানে গিয়ে আমার পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি সারা জীবন প্রার্থনা করে যাব! যিশুপ্রেমীরা তো এমন কথাই বলে—তাই না? এই যেমন তুই আর আমি এখন করছি—ঠিক কিনা?"

"ঠিক কথা।" আলিয়োশা মৃদু হাসল।

"তোকে আমি এই কারণেই না ভালোবাসি যে তুই সব সময় খাঁটি সত্যি কথা বলিস, কিছুই লুকোস না!" উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে মিতিয়া বলে উঠল। 'তার মানে আমি আমার আলিয়োশাকে একজন যিশুপ্রেমী হিসেবে পেলাম! বলি কি, এর জন্য তোকে আচ্ছা করে চুমু খাওয়া দরকার! তা হলে শোন, এখন আমি বাকিটাও, আমার মনের বাকি অর্ধেকটাও তোর কাছে খুলে ধরব। আমি কী ভেবেছি আর ভেবে কী স্থির করেছি তাহলে শোন। আমি যদি পালিয়েও যাই, এমনকি টাকাকড়ি পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়েও পালিয়ে যাই, যদি আমেরিকাতেও যাই তাহলেও আমার এই চিন্তাটাই আমাকে উৎসাহ জোগাবে যে আমি আনন্দের জন্য বা সুখের জন্য পালাচ্ছি না, সত্যি বলতে গেলে কি যাচ্ছি আরেকটি জায়গায় সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে, আর সে জায়গাটা হয়তো বা এটার চেয়ে কোনো অংশে কম খারাপ নয়। খারাপ, আলিয়োশা, সত্যি বলছি, কোনো অংশে কম খারাপ নয়! চুলোয় যাক, আমেরিকা! এই আমেরিকার ওপর এর মধ্যেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে। না হয় গ্রুশা থাকলই আমার সঙ্গে, কিন্তু তাহলেও একবার তাকিয়ে দ্যাখ দেখি ওকে—ও কি আর আমেরিকান মেয়ে? ও রুশি, হাড়ে মজ্জায় রুশি। জন্মভূমি মা'র জন্য ওর প্রাণ কাঁদবে, আর আমাকে প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখে যেতে হবে আমার জন্যই ওকে এমন কষ্ট পেতে হচ্ছে, এমন গুরুভার ক্রস বইতে হচ্ছে! কিন্তু ওর দোষটা কোথায়? তা ছাড়া আমি? আমিই বা কি সইতে পারব ওখানকার ওই ছোটোলোকগুলোকে—যদিও হতে পারে ওদের প্রত্যেকেই আমার চাইতে ভালো? এর মধ্যেই আমি ঘেন্না করতে শুরু করেছি এই আমেরিকাকে! না হয় হলই সেখানকার প্রতিটি মানুষ বিশাল বিশাল একেকটা যন্ত্রের কারবারি, কিন্তু তাতে আমার কী? চুলোয় যাক ওরা! ওরা, আমার লোক নয়, আমার প্রাণের মানুষ নয়। আমি নিজে একজন নীচ প্রকৃতির মানুষ হলে কী হবে আমি রাশিয়াকে ভালোবাসি আলেক্সেই, রাশিয়ার ঈশ্বরকে ভালোবাসি! আমি বলছি, আমি সেখানে গেলে টেঁসে যাব!"

হঠাৎ চেঁচিয়ে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দু চোখ ঝলক উঠল। কান্নার দমকে কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

“শোন্ তাহলে আলেক্সেই, ‘আমি কী ঠিক করেছি!” মনের উত্তেজনা চেপে রেখে সে আবার বলতে শুরু করল। “গ্রুশাকে নিয়ে আমি ওখানে যাব ঠিকই—ওখানে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথাও, বুনো ভালুকেরা যেখানে থাকে এমন কোনো জায়গায় একেবারে নিরিবিলিতে ঠাঁই নিয়ে কাজে লেগে যাব, চাষবাস শুরু করে দেব। ওখানেও নিশ্চয়ই সুদূর কোনো প্রান্তে কোনো ঠাঁই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুনতে পাই ওখানে নাকি সুদূর দিগন্তের কোন্ এক প্রান্তে কোথাও লাল চামড়ার আদিবাসীরা থাকে—যাব সেই সেখানে, শেষ মোহিকানদের দেশে। আর তৎক্ষণাৎ ব্যাকরণ নিয়ে উঠে পড়ে লেগে যাব—আমি আর গ্রুশা—আমরা দুজনেই। কাজ আর ব্যাকরণ চর্চা—এই ভাবে বছর তিনেক চলবে। তিন বছরে ইঞ্জিরি ভাষাটা এমন ভাবে রপ্ত করে ফেলব যে কার সাধ্য আমাদের খাঁটি ইংরেজ না বলে! যেই শেখা হয়ে যাবে অমনি আমেরিকা থেকে বিদায়! ছুটে চলে আসব এখানে, রাশিয়ায়, আমেরিকার নাগরিক হয়ে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, এখানে আমাদের এই শহরে আসতে যাচ্ছি না। আত্মগোপন করব দূরে কোথাও—উত্তরে বা দক্ষিণে যেখানেই হোক। ইতিমধ্যে আমি পালটে গেছি, সেও পালটে গেছে—সেই আমেরিকাতে থাকতেই। ওখানকার ডাক্তার আমার মুখের ওপর একটা আঁচিল বা ওই গোছের কিছু একটা বানিয়ে দেবে — তা নইলে ওদের আর কারিগর বলি কেন! আর তা যদি না হয় তা হলে আমি নিজেই না হয় আমার একটা চোখ গেলে ফেলব, ইয়া লম্বা দাড়ি রাখব — সাদা দাড়ি — তা ইতিমধ্যে রাশিয়ার কথা ভেবে দাড়িতে পাকও ধরে যাবে। সম্ভবত কেউ চিনতে পারবে না। আর চিনতে যদি পারেও পাঠালেই না হয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। ওতে কিছু আসে যায় না। ধরে নেব ভাগ্য আমাদের ওপর প্রসন্ন নয়! এখানেও কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে জমি চাষ করব। সারাটা জীবন আমি নিজেকে আমেরিকান বলে জাহির করব। কিন্তু আমরা আমাদের জন্মের মাটিতে দেহ রাখব। এই হল আমার পরিকল্পনা, এর কোন রদবদল হবার নয়। তুই অনুমোদন করছিস ত?”

“করছি।” তার কথার প্রতিবাদ করার কোন ইচ্ছে আলিয়োশার ছিল না।

মিতিয়া মিনিটখানেক চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ দুম করে বলে উঠল

“কোর্টে দেখলি ত ওরা কী কারবারটা করল? কী কারবারটাই না করল বল দেখি!”

“কারবার যদি নাও করত, অমনিতেই তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করত”, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলিয়োশা বলল।

“তা বটে, এখানকার লোকজন আমাকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল! ভগবান

বিচার করবেন। কিন্তু সহ্য করা কঠিন!" ব্যথিত কণ্ঠে কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল মিতিয়া।

আবারও মিনিট খানেকের জন্য দুজনেই চুপচাপ।

"আলিয়োশা, পারিস ত আমাকে এখনই আমাকে মেরে ফেল, দোহাই তোর!" সে আবার হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। "বল, ও কি আসছে, না আসছে না! কী বলল? কী ভাবে বলল?"

"বলল আসবে। কিন্তু আজই আসবে কিনা জানি না। ওর পক্ষে বড় কঠিন!" আলিয়োশা ভয়ে ভয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

"তা নয় ত কী! কঠিন হবে না আবার! আমি ওই ভেবে ভেবেই পাগল হয়ে যাব রে আলিয়োশা! গ্রুশা তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখে। ও বুঝতে পারে। হা ভগবান! আমার মন শান্ত কর প্রভু! এ আমি কী দাবি করছি? আমি কিনা কাতিয়াকে দাবি করছি! একবার ভেবে দেখেছি কি কী দাবি করছি? এ ত সেই অসংযমী কারামাজ়ভ্ বংশের দুষ্টগ্রহ! না, কষ্ট ভোগ করার যোগ্য আমি নাই! আমি একটা ইতর—এর বেশি কিছু বলার নেই!"

"এই ত এসে গেছে!" আলিয়োশা বলে উঠল।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ দরজার মুখে কাতিয়ার আবির্ভাব ঘটল। পলকের জন্য সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে দৃষ্টি মেলে মিতিয়াকে দেখতে লাগল। মিতিয়া চট করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার ঠোঁটে খেলে গেল এক ধরনের কুণ্ঠাজড়িত মিনতি ভরা হাসি। সে আর নিজেকে সংযত করতে না পেরে হঠাৎই কাতিয়ার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিল। এই দেখে কাতিয়াও উচ্ছ্বসিত আবেগে তার দিকে ছুটে গেল। কাতিয়া তার দু হাত চেপে ধরে এক রকম জোর করে তাকে বিছানায় বসাল। নিজেও তার পাশে বসল, কিন্তু তখনও তার হাত ছাড়ল না, থেকে থেকে সজোরে তার হাতে চাপ দিতে লাগল। দুজনেই বেশ কয়েকবার কিছু একটা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই থেমে যেতে হল। আবারও চুপ করে রইল, অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসি মুখ করে কেমন যেন স্থির নিবদ্ধ এক দৃষ্টে তারা একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই ভাবে মিনিট দুয়েক কেটে গেল।

"আমাকে ক্ষমা করেছ, নাকি কর নি?" অবশেষে আমতা আমতা করে মিতিয়া বলল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উদ্ভাসিত মুখটা আলিয়োশার দিকে ফিরিয়ে সে চেঁচিয়ে তাকে বলল, "শুনছিস, আমি কী জিগ্যেস করছি?"

"তোমাকে এই কারণেই ভালো বেসেছিলাম যে তোমার মনটা বড় উদার!" হঠাৎ কাতিয়ার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো। "আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমার কোন কাজ নেই, আমারও কাজ নেই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর আর না কর সবই সমান—সারা জীবনের মতো তুমি আমার বুকের

ক্ষত হয়ে থাকবে, আমিও তোমার বুকের ক্ষত হয়ে থাকব—যা হওয়া উচিত তাই হবে বলতে বলতে সে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য থামল। "কীসের জন্য আমি এলাম?" উদ্‌ভ্রান্তের মতো, তাড়াহুড়ো করে সে আবার বলতে শুরু করল", তোমার পা দুটো জড়িয়ে ধরব বলে, তোমার হাত দুটো চেপে ধরব বলে—ঠিক এই ভাবে, ব্যথায় টনটন না করা পর্যন্ত যেমন চেপে ধরতাম মস্কোয় থাকতে—মনে আছে? আবারও তোমাকে এই কথা বলব বলে যে তুমি আমার দেবতা, আমার আনন্দ, তোমাকে আমি ভালোবাসি, পাগলের মতো ভালোবাসি।" বলতে বলতে যন্ত্রণায় সে যেন কাতরে উঠল এবং হঠাৎই আকুল হয়ে মিতিয়ার হাতে ঠোঁট ঠেকাল। তার দু চোখ জলে ভেসে গেল। আলিয়োশা বিমূঢ় হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সে যা দেখল তা কখনও আশা করে নি।

"ভালোবাসা অতীত হয়ে গেছে মিতিয়া!" কাতিয়া আবার বলতে শুরু করল। "কিন্তু সে অতীত আমার কাছে পরম মূল্যবান—তার মূল্যের পরিমাণ এত বেশি যে ভাবতেও কষ্ট হয়। জেনে রেখো, চিরকালের জন্য এমনই রয়ে যাবে। কিন্তু যা হলেও হতে পারত, এখন মুহূর্তের জন্য হলেও তা-ই হোক না কেন", বাঁকা হেসে আমতা-আমতা করে এই কথা বলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আবার সে তার চোখের দিকে তাকাল। "এখন তুমি অন্য একজনকে ভালোবাস, আমিও আরেক জনকে ভালোবাসি। কিন্তু তাহলেও তোমাকে চিরকাল ভালোবেসে যাব, তুমিও আমাকে ভালোবেসে যাবে—এটা কি তুমি জানতে? শুনতে পাচ্ছ, আমি কী বলছি?—আমাকে ভালোবাস, সারা জীবন ধরে ভালোবাস আমাকে!" কতকটা যেন হুমকির সুর ফুটে উঠল তার কথার মধ্যে, তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

"ভালোবাসব আর আর জান কাতিয়া", একেকটি কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে মিতিয়া বলতে লাগল, "জান, আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পাঁচদিন আগে... সে দিনের সেই সন্ধ্যায় যখন তুমি পড়ে গেলে, তারপর লোকে তোমাকে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। সারা জীবন ভালোবাসব! তা-ই হবে, চিরকাল ধরে চলতে থাকবে

এই ভাবে ওরা দুজনে বকবক করে একে অন্যের উদ্দেশে এমন সব কথা বলে যেতে লাগল যা ছিল প্রায় অর্থহীন, পাগলের প্রলাপ, এমনকি হয়তো বা অসত্যও, অথচ ঠিক সেই মুহূর্তটির জন্য সবটাই ছিল এবং ওরা নিজেরাও আন্তরিক ভাবে সেটা বিশ্বাস করত।

"কাতিয়া", মিতিয়া হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, "তোমার কি বিশ্বাস যে আমি খুন করেছি? জানি যে এখন বিশ্বাস কর না, কিন্তু তখন যখন এজাহার দিয়েছিলে তখন? সত্যিই কি বিশ্বাস করেছিলে? সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছিলে?"

"তখনও বিশ্বাস করিনি! কোনো কালেই বিশ্বাস করিনি! তোমার ওপর আমার বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছিল, তাই আমি তখন হঠাৎই মুহূর্তের জন্য জোর করে নিজেকে

বুঝিয়েছিলাম, বুঝিয়েছিলাম এবং বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু যখন এজাহার দেওয়া শেষ করলাম অমনি আবার আমার সেই বিশ্বাস চলে গেল। যা বলছি জেনে রাখ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি এসেছিলাম নিজেকে শাস্তি দিতে!" হঠাৎ কেমন যেন একটা নতুন সুর ফুটে উঠল তার কণ্ঠস্বরে, যা তার এই কিছুক্ষণ আগের প্রেম মুগ্ধ আবোল তাবোল কথার মতো একেবারেই ছিল না।

"স্ত্রীলোকের মন বলে কথা, তোমার মনের বোঝাটা বড়োই ভারী", মিতিয়ার মুখ থেকে হঠাৎই যেন একেবারে অসংযত ভাবে বেরিয়ে এলো।

"আমাকে যেতে দাও", ফিসফিস করে কাতিয়া বলল। "আমি আবার আসব। এখন আমার মন ভার হয়ে আছে!

সে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় আচমকা জোরে চিৎকার করে উঠে পিছিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একেবারে নিঃশব্দে হলেও অতর্কিতে গ্রুশেন্‌কার আবির্ভাব ঘটল। তাকে কেউ এই সময় আশা করেনি। কাতিয়া দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল, কিন্তু গ্রুশেন্‌কার কাছাকাছি চলে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখ খড়ির মতো সাদা হয়ে গেল, প্রায় ফিসফিস করে মৃদুকণ্ঠে আর্তনাদ করে সে তাকে বলল

"আমাকে ক্ষমা কোরো!"

গ্রুশেন্‌কা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য থেমে বিষমাখা তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল

"মা গো, আমরা দুজনে রাগে জ্বলেপুড়ে মরছি! দুজনেই! ক্ষমা করার জায়গা কোথায় আমাদের? তুমি আমাকে কী করে করবে, আমিই বা তোমাকে কী করে করব? বলি, ওকে বাঁচাও, সারা জীবন আমি তোমাকে পুজো করব।"

"কিন্তু ক্ষমা করার ইচ্ছে নেই!" মিতিয়া উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে ভর্ৎসনার সুরে গ্রুশেন্‌কাকে বলল।

"চিন্তার কোনো কারণ নেই, ওকে উদ্ধার করে তোমার হাতে দেব!" দ্রুত ফিসফিস করে এই কথা বলে কাতিয়া ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল!"

"ও নিজে তোমাকে বলল 'ক্ষমা কোরো'—তার পরও কিনা তুমি ওকে ক্ষমা করতে পারলে না?" তিক্ত কণ্ঠে মিতিয়া আবার বলে উঠল।

"ওকে বকাবকি করার মতো স্পর্ধা দেখিয়ো না, মিতিয়া! সে অধিকার তোমার নেই!" উত্তেজিত কণ্ঠে আলিয়োশা তার ভাইয়ের ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

"ও যা বলল সেটা তেজ দেখিয়ে মুখে বলে গেল, ওর মনের কথা নয়", কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার সুরে গ্রুশেন্‌কা বলল। "ও যদি তোমাকে বাঁচায় তাহলেই আমি ওর সব কিছু ক্ষমা করে দেব।

মনের মধ্যে কিছু একটা যেন চেপে রেখে সে চুপ করে রইল। তখনও সে ধাতস্থ হতে পারছিল না। পরে দেখা গিয়েছিল সে যে এসেছিল সেটা একেবারেই

কিছু না জেনে, কোনো রকম সন্দেহ না করে। তার ধারণাই ছিল না যে তাকে এরকম একটা অবস্থার মুখে পড়তে হবে।

"আলিয়োশা, ওকে ছুটে গিয়ে ধর!" ভাইকে তাড়া দিয়ে মিতিয়া বলে উঠল। "ওকে গিয়ে বল   জানি নে কী বলবি   তাই বলে ওকে এই ভাবে চলে যেতে দিস না!"

"সন্ধ্যার আগে আগে আমি তোমার কাছে ফের আসব", চিৎকার করে এই কথা বলে কাতিয়াকে ধরার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেল আলিয়োশা।

হাসপাতালের সীমানার বাইরে সে কাতিয়ার নাগাল ধরল। কাতিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। কিন্তু আলিয়োশা তার নাগাল ধরতেই সে তাড়াতাড়ি তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল

"না ওই মেয়ের সামনে আমি নিজের দণ্ডবিধান করতে পারি না! আমি ওকে বলেছিলাম 'আমাকে ক্ষমা কোরো', তার কারণ আমি নিজের চূড়ান্ত শাস্তিবিধান করতে চেয়েছিলাম। সে আমাকে ক্ষমা করল না। ...এর জন্য ওকে আমার ভালোই লাগছে!" বিকৃত স্বরে কাতিয়া যোগ করল। তার দু চোখে দপ্‌ করে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল।

"ভাই কিন্তু আশাই করতে পারেনি", বিড়বিড় করে আলিয়োশা বলতে গেল, "ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আসবে না   "

"কোনো সন্দেহ নেই। ও কথা ছেড়ে দিন", কাতিয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল। "যা বলছি শুনুন। আমি এখন আপনার সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে পারছি না। সমাধিতে দেবার জন্য কিছু ফুল আমি ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি। টাকাকড়ি এখনও ওদের আছে—আমার তা-ই ধারণা। যদি দরকার হয় ওদের বলবেন যে ভবিষ্যতেও কখনও ওদের ছেড়ে চলে যাব না।   এখন আমাকে ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন। আপনার ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে, গির্জার ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের শেষ ঘণ্টা বাজছে।   আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন!"

## তিন

## ইলিউশার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। শিলাখণ্ডের পাশে কয়েকজনের ভাষণ।

বাস্তবিকই তার দেরি হয়ে গিয়েছিল। সকলে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষকালে এমনও স্থির করে ফেলেছিল যে তাকে বাদ দিয়েই ফুল দিয়ে সাজানো, সুন্দর ছোট্ট কফিনটা তারা গির্জায় নিয়ে যাবে। কফিনটা সেই বেচারি বাচ্চা ছেলে ইলিউশার। যে দিন মিতিয়ার দণ্ড ঘোষণা করা হয় তার দু দিন পরেই ইলিউশার

মৃত্যু হয়। আলিয়োশা বাড়ির গেটের কাছে আসতে না আসতে ইলিউশার স্কুলের বন্ধুবান্ধব ছেলের দল তাকে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তারা অধীর হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে যে শেষ কালে এসে পৌঁছেছে তাতে তারা খুশি। সবসুদ্ধ জনা বারো বন্ধুবান্ধব এসে জুটেছে। সকলেরই পিঠে বাঁধা স্কুল ব্যাগ বা কাঁধে ঝোলানো থলি। 'বাবা কাঁদবে, তোরা বাবার সঙ্গে থাকিস', ইলিউশা মারা যাবার সময় তাদের বলে গিয়েছিল, ছেলেরা সেটা মনে করে রেখেছে। তাদের দলের নেতা ছিল কোলিয়া ক্রাসোতকিন।

"আপনি যে এসেছেন তাতে আমি কী খুশিই না হয়েছি, কারামাজ়ভ্!" কারামাজ়ভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উল্লসিত হয়ে সে বলে উঠল। "এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সত্যি বলতে গেলে কি চোখে দেখা যায় না। স্নেগিরিয়োভ্ মাতাল নয়, আমরা ঠিক জানি যে আজ এক ফোঁটা মদও খায়নি, অথচ দেখে মনে হয় যেন মাতাল। আমার মন বরাবরই শক্ত, কিন্তু যা দেখছি এ বড়ো সাঙ্ঘাতিক। কারামাজ়ভ্, আমি যদি আপনার দেরি করিয়ে না দিয়ে থাকি তাহলে আপনি ঘরে ঢোকার আগে আপনাকে আরও একটি মাত্র প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"সেটা কী কোলিয়া?" আলিয়োশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আপনার ভাই কি অপরাধী, না কি অপরাধী নয়? বাবাকে কি সে-ই খুন করেছে, না কি বাড়ির চাকর খুন করেছে? আপনি যা বলবেন তা-ই হবে। এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার চার রাত ঘুম হয়নি।"

"খুন করেছে বাড়ির চাকর। আমার ভাই নির্দোষ", আলিয়োশা জবাব দিল।

"আমিও তো তা-ই বলি!" স্মুরভ্ নামে ছেলেটি পাশ থেকে ফস্ করে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

"তাহলে সত্যের জন্য বিনা অপরাধে প্রাণ বলি দেবে!" বিস্ময় প্রকাশ করল কোলিয়া। "প্রাণ বলি দিলেও আমি কিন্তু ওকে সৌভাগ্যবান মনে করি! আমি পারলে ওকে ঈর্ষাই করি!"

"সে আবার কী? তা কী করে হয়? কেন?" আলিয়োশা অবাক হয়ে গেল।

"আহা আমিও যদি সত্যের জন্য অন্তত কোনো দিন নিজেকে উৎসর্গ করতে পারতাম!" সোৎসাহে কোলিয়া বলে উঠল।

"কিন্তু তাই বলে এই রকম একটা ব্যাপারে তো আর নয়। এমন একটা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে, এমন ভয়াবহ ধরনেও নয়।" আলিয়োশা বলল।

"অবশ্যই ... আমার ইচ্ছে সমস্ত মানবজাতির জন্য মৃত্যু বরণ করা, আর কলঙ্কের বোঝার কথা যদি বলেন তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের নাম বলতে তো কিছুই থাকছে না। আপনার ভাইকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

"আমিও!" ছেলেদের দলের ভিড়ের মধ্য থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে, একেবারে আচমকা বলে বসল সেই ছেলেটা, যে এক সময় বলেছিল ট্রয় কে প্রতিষ্ঠা করেছিল

তা সে জানে। চেঁচিয়ে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেবারের মতো এবারেও কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মুখ লজ্জায় আকর্ণ সিঁদুরে লাল হয়ে উঠল।

আলিয়োশা ঘরে ঢুকল। চারধারে সাদা ঝালর দেওয়া নীল রঙের একটা সাজানো গোছানো খোলা কফিনের ভেতরে ইলিউশা শুয়ে আছে। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা, চোখ দুটো বন্ধ। তার শীর্ণ মুখমণ্ডলের প্রায় কোনো অদল বদল হয় নি বললেই চলে, আর অদ্ভুত ব্যাপার এই যে শবদেহ থেকে পচনের কোনো গন্ধও প্রায় আসছিল না। মুখের ভাবটা গম্ভীর, মনে হয় যেন চিন্তাচ্ছন্ন। বিশেষ করে ভালো লাগছিল বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা হাতের ভঙ্গিটা—দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন মর্মর পাথর কেটে তৈরি। তার দু হাতে ফুল গোঁজা, তা ছাড়া পুরো কফিনটাই ভেতরে বাইরে ফুল দিয়ে সাজানো। ভোর হতে না হতেই লিজা খখ্‌লাকোভা ওই ফুলগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া কাতেরিনার কাছ থেকেও আরও ফুল এসেছিল। আলিয়োশা যখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল তখন ক্যাপ্টেন এক গোছা ফুল নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে তার আদরের ছেলের শরীরের ওপর আবারও ফুল ছড়াচ্ছিল। আলিয়োশাকে ঢুকতে দেখেও সেদিকে প্রায় কোনো দৃষ্টিপাতই করল না। কারও দিকে দৃষ্টিপাত করার ইচ্ছে তার ছিল না—এমনকি তার উন্মাদিনী স্ত্রী, তার ছেলের মা যে কেঁদে আকুল হয়ে মৃত সন্তানকে আরেকটু কাছ থেকে দেখার জন্য পঙ্গু পায়ে বারবার ওঠার চেষ্টা করছে—সে দিকেও না। নিনাকে ছেলেরা চেয়ারসুদ্ধ ঠেলে একেবারে কফিন ঘেঁষে বসিয়ে দিয়েছে। কফিনে মাথা ঠেকিয়ে সে বসে ছিল। নিঃসন্দেহে সেও কাঁপছিল, নিঃশব্দে কাঁদছিল। স্নেগিরিয়োভের চোখে মুখে এক ধরনের সজীব অথচ কেমন যেন একটা বিহ্বলতা এবং সেই সঙ্গে একটা কঠোর ভাবও ফুটে উঠেছে। তার ভাবভঙ্গিতে এবং তার মুখ ফসকে যে সমস্ত কথা বেরিয়ে আসছিল সেগুলির মধ্যে পাগলামি গোছের কিছু একটা প্রকাশ পাচ্ছিল। ইলিউশার দিকে তাকাতে তাকাতে প্রতি মুহূর্তে সে 'বাছা আমার, বাপধন আমার!'—বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। ইলিউশা বেঁচে থাকতেও তাকে আদর করে 'বাছা আমার, বাপধন আমার' বলার অভ্যাস তার ছিল।

"ওগো শুনছ, আমাকেও একটা ফুল দাও না, ওই যে ওর হাত থেকে ওই সাদা ফুলটা এনে আমাকে দাও না গো!" উন্মাদিনী গিন্নি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার কর্তার কাছে আবদার করল। ইলিউশার হাতে গোঁজা ছোট্ট সাদা গোলাপটা তার ভালো লেগেছিল বলেই হোক অথবা তার হাত থেকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ফুলটা তার নেওয়ার সাধ হয়েছিল বলেই হোক ফুলের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে ভীষণভাবে ছটফট করতে লাগল।

"কাউকে দেব না, কিছুই দেব না!" নির্মম কণ্ঠে তাকে দাবড়ে দিয়ে স্নেগিরিয়োভ্ বলে উঠল। "ও ফুল ওর, তোমার নয়। সব ওর, তোমার কিছু নেই!"

"আহা বাবা, দাও না মাকে একটা ফুল!" হঠাৎ চোখের জলে ভেজা মুখটা তুলে নিনা তাকাল।

"কিছুই দেব না, ওকে তো আরোই দেব না! ছেলেটাকে ও ভালোবাসত না। সেবারে ওর হাত থেকে খেলনা কামানটা কেড়ে নিয়েছিল, ছেলে ওকে শেষ পর্যন্ত ওটা উপহারই দিয়ে দিল।" এক সময় ইলিউশা যে তার খেলনা কামানের দখল তার মাকে ছেড়ে দিয়েছিল সে কথা মনে হতে হঠাৎ ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। বিকৃত মস্তিষ্কের বেচারি মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে চোখ ঢেকে নিঃশব্দে কেঁদে ভাসিয়ে দিল। অবশেষে ছেলের দল যখন দেখল বাপ তার ছেলের কফিনটা কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইছে না, অথচ সেটা এখনই বয়ে না নিয় গেলে নয় তখন তারা ঘন দঙ্গল বেঁধে হঠাৎ কফিনটাকে চারধার থেকে ঘিরে ধরে তোলার আয়োজন করতে লাগল।

"গির্জার চত্বরে ওকে গোর দিতে দেব না!" আচম্বিতে আর্ত চিৎকার করে উঠল স্নেগিরিয়োভ্। "পাথরটার কাছে গোর দেব, আমাদের ওই পাথরটার কাছে! ইলিউশা তা-ই বলেছিল। নিয়ে যেতে দেব না!"

এর আগেও, গত তিন দিন ধরে সে বলে যাচ্ছিল যে ওই পাথরটার কাছে ওকে গোর দেবে। কিন্তু আলিয়োশা, ক্রাসোত্‌কিন, বাড়িউলি, তার বোন আর ছেলেরাও সকলে মাঝখান থেকে গোলমাল বাধাল।

"আহা, কী সব উদ্ভট চিন্তা! কোথাকার কোন্ ছিষ্টিছাড়া পাথর—বলে কি না সেটার পাশে গোর দেবে! কেন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে নাকি?" বাড়িউলি বুড়ি কড়া ধমক দিয়ে বলল। গির্জার চত্বরে ওর জন্য ক্রস দেওয়া জমি থাকছে। সেখানে ওর জন্য প্রার্থনা করা হবে। গির্জা থেকে ভজন কানে আসবে, গির্জার পুরুতমশাই এত সুন্দর আর শুদ্ধ ভাষায় কথকতা করেন যে প্রতিবারই কথাগুলো ঠিক ওর কানে গিয়ে পৌঁছুবে—মনে হবে ঠিক যেন ওর কবরের ওপরই উনি পাঠ করছেন।

ক্যাপ্টেন শেষ কালে হাল ছেড়ে দিয়ে হাত নেড়ে এমন একটা ভাব করল যে মনে হল বলতে চায় 'তোমাদের যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পার!'

বাচ্চারা কফিন ওঠাল। কিন্তু মার পাশ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবার সময় তার সামনে একটুখানি থেমে কফিনটা মাটিতে নামাল যাতে ইলিউশাকে সে শেষ বিদায় জানাতে পারে। গত তিন দিন ধরে মা তার বড়ো আদরের এই মুখখানাকে কেবল খানিকটা দূর থেকেই দেখে এসেছে, কিন্তু এখন হঠাৎ এতটা কাছ থেকে দেখতে পেয়ে তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, তাঁর সাদা চুল ভরতি মাথাটা কফিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে খিঁচুনি তুলে দমকে দমকে আগে পিছে দুলতে লাগল।

"মা, ওর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে ওকে আশীর্বাদ কর, চুমু খাও ওকে", নিনা তার মাকে চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু মহিলার মাথাটা যন্ত্রবৎ ঝাঁকুনি দিয়ে দুলছে

তো দুলছেই। মুখে কোনো ভাষা নেই। তিক্ত বেদনায় বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখটা। আচমকা হাত মুঠো করে সে বুক চাপড়াতে লাগল। কফিনটা ওরা তার পাশ থেকে উঠিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। নিনার পাশ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবার সময় নিনা শেষবারের মতো তার ভাইয়ের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাল। আলিয়োশা ঘর থেকে বেরোবার মুখে বাড়িউলিকে অনুরোধ করতে যাচ্ছিল যারা বাড়িতে রয়ে গেল সে যেন তাদের একটু দেখেশুনে রাখে। মহিলা আলিয়োশাকে তার মুখের কথা শেষ করতে দিল না।

"সে আর বলতে হবে না। ওদের সঙ্গে আছি। আমরাও তো খ্রিস্টান রে বাপু!" বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বলল।

গির্জা পর্যন্ত বেশি দূরের পথ নয়—কফিন বড়জোর তিনশ পা মতন দূরে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। দিনটা পরিষ্কার, শান্ত। হিম পড়ছে, তবে তেমন একটা নয়। গির্জার প্রার্থনা অনুষ্ঠানের ঘণ্টা বাজছে। স্নিগোরিয়োভ্ শশব্যস্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কফিনের পিছন পিছন ছুটছে। তার গায়ে প্রায় গরমকালে পরার উপযোগী তার সেই পুরনো খাটো ওভারকোটটা, মাথা খালি, চওড়া কানাতওয়ালা ন্যাতপেতে পুরনো টুপিটা হাতে ধরে রেখেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল এমন একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে যার কোনো কূলকিনারা সে করতে পারছে না। থেকে থেকে হঠাৎ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কফিনের মাথার দিকটা উঁচু করে ধরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাতে সাহায্য করার বদলে বাহকদের কেবল বিঘ্নই ঘটাচ্ছিল। কখনও বা সুবিধামতন জায়গা নিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে পাশ বরাবর ছুটছিল। একটা ফুল বরফের ওপর পড়ে যেতে সে এমন ভাবে ছুটে গিয়ে সেটা কুড়োতে গেল যে মনে হচ্ছিল যেন সেটা খোয়া গেলে ভগবান জানেন কী না কী হয়ে যাবে।

"এই রে, রুটির ওপরের শক্ত পিঠটা—সেটাই তো আনতে ভুলে গেছি!" হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছেলেরা তাকে তৎক্ষণাৎ মনে করিয়ে দিল যে রুটির শক্ত পিঠটা এই একটু আগেই সে নিয়েছে, সেটা তার পকেটে আছে। স্নিগেরিয়োভ্ মুহূর্তের মধ্যে টুকরোটা টেনে বার করল এবং আছে দেখে নিশ্চিন্ত হল।

'ইলিউশা বলেছিল, আমার ইলিউশা আমায় বলেছিল", সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কারণটা ব্যাখ্যা করে আলিয়োশাকে বলল, "এক দিন রাতে ইলিউশা বিছানায় শুয়ে আছে, আমি ওর পাশে বসে আছি, এমন সময় ও আমাকে বলল 'বাবা, আমাকে যখন গোর দেবে, তখন আমার কবরের ওপর রুটির শক্ত পিঠ গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিয়ো, তাহলে চড়ুই পাখিরা উড়ে এসে বসবে, আমি শুনতে পাব যে ওরা উড়ে এসেছে। শুনতে শুনতে আমার এই ভেবে আনন্দ হবে যে আমি সেখানে একা একা শুয়ে নেই।'"

"এ তো খুব ভালো কথা", আলিয়োশা বলল। "মাঝে মাঝেই নিয়ে আসতে হয়।"

"মাঝে মাঝে কেন? রোজ রোজ", রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে ক্যাপ্টেন বলে উঠল।

শেষকালে সকলে কফিন নিয়ে গির্জায় পৌঁছুল। কফিনটা গির্জার মাঝখানে রাখল। ছেলেরা সকলে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল, গির্জার অনুষ্ঠান যতক্ষণ চলল ততক্ষণ সশ্রদ্ধ চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল। গির্জাটা প্রাচীন এবং বড়োই দৈন্যদশাগ্রস্ত। অনেকগুলি সাধু সন্ত ও দেবদেবীর পট—একেবারেই বাঁধানো নয়। তবে এ ধরনের গির্জা যেন প্রার্থনা করার পক্ষে বেশি ভালো। দ্বিপ্রাহরিক উপাসনার সময় স্নিগেরিয়োভ্ যেন বেশ খানিকটা চুপচাপ হয়ে গেল, অবশ্য যদিও সময় সময় ওই একই রকম ভাবে তার অবচেতন মন থেকে এমন এক ধরনের উৎকণ্ঠার ভাব ঠেলে বেরিয়ে আসছিল যা তাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। ফলে সে কখনও ঢাকনার কাপড়টা ঠিক করে দেওয়ার জন্য কফিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার এক সময় যখন বাতিদান থেকে একটা মোমবাতি পড়ে গেল অমনি সেটাকে ঠিক মতো বসিয়ে রাখার জন্য ছুটে গেল, সে কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক বেশি সময় লাগিয়ে দিল। তার পর শান্ত হয়ে চুপচাপ শিয়রে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন ভেবাচেকা খাওয়া মুখ করে শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। আলিয়োশা তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুসমাচার পাঠের পর্ব শেষ হলে হঠাৎ ফিসফিস করে আলিয়োশাকে সে বলল যে পড়াটা 'সে রকম হয়নি', কিন্তু তার অর্থটা যে কী সেটা আর ভেঙে বলল না। 'নিষ্পাপ দেবশিশু সম' প্রার্থনাগীতের সময় সে গলা মেলাতে গিয়েও ছেড়ে দিল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর গির্জার পাথরের মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে সেই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থাকল।

শেষকালে শুরু হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্রত্যেকের হাতে মোমবাতি ধরিয়ে দেওয়া হল। আবারও পাগলের মতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠার উপক্রম করল ইলিউশার বাবা। কিন্তু সমাধি সঙ্গীতের আবেগঢালা আশ্চর্য সুরমাধুর্য তার মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিল, তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। হঠাৎ সে কেমন যেন গুটিসুটি মেরে গেল, থেকে থেকে ঘন ঘন কান্নায় ভেঙে পড়তে লাগল। গোড়াতে কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছিল কিন্তু শেষকালে গলা ছেড়ে ডুকরে কাঁদতে লাগল। মৃতের কাছ থেকে শেষ বিদায়ের সময় ডালা বন্ধ করার পালা আসতে সে কফিনটা দু হাতে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরল যেন কফিনের ডালা বন্ধ করতে দেবে না। আকুল হয়ে ঘন ঘন সে তার মৃত সন্তানের ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল। শেষকালে সকলে মিলে অনেক বলে কয়ে তাকে সরে আসতে রাজি করাল। ওরা তাকে সিঁড়ির ধাপ থেকে প্রায় সরিয়েও এনেছিল, এমন সময় কী মনে হতে সে হাত বাড়িয়ে কফিনের ভেতর থেকে ছোঁ মেরে কয়েকটা ফুল তুলে নিল। ফুলগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ

যেন নতুন একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে গেল, যেন মুহূর্তের জন্য আসল বিষয়টাই সে ভুলে গেল। মনে হল অল্প অল্প করে গভীর কোনো একটা ভাবনার মধ্যে সে ডুবে গেল। কফিনটা তুলে নিয়ে যখন গোর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে আর কোনো বাধা দিল না। জায়গাটা ছিল গির্জার চত্বরের মধ্যে, খুব একটা দূরে নয়, গির্জার একেবারে গায়ে। কাতেরিনা ইভানভ্‌নার অর্থানুকূল্যে এই জায়গাটা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। চিরাচরিত অনুষ্ঠান সমাধার পর সমাধিখনকেরা কফিনটা গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিল। স্নেগেরিয়োভ্‌ ফুল হাতে করে খোলা গর্তটার ওপর এতদূর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল যে ছেলের দল ভয় পেয়ে পেছন থেকে তার ওভারকোটের খুঁট ধরে তাকে টেনে রেখেছিল। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক কী ঘটতে চলেছে তা সে বুঝতে পারছে না। যখন মাটি ফেলে সমাধি বুজিয়ে দেওয়া হতে লাগল তখন হঠাৎ সে উদ্বিগ্ন হয়ে সে দিকে ইঙ্গিত করে কিছু একটা বলতে শুরু করল। কিন্তু কী বলতে চায় কেউই বুঝতে পারল না। তা ছাড়া সে নিজেও বলতে বলতে হঠাৎই চুপ করে গেল। এমন সময় তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে রুটির শক্ত পিঠটা গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। শোনামাত্র দারুণ উত্তেজিত হয়ে পকেট থেকে সেটা বের করে ছিঁড়তে শুরু করল, ছিঁড়ে কুটিকুটি করে কবরের ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগল। 'এসো পাখিরা, উড়ে এসে বসো গো, চড়ুই পাখিরা!' উৎকণ্ঠিত ভাবে বিড়বিড় করে সে বলল। ছেলেদের মধ্যে কে একজন তাকে বলতে গেল যে ফুল হাতে করে রুটির টুকরো কুটি কুটি করে ছেঁড়া তার পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে, তাই ফুলগুলি আপাতত ধরার জন্য সে যেন কারও হাতে দিয়ে দেয়। কিন্তু কারও হাতে দেওয়া তো দূরের কথা, এমনকি একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের কথা ভেবে সে এত ভয় পেয়ে গেল যে মনে হল কেউ বুঝি তার কাছ থেকে সেগুলি একেবারে কেড়ে নিতে আসছে। এর পর কবরটার দিকে তাকিয়ে যেন যা যা করার ছিল সব করা হয়ে গেছে, রুটির টুকরোও গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—এই দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার পর বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে আকস্মিক ভাবে, এমন কি শান্ত ভাবে ঘুরে গিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দেখতে দেখতে তার পদক্ষেপ আরও ঘন ঘন এবং গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠতে লাগল। দ্রুত পায়ে সে প্রায় ছুটতেই শুরু করে দিল। ছেলের দল এবং আলিয়োশাও তার পিছু ছাড়ল না।

"ওর মাকে দিতে হবে, ফুলগুলো ওর মাকে দিতে হবে! ওর মনে ব্যথা দেওয়া হয়েছে", হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল। কে একজন তাকে চেঁচিয়ে ডেকে টুপিটা মাথায় দিতে বলল, যেহেতু বাইরে এখন ঠান্ডা আছে। কিন্তু একথা শুনে অনেকটা যেন রাগের মাথাতেই হাতের টুপিটা পাক মেরে বরফের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বলতে শুরু করল 'টুপি-ফুপি দরকার নেই, চাইনে টুপি, রইল টুপি!' স্মুরভ্‌ নামে ছেলেটা টুপি কুড়িয়ে নিয়ে তার পেছন পেছন বয়ে নিয়ে চলল।

ছেলেদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে কাঁদল না। সবার চেয়ে বেশি কাঁদছিল কোলিয়া আর সেই ছেলেটা যে ট্রয় আবিষ্কার করেছিল। ক্যাপ্টেনের টুপি হাতে স্মুরভ্ও ভীষণ ভাবে কাঁদছিল, কিন্তু তাহলেও এরই মধ্যে প্রায় ছুটতে ছুটতে পথে বরফের ওপর একটা লাল রঙের ভাঙা ইটের টুকরো দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে তুরন্ত এক ঝাঁক উড়ন্ত চড়ুই পাখিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। বলাই বাহুল্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আবারও কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে লাগল। অর্ধেক পথে এসে স্নিগেরিয়োভ্ সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল, আধ মিনিট খানেক মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎই পিছনে গির্জার দিকে ঘুরে গিয়ে ফেলে আসা কবর লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু ছেলেরা নিমেষের মধ্যে তার নাগাল ধরে ফেলল, চারপাশ থেকে তাকে জাপটে ধরল। এই সময় সে অসহায়ের মতো এমন ভাবে বরফের ওপর টলে পড়ে গেল যে মনে হল কেউ বুঝি তাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে! পড়ে গিয়ে ছটফট করতে করতে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। 'ইলিউশা, বাবা আমার! বাছা আমার! ওরে আমার খোকা রে!'—বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিলাপ করতে লাগল। আলিয়োশা ও কোলিয়া তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নানা কথায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

“হয়েছে ক্যাপ্টেন, আর নয়। সাহসী মানুষকে সব কিছু সইতে হয়”, বিড়বিড় করে কোলিয়া বলল।

“ফুলগুলো তো আপনি নষ্ট করে ফেলবেন দেখছি”, আলিয়োশা বলল। “এদিকে মা’ ওগুলোর জন্য হাঁ করে বসে আছেন। আপনি যে তখন ইলিউশার কাছ থেকে তুলে এনে দিলেন না সেজন্য কান্নাকাটি করছেন। ইলিউশার শয্যাটা এখনও ওখানে পড়ে আছে।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। মার কাছেই তো যাচ্ছি!” আবারও হঠাৎ স্নেগিরিয়োভের মনে পড়ে গেল। “আরে তাই তো! ওর শয্যাটা তুলে ফেলবে যে! ঠিক তুলে ফেলবে!” সে যোগ করল—যেন সত্যি সত্যি শয্যা তুলে ফেলা হচ্ছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করে দিল। বাড়ি তখন বেশি দূরে নেই। সকলেই ছুটতে ছুটতে একসঙ্গে এসে পৌঁছুল। এই কিছুক্ষণ আগে স্ত্রীর সঙ্গে স্নেগিরিয়োভের একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল, তখন সে স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু এখন বাড়িতে পৌঁছেই ভেজানো দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে সে স্ত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

স্নেগিরিয়োভ্ যখন বরফের ওপর পড়ে ছটফট করছিল সেই সময় তার হাতে ধরা গোছার ফুলগুলো বরফে জমে গিয়েছিল, দুমড়ে গিয়েছিল। সেই ফুলের গোড়াটাই গিন্নির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে তাকে বলল, “এই যে গিন্নি,

আমাদের খোকা তোমাকে ফুল পাঠিয়েছে গো! তোমার আবার পায়ের ব্যামো আছে কিনা!"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ইলিউশার শয্যার সামনে, ঘরের কোনায় ইলিউশার পুরনো, রংচটা, শুকনো চড়চড়ে ছোটো বুট জুতো জোড়ার ওপর তার নজর পড়ল। বাড়িউলি সবে জুতো দুটো পাশাপাশি গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল। দেখামাত্র সে দু হাত তুলে সে দিকে ছুটে গেল, নতজানু হয়ে বসে পড়ে একপাটি জুতো চট করে তুলে নিয়ে তাতে ঠোঁট ঠেকাল, ব্যাকুল হয়ে সেটাতে চুমু খেতে খেতে চিৎকার করে বলতে লাগল "ইলিউশা, খোকা আমার, বাবা আমার, কোথায় গেল রে তোর ওই পা দুটো?"

"কোথায়? কোথায় তুমি ওকে নিয়ে রেখে এলে?" হৃদয় বিদারক কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল উন্মাদগ্রস্ত মহিলা। এই সময় নিনাও ডুকরে কেঁদে উঠল। কোলিয়া ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন অন্য ছেলেরাও বেরিয়ে যেতে লাগল। শেষ কালে আলিয়োশাও বেরিয়ে গেল।

"কাঁদুক, কেঁদে হালকা হোক", কোলিয়াকে সে বলল। "এই সময় সান্ত্বনা দিতে যাবার কোনো মানে হয় না। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে ফিরে যাওয়া যাবে।"

"ঠিক কথা, কোনো মানে হয় না। কী ভয়ঙ্কর!" কোলিয়া সায় দিয়ে বলল। "জানেন কারামাজ়ভ্ " যাতে কেউ না শুনতে পায় এমন ভাবে হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামিয়ে সে বলে উঠল, "আমার বড়ো দুঃখ হচ্ছে। আহা, ওর জীবন যদি ফিরিয়ে আনা যেত তার জন্য পৃথিবীতে এমন জিনিস নেই যা আমি দিতে পারতাম না!"

"ওঃ, আমিও!" আলিয়োশা বলল।

"আপনার কী মনে হয় কারামাজ়ভ্, আজ সন্ধ্যায় কি এখানে আমাদের একবার আসতে হয়? মদ খেয়ে চুর মাতাল হয়ে থাকবে যে।

"হয়ত মাতাল হয়েই থাকবে। আসতে হলে শুধু আমরা দুজনই আসব। ওর মা আর নিনার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বসে কাটানোর পক্ষে সেটাই যথেষ্ট হবে। সবাই যদি এক সঙ্গে মিলে আসে তাহলে আবার সব কিছু নতুন করে ওদের মনে পড়ে যাবে।" আলিয়োশা পরামর্শ দিল।

"এদিকে বাড়িউলি দেখছি টেবিল সাজাতে লেগেছে। পারলৌকিক অনুষ্ঠানের খাওয়া দাওয়া গোছের কিছুর আয়োজন হচ্ছে, পুরুতমশাইও আসবেন। এখন আমাদের কি তাহলে ওখানে ফিরে যেতে হয়? আপনি কী বলেন কারামাজ়ভ্?

"অবশ্যই।"

"তাজ্জবের বিষয়, কারামাজ়ভ্, এত বড়ো একটা শোক, এর মধ্যে কিনা প্যানকেক-ট্যানকেক যত সব খাওয়াদাওয়ার ধুম! আমাদের ধর্মের এসব কী অস্বাভাবিক ব্যাপার বলুন তো!"

"ওখানে আবার দামি স্যামন মাছও থাকবে", গলা চড়িয়ে দুম্ করে মন্তব্য করে বসল ট্রয়ের আবিষ্কারক ছেলেটি।

"দোহাই আপনার, কার্তাশভ্ আমি আপনাকে ভালো করেই বলে দিতে চাই ওসব বোকা-বোকা মন্তব্য করে ফের অনধিকার চর্চা করতে যাবেন না—বিশেষ করে কথা যখন আপনার সঙ্গে হচ্ছে না এবং আপনি এই পৃথিবীতে আছেন কি নেই তাও জানার কোনো সাধ কারও নেই।" বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুখের ওপর তাকে শুনিয়ে দিল কোলিয়া। ছেলেটা দপ্ করে জ্বলে উঠল ঠিকই, কিন্তু উত্তরে কিছু বলার মতো সাহস পেল না।

ইতিমধ্যে সকলে ধীরে সুস্থে পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে চলছিল, এমন সময় স্মুরভ্ চেঁচিয়ে বলে উঠল

"এই তো ইলিউশার সেই পাথরটা, যেটার তলায় ওকে কবর দেবার কথা উঠেছিল!"

ওরা সকলে নীরবে বড়ো পাথরটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আলিয়োশা তাকিয়ে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল পুরোপুরি সেই দৃশ্যটা যার বিবরণ স্নেগিরিয়োভ্ এক সময় ইলিউশা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আলিয়োশাকে দিয়েছিল, যখন ইলিউশা কাঁদতে কাঁদতে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল: 'বাপি, বাপি, লোকটা কী অপমানই না করল তোমাকে!' আলিয়োশার বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। গম্ভীর মুখে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সে একে একে ইলিউশার স্কুলের বন্ধু এই ছেলেদের সকলের ঝলমলে মিষ্টি মুখগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ তাদের বলল

"ওহে ছেলেরা, এখানে, ঠিক এই জায়গাটাতেই আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই।"

ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরল, তৎক্ষণাৎ তাদের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হল, তারা উদ্গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকাল।

"ছেলেরা, তোমাদের সঙ্গে আমার শিগ্‌গিরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আপাতত, এখনকার মতো আমাকে আমার দুই ভাইকে নিয়ে কিছু সময় কাটাতে হবে। তাদের মধ্যে একজন নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে সাইবেরিয়া যাচ্ছে, আরেকজন মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু শিগ্‌গির আমি এই শহর ছেড়েও চলে যাব—হয়তো বা খুবই দীর্ঘ সময়ের জন্য। মোটকথা, ছেলেরা, তোমাদের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এসো, এখানে, ইলিউশার এই পাথরটার সামনে আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিই যে আমরা কখনওই প্রথমত, ইলিউশাকে ভুলব না, দ্বিতীয়ত একে অন্যকে ভুলে যাব না। পরে আমাদের জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, এমনকি এর পর যদি বিশ বছরও আমাদের মধ্যে কোনো দেখাসাক্ষাৎ না হয় তাহলেও আমাদের যেন মনে থাকে কী ভাবে আমরা গোর দিয়েছিলাম এই বেচারি ছেলেটাকে, যাকে—তোমাদের

মনে আছে?—ওই সাঁকোটার কাছে এক সময় তোমরা ঢিল ছুড়ে মেরেছিলে?—তারপর ভালোও বেসেছিলে? ও ছিল চমৎকার ছেলে, ওর মনে দয়া মায়া ছিল, বুকে সাহস ছিল। ওর বাপের মান সম্মান সম্পর্কে বোধ ওর ছিল, তাকে যে রকম নিষ্ঠুর ভাবে অপমান করা হয়েছিল তা উপলব্ধি করে বাপের পক্ষ নিয়ে সে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই বলছিলাম কি, ছেলেরা, প্রথমত, আমরা ওকে সারা জীবন মনে রাখব। আমরা যত গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন, জীবনে সম্মান অর্জন করি বা যত বড়ো দুর্ভাগ্যের মধ্যেই পড়ি না কেন—তাহলেও আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই এক সময় আমরা এখানে কত ভালো ছিলাম, সকলে এক সঙ্গে একটা ভালোর এবং উদারতার এমন একটা অনুভূতি নিয়ে মিলেমিশে ছিলাম যা এই বেচারি ছেলেটাকে আমাদের ভালোবাসার এই সময়টাতে হয়তো বা আমাদেরও এত ভালো, এত বেশি মহৎ ও উদার করে তুলেছে যতটা আসলে আমরা নই। আমার খুদে বকম বকমরা—এসো, তোমাদের আমি এই নামেই ডাকি—কেন না এখন এই মুহূর্তে তোমাদের স্নিগ্ধ সুন্দর কোমল মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে তোমাদেরও তাদের মতো—ওই নীলচে আভার সুন্দর পাখিগুলোর মতোই আমার মনে হচ্ছে। আমার আদরের কচিকাঁচারা, আমি তোমাদের যা বলছি তোমরা হয়তো তা বুঝতে পারবে না, কারণ আমি অনেক সময়ই এমন কথা বলি যা খুব একটা বোধগম্য নয়। কিন্তু তা হলেও যা বলছি তা মনে করে রেখো, পরে কোনো এক সময় আমার কথা তোমাদের মেনে নিতে হবে। জেনে রাখ, কোন্ সুখের স্মৃতির ওপরে, তার চেয়ে প্রবল, উপকারী বা স্বাস্থ্যকর কোনো সম্পদ তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না—বিশেষত সেই সুখস্মৃতি যদি তোমার ছোটবেলার হয়, তোমার পৈতৃক ভিটার হয়। তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে লোকে তোমাদের কত কথাই না বলে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে এই ধরনের কোনো মধুর ও পুণ্যস্মৃতি মনের গহনে সযত্নে রক্ষা করে চলা—সব চাইতে বড়ো শিক্ষা সম্ভবত এটাই। এরকম স্মৃতি যদি জীবনে কেউ অনেক সঞ্চয় করতে পারে তাহলে বলতে হবে সে ব্যক্তি সারা জীবনের মতো উদ্ধার পেয়ে গেল। এমনকি একমাত্র একটি সুখস্মৃতিও যদি আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায় তাহলেও সেটাই কোনো এক সময় আমাদের উদ্ধারের উপায় হতে পারে। এমনও হতে পারে যে পরে হয়তো আমরা দুর্বৃত্তে পরিণত হলাম, এমন কি হয়তো দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম, মানুষের চোখের জল দেখে উপহাস করতে লাগলাম, আর এই যে কিছুক্ষণ আগে কোলিয়া যেমন বলে উঠেছিল 'আমি সকলের জন্য কষ্ট ভোগ করতে চাই!'—তার মতো লোকদের নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতে লাগলাম, হয়তো নিষ্ঠুর ঠাট্টা বিদ্রুপে তাদের জর্জরিত করতে লাগলাম; কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমরা যত খারাপই হই না কেন—ঈশ্বর না করুন, আমরা যেন তা না হই—তবু আমি বলব, যখনই আমাদের মনে পড়ে যাবে কী ভাবে আমরা

আমাদের ইলিউশাকে সমাধিস্থ করেছিলাম, মনে পড়ে যাবে ইলিউশার জীবনের শেষ দিনগুলিতে আমরা তাকে কী পরিমাণ ভালোবেসেছিলাম, আর এই এখন আমরা সকলে এমন বন্ধুর মতো মিলেমিশে এই পাথরের খণ্ডটার সামনে এত সব কথা বলেছিলাম — যখন তা আমাদের মনে পড়ে যাবে তখনই কিন্তু দেখা যাবে আমাদের মধ্যে সব থেকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও পরিহাসপ্রিয় লোকটি পর্যন্ত—যদি সেরকমই হওয়া আমাদের কারও কপালে থাকে—এই এখন, এই মুহূর্তটিতে সে যে এত ভালো, এত উদার ছিল সে কথা মনে পড়ে যেতে এমনকি মনে মনেও হাসার স্পর্ধা করবে না! শুধু কি তাই? তার এই একটা স্মৃতিই হয়তো তাকে বড়ো রকমের দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত করবে, তাকে ভাবতে হবে, সে তখন বলবে 'তাই তো তখন আমি উদার ছিলাম, আমি সাহসী আর সৎ ছিলাম!' না হয় হাসলই মনে মনে, তাতে কিছু আসে যায় না। লোকে অনেক সময় ভালো আর উদার প্রকৃতির কিছু দেখলে হাসে। সে কেবল তাদের চপল স্বভাবের দরুন। কিন্তু ছেলেরা, আমি তোমাদের আশ্বস্ত করে বলতে পারি মনে মনে যেই হাসবে অমনি অন্তর থেকে সে বলবে 'না হাসাটা ঠিক হয়নি, এ নিয়ে হাসা উচিত নয়!'

"অবশ্যই তাই হবে, কারামাজভ্। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি কারামাজভ্!" বলতে বলতে কোলিয়ার দু চোখে ঝলক দিয়ে উঠল।

ছেলেদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারাও উল্লসিত হয়ে কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিল। বিগলিত হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তারা বক্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"একথা আমি তোমাদের বলছি এই আশঙ্কা করে যে যদি আমরা খারাপ হয়ে যাই", আলিয়োশা বলে যেতে লাগল, "কিন্তু আমরা খারাপ হতেই বা যাব কেন? ঠিক কিনা ভাই, তোমরাই বল না? প্রথমত, সর্বোপরি আমরা ভালো মানুষ হব, তারপর আমরা সৎ হব, তারপর আরও কথা হল আমরা কেউ কাউকে কখনও ভুলে যাব না। একথা আমি আবারও বলছি। শোন ছেলেরা, আমি আমার নিজের তরফ থেকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমাদের একজনকেও ভুলব না—এই যে মুখগুলো এখন আমার দিকে চেয়ে আছে তাদের প্রত্যেকটিকে আমার মনে থাকবে—এমন কি ত্রিশ বছর পরে হলেও মনে থাকবে—এমন কি ত্রিশ বছর পরে হলেও মনে থাকবে। এই যে কিছুক্ষণ আগে কার্তাশভ্কে কোলিয়া এমন কথা বলল যেন কার্তাশভ্ 'এই পৃথিবীতে আছে কি নেই' তাতে আমাদের বয়েই গেল। তা কেন হবে? কার্তাশভ্ যে এই পৃথিবীতে আছে তা আমি ভুলে যাই কী করে যখন আমি দেখতে পাচ্ছি এই তো সে আর তখনকার মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে না যখন সে ট্রয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলেছিল, তার বদলে এখন কেমন সুন্দর, দরদমাখা, খুশি চোখের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে! এসো ছেলেরা, আমার আদরের সাথীরা,

আমরা সবাই আমাদের ইলিউশার মতো উদার মনের হই, সাহসী হই, আমাদের এই যে কোলিয়া—যে বয়সকালে আরও বুদ্ধিমান হবে—তার মতোই বুদ্ধিমান, সাহসী আর উদার হই, কার্তাশভের মতো লাজুক প্রকৃতির অথচ বুদ্ধিমান আর মিষ্টি স্বভাবের হই। অবশ্য শুধু এই দুজনের কথাই বা বলি কেন! তোমরা, ছেলেরা সবাই আমার বড়ো প্রিয়, তোমাদের সবাইকে আমি আমার বুকের ভেতরে ধারণ করছি। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমরাও যেন আমাকে তোমাদের বুকের ভেতরে স্থান দিয়ো! আর হ্যাঁ, এই যে এত ভালো এমন উদার একটা উপলব্ধি যা আমাদের সারা জীবন মনে থাকবে, যতকাল আমরা বেঁচে থাকব ততকাল মনে করে রাখব বলে আমরা সঙ্কল্প করেছি যে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমাদের মনের মধ্যে তা গেঁথে দিয়েছিল? কে আবার? আমাদের ইলিউশা, আমাদের আদরের সেই মিষ্টি ছেলেটা—তাকে আমরা চিরকাল মনে রাখব না তো কাকে মনে রাখব! তাকে আমাদের কখনও ভুলে গেলে চলবে না। আজ থেকে তার মধুর স্মৃতি চিরকালের জন্য আমাদের মনের মধ্যে থেকে যাবে। অমর হোক তার স্মৃতি!"

"ঠিক কথা, ঠিক কথা, অমর হোক!" অমনি সুরেলা গলায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলের দল। উচ্ছ্বসিত আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল তাদের চোখমুখ।

"আমরা তার মুখ মনে রাখব, তার জামাকাপড়, তার সেই বেহাল জুতোজোড়া, তার ছোট্ট কফিনটা—সবই মনে রাখব। মনে রাখব তার হতভাগ্য দুরাচার বাপকে, মনে রাখব কী ভাবে সাহস করে ছেলে তার বাপের পক্ষ নিয়ে ক্লাসের সকলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল!"

"মনে রাখব, মনে রাখব!" ছেলের দল আবার কলবল করে উঠল। "ওর বুকের পাটা ছিল, ওর মনটা উদার ছিল!"

"ওঃ আমি ওকে কী ভালোই না বাসতাম!" কোলিয়া বলে উঠল।

"ওহে ছেলের দল, আমার প্রিয় সাথীরা, তোমরা জীবনকে ভয় পাবে না! যখন ভালো বা সৎ কোনো কাজ করবে তখনই দেখতে পাবে জীবন কত ভালো!"

"তাই তো, তাই তো", উল্লসিত হয়ে বারবার বলতে লাগল ছেলেরা।

"কারামাজ়ভ্, আমরা আপনাকে ভালোবাসি!" ওদের মধ্য থেকে একটা কণ্ঠস্বর আবেগ সামলাতে না পেরে বলে উঠল—মনে হল কার্তাশভের কণ্ঠস্বর।

"আমরা আপনাকে ভালোবাসি, আমরা আপনাকে ভালোবাসি", সকলে সুর মেলাল। অনেকের চোখে জল চিকচিক করতে লাগল।

"বাহবা কারামাজ়ভ্!" কোলিয়া উল্লাসে ফেটে পড়ল।

"আমাদের সাথী মরা ছেলেটার স্মৃতি অক্ষয় হোক!" আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে আলিয়োশা আবার যোগ করল।

“অক্ষয় হোক ওর স্মৃতি!” আবারও সুর মেলাল ছেলের দল।

“কারামাজ়ভ্‌!” কোলিয়া চিৎকার করে তাকে ডেকে বলল, “আচ্ছা আমাদের ধর্মে যে বলে আমরা নাকি সবাই এক দিন মৃত্যু থেকে উঠে দাঁড়াব, আবার জীবন ফিরে পেয়ে একে অন্যের দেখা পাব, আমাদের সকলের, এমনকি ইলিউশারও দেখা পাব?—এটা কি সত্যি?”

“অবশ্যই উঠে দাঁড়াব, অবশ্যই একে অন্যের দেখা পাব, আনন্দে উল্লসিত হয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের যার যার জীবনের কথা আমরা একে অন্যকে বলব!” সামান্য একটু হেসে, সামান্য খানিকটা উৎসাহের ভাব দেখিয়ে আলিয়োশা উত্তর দিল।

“আহা, কী ভালোই না হবে!” কোলিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

“আচ্ছা, এবারে কথা শেষ করা যাক। চল সবাই মিলে ওর অন্ত্যেষ্টি ভোজনের জায়গায় যাওয়া যাক। আমরা প্যান কেক খাব বলে মুষড়ে পড়ার কোন কারণ নেই। এটা আবহমন কালের একটা প্রাচীন প্রথা, এর মধ্যে ভালোও আছে।” আলিয়োশা হাসল। “চল, চল, যাওয়া যাক! এই তো আমরা এখন কেমন হাত ধরাধরি করে চলেছি।”

“এই ভাবে আমরা চিরটা কাল, আমাদের সারাটা জীবন হাত ধরাধরি করে চলব! বাহবা কারামাজ়ভ্‌!” আরও একবার উল্লসিত হয়ে চ্যাঁচাল কোলিয়া। এবারেও ছেলের দল আরও একবার তার সুরে সুর মেলাল।

The Online Library of Bangla Books

# টীকা-টিপ্পনী

(১) মঠের কোনো সাধুর মরদেহ তার আশ্রম প্রকোষ্ঠ থেকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে সেখানে যথারীতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির পর যখন সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সাধু নিছক সন্ন্যাসী বা কৃচ্ছ্রসাধক হলে সেই সময় তার জন্য 'মধুময় আহা ও জীবন গীত হয়। কিন্তু মৃতব্যক্তি যদি উচ্চস্তরের কোনো সিদ্ধপুরুষ এবং যাজক শ্রেণির কেউ হন তাঁর জন্য 'সহায় ও রক্ষক' স্তোত্র গীত হয়।

(২) বাইবেলের কিংবদন্তি অনুযায়ী মেরি ম্যাগ্‌ডালিনের মাথা থেকে সাত শয়তানকে বিতাড়ন করে যিশু তাকে সৎপথে এনেছিলেন।

(৩) গ্যালিলির কানা গ্যালিলি—প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশ। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল মৎস্যজীবী। কানা—গ্যালিলির একটি ছোটো শহর। নাজারেত্‌-এর সন্নিকটবর্তী।

সুসমাচারে কথিত আছে কানা-তে এক বিবাহের ভোজসভায় যিশু জলকে সুরায় পরিণত করে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

(৪) মূলত ডাক ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য তখনকার দিনে 'রিলে' প্রথায় এক স্টেশন বা ঘাঁটি থেকে আরেক স্টেশনে ডাক গাড়ির ঘোড়া বদল করা হত। দীর্ঘ পথযাত্রায় ঘোড়া যাতে ক্লান্ত না হয়ে বিশ্রাম নিতে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। যাত্রীরাও এই ভাবে গাড়ি ও ঘোড়া ভাড়া নিয়ে দূর দূর পথে যাত্রা করতে পারত। প্রতি স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকত।

(৫) ১৮৩৪-১৮৩৬ সালে Table talk নামে টুকরো মন্তব্য সংগ্রহে পুশ্‌কিন ওথেলোর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন।

(৬) ও (৭) মিখাইল ইয়েভ্‌গ্রাফভিচ্‌ সাল্‌তিকভ্‌-শ্চেদ্রিন (১৮২৬-১৮৮১) ঊনবিংশ শতাব্দীর ৬০ থেকে ৮০-র দশকের রুশ সমালোচনামূলক বাস্তবতার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় লেখক। ইতিহাস ও উপন্যাসধর্মী ব্যঙ্গ রচনা এবং রূপকথার আঙ্গিকে রাজনৈতিক রঙ্গরচনার লেখক। সামাজিক অন্যায় অবিচারের কঠোর সমালোচক। জারের আমলের কঠোর সেন্সর ব্যবস্থার বারবার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে জারের হুকুমে আট বছর রাজধানী পেতের্বুর্গের বাইরে তাঁকে নির্বাসনের জীবন কাটাতে হয়।

সভ্রেম্যেন্নিক (সমকালীন) পত্রিকায় প্রায় দু বছর কাজ করেন। সেখানে তাঁর বহু সংখ্যক গল্প নক্‌শা প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি দু দুবার সেন্সর বোর্ডের কোপে পড়ে। দু দুবার সেন্সর বোর্ড থেকে সাবধানবাণী পাঠানোর পর ১৮৬৬ সালে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাসে খখ্‌লাকোভার চিঠির এই উল্লেখে শেচদ্রিন তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন 'স্বদেশবৃত্তান্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে।

লেখার মধ্য দিয়ে শেচদ্রিনের সঙ্গে দস্তইয়েভ্‌স্কির যে চাপান উতোর ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায় শুরু হয়েছিল দস্তইয়েভ্‌স্কির 'কারামাজ়ভ্ ভাইয়েরা' উপন্যাস লেখার সময়ও তা অব্যাহত ছিল।

(৮) কবি ফিয়োদর ইভানভিচ্ ত্যুত্‌চেভ্ (১৮০৩-১৮৭৩) এর কবিতা থেকে!

(৯) শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের শেষ অঙ্ক (পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) থেকে!

ইওরিক-ডেনমার্কের রাজার মৃত বিদূষক, যার করোটিকে উপলক্ষ্য করে হ্যামলেটের দার্শনিক ভাবনাচিন্তা।

(১০) বুআলো (Boileau) নিকোলা বুআলো (১৬৩৬-১৭১১) ফরাসি কবি। ক্লাসিসিজমের তাত্ত্বিক। L' art poétique-এ কাব্যকলা, ১৬৭৪) উক্ত তত্ত্বের বিধি সম্পর্কে লেখেন।

(১১) রুশ সাহিত্যিক ও নীতিকবিতার রচয়িতা ইভান আন্দ্রেইয়েভিচ্ ক্রিলভ্ (১৭৬৯-১৮৪৪)। বুআলোর L' art poétique এর রুশ অনুবাদ প্রসঙ্গে।

(১২) কোনো এক রুশ মহিলা কবির উদ্দেশে বিখ্যাত রুশ কবি কন্‌স্তান্তিন নিকলাইয়েভিচ বাত্যুশ্‌কভের (১৭৮৭-১৮৫৫) একটি চুটকি (১৮০৯)।

(১৩) জনৈক স্বল্পখ্যাত ফরাসি কবি আলেক্সিস পিরোঁ (১৩৮৯-১৭৭৩)-র চুটকি কবিতা 'আমার সমাধিলিপি'।

(১৪) ১৭৭২ সালে পোল্যান্ড থেকে বেলোরুস্ ও লিভ্‌লাভের একটি অংশ রাশিয়ায় চলে যায়।

(১৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে দেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে লাতিন ও গ্রিক ভাষার পঠন পাঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এর পিছনে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ছিল দেশের যুবমানসে যে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছিল তা থেকে যুব সমাজকে বিমুখ করা! এই সরকারি 'ক্ল্যাসিসিজম' সেই সময়ে রুশদেশের অগ্রণী সমাজে ধিক্কৃত হয়েছিল।

(১৬) ভিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি (১৮১১-১৮৮৪) প্রখ্যাত রুশ মনীষী, চিন্তাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক।

রুশ সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর বৃহত্তম অবদান কবি ও নাট্যকার 'আলেক্সান্দ্র

পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)-এর রচনা' সম্পর্কে ১৭টি প্রবন্ধের এক ধারাবাহিক পর্যালোচনা। এর মধ্যে পুশ্‌কিনের বিখ্যাত কাব্যোপন্যাস 'য়েভ্‌গিয়েনি অনিয়েগিন' প্রসঙ্গও আছে।

খ্রিস্ট প্রসঙ্গে বেলিনস্কি না, বেলিনস্কি এমন কথা কোথাও লিখে যাননি, কিন্তু দস্তইয়েভ্‌স্কির লেখকের দিনলিপি'তে খ্রিস্ট সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বেলিনস্কির এরকম একটা মন্তব্যের উল্লেখ আছে। দস্তইয়েভ্‌স্কি তাঁর নিজের স্মৃতিকথা থেকে বেলিনস্কির এই মন্তব্য কোলিয়া ক্রাসোত্‌কিনের মুখে লাগিয়েছেন। তবে আলিয়োশাকে যে বেলিনস্কির রসবেত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে সেটা বাস্তব সম্মত নয়—একজন অল্পবয়সি শ্রমণের যে পুথির জগৎ তাতে বেলিনস্কির কোনও স্থান ছিল না।

(১৭) তাতিয়ানা—পুশ্‌কিনের 'য়েভ্‌গিয়েনি অনিয়েগিন্'-এর নায়িকা।

(১৮) কবি দ্‌মিত্রি মিনায়েভের (১৮৩৫-১৮৮৯) ব্যঙ্গ কবিতা থেকে। 'ইস্ক্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত। তিন নম্বর ডিপার্টমেন্ট—গোপন পুলিশ দপ্তর। রাজধানী সাংক্‌ত পেতের্বুর্গের শিক্‌লি সেতুর ধারে দপ্তরের দালানটির অবস্থান ছিল।

(১৯) যেরুসালেম থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর জনৈক প্রার্থনা সংগীত রচয়িতার আক্ষেপ 'If I forget thee o, Jerusalem, let my right hand forget her cunning!'

(২০) ১৮৬১ সালে সরকারের কৃষি সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথা আইনত বিলুপ্ত হয়। তাই ১৮৭৯-৮০ তে যখন 'কারামাজভ্ ভাইয়েরা' লিখিত হয় সেই সময় অতীতের এই কুপ্রথার সমর্থনকে একটা সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য করা হত।

(২১) এই সময় মস্কোয় জনসাধারণের অর্থে মহাকবি পুশ্‌কিনের স্মৃতিমূর্তি নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৭১ থেকে চাঁদা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায়।

১৯৮০ সালের জুন মাসে উক্ত স্মৃতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় দস্তইয়েভস্কি তাঁর বিখ্যাত পুশ্‌কিন ভাষণ দান করেন।

(২২) Claude Bernard (1813-1878) বিখ্যাত ফরাসি শরীর বিজ্ঞানী। পরীক্ষামূলক রোগবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী দ্‌মিত্রি কারামাজ়ভের পক্ষে ক্লোদ বের্নার-এর বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

(২৩) স্বাধীন ভ্রাতৃসংঘ Free masonry (ফ্রি মেসনরি) নামে পরিচিত এই সঙ্ঘ পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সর্ববৃহৎ বিশ্ব ভ্রাতৃসঙ্ঘ। ঈশ্বর পরিবার প্রতিবেশী ও দেশের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের এই সংগঠনটি প্রায় তিন শ বছরের প্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে এর উদ্ভব, পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রুশ অভিজাত মহলে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

মধ্যযুগীয় বীরব্রতী নাইটদের আচরণবিধির সঙ্গে সঙ্ঘের আচরণবিধির কিঞ্চিৎ মিল আছে। সাঙ্কেতিক ও গোপন ধরনের কিছু আচরণবিধি সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় অনেকে এটিকে গুপ্তসমিতি বলে মনে করে।

(২৪) 'গাত্‌ৎসুক-এর পত্রিকা (১৮৭৬-১৮৯০) এবং তার ক্রোড়পত্র হিসেবে চিত্র সংবলিত সাপ্তাহিক 'ধর্মীয় ক্যালেন্ডার' -এর জনৈক প্রকাশক।

(২৫) নিকলাই গোগলের (১৮০৯-৫২) 'ইনস্পেক্টর জেনারেল' (১৮৩৬) ব্যঙ্গ নাটকের মুখ্য চরিত্র, এক যুবক।

(২৬) গ্রিক ও হিব্রীয় ভাষায় ঈশ্বরের প্রশস্তিসূচক ধ্বনি, যার আক্ষরিক অর্থ 'পরিত্রাণ কর এবে'। দ্র. মথিলিখিত সুসমাচার ২৬ ৯, ১৫ ইত্যাদি।

(২৭) ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত-এর (১৫৯৬- ১৬৫০) বিখ্যাত উক্তি।

(২৮) যোনাহ্ (খ্রি পূ অষ্টম শতাব্দী) বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' -এ উল্লিখিত জনৈক মহাপুরুষ। কথিত আছে ঈশ্বরের আজ্ঞামতো কাজ না করে জাহাজে করে পলায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমুদ্রগর্ভে ঝড় ওঠায় যোনাহ্-ই যে তাদের এই বিপদের কারণ তা জানতে পেরে নাবিকেরা তাঁকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করে, ফলে ঝড় প্রশমিত হয়। এই সময় একটি বৃহদাকার তিমি তাঁকে গলাধঃকরণ করে। তিন দিন তিন রাত তিমির জঠরে অতিবাহিত হওয়ার পর ঈশ্বরের আদেশে তিমি শেষ পর্যন্ত তাঁকে উদ্‌গীরণ করে দেয়। যোনাহ্ পরে অবশ্য ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ম পালন করেছিলেন।

(২৯) ১৮৩৬ সালে পুশ্‌কিনের লেখা একটি কবিতার প্রথম পঙক্তি।

(৩০) প্রথম খণ্ডের ৫৫ সংখ্যক টীকা দ্র.

(৩১) কৌতূহলী পাঠক প্রসঙ্গত রুশ কথা সাহিত্যিক নিকলাই গোগলের (১৮০৯-১৮৫২) 'নাক' (১৮৩৬) গল্পটি দেখতে পারেন (দ্র. 'রচনা সপ্তক' নিকলাই গোগল, রাদুগা প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬)।

(৩২) গ্যেথের 'ফাউস্ট'-এর তৃতীয় দৃশ্যে মেফিস্টোফেলেসের ঘোষণা

আমি সেই শক্তির অংশবিশেষ
অনিষ্ট যে চায় সদা,
সদা করে মঙ্গলসাধন।

(৩৩) মার্টিন লুটার তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন না। শয়তান নাকি তাকে প্রলোভন দেখাতে এসেছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে একবার তিনি 'কালির দোয়াত পর্যন্ত ছুড়ে মেরেছিলেন 'শয়তানকে' ইভান কারামাজভের দৃষ্টি বিভ্রম লুটারের সর্বজনবিদিত বিভ্রমের কথা মনে করিয়ে দেয়।

(৩৪) ২২ সংখ্যক টীকা দ্র.

(৩৫) মোরাভীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ায় উদ্ভূত। জন্ হাস্ -এর অনুসারী। মিশনারি কার্যকলাপের জন্য

বিখ্যাত। হারন হুট্ ‘প্রভুর আশ্রিত’। জার্মান বসতিতে বসবাসকারী মোরাভীয় ভ্রাতৃসম্প্রদায়।

(৩৬) রোমান কবি Juvenall-এর একটি স্যাটায়ার থেকে। ‘Panem et circenses’ (আক্ষরিক অর্থে রুটি ও সার্কাস)!—জনতা সম্রাটের কাছে এই দাবি তুলেছিল।

(৩৭) বিখ্যাত রুশ কথাশিল্পী ও নাট্যকার নিকলাই ভাসিলিয়েভিচ্ গোগল (১৮০৯-১৮৫২) তাঁর ‘মৃত আত্মা’ উপন্যাস প্রসঙ্গে।

(৩৮) ‘মৃত আত্মা’ উপন্যাসে লেখক তৎকালীন পচনশীল সমাজব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং রাশিয়ায় তখন যে কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাতে রচনাটি প্রকাশের অনুমতি পাওয়াটাই অস্বাভাবিক ছিল। বক্তার ধারণা উপসংহারে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত আশার বাণী লেখক শুনিয়েছিলেন তার ফলেই সেন্সরের ছাড়পত্র মিলেছিল।

(৩৯) ‘মৃত আত্মার’ প্রধান কয়েকটি দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র।

(৪০) উক্তিটি ফরাসি সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের নামে প্রচলিত। তবে আসলে উক্তিটি করেছিলেন উক্ত সম্রাটের অন্যতম প্রিয়পাত্রী মাদাম দে পঁপাদুর (১৬৬৭-১৭০২)। রস্‌বাখ্‌-এ ফরাসী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর এই বলে তিনি সম্রাটকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য ‘আমার’ (moi) জায়গায় ‘আমাদের’ (nous) প্রযোজ্য।।

(৪১) ‘মৃত আত্মা’ উপন্যাসে লেখক ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্নীতিগ্রস্ত রাশিয়ার একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন ঠিকই. কিন্তু কাহিনির প্রথম খণ্ডের উপসংহারে ভাবী রাশিয়ার উদ্দেশে একটি স্তোত্রও রচনা করেছিলেন, যেখানে রাশিয়া সম্পর্কে তিনি একটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন “প্রবল ঘণ্টাধ্বনিতে দশ দিক মুখরিত করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে তিন ঘোড়ার গাড়ি ত্রোইকা।” লেখকের প্রশ্ন ‘কোথায় চলেছ রুশ? উত্তর দাও।’ “উত্তর মেলে না। দুর্বারগতি ত্রোইকার ঘণ্টা অবিরাম বেজে চলেছে ঢং ঢং ঢং—আকাশ-বাতাস মুখরিত, মণ্ডিত, বিদীর্ণ। শূন্যে শিস দিয়ে আছড়ে পড়ছে হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে চলেছে চলার পথের ধারের সব কিছু। অপাঙ্গে তাকিয়ে তাকে পথ করে দেয় আর সব দেশ, অন্য সব জাতি। ”

(৪২) ‘স্রষ্টা’ অর্থে ‘কবি’ শব্দটি প্রযুক্ত। প্রসঙ্গত, প্রাচীন গ্রিক ভাষাতেও “Poet” “নির্মাতা” অর্থে প্রযুক্ত; তা ছাড়া ‘মৃত আত্মা’র লেখক নিজেও তাঁর রচনাকে উপন্যাস অভিধায় অভিহিত না করে ‘কাব্য’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

(৪৩) ক্রন্‌শ্‌টাট্‌ ফিনল্যান্ড প্রণালীর একটি দ্বীপে অবস্থিত, পেতের্বুর্গের একটি অঞ্চল. রাশিয়ার নৌবাহিনীর ঘাঁটি এবং ইউরোপের সঙ্গে সমুদ্রপথে রাশিয়ার যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল।

(৪৪) নাট্যকার আলেক্সান্দ্র অস্ত্রোভস্কির ‘দুঃসময়’ (১৮৬২) নাটক থেকে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক বেনে বৌয়ের উক্তি 'আমি এমনই ভীতু না যে কী বলব! 'জুজুবুড়ির' নাম শুনলাম কি না হয়ে গেল—অমনি ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়!'

(৪৫) লাফঁতেন (১৬২১-১৬৯২)-এর একটি ফরাসি নীতিকবিতা শেষ তিন ছত্রের রুশ সাহিত্যিক নিকলাই কারাম্‌জিন (১৭৬৬-১৮২৬)-কৃত স্বচ্ছন্দ রুশ অনুবাদ। পরবর্তীকালে প্রবচনে পরিণত হয়।

(৪৬) সম্ভবত অধুনা অজ্ঞাত কোন প্রাচীন গ্রিক নাটকের একটি উক্তি। পরবর্তী কালে সুভাষিতে পরিণত। অনুমান করা হয় প্রাচীন গ্রিক ব্যঙ্গকার লুতিয়ান্ (১২০-১৮০ খ্রি.)-এর একটি রচনায় যুপ্পিতের (জেউস্)-এর প্রতি প্রোমেথউস্ -এর একটি উক্তির ('উত্তরের বদলে যখন বজ্র হাতে নিচ্ছ তখন বুঝতে হবে তুমি ভুল করছ।') রূপভেদ।

(৪৭) অর্থাৎ খনির গর্ভে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

The Online Library of Bangla Books